দেশ

২১ বর্ষ

সংখ্যা ৩১

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১

DESH SATURDAY, 5TH JUNE, 1954

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

পূর্ববঙ্গে গভর্নরের শাসন

পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেল জনাব গোলাম মহম্মদ হক মন্ত্রিসভাকে অপসারিত করিয়া পূর্ববঙ্গে গভর্নরের শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পাকিস্থানের দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী-জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা পূর্ববঙ্গের গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গে ধর-পাকড় আরম্ভ হইয়াছে। জনাব ফজলুল হকের বাড়ী ঘিরিয়া সঙ্গিনধারী সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী পাহারা দিতেছে এবং কার্যত তিনি স্বগৃহে কারারুদ্ধ হইয়াছেন। ইহার পর তাঁহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে, এখনও বোঝা যাইতেছে না। পূর্ববঙ্গের পদচ্যুত মুখ্যমন্ত্রীকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। এখানে গভর্নরের শাসন প্রবর্তিত হইবার আগে পাকিস্থানে প্রধানমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী হক সাহেবকে পাকিস্থানের প্রতি বিশ্বাসঘাতক, সেই সঙ্গে পূর্ববঙ্গের প্রতিও তিনি বিশ্বাসঘাতক, এই কথা অভিযোগ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হক সাহেবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গিয়া তাঁহারা শুধু পাকিস্থানের একজন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন না, এমন একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাঁহারা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন, পাকিস্থানের প্রতি যিনি নিতান্তই আনুগত্যবিহীন। এক্ষেত্রে স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠে যে, হক সাহেব যদি বিশ্বাসঘাতক হইয়া থাকেন, যদি তাঁহার সেই অপরাধ হয়, তবে সমগ্র পূর্ববঙ্গই সেই একই অপরাধে অপরাধী। কারণ হক সাহেব যে দাবী করিয়াছেন, তাহা পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ কর্তৃক সর্বজনীনভাবেই সমর্থিত। পূর্ববঙ্গের বিগত নির্বাচনে পূর্ববঙ্গের বিধান সভার ২২৪টি মুসলিম আসনের মধ্যে হক সাহেবের যুক্ত ফ্রন্ট দল ২১৫টি আসন অধিকার করে। জনগণের এমন প্রতিনিধিত্বসম্পন্ন মন্ত্রিসভাকে আজ যেমনভাবে পূর্ববঙ্গের কর্তৃত্ব হইতে অপসারিত করা হইল সত্যই জগতের ইতিহাসে তাহার নজীর মিলিবে না। পূর্ববঙ্গের সম্বন্ধে এমন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের ফল কি হইবে, এখনও কিছু বলা চলে না, তবে ভাল হইবে না নিশ্চয়ই ইহা বোঝা যায়। তথাকার বিপুল জনসাধারণ যুক্ত ফ্রন্টের নীতিরই যে অনুরক্ত বিগত নির্বাচনে অসংশয়িতভাবে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ফলত সাত বৎসরের লীগ শাসনের অভিজ্ঞতা হইতে উদ্ভূত তাহাদের এই মনোবৃত্তি পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রীর উক্তির যুক্তিতে নিশ্চয়ই উল্টাইয়া যাইবে না। করাচীর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অবলম্বিত নীতির দ্বারা পূর্ববঙ্গবাসীদিগকে তাহাদের সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে, তাহারা ইহাই বুঝিয়া লইবে। তাহাদের প্রতি নিতান্ত অন্যায্যভাবে অবিচার করা হইতেছে, পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের মনে এজন্য বিক্ষোভের কারণ সৃষ্ট হইবে এবং সেই বিক্ষোভ গূঢ় গতিতে সঙ্কটযাত্রার পথে সার্থকতা খুঁজিবে, ইহাও বিচিত্র নয়।

হক সাহেবের অপরাধ

করাচী ত্যাগ করিবার পূর্বে হক সাহেব একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। তিনি এবং তাঁহার কয়েকজন সহকর্মী মিলিয়া এই বিবৃতিতে পূর্ববঙ্গের জন্য স্বায়ত্ত শাসন দাবী করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, পাকিস্থানের উভয় অংশের মধ্যে ব্যবধানের দূরত্ব এবং ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের অভিমত এই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বে এই উভয় অঞ্চল শাসিত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং মুদ্রা-ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিয়া অন্যান্য ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেওয়াই কর্তব্য। তাঁহারা পাকিস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে কোনদিনই চাহেন নাই। তাঁহারা পাকিস্থানের ঐক্য কামনা করেন। বলা বাহুল্য, হক সাহেব এবং তাঁহার সহকর্মীদের এই বিবৃতি পাকিস্থানের বর্তমান কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে চঞ্চল করিয়া তোলে কারণ, তাহাতে তাঁহাদের এতাবৎকালের অবলম্বিত নীতিরই অন্যথা সাধিত হয়। বস্তুত জনগণের অভিমতকেই যদি তাঁহারা মর্যাদা দান করিতেন, কিংবা করিতে দিতে পারিতেন তবে পাকিস্থানের সমস্যা নানাদিক হইতে এতটা জটিল হইয়া উঠিতে পারিত না। মার্কিনের সঙ্গে সামরিক চুক্তিকে তাঁহারা পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে অবলম্বিত তাঁহাদের সাম্প্রতিক নীতির অনুকূলে খাটাইয়া লইতে চেষ্টা করিবেন।

সেই সমগ্র ভারতে ইসলামের ধ্বয়োও উ... পীড়িত, দলিত এবং শো... অভিমতকে কম্যুনিস্ট বা... মুড়িয়া তাহাকে পিষ্ট করিবার উদ্যম দেখা দিবে। কিন্তু রাষ্ট্রের আদর্শকে সমুন্নত করিয়া তুলিতে হইলে সেজন্য সংকল্পশীল সাধনা এবং গঠনমূলক কর্মোদ্যম প্রয়োজন হইয়া থাকে। পাকিস্থানের পক্ষেও ঐতিহাসিক সে সত্যের ব্যতিক্রম ঘটিবে না। এইদিক হইতে সমগ্র পাকিস্থানের ভবিষ্যতের ঝুঁকি পূর্ববঙ্গের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। পূর্ববঙ্গ তাহার গৌরবময় ঐতিহ্যকে উপদলীয় গোষ্ঠীর কাছে বিকাইয়া দিবে না, আমরা ইহাই আশা করি।

ভেজাল দমনের দায়িত্ব

কলিকাতার কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুক্ত নরেশনাথ মুখার্জি সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, ভেজাল খাদ্য ও ঔষধের বিরুদ্ধে কার্যকরী অভিযান চালাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা মিউনিসিপ্যাল আইনের আবশ্যক সংশোধন অথবা একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিবার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে শীঘ্র রাজ্য সরকারের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন। এই উদ্দেশ্যে এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করিবেন বলিয়াও জানাইয়াছেন। কলিকাতার বাজারে ভেজাল সমস্যা আজ নূতন নয়। দুধে ভেজাল তো দস্তুরমত সামাজিক রীতি এবং ব্যবস্থার বিধিসঙ্গত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ঘিয়ে ভেজাল, তেলে ভেজালও চোরাগোপ্তা বিষয় নয় বলা চলে। মশলার ভেজালের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক প্রতিভারও এখানে প্রচুর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ঔষধে ব্যাপক ভেজালের কারখানা চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ... সেকথা স্বীকার করিয়া আতঙ্ক প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু রাজ্য সরকার এবং পৌরকর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত এই মারাত্মক দুর্নীতি দমন করিতে পারেন নাই। সত্য সত্যই নাকি এতদিনে সরকারের এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ ও কর্পোরেশন গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা সমাজ-বিরোধী ব্যবসায়ীদের ...তা না করিয়া ছাড়িবেন না শুনতেছি। আমাদের কিন্তু সন্দেহ দূর হইতেছে না। কারণ যে সরিষায় ভূত ছাড়াইতে হইবে সেই সরিষাতেই ভূত থাকিবে এ ভয় রহিয়াছে। যাহারা ভেজাল দূর করিবে, তাহারা ভেজাল না হয়, সেদিকে আগে লক্ষ্য রাখা দরকার। সরকারী এনফোর্সমেণ্ট বিভাগে এবং কর্পোরেশনের কর্মচারিবর্গের মধ্যে যদি নৈতিক বুদ্ধি জাগ্রত থাকিত, তবে শহরের বাজারে ভেজাল ব্যবসায়ীদের এরূপ একচ্ছত্র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না। সুতরাং শুধু ভেজাল কারবারীদের দমনে উদ্যোগী হইলেই চলিবে না, এইসব বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের মধ্যে কেহ যদি দুর্নীতিপরায়ণ হয়, তাহার দণ্ডবিধানের জন্যও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। এই সঙ্গে আমাদের ইহাও বক্তব্য যে, খাদ্য এবং ঔষধ প্রভৃতিতে যাহারা ভেজাল চালায় তাহাদের নামধাম প্রকাশ করা উচিত। একথা আমরা পূর্বেও বলিয়াছি। ভেজালদার সমাজ-বিরোধীদের নামধাম প্রকাশ পাইলে তাহাদের বিরুদ্ধে সমাজের চেতনা সহজেই আকৃষ্ট হইবে এবং তাহারা ধিক্কৃত ও লাঞ্ছিত হইবে। এইভাবে একবার যদি তাহাদের দুর্নাম রটে, তবে আর তাহারা মাথা তুলিতে পারিবে না; প্রত্যুত আইনের শাসনেও একাজ হইবার সম্ভাবনা নাই।

মানবতার দাবী

স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ শেঠ স্বদেশী যুগের নির্যাতিত কর্মীদের অন্যতম। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট, কিছুদিন কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলারও ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তাঁহার পুত্র সুবোধচন্দ্র শেঠ আফিস হইতে ফিরিবার পথে লরীতে চাপা পড়েন। আহত এবং সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁহাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তিন চার ঘণ্টার মধ্যেই তিনি মারা যান। এই শোচনীয় দুর্ঘটনার সর্বাধিক মর্মান্তিকতা এই যে, সুবোধের ভ্রাতা মেডিক্যাল কলেজে বারংবার খোঁজ করিয়াও এ সম্বন্ধে কোন খবর জানিতে পারেন নাই। হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার রূঢ়ভাবে তাঁহার কাতর আবেদনের উত্তর দিতে অসম্মত ... ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পর হাসপাতালের ... নার্স নেহাৎ করুণাপরবশ হইয়া সু... চন্দ্রের জুতা এবং কাপড়-চোপড় দেখ... দেয়। এই সম্পর্কে লরীচালকের বি... মামলা হয়। এই মামলায় রায় দিতে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ঘোষ মেডিকেল কলেজের কর্মচারীর বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া... ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার রায়ে বলি... হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার ... সংজ্ঞাহীন সুবোধচন্দ্রকে দেখিবার ... তাঁহার ভ্রাতাকে কেন দেন নাই, ... বুদ্ধির অগম্য। মানবতার দিক ... সহজেই এই প্রশ্নটি উঠে। কিন্তু ... কাতার হাসপাতালের ডাক্তারদের বি... এমন অভিযোগ এই নূতন নয়। ইঁহ... শিক্ষিত ব্যক্তি এ সম্বন্ধে অবশ্য প্রশ্ন চলে না। আমাদের শিক্ষা যে আমা... মানুষ করিয়া তুলিতে পারিতেছে ... সব ব্যাপার হইতে সে সম্বন্ধে ... স্পষ্ট প্রমাণ পাই। সহৃদয়তা না হয় ... করা না গেল; কিন্তু কর্তব্যও ... রহিয়াছে। কলিকাতার হাসপাতা... কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নয়, ... জনপ্রতিষ্ঠান এবং সরকারী অর্থ স... প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী অর্থ স... দ্বারা সেগুলি পরিচালিত হইয়া ... এরূপ ক্ষেত্রে এগুলির পরিচালন ... জনসাধারণের প্রতি সাধারণ ... কর্তব্যের দিকটা উপেক্ষিত হইবার ... কেন ঘটে, আমরা তাহাই বুঝিয়া ... পারি না। সুবোধচন্দ্র কলিকাতা... প্রতিষ্ঠ পরিবারের সন্তান। ... ভ্রাতারাই যদি হাসপাতাল হইতে ... ঘণ্টা পর দুর্ঘটনার খবর জানিতে ... তবে শত শত গরীব আহত হই... পাতালে নীত হইবার দুর্ভাগ্য ... ঘটে, তাহাদের আত্মীয়-স্বজনেরা কিরূপ ব্যবহার পাইয়া থাকে, অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে ... মানুষের দুঃখকষ্টে সহানুভূতির ... যে শিক্ষায় না জাগে, তেমন ... আমরা প্রকৃত শিক্ষা বলিতে ... শিক্ষা এদেশে মানুষ না গড়িয়া অমানুষ করিয়া তুলিতেছে, ... চেয়ে দুঃখের বিষয়।

বৈদেশিকী

পূর্ববঙ্গে জোরজবরদস্তি হক মন্ত্রিমণ্ডলীকে সরিয়ে গভর্নরী শাসনের প্রবর্তন অর্থাৎ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ববঙ্গের শাসন নিজের হাতে নেয়ার ব্যাপারে বৈদেশিক প্রভাব কতখানি কাজ করেছে সে সম্পর্কে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলছে। কারো কারো বিশ্বাস, মার্কিন গভর্নমেণ্টের পরামর্শেই পাকিস্তান গভর্নমেণ্ট এই পথে পা দিয়েছেন। এঁদের ধারনা—পূর্ববঙ্গে ইউনাইটেড ফ্রণ্টের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকারের সেখানে যা-খুশি করা সম্ভব হবে না; ইউনাইটেড ফ্রণ্টের ভিতরে অনেকে মার্কিন সামরিক সাহায্য গ্রহণের নীতির বিরুদ্ধে, পাকিস্তানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের মতলব যদি মার্কিন সরকারের থাকে তবে পূর্ববঙ্গে ইউনাইটেড ফ্রণ্ট ক্ষমতালাভ করলে সে মতলব হাসিল করার অসুবিধা হবে, বিশেষ করে, পূর্ববঙ্গের কোনো অংশে কোনো মার্কিন ঘাঁটি স্থাপনের পরিকল্পনা থাকলে তা কার্যে পরিণত করা সহজ হবে না; তাছাড়া পূর্ববঙ্গে ইউনাইটেড ফ্রণ্টের প্রভাব যদি নিরঙ্কুশ হয় তবে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নীতির উপরও তার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী, কারণ পাকিস্তানের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি হচ্ছে পূর্ববঙ্গবাসী; অতএব পূর্ববঙ্গে ইউনাইটেড ফ্রণ্টের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই তাকে বেদখল করার পরামর্শ মার্কিন গভর্নমেণ্ট দিয়েছেন।

উপরোক্ত ধারনা সর্বাংশে ঠিক কিনা বলা কঠিন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, করাচী গভর্নমেণ্ট যে-পন্থা অবলম্বন করেছেন তা স্থির করার পূর্বে তাঁরা মার্কিন মতামত জিজ্ঞাসা করেছেন এবং এটাও নিশ্চিত যে, মার্কিন সরকারের সম্মতি ছাড়া তাঁরা একার্যে অগ্রসর হননি। তবে মার্কিন সরকারকে কী বুঝানো হয়েছে এবং মার্কিন সরকারই বা কী বুঝে পাকিস্তান সরকারের এই রকম উৎকট গণতন্ত্রবিরোধী কার্যে সম্মতি দিয়েছেন সেই সমস্ত ভিতরের কথা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কে কার কথায় কতখানি চলছে তা নিশ্চিত বলা যায় না।

অবশ্য মার্কিন সরকারের দায়িত্ব আছেই, কারণ মার্কিন সরকারের সম্মতি ছাড়া পাকিস্তান সরকার এত বড় দুঃসাহসিক কাজ করেন নি। এ কাজের শেষ পরিণাম কী হবে কেউ বলতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গে সামরিক শাসনের সূচনা হয়েছে। ঘটনার স্রোত কোন্ দিকে বয় এবং শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারকে কতখানি শক্তি নিয়োজিত করতে হয় তা কে জানে। সামরিক শক্তি নিয়োগের প্রশ্ন যেখানে রয়েছে সেখানে মার্কিন গভর্নমেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ অবশ্যই করতে হয়েছে, কারণ এ ব্যাপারটিকে মার্কিন সামরিক সাহায্য দানের পরিকল্পনার সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্যভাবে দেখা যেতে পারে না। আমেরিকার সঙ্গে প্যাক্ট হবার পর থেকে আমেরিকা অবশ্যই জানতে চাইতে পারে, পাকিস্তান সরকার কখন কোথায় কীভাবে কী পরিমাণ সামরিক শক্তি নিয়োগের পরিকল্পনা করেন এবং যে-কার্যে বেশি পরিমাণ সামরিক শক্তি নিয়োগের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে সে-কার্যে মার্কিন সম্মতি নিশ্চয়ই আবশ্যক। সুতরাং পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর এই নির্লজ্জ আক্রমণের জন্য মার্কিন সরকারের দায়িত্ব কতখানি, এ প্রশ্ন অবান্তর নয়।

তবে উস্কানিটা মার্কিন সরকারের কাছ থেকেই এসেছে অথবা মুসলিম লীগের চাঁইরাই মার্কিন গভর্নমেণ্টকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মার্কিন গভর্নমেণ্টের সম্মতি আদায় করেছেন সেটা বিবেচ্য। একথা মনে রাখা দরকার যে, সাক্ষাৎভাবে ইউনাইটেড ফ্রণ্টের সঙ্গে মুসলিম লীগেরই শত্রুতা, কারণ ইউনাইটেড ফ্রণ্টের অভ্যুদয়ে মুসলিম লীগেরই প্রাণ নিয়ে টানাটানি উপস্থিত হয়েছে। ইউনাইটেড ফ্রণ্টের সঙ্গে আমেরিকার কোনো সাক্ষাৎ শত্রুতা ছিল না। অবশ্য ইউনাইটেড ফ্রণ্টের অন্তর্গত আওয়ামী লীগের সভা-

পতি মৌলানা ভীসানী সাহেব মার্কিন সামরিক সাহায্য গ্রহণ নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন; কিন্তু ইউনাইটেড ফ্রণ্টের অপর দুই প্রধান নেতা ফজলুল হক সাহেব ও সুরাবর্দী সাহেব—এ বিষয়ে মোটামুটি চুপচাপই ছিলেন এবং তাঁদের ভাবগতিক থেকে মনে হয়েছে যে, তাঁদের পক্ষে প্যাক্ট হজম করে নেয়া কঠিন হবে না। সুতরাং এইদিক দিয়ে ফজলুল হক সাহেব বা সুরাবর্দী সাহেব মার্কিন সরকারের নিকট পরিত্যাজ্য ছিলেন, এরূপ মনে করার কোনো কারণ দেখি না। ইউনাইটেড ফ্রন্টকে আমেরিকার কাছে অস্পৃশ্য প্রতিপন্ন করার জন্য মুসলিম লীগকে অন্য উপায় গ্রহণ করতে হয়েছে। এর প্রমাণ গত ৩০শে মে তারিখের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলীর বেতার ভাষণের মধ্যেই খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে।

পূর্ববঙ্গে [illegible] (কিন্তু আসলে ক্রমশ প্রদেশে) সামরিক শাসন প্রবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী যে-সব কথা বলেছেন সে-সব কথা পূর্ববঙ্গে কেউ বিশ্বাস করবে না। পূর্ববঙ্গে বাঙ্গালী ও অ-বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে যে মনকষাকষি চলছে এবং তার যে-সব কারণ তার একটিরও কাছ দিয়ে মহম্মদ আলী সাহেব যান নি। তিনি আসল কারণগুলি বাদ দিয়ে কতকগুলি উদ্ভট মিথ্যা প্রচারের চেষ্টা করেছেন, যা কি পূর্ববঙ্গে কি ভারতে কেউ বিশ্বাস করবে না। পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক দাঙ্গা করিয়েছে কম্যুনিস্টরা এবং "শত্রুর লোকেরা"—"শত্রুর লোক" মানে ভারত কর্তৃক নিযুক্ত লোক—এই হ'ল পাকিস্তান সরকারের বক্তব্য, অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের কোনো দুঃখ ছিল না, যা কিছু গোলমাল সব পাকিস্তানের সর্বনাশকামী ভারতের এজেণ্ট এবং কম্যুনিস্টরা করিয়েছে। কোনো পূর্ব-বঙ্গবাসী পূর্ববঙ্গের অবস্থার এই বিশ্লেষণ বিশ্বাস করবে না, যদি করত তাহলে নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভাগ্যের বিপর্যয় ঘটত না, কারণ এই ধরনের প্রোপাগাণ্ডাই ছিল নির্বাচন যুদ্ধে মুসলিম লীগের প্রধান হাতিয়ার, যেটা সম্পূর্ণ অকেজো বলে প্রমাণিত হয়েছে। পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রীর কথা ইংরেজরাও অবিশ্বাস্য বলে মনে করেছে। পাকিস্তানী কর্তারা অবশ্যই জানতেন যে, বেতারে যে-বিবৃতি প্রধানমন্ত্রীর মুখ দিয়ে প্রচারিত হচ্ছে সেটা পাকিস্তানে, ভারতে বা বৃটেনে কেউ বিশ্বাস করবে না।

বোধ হয় কেবল আমেরিকানদের উদ্দেশ্যেই বিবৃতিটি রচিত হয়। কম্যুনিস্টের নাম শুনলেই আমেরিকানরা ক্ষেপে গিয়ে সব কিছু বিশ্বাস করবে, পাকিস্তান সরকারের বোধ হয় এই আশা। পূর্ববঙ্গে কম্যুনিস্টরা খুব বেড়েছে এবং তাদের দমন করার জন্য যে-সব ব্যবস্থা আবশ্যক সে-সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হক মন্ত্রিমণ্ডলী অনিচ্ছুক—আমেরিকানদের এইরকম বুঝাতে পারলেই কাজ হাসিল হবে। মনে হয়, হয়েছেও তাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতদ্দ্বারা আমেরিকানদেরই একটা প্রকাণ্ড ধাপ্পা দেওয়া হ'ল। ভারতের "এজেণ্টদের" কথাটা হয়ত আমেরিকানরা বিশ্বাস করে না, তবে বর্তমানে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে পারস্পরিক মনোভাব যেরকম হয়েছে তাতে ভারত সম্বন্ধে একটু কুৎসা শুনতে আমেরিকানদের খুব মন্দ লাগবে না, পুরোপুরি বিশ্বাস করতে না পারলেও।

ফজলুল হক সাহেবের পূর্ববঙ্গের জন্য "স্বাধীনতা"র আকাঙ্ক্ষাকেও আমেরিকার নিকট এরূপভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যাতে আমেরিকা ফজলুল হককে নষ্ট হ'তে দেখতে চায়। পূর্ববঙ্গ যদি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যায় তবে পাকিস্তান আর্থিক দিক থেকে যাকে বলে "viable state" তা আর থাকবে না; পূর্ববঙ্গ আলাদা হয়ে গেলে আমেরিকার চক্ষে পাকিস্তানের "strategic" মূল্যও বহুল পরিমাণে কমে যাবে, তাহলে পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক সাহায্য দানের চুক্তি করার উদ্দেশ্যও পুরোপুরি সিদ্ধ হবার সম্ভাবনা থাকবে না। অতএব পূর্ববঙ্গের "স্বাধীনতার কথাটা মার্কিন কানে অত্যন্ত বেয়াড়া শোনাবে। এইসব মনে রেখেই মহম্মদ আলী সাহেবের ৩০শে মে তারিখের বেতার বক্তৃতাটি রচিত হয়েছে। মনে হয় এই বক্তৃতায় যদি কেউ ঘায়েল হয়ে থাকে তবে সে আমেরিকা।

কিন্তু আমেরিকার চিন্তার কথা আছে। আমেরিকা কি লোককে এই ভাবতে দিতে চায় যে, মার্কিন সাহায্য চুক্তির প্রথম ফলই হচ্ছে পাকিস্তানের অর্ধেকের বেশি লোকের গণতান্ত্রিক অধিকারের বিলোপ? ব্যাপারটা তো সেই রকমই দেখাচ্ছে কারণ একথা কেউ মনেই করতে পারে না যে, মার্কিন সরকারের সম্মতি না নিয়ে পাকিস্তান এই কর্ম করতে সাহসী হয়েছেন।

মার্কিন গভর্নমেণ্টকে আর একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যের কোনো কোনো দেশে বিদেশী সামরিক সাহায্য দিয়ে পেটোয়া দলের কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ইরাণে মুসাদ্দেক ও তুদে পার্টির বিরুদ্ধে জাহেদী গভর্নমেণ্টকে খাড়া করে রাখা এক কথা আর করাচী থেকে পূর্ববঙ্গকে পদানত করে রাখার চেষ্টা আর এক কথা। এখানে এক দেশের একটা দলকে চেপে রেখে আর একটা দলকে খাড়া করে রাখার সমস্যা নয়, এখানে আসলে একটা আলাদা দেশকে বলপূর্বক পদানত করে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। পূর্ববঙ্গকে জয় করা—আমেরিকার সাহায্য নিলেও—সম্ভব হবে না। মার্কিন গভর্নমেণ্টের যদি নিজের সুনামের কিছুমাত্র দরদ থাকে তবে তাঁদের এখানে আগাগোড়া ভেবে দেখা উচিত।

২।৬।৫৪

শহরতলীর এক টেরে ছোট্ট বাড়িখানা। ভদ্রলোকটির নাম রামধন্ গাঙ্গুলী।

বাড়িতে জুল্লে তিনটি প্রাণী—কর্তা, গিন্নি আর পাঁচ বছরের মেয়ে স্বাতী।

বর্তমান দুনিয়ার আবহাওয়া আর হালচাল দুই-ই বিগড়ে গেছে। এহেন পরিস্থিতিতে গাঙ্গুলী পরিবারের জন-সংখ্যা কখনো-সখনো ছয় পর্যন্ত উঠবে তার আর বিচিত্র কি! ফিরিস্তিটা তখন হয় এরকম: রামধন্ গাঙ্গুলী, তাঁর পরিবার, তিনি স্বয়ং, কন্যা স্বাতী, আর তার মা ও বাবা!

খাওয়া-দাওয়ার পর একদিন রাত্রে গাঙ্গুলী মশায় ঘুমুতে যাবেন, এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই স্বাতীর পেট-ব্যথা শুরু হল, ভয়ানক পেটব্যথা। হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন তিনি শহরে ওষুধ আনবার জন্যে।

রামধন্ সেই যে গেলেন, আর ফিরলেন না।

স্বাতীর উদর-ঘটিত গোলযোগ খানিক পরেই মিটে গেল এবং ক্রমে সে বড়ো হল।

স্বামীর অন্তর্ধানে গাঙ্গুলী-গিন্নির মন ভেঙে গিয়েছিল। মেয়েকে পাত্রস্থ করে তিনি কাশী চলে গেলেন।

বিয়ের পর স্বাতী বাপের বাড়িতেই রয়ে গেল, সে আর তার স্বামী প্রভাকর ভাদুড়ি। এই বাড়ি থেকেই তার বাবা একদিন অগস্ত্য-যাত্রা করেছিলেন।

বছর কয়েক পর একটি মেয়ে হল তাদের, ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে—নাম নন্দিনী।

নন্দিনীর বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন অঘ্রাণ মাসের পঁচিশে তারিখ রাত্রিবেলা হঠাৎ তার সাংঘাতিক পেটব্যথা শুরু হল। বছর কুড়ি আগে রামধন্ গাঙ্গুলী যেদিন নিরুদ্দেশ হন, সেদিনও ছিল পঁচিশে অঘ্রাণ। উদ্ভট কাণ্ডই বটে!

বেঁচে-বর্তে থাকলে সেই রামধন্ই হতেন নন্দিনীর দাদামশায়।

নন্দিনীর জন্যে ওষুধ আনবেন বলে প্রভাকর শহরের দিকে রওনা হতেই স্বাতী বাধা দিয়ে বলল: না, না, গিয়ে কাজ নেই তোমার; বাবার মতো শেষটা তোমারও আর পাত্তা মিলবে না, তুমিও হয়তো ফিরে আসতে ভুলে যাবে।

প্রভাকর আর কি করেন, নন্দিনীর বিছানার পাশেই বসে থাকতে হল তাঁকে।

নন্দিনীর অসুখটা কিন্তু বেড়েই চলল। আবার উঠে পড়লেন প্রভাকর—হাঁ, আনতেই হবে ওষুধ; বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে মেয়েটা? কিন্তু স্ত্রী এবারও বেঁকে বসল। স্বাতীর বঙ্কিম ভঙ্গি দেখে প্রভাকরও ফের বসে থাকতে বাধ্য হলেন—অর্ধ-ঋজু হয়ে, উপায় নেই।

এমন সময় হঠাৎ দরজা খুলে গেল।

ঘরে ঢুকলেন এক কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জ-তনু থুত্থুড়ে বুড়ো, মাথায় তাঁর একরাশ পাকা চুল।

তাঁকে দেখেই নন্দিনী বলে উঠল: আরে, এই যে দাদামশায় এয়েচে।

একমাত্র সে-ই তাঁকে চিনতে পেরেছিল। পকেট থেকে একটা শিশি বের করে এক চামচ ওষুধ তাকে খাইয়ে দিলেন রামধন্ গাঙ্গুলী।

খেতে না খেতেই ব্যথা সেরে গেল।

রামধন্ তারপর হেসে বললেন: রিকশা-ফিকশা খুঁজে পাইনে, তাই ফিরে আসতে আমার একটু দেরি হয়ে গেল, বুঝলে বাছারা? *

---

* কৌতূহলী পাঠক গল্পিকাটি পড়বার আগে বা পরে ও হেনরি'র "এ স্ট্রেঞ্জ স্টোরি" পড়ে দেখতে পারেন।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

বিভোর

ভোর, তবে হও মনোভোর
যেন দেখি ঊষার আলোর
একটি সরিৎ-ছবি বহুদূরে সরস্বতী-তীরে
অচেনা অংশুক নেয় জড়িয়ে শরীরে
যখন আবার চির পুরাতন নারী।
দাও সেই অনুভব যাতে নদী চিনে নিতে পারি
দাহভরা দেহে।

ভোর তুমি রাত্রিময় স্নেহে
এসেছ আমার বিছানায়।
বিকেলে চাইব সুর যা অমৃত-নদীতে মানায়
সমুদ্রের সাধ নিয়ে নীচে যেতে হলে।

নগরের কোলাহলে
জ্বলুক সোনার সূর্য আমি দেব গান,
সুরধুনী করে রেখে যাব অপমান
সব না-পাওয়ার ইতিহাস।

অতীতের একমুঠো ঘাস
পাবে বুকে স্ফটিক-উজ্জ্বল
প্রভাতের শিশিরের অশ্রু নয় তবু তা-ও জল
একবিন্দু ভোর,
রূপ লাগি আঁখি ঝুরে তার গুণে হয় মনোভোর।

পাওনা ছুটি

স্বপ্নে নয় কোনো এক ছুটিতে পাবু কি
হরিণের বন আমলকী
পাহাড়ের ঢালুতে গড়ানো।
কাছে জলা পদ্মগন্ধ গায়ে মেখে থাকে,
দূরের ওপার হতে ঝাউ-এর গানও
এসে শিরশির করে ঢেউ দেবে বুকে।

মোটের উপর বটগাছের যৌতুকে
সে-দেশ সবুজ নয়, ডুমুরের কাঁচ মুখ আঁকে
অনেক পুরনো দিন অনেক পুরনো ফলশ্রুতি,
সেখানে কপোত-ভোর দ্বারে দ্বারে জাগরে আকূতি
দিয়ে দুপুরের ঘুঘু-নিদালি ছড়ায়।

যে দূর-স্থানের কাল সুদূর জড়ায়
তার কাছে ছুটি-মনে খানিক সময়
ধার নিতে পারবে কি সময়ের বহু অপচয়?
তুমি আমি সেইখানে—
(তুমি ছাড়া সে-ছুটির নেই কোনো মানে)
হয়ত গেলাম, পথে রাত্রি হয়ে গেলো:
'সকলি গরল ভেল'
মনে-মনে বলবে হৃদয়
জ্যোৎস্না আর হাওয়া যদি লেবুফুলে গন্ধ মেখে রয়
মনে হবে—সে-হাওয়া কি আমাদের মন—
যেমন প্রথম-জাগা সাপলার বন?

—২—

ইচ্ছা ছিল কেউ না জানে এভাবে এ-বাড়ি থেকে তারা সরে পড়বে। কিন্তু ইচ্ছা শোনে কে। ঠিক দুপুর-বেলা 'সুদর্শন' এসে দর্শন দিলে দরজায়। এবাড়ির ধোবা। কোনদিনই সুদর্শন দুপুরে আসে না। আসে সন্ধ্যায়। ওপর ও নিচের আটটা ফ্ল্যাট ঘুরে ঘুরে রঙ-বেরঙের শাড়ি, সায়া, ফ্রক, বেডকভার বাবুদের আধময়লা টাই পেন্টুলেন, শার্ট, গেঞ্জি কুড়িয়ে রাত আটটা সাড়ে আটটায় সুদর্শন এসে উঁকি দিয়েছে রুচির ঘরের দরজায় মাইজীর কাপড়া যাবে কিনা ধোলাইয়ে জানতে। আজ আর সুদর্শনের হাতে ময়লা কাপড়ের পুঁটুলী নেই। অসময়ে দরজায় এসে ওকে দাঁড়াতে দেখে রুচির মুখ কালো হয়ে গেল। এ মাসে তার কিছুই যায়নি যদিও, গেল মাসে দু'খানা সাড়ি ধোয়ানো হয়েছিল সেই পয়সা এবং আগের কিছু পাওনা জমে আছে। ধোবার কথা একেবারে রুচির মনে ছিল না।

'আহা এমন অসময়ে তুই এলি!' শিবনাথ চোখে-মুখে বিরক্তি প্রকাশ করল।

সুদর্শন দাঁত বার ক'রে হাসল।

কাপড় নিতে আসেনি সে। এসেছে প্যাওনা উসুল করতে। 'বাবু কোথায় কুঠি ভাড়া করলেন?'

শিবনাথ সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রুচির দিকে তাকাল।

কত পাওনা হয়েছে তোমার?' রুচি সোজা নিজে প্রশ্ন করল।

'দো রুপেয়া ন' আনা।'

নিঃশব্দে কৌটো থেকে পয়সা তুলে রুচি সেটা ধোবার হাতে দিয়ে বলল, 'যাও, আজ আর কাপড় যাবে না।' কিন্তু দেখা গেল শিবনাথের চেহারা ততক্ষণে বদলে গেছে। বেশ প্রফুল্লভাব।

'কারোর পাওনা বাকি রেখে আমরা এখান থেকে যাব না, বুঝলি।' বেশ বড় গলা ক'রে শিবনাথ সুদর্শনকে বলল, 'যাবি, বেলেঘাটা পর্যন্ত যেতে পারবি তোর গাধা চালিয়ে নিয়ে কাপড় আনতে? যাস তো তোকে দিয়েই সেখানে কাপড় ধোয়াব।'

'উঃ তুমি এখন কাপড় ধোয়াবার কথা ভাবছ।' রুচির রাগ বাড়ছিল।

লক্ষ্য ক'রে শিবনাথ আর উচ্চবাচ্য করল না। হাতের কাজে মন দিলে।

বেগতিক দেখে সুদর্শন সরে পড়ল।

'ধোবা-নাপিত সবাইর কাছে ঠিকানাটা দিয়ে রাখ তারপর সেখানে গিয়ে তোমার টিনের ঘর দেখে এসে এবাড়ির দিদি-মণিদের ছোট-মা ও বড়-মা'দের কাছে সবিস্তারে সেগুলি বর্ণনা করুক।'

শিবনাথও সেটা পছন্দ করে না। বলল, 'ভুল হয়ে গেছে।'

রুচি বলল, 'নাও এইবেলা শিশি-কৌটোগুলো ভাঙা সুটকেসটার মধ্যে ঢোকাতে চেষ্টা কর।'

শিবনাথ সুটকেসের ডালা তুলল।

শূন্য শিশি-বোতলগুলো বাক্সের মধ্যে ঢেলে বিছাতে বিছাতে রুচি বলল, 'বাবু-পাড়ার ধোবা-নাপিত বেলেঘাটার বস্তিতে যায় না তা-ও ঠিক, তবু তো কি দরকার ঠিকানা জানিয়ে।'

সব মোটামুটি ঠিকঠাক ক'রে তারা যাত্রা করবে এমন সময় রণদামূর্তি হয়ে সামনের দরজায় দাঁড়াল এবাড়ির ঝি কামিনী। এইমাত্র খেয়ে উঠে পান চিবোচ্ছে। অধরোষ্ঠ রক্তবর্ণ। ভিজে চুল পিঠময় ছড়ানো। দুই হাত কোমরে রেখে দ্রুত নিশ্বাস ফেলছে।

যেন এঘরের লোক চলে যাচ্ছে কারো মুখে শুনে কামিনী ছুটে এসেছে ব্যস্ত হয়ে।

রুচির মুখ আবার অতর্কিতে কালো হয়ে গেল। কি ব্যাপার, না মঞ্জুর পরে মঞ্জুর ষে ভাই কি বোনটি হব তখন রুচি হাসপাতালে থাক শিবনাথকে রেঁধে খাইয়েছিল সেই ক'টা টাকা, এক বছ পাওনা।

হিসাব বহুদিন থেকে আছে। ও মোট সাত দেয়নি, কেননা কামিনীও চায় জোর করে—রুচিদিদিমণির এ যাচ্ছিল ব'লে। যেন এই মধ্যে একটু প্রীতির রং ছিল মাস যেতে ওটা দু'জনের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল তখন।

এভাবে একটা বছর ঘুরেছে

কিন্তু এখন সেটা কামিনী দিতে হবে। ওর দরকার।

'তুই কারোর কাছে বলিস ঠিকানা লিখে দিচ্ছি, সামনের ম নিয়ে আসিস, ট্রাম-বাসের পয়সা

কামিনী রাজী হ'ল না।

রুচি মুশকিলে পড়ল।

কারণ হিসাব ক'রে রুচি দে টাকা থেকে সাত টাকা ঝিকে দি পথের সব খরচ মিটিয়ে সেখানে যাওয়া হয় না।

'উঃ, সব ইতর-নাতালের জায় সেখানে কি আমি মেয়েমানুষ যা ছোরা খেয়ে মরতে। বিশ বছরে কামিনী মোক্তারনবাবু স্ট্রীট পা কোথাও কারো বাড়িতে এক চৌয়াতে গিয়েছে কি না জিজ্ঞে এবাড়ির বাবুদের, মা'দের। যাব মরতে সাত টাকার তাগি ছোঃ!'

তাচ্ছিল্যভরে ঝি বলল, 'নাও দিও ওটা তোমাদের সংসারে, ত করো এই ক'টা দিন ঝি হয়ে তোমার সতীন হয়ে খেটে কামিনী।'

কামিনী রক্তিম ঠোঁট ফুলিয়ে হ

রুচি কথা বলল না।

যেন পৌরুষে লাগল, উত্তে শিবনাথ স্ত্রীর দিকে তাকায়। থেকেই তুমি ওর ওটা মিটিয়ে দা টাকা আমরা রাস্তায় গিয়ে যা হো ম্যানেজ করতে পারব।'

নানারকমের দেনা শোধ করে

মাসেরও পাঁচদিন খেয়ে রুচির ইস্কুলের মাইনের আর কুড়ি পঁচিশ টাকা হাতে অবশিষ্ট আছে। নিঃশব্দে সাতটি টাকা তুলে ও কামিনীর হাতে দিতে শিবনাথের চেহারার বিরক্তিভাবও চট্ করে কেটে গেল।

'বুঝলে কামিনী, আমরা কারোর টাকা মারি না। ভদ্রলোকের সন্তান। লেখাপড়া শিখেছি।'

'তা কি আর জানি না গো দাদাবাবু।' ঠোঁট থেকে শ্লেষের হাসি মুছে ফেলে গম্ভীরগলায় ঝি বলল, 'তুমি বি-এ পাশ, দিদিমণি বি-এ পাশ। এবাড়ির সবাই তো বলছে। তোমরা যদি আমার টাকা মারো তো মুখ্যুসুখ্যুরা করবে কি।'

'তাই বলছিলাম, তুমি যদি সেখানে না যেতে আমি নিজে এসে একদিন দিয়ে যেতাম। তোমার পাওনা টাকা। আমরা কি তা রাখতে পারি।' শিবনাথ প্রসন্নগলায় হাসল।

কামিনী আরো নরম হয়ে যায়। ফিসফিসিয়ে বলে, 'গড়পাড় যেতে কি লেগেছে, টালায় কি দক্ষিণে ভবানীপুর কালীঘাটের দিকে ঘর ভাড়া করলেও আমি একদিন সময় ক'রে বেড়াতে যেতুম, গিয়ে দেখে আসতুম দিদিমণিকে মঞ্জুমামণিকে।' কিন্তু খালের ওপার বেলেঘাটা বড্ড বিশ্রী জায়গা। ধুলো আর রোদ, মোষের গাড়ি আর খেঁকি কুকুর ছাড়া সেখানে রাস্তায় কিছু চোখে পড়ে না। এই মোক্তারামবাবু স্ট্রীটের অত নম্বর বাড়ির জনার্দন রায় একবার কি এক দরকারে সেখানে গিয়ে ফিরে এসে কামিনীকে সেদিন বলছিল। কামিনী তা সবিস্তারে শিবনাথের কাছে এখন বর্ণনা করল।

'না না, সাময়িকভাবে যাচ্ছি সেখানে, এদিকে সুবিধামতন ঘর পেলে ফের আমরা চলে আসব।'

'তাই চলে এসো, সেখানে ছোটলোক ছাড়া ভদ্দরনোক থাকে না।' বলে কামিনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর কেউ রইল না পথ রুখতে। সকলের পাওনা মিটিয়ে তবে ওরা মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে পারল।

'শেষ হ'লে ফুটিয়ে দিয়েছে কামিনী।' রুচি রাস্তায় শিবনাথকে কয়েকবার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিল। 'বাবুপাড়ার ঝি ক্যানেলের ওধারে পা ছোঁয়াবে না।'

শিবনাথ বলল, 'এই বাড়ির মানুষগুলোকে দেখেশুনেই ঝি-চাকরগুলো এমন আস্কারা পেয়েছে। বাই প্রোডাক্ট। বেলেঘাটায় তোদের বাবুদের চেয়ে বড়বাবু নেই নাকি, তোদের চেয়ে চার ডবল বেশি রোজগার ক'রে এমন অনেক গুণী রূপসী ঝি আছে!'

'উঃ ইচ্ছা করছিল আমার ওর চুলের ঝুঁটি ধরে মারি।' রুচি বলল।

'না না না।' ঠেলার পিছনে কতকক্ষণ হাঁটবার পর এক সময়ে রিক্সায় রুচির পাশে এসে বসে শিবনাথ বলল, 'ও চীৎকার করে লোক জড়ো করে এমন মামলা দাঁড় করাতে পারতো যে, আমাদের দুজনকেই হয়ত কোর্টে যেতে হ'ত।'

আশ্চর্য, রাস্তায় যেমন খারাপ লাগছিল একটু নিরিবিলিতে, ঘন ছায়ায় এসে সব কোলাহল ছাপিয়ে খালের জলের ছলছল শব্দটা খারাপ লাগল না। ঠাণ্ডা শিরশিরে হাওয়া দিচ্ছিল। গাছের মাথায় পাখি ডাকছিল। পাতার ফাঁক দিয়ে এক মুঠো তারা ঝকমক করে উঠল হঠাৎ।

কামিনী, বকুল, বকুলের মুখরা মাসির কথা আর মনে রইল না তাদের।

ঠিক বেলেঘাটা নয়। আর একটু পশ্চিমে।

লটবহর নিয়ে এক সময় খেয়া পার হ'তে হ'ল। একটু সময়ের জন্য নৌকায় ওঠা। মঞ্জু আহ্লাদে হাত তালি দিয়ে উঠল।

তারপর একটা গেঞ্জী কলের খটখট শব্দ, একটা করাত কলের ঘসঘস আওয়াজ, অন্ধকার আর অফুরন্ত ঝিঁঝিঁর ডাক শুনে এক থমথমে চীনা কবরখানার পাশ কাটিয়ে ঘেঁটু ফুলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে আরও খানিকটা হাঁটা-পথ। রিক্সা যায় কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু রিক্সা কি মোটরগাড়ি চলতে পারে, এমন পথ এখন আর খোঁজাখুঁজি না করে মুটের মাথায় মালপত্র চাপিয়ে মাঠের ওপর দিয়ে তারা অগ্রসর হ'ল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই কুঠি।'

যারা মোট বইছিল, এক সময় তারা কলরব ক'রে উঠল।

মাঠের রাস্তা শেষ হয়ে গেছে। এক আলোকোজ্জ্বল সুন্দর প্রাসাদোপম বাড়ির সামনে এসে ক্যারাভান দাঁড়ায়।

রুচি ঠিক বুঝতে পারল না।

শিবনাথ বলল, 'আমাদের নতুন বাড়িঅলা এখানে থাকেন। এঁর কাছে দু'মাসের ভাড়া জমা রেখে রসিদ ও চাবি নিয়ে বাড়িতে ঢুকতে হবে।'

এখন রুচি বুঝতে পারল।

মালপত্রের সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে রইল। শিবনাথ গেট পার হয়ে ভিতরে ঢুকল।

চারদিকে তাকিয়ে দূরে কাছে রুচি টিনের বেড়া টালির ছাউনি দেখতে পেল না। দেখল মাঠ, ফুলের বাগান, আর ফলসা ও লিচু গাছের মত বড় বড় গাছ। গাছের তলা দিয়ে এঁকে-বেঁকে গেছে পরিচ্ছন্ন লাল কাঁকরের পথ। অদূরে একটা গ্যারেজ দেখা গেল। আয়নার মত চকচক করছে সুন্দর একটা গাড়ি। ডাইনে বাঁয়ে পিছনে সামনে খুঁটির মাথায় এতগুলি ইলেকট্রিক ডোম জ্বলছিল ব'লে অবশ্য রুচি বাড়ির প্রায় চারপাশের সবটা

'শত হোক, বড় ঘরের ছেলে তো, আপনারা পাঁচজন ভদ্রলোক এসে এখানে তাঁর জমিতে বাসা বেঁধেছেন, আপনাদের সুখ সুবিধা তিনি দেখবেন বৈ কি।'

শিবনাথ রুচির কানে ফিসফিসিয়ে বলল, 'পারিজাতবাবু রায় সাহেবের বড় ছেলে। রায় সাহেব বুড়ো হয়েছেন। বালিগঞ্জের বাড়ি থেকে নড়েন না। ছেলেই কাঠের কারখানা গেঞ্জির ফ্যাক্টরী দেখছে আর এই বস্তি।'

'তা পারিজাত বাবু আজ কোথায় গিয়েছিলেন। ওদিক দিয়ে আসছি তখন দেখলাম বৌ বাচ্চা দুটো সংগে নিয়ে ফিরছেন। খুব সাজগোজ করা সবাই?' কমলা প্রশ্ন করল।

'সিনেমায় গিয়েছিলেন সব। কোলকাতার লাইট হাউসে ভাল জাংগল পিকচার এসেছে। রাত্রে আজ আর কুঠিতে ফিরে খাওয়াদাওয়াও নেই হোটেলে সারা হয়েছে বই দেখে ফেরার পথে।'

'যাকগে' কমলা একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল। 'আপনার বাবুকে ধন্যবাদ জানাবেন। এর বেশি, আমাদের আর কি করার আছে।' মদন ঘোষের চোখের দিকে তাকিয়ে কমলা অর্থব্যঞ্জক একটু হাসল। 'এত বড় লোকের আঠারো টাকা ঘরের ভাড়াটে আমরা।'

'ছি ছি!' দাঁত দিয়ে জিভ কাটল ঘোষ। 'তিনি আপনাদের সেই চোখেই দেখেন না। আপনি আছেন, লাহিড়ি মশাইয়ের পরিবার আছেন, কানাইবাবু রতনবাবুরা আছেন। সবাই তো ভাল ঘর না পেয়ে ঠেকে এখানে এসেছেন। তিনি তা খুব জানেন, সেই জন্যেই আমাকে দিনের মধ্যে দশবার ক'রে পাঠাচ্ছেন বারো নম্বর বাড়ি দেখে আসতে কারোর কিছু অসুবিধা হচ্ছে কি না।'

শিবনাথ রুচির কানে ফিসফিসিয়ে বলল, 'মোক্তারামবাবু স্ট্রীটের বাড়িঅলা নয়। ঢের বেশি শিক্ষিত, অনেক বেশি প্রগতিবান। এঁর সংস্রবে এসে আমরা খারাপ করিনি।'

সরকার বলল, 'আপনারা আর দাঁড়িয়ে কেন, চলুন। আপনাদের ঘর দেখিয়ে আমাকে এখুনি কোলকাতায় যেতে হবে।'

'কেন?' কমলা প্রশ্ন করল।

মদন ঘোষ একটু বিষণ্ণ গলায় বলল, 'বড় খোকা বাবুর পেটের অসুখ হয়েছে, হোটেলে বোধ করি শুয়োরের মাংস ঠেসে খেয়েছিল। যেতে হবে আমাকে এই রাত ক'রে এখন সেই চৌরঙ্গির সাহেব পাড়ায় ওষুধের দোকানে।'

'কেন বেলেঘাটার কোনো ডিসপেন্সারীতে কি পেটের অসুখের ওষুধ পাওয়া যায় না?' কমলা সরু গলায় বলল।

মদন ঘোষ ঠোঁট প্রসারিত ক'রে অর্থব্যঞ্জক হাসি হাসল।

'পয়সা—দিদিমণি, পয়সার ওপর রায় সাহেব সবাইকে শুইয়ে রেখেছেন। শুধু ওষুধ! বৌদিমণির সেলাইয়ের ছুঁচ ভেংগে গেলে নতুন ছুঁচ কিনতে আমাকে আর্মি নেভি স্টোরে ছুটতে হয়। অবশ্য রাহা খরচের বিলটাও তেমনি আমি ঠেসে করি। তাঁরা বিলাতি হোটেলে খান আমিও ফেরার পথে খিদে পায় বলে শেয়ালদায় এসে বাস বদলানোর সময় রেস্টুরেণ্টে মাংস পরোটা মারি। বাবু কিছু বলেন না বটে, মুখ টিপে হাসেন, হাসেন আর বিলে সই মেরে দেন। তারপর ঠাট্টা ক'রে বলেন, 'সরকার মশাই, আজ শনিবার চলুন আরামবাগ থেকে ঘুরে আসিগে!'

'আরামবাগে কি?' কমলা ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করল। মদন ঘোষ হেসে মাথা নাড়ল। 'সে আর বলব না, তা আর না-ই-বা শুনলেন। হে—হে। সরকার এত জোরে হাসে যে, মুদি দোকানের সামনে দাঁড়ানো লোক দুটি হকচকিয়ে ওঠে।

'ও বুঝেছি, না না, সে আমি জানতে চাইনে, তা আমার জিজ্ঞাস্য নয়।' কমলা হঠাৎ লজ্জিত হয়েছে এমন ভান করতে মদন ঘোষ তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়া হাসিটাকে ছোট করে ফেলতে চেষ্টা করে। যেন গুটিয়ে সবটাকে দুই ঠোঁটের মধ্যে ধরে রাখবার চেষ্টা ক'রে পরে বলে, 'না না তেমন কিছু নয়, খুব যে একটা প্রাইভেট কিছু, বাস্তবিকই রায় সাহেবের ছেলেটি ভাল, পারিজাতবাবু পাক্কা জেণ্টেলম্যান। বলছিলাম, আমাদের প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক, আমি তার কর্মচারী। আবার দরকার হলে একসংগে ফুর্তি করতেও ডাকেন।'

কমলা বলল, 'আপনি ভাগ্যবান। আমরাও পরের চাকর। প্রভু ভৃত্যের দূরত্ব অনেক।' যেন কথার অনুমোদন আদায়ের জন্য কমলা শিবনাথের দিকে তাকায়। শিবনাথ মাথা নেড়ে বলল, 'একশ বার। কালচার্ড মনিব এমনি হয়।' বলে বেশ আত্মীয়তার ভংগিতে মদন ঘোষের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি হ্যাপি সরকার মশাই, এই বিষয়ে আমারও অপিনিয়ন নিন।'

মদন ঘোষ প্রসন্ন দৃষ্টিতে নতুন ভাড়াটে দম্পতির দিকে তাকাল।

'আহা আপনাদের দেরি ক'রে দিচ্ছি, চলুন। আপনারই নাম তো শিবনাথ দত্ত? বারো নম্বর ঘর। চলুন। আপনার মোটঘাট ফ্যামিলির লোক সব এসে গেছে।'

'হ্যাঁ, এই তো।' শিবনাথ ঘাড় নেড়ে রুচি মঞ্জু ও মুটে তিনটেকে দেখিয়ে দিলে।

'চলুন মিস গাংগুলী আপনি তো ঘরে যাচ্ছেন।'

'চলুন।'

কমলা রুচির হাত ধরে অগ্রসর হ'ল।

মুদির দোকানের সামনেটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল।

দোকানের সামনে দাঁড়ানো একজন আর একজনকে বলল, 'আর এক বাবু এসেছেন টিনের ঘরে মশার কামড় খেতে। হা-হা।'

'কি করবে রে দাদা। দিনকাল বহুৎ খারাপ হয়ে গেছে। শুধু কি রিফুউজি আতর পাউডার এসেন্স মাখা ক'গন্ডা মাইয়াছাইল্যা দেখবি তুই আয়। রাস্তায় লাইন দিয়েছে ঘড়া কলসি নিয়ে কলের জল ধরতে।'

'কেন,' একজন ব্যস্ত হয়ে বলল,' রায় সাহেবের বাড়িতে তো কল বসেছে। অথচ ভাড়াটেদের ভাড়া বাড়েনি শুনলাম। এই জন্য পারিজাতবাবুর ওপর সবাই খুশি।'

'দিয়েছেন,' দ্বিতীয় লোক বলল। 'বারোটা' ফ্যামিলির জন্য একটা পাইপ। সেই পাইপ বিগড়াতে কতক্ষণ।'

'তাও বটে।' প্রথম ব্যক্তি অনুমোদন-সূচক ঘাড় নাড়ল। (ক্রমশঃ)

দেবতাত্মা হিমালয়

প্রবোধকুমার সান্যাল

নেপাল

২

বাগমতীর ধারে সরকারী এক তাঁবু পাওয়া গেল। সেটা লতাপাতায় ছাওয়া তাঁবু। ভিতরে কিছু নেই, বালুপাথরে কাঁকরে পরিপূর্ণ। খড় সংগ্রহ করে আনা গেল। কিন্তু নদীর স্রোত যদি হঠাৎ খরতর হয়, তবে জল আসবে ভিতরে। আমাদের মনে উদ্বেগ ছিল, কিন্তু তার চেয়েও দুর্ভাবনা ছিল এই, তুহিন ঠাণ্ডার মধ্যে আমাদের রাত্রি কাটবে কেমন করে?

পাথরের টুকরোর সাহায্যে উনুন বানিয়ে ভাত ফোটাবার চেষ্টা চললো। কাঠের সেই আগুনটাই হোলো আলো, তার বাইরে সব অন্ধকার হয়ে আসছে। শোনা গেল, এখন এদিকে নাকি নরখাদক বাঘের উপদ্রব চলছে। মানুষের গন্ধ ও সাড়াশব্দ পেলে তারা আসতে পারে বৈ কি। হিমাচ্ছন্ন সন্ধ্যার ঠাণ্ডায় আমরা নদীর তটে ব'সে এমনিতেই ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিলুম, তার উপরে এলো নরখাদকের আতঙ্ক। পালিতমশাই এদিক ওদিক তাকিয়ে কাঠের আগুনটা ছেড়ে তাঁবুর দরজার কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসলেন। গরম গরম চা ও জলখাবার পেয়ে তাঁর আবার পরিহাসবোধ ফিরে এসেছিল। এপারে কিন্তু অন্ধকারে আর বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না। আমরা কেবল উদ্বিগ্ন-চক্ষে চেয়েছিলুম পশ্চিম দিকে, দুই বিশাল পর্বতের নীচেকার গহ্বর থেকে যেখান দিয়ে বাগমতীর দুরন্ত জলধারা সশব্দে ছুটে আসছে। গত কয়েকদিন রৌদ্র অতিশয় প্রখর ছিল, বরফ গলেছে নিশ্চয় অনেক বেশী। মধ্যরাত্রের দিকে স্রোত স্ফীত হবার সম্ভাবনা আছে। আমাদের মন দুশ্চিন্তায় ভ'রে রইলো।

আহারাদি সেরে তৃণশয্যার উপরে কম্বল মুড়ি দিয়ে যখন পড়েছি তখন আমাদের তাঁবু যাত্রীর সংখ্যায় দেখতে দেখতে ভ'রে উঠছে। ভিতরে জন আটেকের মতো জায়গা হ'তে পারতো, কিন্তু জন পনেরো এসে জায়গা নিল। ভিখারী, বৃদ্ধা, খঞ্জ, বাউণ্ডুলে, সাধু—নানা লোকে ভ'রে গেল। ওর মধ্যে ছিল একজন কাঁচা বয়সের কৃষ্ণাঙ্গী বিহারী স্ত্রীলোক—কপালে টিপ—মাথায় সিঁদুর, হাতে রূপার চুড়ি, পরনে কালাপাড় শাড়ী, আগে থেকেই আমাদের মুখচেনা হয়েছিল। সে এসে জায়গা নিল এক কেশবিরল বৃদ্ধ মহারাজের পাশে। স্ত্রীলোকটির কলকণ্ঠে, পরিহাসে, স্পষ্ট-বাদিতায় এবং গুনগুনানি সঙ্গীত সাধনায় মরুভূমির উপর যেন কাজল মেঘের ছায়া ঘনিয়ে এল। হিন্দিভাষায় পালিত মশায়ের ব্যুৎপত্তি কম, তবুও কম্বল মুড়ি দিয়ে ভিতরে ভিতরে হেসেই খুন। স্ত্রীলোকটির প্রাণশক্তি ছিল অসামান্য, তার কলকণ্ঠের তাড়নায় ঘুম পালাচ্ছে সকলের চোখ থেকে। কিন্তু একথাটা শোনানো হোলো যে, মানুষের গলার আওয়াজ পেলে নরখাদকের পক্ষে পথ চিনে তাঁবুর মধ্যে ঢোকা সম্ভব এবং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের প্রতি নরখাদকের আকর্ষণ বেশী,—তখন সে চুপ করলো।

মধ্যরাত্রে চেঁচামেচিতে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। পুঁটলী থেকে মোমবাতি নিয়ে আলো জ্বালানো হোলো। আমরা লাঠি বাগিয়ে ধরলুম। কিন্তু ব্যাপারটা
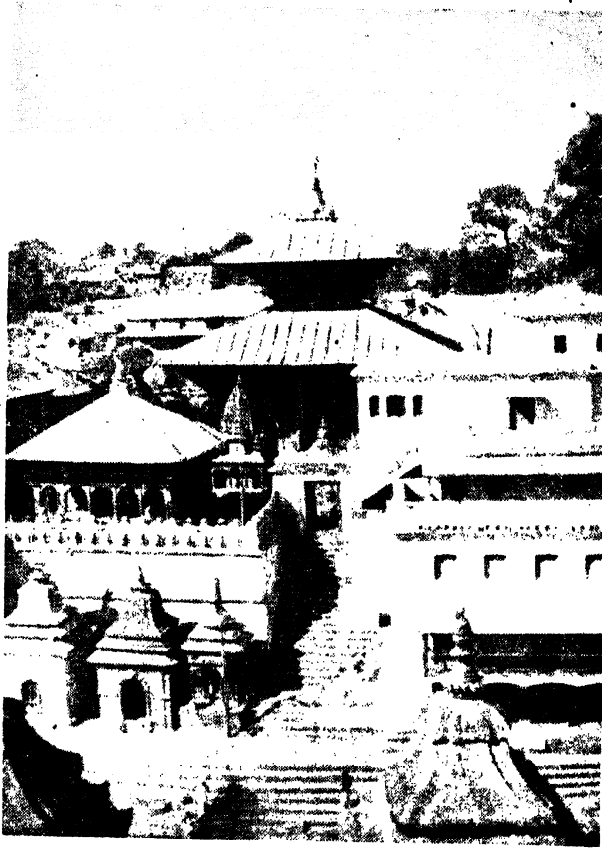
নেপালের সুবিখ্যাত পশুপতিনাথের মন্দিরের একাংশ

একটু ভিন্ন রকমের। বৃদ্ধ কেশবিরল গেরুয়াধারী মহারাজ শুয়েছিল স্ত্রী-লোকটির ঠিক পাশে। সহসা মধ্যরাত্রে ঘুমের ঘোরে স্ত্রীলোকটি অনুভব করে, নরখাদক ব্যাঘ্রের থাবা তা'র শরীরকে আঁকড়ে ধরেছে। ঘুম ভাঙতেই বুঝতে পারে, নরখাদক নয়—বৃদ্ধ মহারাজেরই থাবা। আলো জেলে আমরা দেখি, বিরল কেশ মহারাজের মাথায় স্ত্রীলোকটি সজোরে চপেটাঘাত করছে। কিন্তু মহারাজ স্বয়ং বহুকাল তপশ্চর্যার ফলে এমনি সংযম ও অহিংসায় ব্রতী ছিলেন যে, অত প্রহারের ফলেও তাঁর আক্রোশ হচ্ছে না। বৃদ্ধ এই কথা বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন যে, ঘুমের ঘোরে তাঁর এক প্রিয় শিষ্যকে স্বপ্নে দেখে হাত বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু স্ত্রীলোকটি তাঁর কথায় তিলমাত্র বিশ্বাস স্থাপন না ক'রে এই কথাটাই চীৎকার ক'রে জানাতে চায় যে, পুরুষের হাতের এবং আঙুলের ভাষা প্রত্যেক যুবতী নারী বোঝে এবং এই মধ্যরাত্রে মহারাজের শ্বাসপ্রশ্বাসের যে উত্তাপ অনুভব করা যাচ্ছিল, তার ভিতরকার রহস্যটা মেয়ে-মানুষের কাছে দুর্বোধ্য নয়।

চেঁচামেচি এবং তর্কবিতর্ক চলা অনেকক্ষণ পর্যন্ত। মোমবাতির মালি আলোটা নিবিয়ে মোমবাতিটা কাছে নিয়ে স্ত্রীলোকটি এবং মহারাজ যেখানে শুয়ে ছিল ঠিক সেখানেই রইলো। যতদূর মনে পড়ে শেষরাত্রের দিকে আবার উভয়ের মধ্যে একটা চাপা কলহ এবং লাঞ্ছ পুনরায় আমাদের কানে আসছিল।

তারপর সকাল হোলো। শীতে জ'মে যাচ্ছিল হাত পা। আজ ভোর-ভোর আমরা চেৎলাং ছেড়ে চন্দ্রাগিরির চূড়া অতিক্র করবো। চড়াই খুব কঠিন, তবে এইটি শেষ চড়াই। এরপর নামতে হবে থান কোটে, সেখান থেকে সোজা কাটমাণ্ডু আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলুম রোদ ওঠবার আগেই বেরিয়ে পড়লো।

পালিতমশাই সহজে নড়তে চান্ না তিনি একটু ধীরগতি। তাঁর চা-পান চাই ঘন ঘন। একটু মশগুল হয়ে বসা, একটু গত রাত্রির আলোচনা,—তার সঙ্গে গরম গরম পুরি-কচুরি। সমস্তটা লোভনীয় সন্দেহ নেই, তবে কিনা পকেটের ভাবাট একটু অন্য রকমের। যত দেরি হবে ততই তহবিলে টান ধরবে, এই মুশকিল। যাই হোক, আমাকেও একটু ঢিলে দিতে হোলো।

আজ সকালে আমরা আবিষ্কার করলুম, মহারাজ এবং সেই হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকটির মধ্যে বেশ সদ্ভাব ঘটেছে। মেয়েটি পরিহাসে বেশ সরস, **এবং** বৃদ্ধ মহারাজও কর্মোৎসাহে বেশ **চঞ্চল। দুজনে** একসঙ্গেই চলাফেরা করছে। **পরম্পরায়** জানা গেল, স্ত্রীলোকটির **সন্তানাদি হয়** না ব'লে স্বামীর সঙ্গে বিবাদ ক'রে পশুপতিনাথে চলেছে। বাবা পশুপতিনাথ যদি তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, এই আশা! এই কাহিনীটিকে কেন্দ্র ক'রে আমি পরে 'দেবতার গ্রাস' নামে একটি রচনা প্রকাশ করেছিলুম। বাবা পশুপতি-নাথ স্ত্রীলোকটির মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছিলেন!

চেৎলাঙের সামনেই সুবিশাল পর্বত-চূড়া। ওরই গা বেয়ে উঠছে শত শত যাত্রী পিপীলিকাশ্রেণীর মতো। সিসাগাড়ির মতো এটারও নাম চন্দ্রাগাড়ি। অত্যন্ত কষ্ট-সাধ্য পাকদণ্ডি পথ,—সোজা খাড়াই। অমরনাথ তীর্থে যাঁরা গেছেন, যাঁরা

মন্দাকিনী থেকে উখীমঠে গেছেন, যাঁরা বিশ বাইশ বছর আগে ত্রিযুগীনারায়ণ কিংবা গুপ্তকাশী গেছেন—তাঁরা বুঝবেন চন্দ্রাগিরির চড়াই পথ। একমাত্র সান্ত্বনা এই, এই পথের দীর্ঘতা কিছু কম—মাইল চারেকের বেশী নয়। যেমন ভুটানের সীমানায় বক্সা বন্দীশালার পথ,—মাইল দেড়েক চড়াই ব'লেই রক্ষে, নইলে কষ্টটা মনে থাকতো। যেমন মুসৌরী থেকে 'কেম্পটি' জলপ্রপাতের পথ,—ছয় মাইল মাত্র চড়াই ব'লেই লোকে সহজে ভুলে যায়। কিন্তু যে কারণে লোকে নৈনীতালের 'চায়না পীকের' কথা ভোলে না,—সেই কারণেই চন্দ্রাগিরির কথা আজও আমি ভুলিনি।

শ্রীশাগিরি এবং চন্দ্রাগিরি—দুটো চড়াই সমুদ্রসমতা থেকে প্রায় আট হাজার ফুট উঁচু। কিন্তু ভীমপেডির পর চার থেকে আন্দাজ পাঁচ হাজার ফুট পর্যন্ত চড়াই উঠতে হয়। বাকি চড়াই উৎরাই অমলেকগঞ্জ থেকে ভীমপেডি অবধি মোটর বাসেই আনাগোনা চলে। চন্দ্রাগিরির চূড়া এবং এদিক ওদিকের পর্বতমালা ঘন অরণ্যে আবৃত, হিংস্র জন্তুর অবাধ বিচরণ ভূমি। চূড়ার দিকে অগ্রসর হলেই চারিদিকের দিগন্ত বিস্তার লাভ করতে থাকে। নীচের দিকে যখন থাকি, নিজে তখন অনেক বড়। যত উপরে উঠি, যত বিশ্বপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টি যায়, তখন দেখি নিজে আমি কত ক্ষুদ্র! সংসার যাত্রায় আমার আশে পাশে যত লোভ, মোহ, অভিমান, আকর্ষণ, আমার সুখ দুঃখ, আমার ভিতরকার ষড়রিপুর খেলা—তারা কী নগণ্য, কী সামান্য! আকাশ এখানে অনেক বড়। এ পৃথিবী আশ্চর্য।

চন্দ্রাগিরির চূড়ায় দেখি, কাপড়ের টুকরো বাঁধা অসংখ্য পতাকা! হিমালয়ের যেখানে যাও, এ দৃশ্য চোখে পড়ে। সিকিমে এই, অমরনাথে এই, গাড়োয়াল কুমায়ুনে এই, ভুটানের সীমানায় এই, হরিদ্বারের চণ্ডী পাহাড়ের পথে এই। এতই যখন চলতি, তখন এটি প্রচলিত কুসংস্কার সন্দেহ নেই। কিন্তু এই কুসংস্কার এক অখণ্ড ঐক্যবন্ধনে বেঁধে রেখেছে সমগ্র হিমালয়কে একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। কালো কাপড় উড়িয়ে কাক তাড়ানো যায়, লাল কাপড় দেখলে

নেপালের বাগমতী নদী

নাকি মহিষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, সাদা কাপড়ের টুকরো ওড়ালে নাকি হিমালয়ের ভূত প্রেত পিশাচেরা সে তল্লাট ছেড়ে দূর হয়ে যায়। এই শ্বেতপতাকা ওড়ে সমগ্র তিব্বতের গুম্ফায়-গুম্ফায়।

চূড়ায় উঠে দেখি সেই প্রাচীন পৃথিবী; কিন্তু উত্তরে তার স্বপ্নলোক। সমগ্র হিমালয়ের তুষার রাজ্য,—তার প্রত্যেকটি শৃঙ্গ দুগ্ধশুভ্র বরফে ঢাকা। প্রত্যেকটি যেন তুষার শুভ্র মন্দির, প্রত্যেকটি যেন মহাযোগে আসীন। বায়ুস্তর ভেদ ক'রে গিয়ে ওদের উপর পড়েছে রৌদ্র—একটি অত্যুজ্জ্বল গৈরিক স্বর্ণাভার আবহ সৃষ্টি করেছে। এখানে সব চুপ। মানুষের কথা, ভাষা, মন্ত্র, স্তব, কলকণ্ঠ—সমস্ত স্তব্ধ। চেতনা, প্রাণ, চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধি—সমস্তগুলো যেন থরথরিয়ে কাঁপছে আমার এই দৃষ্টিবিন্দুতে। অনেকক্ষণ পরে নিজেকে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে নাড়িয়ে বুঝতে হয় যে, এবার আমাদের এগোতে হবে।

উপর থেকে চোখ নামিয়ে নীচে আনতে হয়। নীচের দিকে বিরাট নেপাল, —নীলাভ তা'র উপত্যকা এবং শস্যপ্রান্তর। বড় বড় মন্দির ও প্রাসাদের চূড়া—কিন্তু এখান থেকে কী ক্ষুদ্র! মাঝখানে রৌপ্য রৌদ্রাভ নগর কাটমাণ্ডু,—সমস্তটা যেন পুতুলের ঘর সাজানো। যত বিরাট যত ব্যাপক যত বিস্তৃত যা কিছু, হোক—হিমালয়ের কাছে অতি নগণ্য। এই পশ্চাদ্‌পটের সামনে দাঁড়িয়ে সমস্ত কাটমাণ্ডু শহরটাকে ফুটখানেক লম্বাচওড়া একটা ছেলেখেলা ব'লে মনে হতে লাগলো। এমনি ক'রে দাঁড়িয়ে কতবার কত উপত্যকা দেখেছি হিমালয়ের কত বিস্ময় দুই চোখে নিয়ে। মুসৌরির উপরে দাঁড়িয়ে দেরাদুন, বানিহালের সুড়ঙ্গলোকের মুখ থেকে সমগ্র কাশ্মীর, হনুমান চটি ছেড়ে গিয়ে দূরের থেকে বদরিকাশ্রম, গোপেশ্বরের পাহাড়ের উপর থেকে বহুদূর অলকানন্দার তীরে চামোলির পার্বত্য শহর, বজ্রেশ্বরীর মন্দির অঞ্চল থেকে পাঞ্জাবের বিশাল কাংড়া উপত্যকা, চণ্ডীর মন্দিরে দাঁড়িয়ে, হরিদ্বারের মনোরম দৃশ্য।

কতক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমরা এবার অবতরণের দিকে পা বাড়ালুম। আমাদের নামতে হবে আন্দাজ হাজার চারেক ফুট নীচে, কিন্তু কিঞ্চিদধিক দুমাইলের পরিসরে। কাজটি শক্ত। বুঝতে পারা যায়,

এই বিরাট প্রাকৃতিক প্রাচীরের অন্তরালে রাখা হয়েছে কাটমাণ্ডু শহর; এই অবরোধের বাইরে রাখা হয়েছে সভ্যতাকে। এই বিপজ্জনক অবতরণের দিকে তাকিয়ে প্রথমটা আমরা প্রমাদ গণলাম। নামবার সময় দেহের ভারসাম্য না রাখতে পারলে অপঘাত অবধারিত। তা ছাড়া ভয় ছিল হাঁটুর ওপর অতিশয় চাপ পড়বে। পাহাড়ের চড়াইতে বিপদ নেই,—কেবল বুকের মধ্যে আঘাত লাগে এবং পরিশ্রম হয়; কিন্তু উৎরাইতে লাঠি ঠিক ক'রে ধ'রে না রাখতে পারলে বিপদের সমূহ আশঙ্কা। মনে পড়ে যাচ্ছে পরেশনাথের কথা। ওই হুজারীবাগের ওদিকে। যারা শ্বেতাম্বরী দিগম্বরী ধর্মশালার ওদিক দিয়ে পরেশনাথ পাহাড়ের মন্দিরে উঠেছেন, তাঁদের খানিকটা অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু তবু পরেশনাথের সুবিধা এই, পথটা ছয় মাইলে ছড়ানো। এখানে বড় জোর আড়াই মাইল। শোনা গেল, এই উৎরাই পথে প্রতি বছরে বহুসংখ্যক দুর্ঘটনা ঘটে। অসতর্ক পায়ের ধাক্কায় নীচের দিকে অনেক সময় পাথর গড়িয়ে পড়ে। অনেকে পা ফসকে নীচে গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তীর্থযাত্রাপথে কতকটা দুর্গম অঞ্চল থাকে ব'লেই সেটা মানুষের সাহস ও শক্তিকে আকর্ষণ করে। সমগ্র হিমালয় ভ্রমণে মানুষের শক্তি, সাহস, ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং আত্মনিগ্রহের অগ্নিপরীক্ষা এইভাবেই চলে। তুমি শান্ত, তুমি নম্র, তুমি ধীর, তুমি একাগ্র, তুমি কষ্টসহিষ্ণু,— তবেই তুমি হিমালয়ের প্রকৃত স্বরূপকে দর্শন করবে!

প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগলো থানকোটে এসে পৌঁছতে। ছোট গ্রাম্য শহর। চারিদিকে দারিদ্র্যটা বড় প্রকট। এখান থেকে কাটমাণ্ডু আন্দাজ মাইল ছয়েক পথ। এখান থেকেই মোটরবাস ছাড়ে। এবারে আমাদের চেহারায় তীর্থযাত্রীর ছাপ ফুটেছে। ধুলোবালি-মাখা কম্বল, নোংরা পরিচ্ছদ, ময়লা মাথা, শীতের ছাপ ছাপ চামড়া-ফাটা দাগ,—তার সঙ্গে নিগ্রহের কৃশতা। এবার সহজে মিলে গেছি যাত্রীর জনতার সঙ্গে। এর আগে দরিদ্র তীর্থযাত্রীদের কেউ কেউ আমাদের কাছে ভিক্ষা
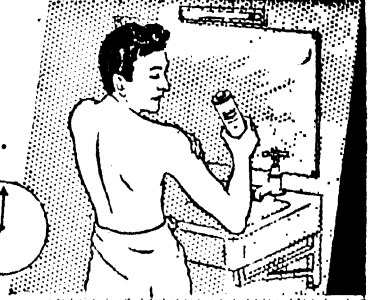
চাই, তবে আমাদের চেহারায় বেমানান হবে না। পাহাড় থেকে নেমে বড় স্বস্তিবোধ করলুম। গত তিন-চারদিনে সমান সহজ রাস্তা যেন ভুলে গেছি। আমরা বাসে চ'ড়ে বসলুম।

পিছনে প'ড়ে রইলো চন্দ্রাগিরির আরণ্যক বন্য-শোভা। গুহাগহ্বরে, কন্দরে, পাহাড়তলীর নীচে নীচে জানোয়ার ও সরীসৃপরা তাদের চিরস্থায়ী বাসা নিয়ে আছে; আর এই পর্বতমালার কোন এক রহস্যালোকের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে বাগমতী,—যার এপারে ওপারে বহু অঞ্চলে আজও মনুষ্যপদচিহ্ন স্পর্শ করেনি। মনে পড়ছে অলকানন্দার কোন এক শাখা নদীর পথ। চলতি পথের থেকে কিছুদূরে যেখানে যাবার প্রয়োজন ঘটে না কারো। ভীরু পায়ে গিয়ে নামলুম সেই নদীর কোলে প্রস্তর-শিলায়। কিছুদূর পর্যন্ত গিয়ে সেই নদী দুই বৃহৎ পর্বতের মাঝপথ দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। কোন মানুষ কখনো গিয়েছে সেখানে, তার কোন চিহ্ন নেই। উপর থেকে নামছে সেই জলধারা, তার দুরন্ত বেগ ছুটে এসে পাথরের উপরে ধাক্কা খেয়ে উৎক্ষিপ্ত ফেনায়িত হচ্ছে। বড় বড় মাছ উপর থেকে জলের সঙ্গে নীচে নেমে যাচ্ছে। বসন্তকাল পরিপূর্ণ সমারোহে নেমেছে ছোট নদীর দুই ধারে, পাহাড়ের গায়ে, বনময় গুহা-গহ্বরের আশেপাশে। শৈবালাচ্ছন্ন পাথর আর প্রাচীন শিকড়ের পাশ দিয়ে বনলতারী উঠে গেছে মস্ত গাছগুলিতে। অজানা অনামা পুষ্পসম্ভার ঝুঁকে পড়েছে গাছ থেকে নদীতে। বড় বড় রঙীন পাখীরা ডাকছে। প্রকাণ্ড দুই ডানা মেলে নেমে এলো দুই লালমোহন। পাহাড়ের কোটরে ডিম পেড়েছে অপরিচিত পাখী। মস্ত পাথরখানার পাশে প্রকাণ্ড বিচিত্রবর্ণ সাপ স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। দেখতে দেখতে আরো গিয়েছি এগিয়ে। মধ্যাহ্নের নৈঃশব্দ্যের মধ্যে শুনতে পাওয়া যায় পাখীর কূজনের মধ্যে মেলানো সরীসৃপের ডাক। নানাবর্ণের বন্য মাকড়সারা জাল বেঁধে ঝুলছে কাঁধের পাশে পাশে পাহাড়ে। দূরের বস্তির থেকে কখনো কোন গৃহ-পালিত পশু আসে না এই নদীতে জল খেতে। সম্পূর্ণ নিঃঝুম পাহাড়তলীর এই বন্যপ্রকৃতি। বিশ্বাস করেছি সেদিন ওইখানে দাঁড়িয়ে, আকাশপথের জ্যোৎস্না-লোক থেকে নেমে আসে শুক্লপক্ষ দেববালার দল—ওরা এসে অবগাহন ক'রে যায় ওই নীলাভ জলধারায়, উঠে বসে ওই শিলাতলে, তাদের দেহের শোভায় পাহাড়তলীর এই মায়াকানন রোমাঞ্চ হয়ে পুলকিত হয়। উপরে দূর ঈশান কোণের পর্বতগাত্র বেয়ে মানুষের পায়ে চলার সংকীর্ণ পথ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। আর এই নীচে অদূরে পাথরের

নেপালী রমণী

উপরে দেখেছি শুষ্ক রক্তের ধারা তখনও রক্তিমাভ এবং তারই অদূর-ঝোপের পাশে সদ্যহত শৃগজড়ানো হরিণের খণ্ডদেহ। হঠাৎ সন্দেহ হয়েছে আশপাশ থেকে আমাকে কোন একটা প্রাণী তাক করছে, ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমি অনুভব করতে পারছি,—একটি মুহূর্তে আমার সর্ব-শরীর ছমছমিয়ে এসেছে! আমি বাইরের লোক, এ রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করেছি, ওদের কেউ একজন মুখ বুজে আমাকে লক্ষ্য করছে। সহসা সজাগ হয়েছি, আমার হাতে হাতিয়ার কিছু নেই। তখন ভারি পা দুটো টেনে টেনে উঠে আবার ফিরে গেছি।

বালু-পাথরে আকীর্ণ পথ ভেঙে আসতে মোটরবাসের লাগলো আধ ঘণ্টা। যেখানে নামালো সেখানকার কাছেই ছিল জলের কল। এখানে পৌঁছবার আগে বাগমতীর পুল পেরিয়ে এসেছি। কিন্তু প্রথমেই কাটমাণ্ডুর চেহারা দেখে মন বড় বিষণ্ন হলো। যেমন অপরিচ্ছন্ন, তেমনি ঘিঞ্জি—সমস্তটা মিলে কেমন যেন বুক-চাপা সংকীর্ণতা। প্রত্যেক চতুষ্কোণযুক্ত দোপাট্টা চালাঘরের ভিতরে যতই দৃষ্টি যাচ্ছে, কেমন যেন অস্বাস্থ্যের চিহ্ন, কেমন রুগ্নতা, কেমন একপ্রকার নোংরা অসুস্থ জীবনযাত্রা। কাছেই ত্রিপুরেশ্বরের মন্দির। কাঠের কাজের ওপর অমন চমৎকার কারুশিল্প, এমন অপূর্ব নক্সায় প্রত্যেক বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে—তার ছন্দ, তার মাত্রা, তার সুষমা ও সুসঙ্গতি,—দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে গেলুম। কিন্তু শীতপ্রধান দেশের কপাল-গুণে নাগরিকদের অপরিষ্কার এবং বিশৃংখল গৃহস্থালীর দিকে চেয়ে অত্যন্ত নিরুৎসাহ বোধ করলুম।

পথের উপরে পড়ে রয়েছে সিঁদুর-মাখা শিবলিঙ্গ, তার পাশে হাঁড়িকাঠ—সেখানে টাটকা রক্ত থিক্ থিক্ করছে। এটা স্বাধীন দেশের একটা রাজপথ হলেও শ্রী ও শোভনতার উপর ভ্রূক্ষেপ কারো নেই। কোথাও গম্বুজ, কোথাও প্যাগোডা, কোথাও বা শাক্ত-মন্দির।

অত্যন্ত তীব্র রোদ, সুতরাং ঠাণ্ডা কলের জলে যেমন তেমন করে পথের ওপরেই সকলের আগে স্নান করে নিলুম। নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনলুম। গলা ধ'রে গেল, মাথা ভার হলো। স্নান সেরে হাঁটতে হাঁটতে এসে আমরা অতিথিশালা খুঁজে বার করলুম।

আধুনিক কাটমাণ্ডু সৃষ্টি করেছেন পরলোকগত মহারাজা চন্দ্র সমসের জঙ্গ বাহাদুর। রাজপথের ধারে তাঁর প্রস্তর-মূর্তি। অদূরে কলকাতার লালদীঘির মতো একটি সরোবর—রাণীবাগ। সরোবরের ঠিক মাঝখানে একটি মন্দির,—অমৃতসরের স্বর্ণ-মন্দিরের মতন। রাণী-বাগের ওপারে একটা ঘণ্টা-ঘড়িঘর; যাকে বলে টাওয়ার ক্লক। চতুর্দিকে পাহাড়, মাঝখানকার এই উপত্যকায় হলো কাটমাণ্ডু। এরই আশেপাশে ছোট ছোট পার্বত্য গ্রাম্য-শহর হলো, স্বয়ম্ভূ, দক্ষিণ-

নেপালের একটি ধর্মানুষ্ঠান

কালী, পাটান, নারায়ণথান, দত্তাত্রেয়, চৌবাহার ইত্যাদি। কিছু গৃহশিল্প, কিছু বা চাষবাস, এই হলো সাধারণ জীবিকা। এ ছাড়া চাকরিবাকরির সুবিধা কম। ছেলেরা বড় হতে পারলে চোখ পড়ে পল্টনের দপ্তরে, মেয়েরা বয়স্থা হলে 'কেটি' হয়ে যাবার কামনা করে রাজসংসারে। যিনি রাজা, তিনি ধীরাজ নামে পরিচিত, প্রধান মন্ত্রী হলেন মহারাজা। ধীরাজ হলেন 'পাঁচ সরকার', মহারাজা 'তিন সরকার'—যতদূর কানে এলো। এগুলো বাইরের লোকের কাছে কোন অর্থ বহন করে না, তাই এসব নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায় না।

চারিদিকে পর্বতমালা,—মাঝখানে এই উপত্যকা নাকি ছিল এককালে এক বিশাল হ্রদ। এই হ্রদের জল যিনি তরবারির একটি আঘাতে বার করে দেন, তিনি হলেন নেপালবাসীর উপাস্য দেবতা মঞ্জু দেব। তরবারির সেই আঘাতেই বাগমতী নদীর সৃষ্টি। সেই থেকে এই উপত্যকা মানুষের বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। কাশ্মীরেও ঠিক এই গল্প চলে। সেখানে ছিল কশ্যপমুনির কৃপা। কশ্যপ-মীর, এই নিয়ে কাশ্মীর। শ্রীনগর প্রান্তের ডাল হ্রদটিকে নালিপথে বার করে দিলে খুব খারাপ কাজ হয় কিনা আমার জানা নেই। নৈনীতালেও তাই। নৈনীহ্রদের নীচে থাকতেন নয়নীদেবী,—এদিক থেকে তাঁর অবশ্য কোন কৃপা হয়নি।

আজ নেপালে বয়ে চলেছে নতুন হাওয়া, সুতরাং আগেকার কাহিনী ওর ইতিহাসের মধ্যেই থাক্। এই সেদিনও রাজার পক্ষে নেপালের বাইরে যাওয়াটা ছিল অমঙ্গলসূচক একটা গর্হিত কাজ। আজকে সেই ধারণা এক ফুৎকারে উড়ে গেছে। রাজসংসারে 'কেটি' হয়ে থাকতে পারলে মেয়েদের বরাত ফিরে যেতো। কিন্তু এই রেওয়াজও বোধ হয় এবার কমে এলো। নেপালের বুদ্ধি ছিল প্রাচীন-পন্থী, জ্ঞান ছিল রক্ষণশীল সংস্কারে আচ্ছন্ন—সমাজে, ধর্মে, শিক্ষায়, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সেই কারণে মন ছিল পিছিয়ে। ফলে ব্যাধি অস্বাস্থ্য রাজ-নিগ্রহ এবং হতাশা কামড়ে ধরেছিল এতকাল ওদের সমাজ-জীবনকে। এই অবস্থায় বাঙালী গিয়ে পৌঁছেছিল নেপালে। তারা নিয়ে গিয়েছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতি। স্কুল-কলেজে, ডাকঘরে, রাজকোষে, সরকারী দপ্তরে, হাসপাতাল আর পূর্তবিভাগে এবং আইন আদালতে—যেখানে সেখানে ঢুকেছিল বাঙালী। আমি যখন গেলুম, তখন দেখি প্রধানমন্ত্রী মহারাজার গৃহশিক্ষক, মুন্সী, চিকিৎসক এমন কি তাঁর রন্ধনশালার অধিনায়ক সকলেই বাঙালী। বাঙলার অগ্নি-বিপ্লবী দলের ছেলে এককালে দেশ ছাড়িয়ে নেপালে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। বাঙালীরা আজো নেপালে খুব জনপ্রিয়। এই সেদিন পর্যন্ত ইংরেজরা ওদের ডাকবিভাগ দখল করেছিল, ওদের ভালো মন্দ নিয়ে গায়েপড়া অভিভাবকত্ব করে এবং পাসপোর্টের নামে ভারতবর্ষের সঙ্গে নেপালের মেলামেশা করতে দিত না। ইংরেজ চলে যাবার পর শ্রীশগিরি ও চন্দ্রগিরির দেওয়াল অতিক্রম করা এখন সহজ হয়েছে। নতুন রাস্তা খুলেছে। ইংরেজের খয়ের-খাঁ যারা অর্থাৎ মহারাজার দল এতদিন পরে রাজ্যপাট তুলে সরে পড়েছে। দক্ষিণের হাওয়া লেগেছে ওদের মনে। ওদের বাঁধন সব খুলে গেছে।

আগামীকাল পশুপতিনাথে শিব রাত্রির মেলা। আমি জ্বরে পড়েছি, মাথা তুলতে পারছিনে। জ্বর বেড়েই চলেছে। পালিতমশাই বেশ স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করেছেন সোৎসাহে তিনি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সরোবরের ধারে ধারে বায়ু সেবন করে ফিরছেন গলায় সেই হারছড়াটি ঝুলিয়ে। তাঁর বাঁ-হাতের দুটি আঙুল সেই হারগাছাটা প্রায় সময়েই ছুঁয়ে থাকে। গান তিনি জানেন না এই আমি জানতুম এবং গান তিনি যখন নিতান্তই গাইতে থাকলেন, তখনও বিশ্বাস করলুম, গান তিনি জানেন না।

হাসপাতালের বাঙালী এক ডাক্তারের বাড়িতে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলুম। তিনি আমার চিকিৎসার ভার নিলেন। ভদ্রলোক একা থাকেন, সুতরাং পথ্যাদির ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যা ছিল। সে যাই হোক, একটি ঘর পেয়েছিলুম ভালো। তারই জানলা দিয়ে চেয়ে রইলুম কাটমাণ্ডুর দিকে।

এককালে মুসলমান আক্রমণের ফলে বহু রাজপুত পরিবার পালিয়ে আসে নেপালে। সেও প্রায় সাতশো বছর হতে চললো। তখন নেপালে ছিল মঙ্গোলীয় পার্বত্য জাতি। তারা শুধু শান্তিপ্রিয় নয়—তারা নিজের শিল্পকলা ও স্থাপত্য

নয়ে থাকতো। রাজপুতেরা তাদের হাত থকে শাসনভার তুলে নেয়। ফলে সেই মঙ্গোলীয় ও রাজপুতের সংমিশ্রণের ফলে গুর্খা জাতির উৎপত্তি। সেই গুর্খারা পশ্চিম নেপালে ক্রমে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে এবং গুর্খা রাজ্যের পত্তন করে। অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে তারা এবং সমগ্র নেপালকে তারা শাসন করতে থাকে। আজও সেই তাদেরই রাজ্যপাট এবং তাদেরই প্রতিপত্তি। অবশ্য মাঝে মাঝে এখনও দুই দলের মধ্যে কলহের কথা শোনা যায়। একদল হলো গুর্খা নেপালী, অন্য দল হলো রাজপুত নেপালী। সে যাই হোক, নেপালের বহু অংশ আজও অনাবিষ্কৃত এবং উপেক্ষিত। দুর্গম ও দুরারোহ পর্বতমালার অংশে- অংশে উপত্যকা আছে, কিন্তু সেখানে জনবসতি। কোথাও চিরস্থায়ী তুষারের স্তূপ, কোথাও হিমবাহের আতঙ্ক, কোথাও বা ভীষণাকার তুষারবিগলিত জলপ্রপাত ঘেরা বৃক্ষলতা-তৃণহীন প্রস্তর প্রান্তর। এদেরই উত্তর সীমানায় রয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও গৌরীশৃঙ্গ। কাঠমাণ্ডু থেকে প্রায় দুশো মাইল পেরিয়ে গেলে মুক্তিনাথ,—সেখান থেকে গেছে গৌরীশৃঙ্গের পথ। সেখানে গৌরী- শৃঙ্গের একটি প্রাদেশিক নাম প্রচলিত।

কাঠমাণ্ডুর কেন্দ্র থেকে আন্দাজ আড়াই মাইল দূরে পশুপতিনাথ। মন্দিরের নামেই গ্রাম। যেমন কেদার- নাথ, যেমন জ্বালামুখী, যেমন বৈজনাথ। শহর থেকে মোটরবাস যায়, কিন্তু ভিড়ের চাপ ছিল বেশী। সেজন্য প্রবল জ্বর নিয়েও পরদিন আমাকে হেঁটে যেতে হলো। পালিতমশায়ের পুঁজি বোধ হয় কিছু ছিল, তিনি গেলেন মোটরবাসে। কথা রইলো মন্দিরে অথবা ফিরে এসে আবার দেখা হবে। পায়ে হাঁটা সুবিধা, কেননা ভ্রমণটা সত্য হয়। হিমালয়ের মধ্যে যখনই মোটরে ভ্রমণ করেছি, দেখেছি অনেক, কিন্তু উপলব্ধি সত্য হয়নি। পথে যাবার সময় রাজবাড়ি পড়ে বাঁদিকে। কিন্তু রাজবাড়ি বলতে যেমন উদ্যান সরোবর আর ফোয়ারার কল্পনা আসে, তেমন নয়। এ এক বিশাল ইমারত,— র তুলনায় সামনের দিকে অবকাশ নেই। কুচবিহারের রাজবাড়ি, নাটোরের রাজবাড়ি, কলকাতার গভর্নমেণ্ট হাউস, দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবন,—এরা চোখে স্বস্তি আনে। কিন্তু এ রাজবাড়ি একেবারে নীরেট। শহরের উপর দিয়ে গেছে সেই ভীমপেডির রজ্জুপথ—যেমন দার্জিলিংয়ে। জনস্রোতের ভিতর দিয়ে চলেছি। জ্বরের তাড়নায় পথে বসেছি কয়েকবার। চোখ দুটো ছিল ঘোলাটে, তাতে দেখার অসুবিধা হয়েছে। ক্রমে আমরা এসে পৌঁছলুম বাগমতীর পুলের কাছে। অদূরে শ্মশানঘাটা। নদীর ওপারে গুহ্যেশ্বরীর মন্দির ও পীঠস্থান। পশুপতিনাথের মন্দির বাগমতীর তীরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। মূলমন্দির-চূড়া সোনার পাতে ঢাকা, রূপার তোরণ, এবং মন্দিরের বাইরে বিশালকায় এক কনককান্তি বলিবর্দ। পশুপতিনাথের আশেপাশে আরো অনেকগুলি মন্দির দাঁড়িয়ে। মন্দিরের চত্বর অনেকখানি এবং চতুর্দিক মার্বেল পাথরে মোড়া। মূল মন্দিরের ভিতরে পশুপতিনাথের কৃষ্ণকায় পঞ্চমুখী প্রস্তর বিগ্রহ কষ্টিপাথরের বেদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত। ভিতরটা, যেমন অনেক দেশেই দেখি—অন্ধকার। ভিড়ের চাপকে রোধ করার জন্য মূল মন্দিরের চারদিকে চারটি দরজায় কাঠের বেড়া দেওয়া হয়। কিন্তু যাত্রীদলের প্রচণ্ড চাপ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ভিতরটা ভালো করে দেখতে দেয় না।

গুহ্যেশ্বরী মন্দিরে মূর্তি নেই, আছে

প্রস্তরশিলা, সোনার পাতে ঢাকা। ওটাই হলো মহাপীঠ,—এখানে সতীর গুহ্যস্থান পড়েছিল। যেমন কামাখ্যায় দেখে এলুম সতীর যোনিপীঠ—মন্দিরের ভিতরে গিয়ে কয়েকটি ধাপ নেমে অন্ধকারের মধ্যে সেই শীলাখণ্ড দর্শন। পশুপতিনাথে শৈব-পূজা, কিন্তু গুহ্যেশ্বরীর পূজা হলো শাক্ত,—এখানে মোরগ ও পশুবলি হয়। শাক্ত হিন্দু ও বৌদ্ধ এখানে মিলেছে। এই মিলন দেখা যায় নেপালের মচ্ছেন্দ্র-নাথের দেবস্থানে। উভয় জাতির লোক এখানে পূজা দেয়। সম্রাট অশোক এসেছিলেন পশুপতিনাথে, তাঁর আমলের বৌদ্ধমূর্তি চারিটি এখনো এখানে বিদ্যমান। পাশে রয়েছেন মৈঞ্জুদেবের মন্দির—যাঁর তরবারির আঘাতে জলরাশি স'রে গিয়ে এখানকার উপত্যকার জন্ম হয়। এখানে প্রবাদ, মঞ্জুশ্রীদেব এসে-ছিলেন চীন দেশ থেকে। সেই কারণে চীন, তিব্বত ও নেপালের ধর্মীয় যোগ ঘনিষ্ঠ। সেখান থেকে তীর্থযাত্রীরা আসে বুধনাথ স্তূপে—তারা আসে কাটমাণ্ডু পর্যন্ত। সেই স্তূপের থেকে নির্গত পবিত্র জল নিয়ে যায় তারা চীনে ও তিব্বতে। দালাই-লামা সেই জল স্পর্শ করেন।

শিবরাত্রির মেলায় এলো রাজার মস্ত শোভাযাত্রা। রাজদর্শন ঘটতে বিলম্ব হলো না। শিবিকায় এলেন রাজার পুরনারীরা, যাঁরা অন্তঃপুরিকা অসূর্যম্পশ্যা। তাঁদে সঙ্গে সঙ্গে এলেন অমাত্যগণ এবং রাজপুরুষ। পালিত-মশাইকে সেই জনারণ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

কাটমাণ্ডুর কাছে নেপালের কুচ-কাওয়াজের মাঠ বড় আধুনিক,—এদিকটায় এলে নব্য সভ্যতার স্বাদ মেলে। এর সীমানায় প্রাচীন নেওয়ারদের রাজধানী ছিল,—এর নাম যণ্ডিখাল। এই নেওয়ারদের হাত থেকেই পরবর্তীকালে গুর্খারা শাসনদণ্ড কেড়ে নিয়েছিল। এ ছাড়াও পরিভ্রমণের অঞ্চল রয়েছে পাটান ও ভাটগাঁও। এরা ছিল প্রাচীন নেপালের রাজধানী। সেখানেও নেওয়ারদের স্থাপত্য ও শিল্পকলার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। যাত্রীরা নীলকণ্ঠের ধারে গিয়ে বিষ্ণুমূর্তি ও বসুধারা দর্শন করে আসে। অসুস্থ দেহ নিয়ে সেখানে আমি যেতে পারিনি।

পরবর্তী তিনদিন একটু বেশী জ্বরে অনেকটা যেন বেহুঁশ থাকতে হয়েছিল। সমগ্র হিমালয় পর্বতমালা ভ্রমণের মধ্যে এই আমার প্রথম ও শেষবারের অসুস্থতা। যাই হোক, ডাক্তার সে-যাত্রায় নিউমোনিয়া ও বিকারের লক্ষণ সন্দেহ করে নেপাল ত্যাগের পরামর্শ দিলেন। শ্রীশগিরি ও চন্দ্রাগিরির আন্দাজ কুড়ি মাইল পাহাড় আমাকে ঝাম্পানে যেতে হবে।

যেতেই হবে ঝাম্পানে। কিন্তু টাকা! ঝাম্পানের ওই অতিরিক্ত কুড়ি টাকা ত' আমাদের কাছে নেই! পালিতমশাই আহারাদি সেরে পান চিবোতে চিবোতে এসে আমার চেহারা দেখে ত' হেসেই খুন। —একি, বাবা পশুপতিনাথের পায়ে মাথা রেখে চোখ বোজবার চেষ্টা করছেন দেখছি! সে কেমন করে হয়!

উনি একটা সিগারেট ধরিয়ে দিলেন আমার দুই আঙুলের ফাঁকে। কিন্তু যে কারণেই হোক সিগারেটটা প'ড়ে গেল হাত থেকে। উনি সন্দেহ করে কাছে এলেন এবং একটু যেন ভয়ই পেলেন। আমি হাসছিলুম। পালিতমশাই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, দেখুন, হারগাছাটা আমার গলাতেই আছে, এটা এখনই বিক্রী করা চলে,—তাছাড়া এটা আপনারই বান্ধবীর জিনিস; কিন্তু ব্যাপারটা একটু 'ডেলিকেট' ত'—তাঁর জিনিস তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিলেই আমার মান রক্ষা হয়।

কথাটা যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু কিছু ভাববার আগেই ডাঃ দাশগুপ্ত পাশের থেকে বেরিয়ে এলেন। গম্ভীরভা[বে] পালিতমশায়ের মুখের দিকে তাকি[য়ে] বললেন, ও'র হাতে আমিই পঁচিশটি টা[কা] দিচ্ছি, ওতেই ও'র হবে।

ফাইন্!—ব'লে পালিতমশাই লাফি[য়ে] উঠলেন।

ওই আমার প্রথম ঝাম্পানে চড়া। ফিরবার পথে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে চো[খ] দুটো প্রায় বন্ধ করে চারজন মানুষে[র] কাঁধের উপর যেন ভাসতে ভাসতে চললুম থানকোট থেকে ভীমপেডি। দেহের মতে[া] চোখ দুটোও কেমন একপ্রকার আচ্ছন্ন ছিল। চোখ বুজে নেই, চেয়ে নেই ঘুমিয়ে নেই—ওই একরকম। খররৌ[দ্র] ছিল মাথার ওপর। অমনি করে আমাকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে আমার নিয়তি হিমালয়ের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে কোনদিন তার বিরতি নেই। ওই একট[া] অস্বাভাবিক আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যেও যে[ন] শুনতে পাচ্ছি আবার নতুন পাহাড়ের ডাক—ওরই ভিতর দিয়ে কেমন একটা রুক্ষ বন্য ক্ষুধার্ত কঠিন আত্মনিগ্রহের ডাক। ওই ডাক আমাকে কোনদিন কোথাও স্থির থাকতে দেয়নি।

আমার বহুকালের ধারণা, হিমালয় পরিভ্রমণকালে যদি কেউ অসুস্থ হয়, তবে ওখানকার নদীতে অবগাহন স্নান করলে তার সব অসুখ সারে। সন্ধ্যার সময় ভীমপেডিতে পৌঁছে বাগমতীতে আমি স্নান করেছিলুম। ঠাণ্ডা হাওয়া আর ঠাণ্ডা জল সত্ত্বেও আমার শীত ধরেনি। বাড়ি যখন ফিরেছি, তখন আমি সুস্থ। সেই কথাটা জানিয়ে ডাঃ দাশগুপ্তকে তাড়াতাড়ি পঁচিশ টাকার মনিঅর্ডার পাঠিয়ে দিলুম। পালিতমশাই কলকাতায় ফিরে তাঁর গলায় ঝোলানো সোনার হার-ছড়াটা মালিকের হাতে অবশ্যই ফেরৎ দিয়েছিলেন। তবে তাঁর প্রত্যর্পণে কিছু কৌতুকজনক আড়ম্বর ছিল। কিন্তু হারছড়া যিনি ফেরৎ পেলেন, আমাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শুনে তাঁর মুখে গাম্ভীর্য ছিল কিছুদিন।

এই সংখ্যার নেপালের ছবিগুলি শ্রীবীরেন সিংহ কর্তৃক গৃহীত।

মহাত্মা গান্ধী ও লণ্ডনের জনসাধারণ

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

জানুয়ারী আর ফেব্রুয়ারী—এই দু মাস ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে খারাপ সময়। বিদায় নেবার আগে শীত যেন প্রাণপণে পৃথিবীকে আলিঙ্গন করে রাখে। কনকনে হাওয়া, অবিশ্রাম তুষারপাত আর অন্ধকার দিন—অধৈর্য হয়ে মানুষ দিন গোণে কবে সূর্যের আলোয় রঙ বেরঙের ফুলে ঝলমল করবে—কবে আসবে বসন্তের উজ্জ্বল দিন।

হাওয়ার বেগ বেড়ে যায় মার্চ মাসে। তীব্র ঠাণ্ডা হাওয়া পুরু গরম কাপড় ভেদ করে যেন মানুষের হাড়ে বিঁধে যায়। তবু মেলে থাকে শুধু হাওয়ার জোর। ততো বেশী তুষার ঝরে না। দিনের বেলায় যেন করে অন্ধকার ভারি করে তোলে না মন। আসন্ন এপ্রিলের আনন্দে মার্চ মাসের হাওয়ার গতি কঠিন দাগ কাটে না মানুষের মনে। তাই শীতের হিসেব করবার সময় লোকে জানুয়ারী আর ফেব্রুয়ারীকে যতো ভয়ের চোখে দেখে, মার্চ মাসকে ততো গ্রাহ্য করে না। যদিও অনেক সময় দেখা গেছে মার্চের ঠাণ্ডা জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারীর শীত অনেকখানি ছাড়িয়ে গেছে, কঠিন হাওয়ার দুরন্ত বেগ কাঁপিয়ে গেছে গাছের সুদৃঢ় শিকড়। তবু মার্চ যেন তীব্র সিক্ত এলোমেলো হাওয়ায় বারবার গান গেয়ে বলে যায়, এপ্রিলের দেরি নেই। নিকট থেকে নিকটতর হলো ফুল ফোটবার দিন।

কিন্তু আশ্চর্য প্রকৃতি লণ্ডনের। জানুয়ারী শেষ হয়ে গেল আজ তিরিশ তারিখ। এমাসে তুষার ঝরেনি একদিনও, শীতের কাঠিন্য তেমন করে পথে প্রান্তরে আজও কাটেনি কোনও দাগ। যদিও প্রকৃতিকে বিশ্বাস করে না এদেশের লোক, তবুও তারা যেন বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছিলো।

হঠাৎ তিরিশে জানুয়ারী ভয়ংকর-রূপ নিলো প্রকৃতি। সকাল থেকে বাতাস যেন প্রকৃতির শাণিত তীরের তূণ উজাড় করে দিলো। ভীত সূর্য পুরু মেঘের আড়ালে কখন অদৃশ্য হলো জানতে পারলো না কেউ।

বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের জোর বেড়ে গেল। উদ্দাম হাওয়ার ঝাপটায় দিকবিদিকে উন্মাদের মত ছুটে বেড়াতে লাগলো ভারি তুষারকণার দল। তারপর অবিশ্রাম বয়ে চললো তুষারের ঝড় যেমনি কঠিন তেমনি ভয়ংকর। শুষ্ক মূক গাছগুলি তুমুল প্রতিবাদ জানিয়ে যেন বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু নিষ্ফল তাদের আক্রোশ। প্রবল তুষারের চাপে তাদের অবশেষে শুধু নির্বাক শ্বেত স্তম্ভের মত মনে হলো। জানলা দরজা বারবার নড়ে উঠছে। গৃহ কাঁপছে হাওয়ার আঘাতে। এখুনি যেন চুরমার হয়ে যাবে।

তবু সেই বরফের ঝড়ের মধ্যে দিয়েও কোনোরকমে পথ করে আমাকে ইণ্ডিয়া হাউসে আসতে হয়েছিলো। না এসে উপায় ছিলো না। দেশ থেকে এমাসে টাকা আসবে না। যথাসময়ে বাড়ী থেকে খবর এসেছিলো। শূন্য পকেট। তাই ইণ্ডিয়া হাউসে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় আসতে বাধ্য হয়েছিলাম।

আজ ইণ্ডিয়া হাউসে তেমন ভিড় নেই। শুধু আমার মত যাদের বিশেষ প্রয়োজন, তারা যথারীতি এসে বসে আছে। তখনও লাঞ্চের সময় হয়নি। চুপ করে লাউঞ্জে বসে কাচের শার্সি দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু কিছুই দেখা যায় না আর। এখনও শুধু হাওয়ার সোঁ সোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে আর মনে হচ্ছে পুরু কাচ ভেদ করে সেই হাওয়া যেন গায়ে ধারালো তীর বিঁধিয়ে দিচ্ছে।

কতোক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম মনে নেই। হঠাৎ দেখি আমার পরিচিত এক রসিক ভদ্রলোক, যিনি ইণ্ডিয়া হাউসে চাকরী করেন, ওপর থেকে হন হন করে নেমে আসছেন। আজ কিন্তু তাঁর চেহারা হাসিখুশি নয়, একেবারে অন্য রকম। চুল উস্কোখুস্কো, মুখে হতাশার ছাপ আর তাঁর সমস্ত শরীর প্রবল উত্তেজনায় কাঁপছে।

আমাকে দেখতে পেয়ে সেই সোফায় আমার পাশে তিনি যেন টলে পড়লেন। তারপর এক হাতে আমাকে শক্ত করে ধরে চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে তাঁর। সমবেদনার মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে? আপনি অমন করছেন কেন?

দীর্ণ স্বরে তিনি চীৎকার করে উঠলেন, খবর শুনেছো? গান্ধীজী মারা গেছেন।

সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল। তবু তাঁর কথার একবর্ণ বিশ্বাস না করে নির্বিকারভাবে বললাম, কই আমি তো কিছু শুনিনি। আপনাকে কে বললো?

আমি ওপর থেকে শুনে এলাম। ভারতবর্ষ থেকে টেলিফোনে হাই কমিশনারকে এই মাত্র খবর দেওয়া হয়েছে।

আমি তাঁকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই ইণ্ডিয়া হাউসের একজন মাদ্রাজী চাকুরে আমাদের দেখতে পেয়ে ব্যস্তভাবে সেখানে এগিয়ে এসে বললো, কারা মারলো? মুসলমানেরা?

এবার আর বসে থাকতে পারলাম না; শুকনো মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আপনি কি বলছেন?

দিল্লীতে আততায়ীর গুলীতে গান্ধীজী প্রাণ দিয়েছেন।

নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে সেই ভদ্রলোকের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। তাঁর প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম, মিথ্যা। মিথ্যা। একেবারে বাজে কথা। মহাত্মা গান্ধীকে গুলী করবে কে! মনে মনে শুধু বলতে লাগলাম, এখবর যেন মিথ্যা হয়।

একে একে ওপর থেকে লোক নেমে এসে একতলায় জড়ো হচ্ছে। কেউ জোর করে বলতে পারছে না এ মর্মান্তিক সংবাদ সত্যি কিনা। এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু বলাবলি করছে, কি ব্যাপার? এ খবর কে রটাচ্ছে? দূর তাও কি হয়? মিথ্যা কথা। আপনি নিজে জানেন হাই কমিশনার খবর পেয়েছেন কিনা? শুষ্ক ম্লান মুখে লোকে আলোচনা করে যাচ্ছে এমনি অনেক কথা।

কিন্তু দেখতে দেখতে কয়েক মিনিটের মধ্যে ইণ্ডিয়া হাউসের হাওয়া একেবারে ঘুরে গেল। চারপাশে কেমন যেন দিশা-হারা সন্ত্রস্ত ভাব। দলে দলে লাউঞ্জে লোক আসছে, কিন্তু কেউ জানে না এ খবর সত্যি কিনা।

ওদিকে বাইরে তুষারের ঝড় হঠাৎ যেন থেমে গেছে। তুষারপাতও বন্ধ। গুম হয়ে গেছে প্রকৃতি। হিম শীতল কঠিন বিস্ময়ে যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে চারপাশ।

লোকেরা যখন ইণ্ডিয়া হাউসের ভেতরে এ মর্মান্তিক খবর সত্যি কিনা জানবার জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠেছে তখন অকস্মাৎ বাইরে খবরের কাগজের একদল হকার যেন একসঙ্গে চীৎকার করে উঠলো, গান্ধী কিল্‌ড বাই এ হিন্দু! গান্ধীজী অ্যাসাসিনেটেড! গান্ধী শ্যাট ডেড অ্যাট ডেল্লী—

মুহূর্তে ইণ্ডিয় হাউসের বাইরে কাগজের হকারদের ঘিরে ফেললো অধৈর্য জনতা। খুব অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেল সমস্ত কাগজ।

বিলাতি দৈনিক পত্রিকাগুলির সান্ধ্য সংখ্যায় নির্মম হত্যার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। ত্রিরিশে: জানুয়ারী লণ্ডনে যখন অঝোর-ঝরা তুষার বিক্ষুব্ধ ভরা দুপুর, দিল্লীতে তখন কঠিন শীতের অপরাহ্ণের শেষ। সান্ধ্য উপাসনার সময় মহাত্মার বুকে গুলী এসে লাগে। দারুণ যন্ত্রণায় টলে পড়লেও তাঁর মুখের সুন্দর হাসি অন্তিম মুহূর্তেও মি... যায়নি। হত্যাকারীর নাম নাথুরাম গ... বয়সে তরুণ এক হিন্দু। কাজ শেষ ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করার ...

করবার সময় জনৈক মার্কিন অতিথি তাকে গ্রেপ্তার করে।

নিরন্তর শুধু খবরের কাগজের ভ্যান আসছে। একের পর এক—অনেক। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে হকারদের কাছে থামছে তারপর রাশি রাশি কাগজ নামিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে যাচ্ছে অন্য রাস্তার মোড়ে অন্য হকারকে কাগজ দেবার জন্যে। ইভনিং নিউজ, ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড, স্টার—আরও কতো কাগজ তার ঠিক নেই।

কিন্তু কাগজের নাম দেখবার মত মনের অবস্থা তখন কারুর নয়। যে যা কাগজ হাতের সামনে পাচ্ছে, তাই নিয়ে প্রবল উৎকণ্ঠায় ঝুঁকে পড়ছে প্রথম পাতার বড়ো বড়ো অক্ষরগুলির ওপর।

শুধু ভারতীয় নয়, হকারদের চার-পাশে অনেক ইংরেজ নরনারী ভিড় করেছে। কেউ কেউ খবর পড়ে করুণ চোখে ইণ্ডিয়া হাউসের দিকে তাকিয়ে আছে অনেকক্ষণ। অর্ধ উত্তোলিত করা হলো ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা।

সেদিন কাজ বন্ধ হলো ইণ্ডিয়া হাউসের। যারা মোটা মোটা ফাইল নিয়ে দরকারী চিঠি খোঁজবার চেষ্টা করছিলো, সেই চিঠি খোঁজা আর হলো না। হাত যেন অবশ হয়ে গেল। কলম থেমে গেল [illegible]। সেই কঠিন শীতের দুপুরেও অসংখ্য ভারতীয় কর্মীর কপালে জমে উঠলো বিন্দু বিন্দু ঘাম।

তুচ্ছ হয়ে গেল শীত, ব্যর্থ হলো হাওয়ার ধারালো তীর। লণ্ডনের চার-পাশে যতো ভারতীয় ছিলো, তারা এসে ম্লান মুখে জমা হলো ইণ্ডিয়া হাউসের লাউঞ্জে। ওপরের ক্যানটিন একেবারে খালি হয়ে গেল। ওয়েট্রেস একে একে অনেক ভরা প্লেট তুলে নিলো। প্রথম গ্রাস মুখে তোলবার সময় যারা খবর পেলো, তারা আর মুখে তুলতে পারলো না অন্ন। ভরা থালা রইলো পড়ে। যে অবস্থায় ছিলো, সে অবস্থায় লোকে ঘোরাঘুরি করতে লাগলো হাই কমিশনারের ঘরের কাছে।

ইণ্ডিয়া হাউসে আর জায়গা নেই। দেশী বিদেশী কতো দেশের মানুষ যে ভেঙে পড়েছে সেই অট্টালিকায়! তাদের মুখে হতাশা, চোখে জল। কেউ কেউ অশ্রু সংবরণ করবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে, কেউ শিশুর মত ফুঁপিয়ে উঠছে আর কেউ কেউ স্থানকাল ভুলে ভারি কান্না কাঁদছে। একতলা, দোতলা, তেতলা—কোথাও আর দাঁড়াবার জায়গা নেই। ইণ্ডিয়া হাউসের দেওয়াল ভেদ করে বেরিয়ে আসছে দীর্ঘশ্বাস। ক্রন্দনের করুণ সুরে চারপাশ কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ঘরের দরজা খুলে আস্তে আস্তে হাই কমিশনার বেরিয়ে এলেন। লণ্ডনে, ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর নাকি এসময় কিছু বলা দরকার। কিন্তু কি কথা বলবেন তিনি! এক মহান জাতি যিনি নিজের হাতে গড়ে তুলেছেন, অনেক ঝড়ের সমুদ্রে যাঁর শক্তিমান বাহু পথ দেখিয়েছে ভারতবাসীকে—আজ তিনি তাঁরই দেশের লোকের হাতে প্রাণ দিলেন, সেকথা অসংখ্য বিদেশীর সামনে কোনমুখে উচ্চারণ করবেন তিনি! তবু হাজার অনিচ্ছায় দু' কথা বলবার চেষ্টা করতেই হলো। অবশ বিমূঢ় দেহকে হাই কমিশনার অনেক কষ্টে টেনে নিয়ে এলেন দোতলায় লাইব্রেরী ঘরে। ইণ্ডিয়া হাউসে যতো লোক জমা হয়েছিলো, তারা সকলে এলো পিছনে পিছনে।

হাইকমিশনার ছোটো ছেলের মত ফোঁপাতে ফোঁপাতে কোনোরকমে শুধু সেই নির্মম হত্যার বিবরণ সংক্ষেপে শোনালেন। তারপর হয়তো তিনি আরও দু'এক কথা বলতে চেয়েছিলেন কিন্তু বিপুল ক্রন্দনের চাপে সহসা তার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে গেল। তিনি মূর্ছিতের মত হয়ে পড়লেন। মাটিতে টলে পড়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে ধরে ফেললো। আস্তে আস্তে সরে গিয়ে নরনারী তাঁকে ঘরে নিয়ে যাবার পথ করে দিলো।

ইণ্ডিয়া হাউসে আর কিছু জানবার নেই। এবার বিশ্বাস করতেই হবে। যারা গুজবে বিশ্বাস না করে অনেক দূর থেকে আসল খবর জানবার জন্যে এসেছিলো, তারা যেন নিঃস্ব রিক্ত অবস্থায় ঘরে ফিরে চললো। শূন্য হয়ে গেছে বুক। একটি একটি করে যেন পাঁজর ভেঙে যাচ্ছে। অনেকে দেশ ছেড়েছে বহু বছর আগে। আজ দেশের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু অকস্মাৎ তাদেরও বুকে যেন গুলি লেগেছে, দেহ মন প্রাণ জ্বলে যাচ্ছে অব্যক্ত যন্ত্রণায়। ভারতবর্ষ বলতে আজও তারা যে মহাত্মা গান্ধীকেই জানে। এখন দেশে আর রইলো কি, দেশের আর রইলো কে? কি হবে এখন সেখানে? কে দেখাবে পথ? কে দেবে নির্দেশ? বিশৃঙ্খল জনতাকে সঙ্ঘবদ্ধ করবে কে? যদি দাঙ্গা বাধে, যদি রক্তগঙ্গা বয়ে যায়? যেন আলো নিভে গেছে, অসময়ে অন্ধকার নেমেছে। ভারতবর্ষের এই যুগ-সন্ধিক্ষণে কার অভিশাপে শক্তিমন্ত্রের দীক্ষাগুরু সরে গেলেন! বার বার বুক ঠেলে শুধু গভীর দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসতে চায়।

বাইরে এর মধ্যে অল্প অল্প অন্ধকার নেমেছে। ভারি হাওয়া বইছে—যেন দেশ-দেশান্তরে শোকের বার্তা বহন করে নিয়ে চলেছে। খবরের কাগজের হকাররা এখনও ভিড় করে আছে পথের ধারে ধারে। তাদের কাছে এখন আর ভারতীয় ক্রেতা নেই, শুধু বিদেশী—বিদেশিনীর ভিড়।

খবর দেখে কেউ কেউ রাস্তায় দাঁড়িয়ে রুমাল বের করে চোখের জল মুছছে।

ইংরেজ নাকি জোরে কেঁদে শোক প্রকাশ করে না তবু দেখা গেল কতো বুড়োবুড়ী সব ভুলে কেঁদে উঠলো। তারপর এগিয়ে এলো ইণ্ডিয়া হাউসের দিকে। তারা বোধহয় আরও ভালো করে খবর জানতে চায়।

যতো ভারতীয় রাস্তায় চলেছে আজ তাদের প্রত্যেকের হাতে অনেক খবরের কাগজ। কিন্তু বোধহয় জীবনে এই প্রথমবার নানা বয়সের নানা ধরনের ইংরেজ পথিক তাদের থামিয়ে নিজেদের মাথা থেকে টুপী নামিয়ে শক্ত করে হাত চেপে ধরে ধরা গলায় বলচে, তোমাদের দুঃখে আমার গভীর সমবেদনা জেনো!

একবার নয়, দু'বার নয়, পথ চলতে চলতে অসংখ্যবার লোকে এমন করে সমবেদনা জানাতে লাগলো। আজ এই গভীর শোকের মাঝেও ভারতীয়দের প্রবাস বাস যেন সার্থক হলো। অপরিচিত ইংরেজের কাছ থেকে বন্ধুর মত এমন আন্তরিক ব্যবহার তারা এর আগে আর কখনও পায়নি। ভারতবর্ষে ভারতীয় হয়ে জন্মাতে পেরেছে বলে আজ গর্বে তাদের বুক ভরে গেল। মহাত্মা গান্ধীর দেশে জন্মেছে বলে সার্থক জন্ম তাদের—সেকথা খুব সহজে আজ প্রত্যেক ভারতবাসী বুঝতে পারলো।

তখন সবে অফিস ছুটি হয়েছে। বাসে, টিউব ট্রেনে অনেক লোকের ভিড়। প্রত্যেকের হাতে একটি করে খবরের কাগজ। প্রত্যেকে মাথা নিচু করে এক দৃষ্টিতে মহাত্মার হাসিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ইনি যেন তাদের বড়ো আপনার জন। ভারতবর্ষের লোক দেখলেই তারা সশ্রদ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখছে। অনেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলছে, তুমি ব'সো এবার, আমি অনেকক্ষণ বসেছি।

যারা এতোদিন দেশকে একেবারে ভুলেছিলো, দেশের ত্রুটি ছাড়া আর ভালো কিছুই যাদের চোখে পড়েনি, সুযোগ পেলেই বিদেশীদের কাছে যারা পঞ্চমুখে ভারতবর্ষের নিন্দে করেছে, যারা নিজের দেশের সব কিছু তুচ্ছ করে মনে প্রাণে সাহেব হয়ে গেছে—আজ তাদের চতুর্গুণ আঘাত লাগলো। ভারতীয় বলে যখন অসংখ্য ব্রিটিশ নরনারী তাদের সমবেদনা জানাচ্ছে তখন তারা কথা বলতে পারছে না। লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে। এ সম্মান তো তাদের প্রাপ্য নয়। কি করেছে তারা জন্মভূমির জন্যে? দেশে কিছু করতে না পেরে ভীরুর মত পালিয়ে এসে নিজেদের যা কিছু বিসর্জন দিয়েছে। পশুর মত নকল করেছে বিদেশীকে। তাদের দেশে নিজেদের মানিয়ে নিতে পেরেছে বলে গর্ব অনুভব করেছে। ভারতবাসী বলে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করেছে। কিন্তু আজ এতোদিন পর প্রচণ্ড ধাক্কায় তারা যেন নিজেদের নতুন করে উপলব্ধি করলো। বারবার তারা ধিক্কার দিলো নিজেদের—মহাত্মার হত্যাকারীর চেয়ে তাদের অপরাধ যেন আরও বেশী।

লণ্ডনের আর কারুর খবর জানতে বাকি নেই। কুলি মজুর মধ্যবিত্ত বড়লোক—কে না চেনে মহাত্মা গান্ধীকে! সারা শহরে শোকের ছায়া নেমেছে। বি বি সি থেকে নতুন করে পূর্ণ বিবরণ প্রচারিত হচ্ছে—অন্তিম মুহূর্তে মহাত্মাকে গীতা পাঠ করে শোনানো হয় সেকথাও জানিয়ে দিলো ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন।

ঘরে ঘরে ভেতরে বাইরে থমথমে ভাব। পৃথিবীর আত্মীয়র জন্যে যেন সমস্ত পৃথিবী শোক প্রকাশ করছে।

একে একে ইণ্ডিয়া হাউসের আলোগুলি নিভিয়ে দিচ্ছে ম্যাসেঞ্জার। একটু পরে তারাও বেরিয়ে যাবে। আর সকলে চলে গেছে। শূন্য ইণ্ডিয়া হাউস। মাথা থেকে হাত নামিয়ে দেখলাম কেউ কোথাও নেই। এবার উঠে যেতেই হবে তা না হলে হয়তো ম্যাসেঞ্জার এখুনি এসে বিনীত অনুরোধ করবে চলে যেতে।

কিন্তু যাবো কেমন করে? আ বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়েছে, রক্ত হিম হ গেছে, পা কাঁপছে, শরীর টলছে। ওঠ ক্ষমতা নেই। এতোক্ষণ আমার যেন [illegible] লেগেছিলো। এ কি সত্যি না স্বপ্ন এখনও কিছুতেই যে বিশ্বাস হ পারছি না। মাথা যেন আর কাজ কর না আমার। কিছু বুঝতে পারছি ভাবতে পারছি না, ঠিক করতে পারছি কি করবো, কোথায় যাবো। একবার সম শক্তি দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করলাম কি কিছুতেই পারলাম না। আবার সব সোফায় বসে পড়তে হলো। অনেক ক পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট [illegible] করলাম। কিন্তু দেশলাই জ্বেলেই [illegible] উঠলাম আগুন! ভীষণ ভয় পেয়ে [illegible] কাঠি সিগ্রেট দেশলাই দূরে ছুঁড়ে [illegible] দিলাম। যতোদিন বেঁচে থাকবো [illegible] কোনোদিনও সিগ্রেট স্পর্শ করবো [illegible] কোনোদিনও নিজের হাতে দেশলাই [illegible] আগুন ধরাবো না।

কিন্তু ও কি, চোখের সামনে স্প দেখলাম সারা পৃথিবীতে আগুন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চারদিক [illegible] চোখে জল এসে পড়ছে আমার। [illegible] এসে গায়ে লাগছে। এখুনি দেহ [illegible] যাবে।

না, না ভয় নেই। ধীর মন্থর পা [illegible] আগুনে ভরা [illegible] পথ করে নিয়ে [illegible] চলেছে যাত্রী আগে। সে মূর্তি কি ভোলবার! পরনে [illegible] লাঠি, সারা দেহে অপূর্ব জ্যোতি আ পিছনে লক্ষ লক্ষ নরনারী। তাদের কণ্ঠে জপমন্ত্রের মত শুধু ধ্বনিত হচ্ছে, মহাত্ম গান্ধীজী কি জয়!

যা ভেবেছিলাম তাই। যথাসময়ে ম্যাসেঞ্জার এসে সামনে দাঁড়ালো। আমাকে ওখানে ওভাবে বসে থাকতে দেখে অবাক হলো। জিজ্ঞেস করলো আমার জন্যে কিছু করতে হবে কি না।

ভাঙা গলায় বললাম, দয়া কর আমাকে শুধু হাত ধরে তুলে দাও ম্যাসেঞ্জার হাত ধরে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলো, আ কি করতে পারি তোমার জন্যে?

আর কিছু না। অনেক ধন্যবাদ আস্তে আস্তে পা ফেলে বাইরে বেরিয়ে

এলাম। ভারি ঠাণ্ডায় বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। কিন্তু আমার শীত লাগলো না, শুধু মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। কিছুতেই বেশীক্ষণ হাঁটতে পারবো না। কানে শুধু গুলির শব্দ বাজছে, গুড়ুম! গুড়ুম!

কোনো রকমে স্ট্র্যাণ্ডের ওপর এসে দাঁড়িয়ে শূন্য দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকালাম। না, এমন করে আর চলতে পারবো না। একটা ট্যাক্সি চাই আমার। কিন্তু চোখে পড়ছে না একটিও। কে আমাকে ট্যাক্সি ডেকে দেবে। তখনও হাজার চীৎকার করছে, গান্ধী কিলড্ বাই এ হিন্দু, গান্ধী অ্যাসাসিনেটেড—

আমাকে সে-অবস্থায় দেখতে পেয়ে [illegible] কাছে এগিয়ে এলো। চেহারা [illegible] মনে হয় মজুর। এইমাত্র সামনের [illegible] থেকে বেরিয়ে এসেছে। মুখে মদের [illegible] টলে টলে পড়ছে সে। আমার [illegible] দেখে থমকে দাঁড়ালো সেই [illegible]।

[illegible] ইণ্ডিয়ান? [illegible] থেকে টুপী [illegible] একটা হাত ধরে [illegible] এই সাহেব [illegible] গান্ধী, [illegible] দিকে তাকিয়ে সে কেঁদে [illegible]।

[illegible] হাত দিয়ে [illegible], [illegible] আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবে?

নিশ্চয়ই, চারপাশে তাকিয়ে মাতাল [illegible] করতে লাগলো, [illegible] ট্যাক্সি [illegible] দরজা বন্ধ করে দিয়ে মাতাল আর [illegible] গেলো।

অনেকটা পথ। বাড়ি পৌঁছতে সময় লাগবে। কটা বেজেছে কে জানে! ট্যাক্সিতে হেলান এলিয়ে দিলাম। আস্তে আস্তে [illegible] মাটি সরে যাচ্ছে আর আমি শুধু [illegible] যাচ্ছি। নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে [illegible] আমার। তবু চোখের সামনে ছবি [illegible]টে উঠছে, নাকে এসে লাগছে ধূপের [illegible]ধ আর একই কথা বারবার মনে ঘুরে [illegible]রে আসছে, রক্তপাতের বিরুদ্ধে আজীবন [illegible] সংগ্রাম তাঁর জীবনের অবসান হলো [illegible]পাতে। এতো বড়ো কলঙ্কিত দিন [illegible]হাসে আর কতোবার এসেছে? এ [illegible] কার! সমস্ত জীবন দিয়ে কি সমস্ত জাতি এতো বড়ো লজ্জা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দেবার চেষ্টা করবে না? এ কলঙ্ক মুছে দিক সকল জীবন। এ যে আমাদের সবচেয়ে বড়ো ঋণ। এ ঋণ শোধ করবার ভার প্রত্যেককে নিতে হবে।

দিল্লীতে সান্ধ্য উপাসনার আসর কেমন করে সাজানো হয়েছিলো? কতো লোক এসেছিলো সেখানে? কি কথা বলে উপাসনা আরম্ভ করেছিলেন মহাত্মা? হয়তো তখন একে একে জ্বলে উঠেছিলো অনেক প্রদীপ। পবিত্র মধুর গন্ধে আসর ভরে উঠেছিলো। তুচ্ছ মনে হয়েছিলো অর্থ যশ মান। সমবেত কণ্ঠে শুধু ধ্বনিত হয়েছিলো ভজন গান—

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
পতিত পাবন সীতারাম—

যথাসময়ে ড্রাইভার আমার বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামিয়ে জানালো যে এবার নামতে হবে। খুব সাবধানে নেমে দাঁড়ালাম। এখনও উত্তেজনায় থর থর করে শরীর কাঁপছে। কিন্তু ভাড়া দেবার কথা মনে হতেই চমকে উঠলাম। টাকা কোথায় পাবো! পকেটে যে অতো পয়সা নেই। বাড়িতেও আছে কিনা সন্দেহ। থাকলেও তা কিছুতেই খরচ করা চলবে না। কারণ, তাহলে কাল বাড়ি থেকে বেরুনো সম্ভব হবে না।

আমার বিমূঢ় ভাব দেখে ড্রাইভার বোধহয় ব্যাপার বুঝতে পারলো। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সে বললো, কিছু যায় আসে না। আমি চললাম—

বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বললাম, দাঁড়াও দেখি বাড়ির ভেতর—

থাক স্যার, ট্যাক্সির ক্লাচ্ ছাড়তে ছাড়তে সজল চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে থেমে ড্রাইভার শুধু বললো, মে হিজ্ সোল্ রেস্ট্ ইন পিস্!

ট্যাক্সি চলে গেল। কিন্তু সেই শীতের রাত্রে নিজের বাড়ির গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। এপাশে ওপাশে জমা হয়ে আছে পুরু তুষার। সাদা হয়ে আছে চারপাশ। কি যেন নেই—কি যেন নেই! অসীম শূন্যতা যেন ঝরা তুষারে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাই দেখতে দেখতে কান পেতে শুনতে লাগলাম হাওয়ার একটানা হাহাশ্বাস।

জনাব ফজলুল হক সাহেব পাক্-প্রধানমন্ত্রীকে বলিয়াছেন—আমাদের দেশপ্রীতি সম্বন্ধে বরাবরই দেখিতেছি আপনার মনে যেন কেমন একটা সন্দেহের ভাব। এ যদি সত্যই আপনার মনের ভাব হইয়া থাকে তাহা হইলে আপনার সঙ্গে

আলাপ-আলোচনা করার কোন অর্থ হয় না। বিশুখুড়ো বলিলেন—"আমাদের মুন্দুর মনে হয়, এই সন্দেহের ভাবটা হক্ সাহেবের দেশপ্রীতি সম্বন্ধে নয়, তাঁর বিদেশ-প্রীতি সম্বন্ধে। এ বয়সে পরদেশী সাঁইয়া হক্ সাহেবের মন কেড়ে নিতে পারবে কিনা সন্দেহটা সেইখেনে"!!

* * *

সম্প্রতি বি টি পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার হল্ হইতে একজোটে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। শ্যামলাল সংবাদটি শুনিয়া নাটকীয় ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিল—"আপনি মজিলি রাজা, মজাইলি কনক লঙ্কায়"।

* * *

২৪শে মে তারিখে পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইবে এই সংবাদ শুনিয়া রোমবাসীরা নাকি সমবেত হইয়া প্রার্থনা করিয়াছেন।—"রোমবাসীদের এ প্রার্থনা হয়ত ভগবানের কানে পৌঁছয় নি, কেননা,

ট্রামে-বাসে

নেরোদের সমবেত বেহালা-সঙ্গীত তাঁর কাছে হয়ত বেশি আকর্ষণের বস্তু হয়েছিল"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত গগন-বিহারীলাল মেহতা বলিয়াছেন যে, ইংরেজী ভাষা যে-কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাতায়নস্বরূপ।—"পর্দানশীনরা অবশ্যি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারবেন না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

একটি সংবাদে জানা গেল, সিড্‌নীতে নাকি তেজস্ক্রিয় বারিপাত হইয়া গিয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"এ বিষ্টির
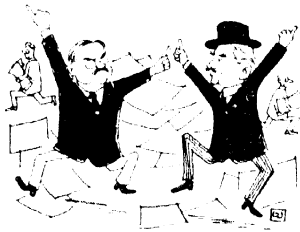
রূপটা যে ঠিক কী তা জানিনে তবে আশা করি এটা কোলকাতার কেরানী-বিষ্টির মতো ঠিক্ দশটা এবং পাঁচটার মুখে নাববে না"।

* * *

সম্প্রতি কলিকাতায় কোন এক হোটেলের বারান্দা হইতে কয়েক-জন বিদেশী রাস্তায় পয়সা ছড়াইয়া ভিখারীদের জড় করিয়া তাহাদের ফটো লইতে চেষ্টা করিলে পথচারীরা নাকি বাধা দেয়। অবশেষে ক্যামেরাটি পুলিশের হাতে সমর্পণ করিয়া বিদেশীরা আত্মরক্ষা করেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"এ আর এমন একটা নূতন কথা কী? চারিদিকে 'Aid' ছড়িয়ে ভাষণ দেওয়া আর ফটো নেওয়া তো হামেশাই হচ্ছে"!!

* * *

জেনিভা হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল, মলোটোভ্ এবং ইডেন্ দুইজনেই নাকি সম্মেলনের গোপন সংবাদ ফাঁস হইয়া যাওবার অভিযোগ করিয়াছেন।—"সুতরাং জেনিভার পরীক্ষাটাও বানচাল হ'লো ব'লে"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

* * *

বৈতরণী নদীতে সম্প্রতি একটি অজ্ঞাত জলচর জীব নাকি স্নানরত গ্রামবাসীদের বড়ই ত্রাসের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।—"সংবাদটায় আমরা বিশেষ শঙ্কিত হইনি। যে-সব গহীন জলের মীন ডাঙায় শিকারের সন্ধানে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়, আমরা ভয় করি শুধু তাদের"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

হোল্ডে রক্ষিত চাউল ফাঁপিয়া-ফুলিয়া যাওয়ায় নাকি একটি জাপানী জাহাজ বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।—"চাল বাড়ন্ত অবস্থাটা সব সময়েই দেখছি শঙ্কার কারণ"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

ট্রেড্‌মার্কের নানারকম জাল হইতেছে বলিয়া ব্যবসায়ী মহল অভিযোগ করিয়াছেন। "সব রকম ট্রেডমার্কের খবর

জানিনে, অন্তত জাল গান্ধীটুপিতে যে বাজার ছেয়ে গেছে সে তো চোখের সামনেই দেখছি"—বলেন খুড়ো।
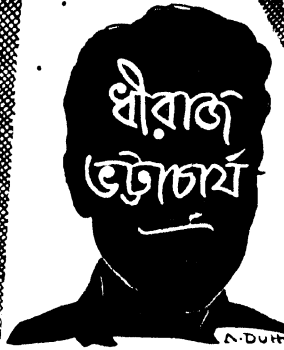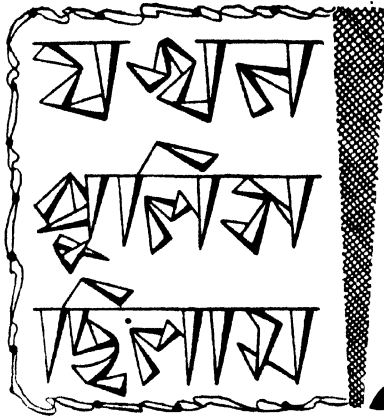
ত্রিশ

অপলক চোখে চেয়ে এক ভাবে বসে রাত কাটিয়েছেন কেউ কোনও দিন? আমি কাটিয়েছিলাম সে রাত খাটের উপর ঠায় বসে। কত রাত, ক'টা বাজে, কোনও খেয়াল ছিল না। দরজা খোলাই ছিল, ইচ্ছে করেই খিল দিইনি।

এক মুখ হাসি নিয়ে ঘরে ঢুকল সতীশ। আমাকে ঐভাবে বসে থাকতে দেখে বললে—"এই যে, মরিআলা থেকে ফিরেছেন দেখ [illegible] সত্যি পুণ্যাত্মা লোক বলেই [illegible] জ্বর [illegible] তা না হলে অতগুলো বিপদের ভিতর থেকে সুস্থ শরীরে ফিরে আসা—"

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—"আমার সঙ্গে তোমার কোনও বিশেষ দরকার আছে কি?"

একটু আমতা আমতা করে সতীশ বললে—"আজ্ঞে আমার মানে—মহেন্দ্রবাবু ডাকছেন আপনাকে।" একটু পরেই সামলে নিয়ে গলায় মধু ঢেলে বললে—"আর একটা কথা হুজুর, মাথিনের সঙ্গে বিয়ের দিন কবে ঠিক করলেন?"

চলে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ফিরে দাঁড়ালাম। সতীশের বীভৎস মুখের দিকে মিনিটখানেক চেয়ে থেকে ঈষৎ হেসে বললাম—"যে দিন মেয়েঘটিত ব্যাপারে মগদের ঐ ধারালো দাঁড়ে তিন হাত দা তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করবে, সেই দিন।"

অপ্রত্যাশিত উত্তরে ভ্যাবাচাকা খেয়ে একেবারে থ হয়ে গেল সতীশ। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

উঠোনে পাতকুয়োর ধারে জ্বরে ধুঁকতে ধুঁকতে বালতি করে জল তুলছে হরকি। কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। হরকি বললে—"কাল রাতে যখন ডাকাডাকি করছিলেন, আমি তখন জেগে। বড্ড জ্বর বলে উঠে আসতে পারিনি।"

বললাম—"থাক, সেজন্যে তোমার লজ্জা পেতে হবে না। এখন কেমন আছ?"

হরকি বললে—"এখন জ্বর একটু কম, আবার বিকেলের দিকে না এলেই বাঁচি।"

দেরি হয়ে যাচ্ছিল। বললাম—"হরকি, অনেক কথা আছে। বিকেলের দিকে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।"

থানা-ঘরে ঢুকে দেখলাম, মহেন্দ্রবাবুর পাশে একটি সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় মগ বসে সিগার খাচ্ছেন। পরনে দামী সিল্কের লুঙ্গি, গায়ে ফতুয়া, মাথায় সিল্কের রুমাল। বয়স পঞ্চাশের উপর, মাথার চুল সাদা, ভুরু সাদা। প্রকাণ্ড চওড়া মুখখানাতে দুটি বিরাট গোঁপ, তাও সাদা। লোকটির চোখে-মুখে সব সময় একটা প্রচ্ছন্ন হাসি লেগে আছে—দেখলে শ্রদ্ধা হয়।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। মহেন্দ্রবাবু বললেন—"বোসো। ইনিই এখানকার জমিদার ওয়াং থিন সাহেব, আর এই ধীরাজ।"

হাত তুলে নমস্কার করলাম। খুশি হয়ে প্রতি-নমস্কার করে ওয়াং থিন মগি-বাংলায় বললেন—"বালো, বালো। নাম শুনেছিলাম, দেখলাম। বেটীর আমার পছন্দ খুব বালো—কি বোলেন থানা-গিরি?"

অনিচ্ছায় শুকনো হাসি হেসে জমিদারকে খুশি করেন মহেন্দ্রবাবু—"আজ্ঞে তাত বটেই, তাতো বটেই।"

চুপ করে বসে আছি। মহেন্দ্রবাবু বললেন—"ধীরাজ, তুমি হরকিকে দিয়ে এর মেয়ে মা-থিনকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলে?"

বললাম—"হ্যাঁ।"

মহেন্দ্রবাবু—"কথাটা ভালো করে ভেবে দেখেছিলে কি? তুমি বামুনের ছেলে হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মের একটি মেয়েকে

বিয়ে করলে তোমাদের সমাজ, তোমার বাবা-মা মত দেবেন কি?"

আমি কিছু বলবার আগেই ওয়াং থিন বললেন—"থাক, থাক, এতো বেস্তো হোবার কিছু নাই, তিন-চার দিন ভাবিয়ে পরে উত্তর দেবেন। আমার ঐ একটি মেয়ে। যদি বুঝেন সমাজ আপনাকে লিবে না, এইখানে থাকিয়ে যান। আমার জমি-জমা যা আছে আপনারই হোবে। আর যদি বুঝেন, ওকে সাথে লিয়ে গেলে গোলমাল হোবে না,—লিয়ে যাবেন। আমার কোষ্টো হোবে—হোক—ও তো সুক পাবে।"

ওয়াং থিন সাহেব যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন, আমরাও উঠে নমস্কার জানালাম। হেসে প্রতি-নমস্কার ক'রে নিভে-যাওয়া চুরুটটা ধরিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেলেন তিনি। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটলো। মহেন্দ্রবাবুই প্রথম কথা বললেন—"চট করে একটা কিছু করে বোস না। বেশ করে ভেবে-চিন্তে ঠিক করো, কি করবে। বিয়ের পর মা-থিনকে নিয়ে কলকাতায় যাবে, না এইখানেই থাকবে।"
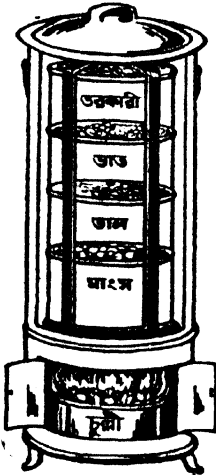
বললাম—"ভাববার দরকার হবে না। আমি কি করবো ঠিক করে ফেলেছি।"

মহেন্দ্রবাবু বললেন—"কি ঠিক করেছ?"

গলা একটুও কাঁপল না। বললাম—"বিয়ে করবো না।"

বিস্ময়ে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ হাঁ করে রইলেন মহেন্দ্রবাবু, তারপর বললেন—"কি বললে? বিয়ে করবে না?"

বললাম—"হ্যাঁ। বিয়ে করব না।"

রাগে ফেটে পড়লেন মহেন্দ্রবাবু। টেবিলটায় প্রকাণ্ড একটা কিল মেরে বললেন—"কী ভেবেছ তুমি, ছেলেখেলা? এই মগ জাতটাকে এখনও তুমি চেননি। হয় মা-থিনকে বিয়ে করে এইখানে থাকতে হবে তোমায়, নয়তো সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে। এ দুটো ছাড়া অন্য পথ তোমার নেই, তা জান কি?"

অম্লানবদনে বললাম—"জানি।"

"—তুমি মা-থিনকে বিয়ে করবে না, এ কথাটা ওয়াং থিনের কানে গেলে তোমায় কেটে টুকরো টুকরো করবে। টেকনাফের সমস্ত পুলিশ ফোর্সও তোমায় বাঁচাতে পারবে না, সেটা জান কি?"

বললাম—"জানি।"

হাল ছেড়ে দিয়ে চেয়ারটায় এলিয়ে পড়ে অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন মহেন্দ্রবাবু। উদ্দেশ্যহীনভাবে তালাবন্ধ ঠান্ডা ঘরের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলাম। বিশ্বেশ্বর এসে কতকগুলো ডাকের চিঠি ও একখানা খবরের কাগজ এনে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে গেল। সেগুলোর উপর চোখ বুলোতে বুলোতে মহেন্দ্রবাবু বললেন—"প্রথমে ভেবেছিলাম, সরল সাধাসিধে ভালমানুষ। ও-বাবা, এখন দেখছি তুমি একটি বিচ্ছু শয়তান। এখন জলের মত বুঝতে পারছি, এত জায়গা থাকতে বড় সাহেব কেন তোমায় টেকনাফে বদলি করেছিল। সতীশের কথাই ঠিক, তোমার মতলব ছি
বিয়ের নাম করে মা-থিনের সর্বনাশ ক
চুপি চুপি এখান থেকে পালিয়ে যাওয়
আর পালাবার পথও দেখছি ভেবেচিন্তে
আগে থেকে ঠিক করে রেখেছ?"

বিস্মিত চোখে চেয়ে দেখি, বহু
আগেকার অন্যমনস্ক হয়ে লেখা আম
সেই চৌদ্দ দিনের ক্যাজুয়াল লিভে
দরখাস্তখানা হাতে করে ঘৃণার দৃষ্টিতে
আমার দিকে চেয়ে আছেন মহেন্দ্রবাব
দরখাস্তখানা আমার দিকে ছুঁড়ে দি
বললেন—"তলে তলে সাহেবের কা
ছুটির দরখাস্ত করেছ, একথাটা ত আম
জানাও নি?'

কী উত্তর দেব, চুপ করে রইলাম
দেখলাম, মুলান্ড সাহেব আমা
দরখাস্তের পাশে ছুটি মঞ্জুর করে স
করে দিয়েছেন। মনে মনে এ বদান্যতা
কারণও বুঝলাম। মুলান্ড বেশ ভা
রকমই জানে যে, ছুটি মঞ্জুর হলে
পাঁচ-ছ' মাসের মধ্যে এখান থেকে আ
যেতে পারবো না। সমুদ্র অসম্ভব রাফ
স্টীমার চলাচল বন্ধ। অদৃষ্টের এ নির্ম
পরিহাসে মুলান্ডের মত আমিও মনে মনে
হাসলাম। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটলো
মহেন্দ্রবাবু সরকারি চিঠিপত্রগুলো পড়তে
লাগলেন, আমি দরখাস্তখানা নিয়ে
নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। শান্ত সংযত
কণ্ঠে মহেন্দ্রবাবু বললেন—
তাতো হয়েই গিয়েছে। শোন ধীরাজ, যদি
বাঁচতে চাও তাহলে আজ রাত্রেই তোমা
পালাতে হবে, দেরি করলে একথা পাঁচ
কান হয়ে জমিদার ওয়াং থিনের কানে
পৌঁছবেই। তখন শত চেষ্টা করেও তোমা
বাঁচানো যাবে না।"

জিজ্ঞাসু চোখে মহেন্দ্রবাবুর দিকে
চাইলাম। বললেন—"একটা বিষয়ে তোমাকে
ভাগ্যবান বলতেই হবে। ছুটির দরখাস্
এসে গেল, এদিকে এই অসময়ে স্টীমারও
রেডি।"

আপনা হতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে
গেল—"স্টীমার? এখন?"

মহেন্দ্রবাবু বললেন—"হ্যাঁ, অনেক
লেখালেখি করে বাজারের দোকানদারের
চৈত্র সংক্রান্তির উৎসবের জন্য মালপত্র
বোঝাই একখানা স্টীমার আনিয়েছিল
শুঁটকি মাছের চালান নিয়ে আজ রাতে

...টা চিটাগং রওনা হবে। আজই সরে পড় ...মি। কাল সকালে আমি সবাইকে বলব—...ঠাৎ বাবার অসুখের সংবাদ পেয়ে তুমি ...ু সপ্তাহের জন্য কলকাতায় চলে গেছ।"

কোয়ার্টার্সে চলে এলাম। আগের দিন রাত্রে কিছুই খাইনি, সকালেও কিছু না। ...বু ক্ষিদে বলে কিছু নেই আমার। দুপুরে অনেক বলে কয়ে রমেশ ভাত খাওয়ালে, একমুঠো খেলাম। কি দিয়ে খেলাম, মনে নেই।

রমেশ বললে—"আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন বাবু, জিনিসপত্তর আমিই গুছিয়ে দেব।"

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল মেঘের ডাকে। উঠে দেখি সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কালবৈশাখীর মাতনের সঙ্গে শুরু হয়েছে পটাপটে বৃষ্টি যা সহজে থামতে চায় না, অনেকক্ষণ চলে। কিছুক্ষণ বাদে কাল-বৈশাখী থেমে গেলেও ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি আরো জোরে এল। চোরের ... সবার অলক্ষ্যে পালিয়ে যাবার পক্ষে উৎকৃষ্ট রাত!

রমেশ ঘরে ঢুকে সুটকেস-বেডিং গোছাতে লাগল। খাকি হাফ প্যান্ট, শার্ট আর কেডস্-এর জুতো পরে টুপিটা হাতে নিয়ে চেয়ারটায় বসলাম। একটু পরে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম—"হরকি, হরকি কেমন আছে রমেশ?"

"ওর জ্বর আজ বিকেল থেকে বড্ডো বেড়েছে হুজুর, দুখানা কম্বল আগা-গোড়া মুড়ি দিয়েও কাঁপুনি থামছে না। এই অবস্থায় আপনার কাছে আসতে চাইছিল। বলছিল আপনার সঙ্গে নাকি ওর অনেক দরকারি কথা আছে। অনেক বুঝিয়ে তবে ঠান্ডা করেছি। বলেছি কাল সকালে দেখা কোরো।"

চট্ করে চার দিক চেয়ে নিয়ে গলাটা খাটো করে রমেশ বললে,—"আপনি যে আজ চলে যাচ্ছেন একথা হরকিকে জানাই নি। ও শুনলে নির্ঘাত একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসত।"

মজিদ সাহেবের মত আর একটি খাঁটি মানুষ ... বন্ধু জন্মের মত হারালাম। ... চিন্তার সময় নেই, উঠোনে দেখ... পা, পরনে খাকি হাফ্ প্যান্ট ... মাথায় ছাতার মত ... নি অফ...

বেত বা : ঐ জাতীয় পাতা দিয়ে বোনা টোকা বা প্রকাণ্ড টুপি, হাতে রাইফেল নিয়ে আট, নয়-জন কনস্টেবল আমায় নিরাপদে স্টীমার পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে। কোনও কথা না বলে উঠে ওদের মাঝখানে উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মাঝ-খানে আমি, দু পাশে রাইফেল হাতে ওরা। নিঃশব্দে পথ চলতে শুরু করলাম। মনে হল, আমি যেন মৃত্যুদণ্ডের আসামী। নির্জন কারাকক্ষে বসে এতদিন চরম মুহূর্তের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণ-ছিলাম। আজ সময় হতেই মৃত্যুদূত এসে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে গুলী করে মারবার জন্য। অন্ধকারে চলেছি, ঝোড়ো হাওয়া বেড়েই চলেছে, বৃষ্টিরও বিরাম নেই। অবশেষে ঐ দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে অক্ষতদেহে নিরাপদে ভীরু প্রাণটা নিয়ে স্টীমার ঘাটে পৌঁছলাম। বেডিং সুট্-কেস ওরাই কখন তুলে দিয়েছিল। দাড়ির
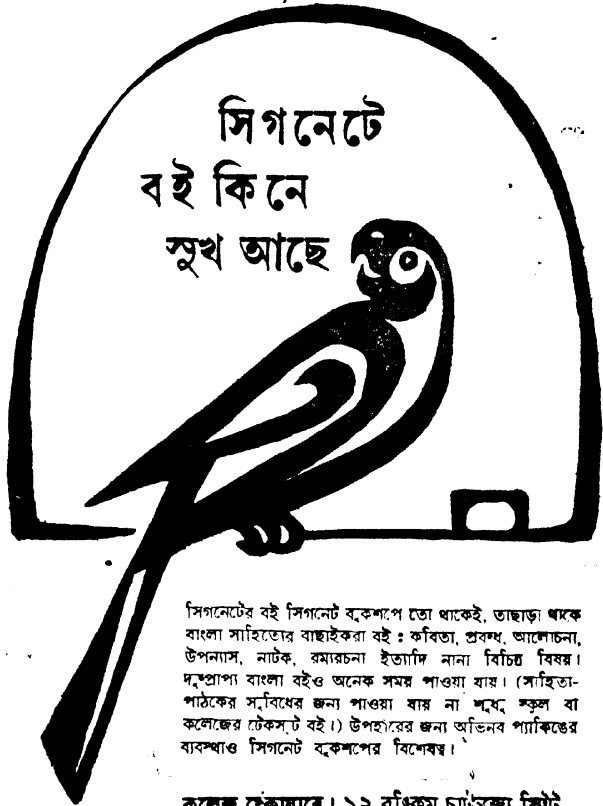
সিঁড়ি বেয়ে উঠতে আজ আর ভয় বা কষ্ট হল না। স্টীমারে উঠে দেখি আমার দেহরক্ষীর দল অপেক্ষা না করেই নৌকো ছেড়ে নাফ নদীর মাঝখান দিয়ে চলেছে। আজ ওরা শেষ বিদায়ের স্যালুট পর্যন্ত করল না, কেনই বা করবে? ওরা আজ জেনে গেছে মানুষের চামড়ার আবরণে আমি একটা কাপুরুষ। ছোট্ট ভীরু খরগোস জাতীয় জানোয়ার ছাড়া আর কিছুই নই।

স্টীমার ছেড়ে দিল।

* * *

রেলিং ধরে টেক্‌নাফের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। বাইরের ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন আজ আমার বুকের ভিতরে প্রলয়ের তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে। প্রকৃতির দুর্যোগ, সমুদ্রের ক্রুদ্ধ আস্ফালন আজ ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছিল না। হঠাৎ স্টীমার ভীষণ দুলে উঠল সেই সঙ্গে প্রকান্ড দোতালার সমান একটা ঢেউ হুমড়ি খেয়ে পড়ল ডেকের তক্তার উপর। চোখের নিমেষে দেখি প্রায় একহাঁটু জলে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছি আর ওরই ভিতরে একটি খালাসী ছুটে চলেছে ওপারে রেলিঙের দিকে আমার সুটকেস্ আর বেডিংটাকে তাড়া করে। পরক্ষণেই জল সরে গেল। দেখলাম সুটকেস্‌টা নিয়েছে বে অব্ বেঙ্গল আর রেলিঙের ফাঁকে আটকে যাওয়া বেডিংটা ধরে টানাটানি করছে খালাসী। সুট্‌কেস! হাসি পেল আমার। ঐ সুট্‌কেসের মধ্যেই ছিল অন্যান্য দরকারি জিনিসের সঙ্গে মিসেস মুলাণ্ডের দেওয়া সিগারেট কেস্‌টা। সপসপে ভিজে বেডিংটা এনে ডেকের মাঝখানে রেখে আমায় উদ্দেশ করে খালাসী কি যে বললে ঝড়ো হাওয়ায় তার এক বর্ণও শুনতে পেলাম না। টলতে টলতে গিয়ে ভিজে বেডিংটার উপর বসে ডেকের চারদিকটা দেখলাম। আজ আমার সহযাত্রী শুধু অগুন্তি শুঁটকি মাছের বস্তা ও ঝুড়ি। খুব শক্ত দড়ি দিয়ে রেলিং আর স্টীমারের চিমনির সঙ্গে বাঁধা ছিল বলে সেগুলো বে অব্ বেঙ্গলের গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে। হঠাৎ রেগে গেলাম। মনে মনে বললাম লংচুর মত নিরীহ শিশু আর অক্ষম সুটকেস, এই সবের উপরেই তোমার যত বীরত্ব। কই আজ এত সুযোগ পেয়েও আমাকে ত রেলিং-এর ফাঁক গলিয়ে টেনে নিতে পারলে না? নির্বিষ ঢোঁড়া সাপের মত শুধু আস্ফালনই সার।

কতক্ষণ ঐভাবে বসেছিলাম মনে নেই। ঝড়বৃষ্টি দুই-ই থেমে গেছে, শুধু মাঝে মাঝে দমকা ঝড়ো হাওয়ায় স্টীমারটা দুলে দুলে উঠছে। ডেকের ভিজে তক্তার উপর ভিজে পোশাকে ততোধিক ভিজে বেডিংটাকে বালিস করে কুঁকড়ে শুয়ে পড়লাম, আর সব চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার—অনেক চেষ্টা করেও জেগে পারলাম না।

জেগে দেখি কক্সবাজার পৌঁছে গত রাত্রের দুর্যোগের সমস্ত নিঃশেষে মুছে ফেলে দিয়ে চতুরা খুশীতে হাসছে। উঠে বেডিংটাকে ডেকের উপর রোদে বিছিয়ে পরনের প্যান্ট ও শার্ট রাতে হাও শুকিয়ে গিয়েছিল। আর না গে উপায় কি ছিল। শুনলাম গত রাতে স্টীমারের বিশেষ কোনও ক্ষতি শুধু শুঁটকি মাছের ঝুড়ি ও গুলো ভিজে গেছে। তাড়াতাড়ি পৌঁছে ওগুলো শুকোবার বন্দোব করলে অনেক টাকা ক্ষতি হবে সুতরাং ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ছেড়ে দেবে। মনে মনে জানতেম নেই অবুঝ মনকে প্রবোধ আবদুলের খোঁজ করলাম। খালাসিটির সঙ্গে দেখা হল, আবদুল এখন রেঙ্গুনের স্টীমারে করছে। দুপুরে কিছু খাওয়া হবে কি না জিজ্ঞাসা করতে এসে খালাসী জানালে, অনেক বেলায় খেলাম মোটা মুশুরির ডাল আর একটা তারপর শুকনো বেডিংটার উপর পড়লাম। বৈচিত্র্যহীন সমস্ত দিনে রাতে ঘটল না। পরদিন বেলা ... বন্দরে পৌঁছলাম। ... সময়ে স্টীমার ... পেলাম না। বেডি... এলাম। কোথায় যা... পুলিস ক্লাব? মন ... যারা আমার জন্য এত ... এক রাশ মিথ্যের ... তাদের সামনে গিয়ে ... না। তার চেয়ে ওদের ... সময়ে স্টী... কাপুরুষ পরিচয়টাই ... সোজা স্টেশনে চলে ... দিয়ে বে... গাড়ি তখনো তিন ... কখনও বসে ও ... মন—"হ্যাঁ, আ... কাটিয়ে দিল... জারের দোকানদা... অবশেষে ... সবের জন্য মা... ছেড়ে বাঁচু... ড়া। টীমার আনিয়ে... ন নিয়ে আজ

শব্দ পাওয়া গেল। চলে

লে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি
মন্ত্রে হিরণ্ময়ীর মাথার যন্ত্রণা
মুখ তার খুশীতে ঝলমল
দীননাথ অভিমানাহত
'এমন যদি কর হিরণ,
বাড়ি আসব না।'
ঝে এমন অবাক করে দেবার
রেন হিরণ্ময়ী। দীননাথ
যান। কি করে আবিষ্কার
ঐ বালিকা পত্নীটি নিজের
কাঁকনপরা মৃণাল-কোমল
দিয়ে স্বামীর গলা বেষ্টন
ণ্ময়ী। বলেন, 'বল তো
খ চোখ রেখে, তুমি আর
না?' কই বলতে ত পারলেন
মুখখানি তাঁর নতবৃন্ত পদ্মের
এল। মিশিয়ে গেল ব্যাকুল

র কথা বেশি দিনের নয়। তাই
'জব্দ হয়েই ত' আছি হিরণ।'
য়েছে, হয়েছে আর বাড়িয়ে ব'ল
মি অভিমানে মুখ ভার করেন
পরক্ষণেই সব অভিমান ঝেড়ে
দিয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করেন,
মুখখানা কেমন দেখতে হয়েছে

—'বিশ্রী যেন একেবারে প্যাঁচা। আর
রেই বা হবে মেয়ের মা যে'—বলতে
দীননাথ মুখখানা হতাশাব্যঞ্জক
লেন।
—আমি প্যাঁচার মত!' কথা সরে না
থাক আমার মেয়ে, প্যাঁচা
আমার প্যাঁচা হ'লেও আমার।'
কুতেই রাগ হ'ল। গভীর
ন দীননাথ।
তো না! হিরণ্ময়ীর অভিমান
নাথের সে কি সাধ্যসাধনা।
রণ্ময়ী শত চেষ্টা করেন,
মুখ ভার করে থাকতে পারেন
ক নিজে বকেন আড়ালে—
বাড় হয়েছে। অত মান
? স্বামীর কাল মুখখানা
জের অভিমানের চেয়েও বড়
মন স্বামী তাঁর। স্বামীর
ন অফুরন্ত পেয়েছেন।

তিনি যে কি পেয়েছেন তা' ত পাড়ার আর পাঁচটা মেয়ের অবস্থা দেখেও টের পান। তবু ঠাট্টার ছলে এতটুকু কথাও তিনি সইতে পারেন না, চোখে জল এসে পড়ে।

* * *

মা—জয়ন্তী ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরতে গিয়ে ডেকে ওঠে। হিরণ্ময়ী যেন সজাগ হয়ে ওঠেন। তিনি কি স্বপ্ন দেখছিলেন। জয়ন্তী ঘুমুচ্ছে। পাশে হৈমন্তী। হিরণ্ময়ীর মেঝ মেয়ে। ও-ও বাড়ন্ত হয়ে উঠেছে। জয়ন্তীকে পার করতে-না-করতেই হৈমন্তীর বিয়ে দিতে হবে। শিউলি গাছটার পাতাগুলির দিকে চেয়ে থাকেন হিরণ্ময়ী। বাড়িটার এক পাশে এক ফালি মাটি—হিরণ্ময়ী এসে অবধিই দেখেছেন ওখানে শিউলি গাছটা, এই কয় বছরে আরও গোটা দুই শিউলি গাছ এখানে হয়েছে দেখেছেন। এবার তার একটায় গোটাকয়েক ফুলও ফুটেছে। শীতের শিরশিরে হাওয়া এর মধ্যেই শিউলি গাছে লেগেছে, শেষ মরসুমের গাছে ফুল বিশেষ নেই। নতুন গাছটার ফুল নিয়েই এবার পাড়ার মধ্যে এত কলরব। অথচ তিনি যখন এসে-ছিলেন তখন ঐ নতুন গাছ কোথায় ছিল? ঘড়িতে বোধ হয় ঢং ঢং করে বারটা বাজল। দীননাথ বোধ হয় শুয়ে পড়েছেন। হিরণ্ময়ীর মনে হ'ল পুরনো ব্যথা একটা আবার আজ চাড়া দিয়ে উঠছে। আশ্চর্য, দীননাথের শুতে যাওয়া কথাটা ত' অনেকদিন হ'ল তাঁর হৃদয়ের সপ্তস্বরায় কোন সঙ্গীত তোলে নি। ব্যথা যা পেয়ে-ছিলেন তা তিনি চেপেই গিয়েছিলেন। আজ কেন বুকে হাজার মৌমাছির গুঞ্জন আর হুলদংশন। কেমন করে কি হয়ে গেল। সেইবার প্রথম বিয়ের পর দীননাথ বাড়িতে রইলেন, অথচ তাঁর ঘরে এলেন না। শাশুড়ী মারা গিয়েছিলেন। মেয়েরা বড় হয়েছে। তাদের বিয়ের খাটে আর চলছিল না। ওটাকে সরিয়ে দিয়ে বড় একটা চৌকী ঘরে পাততে হ'ল। ওটাতে হিরণ্ময়ী আর মেয়েরা, এটাতে হ'ল দীননাথের বিছানা। দিনটা ঠিক হিরণ্ময়ী মনে করতে পারেন না। দীননাথ তাকে মেজ বৌ ব'লে ডাকতে শুরু করলেন। মেয়েরা বড়ো হয়েছে। এ তথ্য হিরণ্ময়ীর অজানা ছিল না।

চোখ ফিরল তার শয্যার দিকে। হৈমন্তী ঘুমের ঘোরে হাতটা ছড়িয়ে দিয়েছে। এখানেই শুধু সব দুঃখের অবসান হয়ে যায়। হিরণ্ময়ী জানেন, এই ঘুমের ঘোরে মেয়েটা তাঁকেই খুঁজছে। এগিয়ে যান হিরণ্ময়ী হৈমন্তীর কাছে। মেয়েটা এমন করবে মায়ের সঙ্গে। কি যে করবে মাকে নিয়ে ভেবে পায় না। দোকান থেকে বাপ একটা ভাল শাড়ি

ঁড়ি বেয়ে উঠতে আজ আর ভয় বা ট হল না। স্টীমারে উঠে দেখি আমার হরক্ষীর দল অপেক্ষা না করেই নৌকো ড়ে নাফ নদীর মাঝখান দিয়ে চলেছে। জ ওরা শেষ বিদায়ের স্যালুট পর্যন্ত রল না, কেনই বা করবে? ওরা আজ নে গেছে মানুষের চামড়ার আবরণে মি একটা কাপুরুষ। ছোট্ট ভীরু গোস জাতীয় জানোয়ার ছাড়া আর ছুই নই।

স্টীমার ছেড়ে দিল।

* * *

রেলিং ধরে টেক্‌নাফের দিকে চেয়ে নেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। বাইরের ড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন আজ মার বুকের ভিতরে প্রলয়ের তান্ডব রু হয়ে গেছে। প্রকৃতির দুর্যোগ, মুদ্রের ক্রুদ্ধ আস্ফালন আজ ছেলেখেলা ড়া আর কিছুই মনে হচ্ছিল না। হঠাৎ টীমার ভীষণ দুলে উঠল সেই সঙ্গে কান্ড দোতালার সমান একটা ঢেউ মড়ি খেয়ে পড়ল ডেকের তক্তার উপর। খের নিমেষে দেখি প্রায় একহাঁটু জলে লিং ধরে দাঁড়িয়ে আছি আর ওরই তরে একটি খালাসী ছুটে চলেছে পারে রেলিঙের দিকে আমার টকেস্ আর বেডিংটাকে তাড়া রে। পরক্ষণেই জল সরে গেল। দেখলাম টকেস্‌টা নিয়েছে বে অব্ বেঙ্গল আর রেলিঙের ফাঁকে আটকে যাওয়া বেডিংটা ধরে টানাটানি করছে খালাসী। সুট্‌কেস! হাসি পেল আমার। ঐ সুট্‌কেসের মধ্যেই ছিল অন্যান্য দরকারি জিনিসের সঙ্গে মিসেস মুলান্ডের দেওয়া সিগারেট কেস্‌টা। সপসপে ভিজে বেডিংটা এনে ডেকের মাঝখানে রেখে আমায় উদ্দেশ করে খালাসী কি যে বললে ঝড়ো হাওয়ায় তার এক বর্ণও শুনতে পেলাম না। টলতে টলতে গিয়ে ভিজে বেডিংটার উপর বসে ডেকের চারদিকটা দেখলাম। আজ আমার সহযাত্রী শুধু অগুন্তি শুঁটকি মাছের বস্তা ও ঝুড়ি। খুব শক্ত দড়ি দিয়ে রেলিং আর স্টীমারের চিমনির সঙ্গে বাঁধা ছিল বলে সেগুলো বে অব্ বেঙ্গলের গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে। হঠাৎ রেগে গেলাম। মনে মনে বললাম লংচুর মত নিরীহ শিশু আর অক্ষম সুটকেস, এই সবের উপরেই তোমার যত বীরত্ব। কই আজ এত সুযোগ পেয়েও আমাকে ত রেলিং-এর ফাঁক গলিয়ে টেনে নিতে পারলে না? নির্বিষ ঢোঁড়া সাপের মত শুধু আস্ফালনই সার।

কতক্ষণ ঐভাবে বসেছিলাম মনে নেই। ঝড়বৃষ্টি দুই-ই থেমে গেছে, শুধু মাঝে মাঝে দমকা ঝড়ো হাওয়ায় স্টীমারটা দুলে দুলে উঠছে। ডেকের ভিজে তক্তার উপর ভিজে পোশাকে ততোধিক ভিজে বেডিংটাকে বালিস করে কুঁকড়ে শুয়ে পড়লাম, আর সব চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার-- অনেক চেষ্টা করেও জেগে ... এলে পারলাম না। ... গেছেন

জেগে দেখি কক্সবাজার পৌঁছের কথায় গত রাত্রের দুর্যোগের সমস্তমা থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলে দিয়ে চতুরম আসছি খুশীতে হাসছে। উঠে বেডিংটা। ডেকের উপর রোদে বিছিয়ে মুখখানা তার পরনের প্যান্ট ও শার্ট রাত্রে ম খুক্‌-খুক্‌ শুকিয়ে গিয়েছিল। আর না। দীননাথের উপায় কি ছিল। শুনলাম গত রা শুয়েছিলেন স্টীমারের বিশেষ কোনও ক্ষতিহয়ে দিলেন শুধু শুঁটকি মাছের ঝুড়ি দিয়ে হেসে গুলো ভিজে গেছে। তাড়াতাড়ি পৌঁছে ওগুলো শুকোবার ব্যবমাকে কেমন করলে অনেক টাকা ক্ষতি হয়েছে। দীন-সুতরাং ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ছেড়ে দেবে। মনে মনে জানতাম ...ন জব্দ! অবুঝ মনকে প্রবোধ দেওয়া ...লার স্বাদ আবদুলের খোঁজ করলাম। গত শনিবার খালাসিটির সঙ্গে দেখা হল, সে ...ক বন্ধুর আবদুল এখন রেঙ্গুনের স্টীমারে ...রে যেতে করছে। দুপুরে কিছু খাওয়ার ...গ মাথার হবে কি না জিজ্ঞাসা করতে একটা ...লর বৌ এসে খালাসী জানালে, হবে। দ... না। অনেক বেলায় খেলাম মোটা লাল ...টাছুটি মুশুরির ডাল আর একটা ডিম সি...বেশি তারপর শুকনো বেডিংটার উপর শ...দিয়ে পড়লাম। বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে যা...লিয়ে সমস্ত দিনে রাতে উল্লেখযোগ্য ...খের ঘটল না। পরদিন বেলা ...টায় চট্ট...পড়ে বন্দরে পৌঁছলাম। জনশূন্য বন্দর ...কুম সময়ে স্টীমার আসার কথা নয় কু...তে পেলাম না। বেডিংটা হাতে নিয়ে ...র এলাম। কোথায় যাব, কোতোয়ালি? না পুলিস ক্লাব? মন সায় দিল না। এতদিন যারা আমার জন্য এত করেছে আজ অসময়ে এক রাশ মিথ্যের বোঝা মাথায় করে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে সাহস হল না। তার চেয়ে ওদের কাছে আমার ভীরু কাপুরুষ পরিচয়টাই বড় হয়ে থাক। সোজা স্টেশনে চলে এলাম। কলকাতার গাড়ি তখনো তিন ...দেরি। কি করি? কখনও বসে ও ...ন-- পাইচারী করে কাটিয়ে দিল... জারের ...

অবশেষে ... সবের জ... ছাড়লো--হাঁপ ছেড়ে বাঁচ... টীমার অ... নিয়ে

(ক্রমশ)

ট্রেনের শব্দ পাওয়া গেল। চলে ট্রেন।

ট্রেনটা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি ভোজমন্ত্রে হিরণ্ময়ীর মাথার যন্ত্রণা গেল। মুখ তার খুশীতে ঝলমল উঠল। দীননাথ অভিমানাহত বললেন, 'এমন যদি কর হিরণ, ল আর বাড়ি আসব না।'

মাঝে মাঝে এমন অবাক করে দেবার কাজ করেন হিরণ্ময়ী। দীননাথ হয়ে যান। কি করে আবিষ্কার ন তাঁর ঐ বালিকা পত্নীটি নিজের শক্তি। কাঁকনপরা মৃণাল-কোমল দু'খানি দিয়ে স্বামীর গলা বেষ্টন হিরণ্ময়ী। বলেন, 'বল তো চোখে চোখ রেখে, তুমি আর আসবে না?' কই বলতে ত পারলেন শুধু মুখখানি তাঁর নতবৃন্ত পদ্মের নেমে এল। মিশিয়ে গেল ব্যাকুল াস।

স সব কথা বেশি দিনের নয়। তাই দেন, 'জব্দ হয়েই ত' আছি হিরণ।' হয়েছে, হয়েছে আর বাড়িয়ে ব'ল কৃত্রিম অভিমানে মুখ ভার করেন ময়ী, পরক্ষণেই সব অভিমান ঝেড়ে দিয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করেন, র মুখখানা কেমন দেখতে হয়েছে ?'

—'বিশ্রী যেন একেবারে প্যাঁচা। আর রেই বা হবে মেয়ের মা যে'—বলতে দীননাথ মুখখানা হতাশাব্যঞ্জক তোলেন।

—'আমি প্যাঁচার মত!' কথা সরে না ময়ীর, থাক আমার মেয়ে, প্যাঁচা ও আমার, বোঁচা হ'লেও আমার।'

এইটুকুতেই রাগ হ'ল। গম্ভীর য়ে বলেন দীননাথ।

—না গো, না—! হিরণ্ময়ীর অভিমান তে দীননাথের সে কি সাধ্যসাধনা। র্য, হিরণ্ময়ী শত চেষ্টা করেন, ক্ষণ ত মুখ ভার করে থাকতে পারেন নিজেকে নিজে বকেন আড়ালে— ার বড্ড বাড় হয়েছে। অত মান র তোমার? স্বামীর কাল মুখখানা তাঁর নিজের অভিমানের চেয়েও বড় ওঠে। অমন স্বামী তাঁর। স্বামীর বাসা তিনি অফুরন্ত পেয়েছেন। তিনি যে কি পেয়েছেন তা' ত পাড়ার আর পাঁচটা মেয়ের অবস্থা দেখেও টের পান। তবু ঠাট্টার ছলে এতটুকু কথাও তিনি সইতে পারেন না, চোখে জল এসে পড়ে।

* * *

মা—জয়ন্তী ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরতে গিয়ে ডেকে ওঠে। হিরণ্ময়ী যেন সজাগ হয়ে ওঠেন। তিনি কি স্বপ্ন দেখছিলেন। জয়ন্তী ঘুমুচ্ছে। পাশে হৈমন্তী। হিরণ্ময়ীর মেঝ মেয়ে। ও-ও বাড়ন্ত হয়ে উঠেছে। জয়ন্তীকে পার করতে-না-করতেই হৈমন্তীর বিয়ে দিতে হবে। শিউলি গাছটার পাতাগুলির দিকে চেয়ে থাকেন হিরণ্ময়ী। বাড়িটার এক পাশে এক ফালি মাটি—হিরণ্ময়ী এসে অবধিই দেখেছেন ওখানে শিউলি গাছটা, এই কয় বছরে আরও গোটা দুই শিউলি গাছ এখানে হয়েছে দেখেছেন। এবার তার একটায় গোটাকয়েক ফুলও ফুটেছে। শীতের শিরশিরে হাওয়া এর মধ্যেই শিউলি গাছে লেগেছে, শেষ মরসুমের গাছে ফুল বিশেষ নেই। নতুন গাছটার ফুল নিয়েই এবার পাড়ার মধ্যে এত কলরব। অথচ তিনি যখন এসে-ছিলেন তখন ঐ নতুন গাছ কোথায় ছিল? ঘড়িতে বোধ হয় ঢং ঢং করে বারটা বাজল। দীননাথ বোধ হয় শুয়ে পড়েছেন। হিরণ্ময়ীর মনে হল পুরনো ব্যথা একটা আবার আজ চাড়া দিয়ে উঠছে। আশ্চর্য দীননাথের শুতে যাওয়া কথাটা ত অনেকদিন হ'ল তাঁর হৃদয়ের সপ্তস্বরায় কোন সংগীত তোলে নি। ব্যথা যা পেয়ে-ছিলেন তা তিনি চেপেই গিয়েছিলেন। আজ কেন বুকে হাজার মৌমাছির গুঞ্জন আর হুলদংশন। কেমন করে কি হয়ে গেল। সেইবার প্রথম বিয়ের পর দীননাথ বাড়িতে রইলেন, অথচ তাঁর ঘরে এলেন না। শাশুড়ী মারা গিয়েছিলেন। মেয়েরা বড় হয়েছে। তাদের বিয়ের খাটে আর চলছিল না। ওটাকে সরিয়ে দিয়ে বড় একটা চৌকী ঘরে পাততে হ'ল। ওটাতে হিরণ্ময়ী আর মেয়েরা; এটাতে হ'ল দীননাথের বিছানা। দিনটা ঠিক হিরণ্ময়ী মনে করতে পারেন না। দীননাথ তাকে মেজ বৌ ব'লে ডাকতে শুরু করলেন। মেয়েরা বড়ো হয়েছে। এ তথ্য হিরণ্ময়ীর অজানা ছিল না।

চোখ ফিরল তার শয্যার দিকে। হৈমন্তী ঘুমের ঘোরে হাতটা ছড়িয়ে দিয়েছে। এখানেই শুধু সব দুঃখের অবসান হয়ে যায়। হিরণ্ময়ী জানেন, এই ঘুমের ঘোরে মেয়েটা তাঁকেই খুঁজছে। এগিয়ে যান হিরণ্ময়ী হৈমন্তীর কাছে। মেয়েটা এমন করবে মায়ের সঙ্গে। কি-যে করবে মাকে নিয়ে ভেবে পায় না। দোকান থেকে বাপ একটা ভাল শাড়ি

শার্ঙ্গদেব

রবীন্দ্রনাথের কথা মনে হলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেও মনে পড়ে। শে বৈশাখ কবিগুরুর জন্মদিন—এর তিনদিন আগে অর্থাৎ বাইশে বৈশাখ গ্রহণ করেছিলেন তাঁর অগ্রজ তিরিন্দ্রনাথ, সাল বাংলা ১২৫৫।

ার কাব্যসংগীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অতুলনীয় অথচ তাঁকে আমরা ভুলে বললেও অত্যুক্তি হয় না। যে রেমাটিক স্বরলিপি আজকাল সংগীতে রা নিত্য ব্যবহার করি সেই উৎকৃষ্ট সরল পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন তিরিন্দ্রনাথ। সংগীত সম্বন্ধে আজ ত লেখাজোখা, আলোচনা এরও প্রধান না এসেছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছ ই। অথচ আমাদের সংগীতসমাজেই আজ বিস্মৃত। আশ্চর্য আত্মবিস্মৃতি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্মের বহুপূর্বে সময় বাংলা গানে একটা জাগরণ ছিল যার ফলে কাব্যসংগীতে টপ্পা তিষ্ঠিত হল। কিন্তু সে জাগরণের সামাজিক চেতনা তেমন করে জাগ্রত নি। ফলে সংগীত যাঁরা অবলম্বন লন তাঁদের বাধ্য হয়েই কিছু নিম্ন-র কাব্যসংগীতকে আশ্রয় করতে হল কার দিনের মনোভাব অনুযায়ী। া সংগীতের গতি আবার নিম্নাভি-ী হতে লাগল। সময়টা যখন এমনি তখন এল প্রবল সামাজিক আন্দোলন। এই আন্দোলনের ফলে সংগীতে একটা গাম্ভীর্য দেখা দিল এবং একটি শান্ত সংযত ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হল। এই সময়ে বাংলাদেশে ধ্রুপদের নব অভ্যুদয় ঘটল যার প্রকাশ হয়েছে বহু ব্রহ্মসংগীতে। ভক্তিরসাত্মক সংগীত ছাড়া অপরাপর কাব্যসংগীতে এই শান্ত সংযত শ্রী ফিরিয়ে আনার জন্য সচেষ্ট হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। সংগীত সম্বন্ধে অত্যন্ত উদার মতাবলম্বী ছিলেন তিনি সেই কারণে কাব্যসংগীতের প্রচলিত ধারাকে তিনি পরিত্যাগ করেন নি। সেকালকার সেই আড় খেমটা, টপ্পাচালের সংগীতধারা তিনি গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তাকে প্রয়োগ করলেন অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে সুমার্জিত এবং সুপরিকল্পিত রচনায়। এইখানেই তাঁর প্রধান কৃতিত্ব। তিনি স্কচ, কেদারা বা ইটালীয়ান ঝিঁঝিটে সুর রচনা করেছিলেন এইটাই বড় কথা নয়, তিনি আমাদের সাংগীতিক রুচির যথেষ্ট উন্নয়ন করেছিলেন, প্রাচীন রীতিকে পরিত্যাগ না করেও সংগীতের একটা বিরাট সংস্কার সাধন করেছিলেন—এইটাই সবচেয়ে বড় কথা। অথচ তিনি যে সংগীতে প্রাচীনপন্থী ছিলেন তা নয়। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে প্রচলিত সুর নিয়ে তিনি নানাভাবে পরীক্ষা করতেন, এই পরীক্ষা চলত পিয়ানোতে। এর ফলে—"ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক একটি অপূর্ব মূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত।" এই যে বাংলা গানে নতুন পরীক্ষা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আগে আর কেউ এমনভাবে করেছেন কিনা সন্দেহ। পিয়ানোতে এইসব পরীক্ষার দরুণ আমাদের সংগীতে আবার আর একটা নতুন রূপের আভাস ফুটেছে। এমন কতকগুলি গান জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আছে
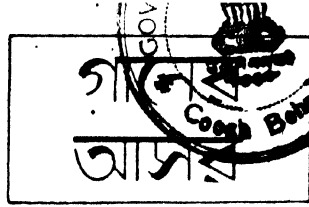
পিয়ানোর সঙ্গে সহযোগিতায় যেগুলির একটা বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়েছে। অবশ্য এইসব গানের প্রত্যেকটিই যে তিনি পিয়ানোতে বসে সুর দিয়েছেন এমন কথা নিশ্চয় করে বলবার উপায় নেই, কিন্তু পিয়ানোর ঝোঁক যে, এইসব সুরে ফুটে উঠেছে সেটা নিশ্চয় করে বলা যায়। উদাহরণস্বরূপ, 'রাখ্‌লো সখি রাখলো বীণা', 'প্রেমের কথা আর বোলো না', 'ছেড়ে দে ছেড়ে দে আমার পাখি', রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'কে যেতেছিস আয়রে হেথা', প্রভৃতি গানের উল্লেখ করা যায়। এই যে সমস্ত পরীক্ষা এর মধ্যে ছন্দ, ভঙ্গী, বৈচিত্র্য নানা দিক দিয়ে একটা নতুন প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। 'প্রেমের কথা আর বোলো না'—এই ধরণের গানে যেমন ছন্দ এবং সুরের পরীক্ষা করা হয়েছে তেমনি সেকালকার খুব সরল অথচ অত্যন্ত সুন্দর এবং পরিণত ঢঙের কিছুটা বিলম্বিত লয়ের সুর রচনাও জ্যোতিরিন্দ্রনাথে কম নেই। 'প্রাণ বড় ব্যাকুল হল', 'কেনই বা ভুলিব তোমায়' 'নিতান্ত না রইতে পেরে'—এইসব গানের সুর মীড়ে ছোট ছোট টপ্পার কাজে, ভাবে রসে নিটোল হয়ে আছে। খেমটা ঢঙের গানেও তাঁর হাত ছিল পাকা। উদাহরণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের লেখা 'কে যেতেছিস আয়রে হেথা' গানখানির উল্লেখ করা যায়। সমগ্র বাংলা গানের মধ্যে এই গানটি একটি আশ্চর্য সৃষ্টি। গানটিতে একটি অপূর্ব নৃত্যভঙ্গী ফুটে উঠেছে। সুরের গতি হাল্কা, ছন্দও হাল্কা কিন্তু তা সত্ত্বেও গানটি খুব হাল্কা নয়, প্রতিটি কথার ভাব সুরে মূর্ত হয়ে উঠেছে এবং একটি করুণ মধুর বিবশভাব মনকে একেবারে বিহ্বল করে দেয়। পিয়ানোর সহযোগিতায় গানটি জমেও চমৎকার। ছন্দ এবং সুরের দিক থেকে আর একটি মনোহর সৃষ্টি তাঁর নিজের লেখা 'মন চুরি করিল' গানটি। বারোয়াঁ-পিলু সুরে ঝাঁপতালে এটি একটি নতুন ভঙ্গির প্রবর্তন করেছে। বৈচিত্র্যের দিক থেকে তাঁর আর একটি গান লক্ষণীয়।

"মধ্যাহ্ন বেলা
ঝাঁ ঝাঁ করে দিকদশ
বায়স ডাকে নিরালা।
খরতর তাপে জরজর ধরণী
উদাস আকাশে হুতাশ জ্বালা।"

এটির সুর মধুমাধবী সারঙ্গ, তাল—ঢিমে তেতালা। সুরটিতে মধ্যাহ্ন বেলার একটা করুণ শুষ্ক মূর্তি তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে। এইসব গানে ছন্দের প্রাধান্য তেমন নেই, এগুলির বৈশিষ্ট্য ঢালা সুরের কাজে।

সঙ্গীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহু বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। একাধারে তিনি ছিলেন গীত-নাট্য রচয়িতা, প্রযোজক, সুরকার, পিয়ানো, হারমোনিয়াম, সেতার, বেহালা প্রভৃতি বহু যন্ত্রের অভিজ্ঞ বাদক। এতগুলি বিষয় আয়ত্তে থাকা বড় কম কথা নয়।

প্রথম যৌবনে তাঁর অধিকাংশ সময় কাটতো খুল্লতাতপুত্র গুণেন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় গানবাজনায় গল্পগুজবে। সত্যেন্দ্রনাথ বিলাত থেকে ফিরে এসে যখন বোম্বাই-এ ছিলেন তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেখানে নানা ভাষায় বিস্তর পড়াশোনা করতেন আর করতেন সঙ্গীত চর্চা সেতার হারমোনিয়াম প্রভৃতি বাজনার সঙ্গে। কলকাতায় এসে তিনি নাটকের দিকে মনোনিবেশ করলেন। এই সময় তাঁদের বাড়িতে যেমন সাহিত্যচর্চা হ'ত তেমনি হ'ত সঙ্গীত চর্চা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গানের আসরে নানারকম পরীক্ষা হ'ত অক্ষয় চৌধুরী, স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ, এ'দের নিয়ে। পিয়ানোতে নতুন নতুন গানের সুর দিতেন তিনি আর কথা বসাতেন প্রধানত অক্ষয়চন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ। পুরোনো গানের ভাণ্ডার ছিল অক্ষয়চন্দ্রের কাছে। সেইসব গানের নানারকম ঢং তিনি আমদানী করতেন এবং প্রাচীন গানের সঙ্গেও তাঁদের পরিচয় হ'ত এই আসরে। ১৮৭৭ সালে যখন ভারতী পত্রিকা বেরিয়েছে তখন তাঁর সঙ্গীতোদ্যম চলেছে পুরোমাত্রায়।

স্বরলিপি নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাধনা চলেছিল বহুদিন। স্বরলিপির প্রথম প্রচেষ্টা করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ কিন্তু তাকে অনেক সহজ করে আনলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। আদি প্রচেষ্টা থেকে তিনি সংখ্যা-মাত্রিক স্বরলিপির উদ্ভাবন করেন। এর কয়েক বৎসর পরে উদ্ভাবন করলেন সবচেয়ে সহজবোধ্য আকার মাত্রিক স্বরলিপি। ১৮৯৭ সালে ডোয়ার্কিনের দোকান থেকে বেরুলো 'স্বরলিপি-গীতি-মালা'—এতে আকার মাত্রিক স্বরলিপির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা এবং তাঁর নিজের, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতির লিখিত বহু গানের স্বরলিপি প্রকাশ করে এই ধারাটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

স্বরলিপি-গীতি-মালার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 'বীণা-বাদিনী' নামক সঙ্গীতবিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করলেন। এইটিই সঙ্গীত সম্বন্ধীয় প্রথম মাসিকপত্র। বীণাবাদিনীতে সঙ্গীতবিষয়ক প্রবন্ধ, হিন্দি বাংলা গানের, গতের স্বরলিপি প্রভৃতি প্রকাশিত হ'ত। পত্রিকাটি চলছিল দু'বছর।

এর পরে তাঁর চেষ্টাতেই স্থাপিত হ'ল ভারত সঙ্গীত সমাজ এবং এর মুখপত্র হল সঙ্গীত প্রকাশিকা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন পুণায় ছিলেন তখন সেখানকার 'গায়ন সমাজ' দেখে কলকাতায় এইরকম একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে ছিল। বীণাবাদিনীর প্রথম সংখ্যায় তিনি একটি বিজ্ঞপ্তিও প্রচার করেছিলেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল যে, সঙ্গীতের ক্রমশ অবনতির জন্য সঙ্গীত সমাজ নামক একটি সভা করা আবশ্যক যাতে সঙ্গীতের সংরক্ষণ এবং উন্নতিবিধান করা যায়। এই সমাজের অধীনে একটি সঙ্গীতশালা থাকবে এবং সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তিগণ প্রতিদিন কিম্বা সপ্তাহে একটি সন্ধ্যায় সেখানে সমবেত হয়ে গান-বাজনা বা সঙ্গীত সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করবেন। সভার বেতনভুক একজন উৎকৃষ্ট গায়ক ও বাদক সঙ্গীতশালায় সর্বদাই উপস্থিত থাকবেন। উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে যিনি যা পারেন, কেউ বা যন্ত্র

াবেন কেউ গান গাইবেন কেউ সংগীত ন্ধে কোন প্রবন্ধ পাঠ করবেন আবার মধ্যে পেশাদার গুণীজনকে আহ্বান তাঁর গানবাজনাও শোনা যাবে। না কখনো উৎকৃষ্ট যাত্রা, কীর্তন, ত্তা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করে সভ্য-র চিত্তবিনোদন করা হবে। প্রতি বৎসর র সাম্বৎসরিক উৎসবের দিনে বা বতী পূজা উপলক্ষ্যে দেশবিদেশ গুণীগণকে আহ্বান করে সংগীত বের অনুষ্ঠান এবং তাঁদের পারি-ষক দেওয়া হবে।

এইরকম উন্নতি পরিকল্পনাও বোধ আমাদের দেশে এই প্রথম। পরিকল্পনা যায়ী কাজও হয়েছিল কিছুদিন। তিরিন্দ্রনাথের চেষ্টায় ভারত সংগীত অল্পকালের মধ্যেই স্থাপিত হ'ল। এই সমাজ কালীপ্রসন্ন সিংহের তে বসত। সকল শ্রেণীর সম্মিলিত কাজও বেশ চলতে লাগল, কিন্তু িনের মধ্যেই মতদ্বৈধ দেখা দিল সমাজও দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। পর সচরাচর যা ঘটে তাই ঘটল। তিরিন্দ্রনাথই ছিলেন ভারত সংগীত জর প্রথম সম্পাদক এবং পরে অন্যতম পতিও নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রথম-এই প্রতিষ্ঠানের জন্য তাঁকে পরিশ্রম কম করতে হয় নি, গানবাজনার ব্যবস্থা ও তাঁর বহু নাটকের অভিনয়ও বহুবার হয়েছিল।

সংগীত প্রকাশিকা বেরিয়েছিল ১ সালে। এই পত্রিকায় প্রাচীন দির প্রকাশ, শাস্ত্রোল্লিখিত পারি-ক শব্দগুলির ব্যাখ্যা এবং প্রাচীন তাদের সংগীতের স্বরলিপি প্রভৃতি করা তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সে সময়কার রচয়িতাদের গান তো ই। এই উদ্দেশ্য তিনি অনেকাংশে ও করতে পেরেছিলেন। এমন উন্নত র সংগীত পত্রিকা এ যুগেও আর য় নি।

কাব্যসংগীতের আর একটা দিক ং উচ্চাঙ্গ সংগীতের দিকেও তিরিন্দ্রনাথের দান বড় কম নয়। ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছেন তিনি, ব্যর দিক থেকে সেগুলি অতুলনীয়। য় উচ্চাঙ্গ ধ্রুপদভঙ্গীম কাব্য-সংগীতের স্রষ্টাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের স্থান যে সর্বোচ্চ একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

সংগীতে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ছিল কিন্তু শুধু সংগীতেই নয়, অপরাপর বহু বিষয়েই তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল। বাংলা সাহিত্যের বহু বিষয়ে তিনি হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবং সাফল্য অর্জন করেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (যার অন্যতম সভাপতি ছিলেন তিনি এক বছর) স্থাপিত হবার পূর্বেই তিনি সারস্বত সমাজের পরিকল্পনা করেছিলেন একই উদ্দেশ্যে। সংস্কৃত এবং ফরাসী ভাষা থেকে বহু অনুবাদও তিনি প্রকাশিত করেছেন। এর সঙ্গে আবার নানা ব্যবসায়েও হাত দিয়েছিলেন। এতগুলি বিষয়ে মনোনিবেশ করার ফলে তাঁর ভাবনা চিন্তা ছিল প্রচুর। শোক, দুঃখ, আঘাতও কম পাননি কিন্তু ধীরভাবে সবই সহ্য করেছেন এবং প্রত্যেকটি কর্তব্য একের পর এক সম্পাদন করে গেছেন। স্বর-লিপির ব্যাপারেই তাঁকে কম লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়নি। গীতসূত্রসার রচয়িতা কৃষ্ণধনবাবু তাঁকে তীব্র ভাষায় অসংগত-ভাবে আক্রমণ করেছিলেন কিন্তু তিনি প্রত্যুত্তরে কোনরকম অসহিষ্ণু মনোভাব প্রকাশ করেন নি। ব্যবসায়ে বহু ক্ষতি তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল কিন্তু সেসব স্বীকার ক'রে নিয়েও মনোভার লাঘব করেছিলেন তিনি চিত্রাঙ্কনে, সাহিত্য এবং সংগীতের সেবায়। শেষ বয়সে তিনি যখন রাঁচিতে ছিলেন তখনও সংগীত তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কোন কোন ব্যক্তিকে তিনি এই বয়সে নিজের স্মৃতি থেকে আগাগোড়া "বাল্মীকি প্রতিভা" গেয়ে শুনিয়েছেন।

১৯২৫ সালে ৪ঠা মার্চ (বাংলা ১৩৩১এর ২০শে ফাল্গুন) রাঁচিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাদের সংগীত সাহিত্যে লেখালেখি খুব কমই হয়েছে অথচ তাঁর রচনার গভীরত্ব অল্প নয়। একজন সংগীত রচয়িতা বললেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিচয় দেওয়া হ'ল না। যে সব সংগীত রচয়িতা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে উদিত হয়েছেন তাঁদের মূলে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ — কাব্যসংগীতের নব-অভ্যুদয়ের পন্থা তিনিই নির্ণয় করে-ছিলেন। রচনা এবং সুরের নূতনত্বের

ইঙ্গিতও তাঁর কাছ থেকেই এসেছিল। শুধু তাই নয়, তাদের সংরক্ষণের পন্থাও তিনি আবিষ্কার ক'রে গেছেন, কিন্তু এই প্রচারবিমুখ নিরহংকার আত্মগোপনপ্রয়াসী ব্যক্তিটি সকলের জন্য পরিশ্রম করেছেন, নিজে থেকেছেন আড়ালে। এর জন্য তাঁর কোন ক্ষোভ ছিল না।

আসরের খবর

সংস্কৃতায়নের অভিনয় "সাগরিকা"

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ১৬ই মে আশুতোষ কলেজ হলে নব-প্রতিষ্ঠিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান "সংস্কৃতায়ন" কর্তৃক রবীন্দ্রসংগীত এবং নৃত্য সহযোগে "সাগরিকা" নামক একটি কথিকার রূপায়ন আমাদের ভাল লেগেছে। বলিদ্বীপকে উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ সাগরিকা নামক যে কবিতাটি লেখেন সেটিকে অবলম্বন করে এই কথিকাটি রচনা করেছেন শ্রীসুধীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচারের অভিযান একটি রূপকের মাধ্যমে ছায়াচিত্র প্রতিফলনের সাহায্যে এবং সংগীতে নৃত্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। রচনা এবং পরিকল্পনা প্রশংসনীয়। রবীন্দ্রসংগীত সুসন্নিবেশিত এবং সুগীত হয়েছে। গীতাংশের তত্ত্বাবধান করেছেন শ্রীসন্তোষ ঠাকুর। নৃত্যপরিকল্পনা এবং পরিচালনায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন শ্রীঅসিত চট্টোপাধ্যায়। তালের ওপর তাঁর চমৎকার অধিকার এবং দৃঢ় পদক্ষেপ প্রত্যেক নৃত্যকে একটি বলিষ্ঠ এবং সুন্দর রূপ দিয়েছে। আজকাল নৃত্যে পদবিন্যাসে, তাল বৈচিত্র্যপ্রকাশে অক্ষম হয়ে অনেকে ভাবাভিনয়ে সেটা ঢাকবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখা গেল। "নৃত্যের তালে তালে" গানটির সঙ্গে বিভিন্ন ছন্দে নৃত্যপরিকল্পনাটি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। তবে ভাবব্যঞ্জনার দিকে আর একটু মনোযোগ দিলে নৃত্যাভিনয় অনবদ্য হ'ত। অনভিজ্ঞতার দরুণ ব্যবস্থাপনার সামান্য ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে।

সংস্কৃতায়নের কর্মাধ্যক্ষ জানাচ্ছেন যে, তাঁরা একটি নিয়মিত নৃত্য, সংগীত ও চিত্রকলার শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের জন্য স্থায়ী কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বঙ্গ সংস্কৃতির ধারাকে অনুসরণ করে বাংলার বিবিধ সংগীতের একটি ধারাবাহিক পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাংলা গানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

বাণী মন্দির পূর্ণিমা সম্মিলন

গত রবিবার, ২৩শে মে সাঁত্রাগাছিতে শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্যের গৃহে পূর্ণিমা সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সভায় বহু সাহিত্যিক ও সংগীতশিল্পী উপস্থিত ছিলেন এবং সভাপতিত্ব করেন শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। এই উপলক্ষে তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের উদ্যোগে তাঁর সুরধাম ভবনে পূর্ণিমা মিলনের প্রথম অধিবেশনের উল্লেখ করে কবিরচিত যে গানটি সেদিন গাওয়া হয় তার প্রথম অংশ আবৃত্তি করেনঃ—

> এটা নয় মলার ভোজের নিমন্ত্রণ
> এখানে আছে কিঞ্চিৎ জলযোগ
> আর চায়ের মাত্র আয়োজন।
>
> সাহিত্যিক ছোট বড়
> এইখানেতে হয়ে জড়
> প্রীতিভরে একত্রেতে
> করতে হবে কালহরণ।

এই সভায় সম্পাদক শ্রীনন্দলাল দাস, মন্মথমোহন বসু, শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে বক্তৃতা দেন।

বক্তৃতাদির পর একটি সংগীতের অধিবেশন হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্ন্যাল, শ্রীযামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপরেশ ভট্টাচার্য, শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

রবীন্দ্র-সংগীত সম্মেলন

আগামী ১১ই থেকে ১৪ই জুন আশুতোষ কলেজ হলে রবীন্দ্র-সংগীত সম্মেলনের যে ত্রৈবার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে তার বিস্তারিত অনুষ্ঠান-সূচী নিম্নে দেওয়া হলো—

প্রথম অধিবেশন—১১ই জুন সন্ধ্যা ৭টা—বেদগান, স্বস্তি-বাচন—পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, সংগঠন-সচিবের ভাষণ, "রবীন্দ্র সংগীতের কাব্যধর্ম"—পরিচালনা—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ এবং 'লোকসংগীত', 'প্রেম-সংগীত' ও 'আনুষ্ঠানিক সংগীতের' আসর।

দ্বিতীয় অধিবেশন—১২ই জুন সন্ধ্যা ৭টা—বেদগান, "রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ ও ধামার" পরিচালনা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এবং 'হাস্যরসাত্মক', 'শিশু-সংগীত', 'টপ্পা' এবং 'উদ্দীপক গানের' আসর।

তৃতীয় অধিবেশন—১৩ই জুন সকাল ৯টা—বেদগান, "রবীন্দ্র-সংগীতের প্রথম যুগ" পরিচালনা শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী এবং 'দেশাত্মবোধক', 'নৃত্যের তালের গান', 'ঋতু-সংগীত', 'খেয়াল ও ঠুংরী' গানের আসর।

চতুর্থ অধিবেশন—১৩ই জুন সন্ধ্যা ৭টা—বেদগান, 'ধর্মসংগীত', 'ভাঙ্গা-গান' ও নৃত্য-পরিকল্পনায় "ভানু সিংহের পদাবলী"—প্রযোজনা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জুলো দত্ত ও স্মৃতি চক্রবর্তী।

শেষ অধিবেশন—১৪ই জুন সন্ধ্যা ৭টা—রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী"—প্রযোজনা—'দক্ষিণী'।

সৃষ্টি ও বিকাশ

সরলাবালা সরকার

মানুষ বিকাশের ধাপে ধাপে পদক্ষেপ করিয়া ক্রমশ বুদ্ধির জ্য যখন প্রবেশ করিল তখন দেখা গেল ন্ত্রিক আবিষ্কারের মধ্য দিয়াই তাহার দ্ধি রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। এই ন্ত্রিক আবিষ্কার অর্থাৎ বুদ্ধির সহায়ে য়োজনীয় সৃষ্টি কার্যে অভাব পূরণ দিম যুগ হইতেই মানবের ইতিহাসে ষ্ট হইয়াছে।

মানবশিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন থাকে নিরাবরণ। পশুর আবরণের ন্য লোমশ দেহ ও পক্ষীর পালক ভৃতির ন্যায় কোন আবরণই প্রকৃতি হাকে দান করেন নাই। তাহার নিজের বরণ নিজেই প্রস্তুত করিয়া লইতে । শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য কৃতি তাহাকে তীক্ষ্ণ নখ দন্ত অথবা ত পলায়নের শক্তি প্রভৃতি কিছুই দেন ই। আত্মরক্ষার জন্য গাছের ডাল ও স্তর প্রভৃতির দ্বারা আদিম যুগ হইতেই নুষ অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে এবং খনও তাহার সেই অস্ত্র আবিষ্কার কার্য মভাবেই চলিতেছে।

মানুষের বুদ্ধির একটি বিশেষ কার্য ই যে, যেরকম অবস্থাতেই হউক না কেন ঙ্কট ও সমস্যার প্রতিকার করিবার জন্য পায় নির্ধারণ করা। খুঁজিয়া বাহির করা, র্তমান অবস্থায় কোন ব্যবস্থাটি তাহার ক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। যে প্রশ্নটি ঠিয়াছে কোনটি তাহার সকলের চেয়ে াল মীমাংসা।

এই আবিষ্কারের কার্যে বুদ্ধিকে য়োজিত করিয়া মানুষ ক্রমশ এমনভাবে য়ী হইয়াছে যে, প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকেও ন করায়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

মানুষই বিজ্ঞানশাস্ত্রের সৃষ্টিকর্তা। য নিয়মে জগৎ পরিচালিত হইতেছে াহার গূঢ় রহস্য অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ রিবার চেষ্টা হইতেই বিজ্ঞানশাস্ত্রের উৎপত্তি। বিজ্ঞানের একটি বিশেষ রূপ সত্যানুসন্ধান। সেই সত্যানুসন্ধান যেমন জড়পদার্থে, যেমন শারীর বিজ্ঞানে, শরীর সম্বন্ধে তথ্য আবিষ্কারে এবং শরীরের ক্ষয় ও ক্ষতি নিবারণের প্রচেষ্টায়, সেইরূপ মনোবিজ্ঞানে মানসিক রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টায় নানাভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে।

বুদ্ধির দ্বারা মানুষ অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে বটে, কিন্তু জীবনের প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটনের শক্তি বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এমন অনেক 'কেন' আছে বুদ্ধি যাহার উত্তর দিতে অক্ষম। কেন মানুষ নিজেকেই নিজে আঘাত দিতে এত ভালবাসে? কেন মানুষ স্বেচ্ছাত্যাগের দুঃখবরণ করে এবং করিয়া আনন্দ পায়? কেন মানুষ শরীরগত জড় প্রয়োজনের নিকট মাথা নত করাটাকে একটা অপমান বলিয়া মনে করে? কেন মানুষ নিজের নিরাপদ আশ্রয় নিজেই ভাঙিয়া বিপদে ঝাঁপ দিতে এত আগ্রহ প্রকাশ করে? নিরন্তর মৃত্যুভয়ে ভীত মানুষ কেন যে প্রাণ বাঁচাইয়া রাখা নয় বরং প্রাণ দিতে পারাটাকেই নিজের সর্বাপেক্ষা বেশী লাভ বলিয়া মনে করে, বুদ্ধি এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না।

সকল দেশের ধর্মসম্প্রদায়েই কৃচ্ছ্র-সাধন ধর্মসাধনার একটি বিশেষ অঙ্গ বলিয়াই পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশে জলের মধ্যে অবগাহন করিয়া তপস্যা, অগ্নি পরিবেষ্টিত হইয়া তপস্যা, গলিত পত্র ভক্ষণ করিয়া তপস্যা, এমন কি বায়ুভক্ষণ করিয়া তপস্যা, এই-রূপ অনেক কঠোর তপস্যার বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। সেগুলি অতিরঞ্জিত বলিয়া ধরিয়া লইলেও তাহার মধ্যে সত্যও যে অনেকটা আছে তাহাতে ভুল নাই। অনাহার, শীতাতপ সহ্য করা এবং সংযমের দ্বারা সকল রকম প্রবৃত্তি জয় করা এগুলি সাধুর লক্ষণ। ইউরোপে ক্যাথলিক যুগেও এইরূপ অনেক কৃচ্ছ্র সাধনের উদাহরণ আছে। সেণ্ট টেরেসা তাঁহার আত্ম-জীবনীতে লিখিয়াছেন, সেণ্ট পিটার দিন ও রাত্রির মধ্যে দেড়ঘণ্টা মাত্র ঘুমাইতেন। যেটুকু ঘুমাইতেন তাহাও বসিয়া বসিয়া, কখনও তিনি শয্যায় শয়ন করিতেন না। মাঝে মাঝে একসঙ্গে অনেকদিন উপবাস করিতেন। এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধনের আদর্শই তখনকার দিনের ক্যাথলিকের একটি বিশেষ ধর্মসাধন প্রণালী ছিল। বীর নাইট টেম্পলারগণ ক্রুসেডের ধর্মযুদ্ধে প্রাণদান করাই সর্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। পরে প্রোটেস্টাণ্টগণ এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধনের প্রথাকে নিছক পাগলামি বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, দেহের উপর এইরূপ অযথা নিষ্ঠুরতা করিয়া কোনই লাভ নাই। ধর্ম-সাধনে কঠোরতা পরিত্যক্ত হইলেও মানুষ অন্য দিক দিয়া একাল পর্যন্ত নানাভাবে নিজেকে সেইরূপ দুঃখকষ্ট স্বীকাররূপ পাগলামির পথেই নিযুক্ত করিয়াছে এবং করিতেছে।

গৌরীশংকর শৃঙ্গে উঠিবার চেষ্টা, উত্তর মেরুতে অভিযান অথবা ষাট সত্তর ঘণ্টা জলে অনবরত সাঁতার দেওয়া, পদ-ব্রজে পৃথিবী ভ্রমণ প্রভৃতি কার্যও কি এক হিসাবে নিরর্থক পাগলামি নয়? রাশিয়ার সম্ভ্রান্ত বংশের অভিজাত সন্তানগণের নিহিলিস্ট দলে যোগ দিয়া নানাভাবে কঠোর ক্লেশ স্বীকার, সাইবেরিয়ায় নির্বাসন ও মৃত্যু বরণ করিয়া লওয়া সেও কি এক হিসাবে পাগলামি নয়? সেও কি যে গাছে বসিয়া আছি সেই গাছেরই মূলো-চ্ছেদনের চেষ্টা নয়? ইউরোপের ধর্মসাধনে কৃচ্ছ্রসাধন ও সন্ন্যাসের যুগ উঠিয়া যাইবার পর যেন প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তিগত

সুখবাদের বন্যা প্রবলভাবে প্রবাহিত হইল। অপরের সুখদুঃখের দিকে দৃষ্টি-মাত্র না করিয়া আরাম ও বিলাসিতাময় জীবনযাপন করাই স্বাস্থ্যবান মনের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইল। পৌরুষ ও বীরত্বের আদর্শের স্থানে ভোগবিলাস এমনভাবে প্রাধান্য লাভ করিল যে, ধর্ম-সাধনের পথ ও তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিল না। সে সময়ের একখানি ধর্ম সম্বন্ধীয় পত্রিকায় লেখা হইয়াছিল, "When a church has to be run by oysters, ice-creams and fun, you may be sure that it is running away from christ." অর্থাৎ যখন কোন ধর্মসম্প্রদায় সুরসাল ঝিনুক ও আইসক্রীম ভক্ষণ ও হাস্যকৌতুকের দিকেই ধাবিত হয় তখন ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে, তাহারা খৃষ্টের দিক হইতে বিপরীত দিকে চলিতেছে।

কিন্তু দেখা যায়, সুখ, আরাম ও বিলাসিতার দিকে মানুষের মনে প্রবল আকর্ষণ থাকিলেও মানুষের মনের গতি সে পথে নয়। সেরূপ হইলে মানুষ পরস্পর পরস্পরের জন্য ত্যাগস্বীকার করিতে প্রবৃত্ত হইত না, পরিবার গড়িয়া উঠিতে পারিত না, সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারিত না, এমন কি রাষ্ট্রও গড়িয়া উঠিতে পারিত না। যাহারা সুখ ও সম্পদ ও সৌভাগ্যের আশীর্বাদ লাভ করিয়াছে, ব্যক্তিগত জীবনে যাহাদের কোন দুঃখ বা অভাবই সহ্য করিতে হয় নাই পৃথিবীর ইতিহাস তাহাদের সম্মুখে অগ্নিময় অক্ষরে ধরিয়া রাখিয়াছে সেই সকল চিত্র—মানুষের জীবনে যেসকল বিয়োগান্ত ঘটনা নিয়তই ঘটিয়া থাকে। মানুষের জীবনব্যাপী যে-সকল দুঃখকষ্টের বিবরণ মানুষের জীবনের ইতিহাসে আছে; মানুষকে যেভাবে মরিতে হইয়াছে;—শীতে জমিয়া মরা, জলে ডুবিয়া মরা, অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মরা, হিংস্র জন্তুর দ্বারা হত হওয়া এবং ততোধিক নিষ্ঠুর মানুষের দ্বারা নির্যাতিত ও হত হওয়া, দুরারোগ্য রোগে মরা, অনাহারে মরা, এইরূপে নানা কষ্টকর মৃত্যু এবং জীবিত থাকিয়াও মরণাধিক কষ্ট ও যন্ত্রণা মানুষ সহ্য করিয়াছে। সুখ বিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়াও মানুষ সেইজনাই সুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, দুঃখের দিকে তাহার মনের গভীরতম প্রদেশে যেন এক নিগূঢ় আকর্ষণ থাকে। নিজে সুখী হইয়াও অপরের দুঃখের কথা তাহার মনের গভীরতম প্রদেশে নিরন্তর জাগ্রত থাকে।

ডারউইন তাঁহার বিবর্তনবাদে "সামাজিকতা বোধ" অর্থাৎ অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকারের প্রবৃত্তিকেই মনোবিকাশের প্রথম সোপান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ক্রমবিকাশটি কি? জড় হইতে ক্রমশ বিকাশ হইতেছে উদ্ভিদ, নিম্নপ্রাণী, অনুভূতিসম্পন্ন প্রাণী এবং তাহার পরে মনুষ্য। যেন এক মহান প্রাণশক্তি জড়কে অতিক্রম করিয়া ক্রমশ ব্যক্তিগত আত্ম-চেতনার মধ্য দিয়া সংগ্রামশীলতা ও ক্রম-বর্ধমান স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতেছে। আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক প্রফেসার জি টি ল্যাড, যিনি একাধারে দার্শনিক ও ভগবদ্ভক্ত, তাঁহার একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"Evolution itself can not even be conceived of expect in connection with the postulate of some Unitary Being, immanent in the evolutionary process which reveals its own nature by the nature of the idea which in fact is progressively set in to reality by the process."

অর্থাৎ ক্রমবিকাশটা যে কি তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারি না, যদি আমরা ধরিয়া না লই যে কোন মহান পুরুষ এই ক্রমবিকাশের গতির মধ্যে মিশিয়া রহিয়াছেন এবং যিনি তাঁহার নিজের প্রকৃতিই প্রকাশ করিতেছেন ভাবের মধ্য দিয়া যাহাতে এই বিবর্তনবাদের গতির দ্বারা অগ্রগমনশীলতা জাগতিক বাস্তবিকতার মধ্যে স্থাপিত হইতেছে।

পৃথিবী যেন একটা নিয়মের তালে তাল রাখিয়া চলিতেছে, অকস্মাৎ কিছু হইতেছে না।

বিবর্তনটা সেইরূপ তালে তাল রাখিয়া চলা। মানুষের বিকাশ প্রথমত জ্ঞানের দিক দিয়া, তাহার পরে ভাবের দিক দিয়া। বিবর্তনগতি যেন একটা আত্মিক স্বাধীনতাকে ক্রমশ প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতেছে। নিম্নপ্রাণীদের মধ্যেও ব্যক্তিত্ব-বোধ আছে। কিন্তু সে জ্ঞানটা ধোঁয়ার ন্যায় অস্পষ্ট, আগুনের ন্যায় পরিস্ফুট নয়। নিম্নপ্রাণীর ব্যক্তিত্ববোধ তাহাদের কাছে এমন একটা অন্ধ অনুভূতি যাহার মধ্যে আলোকের রশ্মি নাই। আরও আমরা দেখিতে পাই মানুষ যেমন নিজের অহং-বোধ ও বীরত্ব আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিয়াছে অন্যপ্রাণী তাহা করিতে পারে নাই। সেইজন্য মানুষের পক্ষে যেমন অনন্ত উন্নতির পথ উদ্ঘাটিত হইয়াছে, অন্য প্রাণীর তাহা হয় নাই। মানুষ যে বীরত্ব ও সাধনায় অন্য প্রাণী অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ, প্রাণীতত্ত্ববিদগণের মতে তাহার বিশেষ একটা প্রমাণ এই যে, মানুষ সমস্ত পৃথিবীতেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে অন্য কোন প্রাণীই সেইরূপ সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে নাই। মানুষের আদিম প্রবৃত্তিসমূহ এখনও তাহার ভিতর সতেজ ভাবেই রহিয়াছে। কিন্তু সে আর জন্তুর মত দ্বিধাহীনভাবে প্রবল প্রবৃত্তির বশে চলিতে পারে না কেন না তাহার মধ্যে এখন নূতন একটি ভাব জাগ্রত হইয়াছে, সেটি উচিত ও অনুচিত সম্বন্ধীয় বিচারবুদ্ধি। আগে যেখানে কেবল এই প্রশ্ন ছিল—"কি আমার প্রয়োজন?" এবং "কি আমি চাই?" এখন সেখানে নূতন প্রশ্ন উঠিয়াছে, "কি আমার চাওয়া উচিত?" এই প্রশ্ন হইতে ইহা বুঝা যায় যে, মানুষ নিজের স্বাধীনতা সম্বন্ধে অধিকতর সজাগ হইয়াছে। "যদিও আমার প্রবৃত্তি আমাকে চাহিবার পথেই টানিয়া লইতে চায়, তথাপি আমার মধ্যে এমন স্বাধীনতাও আছে যে, অনুচিত বুঝিলে আমি সেই প্রবৃত্তিকে দমনও করিতে পারি।" স্বাধীনতার বিকাশে এই ভাবই মানুষের মনে অভ্যুদিত হইয়াছে।

মানুষ আজন্ম যোদ্ধা। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন অনবরত যুদ্ধের মধ্য দিয়াই বিকশিত হইতেছে। মানুষ নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও অহরহ সংগ্রামশীল। তাহার নিজের ভিতরে বাধা এবং বাধা কাটাইয়া উঠিবার শক্তি, দুইই রহিয়াছে। তাহার নিজেকেই নিজে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। আর ভাঙ্গিয়া গড়িবার কার্যে সে জানিয়া বা না জানিয়া প্রতি ক্ষণে বা প্রতি মুহূর্তেই ব্যাপৃত রহিয়াছে।

সামাজিক জীবনেও মানুষকে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। যুগে যুগে সামাজিক পরিবর্তন প্রয়োজন হয় এবং যুগে যুগে সেই পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামেরও প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রীয় জীবনেও বহু বিপ্লবীর প্রাণোৎসর্গের ফলে পরিবর্তনের মধ্য দিয়া নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এক কথায় ইহাই বলা যায় যে, মনুষ্যেতর প্রাণী প্রকৃতি পরিচালিত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছে আর মানুষ সংগ্রামের মধ্য দিয়াই বিকাশের পথে চলিয়াছে। ইতিহাসে আমরা যে সকল রাষ্ট্র বিপ্লবের বিবরণ পাই, মনে হয় সেগুলি যেন এমন এক একটা প্লাবন যাহাতে সমস্ত পৃথিবী একেবারে ওলট পালট হইয়া গিয়াছে। একটা ভাঙ্গন, যেন নূতন গঠনের জন্য সবই ভাঙ্গা হইতেছে, তাহাও ভাঙ্গা হইতেছে, মনও ভাঙ্গা হইতেছে। কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ, যে যুদ্ধে অর্জুনের রথে স্বয়ং ভগবান সারথি, সে যুদ্ধ স্বরূপে এরূপ একটি মহাপ্লাবন। বিপ্লবের এই মহা পরিবর্তন এমনভাবে সাধিত হয় যেন সর্বস্রষ্টা ভগবানের নিজের হাতেই ইহাতে রহিয়াছে। ইহা যেন ভগবানের সাক্ষাৎ প্রকাশ, কিন্তু অতি ভীষণ প্রকাশ, অতি নিষ্ঠুর প্রকাশ। গীতার একাদশ অধ্যায়ে অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনে এই ভীষণ প্রকাশেরই বর্ণনা আছে। বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন যে ভীষণ রূপ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "হে প্রভু! এই ভয়ঙ্কর রূপ আমি আর দর্শন করিতে পারিতেছি না। তুমি আমার উপর কৃপা করিয়া আবার সেই সৌম্যমূর্তি ধারণ কর।" ভগবান তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "এই রূপটিই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ।"

মানুষ সৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধি ও অনুভূতির অধিকারী প্রাণী। প্রাণী জগতে বহু নিম্নপ্রাণী অপূর্ব সৃষ্টিকৌশল ও সামাজিকতা বোধের পরিচয় দিয়াছে। মৌমাছি ও পিপীলিকা প্রভৃতির নির্মাণ কৌশল অতি অদ্ভুত, শ্রমজীবী পিপীলিকা ও মৌমাছি নিজ সমাজের জন্য যেভাবে ত্যাগ স্বীকার করে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। কিন্তু এ সকলই তাহারা সহজাত সংস্কারের দ্বারা পরিচালিত হইয়া যন্ত্রের মত করিয়া যায়, সেইজন্য তাহাদের কার্যের ভিতর ভুল বা ত্রুটির চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। কিন্তু মানুষ নিজের জীবনে পদে পদে ভুল করিতেছে আবার সেই ভুল সংশোধনের জন্য প্রাণপণ করিতেছে। তাহার তীক্ষ্ম বুদ্ধি তাহাকে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন করিতেছে, তথাপি মানুষ পরার্থে অথবা কোন মহান্ কার্য সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেছে। মৃত্যুভয় সহজাত সংস্কারে প্রাণী মাত্রেরই ভিতর আছে, কিন্তু মানুষের মধ্যে কেবল মৃত্যুভয় নয়, সর্বদাই একটা অবসানভীতি তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। দিনরাত তাহার মনে 'গেল, গেল' এই ভাব—ধন গেল, মান গেল, পদমর্যাদা গেল ও প্রাণ গেল। ভয়ে মানুষ লোকের উপাসনা করে, সমাজের উপাসনা করে, রাজার উপাসনা করে এবং ভয়েই মানুষ ভগবানের উপাসনা করে।

আবার সেই মানুষ সমস্ত ভয়ের বাধা পদদলিত করিয়া যেন অনায়াসে জীবন উৎসর্গ করিতেছে। মানুষে ব্যক্তিত্ব পূর্ণ বিকশিত, কিন্তু কেবল ব্যক্তিত্ব নয় সমষ্টির সহিত সংযোগের অনুভূতি তাহার জীবনের সহিত ওতঃপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। মানুষ নিজে যতই ভীরু হউক না কেন, ভীরুকে সে শ্রদ্ধা করিতে পারে না। এই পৃথিবী যেন একটি সাহস ও বীর্যের নাট্যশালা। বীরত্বের মধ্যেই যেন মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু সংগুপ্ত রহিয়াছে। প্রত্যেক মানুষের মনেই ভোগসুখের দিকে তীব্র আকর্ষণ রহিয়াছে কিন্তু যিনি ভোগসুখ তুচ্ছ করিয়া ত্যাগ বরণ করিয়াছেন মানুষ তাঁহাকেই পূজোর সম্মান দান করিয়াছে।

একটি লোকের অন্যদিকে যতই দুর্বলতা থাকুক না কেন, যদি সে যে কর্মসাধনের ভার নিজের জন্য নির্বাচন করিয়া লইয়াছে তাহার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত হয় এবং সেই মৃত্যু সে হাসিমুখে বরণ করে, তাহা হইলে এই ঘটনাটিই তাহাকে আমাদের নিকট চিরকালের জন্য পবিত্র করে। আমাদের অপেক্ষা যে কোন বিষয়েই সে হীন হউক না কেন, তবুও আমরা জীবনটা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিলাম, আর সে জীবনটা যেন কিছুই গ্রাহ্য করে না, এইভাবে একটা ফুলের মত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে পারিল; কেবল ইহাতেই আমরা অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে তাহাকে জন্মগত শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করি।

মানুষের মনের মধ্যে পরাজয় না মানিবার দুর্জয় সাহস ও স্বাধীনতা-

বোধের প্রতি যে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধাই তাহাকে নিজে সাহসী না হইলেও সাহসই যে প্রকৃত মানুষের লক্ষণ ইহা স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। মানুষ জানে তাহার জীবন সীমাবদ্ধ, তথাপি মানুষ অনন্ত জীবনের স্বপ্ন দেখিতেছে। যদি মানুষকে কোন বাধার সম্মুখীন হইতে না হইত যদি মানুষ শান্তত্ব ও অনন্তত্ব এই উভয় ভাবের আধার না হইত, পদে পদে শান্তত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া, বাধার সহিত সংগ্রাম করিয়া, যুদ্ধ করিয়া এবং পরাজিত হইয়া জীবন সংগ্রামের পথে ও অনন্তত্বের উপলব্ধির পথে তাহাকে অগ্রসর হইতে না হইত, যদি পৃথিবী স্বর্গ হইত এবং মানুষ দেবতা হইত তাহা হইলে 'মনুষ্যত্বের সাধনা' বলিয়া কোন কথাই থাকিত না। তাহা হইলে সেই মনুষ্যত্ব-মহিমা থাকিত না যাহা শত পরাজয়েও হার মানে নাই, অন্ধকারের তমোময় গহ্বরেও স্বর্গের স্বপন যাহাকে আশা ও আনন্দে সজীব করিয়া রাখে।

মানবে ব্যক্তিত্ব পূর্ণ বিকশিত। কিন্তু মানব শিশু কেবল ব্যক্তিত্ব লইয়াই জন্ম-গ্রহণ করে না, জন্মের সময় সে পরিবারে জাতিতে ও বিশ্বমানব-জগতে জন্মগ্রহণ করে। এবং সে কেবল জড় জগতে নয় ভাবের জগতেও জন্মগ্রহণ করে।

কেননা সন্তান জন্মগ্রহণ করে মায়ের ক্রোড়ে। যে দিন শিশু জরায়ুর অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া পৃথিবীর আলোকে প্রথম নয়ন উন্মীলন করে তখন ভালবাসার জীবন্ত মূর্তি মায়ের মুখই তাহার সম্মুখে প্রথম প্রকাশিত হয়। এতদিন সে মায়ের দেহের যেন একটি অংশস্বরূপ হইয়া ছিল, কিন্তু মায়ের সহিত তাহার পরিচয় ছিল না। জননী হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর জন্মগ্রহণের স্বাধীনতা যে ব্যক্তিত্ব তাহাকে দান করিল সেই ব্যক্তিগত চেতনার মধ্য দিয়াই মায়ের ও সন্তানের পরস্পরের মধ্যে এক ভাগবত সংযোগ হইল। মা ও সন্তান এই সম্বন্ধ-বন্ধনের মধ্য দিয়া এক নব জগৎ সৃষ্ট হইল।

মায়ের দৃষ্টির আলোকেই সন্তানের পৃথিবীর সহিত প্রথম পরিচয়। না বুঝিয়াও অবোধ শিশুর মনে এই ভাব মুদ্রিত হইয়া গেল জীবনে তাহার যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন মায়ের সান্নিধ্য ও মায়ের ভালবাসা।

মায়ের ভালবাসার ভিতর দিয়া শিশু যে জগতের সহিত পরিচিত হইল সেটি কেবল দৃশ্যমান জড় জগৎ নয়, সেটি ভাবের জগৎ, প্রেমের জগৎ, ত্যাগের আনন্দে পরি-পূর্ণ এক আনন্দ-অনুভূতিময় জগৎ। পারিবারিক প্রীতিবন্ধন সেই জগতেরই পারিপার্শ্বিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত। মায়ের যে কতখানি ত্যাগ তাহা পরিমাপ করা সম্ভব নহে এবং সে ত্যাগ এমন অনায়াস-ত্যাগ যে তাহাকে ত্যাগ বলিয়াই মনে হয় না। জড় দেহের যত কিছু দাবী—ক্ষুধা, তৃষ্ণা নিদ্রা ও আরাম, জননী সে সমস্তই এমন অনায়াসে উপেক্ষা করেন যে মনে হয় সেইটিই যেন মায়ের স্বাভাবিক আচরণ। জননী যদি দুর্বলা অথবা ভীরু-স্বভাবা হন তথাপি প্রয়োজন হইলে সন্তানের কল্যাণের জন্য তিনি সকলপ্রকার শক্তি ও সাহসিকতার কার্য করিতে পারেন।

মানুষ জড় জগতে থাকিয়াও ভাব-জগতের অধিবাসী। শিশু শৈশব হইতেই কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করে। উপকথার ভিতরে যে সকল কাহিনী আছে তাহাতে অসম্ভবকে সম্ভব করা হইয়াছে। যে সব কাহিনীতে সাত-সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া রাজপুত্র বহু দূরদেশে যাত্রা করিয়া অসাধ্য সাধন করিতেছে, মরা মানুষ বাঁচিয়া উঠিতেছে—দৈত্য ও রাক্ষসের দেশে গিয়া লড়াই করিয়া বালক বীর জয়লাভ করিতেছে—এই সমস্ত উপাখ্যান আছে, আর এই কাহিনী কেবল শিশুকেই নয় বয়স্কগণেরও চিত্তবিনোদন করে, কেননা এই সব কাহিনীতে সেই সব কথাই আছে মানুষের যাহা আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

বাহিরের দিক দিয়া দুর্জয় সাহস, স্বাধীনতার স্পৃহা ও জয়ী হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা মানুষকে যেমন দুঃসাহসিক কার্যে এবং সর্ববিধ ত্যাগ-স্বীকারে প্রবর্তিত করিয়াছে, অন্তরের দিক দিয়া আবার পরস্পরের প্রতি আত্মীয়তাবোধ ও ভালবাসা মানুষকে ত্যাগের পথে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়।

'প্রেম' এই মহাশক্তির প্রভাবে, এই অমৃতরস আস্বাদনে বলশালী হইয়া সাধারণ মানুষও অসাধারণ মহিমায় মহিমান্বিত হয়।

বহুদিন পূর্বে কবি চণ্ডীদাস নানা ভাবে প্রেমের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন তিনি বলিয়াছেনঃ—

"চণ্ডীদাসের বাণী শুন বিনোদিন
পীরিতি বিষম কথা।
পীরিতি লাগিয়া পরাণ ত্যজিলে
পীরিতি মিলয়ে তথা।"

অর্থাৎ মরণকে বরণ করিবার সাহসে প্রেমের পরীক্ষা হয়।

স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেনঃ—

"শুন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে
সত্য সার
তরঙ্গ-আকুল ভব ঘোরে এক তরী
করে পারাবার
সেই তরণীটি কি?—না,
প্রেম, প্রেম, এই মাত্র ধ
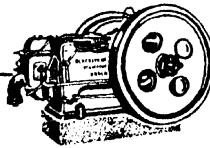
"ছাড় বৃথা যাগ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন
প্রেম সে সম্বল।
"হের শিক্ষা দেয় পতঙ্গম অগ্নিশিখা করি
আলিঙ্গন।

মানুষের জীবনে নীচতা ও ক্ষুদ্রতা আছে, —উপনিষদ বলিয়াছেন, "অবিদ্যার মধ্য দিয়াই বিদ্যায় উত্তীর্ণ হইবার পথ। যে অবিদ্যাকে এড়াইয়া বিদ্যালাভ করিতে চায় সে ততোধিক অন্ধতমসায় পতিত হয়।"

মানুষ কর্মের পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইয়াছে, গীতা বলিয়াছেন, "কর্ম আর অকর্ম বুঝা বড় কঠিন, বুদ্ধির দিক দিয়া বুঝা যায় না। যাহাকে ভাল কর্ম বলিয়া মনে করি তাহার মধ্যেও অকর্ম আছে, আবার অকর্মের মধ্যেও কর্ম থাকে। এমন অবস্থায় একমাত্র উপায় যজ্ঞের জন্য কর্ম করিয়া যাও। যজ্ঞের জন্য যে ভাবেই কর্ম কর তাহাতে কোন দোষ হইবে না, কিন্তু

"যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম-
বন্ধনঃ।"

কিন্তু অন্যভাবে যে কর্মই কর না কেন তাহা মুক্তির উপায় না হইয়া বন্ধন স্বরূপ হইবে। "যজ্ঞের জন্য কাজ কর, প্রভুর জন্য কাজ করিয়া যাও, পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে না, যেমন পদ্মপত্রে জল স্পর্শ করে না।"

এই 'যোগ' ও 'যজ্ঞ' বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সকলের অপেক্ষা কোন এক মহত্তর আদর্শকেই বুঝায়।

অর্জুন যখন যুদ্ধের নানা দোষ দেখাইয়া নীতির দিক দিয়া যুদ্ধ বর্জনই উচিত বলিতেছেন, ভগবান সেকথাগুলি ধর্তব্যের মধ্যেই ধরিলেন না। স্পষ্টই খোলাখুলিভাবে বলিলেন যে, অহং বুদ্ধি হইতে কাজ না করিয়া যে সব কাজ করা হয় সেগুলিতে কোনই দোষ থাকে না। যাহার মন অহং বুদ্ধিতে লিপ্ত নয় হত্যা করিলেও তাহার হত্যা করা হয় না। বৈষ্ণবদর্শন বলিয়াছেন, "কামকেই কৃষ্ণ-প্রেমে পরিণত কর।" এই সব উক্তির তাৎপর্য এই যে, বিকাশ দুই দিক দিয়া হইতেছে। এক প্রেমের দিক দিয়া, যোগের দিক দিয়া। আর এক সংগ্রামের দিক দিয়া, বিয়োগের দিক দিয়া এবং ক্ষুদ্রত্বকে ছাড়িয়া বৃহত্বকে ধরিবার দিক দিয়া অথবা যাহা ক্ষুদ্র তাহাকে বৃহতে পরিবর্তিত করিয়া লইবার দিক দিয়া। কিন্তু আসলে দুই দিকই এক।

মানুষ নিয়ম ভাঙ্গিয়া বিপ্লব করে। এই ভাঙ্গার কার্য দুই ভাবে হয়। এক উচ্ছৃঙ্খলতার দিক দিয়া ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির দিক দিয়া, আর এক বন্ধনমোচনের দিক দিয়া, মনুষ্যত্বের দিক দিয়া। আবার মানুষ দুইভাবে মানিয়া চলে। এক—দাসসুলভ মনোভাবের দিক দিয়া, আর এক বৃহতে আত্মসমর্পণের দিক দিয়া। এইরকম সে দুই ভাবে ত্যাগ করে। এক—অহঙ্কারের দিক দিয়া, আর এক—প্রেমের দিক দিয়া। আবার সে এইরূপে গ্রহণও দুইভাবেই করে।

বিপ্লবের তালেতালেই পৃথিবীর বিকাশ হইতেছে। ছোট ছোট বিপ্লবের আয়োজনে ধীরে ধীরে বৃহৎ বিপ্লবের আবির্ভাব সম্ভব হইতেছে। দুঃখ আর মৃত্যু না হইলে আমরা প্রকৃত আনন্দের আস্বাদ পাই না। আমাদের শাস্ত্রে আছে যে রুদ্রের কোপানলে মদন ভস্ম হইয়া অতনু হইয়াছিলেন অর্থাৎ মৃত্যুর মধ্য হইতে মদন কাম হইতে প্রেম রূপে পরিণত হইয়াছিলেন।

উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়, নচিকেতা মৃত্যুর নিকট হইতেই অমৃতের তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মে নির্বাণকেই অমৃতের পথ বলা হইয়াছে এবং খৃষ্টধর্মে যীশু খৃষ্ট বলিয়াছেন, "যে কেহ আমার পশ্চাতে আসিতে চায় সে নিজের ক্রুস বহন করুক।" মানুষের জীবন সীমাবদ্ধ। কিন্তু তাহার শান্তত্বের ভিতরে আছে অনন্তত্বের অনুভূতি। তাই মানুষ শান্ত হইয়াও কেবল যে সে শান্তই, মরদেহধারী হইয়াও সে যে মৃত্যুরই অধীন, তাহার অন্তরতম যে ভাব ইহা মানিতে চাহে না তাহাই মানুষের প্রকৃত ধর্মভাব।

চরম সত্য ও চরম সাধুতা, চরম সৌন্দর্য, চরম মঙ্গল ও চরম মাধুর্য এই-গুলি মানুষের আকাঙ্ক্ষিত। এই পথে অগ্রসর হইবার যে সাধনা তাহাই মনুষ্যত্বের সাধনা। যে বেগে বীজ ভাঙ্গিয়া বৃক্ষের বিকাশ হইতেছে, পাখীর ছানা ডিম ভাঙ্গিয়া বাহির হইতেছে এবং সহ-জাত সংস্কারে নিম্ন প্রাণীরা সমাজের জন্য, সন্তানের জন্য আত্মত্যাগ করিতেছে এইটি সেই অগ্রগামিত্বের পথের গতিবেগ।

বিকাশ বলিতে নিজের মধ্যে যে সুপ্ত শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে তাহারই বিকাশ বুঝায়।

সর্বশেষ কথা দেশপ্রেম। যেমন মায়ের ভালবাসাকে কেন্দ্র করিয়া পরিবার ও সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে সেইরূপ দেশপ্রেমকে কেন্দ্র করিয়া জাতি ও রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতেছে এবং মানুষের মনে জাতীয়তার বিকাশ হইতেছে। দেশপ্রেম যে কি বস্তু দেশে থাকিয়াও অনেক দেশবাসী তাহা জানে না। যেমন গর্ভে থাকিয়াও সন্তান মাকে জানে না। তথাপি দেশপ্রেম সেইরূপ সত্য, ভগবৎ প্রেম যেমন সত্য অথবা নীতি যেমন প্রেমের মধ্যে গিয়া সত্য হয়, সেইরূপ সত্য। আমাদের স্বাধীন ব্যক্তিত্ববোধ যখন জাতীয়ত্ববোধের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন আমরা নিজেকে জাতির একজন বলিয়া অনুভব করি তখন প্রকৃত দেশপ্রেম যে কি তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি। পৃথিবীতে যত যত মহাবিপ্লব ঘটিয়াছে, সেই সমস্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়াই আমরা জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের প্রেরণা দেখিতে পাই। কি সামাজিক বিপ্লব, কি ধর্ম-নৈতিক বিপ্লব অথবা রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব, সমস্তের মূলেই দেশকে বা জাতিকে মন্দ হইতে ভালর দিকে লইয়া যাইবার একটা আপ্রাণ চেষ্টা এবং সেই চেষ্টার মধ্যে পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ। ব্যক্তিত্বের দিক দিয়া যে সকল সংস্কার আমরা ছাড়িতে পারি না জাতীয়তাবোধের দিক দিয়া সে সমস্ত অনায়াসেই ঠেলিয়া যায়। বস্তুত দেশভক্তির মধ্য দিয়াই বিশ্বপ্রেম অনুভব করা যায়, তাহা না হইলে বিশ্বপ্রেম আকাশকুসুম মাত্র।

আলোচনা

"পূর্ব বাংলার সমসাময়িক সাহিত্য"

বিনয় নিবেদন,

গতবারের মতো এবারেও আপনারা বিশেষ সাহিত্যসংখ্যা প্রকাশ করে সাহিত্যানুরাগীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। আপনাদের এ উদ্যম প্রশংসনীয়। আধুনিক বাংলা কবিতার প্রতি আমাদের দেশের বেশির ভাগ পাঠকই বিমুখ। তাই মনে হয় পৃথকভাবে বিশেষ কবিতা সংখ্যা প্রকাশ করা আরো প্রয়োজন। এতে করে কবিতা জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। আশাকরি, আপনারা এদিকেও সচেষ্ট হবেন।

সাহিত্যসংখ্যা হাতে পেয়ে প্রীত হয়েছি। পূর্ববঙ্গবাসী হিসেবে আরো খুশি হয়েছি, যেহেতু এবারে পূর্ব বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কীয় আলোচনা সংকলিত হয়েছে। অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকীর "পূর্ব বাংলার সমসাময়িক সাহিত্য" প্রবন্ধটিই আমার বিশেষভাবে আলোচ্য-বিষয়। এক কথায় বলতে গেলে তাঁর প্রবন্ধটি পড়ে হতাশ হয়েছি। তিনি আমাদের তরুণতর কবিদের মধ্যে একটা বিশেষ আসনের অধিকারী। তাই তাঁর কাছে আমরা প্রতিনিধিমূলক আলোচনাই আশা করেছিলেম, বিশেষ করে কবিতা সম্পর্কে। আমার মনে হয়, তাঁর আলোচনাটি ভালোই হতো, যদি না আন্তরিকতার অভাব থাকতো। তাঁর আন্তরিকতায় সন্দেহ স্বভাবতই জাগে যখন দেখি, তিনি কবি ও কবিতার নামোল্লেখেও ভুল করেন। এই যেমন, আবদুর রসীদ খানের "উল্লাপাড়া স্টেশনে" কবিতাটিকে তিনি উল্লেখ করেছেন, "উল্লাপাড়া স্টেশনে এক রাত্রি" নামে। তার উপর কবিতাটি ১৩৫৮-এর আষাঢ় সংখ্যা কবিতায় বেরিয়েছিলো; ১৩৫৬ সালের 'কবিতা' পত্রিকায় ওধরণের কোনো কবিতা প্রকাশিত হয়নি। আর সামছুর রহমান নামের কোনো কবি পূর্ব বাংলায় নেই। যিনি আছেন তাঁর নাম হলো শামসুর রাহমান। এবং ১৩৫৩ সালের 'কবিতা' পত্রিকায় এর কোনো কবিতা বেরোয়নি। এমনকি সে সময়ের 'কবিতা'র কোনো সংখ্যায় ঐ নামের কোনো কবির কোনো কবিতা বেরোয়নি। সুতরাং প্রবন্ধ লেখকের সামান্যতম ভুলটি বিভ্রাট সৃষ্টি করেছে। সুতরাং কবির নাম অন্তত শুদ্ধ ভাবে লিখিত হওয়া উচিৎ ছিলো। প্রবন্ধ লেখক কবি রাহমানের কোন দুটি কবিতার কথা বলতে চান ঠিক বোঝা গেলো না; কেননা সামসুর রাহমানের দুটি কবিতা ১৩৬০-এর আষাঢ় সংখ্যা 'কবিতা' পত্রিকায় বেরিয়েছে আবার 'আশ্বিন' সংখ্যাতেও। সুতরাং কোন দুটি কবিতার কথা বলতে চান প্রবন্ধ লেখক? সম্ভবত, তিনি আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত 'মনে-মনে' ও 'তার শয্যার পাশে' কবিতা দুটির কথা বলতে চেয়েছেন।

পূর্ব বাংলার অন্যতম কবি কর্মী আবুল হোসেন সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন —"......আবুল হোসেন এখনও মধ্যে মধ্যে দু'একটি লেখা ছাপেন; কিন্তু সে প্রাণ বুঝি 'নব বসন্তে'র পর উত্তর বসন্তে বিলীয়মান।" এই উক্তি দিয়ে কি বোঝানো হয়েছে বোঝা গেলো না। আমরা তো জানি কয়েক বছর আগে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট কিছু কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিলো আবুল হোসেনের 'নববসন্ত' প্রথম কাব্যগ্রন্থ। আবুল হোসেন বরং 'নববসন্তে'র পরেই কিছু সংখ্যক ভালো কবিতা লিখেছেন। এমন কি বছর দুই আগেও তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা বেরিয়েছে। 'শেষ যুক্তি', 'স্বদেশী কোরাস', 'বন্ধুর জন্য' প্রভৃতি। এই সব কটিই 'পূর্বাশা'য় প্রকাশিত।

আবুল হোসেন, আহসান হাবীব প্রভৃতির ঠিক পরেই এলেন সানাউল হক ও হাবীবুর রহমান। প্রবন্ধ লেখক হাবীবুর রহমানের উল্লেখ করেছেন, অথচ সানাউল হকের নাম বাদ পড়েছে, কিন্তু কি কারণে? সানাউল হক বর্তমানে খুব কম লিখছেন বলেই কি? এই তো বছর দুই আগে সানাউল হক "আমন্ত্রণ-শ্যামলীকে" (ঈদ সংখ্যা 'সংবাদ' ১৩৫৯), 'ইতিহাসোত্তর' (আজাদী সংখ্যা 'সংবাদ' ১৩৫৯), 'পুরোনো কথা' (আজাদী সংখ্যা 'সংবাদ'—১৩৬০) প্রভৃতি কবিতা লিখেছেন। 'ইতিহাসোত্তর' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কবিতা।

তারপর মিঠি হাত নিয়ে সানাউল হক ও হাবীবুর রহমানের পাশে এসে দাঁড়ালেন প্রবন্ধ লেখক স্বয়ং। আশা ছিলো কবিতায় তিনি নিজের কথা নিজের করে বলতে পারবেন। কিন্তু তাঁর অনুকরণ প্রিয় মন তাঁকে এগুতে দেয়নি। তাঁর কাব্য গ্রন্থের 'ট্রেন' কবিতাটি আমাদের মুগ্ধ করেছিলো। তিনি এ পর্যন্ত দুটি কি তিনটি ভালো কবিতা আমাদের উপহার দিয়েছেন। সম্প্রতি কবিতা লেখা ছেড়ে তিনি টুংটাং চটুল ধ্বনি শোনাচ্ছেন আমাদের। তবে এর মধ্যে ১৩৬০-এর 'সংবাদ' পত্রিকার আজাদী সংখ্যায় "কুয়াশা" গদ্য কবিতাটি একরকম ভালোই। শ্রম-বিমুখ না হলে অর্থাৎ কবিতার অন্তর বিষয়বস্তুতে নজর রাখলে সিদ্দিকী ভালো কবিতাই লিখতেন। অনুরূপভাবে আবদুর রশীদ খানও পরিশ্রমী হলে আমরা উপকৃত হতুম।

পূর্ব বাংলার তরুণতর কবি-কর্মের সঙ্গে পরিচিত করাতে গেলে, এখন আর মুহম্মদুল ইসলাম, চৌধুরী ওসমান, নূরে মোহাম্মদ, মাহফুজুল্লাহ্ প্রভৃতির উল্লেখ কিছুতেই হতে পারে না বলেই আমি মনে করি। সমালোচকের নিজস্ব দৃষ্টি কোণের মূল্য স্বীকার করেও একথা বলবো; না বলে উপায় থাকে না।—যদি কেউ সামগ্রিকভাবে কোনো দেশের সাহিত্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে সে দেশের যথার্থ লেখক-দের বাদ দিয়ে কথা বলেন, তখন তাঁর বক্তব্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে বৈকি! বিশেষ করে সিদ্দিকী সাহেবের প্রবন্ধে পূর্ব বাংলার সত্যিকারের শক্তিবান অতি তরুণ কবিদের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে, তার জন্যে কাব্যানুরাগী মাত্রই তাঁকে ক্ষমা করতে পারে না। অতি তরুণদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে পূর্ব বাংলার কবি হচ্ছেন, হাসান হাফিজুর রহমান, মাহ্‌মুদ আতাউল্লাহ, সাব, জাফর ওবায়েদুল্লাহ্, মোহাম্মদ কায়সুল হক, আবুল ফজল শাহাবুদ্দীন, হাসান আজিজুর রহমান প্রভৃতি। অথচ এঁদেরই তাঁর প্রবন্ধে ফেরার। আমার আরো আশ্চর্য লেগেছে এই দেখে যে, তরুণতরদের মধ্যে যিনি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখেন সেই শামসুর রাহমানেরও শুধু মাত্র দুটি কবিতার উল্লেখ করেই দায় সারা গোছের কাজ করা হয়েছে।

এর পর আসে গল্প-প্রবন্ধ ও নাটকের কথা। এক্ষেত্রে লেখক মারাত্মক কিছু ত্রুটি করেননি বলেই মনে হলো। শক্তিশালী প্রায় সব লেখকই উল্লিখিত হয়েছেন। তরুণ-তরদের মধ্যে গল্প লেখক হিসেবে আবদুল গাফফার চৌধুরী, মোহাম্মদ উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, হাসান হাফিজুর রহমান, গোপাল বিশ্বাস প্রভৃতির নামোল্লেখ উচিৎ ছিলো। প্রবন্ধে আলাউদ্দিন আল আজাদ, কবির-উদ্দীন আহমদ, বদরুদ্দীন উমর, মুস্তাফা কামাল প্রভৃতি তরুণতরদের মধ্যে কি উল্লেখের দাবী রাখেন না? প্রবীণ প্রবন্ধকার ডঃ হবিবুল্লাহ্‌-র নাম বাদ পড়লো কেমন করে? আর নাটকে মুনীর চৌধুরীর উল্লেখ প্রয়োজন।

শ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর "পূর্ব বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধে যা বলেছেন, তা পূর্ব বাংলার প্রতিটি সংস্কৃতিসেবীর প্রণিধানযোগ্য। এরকম একটি সুষ্ঠু আলোচনার প্রতীক্ষায় ছিলুম। যাঁরা ইসলামী সংস্কৃতির চেহারা হাতড়ে বেড়াচ্ছেন এ প্রবন্ধ পাঠে তাঁরাই বেশী উপকৃত হবেন সেই সঙ্গে 'উৎকট' সাম্যবাদীর দল। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় এ প্রবন্ধটি লিখে এখানকার সংস্কৃতিবানদের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

সব শেষে জানিয়ে রাখি, আপনাদের পত্রিকায় পূর্ব বাংলার সাহিত্য সম্পর্কীয় আলোচনার সূত্রপাত হওয়ায় আমরা খুশি হয়েছি। এবং শুধু মাত্র এই কারণেই আশরাফ সিদ্দিকী ধন্যবাদার্হ।

—সালেহা খাতুন, রাজবাড়ী, ফরিদপুর

উপন্যাস

গোধূলি—নরেন্দ্রনাথ মিত্র। বেংগল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। আড়াই টাকা।

সঙ্গিনী—নরেন্দ্রনাথ মিত্র। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। আড়াই টাকা।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র বর্তমান কালের একজন অগ্রগণ্য লেখক। কাহিনীবিন্যাসের দক্ষতায়, বিষয়বস্তুর নূতনত্বে এবং দৃষ্টিভংগীর নিজস্বতায় সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম আবির্ভাবের মুহূর্তেই পাঠকসমাজের সবিস্ময় দৃষ্টি আকর্ষণে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। সেই বিস্ময় ধীরে ধীরে আগ্রহে রূপান্তরিত হয়েছে এবং সেই ক্রমবর্ধমান আগ্রহের সম্মান রক্ষা করতে শিল্পী হিসেবে যে কখনোই তাঁর কোনো কুণ্ঠা দেখা যায়নি, সে-কথাও অনস্বীকার্য। বক্তব্য এবং বাচনভংগীর মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের দুরূহ নীতিটিকে তিনি সযত্নে আয়ত্ত করেছেন; গতানুগতিক কোনও বিষয়বস্তুর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে সাহিত্যের নিত্যনূতন উপাদান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষারও তাঁর উৎসাহের অন্ত নেই। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা, তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি সাহিত্যকর্মের মধ্যেই একটি গভীর আন্তরিকতার, একটি নিবিড় হৃদয় সংবেদনার উত্তাপ অনুভব করা যায়। এই আন্তরিকতা এবং সহানুভূতি ক্রমেই প্রায় দুর্লভ হয়ে উঠেছে। মুষ্টিমেয় যে কজন লেখক এ দুটি বৃত্তিকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন, শুধুই বাঁচিয়ে রাখেননি, সযত্নে লালন করেছেন, নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁদের অন্যতম।

তাঁর সাম্প্রতিক দুখানা গ্রন্থ 'গোধূলি' আর 'সঙ্গিনী'। দুটিই উপন্যাস। বিষয়বস্তুর দিক থেকেও সমধর্মী। একথার উল্লেখ করবার প্রয়োজন ছিল এই কারণে যে, আলোচ্য গ্রন্থ দুখানির বিষয়বস্তুর থেকেই নরেন্দ্রনাথের সাম্প্রতিক শিল্প ভাবনার একটি দুঃসাহসিক প্রবণতার সন্ধান পাওয়া যাবে। বিষয়বস্তু প্রেম; কিন্তু প্রেম তার মনোহর কোমলকান্ত মূর্তি নিয়ে এখানে দেখা দেয়নি, সে এখানে বেদনাবিক্ষত, আত্মাহংকারী। সমস্ত লাঞ্ছনা, সমস্ত অপমানের মধ্যেও সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে সে তার প্রতিবাদের তর্জনী তুলে দাঁড়িয়েছে। 'গোধূলি'র ইন্দু আর 'সঙ্গিনী'র জয়া, এ দুটি চরিত্রের রূপ-কল্পনায় মূলত কোনও পার্থক্য নেই। জয়ার তুলনায় ইন্দু অনেক নম্রস্বভাবা যদিও, এবং জয়ার আকাঙ্ক্ষাও যদিও অনেক বেশী উচ্চকণ্ঠ, তবুও তাদের মধ্যে একটা মৌল সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। একই বেদনায় বিদ্ধ হয়েছে তারা, সামাজিক বন্ধন এবং অসামাজিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যবর্তী এক অনিশ্চিত হৃদয়বৃত্তির মর্মান্তিক তাড়নায় দুজনেই তারা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। আর তাদের সেই যন্ত্রণাও যে আনন্দবিমিশ্র, এই তত্ত্বটিকে লেখক যে আশ্চর্য নৈপুণ্যে তাঁর এই উপন্যাস দু'খানির মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন,

তাতে অবাক মানতে হয়। মনোবিশ্লেষণে, মানসিক বিভিন্ন প্রবণতার চরিত্রবিচারে, নরেন্দ্রনাথের সমকক্ষ শিল্পী বর্তমান সময়ে খুব কমই আছেন, আলোচ্য গ্রন্থ দু'খানিতে আরও একবার তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

কাহিনীবিন্যাসে লেখকের দক্ষতার উল্লেখ আগেই করেছি। তাঁর গল্প-বলার ভংগীটি মনোরম, হৃদয়গ্রাহী। তাঁর প্রত্যেকটি সাহিত্যকর্মেই কিছু-না-কিছু তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, তথ্যের কষ্টিপাথরে তত্ত্বকে যাচাই করে নেবার সুযোগ দানেও তাঁর কার্পণ্য নেই। চরিত্র বিশ্লেষণেও এ-দুটি উপন্যাসে তিনি পুনর্বার তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

পরিশেষে একটি কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন। 'সঙ্গিনী' উপন্যাসে ইতস্তত তিনি যে সমস্ত ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেছেন, তার মধ্যে অনেকগুলিরই বানান অথবা প্রয়োগ অশুদ্ধ। লেখক হিসেবে এই অশুদ্ধি তাঁর অনবধানতার পরিচয় বহন করছে। ত্রুটিটা সামান্য হলেও পরবর্তী সংস্করণে এর সংশোধন বাঞ্ছনীয়। ৫২০, ৫২১।৫৩

কিশোর সাহিত্য

মৃত্যুহীন প্রাণ—বিমল মিত্র; শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ থেকে প্রকাশিত। মূল্য—১৷৷০।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যে সন্তান আর ফিরলোনা, যে ইহজীবন থেকেও নিঃশেষে অন্তর্হিত হয়ে গেছে—এই ভুল ধারণার উপরে ভিত্তি করে দার্শনিক পিতা নিত্যানন্দ সেন 'পরলোকতত্ত্ব' আলোচনায় নতুন আলোক-সম্পাত করলেন। প্রকৃতপক্ষে সেই পুত্রের প্রাণহানি হয়নি, সে শুধু স্মরণশক্তি হারিয়ে ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের একটি হাসপাতালে ছিলো; ঘটনার অভিঘাতে যখন পুনর্বার স্মৃতিমান হয়ে উঠলো তখন দীর্ঘদাহময় অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সে আবিষ্কার করলো যে তার কল্পিত মৃত্যুর উপরেই শিক্ষা-জগতে তার পিতার সমস্ত প্রখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত। তাই তাকে নিঃস্ব নিরুপায় হয়ে আবার পুরোনো দ্বীপের কেবিনে ফিরে বাঁধা পড়তে হলো। ওকে যদি তোমরা জিজ্ঞেস করো—তোমার নাম কী?—তোমার বাড়ি কোথায়? তোমার বাবার নাম কী?—ও কিছু উত্তর দেবে না, শুধু ফ্যালফ্যাল করে তোমাদের দিকে চেয়ে দেখবে। তোমাদের মনে হবে ও বুঝি স্মৃতি-শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। কিছুই মনে নেই ওর। কিন্তু তা নয়। কিছুই ভোলেনি ও। এই দুর্ভাগা অথচ রোমাঞ্চসঞ্চারী চরিত্রটিকে লেখক এক অপরূপ রহস্যের আবহে ঘিরে রেখেছেন। তার ট্র্যাজিডির পাশে—পিতার দুর্বহ চিত্তগ্লানিকে পিছনে ফেলেও—বিশেষত গোবিন্দ আর ভোম্বল, এ দুটি পার্শ্বচরিত্র পরমাশ্চর্য সংবেদনশীলতায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। লেখক জানেন যে, 'স্টান্টের' জলুস সর্বক্ষেত্রে ফলপ্রদ হয়ে ওঠে না—বরং ফলশ্রুতির ভিতরে অনেক সময় দোলাচল-প্রসূত বিপর্যয় রচনা করে। তাই তিনি ঘটনাবিন্যাসে স্বাভাবিক অথচ আকর্ষণীয় বিশেষত্ব সঞ্চার করেছেন। তবু একটি অসংগতি উল্লেখ না করে পারছি না। রাতুলের বহিরঙ্গ প্রতিরূপ হরিদাস চরিত্রটির প্রয়োজন ছিলো, এ কথা স্বীকার করেও বলবো ভবতোষ লেখকের একটি অবিশ্বাস্য অবতারণা; সে রাতুল ও

হরিদাসের সংগীতসূত্র আদৌ রক্ষা করেনি।

পূর্বোক্ত শৈথিল্যসত্ত্বেও 'মৃত্যুহীন প্রাণ' একটি স্মরণীয় সৃষ্টিকর্মের নিদর্শন। কিশোর-সাহিত্যের অন্তর্গত উপন্যাস শাখায় ঠিক-ঠিক এরকম রচনা অনন্যলব্ধপূর্ব। ছোটোদের জন্য লিখতে গিয়েও লেখক একটি গভীর গাম্ভীর্য বজায় রেখেছেন যার ফলে বয়স্ক ব্যক্তিরাও এই বই পড়ে আনন্দিত হবেন।

পরিশেষে বলবো স্থানে-স্থানে কবিত্বের আভাস থাকায় গ্রন্থটি প্রাণময় হয়ে উঠেছে; লেখক 'মৃত্যুহীন প্রাণ' কোনো তরুণ কবিকে উৎসর্গ করে খুব সম্ভব তারই সচেতন সমর্থন জানিয়েছেন।

১৪৩।৫৪

রবীন্দ্র-চর্চা

ঋষি রবীন্দ্রনাথ—অমলেন্দু দাশগুপ্ত প্রণীত। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস এম এ কর্তৃক জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩্ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ কি ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি কি ঋষি অনেকেই এই প্রশ্ন করিয়া থাকেন, গ্রন্থকার আলোচ্য পুস্তকখানিতে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রশ্নটি অবশ্য কঠিন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, বিশ্ববিখ্যাত মনীষী ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ এবং ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত রবীন্দ্র দর্শন সম্বন্ধে বই লিখিয়াছেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে ব্রহ্মজ্ঞ, ইহা প্রমাণের চেষ্টা কেহই করেন নাই। অথচ সে প্রমাণ পাওয়া যে একেবারে অসম্ভব ব্যাপার অমলেন্দুবাবু তাহা মনে করেন না। তিনি ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, ব্রহ্মোপলব্ধি বা আত্মোপলব্ধিই এ ক্ষেত্রে প্রমাণ। সাধকের নিজের উপলব্ধি এবং শাস্ত্র বাক্য যখন মিলিয়া যায়, তখনই সাধক সিদ্ধ হইয়াছেন জানিতে হইবে। উপলব্ধি এবং শাস্ত্রবাক্য এই সংকেত নির্দেশ গ্রহণ করিয়া বিচারের পথে অগ্রসর হইলে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত সেই প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে।

বস্তুত পরমার্থ বিষয়ে কোনও সাধকের অনুভব যথার্থ কিনা, শাস্ত্র দ্বারাই নির্ণয় করা সম্ভব, কারণ পরমার্থ বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' প্রভৃতি সূত্রে বেদান্তে ইহা সুস্পষ্টভাবেই নির্দেশিত হইয়াছে। আচার্য শঙ্করও বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন —"অথবা যথোক্তম্ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণম্ অস্য ব্রহ্মণো যথাবৎ স্বরূপাধিগমে" অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান বিষয়ে ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রই প্রমাণ। সুতরাং যাঁহার অনুভবের সঙ্গে শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গতি আছে, তাঁহার অনুভবই যথার্থ অনুভব, পরন্তু যাঁহার অনুভবের সহিত শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গতি নাই, তাহা যথার্থ অনুভব হইবে না, তিনি যত বড়ই অলৌকিকী শক্তিসম্পন্ন পুরুষ হউন না কেন।

অমলেন্দুবাবু বহুশ্রুত ব্যক্তি। তিনি শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সঙ্গে নিজের অনুভবকে মিলাইয়া প্রতিপদে এই আলোচনার পথে অগ্রসর হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কোন বিশেষ অনুভূতির কথা যেখানেই উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই দিয়াছেন শাস্ত্রোক্তি। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কবির অনুভূতির রীতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণে নিজের ব্যক্তিত্বকে তিনি সর্বত্র সংযত রাখিয়াছেন এবং শাস্ত্রার্থ আলোচনার ক্ষেত্রেও বহু কথার পাকের মধ্যে নিজকে জড়িত করিয়া প্রতিপাদ্য মূল বিষয় হইতে ফাঁকে গিয়া পড়েন নাই। এজন্য সমগ্র আলোচনাটি সৌষ্ঠবান্বিত এবং সরস হইয়া উঠিয়াছে। এইখানেই তাঁহার মনস্বিতার পরিচয়।

ঋষি বলিতে রবীন্দ্রনাথকে আমরা তাঁহার জীবন-স্মৃতি প্রভৃতিতে সাধারণতঃ পাই দ্রষ্টারূপে। কিন্তু দ্রষ্টা ঋষির স্রষ্টা রূপও আর একটি আছে। "ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্"। বস্তুত দ্রষ্টা আর স্রষ্টা একেরই দুই রূপ। গীতাঞ্জলিতে দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের স্রষ্টা রূপটি উন্মুক্ত রহিয়াছে। ঋষি রবীন্দ্রনাথ এখানে কবি।

অধ্যাত্ম-সাধনার উচ্চস্তরে অর্থাৎ যে স্তরে ব্রহ্মদর্শন, সেই ব্রাহ্মীভূমিতে দৃষ্টি ও সৃষ্টির সম্বন্ধ নিগূঢ়, রহস্যময়। সাধকগণ এই রহস্যকে ভক্তিযোগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। দৃষ্টি এখানে ইষ্টে সন্নিবিষ্ট এবং এতই ঘনিষ্ঠ যে, স্রষ্টা বলিতে আমরা অহংকৃত কর্তৃত্বের যে ভাবটি বুঝিয়া থাকি, সেখানে তাহা থাকে না। যিনি দূরে, তিনি এখানে কাছে, নিকট তিনি, প্রকট তিনি। আত্মানং অত্র পুরুষং অব্যবধানং একং—সাধক ভাগবতের ভাষায় এইভাবে এই অবস্থায় তাঁহাকে লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে পরম সত্যের এমন নিকট এবং প্রকট উপলব্ধিতেই পূর্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটে এবং তেমন সম্বন্ধেই রস ও আনন্দ, নহিলে উপলব্ধি অনেকাংশে ফাঁকা। এখানে পরাভক্তিরই উদ্দীপিত এবং 'ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি' গীতায় শ্রীভগবানের উক্তির সার্থকতা। দেখা এখানে সকল জায়গায় মাথা। রবীন্দ্রনাথের দর্শন এমনই পাকা,—'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ' সে দর্শনে ঋষিত্বের পূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা অনেকভাবে পাইয়াছি। ফলত তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে আমাদের চোখে ধাঁধা লাগে। ইহার ফলে তাঁহার স্বরূপটি কি, অর্থাৎ খাঁটি মানুষটি তিনি কেমন, আমাদের পক্ষে নির্ণয় করা খুবই কঠিন হইয়া পড়ে। প্রকৃত রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি বা বিবৃতির দার্শনিক বিচার হইতে তাঁহার স্বরূপ লক্ষণটি ধরা যায় না, ফলতঃ তটস্থ লক্ষণেই আমরা বিভ্রান্ত হই। কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী মহাপ্রভুর শ্রীমুখ দিয়া বস্তুনিরূপণের দুইটি লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। একটি স্বরূপ লক্ষণ, অপরটি তটস্থ লক্ষণ। ইহার মধ্যে 'আকৃতিপ্রকৃতি হয় স্বরূপ লক্ষণ', আর কার্য দ্বারা জ্ঞান হয় তটস্থ। ভিতর দিয়া তটস্থ লক্ষণেরই পরিচয় মিলে, সম্ভবত 'গীতাঞ্জলিতেই' তাঁহার স্বরূপ লক্ষণটি ধরা পড়ে। এখানে প্রত্যক্ষই তিনি নিজেকে নিবেদন করিয়াছেন। তাঁহার সেই শ্রেষ্ঠ প্রিয়তম পরম দেবতাকেই তিনি সমগ্র অন্তর দিয়া চাহিয়াছেন। তাঁহাকে পাইয়া তিনি অমৃতের অধিকারী হইয়াছেন।

অমলেন্দুবাবু শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সহযোগে রবীন্দ্রনাথের স্বরূপটি আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করিয়াছেন। "স্বরূপ বিহনে রূপের উদয় কখনো সম্ভব নয়"—কিন্তু স্বরূপ লক্ষণ গূঢ় এবং গোপন; সকলের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না, অথচ 'অনুগতি বিনা কার্যসিদ্ধি কেমনে সাধক করে?' সুতরাং সেজন্য তটস্থ লক্ষণেরও বিচার-বিবেচনা বিশেষভাবেই প্রয়োজন। অমলেন্দুবাবু উভয় দিক হইতে আমাদের এই পরম প্রয়োজন সাধন করিয়াছেন। বাঙলা সাহিত্যে তাঁহার এই অবদান স্থায়ী আসন অধিকার করিবে।

২০৫।৫৪

বিবিধ

১। Listen, oh Netaji and other poems by K. P. Roy. Published by Sri Suresh Chandra Das; 24|4, Russa Road, Calcutta-26.

২। **ভাঙ্গো ভাঙ্গো শৃঙ্খল** (ছায়া-নাট্য) —বিমল সেনগুপ্ত। প্রকাশক কল্লোল প্রেস, কিটিং রোড, শিলং। মূল্য—ছয় আনা।

দুটি বইতে মূলত নেতাজী সুভাষের উদ্দেশে অর্ঘ্যকুসুম অর্পণ করা হয়েছে। সুভাষের সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্ব কেন জনচিত্ত-হারী হয়ে উঠেছিলো, তারও বিস্তারিত বিবরণ দুটি বইয়ের বিশেষত্ব।

বিশেষ কোনো যুগধৃত জাতি-জীবনের তথ্য কবি-জীবনের মতো উত্তীর্ণ হতে গেলে যে দুরূহ গভীর পথচারণার প্রয়োজন আছে—প্রথমোক্ত গ্রন্থে তার লক্ষণ সম্পূর্ণ অবহেলিত না হলেও অনেকাংশেই অবহেলিত, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তবু, 'from the documentary and historical point of view, this collection has both a high intrinsic and natural value.' ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় কালিদাস নাগের এই উক্তি সর্বান্তঃকরণে সমর্থনযোগ্য। তবে এই সূত্রে বলা উচিত, উল্লিখিত গ্রন্থে অন্তর্ভূত আনবিক-হাইড্রোজেন ভীতি থেকে শুরু করে কোরিয়া-পান-মুন-জন প্রভৃতি আন্তর্জাগতীয় ঘটনাবলী সংবাদের প্রচ্ছদেই প্রতিহত থেকে গেছে, সাহিত্যের সর্বাংশে প্রাণবেদনায় উপনীত হতে পারেনি। গ্রন্থের প্রারম্ভে সন্নিবেশিত ডক্টর মোহিনীমোহন ভট্টাচার্যের পত্রটিও নানা কারণে মূল্যবান বলে মনে করি।

শেষোক্ত ছায়া-নাটের (shadow-play) সার্থকতা, বলা বাহুল্য, মঞ্চ-সাফল্যেই নিহিত আর সেই দিক দিয়ে নাট্যকারের প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে না বলেই মনে হয়। তবে বক্তৃতার ভার মাঝেমাঝে দ্যোতনার পথে বাধা-স্বরূপ হয়েছে। ছায়া-নাটো ও কথা-চিত্রের দর্শক, উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের কাছে অধিকতর সূক্ষ্মসংকেতগ্রাহিতা কাম্য।

১০৭।৫৪, ৫৭২।৫৩

সময়টা কেমন যাবে—জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত। শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক নাভানা, ৪৭, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

গ্রন্থকার জ্যোতিষ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। ইতিপূর্বে জ্যোতিষ সম্বন্ধে তাঁহার প্রণীত কয়েকখানা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি কোষ্ঠী বিচার সম্পর্কিত। সাধারণত বিংশোত্তরীদশা এবং অষ্টোত্তরী দশার উপর ভিত্তি করিয়া কোষ্ঠী বিচার করা হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া, ভৃগুসংহিতার মতের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি অষ্টোত্তরী এবং নৈসর্গিক দশা আছে। গ্রন্থকার ভৃগু-সংহিতার মতানুযায়ী অষ্টোত্তরী দশা ও নৈসর্গিক দশার সমবায়ে বিচারের পথ নির্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার মতে এই বিচার নির্ভুল হইয়া থাকে। পুস্তকখানি জ্যোতিষ সম্বন্ধে আগ্রহসম্পন্ন সমাজ, বিশেষভাবে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানান্বেষণের পক্ষে সহায়ক হইবে।

১৯১।৫৪

যোগিরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়। সংক্ষিপ্ত পরিচয়। দ্বিতীয় সংস্করণ। স্বামী সত্যানন্দ গিরি প্রণীত। গ্রন্থকার কর্তৃক সেবায়তন, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৮০ আনা।

শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় স্বনামধন্য মহাপুরুষ। বাংলা দেশের অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে যোগিরাজ লাহিড়ী মহাশয়ের সাধনা এককালে বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল। এ দেশের বহু সাধক সন্তান তাঁহার পুণ্য জীবন এবং সাধনায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা ধর্মসাধনায় ভাবের লঘু চাপল্য হইতে ক্রিয়া যোগনিষ্ঠ একটি বলিষ্ঠ ধারা বিকশিত করিয়া তোলেন। এতদনুযায়ী গীতার নূতন ধরনের ব্যাখ্যা প্রবর্তিত হইতে থাকে। সমাজ জীবনে গীতার মাহাত্ম্য সম্প্রসারিত হয়। মহাপুরুষ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় এবং তদীয় অনুগামিবর্গের এই অবদান এইভাবে অনেকটা অলক্ষ্যে এক অভিনব অধ্যায় রচনা করে। পরোক্ষ চিন্তার পরিবর্তে অপরোক্ষ অনুভূতির প্রতি মনোযোগী হওয়াই লাহিড়ী মহাশয়ের লক্ষ্য ছিল এবং পাতঞ্জল যোগের কতকগুলি প্রক্রিয়াকে তিনি গীতার আদর্শ উপলব্ধির উপযোগীভাবে প্রয়োগ করিবার পদ্ধতি উপদেশ করেন। তাঁহার উপদিষ্ট প্রক্রিয়া পুরুষ গীতার আদর্শ সাধনায় পরবর্তী যুগে সমধিক সক্রিয় হইয়া উঠে, একথা বলা চলে। পরমযোগী এমন মহাপুরুষের জীবনী পাঠে সকলেই উপকৃত হইবেন।

২১০।৫৪

প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির জন্ম ও ভূমিকা —সমর গুহ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি, ৮৬, সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য ৮০ আনা।

আলোচ্য পুস্তিকাখানিতে ভারতের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস কম্যুনিস্ট এবং প্রজাসোস্যালিস্ট পার্টির আদর্শ এবং কর্মপন্থার পর্যালোচনা করিয়া প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির নীতির উপযোগিতা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ পুস্তিকাখানির একটি পরিচিতি লিখিয়া দিয়াছেন।

২২৪।৫৪

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

ভোল্গা থেকে গঙ্গা—রাহুল সাংকৃত্যায়ন। অনুবাদক অসিত সেন ও সুধীর দাশ

বিচিত্র ভবন—শ্রীকেদারলাল রায়

গল্পকার শরৎচন্দ্র—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুচরিতা রায়

পঞ্চ-শিখা—শ্রীগৌরচন্দ্র সাহা

রেবেকা—দাফ্‌নে দ্যু মরিয়ন। অনুবাদক শিউলি মজুমদার

যোগ ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য সৌন্দর্য—আয়রণম্যান নীরোদকুমার সরকার

বাংলা-সাহিত্যের ইতিকথা— শ্রী ভূদেব চৌধুরী

যোগীরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় সংক্ষিপ্ত পরিচয়—স্বামী সত্যানন্দ গিরি

কাব্যকলি—শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক

ঠাকুরমার ঝুলি—দেব সাহিত্য কুটীর

স্বামী সারদানন্দের পত্রমালা—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য

চক্রদত্ত

দন্তচিকিৎসকরা দাঁত পোকায় খেয়ে গেলে যন্ত্র দিয়ে সেই জায়গাটা কুরে ফেলে সোনা, রুপা অথবা পোরসেলিন জাতীয় কোন জিনিস দিয়ে গর্তটা বন্ধ করে দেন। এই অবস্থায় অবশ্য কিছুকালের জন্য দাঁতটা রাখা যায় তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই ধরনের দাঁত শেষকালে উপড়ে ফেলে দিতে হয়। এর কারণ, কৃত্রিম বস্তু দিয়ে গর্ত বন্ধ করা গেলেও দাঁতের ভেতরকার স্পঞ্জের মত যে সব টিস্যু থাকে সেগুলো আবার সাধারণ অবস্থায় ফিরে আসবার সুযোগ পায় না। এই অসুবিধা দুজন বৈজ্ঞানিক দূর করবার একটা উপায় বার করেছেন। এরা কৃত্রিম উপায়ে রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত করে একটা বস্তু তৈরী করেছেন যেটা দাঁতের গর্তে ভর্তি করে দেবার পর দাঁতের ভেতরে টিস্যুতে আবার খনিজ দ্রব্য সংযোগ করতে থাকে, ফলে পোকায় খাওয়া গর্তগুলো আবার সাধারণ দাঁতের মত হয়ে যাবে। বৈজ্ঞানিকরা দেখেছেন, এক জাতীয় প্রোটিন যেটা মানুষের হাড়ের ভেতর এবং চামড়ার মধ্যে পাওয়া যায় এর সংগে কনড্রোইটিন সালফেট মিশ্রিত করে এই কৃত্রিম রাসায়নিক দ্রব্যটি তৈরী করেছেন। বহুদিন গবেষণার পর এই দুজন বৈজ্ঞানিক দেখেছেন যে স্পঞ্জ জাতীয় টিস্যুতে শক্ত আবরণ তৈরী করতে হলে এই জাতীয় রাসায়নিক বস্তুই সুবিধাজনক।

*

লণ্ডনের মিঃ চ্যাপম্যান উত্তরাধিকারী-সূত্রে চারটি খুব বড় বড় মুক্তো ভরা ঝিনুক পেয়েছেন। এই ঝিনুক চারটি পৃথিবীর এক অমূল্য সম্পদ। সামুদ্রিক অভিযানকারীদের এই ঝিনুক চারটি বিশেষ চঞ্চল করে তুলেছে। যদিও এই মুক্তোগুলি লক্ষ লক্ষ বছর আগের জিনিস তবু আজও এগুলির জ্যোতি কিছুমাত্র নিষ্প্রভ হয়নি, আকার একটুও বিকৃত হয়নি। যেভাবে যেদিক থেকেই এগুলিকে দেখা যাক্ না কেন সব সময়েই অপরূপ দেখতে লাগে। বৈজ্ঞানিকেরা আশা করেন যে, সমুদ্রের তলদেশে এই জাতীয় মুক্তোর সন্ধান এখনও পাওয়া যেতে পারে। বর্তমানে যে দুটি সামুদ্রিক অভিযানের দল বার হয়েছেন তাঁদের অধ্যক্ষ এই মুক্তোর অনুসন্ধান করবেন বলে আশা দিয়েছেন। এই অভিযানকারীরা রেড-সি, পারসিয়ান গালফ্ এবং ভারত মহাসমুদ্রে এঁদের অনুসন্ধান কার্য চালাবেন। প্রথম অভিযানকারী দলটি অবশ্য লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার সিলাকান্থ জাতীয় মাছের খোঁজে বের হয়েছেন। এরা একনাগাড়ে দুবছর তাদের অভিযান চালিয়ে যাবেন। প্রথম দলের অধ্যক্ষ বলেন যে, মাদাগাস্কার সমুদ্রে এক ধরনের ঝিনুকের খোঁজ অবশ্য পাওয়া যায় সেগুলো মিঃ চ্যাপম্যানের ঝিনুকের সমগোত্রীয় বলা যায়। দ্বিতীয় দলের অধ্যক্ষও এইটে বিশ্বাস করেন যে, মিঃ চ্যাপম্যানের কাছে যে ঝিনুক আছে, ঠিক সেই ঝিনুক বর্তমানে পৃথিবীতে পাওয়া না গেলেও ঐ একই গণের উপ-প্রজাতির অস্তিত্ব এখনও আছে।

*

পোলিও রোগ আজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লেও আজও সম্পূর্ণভাবে এই রোগের কারণ এবং তার চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি। বর্তমানে আমেরিকার মেডিকেল এসোসিয়েশনের মতে ছোট ছেলেদের টন্‌সিল এবং এ্যাডিনয়েডস্ সব সময় কেটে বাদ দেওয়া উচিত নয়। এগুলো কেটে বাদ দিলে ছেলে-মেয়েদের তাড়াতাড়ি পোলিও রোগ হতে পারে। প্রায় ২,৫০০ জন পোলিও রোগাক্রান্ত ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা করে দেখা গেছে এদের টন্‌সিল এবং এ্যাডিনয়েডস্ কেটে ফেলার দরুণ তাদের এই রোগ হয়েছে। অবশ্য যদি কোন কারণে টন্‌সিল দূষিত হয়ে যায় তাহলে সেটা কেটে বাদ দেওয়া দরকার।

*

পৃথিবীর আয়তন বৈজ্ঞানিকেরা অনেকদিনই আবিষ্কার করেছেন। পৃথিবীর ওজনের কথা বিশেষ জানা ছিল না। এখন বৈজ্ঞানিকেরা সঠিক কিছু বলতে না পারলেও আন্দাজ করছেন যে, পৃথিবীটা ওজনে ৬০০ কোটি কোটি কোটি (৬০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ ইত্যাদি) টন।

*

কুকুরচালিত শ্লেজ গাড়ীই এ পর্যন্ত মেরু প্রদেশের একমাত্র যানবাহন ছিল। এখন এই শ্লেজ গাড়ী কুকুর দ্বারা চালিত না হয়ে এর সংগে একটা ট্রাক্টর লাগিয়ে চালান হয়। এই ট্রাক্টর তুষার বা শক্ত বরফের ওপর অনায়াসে চলতে পারে। এর গতি বেশ দ্রুতই বলা যায়। ট্রাক্টরচালিত শ্লেজ গাড়ী প্রয়োজনানুসারে সামনে-পিছনে দুদিকেই চালান যায়। প্রায় এক টন মাল এই শ্লেজ গাড়ী বহন করতে পারে। এই গাড়ীকে 'স্নো ট্রাক্টর' বলা হয়েছে।
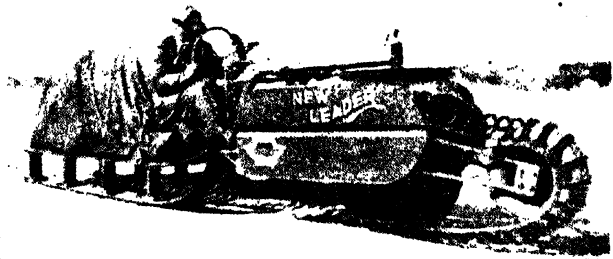
মেরুপ্রদেশের নূতন ধরনের যানবাহন স্নো ট্রাক্টর

তোমাকেই দেখি

আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন

অকালের রুক্ষ ঝড়ে
ঝরে পড়া নারীদের ঝড়ে ওড়া কেশের মতন
এ আকাশ এলোমেলো চিমনির অসহ্য ঘৃণায়!
রামধনু আঁকা কোনো দিগন্তের পক্ষবিধুনন
জানাবে না সম্ভাষণ শান্তিহারা এ মরুতৃষায়।

অরাজক রাজপথে
শকটের আর্তনাদে ছত্রভঙ্গ দিনের আলাপ,
পাথরের কারুকার্যে দিনে দিনে হয়েছে শোষিত
এখানে মাটির স্নেহ: লোকারণ্যে অস্থির প্রলাপ
পাখির কাকুলিশূন্যে অরণ্যের অশান্তির মতো!

মাত্রাহীন মৃত্যু ঠেলে
দুরাশার মঞ্চে তবু তোমাকেই দেখি এ শহরে,
তুমি যেন শস্যহারা শূন্য ক্ষেতে কৃষাণ রমণী—
সীমাহীন আদিগন্তে ধৈর্যের পতাকা তুলে ধ'রে
অশ্রুর সান্ত্বনা ঢাল দীর্ণ মাঠে মাটির জননী!

পাষাণের উষ্ণ বুকে—
পদচিহ্ন এঁকে এঁকে এপারে ওপারে অনুখন
হারানো লক্ষ্মীর খোঁজে ভীড় ঠেলে আজো পথ চলো,
ধূসর মেঘের মতো রক্তহীন তোমার নয়ন
বাদল মেঘের মতো ফসলের স্বপ্নে টলোমলো!

আমারো এ ক্লান্ত প্রাণে
দাও তবে এনে দাও অনন্তের একক বিশ্বাস,
শপথের অগ্নি ছুঁয়ে আমি যদি হই অগ্নিময়—
নীলের বিস্তার মেলে তুমি হও আমার আকাশ,
লাঞ্ছিত সূর্যের মতো আমি হবো তোমাতে উদয়!

সীমা-সুদূর

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

আমি কেবল তাকে হারাই, সে যে সুদূরে
সে যে গহন, আমি তাকে খুঁজে না পাই,
আমি যে তার বেদনারই হারানো সুর,
আমি তাকে পেয়ে হারাই, পেয়ে হারাই!

আমি তাকে খুঁজেছিলেম নীলাকাশে,
আমি শুধুই দেখেছি ঝড় নেমে আসে
কী বেদনায় ছায়া-করুণ ঘাসে-ঘাসে,—
আমি তাকে খুঁজেছিলেম এ-আকাশে!

আসেনি সে, এ আকাশে আসেনি সে,
রামধনুর সকল রঙ বৃথা হলো,
এলোনা সে, শিশিরে-অশ্রুতে ভিজে
এমন চুপ, হৃদয় ম্লান ছলোছলো!

আমি তাকে খুঁজে না পাই, মনের কোন্
গহনে তার নামে মন ওঠে ভরে,
আমি ব্যাকুল, বাড়াই সেই হৃদয় মন—
তাকে হারাই, হারায় তার সব কায়া!

সে যে সুদূরে, অন্তহীন সীমা-সুদূরে,
ধরা-ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে কোন্ অসীম সুরে
তাকে আমার কাছে আনে, হৃদয়ে পাই!
আমি তাকে পেয়ে হারাই, পেয়ে হারাই!!

সেদিন শ্রাবণ

সাধনা চট্টোপাধ্যায়

কখন শ্রাবণ আসে বিগলিত জলের ধারায়,
কালো কালো মেঘগুলি আপনারে কেবল বিলায়।
কখন কদম বনে থরো থরো ফোটা কলিগুলি,
বৃষ্টিতে ঝরে পড়ে পায়ে পায়ে হয়ে যায় ধূলি।
কখন কামিনী ফুল ঝর ঝর হেসে ঝরে যায়,
সবুজ ঘাসের পরে দুধ-শাদা চাদর বিছায়।

তাইতো অবাক লাগে আমি বসে ভাবি মনে মনে,
নিজেকেই বলি দিতে এরা কেন আসে অকারণে।

এখানে ঘরের কোণে চারিদিকে বন্ধ দরোজায়,
নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো মরে যাক্ যদি কেউ যায়।

তবু এই বেঁচে থাকা এতে হাসি পাইনে তো খুঁজে,
কামিনীরা ঝরে যায় তবু হাসে ঘাসের সবুজে।
আহা ওই ঝরে-পড়া ওতে বুঝি অনাবিল সুখ
বলছে শ্রাবণ শোনো ঝর ঝর সবাই ঝরুক।

শার্লক হোমস

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

রবীন্দ্রনাথকে ভুলে গিয়ে তাঁরই সৃষ্ট কাল্পনিক কোন চরিত্রকে নিয়ে কদাপি আমরা মাতামাতি করি না। ঐ চরিত্রের, তা সে যত বিশেষত্বপূর্ণই হোক না কেন, শতবার্ষিকী জন্মোৎসব পালন করার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। ব্যাপারটা আমাদের কাছে কেমন অদ্ভুত আর উদ্ভট মনে হয়। উপন্যাসে সেই চরিত্রের যত প্রাধান্যই থাকুক না কেন, আমরা জানি সে কাল্পনিক চরিত্র মাত্র। লেখকের কল্পনা-মানসে তার জন্ম। রক্ত-মাংসে তার কোন অস্তিত্ব নেই। তাই, তাকে নিয়ে নাচানাচি করাটা অর্থহীন, পাগলামি। কিন্তু এ তত্ত্বটা পশ্চিমের লোকগুলো মেনে নিতে পারেনি। অন্তত একজনের ব্যাপারে স্বীকার করেনি—সে হচ্ছে শার্লক হোম্‌স্। হোম্‌সের সম্বন্ধে গবেষণার জন্য তারা সমিতি গড়েছে। একমাত্র মার্কিন মুলুকেই ৩০টির অধিক এমনি সমিতি রয়েছে। তাছাড়া ব্রিটেন, স্কট-ল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানেও যে সব সমিতি রয়েছে তার সংখ্যাও কম নয়। সম্প্রতি শার্লক হোম্‌স্-ভক্তরা ওর জন্ম শত-বার্ষিকী উৎসব সাড়ম্বরে পালন করেছেন। ওঁদের পাগলামির এও একটা নিদর্শন। ওঁরা কিন্তু এবিষয়ে ভীষণ সিরিয়াস্। ওঁরা হোম্‌স্‌কে রক্তমাংসের মনুষ্যেরই মর্যাদা দেন, এবং তা সত্য বলে প্রমাণিত করারও চেষ্টার ত্রুটি নেই। ওঁদের এই বাড়াবাড়ি দেখে জনৈক সমালোচক শার্লক হোম্‌স্ সোসাইটির সভাপতি মিঃ এস সি রবার্টসকে একখানা পত্র লেখেন। তিনি লেখেন—

"I see that you are President of the Sherlock Holmes Soceity !! I could hardly believe the evidence of my eyes when I read about it. Sherlock Holmes and Watson were fictitious characters invented by Conan Doyle. All there is about these two invented people is what Conan Doyle wrote. There is nothing more to it and very little at that."

সমালোচকের এই কথার কোন প্রতিবাদ প্রেসিডেণ্ট মহাশয় করতে পারেননি। তিনি শুধু বলেছিলেন,—

"Holmes and Watson have earned their title to be 'emancipated from the bonds of fact.'"

শার্লক হোম্‌সের নাম আমাদের দেশেও খুব অপরিচিত নয়। ইংরেজী উপন্যাসের পাঠক বিশেষ করে গোয়েন্দা উপন্যাসের ভক্তরা কোনান ডায়েলের বই অবশ্যই পড়েছেন। বাংলা ভাষায় ঐ সব বই অনুবাদ হওয়ায় ইংরেজীভাষায় অনভিজ্ঞরাও শার্লক হোম্‌সের কীর্তি-কাহিনীর রসাস্বাদন করতে পেরেছেন। তাছাড়া লোকপরম্পরায় ওর নাম আর দক্ষতার কথা শুনেছেন এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়। অর্থাৎ আমাদের দেশেও ওর ভক্তের অভাব নেই। 'জন ও' লণ্ডন' এবং 'দি টাইমস'-এর মত প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক দুটিও যখন ওর সম্পর্কে বিশেষ প্রবন্ধাদি প্রকাশ করে তখন ওর জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকতে পারে না। কিন্তু তা বলে কি ওকে সত্য বলে স্বীকার করে নিতে হবে?

শার্লক হোম্‌স্ ও তাঁর সহকারী ডাঃ ওয়াটসনের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যর আর্থার কোনান ডয়েল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁর লেখা 'এ স্ক্যাণ্ডাল ইন্ বোহেমিয়া' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় বিলিতি মাসিক পত্রিকা 'স্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিনে'। এ গল্পেই সর্বপ্রথম তিনি পরিচিত করান গোয়েন্দাপ্রবর শার্লক হোম্‌স্‌কে। ওর অসমসাহসিকতা, রহস্য উদ্ঘাটনে দক্ষতা এবং অপরাধীকে খুঁজে বের করার অদ্ভুত ক্ষমতা পাঠকের মনে যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ঘটনার অবিশ্বাস্যতা, বিষয়বস্তুর পারম্পর্যের অভাব এবং যুক্তির ফাঁক—কোনটাই পাঠকের কাছে আর দোষণীয় বলে গ্রাহ্য হয় না। তারা হোম্‌স্-পাগল হয়ে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে 'স্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিন'ও ভয়ানক জনপ্রিয় হয়ে উঠে। জনৈক প্রবন্ধকার লিখেছেনঃ 'The first of Holmes's Adventures made the Strand Magazine essential reading for Civilized men.'

স্যর আর্থার কোনান ডয়েলও সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয়তা লাভ করলেন সন্দেহ নেই কিন্তু হোমসের তুলনায় সে কিছু নয়।

হোম্‌সের আরও কয়েকটি কীর্তিকাহিনী প্রকাশিত হবার পর সে বহুলোকের মনে কায়েমী আসন করে নিল। এদিকে অনেকে ডয়েলের কথা ভুলে যেতে লাগল। অনেকের আবার ধারণা হ'ল হোম্‌স্‌ আর ওয়াটসন তাদেরই মত রক্ত-মাংসের মানুষ। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভূতপূর্ব ডাক্তার জন এইচ ওয়াটসন, এম ডি নাকি এ' গল্পগুলি লিখেছেন।

পূর্বেই বলেছি হোম্‌স্‌-ভক্তরা সম্প্রতি তাঁর শতবার্ষিকী জন্মদিবস প্রতিপালন করেছেন। তাঁর জন্মের তারিখটা ও'রা কি করে পেলেন? হোম্‌স্‌কে নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামাচ্ছেন তাঁদেরই অন্যতম ছিলেন পরলোকগত মিঃ এইচ ডবলিউ বেল। তিনি লিখেছেনঃ 'সাধারণত আঠারো বৎসর বয়সে ছাত্ররা অক্সফোর্ড অথবা কেম্ব্রিজে ভর্তি হয়। সে হিসেবে শার্লক হোম্‌সের আনুমানিক জন্ম বৎসর ধরা যেতে পারে ১৮৫৪ সালের শেষ কি ১৮৫৫ সালের প্রথম দিক। ঐ ভক্তদেরই অন্যতম মিঃ গ্র্যাভিন ব্রেন্ড তাঁর পুস্তক 'মাই ডিয়ার হোমস'-এ লিখেছেন, "আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট-দের বয়স আঠারো ধরলে বলা যায় শার্লক হোম্‌স্‌ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৫৩ সালের কাছাকাছি।" এমনি অনেক পরস্পর-বিরুদ্ধ গবেষণার কথাই উল্লেখ করা যায়। তা না করে, ডয়েল হোম্‌সের বয়স সম্পর্কে যা লিখেছিলেন তাই বলি। অবশ্য ডয়েল কোন জীবনেতিহাসে হোম্‌সের বয়স উল্লেখ করেন নি। তাঁর লেখা 'হিজ লাস্ট বো' নামক গল্পে প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলে-ছিলেন, ১৯১৪ সালের ২রা আগস্ট হোম্‌স্‌ এমন নিপুণ ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন যে, তখন তাঁর বয়স যে ষাট হয়েছে তা কিছুতেই বোঝা যাচ্ছিল না।' এইটুকুই প্রমাণ। এর থেকে হোম্‌স্‌-অনুরাগীরা সিদ্ধান্ত করে ফেললেন, হোম্‌স্‌ ১৮৫৩ সালের শেষের দিকে অথবা ১৮৫৪ সালের প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে হিসেবে ১৯৫৪ সালে তাঁর বয়স যে একশত বৎসর হ'ল তাতে সন্দেহ করবার অবকাশ নেই।

শতবার্ষিকী উৎসবের আগে আরও একটি জিনিস করা হয়েছিল, তা হচ্ছে গল্পে বর্ণিত তাঁর বাসগৃহকে সজ্জিত করে একটি এক্সিবিশনের বন্দোবস্ত করা।

২২১-বি বেকার স্ট্রীট-এ হোম্‌স্‌ বাস করত ওর সহকর্মী ওয়াটসনকে নিয়ে। এ বাড়িটি ১০নং ডাউনিং স্ট্রীটের মতই প্রায় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হয়ে আছে। হোম্‌সের অনুরাগীরা ১৯৫১ সালে এই কল্পিত গৃহের একটি কক্ষে প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। কক্ষটিতে হোম্‌স্‌ কর্তৃক ব্যবহৃত বলে পুস্তকে বর্ণিত স্ক্র্যাপ-বই, তামাকু পাইপের র‍্যাক, সংবাদপত্র, টেস্ট-টিউব প্রভৃতি সাজিয়ে রাখা হয়। পুস্তকে যে ভাবে লেখা আছে ঠিক সেইভাবে ডাঃ ওয়াটসনের স্টেথস্কোপটিও ঝুলিয়ে রাখা হয়। মানুষে সাধারণত হুজুগ প্রিয়। এ হুজুগটিও তারা ছাড়তে পারে নি। হাজার হাজার লোক নাকি প্রতিদিন এই বাসকক্ষটি দেখতে আসত এবং অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে এবং কৌতূহল নিয়ে নাকি তারা প্রতিটি জিনিস দেখত।

এই কৌতূহলকে যারা জাগিয়ে রেখে-ছিল, তাদের কথা পূর্বে কিছু কিছু উল্লেখ করেছি। কিন্তু পাগলামী যে কত রকম হতে পারে, ও সম্বন্ধে আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ না করলে, জিনিসটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

হোম্‌স্‌-অনুরাগীরা গবেষণা করে আবিষ্কার করেছেন (এবং বেশ কয়েকটি পুঁথিও তাঁরা লিখে ফেলেছেন) যে, তিনি যখন তারুণ্য লাভ করেন তখন ভিক্টোরীয় যুগের মধ্যকাল। আজিকার দিন থেকে সে যুগ ছিল অনেক নিরাপদ আর নিশ্চিন্ত। পরম যত্নে আর আদরে বর্ধিত হওয়ার পথে তখন কোন বাধাই ছিল না। তারই শৈশবে ঘটেছে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ। শুনেছে সে সিপাহী বিদ্রোহের কাহিনী। তার উপর ছিল আমেরিকা ও ফ্রান্সের প্রভাব। তার ঠাকুরমা ছিলেন একজন উঁচুদরের চিত্র-শিল্পী। তাঁর কাছ থেকেই তিনি বংশ-পরম্পরায় লাভ করেন শিল্পীজনোচিত গুণাবলী।

কিন্তু এও সব নয়। ওয়াটসন ক'বার বিয়ে করেছিল এবং কাকে বিয়ে করেছিল তা নিয়েও ভক্তরা বহু বাদানুবাদ ও গবেষণা করেছেন। তার ভক্তদের মধ্যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক রয়েছেন। তাঁরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হোম্‌সের প্রতিটি কীর্তি-কাহিনী পাঠ করেছেন। ওর কার্যকলাপ সম্বন্ধে কারু যদি কোন সময় সন্দেহ জাগে—সে সন্দেহ নিরসনে তাঁরা কোমর বেঁধে লেগে যান। ক্যাম্ব্রিজের কোন কলেজে তিনি পড়েছিলেন তা নিয়ে তাঁরা তর্ক করেন। হোমসের সঙ্গীত-প্রীতি সম্বন্ধে গবেষণা করে একখানা পুস্তকও লেখা হয়ে গেছে। অর্থাৎ তার জীবনের এমন কোন দিক নেই যা নিয়ে গভীর তত্ত্বালোচনা না হয়েছে। এ বিষয়ে হোম্‌স্‌-ভক্তদের উৎসাহের অন্ত নেই।

কিন্তু সে কথা থাক। যিনি তার ছবি এঁকে এবং চিত্র ও মঞ্চে অভিনয় করে শার্লক হোম্‌স্‌কে জীবন্ত করে তুলে-ছিলেন এবার তাঁদের কথাই বলি।

স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে যে গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে, তাতে যে সব রেখা-চিত্র ছিল সেগুলি অঙ্কিত করেন সিডনি পেজেট নামে জনৈক চিত্রশিল্পী। শার্লক হোমসের মডেল হন শিল্পীর ভ্রাতা ওয়াল্টার। ওয়াল্টার দেখতে ছিলেন কৃশ ও বক্র। তাই হোম্‌সের চেহারাও ওই ধরণের বলে লোকের ধারণা হয়ে গেছে। ওয়াট-

সনের মডেলস্বরূপ প্যাজেট তার ছাত্রকালের জনৈক ভাস্করবন্ধুকে গ্রহণ করেন। গল্পে যে সব মেয়ে চরিত্র থাকত তাদের ছবি আঁকবার সময় তিনি সাধারণত বইয়ের বর্ণনা ও নিজের কল্পনাশক্তির সাহায্য নিতেন। তবে মাঝে মাঝে তাঁর বোনকেও মডেল হিসেবে গ্রহণ করতেন বলে কথিত আছে।

কোন গল্পের সঙ্গে যদি গল্পে বর্ণিত চরিত্রের ছবি দেওয়া হয় তবে তা পাঠককে আকর্ষণ করে বেশী, কারণ পাঠক নিজের কল্পনার সঙ্গে ঐ ছবিগুলিকে মিলিয়ে নিয়ে যুগপৎ আনন্দ ও গর্ব অনুভব করেন। শার্লক হোম্সের বেলায়ও তাই হয়েছিল। প্যাজেটের আঁকা ছবি পাঠকের কল্পনার সম্মুখে হোম্সের একটা জীবন্ত চিত্র উপস্থিত করেছিলেন। ধীরে ধীরে সেই চিত্রই হোম্সের আসল ছবি বলে সারা বিশ্ব গ্রহণ করেছিল। এ অনেকটা 'জন বুল' আর 'আঙ্কল শ্যামের' কল্পিত চিত্রের মত। এ ছবি দুটো বিশ্বের লোক এত বেশী দেখেছে যে, সত্যিকারে তাদের কোন অস্তিত্ব না থাকলেও কোনদিন তাদের পরিচয় দেওয়ার দরকার হয় না। অথচ সেক্সপীয়র বা ডিকেন্স—যাঁরা রক্তমাংসের মানুষ, এবং মনীষী বলে যাঁরা স্বীকৃত —তাঁদের ছবির সঙ্গেও পরিচয় দেওয়া দরকার হয়। শিল্পীর দক্ষতা এবং প্রচারের মাহাত্ম্যই এ দিয়ে প্রমাণিত হচ্ছে।

শার্লক হোম্সের কয়েকটি কাহিনী চিত্রে ও মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। প্রথম অভিনয় হয়েছে ১৮৯৪ সালে এবং তাতে হোম্সের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন জন ওয়েব। সেণ্ট জন হ্যামন্ড অভিনয় করেছিলেন ওয়াটসনের ভূমিকায়। তখন ঠিক কোন্ গল্পটি যে অভিনীত হয়েছিল তা অবশ্য জানা যায়নি। এর পরে হোম্স্ নাটকের অভিনয় হয় নিউ ইয়র্কে। উইলিয়ম গিলেট নামক জনৈক অভিনেতা-নাট্যকার কোনান ডয়েলের একটি গল্পকে নাট্যরূপ দেন। সেই নাটকটি ২৩৬ বার নিউইয়র্কে চলে। পরে ১৯০১ সালে ঐ দল আসে লণ্ডনে। সেখানেও তারা ২১৬ বার অভিনয় করে। এর পর আরও কয়েক জায়গায় শার্লক হোম্স্ অভিনয় হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কোনান ডয়েল নিজে 'দি স্পেকল্‌ড ব্যাণ্ড' গল্পটি নাট্যে রূপান্তরিত করেন। এডেলফি থিয়েটারে নাটকটি অভিনীত হয় এবং মিঃ এইচ এ সেণ্টসবেরী হোম্সের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এর পরে ডয়েলের আরও কয়েকটি গোয়েন্দা কাহিনীও নাট্যে রূপান্তরিত হয়ে মঞ্চস্থ হয়।

১৯০৬ সালে ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম হোম্সের কাহিনী নিয়ে ছবি তোলা হয়। কিন্তু এর বিশদ বিবরণ জানা যায়নি। ১৯০৮ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে ডেনমার্কের নোর্ডিস্ক ফিল্ম কোম্পানী কতকগুলি এ্যাডভেঞ্চারের ছবি তোলেন। সে ছবিগুলো সাফল্য অর্জন করার ফলে কয়েকটি আমেরিকান, জার্মান ও ইটালিয়ান ফিল্ম কোম্পানীও এ্যাডভেঞ্চারের ছবি তোলেন। এদেরই তোলা একটি ছবি হচ্ছে 'শার্লক হোম্স্ ইন দি গ্রেট মার্ডার মিস্ট্রি'। কিন্তু এর গল্পটা ঠিক ডয়েলের কাহিনী অবলম্বন করে তোলা হয়েছিল বলে স্বীকৃত হয়নি। যাহোক, ১৯১২ সাল থেকে ডয়েলের গল্পের উপর ভিত্তি করে ছবি তোলা আরম্ভ হয়। প্রথম ছবি তোলেন ফ্রান্সের একলেয়ার কোম্পানী। পরে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে গ্রেটব্রিটেনের 'স্টোল ফিল্ম কোম্পানী' তোলেন 'দি এ্যাডভেঞ্চার অব শার্লক হোম্স্' নামে একটি চিত্র। তাতে এইল নরউড প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেন। চিত্রটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে। সার কোনান ডয়েল নিজেও নায়কের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। তারপরে সবাক যুগে তাঁর আরও কয়েকটি গল্পের চিত্রগ্রহণ করা হয়। গত ৪৮ বৎসরে হোমসকে নিয়ে অন্তত ১১৫টি চিত্র গ্রহণ করা হয়েছে। এ থেকেও তার জনপ্রিয়তা পরিমাপ করা যায়।

হোমসের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই তা আমরা প্রথমেই স্বীকার করেছি। কিন্তু তা বলে যাঁর মস্তিষ্কে এই মানুষটি জন্ম নিল, সেই সার আর্থার কোনান ডয়েলকে দূরে সরিয়ে রেখে ওকেই সমস্ত সম্মান দেওয়া হবে এটা যেন কেমন মনে হচ্ছে। কিন্তু হুজুগে যার সৃষ্টি, সেখানে যুক্তি কোন কাজে আসে না। সুতরাং শার্লক হোম্স্ সোসাইটির কাজকর্ম আরও কিছুদিন যে চলবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

—শৌভিক—

নাট্যালয়ের অবস্থা

জাপানের বিরাট শিল্পনগরী ওসাকা থেকে বিশ মাইল দূরে নাকাস্কি শহর। এটাও এক শিল্পকেন্দ্র তবে অন্যার্থে—এটা নাট্যশিল্পের কেন্দ্র। বস্তুত নাট্যাভিনয় পরিবেশনের উদ্দেশ্যেই এই শহরের উৎপত্তি। নাট্যকার, অভিনেতা, গায়ক, বাদক, পটশিল্পী, সজ্জাকর ইত্যাদিরাই এখানকার অধিবাসী। চার হাজার জন বসবার একটা বিরাট প্রেক্ষা-গৃহ আছে, তেমন ভিড় হলে আরও হাজারখানেক লোকের দাঁড়িয়ে দেখবার ব্যবস্থাও হয়। নাটক অভিনয় করা নিয়ে এতো কান্ডকারখানা আমাদের দেশে কবে সম্ভব হবে বা কোনদিন সম্ভব হতেও পারবে কিনা তা নিয়ে আলোচনা করা বৃথা। এখন এখানে যে সংকট চলেছে, তাকে কাটিয়ে একটা চালু অবস্থার কথা ভাবাই হচ্ছে আশু কর্তব্য।

* * *

কলকাতার পেশাদার মঞ্চের বর্তমান অবস্থা হচ্ছেঃ উত্তর অঞ্চলের চারটে থিয়েটারের মধ্যে চলছে মাত্র একটি এবং বেশ ভালোভাবেই চলছে; বাকি তিনটের মধ্যে একটিতে খুচরো দলের পুরনো নাটক অভিনীত হচ্ছে শনি-রবিবার, অপর একটি নতুন অধিকারির হাতে পরিশুদ্ধ রূপে নিয়ে উদ্বোধিত হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, আর বাকিটি পরিত্যক্ত গৃহ হয়ে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে। দক্ষিণ কলকাতায় একদা একটা মঞ্চ খুলেছিল, কিন্তু সেটাও সিনেমাতে রূপান্তরিত হয়েছে এতোদিন হলো যে, সেকথা লোকে ভুলেই গিয়েছে একটা মাত্র চালু থিয়েটারে কজন শিল্পীর বা সংস্থান হতে পারে! ফলে পেশাদা মঞ্চের কয়েক শত শিল্পী এখন দলছাড়া হয়ে পড়েছেন। এদের মধ্যে অনেকে ছবিতে অভিনয় করছেন, মাঝে মাঝে বেতারের নাট্যাভিনয়েও কারুর কারু গলা শোনা যায়। কিন্তু ওভাবে কেউ নিজের উপার্জন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারছেন না। তাছাড়াও থিয়েটা এখানকার শিল্পীদের সত্যিকারের প্রাণে উৎস। মঞ্চে অভিনয় করার জন্য শিল্পী দের একটানা চরম দুঃখভোগের অন্ত নেই থিয়েটারের জন্যে ওদের কতো যে ত্যাগ তা হিসেবে কুলিয়ে ওঠা যায় না; আ সেই থিয়েটারের অভাবে ওদের প্রতিভা যেন নিষ্প্রভ। অনেকে, নাট্যাভিনয়ের সং তবু যাহোক যোগাযোগ থাকবে, কেবল মাত্র এই মোহতেই আজেবাজে সৌখী

এম পি প্রডাকসন্সের আগামী ছবি 'অগ্নি পরীক্ষা'তে সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার

দলের সঙ্গেও নেমে পড়েন। স্টারের পর নববেশে রঙমহল খুললে আরও কতক শিল্পীর হয়তো স্থায়ী ব্যবস্থা একটা হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মঞ্চের সঙ্গে অ-যুক্ত থেকে যাবেন ঐ দুটো থিয়েটারে যতোজন নিযুক্ত থাকবেন, তাদের চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যক। আজকাল আরও এক ধরনের পেশাদার শিল্পীর আবির্ভাব হয়েছে। স্থায়ী মঞ্চ বা পর্দার সঙ্গে এদের কোন যোগ নেই; এরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বিভিন্ন সৌখীন দলের যখন যাদের কাছ থেকে ডাক আসে গিয়ে অভিনয় করে দেন। দেখতে দেখতে এখন এরকম শিল্পী সংখ্যায় শতকেরও বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছেন। থিয়েটারই এদের এক-মাত্র জীবিকা কিন্তু তারাও উপার্জন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত নন। সব ধরে দেখা যায় যে, এখন চারটে থিয়েটারই পূর্ণোদ্যমে চললেও পেশাদার সব শিল্পীর স্থান সংকুলান হতে পারে না।

* * *

অপরদিকে দেখা যায় থিয়েটারের ওপরে লোকের ঝোঁক উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। নিতান্তই অগোছালভাবে রয়েছে তাই, তা না হলে বলা যেতে পারতো যে, এখানে নাকাসুরিক কেবলমাত্র একটি নাট্য-নগরী রয়েছে, কিন্তু এখানে সমগ্র বঙ্গ-দেশই একটি নাট্যরাজ্য। এখানে প্রবীন-নবীন, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শ্রমিক-মালিক, ডাক্তার-নার্স, কেরাণী, সাংবাদিক, লেখক-লেখিকা, উকিল-মোক্তার কয়েদী-পুলিশ প্রভৃতি সমাজের সকল শ্রেণীর স্ত্রীপুরুষকেই আজকাল থিয়েটার করতে দেখা যায়। অনেক প্রতিভারও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এদের মধ্যে যারা এদিকে পাকাপাকি কোন ব্যবস্থা দেখলে দেশের নাট্যশিল্পকে প্রভূত সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেন। প্রথমেই তো এদের ঠোকর খেতে হয় অভিনয় অনুষ্ঠিত করার জন্য মঞ্চ জোগাড় করতে। কলকাতায় পেশাদার মঞ্চ দুটি, ছুটির দিন সকালে গোটা দুতিন সিনেমার মঞ্চ, গোটা তিনেক বক্তৃতা মঞ্চ, রেল ও পোর্টকমিশনারের ইনস্টিটিউট, আর কয়েকটি স্কুল-কলেজের সমাবর্তন হল, এইসব নিয়ে মোট পনেরো-ষোলটি পাকা জায়গা আছে যেখানে থিয়েটার করা

চলে। এছাড়া অনেকে কাঁচা স্টেজ বে'ধে নিয়ে প্যাণ্ডেল খাটিয়ে অভিনয় করেন—ডেকরেটারদেরই বাজার গরম। কিন্তু তবুও দেখা যায়, যতো ক্লাব, রিক্রিয়েশন ক্লাব, সঙ্ঘ, পরিষদ, বিদ্যালয়, শিক্ষালয়, বিতান, আসর, এসোসিয়েশন প্রভৃতি নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করে, কলকাতার সব রকম কাঁচা পাকা ব্যবস্থা মিলিয়েও কোনক্রমেই জায়গা কুলিয়ে ওঠা যায় না। এমনিই স্বাভাবিক অবস্থাতেই গড়ে সপ্তাহে পনেরো-ষোলটি নাটক দেখার নিমন্ত্রণপত্র এসে পে'ছিয় শৌভিকের হাতে, তার ওপর পাল-পার্বণ এলে সেসংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধিলাভ করে। মনে রাখতে হবে, এসব নিমন্ত্রণ কেবলমাত্র নাটক দেখার, এছাড়া নৃত্যনাট্য, গানের আসর, ম্যাজিক প্রদর্শনী সে-সব তো আলাদা আছেই। একটা জিনিস অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন আজকাল, বিচিত্রানুষ্ঠানের হিড়িক। বিচিত্রানুষ্ঠান অর্থাৎ পাঁচমিশেলী অনুষ্ঠান' যে অনুষ্ঠানে নাচ, গান, ম্যাজিক, থিয়েটার প্রভৃতি বিবিধ প্রমোদ উপাদান একই সূচীর অন্তর্ভুক্ত করে পরিবেশিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এইসব আসরকে অতিরিক্ত আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ইচ্ছে করেই পাঁচরকম উপাদানের সমাবেশ ঘটানো হয়, কিন্তু বহুক্ষেত্রে আবার পারিপার্শ্বিকের চাপে এমন বহুতর প্রমোদশিল্পীকে এক আসরের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হয়, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে অনুষ্ঠান বসাবার জায়গার একান্ত অভাব।

* * *

নাটকের অভাবও বড়ো বড় কম নয়। কিন্তু তার জন্যে নাট্যালয়ের অভাবই দায়ী। নাটক অভিনীত হবার সুযোগ যেখানে নেই সেক্ষেত্রে নাটক রচনার প্রেরণা আসবে কোত্থেকে? লোকে নাটক লেখায় উৎসাহিত হতে পারে শিল্পী-মনের তাগিদে, কিন্তু যশ ও জীবিকার ধান্দাটাও নাট্যকারের আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই থাকে। আজে বাজে অনেক উটকো লোক নতুন নতুন নাটক লিখছে বিস্তর, সে পরিচয় যে কোন সপ্তাহের রবিবাসরীয় ক্রোড়পত্রে পুস্তক সমালোচনা বিভাগ থেকে জানা যায়। কোন কোন সৌখিন দলকেও মাঝে মাঝে নতুন নাটক অভিনয় করতে দেখা যায়, কিন্তু তেমন বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য হয় না এসব সৌখিন সম্প্রদায় অভিনীত কোন নতুন নাটক নিয়ে। তার কারণ, পেশাদার মঞ্চে পরীক্ষিত না হ'লে কোন নাটকের প্রতিভা বড় একটা স্বীকৃতি লাভ করে না। কয়েকটি মাত্র এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। স্থায়ী মঞ্চের অধিকারী না হ'লেও পেশাদার নাট্যকে দল কয়েকটি গড়ে উঠেছে, যেমন বহুরূপী, শিল্পশ্রী, উত্তর সারথি, আনন্দম প্রভৃতি। এরা নতুন নাটক পরিবেশন করেন এবং সাধারণ সৌখীন দলের মত মাত্র একবার কো[ন] এক উপলক্ষ্য ধ'রে অভিনয় ক'রে ক্ষা[ন্ত] না হয়ে, নাট্যাভিনয়ের সাফল্য অনুযায় বারকতকই পুনরভিনয়ের ব্যবস্থা করেন অনেক সময় মফঃস্বলে গিয়েও অভিন[য়] করে আসেন। তবুও এরা যেসব নাট[ক] পরিবেশন করেন সে নাটকগুলি অন[্য] কোন দলকে ক্বচিৎ স্পর্শ করতে দেখা যায় যত মনোজ্ঞ ও আধুনিক ভাবাপন্ন নাটক এ'রা এনে হাজির করে দেন না কে[ন]

সাধারণ সৌখিন দলগুলি সে-সব নাটকের মধ্যে দিয়ে নিজেদের অভিনয় প্রতিভা স্ফুরিত করে তোলায় কেমন যেন আস্থার অভাব অনুভব করেন। অভিনয় হবে তো একবার, সেক্ষেত্রে নতুন কিছু করতে গিয়ে না তা কাণ্ড ক'রে বসার ঝুঁকি কে-ই বা নিতে চায়! তার চেয়ে পেশাদার মঞ্চের অতি জনপ্রিয় নাটক ধরাই ভালো—লোকের কাছে এসব নাটকের আবেদন আগে থেকেই হয়ে রয়েছে; আর নাটকগুলি কিভাবে পরিবেশিত হয়েছে, অভিনয়ের কেমনতরো সব কায়দা তা আগে থেকেই সব দেখে রাখা গিয়েছে। জনপ্রিয় নাটক অভিনয় করায় সৌখিন দলের এ এক মস্ত সুবিধে। কিন্তু পেশাদার মঞ্চে পর্যাপ্ত সংখ্যক নতুন নাটকই বা সম্ভব হয় কি করে? একখানা নাটক জমে গেলে যে কতদিন চলে তা স্টারের "শ্যামলী" থেকেই দেখা যাচ্ছে: আট মাসেরও ওপর হয়ে গেল ওখানে দ্বিতীয় নাটক পড়বার সুযোগ মেটেনি—আর, জনপ্রিয়তা বজায় থাকতে নাটককে বন্ধ করে নতুন নাটক নিয়ে আসরেও মানে হয় না। হালে দু' তিন বছরের মধ্যে যেমন জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়েছে আর দু'খানি নাটকের নাম করা যায়—"নিষ্কৃতি" আর "আদর্শ হিন্দু হোটেল"। অর্থাৎ সৌখিন দল এই ক'বছরে মাত্র তিনখানি নতুন নাটক পেয়েছেন যেগুলি তাঁরা নির্দ্বিধায় অভিনয় করে যেতে পারেন। তাও আবার হয়তো অনেক দলের পক্ষে এ নাটকের কোনটিই হাতে নেবার মত অবস্থা অনুকূল নাও হতে পারে—সৌখিন দলের অনেক অসুবিধে, অনেক রকমের ফ্যাচাং আছে, যে জন্যে যত ভালোই হোক্, যে কোন নাটক করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে এঁদেরকে আদিকালের পুরনো নাটকই বেছে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। নতুন নাটকের সঙ্গে সৌখিন দলের সম্পর্ক এমনভাবে ব্যক্ত করার কারণ হচ্ছে, নাটক অভিনয় ছাড়া নাট্যকারের আর একটা লাভ হয় পুস্তকাকারে তার প্রচার। যারা অভিনয় করতে অভিলাষী তারাই নাটক পড়ে; অর্থাৎ সৌখিন নাট্যকে দলগুলি। এদের দ্বিতীয় নাটক পড়ে মনোমত একখানি নির্বাচন করার সময় সুযোগ থাকে না, কাজেই এঁরা নাম-করা নাটকই পড়ে দেখেন। অর্থাৎ পেশাদার মঞ্চে অভিনীত হয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন না করলে গ্রন্থাকারে নাটকের কোন প্রচার সম্ভাবনা থাকে না—নাটক রচনায় নিরুৎসাহিত হবার এটাও একটা সম্ভাব্য কারণ।

* * *

সব দিক খুঁটিয়ে দেখা যাচ্ছে, নাটক করবার লোক আছে, নাটক দেখবারও লোক আছে, নেই কেবল নাট্যালয়। আর নাট্যালয়ের অভাবের জন্যেই নাটকেরও অভাব। এখানে একটা প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে, থিয়েটার জিনিসটি একান্তই শহুরে ব্যাপার। গ্রামেও থিয়েটার হয়, কিন্তু থিয়েটারের সব বৈশিষ্ট্য ও আঙ্গিক যথাযথ রক্ষা করা গ্রামে সম্ভব হয় না। গ্রামের অভিনয় ব্যবস্থার জন্যে রয়েছে যাত্রা এবং সেইটাই প্রশস্ত ও বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার থেকে থিয়েটার এবং লোকপ্রমোদের অন্যান্য ব্যবস্থাদি করা নিয়ে জল্পনা ও পরিকল্পনার কথা শোনা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উৎসাহে দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত

'শবাব' চিত্রে ভারতভূষণ ও নূতন

অশোককুমার প্রডাকসন্সের "সমাজ" চিত্রে ঊষাকিরণ ও অনুপকুমার

হয়েছে সঙ্গীত নাটক একাডেমি। প্রতি রাজ্যে তার শাখা খোলার চেষ্টা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যও একটা পরিকল্পনা নিয়ে নেমেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা যে এখন কোন্ অবস্থায় গিয়ে পেঁৗছেছে তার আর কোন আভাস মাত্রও পাওয়া যায় না, আর প্রচার বিভাগও লোককে তা জানাবার প্রয়োজনও বোধ করে না। তবুও শোনা যায়, সরকারী পরিকল্পনার একটা অংশ কার্যকরী হয়েছে, সেটা হচ্ছে অভিনয় শিক্ষা দান। জানা গেল, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ইতিমধ্যেই ক্লাস খুলেছেন এবং ছাত্রও গ্রহণ করা হয়েছে। আর কোন্‌দিকে কি হচ্ছে তা কাণা-ঘুষাতেও শোনা যায় না। হয়তো কিছু হচ্ছে, হয়তো কিছুই হচ্ছে না। তবে কিছু হবার সম্ভাবনা যে আছে সেটা মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের কথাবার্তা থেকে অনুমান করা যায়; অন্তত বোঝা যায় যে, তিনি কিছু করতে চান।

* * *

নাট্যালয় সম্পর্কে কোন সংহত ব্যবস্থা করতে গেলে যে ক'টি দিক আগে স্মরণে রাখা দরকার ওপরে তাই নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যে কোন পরিকল্পনাই হোক্ তার মধ্যে অভিনয়-শিল্পীদের স্থায়ীভাবে জীবিকা অর্জনের সুযোগ, নাট্যামোদীদের অভিনয় কু এবং অভিনয় দেখবার যথেষ্ট ম ব্যবস্থা এবং নাটক রচনায় যাতে কে উৎসাহিত হতে পারে আশ্বাসভরা ে কোন ব্যবস্থা। এগুলো হচ্ছে (প্রয়োজনের দিক। এদিকটা সামলে ও পর তখন অনেক কিছু করা যেতে পা কারণ ততদিনে দেশের জনসাধারণের থিয়েটার সম্পর্কে একটা সচেতনতা (উঠতে পারবে। তখন একটা কিছু ব চাইলে জনসাধারণের সর্বাত্মক সহযো পাওয়াও অসম্ভব হবে না। আর সাধারণের সহযোগিতা লাভ করতে প এই কলকাতাতেই এমন বিরাট না গড়ে তোলা যাবে যা পৃথিবীর ে কাছে একটা অবশ্য দ্রষ্টব্য স্থান তখন চেষ্টা করা যাবে একটা পশ্চি জাতীয় অর্কেস্ট্রা গড়ে তোলার, আছে নিউ ইয়র্ক, বার্লিন, লণ্ডন,

প্রভৃতি ইউরোপ, আমেরিকার বহু রাজ্যে। আরও অনেক কিছু করা যেতে পারবে যার মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তার গৌরব বৃদ্ধি লাভ করবে। থিয়েটারের জন্য লাইব্রেরী, মিউজিয়ম, কলেজ আরও কত কি করবার রয়েছে। কিন্তু সব তখনই সম্ভব হতে পারবে যখন জনসাধারণ থিয়েটার সম্পর্কে সজাগ হবে আর জনসাধারণকে সজাগ করতে গেলে সরকারকে এমন কিছু করতে হবে যার পিছনে আশ্বস্ত হবার মত সুস্মিত মনের সন্ধান পাওয়া যাবে।

গীতবিতান সম্মিলনী

গত ৩০শে মে ময়দানের আই টি এফ প্যাভেলিয়ন মঞ্চে গীতবিতান সম্মিলনীর এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। ছাত্রছাত্রিবৃন্দ কর্তৃক প্রারম্ভে রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও নৃত্য অনুষ্ঠানের পর "বৈকুণ্ঠের খাতা" অভিনীত হয়। নীহারবিন্দু সেন, প্রশান্ত বসু, বিমল নাগ, কিরণ চক্রবর্তী, তরুণ মিত্র প্রভৃতি অভিনয়ে প্রশংসা অর্জন করেন। গানে প্রশংসিত হন শুক্লা বিশ্বাস। সম্মিলনীর পক্ষ থেকে অনাদি দস্তিদার ভবিষ্যৎ কার্যবিবরণী পেশ করেন।

টি-বোর্ড ক্লাবের কৃতিত্ব

গত ২৯শে মে সোমবার স্টার রঙ্গমঞ্চে সেণ্ট্রাল টি-বোর্ড রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে শরৎচন্দ্রের রচনা অবলম্বনে সামাজিক নাটক 'রমা' অভিনীত হল। কলকাতায় আজকাল পেশাদারি রঙ্গমঞ্চগুলির ভাঙ্গা মঞ্চই শুধু পড়ে আছে রঙ্গাভিনয় আর নেই। এ-অবস্থায় কলকাতায় মঞ্চাভিনয়ের গরিমাময় ঐতিহ্যের ধ্বনি জ্বালিয়ে রেখেছে অপেশাদারি ক্লাব আর সৌখিন থিয়েটারের দল। সেদিন টি-বোর্ড ক্লাবের উদ্যোগে 'রমা' অভিনয় দেখে বার বার এই আশার কথাই মনে জাগছিল যে, অপেশাদারি ক্লাব ও থিয়েটারের দল যদি নিষ্ঠার সঙ্গে নতুন পরিকল্পনায় নতুন অভিনয়-শিল্পীদের নিয়ে মাঝে মাঝে মঞ্চাবতীর্ণ হন তাহলে বাঙলার থিয়েটার সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হবার কোনো কারণ থাকে না। ন্যাশনাল থিয়েটার আমাদের দেশে যতদিন না হচ্ছে ততদিন বাঙলা থিয়েটারের মর্যাদাকে এই-ভাবেই অক্ষুন্ন রাখতে হবে।

শরৎচন্দ্রের 'রমা' নাটকে বাঙলার পল্লীসমাজের একটি বিশেষ চিত্র ধরা দেয়; সে-চিত্র হিংসায়, কুটিলতায় ক্রুর আবার প্রেমে ভালবাসায় ও ত্যাগে মহৎ। নাটকের পরিচালক অভিনয়ের প্রারম্ভে রবীন্দ্র-নাথের বিখ্যাত 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটির প্রথম দুটি কলি শুধু বাঁশির সুরে শ্রোতাদের কানে তুলে ধরে যবনিকা উত্তোলন করেছেন এবং অভিনয় শেষও করেছেন এই সুরটিই শ্রোতাদের কানে তুলে দিয়ে। শরৎচন্দ্র 'রমা' নাটকের মধ্যে পল্লীগ্রামের এক-একটি চরিত্র অত্যন্ত নগ্নরূপেই প্রকাশ করছেন, আবার মহৎ চরিত্রগুলিকেও সামনে তুলে ধরতে কার্পণ্য করেন নি। ভালয়-মন্দয় মেশানো এই পল্লীগ্রামকে তবু আমরা ভালবাসি। এদের সুখে আমাদের মন আনন্দে ভরে ওঠে, এদের দুঃখে বেদনাশ্রুতে আমাদের চোখ আপ্লুত হয়।

সেদিনের অভিনয়ে পল্লীগ্রামের এক-একটি টাইপ চরিত্রের অভিনেতারা পল্লীসমাজের বিভিন্ন চরিত্র রূপায়নে আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সবচেয়ে প্রশংসনীয় কীর্তি হচ্ছে মঞ্চে পল্লী-পরিবেশ রচনার প্রয়াস। একতারা হাতে বাউলের নাচ ও গান, মুদিব দোকানের সামনে কবিয়ালের গান, জমিদার-বাড়িতে ছোট ছেলেদের মিষ্টি বিতরণ প্রভৃতি ছোটখাটো পটভূমিকা অভিনয় রসঘন হয়ে ওঠায় সহায়তা করেছে।

প্রধান দুটি চরিত্র অর্থাৎ রমেশ ও বেণীর ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় ক'রেছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন। অপেশাদারী ক্লাবের যাঁরা অভিনেতা তাঁদের কাছ থেকে আমরা সব সময় আশা করি যে, যে-নাটক অভিনয় করবেন তা বহুবার পড়ে তার চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য ও গভীরতা ভাল করে নিজের ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধি করে রূপ দেবেন। তা না করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, পেশাদার মঞ্চের প্রিয় অভিনেতার ব্যর্থ অনুকরণই শুধু তাঁরা করে থাকেন, এমন কি মুদ্রাদোষগুলি পর্যন্ত। অভিনয় দেখে কেন দর্শকের মনে হবে যে, রমেশ মহেন্দ্র গুপ্তের অনুকরণ করছেন বা বেণী অহীন্দ্র চৌধুরীর? তাছাড়া রমেশ ও বেণীর অভিনয় দেখে মনে হল ঐতিহাসিক নাটক অভিনয়েই এ'রা দক্ষ, সামাজিক নাটকে নয়। বাচনভঙ্গির কৃত্রিমতাই বার বার একথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। অনুকরণ করে নয়, নিজের কল্পনায় চরিত্রকে নূতন রূপে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা থাকলে দর্শকদের কাছে তা অধিকতর উপভোগ্য হয়। টি-বোর্ড রিক্রিয়েশন ক্লাবের অভিনয়-শিল্পীদের উৎসাহ আছে, উদাম আছে, অনলস পরিশ্রমে তাঁরা কাতর নন। ভবিষ্যতে এ'দের কাছে তাই নতুন নাটকের মঞ্চরূপ নতুন পরিকল্পনায় পেতে চাই।

খেলার মাঠে

একলব্য

বুট পরে ফুটবল খেলার নিয়ম চালু হবার পর কলকাতার জুনিয়র টিমগুলোকে বুট পরে খেলার বাধ্যবাধ্যকতা থেকে রেহাই দেওয়া কতখানি ভ্রমাত্মক—গত সপ্তাহে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। খালি পায়ের ফুটবল খেলার সূক্ষ্ম নৈপুণ্যের স্বাভাবিক গতিকে কৃত্রিমতার চাপে ব্যহত না করে গোড়া থেকে বুট পরে খেলার নির্ভুল পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, এবং তাতে সুফল পাবারও আশা বেশী। কিন্তু গোড়া থেকে কাদের শিক্ষা দিতে হবে? এক যুগ বা তারও বেশী সময় ধরে যারা খালি পায়ে খেলে আসছেন নিশ্চয়ই তাদের নয়। নৈপুণ্যগত উৎকর্ষের চিরাচরিত অভ্যাসকে ভিন্ন ধারায় চালিত করবার অর্থ উভয়কেই বিসর্জন দেওয়া। এতে করে খেলার মধ্যে না থাকে পূর্ব নৈপুণ্যের ছাপ, না পাওয়া যায় 'বুটেড' ফুটবলের বলিষ্ঠ ক্রীড়াপদ্ধতি। তাই 'বুটেড' ফুটবলের পরিপ্রেক্ষিতে গুণী খেলোয়াড় তৈরী করতে হলে বেছে বেছে উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড়দেরই খেলা শেখাতে হবে। শিক্ষার্থী সংগ্রহ করতে হবে ছাত্রসমাজ এবং ছোট ছোট ক্লাবের মধ্য থেকে,—যাদের মধ্যে রয়েছে ভবিষ্যৎ খেলোয়াড় জীবনের সুপ্ত প্রতিভা, যারা গুণী ক্রীড়াবিদ হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জনের আশা রাখে, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সংসার আবর্তের কঠিন কর্মশালায়।

* * * *

খ্যাতিমান খেলোয়াড়ের প্রতিষ্ঠা সর্বত্র। কর্মসংস্থানের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও একজন গুণী খেলোয়াড়ের পক্ষে একটা কর্মসংস্থান করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। আমাদের দেশে অর্থকরী বিদ্যাই অভিভাবকের প্রধান লক্ষ্য থাকে। কিন্তু একজন গ্রাজুয়েটের পক্ষে যে চাকুরী সংগ্রহ করতে হিমসিম খেয়ে উঠতে হয়, সাধারণ শিক্ষিত একজন খেলোয়াড়ের পক্ষে সে চাকুরী সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য হয় না। তাই কোন ক্রীড়াসংস্থার নিয়ন্ত্রনাধীন সুপরিকল্পিত শিক্ষা পরিকল্পনায় পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র বা ভাগিনেয়কে শিক্ষা গ্রহণ করতে দেখলে কোন অভিভাবকই উদ্বিগ্ন বোধ করবেন না, যদি তারা বোঝেন এ দ্বারা সমাজের এবং তাদের পরিবারের মঙ্গল হবে। কিন্তু পরিকল্পনাহীন শিক্ষা প্রচেষ্টায় অধিকাংশ খেলোয়াড়ই প্রকৃত গুণী খেলোয়াড় তৈরী হতে পারেন না। অধিকন্তু খেলার নেশায় অনেকের ছাত্রজীবনেও ছেদ পড়ে। এদিকে লক্ষ্য রেখেই বেঙ্গল লন টেনিস এসোসিয়েশন এক অভিনব শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। অভিজাত সম্প্রদায় এবং ধনীর খেলা বলে যে টেনিস খেলা এতদিন সাধারণের নিকট অনাদৃত ছিল—বেঙ্গল লন টেনিস এসোসিয়েশন বিনা ব্যয়ে সেই খেলা শেখাবার জন্য একদল তরুণ শিক্ষার্থী বেছে নিয়েছেন। এদের অঙ্কুরিত প্রতিভাকে দীপ্ত করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার সকল ব্যবস্থাই এসোসিয়েশন করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের টেনিস র‍্যাকেট, বল এমন কি প্রয়োজন হলে পোষাক পরিচ্ছদও সরবরাহ করা হবে। আগ্রহশীল দরিদ্র টেনিস শিক্ষার্থীর সাধারণ শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতেও তারা পশ্চাদপদ হবেন না। বেঙ্গল লন টেনিস এসোসিয়েশন ১৬ বছরের বেশী বয়সের কোন শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করেন নি। শিক্ষার্থীদের বয়স ১০ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

আমাদের দেশের ফুটবল খেলার মান উন্নত করতে হলে বেঙ্গল লন টেনিস এসোসিয়েশনের শিক্ষা পরিকল্পনার অনুরূপ পরিকল্পনা অথবা ইহা অপেক্ষা আরও ব্যাপক শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ধেড়ে খেলোয়াড়দের খেলা শেখাবার প্রচেষ্টায় খেলোয়াড়দের খেলা শেখাবার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থেকে খেলা শেখাতে হবে কিশোর তরুণদের। আমাদের দেশের শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে অন্যান্য দেশের শিক্ষা পদ্ধতির কতখানি পার্থক্য এ সপ্তাহের দুখানা ছবিতে তা দেখাবার চেষ্টা করছি। একখানা ছবিতে

মোহনবাগান ও উয়াড়ী ক্লাবের লীগের খেলায় উয়াড়ী দলের গোলের মুখের এক বিপজ্জনক অবস্থা। গোলরক্ষক বলটি 'ফিস্ট' করবার জন্য এগিয়ে গেছেন

দুই দেশের শিক্ষা পদ্ধতির পার্থক্য। উপরের ছবিতে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হাঙ্গেরীর ফুটবল অধিনায়ক ফেরেংক পুসকাসকে ছোট ছোট ছেলেদের ফুটবল খেলার কৌশল শেখাতে দেখা যাচ্ছে। আর নীচেরটি দক্ষিণ ভারতের এক ফুটবল শিক্ষাকেন্দ্রের ছবি। এখানে ফুটবল খেলার কৌশল শিখছেন বয়স্ক খেলোয়াড়গণ—যারা ইতিপূর্বেই আধা-খেলোয়াড়ে পরিণত হয়েছেন

খা যাবে। **অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হাঙ্গেরীর** ুটবল **অধিনায়ক ফেরেঙ্ক পুস্কাস্** দাপেস্টে ছোট ছোট ছেলেদের ফুটবল খেলা শেখাচ্ছেন; অপর ছবিতে দেখতে পাবেন রতের কোন এক প্রধান ফুটবল কেন্দ্রে ড়ে খেলোয়াড়দের খেলা শেখানো হচ্ছে। ঢয় দেশের শিক্ষা পদ্ধতির এই পার্থক্যই রতের সঙ্গে অন্যান্য ফুটবলপ্রিয় দেশের ড়ামানের বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। ই আজ প্রয়োজন নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর। লা শেখাতে হবে ছোট ছোট ছেলেদের। ছের গোড়ায় জল না দিয়ে আগায় জল ার কোন মানে হয় না। ভিত পোক্ত না এই বিরাট সৌধ গড়বার প্রচেষ্টা হাস্যকর। ় প্রচলনের ক্ষেত্রে আই এফ এ'র নীতিতে প্রচেষ্টারই আভাস পাওয়া গেছে।

* * *

া ছাড়া বর্তমান বিধি-ব্যবস্থায় খেলা নারই বা সুযোগ কোথায়? খেলা শেখা দূরের কথা অনুশীলনেরও সুযোগ নেই। দানে অত্যধিক ভীড়। নিত্য নূতন ক্লাব গ়ে উঠছে। কলকাতা ময়দানের ১৮টি ১৮ শ'র বেশী শুধু লীগের খেলাই ষ্ঠিত হয়। এর পর আছে এক আউটের ক ডজন প্রতিযোগিতা আর প্রদর্শনী া; কোন কোনবার জাতীয় ফুটবলও াতায় অনুষ্ঠিত হয়। এবার আবার শীয় ফুটবল এখানে অনুষ্ঠিত হবার । প্রায় তিনশ ক্লাবের পাঁচ সহস্রাধিক ায়াড়ের পক্ষে ময়দানের ১৮টি মাঠ নতই অকিঞ্চিৎকর। ক্লাব এবং প্রতি-তার সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। সঙ্গে খেলাও বাড়ছে, কিন্তু মাঠ বাড়ছে না। মাঠের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ক্লাবের উপর লেও মাঠ তো আর ক্লাবের নিয়ন্ত্রণাধীন যে সেখানে তরুণ খেলোয়াড়দের খেলা নো যাবে। সকালে অনুশীলন করা যায় কিন্তু বিকেলে আই এফ এ'কে মাঠ ছেড়ে হবে। তাদের ব্যবস্থামত সেখানে া লীগের বা নক আউটের খেলা হয়ে । কিন্তু স্কুল কলেজের পড়া এবং সের তাড়ার মধ্যে ক'জন শিক্ষার্থী লে খেলা অনুশীলনের সুযোগ পায়? ন ছাড়া শহরের পার্কে এবং স্কোয়ারে অনুশীলন করবারও উপায় নেই। র নর্থ ক্যালকাটা স্পোর্টস এসোসিয়েশন, শুধু পার্ক এদের দখলে। ২২টি ক্লাবকে গে ভাগ করে এরা নর্থ ক্যালকাটা লীগ লনা করে আসছে। দক্ষিণ কলকাতায় হ সাউথ ক্যালকাটা স্পোর্টস ফেডারেশন। ট ক্লাবকে নিয়ে এরাও দুটো লীগ চালিয়ে । এদের ক্রীড়াভূমি লেক সংলগ্ন দুটো পার্ক সার্কাস ময়দানে জে'কে বসে সাউথ ইস্ট ক্যালকাটা স্পোর্টস রেশন। এদের পরিচালিত দুটো লীগে

'বিশ্বের বিস্ময়' দূরপাল্লার দৌড়বীর এমিল জেটোপেকের দৌড়ের দৃশ্য।

১৬টি করে দল। ছোট ছোট পার্কেও 'সিক্স-এ-সাইড', 'সেভেন-এ-সাইড' লীগ ও নক আউট প্রতিযোগিতার অন্ত নাই। সুতরাং স্থান কোথায়? "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী"। তাই ফুটবলের শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হলে ১২ মাসের জনাই সে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যাতে করে মরসুম ছাড়াও শীতকালে অনুশীলন করা যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে মাঠ বাড়াবারও চেষ্টা করা প্রয়োজন। এর থেকে দুই তিনটি মাঠ শুধু শিক্ষার জনাই পৃথক করে রাখতে হবে। নীচে আমরা সমস্ত লীগ খেলা, তাতে যোগদানকারী দলের নাম এবং মোট খেলার একটি হিসাব দিচ্ছি। এ থেকে কলকাতা ফুটবল লীগের কর্মতৎপরতার কিছু আভাস পাওয়া যাবে।

লীগ ও ক্লাবের সংখ্যা	খেলার সংখ্যা
প্রথম ডিভিসন লীগ	
১৫টি ক্লাব (রিটার্ণ ম্যাচ সহ)	২১০
দ্বিতীয় ডিভিসন	
১৬টি ক্লাব	১২০
তৃতীয় ডিভিসন	
১৬টি ক্লাব	১২০
চতুর্থ ডিভিসন	
১৬টি ক্লাব	১২০
বেঙ্গল সকার লীগ	
১৮টি ক্লাব	১৫৩
এলেন লীগ	
এ গ্রুপ—১২টি ক্লাব	৬৬
বি গ্রুপ—১২টি ক্লাব	৬৬
পাওয়ার লীগ	
'এ' গ্রুপ—১৩টি ক্লাব	৭৮
'বি'গ্রুপ—১৩টি ক্লাব	৭৮
'সি' গ্রুপ—১৪টি ক্লাব	৯১
পাওয়ার লীগ	
দ্বিতীয় ডিভিসন—১২টি ক্লাব	৬৬
প্রথম ডিভিসন অফিস লীগ	
'এ' গ্রুপ—১১টি ক্লাব	৫৫
'বি' গ্রুপ—১১টি ক্লাব	৫৫
দ্বিতীয় ডিভিসন অফিস লীগ	
'এ' গ্রুপ—১১টি ক্লাব	৫৫
'বি' গ্রুপ—১১টি ক্লাব	৫৫
'সি' গ্রুপ—১১টি ক্লাব	৫৫
তৃতীয় ডিভিসন অফিস লীগ	
'এ' গ্রুপ—১১টি ক্লাব	৫৫
'বি' গ্রুপ—১১টি ক্লাব	৫৫
'সি' গ্রুপ—১১টি ক্লাব	৫৫
চতুর্থ ডিভিসন অফিস লীগ	
'এ' গ্রুপ—১১টি ক্লাব	৫৫
'বি' গ্রুপ—১১টি ক্লাব	৫৫
'সি' গ্রুপ—১১টি ক্লাব	৫৫
আন্তঃকলেজ লীগ	
'এ' গ্রুপ—৮টি ক্লাব	২৮
'বি' গ্রুপ—৯টি ক্লাব	৩৬
মোট ক্লাব ২৯৫টি	মোট খেলা ১৮০৭

[এর মধ্যে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা-গুলো ধরা হয়নি]

* * *

৫ই জুন ক্যালকাটা ফুটবল লীগের প্রথম চ্যারিটি খেলা অনেক আলাপ আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান ও এরিয়ানের খেলাটিই চ্যারিটি ম্যাচ হিসাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। প্রথমে অবশ্য এই খেলাটিকেই চ্যারিটির জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, কিন্তু আশানুরূপ অর্থ সমাগমের অনিশ্চয়তার মাঝে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে উয়াড়ী বা মহমেডান দলের খেলাটি চ্যারিটি ম্যাচ হিসাবে খেলানর প্রস্তাব হয়। যাই হোক লীগ খেলায় বর্তমান অবস্থায় মোহনবাগানের সঙ্গে

ইস্টবেঙ্গলের খেলা ছাড়া এই দুটি ক্লাবের একটির সঙ্গে অপর যে কোন ক্লাবের খেলার ব্যবস্থাই হোক না কেন অর্থের দিক দিয়ে সেটা বিশেষ লাভজনক হবে না। তবে যে কোন খেলার মধ্যে 'চ্যারিটি' কথাটি বিশেষণ হিসাবে যোগ করে দিতে পারলেই এক শ্রেণীর লোকের খুব সুবিধা হবে এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কলকাতার মাঠে চ্যারিটি খেলা হতে প্রতি বছর যে বিপুল অর্থ সংগৃহীত হয় দর্শক সাধারণ তার খোঁজ রাখেন কি? এই বিপুল অর্থের মোটা অংশই খরচ হয় আই এফ এ-র কতিপয় ভাগ্যবানের নবাবীয়ানার মাসুল যোগাতে। খেলোয়াড়দের পরিশ্রমে অর্জিত এই অর্থের কতটুকু খেলোয়াড়ের সুখ সুবিধার জন্য ব্যায়িত হয়? বা যাদের ট্যাঁক থেকে বছর বছর এই অর্থ সংগৃহীত হচ্ছে আই এফ এ কর্তৃপক্ষ সেই দর্শক সাধারণের খেলা দেখার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কি ব্যবস্থা করেছেন? প্রাচ্যের সর্ববৃহৎ ক্রীড়াসংস্থা আই এফ এ-র সভাপতি এবং সম্পাদক এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবেন? কোন উত্তরই নেই। চ্যারিটি ম্যাচের সংগৃহীত অর্থ আই এফ এ কর্তৃপক্ষ খেয়ালখুসী মত কি ভাবে খরচ করেন নীচে তার দুটি হিসাব দিচ্ছি। এ থেকে জনসাধারণ উপলব্ধি করতে পারবেন খরচের ফিরিস্তির মধ্যে কোনটা যুক্তিসংগত এবং কোনটা অযৌক্তিক। একটা এমেচার এসোসিয়েশনে কায়েমী স্বার্থ পোক্ত করে যারা খেয়াল খুসীমত পরের অর্থে নবাবী করছেন তাদের মুখোস খুলে দেওয়া আজ একান্ত প্রয়োজন।

মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল

লীগের চ্যারিটি খেলা

তারিখ—১৩ই জুন '৫৩

ব্যয়ঃ—

	টাঃ	আঃ	পাই
প্রিণ্টিং ও ষ্টেশনারী ...	৫৯৫	০	০
চেয়ার ভাড়া ...	৪০	০	০
জলযোগ ...	১৫৪	১১	০
পানীয় জল ...	৪৫২	৯	০
লেমনেড ...	১০৫	৪	০
গেট কিপার ...	৬২০	৮	০
পোস্টেজ ...	৯	২	৬
টেলিফোন ...	১৫	০	০
যাতায়াত ব্যয় ...	৭৯৯	২	০
এ্যাম্প্লিফায়ার ...	২৭	০	০
মালীদের বক্‌শিশ ...	৭০	০	০
অডিট ফি ...	৭৫	০	০
টিকিটের অনাদায়ী মূল্য ও অচল মুদ্রা ...	২৬৯	০	০
মোট ...	৩২৩২	৫	৩

আয়ঃ—

	টাঃ	আঃ	পাই
টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ	৩৫,১৪৬	০	০
বাদ খরচ	৩,২৩২	৫	৩
মোট লাভ	৩১,৯১৩	১০	৯

ইস্টবেঙ্গল : উয়াড়ী

আই এফ এ শীল্ড—সেমি-ফাইন্যাল

চ্যারিটি খেলার ব্যয়

	টাকা	আনা	পাই
প্রিণ্টিং ও স্টেশনারী ...	১০৪৫	৮	০
বিজ্ঞাপন	৫৮৮	১২	০
চেয়ার ভাড়া ...	৪০	০	০
জলযোগ ...	৫০	৫	৬
গেট কিপার ...	৩৯৩	১	৩
টেলিফোন খরচ ...	১৫	০	০
মালপত্র যাতায়াত খরচ ...	১৬	০	০
মাঠের মালীদের বক্‌শিশ	৪৫	০	০
হিসাব পরীক্ষা ফী ...	৭৫	০	০
যাতায়াত	১	৪	০
আগন্তুক দলের খরচ ...	৩১১৯	১৩	০
প্রমোদ কর	১৭৩৮	১২	০
হেডওয়ার্ড কোম্পানীর অংশ	১০৩৫	১০	০
মোট ...	৮১৬৪	১	৯

আয়ঃ—

	টাকা	আনা	পাই
টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ ...	৮৬৯৩	১২	০
দান	২৬৬	০	০
মোট ...	৮৯৫৯	১২	০
বাদ খরচ ...	৮১৬৪	১	৯
নীট আয় ...	৭৯৫	১০	৩

[এই হিসাব চার্টার্ড এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জ রীড এণ্ড কোম্পানী দ্বারা পরীক্ষিত এ হিসাব নির্ভুল বলেও ঘোষণা করা হয়েছে।]

দুটো খেলার খরচের তারতম্য সহজে অনুমেয়। যেখানে মোহনবাগান এবং ইস্ বেঙ্গলের চ্যারিটি খেলার জন্য প্রিণ্টিং স্টেশনারী খরচ হয়েছে ৫৯৫৲ টাকা সেখা ইস্টবেঙ্গল ও উয়াড়ীর খেলার জন্য প্রিণ্টিং স্টেশনারী ব্যয় হাজার টাকারও বেশী হ কেন? মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের খেল লেমনেডের জন্য একশ টাকা লাগলে খেলোয়াড় রেফারী ও লাইনস্‌ম্যান ছাড়া এ লেমনেড কারা খেয়েছিলেন? এর পর আব সাদা জলের জন্য সাড়ে চারশ টাকার মত খ হয়েছে কেন? কলকাতা কি তখন শু মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল যে সাড়ে চার টাকার সাদা জল সরবরাহ করা হল। সব জানে কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতি বিনা ব্য মাঠে জল সরবরাহ করে থাকে এবং এই সে পরায়ণতার জন্য আই এফ এর তরফ থে তাদের ধন্যবাদ দেওয়া হয়েছে। ইস্টবেঙ্গ এবং উয়াড়ীর খেলায় ভিজিটিং টিমের খ দেখান হয়েছে ৩,১১৯ টাকা আনা। এখা ভিজিটিং টিম কোন্‌টি? খেলাটি অনুষ্ঠি হয়েছিল মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল মাঠে। ইস বেঙ্গল তো ঘর ছেড়ে উঠোনে নে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে আর উয়াড়ী ক্লাব এসে একই পাড়ার অপর বাড়ী থেকে। তবে খরচের কারণ কি? গেট কিপারদের জন্য প্র চ্যারিটি খেলায় চারশ' থেকে ছয়শ' টাকা খ হয়ে থাকে এবং গতবারের অসমাপ্ত ফুট মরসুমেও চ্যারিটি খেলার জন্যই গেট কি খাতে খরচ হয়েছে সাড়ে বারো হাজার টাব গেট রক্ষার জন্য এই বিপুল অর্থব্যয়ের কোন প্রয়োজন আছে? চ্যারিটি খেলায় ল বাজারের সদর দপ্তরই তো প্রায় ময়দ স্থানান্তরিত হয়। পুলিশের উপর রক্ষার ভার দিলে আই এফ এর কি ক্ষ তাদের উপর আস্থা না থাকলে মিলিটা হাতে দেওয়া যেতে পারে। তারা আনন সঙ্গেই এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন তা নজির আছে। তবে এই অপব্যয় কেন? ভাবে প্রতি বছর আই এফ এর বহু বাঁচানো যেতে পারে এবং এই অর্থের দ্বা সারা বছরের জন্য এক একটা ট্রেনিং খে সম্ভব।

ফুটবল খেলার সাপ্তাহিক আলোচনা

২৫শে মে তারিখ পর্যন্ত লীগ খে ফলাফল নিয়ে গত সপ্তাহের দেশ পত্রি লীগ কোঠা প্রকাশ করা হয়েছে। এ সপ্ ২৬শে মে থেকে ১লা জুনের খেলাগু আলোচনা করছি।

লীগ চ্যাম্পিয়ন ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব পর্যন্ত একটি পয়েণ্টও নষ্ট করেনি পাঁচটি খেলায় উপর্যুপরি জয়লাভের ক

ফ্রেঞ্চ লন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের মহিলাদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন মিস মৌরিন কনোলী। আমেরিকার এই মহিলা খেলোয়াড় গতবারও সিঙ্গলসে বিজয়ী হন। কনোলী ফাইন্যালে ফিনোট বুকেলকে ৬-৪ ও ৬-১ গেমে পরাজিত করেছেন। মহিলাদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসেও কনোলী বিজয়ীর সমান অর্জন করেন

র্জন করেছে। ইষ্ট বেঙ্গলের ক্রীড়াধারায় শ্য বিগত দিনের সৌন্দর্য আর নেই, ও অন্যান্য দলের তুলনায় এরা ভাল াছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ট বেঙ্গলের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় অধিনায়ক মেদ খাঁ 'একশ্চন্দ্র ওমোহন্তি'র মত একাই দলকে বিজয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে ছেন।

চিরাচরিত ক্রীড়াধারার মত মোহন- গানের খেলার মধ্যে সামঞ্জস্য খ‍ুঁজে পাওয়া চ্ছে না। ছয়টি খেলার মধ্যে ইতিমধ্যেই হনবাগানকে চারটি পয়েণ্ট হারাতে হয়েছে। ট বেঙ্গলের নিপুণ খেলোয়াড় ভেঙ্কটেশ ং এরিয়ানের উদীয়মান লেফ্‌ট আউট স দত্ত মোহনবাগানে গিয়ে সুবিধা করতে াচ্ছেন না। ডাইনে বাঁয়ে এই দুই গুণী খেলোয়াড় লাভ করায় মোহনবাগানের াক্রমণের শক্তি বাড়বে বলে যারা আশা রেছিলেন তাদের অনেকেই হতাশ হয়ে ড়েছেন। তবে দল হিসাবে মোহনবাগান বার সত্যই শক্তিশালী। কয়েকটি খেলায় য়লাভ করলে খেলোয়াড়দের মধ্যে আস্থা রে আসবে এবং দলগত ক্রীড়াধারায়ও গতি দেখা দেবে।

ইষ্ট বেঙ্গল ও মোহনবাগান ছাড়া পরাজিত দলগুলির মধ্যে রাজস্থান, রিয়ান ও উয়াড়ী মোটামুটি ভালই খেলছে। য়টি খেলার মধ্যে পুলিশও অপরাজিত ছিল। মঙ্গলবার ইষ্ট বেঙ্গলের কাছে সপ্তম খেলায় পুলিশকে প্রথম হার স্বীকার করতে হয়েছে।

নূতন বিধান অনুযায়ী এবার দুটো দলের দ্বিতীয় ডিভিসনে নামবার কথা। লীগ শেষ হবার এখনও দেরী। তবে খেলার বহর দেখে বলা যায় ক্যালকাটা সার্ভিসেস দলকে আগামীবার দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলতে হবে। এদের সঙ্গে অন্য কোন ক্লাব ভাগ্য জড়িত করবে বলা শক্ত। ভবানীপুর ক্লাব এবার মোটেই ভাল খেলছে না। চারটি খেলার মধ্যে এপর্যন্ত পেয়েছে মাত্র ১ পয়েণ্ট।

দ্বিতীয় ডিভিসনের দলগুলির মধ্যে কাস্টমস, অরোরা ও পোর্ট কমিশনার্স, তৃতীয় ডিভিসনে সিটি, কে এফ আর ইনস্টিটিউট, এবং চতুর্থ ডিভিসনে বেঙ্গল এ সি, ঐক্য সম্মিলনী ও বাটা স্পোর্টস ক্লাব ভাল খেলছে। গত সপ্তাহে দুটি ক্ষেত্রে রেফারীকে অপমান করবার চেষ্টা হয়েছে আর দর্শক মাঠে প্রবেশ করায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডিভিসনের একটি করে খেলা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত খেলান সম্ভব হয়নি।

গত সপ্তাহের ফুটবল খেলার ফলাফল

২৬শে মে '৫৪'

মহঃ স্পোর্টিং (১) : ভবানীপুর (০)
স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০) : খিদিরপুর (০)

২৭শে মে '৫৪'

মোহনবাগান (০) : উয়াড়ী (০)
কালীঘাট (১) : পুলিশ (১)
ইষ্ট বেঙ্গল (১) : জর্জ টেলিগ্রাফ (০)

২৮শে মে '৫৪'

এরিয়ান (১) : ভবানীপুর (০)
স্পোর্টিং ইউনিয়ন (১) : মহঃ স্পোর্টিং (০)

২৯শে মে '৫৪'

ইষ্ট বেঙ্গল (১) : ক্যালঃ সার্ভিসেস (০)
মোহনবাগান (৩) : ই আই আর (০)
কালীঘাট (২) : উয়াড়ী (২)

৩১শে মে '৫৪'

রাজস্থান (১) : মহঃ স্পোর্টিং (০)
এরিয়ান (১) : খিদিরপুর (০)
কালীঘাট (১) : ক্যালঃ সার্ভিসেস (০)

১লা জুন '৫৪'

ইষ্ট বেঙ্গল (২) : পুলিশ (০)
মোহনবাগান (০) : বি এন আর (০)
ই আই আর (২) : স্পোর্টিং ইউনিয়ন (১)

এমিল জেটোপেকের আর একটি রেকর্ড

অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন এ্যাথলীট এমিল জেটোপেক প্যারিসে আন্তর্জাতিক এ্যাথ- লেটিক প্রতিযোগিতায় ৫ হাজার মিটার দৌড়ে নূতন বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। তিনি ১৩ মিনিট ৫৭.২ সেকেন্ড সময়ে নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করেন। সুইডেনের গুন্ডার হেগ ১২ বছর আগে এই বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন। জেটোপেকের নূতন রেকর্ডের সময় হেগের সময় অপেক্ষা ১.১ সেকেন্ড কম। ফরাসী সরকার প্রথমে জেটোপেককে প্যারিস গমনের অনুমতি দেন না, শেষ মুহূর্তে ভিসা মঞ্জুর করেন। জেটোপেক নাকি প্যারিস সম্পর্কে অশ্লীল মন্তব্য করেছিলেন।

'বিশ্বের বিস্ময়' দূরপাল্লার দৌড়বীর জেটোপেকের পক্ষে নূতন রেকর্ড করা কিছু নূতন ঘটনা নয়। ইতিপূর্বেই তিনি ৯টি বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ড করে "Human Locomotive" আখ্যা লাভ করেছেন। এর মধ্যে ১৫ হাজার মিটার দৌড়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা নেই। চেকো- শ্লোভাকিয়ার ৩১ বৎসর বয়স্ক সামরিক অফিসার এমিল জেটোপেকের কয়েকটি রেকর্ড সরকারীভাবে অনুমোদিত অপর কয়েকটি অনুমোদন সাপেক্ষ। গত হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে জেটোপেক ৫ হাজার মিটার, ১০ হাজার মিটার এবং ম্যারাথন দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। নীচে জেটোপেককৃত রেকর্ডগুলোর খতিয়ান দেওয়া হল।

১০ মাইল	৪৮ মিঃ ১২ সেঃ
১৫ মাইল	১ ঘঃ ১৬ মিঃ ২৬.৪ সেঃ
৫ হাজার মিটার	১৩ মিঃ ৫৭.২ সেঃ
১০ হাজার মিটার	২৯ মিঃ ২.৬ সেঃ
২০ হাজার মিটার	৫৯ মিঃ ৫১.৮ সেঃ
২৫ হাজার মিটার	১ ঘঃ ১৯ মিঃ ১১.৮ সেঃ
৩০ হাজার মিটার	১ ঘঃ ৩৫ মিঃ ২৩.৮ সেঃ
এক ঘণ্টা দৌড়	১২ মাইল ৮০৯ গজ

দেশী সংবাদ

২৪শে মে—পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের নিকট প্রায় দুইশত পৃষ্ঠাব্যাপী এক দীর্ঘ স্মারকলিপি পেশ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের সহিত বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কয়েকটি বঙ্গভাষী অঞ্চল এবং গ-শ্রেণীর রাজ্য ত্রিপুরা অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানাইয়াছেন।

কোকনদে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, ফরাসী ভারতের ইয়েনাম হইতে আগত ভাড়াটিয়া গুণ্ডাগণ দলে দলে লাঠি লইয়া ভারতীয় ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী গ্রাম-সমূহ আক্রমণ করিয়া ভারতীয় নাগরিকদের উপর মারধর চালায় এবং শ্রী ডি সত্যনারায়ণ নামক জনৈক বিশিষ্ট ভারতীয় নাগরিককে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া যায়।

২৫শে মে—ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রী সি ডি দেশমুখ আজ এই আভাস দেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সাধারণভাবে দেশের বাসগৃহ সমস্যার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করার সম্ভাবনা আছে।

কলিকাতা কর্পোরেশন এবং নগরীর এনফোর্সমেণ্ট বিভাগীয় পুলিশের যুক্ত উদ্যোগে ভেজাল ঔষধ, চা এবং খাদ্যের বিরুদ্ধে এক অভিযান শুরু করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রায় এক সপ্তাহকাল ধরিয়া ঐ অভিযান চালান হইতেছে। প্রকাশ, এই কয়েকদিনে জাল ও ভেজাল সন্দেহে প্রচুর পরিমাণ ঔষধ ও প্রায় ৬০ হাজার পাউণ্ড চা আটক করা হইয়াছে।

২৬শে মে—আজ ইণ্ডিয়া গেজেটের একখানি অতিরিক্ত সংখ্যায় জনমত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নূতন হিন্দু উত্তরাধিকার বিলটি প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে কোন উইল ব্যতিরেকে পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তিতে কন্যার উত্তরাধিকার এবং নারীদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অথবা অর্জিত সম্পত্তি রক্ষার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ আসন্ন বর্ষা ঋতুর প্রাক্কালে নগরীতে প্রায় ১৫০টি বিশেষভাবে জীর্ণ ভবন ভূমিসাৎ অথবা উহাদের সংস্কারসাধন সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা কার্যকরী করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

বার্ন কোংর রাণীগঞ্জস্থ পটারী ওয়ার্কসে গতকল্য হইতে নাকি লক আউট ঘোষণা করা হইয়াছে। গত ২৮শে এপ্রিল হইতে এই কারখানায় ২৫০০ শ্রমিক ধর্মঘট করিয়াছে।

স্বর্গত নরেন্দ্রনাথ শেঠের পুত্র সুবোধ-চন্দ্র শেঠ গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে লরীর ধাক্কায় আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই মামলার রায়দান প্রসঙ্গে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অব্যবস্থা সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন।

২৭শে মে—আজ কলিকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের চারিদিনব্যাপী সম্মেলন আরম্ভ হয়। সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি শ্রী ভি সি চেট্টিয়ার অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে না পারায় উক্ত সংস্থার সহ-সভাপতি শ্রী এস এস মিরাজকর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

ভারতের খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণাপ্পা ঘোষণা করেন যে, ভারত আন্ত-র্জাতিক গম ভাণ্ডারকে জানাইয়াছেন যে, তাহার আর গম আমদানীর প্রয়োজন নাই।

২৮শে মে—আজ রাত্রি ৮টায় খিদিরপুর ডকে নোঙরবদ্ধ অবস্থায় ক্লাশ স্টুয়ার্ট নামে কয়েক হাজার টন মাল ভর্তি একখানি বিরাট মাল ও যাত্রিবাহী জাহাজের খোলে আগুন লাগে। অধিক রাত্রি পর্যন্তও এই আগুন আয়ত্তে আনা সম্ভবপর হয় নাই।

২৯শে মে—অদ্য বোম্বাই রাজ্যে খাদ্য-শস্যের রেশন ব্যবস্থার অবসান হয়।

৩০শে মে—কলিকাতায় মনুমেণ্টের পাদ-দেশে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে শ্রমিক, অফিসকর্মী ও নাগরিকগণের এক বিপুল জনসমাবেশে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সর্বক্ষেত্রে শ্রমিক সংহতির আহ্বান জানান। তাঁহারা বলেন, শ্রমিকগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম শক্তিই তাহাদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার নিঃসংশয় প্রতিশ্রুতি।

বিদেশী সংবাদ

২৫শে মে—করাচীতে পাক প্রধান মন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলীর সহিত পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হকের এক উ উত্তেজনাপূর্ণ বৈঠক হয়। নিউ ইয় টাইমস-এর প্রতিনিধির সহিত হক সাহে সাক্ষাৎকার এবং পূর্ব পাকিস্থানের কম্যুনি সমস্যাই এই বৈঠকের প্রধান আলোচ্য বি ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, উ সাক্ষাৎকারকালে হক সাহেব নাকি বলিয়াছে যে, তাঁহার প্রদেশ স্বাধীন হইতে চাহে কিন্তু জনাব হক এই কথা রূঢ়ভাবে অস্বীক করেন।

২৬শে মে—মার্কিন বিমানবাহী জাহা বেনিংটনে অগ্নিকাণ্ডের ফলে শতাধিক লে নিহত ও ২২০ জন আহত হইয়াছে।

২৭শে মে—গত রাত্রে করাচীতে প্র গুজব রটে যে, কেন্দ্রীয় পাক মন্ত্রিস পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক সম্ব আশু কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে করাচীর কোন কোন সংবাদপত্র পূর্ববঙ্গে মুখ্য মন্ত্রিত্ব হইতে মিঃ হকের অপসারণ এ পূর্ববঙ্গে সামরিক অথবা গবর্নরের শা প্রবর্তনের দাবী করিতেছে।

২৮শে মে—ফরাসী মন্ত্রিসভা আজ সি করিয়াছেন যে, ইন্দোচীনে সংগ্রামরত সে বাহিনীকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার উদ্দে কয়েকটি চূড়ান্ত রকমের ব্যবস্থা অবল করা হইবে। যাহাদিগকে অক্টোবর মা সৈন্যদলে তলব করার কথা ছিল, তাহাদিগ এ মুহূর্তেই আহ্বান করা হইবে বলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

২৯শে মে—গতকল্য পূর্ব বার্লিনে বি শান্তি পরিষদের সমাপ্তি অধিবেশনে দক্ষি পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য হইতে অবিল সকল বিদেশী সৈন্য অপসারণের দ জানাইয়া সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহ হয়।

৩০শে মে—পাকিস্থানের গবর্নর জেনার মিঃ গোলাম মহম্মদ পূর্ববঙ্গের হক মন্ত্রিস বাতিল করিয়া দিয়া পূর্ববঙ্গে গবর্নর শাসন প্রবর্তন করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গে শাসন পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব পাক দে রক্ষা সচিব জেঃ ইস্কান্দার মির্জার হ অর্পণ করা হইয়াছে এবং তিনি পূর্ববঙ্গে গবর্নররূপে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্বব জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হইয়াছে সৈন্যদল প্রধান প্রধান শহর টহল দিতে আর করিয়াছে। ঢাকায় জনাব ফজলুল হব স্বগৃহে অন্তরীণ এবং মন্ত্রী মুজিবর রহমান গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২১ বর্ষ
সংখ্যা ৩২

দেশ

২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১

DESH SATURDAY, 12TH JUNE, 1954

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

গ্রেসের দায়িত্ব

কংগ্রেস সভাপতিস্বরূপে ভারতের নমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তি বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি-হের নিকট একটি নির্দেশপত্র প্রেরণ য়াছেন। এই পত্রে তিনি ভাষাগত স্যা সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ য়াছেন। বস্তুত রাজ্য কমিশনের কাজ ম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নটি গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। পণ্ডিতজী গ্রেসকর্মীদিগকে এ সম্পর্কে সতর্কতা লম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। নি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যেসব প্রাদেশিক ভাষা আছে, র প্রত্যেকটিই গুরুত্বসম্পন্ন এবং কেরই যাহাতে উন্নতি এবং সমৃদ্ধি টে সেজন্য আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। ভাষাগুলির মধ্যে যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেয় এবং বিশেষ ভাষাকে প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্যে অপর একটি ভাষাকে ষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা হয়, তবে উভয় রই অনিষ্ট ঘটিবে; অধিকন্তু তেমন বেচিত কাজের ফলে ভারতের রাষ্ট্রীয় ও বিপন্ন হইবে। এই সম্পর্কে গ্রেসকর্মীদের উপর গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত য়াছে, যাহাতে ভাষা সম্পর্কিত প্রশ্নটি টকর পরিণতির দিকে না যায়, কে তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা ত। কংগ্রেস সভাপতিস্বরূপে পণ্ডিত র এই সাবধান-বাণী নূতন নয়। তিপূর্বে বহুবার কংগ্রেসকর্মীদের এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ছাড়া প্রয়োজনীয় নির্দেশও প্রদত্ত ছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অবস্থার শেষ কোন প্রতীকার হয় নাই। বিহারই সে পক্ষে বড় প্রমাণ। বিহারের কংগ্রেস-পরিচালিত সরকার তথাকার বাংলাভাষা-ভাষী অঞ্চলে বাংলাভাষাকে পিষ্ট করিবার জন্য ক্রমাগত বিভিন্ন নীতি প্রয়োগ করিয়া চলিয়াছেন। সেখানে কংগ্রেস-কর্মীরা বাঙলাভাষাভাষী অঞ্চলে জোর করিয়া হিন্দী চালাইবার অনর্থকর উদ্যমে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। বাংলাভাষার পক্ষে ন্যায্য দাবীর কথা তুলিতে গেলেই সেখানে মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। মানভূমের জনমান্য নেতৃবর্গকে নিগৃহীত এবং লাঞ্ছিত করা হইয়াছে। বিহারের কংগ্রেস নেতৃবর্গের প্রাদেশিকতামূলক মনোবৃত্তি উত্তরোত্তর পাকিয়া উঠিতেছে। কংগ্রেস-সভাপতি ভাষাগত প্রশ্ন সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়াছেন। তাঁহার সেই উক্তিটিও বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, ভাষা জীবন্ত, প্রাণবান্ এবং গতিশীল বস্তু; অভিধানপ্রণেতা বা কোষকার যাঁহারা, ভাষা গঠন তাঁহারা করেন না। জনসাধারণ, লেখক, কবি এবং গায়ক ইঁহাদের দ্বারাই ভাষা গঠিত হইয়া থাকে। ভাষা গঠনে বৈয়াকরণ এবং কোষকারগণের অবদানের গুরুত্ব অবশ্য আছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্লিষ্ট বা আড়ষ্ট প্রতিবেশের মধ্যে কোন ভাষাই শক্তিশালী হইতে পারে না। পণ্ডিতজীর উক্তির তাৎপর্য এই যে, ভাষাই জাতির সংহতি, সভ্যতা এবং অগ্রগতির মূলে প্রাণশক্তি সঞ্চার করিয়া থাকে। জবরদস্তিতে একটি ভাষাকে পিষ্ট করিয়া অপর ভাষা চালাইতে গেলে জাতির প্রাণশক্তির উৎসমূল অবরুদ্ধ হইয়া যায়। বাংলাভাষাকে দমিত করিয়া হিন্দী চালাইবার উৎকট আগ্রহবশে যাঁহারা চলিতেছেন, এবং কংগ্রেসের নামে সেই কার্যে প্রবৃত্ত থাকিয়া প্রাদেশিকতাকে প্রশ্রয় দিতেছেন, কংগ্রেস-সভাপতির এই নির্দেশে তাঁহাদের চৈতন্যলাভ হইলেই মঙ্গল।

দুর্ভাগ্য পূর্ববঙ্গ

যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচনে জয়ী হইবার পর পূর্ববঙ্গের নূতন জাগরণ ঘটিবে, বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সেখানে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, স্বদেশপ্রেমের ঐতিহ্যকে আশ্রয় করিয়া পূর্ববঙ্গ সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে, ইহাই আশা করা যাইতেছিল; কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হইয়াছে। সমগ্র পূর্ববঙ্গ নৈরাশ্যের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। গভর্নরের শাসন প্রবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের সর্বত্র একটা বিভীষিকার ভাব সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যহ ধরপাকড় চলিতেছে। সেখানকার অবস্থা শান্ত, আমরা পূর্ববঙ্গ সরকারের বিবৃতিতে এই কথা শুনিতে পাইতেছি। কিন্তু শান্ত এই কথাটিই যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ। কারণ শান্ত অবস্থা বলিতে সাধারণত দমিত অবস্থাই বুঝায়। নারায়ণগঞ্জ মিলের হাঙ্গামা শোচনীয় অধ্যায় রচনা করিয়া ইতিপূর্বেই শান্ত হইয়া গিয়াছে, বিশেষত একটা সীমাবদ্ধ অঞ্চলের মধ্যেই সেই অশান্তি দেখা দেয়।

তবে এখনও অবস্থা শান্ত, একথা জানাইবার তাৎপর্য কি? হক সাহেব গদিচ্যুত হইয়াছেন। জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করিয়াছেন, এখন স্বাভাবিক অবস্থাই সেখানে আশা করা যাইতেছিল। তবে কিসের জন্য চারদিকে ধরপাকড়? যুক্ত ফ্রন্টের নেতারা নিয়মতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এমন সংবাদ এ পর্যন্ত কোনদিক হইতেই পাওয়া যায় নাই। এমন অবস্থায় যুক্তফ্রন্ট দলের কর্মকর্তৃগণের সভা নিষিদ্ধ করিয়া কার্যত ঐ দলকে বেআইনী প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে লইয়া ফেলিবার কি প্রয়োজন ছিল, বুঝিয়া উঠা কঠিন। এতদ্দ্বারা বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে ধীরভাবে বিবেচনা করিবার সুবিধা হইতেই ঐ দলের নেতাদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের নবনিযুক্ত গভর্নর শাসনভার গ্রহণ করিয়া আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের গভর্নরের নিকট সহযোগিতা কামনা করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন, পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের নিরাপত্তার জন্য তিনি সর্বতোভাবে অবহিত থাকিবেন। বস্তুত হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন পূর্ববঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেকটা পরোক্ষ হইয়া পড়িয়াছে, তবে রাজনীতির খেলা নূতন রূপ ধরিতে পারে, এমন আশঙ্কা আছে। প্রত্যুত পূর্ববঙ্গের সর্বত্র জনগণের শান্তি, নিরাপত্তা এবং সন্তোষের ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, আমরা ইহাই কামনা করি। পূর্ববঙ্গের সহিত পশ্চিমবঙ্গের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবচ্ছেদ সত্ত্বেও হৃদয়ের সেই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় নাই, সুতরাং পূর্ববঙ্গের বর্তমান অবস্থা আমাদিগকেও উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। সেখানে অল্পদিনের মধ্যেই জনমতানুমোদিত শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, আমরা ইহাই দেখিতে চাই।

নারীর অধিকার

সম্প্রতি কলিকাতা রাষ্ট্রীয় মহিলা কংগ্রেসের চার দিবসব্যাপী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারতের সংবিধানে নারীদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমান অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমান অধিকারের প্রশ্ন এখনও সমস্যা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। এইসব ক্ষেত্রে নারীদের অধিকারের দাবী উত্থাপন করিতে গেলে মনু-পরাশরকে লইয়া টানাটানি আরম্ভ করা হয়। যাঁহারা এইসব প্রাচীনপন্থী যুক্তি উত্থাপন করেন, তাঁহারা এ সত্য ভুলিয়া যান যে, প্রাচীন যুগের বিধিবিধান বর্তমান সমাজ-জীবনে চলে না। সমাজের কালোপযোগী পরিবর্তন ঘটে। ঋষিদের যুগেও এমন পরিবর্তন ঘটিত এবং সেই পরিবর্তন সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন বিধানও রচিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বৈদেশিক পরাধীনতাই হিন্দু সমাজের কালোপযোগী পরিবর্তনের শক্তিকে ব্যাহত করে এবং পরাধীনতাজনিত দুর্বলতা নানাভাবে হিন্দুসমাজের জীবনীশক্তিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া হিন্দুকে কূপমণ্ডূকতার মধ্যে লইয়া ফেলে। স্বাধীন ভারতের সমাজ-জীবন নারীদের অবদানে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে ইহাই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য নারী প্রগতি বা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার এই প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ স্পৃহনীয় নহে। ভারত-নারীর নিজস্ব একটি বিশিষ্ট মর্যাদা আছে। তাঁহারা সেই মর্যাদা হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন না। মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রিস্বরূপে শ্রীযুক্তা ঊর্মিলা দেবী তাঁহার অভিভাষণে সে বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আর্থিক প্রয়োজন উপেক্ষণীয় নয়; কিন্তু সেই সঙ্গে ভিতরের দিকেও তাকান দরকার। আর্থিক প্রয়োজন সাধনের সঙ্গে সঙ্গে নারীকে অন্তরের শক্তিতে সমৃদ্ধিশালিনী হইতে হইবে। নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত মহিমময় মাতৃত্ব, ত্যাগ ও পবিত্রতার সাধনার সংযোগ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের অধিকারিণী করিবে। ফলত নারীর অধিকারকে শুধু সংবিধানে বিধিবদ্ধ রাখিলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হইয়া যায় না। ভারতের বিপুল নারী-সমাজ আজও অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং উপেক্ষিত রহিয়াছে। নারী-সমাজের সংস্কারমূলক যেসব আইন এ পর্যন্ত বিধিবদ্ধ হইয়াছে, সেগুলিও অনেক ক্ষেত্রে অকেজো হইয়া আছে, সমাজের এমনই অবস্থা, অথচ সমাজের অর্ধাংশকে পঙ্গু রাখিয়া কোন জাতিই সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিতে পারে না। আজ এই সত্যকে সোজাসুজি স্বীকার করিয়া লইবার দিন আসিয়াছে।

বৈদেশিক পতাকার মর্যাদা

পশ্চিম প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্যনির্বাহক পরিষদ বিগত অধিবেশনে ভারতের সাধারণ নির্বাচনে দল বিশেষের পক্ষ হইতে বিদেশী পতাকা ব্যবহার নিষিদ্ধ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার নিমিত্ত ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আমরা এই প্রস্তাব সর্বতোভাবে সমর্থন করি। বলা বাহুল্য এতদ্দ্বারা বিদেশী কোন রাষ্ট্রের প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শনের ইচ্ছা আমাদের নাই। বিশেষত সে প্রশ্ন এক্ষেত্রে উঠেই না। ভারতের নিজের একটা স্বাতন্ত্র্য মর্যাদা রহিয়াছে এবং এদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সেই স্বাতন্ত্র্য মুখ্যভাবে স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাদের কর্মসাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন, ইহাই আশা করা যায়। ভারতের রাজনৈতিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বৈদেশিক রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকার আশ্রয় গ্রহণে ভারতের সেই রাষ্ট্রমর্যাদাই ক্ষুণ্ণ করা হয় এবং একই রাষ্ট্রের স্বার্থে সূত্রে করিয়া সংহতি শক্তি সুদৃঢ় করিয়া তুলিবার যে সংকল্পশীলতা প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজন, সেই আদর্শ মলিন হইয়া পড়ে। এইভাবে নানা উপদলীয় সংকীর্ণ স্বার্থ-সংঘাতের সৃষ্টি হয় এবং জাতীয় জীবনে রাষ্ট্রবিরোধী অনাচার জমিয়া উঠে। বিশ্বপ্রেম, আন্তর্জাতীয়তা, এগুলির মূল্য না আছে এমন নয়; কিন্তু স্বদেশপ্রেমকে ভিত্তি করিয়া এইসব বৃহৎ ভাবনা স্বাভাবিক শক্তিতে বিকাশ লাভ করিয়া থাকে। ফলত স্বদেশপ্রেমের বিরোধী যে বিশ্বপ্রেম, সে বস্তু একেবারেই মেকী। তাহার মূলে নীতি বা যুক্তি থাকিতে পারে; কিন্তু প্রাণ থাকে না। প্রাণহীন তেমন উদাম জাতিকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলে। জাতির স্বাতন্ত্র্য-মর্যাদা বিরোধী উদ্যম সর্বভাবে অনিষ্টকর।

খ্যাতি-সঙ্গীত

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
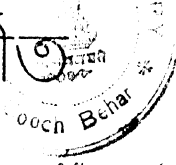
খ্যাতি-সংগীত কথাটি অপ্রচলিত হইলেও এক শ্রেণীর গানের নাম হিসাবে ইহার প্রয়োগ সার্থক। বিশেষ উপলক্ষে রচিত কতগুলি গান এক বৃহৎ সংগীত-সংগ্রহে খ্যাতি-সংগীত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই গানের বিষয় কোন স্মরণীয় ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনা। ইংরাজিতে এই জাতীয় গান অকেসনাল সং বলিয়া পরিচিত। তবে যেসব ইংরাজি গান বা কবিতা কাহারও মৃত্যু উপলক্ষে রচিত তাহাকে ডায়ার্জ বা এলিজিও বলা হয়। ইহাদের আমরা লোকসংগীত নাম দিতে পারি; কিন্তু কোন স্মরণীয় ঘটনা বা বস্তু লইয়া যে গান তাহাকে কি বলি? উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার "সংগীত-কোষে" এই জাতীয় গানকে খ্যাতি-সংগীত আখ্যা দিয়াছেন। গ্রন্থখানি আজকাল দুষ্প্রাপ্য। চার হাজার খোলটি গান সম্বলিত ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১৩০৬ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ ছাপা হয় ইহার অনেক পূর্বে। বারশত আশী পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে সে যুগের নানা বিষয়ের বহু গান সংরক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার অনেক গান বহুপূর্বেই অচলিত হইয়া গিয়াছে এবং সাহিত্যের ঐতিহাসিক ছাড়া অন্য কাহারও কাছে এইসব পুরাতন গানের মূল্যও অল্প।

"সংগীত-কোষের" খ্যাতি-সংগীত বিভাগে মোট আটষট্টিটি গান সংগৃহীত হইয়াছে। অবশ্য ইহার কোনটিই কবিতার স্তরে উঠে নাই অর্থাৎ সুরনিরপেক্ষ ইহাদের সাহিত্য-মর্যাদা একরূপ নাই বলিলেই চলে। তবু সেকালের গান হিসাবে এগুলি চিত্তাকর্ষক। যে গান পুরাতন হইয়া গিয়াছে, যাহা আর কেহ গায় না, তাহার কথা কয়টি শুনিতে মধুর না হইলেও কৌতূহলোদ্দীপক। আবার সে গান যদি অতীতের কোন ঘটনা লইয়া রচিত হইয়া থাকে, তবে তাহার আকর্ষণ আরও বেশি। পুরোনো চিঠি বা পূর্ব-পুরুষের জীর্ণ অস্পষ্ট চিত্রের ন্যায় এই ধরনের গান আমাদের মর্ম স্পর্শ করে।

"সংগীত-কোষে" সন্নিবিষ্ট খ্যাতি-সংগীতগুলি চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। (ক) কোন স্বনামধন্য ব্যক্তির মৃত্যুতে রচিত। এই লোক-সংগীতের বিষয়—পরমহংস রামকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ। (খ) কোন স্বনামধন্য জীবিত ব্যক্তির মহিমা কীর্তন। ইহার মধ্যে আছেন মহারাণী স্বর্ণময়ী, মিস মেরী কার্পেণ্টার, মহারাণী ভিক্টোরিয়া, কৃষ্ণদাস পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। (গ) কোন সমসাময়িক ঘটনা উপলক্ষে রচিত, যেমন জুবিলী সংগীত, নীলকরদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে গান, রেলগাড়ি, গ্যাসের আলো, টৌলিঃ জলের কল প্রভৃতির প্রশস্তি। (ঘ) ে ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণে রচিত গ যেমন পুরুরবার সৈন্যগণের সমর গ পৃথ্বীরাজের প্রতি সংযুক্তা, পৃথ্বীরাে প্রতি ভারতমাতার উক্তি, মাতার প্র প্রিন্স নেপোলিয়নের উক্তি, সিডান যু তৃতীয় নেপোলিয়নের উক্তি, হোমি প্যাথির আবিষ্কারক হ্যানিম্যান সম্বে ইত্যাদি। খ্যাতি-সংগীত বিভাগে কয়েকটি গান অনবধানতাবশত সন্নিবি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহার আ দশটি গান সামাজিক নিসর্গ ও ভা বিষয়ক—এগুলিকে খ্যাতি-সংগীত বল যায় না।

মাইকেল সম্বন্ধে গানটি (বাগেশ্রী-আড়াঠেকা) মেঘনাদ-বধ কাব্যের "অপূর্ব তান" ও "গভীর গর্জনে"র প্রশংসাঃ

কে অপূর্ব তান লয়ে, বীররসে মাতাইয়ে
শুনাইবে মেঘনাদে গভীর গর্জনে॥
বীরমদে অম্বুনাদে কে আনিবে মেঘনাদে
কাঁদিবে প্রমীলা সতী কেলী বিপিনে॥

মাইকেলের মৃত্যুতে রচিত কবিতা বহু—যেমন, হেমচন্দ্রের "খোল খোল দ্বার," নবীনচন্দ্রের "হা অদৃষ্ট কবিবর," মান-কুমারীর "এখানে আসিছ যারা নীরবে কহিও কথা" ইত্যাদি। কিন্তু এই উপলক্ষে রচিত গান যদি কিছু রচিত হইয়া থাকে, তাহা আজ বিস্মৃত।

কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্বন্ধে গানটি (সুরেটি—একতালা) প্যারীমোহন কবি-রত্নের রচনা। ত্রিশ বৎসরের জীবনে কালী সিংহ যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন তাহার পূর্ণ পরিচয় এই সংগীতটি।

বিজ্ঞপ্তি

শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসুর রচিত 'শিল্পচর্চা' দেশ পত্রিকার আগামী ৪ঠা আষাঢ় বা ১৯শে জুন সংখ্যা হইতে ধারা-বাহিক প্রকাশিত হইবে। পাঠক-পাঠিকাদের স্মরণ থাকিতে পারে, ১৩৫৯—৬০ সালের দেশে শিল্পাচার্যের এই পর্যায়ের অনেক-গুলি রচনা প্রকাশ লাভ করিয়া শিল্প-শিক্ষার্থী ও শিল্প-রসিক-সমাজে যথেষ্ট ঔৎসুক্য ও আগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছিল। আগামী রচনাবলীতে আচার্য শ্রীনন্দলাল বসু প্রধানত তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায়, অর্থাৎ রেখাবদ্ধ রূপের ভাষায় বুঝাইবেন, চিত্রকর কিরূপে পশুপক্ষী, গাছপালা, মানুষ, সমুদ্র, পাহাড়, বিশ্বের বিচিত্র রূপরাজিকে সার্থকভাবে দেখিতে ও দেখাইতে পারেন; অর্থাৎ ঐসব রূপের নিগূঢ় রহস্য কোথায়; উহাদের মন দিয়া, ইন্দ্রিয় দিয়া, রঙ-তুলি ধরিয়া অধ্যয়ন করার ও আয়ত্ত করার কৌশলটা কী। আগামী সপ্তাহ হইতে দেশের কয়েকটি সংখ্যায় এই 'চিত্রমালা' প্রকাশিত হইবে।

—সম্পাদক, 'দেশ'

বাঙগালী মহলে অল্পদিনে এত বিখ্যাত লোক আর দেখিনে। নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ প্রচার করার অপরাধে লং সাহেবের এক হাজার টাকা জরিমানা ও একমাস কারাবাস হইলে কালী সিংহ জরিমানার সমস্ত টাকাটা দিয়া মহাপ্রাণ পাদ্রীর প্রতি বাঙগালীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মহানুভব দেশহিতৈষীর এই মহত্ত্বই গানটিতে প্রথম উল্লিখিত হইয়াছেঃ

ভয়ানক তুফান নীলদর্পণে, জজ ওয়েলসের
কোপাগুণে
লংকে করিল রক্ষা সমাজে অতি সত্বর

কালী সিংহের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হুতোম পেঁচার নক্সা সম্বন্ধে গানের কথাকয়টি কৌতুকপূর্ণঃ

কম লিখেছে কি হুতোম পেঁচায়,
টের পেয়েছেন অনেক বাছায়,
অনেকের দোষ সুধরে গেছে যারা ছিল দোষের
সাগর।

পরমহংসের তিরোভাবে গিরিশ-রচিত সংগীতটির দুটি চরণ ভাবাবিষ্ট ভক্তের ছবিঃ

ভাবে ভোরা মাতোয়ারা দুনয়নে বহে ধারা,
ঢলে ঢলে নেচে কুতূহলে এস গুণনিধি সাধি।

অক্ষয়কুমার দত্ত—

মাতৃভাষা বাঙগলার নাহি ছিল অলঙ্কার,
সাজালে তাহারে কত রতন মণিকাঞ্চনে।

কলিকাতার জনসমাজকে কেশবচন্দ্র কিভাবে মাতাইতেন তাহার কথা শুনি কুঞ্জবিহারী রচিত একটি শোক-সংগীতেঃ

আর কি টাউন হলে উৎসবে উৎসবে,
স্বর্গের সম্বন্ধ সুগম্ভীর রবে
মত্ত সিংহ হয়ে জ্বলন্ত উৎসাহে
আর তেমন করে শুনাবে সবারে।

দ্বারকানাথ মিত্র ঈশ্বরবিশ্বাসী কি নাস্তিক ইহা লইয়া তাঁহার আত্মীয়েরা কম তর্ক করেন নাই। তবু দেশবাসীর কাছে তাঁহার গৌরব কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাঁহার সম্বন্ধে গানটি হাইকোর্টের জজ হিসাবে তাঁহার নির্ভীক ন্যায়-পরায়ণতা, তাঁহার স্বাভাবিক ঔদার্য ও উজ্জ্বল বুদ্ধির প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ

কে আর তেমন করি বিচার আসনোপরি
বসিবে উজ্জ্বল করি সত্যের সন্ধানে
নির্ভয়ে তেমন আর কে করিবে সুবিচার
মাপিয়ে সত্যের ভার ন্যায়-তুলা ধরি করে॥
হায়! সোহার্দ উদার গুণে আদরের সম্ভাষণে
কে আর বান্ধবগণে তুষিবে তেমনি
জ্বালিয়ে বুদ্ধির আলো দেশের মুখ উজ্জ্বল
কে আর তেমন বল করিবে বঙ্গ ভিতরে।*

মাইকেল বিদ্যাসাগরকে করুণার সিন্ধু বলিয়াছিলেন; ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুতে রচিত গানেরও সেই একই কথাঃ

বিদ্যার সাগর খ্যাতি—আরো মনোহর
বিশাল উদার চিত্ত দয়ার সাগর—

(খ) শ্রেণীর—অর্থাৎ জীবিত মহাপুরুষদের উদ্দেশে রচিত সংগীতগুলির মধ্যেও বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে একটি গান আছে। গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় লিখিত এই গানটিতে বিদ্যাসাগরকে জন স্টুয়ার্ট মিলের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছেঃ

অধিনী কামিনীকুল ক্লেশ নিবারণে
লিখিলে মহাত্মা মিল প্রবন্ধ যতনে,
হইল পূজিত সেই বিখ্যাত ধীমান॥
হিন্দুকুল কামিনীর বৈধব্য যন্ত্রণা,
ঘুচাতে কাতর স্বরে কাঁদিলেক যে জনা,
দয়ার বিদ্যার সেই সাগর মহান॥

কৃষ্ণদাস পাল—

অমোঘ লেখনী ধরে; লেখনী কৃপাণ ধার
মহারাণী স্বর্ণময়ী—
সাধারণ উপকার, করিবারে অনিবার
অমৃত-বদান্য স্রোতে বঙ্গ ব্যাপিলে।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবাস হইলে—

হায় কি হলো রে বিচার,
প্রিয় ভাই সুরেন আজি গেল কারাগার।
বলিতে বিদরে হৃদয়, পেল ন্যায় পরাজয়
এ বিচার কি আইনে কয় ওহে ধর্ম অবতার

তখন হইতেই বাঙ্গালী দেশের জন্য কারা-বরণ করিতে প্রস্তুতঃ

এস বঙ্গবাসী চলে, যেতে হয় যাব জেলে,
কত দহি তুষানলে মরণের কি ভয় আর।

মিস কার্পেণ্টার সম্বন্ধে সংগীতটি কৌতুকপ্রদ। এই মহাপ্রাণ ইংরাজ মহিলা তাঁহার শেষ জীবনে বাংলাদেশের স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। এই ক্ষেত্রে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম, সম্বন্ধে "বেঙ্গলী" পত্রিকা (২২শে ডিসেম্বর—১৮৬৬) বলিয়াছিলেনঃ "The name of Mary Carpenter will go down to posterity as that of an Angel of Mercy who crowned the decline of a life of active benevolence in her own country by an act which broke the fetters that long confined the limbs and the souls of millions of her sisters in a foreign land". মিস্ কার্পেণ্টার প্রাচীনা ও অবিবাহিতা ইহা লইয়াই সংগীতের আরম্ভঃ

অতি লক্ষ্মী বুদ্ধিমতি এবিবি এসেছে,
ষাট বৎসর বয়স তবু বিবাহ না করেছে।

গানের শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গাড়ি উল্টাইয়া পড়িয়া যাইবার ঘটনাটি লইয়া মজা করা হইয়াছে। তখন এ আশঙ্কা কেহ করে নাই যে, এই আঘাতের কষ্ট বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মৃত্যু পর্যন্ত সহ্য করিতে হইবে। ১৮৬৬ সালে বিদ্যাসাগর মিস্ কার্পেণ্টারের সঙ্গে উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবার জন্য বালি স্টেশন হইতে এক ঘোড়ার গাড়িতে উঠিয়াছিলেন। এই গানে আছেঃ

উত্তরপাড়া স্কুলে যেতে, পড়ই রগড় হল পথে,
এটকিনসন্ উড্রো আর সাগর সঙ্গেতে।

---

* দ্বারকানাথের প্রতিভার কথা আজ একরূপ বিস্মৃত। মৃত্যুর কিছু পূর্বে তিনি পজিটিভিজম্ ও হিন্দু দর্শনের মধ্যে এক সমন্বয় সাধন করেন। কেঁতের এ্যানালিটিকাল জিওমেট্রি তিনি মূল ফরাসী হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে ইংলিশম্যান মন্তব্য করেনঃ
"Amongst his more brilliant qualities was his surprising command of the English language. the readiness, precision and force with which he used that language are not common even among those who speak it as their mother-tongue, and were the theme of constant admiration!"

নাড়াচাড়া দিলে ঘোড়া মোড়ের মাথাতে;
গাড়ী উল্টে পল্লেন সাগর, অনেক পুণ্যে
গেছেন বেঁচে।

(ঘ) শ্রেণীর গানগুলির মধ্যে নীলকরদের অত্যাচার সম্বন্ধীয় দীনবন্ধু মিত্র রচিত গান তিনটি উল্লেখযোগ্য। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের মাইকেলকৃত ইংরাজী অনুবাদ প্রচার করিবার জন্য লং সাহেবের যে কারাবাস হয়, তাহার উল্লেখ কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্বন্ধে গানটিতে পাইয়াছি। নীল-গানের প্রথমটিতেও সেই কথাঃ—

নীল বানরে সোণার বাংলা কল্লে এবার
ছারখার।
অসময়ে হরিশ ম'ল লংয়ের হল কারাগার
প্রজার আর প্রাণ বাঁচান ভার।

তৃতীয় গানটিতে নীলের অত্যাচার সংক্রান্ত সে যুগের নানা ঘটনার উল্লেখ। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী এ্যাসলি ইডেন এক রুবাকারী জারী করেন যে, নীল বপন প্রজার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ইডেন সাহেব তখন বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট। নদীয়ার কমিশনার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রোটের ভ্রাতা আর্থার গ্রোট্ ইডেনের এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন। ইহা লইয়া দুইজনের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। গ্রোট্ সাহেব তাঁহার জাতভাই শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের পক্ষ লইয়াছেন ইহা সকলেই বুঝিলেন। ঐ বৎসরেরই ২১শে জুলাই ছোটলাট স্যার জন পিটার গ্রাণ্ট্ এই বিবাদে রায়তদের পক্ষেই রায় দেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ইণ্ডিগো কমিশন তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করেন। ১৮৬১র ২৯শে জুলাই বিচারপতি স্যার মরডান্ট্ ওয়েলস্ লং সাহেবকে নীলদর্পণ মামলার দোষী সাব্যস্ত করিয়া শাস্তি দেন। রায়তদের পক্ষ লইয়া আন্দোলন করিবার জন্য হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইংরাজ কর্তৃক নিগৃহীত হন এবং তাঁহার মৃত্যুর পরও তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা উঠাইয়া লইবার প্রশ্ন উঠে নাই। বাঙলা সরকারের সেক্রেটারী সীটন-কার ইংরাজী নীলদর্পণের প্রচারে সহায়তা করিবার অপরাধে তাঁহার উচ্চ পদ হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন এবং ছোটলাট গ্রাণ্ট্ও এই সংক্রান্ত ব্যাপারেই অবশেষে পদত্যাগ করেন। ১৮৬২ সালের ১৬ই মে বিচারপতি স্যার বার্নিস্ পিকক্ গ্রাণ্ট মহোদয়কে এক টাকা জরিমানা করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা আনিয়াছিল এক নীলকর। এই সমস্ত ঘটনারই উল্লেখ পাই দীনবন্ধু রচিত সংগীতটিতেঃ

নীলদর্পণে লং সাহেব যথার্থ যা তাই লিখেছে।
নীলে নীলে সব নিলে প্রজার বল ভাই কি
রেখেছে॥
ইডেন, গ্রাণ্ট মহামতি, ন্যায়বান উভয়ে অতি,
ত্বরিতে প্রজার গতি কত চেষ্টা পাইতেছে॥
ইণ্ডিগো রিপোর্ট পোড়ে কেনা অন্তরে পোড়ে
তবু নীলিরা নোড়ে চোড়ে পোড়ার মুখ
দেখাইতেছে॥

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রথম কলের জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়। এই উপলক্ষে রচিত গানটিতে ডাক্তারদের লইয়া মজা করা হইয়াছেঃ

কলিকাতায় নাই কো রোগ ডাক্তারের শনির ভোগ
বাবুগিরির ঘোর গোলযোগ দানা পায়না
আস্তাবলে

টেলিগ্রাফের প্রবর্তনে গানঃ

বার্তাবহে বার্তা বহে এ দূত সে দূতে নহে
নিমিষে বৎস চলে যুগে লাগে অনুপল।

গ্যাসের আলোর গানটি গীত হইত রামপ্রসাদী সুরে—

রাজধানী কলকাতা সহর এতদিনে জাঁকাইল
পথে ঘাটে আসতে যেতে দিবারাতে ভাবনা
গেল॥

পূর্বেই বলিয়াছি এসব গানের সাহিত্য-মূল্য নাই বলিলেই চলে—ইহাদের ভাব ও ভাষায় কোন চমৎকারিত্ব নাই। ইহাদের একমাত্র আকর্ষণ এই যে, ইহারা পুরানো দিনের কথা—ইহা আর কোনদিন সুরে বসিবে না, কিন্তু তবু ইহা শুনিতে কৌতূহল হয়।

কাকঝোরার ডাক বাংলোয়

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কাকঝোরার ডাকবাংলোয় একদিন
ভেবেছিলাম থাকবো। কাকঝোরার ডাকবাংলোয়
একদিন থেমেছি
ঝরঝরে জীবনকে দেখেছি
তাই ভেবেছিলাম একদিন
সব ঋণ
শোধ করে কাকঝোরার ডাকবাংলোয় থাকবো।

সেখানে অনেক ঘাস আর ফার্ন আর জলেদের অবিরাম গান
রূপালি পাত্রের মতো ক্রমাগত টুং-টাং
কাকঝোরার ডাকবাংলোয়
একদিন—বহুদিন আগে এক মধ্যাহ্ন আলোয়
কয়েক মিনিটের জন্য থেমেছিলাম
কাকঝোরার ডাকবাংলোয়।

জীবনের ডাকবাংলো বদলায়
পুরনো খানসামা যায় নতুন আর একজন আসে
নতুন করে সেলাম করতে শেখে সে।

সেই ডাকবাংলোর পুরনো চেয়ার-চৌকি
কত গত অভিসারের স্বপ্ন আর ইতিহাস নিয়ে
আছে বোবা হয়ে।

হয়তো এখনো যদি তুমি যাও
কাকঝোরার ডাকবাংলোয়
হয়তো বুঝবে
ফার্ন আর ঘাস আর জলের তরঙ্গে
বহুদিন আগে এক বহুক্লান্ত পথচারী এসে
এইখানে জীবনের চরম শান্তির কথা পেয়েছে নিমেষে।

সেই ডাকবাংলো কোথায়, কোথায় সে-পথিক আজ?
সূর্য নামছে পশ্চিমে, দিনের নমাজ
পড়া শেষ হোলো।
হে অতীত, জীর্ণ তালা খোলো।

মায়াপুরী হরিদ্বার

ঘুরতে ঘুরতে আবার সেই হরিদ্বার। সেই হরিদ্বার তিন হাজার বছর আগেকার। পরিব্রাজক হুয়েন সাং মুগ্ধ অভিভূত হয়েছিলেন হরিদ্বারকে দেখে। ওখানে তিনি বাস করে গেছেন বহুকাল। ওটা কিন্তু আমারও বিশ্রামের জায়গা। ওখানে এসে পৌঁছলে গায়ে হাওয়া লাগে, ধীরে ধীরে তন্দ্রায় চোখ জড়িয়ে আসে। সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ কর, সমস্ত হিমালয় ছুটে বেড়াও আত্ম-তাড়নায়—কপাল বেয়ে ঘাম ঝরুক, মুখ দিয়ে ফেনা পড়ুক, মালিন্যময় হোক সর্বাঙ্গ, নিগ্রহ-পাণ্ডুর হোক দেহ,—কিন্তু ফিরে এসো হরিদ্বারে। সুশীতল ওর জলে নবজন্ম, ওর মধুর হাওয়ায় দেহমন স্নিগ্ধ। অত্যন্ত পুরনো সেই হরিদ্বার, কিন্তু ওর নূতনত্ব কাটে না। আমিই যেন ওকে দেখছি হাজার হাজার বছর থেকে—দেহ থেকে দেহান্তরে—এক জীবন থেকে অন্য জীবনে। তবু নতুন। নিবিড়ভাবে নতুন। মৃতসঞ্জীবনী সুধার মতো ওর নীলজলের স্বাদ। ও যাদু জানে।

যাদু জানে বলেই হরিদ্বারের আদি নাম হোলো 'মায়া'। শক্তি ওর মোহিনী, —তাই ইন্দ্রজাল বোনে প্রতি মানুষের মনে। সেই ইন্দ্রজাল—যাকে বলে 'ইলিউ-শান্'—সেই বস্তুর আকর্ষণ অচ্ছেদ্য। একবার যে হরিদ্বারে গেছে, দ্বিতীয়বার যাবার জন্য তার আন্তরিক ব্যাকুলতা দেখেছি। একেই বলে মায়ার খেলা। ভক্তরা সেইজন্য ওখানে প্রতিষ্ঠা করেছেন মায়া-দেবীর মন্দির, তার থেকে মাইলখানেক এগিয়ে গেলেই মায়াপুরীর সন্ধিস্থল। অনেকবার মনে করেছি যে, হরিদ্বারকে দেখবো পুঙ্খানুপুঙ্খ, কিন্তু বত্রিশ বছর ধ'রে আনাগোনা ক'রেও সেই দেখা আর হয়ে ওঠে না। হাতের কাছেই ত' কলকাতার কালীঘাট, কিন্তু উৎসাহ কম। কাশী গেলেই ত' বৈঠকখানা,—অন্নপূর্ণা আর বিশ্বনাথকে দেখিনি কতদিন, মনেই পড়ে না। এলাহাবাদে আনাগোনা করি যখন তখন। কিন্তু ওই ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আর যাওয়া হয়ে ওঠে না। ত্রিবেণী প'ড়ে থাকে, প'ড়ে থাকে ওই প্রয়াগ দুর্গের তলায় অক্ষয়বট। হরিদ্বারও ঠিক তাই।

ওর পথে ঘাটে যখন কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যায় জ্বলতো তেলের আলো, আর অন্ধকারে এখানে ওখানে হাটতে গিয়ে সাধু-সন্ন্যাসীর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তুম,—তখন ছিল ওই মায়াপুরী রোমাঞ্চকর। কত লোক বলে, কপিলমুনি এখানে ব'সে তপস্যা করতেন—এই গঙ্গার ধারে, সে নাকি কঠিন তপস্যা। সুতরাং মায়াপুরীর সঙ্গে হরিদ্বারের আরেকটা নামও জড়ানো আছে, সে হলো কপিলস্থান। কত লোক আসে এখানে কত দেশ দেশান্তর থেকে। তারা দেখে বেড়ায় সূর্যকুণ্ড, আর সপ্ত-ধারা, গৌরীকুণ্ড আর পিছোড়নাথ, ভৈরব আর নারায়ণশিলা। ঘাটের ঠিক ধারে যে মন্দিরটি দেখে আসছি এতকাল ধরে, ওর মধ্যে নাকি আছে শ্রীবিষ্ণুর চরণচিহ্ন। আর মায়াদেবীর মন্দির, সেও এক দৃশ্য। দেবী হলেন চতুর্ভুজা দুর্গা, ত্রিমুণ্ড করাল মূর্তি। তাঁর এক হাতে মানব-জাতির প্রতি অভয় আশীর্বাদ, অন্য হাতে মহাচক্র, তৃতীয় হাতে নর-কপাল, চতুর্থ হস্তে ত্রিশূল। ওর ব্যাখ্যা জানিনে; জানবার চেষ্টাও করিনি। কিন্তু এ কথা
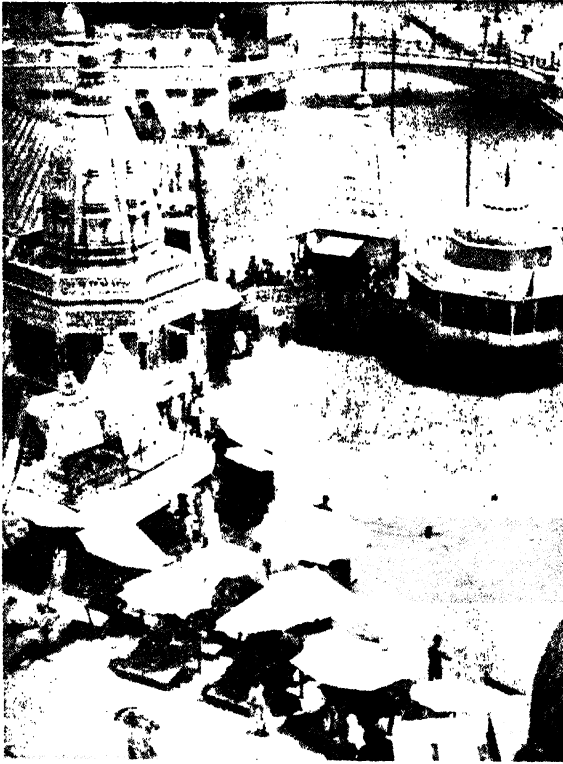
হরিদ্বারে স্নানের ঘাট

জানি, সমস্ত মূর্তিটি অর্থহীন নয়—ওর মধ্যে কথা আছে, আছে তত্ত্ব, আছে রহস্য। কতদিন ঘুরে এসেছি ওই বনচ্ছায়াচ্ছন্ন নিভৃত বিল্বকেশ্বর মন্দিরে, কিন্তু কোনদিন একথা আলোচনা করিনি, ওটার প্রকৃত নাম বিল্লোকেশ্বর, অথবা 'বিল্বকেশর।' কিন্তু পথঘাটের কোলাহল থেকে দূরে ওই মন্দিরটির পরিপার্শ্বে পিপল অশ্বত্থের আবছায়ার তলায় লতাগুল্মে গাঁদা ও সন্ধ্যামণির ঝাড়ের গায়ে প্রাচীন শিবমন্দির—ওরই কাছে গিয়ে পাথরের শিলায় ব'সে আমার কত প্রভাত গিয়ে মিলেছে মধ্যাহ্নে, কত অপরাহ্ন নিঃশ্বাস ফেলে গেছে সন্ধ্যার কোলে। যাত্রীরা এসেই ছোটে হয়ত নীল্লোকেশ্বরে কিংবা কনখলে, কিংবা পঞ্চমুখ-অষ্টবাহু সর্বনাথ শিবদর্শনে। কতদিন ভেবেছি মায়ামন্দিরের বাইরে ওই যে মহাসিদ্ধ বোধিসত্ত্বের মূর্তি,—হয়ত ওরই নাম বিশাল ভারত। অমনি নিমীলিত নেত্র, অমনি তপস্বী, অমনি জ্বরাব্যাধিবিকারহীন অনাদ্যন্তকালের ভারত,—কল্প-কল্পান্তের সমস্ত পতন-অভ্যুদয়ের আদি-সাক্ষ্য ভারত।

কিন্তু আমার কোন তাড়া নেই, হরিদ্বারে এলে আমার ঘুম পায়। এখানে অনন্ত অবকাশ বলেই এত ঔদাসীন্য। এখানে কোন কাজের চাকা ঘোরে না, কেবল পূজার প্রহরের গম্ভীর মধুর ঘণ্টা বেজে বেজে থেমে যায়। সেই আওয়াজ ওই খরস্রোতা নীলধারার ওপর দিয়ে বহু দূর দূরান্তরে হিন্দু দর্শনের বার্তা ঘোষণা করে,—যেদিকে মর্ত্যলোক যেদিকে দেবতার চেয়ে মানবতার দাম বেশী, জ্ঞানের চেয়ে বিজ্ঞানের, আনন্দের চেয়ে আহ্লাদের। চ'লে যায় সেই আওয়াজ পাহাড় থেকে পাহাড়ে, মনসা থেকে চণ্ডী, মায়াবতী থেকে কনখল, লালতারাবাগ থেকে গুরুকুল। আমি থাকি ওই শ্রবণনাথ ঘাটের পাশে অশ্বত্থের তলায় রক্তবরণ, ঘাটের পাথরের সিঁড়িতে,—ওখানে জলস্রোতের ধারে কম্বল বিছিয়ে শুলে পৃথিবীর সমস্ত ঘুম এসে আমার দুই চোখের পাতা জড়িয়ে ধরে। ওই জলস্রোতের তলায় আছে কিছু একটা ভাষা, কিছু একটা কবোর ব্যঞ্জনা, সেটা এত ঘন, এত নিগূঢ়—কিছুটা যেন তার উপলব্ধি করি, কিছু বা তার দুর্বোধ্য। বত্রিশ বছর ধ'রে শুনেছি ওই কলস্বনা জাহ্নবীর মর্মের ভাষা, আজও বুঝতে পারিনি। আজও জানতে পারিনি, সে-মন্ত্র কেন আমার রক্তে এমন করে ভেসে বেড়ায়।

সেই হরিদ্বার আজ নেই। সেই পাথরে হোঁচটখাওয়া রাস্তা, সেই ছোট্ট খোলা স্টেশন, আশে পাশে পাহাড়ি গুহাগর্ভে স্থানীয় লোকের বস্তী,—সেই অগণ্য গেরুয়াধারী সাধু-সন্ন্যাসীর ধুনিজ্বালানো আসন এখানে-ওখানে-সেখানে। সেদিনকার হরিদ্বারের প্রাকৃত রূপের সঙ্গে দারিদ্র্যটা যেতো মানিয়ে। একটি দুটি পয়সায় প্রচুর সুযোগ সুবিধা মিলে যেতো। অন্নসত্র ছিল অবারিত। আহার ও আশ্রয় বিনামূল্যে—হ্যাঁ, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে জুটে যেতো। কে খাওয়াতো, কে জায়গা দিত, তামাকের আসরে কে ডেকে নিত, কেমন ক'রে জুটে যেতুম কথকের আসরে, কোন্ সাধুর হাত থেকে ভস্মতিলক পাবার লোভে কেমন করে তার পায়ের কাছে ভক্ত হনুমানের মতন বসে যেতুম—সে সব কথা এখন আর ওঠে না। সে মন নেই, সেই আবহাওয়া নেই, সে-হরিদ্বার নেই! এখন গেলে প্রথম চোখে পড়বে বিড়লা সাহেবের অত উঁচু ঘণ্টা ঘড়ি, ব্রহ্মকুণ্ডের মাঝপথে নেতাজী সুভাষের প্রস্তরমূর্তি! রাস্তাঘাট পিচঢালা, বিজলী বাতির ছয়লাপ মহাদেবের জটানিঃসৃত গঙ্গার ফোয়ারা-

মূর্তি পথের মাঝখানে। সর্বভারতীয় লক্ষ-পতিদের তৈরী শতাধিক প্রাসাদ। হাল আমলের স্নানাগার, মার্বেল পাথরের দালান, অসংখ্য মোটরযান, সিনেমা হাউস, রেডিয়ো যন্ত্রে বোম্বাই প্রেমের রসতরংগ সংগীত। সাধু-সন্ন্যাসীরা বহু পালিয়েছে, তাদের জায়গা নিয়েছে পাঞ্জাবের কামিনী-কাঞ্চন; গাঁজা-চরসের ধোঁয়া নেই কোথাও, তা'র বদলে খ'ুজে পাওয়া যাচ্ছে ঘোলা জল। কথকের আসর উঠে গেছে, দর্শন-তত্ত্বের সভা গা-ঢাকা দিয়েছে; ভেট-ভোজনের রেওয়াজ উঠে গেছে,—তারা সব এখন জায়গা ছেড়ে দিয়েছে রাজনীতির ধাক্কায়। দুধ-মালাইয়ের দোকানের আশে পাশে এখন চা ও কফি পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর। ঠাকুর আর মন্দিরের পট উঠে গেছে, তার বদলে কোটপ্যাণ্ট পায়জামা আর চুড়িদার পরা মেয়েপুরুষ কোডাকের ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলে বেড়াচ্ছে। ধর্মান্বেষী অপেক্ষা এখন স্বাস্থ্যান্বেষীর ভিড় ওখানে। আগে পাওয়া যেত উৎকৃষ্ট ঘৃতপক্ক পুরি, এখন দালদার চপ-কাটলেট। মাছ, মাংস, ডিম—কেউ খায় না হরিদ্বারে। কিন্তু পেঁয়াজটা চালু আছে। আর জোয়ালাপুর যখন হাতের কাছে, তখন সেখান থেকে গোপনে মাছ-মাংস-ডিম এনে যে কোনো ধর্মশালার বন্ধ ঘরের মধ্যে বিনা পেঁয়াজে রাঁধলে কেই বা দেখছে? সেই হরিদ্বারের হাওয়ায় চন্দনের গন্ধ আর পাওয়া যায় না।

এগুলো মন্দ কি ভালো এ আলোচনা থাক্। কিন্তু এগুলো সময়-কালের তরংগাঘাত, সুতরাং মানতে হবে। মানুষ বদলেছে, সুতরাং হরিদ্বারও বদলাবে বৈ কি। মনসা পাহাড়টা উড়িয়ে দিতে পারলে বর্ষার সময় হরিদ্বার কিছু নিরাপদ হয়, হয়ত কর্তৃপক্ষ একদিন একথা ভাবতে বসবে। এখানকার ঘাটে ঘাটে যে লক্ষ লক্ষ মাছ ঘুরে বেড়ায়—এই মাছ চালান দিলে রাজ্যের প্রচুর আয় বাড়তে পারে, হয়ত একথা লোকের মাথায় ঢুকবে একদিন। সম্ভবত সেদিন বেকার সাধু-সন্ন্যাসীরা কাজ পাবে, মন্দিরের মধ্যে মাইনেকরা পুরোহিত বসবে, ধর্মশালারা মেহনতি জনতার কোয়ার্টারে পরিণত হবে। এই ত' সেদিন কন্‌খলে গিয়ে দেখলুম—দক্ষঘাটের সর্বনাশ। বট-অশ্বত্থের তলায়-তলায় যে নীল জলস্রোত ছুটে যেতো প্রমত্ত তুরংগদলের মতো, সে-জলের চিহ্নও নেই। ঘাট শুকনো। তলা থেকে পাথর বেরিয়েছে, সামনে পচা বদ্ধজলা, ওপারে বালুপাথরের ডাংগা। পাণ্ডারা কপালে হাত দিয়ে বসেছে। যাত্রীরা মুখ ফিরিয়ে চ'লে যায়—না আছে দক্ষঘাটের মহিমা, না আছে সেই প্রাচীন দিনের উদাসী হাওয়া। ভাগ্য ভালো, দাক্ষায়নী বেঁচে নেই, বেঁচে থাকলে তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির এই দুর্দশা দেখে আরেকবার দেহত্যাগ করতেন! পাণ্ডারা বললে, হরিদ্বারের গংগাকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং এদিকে স্রোতের ধারা ছেড়ে দেওয়াটা এখন কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাধীন। অতএব কন্‌খলের প্রাণরস অনেকটা গেছে শুকিয়ে। জলের সংগে আসে জীবনের চাঞ্চল্য, তাই প্রবহমান জলধারার ধারে ধারে জনপদ গ'ড়ে ওঠে, মন্দিরে লোকে পুজো দেয় সংসারযাত্রা হয় ক্রিয়াশীল। আজও সেই দক্ষপ্রজাপতির মন্দির বৃক্ষচ্ছায়াময় তপোবনে রয়েছে দাঁড়িয়ে, সেই রয়েছে দুর্গপ্রাকারের ভগ্নাবশেষ, সেই পথের সামনে রয়েছে বাংগালী পরিচালিত নাগেশ্বর মন্দির—কিন্তু ঘাটে জল নেই, তাই কোথাও রস নেই! মনে হচ্ছে যেন

হরিদ্বারের গংগা

একটা জগৎজোড়া বিশালকায় বৈজ্ঞানিক দৈত্য—যার নাম আধুনিক—সে যেন দিগ-দিগন্ত আচ্ছন্ন ক'রে এগিয়ে আসছে। সে গ্রাস করবে সব! বিজ্ঞানের শাসনে মনুষ্যজাতি নিয়ন্ত্রিত হবে।

মোতিবাজার ছাড়িয়ে ভীমগোড়া পেরিয়ে সন্ধ্যার দিকে একা একা যেতে একদিন ভয় করতো, লালতারাবাগের সেই অশ্বত্থতলার গংগার ধারটা ধ'রে নিরঞ্জনী আখাড়ার পাশ দিয়ে একদিন একা একা মায়াপুরীর পথ পেরিয়ে যেতে সাহস হোতো না। কিন্তু সেদিন আর নেই। এখন সবটা সহজ, আলোকমালায় সুসজ্জিত। হৃষিকেশের রাস্তাটায় ছিল দেরাদুন উপত্যকার ঘনগভীর অরণ্য,—আজও অনেকটা আছে,—কিন্তু ওই পথে বেরিয়ে দিনমানেও গা ছমছম করতো—কেউ বলতো বাঘের উপদ্রব, কেউ বা বলতো ডাকাত-দলের হানাহানি। আজ আর ও রাস্তায় এসব কথা ওঠে না। আগে ছিল হাঁটা, পরে হোল টাংগা, এখন মোটর। মোটর বাস এখন ধুলো উড়িয়ে অবিশ্রান্ত আনাগোনা করে, সাধু-মহন্তরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। দুঃসাধ্য পথ এখন হয়ে গেছে সহজসাধ্য, অগম্য অঞ্চলই এখন অনেকের গন্তব্যস্থল। আগে হৃষিকেশ

থেকে বেরিয়ে কেদারনাথ হয়ে চামোলি পৌঁছতে লাগতো প্রায় বাইশ দিন, এখন লাগে একদিন আর একবেলা—অবিশ্যি কেদারনাথ আর রুদ্রপ্রয়াগ বাদ দিয়ে। চেষ্টা করলে রেলস্টেশন থেকে বদরিনাথ এখন মাত্র পাঁচ দিনে পৌঁছনো যায়।

চেষ্টা করেছি আধুনিক মন নিয়ে হরিদ্বারে ব'সে থাকবো। কিন্তু সম্ভব হয়নি। এক ফোঁটা হিন্দুরক্ত গায়ে থাকলেই ওটা যেন পেয়ে বসে। অবিশ্বাসীকে একবার থমকে দাঁড়াতে হবে, শ্রদ্ধাহীনকে ভাবতে হবে আরেকবার। সমস্ত আধুনিক উপকরণ সঙ্গে নিয়ে হরিদ্বার অথবা হৃষিকেশে গিয়ে পৌঁছও, ক্রমশ দেখবে সেগুলো তোমার কাজে আসছে না। পোশাক আর পরিচ্ছদের বাহুল্যটা বেমানান লাগছে, প্রসাধন বিলাসটা অর্থহীন মনে হচ্ছে, ভোজনের বিস্তৃত আয়োজনটায় যেন অরুচি আসছে,—

কনখলের দক্ষ প্রজাপতির মন্দির

আমিষের প্রতি আকর্ষণ কমে এসেছে। পেলে হয়ত খাই, না পেলেও ক্ষতি নেই। তুমি যদি সমস্ত একে একে ত্যাগ করো, —উৎকৃষ্ট ভোজন, আরামদায়ক বাসস্থান, মূল্যবান পোশাক, প্রচুর সম্ভোগের সুবিধা, শরীরকে নিত্য পরিচ্ছন্ন রাখার আয়োজন,—এবং সব ছেড়ে যদি অত্যন্ত দীন-দরিদ্রের মতো পথে পথে বাসা বেঁধে বেড়াও—কেউ প্রশ্ন করবে না। কেননা তোমার এ চেহারাটা এখানকার সঙ্গে মিলবে। বরং বিপরীতটাই মেলানো কঠিন। অনেক রংমাখা পাউডার বুলানো রেশমী মেয়েকে দেখেছি ওখানে পথের ধারে বসে হাসিমুখে বাসন মাজছে,—

হরিদ্বারের শ্রবণনাথ ঘাট

এতটুকু আড়ষ্টতা নেই। আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে তাদের একটুও দেরি লাগে না। আমার মনে পড়ছে শ্রীমতী ক......দেবীকে, তিনি একজন বিদুষী লেখিকা। কবিতা ও কাহিনী রচনায় একদিন বেশ নাম হয়েছিল তাঁর। অত্যন্ত ভদ্র ও শান্ত প্রকৃতির মেয়ে। কিন্তু তাই ব'লে কথায় কথায় ঠাকুর দেবতার পায়ে মাথা ঠুকে বেড়ানো তাঁর ধাতে ছিল না। দিল্লী থেকে এসে যেদিন তিনি নামলেন হরিদ্বার স্টেশনে, সেদিন থেকে চটি জোড়াটা আর পায়ে দেননি। পাথর ফুটেছে পায়ের তলায়, হোঁচট লেগে রক্ত বেরিয়েছে, ঠাণ্ডায় কত কষ্ট পেয়েছেন,—কিন্তু যে ক'দিন ছিলেন, একটি কথাও বলেননি। অনুযোগ জানালে তিনি নম্র হাসি হেসে বলতেন, জুতো পায়ে দিতে নিজের কাছেই লজ্জা করে! অনভ্যস্ত হাতে রান্না করেছেন, সাবান-প্রসাধন 'শাওয়ার-বাথ' ছেড়ে তিনি লোহার শিকল ধ'রে গঙ্গায় ডুব দিয়েছেন, কিন্তু একটিবারও নিরুৎসাহ বোধ করেননি। শুধু এক এক সময় সানন্দে বলতেন, দিল্লী-কলকাতা হ'লে নিজের এসব আচরণ ভাবতেই পারতুম না। এখানে এলে কিছু ধ'রে রাখা যায় না।

মিথ্যা নয়, শ্মশান বৈরাগ্যটাই এখানে মনের ওপর চেপে বসে। ওটা অদ্বৈতবাদের সংস্রব কিনা, ঠিক আমি জানিনে। কিন্তু হরিদ্বারের হাওয়াটা উত্তরের,—দেবতাত্মা হিমালয়ের হাওয়া! যশ, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি ও সম্পদ—এগুলো প্রত্যেক সাংসারিক ব্যক্তিই কামনা করে। কিন্তু এখানে এলে ওদের দাম ক'মে আসে। ওরা দ্বারের বাইরে প'ড়ে থাকে, কেননা এটা হরিদ্বার। ওদের নিয়ে প্রত্যহের যে কচকচি,—এখানে এলে তা তুচ্ছ, এখানে এলেই তারা শান্ত। যেটা অত্যন্ত দরকারি, সেটাই এখানে হাস্যকর। যে বস্তুটা কলকাতায় না হলেই চলে না, সেটার কথা এখানে মনেই পড়ে না। হরিদ্বার থেকে চ'লে যাও দিল্লীতে, অমনি ইচ্ছা হবে মন্দোদরীর পাশে সীতাকে বসাও, লঙ্কা হোক স্বর্ণচূড়াময়, ত্রিভুবনের উপর প্রতিপত্তি হোক, স্বর্গের দেবতারা পর্যন্ত আমাকে ভয় করুক। আমার সমস্ত সাধ পূর্ণ হোক। হরিদ্বারে কোনো সাধ আহ্লাদ নেই, আছে স্তব্ধ শান্ত ধ্যানমৌন আনন্দ। এখানে সমস্তটা জড়িয়ে যেন একটি স্তব, একটি ওঁকারধ্বনি,—একটি অখণ্ড মহাকাব্য। যত পৌরাণিক কাহিনী আছে ব'লে যাও,—বিশ্বাস করবো। যত দেব-দেবতার অবাস্তব আজগুবী রোমাঞ্চকর কাহিনী আছে—

হর-কি-পারি, হরিদ্বার

সমস্ত মেনে নেবো। কেননা তাদেরকে এখান থেকে যেন দেখতে পাচ্ছি! এই তাদের লীলানিকেতন, এই দেবতাত্মা হিমালয়ের পাদমূলে। দেখতে পাচ্ছি ভগীরথ গিয়েছিলেন এই পথ দিয়ে, এই পথে এগিয়ে গেলেই কর্ণপ্রয়াগে দাতাকর্ণের তপস্যার সঙ্গম। এই পথ দিয়ে সূর্যবংশাধিপের যাত্রা, এই পথই হোলো পাণ্ডবদের। কিছু অবিশ্বাস করবো না, কারণ এটাই হোলো মায়াপুরীর মায়াজাল।

কখনো অসময়ে গিয়ে পড়েছি হরিদ্বারে। থমকে দাঁড়াতে হয়েছে। চারিদিকে নিঃঝুম নির্জনতা। প্রভাতে মধ্যাহ্নে রাত্রে শুধু বেগবতী গঙ্গার দুরন্ত জল-

কনখল

প্রবাহের আওয়াজ। পথে পথে ঘুরে দেখেছি সমগ্র হরিদ্বার তন্দ্রাচ্ছন্ন। ধর্মশালার সিঁড়ির তলা দিয়ে পেরিয়ে গঙ্গায় গিয়েছি, জনহীন মন্দিরের চত্বরে গিয়ে বসেছি, মনসা পাহাড়ের মাঝপথে গিয়ে পাথরে হেলান দিয়ে চোখ বুজেছি,—কী যেন নিগূঢ় আশ্চর্য গন্ধ পাথরে পাথরে। কানে কানে কী যেন কথা কয়, কী যেন বীজমন্ত্র জপ করে। পাহাড়ের উপর থেকে চেয়ে থেকেছি, প্রাণীজগতে কোথাও যেন গতিবেগ নেই, চাকা ঘুরছে না, ঘড়ির কাঁটা চলছে না। যতদূর দৃষ্টি চলে একটা উদাসীন অধ্যাত্ম শান্তি ছড়ানো, তার চাঞ্চল্য নেই কোথাও। হয়ত এইটিই ভারতের সত্য পরিচয়। এই শান্তিকে আহত করতে চেয়েছে কত যুগের কত জাতি, কত সভ্যতা, কত দস্যুতা। সাময়িক কালের সেই তরঙ্গাঘাতে হয়ত এই মহাপ্রাচীন ঐতিহ্যের তন্দ্রা ভেঙেছে, দুই চোখে হয়ত জ্বলেছে রুদ্রবহ্নি, হয়ত বা তার তাণ্ডব নর্তনে অসুরের হৃদ্‌কম্প দেখা দিয়েছে— তারপরে আবার ভারতের নিমীলিত নেত্রে এসেছে শান্তি, এসেছে ধ্যানবুদ্ধের অধরে প্রসন্ন স্মিতহাস্য। ধীরে ধীরে আবার ফিরে এসেছে সেই অনাদি প্রাচীনের চিরনবীন ধারাবাহিকতা। ওই পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে অনুভব করেছি, আমার শিরা উপশিরার রক্তের ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে সেই তিন হাজার বছরের ইতিহাস। ঝড়ে আঘাতে মুখ থুবড়ে পড়েছি, অপমানে লুণ্ঠিত হয়েছে মাথা, হিংস্র অসুরের দংষ্ট্রাঘাতে ছুটেছে কত রক্তধারা, বেদনায় আড়ষ্ট হয়েছে সর্ব অঙ্গ, যন্ত্রণায় অশ্রু গড়িয়েছে কত শত বছর,—কিন্তু আঘাতের পরিবর্তে আমি প্রত্যাঘাত হানিনি, হিংসা করিনি, মনুষ্যত্ববোধের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটাইনি। আজ তিন হাজার বছর পরে সেই আমার সকলের বড় সান্ত্বনা। আমার ওই প্রাচীন বট-অশ্বত্থের কোটরে, ওই হিমালয়ের গুহা-গহ্বরে, ওই সুবিশাল সমতলের অসংখ্য প্রান্তরে, নগরে, জনপদে, নদীপথে, সাগরের বালুবেলায়, অরণ্যের বিজন ভীষণতায়—সংখ্যাতীত সভ্যতা এসে ছোট ছোট বাসা বেঁধেছে। তাদের অনেকে আজও আছে এই ভারত পথিকের হৃদয়ের মধ্যে। যুগে যুগে তা'রা সঞ্জীবিত হয়েছে আমার প্রাণরসে।

ওই চণ্ডীর পাহাড়ের চূড়ায় মন্দির-চত্বরে দাঁড়িয়ে কতবার দেখেছি ভারতকে, দূরে দক্ষিণে চ'লে গেছে আমার দৃষ্টি। এই আমি দাঁড়িয়ে দেখেছি সেই আমিকে। সে চলে গিয়েছে সমগ্র ভারত পরিক্রমায়। মানস সরোবরের থেকে গিয়েছে সিন্ধুনদে, গিয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদের পথে। সে জপ ক'রে ফিরেছে গোদাবরী, বেত্রবতী ও রেবার উপকূলে পাথরের আসনে-আসনে। দৃষদ্বতীতে চন্দ্রভাগায় বিপাশায় যমুনায় গঙ্গায়—আর্যাবর্তকে আলিঙ্গন করেছে সে কতবার। সে চ'লে গিয়েছে পূর্ণায় মঞ্জিরায় ভীমায় কৃষ্ণায় আর বেদবতীর তটে তটে। চ'লে গিয়েছে সে রামগিরি মধ্যগিরি কৃষ্ণগিরি পেরিয়ে কবেরীর অববাহিকা ছাড়িয়ে সেতুবন্ধের দিকে ভারতের আদি সভ্যতার পথের চিহ্ন ধ'রে। সে-আমি কোথাও স্থির নয়, তবু নিত্য চাঞ্চল্যের মাঝখানেও সে শান্ত, সে উদাসীন, সে যোগাসীন। সমস্ত ক্ষয় ক্ষতি রক্তপাত রাষ্ট্রবিপ্লব মহামারী শত্রুভয় অরাজকতা—সকলের মাঝখানে থেকেও সে সকলের থেকে দূরে। সমস্ত সাময়িক চাঞ্চল্যের বাইরে, সকল উত্থান পতনের বাইরে। অনাদি অনন্ত ঐতিহ্যের ধারাবাহী সে এই ভারতের নিত্য পথিক।

পাহাড় থেকে নেমে এলুম। আপাতত একবার বিদায় নেবো। যোগতন্দ্রায় আত্মনিমজ্জিত থাক্ হরিদ্বার। আমার পায়ের শব্দে তার ঘুম না ভাঙে। মন্দিরে মন্দিরে পারাবতের ক্লান্তকণ্ঠে বৈরাগ্যবোধ অটুট থাকুক। নদী নির্ঝরের আবর্তে আবর্তে তার মূল মন্ত্র নিত্য উচ্চারিত হোক, সামগান মুখরিত মুনি-কি-রেতীর তপোবনে ঋষির আশ্রমপ্রান্তে বন্য ময়ূরের কেকা রব শাওনকে আহ্বান করুক,—আমি আপাতত বিদায় নিচ্ছি।

এই গঙ্গা চলুক আমার সঙ্গে, এই গঙ্গাকে চিনে চিনেই আবার আমি ফিরবো। আমি গাঙ্গেয়। এই হরিহরের দ্বার খোলা থাক্, এখান থেকে আবার এরা সবাই ডাক দেবে। এই নীলধারা, মনসা-চণ্ডী, ওপারের অরণ্য, মায়াপুরীর আশ্রম, অশ্বত্থতলের এই রক্তবর্ণ প্রস্তর সোপান, হৃষিকেশ চন্দ্রভাগা ছাড়িয়ে ওই স্বর্গাশ্রম, ওই অন্তহীন টেহরী গাড়োয়াল ব্রহ্মপুরার পার্বত্য রহস্যলোক—ওরা ডাক দেবে আমাকে আবার। আপাতত ঝুলি কাঁধে নিয়ে বিদায় হই!—

(ক্রমশ)

[একত্রিশ]
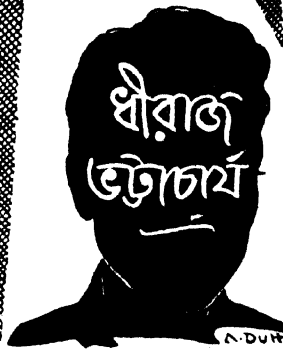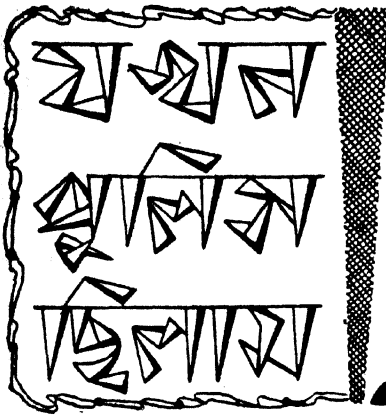
নিরাপদে সুস্থ শরীরে কলকাতায় ফিরে এসেছি। বাবা মা ছোটভাই বোন সবাই খুব খুশী। ওরা যেন জানত আমি আসব, তাই বিস্মিত হল না, কোন প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করল না। এক দিক দিয়ে বেঁচে গেলাম। দু' বেলা খাই আর নিজের ঘরটিতে চুপ ক'রে বসে বই পড়ি বা ঘুমোই। সন্ধ্যের পর হরিশ পার্কের নির্জন বেঞ্চির উপর চিৎ হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকি। ক্রমে রাত গভীর হতে গভীরতর হয়, আমিও উঠে বাড়ি গিয়ে খেয়ে আমার নীচের ছোট্ট ঘরটিতে শুয়ে পড়ি। এইভাবে দু' তিন দিন কাটল। সেদিনও নিয়মমত পার্ক থেকে ফিরে ঘরে ঢুকে দেখি বাবা বসে আছেন। পাশে এসে বসতে বললেন, বুঝলাম কিছু বলবেন আমায়। চুপ করে পাশে বসে আছি, কিছুক্ষণ বাবার মুখে কোনো কথা নেই। তারপর স্বভাবগম্ভীর স্বরে আস্তে আস্তে তিনি বললেন—"আমি ভেবে দেখলাম এ চাকরি তোমার ছেড়ে দেওয়াই ভাল।"

আমি নিঃসঙ্কোচে বলে ফেললাম—"ছাড়ব বললেই ত' আর ছাড়া যায় না। তা ছাড়া বড় সাহেব গোড়া থেকেই আমার উপর চটা। শুধু জব্দ করবার জন্যেই ও আমার রেজিগনেশন চিঠিটা চাপা দিয়ে রাখলে।"

একটু ভেবে বাবা বললেন—"তাহ'লে এক কাজ কর তুমি। মাস দুই ছুটি নেবার ব্যবস্থা কর, আমি এর মধ্যে রতিলালকে ধরে দেখি কলকাতার কাছাকাছি কোথাও বদলি করা যায় কি না।"

ভেবে দেখলাম দীর্ঘ ছুটি নিয়ে অন্য কোনও জেলায় বদলি হওয়া অথবা চাকরি ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আমার আর অন্য পথ নেই। চিটাগং জেলায় আবার ফিরে যাওয়া মানে জেনে শুনে সাপের গর্তে হাত দেওয়া। তা ছাড়া ওদের কাছে মুখ দেখানর সাহস বা মনের বল আমার ছিল না। অগত্যা প্রতিবেশী ডাক্তার সুশীল রায়ের শরণাপন্ন হলাম। সব শুনে ডাক্তার বললে—"আরে এতে ঘাবড়াবার কি আছে। টাইফয়েড হয়েছে বলে আমি একটা সার্টি-ফিকেট দিচ্ছি, দু' মাসের ছুটির দর-খাস্তের সঙ্গে সেটা কালই পাঠিয়ে দাও মুলাণ্ডের কাছে। বাবা বাবা বলে ছুটি দিতে পথ পাবে না।"

এত সহজেই মীমাংসা হয়ে যাওয়ায় মনটা একটু হাল্কা হ'ল।

সে দিন সকাল থেকেই লক্ষ্য করলাম বাবা কেমন মনমরা গম্ভীর। বিকেলের দিকে জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনার শরীরটা কি ভাল নেই বাবা?"

উত্তর না দিয়ে কিছু সময় আমার মুখের দিকে তিনি চেয়ে রইলেন, তারপর আমায় ডেকে নিয়ে নীচে বাইরের ঘরে বসালেন। কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাবা বললে "ধীউ বাবা, একটা ব্যাপারে তোমার ক আমি অপরাধী।" চমকে বাবার মু দিকে তাকালাম।

বাবা বললেন—"আমার আশৈশবের বন্ধু সহপাঠী—চ্যাটার্জি, কথা চিঠিতে তোমায় লিখেছিলাম, ও সকালে তার চিঠি পেলাম।"

রুদ্ধ নিশ্বাসে চুপ করে বসে রইল বাবা মাটির দিকে চেয়ে বললে "লিখেছে—ভাই ললিত, ধীরাজের স নমিতার বিয়ে দেবার জন্য আমি প্রস্তু ছিলাম। এমন কি অনেকদূর এগি ছিলাম। কিন্তু কি জান ভাই, আ আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই আপ করছে। বলছে—আজ স্বদেশী আন্দোল যুগে সামান্য একটা কনস্টেবলের স মেয়ের বিয়ে দিলে সমাজে আমি ম মুখ দেখাতে পারবো না। তা ছাড়া লো কাছে জামাই-এর পরিচয় দিতেও ম কাটা যাবে। আরও অনেক কথা। ভ আজীবনের বন্ধুও কেমন সহজেই ক কয়েকটা কালির আঁচড়ে প্রতিশ্রুতি ধ মুছে শেষ ক'রে দিতে পারলে!"

শেষের কথাগুলো বলবার সময় বা গলা ধরে এসেছিল। খানিকক্ষণ দুজ চুপচাপ বসে রইলাম, তারপর আস্ আস্তে উঠে বাবাকে প্রণাম করে বলল —"ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস হারা বসেছিলাম বাবা। আপনার বন্ধুর চিঠি আমার মস্ত উপকার হয়েছে। আজ ম হচ্ছে ভগবান বলে একজন হয়ত আছেন আপনি নিশ্চিন্ত হোন বাবা, আপনা কথা রাখতে বিয়ে আমি করতামই কি সে যে আমার কত বড় শাস্তি হতো ত হয়তো আপনি বুঝতে পারবেন না। আ একটা অনুমতি আজ আপনি আমায় দিন নিজে ইচ্ছে করে না করলে বিয়ের জন্য কোনও দিন আমাকে আদেশ করবেন না

অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চে থেকে বাবা বললেন—"দিলাম অনুমতি

আর একবার প্রণাম করে তাড়াতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

দিন দুই বাদে 'On His Majesty Service' মার্কা খামে মুলাণ্ড সাহেবে চিঠি এসে হাজির। ছোট্ট চিঠি, সে চিঠি

র্ম হল—আমার টাইফয়েড অসুখের থাটা সাহেব বিশ্বাস করেননি। তাঁর রণা ওটা একেবারে মিথ্যে ছুতো। লম্বা ছুটি নিয়ে কলকাতায় শুধু স্ফূর্তি ক'রে কাটানর মতলব ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি যেন অতি অবশ্য আগামী শুক্রবার বেলা ঠিক দশটার সময় মেডিক্যাল কলেজে উপস্থিত থাকি। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মেজর গ্রীনফিল্ড্ নিজে আমাকে পরীক্ষা করে দেখবেন। তিনি যদি বলেন, আমি অসুস্থ তবেই ছুটি পাব, নইলে পরদিনই আমাকে চিটাগং রওনা হতে হবে। পরীক্ষার ফিজের বত্রিশ টাকা গভর্নমেণ্ট থেকে আগেই জমা দেওয়া হয়েছে।

মাথা ঘুরে গেল আমার। চিঠি নিয়ে দৌড়লাম ডাক্তার সুশীল রায়ের কাছে। চিঠি পড়ে তাঁরও মুখ ফেকাশে হয়ে গেল। বললে—"ও ধীরাজ, এ যে দেখছি কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ল। এখন উপায়?"

বললাম—"তুমি ভাই চল আমার সঙ্গে শুক্রবারে। সাহেবকে একটু বুঝিয়ে বললেই হয়তো পরীক্ষা না করেই ছুটি দিয়ে দেবে।"

চোখ দুটো কপালে তুলে ডাক্তার বললে—"ক্ষেপেছ? মেজর গ্রীনফীল্ড ভারি কড়া আর একরোখা মানুষ। কেউ কোনও অনুরোধ করলে ঠিক তার উল্টোটি করে বসে থাকে। তবে কিনা খাম-খেয়ালী ডাক্তার, হয়তো তোমার দরখাস্ত দেখে এমনিই ছুটি দিয়ে দিতে পারে।" বুঝলাম খানিকটা সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া ডাক্তারের আর করবার কিছু নেই।

বাড়ি এসে বাবাকে সব খুলে বললাম। শুনে বাবা মা দুজনেই বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তা ছাড়া এ ব্যাপারে ওঁদের করবারই বা কি আছে। মনে মনে ঠিক করলাম, মুখটা অন্তত মেক্-আপ্ ক'রে খানিকটা রুগ্ন করবার চেষ্টা করি। যদি দৈবাৎ মুখ দেখে আর পরীক্ষা না ক'রে ছুটিটা মঞ্জুর করে দেয়। মনে মনে বেশ জানতাম ডুবে মরবার আগে তৃণ-খণ্ড আঁকড়ে বাঁচবার চেষ্টার মত এও আমার একটা মস্ত দুরাশা।

মাথার এক বোঝা চুল তেল না মেখে সাবান দিয়ে রুক্ষ করে নিলাম—চিরুনির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখলাম না। সঙ্গে সঙ্গে দাড়ি কামানও বন্ধ করে দিলাম। পরদিন সকালে আয়নায় দেখলাম, একটু রুক্ষতার আভাস দেখা দিয়েছে মাত্র, হাল ছাড়লাম না। আজ সোমবার, হাতে এখনো সময় রয়েছে চার দিন—দেখা যাক। দুদিন বাদে কি একটা দরকারি কাজে রাস্তা দিয়ে হাঁটছি এমন সময় বাল্যবন্ধু তারানাথ মুখার্জির সঙ্গে দেখা। ওর ডাক নাম নীলা। আমায় দেখেই উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে—"তোর কি হয়েছে রে ধীরাজ?"

আশায় আনন্দে মনটা দুলে উঠল। মুখখানা যথাসম্ভব কাঁচুমাচু ক'রে চেষ্টা-কৃত ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম—"নীলা, আমার টাইফয়েড।"

বিস্ময়ে চোখ দুটো কপালে তুলে আমার আপাদমস্তক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে নীলা বললে—"তাই নাকি? একটা কথা কখনই ভুলিস না যে, টেক-নাফে সমুদ্রের হাওয়া আর মুরগীর মাংস খেয়ে দেহটাকে করে এনেছিস একটা নিটোল খাসির মত। ছিলিম আষ্টেক কড়া গাঁজা খেয়েও কেউ বলতে পারবে না তোর দেহে কোনও অসুখ আছে।"

রেগে গেলাম, বললাম—"তোর সব-তাতেই বাড়াবাড়ি। ধর যদি একখানা মোটা পুরু কম্বলে গলা পর্যন্ত ঢেকে অন্ধকারে বসে মিহি সুরে কাতরাই, তাহলে?"

এবার হেসে ফেললে নীলা। বললে—"ব্যাপার কি বলত?"

সব খুলে বললাম। শুনে কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে নীলা বললে—"সত্যি ভাবনার কথা। তবে এখনও দুদিন সময় আছে, চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?"

বললাম "তোকে কিন্তু আমার সঙ্গে শুক্রবার মেডিক্যাল কলেজে যেতে হবে, কারণ একা গেলে আমি হার্টফেল করে মারা যাব।"

নীলা রাজি হয়ে গেল।

পরদিন দুপুরে খেয়ে দেয়ে শুয়ে আছি ম্যাডান কোম্পানী (অধুনা ইন্দ্রপুরী স্টুডিও) থেকে নির্বাকযুগের বিখ্যাত পরিচালক প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর সহকারী জ্যোতিষ মুখার্জি গাড়ি নিয়ে হাজির। কী ব্যাপার? মুখার্জির কাছে ব্যাপারটা যা শুনলাম তা হ'ল এই—নির্বাক ছবি 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র অসামান্য সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে গাঙ্গুলীমশায় দুর্গাদাস ও সীতা দেবীকে নায়ক নায়িকা নির্বাচন ক'রে 'কাল পরিণয়' ছবিটি তুলবার সব ব্যবস্থা শেষ করে ফেলেন। হঠাৎ দুর্গাদাসবাবুর সঙ্গে ম্যাডান কোম্পানীর মতান্তর হওয়ায় দুর্গাদাস-বাবু ম্যাডান কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে এসেছেন। অগত্যা তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নায়কের ভূমিকায় মনোনীত ক'রে শুটিং-এর দিন ঠিক করেন। আজ চার দিন ধরে সীতা দেবীকে নিয়ে শুটিং-এর জন্য সবাই স্টুডিওতে অপেক্ষা করে বসে থাকে, নায়ক তুলসী-বাবুর পাত্তাই নেই। মুখার্জি কলকাতার অলিতে গলিতে কোথাও খুঁজতে বাদ রাখেনি কিন্তু তুলসীবাবু যেন হাওয়ার সঙ্গে মিশে গেছেন। আজ স্টুডিওতে এসে গাঙ্গুলীমশাই ভীষণ রেগে গেছেন। মুখার্জিকে বলেছেন—যাকে হোক নায়ক
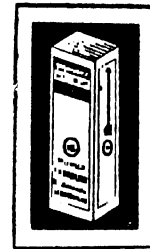
সাজিয়ে আজ তিনি শ্যুটিং করবেনই। আমার কলকাতায় আসার খবরটা কি করে মুখার্জি জানতে পেরেছেন, নাম করতেই প্রিয়নাথবাবু রাজি হয়ে গেছেন। মুখার্জি আমাকে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি নিয়ে এসেছেন, আজই দুপুরে শ্যুটিং। সব শুনে বললাম—"সবই বুঝলাম ভাই। এতবড় একটা চান্স পাওয়াও ভাগ্যের কথা কিন্তু আমার যে এদিকে শিয়রে সংক্রান্তি। আমার মরণ বাঁচন কালকেই স্থির হয়ে যাবে মেডিক্যাল কলেজে।" এক এক করে সব কথাই মুখার্জিকে বললাম। শুনে একটু যেন নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল মুখার্জি। তারপর বললে—"তুমি বাড়িতেই আছ ত? আমি ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ঘুরে আসছি গাঙ্গুলীমশায়ের কাছ থেকে। যদি এক ঘন্টার মধ্যে না আসি, জানবে হল না অন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

মুখার্জি চলে গেলে ভাবলাম এত বড় একটা চান্স পেয়ে হারালাম। নির্বাক যুগে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার পর থেকেই সীতা দেবী অসম্ভব জনপ্রিয়। তার বিপরীত নায়ক সাজা একটা ভাগ্যের কথা। ক্ষোভে দুঃখে নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিছুই করতে হল না।

আধ ঘন্টার মধ্যেই মুখার্জি এসে হাজির। বললে—"চল।"

সত্যিই অবাক হয়ে বললাম—"চল মানে?"

মুখার্জি বললে—"স্টুডিওতে গিয়ে গাঙ্গুলিমশায়ের কাছেই সব শুনবে, চল। মোদ্দা আজ তোমাকে দিয়ে তিনি শ্যুটিং করাবেনই। তোমার কালকের অগ্নি-পরীক্ষার কথাও বলেছি। শুনে বললেন—বেশ কাল যদি বিচারে তুমি দোষী সাব্যস্ত হও এবং শনিবার দিন চট্টগ্রাম রওনা হতে হয়—তাহলে তিনি আজকের শ্যুটিংটা বাতিল করে দিয়ে অন্য নায়ক ঠিক করে আবার শুরু করবেন গোড়া থেকে। মোট কথা আজ শ্যুটিং করা চাই-ই চাই।"

এরপর আর কথা চলে না। উপরে বাবার ঘরে গিয়ে দরজায় আস্তে আস্তে ঘা দিলাম। বাবা মা ঘুমুচ্ছিলেন। একটু পরে বাবাই উঠে দরজা খুলে দিলেন। সব কথা খুলে বললাম। একটু চিন্তা করে বাবা বললেন—"যাও তুমি! যেচে এত বড় একটা সুযোগ এসেছে তাকে ছেড়ে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।"

মা ক্ষীণ একটু আপত্তি তুলেছিলেন, বাবা এক ধমকে মাকে থামিয়ে বললেন—"একবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে পুলিসে ঢুকিয়ে ছেলেটার সারা জীবনটাই নষ্ট হতে বসেছে, এখনও তার জের মেটেনি। এবার নিজের ইচ্ছায় যে পথ ও বেছে নিয়েছে সে পথ ধরে স্বাধীনভাবে ওকে চলতে দাও। পরিণামে দুঃখ কষ্ট যাই পাক ও একাই তা ভোগ করবে। আমরা তো আর ভুগতে আসব না।"

নীচে থেকে মুখার্জি চেঁচামেচি শুরু করে দিলে "দেরি হয়ে যাচ্ছে, কাপড় জামা কিচ্ছু পাল্টাতে হবে না। একটা ময়লা শার্ট আর কোট থাকে ত নিয়ে এস।" তাড়াতাড়ি নেমে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

স্টুডিওতে ঢুকেই দেখি বন আলো করে খোলা চুলে বনদেবী বসে আছেন। এখানে বলে রাখি ম্যাডান স্টুডিও বলতে তখন গেটের সামনে রাস্তার আম ... নীচে ছোট দুখানা টিনের শেড টালিগঞ্জ ডিপোর গা ঘেঁষে দুখানা কোঠা ঘর এই বোঝাত। বাকি সবটাই জঙ্গল। পথের পাশে সেই টিনের ... নীচে নড়বড়ে একখানা চেয়ারে ... আছেন নায়িকা সীতা দেবী। অ্যা... ইন্ডিয়ান মেয়ে নাম 'মিস রেনি' ... তার পাশে একটা টিনের চেয়ারে ... রয়েছেন বিরাটকায় পরিচালক প্রি... গাঙ্গুলী। ময়লা কাপড় জামা পরে গাল খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর এক রুক্ষ চুল নিয়ে নায়িকা সীতা দে... সামনে দাঁড়াতে লজ্জায় মাথা কাটা যা... কোনও রকমে মুখ নীচু করে নম... জানিয়ে গাঙ্গুলীমশায়ের পাশে দাঁড়ালাম। কিছু বলবার আগেই ... বললেন—"আমি সব শুনেছি ধী... কোনও চিন্তা নেই। ছুটি না পাও অ... একদিনের কাজ নষ্ট হবে।"

একটু ইতস্তত করে গালে হাত ... বললাম—"কিন্তু এই এক মুখ দা...

কথা শেষ করতে পারলাম না, হো... করে হেসে উঠলেন গাঙ্গুলীমশাই ... মুখার্জি। শুধু কিছু বুঝতে না ... হতভম্ব হয়ে রইলাম আমি আর ... দেবী।

হাসি থামিয়ে ইংরেজিতে ... দেবীকে বললেন গাঙ্গুলীমশাই ... আশ্চর্য যোগাযোগ, ডাক্তারের ... দেওয়ার জন্য মেক-আপ করল ... আর সেই মেক-আপ ... আমি।" আবার হেসে উঠলেন গাঙ্গু... মশাই। ব্যাপারটা তখনও ঠিক ... পারিনি। সীতা দেবীর অবস্থাও তৈ...

গাঙ্গুলীমশায়ের পরের কথাগুলি... ব্যাপারটা জলের মত পরিস্কার হয়ে ... বললেন—"গল্পের নায়ক মনীন্দ্র ... গরীব। শুধু চেহারা আর বিদ্যার ... ধনী শ্বশুরের একমাত্র কন্যা কিশো... সঙ্গে দৈবাৎ বিয়ে হয়ে যায়। ... কিছুদিন পরে মনীন্দ্রের অ... আরও খারাপ হয়ে পড়ে। সকাল ... পায়ে হেঁটে চাকরীর চেষ্টায় চারি... ঘুরে বেড়ায়, চাকরী হয় না। সারা... হেঁটে নিরাশ হয়ে শ্রান্ত মনীন্দ্র স...

র ঘরে ফেরে, সাধ্বী স্ত্রী কিশোরী ামীকে সান্ত্বনা দেয়। এইভাবে কিছুদিন চলে। পয়সার অভাবে মনীন্দ্রের হারাও হয়ে উঠেছে তদনুরূপ। মাথায় ক রাশ রুক্ষ চুল, মুখে খোঁচা খোঁচা াড়ি, পরনে ময়লা কাপড় ও জামা। দিনও নিয়মিত চাক্‌রীর চেষ্টায় ঘুরে রে সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরে দেখে—তার ী ও এক বছরের শিশুপুত্র নেই। াড়ার লোকের কাছে খবর নিয়ে জানতে রে যে, তার শ্বশুর লোকমুখে খবর য়ে মেয়ের অনিচ্ছাসত্ত্বেও একরকম জোর রেই ওদের নিয়ে গেছে। রাগে হিতাহিত ানশূন্য হয়ে মনীন্দ্র তখনই ছোটে ধনী শুরের বাড়ি।

সিনটা হল এই। কাজেই বুঝতে ারছ, তোমার মেক্-আপ্ আইডিয়াল র্ দি সিন্। কিছু করতে হবে না, মন আছ ঐভাবেই শুটিং হবে। আজ ধু আফিস পাড়ায় চাক্‌রীর চেষ্টায় ারাঘুরি আর বাড়ি থেকে রেগে বেরিয়ে থ দিয়ে হেঁটে শ্বশুর বাড়ি যাওয়া। ই প্যাসিংগুলো শুধু নেওয়া হবে। তীনকে ক্যামেরা নিয়ে রেডি হতে বল দিখুজ্জে।

অধুনা বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান যতীন াস ছবিখানি তুলছিলেন।

সারাদিন কলকাতার পথে পথে াদ্দুরে ঘুরে ছবি তোলা হল। বাড়ি খন ফিরলাম তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। াওয়া দাওয়া সেরে সে রাত্রে ঘুমুতে ারলাম না। একদিকে আমার শৈশবের প্ন বহু আকাঙ্ক্ষিত সিনেমার নায়ক াতছানি দিয়ে ডাকছে, অন্যদিকে ভ্রূকুটি-টিল প্রতিহিংসাপরায়ণ মুল্যান্ড রিভল-ার হাতে শাসাচ্ছে। হাসিকান্নার টানা-পোড়েনে সারা রাত ছটফট করে কাটালাম। বশেষে কাল রাত্রি প্রভাত হ'ল।

শুক্রবার। কোনও বিশেষ বার যে নে কতখানি ভীতির সঞ্চার করতে পারে াজকের আগে তা কোনওদিন উপলব্ধি রতে পারিনি। করবার বিশেষ কিছুই ছল না, শুধু মোটা ময়লা কম্বল একখানা যোগাড় করে ঘড়ির কাঁটার দিকে চেয়ে সে রইলাম। স্নান করলাম না চুলের ুক্ষতা নষ্ট হবে বলে। আর খাওয়া? out of question। ক্ষিদে তেষ্টা ছিলই না। বেলা ঠিক ৯টায় নীলা এসে হাজির। এই চেহারায় কম্বল মুড়ি দিয়ে ট্রামে বাসে গেলে লোকে পাগল বলে ঢিল মারবে। সুতরাং ট্যাক্সি চড়েই যাওয়া স্থির হ'ল। মেডিকেল কলেজে নেমে প্রিন্সিপ্যাল মেজর গ্রীনফীল্ডের রুগী দেখবার চেম্বার খুঁজে নিতে দেরি হ'ল না। শুনলাম, সাহেব এখনও নামেন নি, ঠিক দশটা থেকে রুগী দেখবেন। আরও শুনলাম, মাত্র গতকাল সাহেব বিলেত থেকে ফিরেছেন। দু তিনজন হাউস সার্জেন ছোক্‌রা ডাক্তার ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, ও'দেরই একজনের কাছে গিয়ে নিজের নাম বললাম। শুনে ডাক্তারটি বললেন—"জানি, আপনার কেস্‌টাই আগে দেখা হবে। আসুন সাহেব নীচে আসবার আগেই আপনাকে একজামিন করে ফর্মটা ফিল্-আপ্ ক'রে রাখি। জামা কাপড় খুলুন।"

হতভম্ব হয়ে গেলাম। জামা কাপড় খুলব কি? চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি দেখে ছোক্‌রা ডাক্তারটি বললেন—"কম্বল, জামা খুলে ফেলুন, আপনার বুক পেট পরীক্ষা করব।"

অগত্যা ভয়ে ভয়ে গায়ে জড়ান কম্বল শার্ট ও গেঞ্জিটা খুলে চেয়ারের হাতলের উপর রেখে দিলাম। ঘরের বাইরে ওয়েটিং রুমে নীলা বসে আছে। এ বিপদের সে কাছে থাকলেও খানিকটা সাহস পেতাম।

যথারীতি পরীক্ষা শুরু হ'ল। স্টেথোস্কোপ দিয়ে প্রথমে অনেকক্ষণ ধরে বুক ও পরে পিঠ পরীক্ষা হল। জোরে জোরে পেট টিপে কি পরীক্ষা করলে ডাক্তারই জানে। তারপর ডান হাতখানা ধরে ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নাড়ীর গতি দেখলে—সবশেষে চোখের নীচের চামড়াটা টেনে ধরে দেখে পরীক্ষা শেষ হ'ল। একখানা ছাপানো ফর্ম টেবিল থেকে টেনে বার ক'রে ডাক্তার পরীক্ষার ফল লিখতে লাগলেন। দেখলাম, হার্ট থেকে শুরু ক'রে সবগুলোই লেখা হ'ল—নরম্যাল, শুধু আমার ফেবারে লিখল একটি কথা—Looks ill!

হতাশভাবে বললাম—"এ রিপোর্ট দেখলে সাহেব কিছুতেই ছুটি দেবে না।" খিঁচিয়ে উঠলেন ছোক্‌রা ডাক্তার—"আপনি বলতে চান আপনার ছুটির জন্য আমি চাক্‌রী ডিপ্লোমা সব খোয়াব? আট বছর ধরে দু' তিনবার ফেল ক'রে কত কষ্টে পাশ ক'রে ছ' মাসের জন্য হাউস সার্জেন হয়েছি। মিথ্যে রিপোর্ট লিখে দিই আর সাহেব এসে পরীক্ষা ক'রে দেখুক আট বছরে যা কিছু শিখেছি

...র ভুল। তখন আমার অবস্থাটা কি হবে বুঝতে পারেন?"

ইতিমধ্যে আরো দুটি ছোক্‌রা ডাক্তার কৌতূহল নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের মধ্যে একজন বললে—"এটা সেই চিটাগাং-এর কেস্‌, তাই না ঘোষ?"

ঘোষ মাথা নেড়ে জানালে, তাই-ই। তারপর একটু নরম সুরে বললে—"কিছু মনে করবেন না ধীরাজবাবু, আপনার কেস্‌ হোপ্‌লেস্‌! আপনাদের এস্‌ পি আমাদের সাহেবের অন্তরঙ্গ বন্ধু। দেখবেন চিটাগং থেকে পারসন্যাল চিঠি কি লিখেছেন তিনি? যদিও এটা দেখানো আমার পক্ষে খুবই অন্যায় হচ্ছে, তবু ফর্‌ ইওর স্যাটিসফ্যাকশন্‌ দেখাচ্ছি।"

দেখলাম টেবিলে রয়েছে একটা ফাইল, উপরেই আছে মুল্যাণ্ডের কাছে পাঠানো আমার ছুটীর দরখাস্তখানা ডাঃ সুশীল রায়ের সার্টিফিকেটের সংগে পিন দিয়ে আঁটা। তার নীচে রয়েছে ডাঃ ঘোষের পরীক্ষার ফল, সবার নীচে এক-খানা হলদে খাম। সেই খামখানা টেনে নিয়ে তার ভিতর থেকে একখানা টাইপ করা চিঠি বার ক'রে ডাঃ ঘোষ আমায় পড়তে দিলেন। বহুদিনের কথা, চিঠিটা একবার মাত্র পড়েছিলাম। চিঠির ভাষা হয়তো ঠিক মনে নেই কিন্তু মুল্যাণ্ডের বক্তব্যটুকু আজও স্পষ্ট মনে আছে। যতদূর মনে হয়, চিঠিটা এই—

Dear Greenfield,

A. S. I. Dhiraj Bhattacherjee of my District went on fourteen day's casual leave. At the expiery of the leave he wants to prolong it for another two months on the pretext that he is suffering from typhoid, which I doubt very much. Will you please examine him minutely and let me know the result at your earliest convinience? Your usual fees are sent herewith.

With best wishes ever
yours
H. B. Mulland.

যেটুকু ক্ষীণ আশা ছিল তাও নিভে গেল। শুধু মাইকেল মধুসূদনের বিখ্যাত সনেটের গোড়ার লাইনটি আমার হতাশ মনের দুয়ারে বার বার ঘা দিতে লাগল—

'আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়'—

ডাঃ ঘোষের কথা কানে এল—"এইবার ব্যাপারটা সব বুঝলেন ত? যান, বাইরে ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসুন, সাহেব আসবার সময় হয়ে গেছে। কাঠের পুতুলের মত ঘর থেকে বেরিয়ে ওয়েটিং রুমে নীলার পাশে গিয়ে চুপ করে বসে পড়লাম। নীলা জিজ্ঞাসা করলে—"কিরে, কি হ'ল?" জবাব দেবার ক্ষমতা ছিল না, চুপ করে বসেই রইলাম।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। আরদালি এসে ডাকল—"ধীরাজ ভট্‌চাজ!"

হাঁড়িকাঠে মুণ্ড গলিয়ে দেবার আগে বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে কম্বল জড়িয়ে সাহেবের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বিরাট চেহারা, বিলেতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় লাল মুখ আরো লাল হয়ে গেছে। সাহেবের হাতে রয়েছে আমার সেই ফাইলটা, সবার উপরে রাখা আমার ছুটীর দরখাস্তখানায় একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে সেইদিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সাহেব বললে—"You are Dhiraj Bhattacherjee?"

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়ে... একরকম জোর ক'রেই বললাম—

"Yes Sir".

—"You want two mo... leave?"

"Yes."

—"If I give you t... months?

সত্যিই ভয় পেয়ে গেলাম, ডা... সাহেব আমাকে নিয়ে বোধ হয় ... মশ্‌করা করছেন। কি বলি? ব... ভিতরে হাতুড়ি পিটছিল, ভয়ে... বললাম—"If you please, Sir."

হঠাৎ সিংহের মত গর্জে উঠ... সাহেব। ফাইলটা টেবিলের উপর্‌ আ... ফেলে এই প্রথম আমার মুখের ... চেয়ে বললেন—"I don't please! D... you require three months le... after typhoid?"

নিজের কানকে বিশ্বাস ক... পারছিলাম না। সাহেব কি এ... আমাকে ঠাট্টা করছেন? ইডিয়টের ... চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। দেখি সাহে... চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে হাত মুখ ... ডাঃ ঘোষ আমাকে ইশারা করে বলছে... "বলুন ইয়েস।"

আপনা হতেই মুখ দিয়ে বে... গেল—"Yes Sir."

টেবিল থেকে ফাইলটা টেনে নি... আমার দরখাস্তটার উপরে খস্‌ খস্‌ ... সাহেব লিখলেন—Three mon... leave with pay granted." তার... নীচে নাম সই করে দিয়ে ফাইলটা ... করে বললেন—"Next!"

তবু দাঁড়িয়ে আছি। মনেই ... যে, আমার দাঁড়াবার প্রয়োজন ফু... গেছে। তাড়াতাড়ি ডাঃ ঘোষ আমা... ইশারা করে বাইরে ডেকে নিয়ে গেলে... বাইরে গিয়ে ডাঃ ঘোষকে বললাম—"... হ'ল ডাক্তার?"

অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে ডাক্তা... ঘোষ বললেন—"এখনও বুঝতে পারেন ... ব্যাপারটা কি হল? খামখেয়ালি সাহেব... এসেই আপনার ফাইলটা নিয়ে শুধ... দেখেছে আপনার দরখাস্তখানা। ব্যস,... নীচে যে আরও চিঠিপত্তর রয়েছে, ত... দেখবার দরকারই মনে করলেন না সাহেব

...পনি সত্যিই ভাগ্যবান মশায়! এরকম ...স্ বড় একটা হয় না।"

সংশয় তখনও রয়েছে, বললাম,—...কন্তু আমি দু' মাসের ছুটি চেয়েছিলাম ...সাহেব তিন মাসের দিল কেন?"

হেসে ডাঃ ঘোষ বললেন—"এইখানেই ...মাদের প্রিন্সিপ্যাল সাহেব যে কত বড় ...চক্ষণ ডাক্তার তার পরিচয় পাওয়া যায়। ...নি জানেন, আপনি সত্যি টাইফয়েড ...কে ভুগে উঠেছেন। বিশ্রামের পক্ষে ... মাস ছুটি তাই মোটেই পর্যাপ্ত নয়। ...ন্তত তিন মাস হ'লে তবু খানিকটা ...খরে নিতে পারবেন।"

কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল। মনে মনে ...হেবের দীর্ঘজীবন কামনা করলাম ...রপর ঢুকে পড়লাম ওয়েটিং রুমে। ...স্থিরভাবে পায়চারি করছিল নীলা। ...মায় দেখে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল—...ক হ'ল?" কোন জবাব না দিয়ে ওর ...মার কলারটা মুঠো করে ধরে হিড় হিড় ...রে টানতে টানতে বাইরে চলে এলাম। ...ওড়া সিঁড়ি। দু' তিনটে ধাপ বাদ দিয়ে ...ফিয়ে পার হয়ে গেটের বাইরে এসে ...ৎকার করে ডাকলাম—"ট্যাক্সি!"

ভাগ্য সেদিন আমার সত্যিই ভাল। ...খনই ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। নীলাকে ...ভাবে টানতে টানতে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলাম, গাড়ি ছেড়ে দিল। হতভম্ব নীলা খালি জিজ্ঞাসা করেই চলেছে—ব্যাপারটা কি হ'ল বল? এতক্ষণে হুঁশ হল। কম্বলটা গা থেকে খুলে নীলার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বললাম—"আমি যা বলব, সংগে সংগে বলে যাবি নইলে মেরে ফেলব।" ফুসফুসের সব শক্তি দিয়ে চিৎকার করে বললাম—"লঙ্ লিভ মেজর গ্রীনফীল্ড।" নীলা তবুও চুপ করে আছে দেখে পিঠে কষিয়ে দিলাম প্রচণ্ড এক কিল। দম বেরিয়ে যাওয়া গ্রামোফোনের মত নীলা ভয়ে ভয়ে বলে উঠল, —"হিপ্ হিপ্ হুররে।"

মেডিকেল কলেজ থেকে কতক্ষণে কিভাবে বাড়ি পেঁৗছলাম কিছু মনে নেই। বাড়ি এসেই মা বাবাকে প্রণাম করে ভাগ্যের এই অদ্ভুত ডিগবাজির কথা সবিস্তারে বললাম। শুনে বাবা বললেন—"ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। ভালই হয়েছে, তবে তুমি একটা কাজ করতে ভুল না। খুঁচিয়ে বাঘকে ছেড়ে দেওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। হয় তাকে যেভাবে হোক্ শেষ ক'রে দিতে হয়, নয়তো ওর সান্নিধ্য থেকে বহু দূরে চলে যেতে হয়। শেষেরটাই কর তুমি। কেননা, এ ব্যাপারে মুল্যান্ড আরও চটবে। তবে চোরের মার কান্না, তিন মাসের মধ্যে কিছু করতে পারবে না।" সুতরাং ছুটী ফুরিয়ে যাবা... আগেই রেজিগ্নেশান দিয়ে একটা চিঠি আর সেই সংগে ডাক্তারের একটা সার্টি...ফিকেট পাঠিয়ে দিও। কারণ দেখাবে যে টাইফয়েডের পর অ্যাক্টিভ সার্ভিস কর... তোমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। মনে হয় এবার আর পুলিস লাইন তোমায় ধরে রাখতে পারবে না।"

খানিক বাদে খবর নিতে মুখার্জি এল। সব শুনে আমায় জড়িয়ে ধরে নাচতে শুরু করে দিলে। বললে—"বাঁচালে ভাই! গাঙ্গুলীমশায়ও এ... খবর শুনে খুব খুশী হবেন। তোমার পথে পথে হেঁটে বেড়ানর মেক্-আপ্টা স্টিল ফটোয় এত ভাল এসেছে যে সেগুলো বাদ দিতে হলে সত্যিই দুঃখের কথা হ'ত। আচ্ছা, চলি ভাই, গাঙ্গুলী মশায়কে সুখবরটা দিয়ে আসি। আর একটা কথা। কাল কোনও শুটিং রাখিনি, তোমার কি হয় না হয়, এই ভেবেই। রবিবার শুটিং। তোমার আর সীতার একটা রোমাণ্টিক সিন নেওয়া হবে। কালকের মধ্যে চুল ছেঁটে দাড়ি কামিয়ে ভদ্রলোক হয়ে যেয়ো।

অনেকদিন বাদে রাত্রে পেট ভরে খেয়ে আর প্রাণ ভরে ঘুমিয়ে বাঁচলাম। আঃ।

(আগামীবারে সমাপ্য)

আলোর কন্যা

আলোক সরকার

আলোর কন্যারা যায় দূরে মাঠ দিয়ে
জীবনের অভিসারে।

পুরোনো কথাকে আর কী হবে জ্বালিয়ে?
অন্য পার্থিবের তীর্থে যাও অন্ধকারে
হোক অন্ধকার।

আকাশে আদিম রাত্রি সহসা লজ্জার
গুণ্ঠন সরিয়ে ফেলে বিদ্যুত-বিশাল।

অথবা সে জ্যোতির্ময় সীমাহীন কাল
প্রশান্ত স্বাধীন আত্মপ্রত্যয়ের সচ্ছল বিলাসে।

নতুন আগুনে জ্বলে চিরদিন—নব প্রতিন্যাসে।
আদিম বিদ্যুৎ রাত্রি আনে সযতন
অনন্য কিছুই নয় ভিন্ন রুপায়ণ।
নিজের-ই সৌগন্ধে ব্যাপ্ত অন্তরের অসীম স্বরাটে
অন্য জীবনের তীর্থে আলোর কন্যারা পথ হাঁটে।

স্টেডিয়ামের কথা

শ্রীরমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

খেলার প্রসঙ্গে কলকাতায় আবার স্টেডিয়ামের কথা শোনা গেছে। তাই খেলার অনুরাগী-জনের মনে দোলে এর দোটানা সুর। এ যেন কবি বর্ণিত কোকিলের ডাকের মত—একই সময়ে মনে হয় এ যেন অতি নিকটে, এ যেন অতি দূরে।

একালে খেলা আর হেলাফেলার জিনিস নয়। দেশে দেশে আজ জীবন-যাত্রা জটিল, সংশয়াকীর্ণ, সমস্যা-কুটিল। শান্তির নামে আজ মানুষ ব্যস্তসমস্ত, অস্থির। সভ্যতা যতই আগাচ্ছে, প্রকৃতি থেকে মানুষ ততই দূরে সরে যাচ্ছে। কৃত্রিমতার চাপে সত্য আজ বিপন্ন, মানুষের মন দ্বিধাগ্রস্থ। ঝোপে ঝোপে মানুষ এখন ভূত দেখে থাকে।

তাই হয়ত মানুষ খোঁজে সহজ পথে পা বাড়াতে। তাই একালে দিকে দিকে খেলার প্রসার বেড়েছে। তাই একালে সব দেশেই খেলা জাতীয় জীবনে স্থান পেয়েছে। এরই প্রসন্ন প্রভাব ও সহজাত আনন্দ মানুষের মনকে সুস্থ, সজীব রাখে; তাই একালে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপতিরা জনপ্রিয় খেলার পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন। খেলার মাঠের, খেলাঘরের সহজ, স্বাভাবিক আবহাওয়ায় মানুষ চায় মনকে চাঙ্গা করে নিতে; দেশ, বিদেশের লোকেরা আসে এখানে মিলতে, মিতালি করতে, পরস্পরের আত্মীয় হতে।

স্টেডিয়াম একালে ইংরিজী কথার জাতে উঠেছে, যদিও এর উৎপত্তি একটা গ্রীক শব্দ থেকে। সেকালে গ্রীকরা এটা ব্যবহার করত দূরত্ব-ব্যঞ্জক অর্থে। স্টেডিয়াম বলতে বোঝাত ৫৮২·৫ ফিট দূর পাল্লার দৌড়। পরে এটার মানে দাঁড়াল খেলার বিরাট ইমারত বা মহল। থিয়েটারের মত স্টেডিয়ামও এখন বাঙ্গলায় মুখে মুখে সচল হয়ে এসেছে। বাঙ্গলা দেশে এ জিনিসটার নিদারুণ অভাব স্টেডিয়াম বলতে কি বোঝায় বাঙ্গাল[illegible] হাড়ে হাড়ে বোঝে। বাঙ্গালীর কা[illegible] যেন এরই মধ্যে মাতৃভাষার অন্তর্ভুক্ত পড়েছে। এ শব্দের অর্থ এখন আ[illegible] কাছে অনেকটা মর্মান্তিক সরল, স[illegible] সুস্পষ্ট।

স্টেডিয়াম—স্টেডিয়ামই থাক, বাঙ্গলার পরিভাষায় একে বলা[illegible] ক্রীড়াঙ্গণ, রঙ্গভূমি, ক্রীড়ামণ্ডপ বা [illegible] নিকেতন তাতে যদি মাতৃভাষার স[illegible] কিছু বাড়ে ত ভালই। মোট কথা, এ[illegible] যে সব খেলা জাতীয়তার ধাপে [illegible] তার উপযুক্ত আস্তানা থাকা চাই—[illegible] সে খেলা খর্ব হয়েই থাকবে; তা [illegible] সম্ভাব্য জনকল্যাণ সাধিত হবে না, নিজের অন্তর্নিহিত আনন্দশ্রী পূর্ণ[illegible] হয়ে গড়ে উঠবে না।

দর্শকদের সংখ্যা উপযোগী অ[illegible] ব্যবস্থার জন্য স্টেডিয়ামের প্রয়ো[illegible] অস্বীকার করা চলে না। হুজুগ, [illegible] বিশেষ নিয়ে ভক্তদের অন্ধ গোঁড়াম[illegible] ভাল খেলার আকর্ষণ, যে কারণেই হে[illegible] জনপ্রিয় খেলার ডাকে কলকাতা [illegible] ভেঙ্গে পড়ে খেলার মাঠে। সেখানে [illegible] সমুদ্র সহজেই সৃষ্ট হয়। রোদ, বৃ[illegible] কাদা, শারীরিক কষ্ট, খেলার অনুরা[illegible] জনতা ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। খে[illegible] পাগল উঁচু গাছ থেকে পড়ে মারা গে[illegible] এ কিছু আজগুবী কথা নয়। জাতীয়[illegible] বাদী খেলার পক্ষে এসব কলঙ্কের ক[illegible] যতকাল স্টেডিয়াম তৈরি না হচ্ছে ততক[illegible] এ ধরনের কলঙ্ক হয়ত ঘুচবে না।
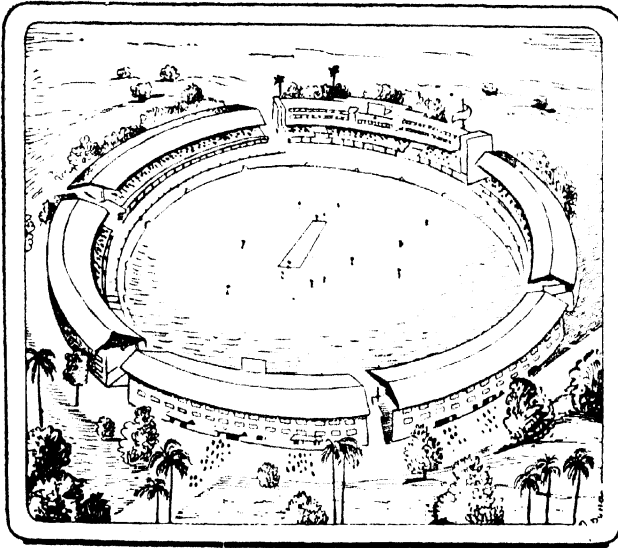
যাতে লোকে সহজে, সুব্যবস্থার ম[illegible] খেলা দেখতে পায় তাই অবশ্য স্টেডিয়[illegible] রচনার প্রথম ও মূল উদ্দেশ্য। কি[illegible] প্রয়োজনের দিক থেকে এই শেষ কথা ন[illegible] একালে খেলার উপর নূতন দাবী ক[illegible] হয়েছে। খেলা আজ জাতীয়তার প্রতী[illegible] খেলা আজ বিপন্ন, বিভ্রান্ত জনসাধারণে[illegible] মনে স্বাস্থ্যকর খোরাক। খেলায় উচ্চাঙ্গে[illegible] চারুনৈপুণ্য আজ জগতের চোখে দেশ বরেণ্য করে তোলে; জগৎ-প্রতিযোগি[illegible] যে দেশ চরম উৎকর্ষ দেখায় সে দেশ বিশেষ সম্মানের স্থান দেওয়া হয়।

ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবের পরিকল্পিত রঞ্জি স্টেডিয়াম নক্সা। এর মাত্র একটি অসম্পূর্ণ ব্লক রচনা করা হয়েছে

ভবিষ্যতের ভরসা যারা সেই সব
ণেরা যাতে বিপথে না যায়, যাতে
দের মনে জড়তার ঘুণ না ধরে, যাতে
রা সুস্থ, সবল, দীপ্ত, সজাগ, স্বচ্ছন্দ
মনের অধিকারী হয়ে গড়ে উঠতে
রে সেই উদ্দেশ্যে খেলার উপর আজ
দায়িত্ব চাপান হয়েছে। উচ্চাঙ্গের
লার মধ্যে দেখা যায় ছন্দের বিকাশ,
খা যায় অনুপম শিল্পশ্রী, দেখা যায়
তিভার অপূর্ব প্রকাশ। স্টেডিয়াম
সবেরই অনুকূল।

মাধুরী ও বীরপণা

তাই খেলার মান উঁচু করতে স্টেডিয়াম
ই। হাজার হাজার কুতূহলী চোখের
মনে খেলায় যে প্রেরণা আপনা থেকে
গে ওঠে তা খোলামাঠের 'এলে বেলে'
শারেশির মধ্যে সম্ভব নয়। তা ছাড়া
টডিয়ামের আবহাওয়াই বিচিত্র। এই
বহাওয়া খেলায় উদ্দীপনা যোগায়। এর
াহায্যে খেলায় উৎসুক অধীর প্রাণশক্তি
নপুণ্য, বুদ্ধি ও অটুট সঙ্কল্পের পথে
ালিত হয়ে অপূর্ব মাধুরী ও বীরপণায়
ফুটে ওঠে।

> তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে সে কলতান উঠে
> বাতাসে বনলতা শিহরি কাঁপে তবে সে মর্মর ফুটে

তেমনি বিরাট ক্রীড়ামণ্ডপের প্রশস্ত
ঙ্গনে সমঝদার আসরের মাঝখানে,
মকালো আবহাওয়ার স্পর্শে ক্রীড়ারত
রুণের মনে সাধ্যাতীত একটা কিছু
রবার অটুট সঙ্কল্প ফুটে ওঠা একান্ত
বাভাবিক। এসব অনুকূল অবস্থা
মন্বয়ে যে মূর্ত উন্মাদনা দেখা দেয় তা
থকে স্থায়ী খেলার উৎকর্ষ ও তারই
উপযোগী মন সহজেই গড়ে ওঠে।

রঙ্গভূমির প্রভাব অস্বীকার করা
সম্ভব। এর চারিদিক ঘিরে সোপান
শ্রেণীতে কাতারে কাতারে দর্শকবৃন্দ।
ঠাৎ সেখানে উদ্দীপনা জাগিয়ে বাজনা
বজে উঠল—হয়ত তার সুরে বাজে
জাতীয়তার সঙ্গীত। সাড়া তার পড়ে
গেল সমবেত জনতার শিরার রক্তে। ক্রমে
সেখানে হল প্রতিযোগীদের আবির্ভাব।
চকিত জনতা সহসা যেন ছোঁয়া পেল
সেখানকার আকাশ বাতাসের উতরোল
স্পর্শ। যেন সেখানকার সে পটভূমির

Football Stadium in Calcutta
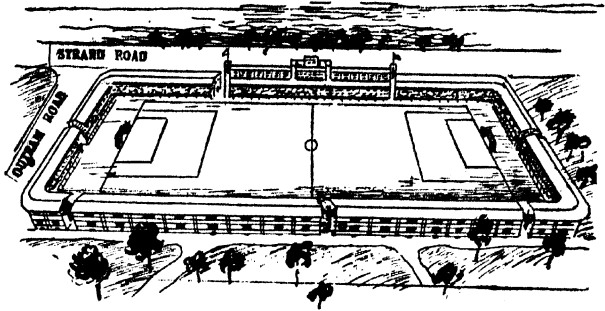
ফুটবলের স্বপ্নলোকের স্টেডিয়াম। ইডেন উদ্যানের ব্যান্ড স্ট্যান্ডের জমির উপর আই এফ এ পরিকল্পিত স্টেডিয়ামের নক্সা

পর্দা উঠে গেল—সেখানে হোল খেলার মনমাতানো নাটকের সূচনা। সে ছবি যেমন পূর্ণ পরিস্ফুট তেমনি তা সহজে ভোলবার নয়।

মহাভারতের কাহিনীতে এমনি একটা ছবি পাণ্ডব জননী কুন্তীর মনে ছিল অম্লান মহিমায় বহুদিন ধরে। হস্তিনা-নগরে কুমারদের অস্ত্র পরীক্ষা-দিনের এ ছবি। কবেকার সে কথা। তারপর কতকাল বাদে শুরু হোল কুরুক্ষেত্রে লড়াই। কৌরবের পক্ষে সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন কর্ণ—তাঁরই কানীন পুত্র—যাকে তিনি তাঁর জন্মক্ষণে করেছিলেন ত্যাগ, ভাসিয়ে দিয়েছিলেন দূরে অগোরবে, কুলশীল-মানহীন মাতৃনেত্রহীন অন্ধ অজ্ঞাত বিশ্বে, অবজ্ঞার স্রোতে। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে মাতা কুন্তী কর্ণের কাছে সেই অস্ত্র পরীক্ষা দিনের কথাই উল্লেখ করেছিলেন। সেই রঙ্গস্থল, সেখানে নক্ষত্র-খচিত পূর্বাশার প্রান্তদেশে নবোদিত অরুণের মতো তরুণকুমার কর্ণের প্রবেশ! সে কথা ভুলবার নয়। কত না শৌর্য, বীর্য, আবেগ, উচ্ছ্বাসের বিচিত্র রং দিয়ে সে ছবি আঁকা।

বিদেশে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দেশের প্রতিনিধি করে যেসব ছেলেদের পাঠান হয় তাদের কথা ধরা যাক। বিদেশের উন্নত ধরনের খেলার ব্যবস্থা, উপকরণ, শাসন পদ্ধতি ও আবহাওয়ার স্পর্শ নিয়ে যে ছেলে দেশে ফিরে আসে তার মানসিক প্রতিক্রিয়া কি হওয়া স্বাভাবিক? দেশের খেলার ব্যাপারে ফিরে এসে সে দেখবে সেই সব মামুলি ব্যবস্থা, অবস্থার সমাবেশ—সেই খাড়া, বড়ি, থোড় আর থোড়, বড়ি, খাড়া—সেই পুরাতন কায়েমি স্বার্থ বিভিন্ন খেলার ওপর জেঁকে বসে আছে, সেই জোড়াতাড়া দেওয়া ব্যবস্থার নামে অব্যবস্থা, সেই নীতির নামে দুর্নীতি, সেই বিধি-নিয়ম নিয়ে ছিনিমিনি খেলা; সেই প্রেরণা-বিহীন, কল্পনা ও দূরদৃষ্টি-অভাবদুষ্ট ঢিলেঢালা খেলার শাসন-পদ্ধতি।

সে অবস্থায় সেও গা ঢেলে দেবে গতানুগতিক স্রোতে। অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় তার মনের উদ্দীপনা উঠবে শুকিয়ে। তাই খেলাকে স্বাধীন দেশের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হাওয়া বদলানোর বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। খেলার ব্যাপারে জনসাধারণের অতৃপ্তি, অসন্তোষের কথা আজ আর কারো অজানা নেই। আশার কথা, প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের মধ্যে যাঁরা নেতা তাঁদের কানেও এ কথাটা উঠেছে। হাওয়া বদলাতে গেলে দুটো জিনিসের বিশেষ দরকার। এটা এখন প্রায় সবাই মেনে নিয়েছেন। প্রথম স্টেডিয়াম রচনা, দ্বিতীয় নূতন শাসন পদ্ধতির প্রবর্তন! এ দুটোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে খেলার ব্যাপারে সুনিয়ন্ত্রিত আয় ব্যয়ের ব্যবস্থা। খেলা বল, ধর্ম বল, অর্থম অনর্থম এ কথাটা মনে রাখায় ক্ষতি নেই।
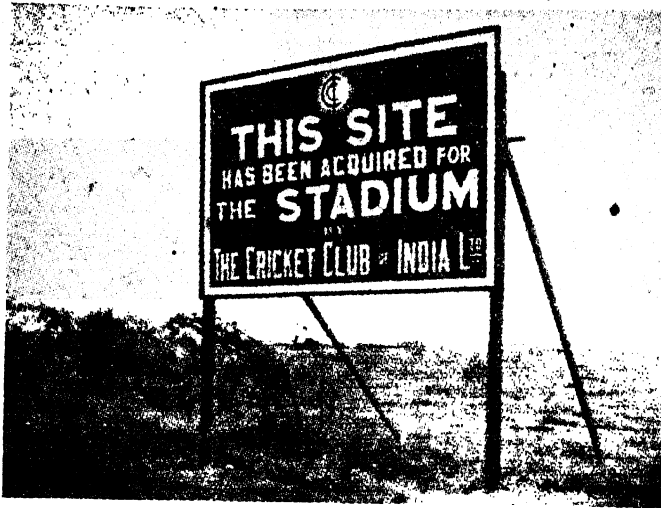
বোম্বাই'এর চার্চগেট স্টেশানের নিকট এই পতিত জমি দখল করা হয় ক্রিকেট ক্লাব অভ্ ইণ্ডিয়ার প্যাভিলিয়ান ও স্টেডিয়াম রচনার জন্য। ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার পথে এটাই হয়ে দাঁড়াল ক্রিকেটের একটা বড় ঘাটি

এসব কারণে মেনে নিতে হবে খেলার ব্যাপারে মামুলী ব্যবস্থার রদ বদল না হলে আর চলে না। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় কল্পিত স্টেডিয়াম শিকেয় তুলে রাখার দিন চলে গেছে। স্কুলের ক্লাস ও খেলার মাঠেই গড়ে ওঠে ভবিষ্যতের নাগরিক ও অনাগত দিনের জাতি। তাদেরই চরিত্র ও দেহ মনের উপর নির্ভর করে দেশের উন্নতি বা অবনতি। ভাবীকালের দিকে চেয়ে এ বিষয়ে এখন কারো আর কর্তব্য-বিমুখ হয়ে বসে থাকা চলে না।

টাউন হলের লুপ্ত গৌরব

এ ছাড়া স্টেডিয়াম রচনার স্বপক্ষে আরও একটা যুক্তির কথা এখানে উল্লেখ করা চলে। একদা পৃথিবীর প্রায় সব দেশের বড় শহরে পৌরনিকেতন বা টাউন হলের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। টাউন হলের পূর্ব মহিমা একালে অনেকটা কমে গেছে। টাউনহলের জায়গা দখল করে বসেছে খেলার বিরাট মনোজ্ঞ সৌধ বা স্টেডিয়াম।

শহর সাজাতে, শহরের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য ফুটিয়ে তুলতে একালে সব দেশেই স্টেডিয়ামের বিশেষ স্থান দেওয়া হয়ে থাকে। স্থাপত্য শিল্পের মর্যাদা ইতিহাসের পাতায় স্বীকৃত হয়েছে। জগতের সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে এ দেশের তাজমহলের স্থান। বোম্বাই-এর ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়াম ক্রিকেট সাহিত্যের পাতায় নিজের জায়গা করে নিয়েছে। এছাড়া চলনসই আকারের স্টেডিয়াম ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও আছে। কিন্তু খেলার এই শ্রীক্ষেত্র, ভারতের খেলার এই রাজধানী সে গৌরব এখনও দাবী করতে পারে না।

এখানে যাঁদের হাতে খেলা চালাবার ভার তাঁদের কেন্ট বিষ্টুর মধ্যে কেউ কেউ সময়ে সময়ে স্টেডিয়াম রচনা সম্পর্কে নানা পরিকল্পনার সাড়ম্বর ঘোষণা করেছেন; বেকায়দায় পড়ে নানা ওজর দেখিয়েছেন, গভর্নমেণ্টের বিমাতাসুলভ আচরণের দোহাই দিয়ে নিজেদের সাফাই গেয়েছেন। কায়েমিস্বার্থ খেলার সত্যকার হিতাহিত ভাবে না। দল বেঁধে আপন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখাই এর কাজ। গণতান্ত্রিক যুগে কোন্ প্রণালী ধরে ভোট আসবে দলের স্বপক্ষে, তা নিয়েই হল যত কিছু কারসাজি। এখানে খেলার ব্যাপারে অনুষ্ঠানের অন্ত নেই। এই ব্যাপারে আছে অনেক বাঁশি, অনেক অনেক আয়োজন; নেই শুধু অন্তর্নিহিত আদর্শের গান; নে[illegible] স্বাস্থ্যপ্রদ খোরাক,—নেই স্টেডিয়া[illegible]

এখানকার ফুটবল শাসন প্রতি[illegible] শিরোমণি যাঁরা তাঁরা নানাবিধ ব্যবস্থাপনা-ব্যাপারে পাণ্ডাগিরি[illegible] এসেছেন। এ'রা ফুটবলের "না ঘ[illegible] পরকা"—এ'রা থাকেন প্রায় সব ডালে ঝোলে অম্বলে। খেলার প্রতি[illegible] দল আছে, দলগত স্বার্থ আছে। দল[illegible] চাল, চলন, বলন থেকে স্পষ্টত[illegible] ফুটে উঠে—"ঘরে আমার রাখতে [illegible] বহু লোকের মন"। এতকাল স্টেডিয়াম নিয়ে শুধু "তা না না[illegible]" এসেছেন—তাতে দানা বাঁধা মোটেই নয়।

আশার কথা কিছুকাল হল প্র[illegible] সরকার ও পৌর প্রতিষ্ঠান উ[illegible] স্টেডিয়াম রচনা সম্পর্কে শু[illegible] জানিয়েছেন। এ'রা এর অভাব [illegible] অবশ্য না আঁচালে বিশ্বাস নেই। [illegible] এ'দের পক্ষে অনধিকার হস্তক্ষেপ [illegible] অবশ্য নয়। যে দেশে খেলার [illegible] প্রতিষ্ঠান অথবা কারবারী সঙ্ঘ স্টে[illegible] রচনা করেন না সেই সব দেশে এ[illegible] ঘুচিয়েছেন পৌরপ্রতিষ্ঠান অথবা [illegible] সরকার। এর নজীর সারা পৃথিবী[illegible] আছে। দক্ষিণ আমেরিকায় [illegible] জেনেরার স্টেডিয়ামের কথা [illegible] এখানকার মারাকানা স্টেডিয়ামে [illegible] সালের ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনাল [illegible] দু লক্ষ দশ হাজার দর্শক সমবেত [illegible] ছিল। আজও পর্যন্ত ফুটবল [illegible] দেখতে এর বেশি দর্শক সমাগম কোথাও হয়নি।

এসব বড় ব্যাপারের কথা বাদ দে[illegible] যাক। আমাদের পরিচিত এই শহ[illegible] চেহারাও দিন দিন বদলাচ্ছে তাই স্টেডি[illegible] হয়ত এখন আর আকাশকুসুম নয়। শহরেই সম্প্রতি স্কাই স্ক্রাপার সরক[illegible] দপ্তর রচিত হয়েছে। শহরের যে অঞ্চলে ফুটপাথে পা বাড়ান এতব[illegible] সম্ভব ছিল না সেগুলো বিলিতি মা[illegible] সংযোগে পাকা করে সুগম করা হ[illegible]

মাণ গ্যাসের আলোর পরিবর্তে লীর রোসনাই'এর ব্যবস্থা হচ্ছে। র অভাবে টাকপড়া ও রেলিং অভাবে কলা পার্কগুলোর কিছু কিছু রূপ- া করা হচ্ছে।

নূতন রূপসজ্জা

নতুন ইমারত, নতুন চলাপথের চেহারা, শ্য সরকারী পরিবহন-যান শহরের তত দেখা যাচ্ছে। কলকাতার নূতন সজ্জার মধ্যে স্টেডিয়াম রচনাও স্থান য়েছে। এ' বিষয়ে এখানকার পৌর- ষ্ঠানের একজন উদ্যোক্তা বলেছেন:

পল্লীউন্নয়নের ওপর পঞ্চবার্ষিকী কল্পনায় যতটা জোর দেওয়া হয়েছে, ত সবাই বাহবা দেবে। অথচ জাতীয় তিকল্পে সুস্থ নাগরিক-জীবন যে খানি সহায়ক, সেদিকে সমুচিত দৃষ্টি ওয়া হয়নি। এটা আমার চোখে দেশ ঠেকে—আমি এর সামঞ্জস্য করতে র না। জাতীয় বাণিজ্য, শিল্প, কর, ন, রাজনীতি ও নানাবিধ পেশার কেন্দ্রস্থল শহর। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কারের হেডকোয়ার্টার শহরেই স্থিত। অথচ এ যুগে দেশব্যাপী তি পরিকল্পনায় শহরের প্রতি যে পেক্ষা ও বিমুখতা দেখান হয়, তার চিত সংগতি খুঁজে পাওয়া শক্ত।

ইনি আরও বলেছেন:

The overall picture of Calcutta life, with the exceptions of some beauty spots so to say, is one of subhuman standard of civic amenities. Such enviornment is bound to seriously affect the whole attitude towards life.

বোম্বাই'এর ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনা হয়েছিল ২২শে মে, ১৯৩৬ সালে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে পরলোকগত লর্ড ব্রাবোর্ন ঐ উপলক্ষে তাঁর ভাষণ মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। তাঁর ডানদিকে বসে আছেন স্যর নওরোজি সাকলাতভালা ও মিঃ জাসদেনওয়ালা

সামান্য কিছু জায়গা যেগুলোকে সুন্দর বলা চলে, সেগুলো বাদ দিলে গোটা কলকাতার চেহারা যা, তাতে স্বীকার করতে হয় এখানকার নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য, মানবোচিত মানের বহু নীচে। এ ধরনের অবস্থা সমন্বয় যে জীবনের প্রতি সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীকে বিশেষ বিকৃত করে তুলবে তাহা সুনিশ্চিত।

পৌর-প্রতিষ্ঠান কারবারী প্রতিষ্ঠান নয়। নাগরিক-জীবন যাতে সুন্দর ও রুচিকর আবহাওয়ায় স্বাস্থ্যবান হয় তাই জল, আলো, রাস্তার ব্যবস্থা করা, শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখা যেমন অপরিহার্য কর্তব্য, তেমনি মনোজ্ঞ ক্রীড়া- নিকেতন রচনা করাও পৌর-প্রতিষ্ঠানের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য।

ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামের অন্তর্ভুক্ত ক্রিকেট ক্লাব অভ্ ইণ্ডিয়ার প্যাভিয়িলানের শিল্পী-কল্পিত ছবি হলেও এর সংগে বাস্তবের সব কিছু খুঁটিনাটির হুবহু মিল আছে

ক্রিকেট, ফুটবল ছাড়াও নানাবিধ খেলার অনুশীলন এই ধরনের স্টেডিয়ামের মাঠে সহজেই হ'তে পারে। হকি খেলায় ভারত জগৎপ্রধান। এই শহরে ক্রিকেট ও ফুটবলের চাপে পড়ে হকি যেন পুঁয়ে- পাওয়া ছেলের মত শুকিয়ে আসছে। খেলার সাফল্যও সাধনার জিনিস। এরও জন্য চাই মনোনিবেশ, ধৈর্য, আত্মপ্রয়োগ ও নিয়মিত অনুশীলন। স্টেডিয়ামের মাঠে প্রতিদিন যে বড় খেলার আসর বসবে

তা নয়। তাছাড়া খেলার মরসুমের অবকাশের ফাঁকে এখানে নিত্য-নিয়মিত হকি, ভলিবল, বাস্কেটবল প্রভৃতি সারা শরীরের ব্যায়াম সম্ভব—অল্প খরচের খেলার অনুশীলন করা সহজেই যেতে পারে।

এ ছাড়া এই স্টেডিয়াম মাঠের সুবিন্যস্ত সৌধের মধ্যে টেবিল-টেনিস থেকে শুরু করে মল্লযুদ্ধ বা মুষ্টিযুদ্ধের কসরৎ করাও চলতে পারে। এরই একান্তে সুইমিং পুল রচনা ও সাঁতারের অনুশীলন ব্যবস্থা সহজেই হতে পারে; এরই প্রান্তভাগে কপাটীর মোহানা, সিন্ডার ট্র্যাক ও সুনির্দিষ্ট রেখাঙ্কিত পথে দৌড় প্রভৃতি সব কিছুর ব্যবস্থা করা চলতে পারে। যে খেলার যা দরকার ঠিক সেই-মত ট্রেনিং বা শারীরিক শক্তি-স্বাচ্ছন্দ্য আয়ত্ত করবার জন্য এইখানে সর্ববিধ জিমন্যাশিয়ামের ব্যবস্থা সহজেই সম্ভব। এই জিমন্যাশিয়ামের ব্যবস্থা অনুযায়ী পরিমিত আহার, মিতব্যয়ীর সহজ, সুন্দর, বলিষ্ঠ শরীর মন ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা অসম্ভব নয়। জীবন ধারণের জন্য আহারের প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলে শুধু যা তা দিয়ে পেটভরা হলেই চলে না। কি খাবো বা কতটা খাবো, তার সঙ্গে নানা কথাই জড়িয়ে থাকে; খাদ্য কোথায় বা তা কেনবার পয়সা কোথায়—এও কিছু সবখানি সমস্যা নয়।

স্কুলের ক্লাস ও খেলার মাঠ ভরে যদি থাকে দীনতা, যদি সেখানে আদর্শের আনন্দ ও প্রেরণার আভাস পর্যন্ত না যায় দেখা, যদি সেখানে সাধনার উদ্দীপনা জাগাবার উপকরণের অভাব ঘোচাবার সত্যিকার কোন চেষ্টাই চোখে না পড়ে, তাহলে জানি না অনাগত দিনের স্বাধীন দেশের মর্যাদার অধিকারী জাত কেমন করে গড়ে উঠবে!

অগ্নি

ফল্গু কর

এই অগ্নি সাক্ষী মোর, দগ্ধ হই প্রদাহে যাহার
ধিকি ধিকি জ্বলে যাই রাত্রিদিন সকল সত্তায়
ক্লিষ্ট হই সংগোপনে। আত্মদাহ তবু বেঁচে থাক
পুড়ে যাক তিলে তিলে হৃদয়ের কঠিন নির্মোক।
দারিদ্র্যের যত গ্লানি, ব্যর্থতার যত হাহাকার
দিনগত পাপক্ষয়ে অস্তিত্বের যত অপমান
উত্তেজিত করে তোলে, তবু তার মাঝে জেগে থাক
এই জ্বালা। তপ্ত হোক প্রাণকোষ অমোঘ উত্তাপে
বিষ হোক উগ্র আরো, পান করি তীক্ষ্ণতর জ্বালা
প্রাণপণে জ্বলে উঠি; ছুটে চলে গুপ্ত অগ্নিকণা
চিন্তায়-অনল-ঢালা, শিখা লেলিহান স্পর্শ করে
ভাবনারে...হৃদয়ের সে কি দ্যুতি, ইন্দ্রিয়ের
একি ইন্দ্রজাল, কল্পনার নিধুবনে সৃজনের
সে কি সমারোহ! জ্বলে দেহ, জ্বলে মন উদগ্র অস্থির
জ্বলে, সারা বিশ্ব মোর—জয়ধ্বনি শুনি কামনার!
তারি মাঝে মনে হয় আর, আমি এক অগ্নিময়
আশ্চর্য মানুষ! সত্য হোক দীপ্ত দাহ-জ্বালা;
তুচ্ছ আর সব, শুধু এই বহ্নি বিশুদ্ধ পাবক।

বিকেলের ট্রামে

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশের নীললাগা আশ্চর্য বিকেল এলে
এই সব আশ্চর্য বিকেলে,
মনে হয় চেয়ে থাকে
সারা পথ চেয়ে থাকে যেন
শহর; আবছা তার শাড়িটি জড়িয়ে
আর এক রকম করে।
আপিসের ছুটির পরের
ভিড়ের ভেতরে থেকে
ফুটপাতের ধারেতে দাঁড়িয়ে
একটি মেয়ের মত,—গুঁড়ো গুঁড়ো রোদ চুলে নিয়ে
কী এক কথাকে ভাবে।
ছোট নীল চিঠিখানি মুঠো করে ধরে
অন্যমনা।—জানালার পাশটিতে বসে
আকাশের নীললাগা আশ্চর্য বিকেল এলে,
এই সব আশ্চর্য বিকেলে,
ট্রামে যেতে তাই ভাল লাগে।

—৩—

এই ধরনের বাড়িতে প্রথমটায় একটু চাপা ফিসফিসানি থাকে।

ফিসফিসানিগুলো এঘর থেকে ওঘরে ঘুরে বেড়ায়। মানে পুরনোদের মধ্যে একজন আর একজনকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে, 'কোথা থেকে এলো? কা'রা? স্বামী-স্ত্রী মনে হচ্ছে। সঙ্গে একটি মেয়ে আছে। ভদ্রলোকের চাকরি নেই না মাইনে কমেছে, নাকি শহরের বাড়িঅলার সঙ্গে মামলায় হেরে গিয়ে উৎখাত হয়ে বস্তিতে এসেছে, সুবিধামতন ঘর পাচ্ছে না। ভাল বাসা পেলে কালই আবার ফুরুৎ—'

'তা বাপু এসেছে দেখা যাবে, যাক না দু'টো দিন। মোটে তো মোটঘাট সামলো।'

'বৌটা ভদ্রলোকের চেয়ে দেখতে সুন্দর। দ্যাখ্ তাকিয়ে। মেয়েটা মার চেহারা পায়নি।'

'না না, ভদ্রলোকও দেখতে বেশ ভাল। স্বাস্থ্যটিও ভাল।'

আট নম্বরের হিরণ বললে, 'এত রাত ক'রে নতুন ঘরে এল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কি হবে?'

'কেন, বৌ মানুষ, যদি তোলা উনুন সঙ্গে থাকে দু'টো ভাতে ভাত চাপিয়ে দেবে। কয়লা না থাকে আমাদের কারো কাছ থেকে চেয়ে নিক না। ফিরিয়ে দিলেই হ'ল।'

দশ নম্বরের কিরণের মন্তব্য শুনে হিরণ ঠোঁট টিপে হাসে। তারপর ফিসফিসিয়ে বলে, 'মনে হয় না। দেখছিস না মহিলা কেমন মুখখানা হাঁড়ির মতন ক'রে আছেন। হয়তো রাস্তায় ঝগড়া হয়েছে। জানত না সোয়ামী শেষটায় বস্তিতে এনে ঠেলে তুলবে। এখন দেখে-শুনে আক্কেল গুড়ুম। এত রাতে রান্না করবে না ছাই!'

'যা বলেছিস।' কমলাও ঠোঁট টিপে হাসে তারপর ফিসফিসিয়ে বলে, বরং পুরুষটাকে একটু খুশিবাসি মনে হয়। হয়তো উদ্যোগ আয়োজন ক'রে কর্তাই রান্না চাপাবেন।'

'হুঁ', হিরণ সায় দেয়। 'দেখে মনে হয় তিনি 'ঘু'টে দেওয়া' স্বামীদের দলের।'

অর্থাৎ এই বাড়িতে এগারোটি পরিবারের সঙ্গে আর একটি পরিবার এসে বাসা বাঁধলো। এদের কারো কারো স্ত্রীর চাকরিতে সংসার চলে। টেলিফোনে, স্কুলে, হাসপাতালে, ডেয়ারী ফার্মে। বেকার স্বামীরা, সংখ্যায় খুব বেশি নয় যদিও, দু' তিনটি, দুপুর বেলা ঘরে থেকে ছেলেমেয়ে দেখে, ঘরদরজা পরিষ্কার রাখে, ফাঁক পেলে বাইরের কল থেকে ঘড়া ভরে জল নিয়ে আসে। স্ত্রীকে খেটেখুটে এসে যা'তে না এসব কাজে হাত দিতে হয়। এ-বাড়িতে যারা থাকে তাদের চাকর রাখবার ক্ষমতা থাকে না। আগের এক ভাড়াটে স্বামী নাকি দুপুরে বেলায় বসে ঘু'টে দিত, অবশ্য বাড়ির ভিতরের উঠানে না, একটা পাঁচিলের গায়ে। তারপর থেকে এখানকার বেকার স্বামীদের 'ঘু'টে দেওয়া বর' নাম পড়েছে।

কমলা চাপা গলায় বলল, 'যাকগে, লোকের ভাগ্য নিয়ে এসব সস্তা রসিকতায় কাজ নেই। তবু তো ওদের বৌ ঝি চাকরি ক'রে খাওয়ায়, বাটনা বেটে, জল তুলেও মনে সান্ত্বনা থাকে। তোর আর আমার স্বামী আজ বেকার হ'লে কাল উনুন ধরানো, বাটনা বাটা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। বুঝতে পারিস?'

বুঝতে পেরে হিরণ চুপ ক'রে থাকে। বিমল চাকলাদারের বৌ আর অমল হালদারের বৌ। চাকলাদার ও হালদার কোথায় দূরে ফ্যাক্টরির কাজে যখন বেরিয়ে যায়, দুইজন, হিরণ ও কিরণ ভাবে তাদের কি দশা হবে। যেটুকুন লেখাপড়া জানে শহরে কি শহরতলীতে তাদের কেউ চাকরি দেবে না।

তাছাড়া, এ-বাড়ির আর পাঁচটি মেয়ের মতন হিরণ কিরণও তেমন চালাক-চতুর, এমন নয়। হয়তো এতকাল পাড়া গাঁয়ে ছিল বলে দু'জনের স্বামী, যদি চাকরি করা তাদের দরকারও হয় কিছুতেই বৌদের বাইরে যেতে দেবে না ধরে রেখেছিল।

দু'জনের স্বামীই কড়া। অমল ও বিমল চেষ্টা-চরিত্র ক'রে চাকরি জুটিয়ে, প'চাত্তর টাকা মাইনেয় শহরে পাকা কোঠা পাবে কোথায়, পরিবার এনে তুলেছে পারিজাতবাবুর বস্তিতে। অপেক্ষাকৃত

পরিচ্ছন্ন, অপেক্ষাকৃত ভদ্র, তারা দূর থেকে শুনেছিল।

দু' নম্বর ও ছ' নম্বর ঘরের ফিস-ফিসানি হয় প্রবীণা প্রবীণায়।

হীরুর মা ও প্রমথর দিদিমায়।

প্রমথর দিদিমা আটা মাখছিল।

হীরুর মা এসে হাত ঘুরিয়ে, অর্থাৎ কথার চেয়ে ইঙ্গিতের ওপর বেশি জোর দিয়ে বলল, 'তামাকাসা কিসসু নেই। এলুমিনিয়মের ডেগচী আর কালাই করা লোহার থালা গ্লাস। একেবারে হাতকাটা জগন্নাথ হয়ে এসেছে দিদি।'

'তা আমি একনজর দেখেই বুঝে নিয়েছি।' যেন আটা ডলতে গিয়ে মাথায় বেশি ঝাঁকুনি লাগছে সেই ভান ক'রে হীরুর মা প্রবলবেগে মাথা নাড়ল। 'কত্তার মুখের আগুন তো দেখছি নিভছে না। সেকেন্ডে সেকেন্ডে সিগারেট ধরাচ্ছেন, বিবির পায়ে জুতো। আসলে ভিতরে মালমশলা নেই, বাইরের ফুটুনি দিয়ে ঢেকে রাখতে চাইছে। জুতো সিগারেট ক'দিন। দাঁড়াও না, পারিজাতের গোয়ালে মাথা গলিয়েছ, খোলস খসতে দেরি হবে না।'

ছ' নম্বর আর বারো নম্বর ঘর দুটো ঠিক মুখোমুখি, কেননা বাড়িটা গোল। হীরুর মা'র রক থেকে শিবনাথের ঘরের ভিতর পরিষ্কার সব দেখা যাচ্ছে।

আরো বেশি দেখা যাওয়ার কারণ, এইমাত্র ওরা ঘরে ঢুকেছে, পর্দা খাটানো হয়নি। জিনিসপত্র ছত্রখান ক'রে রাখা। এবং পর্দা কোনোদিনই খাটানো হবে না একথা সবাই জানে। এ-বাড়িতে কোনো ঘরে পর্দা নেই।

'আস্তে দিদি আস্তে!' প্রমথর মা ফিসফিসিয়ে হীরুর মাকে সাবধান ক'রে দিলে।

হীরুর মা তা গ্রাহ্য করল না। বরং আটা ডলার ভান ক'রে মাথাটা আরো জোরে নেড়ে নেড়ে প্রমথর দিদিমাকে বলল, 'জিনিসপত্র তুই আবার রাতেও রকে ফেলে রাখিস নি। অই তো শুনলাম কাল ওদিকের কোন্ এক বস্তিতে নাকি আবার চুরি হয়ে গেছে। সেখানেও স[illegible] ভদ্দরলোক ঠিক এ-বাড়ির মতন। [illegible] নিত্য নতুন লোক আসছে, যাচ্ছে এস[illegible] বাড়িতে, এমন তো হবেই। তুমি কা[illegible] কতটা জানো বলো।'

প্রমথর দিদিমা হিস্ হিস্ ক'[illegible] বলল, 'আস্তে দিদি আস্তে!'

'তা এ-বাড়িতে কম ঘটনা হ[illegible] নাকি।' তিন আর চার নম্বর পাশাপা[illegible] দুটো ঘরের মাঝের ছোট্ট চৌকোন র[illegible] ওপর ব'সে মৃদুমন্দ ভাষায় ও সম্ভ[illegible] হ'লে হুকোর গুরে গুরে শব্দ দিয়ে কথ[illegible] গুলোকে ঢেকে রাখতে চেষ্টা ক'রে [illegible] বাবু শেখরবাবুকে বললেন, 'সেই যে, এ[illegible] ইয়াং ম্যান্ এলো আর এল তার অ[illegible] টুডেন্ট্ স্ত্রী। না আমি বলছি সং[illegible] বড় কথা নয়, অভাবটাই সব স[illegible] ঘাটছে না, যার জন্যে শহরের [illegible] পারিজাতের সম্ভ্রান্ত এই কামরা[illegible] তে-রাত্তিরও খালি থাকছে না।'

'যা বলেছেন।' হুকোর গুরে [illegible] শব্দটা প্রবলতর ক'রে তার আড়ালে [illegible] শেখরবাবু মন্তব্য করলেন, 'ছি [illegible] শেষটায় জানা গেল ইয়ে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, [illegible] খুব মনে আছে সেই কথা, সাত [illegible] কামরা ভাড়া ক'রে ছিল দুটিতে।'

'না, আমার বক্তব্য, ক্রাইসিস্ ফ্রা[illegible] শনের যোগবিয়োগ কষে সমাজবিজ্ঞান আধুনিক সমাজের যে চিত্রই আ[illegible] আমরা তো চোখের ওপর দেখছি আমা[illegible] আধুনিক সমাজটা কি দাঁড়িয়েছে, [illegible] এর চেহারা হচ্ছে দিন দিন,—[illegible] ডেন্সীয়াল হাউসের অভাব, দু[illegible] বেকারসমস্যা তো আছেই, এদিকে ডামাডোলের বাজারে, ভাল মন্দ, ইতর শিক্ষিত অশিক্ষিত সব মিশে জগাখি[illegible] হয়ে যাচ্ছে, আমাদের এই লোয়ার [illegible] ক্লাশ সোসাইটি। কার ভিতরে কি [illegible] কেমন প্রকৃতি বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই।'

'যা বলেছেন।' হোমিওপ্যাথ শে[illegible] বাবু বারো নম্বর ঘরের জানালার [illegible] তাকিয়ে আস্তে আস্তে মাথা না[illegible]

'সেই যে, এক নম্বরে গেলবার খুলনা না রংপুরের একটা ফ্যামিলী এসেছিল,—ছি ছি কী কেলেঙ্কারী ক'রে গেল শেষ পর্যন্ত,—হ্যাঁ, অভাব তো আছেই, কিন্তু স্বভাবটাকে বাদ দিলে চলবে কেন। বাপ তো মোটামুটিরকম একটা চাকরি করত, অবশ্য পুষ্যি অনেক ছিল, বড় ফ্যামিলী, কিন্তু বড় ছেলেটা কী জঘন্য কাজ ক'রে গেল।'

রংপুরের পরিবারের দুস্কৃতকারী জ্যেষ্ঠ পুত্রের কথা মনে ক'রে স্কুলমাস্টার বিধুবাবু মুখাবয়ব অতর্কিতে গম্ভীর ক'রে ফেললেন। 'হবেই, এ-বাড়িতে আড়াল ব'লে কিছু নেই। উঠোনে দাঁড়ালে সবগুলো ঘরের ভিতর দেখা যায়। এতগুলো পুরুষ স্ত্রী ছেলেমেয়ে। আধখানা বাথরুম, দেড়খানা পাইখানা। হামেশা এর ওর গায়ে ধাক্কা লাগছে।'

'আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি, সুবিধা পেলে এ-বাড়ি ছেড়ে দেব। এখানে কোনো ভদ্রলোক থাকতে পারে না।'

হোমিওপ্যাথ শেখরবাবুর গলার স্বর হুকোর শব্দকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখে বিধু মাস্টার হিস্ হিস্ ক'রে উঠলেন। 'আস্তে মশাই, আস্তে, শুনবে যে!'

'এ কি আর গেরস্থ বাড়ি বলা চলে, আমি বলব হোটেল। হোটেলবাড়ির বারোখানা কামরা। হ্যাঁ, এখানে সবাই মফঃস্বলের হোক, কোলকাতার হোক যথেষ্ট শহুরে হাওয়া গায়ে মেখে বিপদে প'ড়ে এসে টিনের ঘরে বাসা বেঁধেছে। বাবা! দেখছেন তো পাউডার সাবান এসেন্স এর অভাব হচ্ছে কখনো। কি সিনেমা দেখার, রেস্টুরেন্টে খাওয়ার! নামে বস্তি। কিন্তু কোনো কোনো ঘরের প্রগতির ঠেলা বড় শহরকে হার মানিয়ে দেয়।'

'থাক মশাই থাক।' ঠাণ্ডা বিধু মাস্টার উত্তেজিত হোমিওপ্যাথকে শান্ত করেন। 'আপনার প্র্যাক্টিস্ ভাল, পয়সার আমদানী হচ্ছে, ভাল জায়গায় চলে যান। বিপদ তো আমার,—আমাদের। এতগুলি মুখ। এই আয়।'

এঁরা দুজনেই বারো নম্বর ঘর দু'দিনও খালি প'ড়ে রইল না, আবার নূতন ভাড়াটে এসে গেল দেখে উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে আছেন।

জলের অভাব। জায়গার অভাব। চলাফেরার অসুবিধাই বা কি কম। একটি মানুষ চলে গেলে মনে হয়, অনেকখানি জায়গা ফাঁকা হ'ল। একটি লোক বাড়লে মনে হয়, পরমায়ু আরো কয়েক ঘণ্টা কমল।

শুধু কি জল, জায়গার অভাব।

মনের অপ্রশস্ততা হিংসা কলহ নিন্দা পরচর্চা কুৎসা কদর্য স্বভাবে এ-বাড়ির বাতাস ভারি ক'রে রেখেছে। এখানকার মানুষ মানুষই নয়। একজন আর একজনেরটা চোখে দেখছে ব'লেই এ অবস্থা, পর্দা নেই ব'লেই এত বিপদ!

শিবনাথ ও রুচির আবির্ভাবের পর সন্ধ্যা থেকে ফিসফিস ক'রে দুই বন্ধু এইসব আলোচনা করছিল। আর বারো নম্বর ঘরের জানালা দিয়ে দেখছিল শিবনাথ ও রুচি কি করছে।

রুচি সব ছেড়েছে, কিন্তু সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড স্টোভটা আজও আঁকড়ে ধরে আছে। সেটাই এখন খুব বেশি কাজে লাগল।

শিবনাথ একটু ঝাড়পোছ ক'রে বিছানা করে মঞ্জুকে শুইয়ে দিলে। বেচারার সেই কখন থেকে ঘুম পেয়েছে। না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ব'লে রুচির কম দুঃখ হচ্ছিল না। মাঝখানে এসে রুচির কাজে সাহায্য ক'রে দিয়ে গেল কমলা এবং আরো কে দু' তিনটি মেয়ে। শিবনাথ বাইরে চলে গেল সিগারেট কিনতে। তার সিগারেট ফুরিয়েছিল অনেকক্ষণ।

রুচি রান্না করছিল। আর জানালার বাইরে অপেক্ষা করছিল অনেকগুলো মেয়েমুখ। অর্থাৎ তারা জানতে চাইছে, কোথা থেকে এল এই পরিবার, কি বৃত্তান্ত।

কেননা, সকলের আগে এটা জানাজানি হয়ে গিছল, রুচি বি এ পাশ। এ-বাড়ির আর কোনো মেয়ের এত শিক্ষা নেই। নবাগতা বস্তিবাসিনী সম্পর্কে তাদের কৌতূহলটা তাই বেশি।

রুচি বলল, 'আপনারা ঘরের ভিতর আসুন। উনি বেরিয়ে গেছেন।'

তা ক'জনই বা এসে ভিতরে দাঁড়াবে। এইটুকুন ঘর। কমলা একজন একজন ক'রে সকলকে ভিতরে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিলে। এর নাম সুনীতি, ডাক্তারবাবুর মেয়ে, ভাল গান গাইতে পারে, এর নাম নীলিমা, বিধুবাবুর মেয়ে, কবিতা লিখতে পারে, এর নাম বেবি, নাচতে পারে।

'তোমার পুরো নাম কি বেবি বলো।' সুন্দর চেহারার মেয়েটির চিবুক ধরে আদর ক'রে কমলা বলল, 'তোমরা নতুন এসেছো তিন নম্বর ঘরে?'

মেয়েটি মাথা নাড়ল।

'আমার নাম বেবি গুপ্ত।'

'কোন স্কুলে পড়।' রুচি প্রশ্ন করল।

'এখন পড়ি না, নাম কাটা গেছে। লরেটোতে পড়তুম।'

'কেন নাম কাটা গেল?'

'বাবার চাকরি নেই।'

'কোথায় থাকতে কোলকাতায়?'

'পার্ক স্ট্রীট।'

'তোমার বাবা কি করতেন, কোথায় চাকরি করতেন।'

'একটি বড় মার্চেন্ট ফার্মে। বাবার চাকরি গেছে ব'লেই আমরা বস্তিতে এসে

ঢুকেছি।' বলে মেয়েটি মুখ কালো করল।

'যাকগে।' কমলা বেবিকে দরজার বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে লম্বা বেণী পরা আর একটি মেয়েকে ভিতরে টেনে এনে দাঁড় করালো। 'নাম অদিতি। আট নম্বর ঘরের। এর দাদা ফ্যাক্টরীতে কাজ করে। ...এর বাবা বাসকণ্ডাকটার, নাম মুকুল, —এটি পাঁচি, এর বাবা মোড়ে ছোট্ট একটা সেলুন দিয়েছে, 'নাম,—তোমার নাম কি বলো?' 'টেঁপী।'

'তোমার?'

'ময়না।'

কমলা বলল, 'এর বাবা ফেরিওলা। আগে বড়বাজারে ভাল ফলের কারবার ছিল, ফেল্ ক'রে এখানে এসে সাবান-টাবান বিক্রী করছে।'

আর আছেন একজন শিক্ষক এবং তাঁর পাশের ঘরে থাকেন শেখর ডাক্তার, হোমিওপ্যাথ। এই অঞ্চলে এসে তার হাত যশ হয়েছে। আগে ছিলেন পাকিস্থানে।

রুচি রান্না শেষ ক'রে অন্য কাজে হাত দিতে তারা সরে গেল।

কমলাও বিদায় নিল।

'মশাই! আমরাও রিফুইজী ছাড়া আর কিছু না।'

মুদির দোকানের সামনে বিছানো বেঞ্চিটা একরকম ফাঁকা ছিল ব'লে বিশ্রাম করতে শিবনাথ বসেছে। ওপাশে বসা এক ভদ্রলোক দেশলাইয়ের কাঠি জেবলে বিড়ি ধরাতে ধরাতে বললেন, 'মশাই, কোথায় থাকতেন এর আগে?'

'কোলকাতায়, মোক্তারামবাবু স্ট্রীটে।' যেন ভয়ে ভয়ে বলল শিবনাথ। বলে চুপ ক'রে গেল।

'আবার চুপ ক'রে রইলেন কেন', ভদ্রলোক যেন বিরক্ত হয়ে বিড়িটা ঠোঁটের কাছে নিয়েও টানেন না। 'নানা স্ট্রীটের বাবুরা এই টিনের ঘরে এসে মাথা গুঁজেছে। লজ্জার কিছুই নেই, বলুন, কি সার্ভিসে ছিলেন?'

শিবনাথ ঘাড় নেড়ে লোকটির দিকে তাকিয়ে রইল। দোকানের সামনে আর কেউ দাঁড়িয়ে নেই। অন্য খদ্দেররা চলে গেছে। দোকানে একটা বাক্সের ওপর ব'সে শিবনাথ অনুমান করল, এঁরই দোকান। পুরু চশমা চোখে কেরোসিনের বাতির নিচে মাথা গুঁজে হিসাব লিখছে।

'কি বলো, বনমালী! এখানে এসে যদি পরিচয় মানে পূর্বের নামধাম চাকরি বলতে লজ্জা করে তো পরে বাকি কাজ-গুলোর লজ্জা ঢাকতে অনেক কাঁথা-কম্বল জড়াবার দরকার পড়বে যে, হে-হে ভুল বলেছি?'

বনমালী তৎক্ষণাৎ মাথা তুলে এবং পুনঃ পুনঃ সেটি নেড়ে জানাল, 'না ভুল নয়। কে গুপ্ত কখনো ভুল বলে না।'

'কে ইনি?' শিবনাথ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে এবার মুদির দিকে তাকায়।

'আপনি মোক্তারামবাবু স্ট্রীটে থাকতেন, উনি ছিলেন পার্ক স্ট্রীটে সাহেবদের সঙ্গে ফ্ল্যাট ভাড়া করে। দাস-দাসী ছিল, আর্দালি ছিল, আর উঠতে বসতে গাড়ি।' বনমালীও একটা বিড়ি ধরায়। 'তা চাকরি গেলে ক'টা বাঙালির ছেলে খাড়া থাকে,—কই, আমার তো চোখে পড়ে না, আমি দেখিনি। এখন বুঝুন সেই কে গুপ্তকে আজ আঠারো টাকার ঘর ভাড়া করে থাকতে হচ্ছে মশাই; লজ্জার কিছুই নেই। সব সমান এখানে।'

শিবনাথ যেন এইবার লজ্জা ভাঙল, এমনভাবে বেঞ্চির ওপাশে বসা ভদ্রলোকের দিকে আবার তাকাল।

'হাজার টাকার ওপর তার মাইনে ছিল।' বনমালী আরো পরিচয় দিলে কে গুপ্তর। শিবনাথের প্রতিবেশী, প্রতিবেশী বা কেন এক বাড়ির লোক। হয়তো তার পাশের ঘরেই এসে আজ শিবনাথ উঠেছে।

'বিলিতি মার্চেন্ট অফিস যখন ঠেলা দেয় আকাশে ওঠে। যখন পড়ে তখন কি ভাঙে, কি যায় তার হিসাব থাকে না। কত মূল্যবান রত্ন রাস্তায় ড্রেনে ডাস্টবিনে গড়াগড়ি যাচ্ছে। হ্যাঁ—এই গুপ্তর সই না হলে অত বড় অফিসটার পাঁচশ কর্ম-চারীর মাসের মাইনে আটকে থাকত। আজ তার সইয়ের এক পয়সা মূল্য নেই।' বনমালী থামল।

'থামলে কেন, বলো, ব'লে যাও বনমালী।' কে গুপ্ত বনমালীর দিকে না তাকিয়ে আবার একটা বিড়ি ধরায়। 'একটা [illegible] দিয়ে পাঠানো হয়েছিল সন্ধ্যেবেলা। আধ পয়সার চা ধার দেয়নি বনম[illegible] পোদ্দার কে গুপ্তর মেয়েকে বি[illegible] ক'রে। অথচ এমনি দু'জনে ক[illegible] কম কি।'

কে গুপ্তর কথা শুনে বনমালী এ[illegible] দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও কতকক্ষণ চুপ [illegible] নিজের হিসাব দেখতে লাগল।

শিবনাথ দু'জনকেই মনোযোগ [illegible] দেখছিল।

একটু পর বনমালী মুখ তুলে [illegible] একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'কি করব[illegible] দাদা, আধপয়সার এই ধরো, ফোঁড়নও [illegible] দিতে আরম্ভ করেছি কি কাল এই[illegible] এখন নিরিবিলিতে বসে তোমাদের স[illegible] গল্প করছি, আরাম পাচ্ছি তা-ও পাব[illegible] দিনের বেলায় মাছির যন্ত্রণায় [illegible] পারি না—রাত্রে ধারে ফোঁড়ন [illegible] খদ্দেরের ঠেলায় আমার প্রাণ বে[illegible] যাবে। ধারে বিক্রী বন্ধ করার কি এ[illegible] কারণ গুপ্ত! না হলে তুমি কত বড় [illegible] ছিলে সে কি আমি জানি না। তাই [illegible] ভদ্রলোককে বলছিলাম। কি লোক [illegible] কি হয়ে গেল।'

বনমালী অত্যধিক গম্ভীরভাবে ব[illegible] গুলো বলায় কে গুপ্ত আর কিছু [illegible] না। শিবনাথ যথেষ্ট আলো না [illegible] সত্ত্বেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নতুন প্র[illegible] বেশীকে দেখছিল। 'যাকগে,' একটু [illegible] কে গুপ্তর থমথমে গলার শব্দ [illegible] গেল। পাশে শিবনাথ বসে ভ্রুক্ষেপ [illegible] বাজে জিনিস নিয়ে তর্ক ক'রে আমি [illegible] গরম করতে চাই না। পরশু ড্রাই [illegible] যাহোক ক'রে একটা বোতল জোগাড় [illegible] ব্যবস্থা করো। তারপর তুমি আধ পয়[illegible] চা কি এক পয়সার নুন কাউকে ধার [illegible] না দেও বয়ে গেল।'

শিবনাথ বনমালীর দিকে তাক[illegible] বনমালী বোঝায়, 'না, লজ্জা ক[illegible] লুকোবার কিছু নেই, মশাই। এখানে স[illegible] সবারটা জানছে দেখছে, না জানানো দেখানোটাই খারাপ। কিন্তু জানছি ব[illegible] আর দশটা লোককে এ-পাড়ার যে [illegible] দেখছি কে গুপ্তকে সেই চোখে দেখি[illegible] দেখতে বুকে বাজে। এখানে কি কে[illegible] শালা জানে যে, এই এমন সময় হলে লোক বন্ধুবান্ধব নিয়ে চৌরঙ্গির হো[illegible] গরম ক'রে রাখত। দু'হাতে টাকা রোজ

রেছে, দু'হাতে খরচ করেছে, সে আর থা কি। আজ পা ভেঙেগ হাতি খানায় ড়েছে।'

'বলো থামলে কেন, বনমালী।'

'তার রোজ বিকেলের জলখাবার ছিল াঁচ ছ' টাকা।' বনমালী শিবনাথকে শানায়। 'আজ জলযোগ সেরেছে বেলে-াটার মুদির দোকানের বেঞ্চিতে বসে ু'পয়সার তেলেভাজায়।' 'থামিস কেন নমালী, বলে শুনিয়ে দে আমার মোক্তা-ামবাবু স্ট্রীটের বন্ধুকে।' বলে কে গুপ্ত ঠাৎ এমনভাবে শিবনাথের দিকে তাকিয়ে জেগুজ্ করে হেসে উঠল যে শিবনাথ া হেসে পারল না।

'তাই প্রশ্ন করছিলাম মশাই, বড় যে াধ ক'রে পারিজাতের চিড়িয়াখানায় এসে পরিবারে প্রবেশ করেছেন গত বছর ক'টা লেরা কেইস হয়েছিল এ-বাড়িতে তার বর রাখেন? এ-বাড়িতে যক্ষ্মারুগী াছে, আরো কতো কি খারাপ রোগ াছে। মানুষ? চোর বদমায়েস গুণ্ডা কেটমার লোফার ইনফর্মার পাগল—'

'থাক থাক।' বনমালী একটা হাত ুলে গুপ্তকে চুপ করতে বলল, 'এ-সব বলে আর কি হবে, তা কি আর ইনি জানেন না। এতকাল মোক্তারামবাবু স্ট্রীটে ছিমছাম নিরিবিলি কামরায় বৌ বাচ্চা নিয়ে সুখের রাজ্যে ছিলেন। এখানে বারোটা পরিবার। পাঁচটা লোক ভাল, সাতটা লোক ইতর বদমায়েস থাকবেই।'

বনমালীর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আর একজন এসে দাঁড়াল। গায়ে গেঞ্জি। হাতে হুঁকো।

'নমস্কার, ডাক্তারবাবু।'

বনমালীর দিকে তাকিয়ে ঈষৎ মাথা নেড়ে আড় চোখে বেঞ্চিতে বসা কে গুপ্ত ও শিবনাথকে একবার দেখে আগন্তুক শেষটায় শিবনাথের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। 'আপনি এই এলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'ভাল, ভাল, মানুষ মানুষের সঙ্গ ভালবাসে, সমাজবদ্ধ জীব, এ আর অন্যায় কথা কি।' বলে শেখর ডাক্তার চোখ বুজে হুঁকোয় দুটো টান দিয়ে পরে গলার একটা অদ্ভুত শব্দ করে, হাসল কি কাশল বোঝা গেল না, শিবনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার মশারী ফশারী আছে তো?'

শিবনাথ ঘাড় নাড়ল।

'আপনারা সবাই টিকা ফিকা নিয়েছেন তো?'

'হ্যাঁ, আসবার আগে তিনজনেই আমরা টিকা নিয়ে এসেছি।' শিবনাথ ঢোক গিলল।

'সাবধান।' হুঁকোয় আবার দুটো টান দিয়ে ডাক্তার বলল, 'এ-বাড়ির কিছুই বিশ্বাস নেই। এখানে যে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে বেঁচে আছি এটাই জগদম্বার কৃপা।'

কে গুপ্ত নীরব।

বরং মনে হ'ল ডাক্তারের কথায় কান না দিয়ে আকাশের তারা দেখছিল। অদূরে একটা গাছের ডালে বাদুড়ের পাখার ঝট্‌পট্ শোনা গেল। শেখর ডাক্তারের পাশে এসে দাঁড়াল বিধু মাস্টার। 'আপনি নতুন এলেন?'

শিবনাথ ঘাড় নাড়ল।

'আর কোথাও ভাল ঘরটর পেলেন না বুঝি?'

শিবনাথ মাথা নাড়ল।

মাস্টার এবার ডাক্তারের দিকে তাকায়। 'অথচ দ্যাখো ডাক্তার, নিত্য ভাড়াটে জুটছে। একবেলা একটা ঘর তুমি খালি পড়ে থাকতে দেখছ না, কিন্তু কই, বাড়িতে পাতকুয়োটার সংস্কার করার কথাটা পারিজাত কানেই তুলছে না, সরকার শালাকে মাস শেষ হতে দিব্যি রসিদ বই দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে ভাড়াটি আদায় করতে। বলি আমরা কি মানুষ না, এত-গুলি লোক! একটা কল। এইরকম কান্ড কেউ দেখেছে কখনো! ইলেক্‌ট্রিক আনবে আনবে ক'রে আজ দু' বছর ঘোরাচ্ছে।'

'তোমরা বলতে জান না তাই আদায় করতে পার না। বলার মত ক'রে বললে পারিজাতের বাবার সাধ্য আছে বাড়াত পাইপ না বসিয়ে, কি আলো না আনিয়ে দেয় বাড়িতে। মাস মাস এতগুলি ভাড়ার টাকা পাচ্ছে। তা-ও আগাম। শেয়াল চরত রায় সাহেবের এই জমিতে শুনছি ওয়ারের পরও। এখানে ইমপ্রুভমেন্ট! পঞ্চাশ বছর বাকি। তা কিছু টিনটালি খরচ করে কোনো রকমে একটা খোয়াড় তৈরী করে দিয়ে পতিত জমি থেকে বেশ মোটা আয় হচ্ছে। করবে বৈকি একটার জায়গায় দুটো কল, আরো দুটো করে পাইখানা তৈরী করে দেবে, দিতে বাধ্য যদি আজ সব একজোট হয়ে তোমরা ভাড়াটি বন্ধ করে দাও।'

ডাক্তারের এই কথায় মাস্টার একটু ক্ষুণ্ণ হল। 'যা হবার নয়, তা তুমি বলছ কি করে। বারো ঘরের মধ্যে তুমি আমায় দুটি ঘর দেখাও একরকম ভাবে হাঁটে কথা বলে, খায় কি একরকম কাজ করে। তুমি ডাইনে চললে আমি বাঁয়ে চলবই। তুমি যদি বল, 'জলের জন্য রেণ্ট বন্ধ কর' আর একজন তৎক্ষণাৎ উত্তর দেবে, 'না তার আগে চাই লাইট। এটা, বস্তি হলেও ভদ্রলোকের বস্তি। এখানে লেখাপড়া করার রেয়াজ আছে। ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে পড়ছে ভাড়া বন্ধ করতে হয় আগে আলোর জন্য করবো।'

বিধু মাস্টার চুপ করে রইল।

'এখানে সবাই ভাবছে 'আমার কথা সকলের আগে থাকবে এবং সবার ওপরে। সবাই মাতব্বর।'

কথাগুলো না আবার কাউকে প্রকাশ্য-ভাবে ডাক্তার বলতে শুরু করে, যার অর্থ কলহ সৃষ্টি, এই বাড়ির কয়েক সহস্র কলহ বিধু মাস্টার দেখে এসেছে। তাই একটু ভিন্ন গলায় বলল, 'থাক গে। তুমি আমি চেঁচালে কি হবে। চল ওদিকটায় ঘুরে আসি। বাড়ি ঠান্ডা হতে সেই রাত বারোটা।' বলতে বলতে হাতধরাধরি করে দুজন দোকানের সামনে থেকে সরে পড়ল। (ক্রমশ)

ইন্দ্রজিতের আসর

আমি যে স্থানটিতে বাস করি সেটি এতই ছোট যে, পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ যেদিকেই যান—আধ মাইল যেতে না যেতেই সীমা লঙ্ঘন করতে হয়। দু' পা হেঁটে গেলেই একেবারে প্রান্ত সীমায় পেঁছানো যায়, এটি ভেবে আমি মনে ভারি আরাম পাই। কারণ জ্ঞান হওয়া অবধি একটি জিনিস খুব ভালো ক'রে বুঝে নিয়েছি যে, সংসারে কোন জিনিসেরই কূল কিনারা পাওয়া যায় না। সর্বত্র এবং সারাক্ষণ যদি অকূলে হাবুডুবু খেতে হয় তবে তো প্রাণ অতিষ্ঠ। আমাদের এই স্থানটিকে এই কারণে ভালবাসি যে, এখানে আমার আত্মপ্রত্যয় বজায় থাকে। ইংরেজিতে যাকে বলে শক্ত ডাঙগায় দাঁড়ানো সেইটি এখানে সম্ভব হয়। এই স্থানটি ছেড়ে যে কোন যায়গায় গেলে আমার একেবারে দিশেহারা অবস্থা। কোন অঘটনের জন্যই প্রস্তুত থাকি না ব'লে পথে ঘাটে অপ্রস্তুত হতে হয়।

কলকাতার রাস্তায় দৈবাৎ কোন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে তাঁরা আমার বিভ্রান্ত মূর্তি দেখে কৌতুক বোধ করেন। আমি যে গন্তব্যস্থলে পেঁছে কার্যসমাধা ক'রে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসতে পারব সে বিষয়ে তাঁদের মনে সন্দেহ জন্মে। সন্দেহটা অমূলক নয়। কলকাতার যানবাহন আমার পক্ষ কতকটা জন্ গিল্‌পিন্-এর ঘোড়ার মতো। ও খুশি মতো যেখানটায় নিয়ে ছেড়ে দেয় সেখানটায় আমাকে নামতে হয় অর্থাৎ অনেক সময়ে যথাস্থানে পেঁছোতে পারি না আর যথাস্থানে যদি বা পেঁছোতে পারি, যথাসময়ে পারি না। পদব্রজে চলা আমাদের চিরকালের অভ্যাস। ভাবলে হাসি পায় যে, ট্রামে বাসে চড়েও আমাদের পদব্রাজ্য ঘোচে না। কলকাতার লোক যে ইদানীং নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে সেটা ট্রামে বাসে চলতে গিয়েই বুঝতে পারলুম। কলকাতার অধিবাসীদের আমি দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছি—মহাযান আর হীনযান। যাঁদের নিজস্ব যান অর্থাৎ মোটর আছে তাঁরাই মহাযান সম্প্রদায়ের লোক। আর যাঁরা পাব্লিক ট্রান্সপোর্টে চলেন তাঁরা হীনযানপন্থী।

আমার কলকাতার বন্ধুদের ধারণা বহুকাল ছোট যায়গায় কাটিয়ে আমার এই অসহায় অবস্থা ঘটেছে। আমি যেখানটায় থাকি সেখানকার নিভৃত নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রায় কলকাতার জনাকীর্ণ, কোলাহলমুখর গলদঘর্ম জীবনের আভাস নেই, একথা সত্য। অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস হওয়াটা খুবেই সম্ভব। এককালে কলকাতায় বছরের পর বছর আমাকে কাটাতে হয়েছে, কিন্তু তখনও কলকাতার রাস্তায় অনায়াস বিচরণ আমার পক্ষে সম্ভব ছিল ব'লে মনে পড়ে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব অল্পাবিস্তর সব মানুষের উপরেই পড়বে, এ কথা আমি মানি। তথাপি বলব, প্রত্যেক মানুষেই কতক পরিমাণে আত্মজ অর্থাৎ স্বভাবজ। প্রত্যেক মানুষেরই কতগুলি স্বভাবগত ঝোঁক আছে। তার মানসিক গড়নটি সেই ধাঁচ অনুযায়ী হ'তে বাধ্য। চার্লস ল্যাম্-এর জন্ম লন্ডন শহরে, জীবনের বেশির ভাগ কাটিয়েছেন লণ্ডনে। অত্যন্ত শহুরে প্রকৃতির মানুষ। গাছপালা লতা গু... জীব জন্তু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসী... ছিলেন। শহরে লালিত মানুষ ব'লেই যে এমনটি হয়েছিল তা নয়, মনের গড়নই ছিল অন্যরকম। ভারি সুন্দর ক'রে বলেছেন যে, লণ্ডনে জন্ম না হ'য়ে য... Devon's leafy shores-এ জন্মগ্রহ... করতেন তাহ'লেও প্রকৃতি দেবীর প্র... এমনি উদাসীন হতেন। আমারও হয়েছে তাই। আমার আদি এবং অকৃত্রিম বাস... স্থান যদি কলকাতায় হতো তাহ'লেও কলকাতার সঙ্গে আমার ঐ অনাত্মীয় ভা... থেকে যেতো। আমি তার রাস্তার ... ভুলতাম, চীনাবাজারে যাব ব'লে অন্যে... বাজারে গিয়ে হাজির হতাম। ভুল বাসে চ'ড়ে ভুল পথে যে চলেছি সে ভুল ধরা... ক্ষমতা আমার নেই। কারণ আমার মনটা... ভুলো। সব কথাই ভুলে যাই, আ... সবচেয়ে মুশকিল, ভুলে যে গিয়েছি ... কথাও ভুলে যাই।

কিন্তু তাই ব'লে কলকাতাকে আ... ভালোবাসিনে এমন কথা যদি কেউ বলে... তো আমার প্রতি অবিচার করা হবে। ... মানুষটা ভুলো প্রকৃতির হ'লেও অকৃ... নই। রাস্তায় ঘাটে চলতে গিয়ে অনে... বিড়ম্বনা ঘটেছে। কিন্তু ওর চা... দোকানে যা পেয়েছি সে ঋণ কখন... পরিশোধ হবে না। হ্যাঁ, ঋণের কথা... যখন উঠল, শুনে আপনারা হাসবে... কলকাতা ছাড়বার পরেও মাসে মা... টাকা পাঠিয়ে আমাকে চায়ের দোকানে... ঋণ শোধ করতে হয়েছে। অবশ্য সে হ'... আর্থিক ঋণ। পারমার্থিক ঋণ আজ... শোধ হয় নি। পরমার্থ বলতে আ... বুঝি যৎকিঞ্চিৎ অর্থের মূল্যে ... পরমানন্দ লাভ করা যায় সেই আনন্দ আমি কলকাতাকে ভুলিনি বরং কলকা... সম্বন্ধেই আমার মনে অভিমান আছে আজ তার চোখেই অনাত্মীয় দৃষ্টি এ... গেছে। আমাদের বহু সুখস্মৃতি বিজড়িত অতি পরিচিত চায়ের দোকানে ঢুকলেও জোড়া জোড়া কৌতূহলী চোখের সম্মুখে অত্যন্ত অপ্রতিভ বোধ করতে হয়। ভাবটা যেন, এ আবার কে? এ...

তো এখানে আসবার কথা নয়। নিজেকে অনধিকার প্রবেশের অপরাধে অপরাধী মনে হয়। আচ্ছা, ইস্কুল কলেজে যেমন ওল্ড বয়েজ রি-ইয়ুনিয়নের রীতি আছে, তেমনি আমাদের চায়ের দোকানগুলোতে কি পুরোনো খদ্দেরদের রি-ইউনিয়নের ব্যবস্থা হ'তে পারে না? দোকানের মালিকরা যদি কিঞ্চিৎ কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করেন তো কলকাতার কোন কোন চায়ের দোকান কিম্বা কফি হাউস সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে উঠতে পারে। বস্তুত নাগরিক সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক এরাই এবং সেদিক থেকে পান-ভোজনের মূল্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতে বেশি।

আমি যেখানটায় থাকি কলকাতা থেকে তার ব্যবধান অনতিক্রম্য নয়, কাছেই বলতে হবে। আসল ব্যবধানটা সময়ের। কলকাতার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল কুড়ি বাইশ বছর আগে। সেটা এক যুগের ব্যবধান। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে যেমন প্রস্তরযুগ লৌহযুগ ইত্যাদি নানা যুগ ধাপে ধাপে দেখা দিয়েছে, কলকাতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসেও তেমনি বিভিন্ন যুগ দেখা গেছে। সেগুলো বিভিন্ন পানীয়ের যুগ। ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগে মদ্যপানটাই রীতি ছিল। তারপরে এসেছে চা। আমরা চা যুগের মানুষ। এই সবে এসেছে কফির যুগ। আমরা যাকে যুগান্তর বলি, সেটা শুধু কালান্তর নয়, আসলে রুচির রূপান্তর। নিজেকে যুগের যোগ্য প্রতিপন্ন করতে হ'লে প্রচলিত আচার এবং রুচিকে মেনে নিতে হয়। নিজের কথা বলতে পারি—আমি চায়ের যতখানি সমজদার, কফির ততখানি। কাজেই কলকাতা আমাকে যতখানি পর মনে করে আমি ততখানি পর নই।

অভিনব উপায়ে মৎস্য শিকার

হিমাংশু সরকার

"জোর যার মুলুক তার" কথাটা যেন বড় বেশী বর্বরতা ঘেঁষা। এর মধ্যে কিছুটা আদিমতার আভাস পাওয়া যায়। সভ্যযুগের মূল মন্ত্র হচ্ছে "বুদ্ধির্যস্য, বলং তস্য", তাইতো দেখি ঈশ্বরের সর্বোত্তম সৃষ্টি মানবজাতি তার বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের নিজের সুখ সুবিধার্থে স্বচ্ছন্দে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। বাঁদর নাচিয়ে মানুষ দু' পয়সা রোজগার করছে এতো সচরাচরই দেখা যায়। ভালুক নাচ, বাঁদর নাচ ছাড়া সার্কাসে জন্তুজানোয়ারের খেলা দেখিয়ে এক একটি সার্কাসের কর্তা নিজে পয়সা রোজগার তো করেনই, আবার কত লোকের চিত্তবিনোদনও করেন। এসব তো আমরা প্রায়ই দেখি কিন্তু সচরাচর যা দেখি না এমন উপায়েও মানুষ জীবজন্তুকে নিজের কাজে লাগিয়েছে।

পাখিকে দিয়ে মাছ ধরানো—গভীর জলের মাছ জাল ফেলে ধরা হয় আর অল্প জলের মাছ ছিপে ধরা যায়। শিক্ষিত পশুপক্ষী দিয়ে মাছ ধরা নতুন কথা মনে হয়। বক, সারস, মাছরাঙা ইত্যাদি পাখি জল থেকে মাছ ধরে খায়। এদেরই ভালোমত শিক্ষা দিয়ে তৈরি করতে পারলে এরা নিজের জন্য ছাড়াও মানুষের জন্যও মাছ ধরে দিতে পারে।

কর্মোরেণ্ট নামে একরকম মৎস্যভোজী পাখি আছে। চীন জাপানের একদল জেলে এই পাখিদের দিয়ে মাছ ধরিয়ে বাণিজ্য করে। পাখিগুলো বাজপাখির মত বেশ বড় বড় দেখতে। জলের উপরে মাছ যখন ভেসে ওঠে তখনই এরা ছোঁ মেরে জল থেকে মাছ উঠিয়ে নেয়। বর্তমানে চীন জাপানেই কর্মোরেণ্টের সাহায্যে হ্রদ, নদী, খাল, বিল, জলা ইত্যাদি থেকে মাছ ধরার ব্যবস্থা

চীন দেশের প্রাচীন চিত্র হইতে—কর্মোরেণ্টের সাহায্যে মৎস্য শিকার

শিক্ষিত কর্মোরেণ্ট পাখী

প্রচলিত আছে। এক সময়ে য়ুরোপেও এই পদ্ধতির প্রচলন ছিল এবং খুব সম্ভবত ঐদিক থেকেই চীন-জাপানে এই ব্যবস্থার চলন হয়।

শিশুকাল থেকেই কর্মোরেণ্টদের শিক্ষা শুরু হয়। একেবারে ভ্রূণ অবস্থা থেকেই এদের জেলেদের আওতায় এনে ফেলা হয়। মুর্গি দিয়ে কর্মোরেণ্টের ডিম থেকে বাচ্চা ফুটিয়ে শিক্ষা শুরু করা হয়। এরা বড় হলে অন্যান্য শিক্ষিত কর্মোরেণ্টের সঙ্গে মিশতে দেওয়ার আগেই এদের ডানাগুলো ছেঁটে ফেলে, গলায় একটা আংঠা লাগিয়ে দেওয়া হয়। আংঠাটি এমনভাবে লাগান থাকে যে, তখন এরা ছোট ছোট মাছ গিলে ফেলতে পারলেও বড় মাছ গেলার সাধ্য থাকে না। শিশুকাল থেকে এভাবে বেড়াজালে পড়ে যাওয়ায় এদের কাছে পক্ষীকুলের সহজ স্বাধীন জীবনের স্বাদ অজানা থেকে যায়। অবশ্য মানুষ তো নির্দয় নয় কাজেই এইসব কৃষ্ণের জীবেদের একেবারে বঞ্চিত করা হয় না। এরা যখন বড় বড় মাছ ধরে জেলে বোটে এনে দেয় তখন জেলেরা এদের উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কার হিসাবে ছোট ছোট মাছ খেতে দেয়। সাধারণত বোট বা ভেলা জাতীয় নৌকা থেকেই কর্মোরেণ্ট দিয়ে মাছ ধরান হয়। একটা বোটে ছয়টি থেকে বারোটি পর্যন্ত কর্মোরেণ্ট দিয়ে কাজ করা যেতে পারে। সংখ্যায় বেশী হলে একজন লোকের পক্ষে এদের প্রতি লক্ষ্য রাখা খুব অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। এদের মাছ ধরার রীতি-নীতিও বেশ চমৎকার। জেলে ইঙ্গিত করা মাত্র এরা ঝাঁক বেঁধে জলের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে ডুবিয়ে ঠোঁটে করে মাছ উঠিয়ে বোটে নিয়ে আসে, তখন জেলে একটা খুব লম্বা হাতলওয়ালা জালের থলে করে মাছগুলো তুলে নিয়ে আবার মাছ ধরে আনার জন্য পাখিগুলিকে ইঙ্গিত করে। এইসব পাখি মানুষের দাসত্ব করছে বলেই যে এদের আত্মমর্যাদা জ্ঞান নেই তা মনে করলে খুব ভুল করা হবে। এদের সকলেই নিজের নিজের পদমর্যাদা সম্বন্ধে বেশ সচেতন। এদের বয়স এবং মাছ ধরার অভিজ্ঞতার তারতম্য অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ হয়। সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও মর্যাদাসম্পন্ন পাখিদের স্থান বোটের মাথার উপরে; তারপরে পরস্পরের মর্যাদা অনুযায়ী পর পর বসে যাবে। যদি একে অপরের মর্যাদা ঠিকমত না দেয় তাহ'লে তারা নিজেদের মধ্যে বচসা করে স্ব স্ব মর্যাদা বজায় রাখে। পাখিগুলি ঝুড়ি ভরে নৌকায় আনা হয় আর এই ঝুড়ি-গুলোতে আলাদা খোপ থাকে। যদি দেখা যায় যে, এদের মধ্যে কোনও একটির সঙ্গে অন্যদের বনিবনা হচ্ছে না তাহ'লে ঝগড়া বচসা এড়াবার জন্য তাকে দল থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। মাছধরা শেষ হয়ে গেলে জেলে প্রতিটি পাখি নিজের হাতে নিয়ে ওজনটা দেখে নেয়। যদি কোনও পাখির ওজন কমে গেছে বলে মনে করে তাহ'লে বুঝতে পারে যে, তার খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে জোটেনি, সেজন্য তাকে আবার আলাদা করে কিছু মাছ খেতে দেয়। পক্ষীকুল ছাড়া পশুদের মধ্যেও অনেক মৎস্যভোজী প্রাণী দেখা যায়।

ভোঁদড় দিয়ে মাছ ধরানো

"খোকা গেল মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে
মাছ নিয়ে গেল ভোঁদড়ে আর
ছিপ নিয়ে গেল চিলে।"

সুতরাং মৎস্যভোজী প্রাণীদের মধ্যে ভোঁদড় যে অন্যতম একথা ছোটবেলা থেকেই আমরা জানি। জেলেরা নিজেদের কাজের উপযোগী করার জন্য এদেরও মনের মত করে শিক্ষিত করে তোলে। এদের শিক্ষা দেওয়া কর্মোরেণ্টদের শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে অনেক সহজ। অনেকটা কুকুরের মত ভোঁদড়ও প্রভুর সেবা করতে সদাই তৎপর। ভোঁদড় দিয়ে মাছ ধরার রীতি বলতে গেলে সারা পৃথিবীতে প্রচলিত আছে। ইংলণ্ড, স্কটল্যণ্ড, ফ্রান্স স্কাণ্ডিনেভিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী পোল্যাণ্ড, উত্তর আমেরিকা প্রভৃতি সর্বদেশে। এশিয়ার মধ্যে চীন ও ভারতেই এই প্রথা চলিত আছে। ভারতের মধ্যে আবার বঙ্গদেশ, সিন্ধুপ্রদেশ ও কোচিনে এই রীতি দেখা যায়। কর্মোরেণ্টদের মত ভোঁদড় নিজেরা মাছ ধরে আনতে পারে না, এরা জেলেদের সাহায্য করে মাত্র। জেলেরা জলে খ্যাপলা জাল ফেলার সঙ্গে সঙ্গে নৌকা থেকে দুটি একটি ভোঁদড় জলে নেমে গিয়ে জালের চার পাশ দিয়ে সাঁতরে সাঁতরে মাছ গুলোকে তাড়িয়ে জালের মধ্যে নিয়ে আসে। এইভাবে জালের মধ্যে কো অনেকগুলি মাছ এসে গেলে জেলে জাল টেনে তোলে। যেখানে জাল ফেলা হয় যদি সেখানে যথেষ্ট মাছ না থাকে তাহ'লে

শিকারী 'সাকার ফিশ'

চীনা জেলে তার ভেলা থেকে কর্মোরেন্টের সাহায্যে মাছ ধরছে।

ভোঁদড়গুলো জলের মধ্য থেকে মুখটি বাড়িয়ে ইঙ্গিতে প্রভুকে জানিয়ে দেয় যে, ঐ জায়গায় যথেষ্ট মাছ নেই। বাংলাদেশে তার জালের ব্যবহারের সময়েও ভোঁদড়ের সাহায্য নেওয়া হয়। তার জাল একটি জালি থলির মত দেখতে। এই জালের থলিটা জলে ডুবিয়ে দিয়ে তারপর দু'তিনটি শিক্ষিত ভোঁদড়কে জলে নামিয়ে দেওয়া হয় আর তারা জলের মাছগুলো তাড়িয়ে জালের মধ্যে এনে ফেলে, তারপর জালটি আস্তে আস্তে উঠিয়ে আনা হয়।

সাকার ফিস দিয়ে কচ্ছপ ধরানো

এতক্ষণ আমরা মৎস্য শিকারী পশু পক্ষীর কথাই বললাম, এইবার শিকারী মৎস্যের কথা বলা যাক্—কচ্ছপও মাছের মতই মানবজাতির একটি বিশিষ্ট খাদ্য। মাছ দিয়ে এইসব কচ্ছপ শিকার করা যায়। "সাকার ফিশ" অথবা 'রেমোরা' নামে একরকম মাছ আছে এদের মাথার কাছে একটা করে গোল চাকতি থাকে। সাধারণ মাছেদের দেহে 'ডর্শাল ফিন্' বা পৃষ্ঠ পাখনা বলে যে পাখনা থাকে এই চাকতি, সেই ডর্শাল ফিনের রূপান্তর। সাকার ফিশের একটা অদ্ভুত রকম আকর্ষণী ক্ষমতা আছে। একটা দুই ফিট্ মাপের সাকার ফিশ বিশ পাউণ্ড ওজনের যে কোনও জানোয়ারকে টেনে আনতে পারে আর ঐ চাকতিটা শিকারের গায়ের যে কোনও জায়গায় আটকে দিতে পারে। এইভাবে মাছ ও কচ্ছপ শিকারের কাহিনী কলম্বস তাঁর বিবরণীতে লিখে যান। কলম্বস পশ্চিম ভারতের জেলেদের এইরকমভাবে মাছ ধরতে দেখেছিলেন। অবশ্য বর্তমানে আর এইসব স্থানে এইভাবে মাছ ধরার পদ্ধতি নেই। জাঞ্জিবার ও অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট বেরিয়ার রীফে এখনও এই উপায়ে মাছ ধরা হয়। প্রথমে চার ফেলে "সাকার ফিশ"গুলো ধরা হয় তারপর সেগুলোর লেজের মধ্যে ফুটো করে একটা আংঠা পরিয়ে নৌকার খোলে জল ভর্তি করে তার মধ্যে রেখে দিলে ক্রমশ ঘা শুকিয়ে গিয়ে আংঠাটা শক্ত হয়ে আটকে যায়। এই অবস্থায় মাছগুলোকে একটু একটু করে মাংসের টুকরো খেতে দিতে হয়। ক্রমে এগুলো দু' তিন পাউণ্ড ওজনের হলে তারপর শিকারের কাজে লাগে। এই সময় রেমোরাগুলোর লেজের আংঠায় দড়ি বেঁধে আর ওদের চাকতিগুলো নৌকার গায়ে আটকে দিয়ে নৌকাটা আস্তে আস্তে জলের মধ্যে চালান হতে থাকে। নৌকাটা যখন অনেকগুলো কচ্ছপের কাছাকাছি এসে পৌঁছায় তখন রেমোরাগুলোকে নৌকার গা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চাকতিগুলো হাতের তেলো কিংবা বালির ওপর ঘসে ঘসে ওপরের হড়হড়ে জিনিসটা নষ্ট করে দিয়ে ওগুলোকে নৌকা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঐ চাকতিগুলোর ধর্মই কোন কিছুতে সেঁটে যাওয়া, কাজেই সামনে কচ্ছপ দেখলে তাদেরই পিঠের ওপর চাকতিগুলো আটকে যায়। এরপর জেলেরা রেমোরার লেজের দড়িটা শক্ত করে ধরে থাকে আর কচ্ছপগুলো যেমন সামনের দিকে দৌড়াতে থাকে সেই মত আস্তে আস্তে সুতো ছাড়তে থাকে। ক্রমশ ধীরে ধীরে সুতো টেনে টেনে কচ্ছপটিকে নৌকার কাছে এনে ফেলে। এইভাবে ধরে আনার জন্য রেমোরাকেই বেশী কষ্ট পেতে হয় কারণ এভাবে টানাটানি করার দরুণ তাদের লেজের অংশটা কেটে ছিঁড়ে যায়, অবশ্য এর জন্য জেলেদের বিশেষ ক্ষতি হয় না। একটা রেমোরা নষ্ট হলেও তারা অনেক রেমোরাকে শিকারের উপযোগী করে তোলে।

বর্তমানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্য শিকারের তুলনায় এই পুরাতন পদ্ধতি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর সন্দেহ নাই, কিন্তু এক সময়ে এই অভিনব পদ্ধতি কোনও কোনও দেশের মাছের চাহিদা সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা পূরণ করতে পেরেছিল।

দু'পাশে জলঘাসের ঘনবিন্যস্ত অরণ্য-সবুজ—আর তারই মাঝখান দিয়ে মেঘবতী রাজকন্যার সিঁথির মত ঋজু রেখায় নিদ্রাবতীর খালটা সামনের মেঘনায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। সেই খালটা যেখানে নারকেল গাছের মর্মরিত কুঞ্জে আশ্বিনের প্রসন্ন সকালে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ঠিক সেইখানেই প্রথম ভোরে এক-মাল্লাই কেরায়া নৌকাটা এনে ভিড়িয়েছিল ফজল। অস্থির দৃষ্টিটা একবার করমচা ঝোপের আড়াল দিয়ে, সুপারী বীথির মধ্য দিয়ে, সামনের ক্যাঁচা বাঁশের চৌচালা ঘরখানার চারপাশ দিয়ে একনিমেষে চক্রাকারে ঘুরে এলো। কিন্তু, না—সলিমা হয়ত ভুলেই গিয়েছে সন্ধ্যার প্রতিশ্রুতির কথা—

আর একটু অপেক্ষা করেছিল ফজল; তারপরেই কাঁঠাল কাঠের বৈঠাটা হাতে তুলে নিয়েছিল। তাড়াতাড়ি সিরাজ-দীঘার হাটে না যেতে পারলে আজ আর সওয়ারীর প্রত্যাশা নেই। আর সঙ্গে সঙ্গেই নিদ্রাবতীর খালের একটা উচ্ছল ঢেউ কলশব্দে এসে ভেঙে পড়েছিল কানের ওপর, চেতনার ওপর, স্নায়ুগুলোর একাগ্রতার ওপর—একটা ধ্যানমৌনী নারকেল গাছের পাশ থেকে জলতরঙ্গের বাজনার মত খিল খিল করে হেসে উঠেছিল সলিমা। ফজলের মুখের উজ্জ্বল সূর্যাভাসের ওপর চকিতে অভিমানের গাঢ় মেঘ ঘন হয়ে নেমে এসেছিল। গলুইর ওপর পেছন ফিরে চুপচাপ বসেছিল ফজল।

ততক্ষণে পারের ঘাসবিছানো মাটিতে এসে দাঁড়িয়েছিলো সলিমা; তার নীলাভ চোখের মণিদুটোতে নিদ্রাবতীর খালের প্রসন্ন সকালের মোহন স্বপ্ন টলমল করে উঠেছিল। সমস্ত দেহে তন্দ্রামদির আচ্ছন্নতা থাকলেও সলিমার জিভের আগায় কৌতুকের তীক্ষ্ম ঝাঁঝ হিস্ হিস্ করে উঠেছিল; 'ইস্ গোসা হইল না কি আবার: রঙ্গ দেইখ্যা শরীর আমার জ্বইল্যা যায় মরিচের লাখান।'

তবু ফজল নির্বাক। অভিমানের মেঘকে ছত্রখান করে ভেঙে অন্তরঙ্গতার নতুন সূর্যোদয় কি এতই সহজ!

এবার মন্থর গলায় বলল সলিমা: 'আয় নাইম্যা আয়, তুই গোসা হইলে আমার পরাণটা জানি কেমুন কইরা ওঠে।''

অভিমান-ভাঙা মধুর হাসি আভাসিত হয়ে উঠেছিল ফজলের কাঁচা আনাজের মত তাজা মুখখানায়, 'না, না এখন আর আসুম না। কাজে যাই। আরো দশটা টাকা হইলে সাতকুড়ি টাকা হইব। আইজ কেরাইয়া বাইলেই পামু। হিন্দুরা গেরাম ছাইড়্যা যাইতে আছে গিয়া, একটা কেরায়া পামুই। তারপর এই মাসটা গেলেই তোরে সাদি করুম।'

'থাউক তোর আর কেরায়া বাইতে

হইব না আইজ। কেরায়া বেশী, না আমি বেশী?'

নম্রনীল আকাশের বেদনাঘন ছায়া নেমে এসেছিল সলিমার মুখে। 'তোর বাজানে যে চামার—সাত কুড়ি ট্যাকা গইণ্যা গইণ্যা নিয়া তবে মাইয়া দিব; সাফা কথা কইয়া দিছে। যাই এখন—সন্ধ্যার সময় আবার আসিস সলিমা।'

'তবে এখন যা তুই। সন্ধ্যার সময়' আবার আসিস। আমার আর ভালো লাগে না একা একা থাকতে—তাড়াতাড়ি সাদির ল্যাঠা চুকাইয়া দে। সারাদিন পরাণটা কেমন জানি করে!'

'কেমন করে? পঙ্ক্ষী হইয়া আসমানে উইড়্যা যাইতে চায়?'

ফজলের গলায় স্নিগ্ধ কৌতুকের কৌতূহল।

'জানি না যা'—শোন সাতদিনের মধ্যে ট্যাকা জোগাড় করন শেষ কর। না হইলে বাসাইলের কাসিমালি বাজানের কাছে ট্যাকা লইয়া আসছিল। আমারে সাদি করতে চায়। আমি কাইন্দ্যা খেদাইছি তারে। তাড়াতাড়ি করবি। বাজানেরে তো চিনস—'

পাহাড়ি নদীর মত উচ্ছল ছন্দে বাঁক ঘুরছিল সলিমা।

ততক্ষণে ফজল আবার বৈঠাটা হাতের মুঠোতে তুলে নিয়েছিল। খালের রূপালী রেখাটা ধরে দূরে আরো অনেক দূরে ধূ ধূ হয়ে বিন্দুর মত মিলিয়ে গিয়েছিল ফজলের নৌকাটা আর একটা আচ্ছন্ন পুরুষ গলার নিদ্রামেদুর সুরে—

যোল বছরের তাজা মাইয়া
সতেরে দিছে প্যাড়া
আঁখির মইধ্যে রাখছে বাইন্ধ্যা
পরভাতিয়া তারা।

প্রভাতিয়া তারার স্বপ্ন ধরে রাখা চোখের রূপকন্যা তার যৌবন-বন্দনা শুনতে শুনতে সেই মোহন সকালে বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এখন সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে নেমে এসেছে। সিরাজদীঘার কেরায়া ঘাটে নৌকাগুলোতে আলোর বিন্দু জ্বলে উঠেছে; হাটের চালার নীচে নীচে ভিন্-গেরামী দোকানীদের কেরাসিনের কুপীতে এই অন্ধকারের পটভূমিতে কনকচাঁপার মত শিখা ফুটে উঠেছে অজস্র। দূরের কোন একটা মহাজনী নৌকা থেকে মাঝির গলায় নমাজ পড়ার অবসন্ন আওয়াজ ভেসে আসছে। নির্বারিত আকাশ থেকে কে যেন রাত্রির ঘন কালি ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে পৃথিবীর নদী-অরণ্যে; ঘাসে-জঙ্গলে, সূর্যকন্যার কৌতুক-উজ্জ্বল মুখের ওপর অমেঘ লজ্জার মত অন্ধকার ঘনীভূত হচ্ছে।

শেষ সওয়ারীর ক্ষেপ দিয়ে এইমাত্র ফজলের একমাল্লাই নৌকাটা এসে ভিড়ল কেরায়া ঘাটে। সারাদিন সওয়ারী পারাপার করে আজ সাতটা টাকা মিলেছে। লগিটা পারের মাটিতে শক্ত করে পুঁতে মোটা কাছি দিয়ে বাঁধল ফজল। তারপর কেরাসিনের ডিবে জ্বালিয়ে কোমরের গোপন গ্রন্থি থেকে গেঁজেটা বের করে কাঁচা টাকাগুলো একটা একটা করে গুণে নিল। মোট ছ' কুড়ি সতেরো টাকা। সাত কুড়ি পূর্ণ হ'তে এখনও তিন টাকা বাকি। কালকের দিন কেরায়া বাইলেই হয়ে যাবে।

হিন্দুরা সাতপুরুষের স্নেহমধুর ঘর-ভদ্রাসন ছেড়ে বেবাজিয়াদের মত চলে যাচ্ছে গোয়ালন্দের দিকে। একটা কেরায়া মিললে তিনটে টাকা পাওয়া আশ্চর্য কিছু নয় আজকাল; আর তা মিলবেও। এ বিশ্বাস তার ধ্রুবতারার মত স্থির। তারপরেই সাত কুড়ি টাকা নিয়ে সলিমার বাজানের বুনো খাটাসের মত কুৎসিত দাড়ি-আকীর্ণ মুখটার ওপর পেশীর সমস্ত শক্তিতে ছুঁড়ে দিয়ে সলিমাকে নিয়ে চলে আসবে তার স্বাবলম্বনের নিভৃত পৃথিবীতে যেখানে সলিমার বাজানের কদর্য মুখখানা দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা হয়ে ছায়া সঞ্চার করবে না তাদের সংগীত-মর্মরিত স্বপ্নের আকাশে।

সেদিন সলিমার বাজান শকুনের মত তীক্ষ্ণ-নির্মম গলায় টেনে টেনে চেঁচিয়ে উঠেছিল, "সলিমারে সাদি করতে চাও। সাত কুড়ি ট্যাকা ডাইন হাতে দিয়া বা হাতে মাইয়ারে নিয়া যাইও।"

বিরস কণ্ঠে ফজল বলেছিল, "আমার কাছে চাইর কুড়ি ট্যাকা আছে এখন, সেই দেই। সাদির পর দিয়া যামু বাকী ট্যাকা। খোদার কসম।"

কিন্তু বাকি বকেয়ার ব্যাপারে অতিমাত্রায় সচেতন সলিমার বাজান, বাকি টাকা হ'ল আসমানের তারা; কখনই তা হাতের মুঠোয় এসে পেঁছিবে না।

সংসার-নির্লিপ্ত গলায় সলিমার বাজান বলে উঠেছিল, "ধার-বাকি লইয়া আমার কারবার নাই সোনা। আমি নগদ লইয়্যা ব্যাপার করি।"

"বেশ তবে আমারে এক মাসের সময় দ্যান। আমি ট্যাকাটা জোগাড় কইর্যা লই।"

"এইর মধ্যে অন্য কেউ যদি আইস্যা পড়ে তো আমি কিছু জানি না।"

সেদিন আর কোন জবাবই দেয় নি ফজল। ধীরে ধীরে সলিমার বাজানের প্রেতায়িত মুখখানার সমুখ থেকে উঠে খালের কিনারে একমাল্লাই নৌকাটার কাছে চলে এসেছিল।

আর সেইদিন থেকেই একটি একটি ক'রে টাকা জমিয়েছে ফজল। তার সমস্ত যৌবনের স্বপ্নময় কামনাকে ঘাম-ঝরা পরিশ্রমের পবিত্র মূল্যে কিনবার একাগ্র নিষ্ঠায় কেরায়া বেয়ে সওয়ারী করেছে। দেলভোগ, সাভার, বাসাই সোনারঙ—জলবাঙলার উদার প ব্যাপ্তিতে নিজেকে একটি স্রোতের ফু মত ভাসিয়ে দিয়েছে ফজল। দিন-রা ক্লান্তি-অবসাদের কোন হিসাব ছিল এই একটি ঝড়ের মত উন্মত্ত মা পাণ্ডুলিপিতে। নিশ্চিত বিশ্বাসের স সলিমার বন্দরে নোঙর-ফেলার জন্য এই নিচ্ছেদ প্রস্তুতি-পর্ব চালিয়ে গিয়েছে ফজল; ঘরের ভেতর সলিমার স্বপ্নকে নিবিড় করে পাওয়ার জনাই ঘরের বাইরে এই ক্লান্তিবিহীন আয়োজন।

টাকাগুলো গুণে গুণে আবার গেঁজের মধ্যে ভরে নিল ফজল; তারপর কোমরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বেঁধে ফেলল। একটি টাকাও যাতে হারিয়ে না যায়, তাই শরীরের আশ্চর্যসতর্ক চামড়ার সঙ্গে তার স্পর্শকে ধরে রেখেছে ফজল। এর মধ্য থেকে একটি টাকা নিয়েও বেহেস্ত কি দোজখে গেলেও কারো রেহাই নেই—নিশিরাত্তিরের অপযোনির মত তাকে ধাওয়া করে নিয়ে যাবে ফজল।

আর মাত্র তিনটি টাকা—তারপরেই সলিমার স্বপ্নঘন সাহচর্যের উত্তপ্ত

আশ্বাস। ভবিষ্যতের সেই মধুর কল্পনায় মৃদু নেশায় গলার ওপর একটা সুর গুন গুন করে রণিত হয়ে উঠল ফজলের—

কালো চোখের মদ খাইয়াছি,
হইয়াছি উন্মন,
আর মদ খাইয়াছি আমার
বধূর পরথম্ যৌবন।
কেমনে ভাঙগুম আমি সেই
বধুয়ার মান—
চোখের পাতায় দিনু চুমা,
ঠোঁটে সাচি পান।

গান-গাওয়া তন্ময়তার মধ্যে আচমকা চমকে উঠল সকালের সেই প্রতিশ্রুতির কথা—সন্ধ্যার সময় মর্মরিত নারকেলকুঞ্জে দেখা করার কথা ছিল সলিমার সঙ্গে।

তাড়াতাড়ি উঠে 'পারা' তুলল ফজল। আর সঙ্গে সঙ্গে আকাশবাণীর মত শোনালো কথাগুলো।

"মাঝি কেরায়া যাইবা না কী নদীর পার? আরে কে—আমাগো ফজল না কী? আন্ধারে দিশা কইর‍্যা [illegible]ত পারি নাই।"

[illegible] পারের শ্বেতচন্দনের মত কোমল [illegible]তে এসে দাঁড়িয়েছে মালখানগরের [illegible]ছন শিকদার; আর তারই ঠিক [illegible]নে বোরখা-গুণ্ঠিত একটি নারী-[illegible]র্তি, খুব সম্ভব মিঞা সাহেবের [illegible]বজান।

কেরায়াঘাটের সন্নিহিত ফেরী লঞ্চের নিশ্চল জেটীটা প্রলম্বিত হয়ে পড়ে রয়েছে। এইমাত্র কচুরী পানার উদ্দাম বিন্যাসকে বিচ্ছিন্ন করে মুন্সীগঞ্জের লঞ্চটা এসে ভিড়ল, সার্চ লাইটের তীব্র আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে ঝলকে ঝলকে, সিরাজদীঘার বন্দর আর কেরায়া-ঘাটটা আভাসিত হয়ে গিয়েছে। আর সেই আলোতে ইয়াছিন শিকদারের মুখটা কি একটা ভয়ংকর হিংস্রতায় যেন ঝকমক করে জ্বলে উঠল; চোখের মণিদুটো অজগরের দৃষ্টির মত ক্রূর হয়ে উঠেছে। যেন এইমাত্র একটা রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডের নায়কের ভূমিকা শেষ করে এসেছে ইয়াছিন। একটু চমকিত হয়ে উঠল ফজল; "কোথায় যাইবেন মিঞা সাহেব?"

"চরইসমাইল।"

"অতদূর যাইতে পারুম না। রাইত হইয়া গেল—এখন এক গাঙ পাড়ি দেওন যাইবো না। কাইল সকালে আইসেন।" ফজলের গলায় নিরালম্ব নিস্পৃহতা। ব্যস্ত হয়ে উঠল ইয়াছিন, ব্যগ্র পদসঞ্চারে এগিয়ে এসে গলুইটা চেপে ধরল, "কেউ এত রাইতে যাইতে চায় না। তোমারে খুশী কইর‍্যা দিমু। লও, দেরী করনের সময় নাই।"

এবারে মন সংযোগ করার চেষ্টা করল ফজল, "কত দিবেন?"

"পাঁচ ট্যাকা।"

"পাঁচ ট্যাকা—ফুঃ। একখান কাথা দেই—বিবিজানেরে লইয়্যা সারা রাইত পইড়্যা ঘুমান ঐ হাটের চালায়। বিহানে উইঠ্যা সাতইর‍্যা যাইবেন গিয়া। পাঁচ ট্যাকা আর খরচ করবেন ক্যান? ছাড়েন—গলুই ছাড়েন। কাম আছে আমার।" কর কর করে নিজের রসিকতায় কর্কশ ছন্দে হেসে উঠল ফজল।

হ্যাঁ—অনেকটা সময় বাজে খরচ হয়ে গিয়েছে—এতক্ষণে মর্মরিত নারকেল বীথির আড়ালে প্রতীক্ষা করতে করতে রাত্রির সমস্তটুকু অন্ধকার নিশ্চয়ই ঘন হয়েছে সলিমার মুখে। গলুইটা আরো তীব্রভাবে আঁকড়ে ধরল ইয়াছিন শিকদার; "সাত টাকাই দিমু মাঝি আমার বড় ঠেকা চর-ইসমাইলে।"

আবারও সেই হাসির পুনরাবৃত্তি; "সাত ট্যাকা আমারে দিবেন ক্যান? ঐ ট্যাকা দিয়া আড়াই সের ত্যাল কিনা নাকে দিয়া পইড়্যা থাকেন; চরইসমাইলে যাওনের কথা মনেও থাকবো না। ছাড়েন, ছাড়েন"—

"তবে কত চাই তোমার? আমারে আইজ যাইতেই হইব। স্বরাজ আসার পর তোমরাই নবাব হইলা দেখতে আছি। কত চাই তোমার?"

একটা তীব্র উৎকণ্ঠা একরাশ গলিত পিচের আকারে যেন উঠে এলো ইয়াছিনের গলায়।

"দশটা ট্যাকা দিতে হইব মিঞা সাহেব—একেবারে সাফা হিসাব।" পরম বৈষ্ণবের মত সংসার-বিবাগী একটা হাই তুলবার চেষ্টা করল ফজল।

"দশটা ট্যাকা!" আতংকিত চীৎকারের সঙ্গে মহাপ্রাণীটাও যেন গলার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল ইয়াছিনের।

"পারলে পাটাতনে ওঠেন, না হইলে গলুই ছাড়েন। রাইত হইয়া গেল দুফার।"

এই ব্যাপারে আর একটি হাই তোলার বেশী বাজে খরচ করবার মত উৎসাহ নেই ফজলের।

চাপা গলায় এবার গজ গজ করে উঠল ইয়াছিন, "ঠ্যাকায় পাইছ—মোচড় দিয়া ট্যাকা আদায় কর। কি আর করন, দশ ট্যাকাই দিমু।"

প্রথম কথাগুলো যেন শুনতেই পায়নি ফজল; কিন্তু শেষের কথা ক'টা নির্ভুলভাবে তার কানের সুড়ঙ্গে প্রবেশ করেছে।

"এই তো মিঞা সাহেবের মরদের লাখান কথা ছুটছে। বিবিজানরে নিয়া নৌকার পাটাতনে ওঠেন। যাইতে যাইতে আবার রাইত হইয়া যাইব ভোর।"

আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে গেল ঘটনাটা।

ইয়াছিন পেছনের বোরখায় আবৃত নারীমূর্তির হাত ধরে একটা আসুরিক টান দেবার সঙ্গে সঙ্গে মৃদু অথচ অমানুষিক চীৎকার করে উঠল মেয়েটি "না না, আমি যামু না। আমারে ছাইড়্যা দ্যান—আপনের পায়ে পড়ি।"

চাপা গর্জন শোনা গেল ইয়াছিন শিকদারের; "হারামজাদীর সুখে থাকতে ভূতে কিলায়। গিয়া থাকবি খাপ্পা খাঁয়ের নাতিনের লাখান। তা না হইলে গয়না খোলার ঐ ডাকুই তোরে নিয়া যাইত তার কিল খাওনের থিকা আমার খোদ বেগম হওন ভাল না?"

শরীরের উত্তেজিত শিরায় শিরায় প্রবহমান উষ্ণ তুর্কী রক্তে বাদশাজাদার পবিত্র মেজাজ অনুভব করতে লাগল ইয়াছিন।

এবারে মৃদু চীৎকারটি মর্মান্তিক হয়ে উঠল; চমকে উঠল ইয়াছিন; তারপর দুটো ভারী ভারী কর্কশ হাত মুখের ওপর ঠেসে ধরল নারীমূর্তিটির; "চুপ চুপ একেবারে খুনই কইর‍্যা ফেলাম তোরে।"

গলার আওয়াজে অমন একটা বীভৎস বীরকর্ম করা যে একেবারেই অসম্ভব নয় —সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না

ফেরী লঞ্চের সার্চ লাইটটা অন্যদিকে ঘুরে গিয়েছে; কালো কাচের মত মেঘনার জলে ঝকমক করে উঠেছে রক্তরাগ পান্নার কণিকার মত। এদিকে অন্ধকারের সেই ছিদ্রহীন যবনিকা; আর তারই মধ্যে সাপের মাথার মণির মত জ্বলছে ইয়াছিনের চোখ দুটো।

সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে দুটো চোখ আর দুটো কানের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে দর্শন ও শ্রবণ এই দুই পুণ্যকর্মই করছিল ফজল; আচমকা সে বলে উঠল, "কি মিঞা সাহেব, বিবিজানে কি কয়? গোসা হইল না কী?" গলার স্বরটা তার কেমন যেন সন্দেহজনক।

ত্রস্তে তিড়িক করে লাফিয়ে উঠে নৌকার গলুইর কাছে এসে দাঁড়ালো ইয়াছিন, এলোমেলো উচ্ছৃংখল গলায় বলে উঠল, "পোলাপান মানুষ কি না—আমার কাছ থিকা সোয়ামীর ঘরে যাইতে কান্দে। ও কিছু না মাঝি—ও কিছু না"—

"অ—আমি ভাবলাম অন্য কিছু বুঝি"—

বলার স্বরে আরো খানিকটা সন্দেহের উদ্বেগ ঢেলে দিল ফজল। কোন জবাব না দিয়েই এবার বোরখা সমেত পাঁজা-কোলা করে নারীমূর্তিটিকে পাটাতনের ওপর তুলে নিয়ে এলো ইয়াছিন শিকদার। ঘাতকের হাতে উদ্যত ছুরি দেখলে যেমন করে নিরীহ পশু আর্তনাদ করে ওঠে, বোরখার অন্তরাল থেকে তেমনি একটা আকাশ-ফাটানো চীৎকার ভেসে এলো। কেন্দ্রীভূত ইন্দ্রিয়গুলো আবার কেমন যেন বিপর্যস্ত হয়ে গেল ফজলের; "মিঞা সাহেব আমার বড় ডর করতে আছে। কাইল সকালেই যাইয়েন"—

"বাগে পাইছ—আইচ্ছা পনেরো ট্যাকাই দিমু। নাও—আর দেরী কইরো না, নৌকা খুইল্যা দাও—রাতারাতি চর-ইসমাইলে পেঁছাইয়া দিবা।"

আকাশবাণীটা এবার আরো উদাত্ত শোনালো ইয়াছিনের গলায়।

পনেরো টাকা! বলে কী লোকটা—মাথার মধ্যে কোন বিপর্যয় বেধে যায় নি তো এই মুহূর্তে। বাদাম তুলে দিলে উত্তুরে বাতাসে একটানে চর-ইসমাইলের মাটিতে গিয়ে নৌকার গলুই ঠেকবে ত্রিযামা রাত্রির অনেক আগেই; শুধু মাত্র হালের বৈঠাটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে আকাশের আদিগন্ত নক্ষত্র বাসরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তারাদের আয়নায় সলিমার মুখ দেখবার চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছুই নেই। বিনিময়ে পনেরো টাকা! সলিমার জন্য সাত কুড়ি টাকা পূর্ণ হয়েও বারোটা কাঁচা টাকা গেঁজের মধ্যে পাশাপাশি শুয়ে শুয়ে বাজনা বাজাবে মধুর আনন্দে। ভাবতে ভাবতে রোমাঞ্চিত হতে লাগল ফজল। এতক্ষণে উন্নতশির নারকেল বীথির মর্মরিত আয়তন থেকে প্রতীক্ষা-ব্যাকুল অভিমান নিয়ে নিশ্চয়ই চলে গিয়েছে সলিমা। তা যাক্। কাল ভোরে পৃথিবী সূর্যের রক্তমাখার আগেই সে সলিমার চামার বাজানের নাকের ডগায় টাকাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে হতচকিত করে দেবে; সলিমার হাত ধরে নিজের ঘরে এনে সেদিনের সেই আহত পৌরুষের মর্যাদাকে কড়ায়-গণ্ডায় প্রতিষ্ঠিত করবে। একটা বীর্যবান উল্লাসে অনুপ্রাণিত হবার চেষ্টা করল সে।

এবার ইয়াছিনকে পরখ করল ফজল; "কত ট্যাকা দিবেন?"

বিশ্বস্ত গলায় ছই-এর ভেতর থেকে জবাব এলো, "পনেরো।"

মোচড় দিলে আরো রস ঝরবে নিঃসন্দেহ; কিন্তু আর গুণাহ্ করল না ফজল; ধর্মভয় তো আছে তার! বৈঠাটা দিয়ে পারের মাটিতে খোঁচা দিয়ে নৌকাটা মাঝ-নদীতে নিয়ে এলো সে।

এরপর অন্তহীন মেঘনার খরধারা; রাত্রির পিঙ্গল চুল ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত-বিসারী পটভূমিতে। দূরের আকাশ থেকে অতৃপ্ত কামনার মত পান্ডুর জ্যোৎস্না এসে সমস্ত কিছুকে ভৌতিক আর মায়াময় করে তুলেছে।

কালো কাচের মত জল এখন রাত্রির অন্ধকার নিঃসীমতায় তলিয়ে গিয়েছে; ঢেউগুলো উদাত্ত ফণার মত ছোবল দিচ্ছে জামকাঠের নৌকায়। হালের বৈঠাটা শক্তমুঠোয় চেপে ধরে দূর-আকাশের দিকে ফজল তার দৃষ্টিটা বিকীর্ণ করে দিল। রাশি রাশি তারা স্বর্ণপদ্মের মত ফুটে রয়েছে; তাদের মধ্যে আর একটা অদৃশ্য নক্ষত্র যেন এই রাত্রির অতলগর্ভ অন্ধকারে জ্যোতির্ময় দিশারী হয়ে দিক্‌নির্দেশ করে চলেছে। সলিমা। মনটা একটা মোহন মাদকতায় ভরে গেল ফজলের। আজকাল চৌচালা ঘরের বিছানাটাকে মৃত সাপের শীতল আলিঙ্গনের মত ভয়াবহ মনে হয়; বড় নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে আর সেই অবয়বহীন একাকীত্বের মধ্যে সলিমার স্বপ্নসঞ্চার কতকগুলো বিলম্বিত দীর্ঘশ্বাসের অস্বস্তিকে জাগিয়ে রাখে সারা রাত।

আজ রাত্রেই চর-ইসমাইল থেকে সলিমার বন্দরের দিকে নৌকার বাদাম টাঙিয়ে দেবে ফজল। মধুর উত্তেজনায় বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড দুটো অশ্রান্ত-ভাবে ঠোকাঠুকি শুরু করে দিয়েছে তার। তর তর করে নৌকাটা তীরের মত জল কেটে এগিয়ে চলেছে; হালের বৈঠাটা তেমনি ধরে তন্দ্রামধুর গলায় গান শুরু করে দিল সে—

যৌবন আইল কন্যার দেহে
জোয়ারের জল রে—
আমার চোখের জলে পদ্ম নাচে
টলমল রে—
ও কন্যা—তুমি হয়ো চন্দ্রবদন,
আমি হমু মুখের আঁচল
তুমি হয়ো নয়নমণি, আমি হমু—
কালো কাজল ও কন্যা,—

গলার মধ্যে গানের রেশটা স্তব্ধ হয়ে গেল আচমকা। সুরের তন্ময়তা একটা তীব্র ঝাঁকানি খেয়ে সতর্ক করে তুলল ইন্দ্রিয়গুলোকে; সমস্ত সত্তাটাকে শ্রবণের মধ্যে আবার সংহত করে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে রইল ফজল।

ছই-এর ভেতর তখন খণ্ডপ্রলয় চলছে, একটা অস্বস্তিকর ধস্তাধস্তির পরিষ্কার আভাস পাওয়া যায়। বুকের ভেতর রক্তের প্রবাহে কি একটা অনুভূতি কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগল ফজলের; হাঁটু

দ্বটো ঠক ঠক করে অশ্রান্তভাবে বেজে চলেছে।

আর সাপের শিষের মত ক্রুর গর্জন হিস্ হিস্ করে বাজছে ইয়াছিনের গলায়, "চুপ, চুপ—একেবারে গলা টিপা খ্বন করুম।"

"তাই, তাই করেন—আমি বাইচ্যা যাই —আমারে ছাইড়্যা দ্যান। আমি জলেই ঝাপাইয়া পড়ুম।"

নারীকণ্ঠটি ভয়ঙ্কর রকমের করুণ শোনালো।

শ্মশানের শিয়ালের মত খিক খিক করে প্রেতলোকের হাসি হেসে উঠল ইয়াছিন; "মরণ এতই সস্তা, এমনে মারুম না কী! এট্টু এট্টু কইর‍্যা তোরে খ্বন করুম। পোড়াইয়া পোড়াইয়া তোরে মারুম!"

একটা ভয়াবহ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিল ইয়াছিন।

তার কথাগুলো ক্ষ্যাপা তুফানের মত ধড়াস করে এসে আছড়ে পড়ল ফজলের হৃৎপিণ্ডে।

মেঘনার অন্তহীন খরস্রোতে নৌকাটা ভেসে চলেছে তীব্রবেগে। পারের মাটিতে স্বপারী-নারকেলের বীথিতে অশ্রান্ত মর্মর —অবারিত সিন্ধ্ববাতাস বাঁশীর স্বরের মত একটানা মাতন তুলেছে অর্জুন পাতার ফাঁকে ফাঁকে।

ছই-এর ভেতর সেই পাটাতন-কাঁপানো ধস্তাধস্তিটা আবার নিথর হয়ে গিয়েছে।

ফজলের একাগ্র ইন্দ্রিয়গুলো আবার শিথিল হয়ে গেল। আকাশের দিকে চোখ দুটো ছুঁড়ে দিয়ে সলিমাকে ভাববার চেষ্টা করল সে।

মোরগ ডেকে উঠবার আগেই কাল ভোরে সলিমার বাজানকে জাগিয়ে সাত কুড়ি টাকা কন্যাপণ নাকে ছুঁড়ে মারার পর তার মুখের ওপর থেকে শকুনের হাসিটা কেমন ফস করে নিভে পরিম্লান হয়ে যাবে—ভাবতে ভাবতে উদ্দীপ্ত পৌরুষের গৌরবে চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল ফজলের।

জটে বুড়ী মেঘের মত চুল আলুলায়িত করে যেন অন্ধকারে বসে রয়েছে—তারই মধ্যে মধ্যে অপরিচিত কৃষাণ-গ্রামে আলোর আভাস পাওয়া যায়। চাষীদের ঘরে রক্তদীপ্তির মত জ্বলছে কুপীগুলো; অন্ধকারের নিশ্ছেদ পাথরে ঠুকতে ঠুকতে কারা যেন মাথাগুলোকে শোণিতাঙ্কিত করে ফেলেছে। মনের মধ্যে আবার একটু একটু করে স্বপ্নসঞ্চার করতে লাগল সলিমার। তার দুটো নীলিম চোখের ছন্দ দিয়ে, দুটো শ্যামলা বাহুর লয় দিয়ে, তার কামরাঙা শাড়ীর মনোরম সুর দিয়ে চৌচালা ঘরের মধ্যে ফজল একটা আশ্চর্য মায়াময় গান রচনা করবে।

স্বপ্নসঞ্চারিণী আবার সরে গেল, আচ্ছন্ন কল্পনা আবারও বিস্রস্ত ও ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ফজলের।

ছই-এর ভেতর থেকে একটা তীক্ষ্ম ব্যাকুল প্রার্থনা শোনা গেল; "আমারে কইলকাতায় দিয়া আসেন। আপনে আমার ধর্মের বাপ।"

আবারও সেই ভয়ঙ্কর বিষধর হাসি; "তোর বাজান না লো সুমুন্দির ঝি; তোর পোলার বাজান হমু। এখন চুপ মাইর‍্যা পইড়্যা থাক। তোরে আনতে গিয়া তিনটা সড়কির খোঁচা খাইছি তোর সোয়ামীর।

এই চলমান একমাল্লাই নৌকার মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর পরিবেশ সৃষ্টি করল কথাগুলো। অতন্দ্র তমসার হৃৎপিণ্ড খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে যেন এই মুহূর্তে কোটি কোটি ইব্লিশ নদীর অদৃশ্য অতল গর্ভ থেকে উঠে এসেছে—কেমন যেন ভয় করতে লাগল ফজলের; হাতের জোড়গুলো কেমন যেন খুলে খুলে আসতে শুরু করেছে; একাগ্র পেশীগু[illegible] বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আবারও [illegible] ভয়ঙ্কর গলা, আবারও সেই অশরী[illegible] জিনলোকের হাসি। বুকের ভেতর [illegible] ছম করে উঠল ফজলের; "বেশী [illegible] ঘ্যান করবি না, ঠ্যাঙ্ ধইর‍্যা ফা[illegible] ফেলামু"—

পাখীর পালকের মত একটা ভ[illegible] কোমল কণ্ঠ থর থর করে উঠল; "[illegible] করেন—তা হইলে আমি বাইচ্যা যা[illegible] আমার সোয়ামীরে আপনেরা মারছেন।"

"সোয়ামীরে মারছি! প[illegible] সোয়ামীতে কতদিন আর স্বোয়াদ থা[illegible] নয়া সোয়ামী লইয়া এখন ঘর করবি, ত[illegible] মন মেজাজ তাজা হইব।"

সঙ্গে সঙ্গে একটানা হা[illegible] পুনরাবৃত্তি।

অমানুষিক গলায় আর্তনাদ [illegible] উঠল মেয়েটি, বোরখার অবগুণ্ঠ[illegible] অন্তরালে এমন একটা আকাশ-ফা[illegible] চীৎকার কোথায় লুকিয়ে ছিল, এত[illegible] মধ্যে আবিষ্কার করে উঠতে পারে[illegible] ফজল; "আমারে ছুঁইয়েন না, ছুঁই[illegible] না। এই আপনের ধর্মের বি[illegible] এইজন্যে ওগো হাত থিকা আ[illegible] ছিনাইয়া আনছেন? আপনে কইছিলে[illegible] আমারে কইলকাতায় দিয়া আসবে[illegible] আমারে ছুঁয়েন না"—

"ইস্ সতী বেউলা একেব[illegible] ছুঁইয়েন না!"

ছই-এর ভেতর ধস্তাধস্তির আভ[illegible] একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার ইঙ্গিত [illegible] এনেছে ইয়াছিনের মৃত্যুগর্ভ কথ[illegible] নৌকাটা টলমল করে ঢেউয়ের [illegible] আছাড় খেতে খেতে এগিয়ে চলল।

মৃদু গলায় শিকছু একটা উচ্চ[illegible] করার আগেই ছই-এর ভেতর [illegible] তীক্ষ্ম আর্তনাদ করে উঠল মেয়ে[illegible] "আমারে বাঁচাও মাঝি, আমারে বাঁ[illegible] আমার সর্বনাশ কইর‍্যা ফেলল।"

ঐ আকাশ-ফাটানো চীৎকারের [illegible] দিয়ে এই নিকষ তমসাবৃত পটভূমি[illegible] যেখানে মেঘনার অবারিত তরঙ্গ-স্প[illegible] ছাড়া আর কোন পৃথিবীর অস্তিত্ব [illegible] একটা নিশ্চিত মৃত্যুর সঞ্চার হ'ল।

সুরভিত চাঁপার কলির মত নিঃশব্দ সঞ্চারে সোনালী সকালের মোহন স্বপ্নমাখা রাজকন্যা মনের গুঞ্জিত সংগীত থেকে সরে গিয়েছে। কি একটা অনিবার্য প্রতিজ্ঞায় পেশীগুলো বজ্রের মত প্রখর হয়ে গেল, শিরায় শিরায় বহমান মৃদু-কম্পিত রক্তে খরধার স্রোত নেমে এল; চোখের মণি দুটো গুলবাঘের দৃষ্টির মত ধক্ ধক্ করে জ্বলতে লাগল ফজলের।

ভয়ানক গলায় ডাকল ফজল, "মিঞা সাহেব।"

বাঁ হাতে হালের বৈঠাটা শক্ত করে চেপে ধরে ডান হাতটা আড়কাঠের নীচে বাড়ালো কোঁচের ফলাগুলোর দিকে প্রসারিত করে দিল ফজল। আজ সলিমার স্বপ্ন দেখতে দেখতে সারারাত্রি কাটিয়ে দেবার কোমল সংকল্প ছিল ফজলের, কিন্তু সেই স্বপ্নের পাশে পাশে এমন একটা নির্মম অপমৃত্যু ওঁত পেতে ছিল—তা কি সে জানত!

ছই খুলে বাইরের পাটাতনে এসে বসেছে ইয়াছিন; সংগে সংগে একরকম ঝাঁপিয়েই বাইরে বেরিয়ে এলো মেয়েটি। এক ঝলক জল গলুইর ওপর দিয়ে নৌকার ডোরায় এসে উঠল; "আমারে বাঁচাও, আমারে বাঁচাও মাঝি। আমি বামনবাড়ির বউ, দাংগায় আমার স্বামীরে মারছে।" দানা পাওয়া কণ্ঠ। রক্তের মধ্য দিয়ে কেমন যেন শির শির করে বয়ে গেল স্বরটা।

মাথার মধ্যে কেমন যেন বিপর্যয় ঘটে গেল সহসা। ধারালো কোচের মসৃণ ফলাগুলো নির্ভুল লক্ষ্যে গিয়ে গেঁথেছে, লক্ষের নিমেষেই, ইয়াছিনের বাধা দেবার অনেক আগেই।

একটা প্রচণ্ড চীৎকার কুণ্ডলিত হয়ে আকাশের দিকে উঠে গেল; "ইয়ে আল্লা রসুলাল্লা।"

তারপরেই নৌকার ভার খানিকটা হাল্কা করে ইয়াছিনের দেহটা মেঘনার খরস্রোতে পাক খেয়ে কোন্ দিকে মিলিয়ে গেল। ততক্ষণে কোচের ফলাগুলো পরিষ্কার করে ধুয়ে আবার ডোরার নীচে চালান করে দিয়েছে ফজল।

আতঙ্কে শ্বাসনলী যেন চেপে আসতে চাইছে মেয়েটির, আঙুল ফেটে ঝিঁঝিঁ করে রক্ত বেরিয়ে আসতে চাইছে; চোখ দুটো দেহের সংগে বিদ্রোহ করে আর আবদ্ধ থাকতে চাইছে না।

শান্ত গলায় ফজল বলল, "আপনে যাইবেন কই?"

পাণ্ডুর উত্তর এলো; যেন কোন ছায়া কথা বলছে; "এইখানে আমার কেউ নাই; দাংগায় সব পলাইছে। কইলকাতায় আমার এক দেওর আছে—সেইখানে যাইতে চাই।"

নৌকার গলুইটা তারপাশা স্টীমার-ঘাটার দিকে ঘুরিয়ে দিল ফজল।

আবার সেই মেঘনার অন্তহীন তরঙ্গবিস্তার, একটানা সোঁ সোঁ ঝড়ের গর্জন।

ভোর রাত্রে দূরের আকাশে এক আস্তর ছায়া-ছায়া রঙের অস্পষ্ট আলোর ছোপ ধরল। আর এমনি সময় তারপাশার স্টীমারঘাটায় এসে 'পারা' পুঁতল ফজল।

নৌকার পাটাতনে স্থিরনির্বাক বসে রয়েছে মেয়েটি; মুখের ওপর প্রথম ভোরের মুমূর্ষু আলোর আলপনা! সেদিকে তাকিয়ে দৃষ্টিটা কেমন যেন কেঁপে গেল ফজলের। মেয়েটির অনাবৃত মুখে যেন সলিমার আদল স্পন্দিত হয়ে গেল।

জেটীঘাটার ওপর অসংখ্য মানুষের শঙ্কিত জটলা। যাযাবরের মত দেশের স্নেহর্মাদর ঘরভদ্রাসন ছেড়ে সকলে চলে যাচ্ছে। মুখে চোখে ভয়ের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর আঁকা; একটা অপমরণের শ্মশান থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে জীবনের প্রতিশ্রুতিতে পালিয়ে যেতে চাইছে সকলে।

এক সময় মেয়েটিকে নিয়ে ওপরে টিকেটঘরের দিকে এগিয়ে এলো ফজল, বলল, "টিকিট কিনা দেই আপনের?"

ইতস্তত কণ্ঠে মেয়েটি বলল, "আমার কাছে তো টাকা নাই।"

চকিতে কি যেন মনে পড়ে গেল। কোমরের গেঁজেতে তার বয়ঃসন্ধির বাসন্তী স্বপ্ন কিনে আনার মূল্য রয়েছে।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল ফজল, তারপর বিরাট জনসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে টিকিট কিনে আনলো একখানা।

ইতিমধ্যে পোঁ দিয়ে মুন্সীগঞ্জ থেকে ঢাকা মেল এসে পড়েছে। বাকী টাকা-গুলো মেয়েটির হাতে দিতে দিতে ফজল বলল, "এই ট্যাকা কয়টা রাখেন। কামে লাগব পথে। এত মানুষ যাইতে আছে, কেউরে ধইর‍্যা কইলকাতায় গিয়া উঠবেন। পারবেন তো!"

"পারুম। কিন্তু এই টাকা"—

অপরিসীম সংকোচে মাথাটা নীচের দিকে নেমে গিয়েছিল মেয়েটির; ওপর দিকে দৃষ্টি তুলবার সংগে সংগে কাউকে দেখা গেল না। একটা অবিশ্বাস্য ভোজ-বাজীর কুহকে মাঝিটা যেন মরীচিকার মত কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে।

কেরায়াঘাটে নিজের একমাল্লাই নৌকাটার দিকে আসতে আসতে ফজলের কি মনে পড়ল? সলিমাকে? না। রাত্রির ঐ রহস্যময়ী মেয়েটিকে? তাও নয়। দু' একদিনের মধ্যে সাত কুড়ি টাকা না দিতে পারলে সলিমার বাজান অন্য জায়গায় মেয়ের সাদীর বায়না ঠিক করবে—সেই চিন্তাতেই কি আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল ফজলের স্নায়ুগুলো? তাও নয়।

তার মনে পড়ল কাল রাত্রির সেই রক্তাক্ত কোঁচের ফলাগুলো; চেতনার ওপর দিয়ে দুলে দুলে তারা যেন নেচে চলেছে অবিরাম। মেঘনার হু হু বাতাসের অশ্রান্ত আকুলতায় কোন বনস্পতির নিভৃত ছায়ায় সলিমাকে নিয়ে ঘর বাঁধার আগে রাত্রির ক্রুর অন্ধকারে কতবার ইয়াছিনদের আবির্ভাব হবে? কতবার?

ফজলের মনে পড়ল কোঁচটায় অনেক-দিন শান পড়ে নি। আজই শান দিয়ে রূপার মত ঝকঝকে করে তুলতে হবে কোঁচটা।

উড়িষ্যার শিল্পধারা

শ্রীঅজিতকুমার দত্ত

সাংস্কৃতিক দিক থেকে প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর মধ্যে উড়িষ্যার সাথেই বোধ হয় বাংলার আত্মিক সম্বন্ধটা

কাঠের উপর কাজ করা ফুলদানি

নানা কারণে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। তবুও সত্যি বলতে কি শিল্প-সম্পদে সমৃদ্ধ এই এলাকাটির পরিচয়ের অনেকটাই আমাদের অজানা—যতটুকু যা জানি, তা মুখ্যত দেব-দেউলের দেশ হিসেবেই। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, বিগত দিনে ইতিহাসের বিভিন্ন পাদে যে অবিনশ্বর শিল্প-প্রতিভার বিকাশ এখানে ঘটেছিল, ক্রম-ক্ষীয়মাণ হলেও তার উত্তরধারা আজও নানা খাতে প্রবহমান। হয়ত এ অঞ্চলটির ভৌগোলিক অবস্থান এর জন্যে অনেকখানি দায়ী।

আজকের উড়িষ্যা-শিল্পের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, স্থাপত্য-ভাস্কর্য-চিত্রাঙ্কণ ইত্যাদি পুঁথিগত ভাগে এদের বিভক্ত করা এখন খুবই কঠিন। কালের পরিবর্তনে শিল্পের সেখানে গোত্রান্তর ঘটেছে। সামন্ততান্ত্রিক যুগ বহুকাল অতীত হয়েছে, রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা নেই, ধনী-জমিদার ইত্যাদির দিনও গত, তাই অবস্থার ফেরে শিল্পীরও কাজের ধরন বদলেছে। সুবৃহৎ মন্দির হয়ত আর তৈরী হয় না, কিন্তু তাই ব'লে অন্নচিন্তার অবসান ঘটেনি। স্থপতিকে সে-কারণে অন্য পথ খুঁজতে হয়। রাজ-মিস্ত্রীর কাজ? অগত্যা তাতেই রাজী। তা-ও যদি না জোটে, অবসর-কর্ম হিসেবে শিল্পী তখন সোপস্টোনের মন্দির ইত্যাদি নির্মাণে লিপ্ত হয়। ভাস্করের বেলায়ও সেই কথা। পাথর না কুঁদে তাকেও সোপস্টোনের মূর্তি-গড়া বা অনুরূপ কোনও কাজ বেছে নিতে হয়। অর্থাৎ, বর্তমানের শিল্পসৃষ্টি হয়ত অনেক ক্ষেত্রে হাতের কাজ বা মাইনর আর্টসের পর্যায়ে চলে এসেছে, তথাপি পূর্বসূরীদের কার্যক্রম বা সৃজনীপ্রতিভা আজও নিঃসংকোচে শিল্পাদর্শ ব'লে স্বীকৃত। বর্তমান উড়িষ্যার অধিকাংশ শিল্পের যথাযথ পরিচয় বা বিবর্তন-ধারা অনুসরণ করলে, এদের চট করে "লোক-শিল্পের" সংজ্ঞায় বিভূষিত করা চলে না। কাজগুলো নিঃসন্দেহে এক অবিচ্ছিন্ন সুদূরপ্রসারী ধারায় প্রকাশ। বেশ বোঝা যায় যে, এগুলো এককালের দরবারী বা অভিজাত আওতায় পরিপুষ্ট উচ্চাঙ্গ শিল্পের বিবর্তিত রূপ।

দিন বদলেছে, শিল্প-সৃষ্টির মাধ্যমও আজ বহুবিচিত্র। ওড়িয়া শিল্পী আজ কাজের জন্যে সোপস্টোন, গোরু-মহিষের শিং, কাঠ, হাতীর দাঁত ইত্যাদি অনেক কিছুই বেছে নিয়েছে। চিত্রাঙ্কণ ব্যাপারেও পাটা, ঝাঁপি, কাঠের বাক্স বা তাস সবই সমান সমাদৃত। অবশ্য বলা বাহুল্য যে, প্রকাশ-মাধ্যমের সবই একেবারে আধুনিক আবিষ্কার নয়, বস্তুত এর অনেকগুলোই পূর্ব-প্রচলিত।

মোটামুটিভাবে, বর্তমান উড়িষ্যা-শিল্পের প্রধান ধারাসমূহের কথা বলতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সোপ-স্টোনের কাজের। প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য শিল্পের এটা একটা বিশিষ্ট পরিচ্ছেদ। উপাদান নরম ও ক্ষণভঙ্গুর হ'লেও, শিল্প-সৌকর্যের দিক থেকে কাজগুলো যেমন সুন্দর, তেমনি চিত্তাকর্ষক আর দামেও অপেক্ষাকৃত সস্তা। তাই এর জনপ্রিয়তা যথেষ্ট। পুরী-ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দিরসমূহের স্থাপত্য-শৈলী অনুযায়ী কিংবা বিভিন্ন শিল্পশাস্ত্রবর্ণিত নায়িকা ইত্যাদি মূর্তির বর্ণনা অনুসরণে

পুরী জেলা হইতে সংগৃহীত 'পূর্ণ রাস' পট

শিকারের দৃশ্য: হাতির দাঁতের কাজ

শিল্পীদের প্রায়শ মন্দিরের বা চরিত্রের রূপারোপে প্রবৃত্ত হ'তে দেখা যায়।

কাঠের নানারকম শিল্পসৃষ্টি উড়িষ্যায় আজও দেখা যায়। তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ছোট বাক্স, বাটি, প্রসাধন বা অংগরাগ দ্রব্যাদির আধার ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিছক কাঠের কাজ হিসেবে নয়, বহুতর বর্ণসুষমায় উজ্জ্বল ব'লেই এগুলোর চাহিদা খুব বেশী। শিংয়ের কাজও বহুপ্রকারের দেখা গেলেও, সিন্দুর-কৌটো, কাজলদান ইত্যাদি জিনিসগুলোই প্রধানত শিল্পপদবাচ্য।

উড়িষ্যা যে শিল্পের দেশ, বর্ণালীর বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তা সহজেই অনুমান করা যায়। রঙের ভেতর লালের ওপর আবার শিল্পীদের একটা সহজাত আকর্ষণবোধ প্রবল আকারে দেখা যায়। পাটা ঝাঁপি, ইত্যাকার বহু জিনিসই গ্রাম্য শিল্পীদের তুলিকার আঁচড়ে উজ্জ্বল। বাংলার পটুয়াদের মত দেশজ মাটি, খড়ি ইত্যাদি এদেরও সম্বল। বিদেশী রঙের প্রতি এরা সাধারণত নিরাসক্ত। রঙের মধ্যে লাল, নীল ও হলদেই সর্বাধিক ব্যবহৃত। বিষয়বস্তুর দিক থেকেও প্রাচীন নীতি বা রীতি অনুসরণ প্রচেষ্টা অর্থাৎ জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা ইত্যাদি সুপরিচিত দেবদেবী নিয়ে আঁকার চেষ্টাটাই প্রবল দেখা যায়। আবার, রাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে বৃত্তাকার চিত্রও যথেষ্ট অংকিত হয়।

ছোট খাট ধরনের অন্যান্য শিল্প-সৃষ্টির মধ্যে হাতীর দাঁতের কাজ উল্লেখ-যোগ্য। শিল্প হিসেবে এটি প্রাচীন, কিন্তু এ-কাজের পরিমাণ খুবই কমে গেছে।

উড়িষ্যা-শিল্পে আজও জীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায় একথা যেমন সত্য, কিন্তু তার আজ অন্তিম দশা—সে কথাটিও ততোধিক সত্য। এই নিদারুণ সত্যকে স্মরণ রেখে আজ এর বিলুপ্তি রোধে প্রবৃত্ত হওয়া সত্বর প্রয়োজন। জীর্ণাবস্থার কথাটা সাম্প্রতিক উদাহরণ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে। সোপস্টোনের কাজ এত সুন্দর, আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়-

ভুবনেশ্বর মন্দিরের অনুকৃতি: সোপ স্টোনের কাজ
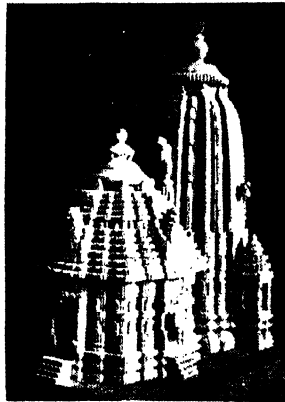
নৃত্যরতা নায়িকা: সোপ স্টোনের কাজ

মান হয় খুব জনপ্রিয়ও বটে। কিন্তু সেকাজে লিপ্ত-শিল্পীরও অন্নসংস্থান হয় না। এককালের দেশখ্যাত স্থপতিকুলের বংশধর আজ কালেভদ্রে ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব সমীক্ষার কিছু কিছু সংস্কার কার্যে লিপ্ত হয়ে সাময়িক ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্ত করে। শিল্পকাজ জেনেও সে বেকার আর দুর্ভাগ্যবশত, হঠাৎ করে নতুন পেশায় আত্মনিয়োগ করাও তার পক্ষে দুঃসাধ্য। মাঝে মাঝে কাজ যাও বা জোটে মজুরী তার যৎসামান্য। কোথাকার কোন মহারাজার প্রাসাদ-অলিন্দ সজ্জিত হবে সোপস্টোন-খচিত কারু-কার্যে। ঠিকাদার মোটা পয়সাই এতে কামাচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু উদরান্নের জন্যে অসহায় শিল্পীকে দিনমজুরের রোজগার নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। দুটি রিপোর্টে বিবৃত উপরের ঘটনা-গুলোই আজকের হৃতগৌরব ওড়িয়া শিল্পীর জীবনের বাস্তব চিত্র।

জাতীয় স্বার্থের বৃহত্তর দিক থেকেই যে দুরবস্থার আশু নিরসন প্রয়োজন,

সে সম্বন্ধে আজ দ্বিমত থাকতে পারে না। পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার পর যে এ বিষয়ে সকলেরই দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে, তা-ও অনস্বীকার্য। সরকারের দায়িত্ব এ-ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী হলেও, দেশের জনসাধারণকে শিল্প-সচেতন মনোভাব নিয়ে সমগ্র সমস্যাটি প্রণিধান করতে হবে। তাই সময়োচিত সাবধানতা ও সমস্যা-সমাধানের কার্যকর পন্থা অবলম্বনের প্রশ্নটি এত জরুরী। শুধু অন্তর্দেশীয় নয়, বৈদেশিক বাজারেও বিভিন্ন ভারতীয় শিল্পের ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টির আজ অত্যন্ত প্রয়োজন। ভারত শিল্পে নতুন প্রাণসঞ্চারের প্রশ্ন ছাড়াও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ব্যাপার হিসেবেও বিষয়টি আমাদের জাতীয় অর্থনীতির দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও অনুধাবনযোগ্য।

[প্রবন্ধে ব্যবহৃত আলোকচিত্রসমূহ আশুতোষ মিউজিয়মের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

চক্রদত্ত

লোমশ শরীর পুরুষদের পক্ষে অশোভন নয় কিন্তু মেয়েদের বেলায় এটা শুধু যে অশোভন তা নয়, খুবই দৃষ্টি-কটু। অনেক জাতের মেয়েদের শরীরে বিশেষ করে মুখে খুব বেশীরকম লোম দেখতে পাওয়া যায়। এটা বহু কারণে হতে পারে। এখানে সে কারণ নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই। এইসব লোম বিভিন্ন উপায়ে নষ্ট করার অনেক পদ্ধতি আছে। তার মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি এবং বিনা যন্ত্রণায় এগুলো এক্স-রে'এর সাহায্যে নষ্ট করা যায়। ডাক্তাররা এই উপায়ে লোম নষ্ট করার কুফল কি সেটাও ব'লে দিচ্ছেন। এক্স-রে'র সাহায্য নিলে পরে শরীরের চামড়া কু'চকে যেতে পারে, এমন কি পরে ঐসব স্থানে ক্যানসার রোগও হতে পারে। ডাক্তারদের মতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে এদের নষ্ট করা সবচেয়ে ভাল। অবশ্য এই পদ্ধতিতে খরচ এবং সময় বেশী লাগে। তাছাড়া, বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এই চিকিৎসা করাতে হয়। প্রত্যেকটি লোমকূপের ভেতর একটি সরু ছুঁচের দ্বারা বিদ্যুৎ চালনা করে লোম গজাবার অংশটি নষ্ট করে ফেলা হয়। একবারে ১৫টির বেশী লোম এইভাবে নষ্ট করা সম্ভব নয়। ডাক্তাররা বলেন যে, সাময়িকভাবে লোম নষ্ট করতে গেলে বিরঞ্জন (bleaching) করা ভাল। তবে লোম কামিয়ে ফেলা কোন সময় উচিত নয় কারণ এতে ক্রমশ লোম শক্ত এবং মোটা হয়ে যেতে থাকে।

*

ঘরে ঢুকতে হলে সাধারণত দরজার গোড়ায় রাখা পাপোশে পা পরিষ্কার করে নিয়ে আমরা ঘরের ভেতরে ঢুকি। এইসব পাপোশ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। সাধারণত এগুলো নারকোলের ছোবড়ার অথবা তারের তৈরী হয়। বর্তমানে এই পাপোশকে আরো উন্নত করা হয়েছে এক নতুন উপায়ে। এই পাপোশ বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত। একটা লোহার ছোট ছোট

বিদ্যুৎ চালিত পাপোশ

খুপরি করা ফ্রেমের নিচে অনেকগুলো কু'চি লাগান আছে। এই কু'চিগুলি এমনভাবে লাগান হয়েছে যে, কোন লোক এই ফ্রেমের উপর দাঁড়ান মাত্রই বিদ্যুতের সাহায্যে নিচের কু'চিগুলো সামনে আর পিছনে নড়তে থাকবে আর সঙ্গে সঙ্গে জুতোর তলা থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলতে থাকবে। ধুলোটা পাপোশটার নিচে লাগান একটা ট্রেতে গিয়ে পড়ে। পরে এই ধুলো সুদ্ধ ট্রেটা তলা থেকে বার করে নিয়ে ধুলোটাকে ফেলে দেওয়া হয়। পাপোশটায় এমন বন্দোবস্ত করা আছে যে, লোহার ফ্রেমটার ওপর কোন লোক দাঁড়ালে তবে এটা বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সঙ্গে সংযোগ হয়।

*

আগাছা কি জলে কি স্থলে উচ্ছেদ করা এক সমস্যা। এই ধরনের আগাছা দূর করবার জন্য নিত্য নতুন উপায় বার করা হচ্ছে। এর মধ্যে বর্তমানে রাসায়নিক পদ্ধতিতে এদের ধ্বংস করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক একটি বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন লাঠির সাহায্যে এইসব আগাছা ধ্বংস করছেন। তিনি সাধারণ বেড়াবার ধরনের লাঠির ডগার দিকে একটা ধাতব ছুঁচের মত জিনিস লাগিয়ে নিয়েছেন। তারপর ১,২০০ ভোল্টের বিদ্যুৎ এর মধ্যে একটা বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্র থেকে চালনা করা হয়। এই অবস্থায় লাঠির ডগাটি আগাছার ওপর ঠেকান হয় আর সঙ্গে সঙ্গে গাছের কাণ্ড এবং শিকড় তড়িতাহত হয়ে মরে যায়।

*

রাত্রে যে সব কীট-পতঙ্গ উড়ে বেড়ায়, মানুষের মতে তারা নাকি রাত-কাণা। আসলে কিন্তু তারা একেবারে কাণা নয়, আলোর মধ্যের নীল আলো ও আলট্রাভায়োলেট রে সম্বন্ধে এদের চোখ বিশেষ সচেতন। এই তথ্যটি জানা থাকায় মানুষের বিশেষ সুবিধা হয়েছে। সন্ধ্যেবেলায় কীট-পতঙ্গরা আলোর চারিদিকে এত বেশী জমা হয় যে, আমাদের বিশেষ অসুবিধা হয়। ইলেকট্রিক কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ারদের মত যে, এইসব পোকামাকড়ের উপদ্রব থেকে রেহাই পেতে হলে এমন ধরনের আলো ব্যবহার করা উচিত, যার থেকে নীল আলো এবং আলট্রাভায়োলেট রে বার হবে না।

মানুষ

সুশীল রায়

মানুষের উপর শ্রদ্ধা যা'তে রাখতে পারি তার জন্যে কিছুদিন থেকে মনের উপর ভীষণ জুলুম চলেছে। কিন্তু হার হয়েছে আমার, আমি পেরে উঠি নি। মানুষের উপর শ্রদ্ধা আমি হারিয়েছি।

এটা যে কি মর্মান্তিক অবস্থা তা সকলের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আমার মত আর কেউ যদি শ্রদ্ধা হারিয়ে থাকেন তাহ'লে কেবল তিনিই এ অবস্থাটা বুঝতে পারবেন।

শিশুকালে যখন বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে প্রথম আলাপ শুরু হল, তখন থেকেই তার ফাঁকে ফাঁকে মানুষের মহত্বের বর্ণনা ছড়ানো দেখতে পেয়েছি। শুনেছি, পৃথিবীতে মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব, মানুষই পৃথিবীর সংস্কৃতির সভ্যতার শিক্ষার সাহিত্যের সঙ্গীতের শিল্পের একমাত্র ধারক ও বাহক। বাল্যকাল থেকে এই কথা প্রত্যহ নানাভাবে শুনেছি, পড়ছি। এতে ঐ ধারণাটা একেবারে অস্থি ভেদ ক'রে মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল। কোনো প্রতিবাদ না ক'রে নির্বিকারে ওই কথার শতকরা এক শো ভাগ মেনে নিয়েছিলাম।

কিন্তু হঠাৎ আমার মত বদলে গেছে কিছুদিন হ'ল। আমি এবার ধরতে পেরেছি—যাকে বলে সুপরিকল্পিত কনস্পিরেসি, সেইরকম একটা চক্রান্তে এতদিন জড়িয়ে পড়েছিলাম আমিও।

এবার ভেবে দেখার সময় এসেছে, মানুষের এসব কথা ঠিক কি না, এবং মানুষ প্রকৃতই পৃথিবীর সেরা জীব কি না।

মানুষের এমন সুপরিকল্পিত ও সুপরিচালিত ষড়যন্ত্রে পড়ে আমার মত এমন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকেও বানচাল হয়ে যেতে হয়েছিল। এই কথা ভেবে এখন নিজেকেই নিজে করুণা করি। এতদিন এই চক্রান্তটা আমার পক্ষেও ধরা সম্ভব হয় নি। ধরা তো সম্ভব হয়ই নি, এটা যে সত্যিই একটা চক্রান্ত, এতদিন এ সন্দেহও বিন্দুবিসর্গ আমার হয় নি। কিন্তু লাভ হয়েছে একটা—আত্মপ্রচার কৌশলের নিপুণ টেক্নিক সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা লাভ করেছি। মানুষের এই প্রচারের প্রভাবে আমিও এতদিন বেকুব হয়ে বসে ছিলাম, এবং আগেই বলেছি, এর সব কথা শতকরা এক শো ভাগ নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাস ক'রে আরামেই দিন কাটাচ্ছিলাম।

মানুষ যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সেরা জীব—এ কথা কে বলেছে? বুদ্ধিতে বিদ্যায় জ্ঞানে চিন্তায় চেষ্টায় মননে গবেষণায় ধ্যানে আরাধনায় মহত্ত্বে বীরত্বে ইত্যাদি বিবিধ মর্ম ও কর্মক্ষেত্রে মানুষ যে সেরা জীব—মানুষের সম্বন্ধে একথা মানুষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো জীব কোনোদিন বলেছে কি না, কয়েকদিন ধ'রে তন্ন তন্ন ক'রে আমি তা খুঁজে বেড়িয়েছি। দুর্ভাগ্য আমার এবং সেই সঙ্গে মনুষ্যেতর অন্যান্য জীবের যে, একথা মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জীবের জবানিতে কোথাও পাইনি। যেখানেই মানুষের গুণকীর্তন দেখেছি, সেইখানেই দেখেছি তার নীচে স্বাক্ষর আছে মানুষেরই। আত্মপ্রচার-কৌশলের এমন জ্বলন্ত ও জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত, পৃথিবীতে তো নেই-ই, অন্য কোনো গ্রহে-উপগ্রহে আছে কি না জানি নে। পৃথিবীর অন্য-সব জীবকে বোবা বানিয়ে রেখে মানুষ নিজেই নিজের কীর্তির জয়গান নিয়ে আত্মহারা। শুধু বোবা নয়, পৃথিবী শুদ্ধ জীবকে মানুষ বোকা বানিয়ে রেখেছে। আমিও এতদিন অবিকল অমনি বেকুব ব'নে ছিলাম, নিজের এই অবস্থার কথা ভেবে সত্যিই আজ নিজের উপরেই করুণা হয়।

মানুষ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব কেন? মানুষ নাকি বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যের ধারক ও বাহক। "জগতের মাঝে এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষজাতি"—কেবল এই কথা ব'লে কোনো কবি যদি উল্লাস প্রকাশ করেন, তাহলে সে উল্লাসে বাধা দেবারও কিছু নেই, আপত্তি জানাবারও কিছু নেই। কিন্তু যখন সেই সঙ্গে যোগ ক'রে বলা হয় যে, সেই মানুষজাতিই পৃথিবীর মহত্তম জীব, তখনই প্রতিবাদ জানাতে হয়। কলে-কৌশলে মানুষ পৃথিবীটাকে নিজের করতলগত করতে পেরেছে ব'লে আমরা তার এত দাপট দেখছি এবং সেই দাপট দেখে অভিভূত হয়ে হয়তো বাধ্য হয়ে বলেও ফেলছি যে, আহা, এমন আশ্চর্য জীব সংসারে আর নেই।

মানুষ এ পৃথিবীর সকল বৈচিত্র্যের ধারক ও বাহকই বটে। সকল বৈচিত্র্য মিলিয়ে-মিশিয়ে মানুষ যে একটা বিচিত্র জীব হয়ে উঠেছে, এতে আর সন্দেহ কি। সংসারের যত রকমের হীনতা নীচতা শঠতা খলতা আছে, তার আধার মানুষ ছাড়া আর কেউ নয়।

কেউ কাউকে বড় হয়ে মানুষ হবার জন্যে আশীর্বাদ করলে আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠি। আমার মনে হয়, ঐ আশীর্বাদটা ভাষার আশীর্বাদ, কিন্তু কাজের অভিশাপ ছাড়া কিছু না।

সেদিন একটা জনসভার খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে দেখি সেটা আসলে মানুষ-সভা—কাতারে কাতারে মানুষ এসে ভিড় করেছে। ওই মানুষের একজন মুখপাত্র অনুচ্চ মঞ্চে দাঁড়িয়ে সারা গায়ে ঝাঁকি দিয়ে হাত নেড়ে অনর্গল চীৎকার ক'রে চলেছেন। প্রতি কথার শেষে তিনি একবার ক'রে চেঁচিয়ে উঠছেন, বলছেন—'আমরা যেন ভুলে না যাই যে, আমরা মানুষ।' তাঁর এই কথায় সকলে উল্লসিত হয়ে করতালি দিচ্ছে। তিনি এতে আরো উৎসাহিত হয়ে মানুষের গুণাবলীর ব্যাখ্যা করে চলেছেন বিপুল উদ্যমে। এর একটু দূরে ফাঁকায় ছিলেম আমি এবং আমার পাশেই একটি সারমেয়। মানুষের এই কলরব শুনে সে জিভ বার করে হাঁফাতে লাগল এবং একটু পরে আকাশের দিকে মুখ উঁচু করে তার নিজের ভাষায় দু'বার শব্দ করল। ওর ভাষা বুঝলাম না, কিন্তু মনে হল, ও যেন এসব কথার প্রতিবাদ জানিয়ে রাখল।

মানুষের সভা ভেঙে গেল, তারা যেন রণজয় করেছে—এমনি ভঙ্গিতে বীরদর্পে ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ ক'রে চলে যেতে লাগল। ক্রমে স্থানটি শূন্য হয়ে গেল, কিন্তু অবশিষ্ট পড়ে রইলাম আমরা—আমরা দুজন। আমার সঙ্গী কি ভাবল জানিনে, কিন্তু আমার বড় মজা লাগল। মনে হ'ল, বেশ আছে এরা। নিজেরাই নিজেদের পিঠ চাপড়ে দিয়ে কী আরামটাই ওরা পেয়ে গেল এখান থেকে। ওদের রকম-সকম দেখে ওদের উপর অসীম করুণা হ'ল আমার। কিন্তু কে ঘাঁটাতে যাবে ওদের? ওদের মত হিংস্র জীব পৃথিবীতে কি আর আছে?

লাখ লাখ সিংহকে কোনো সিংহবাহিনী মেরেছে, ব্যাঘ্রকে ব্যাঘ্রবাহিনী হনন করেছে, হস্তীযূথকে হস্তীপাল নিহত ক'রেছে—এমন নজির নেই; অন্তত আমি জানিনে। কিন্তু মানুষের বাহিনীকে মনুষ্যবাহিনী প্ল্যান ক'রে মেরে ফেলেছে, এর নজির আছে অজস্র। কেবল মারা নয়, মানুষকে মেরে বীর নামে পূজিতও হয়েছে ও হচ্ছে মানুষ। এ হেন জীবকে যদি পৃথিবীর সেরা জীব বলে মেনে নিতে হয়, তাহলে অচিরে এ পৃথিবী নিপাত যাক।

বড় বড় জীবের কথা না হয় বাদ থাক, ছোট ছোট যেসব জীবের প্রতি মানুষের অবজ্ঞা সবচেয়ে বেশি, সেইসব হেয় এবং পদদলিত জীবেরাও মানুষের এই চরম বর্বরতার কথা জানতে পারলে লজ্জায় যে অধোমুখ হবে, এতে সন্দেহ কি।

আমার মনে হয়, মানুষ তার নিজের নীচতা হীনতা ও দুর্বলতার সম্বন্ধে সচেতন; এই জন্যেই সে সেসব ক্ষুদ্রতা চাপা দেবার চেষ্টাতেই এত হৈ-চৈ ক'রে নিজের মহিমা-প্রচারে এমন মুখর। চক্ষুলজ্জার বালাই রাখলে পদে পদে বাধার সম্ভাবনা, তাই সম্ভবত বেপরোয়া হয়ে মানুষকে এমন বেহায়া সাজতে হয়েছে। আশপাশের অন্যান্য জীব কে কি মনে করবে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে মানুষকে তাই নিজের কথা নিয়ে এত মত্ত থাকতে হচ্ছে।

আমার মনে হচ্ছে, মানুষের দিন আর বেশিদিন নেই। যাকে বলে এক্সপোজড্ হয়ে পড়া—মানুষের অবস্থা ক্রমশ তাই হচ্ছে। আজ আমার চোখ খুলেছে। আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে সে, কাল আরো পাঁচজনের চোখ যে খুলবে না—একথা বলল কে।

আমি যতই ভাবছি, মানুষের বিরুদ্ধে আমার মনের উত্তাপ ততই বেড়ে চলেছে। কোনো মানুষ বর্বরের মত কোনো কাজ ক'রে যখনই হাতে-নাতে ধরা পড়ে যায়, তখনই চালাকি করে অন্যান্য মানুষেরা তার সেই বর্বর কাজের নাম দেয় পাশবিক। যেন এ কাজ মানুষের করণীয় নয়, পশুদেরই একচেটে। পশুরা নেহাৎ ভদ্র বলতে হবে, তা না হলে মানুষের এতদিন নিস্তার ছিল না। মানুষের দেওয়া এই অপবাদের কথা তাদের মধ্যে কারো-না-কারো কানে নিশ্চয় পৌঁছেছে, কিন্তু কই, তারা তো একদিনও এজন্যে কোনো মানুষের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করে নি। তাদের ভদ্রতাই কেবল নয়, এতে তাদের ধৈর্যের ও শালীনতার পরিচয়ও যথেষ্ট আছে। এর বিপরীতটা যদি হ'ত, তাহলে পৃথিবীতে একটা বিপরীত ঘটনা যে ঘটতই—এ বিষয় আমি নিশ্চিত। মানুষ তাহলে তার সমস্ত শক্তি একত্রে জমাট করে পশু-সংসারকে উচ্ছন্নে পাঠাবার জন্যে দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং এই মহৎ কাজে আত্মনিয়োগের জন্যে স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকার অভাবও ঘটত না। পাশবিক নাম দিয়ে যে কাজের পরিচয় মানুষ দিয়ে থাকে, বলা বাহুল্য, সে কাজ পশুরা কখনো করে না; সে কাজ কেবল মানুষের দ্বারাই সাধ্য।

মানুষের গুণকীর্তন করতে মানুষের হাঁফ ধরে না, কিন্তু তার এই গুণকীর্তন করতে করতে আমার হাত ব্যথা হয়ে যাচ্ছে, কলমের কালি যাচ্ছে শুকিয়ে। মানুষের বিপরীত গুণের তালিকা এত লম্বা যে, সে তালিকা তৈরি করা একটা কলমের সাধ্য কি। এখানে মাত্র তার আভাসই কেবল দেওয়া যায়।

নিঃসন্দেহে মানুষ একটি বিচিত্র জীব। মানুষেতর অন্যান্য জীবের খাদ্যের মধ্যে নির্দিষ্ট একটা নিয়ম আছে। মানুষ পৃথিবীর সেরা জীব ব'লে সে সে-নিয়মের বালাই মানে না। লতাপাতা থেকে আরম্ভ ক'রে জন্তু-জানোয়ার সবই মানুষের মুখরোচক খাদ্য। মানুষকে তাই আমার সর্বভুক ব'লে মনে হয়। কিন্তু এ কথাটার নাকি আলাদা একটা মানে আছে; তাই নিজেকে শুধরে নিয়ে আমি মানুষকে সর্বাহারী বলে থাকি।

সার্কাস-পার্টির সিংহ, ব্যাঘ্র, ভাল্লুক, হস্তী ইত্যাদি নানা জীব আমি দেখেছি। তারা সাইকেল চালায় লম্ফঝম্প দেয়, তারের খেলা দেখায়, সিগারেট টানে—কত কিছুই তারা করে। বনে-জঙ্গলে তাদের যা করণীয় নয়, এখানে এসে মানুষের পাল্লায় প'ড়ে সে সবই তাদের করতে হয়। কিন্তু এজন্যে তাদের আলাদা কোনো খাতির বা পৃথক কোনো খাদ্যতালিকা নেই। বনে থেকে তারা সংগ্রহ করে যা খায়, খাঁচায় থেকে তারা পরিমাণে পায় তার চেয়ে অনেক কম। কিন্তু মানুষ? যেই তারা কয়েকটা কসরৎ বেশি দেখাল, কোনো কুস্তির আখড়ায় দুটো রদ্দা বেশি দিতে পারল, অমনি তার চেহারা গেল বদলে, খাদ্য-তালিকা হয়ে গেল প্রকাণ্ড লম্বা। সেই তালিকা অনুযায়ী খাওয়া দূরের কথা, সেই তালিকার দিকে তাকালেই মাথা ঝিমঝিম করে।

মানুষ ও পশু—এই দুই জীবকে পাশাপাশি রেখে তাদের দোষ-গুণ বিচার করে আমি নিঃসংশয় হয়েছি যে, পশু অশ্রেষ্ঠ জীব নয়। অশ্রেষ্ঠ তো নয়ই, বরঞ্চ মানুষের তৈরি কানুন অনুযায়ী তারাই সেরা জীব। মানুষ জানায় যে, আত্মপ্রচারের মত হীন কাজ নেই, নিজের গুণের কথা নিজের মুখে বলা পাপ। সমস্ত পশু-সংসার এই নিয়ম মেনে চলেছে; কিন্তু মানুষ সে নিয়মের ধার ধারে না। আসলে আত্মপ্রচার করাই তার একমাত্র কাজ।

এইসব দেখে-শুনে কেবল অশ্রদ্ধা নয়, মানুষের উপর আমার ঘৃণা ধরে গেছে। জানি, আমার অবস্থা শোচনীয়—আমার এইসব কথা শুনে ক্ষিপ্ত মানুষের দল আমার উপর প্রতিহিংসা নেবে সাংঘাতিক ভাবেই।

তা নিক্। তাদের সেই প্রতিহিংসা এড়িয়ে যদি প্রাণে বেঁচে বড় হতে পারি, তবু প্রার্থনা করব এই যে, বড় হয়ে আর যা-ই হই না কেন, বড় হয়ে যেন কিছুতে মানুষ না হই।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তারপর শুধু নাচ। সন্ন্যাসীর দিক থেকে চোখ ও কান দুই-ই চলে গেল রামজীদাসীর দিকে। তবু, সন্ন্যাসীকে ছাড়তে মন চাইছে না। একটা তীব্র ও চাপা কৌতূহল অদৃশ্য চুম্বকের মত টেনে রেখেছে আমাকে। টেনে রেখেছে রুক্মিণী আর মনিয়াবাঈ। শুনতে পাচ্ছি, সন্ন্যাসী বিড়বিড় করছে আপন মনে। অস্পষ্ট কথা আর চাপা হাসি।

তবুও মন ভাসিয়ে নিয়ে গেল রামজীদাসী। রামজীদাসীর নাচ। নাচ আর বাজনা। সরোদ বাজছে। বাজছে যেন স্রোতস্বিনীর টানে, কিনারে কিনারে নুড়িমালার রিনিঠিনি। তার সংগে তবলা সংগত। রামজীদাসীর পদক্ষেপের তালে তালে একজন হাতে নিয়ে ঝঙ্কার দিচ্ছে নূপুরের গোছা।

যন্ত্রসংগীতের এই সুর যেন একটি ছবি। একটি নিখুঁত প্রাকৃতিক দৃশ্য। নিরন্তর তানপুরা-ধ্বনি যেন ছবির পেছনের বিস্তৃত অসীম নীল আকাশ। কোলে তার একটি রূপের দ্যোতি। রামজীদাসী।

ভাবের ঘোরে নাচ নয়। নাচে লেগেছে এবার ভাবের ঘোর। কথা ফুটছে নাচের ছন্দে। সেই নিঃশব্দ কথাঃ হাসি ও আনন্দের, বেদনা ও অভিমানের। কখনো নির্বাক ব্যথা ব্যক্ত হয়ে পড়ছে দেহ ভঙ্গিতে। নিথর আড়ষ্ট বঙ্কিম দেহ। তারপরে অকস্মাৎ ব্যথার পাথর সরিয়ে নির্ঝরিণী ছলছল। সর্বাঙ্গ আনন্দে থরথর কম্পিত কিংবা কপট অভিমানে চটুল নারী চোখে হাত দিয়ে খেলে আঁখিমিচোলি। আবার ভক্তি উচ্ছ্বাসে মাটিতে লুটনো প্রণাম।

রামকে নিয়ে রামজীদাসীর লীলা। নির্বাক বিস্ময়ে ছেলে তিনটি গোল গোল চোখে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। রাম লক্ষ্মণ আর সীতা। বেচারীরা অন্যদিকে তাকাবার অবসরও পাচ্ছে না একটু।

আর জানিনে, ভক্তি উচ্ছ্বাসে কতখানি মেতে উঠেছে মণ্ডপের নরনারী। কিন্তু অভূতপূর্ব স্তব্ধতা বিরাজ করছে সর্বত্র। মোহমুগ্ধ নির্বাক সকলে। যেন তাদেরই নির্বাক হৃদয়ের তালে তালে নাচছে রামজীদাসী।

ভিড় হয়েছে প্রচণ্ড। গেটের সামনে আর বেড়ার ধারে ধারে গিজগিজ করছে কৌতূহলী দর্শকের ভিড়। সারা কুম্ভ মেলাটাই ভেঙ্গে পড়েছে যেন রামজীদাসীর নৃত্য আসরে।

পাশ থেকে সন্ন্যাসী হেসে বলল, একদিন যার নাচ দেখার জন্য লাখপতি ধর্না দিত বন্ধ দরজায়, আজ সে মেলার মাঝে নেচে নেচে ভগবানের সেবা করছে।

'লাখপতি ধর্না দিত!' সন্ন্যাসীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই রামজীদাসীর নাচ দেখার জন্য?' সন্ন্যাসী বক্র হেসে, গম্ভীর গলায় বলল, 'ছি বাবুজী, রামদাসী বলতে আছে। আমি বলছি মনিয়াবাঈয়ের কথা। লক্ষ্ণৌয়ের মানিয়াবাঈ। রূপে যার জুড়ি ছিল না দিল্লী লক্ষ্ণৌয়ের বাঈজীকুলে। মনিয়াবাঈ। কেউ কেউ বলত রুক্মিণী। কার ফুলে মধু আছে, ভ্রমর ছাড়া কোন্ রসিক তার সংবাদ রাখে। কলকাতা থেকে বোম্বাইয়ের রসিক ভ্রমরেরা আসত ছুটে, মনিয়াবাঈয়ের সন্ধানে। সংবাদ চাপা থাকতো না তাদের কাছে। কেউ দেখা পেত, কেউ পেত না। সহজ কথা? একি সেই লড়কী, সেই অওরত, যে সড়ক-কি-কিনারে পেতেছে আপনা বেসাতি। হাসি যার ঠোঁটে লেগে থাকে, নাগরকে খুশী করা ছল-কথা যার মুখে ঝরে হরবখত? নহি নহি বাবুজী। সেরকম বাঈজী ছিল না মনিয়াবাঈ। গানের কলি দিয়ে ভোলানো? আরে রাম রাম!'

বলতে বলতে কিছু ভাবান্তর ঘটল সন্ন্যাসীর মুখে। বক্র হাসিটি চাপা ব্যথায় করুণ হয়ে উঠেছে। যদি ঠিক দেখে থাকি, যদি ভুল না হয়ে থাকে, তবে দেখেছি ঠিক। দেখলাম, কোন্ এক সুদূরের বুকে নিবদ্ধ তার দৃষ্টি। যেন কোন এক দূর মঞ্চে, কি এক খেলা দেখছে সে। দেখছে, আর তার চোখে সে খেলারই আলোছায়ার ঝিলিমিলি। তার কথাগুলি বুঝলাম। কিন্তু ব্যক্ত করতে পারব না তার ভাষায়। ঠেট্ হিন্দি নয়। গ্রাম্য ভাষার মধ্যে গ্রাম্য অলঙ্কার দিয়ে কবিতা-আবৃত্তির মত হিন্দিতে বলল সে। বলল, 'বাবুজী মানো, অনেক খেলা ভগবান আমাদের দেখাচ্ছে। মনিয়াবাঈকে দিয়ে ভগবান আমাদের একটা খেলা দেখিয়েছে। মনিয়াবাঈ সোনার পালঙ্কে বসে মহারাণীর আদর পেয়েছে, কিন্তু বুকের ভেতর তার আঁকা ছিল রঘুনন্দনের মূর্তি। রঘুনন্দন!' যেন সে ডাক দিল রঘুনন্দনকে। জানিনে কে সেই রঘুনন্দন। ব্যাকুল গলায়, জোড় হাতে বলল সন্ন্যাসী, 'হে মহাপ্রাণ, সাধক-গুরু, আমার প্রণাম নাও।' বলে সে চুপ করল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'রঘুনন্দন কে?'

বলল, 'সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী, কিন্তু কপনি এঁটে জটা বাঁধবার জন্য? চোখ পাকিয়ে খালি ব্যোম্ ব্যোম্? উঁহু, বাবুজী, সন্ন্যাসী রঘুনন্দনের মধ্যে প্রেমাবতার বাসা নিয়েছিল। যে তার কথা শুনেছে, প্রাণ জুড়িয়েছে তার। মনে হত, যুগ যুগান্তের কোন্ সিদ্ধাচার্য নতুন রূপে এসে দাঁড়িয়েছে তোমার সামনে। সেই রঘুনন্দনের ছায়া পড়েছিল মনিয়াবাঈয়ের বুকে। পরছায়া নয়। রঘুনন্দনের সাচ্চা ছায়া। যত ঝাড়ো, যত মারো, যত বুক চাপড়াও, সে ছায়া সরবে না। আগুনে ঝাঁপ দেবে? তোমার ছাইয়ের, তোমার আত্মার মধ্যে বিরাজ করবে সে। হা-হা-হা ......লক্ষ্ণৌয়ের রাজ ইমারত, বিজলীবাত্তি

আর সোনার খাট। হীরা জহরতে ভরা মনিয়াবাঈয়ের সর্বাঙ্গ। বাবুজী, লালসামন্ত পাগলেরা বাঈজীর খোলা গায়ে মদ ঢেলেছে। তার সুন্দর পা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা পড়েছে সেই মদ। লোভী কুকুরের মত কামাসক্ত মানুষ তাই চেটেছে। মানুষ নয়, জানোয়ার। জানোয়ারের উল্লাস। যৌবন যার ক্ষেত-জমিনের মাটির ঢালা। আজকে পাথরের মত শক্ত, কালকের বর্ষায় সে কাদা হয়ে গলে যাবে। আর এই জানোয়ারের মাঝে পাগলীর মত খিলখিল করে হেসেছে নটী মনিয়াবাঈ। হেসেছে, নেচেছে, গান করেছে। তারপর জিন্ পাওয়া অওরতের মত চীৎকার করেছে, লণ্ডভণ্ড করেছে ঘরদোর, ভেঙ্গে দিয়েছে সভা। সে ভৈরবী মূর্তি দেখে পালিয়েছে কামার্ত পশুরা। মনিয়াবাঈয়ের আর এক নাম ছিল পাগলী বাঈজী। তার রূপ ছিল তার পাপ। সেই পাপের মধ্যে লুকিয়ে ছিল আলো। সেই আলো যখন জ্বলে উঠত পাপের ভারে, মনিয়া তখন পাগলী হত। হবে না! আরে বাপরে। রঘুনন্দন এসে দাঁড়াতে যে তার সামনে। তার দিব্য-দৃষ্টির সামনে। তাকে বুকে নিত, আদর করত, সোহাগ করত। তারপর একদিন—বলতে বলতে সে থামল আচমকা। যেন কি কথা মনে পড়েছে হঠাৎ। চাপা উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, 'মগর, আখেরি নতিজা কেয়া মিলি? বাবুজী, দেখ, দেখ তো রামজীদাসীকে। হাত রাখো নিজের বুকে। রেখে বল, কি দেখছ? কি ভাবছ? তোমার মনের মধ্যে এক ছোট্ট রংদার চিড়িয়া পাখা ঝাপ্টা দিচ্ছে, না? আরে, সরমাচ্ছো কেন বাবুজী? লজ্জা কি? ওই চিড়িয়া তোমার বাসনার সুন্দর মূর্তি। তোমার নয় সকলের। সকলের মনেই ওই বিহঙ্গ ছটফট করছে। করবে না? ওই রূপ! ওই বেশ। উর্বশীর জীবন্ত ছায়া।

রামজীদাসী নামে, বুকের মধ্যে ধিকি ধিকি, ধুকু ধুকু। নিজের মন চেনে ক'জনা? গৃহী বাদ। সন্ন্যাসী? মন চেনে ক'জনা? মন দেখে ক'জনা? বাসনা মরেছে ক'জনার? রামজীদাসী নয়, আগুনের পিছে ছুটছে সব। প্রকৃতি একটা শোধ নিচ্ছে ওই রহস্যময়ীকে দিয়ে। ভগবানের মুখে চুন কালি মাখাতে চাইছে। শুনলে লোকে হাসবে, রাগ করবে। লোকে শুধু ওইটুকুই জানে। থাক্ থাক্ ওসব কথা।'

সন্ন্যাসী চুপ করল। দাঁড়িয়েছিল একটা বাঁশ ধরে। সেটা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল এবার। গলায় তার রুদ্রাক্ষের মালা। রুদ্রাক্ষের কুণ্ডল কানে, বলিষ্ঠ হাতে বালা রুদ্রাক্ষের। কপালে অস্পষ্ট পুণ্ড-রেখা।

সন্ন্যাসী থামল। কিন্তু আমার মন থামেনি। সে তার সবটুকু অনুভূতি দিয়ে কান খাড়া করে রইল। দেখছি, রামজীদাসী হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখ দেখতে পাচ্ছিনে। পেছন ফিরে রয়েছে। হয়তো নিমীলিত চোখ, মুখে বিশ্বভোলানো হাসি। পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছি, রুপোলী পাড়ের বেষ্টনী ঘিরে রয়েছে তীব্র রেখাঙ্কিত দেহ। তাকে দু' ভাগে ভাগ করে নেমে এসেছে সুদীর্ঘ কালো বেণী। আর কীর্তন মণ্ডলেশ্বরের গীতকারেরা সকলে মিলে ধরেছে গান।

রামজীদাসী আর মনিয়াবাঈ। মনিয়াবাঈ আর রঘুনন্দন। সব মিলিয়ে একটা অস্পষ্ট অথচ তীব্র রহস্যের দ্বারে দাঁড়িয়ে আছি উৎকর্ণ হয়ে। অতীত ভারতের এক রহস্য দ্বারের সামনে যেন দাঁড়িয়েছি আমি। যেন বিচিত্র রহস্যে ছেয়ে গিয়েছে সারা কুম্ভমেলা। মনিয়াবাঈ আর সন্ন্যাসী রঘুনন্দনের কাহিনী শোনবার জন্য আকুল মন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'সন্ন্যাসীজী, তারপর?'

বুকের খুলে যাওয়া আবরণ ঢাকা দিল সন্ন্যাসী। হঠাৎ যাওয়ার উদ্যোগ করল। বলল, পুরনো কথা বাবুজী। এ হ'ল সন্ন্যাসীর গুপ্তকথা। আপনাদের শুনতে নেই। ভালও লাগবে না।'

ব'লে সে সত্যি পা বাড়াল। বললাম, 'যদি বাধা না থাকে, তবে শুনতে চাই।'

সন্ন্যাসী তাকাল আমার দিকে। মন-সন্ধানের তীক্ষ্ণতা তার চোখে। বলল, 'আপনার আশ্রমের কোতোয়ালের কাছ থেকে শুনে নেবেন বাবুজী। রামানন্দজীর কাছে। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কারুর অজানা নেই এই কথা।

বলতে বলতে চলে যেতে চায়। মনে হ'ল, অনিচ্ছার ছল-হাসি তার মুখে। হয়তো শুনতে পাব না কিছুই রামানন্দের কাছে। সন্ন্যাসীর কাছ ঘেঁষে এলাম, জানিনে সাধু সন্ন্যাসীর মেজাজ। কখন কোন্ ভাবে বিভোর। বেশী বললে যদি আবার গণ্ডগোল ঘটে। তবু বললাম, ভয়ে ভয়ে, 'অসুবিধে না হ'লে, আপনিই বলুন।'

সন্ন্যাসী বাঁকা হেসে বলল, 'কেন শুনতে চান। এ এক সন্ন্যাসীর প্রেম-কাহিনী। আপনার গৃহী মন বিরূপ হবে।

হয়তো হবে। তবে গৃহী ব'লে নয়। অমানুষিক কাহিনী হ'লে মানুষ দুঃখ পাবে বৈ কি। তবুও মনে বড় কৌতূহল। সন্ন্যাসীর আবার প্রেম। সে কি কথা?

বললাম, 'শুনতে বড় সাধ। সন্ন্যাসীর প্রেম-কথা, এযুগে কখনো শুনিনি।'

সন্ন্যাসী আমার দিকে তাকিয়ে আবার হাসল। হেসে চলতে আরম্ভ করল আশ্রমের গেটের দিকে। বুঝলাম, নীরবে আহবান করছে সে আমাকে। আর একবার দেখলাম রামজীদাসীকে। সত্যি, আগুনই বটে। সভাস্থ নরনারী সকলে অপলক বিস্মিত মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে সেদিকেই।

গেটের কাছে এখনো ভিড়। ভিড় ঠেলে বাইরে এলাম। চারদিকে লোকে লোকারণ্য। যেদিকে তাকাই সেদিকেই লোক। তবে গায়ে গায়ে নয়। সীমাহীন বালু প্রান্তরের আলোকিত মেলায় ছড়ানো মানুষ।

সন্ন্যাসী চলল পূব-দক্ষিণ কোণ বরাবর। সঙ্গমের এক কোণে। যেখানে সরস্বতী আছে আত্মগোপন ক'রে। ওদিকটায় আলো নেই। কিন্তু আকাশে চাঁদ রয়েছে। প্রবল শীত। তবু, উত্তর

প্রদেশের আকাশে এখনো যেন শরতের সমারোহ। সমারোহ শুধু মেঘেরই আনাগোনায়। কুয়াশার আবরণ ভেদ করে দেখা যায় না শরতের ঘোর নীলিমা। ঝুসির উঁচু বুকে অড়হড়ের ক্ষেত। ঘন মেঘের মত লেপটে রয়েছে অস্পষ্ট আলোকিত আকাশে। এদিকটায় বৈদ্যুতিক আলো নেই। কিন্তু মানুষের আনাগোনা কম নয়। অস্পষ্ট ছায়া-মিছিল চলেছে চারদিকে।

যত এগুচ্ছি, বালি তত গভীর মনে হচ্ছে। পা ডুবে যাচ্ছে।

সন্ন্যাসী আমার দিকে ফিরে বলল, 'সন্ন্যাসীর প্রেম-কথা কখনো শোনেননি?'

তার কণ্ঠস্বরে অবাক্ হলাম। এক বিচিত্রভাবে ও সুধায় কথা তার গম্ভীর ও তরল। খুশী ও আনন্দে ভরপুর। বলল, 'সন্ন্যাসীর প্রেম তার ধ্যানে ও ধর্মে। ধর্মে আর কর্মে। তার প্রেম বলে, ওগো দেবী, প্রাণেশ্বরী, প্রেয়সী, সন্ন্যাসিনাং সদা সেব্যং পঞ্চতত্ত্বং বরাননে। তবে গোপনে। গৃহী-জগতের বাইরে। প্রেম থাকবে না কেন? তবে, এই প্রেমে অনেক আড়ম্বর, অনেক আয়োজন। লোকচক্ষে বড় ভয়ের বিষয়!......বসুন বাবুজী, আপনাকে সন্ন্যাসীদের একটি গুপ্ত ক্রিয়ার কথা বলি।'

বলে সে শিশিরসিক্ত বালির উপরেই বসে পড়ল। আমিও বসলাম। আধুনিক শহুরে মনে সাধু সন্ন্যাসীর সবই উদ্ভট ব'লে জানি। তবু কৌতূহল ছাড়তে পারিনে।

সে বলল, 'বাবুজী, সন্ন্যাসীর আছে কুলাচার। কুলাচার কি? আপনি বাঙ্গালী। আপনাদের দেশে কুলাচারী বড় বেশী ছিল। আপনাদের ভক্ত চণ্ডীদাস, কবি-সাধক। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা গেয়েছেন। তিনিও কিন্তু কুলাচারী। কুল তার রজকী। রামী ধোপানি। ব্রাহ্মণী, চণ্ডালী, নটী, ডোমী আর রজকী। এ হ'ল বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের নির্বাচন। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র মতে নয় কুল। ওই পাঁচ, আরও চারটি। বেশ্যা কাপালী, নাপিতানী, গোপিনী। কোন কোন তন্ত্র মতে চৌষট্টি কুলও আছে। যবনীও বাদ যায় না তাতে। এসব সাধনমার্গের গুহ্য পদ্ধতি। তবে, এ সবই তন্ত্রমতে। কিন্তু সন্ন্যাসীর তো তন্ত্র নেই। অনেকে কুলাচার পদ্ধতিতে সাধনা করে থাকে। আপনাকে সন্ন্যাসীদের কথাই বলি।' বলে সে আমার মুখের দিকে তাকাল। বোধ হয়, আমি কি ভাবছি, সেটুকু দেখবার জন্য। কিন্তু এসব বৃত্তান্ত কম বেশী শুনেছি। এতে আমার বিস্ময়ের কিছু ছিল না। আমি শুনতে চাইছিলাম, রঘুনন্দন ও রামজীদাসীর কাহিনী।

সে বলল, 'সন্ন্যাসী আর অবধূতে বড় একটা তফাৎ নেই। এরা অনেকে জ্যোত্-মার্গের সাধন করে। অনেক তার ক্রিয়া কাণ্ড। মূলে বালাসুন্দরী দেবীর আবির্ভাব হ'ল তার কামনা। ঘৃত-কর্পূরের একটি প্রদীপকে তারা পূজো করে। প্রদীপের চারপাশে সাক্ষী থাকেন কালী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হনুমান আর ভৈরব। এ পূজার উপচার হ'ল, প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, মতি ও চক্রী। বুঝতে পারলেন না? মদ, মাংস, মাছ, অন্ন আর পুরি। এ হ'ল গুপ্ত শব্দ। এছাড়া, সপ্তমী ও ষষ্ঠী। গাঁজা আর তামাকু। এ হ'ল জ্যোত্‌মার্গে প্রবেশের পন্থা। যে প্রবেশ করে, তাকে আর একটি ব্রত করতে হয়। তাকে বলে চৈত্র মাসে নবরাত্রি ব্রত। এই ব্রতের দিন সন্ন্যাসী চক্র করে আর গুপ্ত স্থানে মিলিত হয় অওরতের সঙ্গে। এই মিলন হ'ল সন্ন্যাসীর গুপ্ত সাধনের সিঁড়ি। একে ছাড়া চলবে না। এর মধ্যে আছে অনেক যুক্তি, কূট বিষয়। আপনি সব বুঝবেন না বাবুজী।'

সন্ন্যাসীর জ্যোত্‌মার্গ প্রবেশ জানিনে। কিন্তু তন্ত্রের নানান কথা অনেকবার শুনেছি। শুনেছি, আর বারবারই মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে একটি প্রশ্ন, 'এসব কেন, কেন?' যত জিজ্ঞেস করেছি, জবাবগুলি ততই অস্পষ্ট হয়ে এসেছে অনুভূতিতে। বুদ্ধি ও অনুভূতির অগম্য। নানান জনের নানান মত। সাধকের সিদ্ধিলাভের বিচিত্র লীলা। নিতান্ত সামাজিক জীব আমরা। আমাদের বলে, তোমরা বুঝবে না। আর আমরা ভাবি, তবে বুঝব না। শেষ পর্যন্ত যা পাই, সে তো মানুষের আর সাধকের আত্মার তৃপ্তি। এখানেই এত ঘোরপ্যাঁচ। কিন্তু কই, বিকলাঙ্গ বলরামকে, তার কথাকে তো এত জটিল মনে হয়নি। সে যেন পরিচ্ছন্ন একটি সুন্দর মানুষ। তার সঙ্গিনী লক্ষ্মী-দাসীও তেমনি সুন্দর।

প্রতিবাদ করলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'রঘুনন্দনের কি হ'ল?'

সন্ন্যাসী বলল, 'রঘুনন্দন আর রুক্মিণীর কথা বলব ব'লেই এত কথা বললাম। এমনি বললাম বুঝি তোমাকে এসব? তবে, এ বিশ্বসংসারে কিছুই গোপন নেই। তাই বললাম। বাবুজী রামজীদাসীর রূপ দেখে মানুষের চোখ ভুলে যায়। পুরুষের চোখ কিনা। কিন্তু পুরুষের রূপ দেখেও যে মানুষের চোখ ভোলে, তার প্রমাণ ছিল রঘুনন্দন। এই এলাহাবাদেই এক ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে। মানুষ নয়, সাক্ষাৎ শিব-স্বরূপ। শুধু রূপে নয়, গুণেও। সে চোখ তুলে তাকালে গায়ে হাত দিলে সারা দেহে কাঁটা দিয়ে উঠত মানুষের। মন্ত্র তন্ত্র নয়। তার হৃদয়টি ছিল অমনি। তার চরিত্রের গুণে তার কাছে আসতো মানুষ। তোমার ওই নিরঞ্জনী আখড়ার সাধুরা রঘুকে বিদ্রূপ করত, ঠাট্টা করত। বলত, সন্ন্যাস জীবন তোমার নয়। গোঁফ দাড়ি কামিয়ে শাড়ি প'রে নবদ্বীপে চলে যাও। তা' বললে কি হয়? মহাজ্ঞানী রঘুনন্দন। তর্কে হার মেনে রগচটা সন্ন্যাসীরা খালি ত্রিশূল দিয়ে মাটি খোঁচাত।......এই রঘুনন্দনের সঙ্গে রুক্মিণীর দেখা হয়েছিল হরিদ্বারে। রঘু তখন জ্যোত্‌মার্গ সাধন করে নবরাত্র ব্রত উদ্‌যাপনের আয়োজন করছে।

ক্রমশ

ট্রামে-বাসে

কোন্ খাদ্যের কী ফল সে সম্বন্ধে জনসাধারণকে ওয়াকেবহাল করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নাকি সারা ভারতবর্ষে বারোটি রসুইখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন। —"কিন্তু

কোন্ অখাদ্যের কী ফল এবং সেসব কী উপায়ে হজম করে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বেঁচে থাকা যায়, সে সম্বন্ধে একটা সরকারী ব্যবস্থাই জনসাধারণের কাজে লাগতো, কেননা হালে খাদ্যের চেয়ে অখাদ্যের সংগেই আমাদের পরিচয় বেশি" —বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

কলিকাতায় বর্ষা নাবি নাবি করিতেছে এবং আবহাওয়া-তত্ত্ববিদ্‌দের মতে অবিলম্বেই পূর্ণ সমারোহে বর্ষা আসিয়া আসর জাঁকাইয়া বসিবে। —"কিন্তু ইলিশ বাজারে উঠি উঠি করেও উঠছে না, অদূরভবিষ্যতে ঝাঁকা ঝাঁকা ইলিশ বাজারে উঠবে, এমন কথা মিথ্যেবাদী রাখালের মুখ দিয়েও বেরুবে না, সুতরাং বর্ষায় আমাদের কৌতূহল আর নেই। তা ছাড়া শুনলাম ২৯শে এপ্রিল নাকি কোলকাতায় তেজস্ক্রিয় বারিপাতও হয়ে গেছে। সুতরাং বর্ষা যদি এইরূপেই এবারে নাবে, তাহলে 'কোন্ ছেলেরে ঘুমপাড়াতে কে গাহিল গান' তো মনে পড়বেই না, বরং বাপের নাম মনে পড়বে কিনা, সে সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

আগরতলায় এক সংবাদে প্রকাশ, একটি মুরগী নাকি মোরগে রূপান্তরিত হইয়াছে। —"পাইকিরী হারে মেয়েদের পুরুষে রূপান্তর সত্যিই শঙ্কার কারণ। এতে এক ট্রামে-বাসের আসনের সুবিধে ছাড়া তো আর কোন দিক থেকেই কোন সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছিনে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

ইন্দোচীন সমস্যার সমাধানে পাকিস্তান নাকি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। —"একেই বলে আপনি ঠাকুর খেতে পায় না, শঙ্করাকে

ডাকে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

জমিদারী হস্তান্তরের পূর্বে জমিদারগণ তাঁহাদের এলাকার সমস্ত বৃক্ষ কর্তন করিয়া ফেলিতেছেন বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। জনৈক সহযাত্রী একটি অসমর্থিত সংবাদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"কিন্তু তাঁরা তাঁদের স্বহস্তরোপিত বিষবৃক্ষগুলি এখনো প্রাণধরে কাটতে পারছেন না!"

* * *

নিখিল বঙ্গ মহিলা সম্মেলন নারী এবং পুরুষ কর্মীদের মধ্যে বেতনের তারতম্যের নিন্দা করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। —"এই তারতম্যের নিন্দা আমরাও করি, যেমন নিন্দা করি ট্রামে-বাসের নারীদের আসনের প্রতিরক্ষণ ব্যবস্থার"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

পাকিস্তানের বর্তমান পরিবেশে বেতার বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন প্রধান উজীর নিজে —"শুনলাম অনুরোধের আসরটিকে জাঁকিয়ে তোলার জন্যেই নাকি এই ব্যবস্থা হয়েছে। এবারে সাগরপারের গানে গানে সিন্ধুতে ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডাকবে"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

ভাস্কো-ডা-গামার প্রায় চল্লিশটি বাড়ি অবিলম্বে ত্যাগ করিবার জন্য গোয়া সরকার ভাড়াটিয়াদের একটি নোটিশ দিয়াছেন। —"স্বর্গ থেকে কালিকটের জামোরিন এ সংবাদ শুনেছেন কিনা বলা শক্ত এবং শুনে থাকলে তিনি হাসছেন কি কাঁদছেন, তা-ও বলা শক্ত"—বলে শ্যামলাল।

* * *

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের রুশ ভাষায় অনুবাদের আয়োজন চলিতেছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। —"আমেরিকা থেকে অনুরূপ সংবাদ আমরা কিছু পাইনি, তবে চাণক্যের বিশ্বাস নৈব কর্তব্য নীতি তাঁরা যে বহু আগেই গ্রহণ করেছেন, তার প্রমাণের অভাব নেই"—বলেন এক সহযাত্রী।

* * *

স্যার উইনস্টন চার্চিলের একটি কালো হাঁস হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম।

"তাঁর বুনো-হাঁসের পেছনে পেছনে ধাওয়া করার সংবাদ আমরা বহুবারই পেয়েছি পোষা হাঁসের সংবাদ পেলাম এই প্রথম এটা অবশ্যি গুরুতর সংবাদ নয়, হারানো প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ কলমে একটি বিজ্ঞাপনেই হয়ত কাজ হবে"—বলেন বিশুখুড়ো।

জেনেভা কনফারেন্সের সাফল্যের আশা খুব যে বেশি আছে, তা বলা যায় না। কোরিয়ার সমস্যা যেখানে ছিল, সেইখানেই থাকবে বলে মনে হচ্ছে। এর চেয়ে বেশি কিছু আশা বোধ হয় কেউই করেনি। কনফারেন্সের আলোচনা সম্পর্কে সাধারণের আসল ঔৎসুক্য হচ্ছে ইন্দোচীনের সমস্যা নিয়ে। যুদ্ধ থামবে কি থামবে না—এইটে হোল প্রথম প্রশ্ন। কোরিয়ার মতো যদি ইন্দোচীনে ভাগ-রেখা টানা সহজ হোত, তাহলে হয়ত যুদ্ধবিরতির পথ সুগম হোত। কোরিয়াতে সামরিক ভাগাভাগির সঙ্গে সাময়িকভাবে একটা রাজনৈতিক ভাগাভাগিও সম্ভব হয়েছে। উত্তর কোরিয়ায় রুশ ও চীনের আশ্রিত কম্যুনিস্ট গভর্নমেণ্ট এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিনের আশ্রিত সীংম্যান রী'র গভর্নমেণ্ট চলছে। দুভাগ হয়ে থাকল—সেটা কোরিয়ান জাতির দুঃখ, কিন্তু বিভক্ত কোরিয়ার দুই গভর্নমেণ্টের পিছনে যে বড়োদাদারা রয়েছেন, তাঁদের বর্তমান স্থিতাবস্থা থাকতে দিতে বিশেষ আপত্তি নেই। কোরিয়ার ঐক্য কীভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তাই নিয়ে অবশ্য দুপক্ষের মধ্যে বাগবিতণ্ডা চলছে এবং চলবে একপক্ষ একরকম প্রস্তাব করবে, অন্যপক্ষ অন্যরকম করবে, কিন্তু আপাতত উভয়পক্ষ-সম্মত কোন মীমাংসা লাভের সম্ভাবনা নেই। তার প্রধান কারণ এই যে, অবস্থা যেমন আছে, তেমনি থাকাতে পিছনের বড়োদাদাদের আপত্তি নেই। জেনেভা কনফারেন্সের ব্যর্থতার পরে ডক্টর সীংম্যান রী নিশ্চয়ই আবার দু-একটা রণহুংকার ছাড়বেন, কিন্তু আমেরিকা তাঁকে ঠান্ডা করে রাখতে পারবে আশা করে।

ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতির পক্ষে প্রথম মুশকিল হচ্ছে দুপক্ষের মধ্যে সামরিক অধিকারের সীমানা স্থির করা। কারণ ভিয়েৎমীনের গেরিলা প্রায় সারা ইন্দোচীনে ছড়িয়ে আছে। যদি কেবল ভিয়েৎনাম রাজ্যের ভিতর দিয়ে একটা ভাগরেখা টানা যেত এবং ডক্টর হোচি মিন তাতে রাজী থাকতেন, তাহলে

বৈদেশিকী

ফরাসীরা নিশ্চয়ই রাজী হয়ে যেত। কিন্তু তাতে ভিয়েৎমীন রাজী নয়। কেনই-বা হবে? যুদ্ধে তো তারাই জিতছে। ফ্রান্স যেসব সর্ত বলছে, সেগুলো বিজয়ী পক্ষের মুখে শোভা পায়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, ভিয়েৎমীন যা চাইছে—যুদ্ধে তারা যেরূপ সাফল্যলাভ করছে, তাতে চাইতেও পারে—তাতে রাজী হলে ভিয়েৎনাম রাজ্য তো যাবেই, লাওস ও ক্যাম্বোডিয়াতেও ভিয়েৎমীনের পক্ষপাতী দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে, অর্থাৎ সমস্ত ইন্দোচীনই কম্যুনিস্ট-প্রভাবাধীন হয়ে যাবে। লাওস ও ক্যাম্বোডিয়াতেও প্রতিরোধ আন্দোলন আছে, ভিয়েৎমীন চায় যে, সেই প্রতিরোধ আন্দোলনের দাবীও স্বীকার করতে হবে। লাওস ও ক্যাম্বোডিয়াকে যদি সম্পূর্ণ-ভাবে ভিয়েৎমীন ও ভিয়েৎমীন-প্রভাবাধীন গেরিলা থেকে মুক্ত করা যেত, তাহলে ফ্রান্সের পক্ষ থেকে যা চাওয়া হচ্ছে, তা গ্রাহ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকত।

এই দিক থেকে আমেরিকার মনোভাবের একটা মানে বুঝা যায়। মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব জেনেভা কনফারেন্স থেকে সরে আছেন, তাঁর বিশ্বাস জেনেভা কনফারেন্সে কিছু হবে না। ফরাসী পররাষ্ট্রসচিব মঃ বিদো ও বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইডেন চেষ্টা করে দেখতে পারেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা নিরাশ হবেন, কম্যুনিস্টপক্ষের সঙ্গে জেনেভায় কোন মীমাংসা সম্ভব হবে না—এই হলো মার্কিন সরকারের ধারণা। মার্কিন সরকারের মতে, ইন্দোচীনের সামরিক অবস্থা যদি পশ্চিমা শক্তিদের অনুকূলে না আনা যায়, তবে পশ্চিমা শক্তিদের মধ্যে এখন কোন মীমাংসায় কম্যুনিস্টপক্ষকে রাজী করা যাবে না। সেইজন্য আমেরিকা ইন্দোচীনে ফ্রান্সের পক্ষে সরাসরি নেমে পড়ার কথা বৃটেনের কাছে পেড়েছিল। অন্ততপক্ষে একটা হুমকি দেওয়া। হুমকি যে একবারে দেয়া হয়নি তাও নয়, কিন্তু তাতে কাজ হয়নি।

মিঃ ইডেন একটা মিটমাটের চেষ্টায় দৌড়োদৌড়ি করছেন। কিন্তু মিটমাট হবে কেমন করে? আসলে পশ্চিমা শক্তিদের যা দাবী, তা যুদ্ধে হেরে পাওয়া

যায় না। শুনা যাচ্ছে যে, ওপক্ষে মঃ মলোটভের সুর নাকি অপেক্ষাকৃত নরম, মিঃ চৌ এন লাইএর সুর তার চেয়ে চড়া এবং সবচেয়ে চড়া নাকি ভিয়েৎমীন প্রতিনিধির সুর। এটা অসম্ভব নয়, কারণ যুদ্ধ করছে এবং জিতছে ভিয়েৎমীন। বলা বাহুল্য, মঃ মলোটভ তাঁর প্রভাব কতখানি ও কীভাবে প্রয়োগ করছেন, তা সঠিক জানার উপায় নেই, তবে এটা সম্ভব মনে হয় না যে, তিনিও ভিয়েৎমীনকে দিয়ে এমন সব সর্ত স্বীকার করাতে পারবেন, যাতে ভিয়েৎমীনের পক্ষে যুদ্ধের সাফল্যের সুযোগ ব্যর্থ হয়ে যাবে। রুশ গভর্নমেণ্ট নিজেও তা চাইবেন না। তবে মিঃ ইডেন যদি মঃ মলোটভের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়ে থাকেন যে, একটা মিটমাট না হলে আমেরিকাকে ঠেকানো যাবে না এবং তার সংগে সংগে বৃটেনকেও যেতে হবে এবং ঘটনার স্রোত দুর্নিবার গতিতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে যাবে, তাহলে মঃ মলোটভ চীন ও ভিয়েৎমীনের উপর একটু বেশি চাপ দিতে পারেন, কারণ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথায় চীন ও অন্যান্য এশীয় কম্যুনিস্টদের চেয়ে রাশিয়া ও অন্যান্য য়ুরোপীয় কম্যুনিস্ট দেশগুলি বেশি ভয় পায়।

ইন্দোচীন যুদ্ধের ফরাসী বাহিনীর প্রতিনিধি ও ভিয়েৎমীন বাহিনীর প্রতিনিধিকে জেনেভায় ডেকে পাঠানো হয়েছিল যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য। তাঁরা জেনেভায় এসেছেন এবং তাঁদের মধ্যে আলোচনাও চলেছে; কিন্তু আসল সমস্যা যা, তার একটা মীমাংসার পথ না হওয়া পর্যন্ত সেনাপতিরা আলোচনা করছেন বলেই যুদ্ধবিরতি আসন্ন, এরূপ আশা করা যায় না।

Armistice হলে তার তদারক করার জন্য কাদের নিয়ে কমিশন গঠিত হবে, সেই প্রশ্ন নিয়েও অনেক বাগবিতণ্ডা চলছে। পশ্চিমা শক্তিদের তরফের প্রস্তাব হচ্ছে যে, কমিশন ভারত, পাকিস্থান, বর্মা, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়ার অর্থাৎ কলম্বো কনফারেন্সে যেসব দেশের প্রধান মন্ত্রীরা যোগ দেন, তাঁদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে। কম্যুনিস্ট-পক্ষ এতে রাজী নয়। কম্যুনিস্টপক্ষের প্রস্তাব ছিল ভারত, পাকিস্থান, পোল্যাণ্ড এবং চেকো-শ্লোভাকিয়ার প্রতিনিধি নিয়ে কমিশন গঠিত হবে এবং কমিশনের প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধির "ভেটো"র অধিকার থাকবে এপক্ষ তাতে রাজী নয়। শুনা যাচ্ছে কলম্বো কনফারেন্সে যোগদানকারীদের মধ্যে তিনটি দেশের প্রতিনিধি এবং একটি কম্যুনিস্ট ও আর একটি কম্যুনিস্টবিরোধী দেশের প্রতিনিধি নিয়ে কমিশন গঠনে মঃ মলোটভ রাজী হতে পারেন। কিন্তু এসব গৌণ ব্যাপার। আসল মুশকিলের আসান হলে "নিরপেক্ষ" আরমিসটিস্ কমিশন কাদের নিয়ে গঠিত হবে, সে প্রশ্নের উপরে বাগবিতণ্ডা যতই হোক, একটা মীমাংসা হবেই। যুদ্ধবিরতি যে প্রশ্নের উপর নির্ভর করছে, তার মীমাংসা হলে কমিশন গঠনের প্রশ্নে তা আটকে থাকবে না। যুদ্ধবিরতির পথে যা আসল বাধা, তার উল্লেখ উপরে করা হয়েছে।

*　　*　　*

যে আশায় নেহরু-কোটলেওয়ালা চুক্তি ভারতে সমর্থিত হয়েছিল, সে প্রশ্ন (ভারতের দিক থেকে) সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। সিংহল সরকার সেই চুক্তির যে ব্যাখ্যা করছেন এবং সেই ব্যাখ্যা অনুযায়ী যে নীতি অনুসরণ করছেন, তাতে ভারতীয় বংশোদ্ভূত সিংহলবাসীদের প্রায় চার ভাগের তিন ভাগের অবস্থা "না ঘরকা না ঘাটকা" হবে। তখন স্যার জন কোটলেওয়ালাকে "খাতির" করার জন্য ঐ রকম চুক্তি করা হয়েছিল, আশা করা গিয়েছিল যে, তিনি "খাতিরের" মান রাখবেন। "নয়াদিল্লী"র প্রভাবের পরিমাণ তো বুঝা গেল। এখন আবার সিংহল-ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সংগ্রামের চিন্তা করতে হবে।

৯।৬।৫৪

ছোটগল্প

কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প : পরশুরাম প্রণীত। এম সি সরকার এ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট্‌ কলিকাতা—১২; মূল্য দুই টাকা আট আনা।

ব্যঙ্গরসিক লেখক হিসাবে পরশুরাম বাঙলা সাহিত্যে সুবিখ্যাত। তাঁর 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থ সূক্ষ্ম বিদ্রূপ-নৈপুণ্যের জন্য বাঙলার পাঠকসমাজে চির-সমাদৃত হয়ে থাকবে। কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প একই মেজাজের লেখা তাঁর কয়েকটি আধুনিক গল্পের সংকলন।

বর্ষীয়ান লেখক পরশুরামের সঙ্গে আমাদের সাহিত্যের অন্যান্য লেখকের দৃষ্টি-ভঙ্গীর কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। পরশুরামের গল্প-সাহিত্যের রস সম্যক বুঝতে হলে এই পার্থক্য বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজন আছে। প্রথমত, এই সুবিজ্ঞ প্রবীণ লেখক শব্দের নির্বিচার তথা অযত্নমনস্ক প্রয়োগের দ্বারা রসসৃষ্টির নীতিতে বিশ্বাস করেন না; এই ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আগাগোড়াই বৈজ্ঞানিক। তাঁর পরিবেশিত কথাসাহিত্যের বাক্যবিন্যাসের ভিতর একটি কথা বাহুল্য নয়, একটি কথা কম নয়। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর গল্প অতি সতর্ক শব্দ সচেতনতার দ্বারা সুরক্ষিত। আমাদের তথা-কথিত খ্যাতিমান কথা সাহিত্যিকেরা পরশু-রামের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে যদি শব্দ প্রয়োগে বৈজ্ঞানিক যাথাযথ্যের (precision) নীতি কতকাংশেও মান্য করে চলতেন তা হলে অনেক আবর্জনা দূর হতে পারত। অবশ্য সৃজনশীল অর্থাৎ কল্পনাশ্রিত সাহিত্যে শব্দালঙ্কারের প্রয়োজন একেবারে বাদ দেওয়া যায় না, তা হলেও এই ক্ষেত্রে যে অনাচার চলছে তার তুলনা নেই। পরশুরামের রচনারীতির শুভপ্রভাব অন্যান্য রচনায় কার্যত প্রযুক্ত হলে এই অনাচার অনেক পরিমাণে দূরীভূত হতে পারে বলে মনে করি।

দ্বিতীয়ত, পরশুরাম অত্যন্ত সমাজ-সচেতন লেখক। আমরা ইদানীংকালে সমাজ-সচেতন কথাটাকে বামপন্থী রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করে থাকি। কিন্তু সমালোচ্য লেখকের সমাজ-সচেতনতা ঠিক সে জাতের জিনিস নয়। তাঁর সমাজ-সচেতনতার পরিধি আরও ব্যাপক, আরও দূরবিস্তৃত। ভূয়োদর্শন, ভূয়োজ্ঞান, বিচিত্র জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে চিন্তন ও মনন পরশুরামের সমাজচৈতন্যের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে। যে বয়সে মানুষ আপাত-নিস্পৃহ মনের উপর বৈরাগ্যের খোলস চড়িয়ে সনাতন কায়দায় পরমার্থের চর্চা করে পরশুরাম সেই বয়স উত্তীর্ণ হয়েছেন, অথচ আশ্চর্য তাঁর মনের সজীবতা ও নবীনতা। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের প্রতি এমন প্রগাঢ় নিষ্ঠা পরশুরামের মতো সত্তরোত্তর বয়সের লোকের পক্ষে সত্যই এদেশে বিস্ময়কর। ধর্মের নামে ভণ্ডামীর ব্যবসায়কে একবার তিনি 'বিরিঞ্চি বাবা' গল্পে কঠিন আঘাত করেছিলেন, তেমনিতর কঠিন আঘাত এবার তিনি হেনেছেন ভক্তির ক্লেদে আপাদ-মস্তক অনুলিপ্ত গুরুবাদীদের উপর। এ গ্রন্থের অন্তর্গত 'ভবতোষ ঠাকুর' গল্পটি সকলেরই মন দিয়ে পড়া উচিত, বার বার পড়া উচিত। বিশেষ, গুরুকে ঠাকুরের আসনে না বসালে যাঁদের কিছুতেই মন ভরে না, তাঁদের পক্ষে এ গল্প দাওয়াই-এর তুল্য হিতকারী হওয়া উচিত।

তৃতীয়ত, পরশুরাম নৈরাশ্যবাদী লেখক। জীবনের মহৎ ও সুন্দর দিকগুলি সম্পর্কে যে কারণেই হোক তিনি বিশ্বাস হারিয়েছেন। অথবা এমন হতে পারে নৈরাশ্যবাদ তাঁর স্বভাবের মজ্জায় নিহিত। বোধ করি লেখকের অতিরিক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে এই যান্ত্রিক নৈরাশ্যবাদের কোন একটা জায়গায় সূক্ষ্ম যোগ থেকে থাকবে। ব্যঙ্গরসিক হলেই যে কাউকে অবশ্যও 'সীনিক' হতে হবে এমন কোন কথা নেই। Cynicism বাদ দিয়ে পরশুরামকে ভাবা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তিনি 'সরলাক্ষ হোম' গল্পে প্রেমকে নিতান্তই স্বার্থবুদ্ধিসসর্বস্ব, অব্যবস্থিতচিত্ত খাম-খেয়ালী একটি জৈব প্রেরণা রূপে অঙ্কন করেছেন। প্রেমের উপর বিশ্বাস হারানো সহজ, তা বলে তাকে অযথা খেলো প্রতিপন্ন করবার মতো অহেতুক লঘুমনস্কতা বুঝি ব্যঙ্গরসিক লেখককেও সাজে না। সাহিত্যে অতিরঞ্জনের স্থান আছে, বিশেষ ব্যঙ্গসাহিত্যে তাকে অনেকখানি স্থান ছেড়ে দিতেই হয়, তাই বলে অতিরঞ্জনের নামে খুব বেশী কড়া রঙের আশ্রয় নিতে গেলে তা বিদ্রূপাত্মক হয়ে ওঠা অসম্ভব নয়। তেমন সম্ভাব্যতার আভাস আছে 'সরলাক্ষ হোম' গল্পে 'বালখিল্যগণের উৎপত্তি' গল্পে। শেষোক্ত গল্পটি খুবই চতুরতামণ্ডিত, কিন্তু যথোচিত পরিমাণে হাস্য-রসাত্মক নয়। 'কাঁচ সংসদ' এবং 'বালখিল্য-গণের উৎপত্তি' এই উভয় গল্পেই অকালপক্ক তারুণ্যকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে; কিন্তু দুইয়ের মধ্যে তফাত ঐখানে যে, প্রথম গল্পে বিদ্রূপ প্রয়াস সবটাই নির্মল হাস্যরসের দ্বারা বিগলিত, অন্যপক্ষে শেষোক্ত গল্পের ভিতর ঝাঁজ সুপ্রকট।

তবে গ্রন্থটির ভিতর কতকগুলি অনাবিল হাস্যরসের গল্পও আছে। যেমন 'নিরামিষাশী বাঘ', 'বরনারীবরণ', 'একগুঁয়ে বার্থা', 'আতার পায়েস'। 'কৃষ্ণকলি' গল্পের পরিবেশিত কৌতুক অতিশয় নির্মল ও শান্ত,

এই গল্পপাঠে ক্লিষ্ট মনের ক্লেশের উপশম হতে পারে। 'পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী'র অভীপ্সিত পরিহাসরসিকতা চেখে চেখে ভোগ করবার মতো। মোট কথা সব জড়িয়ে 'কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প' নিপুণ লেখকের পরিণত মননের সৃষ্ট একটি অতি উপাদেয় সরস গ্রন্থ। গ্রন্থকারের সত্যনিষ্ঠাও লক্ষণীয়। কোনো কোনো মেরুদণ্ড-হীন লেখক এবং অসাধু প্রকাশকের ষড়যন্ত্রে যে যুগে গল্পের বই গল্পের বই কি না বোঝা যায় না, প্রায়শ গল্পগ্রন্থকে অসতর্ক পাঠকের নিকট উপন্যাস নামে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়, সেই যুগে দ্ব্যর্থহীনভাবে গল্প-গ্রন্থকে গল্পগ্রন্থ নামে প্রকাশ ও প্রচার করবার চেষ্টাটাই বিশেষ সাধুবাদের যোগ্য ব্যাপার।

পরশুরামের সততা ও বৈজ্ঞানিক মনোভাব আমাদের লেখকদের মধ্যে কতক পরিমাণেও যদি সঞ্চারিত হত, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের বিশেষ উপকার হত। ১৬৫।৫৪

দিল্লীকা লাড্ডু—(তৃতীয় সংস্করণ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। পি কে বসু এণ্ড কোং—কলিকাতা—৩১। দাম ২৷৹ আনা।

'দিল্লীকা লাড্ডু', 'পঞ্চরুদ্র', 'মাছের কাঁটা', 'ইষ্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান'—প্রভৃতি প্রায় সাত আটটি গল্পের সংকলন দিল্লীকা লাড্ডু। তারাশঙ্করের ছোট গল্পের অনুরাগী পাঠক এই কয়টি গল্পের মধ্যে তাঁহার রচনা বৈশিষ্ট্যের আর এক নূতন পরিচয় লাভ করিবেন। বলা বাহুল্য গল্প-গুলি হাল্কা রসের। পাঠকের মনকে লঘুভার করিবার জন্য এবং তাহাদের ঠোঁটে পরিচ্ছন্ন হাসি ফুটাইবার উদ্দেশ্যেই দিল্লীকা লাড্ডুর গল্পগুলি রচিত। শক্তিমান লেখকের সে উদ্দেশ্য শুধু যে সফল হইয়াছে তাহা নয়—প্রতিটি গল্পেই তারাশঙ্করের স্বকীয় রচনা-মাধুর্যে উল্লেখযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীশৈল চক্রবর্তী অঙ্কিত চিত্রগুলি এই পুস্তকের আর এক সম্পদ। বইয়ের ছাপা, বাঁধাই ভাল। (১০২।৫৪)

সাহিত্য পরিচয়

বাঙলা সাহিত্যের ইতিকথাঃ শ্রীভূদেব চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক বুকল্যাণ্ড লিমিটেড ১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬। মূল্য—৬৷৷৹ টাকা।

বাঙলা সাহিত্যের তরুণ অধ্যাপক শ্রীভূদেব চৌধুরীর সদ্য প্রকাশিত আলোচ্য গ্রন্থ-খানি বিশেষ অভিনন্দনের যোগ্য। তাঁর গ্রন্থের নাম 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিকথা'। সোয়া চারশ' পৃষ্ঠায় আদিযুগ থেকে ভারত-চন্দ্র পর্যন্ত প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস তিনি রচনা করেছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা বা কোনো নতুন তথ্য আবিষ্কারের দাবী গ্রন্থ-কারের নেই। আবিষ্কৃত তথ্যরাজি ও প্রামাণিক উপাদানের উপর ভিত্তি করেই তিনি তাঁর ইতিহাসের ইমারত রচনা করেছেন। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উপকরণকে একটি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করাই তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল। সে লক্ষ্যে তিনি পৌঁছেছেন এবং তাঁকে অনুসরণ করে সহৃদয় পাঠকও অনাধুনিক বাঙলা সাহিত্যের উদ্বর্তন-বিবর্তনের একটি পরিচ্ছন্ন পরিচয় লাভ করে পরিতৃপ্ত হবেন। ইতিহাস-রচয়িতা হিসাবে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পূর্বসূরিগণকে স্বীকার করে নিলেও উপকরণ-নির্বাচন ও সত্যানিরূপণের ক্ষেত্রে তিনি নিজের দৃষ্টিকে মুক্ত রেখেছেন। তাছাড়া সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিও গ্রন্থখানিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁর মতে 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস বাঙালী জীবনধর্মের ইতিহাস।' কাজেই তিনি আলোচ্য গ্রন্থে 'বাঙলা সাহিত্যের মধ্যে বাঙালী-ঐতিহ্যের এই স্বতন্ত্র রূপটিকেই খুঁজে দেখেছেন। এদিক দিয়ে খৃষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের তিন-চতুর্থাংশ কাল জুড়ে পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থায় বাঙালীর জীবন-যাত্রায় যে জীবনসাধনা ও শিল্পপিপাসা ঐতিহাসিক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে বিপর্যয় ও বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বিচিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে তারই সাহিত্যিক প্রতিফলনকে ইতিহাস বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ধরবার সার্থক ও সুন্দর চেষ্টা পরিলক্ষিত হবে এই গ্রন্থখানিতে। বাঙলা সাহিত্য যে বাঙালীরই সাহিত্য এবং মধ্যযুগের বাঙলার সাত-আটশ' বছরের সাহিত্যের পর্যালোচনায় যে শিল্পসংস্কৃতিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এই জাতির চিৎশক্তির উন্মীলন রহস্যেরই সন্ধান পাওয়া যায় লেখক বারবার এই সত্যের প্রতিই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু এই ঐতিহাসিক সত্ত্বেও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে তিনি সমাজ মানসের ইতিহাস রচনায় পণ্ডশ্রমে শক্তিক্ষয় করেননি। সাহিত্যবোধকেই তিনি মুখ্যস্থান দিয়েছেন। তাই তাঁর এই সুপরিকল্পিত ও সুসজ্জিত গ্রন্থখানি নীরস তথ্যসঙ্কলনমাত্র না হয়ে সাহিত্যের স্বাদে ও সুরভিতে মধুস্বাদী হয়েছে। রসবোধ ও ইতিহাসবোধের সমন্বয় সাধনের প্রথম সার্থক প্রয়াস হিসাবে এই গ্রন্থখানি রসিক-জনসমাজে সমাদৃত হবে। আর প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের মহারণ্যে দিগ্‌ভ্রান্ত ছাত্রসমাজ যে এই গ্রন্থপাঠে বিশেষ উপকৃত হবে তা বলাই বাহুল্য। আমরা বাঙলা সাহিত্যের আঙিনায় এই তরুণ সাহিত্য-ঐতিহাসিককে সুস্বাগত জানাই। ২০৯।৫৪

ধর্মগ্রন্থ

ধম্মপদঃ মহাস্থবির প্রজ্ঞালোক ও ভিক্ষু **অনোমদর্শী**—প্রজ্ঞালোক প্রকাশনী, ১, বুদ্ধিস্ট টেম্পল স্ট্রীট। দাম—৪৷৷৹ টাকা।

হিন্দুদের কাছে যেমন গীতা, বৌদ্ধদের কাছে তেমনি ধম্মপদ। সুতরাং ধম্মপদের আর পরিচয় দিতে যাওয়াই নিষ্প্রয়োজন। সূত্র পিটকান্তর্ভুক্ত খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত দ্বিতীয় গ্রন্থ এই ধম্মপদ। কি প্রাচ্যখণ্ডে, কি পাশ্চাত্ত্যখণ্ডে সর্বত্রই সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকলেরই কাছে এই গ্রন্থ বিশেষভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে। বাংলায় যতগুলি সানুবাদ ধম্মপদ প্রচলিত আছে তা নেহাৎ কম নয়। কিন্তু এগুলি প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সংস্করণটি নানা কারণে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য এবং নিঃসংশয়েই সবচেয়ে ব্যাপক।

ধম্মপদের ৪২৩টি গাথার মধ্যে ২৯৯টি কাহিনী বর্ণিত আছে আচার্য বুদ্ধঘোষের অর্থ কথায়। এই কাহিনীগুলি জানলে ধম্মপদের গাথাগুলির তাৎপর্য বুঝতে যে সুবিধাই হয় এটুকু বলা বাহুল্য। তাছাড়া এই

কাহিনীগুলির মধ্যে তদানীন্তন সামাজিক প্রথা, লৌকিক আচার-ব্যবহার, ইতিহাস ইত্যাদি অনেক কিছু তথ্যই জানা যায়। সেজন্য বুদ্ধ ঘোষের 'অট্ঠ কথা'র অনুবাদ হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। একবার শীলালংকার স্থবির কর্তৃক যে চেষ্টার সূত্র পাতিত হয়েছিলো আবারও সেই সূত্র অগোণে তুলে নেওয়া উচিত। কারণ সমগ্র অর্থকথার অনুবাদের চাহিদা এই বই কিছুতেই মেটাতে পারবে না—সমগ্রতাতেই সুখ, পরিচ্ছিন্নে সুখ নেই, ভূমার মধ্যেই সুখ, নাল্পে সুখমস্তি। ধম্মপদের আলোচ্য সংস্করণটিতে প্রতিটি গাথা কিংবা গাথাগুচ্ছের শীর্ষে 'পরিচিতি' মাতৃকায় সেই সব কাহিনী সংক্ষেপে বলা আছে—এটাই এর বৈশিষ্ট্য। এর আগে এ জিনিসটি আর কেউ করেননি। তবে স্থানে স্থানে কাহিনীগুলি এতই সংক্ষেপে সারা হয়েছে যে তাতে মূল গল্পের স্বাদ কিছুই মেলে না। এর অবশ্য উপায়ও নেই, আয়তনের স্ফীতিই এর প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এর ব্যাখ্যাংশে। লৌকিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে কেবল বঙ্গানুবাদই যথেষ্ট; কিন্তু আধ্যাত্মিক অর্থের জন্য প্রয়োজন বিশেষ ব্যাখ্যার অর্থাৎ বৌদ্ধ দর্শনানুগ বা অভিধর্মানুমোদিত ব্যাখ্যার। এই বিশেষ ব্যাখ্যাই এই গ্রন্থের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য।

এখানে কথা উঠতে পারে, ধম্মপদ এমনিতেই এত বিশদ ও প্রাঞ্জল যে সকলের পক্ষেই তার মর্মগ্রহণ করা সম্ভব তবে আর মিছে অর্থকথা দিয়ে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির কী প্রয়োজন? বুদ্ধঘোষ অর্থকথা লিখলেন খৃস্টীয় ৫ম শতকে অর্থাৎ সিংহলরাজ মহানামের রাজত্বকালে (৪১০—৪৩২ খৃঃ অব্দ)। তার আগে যখন ধম্মপদের অর্থকথা ছিলো না তখন কি আর কেউ ধম্মপদ বোঝেনি? কিন্তু অনেকেরই কাছে তেমন করে বোঝা যথেষ্ট মনে হয় নি। সেই সব সূক্ষ্মবিচারী পণ্ডিত ও অধ্যবসায়ী সাধক তাঁদের জন্যই প্রয়োজন আছে অর্থকথার এবং অভিধর্মানুগ ব্যাখ্যার।

তবে বুদ্ধঘোষের অর্থকথার আগে ত্রিপিটক গ্রন্থাবলীর ব্যাখ্যা পুস্তক ছিলো না এবং এটি সমস্তই বুদ্ধঘোষের স্বকপোল-প্রসূত এমন কালাপাহাড়ী কথা বলতে চাই না। কারণ 'মহাবংশে' উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে যে রেবত স্থবির বুদ্ধঘোষকে মগধ থেকে সিংহলে গিয়ে (অশোক বর্ধনের পুত্র) মহেন্দ্র মহাথের কর্তৃক ভারত থেকে সিংহলে আনীত ব্যাখ্যা পুস্তক অবলম্বন করে নূতন ব্যাখ্যা-পুস্তক বা অট্ঠকথা প্রণয়ন করতে উপদেশ দিচ্ছেন। কারণ জম্বুদ্বীপে ব্যাখ্যা পুস্তক ছিল না অর্থাৎ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

'মহাবংশে'র এই বিবরণ প্রামাণ্য বলে স্বীকার করা যেতে পারে। হয়তো সে সময়ে ভারতে ব্যাখ্যাপুস্তক লিপিবদ্ধ ছিল না, মাত্র ত্রিপিটকধরদের স্মৃতিবৈপুল্যের মধ্যেই রক্ষিত হয়ে আসছিল শিষ্যপরম্পরায় কিংবা তালপত্রে লিপিবদ্ধ থাকলেও পরে হয়তো তা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মদ্বেষী সম্প্রদায় বিশেষের দ্বারা—যাই হোক এখানে সেকথা প্রাসঙ্গিক নয়। এস্থলে কথা এই যে, বুদ্ধঘোষ প্রণীত পুস্তকগুলি থেরবাদীদের কাছে প্রায় এক-রকম শাস্ত্রান্তর্ভুক্ত হয়ে যাবার মহিমাই অর্জন করেছে। সুতরাং আজো পর্যন্ত পণ্ডিতদের কাছেও এগুলি প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত। একাধারে ত্রিপিটক-পাঠার্থী ও সাধনমার্গীর কাছে এগুলি বিশেষভাবে পঠন, পাঠন ও আলোচনযোগ্য।

সমগ্র ত্রিপিটক ও তৎসহ বুদ্ধঘোষ, ধম্মপাল ও বুদ্ধদত্ত প্রভৃতি থেরবাদী আচার্য-গণের অর্থকথার অনুবাদ যদি ক্রমশ বাংলাতেই পাওয়া যায় তাহলে বাংলার ভিক্ষুদের লঙ্কায় কিংবা বর্মায় ছুটতে হয় না শিক্ষালাভ করবার জন্যে। এই রকম অনেক কাজই রয়েছে এখনো হাতে নেবার। উদাহরণ-স্বরূপ বলতে পারা যায় সুত্তনিপাতের অর্থ-কথার অনুবাদের কথা। সুত্তনিপাত আরো অনেক সুবোধ্য হবে অর্থকথার অনুবাদ বাংলায় পেলে। অধুনা অনুষ্ঠীয়মান ষষ্ঠ থেরবাদী সঙ্গায়নের পরিপ্রেক্ষিতে আশা করা যায় যে, এই চেষ্টা ও পরিকল্পনা ত্বরান্বিত হবে।

এ বইয়ের যে-দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তাছাড়াও বইয়ের শেষে যে 'গাথা সূচী' ও 'সূচক' সংযোজিত আছে এগুলিও পাঠার্থীর পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক। এগুলিও ধম্মপদের অন্যান্য সংস্করণ থেকে এটিকে পৃথক ও বিশিষ্ট করেছে। ডক্টর দত্তের ভূমিকায় এই বইয়ের যত প্রশংসা করা হয়েছে তা খুবই যথাযথ এবং তার উপর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। অনুবাদ প্রায়শই সাবলীল ও মূলানুগ কচিৎ কখনো এর ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। তবে ব্যাখ্যাংশের কোথাও কোথাও যেন অনাবশ্যকভাবে টেনে টেনে বাড়ানো হয়েছে মনে হলো। হয়তো বা বক্তব্যের পরিস্ফুটনের জন্যই তার প্রয়োজন ছিল। পরিশেষে পরমসৌগত ও বিরলজ্ঞানী পণ্ডিত ডক্টর নলিনাক্ষ দত্তের মূল্যবান, তথ্যসমৃদ্ধ ও মনস্বিতাপূর্ণ ভূমিকাটি বহুলাংশেই বই-খানির গৌরব বাড়িয়েছে। ছাপা, বাঁধাই সুন্দর। ধম্মপদের প্রচলিত সংস্করণগুলি থেকে এ বইয়ের শ্রেষ্ঠত্ব এমনই সর্বাংশে প্রস্ফুট যে, প্রকৃত বোদ্ধার কাছে বইখানা অকুণ্ঠ অভ্যর্থনা পাবেই। সর্বান্তরে আমরা এর বহুল প্রচার কামনা করি। ৫৪৬।৫৩

ঐতিহাসিক কাহিনী

ভোলগা থেকে গংগা—রাহুল সাংকৃত্যায়ণ প্রণীত। অনুবাদক অসিত সেন ও সুধীর দাস। মিত্রালয়, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৬৲ টাকা।

গ্রন্থকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সর্বজনবিদিত ব্যক্তি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও রাহুল সাংকৃত্যায়ণের খ্যাতি আছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ হিন্দী গ্রন্থ 'ভোলগা সে গংগার' বঙ্গানুবাদ। প্রায় ৬ হাজার খৃষ্টপূর্বাব্দ কালে ভোলগা তীরে গুহাবাসী প্রস্তরযুগে যে মানব-গোষ্ঠীর আবির্ভাব হইয়াছিল তাহাদের জীবনকে অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থের সূচনা। সেই মানুষ ক্রমে মধ্য ভোলগা তটে অগ্রসর হইল, ক্রমে মধ্য এসিয়া হইতে পামিরে, সেখান হইতে গান্ধার এবং গান্ধার হইতে গাংগেয় উপত্যকায় পেশছে।

গ্রন্থকার কিন্তু ইতিহাস লেখেন নাই। সমগ্র গ্রন্থটি ছোট ছোট গল্প বা কাহিনীর আকারে লেখা। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ, দুঃখ প্রীতি এবং ভালবাসা এইসব মনোবৃত্তির সুনিপুণ প্রতিবেশে প্রত্যেকটি কাহিনী বেশ সরস হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কালের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষায় সমাজ-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ সাহায্যে গ্রন্থকার মানুষের জীবন্ত স্বরূপটি উন্মুক্ত করিয়াছেন। অবশ্য জাতির বর্তমান প্রতিবেশ এবং পরিস্থিতির ভিতরে সমাজচেতনাকে আমরা যেভাবে গ্রহণ করি, বিভিন্ন যুগের পুরাতাত্ত্বিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষায় তৎকালীন সমাজ-চেতনা অনুরূপ মতবাদের দৃষ্টিতে বিচারের যৌক্তিকতা লাভ করিয়াছিল, এমন কথা বলা চলে না। গ্রন্থকার তাঁহার পরিকল্পিত আখ্যানসমূহের রসতাৎপর্যে যে ব্যাখ্যান আমাদের কাছে উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহার মূলে বর্তমান পরিস্থিতির বিচারগত মত-বাদের ছোপ কিছুটা যে পড়িয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মার্কস, বিশেষভাবে এঙ্গেলসের সামাজিক মতবাদের দ্বারা তাঁহার চিন্তা প্রভাবিত। ইহার ফলে তাঁহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ স্থানে স্থানে মাত্রা অতিক্রম করিয়া মহদপভাষণের পর্যায়ে গিয়া পড়িয়াছে, একথাও মনে হইবে। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যান বিশিষ্ট মতবাদের প্রভাবে যতটাই একদেশ-দর্শিতা-স্পৃষ্ট হোক্ না কেন, তাঁহার আবেদনের মৌলিক গরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। মানুষের বিচারশক্তিকে গ্রন্থকার বড় করিয়া দেখিয়াছেন। মানুষ হিসাবে মানুষের মর্যাদা এবং মানুষের অধিকারকে তিনি গরুত্বে দিয়াছেন। যুগে যুগে মানুষকে বঞ্চিত এবং নিগৃহীত করিয়া গোষ্ঠী স্বার্থের কারসাজী চলিয়া আসিতেছে। তিনি সে সব আঁধার কাটাইয়া বৃহৎ মানবকে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। এইখানে সুপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ণের প্রখর মনস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। সমগ্র গ্রন্থখানিতে মানবতার বলিষ্ঠ সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। মানবতার সেই বেদনা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, পৌরোহিত্যবাদের বিরুদ্ধে, সামন্ত-বাদের এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, সর্বোপরি ধর্মের নামে অধর্মের আস্ফালন এবং অনাচারের বিরুদ্ধে গ্রন্থকারের লেখনীকে আগ্নেয় করিয়া তুলিয়াছে। গ্রন্থকারের সংগে সব বিষয়ে আমাদের মতের মিল হয় না,

তথাপি এই অগ্নি অভিবন্দনীয়; এইজন্য যে, ইহা আমাদের অগ্রগতির পথে আলোকসম্পাত করিতে পারে।

আলোচ্য গ্রন্থখানির কয়েকটি ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে। বাংলা অনুবাদটি সম্পূর্ণ যে ত্রুটিশূন্য হইয়াছে এমন কথা বলা যায় না। স্থানে স্থানে আড়ষ্টতা রহিয়া গিয়াছে। আরও একটু দেখিয়া শুনিয়া দিলে ভাল হইত। ২০০।৫৪

রসরচনা

অর্ধেক মানবী তুমি—দেবেশ দাশ। জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩, টাকা।

রস-রচনার বই। আধুনিক সমাজের তরুণ-তরুণীদের অবলম্বন করিয়া এখানি লিখিত হইয়াছে। লেখায় ব্যঙ্গ আছে, রস-রচনার অনেক ক্ষেত্রে তাহা একটা প্রধান অঙ্গ, কিন্তু এখানিতে ব্যঙ্গের সঙ্গে রঙ্গও আছে। বস্তুত ব্যঙ্গ এবং রঙ্গ এই দুইটি চলিত ভাষায় অনেক ক্ষেত্রে একই অর্থে ব্যবহৃত হইলেও দুইটিতে পার্থক্য আছে। ব্যঙ্গের অঙ্গ নাই; রঙ্গও অবশ্য সক্ষম ভাবের দৃষ্টিতে অনঙ্গ; কিন্তু রঙ্গে আসঙ্গ থাকে। ব্যঙ্গ রসের বিস্তার ভঙ্গীতে অঙ্গের অর্থাৎ আচার বিচারের মাত্রা মাপে ঔচিত্যের কথা ভুলাইয়া মনকে খোলামেলা খেলার মধ্যে লয় বটে, কিন্তু রঙ্গ মিলায়, মজায় ভজায়। ব্যঙ্গ হাসায়, কিন্তু রঙ্গ হাসাহাসিতে ঘেঁষাঘেঁষি মেশামেশি খোঁজে, মধুর ছন্দে সম্বন্ধ পাতাইয়া লয়। ব্যঙ্গ খেলা, রঙ্গ লীলা। আলোচ্য পুস্তকখানিতে অঙ্গকে অবলম্বন করিয়া ব্যঙ্গের বিস্তার করা হইয়াছে, এজন্য রস এখানে প্রমূর্ত দীপ্ত। এ রচনায় বুদ্ধির প্রাচুর্য আছে। ব্যঙ্গকে জমাইয়া তুলিতে হইলে এইটিই যথেষ্ট হইত, কিন্তু রঙ্গকে জমাইয়া তুলিতে প্রয়োজন ভাবের মাধুর্যের। বুদ্ধির প্রাচুর্যের সঙ্গে সে ক্ষেত্রে হার্দ্য রসানুভূতির উজ্জ্বল ইঙ্গিত এবং সংকেত প্রয়োগে চাতুর্যও আবশ্যক। দেবেশবাবুর এই রচনায় ঐ বস্তুটিই মাধুর্যের বীর্য স্বরূপে কাজ করিয়াছে।

লেখক নারীর সত্যকার স্বরূপ এই গ্রন্থে উন্মুক্ত করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে নারী যদি কল্পনার মধ্যেই নিজের মাধুর্যকে আবেষ্টিত রাখেন আমাদের দৈনন্দিন বাস্তব জীবনে যদি তাঁহার রস-সংস্পর্শ উদার প্রভাবে ঘনিষ্ঠ না হয়, তবে আমাদের বিড়ম্বনা। সংসারস্থিতিকারিণী তিনি। যুগোপযোগীভাবে নারী মানবী লীলায় বিকশিত এবং বিলসিত হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহার এই করুণাই আমাদের সান্ত্বনা। দেবেশবাবু আলোচ্য পুস্তকখানিতে রসানুভাবনার পথে এই নারীরই বন্দনা করিয়াছেন। তিনি ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতিরও আদর্শের প্রতি বলিষ্ঠ চেতনার সুর এই রচনার সর্বত্র বাজাইয়া তুলিয়াছেন। আচার-ব্যবহার, ভাষায় এবং রীতিনীতিতে বৈদেশিক অনুকরণের মোহের উপর তিনি সুতীক্ষ্ম বিদ্রূপ বাণ বর্ষণ করিয়াছেন। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও দেবেশবাবুর সেই আদর্শের ব্যত্যয় ঘটে নাই। ১১৮।৫৪

বিবিধ

Report of the Committee on Finance for the Private Sector—প্রাপ্তিস্থান—একাউণ্টাণ্ট ডিপার্টমেণ্ট অফ্ রিসার্চ এন্ড স্ট্যাটিসটিকস্, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, পোঃ বক্স ১০৩৬, বোম্বাই—১। মূল্য—৩, টাকা।

ভারতের বেসরকারী শিল্পের জন্য কিভাবে মূলধন সংগৃহীত হইতে পারে এবং বিশেষভাবে ভারতের ব্যাংকসমূহ এই ব্যাপারে কিভাবে সাহায্য করিতে পারে তৎসম্বন্ধে সুপারিশ করিবার জন্য ভারত সরকার গত বৎসর অক্টোবর মাসে টাটা সন্স লিঃর ডিরেক্টর শ্রী এ ডি শ্রফের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। বর্তমানে এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের সৌজন্যে উহার এক কপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উক্ত রিপোর্টে ভারতীয় বেসরকারী শিল্পসমূহ বর্তমানে মূলধনের অভাবে কি প্রকার বিব্রত হইয়াছে, দেশের বীমা কোম্পানী ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন ইত্যাদি কিভাবে বেসরকারী শিল্পের মূলধন সরবরাহ করিতে পারে, মূলধন সরবরাহের সৌকর্যার্থে দেশে নূতন কি ধরণের প্রতিষ্ঠান গঠন আবশ্যক, দেশের ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পগুলির মূলধন পাইবার উপায় কি ইত্যাদি বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে। বর্তমানে দেশের বেসরকারী শিল্পগুলির প্রকৃত অবস্থা জানিতে এই রিপোর্টখানা বিশেষভাবে সাহায্য করিবে।

প্রাপ্তি-স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

দুই নগরের গল্প—চার্লস ডিকেন্স অনুবাদক—শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী।

শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্ব ও সাধন রহস্য (উত্তর খণ্ড, শুম্ভ নিশুম্ভ বধ)—স্বামী যোগানন্দ।

জগদ্গুরু কীর্তনমালা—স্বামী যোগানন্দ।

বেদানুভূতিকারিকা—শ্রীকালীকুমার মিশ্র।

শাস্ত্র-সংশয় নিরসন (প্রশ্নোত্তর মালা)—শ্রীভবেন্দ্রনাথ মজুমদার।

মহাবির্ভাব—শ্রীঅনিলবরণ রায় ও শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী।

বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস—শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য।

Never Too Late.—Nikhil Ranjan Ray.

রঙ্গজগৎ

—শৌভিক—

গানের জলসা "ঢুলী"

গানের একটা প্রায় আস্ত জলসাই বলা যায় আজ প্রডাকসন্সের 'ঢুলী'কে। নিন্দের সুত্রে নয়, সত্যিই রাগ-রাগিণীপ্রধান গান আর একেবারে দিশী বাদ্যের সমাবেশের দিক থেকে 'ঢুলী' সমগ্র ভারতীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেই একটি অতীব প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। নামকরা ওস্তাদ শ্রেণীর গাইয়ে বাজিয়ে মিলে প্রায় ডজন দুই গান পরিবেশন করেছেন। তার মধ্যে কালোয়াতীও আছে, 'আধুনিক'ও আছে এবং খান দুই গানের তো মুখে-মুখে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছেই, তাছাড়াও অন্য সমস্ত গানগুলিও ছবির বর্তমান ধারার ক্ষেত্রে একটা স্বাগত-ব্যতিক্রম নিয়ে এসেছে। শুধু গানের দিক থেকেই বা কেন, সমগ্রভাবেই ছবিখানির মধ্যে চলতি চলচ্চিত্রের আকৃতিতে একটা নতুন শ্রী ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা দেখে মন খুশিতে ভরে ওঠে। দারিদ্র্য, দীনতা, হাহাকার, আর্তনাদ আর কান্নায় ভরা আঁধার-বাস্তবের উলঙ্গ চেহারার যে একটানা মিছিল আজকাল চলেছে পর্দার পর পর্দা অধিকার করে, সে-দলের বাইরের একটা সুরময় হৃদয়ানুরাগ ও সহজ আবেগভরা ছবির আবির্ভাব চিত্রামোদীদের মনে বহুলালায়িত স্বস্তি এনে দেবে। গল্পটা অবশ্য ট্রাজেডীতে শেষ এবং সেইটেই হচ্ছে ছবিখানির মহা ট্রাজিক দিক, তা নয়তো বিষয়বস্তু যা উপস্থাপন করা হয়েছে, তার বেশ একটা জোরালো আবেদন আছে। গুণের চেয়ে জাতের প্রশ্নটাই বড়ো হওয়ার পরিতাপ, শিল্প-সাধনায় নিষ্ঠা ও ত্যাগের কথা, শিল্পীর অবস্থার কথা। আর রয়েছে দেশ ও দেশের শিল্পের প্রতি মমতাপন্ন হওয়ার নির্দেশ।

• • • •

চিত্রনাট্যের চেয়ে ঘটনা সাজানো, পাত্র-পাত্রীর চলা, বলা ও হাবভাবের মধ্যে মঞ্চ নাটকের ঢঙটাই বেশি করে পাওয়া যায়, আর গল্পের মধ্যে কৃত্রিমতার লেশও বড়ো কম নেই। ছবির ধর্তাটা বেশ জোরালো, একেবারে টাইটেল আরম্ভ থেকেই বলা যায়। ক্ষীরোদ নট্টের ঢোলের আওয়াজেই মন নেচে ওঠে, তারপর ছবির আরম্ভ দুর্গাপুজোর দৃশ্য থেকে। বাঙলার সেরা উৎসবের মেজাজটা ততক্ষণে ঢোল তবলা, বাঁশী, সেতারের ঝঙ্কারে পূর্ণ মাত্রায় তৈরি হয়ে যায়, আর সেই সঙ্গে গ্রাম-বাঙলার বেশ একটা সুস্মিত চেহারাও সামনে হাজির হয়ে যায়। এমনি এক পুজামণ্ডপে ঢোল বাজাতে আসে কুঞ্জ ঢুলী, সঙ্গে তার বাপ-মা-মরা নাতি পরাশর। বংশপরম্পরায় ওরা ঢুলী। সন্ধ্যায় গানের আসরে পরাশর মন্ত্রমুগ্ধ হলো খাগড়ার গণেশ ওস্তাদের গান শুনে। পরাশর এগিয়ে গেল গণেশ ওস্তাদের কাছে; ওস্তাদ যেন কিশোর বালকের মনের বাসনা বুঝতে পারলে, পরাশরকে গান শেখাতে চাইলে সে। পরাশরের আবদার কুঞ্জ ঠেলতে পারলে না। গণেশ ওস্তাদ পরাশরকে খাগড়ায় নিয়ে গিয়ে গান শেখাতে লাগলো। খাগড়ায় যাবার জন্যে গণেশ ওস্তাদের সঙ্গে নৌকায় ওঠা এবং তারপরই গানের ধাপ বদলে বদলে সময়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে পরাশরকে একেবারে গণেশের কাছে গান শিক্ষারত যুবকের বেশে দেখানো হয়েছে বেশ সুন্দর পরিবেশ ফুটিয়ে তুলে। দীর্ঘকাল পর গণেশ ওস্তাদ শিউলি ফোটার খবর পেয়ে পরাশরকে তার গ্রামে পাঠালে পুজা-মণ্ডপে গান গাইবার জন্যে। পরাশর এলো আর তার দাদু কুঞ্জরও মৃত্যু হলো। পরাশর ফিরে গেল গণেশ ওস্তাদের কাছে। কিন্তু গণেশের আর শেখাবার কিছু বাকি ছিল না; পরাশরকে সে কলকাতায় পাঠালে তার গুরু রামলোচন শর্মার কাছে। অন্ধ বৃদ্ধ রামলোচন গণেশের ওপর অত্যন্ত রুষ্ট ছিলো। গণেশের কাছ থেকে এসেছে শুনেই সে পরাশরকে তাড়িয়ে দিতে বললে। নিরাশ্রয় পরাশর সে-রাত্রির মতো রামলোচনের কন্যা মিনতির সৌজন্যে সেখানেই আশ্রয় পেলো। ভোরে রামলোচনের ঘুম ভাঙলো অপূর্ব এক কণ্ঠস্বর শুনে—বিস্ময়াভিভূতা মিনতি নীচে নেমে এসে দেখলে সেই কণ্ঠের অধিকারী তাদের আগের রাতের অতিথি। রামলোচনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো পরাশর; রামলোচন তাকে জড়িয়ে ধরলে। কিন্তু মিনতির নিষেধ সত্ত্বেও পরাশর নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে গণেশ ওস্তাদের নাম

করতেই রামলোচন ক্ষিপ্ত হলো। মিনতি বাবার রাগ প্রশমিত করলে এই বলে যে, দোষ করেছে গণেশ ওস্তাদ, সেজন্যে পরাশর শাস্তি পাবে কেন। রামলোচনের মনে ধরলো যুক্তিটা; পরাশরকে বিদ্যা দান করতে রাজী হলো সে। প্রাণ ঢেলে দিনের পর দিন রামলোচন নিজেকে উজাড় করে পরাশরকে শিখিয়ে যেতে লাগলো, আর পরাশরও পরম নিষ্ঠার সঙ্গে একাগ্র সাধনায় শিক্ষা গ্রহণ করে যেতে লাগলো। এই সূত্রে ছবিতে ভৈরবী, তোড়ী, বৃন্দাবনী সারঙ্গ, শ্রী, বসন্ত, হিন্দোল, মেঘ, কানাড়া, মালকোষ প্রভৃতি ক'টি মূল রাগের সুর ও রূপ বর্ণনায় সুন্দর জমাটি একটা পরিবেশ মনকে মাতিয়ে তোলে। নিজের যাকিছু দান করে দিয়ে রামলোচন পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে।

* * *

রামলোচনের মৃত্যুর পরই গল্প দাঁড়ালো গুরুচণ্ডালী রূপ নিয়ে। গল্পের ভাবটা তখন পারঘাট ছেড়ে বিধায়কী সিরিও-কমিকের প্লাবনে ভেসে গিয়ে ঠেকলো মেলোড্রামার আঘাটায়। পরাশরের শিষ্যা মিনতি নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতি-যোগিতায় ধনীর দুলালি রাত্রি রায়কে পরাজিত করলে। রাত্রির বান্ধব পুলক সেন এর প্রতিশোধ নিলে পরাশরকে ধরে এনে রাত্রির মাস্টার নিযুক্ত করে দিয়ে। বিরাট ধনী রাত্রিরা, আর একেবারে আলট্রা-মডার্ন প্রকৃতির। পরাশরকে আরও বেশি করে কাজে লাগাবার জন্যে পুলক একটা ফন্দী করলে ওকে রাত্রিদের বাড়িতে এনে রাখার। পরাশরকে সে মিথ্যে করে জানালে যে মিনতির সঙ্গে এক বাড়িতে একলা থাকার জন্যে পাঁচকানে কথা উঠছে, তাতে মিনতির বিয়ে হওয়াই মুশকিল। পরাশর জীবনের এদিকটা ভাবেনি কোনদিন; মিনতির কোন ক্ষতিই সে ঘটতে দিতে পারে না। মিনতিদের বাড়ি ছেড়ে পরাশর রাত্রিদের প্রাসাদে এসে উঠলো। তার সরল মন মিনতির চোখের জলের অর্থ ধরা পড়লো না। কিছুকাল শেখবার পর রাত্রি মান ও যশের লোভে দেশ পরিভ্রমণে বের হলো। পরাশর বোঝাতে চেয়েছিল যে, গুণী কখনো মান নিতে দরবারে যায় না, দরবরাই গুণীর কাছে আসে মান দিয়ে যেতে। কিন্তু পুলক সে যুক্তিকে দাঁড়াতে দিলে না। রাত্রি বের হলো পরিক্রমায়, সঙ্গে ঘোরে পরাশর। পাটনা, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, আগ্রা, বেনারস ঘুরে ওরা পৌঁছলো দিল্লীতে। রাত্রির নাম ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। তবুও পরাশর রাত্রির এই যশোন্মাদনা প্রতিরোধ করতে চায়। রাত্রি রুষ্টা হয়, বলে, পরাশর তার খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত। ঠিক তখনই টেলিগ্রাম আসে, গ্রামে পরাশরের বৃদ্ধা দাদীর মৃত্যুশয্যার বার্তা নিয়ে। আর সেই টেলিগ্রাম থেকেই

দক্ষিণ ভারতের নৃত্য পটিয়সী শিল্পী কমলা—তামিল ছবির হিন্দী সংস্করণ "মনোহর"-এর একটি বিশেষ আকর্ষণ

রাত্রি জানতে পারলে পরাশর জাত ঢ়ুলীর ছেলে। ঘৃণায়, রোষে রাত্রি পরাশরকে তাড়িয়ে দিলে। উন্মাদের মতো পথে পথে ঘুরতে লাগলো পরাশর, সত্যিই তো সে ঢুলীর ছেলে, তার আবার গানে ওস্তাদী করতে যাওয়া কেন; কেন তার উচ্চাশা। পথের পাশে কুড়িয়ে পেলে শিউলি ফুল, কানে বাজলো ঢাকের আওয়াজ। ছুটলো পরাশর সেই শব্দ শুনে। দিল্লীর কালি-বাড়িতে দুর্গাপুজা হচ্ছে। পরাশর ঢাকীর কাছ থেকে একরকম জোর করে কেড়ে নিয়ে ঢোল বাজালো, বন্দনা গান গাইলে যেটা শিখেছিল গণেশ ওস্তাদের কাছে। তারপর প্রতিমা বিসর্জনের সঙ্গে সেই যে যমুনার তীরে গিয়ে বসলো, আর সে ফিরলো না সেখান থেকে। গ্রামে দাদীর মৃত্যুশয্যার পাশে পরাশরকে ফিরিয়ে আনার জন্য মিনতি এলো কলকাতা থেকে। কালিবাড়ির পুরোহিতের কাছে খোঁজ নিয়ে ছুটলো সে যমুনার তীরে। পরাশরকে পাওয়া গেল, কিন্তু তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে; পুরোহিতের গৃহে ওকে নিয়ে আসা হলো। ডাক্তার জানালে দিনরাত যমুনার তীরে রোদে জলে ঠাণ্ডায় বসে অবিরাম গান করার ফলে গলার তন্ত্রী ছিঁড়ে গেছে। দীর্ঘ চিকিৎসার প্রয়োজন। টাকা জোগাড়ের উদ্দেশ্যে মিনতি হাজির হলো আকাশবাণীর পরিচালকের কাছে। পরিচালক অ-বাঙালী কাপুর সাহেব, কিন্তু মিনতির কথা শুনে তাঁর সহানুভূতি জাগলো। একটা জলসার ব্যবস্থা করে কাপুর কিছু টাকা জোগাড় করে দিলে। পরাশরকে নিয়ে মিনতি কলকাতায় ফিরলো। পথে বিজ্ঞাপনে এক জলসার খবর পাওয়া গেল, তাতে গাইবে রাত্রি। পরাশর সেই জলসায় আসতে চাইলে, মিনতি নিয়ে এলো তাকে। গাইতে গাইতে রাত্রি খেই হারিয়ে ফেলছে বার বার, তাল কেটে যাচ্ছে; পরাশর থাকতে পারলে না। উদ্বেগে, উত্তেজনায় তার কণ্ঠে গান ফুটলো। রাত্রি তার হারানো খেই খুঁজে পেলে, কিন্তু পরাশরের কণ্ঠ দিয়ে বের হলো রক্তের ঝলক। মিনতির সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করে পরাশর মারা গেল; শুধু শেষ মুহূর্তে জেনে গেল যে, মিনতি তাকে ভালোবেসেছিল।

• • • •

লম্বা গল্প এবং ছবিও লম্বায় চোদ্দ হাজার ফিট ছাপিয়ে গিয়েছে। তাহলেও কিন্তু নীরস ও নিস্পৃহ ভাব এসে পড়ার মতো কোন অংশ নেই, শেষের দিকে যথেষ্ট কৃত্রিমতা সত্ত্বেও। রামলোচন শর্মার মৃত্যুর পরবর্তী অংশ পাক্কা মেলোড্রামা আর একেবারে মঞ্চের ছকে ফেলা। কথা-বার্তায়, অভিব্যক্তিতে নাটকসুলভ সেই রকম অতিশয়তার ভাব, সময় ডিঙিয়ে ঘটনা এনে ফেলা। রাত্রির জন্মদিনে গান শেষ হতেই কথা উঠলো দেশ ভ্রমণে যাবার, কথামাত্রই দিন স্থির হলো পরশু, অমনি বেরিয়ে পড়া আর সঙ্গে সঙ্গে শহরে শহরে জলসার আয়োজন হয়ে যাওয়া—এ ক্ষিপ্রতা মঞ্চে চলে, ছবিতে সময়ের বিস্তার না মানলেই অস্বাভাবিক লাগবে। সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় গান শেষ হওয়া মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে ফলাফল ঘোষণা হয়ে গেল। ছবিকে এতো ব্যস্ত করে তোলা চলে না। গণেশ ওস্তাদ যখন পরাশরকে কিশোর অবস্থায় নিজের কাছে নিয়ে গেল, তখন ওকে বেশ সাধক প্রকৃতির ব্যক্তি দেখা গেল, কিন্তু পরাশরকে শিক্ষাদান শেষ করার পর এবারে ওকে দেখা গেল সুরাসক্ত একজন। ওর মদ খাওয়ার পিছনে কোন গভীর দুঃখময় রহস্য যেন রয়েছে, যেটা সে পরাশরকে বলি বলি করেও আর বললে না। এতে যে সাসপেন্স তৈরি হলো, সেটা কিসের জন্য? কুঞ্জ ঢুলীর মৃত্যুর পর গ্রামের পুরুতবাড়ির দরজায় কাছাগলায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে পরাশরের হঠাৎ অট্টহাসি কেন? যমুনার তীরে গান গাইতে গাইতে হঠাৎ পরাশরের গলার তন্ত্রী ছিঁড়ে যাওয়া; জলসায় রাত্রির মুখের খেই ধরিয়ে দিতে গিয়ে ঝলক দিয়ে রক্ত পড়া ইত্যাদি অতিনাটকীয় ঘটনায় আবেগ সৃষ্টি হয়, কিন্তু এমন নির্মমতায় মনের সায় থাকে না। আর পরাশরকে মেরে ফেলেই বা কার কি লাভ হলো? বরং ও বাঁচলে শুধু মিনতিরই জয় হতো না, সেই সঙ্গে মিনতি ব্রাহ্মণ কন্যা হলেও তার সঙ্গে ঢুলী পরাশরের মিলনের মধ্যে দিয়ে জাত অ-জাতের ঘৃণ্য ব্যবধান অস্বীকার করার একটা দৃষ্টান্ত ফুটে উঠতো— যেখানে গুণীর একমাত্র জাত তার গুণ বলে স্বীকৃতি পেতো।

• • • • •

আরম্ভ থেকেই মনে একটা তুষ্টির ভাব আশ্রয় করে নেয়। আলোয় হাওয়ায় বেশ একটা দিশী পরিবেশ—গ্রামের ছবি, ধান-ভরা ক্ষেতের ছবি, আনন্দমুখর উৎসবের ছবি। বেশ সজ্জন সজ্জন দরদী মানুষকে পাওয়া যায়। গণেশ ওস্তাদ বা রামলোচন শর্মা মনে করিয়ে দেয় যে, সত্যিই শিল্প সাধনায় একাগ্রব্রতী হলে নিঃশেষে বিদ্যা উজাড় করে দেবার মতো সদ্‌গুরুর অভাব হয় না। দিল্লীর কালিবাড়ির পুরোহিত বা আকাশবাণীর পরিচালক কাপুর সাহেবদের মতো হৃদয়বান লোককে দেখে মন খুশী হয়; জীবনের সুন্দরতা ও ভালোর দিকেরই ছবি। হিন্দী বাঙলা মিশিয়ে প্রায় থান-চব্বিশ বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর গান আছে এবং প্রত্যেকখানিই মাতিয়ে দেবার মতো। অন্তত "ভাঙনের তীরে ঘর বেঁধে কিবা ফল?" এবং "এই যমুনারি তীরে" গান দুখানি বোধহয় ইতিমধ্যেই মুখে মুখে গুঞ্জরিত হতে আরম্ভ করেছে। দুখানিই প্রণব রায়ের রচনা। ছবিখানিতে সবচেয়ে বড়ো অংশ এবং ভালো কাজ হয়েছে সঙ্গীত পরিচালক রাজেন সরকারের। সম্পূর্ণরূপে রাগরাগিনী অনুসৃত গান এবং দিশী বাজনার ব্যবহার করে লোককে মাতিয়ে তোলার মতো প্রাণ-ভরা জিনিস পরিবেশন করার অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত তিনি সামনে তুলে ধরেছেন। অত্যন্ত বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা তাঁর এটা। গানে এ টি কানন, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত-কুমার, ধনঞ্জয়, যূথিকা রায় (বাঙলা ছবিতে এই প্রথম), প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

নাম-করা ওস্তাদ ও জনপ্রিয় গাইয়ে এবং ক্ষিরোদ নট্ট, কেরামৎউল্লা, জগীরুদ্দীন, হিমাংশু বিশ্বাস, বলরাম পাঠক, জিতেন সাঁতরা প্রভৃতি খ্যাতনামা বাজিয়ের সমাবেশে সত্যিই একটা বড়ো জলসার আনন্দ এনে দেয়। টাইটেল পড়তেই ক্ষিরোদ নট্টের ঢোল তো এক অনাস্বাদিত পুলক শিহরণে সারা মনকে অনুরণিত করে তোলে। গানগুলি উপস্থাপিতও হয়েছে গল্পের সাবলীল গতিপথে বেশ স্বাভাবিক প্রয়োজনেই। অতো গান কিন্তু কোনটি বাড়তি বলে মনে হয় না। প্রণব রায় ছাড়া এতে গান লিখেছেন বিমলচন্দ্র ঘোষ, পণ্ডিতভূষণ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও মালিক।

* * * *

চিত্রনাট্য ও তত্ত্বাবোধন (?—কাহিনী-পুস্তিকা দ্রষ্টব্য) অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের। বিধায়ক ভট্টাচার্যের কাহিনীটির ঘটনাবলী তিনি সাজিয়েছেন অনেকটা নাটকের ছকে, তবে সেজন্য যথাযথ আবেগপ্রবাহ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হননি তিনি। আরম্ভ থেকেই দর্শকের চেতনাকে নিবিষ্ট করে ধরে রাখবার কৃতিত্ব পাওয়া যায়, এমন কি রাত্রি রায়, তার বাড়ি, পুলক সেন প্রভৃতি প্রসঙ্গে অনেক কৃত্রিমতা এসে পড়া সত্ত্বেও। পরিচালনায় পিনাকী মুখোপাধ্যায় নাটকীয় পরিবেশ গড়ে তোলার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আঙ্গিক পারিপাট্যের দিক থেকে "ঢুলি" বাঙলা ছবির এখনকার অবস্থার চেয়ে যথেষ্ট উঁচু পর্যায়ের। বিশেষভাবে প্রশংসনীয় হচ্ছে শব্দগ্রহণের দিকটা, আরও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গানগুলির রেকর্ডিং। এ জন্যে প্রধান যন্ত্রী গৌর দাস এবং শব্দযন্ত্রী শিশির চট্টোপাধ্যায় সাধারণের চেয়ে অনেক ভালো কাজ দেখিয়েছেন। আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন সন্তোষ গুহ রায় এবং অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্পনির্দেশেও বটু সেনের কৃতিত্ব উল্লেখ করার মতো।

* * *

অভিনয়ের ক্ষেত্রে অভিব্যক্তিতে মঞ্চের আতিশয়তা লক্ষ্য করা যায়। সমগ্রভাবে অভিনয় জমে ওঠে, তবে থিয়েটার দেখার মতো। নবাগত প্রশান্তকুমার নায়ক পরাশরের ভূমিকায় অবতরণ করেছেন। এই চরিত্রটির ওপরেই কাহিনীস্রষ্টার জোর, তাছাড়া একটা বিচিত্র জীবনের দিক সামনে এসে দেয়—দেশের একটা শিল্পৈতিহ্যের ধারক ও বাহকের কথা মনে করিয়ে দেয়, তাই আপনা থেকেই ওর ওপরে সকলের সহানুভূতি গিয়ে পড়ে, তা না হলে প্রশান্তকুমারের নায়কোচিত ব্যক্তিত্বের খামতিটাই বড়ো হয়ে দেখা দিত। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ছবিখানিতে মিনতির চরিত্রে সুচিত্রা সেনকেই লোকের ভালো লাগবে সবচেয়ে বেশি। কয়েকটা জায়গায় তার অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টার কৃত্রিমতা বড়ো স্পষ্ট। তা ছাড়া মিনতির দরদী মনটা দর্শকমনে পরিব্যাপ্ত করে দিতে সুচিত্রার শান্ত অভিনয় প্রশংসা পাবে। দিল্লীর আকাশবাণীর পরিচালক কাপুরের হিন্দীভাষী চরিত্রে ছবি বিশ্বাস অবাকও করেছেন খুশীও করেছেন। ওস্তাদ রামলোচন শর্মার ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যালের অতি অভিনয় সত্ত্বেও ওর মুখে এ টি কাননের গাওয়া খানকয়েক ওস্তাদী গান আর রাগরাগিনীর রূপবর্ণনা শুনতে পাওয়ায় চরিত্রটির কথা মনে থাকে। গণেশ ওস্তাদের ভূমিকায় নীতীশ মুখোপাধ্যায় ছবির গোড়ার অংশটিকে ভাবগম্ভীর করে রাখেন। পুলক সেনের ভূমিকায় বিকাশ রায়ই এ কাহিনীর ভিলেন, আর অভিনয়ে তিনি ফুটিয়েও তুলেছেন চরিত্রটাকে। রবীন মজুমদার মিনতির শুভানুধ্যায়ী এক প্রতিবেশী এবং প্রচ্ছন্নভাবে তার প্রেমিকের একটি শান্ত চরিত্রে অবতরণ করেছেন, তাঁর কোন গান নেই। বাড়ী-ঘরে আসবাবের চেহারা যেমন আলট্রা-মডার্ন তার সঙ্গে রাত্রি রায়ের ভূমিকায় মালা সিংহ একটু যেন বেখাপ্পা, সেরকম চমক ও ঠাট নেই। অজিত চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, পাপু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কমিক দল এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছেন তবে নেহাৎই ফালতু হয়ে, ওদের কোন দরকারই ছিল না। এ ছাড়া অভিনয়ে অন্যান্যদের মধ্যে আছেন ডাঃ হরেন, বিপিন মুখোপাধ্যায়, খগেন পাঠক, মনি শ্রীমানি, অনিল চট্টোপাধ্যায়, নরেশ বসু, ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

নির্ভীক জাতীয় সাপ্তাহিক

দেশ

প্রতি সংখ্যা	...	।৵৹
শহরে বার্ষিক	...	১৯,
ষান্মাসিক	...	৯৷৹
ত্রৈমাসিক	...	৪৸৹
মফঃস্বলে (সডাক) বার্ষিক	...	২০,
ষান্মাসিক	...	১০,
ত্রৈমাসিক	...	৫,
ব্রহ্মদেশ (সডাক) বার্ষিক	...	২২,
ষান্মাসিক	...	১১,
অন্যান্য দেশে (সডাক) বার্ষিক	...	২৫,
ষান্মাসিক	...	১২,

ঠিকানা—আনন্দবাজার পত্রিকা

১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা—৭।

খেলার মাঠে

একলব্য

ফুটবল খেলার চ্যারিটি ম্যাচ হতে সংগৃহীত অর্থের অপচয় সম্বন্ধে গত সপ্তাহে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। 'গৌরী সেনের' টাকা খরচের মত আই এফ এর কর্ণধারেরা নিজেদের খেয়াল-খুশীমত সাধারণের এই অর্থ খরচ করে থাকেন। যারা স্মরণাতীত কাল থেকে আই এফ এর কর্তাদের খেয়ালখুশী চরিতার্থের রসদ জুগিয়ে আসছেন, সেই দর্শকসাধারণের জন্য আজ পর্যন্ত একটি কানাকড়িও খরচ হয়নি। অথচ স্টেডিয়ামের অভাবে মাঠে প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত বৃক্ষারূঢ় দর্শক ভূপতিত হয়ে জীবন হারিয়েছে তারও দৃষ্টান্ত আছে। যাদের শ্রমে, যাদের হাত পা ও মাথার কসরতে এই অর্থ সংগৃহীত হয়ে থাকে, সেই খেলোয়াড়কুলের জন্যও আই এফ এ বিশেষ কিছু করেছেন বলে শোনা যায়নি। খেলোয়াড়দের হাত পা ভাংগলে তাদের কোন দায়িত্ব নেই, মাথা ভাঙগলে মাথা ব্যথা নেই। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের কত প্রতিভাদীপ্ত খেলোয়াড়-জীবন তিলে তিলে শেষ হয়ে গেছে তার অন্ত নেই। শিক্ষার অভাবে পরিপূর্ণ নৈপুণ্য বিকাশের পূর্বেই কত খেলোয়াড়ের সুপ্ত প্রতিভা নিঃশেষ হয়ে গেছে তার খোঁজই বা কে রাখে? দেশে দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নত পরিকল্পনার কথা শুনেও আই এফ এর টনক নড়ে না। স্টেডিয়াম নির্মাণের আর্ত আবেদনও তাদের কর্ণ-পটাহে প্রবেশ করে না। এক যুগ বা তারও বেশী সময় ধরে স্টেডিয়ামের এক চমৎকার পরিকল্পনা আই এফ এ কর্ণধারদের মানস-পটে নাকি অংকিত হয়ে আছে, সম্প্রতি সরকারী প্রচেষ্টায় মানসপটের পরিকল্পনা নক্সার মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করবে বলে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তব রূপ নেবার কোন কথা শোনা যায়নি। স্টেডিয়াম বাস্তবে রূপায়িত হবার এখনো অনেক দেরী।

* * *

চ্যারিটি ম্যাচে সংগৃহীত অর্থের অপব্যয় রোধ করবার জন্য সংবাদপত্র মারফৎ আই এফ এ কর্তৃপক্ষকে ইতিপূর্বে বহু অনুরোধ করা হয়েছে। আই এফ এর সাধারণ সভায়ও এ নিয়ে যে আলোচনা ও তর্কের ঝড় উঠেছিল তা কারো অবিদিত নেই। ক্রীড়ামানের উন্নতির জন্য আই এফ এ-র কাছে নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনা গ্রহণের আবেদন নূতন ঘটনা নয়। আই এফ এর অভ্যন্তরীণ পরিচালন ব্যবস্থাকে ক্লেদমুক্ত করবার দাবীও বহুদিনের, কিন্তু কার কথা কে শোনে? আই এফ এ কর্তৃপক্ষের ভাবখানা সেই অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মত "হায় মহারাণী, সত্য তব উপদেশ, তীব্র তব বাণী।"

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মোহনবাগান ও এরিয়ানের চ্যারিটি ম্যাচের কথাই ধরা যাক। এখানেও সেই পুরানো ব্যবস্থা। উৎসব বাড়ির নহবৎ-এর মত লাউডস্পীকারযোগে হিন্দী ও বাঙলা ছায়াছবির লঘু সঙ্গীত। V. I. P.-দের জন্য ব্যয়সাপেক্ষ বিশেষ আসনের ব্যবস্থা। গেটে পরিচালকদের প্রিয়-জনের ভিড়। খরচের অংক এখনো প্রকাশ পায়নি। হয়তো দেখা যাবে, গেটরক্ষার জন্যই পাঁচশ টাকা খরচ হয়েছে। ক্রীড়াভূমিতে পুলিশ অথবা কোন এমেচার ব্যান্ড পার্টির সামরিক ঐকতানের পরিবর্তে সঙ্গীতের ব্যবস্থা কেন? যেখানে শক্তির পরীক্ষা, শক্তির লড়াই, সেখানে সামরিক [illegible] পরিবর্তে ছায়াছবির লঘু সঙ্গীত পরিবেশন বিকৃত রুচির পরিচায়ক। আর খেলার মাঠে V. I. P.-দের জন্য বিশেষ আসনের ব্যবস্থা না থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই সব [illegible] কথা কি আই এফ এর সভাপতি, বাঙলা তথা ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রের খর্বাকৃতি হিটলার

ক্যালকাটা মাঠে মোহনবাগান ও এরিয়ানের লীগের চ্যারিটি খেলায় মোহনবাগানের দ্বিতীয় গোলের দৃশ্য

মোহনবাগানের সেণ্টার ফরোয়ার্ড কে পাল হেড করবার পর বলটি গোলে প্রবেশ করেছে। ছবির ডান দিকে একসঙ্গে যে দু'জন খেলোয়াড়কে দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে নীচু হয়ে যিনি হেড করবার ভংগিতে রয়েছেন, তিনিই কে পাল
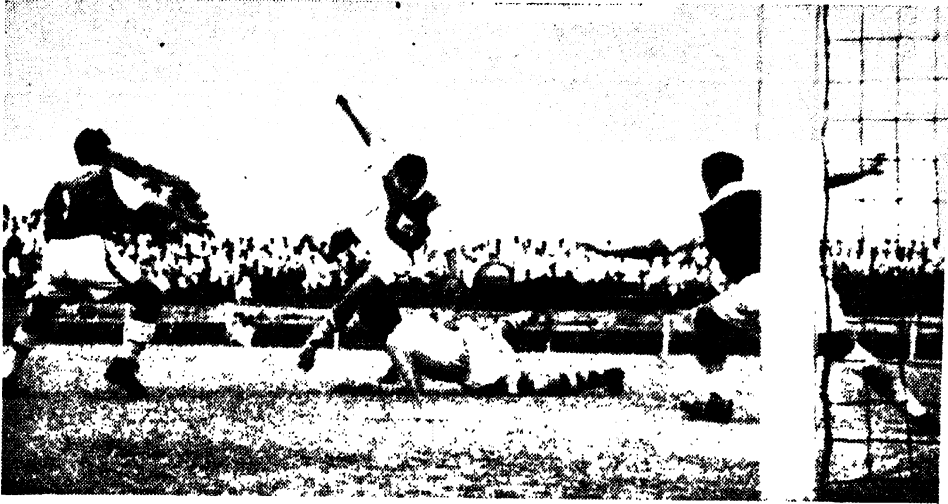
রাজস্থান ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের লীগের খেলায় রাজস্থানের সেণ্টার ফরোয়ার্ড ধনরাজ বিজয়সূচক গোল করছেন

শ্রীপংকজ গুপ্তের কানে উঠবে? তার সেই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের নীতি ঃ

"......বারেক যখন নেমেছে পাপের পথে কুরুপুত্রগণ, তখন ধর্মের সাথে সন্ধি করা মিছে; পাপের দুয়ারে পাপ সহায় মাগিছে।"

* * *

প্রাচ্যের সর্ববৃহৎ ক্রীড়াপ্রতিষ্ঠান আই এফ এর পরিচালন ব্যবস্থার পঙ্কিলতা এবং ব্যক্তিবিশেষের স্বেচ্ছাচারে বিচলিত হয়ে গভর্নমেণ্ট রাজ্যের সমগ্র খেলাধুলাকে সরকারী আওতায় আনতে চাইছেন। অবশ্য পুরোপুরি সরকার নিয়ন্ত্রিতে নয়। যারা খেলাধুলোর মধ্যদিয়ে এতদিন দেশের সেবা করে এসেছেন, সেই সব সেবক-প্রধানদেরও এখানে আসন থাকবে। এ উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ স্পোর্টস বোর্ড গঠন বিধির এক খসড়াও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। পুরোপুরি না হলেও খেলাধুলো নিয়ন্ত্রণে সরকারের এই আংশিক হস্তক্ষেপও রাজ্যের ক্রীড়া-পরিচালকরা পছন্দ করছেন না। কিন্তু উপায় নেই। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বড় শক্ত মানুষ। পশ্চিমবঙ্গে একটি স্পোর্টস বোর্ড গঠন করে সমস্ত খেলাধুলোকে সুনিয়ন্ত্রিত করা তাঁরই অভিপ্রেত। বর্তমানের ক্রীড়া-পরিচালকরা বলছেন, কম্যুনিস্ট দেশগুলি ছাড়া অন্য কোন দেশে খেলাধুলোর ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের নজির নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই উৎকট আগ্রহ কেন? সত্যিই তো দেশ শাসনের গুরুভার যাদের উপর ন্যস্ত খেলাধুলোর ব্যাপারে তাদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন কি? প্রয়োজন সত্যই থাকে না যদি খেলাধুলো পরিচালনার মধ্যে কোন গলদ না থাকে। বর্তমানে খেলাধুলো এবং খেলাধুলোর মাধ্যমে স্বাস্থ্য গঠন জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংগ। —তাই কতিপয় স্বেচ্ছাচারীর খামখেয়ালের ফলে খেলাধুলোর পবিত্র স্থান যদি কলুষিত হয়, আর ক্রীড়াপ্রতিষ্ঠানকে ক্লেদমুক্ত করবার জন্য জনসাধারণের মধ্য থেকে দাবী উঠতে থাকে, তবে গভর্নমেণ্ট নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেন না। অবশ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত ক্রীড়াপ্রতিষ্ঠান সুপরিচালিত এবং ক্লেদমুক্ত হবে এ আশাও করা বৃথা। সরকার নিজেদের সমস্যায়ই জর্জরিত। তারপর খেলাধুলো পরিচালনের ক্ষেত্রে তাদের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। পশ্চিমবঙ্গ স্পোর্টস বোর্ড গঠনের খসড়া যেভাবে রচিত হয়েছে, সেভাবে স্পোর্টস বোর্ড গঠিত হলে সরকার-প্রতিনিধি এবং বর্তমান পরিচালকদের সহযোগিতাপূর্ণ প্রচেষ্টার দ্বারাই ক্রীড়াক্ষেত্র ক্লেদমুক্ত হতে পারে। কিন্তু উভয় পক্ষের মধ্যে সমন্বয় কি সম্ভব? একচেটিয়া অধিকারই ক্রীড়াসেবকদের কাম্য। অপরদিকে গভর্নমেণ্ট চাইছে মাথা গলাতে। সুতরাং সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য। তাই স্পোর্টস বোর্ড গঠন এবং স্টেডিয়াম নির্মাণের ব্যাপারে "নঃ যযৌ নঃ তস্থৌ" অবস্থা। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

ফুটবল খেলার সাপ্তাহিক আলোচনা

গত সপ্তাহে কলকাতা ফুটবল লীগের সাপ্তাহিক আলোচনা লেখবার সময় পর্যন্ত পাঁচটি ক্লাব অপরাজিত আখ্যার অধিকারী ছিল, কিন্তু এর মধ্যে তিনটি দল—এরিয়ান, রাজস্থান ও উয়াড়ী ক্লাব পরাজয় স্বীকার করায় ১৫টি ক্লাবের মধ্যে মাত্র দুটি ক্লাব অবশিষ্ট আছে, যারা এখন পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করেনি। খেলাপ্রিয় দর্শকদের প্রাণ-মাতানো মন-মাতানো এ দুটি ক্লাব হচ্ছে—মোহনবাগান ও ইস্টবেংগল ক্লাব। এরিয়ানের পরাজয় ঘটেছে মোহনবাগানের হাতে চ্যারিটি খেলায়। স্পোর্টিং ইউনিয়ন হারিয়েছে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রাজস্থান ক্লাবকে আর উয়াড়ীর পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কাছে।

আলোচ্য সপ্তাহের অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা দু'জন খেলোয়াড়ের 'হ্যাট্রিক' লাভ। এরিয়ানের সেণ্টার ফরোয়ার্ড বি দাশ লীগ খেলা আরম্ভের প্রায় ৩ সপ্তাহ পরে জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে তিনটি গোল করে প্রথম হ্যাট্রিক করেন। পরের দিন আবার উয়াড়ীর সেণ্টার ফরোয়ার্ড এস ঘোষ পুলিসের বিরুদ্ধে মরসুমের দ্বিতীয় হ্যাট্রিক করতে সমর্থ হন। উয়াড়ী এই খেলায় পুলিসকে ৪—০ গোলে হারিয়ে দিয়েছিল। এখন পর্যন্ত অন্য কোন খেলায় এত বেশী গোল হয়নি। এ সপ্তাহে এরিয়ান, রাজস্থান এবং উয়াড়ী ক্লাব যেমন প্রথম পরাজয় স্বীকার করেছে, তেমন একটি দল প্রথম জয়লাভ করতেও সমর্থ হয়েছে। এরা হচ্ছে প্রথম ডিভিসনের সর্বকনিষ্ঠ দল খিদিরপুর ক্লাব। ৭টি খেলায় ৩ পয়েণ্ট অর্জনের পর খিদির-

আম্পায়ারের সিম্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। "অন্যে পরে কা কথা" আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট স্বয়ং আইসেনহাওয়ারকে আম্পায়ারের সিম্ধান্তের বিরুদ্ধে উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে "No! Not out" ব'লে চীৎকার করতে দেখা যাচ্ছে। ওয়াশিংটনে বেসবল খেলার সময়ে দুর্বল মুহূর্তে প্রেসিডেণ্টের এই সাময়িক ধৈর্যচ্যুতির ছবি ক্যামেরাম্যান ধরে রাখবার লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি। আমাদের দেশের ফুটবলের মত আমেরিকায় বেসবল খেলা জনপ্রিয়

পুর ক্লাব বি এন রেল দলকে হারিয়ে দিয়ে প্রথম জয়লাভ করে। লীগ কোঠার শীর্ষ-স্থানীয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের যেমন অপ্রতিহত অগ্রগতি, নিম্নস্থানীয় সামরিক দলের তেমন একটানা অধোগতি। ৬টি খেলার মধ্যে তারা একটি পয়েণ্টও পায়নি। কোন খেলায় গোলও করতে পারেনি। ক্যালকাটা সার্ভিসেস দলের একক সংগী ভবানীপুর ক্লাব। তিনটি পয়েণ্ট পেলেও ভবানীপুর ক্লাব এ পর্যন্ত কোন গোল লাভ করেনি। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিরুদ্ধে এতদিন কোন গোল হয় নি। ই আই রেল দলই তাদের বিরুদ্ধে প্রথম একটি গোল করে। ১৫টি ক্লাবের মধ্যে এখন পর্যন্ত যাদের বিরুদ্ধে কোন গোল হয়নি, তারা হচ্ছে দুই প্রধানের অন্যতম মোহনবাগান ক্লাব।

লীগ খেলার গতি ক্রমশ মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র প্রশস্ত করছে। অবশ্য ৮টি খেলায় ৪ পয়েণ্ট নষ্ট করায় মোহনবাগান বেশ খানিকটা পিছিয়ে আছে, কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ক্লাব যেভাবে খেলছে তাতে যে কোন দিন যে কোন ক্লাবের কাছে তাদের পয়েণ্ট হারাবার সম্ভাবনা। অবশ্য 'বুটেড' ফুটবল চালু হবার ফলে কোন ক্লাবই এবার ভাল খেলতে পারছে না। এ পর্যন্ত লীগের যে ৫০টি খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার মধ্যে কোন খেলাই দর্শকদের আনন্দের খোরাক যোগাতে পারেনি। তবু ইস্টবেঙ্গল ও পুলিসের খেলায় খানিকটা নৈপুণ্যগত উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়।

ক্যালকাটা ফুটবল লীগের চারটি ডিভিসনের ৬৩টি ক্লাবের মধ্যে দ্বিতী ডিভিসনের একমাত্র কাস্টমস দলের এখ পর্যন্ত কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তারা কো খেলায় পরাজিত হয়নি। কোন পয়েণ্ট নষ্ট করেনি, তাদের বিরুদ্ধে কোন ক্লাব গোল করতে পারেনি। দ্বিতীয় ডিভিসনে ক্যালকাট এবং পোর্ট কমিশনার্সও ভাল খেলছে। তৃতীয় ডিভিসনে ভাল খেলছে সিটি ক্লাব ও এলবার্ট স্পোর্টিং; চতুর্থ ডিভিসনে বাটা স্পোর্টস ও ঐক্য সম্মিলনী।

৮ই জুন তারিখের খেলার ফলাফল নিয়ে এ আলোচনা করা হল। গত সপ্তাহের খেলা-গুলির ফলাফল দিচ্ছি।

২রা জুন, '৫৪

এরিয়ান (৩) জর্জ টেলিগ্রাফ (০)
রাজস্থান (০) ভবানীপুর (০)

৩রা জুন, '৫৪

ইস্টবেঙ্গল (১) স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০)
উয়াড়ী (৪) পুলিশ (০)
ই আই আর (১) বি এন আর (০)

৪ঠা জুন, '৫৪

ভবানীপুর (০) জর্জ টেলিগ্রাফ (০)
রাজস্থান (১) খিদিরপুর (১)

৫ই জুন, '৫৪—চ্যারিটি ম্যাচ

মোহনবাগান (২) এরিয়ান (০)

৭ই জুন, '৫৪

স্পোর্টিং ইউনিয়ন (২) রাজস্থান (০)
জর্জ টেলিগ্রাফ (৩) ক্যালঃ সার্ভিসেস (০)
খিদিরপুর (২) বি এন আর (০)

৮ই জুন, '৫৪

ইস্টবেঙ্গল (২) ই আই আর (১)
মোহনবাগান (১) ভবানীপুর (০)
মহঃ স্পোর্টিং (২) উয়াড়ী (১)

প্রথম ডিভিসন লীগ কোঠায় বিভিন্ন দলের অবস্থা

[৮ই জুন পর্যন্ত]

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ইস্টবেঙ্গল ...	৭	৭	০	০	৯	১	১৪
মোহনবাগান	৮	৪	৪	০	৮	০	১২
উয়াড়ী ...	৮	৫	২	১	১৪	৫	১২
এরিয়ান ...	৭	৪	২	১	৮	৩	১০
রাজস্থান ...	৭	৩	৩	১	৫	৩	৯
মহঃ স্পোর্টিং	৯	৩	৩	৩	৭	৭	৯
পুলিস ...	৮	২	৪	২	৪	৮	৮
কালীঘাট ...	৬	২	৩	১	৬	৫	৭
স্পোর্টিং ইউঃ	৭	২	২	৩	৫	৫	৬
জর্জ টেলিঃ	৮	২	২	৪	৫	৭	৬
ই আই আর	৮	২	২	৪	৪	৮	৬
খিদিরপুর ...	৮	১	৩	৪	৪	৮	৫
বি এন আর	৬	১	১	৪	৫	৯	৩
ভবানীপুর ...	৭	০	৩	৪	০	৪	৩
ক্যালঃ গ্যারিসন	৬	০	০	৬	০	১১	০

কেনিয়নের সর্বপ্রথম হাজার রান :— ইংলণ্ডের এবারের ক্রিকেট মরসুমে ডন কেনিয়ন সর্বপ্রথম সহস্র রান লাভের কৃতিত্ব

ডন কেনিয়ন
ইংলণ্ডের এবারের ক্রিকেট মরসুমে সর্বপ্রথম যিনি হাজার রান করেছেন

অর্জন করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, কেনিয়ন গতবারও সর্বপ্রথম সহস্র রান লাভ করেছিলেন।

উরস্টার কাউন্টির ওপেনিং ব্যাটসম্যান ডন কেনিয়নের হাজার রান পূর্ণ করতে ২১ দিন সময় লেগেছে। ইতিপূর্বে কম সময়ের মধ্যে যারা হাজার রান করেছেন, তাদের মধ্যে ইংলণ্ডের দুই ধুরন্ধর খেলোয়াড় ডবলিউ জি গ্রেস এবং ওয়ালী হ্যামণ্ডের নাম উল্লেখযোগ্য। গ্রেস ও হ্যামণ্ড মাত্র ২২ দিনে সহস্র রান পূর্ণ করেন। গত সপ্তাহে এসেক্স কাউন্টির বিরুদ্ধে ১৪৭ রান করবার পর কৃতী ব্যাটসম্যান কেনিয়নের সহস্র রান পূর্ণ হয়।

ইংলণ্ড ও পাকিস্থানের প্রথম টেস্ট: ইংলণ্ডে ৯টি খেলার মধ্যে ২টি খেলায় জয়লাভ এবং বাকী ৭টি খেলায় অপরাজিত থাকবার কৃতিত্ব অর্জন করে পাকিস্থান ক্রিকেট দল প্রথম 'টেস্ট' খেলায় ইংলণ্ডের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হচ্ছে। বেশ শক্তিশালী করেই ইংলণ্ডের টেস্ট টীম গঠিত হয়েছে। অধিকাংশ তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত পাকিস্থান ক্রিকেট দল—যারা ইতি-মধ্যেই ইংলণ্ডে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে, তারা 'টেস্টে' ইংলণ্ডের সঙ্গে কেমন খেলে সেদিকে সমগ্র ক্রিকেট বিশ্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ। মহা অনিশ্চয়তাই ক্রিকেট খেলার বৈশিষ্ট্য। সেজন্য আগে থেকে কোন মন্তব্য না করাই ভাল। লর্ডস মাঠে পাকিস্থান ও ইংলণ্ড দলের পাঁচ দিনব্যাপী চারটি টেস্ট খেলার প্রথম খেলার নির্দিষ্ট তারিখ ১০ই, ১১ই, ১২ই, ১৪ই ও ১৫ই জুন। নীচে ইংলণ্ড টেস্ট টীমের নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম দেওয়া হল।

ইংলণ্ড দল:—লেন হাটন—অধিনায়ক (ইয়র্কশায়ার), ডবলিউ এডারিচ (মিডলসেক্স), টি ই বেলী (এসেক্স), আর টি সিম্পসন (নটিংহামশায়ার), পিটার মে (সারে), ডেনিস কম্পটন (মিডলসেক্স), রয় ট্যাটারসল (ল্যাঙ্কাশায়ার), জে এইচ ওয়ার্ডল (ইয়র্কশায়ার), এ স্ট্যাথাম (ল্যাঙ্কাশায়ার), টি জি ইভান্স (কেণ্ট), জিম লেকার (সারে) ও ডবলিউ ওয়াটসন (ইয়র্কশায়ার)।

ইংলণ্ডে পাকিস্থানের অন্যান্য খেলা:—ইংলণ্ডে পাকিস্থানের প্রথম ৫টি খেলার ফলাফল 'দেশে' প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী ৪টি খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল এ সপ্তাহে প্রকাশ করা হচ্ছে। এই চারটি খেলার মধ্যে ডেভনশায়ার দলকে 'ফলো-অন' করিয়েও পাকিস্থান একটু সময়ের অভাবে জয়লাভ করতে পারেনি। আর সাসেক্স ও পাকিস্থানের খেলাটি বৃষ্টির জন্য তৃতীয় দিন বন্ধ থাকে।

পাকিস্থান : সাসেক্স

সাসেক্স—প্রথম ইনিংস ২৭১ (ডগার্ট ১০১, পার্কস ৪৬, ওকম্যান ৪০, জুলফিকার আমেদ ৮১ রানে ৫ উইঃ)।

পাকিস্থান—প্রথম ইনিংস ২৭৯ (কারদার নট আউট ৯৯, আলিমুদ্দিন ৫১, হানিফ ৪৫, ওকম্যান ৬৪ রানে ৩ উইঃ)।

সাসেক্স—দ্বিতীয় ইনিংস (কোন উইকেট না হারিয়ে) ১৭১ (ল্যাংরিজ নট আউট ৮৫, স্মিথ নট আউট ৭৮)।

(খেলা অমীমাংসিত)

পাকিস্থান : ডেভনশায়ার

পাকিস্থান—প্রথম ইনিংস—(৭ উইঃ ডিঃ) ৩৯৬ (ওয়াকার হোসেন ১৩৭, হানিফ ৬৩, জুলফিকার আমেদ ৬১, সুকুর আমেদ ৫১, গজালী ৪১; কিলার্সলী ৮৭ রানে ৪ উইঃ)।

ডেভনশায়ার— প্রথম ইনিংসে ১৭৭ (ফেদারস্টোন ৫২, ব্রয় ৪৭, মামুদ হোসেন ৩২ রানে ৩ উইঃ, সুজাউদ্দিন ৩২ রানে ৩ উইঃ, মহম্মদ আসলাম ৪৩ রানে ৩ উইঃ)।

ডেভনশায়ার—দ্বিতীয় ইনিংস (৯ উইঃ) ১৬০ (কুপার ৪৮, সুজাউদ্দিন ৪২ রানে ৪ উইঃ)।

[খেলা অমীমাংসিত]

পাকিস্থান : হ্যাম্পশায়ার

হ্যাম্পশায়ার— প্রথম ইনিংস— ১৮৫ (ইংগলবি ৪৭, এগার ৪২, ফজল মামুদ ৬৮ রানে ৫ উইঃ, মামুদ হোসেন ২৮ রানে ২ উইকেট)।

পাকিস্থান— প্রথম ইনিংস— ১৬০ (ওয়াকার হোসেন ৪১, ক্যানিং ৩৩ রানে ৪ উইঃ, ডারে ৩৭ রানে ৩ উইকেট)।

হ্যাম্পশায়ার—দ্বিতীয় ইনিংস (৬ উইঃ ডিঃ), ১৩৮ (বার্ণার্ড নট আউট ১০১, এগার ৪৪)।

পাকিস্থান—দ্বিতীয় ইনিংস (৪ উইঃ) ৮৬ (হানিফ মহম্মদ ৩২, হিল ১২ রানে ২ উইকেট, বার্ণার্ড ১৮ রানে ২ উইকেট)।

[খেলা অমীমাংসিত]

টেলিভিশনে ভারতের টেনিস খেলা

ভারত ও ফ্রান্সের ডেভিস কাপের খেলা টেলিভিশনযোগে ইংলণ্ড এবং অপর সাতটি ইউরোপীয় দেশে প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছে। ১৩ই জুন প্যারিসে ভারত ডেভিস কাপের খেলায় ফ্রান্সের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

দেশবন্ধু স্মৃতি ভবনের জন্য আই এফ এ'র দান। গত ৫ই জুন রাজভবনে আই এফ এ'র সভাপতি শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জির হাতে ১০ হাজার টাকার একখানি 'চেক' দেশবন্ধু স্মৃতিভবনের জন্য দান করছেন। রাজ্যপালের ডানদিকে আই এফ এ'র সম্পাদক শ্রী এম দত্ত রায়কে দেখা যাচ্ছে

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৩১শে মে—পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভীমসেন সাচার আজ ১০৮ মাইল দীর্ঘ ভাখরা খালের উদ্বোধন করেন। শতদ্রু হইতে নিষ্কাশিত জল এই খালে গিয়া পড়ে। শ্রী সাচার এই অনুষ্ঠানে বলেন, যখন ভাখরার সবগুলি খালে জল প্রবাহিত হইবে, তখন প্রায় ১১ লক্ষ টন অতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হইবে।

১লা জুন—প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ ভুপালে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, এসিয়ার দেশসমূহের ভবিষ্যৎ অন্য রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হউক—ইহা তাঁহারা আর সহ্য করিবেন না। জেনেভা সম্মেলন সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী বলেন, এসিয়ার দেশগুলির সমস্যা আলোচনার জন্য ইউরোপে সম্মেলন আহ্বান করা হইবে এবং অন্য রাষ্ট্র কর্তৃক তাহাদের ভাগ্য নির্ধারিত হইবে—ইহা সত্যই আশ্চর্যের বিষয়।

কাঁচড়াপাড়া, হালিসহর, নৈহাটি, বাঁশবেড়িয়া এবং হুগলী-চুঁচুড়ার যেসব অঞ্চলে রেশন এলাকা রহিয়াছে, সেই সব স্থানে রেশনের দোকানের পরিবর্তে আগামী ৭ই জুন হইতে ন্যায্য মূল্যের চাউলের দোকান খোলা হইবে। ন্যায্য মূল্যের চাউলের দোকান হইতে সাত আনা সের দরে চাউল বিক্রয় করা হইবে।

২রা জুন—ভারতীয় এলাকা হইতে চোরাকারবারীদের ছিনাইয়া লইবার অভিপ্রায়ে ফরাসী ভারতের কয়েক শত নাগরিক বে-আইনীভাবে ভারতীয় অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া ভারতীয় পুলিশ কনস্টেবল ও শুল্ক বিভাগের কর্মচারীদের আক্রমণ করে। পণ্ডিচেরীস্থিত ভারতীয় কন্সাল জেনারেল ফরাসী ভারতের কমিশনারের নিকট এই কার্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

৩রা জুন—আজ রাত্রে কলিকাতা হইতে ১১ মাইল দূরে মধ্যমগ্রাম স্টেশনে ডাউন বরিশাল এক্সপ্রেসে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়। ডাকাতগণ রিভলবার দেখাইয়া একজন যাত্রীর নিকট হইতে ২৩০ টাকা ছিনাইয়া লইয়া চম্পট দেয়।

আমেদাবাদের সংবাদে প্রকাশ, দিউ-র পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ মজুদ করিতেছেন এবং সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন বলিয়া সীমান্ত এলাকা হইতে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে।

৪ঠা জুন—আজ কলিকাতায় ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ভগ্নী শ্রীযুক্তা উর্মিলা দেবী নিঃ ভাঃ জাতীয় নারী মহাসম্মেলনের ৪ দিনব্যাপী অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে প্রায় ৮৩০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। নারী সমাজের অধিকার ও দাবী সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সুষমা সেনগুপ্ত। শ্রীযুক্তা অনসূয়া জ্ঞানচাঁদ সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন।

আজ কোন্নগরের একটি চটকলের প্রায় ৬৪ হাজার টাকা লইয়া একব্যক্তি ডালহৌসী স্কোয়ার হইতে মোটর গাড়ীতে চম্পট দেয়। প্রকাশ, ঐ ব্যক্তি উক্ত চট কলেরই মোটরচালক।

আজ বোম্বাইয়ে একখানি সুবার্বন ইলেকট্রিক ট্রেন ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসের প্রায় ৮ মাইল দূরে একটি ওভারব্রীজের উপর একখানি মালগাড়ীর পিছনে ধাক্কা দিবার ফলে দুইজন রেল কর্মচারী নিহত ও ৪ জন যাত্রী আহত হয়।

৫ই জুন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই এ ও আই এস-সি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। এবার আই এ পরীক্ষায় শতকরা ৫১ জন এবং আই এস-সি পরীক্ষায় শতকরা ৪৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

খাদ্যে ভেজাল দূর করিবার উপায় সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে আজ উত্তর কলিকাতায় আজাদ হিন্দ বাগে এক জনসভা হয়। অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোরতর শাস্তি বিধানের উপযোগী আইন প্রণয়নের দাবী জানাইয়া সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীবিজয়সিং নাহার উহাতে সভাপতিত্ব করেন।

৬ই জুন—ম্যালেরিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৭ই জুন হইতে ১২ই জুন পর্যন্ত "জাতীয় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ" পালন করিতেছেন। এই সম্পর্কে এক বিবৃতিদান প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যবিভাগীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বলেন যে, ম্যালেরিয়া নিবারণকল্পে রাজ্য সরকার যেভাবে অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের আশা আছে, আগামী সাড়ে তিন বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ম্যালেরিয়ামুক্ত হইবে।

বিদেশী সংবাদ

৩১শে মে—পূর্ববঙ্গে হক মন্ত্রিসভার পদচ্যুতি সম্পর্কে পূর্ববঙ্গ আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী আজ লণ্ডনে বলেন, হক মন্ত্রিসভার পদচ্যুতি পাকিস্থানে ঘাটি স্থাপনের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রই প্রকাশ করিল।

পূর্ববঙ্গে গবর্নরের শাসন প্রবর্তিত হওয়ার দ্বিতীয় দিবসে আজ প্রদেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে ধরপাকড় হইয়াছে। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে দুই শতাধিক লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

১লা জুন—আজ করাচীতে পাক নিরাপত্তা আইন অনুসারে ৫ জন সাংবাদিক, ১ জন অধ্যাপক ও ১ জন চিকিৎসক সহ ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। হক মন্ত্রিসভাকে বাতিল করার প্রতিবাদে গতকল্য পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্টে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।

২রা জুন—পূর্ববঙ্গে ইস্ট পাকিস্থান রাইফেলসের ভার সৈন্য বাহিনীর হাতে অর্পণ করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে ইহার নিয়ন্ত্রণভার প্রাদেশিক পুলিসের হাতে ছিল। পূর্ববঙ্গে গবর্নরের শাসন প্রবর্তিত হইবার পর এ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ বিধানসভার নয়জন সদস্য সহ ৪২৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

৩রা জুন—পূর্ববঙ্গের রংপুরের মহেন্দ্রনগর বিমানঘাটিতে মার্কিন সৈন্যগণ সহ পাঞ্জাবী ও বেলুচ সৈন্যদল অবতরণ করিয়াছে এবং চট্টগ্রাম বন্দর হইতে বহু সংখ্যায় সৈন্য চলাচল আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

৪ঠা জুন—পূর্ববঙ্গের যশোহর এবং কোটচাঁদপুর সামরিক ঘাটিতে 'ইস্ট পাক রাইফেলস' বাহিনীতে যে সব বাঙ্গালী রহিয়াছে, তাহাদের সরাইয়া তাহাদের স্থলে পাঠান ও বেলুচ নিয়োগ করা হইতেছে। যশোহর জেলায় ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে। গবর্নর শাসনের প্রতিবাদে রবিবার বরিশালে সম্পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। শ্রীসতীন সেন গত ১লা জুন তাঁহার পটুয়াখালিস্থিত বাসভবন হইতে পাক-নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

৫ই জুন—পূর্ববঙ্গে গবর্নরের শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর এ পর্যন্ত ৫৮০ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

৬ই জুন—আজ জেনেভায় কোরিয়া সম্মেলনে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ মলোটভ কোরিয়া সমস্যার সমাধানকল্পে একটি ৫ দফা পরিকল্পনা পেশ করেন।

আজ ঢাকায় ইউনাইটেড ফ্রন্ট পার্লামেন্টারী পার্টির যে বৈঠক হইবার কথা ছিল, পূর্ববঙ্গের গবর্নর জননিরাপত্তা আইনে এক নির্দেশ জারী করিয়া সেই বৈঠক নিষিদ্ধ করিয়া দেন।
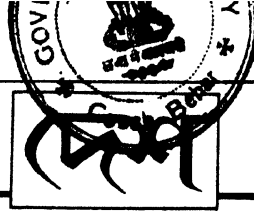
প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

বঞ্চিতকে রক্ষার ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমিদারী প্রথা বিলোপ করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু কায়েমী স্বার্থের ঘাটি আমাদের সমাজে নানাভাবে পাকা হইয়া গিয়াছে, তাহা সহজে ভাঙা যায় না। গভর্নমেণ্ট ভূমি-সংক্রান্ত ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য আইন প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইবামাত্র স্বার্থান্ধ জমিদার ও জোতদার শ্রেণী রায়ত ও ভাগচাষীদের উচ্ছেদ করিয়া জমি নিজেদের খাস দখলে আনিবার জন্য নানাবিধ অপকৌশল অবলম্বন করিতে থাকেন। এজন্য আইনের মধ্যে ফাঁক বাহির হইতে স্বার্থ-সংশিলষ্ট মহলের বেশি বিলম্ব ঘটে নাই। যেখানে প্রবলের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত, সেখানে মামলা-মোকদ্দমার পাকে পাকে দুর্বলকে মার খাইতে হয় এবং অবশেষে তাহারা সর্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। এইভাবে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সাত লক্ষ ভাগচাষী-পরিবার ধ্বংসের মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। অবস্থা ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করিতে থাকে এবং রায়তদের মধ্যে অসন্তোষের কারণ বৃদ্ধি পায়। এই পরিস্থিতির প্রতিকার সাধনের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নূতন অর্ডিন্যান্স জারী করিতে হইয়াছে। আমরা ইহা সর্বতোভাবে সমর্থন করি। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব হইতেই এ সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয়। এই সব সংস্কারে কতকটা বৈপ্লবিক রীতি থাকিবে এবং সেসব ক্ষেত্রে সরকারের নীতি দ্বিধা-বিজড়িত হওয়া উচিত নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এ সম্বন্ধে যে চৈতন্য ঘটিয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিতে গিয়া আইনঘটিত বা অন্য কোন প্রকার বাধার সম্মুখীন হইলে গভর্নমেণ্ট দ্রুত প্রতিকারের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুমাত্র দ্বিধা করিবেন না, স্বার্থ-সংশিলষ্ট মহল ইহা যত শীঘ্র উপলব্ধি করিয়া পরিবর্তিত অবস্থার সহিত নিজেদের স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধানের সুবুদ্ধি লাভ করেন, ততই মঙ্গল।

যুক্তি ও উক্তি

বিহার রাজনীতিক সম্মেলন বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানা পুনর্নির্ধারণ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের দাবীকে অযৌক্তিক উদ্ভট ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া বক্তৃতার পূর্ব-পরিকল্পনানুযায়ী যথারীতি নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেই সঙ্গে বর্ধমান, আসানসোল, মালদহ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং উড়িষ্যারও কতকটা অঞ্চল বিহারের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য পাল্টা দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে ইহা অপ্রত্যাশিত কিছুই নয়। প্রত্যুত এই অভিনয় জমাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই পুরুলিয়াকে এই অধিবেশনের ক্ষেত্রস্বরূপে নির্বাচন করা হইয়াছিল। সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে বিহারের অন্যতম মন্ত্রী ডাঃ অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ তাঁহার অভিভাষণে উদার তত্ত্বকথার অবতারণা করেন। তিনি রাজ্য পুনর্গঠনের আন্দোলন সম্পর্কিত অবাঞ্ছিত বিতর্কের নিন্দা করেন এবং সমগ্রভাবে ভারতের স্বার্থের সম্বন্ধে সকলকে অবহিত থাকিতে উপদেশ দেন। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলিতে তাঁহার এই মন্তব্যের মর্যাদা কতটা রক্ষিত হইয়াছে, এই সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিবে। প্রস্তাবকেরা তবে কি সভাপতির বিরোধী ভাবে কাজ চালাইয়াছেন? বস্তুত তেমন মনে করিবার কারণ নাই। ফলত সভাপতি তাঁহার বক্তৃতায় বঙ্গভাষা এবং বঙ্গ-ভাষাভাষীদের সম্বন্ধে বিহার সরকারের অবলম্বিত নীতির মাহাত্ম্য-কীর্তনে যে বস্তু গুপ্ত রাখিয়াছিলেন, প্রস্তাবকদের মুখে নিতান্ত নির্লজ্জ স্তাবকতায় উদ্দীপ্ত হইয়া তাহাই অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। সুতরাং মূল ভাবের দিক হইতে বিরোধ কিছুই ঘটে নাই। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বর্ধমান, মালদহ, জলপাইগুড়ি এসব বিহারের জন্য দাবী করিবার যৌক্তিকতা যাঁহাদের মূল্যবান মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইল, খাস কলিকাতা শহরকে তাঁহারা বাদ দিলেন কেন? জনগণের অভিমতের যুক্তি এক্ষেত্রে উত্থাপন করিবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? বিহারের বঙ্গ ভাষাভাষী অঞ্চলের জনমতকে পিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে যাঁহাদের নীতি ক্রমাগত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এবং প্রাদেশিক মনোবৃত্তিতে প্রভাবিত হইয়া চলিয়াছে, তাঁহাদের মুখে ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ এবং সংহতির বড় বড় কথা নিশ্চয়ই শোভা পায় না।

পূর্ববঙ্গের দাবী

পূর্ববঙ্গের ভূতপূর্ব গভর্নর এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নূন নিশ্চয়ই কম্যুনিস্ট নহেন। তিনি পাকিস্থান রাষ্ট্রের অনিষ্ট চিন্তা করিবেন, তাঁহার অতিবড় শত্রুও তাঁহার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উত্থাপন করিতে সাহস পাইবেন না। সম্প্রতি পূর্ববঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, পূর্ববঙ্গ কেন্দ্রীয় শাসন-শক্তির কিছুটা সঙ্কোচ সাধনের জন্য যে দাবী উত্থাপন করিয়াছে, পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধিগণ যদি সেই দাবী পূরণের জন্য সত্যই আগ্রহী হন, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকারকে উক্ত দাবী স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। শুধু ইহাই নয়, মালিক ফিরোজ খান নূন নিজেও পশ্চিম পাকিস্থানের জন্য অনুরূপ দাবী উত্থাপন করিয়াছেন। ফলত পূর্ব-পাকিস্থানের 'অটোনমী' দাবী করিয়া পূর্ববঙ্গের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ অযৌক্তিক কিছু করেন নাই। জনাব ফজলুল হক নির্ভীকভাবে জনগণের সেই মত অভিব্যক্ত করিয়া কারারোধযোগ্য অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন, এমন যুক্তিও অপূর্ব। পূর্ব-পাকিস্থান আওয়ামী লীগের সহকারী সভাপতি জনাব আতাউর রহমান সেদিন একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা পূর্ববঙ্গে গভর্নরের শাসন যাহাতে অল্পকাল স্থায়ী হয়, সেজন্য চেষ্টা করিবেন। কিন্তু যাঁহারা জনগণের প্রতিনিধি, তাঁহাদের মত প্রকাশের সুবিধা যদি না থাকে, এবং জনমত নিয়ন্ত্রণের সর্ববিধ অধিকার হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হন, তবে সে সুযোগ দেখা দেওয়া সম্ভব নয়। পূর্ববঙ্গের গভর্নর মোল্লা-মতবাদকে পাকিস্থানের দ্বিতীয় শত্রু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গের শাসন-নীতি যেভাবে আবর্তিত হইতেছে, তাহাতে জনস্বার্থপ্রণোদিত বলিষ্ঠ রাজনীতিক চেতনা বিকাশের পথ সেখানে রুদ্ধ হইয়াছে এবং মোল্লাবাদই কার্যত পরিস্ফীত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইতেছে।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা

সম্প্রতি শ্রীনগরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের পুনর্বাসন বিভাগের মন্ত্রীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সম্মেলনে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন সচিব শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন যে অভিভাষণ দিয়াছেন, তাহাতে সুস্পষ্ট ভাষাতেই এই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার অল্প দিনের মধ্যেই পুনর্বাসন দপ্তর যাহাতে তুলিয়া দেওয়া যায়, সেজন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন-ব্যবস্থা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং পুনর্বাসন দপ্তর বজায় রাখিবার প্রয়োজন নাই, ভারত সরকার সম্ভবত ইহাই বুঝিয়া লইয়াছেন। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সমস্যা সমধিক গুরুতর এবং সে সমস্যা অদ্যাপি অমীমাংসিতই রহিয়া গিয়াছে, সরকার সম্ভবত ইহা ভুলিয়া গিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ নরনারী নিরাশ্রয় অবস্থায় এখনও দিন কাটাইতেছে এবং জীবিকার অভাবে দিন দিন মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে। প্রথমত পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের হিসাবের সম্বন্ধে অভিযোগের কারণ রহিয়াছে। ১৯৫০ সালের পরে যাহারা পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়াছে, সরকারী হিসাবে তাহাদিগকে উদ্বাস্তুস্বরূপে গণ্য করা হইয়াছে; কিন্তু ১৯৫০ সালের পূর্বে হইতে যাহারা পশ্চিমবঙ্গে ছিল, কিন্তু পরে পূর্ববঙ্গের বাস্তুভিটার আশা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাদিগকে এই হিসাবের মধ্যে লওয়া হয় নাই, অথচ ইহারাও গৃহহীন এবং উদ্বাস্তু। উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে সরকারী এবং বেসরকারী হিসাবের এই গরমিলের এপর্যন্ত কোন মীমাংসা হয় নাই। সরকার পক্ষ তাঁহা[illegible] সংজ্ঞার সঙ্কীর্ণতার মধ্যে থাকিয়া ক[illegible] অগ্রসর হইতেছেন। এ সম্বন্ধে অ[illegible] যোগের কারণ সুস্পষ্ট। পূর্ববঙ্গে[illegible] উদ্বাস্তু সমস্যাকে বাস্তবের দিক হই[illegible] বিচার বিবেচনা করিয়া সরকারী হিসাবে[illegible] সংশোধন করিয়া লওয়া কর্তব্য। প্রকৃ[illegible] পক্ষে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মন্ত্রিত্বে[illegible] আমলে উদ্বাস্তুদের সরকারী সংজ্ঞা[illegible] নির্দেশে এই ভুলটি প্রথমে করা হয় এব[illegible] এখনও সেই ভুলই অসংশোধিত রহিয়াছে[illegible] পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবিলম্বে এজন[illegible] চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, আমাদের মনে[illegible] হয়। তাঁহারা যদি কেন্দ্রীয় সরকারের উপর[illegible] এজন্য চাপ দেন, তবে তাঁহারা সে ন্যায্য[illegible] দাবী উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। হিসাবের এই অবিচারের মধ্যেও পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে সরকারের কর্মতৎপরতা সন্তোষজনক নয়। সরকারী সংজ্ঞা অনুসারে যাহারা উদ্বাস্তু, তাহাদের সংখ্যা সরকারী হিসাব অনুসারে ৩১ লক্ষ, বেসরকারী-মতে ইহাদের সংখ্যা ৪৫॥ লক্ষের কম নয়। এই সংখ্যার মধ্যে ১৫ লক্ষ উদ্বাস্তু নরনারীর এ পর্যন্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে; অবশিষ্ট সরকারী হিসাব অনুসারে ১৬ লক্ষ এবং বেসরকারী হিসাবমতে ৩০॥ লক্ষ নরনারী এখনও নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়িয়া আছে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার উভয়পক্ষ হইতে চেষ্টার ফল যদি এ পর্যন্ত এইরূপ হইয়া থাকে, তবে রাজ্য সরকারের উপর অবশিষ্ট উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ভার ছাড়িয়া দিলে তাহাদের অদৃষ্টে কি ঘটিবে, সহজেই অনুমেয়। একা রাজ্য সরকারের পক্ষে এই ঝুঁকি সামলাইয়া লওয়া কিছুতেই যে সম্ভব নয়, সহজেই বোঝা যায়। এরূপ অবস্থায় ভারত সরকার পুনর্বাসন দপ্তর যদি তুলিয়া দেন, তবে তাঁহাদের সেই নীতি পশ্চিমবঙ্গের জনগণের উপর নিশ্চয়ই প্রীতিকর প্রভাব বিস্তার করিবে না।

বৈদেশিকী

প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের সঙ্গে দেখা করার জন্য বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী স্যার উইন্সটন চার্চিল ২৫শে জুন ওয়াশিংটনে যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ইডেনও যাবেন। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডালেস চার্চিল সাহেবের ওয়াশিংটন যাওয়ার কথাটাকে একটা মামুলি ব্যাপার বলে অভিহিত করেছেন। বলেছেন, কোনো বিশেষ জরুরী অবস্থার উদ্ভবের ফলে চার্চিল-আইজেনহাওয়ার সাক্ষাৎকার ঘটছে তা নয়। বৃটিশ হাউজ অব কমন্সে এখবরটি জানানোর সময়ে চার্চিল সাহেব বলেন যে, ওয়াশিংটনে যাবার নিমন্ত্রণ তিনি কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই পেয়েছিলেন। অর্থাৎ লণ্ডন এবং ওয়াশিংটন উভয় দিক থেকেই সরকারী মহল এই ধারণা সৃষ্টি করতে চাচ্ছে যে, হঠাৎ কোনো গুরুতর জরুরি অবস্থার উদ্ভব হয়নি।

হঠাৎ হয়ত হয়নি, কিন্তু অবস্থার যে-রকম যোগাযোগ হয়ে আসছে, তাতে মার্কিন ও বৃটিশ সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের মধ্যে নীতি নির্ধারণের জন্য সলাপরামর্শ করার প্রয়োজন অতি সুস্পষ্ট। জেনেভা কনফারেন্স ভাঙ্গে ভাঙ্গে, কোরিয়া সম্পর্কিত অংশতো ভেঙ্গে গেছেই। কোরিয়া সমস্যা যেখানে ছিল, সেখানেই ছিল, কোরিয়ার ঐক্য সাধনের উপায় সম্বন্ধে দুই পক্ষের মতের অমিলের বিন্দুমাত্র হ্রাস হোল না। তবে কোরিয়া সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করার কারণ ছিল না। জেনেভা কনফারেন্সের আসল গুরুত্ব ছিল ইন্দোচীনের ব্যাপার নিয়ে। সেদিক দিয়েও তো কনফারেন্সের ব্যর্থ হবার সম্ভাবনাই প্রকট হয়ে উঠেছে। যদি শেষ মুহূর্তে আশ্চর্য ব্যাপার কিছু না ঘটে, তবে ইন্দোচীন সম্বন্ধে মতদ্বৈধ জাহির করেই জেনেভা কনফারেন্স শেষ হবে বলে মনে হয়। চার্চিল সাহেব বলেছেন যে, আগামী মঙ্গলবার মিঃ ইডেন বৃটিশ পার্লামেন্টে জেনেভা কনফারেন্স সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দেবেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, যা হবার এই সপ্তাহের মধ্যেই হয়ে যাবে। হয় দু তিন দিনের মধ্যে একটা মীমাংসার পথ বার হবে, নয়ত কনফারেন্সের ব্যর্থতা ও অবসান ঘোষিত হবে।

কিন্তু ততঃ কিম্? ইন্দোচীন তথা সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়া অঞ্চল সম্পর্কে কি কর্তব্য সে বিষয়ে মার্কিন, বৃটিশ ও ফরাসী নীতির মধ্যে ঐক্যের অভাব দেখা গেছে। আমেরিকাতে জেনেভা কনফারেন্সের মীমাংসার চেষ্টাকে প্রায় গোড়া থেকেই খরচের খাতায় লিখে বসে আছে। আমেরিকার মোটামুটি ধারণা হচ্ছে এই যে, সামরিক দিক থেকে সামর্থ্যের প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত কম্যুনিস্ট পক্ষ পশ্চিমী

শক্তিদের মনঃপূত কোনো মীমাংসায় রাজি হবে না। সেইজন্য ইন্দোচীনে ফরাসী ইউনিয়নের সৈন্য বাহিনীর দিক থেকে সামরিক পরিস্থিতির উন্নতি করার উপর আমেরিকা জোর দিয়ে আসছে। ইন্দোচীনের সামরিক পরিস্থিতি ফরাসী ইউনিয়নের অনুকূল করা যে একলা ফরাসীদের (মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র বিমান প্রভৃতির সাহায্য পেয়েও) কর্ম নয়, সেটা বুঝা গেছে। তাই আমেরিকা সরাসরি ইন্দোচীনের যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার পক্ষপাতী ছিল, নিদেনপক্ষে জোর হুমকি দেওয়ার। কিন্তু হুমকিতে ফল হয় নি, কারণ কম্যুনিস্ট পক্ষ বুঝেছে যে, আমেরিকা বর্তমান অবস্থায় একলা লাগতে রাজি নয়, বৃটিশদের সঙ্গে না পেলে। কিন্তু বৃটেন এগুতে চাচ্ছে না, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কোনো নূতন সামরিক ভার ঘাড়ে নিতে চাচ্ছে না বিশেষ করে যেখানে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ লেগে যাবার একটি সম্ভাবনা রয়েছে।

কিন্তু ভিয়েৎমিন যুদ্ধে জিতেও তার সুবিধা কেন ছেড়ে দেবে? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা বৃটেন করছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির নৈতিক সমর্থন সংগ্রহের দ্বারা। ভারত, পাকিস্থান, বর্মা প্রভৃতি দেশের নৈতিক সহানুভূতির খাতিরে কম্যুনিস্ট পক্ষ সামরিক পরিস্থিতির পুরো সুযোগ নেবার চেষ্টা করবে না, এই বোধ হয় ছিল বৃটেনের আশা। সে আশা নিষ্ফল প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে পথে আনার জন্য খুব বেশি চাপ দেওয়া আমেরিকার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফ্রান্সেরও মার্কিন নীতি সম্বন্ধে দ্বিধা ও আপত্তির কারণ আছে। ইন্দোচীনের যুদ্ধে ফ্রান্স সরাসরিভাবে আমেরিকা, বৃটিশ প্রভৃতিকে শরিক করতে চায় না। কারণ তাহলে ইন্দোচীনে ফ্রান্সের একান্ত নিজস্ব প্রভাব এবং স্বার্থ বা তার অবশেষটুকুও বাঁচিয়ে রাখার আশা থাকবে না। সেইজন্য ভিয়েৎমিনের সঙ্গে কেবল ফ্রান্সের একটা রফা ফরাসীদের কাম্য, তারা ইন্দোচীনের যুদ্ধকে 'internationalise' করতে চায় না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ফ্রান্স মীমাংসার যে সর্ত চাচ্ছে, তা যুদ্ধে হেরে পাওয়া যায় না। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রকে খাতির করার জন্য কম্যুনিস্ট পক্ষ যে রাজি হয়ে যাবে, তার সম্ভাবনাও বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং জেনেভা কনফারেন্স সমস্যার কোনো মীমাংসা না করেই ভেঙ্গে যাবে সকলকে এই আশঙ্কার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

জেনেভা কনফারেন্স ভেঙ্গে গেলে বৃটেন ও ফ্রান্সের উপর মার্কিন নীতির অনুসরণ করার জন্য চাপ বৃদ্ধি হবে। সম্প্রতি ওয়াশিংটনে কয়েকটি রাষ্ট্রের সামরিক প্রতিনিধিদের মধ্যে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার 'প্রতিরক্ষা' সম্বন্ধে যে আলাপ-আলোচনা হয়ে গেল, সেটাকে ভবিষ্যত কর্মধারার জন্য প্রস্তুতির একটা অংশ বলে মনে করা অন্যায় হবে না। তবে যুদ্ধের ক্ষেত্র বিস্তৃত হবার সম্ভাবনা-সমন্বিত কোনো কর্মনীতিতে সহজে চার্চিল সাহেবকে রাজি করানো যাবে না, কারণ বৃটিশ লোকমত তার জন্য এখনো প্রস্তুত নয়। চার্চিল সাহেব প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন শুনে বৃটিশ পার্লামেণ্টে মিঃ এটলী এই আশা প্রকাশ করেছেন যে, এই সাক্ষাৎকারের দ্বারা 'আরো কথাবার্তা'র পথ অর্থাৎ সোভিয়েট বড়কর্তার সঙ্গে পশ্চিমী বড়কর্তাদের সাক্ষাৎ কথাবার্তার পথ সুগম হবে। কিছুদিন পূর্বে হাইড্রোজেন বোমার ব্যাপার নিয়ে বৃটিশ পার্লামেণ্টে বিতর্কের সময়ে এই রকম 'টপ্ লেভেল' সাক্ষাৎকার ও আলোচনার জন্য আশা প্রকাশ করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই আইডিয়াটি চার্চিল সাহেবের নিজেরও খুব প্রিয়। রাজনী থেকে অবসর গ্রহণ করার পূর্বে আইডিয়াটিকে বাস্তবে রূপান্তরিত ক যাবার সাধ চার্চিল সাহেবের খুবই থাক কথা। চার্চিল সহেব 'শীঘ্রই' অবসর গ্র করবেন এই গুজব বেশ কিছুদিন থে ক্রমগত শুনা যাচ্ছে। চার্চিল সাহেবের কি মতলব তা সঠিক বলা যায় ন সম্প্রতি আবার কনজারভেটিব পার্টি মধ্যে একদল চার্চিল সাহেবকে সরাবা পক্ষপাতী হয়ে উঠেছে। এই দল পার্লা মেণ্টের মেম্বারদের মাইনে বাড়াবা বিরুদ্ধে ছিল। পার্লামেণ্টে অধিকসংখ্য ভোটে মাইনে বাড়াবার প্রস্তাব গৃহী হয়েছে। উপরোক্ত দল এই প্রস্তাব অনুযায় কাজ করতে গভর্নমেণ্টকে নিষেধ কর এবং চার্চিল সাহেব পার্লামেণ্টে গৃহী প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করতে চান ব তাঁর উপরে ক্ষেপেছে।

যাই হোক তার রাজনৈতিক জীবনের অবসানের পূর্বে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে একটা শেষ নাটকে অংশ গ্রহণ করার আগ্রহ চার্চিল সাহেবের পক্ষে থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু জেনেভা কনফারেন্স ব্যর্থ যদি হয়, তবে তার অব্যবহিত পরেই সোভিয়েট বড়কর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ-আলাপের প্রস্তাব আমেরিকার বরদাস্ত হবে কি? তবে বিশ্বশান্তি রক্ষার শেষ চেষ্টা বলে যদি ব্যাপারটাকে পৃথিবীর বিশেষ করে আমেরিকার জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে একটা ভাবাবেগের প্লাবন চার্চিল সাহেব সৃষ্টি করতে পারেন, তবে মার্কিন গভর্নমেণ্ট কাবু হতেও পারেন। কিন্তু তার সম্ভাবনা অল্প। অপর পক্ষে বৃটিশ জনমতের বর্তমান অবস্থায় সামরিক ঝোঁকওয়ালা জবরদস্ত নীতি বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষে স্বীকার করে নেওয়াও কঠিন হবে। ফ্রান্সের ব্যাপারতো আরো গোলমেলে, এক মন্ত্রিসভা তো গেল। তার জায়গায় নূতন মন্ত্রিসভা ঠিকমতো কতদিনে বসতে পারবে বা কতদিন বসে থাকতে পারবে, তা বলা মুশকিল। সুতরাং জেনেভা কনফারেন্স ভেঙ্গে যদি যায়, তা হলে তার সঙ্গে সঙ্গেই যে আমেরিকা বৃটেন ও ফ্রান্সকে পুরোপুরি নিজের মতে আনতে পারবে, সেবিষয়ে সন্দেহ আছে।

১৬।৬।৫৪

ট্রামে অত্যন্ত ভীড়। কোন একটি স্টপে আসিয়া ট্রাম থামিল এবং লেডিস সীট হইতে দুইটি মহিলা নামিয়া গেলেন। এত বড় সৌভাগ্য সহজে মেলে না, কাজেই ধাক্কাধাক্কি শুরু হইয়া যায় এবং যোগ্যতমের ভাগেই সীট পড়ে। বিজয়গর্বে বঞ্চিত ভাগ্যহীনদের প্রতি তাকাইয়া তাঁরা গদিতে সমাসীন হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই একজন অন্যজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"বসলাম বটে, কিন্তু এ যেন পাকিস্তানে বসা, কখন যে উঠে যেতে হবে, তার ঠিক নেই।" —এই মর্মান্তিক পরিহাসেও আমরা হাসিলাম!!

* * *

স্বনামখ্যাত জনাব সুরাবর্দি মন্তব্য করিয়াছেন যে, পূর্ব-পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন প্রবর্তন যুক্তিযুক্তই হইয়াছে—"And Surahwardy is an honourable man"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

জনাব ইস্কিন্দার মির্জা হিন্দুদিগকে যুক্ত বঙ্গের 'স্বপ্ন' দেখিতে বারণ করিয়াছেন। —"কিন্তু স্বপ্ন কণ্ট্রোল করা মানুষের হাতে নেই; অবশ্যি জেগে জেগে যাঁরা ঘুমোন এবং ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেন, তাঁদের ইয়াংকী কায়দার স্বপ্নের কথা আলাদা"—চোখ বন্ধ করিয়া, বোধহয় প্রায় ঘুমাইতে ঘুমাইতেই বলে শ্যামলাল।

* * *

শ্রীযুত জওহরলাল তাঁর সিমলায় প্রদত্ত এক সাম্প্রতিক ভাষণে

বলিয়াছেন যে, আমাদের সমস্যা নীচে থাকার কালে যত বড় মনে হইয়াছিল, এখানে আসিয়া দেখা গেল, তা তত বড় নয়। —"শুধু পাহাড়ের ওপর কেন, সমস্ত ওপরেরই কোন সমস্যা নেই, সমস্যার ঝড়-ঝাপ্টা নীচেকার মানুষের ওপর দিয়েই যায়"—বলিলেন বিশু খুড়ো।
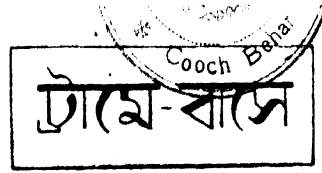
* * *

আমেরিকার এক সংবাদে প্রকাশ যে, এ বছরে এত ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে যে, তা পূর্বেকার সমস্ত রেকর্ড ছাড়াইয়া গিয়াছে। —"সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, এবার কপালে চাল বাড়ন্ত"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, কোন এক মামলার শেষে কলিকাতার এক কাছারির প্রাঙ্গণে নাকি দুইজন উকিল ঘুষাঘুষি করিয়াছেন। —"উকিলের সঙ্গে

কিলের যোগাযোগ আছে বলে কিলটা, চড়-চাপড়টাই মানানসই হতো, ঘুষোঘুষিটা সত্যিই একটু বেয়ারা মার"—বলিলেন আমাদের এক সহযাত্রী।

* * *

ডাঃ কেশকার বলিয়াছেন যে, সিনেমায় যাহাতে 'লারেলাপ্পা' জাতীয় সংগীতের পরিবর্তে উচ্চাঙ্গ সংগীতের নিখুঁত সুরসম্বলিত সংগীত পরিবেশন করা হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে। —"কিন্তু যাঁরা সারেগার চেয়ে মারেগার অনুরাগী, তাঁরা কি এই ব্যবস্থায় খুশি হবেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকরা ঘোষণা করিয়াছেন যে, শুক্রগ্রহে নাকি অবিলম্বে এবং যে কোন সময়ে জীবন সঞ্চারের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। —"আমেরিকার বৈজ্ঞানিকরা অবিলম্বে এবং যে কোন সময়ে শুক্রগ্রহে মারণাস্ত্র ব্যবহারের চেষ্টা করবেন বলেই মনে হয়"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

কোন এক বেসবল খেলায় আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইসেনহাওয়ার 'No' বলিতেছেন, এই অবস্থার একখানা ছবি সম্প্রতি খবরের

কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"বেসবল খেলার বাইরেও আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 'না' তিনি অনেকবারই বলেছেন, শুধু ফটোগ্রাফার সেই ছবি ধরতে পারেন নি। এই কথাটা আপনি না বলুন, আমি না বলি, কিন্তু এমন অনেকে আছেন, যাঁরা বলে থাকেন'!!

* * *

বিলাতের "ম্যাঞ্চেস্টার গার্জিয়ান" কাগজ মন্তব্য করিয়াছেন—শ্রীযুত নেহরু এই গর্ব করিতে পারেন যে, দিল্লী হইল এশিয়ার স্কুল। —"কিন্তু আমাদের যদ্দূর মনে হয়, স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার কেলেঙ্কারীর পর স্কুলের গর্ব আর কেউ করবেন না, নেহরুজী তো নয়ই। তাছাড়া উচ্চশিক্ষার জন্য যে নূতন ধরনের কলেজ স্থাপনের চেষ্টা করাচীতে চলছে, এর পর স্কুলের গর্ব আর চলে না"—কথাটা বিশু খুড়োই বলিলেন।
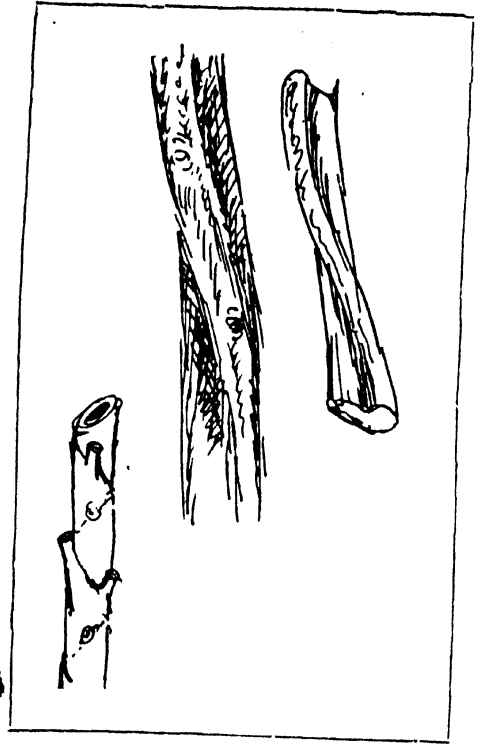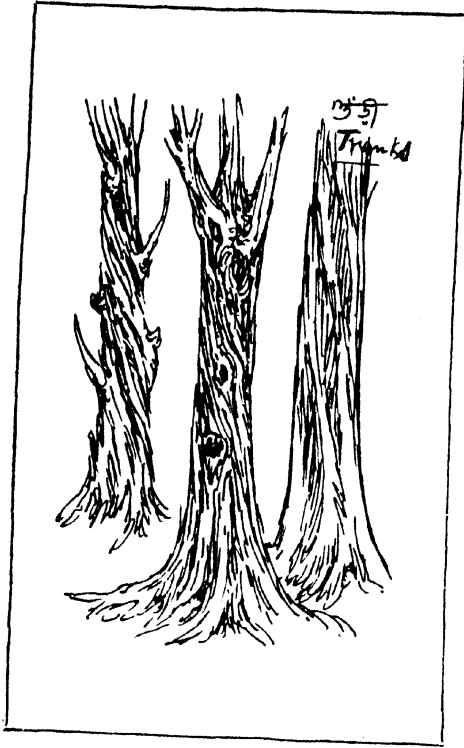
গাছের গুঁড়িরও বেড়ে ওঠার মধ্যে একটি ছন্দ আছে। সেই ছন্দটি শিল্পশিক্ষার্থীর কাছে ধরিয়ে দেবার জন্যে কয়েকটি নক্সা এঁকে দেখিয়েছেন শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসু

শিল্পচর্চা

১ ২ ৩ ৪ ৫

পেয়ারা শিরীষ-মহানিম শাল বাঁশ

তাল খেজুর কচু পেঁপে

গাছপালার ভারভঙ্গী গঠন
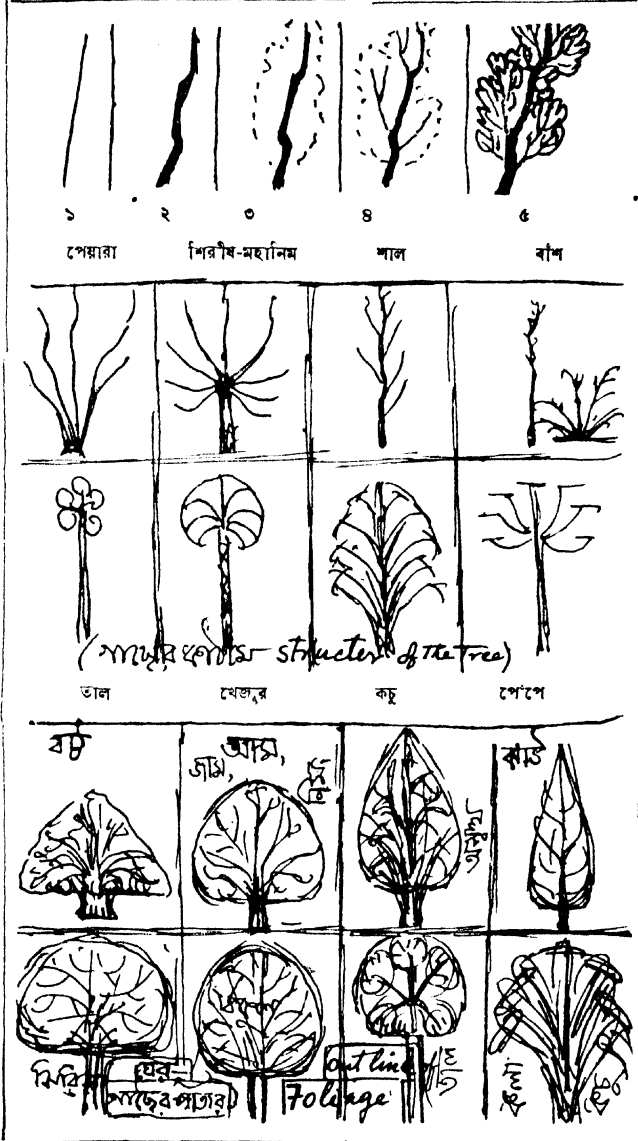
১ ভারসাম্য রক্ষা ক'রে গাছের দাঁড়ানো।

২ গাছের গুঁড়ির বাঁক।

৩ পুরো গাছের পাতার ঝোপের মোটের উপর আভাস, হাল্কা হাতে।

৪ গুঁড়ির বাঁক থেকে ছোটো ছোটো ডাল ও ফেঁকড়ি।

৫ ছোটো ছোটো ডাল ও ফেঁকড়ি ঘিরে পাতার গোছা।

দ্বিতীয় পর্যায়ের নক্সায় দেখানো হয়েছে পেয়ারা, শিরীষ, শাল, বাঁশ প্রভৃতি গাছপালার মূল কাঠামো। জীবের যেমন অস্থিসংস্থান বা অ্যানাটমি, গাছের তেমনি এই কাঠামো।

গাছের গুঁড়ি যেন তার শিরদাঁড়া; সেটির গতি-প্রকৃতি প্রথমেই ছুঁকে নিতে হয়। পরে বহু শাখা প্রশাখা নিয়ে তার মূল কাঠামোখানা। সবশেষে পাতার গোছায় পল্লবে ঘেরা গাছের সামগ্রিক চেহারা বা আউট্‌লাইন—ভিন্ন গাছের ভিন্ন রকম হয়ে থাকে।
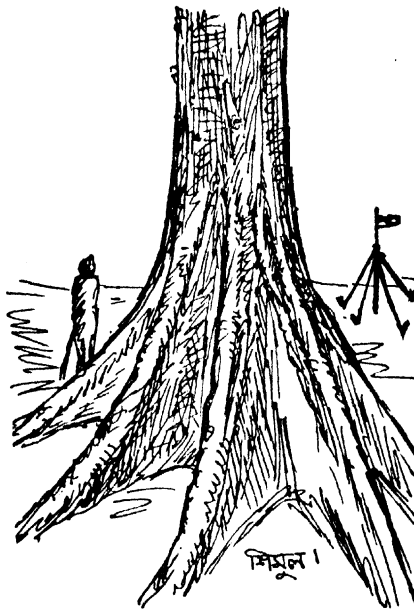
অংকুর থেকে বেড়ে বেড়ে গাছ বড়ো হয়ে উঠলো। ঝড়বৃষ্টি সামলে দীর্ঘকাল টিকে থাকবার প্রয়োজনে মজবুত হল তার গুঁড়ির গড়ন। দ্রব্যভার আর শক্তির (প্রয়াসের) পরিমিত ব্যবহারের দিকেও প্রকৃতির হুঁস আছে সর্বদাই। তাই, কোনো গাছের গুঁড়ি প্যাঁচ দিয়ে বেড়ে উঠছে, কোনো গুঁড়ির বা শিরওআলা চেহারা, কোনো গাছ বা (যেমন শিমুল) তাঁবুর মূল খুঁটি যেভাবে মাটিতে দখল জারি করে ঠিক তারই অনুরূপ কৌশলে ভূমিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করল।

বাঁশ, নলখাগ্ড়া, তাল এসব জাতের গাছের জন্যে অন্য ব্যবস্থা। লোহার শিকের চেয়ে লোহার নল বেশি শক্ত একথা মানুষ জেনেছে সভ্যতা-উদ্ভবের বহু সহস্র বৎসর পরে, খুব সম্ভব স্বভাব-পর্যবেক্ষণেরই ফলে। ওদিকে বট চারিদিকে দীর্ঘ সব শাখা প্রসারিত ক'রে, বয়সের ভারে আর বস্তুর ভারে যাতে মাটিতে না লুটোতে হয়, সেজন্যে সময় থাকতেই কিছুদূর অন্তর অন্তর ঝুরি নামিয়ে দেয়, সময়ে খুঁটির মতো সেগুলি বড়ো বড়ো বুড়ো ডালকে ধরে রাখে। শিবপুর সরকারী বাগানের বিখ্যাত বটগাছটি তো এই রকম শত শত ঝুরির উপরেই দাঁড়িয়ে আছে— আদিম কান্ড কোথায় বলাই মুশকিল।
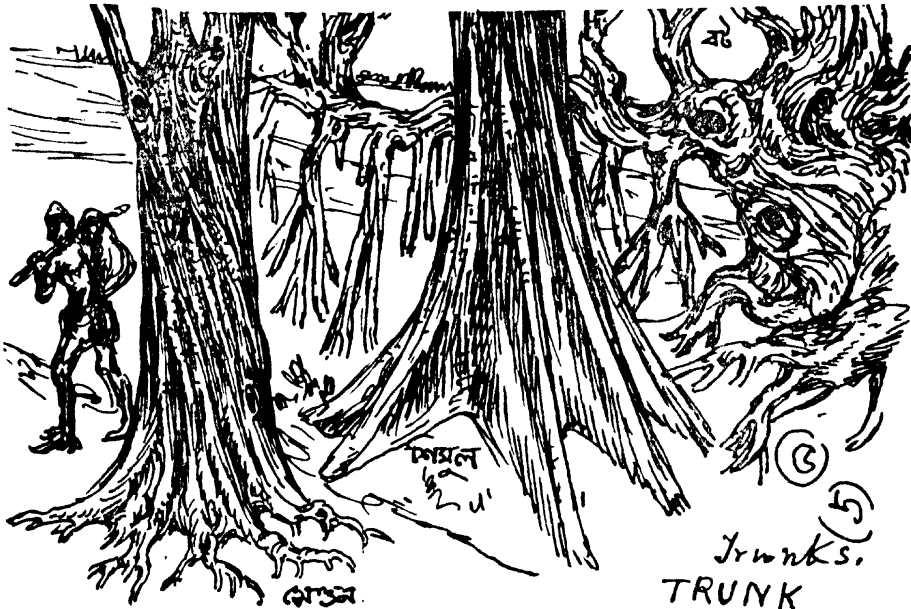
গাছের গাঁট। পচা ডালের গোড়া
গাছ মেরামত করে নিয়েছে।

ছেঁড়া ছালের দরুণ যে ক্ষতচিহ্ন তার ধারগুলি
যেন সেলাই ক'রে সারা হয়েছে।
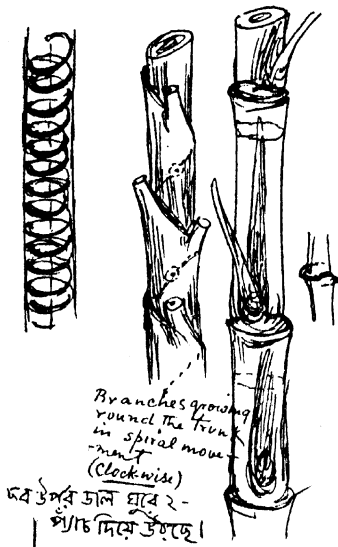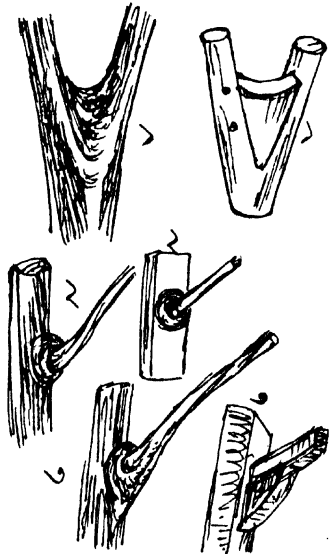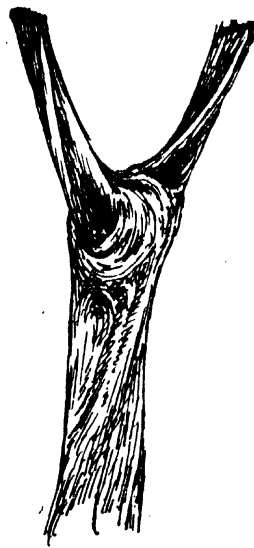
গুঁড়ি থেকে ডাল বেরোল। মজবুতির জন্যে জোড়ের মুখে কত ব্যবস্থা।
মানুষ ছুতোর যেন গাছের কাছেই পাঠ নিয়েছে।
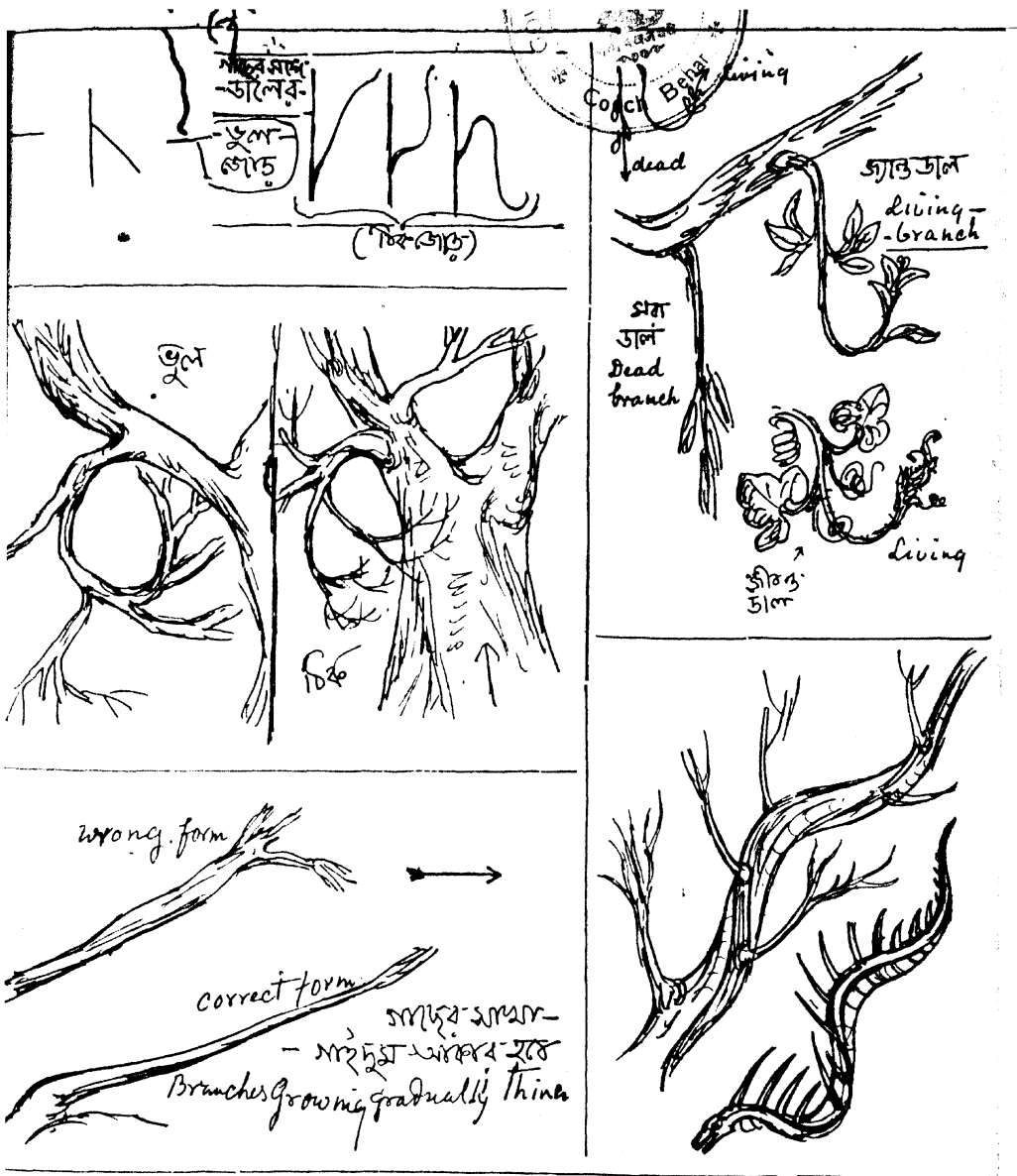
নক্সাতেই সব কথা বলা হয়েছে। শেষ নক্সায় দেখানো হয়েছেঃ সাপের শিরদাঁড়ায় কাঁটার মতো ডালের পিঠে ছোটো ছোটো ডাল গজায়। সাপের মতোই ডালেরও পিঠ আর পেট আছে, যে দিকটা উপরের আলোয় আছে, যে দিকটা ছায়ায়।

আকাশিনী ও মৃন্ময়ী

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

দুপুরের মরু হাঁক দিলো যেই—বিকেল বন্যা এখনো দূর!

চান-করা-চুল শুকানো দুপুর থেকে ব'লে ওঠে অম্নি সে—
সে-বানে তখন ভাস্‌বে কে?

কথাহারা বুকে কথার ফোয়ারা মুক্ত হয়
ওঠে নিরন্ত কথার সুর—
'ঊর্ণার মতো চুল যার আর চিন্তার মতো পাকানো জট
বন্যার মতো উচ্ছল যার দেহের ঘট
বিকেল বন্যা সেই কন্যার ভাসাক মুখ।
আলো-বন্যার স্বর্ণিল সেচে ভিজোক বুক!
কনে-দেখা-আলো সে কনের মুখ ধুইয়ে দিক
আলোকে ও গানে হাসিয়ে ভাসিয়ে আভাসিত ক'রে দিক হৃদয়।'
রোদের দস্যু সেই শুনে হ'লো বিবর্ণ-হওয়া হলুদ পট...
দুপুরের রোদ ম'রে প'ড়ে থাকে নির্নিমিখ!
জান্‌লাপ্রান্তে কী কথা জানতে চুপিচুপি হাওয়া-বিকেল বয়!

বৈকালী-চুল-বাঁধা-আরশির সামনে দাঁড়িয়ে বললো সে—
'এখন তাহ'লে হাসবে কে?'
উত্তর হ'লো—'হাসো তুমিই।
ভোরের আভায়ও হাসো তুমিই,
বিকেলের বানে ভাসো তুমিই,
রাতকেও সম্ভাষো তুমিই,
তপ্ত নিদাঘে শ্বসিত তোমারই বুকের শ্বাস—
মুখভার হ'লে মনে হয় মেঘ,
ঝঞ্ঝা সে যেন আহত আবেগ,
অশ্রু দেখ্‌লে মনে হয় বুঝি শ্রাবণ মাস!
সেই তুমি!
যে আছে ছড়িয়ে
গিয়েছে ছাড়িয়ে
আকাশ-পৃথিবী যার ব্যাপ্তির লীলাভূমি!'
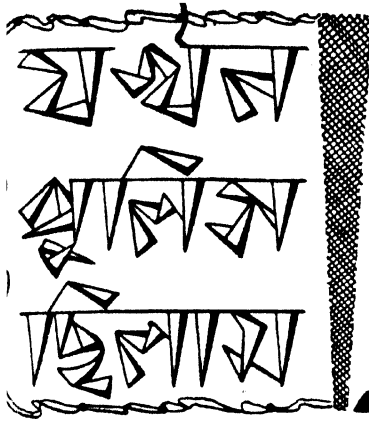
—উপসংহার—

কাহিনী এখনও শেষ হয়নি, আর একটুখানি বাকি আছে।

রবিবার। সকালে ঘুম থেকে উঠে
ড় কামিয়ে স্নান করে খেয়ে নিতেই
া বাজলো। আরশির সামনে দাঁড়িয়ে
আঁচড়াচ্ছিলাম, নিজের চেহারা দেখে
জেই মোহিত হয়ে গেলাম। ভাবলাম,
জ আর হিরোইন সীতা দেবীর পাশে
থ নিচু করে নয়, উঁচু করেই দাঁড়াতে
রবো। স্টুডিওর গাড়ি এসে গেল.
া মাকে প্রণাম করে নতুন কাপড় জামা
র ফিটফাট হয়ে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি,
া পিওনের সঙ্গে দেখা। অভ্যাস মতো
মার কিছু আছে কি না জিজ্ঞেস করতেই
ঠর বাণ্ডিল থেকে একখানা খাম আমার
তে দিলে, দেখি টেকনাফের ছাপ।
টা অজানা আশংকায় সমস্ত শরীর
পে উঠলো। খামখানা পকেটে নিয়ে
ড়তে উঠে বসলাম।

স্টুডিওয় পেঁাছে দেখি গেট-এর সামনে
তায় গাঙ্গুলীমশায় পায়চারি করছেন।
ড় থেকে নামতেই আমার আপাদমস্তক
খ নিলেন, তারপর খুশি হয়ে বললেন
very good। যাও ধীরাজ, তাড়াতাড়ি
লা করে মেক-আপ করে নাও। আজ
মার আর সীতার বিয়ের পর প্রথম
চ সিনটা নেবো। ঐটের উপরই ছবির
অফিস।

মেক-আপ রুমে এসে আরশির সামনে চুপ করে বসে আছি। দু'তিনবার মনে করলাম চিঠিটা পকেট থেকে বার করে খুলে পড়ি—সাহস হলো না। নিজের মনকেই প্রশ্ন করি—কে লিখেছে? কেন লিখেছে আমায়? আমি তো টেকনাফের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এসেছি! কোনো জবাব পাই না। আস্তে আস্তে ভেসলিনের শিশি থেকে একটুখানি নিয়ে হাতে ঘষে মুখে লাগালাম। তারপর সবেদার সঙ্গে অল্প একটু পিউড়ি মিশিয়ে জল দিয়ে দুহাতে ঘষে নিয়ে মুখে বেশ ক'রে মাখিয়ে নিলাম। আলতার শিশি থেকে আঙুলে করে একটু নিয়ে ঠোঁটে লাগালাম, খানিকটা ভুসো কালি একটা দেশলাই-এর কাঠিতে নিয়ে ভুরু আর চোখ আঁকলাম। মেক-আপ হয়ে গেল। আরশির ভিতরে 'কাল পরিণয়' ছবির নায়ক মণীন্দ্রের দিকে চেয়ে বসে আছি। আমার ভিতরের মন তিরস্কার করে উঠলো —সামান্য চিঠিটা পড়বার সাহসও তোমার হচ্ছে না? চরম কাপুরুষতার পরিচয় দিয়ে বেশ তো পালিয়ে আসতে পারলে। আর এত দূরে এসেও সামান্য কয়েকটা কালির আঁচড়কে এত ভয়? যা হয় হোক, মরিয়া হয়ে পকেট থেকে খামখানা বার করে একটা ধার ছিঁড়ে চিঠিটা বার করলাম। ছোট্ট চিঠি, বারোদিন আগের তারিখ দেওয়া। এ এস আই যতীন লিখছে টেকনাফ থানা থেকে—

ভাই ধীরাজ—

তুমি এখান হইতে যাওয়ার দু'দিন পরেই কথাটা কি ভাবে রাষ্ট্র হইয়া যায় যে তুমি বাবার অসুখের জন্য ছুটি লইয়া যাও নাই, মাথিনকে বিবাহ করিবার ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে। আমার দৃঢ় ধারণা সতীশই এই সর্বনাশ করিয়াছে। খবর শুনিবার পর হইতে মাথিন অন্নজল ত্যাগ করিয়া শয্যা লয়। ওর বাবা ওয়াংথিন সাহেব, আমরা সবাই এমনকি সমগ্র টেকনাফবাসীর শত চেষ্টাও জল গ্রহণ করাইতে পারে নাই। গতকল্য সকালে মাথিন মারা গিয়াছে। ওয়াংথিন পাগলের মত হইয়া গিয়াছে। তোমার ঠিকানা জানিবার জন্য ওয়াংথিন বহু চেষ্টা করিয়াছে ও এখনও করিতেছে, আমরা দিই নাই। এখন বুঝিতেছি তুমি পলাইয়া গিয়া ভালই করিয়াছ। হরকিই যত অনিষ্টের মূল জানিতে পারিয়া ওয়াংথিন তাহাকে মারিয়া আধমরা করিয়াছে। প্রাণে বাঁচিয়া

থাকিলেও অনেক দিনের জন্য বিশ্রাম লইতে হইবে। মহেন্দ্রবাবু বদলি হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্থলে মিঃ ভৌমিক আসিয়াছেন। আমরা ভালো আছি, তুমি—

আমি ভালো আছি, খুব ভালো আছি।

আর দরকার নেই, পড়বার প্রয়োজন আমার ঐ একটি লাইনেই ফুরিয়ে গিয়েছে —'গতকল্য সকালে মাথিন মারা গিয়াছে।' আমার অভিশপ্ত ভাগ্যের সামান্য ছোঁয়াচ লেগেই দুটো অমূল্য জীবন নষ্ট হয়ে গেল। মাথিন আর হরকি। কিন্তু আমার তো ভালো হলো! কন্দর্পকান্তি তরুণ সিনেমার নায়ক! আরশির ভিতরের মানুষটার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে বসে রইলাম।

বোধ হয় অনেকক্ষণ বসে ছিলাম, সময়ের হিসাব ছিল না। হন্তদন্ত হয়ে গাঙ্গুলীমশায় এসে হাজির। বললেন,—"এত দেরি হচ্ছে কেন? এই যে, মেক-আপ হয়ে গিয়েছে দেখছি। শিগগির এসো ধীরাজ, রোদ্দুর চলে যাচ্ছে।"

আস্তে আস্তে উঠে গাঙ্গুলীমশাই-এর পা দুটো জড়িয়ে ধরে বললাম—

"আপনি আমার বাবার বয়সী, আজ আমায় ক্ষমা করুন। আমি আজ কিছুতেই লাভ সিন করতে পারবো না, শুধু আজকের দিনটা আমায় ছেড়ে দিন। কাল পরশু যেদিন বললেন—"

একবার আমার মুখের দিকে একবার হাতের মুঠোয় দলা পাকানো চিঠিটার দিকে চেয়ে কি ভাবলেন যেন গাঙ্গুলীমশায়, তারপর বললেন—"তার জন্যে তুমি এত কুণ্ঠিত হচ্ছো কেন ধীরাজ। আজ আমি সীতার ক্লোজ-আপগুলো নিয়ে শুটিং প্যাক-আপ্ করে দিচ্ছি—পরে সুবিধামতো সিনটা নিলেই চলবে। তুমি মেক-আপ তুলে বাড়ি চলে যাও, আমি মুখুজ্জেকে দিয়ে গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

মেক-আপ? মনেই ছিল না। হঠাৎ মনে হলো আমার সারা জীবনটাই শুধু মেক-আপ—এমন কি মাথিনকে ভালোবাসাটাও মেক-আপ ছাড়া আর কিছুই নয়। আরশির সামনে বসে নারকেল তেলের শিশি থেকে খানিকটা তেল হাতে ঢেলে নিয়ে জবজবে করে মুখে মাখিয়ে নিলাম। পুরু একখানা তোয়ালে দিয়ে ঘষে রঙ তুলতে যাচ্ছি, আরশির ভিতর দেখলাম ঘরে ঢুকলো সীতা দেবী। কোনো রকম ভূমিকা না করে আমার দিকে চেয়ে ভাঙা বাঙলায় বললে—"ধীরাজ, গাঙ্গুলীমশায় বললেন, তুমি নাকি খুব নারভাস্ হয়ে পড়েছ, ব্যাপার কি?"

জবাব না দিয়ে রঙ তুলতে লাগলাম। খিল খিল করে হেসে উঠলো সীতা, তারপর বললে—"মুখুজ্জে বলছিল চিটাগঙে তুমি অনেক অ্যাড্‌ভেঞ্চার করে এসেছ। একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতে এত ভয়?"

গাড়ি রেডি হয়েছে খবরটা দিতে মুখার্জি ঘরে ঢুকলো। সীতা মুখার্জিকে বললে—"মুখার্জি, এমন একজন কাওয়ার্ড স্বামী আমায় জুটিয়ে দিয়েছ, প্রেম করা দূরের কথা, কথাই কইছে না আমার সঙ্গে।" আবার সেই দুষ্টুমি ভরা হাসি। গাড়ির খবরটা দিয়ে মুখার্জি তাড়াতাড়ি সীতাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তা তো গেল, কিন্তু ঘরময় ছড়িয়ে দিয়ে গেল ঐ বিষাক্ত কথাটা—কাওয়ার্ড। ঘরের দেয়াল থেকে দেয়ালে রিবাউন্ড করে আমার চার পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলো একটিমাত্র কথা—কাওয়ার্ড! কাওয়ার্ড!! কাওয়ার্ড!!!

হঠাৎ মনে হলো আরশিতে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। রাগ হলো মেক-আপম্যানের উপর। ধুলো জমেছে, একটু পরিষ্কার করে রাখতেও পারে না? আন্দাজে মুখে তোয়ালে ঘষেই চলেছি।

কাওয়ার্ড! মাথিন মরবার আগে জেনে গিয়েছে আমি কাওয়ার্ড। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে হরকি শুধু বলছে ঐ একটি কথা—কাওয়ার্ড! কোতোয়ালির হেমদা, রাখালদা, এমন কি মুলান্ড দম্পতি পর্যন্ত আমার প্রসঙ্গে ঐ একটি কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারছে না—কাওয়ার্ড!

পুলিস লাইন ছেড়ে নতুন জীবনের পথে পা বাড়ালাম—এখানেও ঐ অভিশপ্ত কথা আমার পিছু ছাড়লো না। আজ গাঙ্গুলীমশায়, সীতা দেবী, মুখুজ্জে, এদের সবার কাছে আমার একমাত্র পরিচয় হলো—কাওয়ার্ড।

সবেদা আর পিউড়ি মেশানো রঙ, সামান্য একটু নারকেল তেল দিয়ে দু'বার ঘষলেই উঠে যায়। আমি কিন্তু মুখে তোয়ালে ঘষেই চলেছি। মানুষের চামড়া হলে এতক্ষণ ছাল চামড়া উঠে যেতো, কিন্তু এক ফোঁটা রক্তও পড়লো না। গণ্ডারের চামড়া কিনা!

সমাপ্ত

ব্রহ্মপুরা গাড়োয়াল

১

প্রায় দেড় হাজার বছর হ'তে চললো।

সিংহাসন থেকে নেমে এসে সম্রাট হর্ষবর্ধন অভিবাদন করলেন পরিব্রাজক হুয়েন সাংকে,—মহাত্মন্, বিদায় নেবার আগে এই অখণ্ড সমগ্র মহা-ভারত আপনার আশীর্বাদ কামনা করে।

প্রণত বিনয়ে পুরুষশ্রেষ্ঠ হুয়েন সাং জবাব দিলেন, এই যোগাসীন ধ্যান-নিমীলিত প্রাচীন ভারতের আশীর্বাদ আমিও সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই, রাজন্। ভূ-স্বর্গময় এই ভারত। হিমালয়ের ওই ব্রহ্মপুরায় দাঁড়িয়ে বারম্বার আমি সেই ভূ-স্বর্গলোক দর্শন করেছি।

ভারতের প্রাচীন আর্যসভ্যতার আদি মন্ত্র লাভ করেছিল এই ব্রহ্মপুরা। হাজার হাজার বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী এই ব্রহ্মপুরাব পথ দিয়ে গেছে মুনি ঋষি যোগী সন্ন্যাসী পরিব্রাজক আর পর্যটক। হিমালয়ের এই দুস্তর ও দুরারোহ পর্বতের প্রান্তে কোনো এক নির্ঝরিণী তীরস্থিত তপোবনে ব'সে মহামুনি বেদ-ব্যাস রচনা করেছিলেন শিবপুরাণ তথা কেদারখণ্ড। অন্যান্য পুরাণেও এই ব্রহ্মপুরাকে বলা হয়েছে ভূস্বর্গ। মহাকবি কালিদাস এই ব্রহ্মপুরাকে বলেছিলেন স্বপ্নপুরী। সমগ্র মহাভারতের বিরাট কাহিনী এই ব্রহ্মপুরায় ব'সে লেখা হয়েছিল। মৌর্য সাম্রাজ্য, তারপর অশোক, তারপর সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল—ইতিহাসের সেই গৌরব-মহিমার কালে ব্রহ্মপুরা ছিল ঋষিগণের তপস্যালোক, আনন্দ ও শান্তির লীলাক্ষেত্র। এই ব্রহ্মপুরার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে গোমুখী নিঃস্রাবিত জননী জাহ্নবী, গেছে দেবলোক প্রবাহিনী অলকনন্দা, গেছে ব্রহ্মলোকবিধৌতা মন্দাকিনী। এখানকার সূর্যকরোজ্জ্বল তুষার-কিরীট হিমালয়ের প্রথম স্তর হলো ব্রহ্মলোক—পৃথিবীর থেকে অনেকদূর; তা'র নীচে যেখানে শিবলিঙ্গ পর্বতমালার দুরতিক্রম্য স্তর, সেটি দেবলোক, দেবগণের বিচরণ ক্ষেত্র। ভাগীরথী যেখানে উপলাহতা ঊর্মিমুখরা হয়ে ঋষিকুলের আশ্রম-সীমান্তে বয়ে চলেছেন—সেই স্তরটিকে চিরদিন ঋষিরা ব'লে এসেছেন তপোলোক। তা'র নীচে যেখানে দিগন্তপরিব্যাপ্ত হিমালয়ের পাদমূল, যে-স্তর হলো অরণ্যময়—যেখানে গঙ্গা প্রসারিত—তার নাম হোলো মর্ত্যলোক, সেখানে নর-বানর, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গর অবারিত লীলা-ভূমি। সেই ভূভাগে নেমে গঙ্গা উপত্যকার নাম হয়েছে গঙ্গাবতরণ; গঙ্গা সেখানে জীবলোকে অবতরণ করেছেন। তিনি নেমেছেন আর্যাবর্ত প্রতিপালনে। ত্রিভুবনতারিণী তরলতরঙ্গে!

আমার প্রথম তারুণ্য তা'র চোখ মেলেছিল ব্রহ্মপুরার ওই শিবলিঙ্গ পর্বতমালার নীচে গঙ্গাবতরণের প্রান্তে। বত্রিশ বছর আগে সেদিন প্রথম হিমালয়ের পাদমূল স্পর্শ করি। কিন্তু সেই হাজার-হাজার বছর আগেকার ব্রহ্মপুরা এখন আর নেই, আছে তা'র স্থলবর্তী একটি নাম—গাড়োয়াল। মাত্র চারশো বছর আগে রাজা অজয়পাল সমগ্র ব্রহ্মপুরার বাহান্নটি দুর্গ একত্র ক'রে এর নামকরণ করেছিলেন গড়বাল। অর্থাৎ দুর্গপ্রধান। সেদিন চোখ মেলেছিলুম, কিন্তু কিছু দেখিনি। আবিষ্কার করেছিলুম নতুনকে, বিচিত্রকে, ভারতের শ্রেষ্ঠ মহিমাকে,—তাই

কেদারনাথের মন্দির

দৃষ্টি ছিল নিমেষ-নিহত, একাগ্র। শুধু দেখে এসেছিলুম তা'র নীল ধারা,—এক রহস্য থেকে ভিন্ন রহস্যালোকের ভিতর দিয়ে কোন্ পর্বতমালার তলা দিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। সেদিন আমার মন বাঙময় ছিল না, তাই আস্বাদ আর উপলব্ধির পথ দিয়ে ক্ষুধাতুর প্রাণ কেবল আপন খাদ্য সংগ্রহ ক'রে ফিরেছিল। তবু তা'র মধ্যেও উপলব্ধি অপেক্ষা আবিষ্কারের চেষ্টা ছিল প্রধান।

তারপর কতবার গেছি ওই ব্রহ্মপুরার প্রান্তসীমায়, ওই গাড়োয়ালের পাহাড়-তলীর নীচে নীচে, নীলধারার তীরে তীরে, ওর বনে-বনান্তরে, গিরিগুহা-লোকে, ওর মনোরম বসন্তশোভার ভিতর দিয়ে, ওর উন্মাদিনী নির্ঝরিণীর প্রস্তর-সঙ্কুল তটে তটে। কত মধ্যাহ্নের একান্ত ভাবনা, কত প্রভাতের নিঃসঙ্গ নির্জনতা—আমাকে সঙ্গে নিয়ে স্বাক্ষর রেখে গেছে ওর ওই সংকীর্ণ গিরিসংকটে, এখানে ওখানে, মন্দিরে, তপোবনে, উপত্যকায়, আর গভীর গহ্বরে। আজ তাদের ইতিহাস আর মনে নেই। কিন্তু ওখানে আমি বার বার দেখতে চেয়েছি যা দৃষ্টিগোচর হয় না, ভাবতে চেয়েছি যা ভাবনাতীত, জানতে চেয়েছি যা জ্ঞানের সীমানার মধ্যে নেই। বিজন ভীষণ গিরিগহ্বরের নীচে শিলাতলে গিয়ে নিঃসঙ্গ বসেছি, দেখেছি কতবার বসন্ত-শোভা কলস্বনা দিশাহারা নির্ঝরিণীর এপাশে ওপাশে, তারপরে সহসা কোথাও কোথাও তৃণগুল্মে শৈবালে আকীর্ণ অন্ধকার গুহাগর্ভের দিকে চেয়ে ছমছমিয়ে এসেছে সর্বশরীর, আবার ফিরে এসেছি ভয়ে ভয়ে। হয়ত ওদের মধ্যে ছিল ভয়াল ময়াল, কিংবা কোনো অনাবিষ্কৃত অতিকায় জন্তু, কিংবা কোনো অটল অচল যোগ-তন্দ্রাচ্ছন্ন মহাঋষি,—জটাজটিল ধ্যানমৌন মহাস্থবির। হায় হায় ক'রে উঠেছে প্রাণ, হায় হায় করেছে সমগ্র জীবন। কিন্তু তারপর আবার গিয়েছি নিজের পথ দিয়ে। মনে হয়েছে আমার পিছু নিয়েছে সেই হাজার হাজার বছর আগেকার অশরীরী ছায়ামূর্তির দল। তা'রা শুনতে চেয়েছে আমার মধ্যে তাদের পায়ের শব্দ, তা'রা দেখতে চেয়েছে আমার মধ্যে তাদের প্রকাশ, জানতে চেয়েছে আমার মধ্যে দিয়ে তাদের আশীর্বাদ। অবশেষে ছায়ামূর্তিরা বিলীন হয়েছে যেন আমার এই কায়া-মূর্তিরই মধ্যে।

গাড়োয়ালের সঙ্গে তিব্বতের যোগা-যোগ সামান্য নয়। যোশীমঠ থেকে তা'র আভাস পাওয়া যায়, হনুমান চটি ছাড়ালে তা'র পরিচয় মেলে। মেয়ে-পুরুষের চেহারা ও পরিচ্ছদ দেখতে দেখতে যায় বদলে। গৃহপালিত পশুদের আকারেরও পরিবর্তন ঘটে। যেমন নেপালে, যেমন পূর্ব কাশ্মীরে, যেমন সমগ্র সিকিম ও ভুটানে,—তেমনি উত্তর-পূর্ব গাড়োয়াল যেখানে মিলেছে তিব্বতের পাহাড়ে, যেখানে তা'র ছোঁওয়া-ছুঁয়ি কিছু বেশী। সেখানে আচার-আচরণ, সামাজিক প্রথাদি, আচ্ছাদন-পরিচ্ছদেই যে কেবল তিব্বতকে এড়ানো যায়নি তা নয়,—তিব্বতের প্রবল প্রভাব পড়েছে হিমালয়ের বহু মন্দিরে ও স্থাপত্যে। যোশীমঠ বলো, উখীমঠ বলো, কেদার ও বদরিনাথের মন্দির বলো, —তিব্বতের গুম্ফা ও মন্দিরের যে সমস্ত স্থাপত্যশিল্পের সঙ্গে আমাদের কিছু পরিচয় আছে, তাদেরই প্রভাব পড়েছে এই সব মন্দিরে। কাশ্মীরের লাডাকে এই কথা, কুলু উপত্যকার উত্তর প্রান্তে এই চেহারা, উত্তর আলমোড়াতেও এরই পুনরাবৃত্তি। তুর্কীস্তান ও পামীরের মালভূমি থেকে যাদের আসতে দেখেছি, যে সকল হুনজাজাতির লোককে একদা দেখেছি ঝিলম্ নদী ও সিন্ধুনদের তীর ধরে' এসে সীমান্তে পৌঁছেছে—তারাও এই শাক্ত-শৈব-বৌদ্ধের সর্বগ্রাসী প্রভাবকে আজও এড়াতে পারেনি। তিব্বতী অথবা কোনো বড় গুম্ফায় ঢুকে দেখো, সেখানে শক্তিরূপিণী মহাকালী রয়েছেন হয়ত ভিন্ন নামে, এবং হিমালয়ের নানা মন্দিরে প্রবেশ ক'রে দেখো, বৌদ্ধ-প্রভাবের কী চমৎকার পরিণতি! ভারতের সঙ্গে পশ্চিম তিব্বত একাকার।

এই গাড়োয়ালের সমগ্র উত্তর সীমানা তিব্বত ও কাশ্মীর থেকে পৃথক্ ক'রে রেখেছে শতদ্রু নদী। মানস সরোবর থেকে নেমে কৈলাস পর্বতের পাদমূল বেয়ে অনধ্যুষিত গিরিসংকটের ভিতর দিয়ে শতদ্রু নদী চলে গেছে তিব্বত পেরিয়ে, গাড়োয়ালের উত্তর দিয়ে উত্তর-

পূর্ব পাঞ্জাবে। যেমন কাশ্মীরের নীল-গঙ্গা। এদের মূলধারাকে কি কেউ অনুসরণ করেছে? শত সহস্র গিরিনদী নির্ঝরিণী শত সহস্র শাখা-প্রশাখায় কোন্ পথ দিয়ে কোথায় এদেরকে নিয়ে চলেছে কেউ কি জানে? এদের এপারে ওপারে এমন অনেক অনাবিষ্কৃত গিরিসংকট-সংকুল ভূভাগ রয়েছে যেখানে আজও কোনো মানুষের পায়ের দাগ পড়েনি। জন্তু সেখানে জন্মায় না; কীটপতঙ্গ সরীসৃপ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। সেই নিষ্প্রাণ তৃণতরুলতাহীন অসাড় পার্বত্যলোকের নির্জনতা বিভীষিকার মতো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি কতদিন!

কিন্তু গাড়োয়ালে এর কিছু ব্যতিক্রম। একটি পর্বত ছাড়িয়ে অন্য পর্বত অতিক্রম করো, এক চূড়া থেকে অন্য চূড়ায়—রুক্ষতা নেই কোথাও! তুষারের সমান্তরাল বাদ দাও,—শুধু চেয়ে থাকো সমগ্র ব্রহ্মপুরার দিকে। যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল ঘননীলের আভা, চারিদিকে সবুজের সমারোহ। যত চাও নদী, যত চাও জলধারা, যত তাকাও এখানে ওখানে,—পুষ্পস্তবকাবনম্রা! পৃথিবীর সব ফুল এখানে ফোটে স্তবকে স্তবকে। যেখানে যাও, যেদিকে চাও,—তপোবন! ওই যেখানে বাঁকা আলো পড়েছে গুহার পাশ দিয়ে লতাবিতানের ছায়ার তলায় ঝরণার ঠিক ধারেই,—ওখানে উদ্বেলিত হচ্ছে করুণ কবিতার ব্যঞ্জনা! ওই ছায়াচ্ছন্ন নিভৃত নিকুঞ্জে বাকি জীবন কাটানো যায় বৈকি! তুমি তৃষ্ণার্ত হয়ে চলেছ, পথের কোন একটি বাঁক ঘুরেই তোমার কানে পৌঁছবে জলধারার মৃদু কলতান! রঙীন পাখায় প্রজাপতিরা ছেয়ে ফেলেছে উপত্যকা, রক্তরঙীন আপেল আর আনার বিরাট পাহাড়ের গাত্রদেশকে রক্তপ্লাবিত করেছে,—তুমি দেখে নাও পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময়। পাখীদের দিকে দেখো,—যাদের দেখোনি তুমি কোনোদিন, যাদের বর্ণ-সুষমা তোমার কল্পনাকে নিয়ে যাবে নন্দনকাননে,—চোখ ভ'রে তাদের দেখে নাও। চেয়ে থাকো সুনীলনয়না নদীর দিকে,—অনন্ত উদার গগনলোকের প্রতিচ্ছায়া পড়েছে যার জলরাশিতে। সে রোমাঞ্চ কৌতুক তোমার পক্ষে, অবিস্মরণীয়। উত্তুঙ্গ পর্বতের চূড়ায় ওঠো,—চূড়া থেকে

তুঙ্গনাথের চূড়া থেকে তুষারমুকুট কেদার পর্বত

চূড়ায়,—চিরতুষারমণ্ডিত ত্রিশূল পর্বত আর নয়নাভিরাম নন্দাদেবীর শোভা তোমাকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখবে। চেয়ে থাকো পিন্দার হিমবাহের দিকে, চেয়ে দেখো নন্দকোট। ওখান থেকে নেমে এসেছে পিন্দার গঙ্গা, যেমন এসেছে রামগঙ্গা গাড়োয়াল থেকে আলমোড়ায়। তোমার দুটি অপলক চোখ।

গাড়োয়ালের প্রকৃত রূপ হোলো গাঙ্গেয়। উত্তর ব্রহ্মপুরায় গোমুখী থেকে গঙ্গার উৎপত্তি জানি। কিন্তু জানা গেল কি কোথা থেকে এলো অলকনন্দা আর সরস্বতী? জেনেছি কি ধবলী গঙ্গার জন্মস্থল? সহজে কিছু জানা যায় না! কিন্তু অসংখ্য নামে অসংখ্য জলস্রোত পরিণামে গিয়ে মিলেছে গঙ্গায়,—যে-গঙ্গাকে আমরা জেনেছি হরিদ্বারে চণ্ডীপাহাড়ের পাদমূলে। মনে প'ড়ে গেল চণ্ডীর পাহাড়তলীকে—শিবলিঙ্গ পর্বতমালার পাদমূলে। দেরাদুনে উপত্যকার সীমানা। হিংস্র শ্বাপদসংকুল ঘন অন্ধকার অরণ্যলোক চ'লে গেছে যতদূর দৃষ্টি যায়। উপরের চূড়ায় রয়েছেন চণ্ডী অসুরনাশিনী। নদীর এপারে শিবপূজায় ব্যস্ত হরিদ্বার, ওপারে চলেছে শক্তিপূজা! কনখলে যাবার পথে মায়া-

বতীর পাশ দিয়ে গঙ্গার মূলধারার তীরে তীরে পথ। আশ্চর্য, এই নদীর উপরে দাঁড়ালে উত্তরে দিগন্তে সোজা দেখা যায় তুষারমৌলী বদরিনাথের পর্বতচূড়া—আকাশপথে হয়ত পঞ্চাশ মাইলের বেশী নয়। এই গঙ্গার দুই তীর ভূমি থেকে তুলেছি কত বিচিত্রবর্ণের নুড়ি,—নিটোল মসৃণ মোলায়েম পাথরের টুকরো। হরিদ্রাভ, রক্তিম, নীল, সবুজ, লোহিত-নীলাভ, কৃষ্ণ,—আরো কত রং। নুড়ি তুলেছি অনেক, হিমালয়ের নানা অঞ্চলে। নুড়ি তুলেছি রং-পো আর রায়ডাক আর তিস্তার তীরে—যেখান দিয়ে পথ হারিয়ে গেছে সিকিমে ভূটানে আর নাথু-লা গিরি-সংকটে, নুড়ি তুলেছি ব্রহ্মপুত্রে আর বাগমতীতে, গোমতী আর কৌশল্যার তীরে, নুড়ি তুলেছি শারদায় আর সরযূতে, নুড়ি তুলেছি বিতস্তায় বিপাশায় আর চন্দ্রভাগায়। অজানা অনামা নদীর উৎস অনাবিষ্কৃত রয়ে গেল চিরকালের জন্য, শুধু তাদের থেকে নুড়ি কুড়িয়ে বেড়ালুম।

নদী পার হয়ে গেছে চণ্ডী পাহাড়ের পথ। কতকটা চড়াই। এপার থেকে দেখতে অনেক চড়াই,—ওপারে গিয়ে কিছুদূর উঠলে অতটা আর মনে হয় না।

১৩০০০ হাজার ফুট পাহাড়ের উপর তুঙ্গনাথের মন্দির

পাহাড়ের পূর্ব-দক্ষিণে নদী,—আর সব দিক ঘন অরণ্যে নিবিড়। চড়াই পথে বাঁহাতি কালীর মন্দির,—যতদূর মনে পড়ে, ও'র নাম দক্ষিণকালী। মন্দির প্রাচীন,—যেমন গাড়োয়ালের বহু শত মন্দিরই প্রাচীন। মন্দিরের পূজাও অকিঞ্চনের। শৈব হরিদ্বার কেড়ে নেয় সব উপচার, কালী আর চন্ডীর জন্য থাকে সামান্য। এখানে বিধি হোলো বলিদান। পাকদন্ডী পথ বেয়ে উঠতে থাকলে অবশেষে পাওয়া যায় চন্ডীর মন্দির। লোহার রেলিং ঘেরা প্রদক্ষিণকরা বারান্দা। ভিতরে চন্ডীর মূর্তি। উনি আনন্দ পান অসুরের হিংসায়, দংষ্ট্রায়, নখরে, রক্তপিপাসায়। সমগ্র সৃষ্টি ও'র সংহারের লীলাক্ষেত্র। দুষ্কৃতের বিনাশ, অকল্যাণের ধ্বংস—এই ও'র মন্ত্র। উনি ভৈরবী—ভীরুতার বৈরী। ভয় হোলো মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু, তাই উনি ভয়নাশিনী। উনি ভয়ভীষণা, তাই অভয়মন্ত্র দান করেন।

পথ ভুলে নেমেছি পশ্চিম দিকে। কিন্তু সেই পথে পাওয়া গেল তাদের, যারা গুহাবাসী সাধু। ওরা চিরকাল থাকে এই হিমালয়ে—সংসার থেকে দূরে যেখানে জনসমাগম নেই, প্রত্যহের জীবন-সমস্যায় ওরা আলোড়িত নয়। ওরা কি খায়, কে ওদেরকে খাওয়ায়, সব খবর রাখিনে। ওরা জানে সূর্যের উত্তরায়ণ আর দক্ষিণায়নের কাল, ওরা জানে চান্দ্র-মাসের নির্ভুল হিসাব। গ্রহ নক্ষত্র শুক্ল-পক্ষ কৃষ্ণপক্ষ গণনা ক'রে ওরা জানতে পারে, কবে কোথায় ওদেরকে যেতে হবে। ওরা বুঝতে পারে কবে প্রয়াগ-ত্রিবেণীর সঙ্গমে কিংবা পঞ্চবটীতে পূর্ণকুম্ভের মেলা, বুঝতে পারে ঝুলন পূর্ণিমায় কবে তুষারতীর্থ অমরনাথের পূর্ণাঙ্গ দর্শন। শিবরাত্রিতে পশুপতিনাথ, অক্ষয়-তৃতীয়ায় বদরিনারায়ণ, কবে অর্ধোদয় যোগ, কবে সূর্যগ্রহণ! ওরা পথে-পথে খায় আর ঘুমোয়, পথে পথে ওদের জীবন-মৃত্যুর খেলা,—ওরা উলঙ্গ দরিদ্র সর্বত্যাগী স্নেহমোহমুক্ত অদ্বৈতবাদীর দল,—কিন্তু ওরা বেঁধে রেখেছে আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের ঐক্যসংহতিকে। ওরা ধ'রে রেখেছে সন্ন্যাসী যোগী ভারতের আবহমানকালের ধর্মসংস্কৃতিকে। ওরা ওই ভস্মমাখা নগ্নদেহে যখন ব্রহ্মপুরার পাহাড়ে-পর্বতে শীতাতপ সংস্কারবর্জিত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তখন বুঝতে পারিনে ওরা কোন্ অঞ্চলের, কোন্ জাতির, কোন্ সমাজের, কোন্ ধরনের। বুঝতে পারিনে ওরা আর্য কি অনার্য, মঙ্গোল কি দ্রাবিড়, মারাঠা কি তিব্বতী। ওদের কোনো জাত নেই, ওরা সন্ন্যাসী। ওদের কোনো ধর্ম নেই,—ওরা হোলো বিশ্বদার্শনিক। গুহা-মুখে ওদেরকে কখনো দেখেছি আত্ম-নিমজ্জিত, তুষার প্রান্তরে কখনো দেখেছি ওরা আপন মনে বসেছে জপে, কখনো দেখেছি এই ব্রহ্মপুরার পাহাড়তলীর কোনো প্রাচীন অশ্বত্থের তলায় নিষ্কাম ব্রত নিয়ে আপন মনে প'ড়ে আছে মাসের পর মাস, কখনো বা কোথাও তাকিয়ে রয়েছে আপন মনে অপলক চক্ষে। কাছে গিয়েছি, বসেছি, গাঁজা টিপে ছিলিম সাজিয়ে পাশে রেখেছি, ভাঙ বেটে গুলী পাকিয়ে দিয়েছি, আটা মেখে রুটি সেঁকে দিয়েছি,—কিন্তু দিনের পর দিন গেছে, কোনোটাই স্পর্শ করেনি।—পা ছুঁইনি ভয়ে, পাছে লাথি মারে; গা ছুঁইনি, পাছে কামড়ায়, অন্যমনস্ক হইনি, পাছে হঠাৎ আক্রমণ করে। তারপর একদিন গিয়ে দেখি, সব ফেলে সে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে! কিন্তু এই ব্রহ্মপুরা, এই গাড়োয়াল,—এ অঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও ওরা স্থির থাকতে চায় না। এখানে ওরা সংখ্যায় বেশী, এখনকার পাহাড়-পর্বতেই ওদের অবিশ্রান্ত আনাগোনা। পাঠান মোগল ইংরেজ,—কারো আমলে কেউ ওদের ঘাঁটায়নি, ওদের তপোভঙ্গ করতে সাহস করেনি। অমন যে গোঁড়া মুসল-মান সম্রাট ঔরঙ্গজেব, তিনিও গুরু রামরায়কে এই ব্রহ্মপুরার উত্তরে মোহন গিরিসঙ্কটে একটি সন্ন্যাস আশ্রম নির্দেশ ক'রে দিয়েছিলেন।

সাধুদের আশ্রম-সীমানা ছেড়ে নামলুম নদীর বালুভূমে। কিন্তু অপরাহ্ণে সেই অরণ্য সীমান্তে বালু-পথের ওপর ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন দেখে গা ছমছম ক'রে উঠলো। জনমানবের চিহ্ন কোথাও নেই। বাঘের পায়ের দাগগুলি অতি স্পষ্ট হয়ে চ'লে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, সম্ভবত একটু আগেই গেছে। সুতরাং বিভ্রান্ত দ্রুতপদে অরণ্যের বাঁক পেরিয়ে নদীর দিকে অগ্রসর হয়ে গেলুম।

রাজা অজয়পালের মৃত্যুর পর থেকে ব্রহ্মপুরা তা'র স্বাতন্ত্র্য গৌরবে ভারতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে থাকে। গাড়োয়ালীরা প্রধানত হোলো 'ছত্রী' ব্রাহ্মণ,—ওরা স্বপাক ভিন্ন অপরের হাতে খাদ্য গ্রহণ করে না। যেমন কাশ্মীরের দেহাতী সরল মুসলমান সম্প্রদায়।

তা'রা ভয় পায় পাছে কাশ্মীরী পণ্ডিতের রান্না কিছু খেলে তাদের জাত যায়। কিন্তু কৌতুকের কথা এই, কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ, পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকরা কাশ্মীরী মুসলমানকে পাচক ও পরিচারক রাখে। যে কোনো হিন্দু ও পাঞ্জাবী হোটেলে মুসলমান পাচক ও ভৃত্য—এতে কারো কোনো আপত্তি ওঠে না। যে কোনো উচ্চশ্রেণীর মুসলমানের ঘরে কাশ্মীরী পণ্ডিতরা কাজ করে,—কোনো আপত্তি ওঠে না। সে যাই হোক, ক্ষাত্র-ব্রাহ্মণ ব'লেই গাড়োয়ালীরা ব্রহ্মপুরার নাম বদলে ক্ষাত্রপুরা নামকরণ করে। বিচ্ছিন্ন ও বহুখণ্ডিত ব্রহ্মপুরাকে সংহত রাষ্ট্রে রূপান্তরিত ক'রে রাজা অজয়পালই নূতন নাম প্রবর্তন করেন—গড়বাল। রাজা অজয়পালের গোষ্ঠী এই চন্দ্রবংশীয় রাজারাই তখন কুর্মাঞ্চল অর্থাৎ আধুনিক কুমায়ুনের প্রবল প্রতাপান্বিত অধিপতি। এর পর সুসমৃদ্ধ গাড়োলায়ের চেহারা দেখে হিমালয়ের অন্যান্য রাজ্যও ধীরে ধীরে গড়বালের প্রতি ঈর্ষান্বিত হোলো। ক্রমে ভূস্বর্গ গড়বালকে কুক্ষিগত করার জন্য তিব্বতী লামারা তৎপর হতে লাগলো। ভারতে তখন মোগল সাম্রাজ্য চারিদিকে আপন আধিপত্য বিস্তার করেছে। কিন্তু এই পার্বত্য রাজ্যের দিকে পাঠান অথবা মোগলেরা কেউই হাত বাড়াতে সাহস করেনি। তখন হিমালয়ের সঙ্গে বৃহত্তর ভারতের রাজনীতিক যোগাযোগ ছিল কম; সেদিন আজকের মতো আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার কথা ওঠেনি। সুতরাং ত্রয়োদশ শতাব্দীর বের শাহ থেকে উনিশ শতাব্দীর বাহাদুর শাহ পর্যন্ত হিমালয়কে নিয়ে বিশেষ কেউই মাথা ঘামাননি। কেবল তাঁরা পার্বত্য রাজাদের সঙ্গে মোটামুটি সদ্ভাব রেখেই চলেছিলেন।

ইতিহাস বলতে আমি বসিনি। কারণ তাতে আছে অনেক ফাঁকি, অনেক কারচুপি এবং বহুরকমের পক্ষপাতিত্ব। বলা বাহুল্য, ইংরেজের লেখা ইতিহাসেই সবচেয়ে বেশী এর ফের, কেননা এগুলোর মধ্যে থাকে সূক্ষ্মতম মিথ্যার অদৃশ্য জালবোনা। মূলে কথাটা সহজে বলে না ইংরেজ। উনিশ শতাব্দীর প্রথমে গুর্খারা যখন
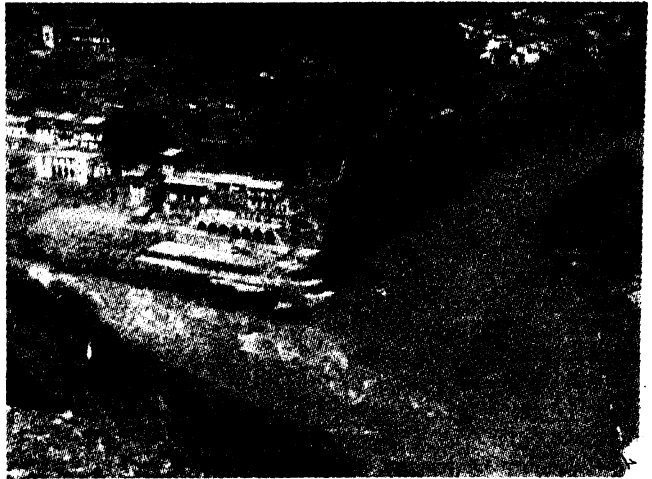
দেবপ্রয়াগ

গড়বাল আক্রমণ করে, এবং রাজা প্রদ্যুম্ন শাহকে দেরাদুনে এসে হত্যা করে—তখন ইংরেজ গিয়েছিল গড়বালকে সাহায্য করতে। গুর্খারা পরাজিত হলো, কিন্তু ইংরেজ পেয়ে গেল পূর্ব গাড়োয়াল। টেহরী গাড়োয়াল রইলো পশ্চিমে টেহরী রাজধানীকে কেন্দ্র ক'রে। মেহল চৌরী হলো সেই টেহরী ও বৃটিশ গাড়োয়ালের প্রাচীর সীমানা। লর্ড ল্যান্সডাউনের নামে একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য শহর তৈরী হোলো হিমালয়ে—সেখানে বসানো হোলো গাড়োয়াল রেজিমেন্ট্। ল্যান্সডাউনের কথা পরে বলবো।

এই ব্রহ্মপুরার হৃদয়ের ভিতর দিয়ে গেছে চারটি প্রধান তীর্থপথ। কেদারনাথ, বদরিনাথ এবং উত্তর কাশী হয়ে যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরীর পথ। নদী-মাতৃক হোলো ভারত। নদী তা'র জননী। তিনি জলদান করেন ভারতকে। জল মানেই জীবন। সমগ্র অখণ্ড ভারতের জীবন-সূত্র এসেছে হিমালয়ের থেকে। আচার্য শংকর তাই একদা এসেছিলেন এই উত্তরধামে, এই ব্রহ্মপুরায়। ব্রহ্মলোক থেকে যে নদী প্রথম দেবলোকে আত্মপ্রকাশ করেছে, সেই সন্ধিস্থলে আচার্য প্রতিষ্ঠা করেছেন দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রতীক্ দেবাদিদেবের মন্দির, পাশে বসিয়েছেন পার্বতীকে। নদী হোলো পার্বতী, মহাদেবের জটা হোলো হিমালয়ের চূড়া। ওই জলধারার প্রবাহে নেমে এসেছে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ভারতের দর্শন ও যোগ, ভারতের প্রসন্ন শান্তি ও ত্যাগধর্ম। যাঁরা চিরদিন ভারতের এই সংস্কৃতি, দর্শন, যোগ ও ত্যাগধর্মকে ধারণ করেছেন, বহন করেছেন, প্রচার করেছেন,—তাঁরা মন্ত্র নিয়েছেন ওই ব্রহ্ম-পুরা থেকে। তাঁরা একদা বৃক্ষবল্কল ত্যাগ ক'রে গ্রহণ করেছিলেন গৈরিক বাস। সেই গৈরিক বর্ণের পরিচ্ছদ আজও রয়েছে অম্লান। ঋষিকুলে যাও, গুরুকুলে যাও, যাও কনখলে আর লালতারাবাগে, যাও হৃষিকেশে কিংবা দেবপ্রয়াগে, যাও যোশী মঠে কিংবা উত্তর কাশীতে,—দেখবে বিচিত্র এই ভারত ছিল তোমার কাছে অনাবিষ্কৃত! দেখবে নিজের আধুনিক শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার বিচার ন্যায়নীতি—যা কিছু নিয়ে তুমি একটা নিজস্ব মনোবৃত্তি গ'ড়ে তুলেছ,—এখানে এসে তা'র ব্যাখ্যা যাচ্ছে বদলে। যদি তুমি সত্য ভারতবাসী হও, যদি এদেশের সংস্কৃতির কণামাত্রের সঙ্গে তোমার আপন মানবতার তিলমাত্র সনাক্তি-করণ থাকে, তবে তুমি কেবল বদলাবে শুধু নয়,—তোমার ইচ্ছা অভিরুচি সংস্কার অভ্যাস আদর্শ, এমনকি তোমার

প্রকৃতিগত পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। হিমালয়ের হাওয়ায় তুমি হারিয়ে গেছ।

পথ অনেক দূর, অনেক দুরারোহ। তা হোক, হৃষিকেশ থেকে চলো, ধীরে ধীরে চলো, চলো নদী পেরিয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে, উপত্যকা ছাড়িয়ে—চলো দূর থেকে দূরে। পিছন দিকে একবার তাকাও। চেয়ে দেখো পিছনে, কখন্ ফেলে এসেছ তোমার স্বকীয়তা, তোমার স্নেহমোহবন্ধন, তোমার প্রত্যহ-জীবনের কত শত তুচ্ছ ভগ্নাংশ। তুমি ইচ্ছা অনিচ্ছার অতীত—পথের অচ্ছেদ্য টান তোমাকে টেনে নিয়ে চলেছে। কথা ব'লো না একটিও, জানতে চেয়ো না কিছু, —ধীরে ধীরে ওই হিমালয় তোমার চোখের সামনে নিজেকে প্রতিভাত করবে। প্রলয়পয়োধি জলে এই বিশ্বসৃষ্টি হলো একটি মহাপদ্মপুষ্প। সেই পদ্ম বিকশিত হয়েছে সত্যনারায়ণ সূর্যের কিরণসম্পাতের দিকে। হিমালয় তেমনি ... র সমগ্র আর্যাবর্ত জোড়া বিশাল হাদ্পদ্মকোরককে এককেটি দল মেলে শতদলে বিকশিত করবে তোমার বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিপথে।

দূর থেকে দূরে যাও। নরেন্দ্রনগর থেকে টেহরী, কিংবা দেবপ্রয়াগ থেকে। যদি 'দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী' ভাগীরথীকে চাও, তবে দেবপ্রয়াগ থেকে ধরো। টেহরী ছাড়াও, তারপর ডুন্ডাগাঁও আর উত্তর কাশীর পথে চলো। যদি যমুনোত্তরী যাও তবে সোজা উত্তরে; গঙ্গোত্তরী যদি যাও—তবে ওই পূর্বপথ। পূর্ব থেকে উত্তর। ভাগীরথী তোমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন তুমি যতদূরে যাবে,—যেখানে যাবে। হিমবাহ আছে আরো উত্তরে, আছে বিজন ভীষণ তুষার প্রান্তর—আছে দেবাদিদেবের হিমজটা—যার ভিতর দিয়ে জাহ্নবীর ধারা গোমুখীর দিকে হারিয়ে গেছে। অবশেষে তুমি বিশ্রাম নাও গঙ্গোত্তরীতে গঙ্গামন্দিরে। চেয়ে থাকো গঙ্গার আদি আর অন্তে—গোমুখী থেকে গঙ্গাসাগর,—প্রায় দু' হাজার মাইল, দেখবে পৃথিবীর কোথাও কোনো জাতির কোনো সংস্কৃতি একটিমাত্র নদীকে এমন ক'রে জাতির প্রত্যেকটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে এমন শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সঙ্গে গ্রহণ করেনি। কন্যাকুমারীতে যাও, যাও মাদুরায় আর রামেশ্বরমে, যাও আবু

ত্রিযুগী নারায়ণের মন্দির

পাহাড়ে আর দ্বারকায়, যাও জগন্নাথে কিংবা পঞ্চবটীতে,—সেখানে তোমার শেষ পুণ্যলাভ ঘটবে গঙ্গাজল দানে। এই গাঙ্গেয় সভ্যতা সমগ্র অখণ্ড ভারতকে সর্বকালজয়ী বন্ধনে বেঁধে রেখেছে।

দেবপ্রয়াগ থেকে রুদ্রপ্রয়াগ—অলকানন্দা থেকে মন্দাকিনী। চারিদিকে কেবল গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না

রুদ্রপ্রয়াগের পথ

পৃথিবী'। নীচে নীচে তা'র বনস্পতি পথ, সুশ্যাম বনানী অনন্ত লতাবিতানে ছাওয়া। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে গুপ্তকাশী, তারপর গৌরীকুণ্ড হয়ে তুষারর... কেদারনাথ। ফিরবার পথে উখী... চামোলী হয়ে যোশীমঠ,—যোশীমঠ থেকে নেমে বিষ্ণুগঙ্গা পেরিয়ে সোজা বদরিনাথ সোজা, তবু অত সোজা নয়। ধূলো লুণ্ঠিত দেহ, ছিন্ন ভিন্ন মলিন পরিচ্ছ... —আড়ষ্ট আর অবসন্ন, শ্রমমালিন্য ... পাণ্ডুর দেহ! কিন্তু ওটাই হো... পুরস্কার। ওই চিরদরিদ্র হতমান ... বস্ত্রহীন গাড়োয়ালীদের সঙ্গে নিজে... মেলানো; ওই সর্বহারা মানহারা জনত... মধ্যে আত্মপরিচয়হীন হয়ে থাকা,—তবে ব্রহ্মপুরার সত্য পরিচয় পাওয়া যায়।

ত্রেতাযুগ ও দ্বাপরযুগের দুই বি... কাহিনী এই ব্রহ্মপুরায় এসে মিলেছে সমগ্র ভারতে ছড়ানো রামায়ণ আর মহা... ভারত। হিমালয়ে এসে মিলেছে সে... দুই ধারা। লঙ্কায় রাবণকে বধ ক... হোলো সত্য, কিন্তু এই হত্যার প্রায়শ্চি... কি নেই? ভগ্নহৃদয়ে মৃত্যু হয়ে... দশরথের, কিন্তু পিতৃপুরুষের তর্পণ ... বাকি। রাজা রামচন্দ্র পিতৃলোকে... উদ্দেশে পিণ্ডদান করলেন দেবপ্রয়াগে লছমনঝুলার কাছে ব'সে চার ভাই মি... মহাদেবের নিকট পূজা নিবেদন করলেন এপারে তাই বিল্বেশ্বর, ওপারে নীলকণ্ঠ চারটি ভাইকে কেন্দ্র ক'রে চারটি স্মৃতি... ফলক—তার ওপরে প্রতিষ্ঠিত হলো চারটি মন্দির। তবে রামচন্দ্রের মন্দিরটি হলো দেবপ্রয়াগে। সম্ভবত ভারতের আর কোনো অঞ্চলে এমন শত সহস্র পার্বত্য ও সুপ্রাচীন মন্দির আর কোথাও নেই,—যেমন আছে এই গাড়োয়ালে। অজস্র জলধারা, অফুরন্ত অরণ্যালোক, অটুট স্বাস্থ্যশ্রী, অসংখ্য উপত্যকা,—তা'র সঙ্গে ধবল তুষারের দৃশ্য, নীলাভনয়না গিরিনদী, বনরাজির শ্যামবসন্ত শোভা, গিরিশৃঙ্গতলে উপলখণ্ডময় নদীসঙ্গমের উদার বিস্তার, এবং তারই তীরে তীরে মেঘখণ্ড দলের নিশ্চিন্ত বিশ্রাম,—আর উপরে অনন্ত গগনে মহামৌন শান্তির মধ্যে মাঝে মাঝে ওঙ্কার-ধ্বনিত হচ্ছে সমগ্র ব্রহ্মপুরার শত সহস্র মন্দিরপ্রাঙ্গণ থেকে!

(ক্রমশ)
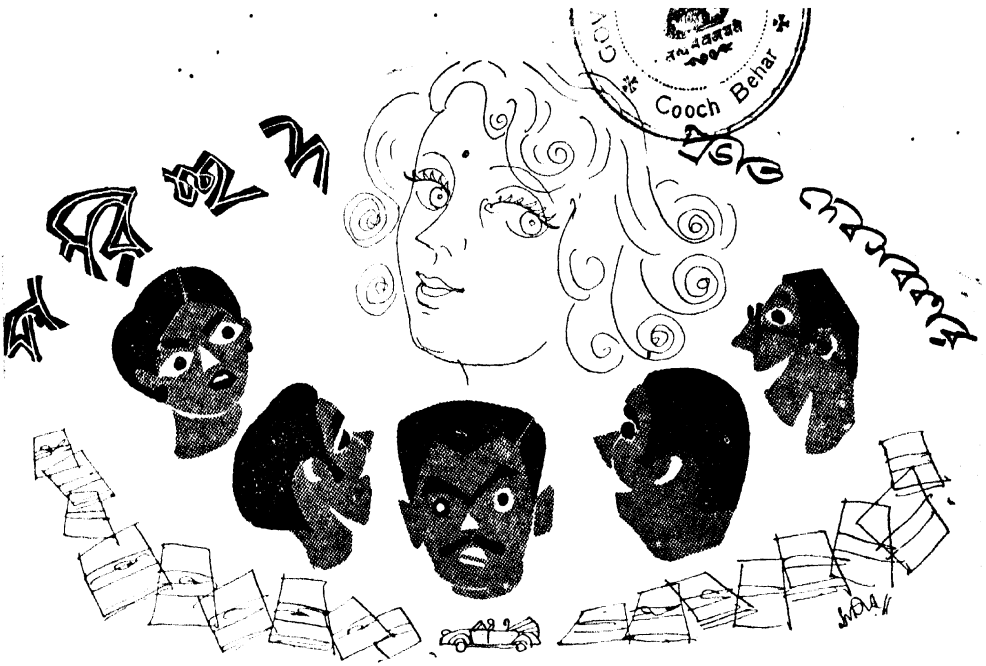
ও**দেরই** মধ্যে কোন একজন অতি উৎসাহী এ বিষয়ে প্রথমে উদ্যোগী হয়েছিল. তারপর সপ্তাহ শেষে আকাশে তারা গোনার মত হেরে গিয়ে বলেছিল, মাথা খারাপ হ'য়ে যাবে! এরি মধ্যে রেজিস্টারের পাতা ভর্তি! ও'র কাপড়ের হিসেব রাখা আমার কম্ম নয়......তোমরা যদি পার রাখ!

উৎসাহ থাকলেও রেজিস্টারটার আর কেউ নতুন করে' পাতা খোলেনি। অতঃপর ওরা মুখে-মুখেই হিসেব করতো, হিসেব মত নিজেদের মধ্যে। রোজ আর কি নতুন পরিচ্ছদে ভূষিতা হ'লো অচিরা অর্ণব?

এ পর্যন্ত একই পোশাকে দ্বিতীয়বার কেউ দেখেনি অচিরাকে। আবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যে একই পোশাক দু'বার পরেছে অচিরা এই পাঁচ বছরের কোন একটা দিন, মনে করতে পারে না কেউ। নিত্য শুধু নতুন নয়, অভিনব, অদ্বিতীয়। প্রজাপতি হার মেনে যায় আর হার মেনেছে অফিসের ঐ পুরুষ সহকর্মীরা!

ও যখন হাঁটে, কি কাজের জন্যে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ফেরে, কি কোথাও গিয়ে থামে তখন মনে হয়, কত না চোঁচিয়ে-চাওয়া ওকে ঘিরে নিঃশব্দে গুঞ্জরিত হ'য়ে উঠছে বিস্ময়ে, আনন্দে, ঘৃণায়, লোভে।

সাক্ষাৎ প্রশ্ন অসাক্ষাতে জটলা করে. এত সাজ-পোশাক আসে কোত্থেকে? কে জোগায়? এত বিচিত্র পরিচ্ছদই বা মেলে কোথায়? চাকরি তো এই!

কিন্তু এমন আশ্চর্যভাবে মানায় অচিরাকে, কে বলবে পর-প্রসাদ-তুষ্ট অকিঞ্চনের বেশ তা। স্বোপার্জিত, স্বক্রীত, সুতরাং স্বাধিকারে অহঙ্কৃত, উচ্চ কণ্ঠ। নিজের জিনিস নিজের মত করে' পরার স্বচ্ছন্দতা আছে মিস্ অর্ণবের সাজ-সজ্জায়। সদা পরিপাটি, নিভাঁজ, সুবিন্যস্ত।

ওকে দু'দিন লক্ষ্য ক'রেই তৃতীয় দিনে কেউ কেউ বলতো, ফোতো...ফাপিস্!

কেউ বলতো, কাপুড়ে বিবি!

আবার কেউ বলতো, বাইরে চিকণ-চাকণ, বাজি রেখে বলতে পারি ভেতরে কিস্সু না! ঐ বাহারই!

অসহ্য এই বিবিয়ানা! গলদঘর্ম, দীনবেশ কেরানী কেউ বলতো সস্তা সিগ্রেট ফুঁকতে ফুঁকতে, করচেন তো কেরানীগিরি!

আদর করে শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে বলতো কেউ, বাটারফ্লাই! চমৎকার!

চাকরি ক'রতে অচিরা অর্ণব যেদিন এখানে এল সেদিন উঠতে গিয়ে এই সরকারী দপ্তরটা আবার ব'সে পড়ল—দেশ-বিভাগ আর রাজ্যলাভের বিলি-ব্যবস্থায় কেমন করে' যেন টি'কে গেল। কেরানীরা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো, খাঁড়ার ঘা'টা অন্যত্র চালান হ'য়ে গেল। উল্টে আরো রিক্রুট করা হ'লো—দিল্লী থেকে খবর এলো, যেমন চলছে তেমনি চলুক! নতুন নিয়োগে ফিমেল সুটেবল্ নীতি অবলম্বন করবে অতঃপর। দু'পাঁচজন আরো নাও।

ডিপার্টমেন্টে বড় সাহেব তখনো সাহেব, মেজো এ্যাংলো, সেজো ভারতীয় শ্রীভার্মা। আর শ্রীভার্মার আপত্তিটাই বেশি, নট্ ওন্‌লি আন্‌সুটেবল্, ওয়ার্থলেস্! হোয়াট উড্ দে ডু?

বড়সাহেব মার্শাল বুঝিয়েছিল, তা বললে চলবে কেন, কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম... নিতেই হবে। দে মে বি ইউজফুল!

মেজো নর্মান ডিটো দিয়েছিল, তবে দেখে শুনে এ্যাংলো গার্ল নিলে অধিক কাজ হবে। যেমন চট্‌পটে তেমনি কাজের ওরা!

কিন্তু ওপরের নির্দেশ অন্য—কুলজীতে খাঁটি স্বদেশী আর শিক্ষায় মিনিমম্‌ ম্যাট্রিকুলেট হওয়া চাই।

ভেতরের খবর অবিনাশ ঠুকরে বার করেছিল, এ'টো কলাপাতের মত এর-ওর টেবিলে উড়ে উড়ে পড়েছিল। খুব গোপনীয় কিন্তু পরম রমণীয় সংবাদ পরিবেশন করেছিল।

সত্যি! আমাদের ডিপার্টমেণ্টে ফিমেল ক্লার্ক নিলে? সুখময় উত্তেজনায় ডবল টিফিনের অর্ডার দিলে।

অসত্যের কিছু নেই, অবিনাশ এশট্যাবলিশমেণ্ট সেকশনে শুধু কাজই করে না, অনেক গুহ্য বারতা তার হাত দিয়ে আসা-যাওয়া করে। সুতরাং—

খবরটা ছড়ান থেকে এই কিছুদিন আগের চাকরি যাওয়ার ভয়টা কেমন অদ্ভুত ভাবনায় রূপান্তরিত হ'য়ে অনুভূত হয়। সত্যি চাকরি গেলে মনের এমন অম্ল-মধুর ভাব হ'তো না। মিস্‌ অর্ণবের জন্যেই যেন তাদের অনেকের চাকরি রয়ে গেল, ডিপার্টমেণ্টের টিম্‌টিমে বাতিটা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

কি নাম বললে? অচিরা অর্ণব!

অদ্ভুত তো, শুনিনি কখনো!

নামকরণে মৌলিকতা আছে! মানে না থাক, 'মানান' আছে!

কিছুই নেই হয়তো, চাক্ষুষ ঐ নামটাই সার! দেখতে হয়তো—

না না, ভাল!

বাজি রাখ, কখ্‌খোন না—নামের ঘটা যেখানে অত, রূপ সেখানে থাকতে পারে না ছি'টে-ফোঁটা! A rose will smell as sweet by calling any other name! আমার জানা আছে দেখা আছে ঢের!

আর কে-কে আছে?

ই'ণ্টারভিউ-এর সময় অবিনাশ চুপি-চুপি কানে কানে এসে বললে, এক ঝাঁক! সি ইজ্‌ বেস্ট অব্‌ দি লট্‌! নামের সঙ্গে মিল আছে!

কিন্তু চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই। দেখা যায় কি করে? অবিনাশ যখন-তখন বড়-সাহেবের ঘরে যেতে পারলেও আর সকলের পক্ষে কেবল অসম্ভবই নয়, অমার্জনীয় অপরাধ! রিক্রুটমেণ্টে অবিনাশ ডিলিং ক্লার্ক, তারা কি? উ'কি দেবারও উপায় নেই, ভারি পর্দা সদাই মুখ-ভার। তায় আবার একটেরে ঘর, আশপাশ থেকে দেখা যায় না! যদি কোনরকমে মাছি হ'য়ে ঢোকা যেত এ সময়!

ওরা বসেছে কোথায়?

বড়সাহেবের ঘরে! অবিনাশ বললে।

কেন হলঘরটা তো ছিল, সেখানে বসালো না কেন?

চোখের কোণে অবিনাশের দুষ্টু হাসি দেখা যায়, তা হ'লে খুব সুবিধে হ'তো, না? সিটে আর কাউকে পাওয়া যেত না!

কেউ কেউ প্রতিবাদ করলে অবিনাশ বলে, বড়সাহেবের হুকুম—করবার কিছু নেই। সাহেবেরও হ'য়ে গেছে!

তাই। না হ'লে চাকরি প্রার্থিনীদের নয়নের মণি করে' রাখবে কেন! প্রেস্‌টিজ জ্ঞান নেই বেটার! লেট্‌ দেম্‌ ওয়েট আউট সাইড! তা নয়—

ক'জন এসেছে?

পাঁচজন।

সবাইকেই কি একরকম দেখতে?

যমজ নাকি যে একরকম হ'বে!

না, পাঁচ রকম! ওর মধ্যে একজন, মানে যাকে বলে দেখতে-শুনতে একেবারে! ঐ তোমায় যা বলেছিলুম, যেমন মানিয়ে নাম রেখেচে তেমনি মানিয়ে সাজ-গোজ করেছে—মার্ভেলাস!

চোখ জুড়িয়ে যাবে কি বলিস্‌?

দূর-র্‌, ঝল্‌সে যাবে। এক লহমায় যা দেখলুম মনে হ'চ্ছে, চোখের সামনে একটা ঝিলিক দিচ্ছে এখনো! অবিনাশের চোখ বু'জে আসে।

ক্রমে চোখে সইলেও মনের ভাবটা গোপন করা যায় না। নিত্য নতুন নতুন সংবাদ সংগ্রহ হয়ে টেবিলে ছড়ায়!

টালা থেকে আসে সুধীর, ত নেক্‌স্‌ট ডোর নেবার যিনি তাঁর ভাগি সহপাঠিনী সুধীরের ভাইঝি, তার কা শোনা, মিস অর্ণবরা খুব বড়লোক, শ্যা বাজার থেকে পাইকপাড়ার মধ্যে পাঁচ-সা খানা বাড়ি! সব নতুন!

বাগবাজার থেকে আসে রামপ প্রতিবাদ ঠিক না-করে' বললে, আমা মামীমার বোনের সঙ্গে পড়তো, থাকতে ও'রা কাঁটাপুকুরে।

মধ্য কলিকাতাবাসী যোগেশ বলে ইটলীর কাছে ডাক্তার লেনে থাকতো ওর ক'বার মামাশ্বশুরের বাড়ি যেতে আ ও'কে দেখিচি সেখানে। তখন অত সাজে ঘটা ছিল না, প্লেন, একেবারে সাদাসিদে —মানুষটা ঠিক আছে, যাবে কোথায়!

দক্ষিণে সুখময় বাসাড়ে। সে প্রতি বাদই করলে, বললেই হোল যা তা!...এ কালই দেখলুম, আমাদের পাড়ায় রসে মিত্তির রোডে, তারপর মেডকস্‌ পার্কে ছাতিম গাছটার তলায়। আমি বক জিজ্ঞেস করলুম, এখানে থাকেন!

অবিনাশ ফিক্‌ ফিক্‌ হাসছি এতক্ষণ। জিজ্ঞেস করলে, কি বললো ঐখানেই থাকেন! আপিসের ঠিকান কিন্তু অন্য—নম্বরটা বলবো না, গড়পারের কাছ বরাবর।

সুখময় তর্ক করলে, গড়পারে থাকলে আর এপারে আসতে পারে না—মেডকস্‌ পার্কে বেড়াতে? কোলকাতার ঠিকানার কোন মানে নেই, মেয়েদের অমন পাঁচ সাতটা ঠিকানা থাকে। খু'জে দেখ, সব মেয়ের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত অমনি কত আছে তার ঠিকানা নেই! নিজের চোখকে তা বলে অবিশ্বাস করবো!

জো বুঝে যোগেশ মধ্যকলকাতার দাবী ছেড়ে দিয়েছে। সুখময়ের দিকে হ'য়ে বললে, এতো আর তোমার আমার মত নয়, এক ঠিকানা কামড়ে আছি বার বছর। এক দোর দিয়ে চিরকাল ঢুকলুম আর বেরলুম। ও'দের জন্যে সহস্র দোর খোলা আছে!

ছাতিম ফুলের গন্ধ বড় তীব্র, নেশা ধরে যায়। সুখময় বললে, অমন একদিন নয়, পাঁচদিন দেখেচি ঠিক ঐ জায়গাটিতে বসে থাকতে—একলা একলা চুপ করে' আকাশের দিকে চেয়ে! তখন এত সাজের

বাহার ছিল না, পরিপাটি কিন্তু সাদাসিদে।

টালাও দাবী ছেড়ে' দিলে। বললে, কারো জন্যে অপেক্ষা করতো বোধ হয়।

কই, দেখিনি তো কাউকে কোনদিন এগিয়ে আসতে। কতক্ষণ ওৎ পেতে থাকতুম! ঠায় চেয়ে থাকতো মিস্ অর্ণব আকাশের দিকে।

ক'বছর আগে? রামপদ বললে জেরার ভঙ্গিতে।

তা চাকরির দু'চার বছর আগে, আমার তখন সবে নতুন বিয়ে হ'য়েছে—শ্বশুর-বাড়ি গেলেই বৌকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরুই! সুখময় বিজয়গর্বে বললে কিছু না ভেবেই।

রামপদ চেপে ধরলে কোণ ঠেসে, আগের কথা তো হ'চ্ছে না—মান্ধাতা আমলে ও কোথায় থাকতো, না থাকতো তা'তে কার কি! এখন কোথায় থাকে, তাই বল! পার্কে তুমি ওকে দেখতে দু'বছর আগে, কি বল?

জেরায় সুখময় কেমন চুপসে যায়। তার কথা টি'কবে না। অচিরার সর্বাধুনিক বাসস্থান সম্বন্ধে তার জ্ঞান অপরিমিত। আন্দাজে সে ফয়তা মারছে। চুপ করে' ছাতিমতলায় বসবার মেয়ে মিস্ অর্ণব নয়। সুখময়টা যেন কি, অমন একটা সৌখিন মেয়েকে বসাবার আর গাছ পেলে না! আর জায়গাটাও তেমনি, মেডক্স্ পার্ক! দেড় কাঠা জমিতে দেড় হাজার লোক রাতদিন মাছির মত ভন্ ভন্ করছে, কলাই-চটা ঘাস, পা রাখা যায় না।

আর সবার মনোভাবটা বোধ হয় সুখময় বুঝতে পেরেছে—তার কথা কেউ বিশ্বাসই করেনি—রামপদর জেরায় সব কে'চে গেছে—সে যাকে কাল দেখেছে সে এই আপিসের অচিরা নয়, ছাতিমের নেশায় কা'কে দেখতে কা'কে দেখেছে! ক্ষোভটা অদেখার নয়, হার মানার। পাঁচন-গেলা মুখ করে সুখময়।

অবিনাশ বুঝতে পারে। মধ্যস্থ হ'য়ে বলে, বায়ু, সূর্যকিরণ আর প্রজাপতি এদের গতি সর্বত্র। উনি সর্বগা, পূব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ কোথাও ও'র বাধা নেই। দেখাটাই সব, সে যেখানেই হোক আর যেই দেখুক—তুমিই/দেখ আর আমিই দেখি। যেখানে হোক এক জায়গায় থাকে, তা'তে তোমার কি আমার কি! রোজ আপিসে তো আসে!

আপিসে তো সবাই আসে, আসতে বাধ্য—দাসখত যখন লিখিয়েচে! ও'দের একটু বিশেষত্ব আছে, তোমার আমার মত নয়! মুখ-চোরা সুশীল কেন জানি না মুখ খুললে!

সুখময় রেগেই গিয়েছিল। বেগড়া পেতে হঠাৎ সব বিস্বাদ লাগছে। তেড়ে বললে, কি আমার বিশেষত্ব!

কেন অমন শাড়ি-ব্লাউস্, অঙ্গরাগ! হবে কোনদিন? হাসির ঝিলিকটা বিদ্বেষ-বিদ্রূপে উচ্চকিত হ'য়েই মিলিয়ে গেল। অবিনাশ রামপদর গা টিপলে।

সদ্য ফোটা ফুলটির মত কখন এসে মিস্ অর্ণব ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছে। একটু আগে ওর উদ্দেশ্যে যে-বিদ্যুৎ চমকেছিল, তা ওর মুখে-চোখে স্থির হ'য়ে আছে যেন। আশ্চর্য, বজ্রবিমূঢ়কারিনী!

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে' এগিয়ে এসে মিস্ অর্ণব শুধাল, সি-ও-টু ফাইলটা কোথায় বলতে পারেন—খ'ুজে পাচ্ছি না —শ্রী ভার্মার কাছে সাবমিট করতে হবে!

সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে এ ওর চোখে-মুখে হারান ফাইল খ'ুজতে থাকে। অচিরা স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে থাকে কতক্ষণ।

সাহস সঞ্চার করে অবশেষে অবিনাশ বললে, আসুন দেখি বড়সাহেবের ঘরে যদি থাকে!

ওরা বেরিয়ে যেতে সুখময় বললে, ফাইল ঘাঁটা কাজটা ওকে না দিলেই হ'তো! বেচারাকে দেখলে কষ্ট হয়!

কষ্ট হ'লে কি হবে, ওর বেশী যোগ্যতা থাকলে তো! সাজের বাহারে আপিসের বড় কাজ মেলে না! এ মার্চেণ্ট আপিস নয়, মুখ দেখে, সাজ দেখে বড়-সাহেবের পাশে বসিয়ে রাখবে! সুশীলের এ অহেতুক উষ্মার কারণ বোঝা গেল না। আমরা কি করচি বি-এ, এম-এ পাশ করে?

কেউ কিছু বলে না প্রতিবাদে, মনে হয় সুশীলের গায়ে-পড়া মন্তব্য কারো মনঃপূত নয়। সামান্য ক'টা টাকার জন্যে কেন যে ও-মেয়ে চাকরি করতে আসে বোঝা যায় না! অমন নিত্য-নতুন রূপ-সজ্জা যে করতে পারে তার চাকরিতে দরকার, কি!

হঠাৎ সুধীর চটুলতা প্রকাশ করলে নিয়ম মতঃ ডেস্ক্রিপ্শন্টা কি লিখবো? রডোড্রেনডন গুচ্ছ, না রক্ত-শ্বেত কমল? না—

রামপদ তাড়া দিলে, থাম্, ভাল লাগে না ফ্যাচ-ফ্যাচ! ফাইল দেখবার নাম করে' অবিনাশ ওদিকে মজা লুটছে!......লিখে আর কি করবি! কচু!

তবু কচুই সই। রেজিস্টারটা হারিয়ে গিয়েছিল। এক চিলতে কাগজে দুর্গানাম লেখার মত লাল কালিতে সুধীর আপন মনে লিখলেঃ ফুইজি সিল্ক শাড়ি, স্নাফ্ কলার; অরগ্যাণ্ডি পেটিকোট, হাই-নেক, ওপেন ব্যাক্, হাফ্ হার্টটেড্; নো বর্ডার। পায়ে প্ল্যাস্টিক স্লিপার, বেয়ার আরম্স্, ওন্লি রিস্টওয়াচ্! বব-করা চুলের কায়দা! শ্বেত-চন্দন কমল সস্মিত মুখাবয়ব!

বাজার মন্দা দেখে কাগজটা সুধীর প্যাডের তলায় রেখে দিলে। রামপদ চেয়ার থেকে তেমনি গলা বাড়িয়ে সর্বত্র সঞ্চারিনী বায়ু শ'ুকে আপন মনে

বললে, ফাইল খ'ুজচে না আরো কিছ্—গেচে আর আসবার নাম নেই! ইডিয়ট, মেয়েমান্ষ দেখেনি কখনো!...... নিকুচি করেচে তোর রডোড্রেনডন্ গ্চ্ছ! যত সব ফ্ল!

অনাঘ্রাত ছাতিম ফ্লের নেশায় বিভোর স্খময় ফাইল খ্লে শ্ন্য দ্ষ্টিতে সামনে চেয়ে বসে আছেঃ কাজের ডিস্ট্রিবিউশনটা ঠিক হয়নি, মিসেস্ সেনকে ফাইল বাছাবাছির কাজটা দেওয়া উচিত ছিল। যেমন এ্যাডমিনিস্ট্রেশন! সি ইজ্ ট্য প্রেটি! একট্ যদি কাণ্ড-জ্ঞান থাকে!

পরের দিন অবিনাশই খবরটা নিয়ে এল। যেন কৈফিয়ৎ দিতে এসেছে বন্ধ্দের কালকে ফাইল খোঁজার নাম করে' ও'র পিছনে উধাও হ'য়ে যাওয়ার। না, সন্দেহ করার কিছ্ নেই। এ ব্যাপারে অবিনাশ আন্তরিক। চেষ্টার ত্রুটি সে করেনি। খ'ুজে খ'ুজে নারি।

কণ্ঠটা কেমন শোনাল অবিনাশের ঃ লোকটা যে অমন বেরসিক কে জানতো—ফাইলের জন্যে ভার্মা যা তা করলে ও'কে। বেটা কত কাজের লোক জানতে আর বাকি নেই! ভাগ্যে য্দ্ধ বেধেছিল আর ভাই ব্রাদার ছিল! যত সব নাড়াবনে... একটা ভদ্রতাও নেই, ম্যানার্স জানে না! পাত্রাপাত্রী জ্ঞান নেই! ফাইল হারিয়েচে তা হ'য়েছে কি, মহাভারত অশ্দ্ধ হ'য়ে গেছে!

ভারি অসভ্য তো লোকটা! বড্ড গরম বি'ধেছে!

এ আর কিছ্ নয়—বাঙালীর ওপর জাত-ক্রোধ; সে-মেয়েই হোক, আর প্র্ষই হোক! কম্যুন্যাল-এর একশেষ!

প্রধানমন্ত্রীর কাছে বেনামে নালিশ করা উচিত! বেটা খয়ের খাঁর জাত! মনে আছে য্দ্ধের সময় নর্মানের সঙ্গে পিরীতিটা? ডেস্প্যাচার থেকে অফিসার! ওয়ার এফার্টে মোটা টাকা দিতো! শালা! এখন দেখ দিব্যি ভোল পাল্টে ফেলেচে মিস্টার বদলে ও-ই আগে শ্রী লেখে নামের আগে!

মিস্ অর্পবকে যা তা করা মানে এদেরও যা তা করা। প্রকারান্তরে আপিসের সবাইকে অপমান করা। প্রতিবাদ করা উচিত। ফ্ল তুলে চটকান কার সহ্য হয়!

অবিনাশ বললে, আমার সামনে হ'লে শ্নিয়ে দিতুম—বিস্ট কোথাকার! মেয়েমান্ষের সম্মান রাখতে জানে না! ডিস্গ্রেসফ্ল!

সহকর্মী আর সবার ম্খে গালাগালটা নিঃশব্দে উচ্চারিত হ'লো। হ'লেই বা কাজের গল্তি, যে মেয়ে এক শাড়ি দ্বার পরে না, এক চুল দ্বার বাঁধে না এক ছাঁচে, তাকে অমন করাটা উচিত হয়নি অফিসিয়াল টোনে।

কি বলেচে তব্? অব্জেক্শন্এবল্ কিছ্?

নিজে শ্নিনি, মিসেস্ সেন রিপোর্ট করলে—বেটা বলে কিনা সাজ-পোশাক সম্বন্ধে যত সচেতন কাজ সম্বন্ধে তত সচেতন হ'তে পারেন না! টোয়েনটি ফোর আওয়ার্স সময় দিল্ম, ফাইল খ'ুজে বার করা চাই-ই, আদারওয়াইজ্—

চার্জ সিট! দিক না দেখি, উল্টে বাছাধনকে চার্জ করতে বলবো! সি ইজ্ নো রেকর্ড ক্লার্ক! এক ফাইলের সতের খানা ডিস্পোজাল! কোথায় ঘ্রচে তা কে জানে, তিন দিন আগে আমার কাছে ছিল! স্খময় সবাইকে সাক্ষী মেনে বললে।

আমিও বলে দিয়েচি ও'কে কিছ্ না করতে। দেখি কি করতে পারে! ফাইল তো আর কেউ ইচ্ছে করে বাড়ি বয়ে নিয়ে যায়নি! উনি কি জানেন! অবিনাশ চোখ ঘ্রিয়ে বন্ধ্দের দেখে নিলে কট্ চোখে। মিসেস্ সেনকে বলে দিয়েচি, বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমরাও দেখে নেব! ভার্মাগিরি ছাড়িয়ে দেব!

ও'কে কিছ্ বলনি, মানে মিস্ অচিরা দেবীকে—ঘাবড়াবার কিচ্ছ্ নেই, আমরা আছি!

বলবো কি, অত কথার পর দেখি দিব্যি ঘাড় গ'ুজে কাজ করচে! আমরা হ'লে আর এক তিলও আপিসে থাকতুম না। ও'কে এখনো ঠিক ব্ঝতে পারল্ম না!

হঠাৎ অবিনাশের গলার স্বরটা শ্লেষ্মা-জড়িত হ'য়ে আসে।

ভেতরে স্পিরিট নেই, খড়ের আণ্ডিল। আমি হ'লে দেখিয়ে দিতুম, মাথা ঘ্বরিয়ে দিতুম বেটার......ব্থা এ সজ্জা! স্বধীর বললে, যাই বল তেমন স্মার্ট নয়। ও'র চেয়ে মিসেস্ সেন দেখতে যাই হোক অনেক-অনেক চালাক-চতুর। ও'দের চাকরি পোষায় না!

অম্তং বাল ভাষিতং শোনায় স্বধীরের কথাগ্লো। কোথায় অর্ণব আর কোথায় সেন! ছোটলোকের সংগে ছোটলোকমী করাটা তো আর র্চির পরিচয় নয়। প্রতিবাদ না করে মিস্ অচিরা নিজেকে আরো মহিমান্বিতা করেছেন। আগের চেয়ে আরো স্বন্দর মনে হ'চ্ছে তাঁকে!

আমার মনে হয় এ নিয়ে ও'র ডি-জি'র কাছে একবার যাওয়া উচিত। কিছ্ব না, কথাগ্লো বড় আপত্তিকর—আমি যদি সাজ-গোজ করি তা'তে তোর কি? তোর পয়সায় করি না, তোর জন্যে করি? আপিসের কাজের সংগে ড্রেসের কি সম্বন্ধ? যেমন ইতর, কোন্দিন না ব'লে বসে ফাইল পাচ্ছেন না যখন উলংগ হ'য়ে আপিসে আসবেন এর পর! সিলি ডগ! ওর চেয়ে ট্যাঁশটা ঢের ভাল—হি হ্যাজ গট্ সাম রেস্পেক্ট ফর উইমেন! স্খময় বন্ধ্দের সমর্থন চাইলে।

ছাতুর আর কত ব্দিধ হবে! দেখগে বাপ হয়তো বরানগরে খাটাল বানিয়ে আছে, খৈনি টিপ্চে আর খড়কাটা কলে গ্চি দিচ্ছে ঠেলে! জাত-ধম্ম যাবে কোথায়? স্শীল ম্খটা বিকৃত ক'রে বললে।

অবিনাশ কি বলতে যাচ্ছিল, স্খময় চোখ ঠারলে। সকলে সচকিত হ'লো।

কখন এসে অদ্রে দাঁড়িয়েছে অচিরা। সাজটা আজকে আরো বিচিত্র, অভিনব—মনে হয় একটা অট্টহাসি হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে আছে ওর দেহে।

ফাইলটা কোথায় আছে একবার দেখবেন দয়া করে' আপনাদের টেবিল-গ্লো! অচিরা ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে এদের দিকে চেয়ে বলে, যেন ভয় পেয়ে ও কাঁপছে। যদি থাকে কোথাও ঢেকে-ঢ্কে।

সংগে সংগে নড়াচড়ার ধ্ম পড়ে যায় ফাইল খোঁজার নামে। অবিনাশের উৎসাহ বেশি, কৃতার্থমন্যতায় স্খময়, স্শীল যেন বোবা হ'য়ে গেছে।

অচিরাও এগিয়ে আসে। আলগোছে প্রত্যেক জনের টেবিলে ঝ্ঁকে বলে, এক্স্কিউজ্ মি, আমি দেখ্চি!

আহা—হা, কি করচেন! রামপদ শিউরে ওঠে, আমরা দেখ্চি, আপনি বস্ন। যাবে আর কোথায় সেক্শনেই আছে।

অগোছাল, দীন-হীন টেবিলগ্লোর জন্যে সবাই এই প্রথম যেন অপ্রস্তুত বোধ করে। এখানে বসে কাজ করাও যা আর, রাস্তায় ঝাড়্ তেড়ে বেড়ানও তা। সরকারী আপিসে কেরানীর কোন মা-বাপ নেই, যেমন তেমন বসে দিন-সই করে গেলেই হ'লো! ইস্-স কত ধ্লো লাগল ওঁর হাতে!

অচিরা হয়তো বোঝে, হয়তো বোঝে না ওদের অসহায় অবস্থাটা। এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের ফাইল খোঁজা লক্ষ্য করে। তার জন্যেই তো!

সম্দ্রে সহসা ঝড় ওঠার মত এ ঘরের অবস্থা সে হাওয়ায় অচিরার আঁচল খসে পড়ে, বেণী বন্ধনে শলমা-চুমকি দোলে। ম্খের ভাবটা কেমন কঠিন কঠিন মনে হয়।

ঘড়ির ম্খে মিলিয়ে নিলে বোঝা যায়—সমগোত্র, ছ্টির পর গৃহ-গত প্রাণ, দশটা-পাঁচটার শিকলে বাঁধা। নচেৎ আপিস থেকে বেরিয়েই এমনভাবে স্পর্শ বাঁচিয়ে একধারে সরে থাকে ট্রাম-বাসের

এখন মিসেস সেনকে, হাসির আক্ষেপে দেহটা সরীসৃপের মত নড়ছে।

মুখ ঘুরিয়ে নীচু স্বরে রামপদ বললে, কিন্তু কি ব্যাপার বলুন দিকি? অমন সাজ-পোশাক করে' আসার মানে কি!

মিসেস সেন দ্ব্যর্থক হাসলে। ব্যাপার আর কি, খুবই প্রাঞ্জল, আছে কেউ! ভাবচেন একজন, অমন কত জন! বলে যে মাইনে তা'তে চুলের তেল জোটে না, আবার টেরি!

দেখেচেন আপনি কাউকে? রামপদ ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলে।

আমার জানা আছে, দেখা আছে। আপনারা দেখুন! জবরজঙ্ সেজে এসেছে আজ আপিসে মিসেস্ সেন, বুক-খোলা বডিসের রঙটা বড় কড়া, শাড়িটা আধময়লা, এলোমেলো।

বলুন না জানেন যদি, রামপদ বললে। ইণ্টারেস্টিং কিছু?

আজকে ছুটির পর আসবেন সেই জায়গাটায়, দেখাবো। দেখেচেন তো কতক্ষণ ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করে রোজ! বুকের ওপর কাপড়টা সামলে নিয়ে মিসেস সেন বললে।

সেই আবার কাকটা উড়ে এসে বসল। রামপদ পিছন ফিরে বললে, আচ্ছা।

মিসেস্ যদি, সিঁথিতে সিঁদুর দেয় না কেন মিসেস সেন? এতদিন পরে হঠাৎ রামপদর লক্ষ্য হ'য়েছে—চুল-চেরা সিঁথিটা বিশ্রী দেখতে!

সেদিন সমবেত আলোচনায় প্রায় ঠিক হ'য়ে গিয়েছিল কারণটা—অমন পরিচ্ছদে অচিরা চাকরি করতে আসে কেন, কে বা কারা সে-পরিচ্ছদ যোগায় আর তার উদ্দেশ্যটা বা কি!

প্রায় সর্ববাদিসম্মত হ'য়ে এসেছিল সিদ্ধান্তটা। ওসব মেয়ের চাকরি না-করাই উচিত। তার চেয়ে একজন গরীব মেয়েকে দিলে কাজ দেখতো এই বাজারে, পাঁচটা মুখে তবু অন্ন উঠতো। যেমন হ'য়েছে বড়সাহেব! চাকরিটা কিসের জন্যে?

মিসেস সেন কি দেখাবে, কাল আমি নিজে চক্ষে দেখেচি—পাশাপাশি বসে হাসাহাসি করতে করতে চলেছে। রাত তখন এগারটা—সিনেমা দেখে ফিরছিলুম। ক্যাসানোভার কাছে থেকে টলতে টলতে দু'জনে এসে উঠলো কিনা! রামপদ নস্যিটা নাকমুড়ে গুঁজতে গুঁজতে অনু-নাসিক সুরে কুৎসা রটনা করে' বললে, এ'দিকে অ'পিসে দে'খ মুখটি খোলে না!

অবিনাশ হাসলে। মানে তার সব বোঝা আছে, তোমরাই বোঝ, মেয়ে দেখলেই সে চিনতে পারে! আরে বাবা সাজের একটা মানে আছেই। গোড়াতেই বাজি রাখতে চেয়েছিলুম, মনে নেই!

তোমরাই যত মাথা ঘামাও ওর চার্জ-সিট নিয়ে. কিন্তু সে কি কিছু গ্রাহ্য করচে? আগের চেয়ে সাজটা বরং আরো বেড়েচে! অবিনাশ রামপদকে শুনিয়ে বললে। কত ব্যাপার আছে এর মধ্যে কি বুঝবে!

আর এক টিপ নশ্যি নিয়ে রামপদ বললে, দেখা যাক, আজই বোঝা যাবে —সাজ বেরিয়ে যাবে। দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ!

রামপদর কথা শেষ হবার মুহূর্তেই হাস-খুশী মুখে মিসেস সেন এসে দোর-গোড়ায় দাঁড়াল। ঊর্দ্ধশ্বাসে রামপদ জিজ্ঞেস করলে, কি!

হাসির ঝিলিক শব্দিত করে' মিসেস সেন বললে, হ'য়ে গেচে! চার্জসিট খেয়েচে।

খেয়েচে! সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো অস্পষ্ট স্বর যেন আক্ষেপে চিৎকার করে উঠলো।

মিসেস সেনের মুখে হাসি মিলিয়ে গেল। রামপদ আর কি যেন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল। ওরা সবাই নিঃশব্দে এক এক করে উঠে গিয়ে ঘরের বাইরে করিডরে এসে দাঁড়াল—কে জানে মিস্ অর্ণবকে সান্ত্বনা দিতে না, টিটকিরি করতে! না কোন বিপদের আশংকায়?

মুখ বুঁজে একা ঘরে অনেকক্ষণ অপ্রস্তুতের মত দাঁড়িয়ে থেকে মিসেস্ সেন বেরিয়ে গেল। বেশ বুঝেছে, যাদের প্ররোচনায় সে চুরি করেছে, তারাই তাকে চোরের হীনতা স্বীকার করালে। চাকরিতে কাউকে বিশ্বাস নেই। এখন সে বুঝে পেল না, সতিকারে অচিরার ওপর তার ক্রোধের কি কারণ ছিল।

এরপর সারাদিন আপিসটা মৃ[illegible] রোগশয্যার মত ঝিমিয়ে রইল। [illegible] মুখে কোন কথা নেই, উল্টে অচি[illegible] দেখলে মুখ লুকোন ভাব। কে [illegible] ও এদের কোন বৃত্তিটা জাগায় [illegible] না, ভালবাসা?

ছুটির আগে ওরা ঠিক করলে, [illegible] ফাইলটা ফিরিয়ে দেবে অচিরাকে, বলবে, সরি ফর্ দি ট্রাব্‌ল্!

শেষ পর্যন্ত অবিনাশ অগ্রণী হয়ে[illegible] পা পা করে' আসতে আসতে অনে[illegible] পা জড়িয়ে গেল। সামনা-সামনি হ'লে হয়তো ভেঙেই পড়বে। ব[illegible] কেমন ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। রাম[illegible] চিরকাল ইতরামী, কি দরকার [illegible] এখন উনি কি ভাববেন?

করিডর পেরিয়ে আসতে অ[illegible] হঠাৎ উৎকট একটা শব্দে চমকে [illegible] অবিনাশ নীচে তাকিয়ে দেখ[illegible] অফিসারদের গাড়িগুলো সার-সার দাঁ[illegible] আছে খোলা-ছাতা উপুড় করে' র[illegible] মত। কিন্তু শব্দটা?

অবিনাশ চোখটা বুলিয়ে অ[illegible] এদিক থেকে ওদিক। দেখলে, স্টার্ট [illegible] ভার্মা'র গাড়িটা কাঁপছে থর-থর ক[illegible] হ্যাণ্ডেল হাতে ভার্মা স্টিয়ারিং-এর [illegible] এগিয়ে আসছে ঘর্মাক্ত হ'য়ে। আর ওা[illegible] কে ও গাড়িতে?

সামনে বাঁ দিকের সিটটায় আগে-[illegible] উঠে বসে আছে অচিরা। ঘাড় কাৎ [illegible] ঠিকই চিনলে অবিনাশ। বিজ্ঞা[illegible] পরিচ্ছদের বর্ণচ্ছটা অদৃষ্টপূর্ব।

কান ভোঁ-ভোঁ, মাথা ঝিম্-[illegible] ভাবটা কাটতে চোখের সামনে শূন্য দে[illegible] অবিনাশ। দুজনেই অফিস পালিয়েে[illegible]

রেগে টান মেরে হাতের ফা[illegible] ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজেকে ধিক্কার দি[illegible] যেন অবিনাশ বিড়-বিড় করে' উঠ[illegible] মরুক শালা কার কি! কোটি [illegible] টাকার কনট্রাক্টগুলোর হিসেব ঐ দে[illegible] আমাদের কি!

তারপর দাঁত দিয়ে শুকতলা চিব[illegible] মত ফাইলটা কুড়িয়ে নিয়ে টেনে-[illegible] টুকরো-টুকরো করে' ছিঁড়তে ল[illegible] অবিনাশ।

জাত-জন্ম আর রইল না!

দূরদূরান্তরের স্টেডিয়াম

শ্রীরমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ছোট, বড়, গণতান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক, পৃথিবীর সব দেশে 'তুচ্ছ' খেলা নিয়ে কত যে মাথা ঘামান হয়, তা সত্যিই ভাববার কথা। খেলা নিয়ে অল্পবয়সের ছেলেমেয়েরাই মাতামাতি করতে পারে! কিন্তু তাই বলে যাদের বয়স হয়েছে, সাংসারিক অভিজ্ঞতায় বুদ্ধি পেকেছে, যারা লঘু গুরুর তারতম্য বিচার করতে শিখেছে, হিসেব করে পা ফেলায় বা ওজন করে কথা বলায় যারা হয়েছে পোক্ত, তাদের আবার খেলা নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন? অথচ ঐসব দেশের লোকদের নির্বোধ, চপল-চিত্ত বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

আমরা এই শহরে এখনও স্টেডিয়ামের আশায় উঠছি, পড়ছি—আর পৃথিবীর অন্যত্র দিকে দিকে বহুদিন আগেই খেলার আয়োজন একরকম ভাল মতই সারা হয়ে গেছে। পৃথিবীর ঐসব দেশে মখমলের মসৃণতা হার মানিয়ে খেলার খোলা মাঠে ঘাসের গালচে পাতা হয়েছে; মাঠ ঘিরে স্টেডিয়াম তৈরি করা হয়েছে। এইসব স্টেডিয়াম দেখবার মত। এ যুগের স্থাপত্য শিল্পের বিশিষ্ট প্রকাশ এদেরই সারা অঙ্গে; এদেরই প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে নানাবিধ খেলার আয়োজন।

ভারতের ছোট ছোট উপনিবেশগুলো দখলে রাখবার জন্য পর্তুগীজ প্রেসিডেণ্ট সালাজার যে সব কিম্ভুৎ-কিমাকার যুক্তি দেখিয়েছেন, তাতে পর্তুগ্যালের উপর আমাদের মন বিশেষ বিষিয়ে উঠেছে। তাহ'লেও সেই পর্তুগ্যালের কথাই ধরা যাক। রাজধানী লিসবনে অবস্থিত এদের স্টেডিয়াম দেখে অনেকেই অবাক হয়েছেন। অন্যের কথা বাদ দেওয়া যাক—ইংরেজ খেলোয়াড়ের মুখে এরই সুখ্যাতি সত্যিই উল্লেখযোগ্য। একালে নানাবিধ খেলায় ইংরেজের পূর্ব-গরিমার অনেকখানি হ্রাস হয়েছে। কিন্তু তাহ'লেও, খেলার উপকরণ, খেলার শাসন-শৃঙ্খলা, খেলার আয়োজন ব্যাপারে ইংরেজকে এখনও সমঝদার বনেদী বড়লোক বলে সবাই মানে।

কিছুকাল আগেও ফুটবল খেলায় ইংরেজকে এ'টে ওঠা জগতের অন্য কোন জাতির পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। চার বছর আগে বিশ্ব কাপ প্রতিযোগিতায় আমেরিকার মত অখ্যাত দলের কাছে ইংলণ্ডের পরাজয়, ফুটবল জগতের কাছে অত্যাশ্চর্য ঘটনা বলেই বোধ হয়েছিল। সম্প্রতি আবার অলিম্পিক ফুটবল-প্রধান হাঙ্গেরীর কাছে ইংলণ্ড ৭—১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে। এ নিয়ে ইংলণ্ডে শোকের ছায়া দেখা গিয়েছিল। বিদেশীর বিরুদ্ধে খেলায় এর আগে এমনভাবে ইংলণ্ডকে কখনও হারতে দেখা যায়নি।

ইংলণ্ডের একটি বাছাই করা ফুটবল দল ১৯৪৭ সালে ইউরোপের সফরে বেরিয়েছিল। পর্তুগ্যালের ন্যাশনাল স্টেডিয়াম দেখে এই দলের জগৎ-জোড়া নাম-করা একজন খেলোয়াড় বলেছিলেন—"এ যেন ছবির বই'এর পাতা থেকে তোলা হয়েছে" (Just like something out of a picture book)। ঐ দলের আর একজন প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় লিখে গেছেন—"স্টেডিয়াম ও সেখানে ট্রেনিং নিতে গিয়ে যা দেখলুম, তা'তে আমরা ইংলণ্ড দলের সব খেলোয়াড়েরা বিশেষ তাজ্জব বোধ করলুম। এবার খেলা; কাতারে কাতারে, গায়ে গায়ে, ঠেসাঠেসি করে বসে আছে ৬৫,০০০ দর্শক—রংএর ছোপ-লাগান সে দৃশ্য আমাদের নির্বাক্ করে দিল।" (We England players had been most impressed with the stadium and everything that went with it on our visit for training. Now, with 65,000 packed upon the tiered seats, we were left speechless by the colourful scene.)

অনেকের মতে পর্তুগ্যালের এই স্টেডিয়ামের মত এত ভাল স্টেডিয়াম ইউরোপে আর নেই। ওয়েম্বলির মাঠের মত এর মাঠের ঘাস; তেমনি সুকোমল, সমুজ্জ্বল, মসৃণ। ব্যবস্থার দিক থেকে লিসবনের এই স্টেডিয়াম অতুলনীয়। একে পর্তুগ্যালের জাতীয় সম্পদ, আনন্দ ও গৌরব বলা চলে। এই স্টেডিয়ামের জন্য পাহাড়ের উপর দিয়ে কয়েকটা বিশেষ রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। ঢালাই লোহার প্রকাণ্ড এর তোরণদ্বার; তারপরেই সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি বিরাট আয়তনের

লিসবনের ন্যাশনাল স্টেডিয়াম : এই বিপুল দর্শকপূর্ণ স্টেডিয়ামে ১৯৪৭ সালে ইংলণ্ড পর্তুগালের কাছে ফুটবল খেলায় ১০—০ গোলে পরাজিত হয়
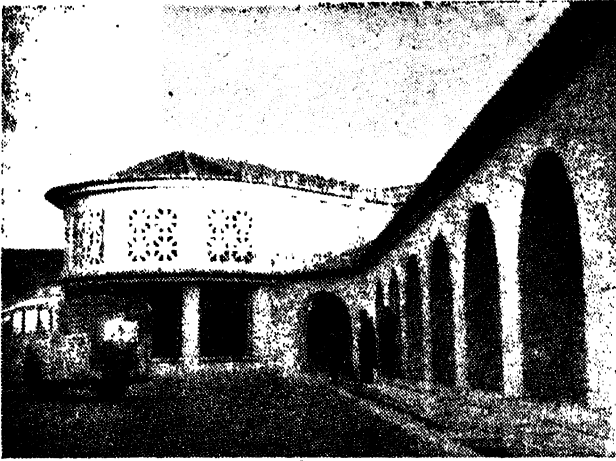
লিসবন ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের প্রাসাদোপম ড্রেসিং রুমে। বুট জুতোর কাদা-মাটি ধোয়ার জন্যে ঝর্ণা-জলের ব্যবস্থা আছে

এর প্রবেশমন্দির; এরই শেষে স্টেডিয়ামের সোপানাবলী।

এই স্টেডিয়ামের জন্য উপত্যকা কাটিয়ে চৌরস করায় জাতীয় সরকারের খরচ পড়েছিল পর্তুগীজ কারেন্সির ৩,৫০,০০০ পাউন্ড। উপত্যকার পার্শ্ব-স্থিত তিনটি পাহাড় নিয়ে এই স্টেডিয়াম রচনা করা হয়। সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি এর আসনশ্রেণী; এর সোপানশ্রেণী খচিত হয়েছে সাদা 'গ্র্যানাইট' পাথর দিয়ে।

স্টেডিয়ামের তিন ধার রচনা করতেই নিরূপিত অর্থ ব্যয়িত হয়—তাই এর বাকি একটা দিক খোলা। অনেকটা ঘোড়ার পায়ের খুরের আকারে এই স্টেডিয়াম রচিত হয়েছে। এই ধরনের ত্রিভুজ হওয়ায় স্টেডিয়ামের গঠন-সৌন্দর্য আরো বেশি খুলেছে বলে গভর্নমেন্টের মত। মাঝখানে প্রেসিডেন্টের আসন; এরই সম্মুখে দূরপ্রসারিত সাদা ধবধবে পাথরের তৈরি স্তম্ভশ্রেণী। সেখান থেকে সামনে খেলার প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে দেখা যায় নানা রংএর বিস্তৃত মাঠ, দেখা যায় দূরে অতলান্তিকের অশান্ত মহিমা।

স্টেডিয়ামের খেলার মাঠ ঘিরে দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য সিন্ডার ট্রাক। এরই পাশ ঘেঁষে চলে গেছে দু' ফুট চওড়া কংক্রীটের খাদ। এটা যে জল ভরে রাখা হয় তা নয়। দর্শক ও সিন্ডার ট্রাকের মধ্যে ব্যবধান রাখার জন্য এটা তৈরি করা হয়েছে।

খেলোয়াড়ের জন্য খড়ম

মাঠ থেকে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে পর্যন্ত পাথরের তৈরি সুড়ঙ্গ পথ সরাসরি চলে গেছে খেলোয়াড়দের পোশাক বদলাবার প্রকোষ্ঠগুলির মধ্যে। এই বাড়িগুলি বাইরে থেকে সেকালের স্পানীয় ছাঁদে তৈরি বলে দেখায়। কিন্তু ভিতরটা মোটেই সেকালের ধরনের নয়। এর দেয়াল, মেঝে সবই পালিশ করা পাথরের তৈরি। এগারজন খেলোয়াড়ের জন্য এখানে আছে এগারটা "লকার"। এর প্রত্যেকটির মধ্যে থাকে এক জোড়া কাঠের খড়ম; তাই পায়ে দিয়ে খেলোয়াড়রা স্নানের ঘরে যায়। এগুলো সবই পৃথক; প্রত্যেকটায় ঝাঁঝরি লাগান জলের কল। এসব ড্রেসিং রুমে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি থাকে। আহত খেলোয়াড়দের প্রাথমিক শুশ্রূষা ও চিকিৎসার জন্য এসব ব্যবহার করা হয়।

পর্তুগ্যাল সাহেব বিবির দেশ। সেখানে স্নানের ঘরে যাবার জন্য কাঠের খড়মের ব্যবস্থা আছে। কথাটা আমাদের কানে একটু অদ্ভুত শোনায়। কিন্তু আরও উল্লেখযোগ্য হ'ল এইসব প্রকোষ্ঠ ঘিরে জলের প্রণালী—এতে জল বয়ে চলেছে। খেলোয়াড়েরা ধুলো বা কাদা মাখা বুট এই জলে ধুয়ে পোশাক বদলাবার ঘরে ঢোকে। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সুবিধা, আরাম প্রভৃতি সব কিছুর উপর নজর রেখে এই স্টেডিয়াম তৈরি হয়েছে। পাহাড় কেটে স্টেডিয়ামের কাছেই গাড়ি রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইখান থেকে নানা রাস্তা চলে গেছে—সবই বাইরে যাবার পথ। খেলা ভাঙবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই গাড়ির সারি এখান থেকে চলে যায়।

এবার লিসবন ছেড়ে দক্ষিণ আমেরিকায় যাওয়া যাক। উরুগুয়ে, আর্জেণ্টিনা নয়—যাত্রা ব্রেজিলের উদ্দেশে। আফ্রিকা, আতলান্তিক পার হয়ে ব্রেজিলের প্রথম বিমানঘাটি রেকিফিতে অবতরণ। ব্রেজিলের যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র ইউরোপের দেড়গুণ বড়; কিন্তু ইউরোপের তুলনায় এদেশে লোকসংখ্যা অনেক কম। রাইও ডি জেনিরো ও সাও পায়োলো ব্রেজিলের সবচেয়ে বড় শহর। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর শহর রাইও। যে দিক থেকেই দেখা যাক, এর তুলনা নেই। ঐশ্বর্য-সম্ভার ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরা এর ঝলমলে রূপের প্রশংসা যারাই এখানে এসেছে, তারাই করেছে।

গগনস্পর্শী মনোজ্ঞ সৌধশ্রেণী এর বিভবের পরিচয় দেয়। পাহাড়, অপর্যাপ্ত সূর্যালোক, সীমাহীন সমুদ্র, বহু মাইল-ব্যাপী সোনালী বালির বেলাভূমি একে দিয়েছে মনোহর রূপ। সমুদ্রতীরের প্রশস্ত রাজপথ—পরিষ্কার, সরল, আবর্জনার লেশহীন তারই উপরে ছুটে চলেছে বাঁধাধরাহীন গতি হালফ্যাসানের 'লিমুসিন'। পাশেই বারো ফিট চওড়া সাদা কালো টালির মোজেকের ফুটপাথ,—সেখানে চলেছে ভাল পোশাক-পরা নরনারীর প্রবাহ।

ব্রেজিল ফুটবল পাগল। রাইও ডি জেনিরো ও সাও পাওয়োলো এ দেশের সবচেয়ে বড় শহর। সাও'তে ইটালিয়ান ফুটবলের প্রভাব বেশি করে দেখা যায়।

ব্যক্তিগত উৎকর্ষতার বিশেষ. পরিচয় পাওয়া যায় রাইওর খেলায়। সাওয়ো-পোলো লীগে ১২টি দল খেলে। সর্বসমেত ১১টি দল নিয়ে রাইওর প্রথম লীগ। এই সব দলের প্রত্যেকের স্টেডিয়াম আছে। রাইও'র প্রধান দল ভাসকো ডি গামার স্টেডিয়ামে ৭০,০০০ লোকের আসন আছে। সাওয়োপোলোর পেকাম্বু মিউনিসিপ্যাল স্টেডিয়ামে অনায়াসে ৮০,০০০ লোক ধরে।

রাইও ডি জেনিরোর মিউনিসিপ্যাল স্টেডিয়াম জগতে অতুলনীয়। খেলার ব্যাপারে এ এক অপূর্ব কীর্তি। এই অতিকায় স্টেডিয়ামের রচনা হয়েছিল সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। সে এক বিচিত্র কাহিনী।

মনোহর দিগন্ত

সেবার ১৯৫০ সালে বিশ্ব কাপ প্রতিযোগিতার বৈঠক বসবে ব্রেজিলে। সারা জগতের শ্রেষ্ঠ ফুটবল দল এই প্রতিযোগিতায় নামবে। এখানে আসবে ইংলন্ডের বাছাইকরা দল। সারা ব্রেজিল মেতে উঠল। একজোড়া স্টেডিয়াম চাই।

ইংলন্ডের ফুটবল শক্তি সম্পর্কে ব্রেজিলের লোকের উচ্চ ধারণা—ওরা ঐ খেলার রাজা। রাজার উপযুক্ত করে স্টেডিয়াম গড়তে হবে। কাজেও হ'ল তাই। রাজধানী রাইওর প্রাধান্য থাকা উচিত, তাই এখানকার স্টেডিয়াম হ'ল পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য। অপর স্টেডিয়ামটি তৈরি করা হ'ল রাইও থেকে ২৮০ মাইল দূরে, বেলো হোরাইজোন্টি শহরে। বিস্তৃত বনানীর মধ্যে এই জনপদ -বেলো হোরাইজোন্টি—'মনোহর দিগন্ত'—'Beautiful Horizon।'

রাইওর মতন এখানেও স্কাইস্ক্রেপারের শ্রেণী আকাশ ছুঁয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। এখানেও তেমনি বিলাস ও আরামের ব্যবস্থা; তেমনি প্রশস্ত রাজপথ; ফুলেভরা পার্কের প্রাচুর্য। বিস্ময় লাগে বিরাট অরণ্যের মধ্যে এই সাজানো-গোছানো ঝলমলে শহর দেখে। কত ত্রাসসংকুল, ঠাসা, বন-জঙ্গল পার হয়ে ডাকোটা প্লেন এখানে এসে নামে; কত পাহাড়ের চূড়া পার হয়ে চলেছে আর ওয়ার পথ। আতঙ্কে বিদেশী পর্যটকের গা শরীর শিউরে ওঠে ডাকোটা যখন
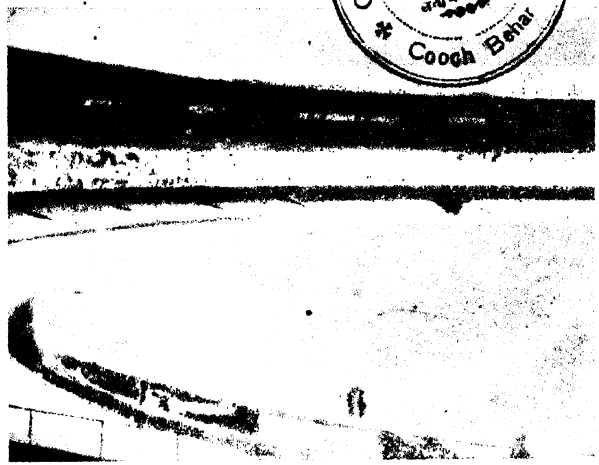
রাইও ডি জেনিরোর মিউনিসিপ্যাল স্টেডিয়ামের একাংশ

নিচুতে নেমে এসে দুই প্রকাণ্ড পাহাড়ের সংকীর্ণ ব্যবধানের পথে উড়ে চলে;—মনে হয় যেন তার দুই ডানার প্রান্তভাগ পাহাড় দুটোর গায়ে ঠেকে যাবে।

রাইওর মিউনিসিপ্যাল স্টেডিয়ামের একটা বৈশিষ্ট্য—এখানে এক লক্ষ বিশ হাজার দর্শক ছাদের তলায় বসে রোদে কষ্ট না পেয়ে, বৃষ্টিতে না ভিজে খেলা দেখতে পারে। এই ধরনের ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্য কোন দেশের স্টেডিয়ামে নেই। এই স্টেডিয়াম তৈরি হবার পর এখানে একাধিক খেলায় ১,৭০,০০০ থেকে ২,১০,০০০ দর্শকের স্থান সঙ্কুলান হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল বিশেষজ্ঞ মেরিও ফিলহোরের মতে স্টেডিয়ামে এখনও যা জায়গা আছে, তাতে সর্বসমেত এখানে ২,২২,৭৫০ আসনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

এতগুলি দর্শকের প্রবেশমূল্য থেকে পাওয়া যাবে ১,৭০,০০০ পাউন্ড। রাইও ডি জেনিরোরা স্টেডিয়াম নির্মাণের আগের বছরে এফ্ এ কাপ ফাইন্যাল দেখতে দর্শকসংখ্যা হয়েছিল ৯৮,২৪৯ ও টিকিট বেচে পাওয়া গিয়েছিল ৩৯,২৯৬ পাউন্ড। দর্শক ও প্রবেশমূল্য বাবদ অর্থের সংখ্যা তুলনা করলে ওয়েম্বলির চেয়ে রাইও'র মিউনিসিপ্যাল স্টেডিয়াম কত বড় তা সহজেই বোঝা যায়।

বিশ্ব ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতার প্রথম খেলা শনিবার, ২৪শে জুন ১৯৫০ সালে এই রাইও'র মিউনিসিপ্যাল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। তখনও এর নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ শেষ হয়নি। এই স্টেডিয়াম তৈরি করবার জন্য সময় দেওয়া হয়েছিল অল্প। তাহলেও কনট্রাক্টররা একরকম বলতে অসাধ্য সাধন করেছে। তা নয়ত নির্ধারিত তারিখে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা সম্ভব হত না। এর জন্য ৬,০০০ লোক দিবারাত্রি কাজ করেছে—এ কাজে হাত লাগাতে হয়েছে সামরিক বিভাগের লোকদের।

যারা দেখেছে এই স্টেডিয়াম ও প্রতিযোগিতার উদ্বোধনের দৃশ্য তারা তা জীবনে কখন ভুলতে পারবে না। মোটর-যোগে ইংলন্ড দল প্রথম দিনের এই খেলা দেখতে গিয়েছিল। এই দলের অধিনায়ক বিলি রাইট এই দিনের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন : "কোপাকাবানা সমুদ্রতীর থেকে রাইও'র মধ্যভাগ পর্যন্ত আমরা সহজেই পেঁছুলাম। শহরের মধ্যভাগ ছাড়িয়ে যে রকম যানবাহনের বিরাট অচল অবস্থার মধ্যে ঢুকে পড়লুম, সে রকম হয়ত জীবনে আর কখনও দেখ

মস্কোর স্টেডিয়াম মাঠে ইস্টবেংগল দল : দলের কর্মকর্তা শ্রীজ্যোতিষ গুহকে মাইক্রোফোন-সহযোগে ভারতের শুভেচ্ছাবাণী জ্ঞাপন করিতে দেখা যাইতেছে

না। লোকবোঝাই ট্রাম, বাস, দামী লিমুসিন সবই চলেছে স্টেডিয়ামের দিকে। আমাদের পুলিস পথপ্রদর্শক সেই বিশাল জনসমুদ্রে হঠাৎ গেল তলিয়ে। পথ বন্ধ, তাই কেউ বা ফুট-পাথের উপর গাড়ি চালিয়ে আগে যাবার চেষ্টা করলে। কোন গাড়ির জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে নিগ্রো ড্রাইভার আমাদের দিকে তাকিয়ে হেঁকে বলে যাচ্ছে—"ব্রেজিল"। ব্রেজিল জয়যুক্ত হ'ক —এ সবারই মনের ইচ্ছা।"

স্টেডিয়ামের উপরিভাগের আসন থেকে বহু নিচে মাঠের দৃশ্য মনে করিয়ে দেয় আরব্য উপন্যাসের পাতার কাহিনী। ডিম্বাকৃতি খেলার মাঠ। চারিদিক ঘিরে উঠে গেছে দর্শকের শ্রেণী। বেশভূষা সকলেরই বেশ ভাল। মাঠ ঘিরে বেশ চওড়া ও গভীর কংক্রিটের খাদ। এটাকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বলা চলে। প্রতি-যোগিতার মধ্যে বৃষ্টির দিন ছাড়া এটা কোনোই ছিল। দূরে খেলোয়াড়দের প্রকোষ্ঠ থেকে সুড়ংগপথে খেলার মাঠে পৌঁছুবার ব্যবস্থাও বেশ ভাল। সাদা ও নীল পোশাক পরা প্রেসিডেণ্টের রক্ষি-দলের সোনালী শিরস্ত্রাণ থেকে সূর্যের আলো ঠিকরে দর্শকদের চোখে গিয়ে পড়ছে। তারা ব্রেজিলের জাতীয় গান বাজাতে শুরু করে দিল। তারপর হঠাৎ ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা ছেড়ে দেওয়া হল। প্রেসিডেণ্ট তাঁর আসনে বসলেন—সংগে সংগে ২১বার তোপ ছোঁড়া হ'ল। এর গুরুগম্ভীর আওয়াজের সহিত মিলিত হ'ল হাজার হাজার আতস বাজির শব্দ। ব্রেজিলের লোকেরা বাজি পোড়াতে খুব ভালবাসে। মাঠে দল পেঁছুলে চারি-দিক থেকে সশব্দে শূন্যপথে হাউই ছুটলো। ব্রেজিল দলের খেলায় যখনই ভাল কিছু দেখা গেছে বা ওদের পক্ষে গোল হয়েছে তখনই হাজার হাজার হাউই উঠেছে, আকাশ ছেয়ে দিয়েছে আগুনের ফুলের মালা ছড়িয়ে।

ব্রেজিল ও মেক্সিকোর খেলার প্রথমার্ধ শেষ হবার বহু পূর্বেই মাঠ ভরে উঠেছে এই সব আতসবাজির দগ্ধাবশেষে। একবার বল তুলে নিতে গিয়ে জ্বলন্ত বাজির একটা অংশ গোল-কিপারকে তুলে নিতে দেখা গেছে। ব্রেজিলে জুন মাস থেকেই শীতের আরম্ভ। সে সময় ফুটবল খেলা মোটেই ক্লান্তিকর নয়। তাছাড়া স্টেডিয়ামটা যেভাবে তৈরি হয়েছে তাতে আধ ঘণ্টা খেলা হবার পর এর ছায়া মাঠের তিন ভাগের দু'ভাগ অংশের উপর পড়ে।

রাজধানীর সন্নিকটে করকোভাডো পাহাড়। এ একটা দেখবার মত জায়গা। প্রথমটা মোটরযোগে ও পরে স্টিলের দড়িতে চাকা-বাঁধা পার্বত্য রেলওয়ে চড়ে এখানে যেতে হয়। পাহাড়ের উপরে বিরাট আকারের যীশুখৃস্টের মূর্তি। এর দুই হাত প্রসারিত। প্রকাণ্ড বেদীর বসবার আসনে নেমে যেতে হয়।
উপর দণ্ডায়মান মূর্তি। বেদীর ধাপ-গুলো থেকে বহু নিচে দেখা যায়

রাইওকে—ছবির মতন পড়ে আছে। কোথাও দীনতার চিহ্ন নেই; উৎসুক, প্রাণচঞ্চল, সাজান-গোছান শহর; তার উচ্ছলিত, উদ্বেলিত জীবন যেন ধরা দিয়েছে শিল্পীর তুলিতে। বেদীর ধাপ থেকে মাঝে মাঝে দেখা যায় বহু নিচে সাও পাওয়োলোর অভিমুখে চলেছে হাওয়ায় ভেসে উড়োজাহাজ; নিচে কখন বা খেয়ালী মেঘের দল দৃষ্টিপথ রোধ করে দেয় ঘন কুয়াশার মত জাল টেনে।

লৌহপর্দার অন্তরালে

এবার লোহার পর্দা সরিয়ে সোভিয়েট রাশিয়ায় একটু উঁকি মেরে দেখা যাক। এ রাজ্যের লোকেরাও ফুটবল পাগল। এক মস্কোতেই এক ডজনের উপর স্টেডিয়াম আছে। ছয় মাস ধরে এদের জাতীয় প্রতিযোগিতার খেলা চলে; তাতে ১৭,৫০০ দল যোগদান করে। মস্কোতে শেষ ৬৪ দলের খেলা হয়। ইংলণ্ডের মত জল-কাদায় এদেশে ফুটবল খেলা হয় না। সোভিয়েট রাশিয়ায় ফুটবল গ্রীষ্মকালের খেলা। তাই এদেশে স্টেডিয়ামের প্রায় সব আসনগুলোই অনাচ্ছাদিত। যদিও এক লাখের বেশি দর্শকের স্থান এই সব স্টেডিয়ামে নাই, তাহলেও একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল এগুলোর চারিপাশে অনেক জায়গা আছে। সেখানে আরো কয়েকটা খেলার মাঠ আছে। সে সব মাঠে অল্প বয়সের ছেলেদের খেলা শেখান হয়, বড়দের খেলার অনুশীলন চলে। তাছাড়া সে সব জায়গায় বাস্কেট বল, ভলিবল, লন টেনিস প্রভৃতি খেলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া সেখানে চাকা-লাগান আইসক্রিমের গাড়ি, প্রকান্ড আকারের চারাবৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। এ সব মিলিয়ে খেলা একটা বিরাট উৎসবে পরিণত হয়।

লেনিনগ্রাদ স্টেডিয়ামকে আধুনিক বলা চলে। এটা তৈরি হয়েছে নূতন পদ্ধতিতে। এর চারিদিক ঘিরে প্রকান্ড ঢিবি—তারই গা বেয়ে সামান্য ঢালের রাস্তা চলেছে। তা দিয়ে লোক হেঁটে চলেছে, মোটর গাড়ি ভরে চলেছে। ওপরে মোটরগাড়ি রাখবার জায়গা আছে। একেবারে উপরে উঠে স্টেডিয়ামের বসবার আসনে নেমে যেতে হয়।

সোভিয়েট দেশে স্টেডিয়াম মাঠে খেলা শুরু হবার কিছু আগে সুড়ঙ্গপথ ধরে খেলোয়াড়েরা মাঠে চলে আসে। তারপর দুই দল মাঠের মাঝখানে বৃত্তাকারে দাঁড়ায়, দুই দলের মধ্যে ফুলের তোড়া বিনিময় হয়, আবার পোশাক বদলাবার ঘরে তারা ফিরে যায়। সেখানে ফুলের তোড়াগুলো রেখে আবার ফিরে আসে মাঠে। খেলা আরম্ভের আগে পাঁচ মিনিট ধরে দুই গোলের সামনে দুই দলের প্রাকটিস চলে। তারপর রেফারির বাঁশীর ইঙ্গিতে ম্যাচ শুরু হয়।

চার বছর আগে একটা প্রবন্ধে আইভর মণ্টেগু মস্কো ডাইনামো স্টেডিয়াম মাঠের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে সামান্য কিছু এখানে উদ্ধৃত করে এই প্রবন্ধ শেষ করবো। ইনি লিখেছেন ঃ

বিদেশীর চোখে এখানকার কিছু কিছু ব্যবস্থা একটু অদ্ভুত ঠেকে। কোন্ দলের কত গোল হ'ল তা দেখান হয় একটা বিরাট স্কোর-বোর্ডে। লাউড স্পীকারে ঘোষণা করা হয় ম্যাচে কোন্ দলের কে কোথায় খেলবে। তাছাড়া ম্যাচ শেষ হবার পাঁচ মিনিট থাকতে একটা প্রকাণ্ড ঘড়ি থেকে সকলকে সতর্ক করে ঘণ্টা বাজতে থাকে। এর পর নির্ধারিত সময় পুরো খেলা হ'ল কি না, তা নিয়ে দর্শক ও রেফারির মধ্যে কোনরূপ বচসা হয় না। মাঠের একদিকেই একই লাইনের দুই অর্ধে দু'জন লাইনসম্যানই দাঁড়ায়। এতে রেফারির অফসাইড বিচার করায় খুবই সুবিধা। এরই বিপরীত দিকের লাইনে রেফারি থাকেন। এই ব্যবস্থায় তাঁর কর্তৃত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না।

দাম ৷৷৵০
আর স্থানীয়
শুল্ক
LUX
TOILET SOAP
BATH SIZE
ভারতে
প্রস্তুত
বড় সাইজের

—৪—
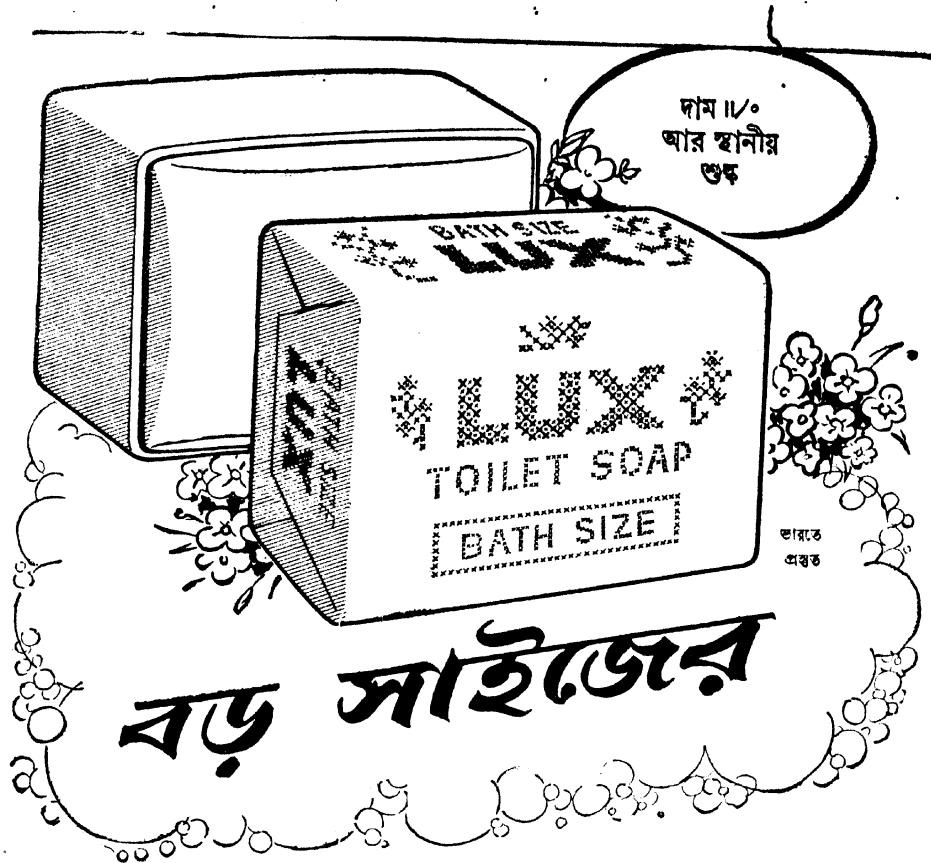
'এ দু'টো হল' আসল বজ্জাত, বুঝলি বনমালী। আমি সব দেখি, দেখে চুপ ক'রে থাকি। ভাবি কি হবে বলে। খামোকা কথা সৃষ্টি হবে কতগুলো। কে ভাড়া দিচ্ছে কে দিচ্ছে না। কার দেবার ক্ষমতা কবে বন্ধ হবে ওরা ভয়ানক টের পায়, ওরা এবং ওদের পরিবার দু'টো। বাচ্চাগুলো পর্যন্ত বোঝে কার আর্থিক ক্ষমতা কতটা। সারাদিন এই ক'রে ঘুরে বেড়ায়। ব্যস্, তারপর সোজা চলে যায় পারিজাতের বাংলোয়। গিয়ে বলে আসে, অমুকের একটা রেণ্ট আটকে গেলে নোটিশ দিয়ে তুলে দেবেন। দু'বার চান্স নিতে গেলে ঠকতে হবে: কেননা, ঘরের মানুষগুলো ঘড়া এমন জিনিস নেই যে, সব বিক্রী করলেও দু' মাসের ভাড়া উঠবে, কাজেই।'

জায়গাটা অন্ধকার থাকলেও শিবনাথ কেদার গুপ্তের চোখ দু'টো, চোখের ভেতর পর্যন্ত বেশ দেখতে পাচ্ছিল। পরনে ছেঁড়া মতন পায়জামা। গায়ে কমদামী একটি গরম কোট। অনেক দিন চুল কাটছে না, দাড়ি বড় হয়েছে গালের। আর বাকি যে ক'ঘর আছে, সেগুলোকে [illegible]গলও বলতে পারিস, মেষও বলা চলে। [illegible]গুলি কিন্তু দেখতে খুবসুরৎ। [illegible]টোই কাজে বেরিয়ে যায় সেই কাকভোরে, ঘরে ফেরে দুই দণ্ড রাত ক'রে। [illegible]কটা বুঝি স্টেট্ বাস-এর কণ্ডাক্টার। [illegible]টির দিন হলেই সেজেগুজে বৌ নিয়ে [illegible]লকাতায় চলল মরদ সিনেমায়, রেস্টুরেণ্টে [illegible]তে। সব করতে রাজী আছে ওরা, [illegible]ন্তু ছুটির দিন বৌকে নিয়ে বেড়ানো [illegible]ধ রেখে জল বাতি নর্দমা পায়খানা [illegible]মাছি থুথু নিয়ে মিটিং করবে না। [illegible] দায় বুড়োদের। ওরা জানে, তাদের [illegible]প করতে বললে স্টপ করবে, চলতে বললে চলবে। এর বেশি কিছু করবে না। কাজেই—

কেদার গুপ্ত খসখসে গলায় হাসল। শিবনাথ অনেকটা গুপ্তের কথা সমর্থন করল।

'কাজেই রাতদিন জল, কল, পায়খানা নিয়ে ঘাটাঘাটি করছে এই বুড়ো শালিক দু'টো। এরাই এখানকার, মানে পারিজাতের বাবার চিড়িয়াখানার পুরোনো জীব। হাজার অসুবিধা ভোগ করলেও বস্তি ছাড়ছে না; কেননা, অন্য জায়গায় গিয়ে এমন বিনি পয়সায় জল, কল, পায়খানা নিয়ে পলিটিক্স করতে পারবে না। একটু বয়স হলে মানুষ পলিটিক্স করতে চায় ডাক্তার আর মাস্টার হ'ল তার নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। বস্তি এখন ওদের রাজনীতির এক নম্বর ফিল্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

হিসাবের খাতা থেকে বনমালী মাথা তুলল।

'কিন্তু হিসাব এখনো বাকি রয়ে গেল গুপ্ত। মাস্টার, ডাক্তার, বাস-কণ্ডাক্টার আর ফ্যাক্টরির দুই ছোকরাকে নিয়ে হ'ল পাঁচ ঘর। এক ঘরে তুমি আছ, এক ঘরে এসেছেন আজ এই ভদ্রলোক।' চিবুক নেড়ে ইঙ্গিতে শিবনাথকে দেখিয়ে বনমালী বলল, 'আর? পারিজাতকে গিয়ে সাহস ক'রে দু'কথা শোনাতে পারে এমন আর আছে কেউ?'

'পাঁচু ভাদুড়ি আছে এক ঘরে।'

'সেই সেলুনওলা?'

কে গুপ্ত মাথা নাড়ল।

'মানুষের ঘাড় চেঁছে ব্যাটা দু' পয়সা করেছে শুনলাম। অথচ বস্তিটা ছাড়ছে না তো।' বনমালী বলল।

'শালা এক নম্বরের খানি, পয়সা করবে না কেন।' কে গুপ্ত বলল, 'আমি আর ওর দোকানে এখন চুল কাটতে যাই না।'

'কেন ধারের খদ্দের নেয় না বুঝি পাঁচু?'

'সেকথা হচ্ছে না। শালার ক্ষুরের ভয়ানক ধার। চুলের সঙ্গে ঘাড়ের মাংস তুলে ফেলে। নগদের কারবারেও।'

'বলে কি?' বনমালী অবাক হয়ে শুনে।

'চামার এক নম্বরের চামার।' কে গুপ্ত লম্বা চুলে হাত বুলিয়ে বলল, 'আমার চুল কি আর কাটা হবে না, হবে, কিন্তু সেদিন ন্যায্য পয়সা মিটিয়ে দেবার পরও শালা আমাকে ইনসাল্ট্ করল। কি না,—দোয়ানিটা খারাপ।'

'কি রকম! তোমার সঙ্গে বুঝি আর বেশি পয়সা ছিল না?' বনমালী প্রশ্ন করল। 'পাল্টে দিতে পারলে না?'

কে গুপ্ত মাথা নাড়ল।

একটু ভেবে বনমালী বলল, 'তারপর থেকে বুঝি আর চুল কাটছ না, দাড়ি কামাচ্ছ না। এদিকে আর একটাও সেলুন নেই বটে। হবে, আস্তে আস্তে হয়ে যাবে।'

'নাঃ।' গুপ্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'সেলুন ছাড়া ভদ্রলোক চুল কাটতে পারে!'

বনমালীও দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'আহা কত বড় সেলুন ছিল, কত আড়ম্বর ক'রে তুমি চুল কাটতে, দাড়ি কামাতে পার্ক স্ট্রীটের সেলুনে ডিলুক্সে। সে সব কি আমি জানি না।'

কে গুপ্ত বলল, 'থাক, অতীত ঘেঁটে লাভ নেই। কথা হচ্ছে পারিজাতকে গিয়ে দু'কথা বলা নিয়ে। উঁহুঁ, ওই শালা ভয়ানক স্বার্থপর। কারুর জন্য কিছু করবে না। নিজের সুখসুবিধা ছাড়া।'

'কেন বাড়িতে জল-কলের সুবিধা হলে সেটা ওরও তো পাওনা হ'ল। পাঁচু ভাদুড়ি বলে কি।'

'জলকলে ভাদুড়ির দরকার নেই। সারাদিন থাকে সেলুনে। রাতে পড়ে থাকে বেশ্যাবাড়ি। পাঁচু ভাদুড়ির এ-বাড়ির সুখ-সুবিধা ভোগের সময় কতটুকুন।'

'জুটেছে সব ভাল।।' বনমালী শিবনাথের দিকে তাকাল। পারিজাতের চিড়িয়াখানার যতসব চিড়িয়া। কিছু মনে

করবেন না মশাই, বন্ধুলোক বলে গুপ্তকে ঠাট্টা করছি।' দাঁত বার করে মুদি হাসল।

'না আমার মনে করার কি আছে।' বেশ সতর্কভাবে কথাটা বলে শিবনাথ চুপ করল।

'থাক গে,' বনমালী বলল, 'আর,— আর কে আছে ভাড়াটে?'

'বলাই। বড়বাজারে ওর ফলের দোকান ছিল। এখন কাপড়কাচা সাবান ফেরি করছে বেলেঘাটার রাস্তায়। ও নাকি কাল সারাদিনে একটাও সাবান বিক্রী করতে পারেনি, আমার কাছে ব'সে তখন কাঁদাকাটি করছিল। আর চালাতে পারছে না। এদিকে ঘরে মেয়ে বড় হয়ে আছে। ডুবছে লোকটা। কাজেই হেন ভাড়াটের আর সুবিধা অসুবিধা নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ কি। আমার মতই চুপচাপ পড়ে আছে কোণার দিকের একটা ঘর নিয়ে।'

'তাও বটে।' বনমালী ঘাড় নাড়ল। 'এরকম অবস্থার ভাড়াটেদের একটু চুপচাপ থাকাই ভাল।' কে গুপ্ত আকাশের দিকে মুখ ক'রে কি ভাবল।

'সে জন্যেই আমি এসে তোর দোকানের সামনে সারাদিন এই বেঞ্চিটার ওপর ব'সে থাকি বনমালী, যাতে না নিজের এই ক্রাইসিসের মধ্যে আবার ভাড়াটেদের স্ট্রাইক-ফ্রাইকের মামলায় জড়িয়ে গিয়ে একটা নতুন বিপদ ডেকে আনি।'

'তা কি আর আমি বুঝি না—সে তো চোখেই দেখছি। যাকগে,—বলাইকে নিয়ে দশ ঘর ভাড়াটে হ'ল। বাকি দুই কে আছে।'

যেন বনমালীর এবারের প্রশ্নে গুপ্ত বেশ বিরক্ত হ'ল।

'বাবা, তুমি আছ সদরটি আ ব'সে। বাড়িতে ক'টা মাছি ঢুকছে, মাছিটা কার পাতে বসেছে, কে কি ভাত খেয়েছে, সব তুমি জান। ন'ন প্রীতি বীথি আর এক নম্বর ভাড়াটে কমলা কি তোমার দো জিনিসপত্র কিনতে আসে না। এ লোক হয়ে গেছে ওরা, ওদের সব এখন শহরের দোকান থেকে আ বুঝি!'

'অনেকটা তাই,' বনমালী গম্ভ হয়ে বলল, 'কমলা মাঝে মাঝে আসে।'

'করিস তো টেলিফোনে চাকরি বোন। ঘরে পুষ্যি কত।'

'কমলার কোন পুষ্যি নেই।' বনম বলল, 'মাইরি নার্স আছে বেশ। ডাক্তার ছোঁড়া নাকি বিয়ে করতে চাই বিয়ে করবে না। বস্তির উন্নতি ক তাই এমন ভাল চাকরি করা স তোমাদের সঙ্গে সস্তাঘরের ভাড়াটে আছে। হা-হা।'

'তোকে বলেছে নাকি?' কে গ নাকে হাসল। 'কি মশাই, আপনা বলেছে নাকি, এই মাত্র তো আপনার স আলাপ-সালাপ হ'ল দেখলাম। কার হচ্ছে বুঝেছেন তো?'

শিবনাথ সলজ্জ হেসে ঘাড় নাড় 'হ্যাঁ, কমলা,—নার্স বুঝি?'

'হোক, আমি বলব, 'শী ইজ বেটার দ্যান্ এ—'

'এই গুপ্ত!' বনমালী ধমক দিল 'মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কেন তোমার এ সব বাজে বকার প্রয়োজন। এক বাড়িতে ধরতে গেলে এক চালার নিচেই সবাই। বেশ তো, তিনি তো এসেছেন এখানে, দু'দিন বাস করবেন। কে মালুম করার মতন চোখ আছে। না ওঠ, এইবেলা দোকানের দরজা বন্ধ ক কি মশাই, আপনি আসতে না আসতে গুপ্তর সাথী হয়ে পড়লেন নাকি।'

শিবনাথের চোখের দিকে তাকিয়ে বনমালী মৃদু হাসল।

'না, এই?' শিবনাথ হঠাৎ ব্যস্ততার ভাব নিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। 'বাড়ির ভিতরে খুব চেঁচামেচি অনেক লোক, এখানে আপনার দোকানের সামনেটা এখন বেশ ফাঁকা। নিরিবিলিতে একটু বসেছিলাম।'

'না না না।' বনমালী বুঝল শিবনাথ অন্যরকম বুঝেছে। 'কেন বসবেন না, আপনারা দশজন ভদ্রলোক এসে এখন এখানে বাস করতে আরম্ভ করেছেন দেখে সাহস করে আমিও দোকান করেছি। আসবেন, বসবেন বৈকি। বলছিলুম গুপ্তকে। বড্ড বাজে বকে।'

শিবনাথ চুপ করে রইল।

কে গুপ্ত, বোঝা গেল বিড়ি খুঁজতে পকেট হাটকাচ্ছে।

সেদিকে তাকিয়ে বনমালী বলল, 'সেটার কি হ'ল, আর একটা কাজের যে খবর পেয়েছিলে? কোট-পেন্টুলন প'রে সেদিন বেরোলে দেখলাম।'

বিড়ি পাওয়া গেল না। ব্যর্থ হয়ে হাত গুটোল কে গুপ্ত। 'হয়নি। হয়নি বলেই তো তোমার পায়া ভাঙ্গা বেঞ্চিটার ওপর এসে আড্ডা বসি, আর একটা বাঙলা বোতলের জন্যে তোমায় বাবা ডাকি।'

কথা শেষ ক'রে গুপ্ত চুপ করে রইল।

সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে বনমালী শিবনাথের দিকে তাকাল। 'গুপ্তর মতন এমন মন্দ বরাতের লোক আর দু'টি দেখলাম না মশাই। কম সে কম, লাখ জায়গা থেকে চিঠি পেয়ে দেখা করতে ছুটে গেছে। হচ্ছে না, কোনোটায় সুবিধা করতে পারছে না। তাই বলছিলাম ভয়ানক সুখের চাকরি ছিল, আজ এই অবস্থা, মাথা খারাপ হবে বৈকি। সেজন্যেই এত বাজে বকে।' কথা শেষ করে মুদি আড়চোখে গুপ্তকে দেখল।

কে গুপ্তর সেদিকে ভ্রুক্ষেপই নেই। বাঞ্চ ছেড়ে ওঠারও লক্ষণ নেই। 'তুই আমায় সতী শেখাচ্ছিস, তুই আমায় মেয়েমানুষ চেনাচ্ছিস। বুঝলি বনমালী, আই হ্যাড্ গট্ এনাফ্। আমার আফিসে আঠারোটা মেয়ে ঢুকিয়েছিলাম। আমি তাদের চাকরি দিতাম এবং তা খেতেও দিতাম।'

'সে কি আর আমি জানি না, তুমি কতবড় একটা বড়বাবু ছিলে।' যেন একটু ভেবে বনমালী হেসে পরে প্রশ্ন করল 'তা ডুবো জাহাজের কাপ্তান না হয় হাত পা ভেঙ্গে আমার দোকানের সামনে চিৎপটাং হয়ে পড়েছে, মেয়েগুলো এখন করছে কি?' বনমালী মিটিমিটি হাসল।

'সাঁতার দিয়েছে। ওরা ভাল সাঁতার কাটতে জানে বলে একটা আফিস ডুবতে থাকলে বেলাবেলি আর একটিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। দেয় ওদের আশ্রয়। তাই বলে কি আমাকে দেবে।' কে গুপ্ত গলার একটা শব্দ করল। 'তাই বলি, যা জানিস না, যে-লাইনে তুই নেই সেই লাইনের খবর তুই আমায় শেখাসনি। চুপ ক'রে থাকবি।'

একবার থেমে গুপ্ত শিবনাথের দিকে তাকায়। 'দুনিয়া জুড়ে বেকার সমস্যা; কিন্তু যুবতী উপোস থাকছে, মুদি দোকানের সামনে বেঞ্চিতে ব'সে গাছের পাতা গুনেছে এমন দেশের নাম কি আপনি খবর কাগজে দেখেন মশাই? তা ছাড়া আমরা যখন হালে স্বাধীন হয়েছি প্রথম প্রথম এদিকটায় ভদ্রতাটা একটু বেশি করবই। কি বলেন?'

ইঙ্গিতটা বনমালী বুঝল কি না শিবনাথ বুঝতে পারল না, নিজে বুঝে মৃদু হাসল।

কে গুপ্ত বলল 'আই কান ওয়েল ইমাজিন হাও শী ম্যানেজেস। বুঝেছেন মশাই, ওর হাতে ঘড়ি, মাখন না মেখে পাউরুটি খায় না। একটু ফল দুধ ঘরে ব'সে টুপ্‌টাপ্ চুকচুক্ ক'রে বেশ চালাচ্ছে। আপনি একদিন উঁকি দিলে দেখতে পারেন। আমি? ওর মতন মেয়েমানুষের ঘরে—ও যদি আজ মরে গেছেও শুনি উঁকি দেব না। উঁকি দেবার দরকার হয় না। বস্তির লোকের সব কিছু চাপা থাকে না। কে কি দিয়ে খাচ্ছে তা লুকোবার জো নেই। খারাপ জিনিস তো বেরোবেই, ভালটাও আপনি লুকিয়ে খেতে পারবেন না। প্রকাশ পাবে। মাছি? শালা বিধু মাস্টারের আটটা, শেখর ডাক্তারের ছ'টা, ফ্যাক্টরির দু' ঘরের আড়াইটে ক'রে ধরুন আর ওদিকটায় কারা থাকে? এইটুকুন বাড়িতে সবে হাঁটতে শিখেছে কথা বলতে শিখেছে চব্বিশটা বাচ্চা মশাই। পিল্‌পিল্ ক'রে রাতদিন এঘর ওঘর রান্নার খবর এসে ওবে বাজার এল তাকে গিয়ে লিস্টি দিচ্ছে।'

'ভালই তো' বনমালী মশলা দিয়ে রান্নার রেওয়াজ এখন গন্ধে তরকারী বুঝবার কাচ্চাবাচ্চার কলরবে সেটা বোঝা মন্দ কি।'

কে গুপ্ত বনমালীর কথায় কান না দিয়ে শিবনাথের দিকে তাকাল।। 'সুতরাং খবর আমাদের কানে আসছে। ফল মাখন দুধ ঘি ওবলটিন খেয়ে খেয়ে স্বাস্থ্যটা কেমন তাগড়াই করেছে লক্ষ্য করেছেন তো?'

শিবনাথ একটু আগে দেখা কমলাকে মনে করবার চেষ্টা করল।

বনমালী আর বাক্য ব্যয় না ক'রে দোকানের আলো নিভিয়ে দরজায় তালা দিল।
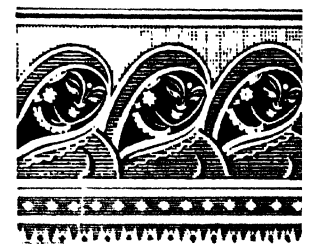
করবেন না মশাই, বন্ধ যেও না,' কে গুপ্ত ঠাট্টা করছি।' দাঁত হাসল। বলল না।

'না আমার। যেতে কে গুপ্ত গলা বেশ সতর্কভাবে বলল, 'ভাবছেন মুদির চুপ করল। আমার এত বন্ধুত্ব। ভয়ানক

'থাক ওকে দিয়ে মশাই। কাল বললে আর-স করবেন কি, ওর দোকান থেকে তেল নুন ডাল মশলা বৌ বুদ্ধি ক'রে আমার পুরোনো ফ্লাস্কটা, ছোট মেয়েটাকে দিয়ে পাঠিয়ে ছটাক দেড়ছটাক ক'রে সবই তো নিয়ে গেল।'

শিবনাথ কে গুপ্তর চোখের দিকে তাকায়। 'ঘরের জিনিস বাঁধা রাখে বুঝি বনমালী?'

বাঁধা রাখে মানে! তা'লে ওর দোকানে যে পাড়ার লোকের ঘরের জিনিসপত্তরে এ্যাদ্দিনে পাহাড় জমত মশাই, এত সব রাখতো বা সে কোথায়। কাজেই বার্টার সিস্টেম। ছাড়িয়ে আনা ফিরিয়ে পাওয়ার প্রশ্ন নেই। মন্দ না। বনমালী সংগে সংগে অন্য লোকের কাছে সব বিক্রী ক'রে দেয়।

—শিবনাথ চুপ ক'রে রইল।

'আমার শালা সব গেছে,' কে গুপ্ত বলল, 'ভাতের হাঁড়ি আর জলের ঘড়াটা ছাড়া। আর পরনের একখানা দু'খানা জামা-কাপড়। তা সেদিন ওয়াইফ ভেবে ভেবে শেষটায় যা হোক বার করতে পারল। মানে বৌর একজোড়া সায়া। বাক্সে তোলা ছিল। তা বৌ এখনো শায়া শাড়ি পরতেই আরম্ভ করেনি। জন্মদিনে কোন্ মাসি না পিসি ওকে উপহার দিয়েছিল। যাকগে। বনমালী শায়া রেখে দেশলাই সাবান এক বোতল কেরোসিন গিন্নির সুঁচসুতো আরো কি কি হাবিজাবি মিলিয়ে সুন্দর এতগুলো মনিহারী মেয়েটাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে।' কথা শেষ করে কে গুপ্ত হা হা ক'রে হাসল। আচ্ছা ব্যবসাদার। আর আপনি চাইলে না পাবেন কি ওর কাছে। বনমালী সব দিতে পারে আপনাকে, পাঁচফোড়ন থেকে আরম্ভ ক'রে কণ্ট্রোলের চাউল, মঙ্গলবারের মদ, যত বোতল খুশি। ওর এইটুকুন দোকানই দোকান নয়। এটা কারবারের মুখ। শরীরটা এত বড় আর এত বেশি ছড়িয়ে আছে যে, চট্ ক'রে বোঝা যায় না মালুমই হয় না সাদা চোখে।'

শিবনাথ ঢোক গিলল। কি ভাবছিল সে।

'লোক খারাপ না।' কে গুপ্ত মাথা নাড়ল। 'পয়সার লোভ বেশি। তা পয়সার লোভে, বনমালীর বলতে গেলে 'ক' অক্ষর গো-মাংস; আমাদের শিক্ষিত মহাজনরা এদিনে কম মারাত্মক রকমের ব্যবসা করছে কি, কি বলেন?'

যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে শিবনাথ মাথা নাড়ল।

'কি মশাই আপনি আমার কথায় বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছেন না।' যেন টের পেয়ে কে গুপ্ত হঠাৎ চুপ করল।

'শুনেছি বই কি।' শিবনাথ বলল 'ক'টা বাজে?'

'ও আপনার বুঝি হাতঘড়ি নেই। আমারটাও শালা গেছে- অনেকদিন। তা দশটা হবে। যান আপনি ঘরে যান নতুন জায়গায় এসেছেন আপনার স্ত্রী আবার ভাবছেন হয়তো আমায় বস্তিতে ঢুকিয়ে লোকটা পালাল কোথায়।' শিবনাথ এবার নাকে হাসবার চেষ্টা করল।

'আপনি বুঝি এখানে বসে থাকবেন।'

'আমি শালা চব্বিশ ঘণ্টাই এখানে পড়ে আছি। বনমালীর দরজায় ধরনা দিয়ে আছি কেন না কসাই হলেও ও আমার শুকনো দিনে গলাটা ভেজায়। প্রকৃত বন্ধুলোক। তা ছাড়া, বাড়িতে ঢুকতে ইচ্ছা করে না। ওই মশাই ডাক্তারনীর দরুণ। হ্যাঁ, এই যে এখন এসেছিলেন রোগা টিঙটিঙে শেখর ডাক্তার হোমিওপ্যাথ। সব চেয়ে বেশি ঝগড়াটে ডাক্তারনী আর সব চেয়ে চড়া ওর গলার আওয়াজ। উঃ মাথা ধরে যায় প্রভাতকণার চীৎকারে। তাই তো পালিয়ে এখানে চলে আসি মশাই আপনার হয়তো শুনতে ভাল লাগবে, জানি না। আমার আয়ু অর্ধেক কমে গেছে ওর চীৎকার শুনেই।'

শিবনাথ বলল, 'আমি চলি।'

'না আপনি যান। আপনার ওয়াইফ ছেলেমানুষ।'

শিবনাথ বস্তির দিকে এগোতে এগোতে অনুমান করল কে গুপ্তর বয়স কত, তাঁর স্ত্রী দেখতে কেমন, কত বয়স হবে। 'আপনার ওয়াইফ ছেলেমানুষ।' গুপ্তর কথাটা শিবনাথ মনে মনে আওড়ায়।

(ক্রমশ)

মাউণ্ট এভারেস্ট

'অনুসন্ধানী'

মাউণ্ট এভারেস্ট বিজয়ের পরে সকলের মনে এর খবর সম্বন্ধে বেশ কৌতূহল জেগে উঠেছে। এভারেস্টের নাম ও তার আবিষ্কার কাহিনী নিয়ে তর্ক চলেছে প্রায় একশো বছর ধরে এবং মনে হয় যে এ তর্ক হয়ত কোনোদিন শেষ হবে না।

১৮৫২ সালের আগে মাউণ্ট এভারেস্ট ১৫নং শিখর নামেই পরিচিত ছিল, কারণ কোন স্থানীয় নাম তখন পাওয়া যায়নি। শুধু এভারেস্ট নয় আরও অনেক শিখরের নাম তখন নম্বর দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হত। কর্নেল মণ্টগোমারি সে যুগে গিরিশৃঙ্গের নামকরণের এক সুন্দর পদ্ধতি চালু করেছিলেন। সমগ্র কারাকোরাম পর্বতশ্রেণীকে তিনি ইংরেজী 'কে' অক্ষর দিয়ে বোঝাতেন, আর কারাকোরামের বিভিন্ন শিখরের নাম দিয়েছিলেন 'কে—১' 'কে—২' ইত্যাদি।

সবাই এই নিয়ম মেনে নিলেন না। পাছে লোকে আবিষ্কারকের নাম ভুলে যায় তাই মনে করেই হয়ত কর্নেল ট্যানার তাঁর নিজের নামের (তিনিই পর্যবেক্ষক ছিলেন) আদ্যক্ষরের সঙ্গে নম্বর জুড়ে দিয়ে পর্বত শিখরের নাম দিলেন 'টি—১' 'টি—২' ইত্যাদি। নীচে হিমালয়ের নয়টি সুউচ্চ শিখরের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল তার ভিতরে এই দ্বিবিধ নামকরণের উদাহরণ মিলবে।

এভারেস্টের উচ্চতা জরিপ হয়েছিল ১৮৪৯ সালে কিন্তু ১৮৫২ সালের আগে সে জরিপের ফল হিসাব করে দেখা হয়নি। ঐ সালে ট্রিগনমেট্রিকাল সার্ভের চিফ কম্প্যুটার (রাধনাথ শিকদার) তার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্যার অ্যানড্রু অ-কে জানান যে জরিপের ফল হিসাব কষে দেখা গিয়েছে যে ১৫নং শিখরটি আজ পর্যন্ত যত শিখরের উচ্চতা নির্ণয় হয়েছে তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ।

সে সময় আশা ছিল যে পরে হয়ত এর চেয়ে উঁচু শিখর আবিষ্কৃত হবে কিন্তু বর্তমানে সে সম্ভাবনা আর নাই বললেই চলে। প্রথমে এই শিখরটির নামকরণ হয়েছিল 'মণ্ট এভারেস্ট' কিন্তু পরে মণ্ট কথাটিকে বিকৃত করে সবাই একে মাউণ্ট এভারেস্ট বলতে থাকেন; ধীরে ধীরে এই বিকৃত নামই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়ে যায়। গোড়াতে অবশ্য নামকরণ নিয়ে অনেক হৈ চৈ হয়েছিল। নেপালের তদানীন্তন পলিটিকাল অফিসার হজসন সাহেব বলেছিলেন এভারেস্টের স্থানীয় নাম 'দেবধুঙ্গ' কিন্তু তিনি যে সত্যই এভারেস্ট শিখর দেখেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ ছিল।

১৮৫৫ সালে হেরম্যান শ্ল্যাগিনটুইট নামে এক পর্যটক নেপালে যান, তিনি বলেন এভারেস্টের আদিনাম হচ্ছে গৌরীশঙ্কর; কিন্তু ১৯০৩ সালে ক্যাপটেন উড আবিষ্কার করেন যে, এভারেস্ট ও গৌরীশঙ্কর দুটি আলাদা শিখর, উভয়ের মধ্যের ব্যবধান ৩৬ মাইল। গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গটি ২৩৪৪০ ফুট উঁচু আর সরকারী দপ্তরে এর নাম ২০নং শিখর।

বহুদিন পর্যন্ত কোনও শিক্ষিত মানুষ এভারেস্টের তিরিশ মাইলের ভিতরেও পৌছতে পারেননি। পরে ধীরে ধীরে একটু একটু করে এভারেস্ট মানুষের কাছে ধরা দিয়েছে, তার জন্য মানুষকে যে অসামান্য মূল্য দিতে হয়েছে তার বিচিত্র কাহিনী খবরের কাগজ ও প্রকাশিত গ্রন্থরাজির মারফৎ আমরা অনেকেই জেনে ফেলেছি সুতরাং সে প্রসঙ্গ এখানে টেনে আনা নিরর্থক। সকলের হয়ত জানা নাই যে, প্রায় প্রত্যেকটি এভারেস্ট অভিযানেই ভারত সরকার কিছু কিছু সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। এরিক শিপটনের নেতৃত্বে যে অনুসন্ধানকারী দলটি গিয়েছিল তাতে জিয়লজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন একজন বাঙালী ভূবিদ (The Everest Reconnaissance Expedition, 1951—Eric Shipton.—Hodder & Stoughton, London).

বিস্ময় বোধ হতে পারে, এই ভেবে যে, এভারেস্ট শিখরে না পৌছেও মানুষ এর ভৌগোলিক অবস্থান ও উচ্চতা সম্বন্ধে এমন ওয়াকিবহাল হল কি করে?

ভৌগোলিক অবস্থান জরিপ করে বের করা শক্ত নয়। দুটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে অজানা শিখরের কৌণিক দূরত্ব সহজেই

শিখরের নাম	উচ্চতা ফুট হিসাবে	কত জায়গা থেকে উচ্চতা মাপা হয়েছিল	গিরিমালার নাম
মাউণ্ট এভারেস্ট	২৯০০২	৬	নেপাল হিমালয়
কে—২ (গডেন-অস্টেন)	২৮২৫০	৯	কারাকোরাম
কাঞ্চনজংঘা—১	২৮১৪৬	৯	নেপাল হিমালয়
কাঞ্চনজংঘা—২	২৭৮০৩	৭	ঐ
মাকালু	২৭৭৯০	৬	ঐ
টি—৪৫	২৬৮৬৭	৩	ঐ
ধবলাগিরি	২৬৭৯৫	৭	ঐ
XXX	২৬৬৫৮	৩	ঐ
নাঙ্গাপর্বত—১	২৬৬২০	৮	পাঞ্জাব হিমালয়

মাপা যায়; ঐ নির্দিষ্ট জায়গা দুটির ব্যবধান নির্ভুলভাবে মেপে নিতে পারলে অজানা শিখরের অবস্থান যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে বের করা যায়। ১নং চিত্রে চ একটি অজানা জায়গা; দুটি নির্দিষ্ট জায়গা ক ও খ থেকে তার কৌণিক দূরত্ব মাপা হ'ল অর্থাৎ খ-ক-চ এবং ক-খ-চ কোণ দুটি জানা গেল, এখন ক ও খ-র মাঝের দূরত্ব জেনে নিলেই আমরা চট করে কাগজের উপর ঐ তিনটি জায়গার একটি নক্সা এ'কে ফেলতে পারি।

উচ্চতা মাপা অত সহজ নয়। নানা কারণে দূর থেকে পর্বত শিখরের সঠিক উচ্চতা দেখা যায় না। প্রথম কারণটি ২নং চিত্রে দেখান হয়েছে; সেখানে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে ঐ শিখরেরই একটি নীচু
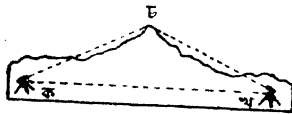
১নং চিত্র

অংশ। এই সম্ভাবনা এড়াবার জন্য গিরিশিখরের উচ্চতা একাধিক জায়গা থেকে দেখা হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি মজার গল্প মনে পড়ে গেল। দুই বন্ধু একবার ছোটনাগপুরের পাহাড় অঞ্চলে ঘুরছিলেন; সঙ্গে যে নকশা ছিল, তাতে পাহাড়গুলি দেখান ছিল না। একদিন পথ সংক্ষেপ করতে তারা রাস্তা ছেড়ে পাহাড় ডিঙিয়ে যাওয়া স্থির করলেন। প্রথমে মনে হয়েছিল যে, ছোট একটি পাহাড় পার হলেই ওপারের সমতলভূমিতে পৌঁছন যাবে। পাহাড়ের মাথায় উঠতেই দেখলেন সামনে আরও একটি পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে; সেটাও চড়লেন, কিন্তু তারপরে আরেকটি পাহাড় দেখা গেল, সেটি আরও উঁচু। এমনি করে পাহাড় চড়তে চড়তে বেলা গড়িয়ে গেল; যখন ভীষণ ক্ষিদে আর জলতেষ্টা পেয়েছে, তখন ছোট একটি গ্রাম দেখা গেল। বন্ধুরা সেখানে যেয়ে এক গৃহস্থ বাড়িতে এক মাচা শশা গাছ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে শশা কিনতে পাওয়া যাবে?

২নং চিত্র

গৃহস্বামী বিস্মিত হয়ে জবাব দিলো—"শশা ইখানে কুথা মিলবেক বাবু, শশা তো জঙ্গলে থাকে।" ও অঞ্চলে শশা মানে খরগোশ।

অনেক বাক-বিতণ্ডার পরে মাউণ্ট এভারেস্টের উচ্চতা ২৯০০২ ফুট বলে স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু চিরতুষারাবৃত হিমালয় শিখর সারা বছর ধরে সমান উঁচু থাকে না, উপরে বরফ জমলেই বেশী উঁচু হয়, আবার বরফ ঝরে গেলেই একটুখানি নীচু হয়ে পড়ে।

বাক-বিতণ্ডার অবশ্য আরও দুটি কারণ আছে, তাদের সঙ্গে একটু পরিচিত হওয়া ভালো। আমাদের চোখের সামনের জিনিস আমরা দেখতে পাই, কারণ তার থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখের তারায় পড়ে, তাই আলো না থাকলে কিছুই দেখা যায় না। এই আলোর গতিবিধি বিচিত্র।

আধুনিক বিজ্ঞান বলে, কম্পমান ইলেকট্রন থেকে তেজ বিকিরণের যে পর্যাবৃত্ত বৈচিত্র্য ঘটে, অপরাপর ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক সাড়ার মত, তার থেকেই আলোর সাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু এই
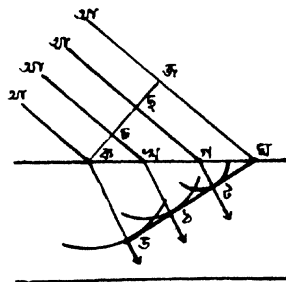
৩নং চিত্র

দুরূহ তথ্য নিয়ে মথা না ঘামিয়ে আমরা আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য আলোকে গতিশীল কণিকারূপে মেনে নিলে অন্যায় হবে না।

সাধারণত আলো তার উৎস থেকে চারিদিকে সমান বেগে ছড়িয়ে পড়ে। নিস্তরঙ্গ পুকুরের মাঝখানে একটি ঢিল ফেললে যেমন সেই ঢিল-পড়া জায়গাটিকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে ঢেউ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, জল, বাতাস, প্রভৃতি সাধারণ জিনিসের ভিতরে আলোর গতিও ঠিক ঐ গোল ঢেউর মতন। আলো যখন হালকা বাতাস ছেড়ে অপেক্ষাকৃত ঘন জিনিসের মধ্যে ঢোকে, তখন তার বেগ একটুখানি ব্যাহত হয়; তার ফল ৩নং চিত্রে দেখান হয়েছে।

একটি আলোর তরঙ্গ এসে একটি পুকুরের জলে তির্যকভাবে পড়ছে। বাতাসে আলোর গতি যত সহজ জলে তত নয়; ধরা যাক যে, ঐ পুকুরের জলে আলোর বেগ বাতাসের ভিতরের বেগের ¾ অংশের সমান। আ-ক, আ-খ, প্রভৃতি আলোক-রশ্মিগুলি সমান্তরাল, তাদের বেগও সমান, সুতরাং যে মুহূর্তে আ-ক রশ্মিটি জলের উপরে এসে পড়ছে, ঠিক সেই সময় আ-ঘ রশ্মিটি এসে পৌঁছচ্ছে জ-বিন্দুতে; জ থেকে ঘ-তে পৌঁছতে তার যে সময় লাগছে, সেই সময়ের ভিতর আ-ক রশ্মিটি জলের ভিতরে খানিকটা এগিয়ে যাচ্ছে। জলের ভিতরে আলোর বেগ বাতাসের ভিতরের ¾ অংশ, সুতরাং ঐ সময়ে আ-ক রশ্মি জলের ভিতরে জ থেকে ঘ-র দূরত্বের ¾ অংশ পথ এগিয়ে ড-তে পৌঁছচ্ছে। এমনিভাবে ঐ সময়ে অপর রশ্মি দুটি (আ-খ এবং আ-গ) জলের ভিতরে ঠ ও ট বিন্দুতে পৌঁছচ্ছে। ফলে সমগ্রভাবে দেখা যাচ্ছে যে, বাতাসের ভিতরে যে আলোক তরঙ্গের সম্মুখভাগ ছিল, ক-চ-ছ-জ, জলের ভিতরে তাই বদলে যেয়ে হল ড-ঠ-ট-ঘ অর্থাৎ আলোর পথ একটুখানি পিছনদিকে ঝুঁকে পড়ল।

এভারেস্ট শিখর থেকে প্রতিফলিত আলো শুধু বাতাসের ভিতর দিয়েই পর্যবেক্ষকের চোখে পৌঁছয় বটে, কিন্তু সে বাতাস সব জায়গায় সমান ঘন নয়। আমরা যত উপরে উঠি, বাতাস তত পাতলা

আর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সাগর-সমতল থেকে ২ মাইল উপরে বাতাসের চাপ থাকে ব্যারোমিটার যন্ত্রের ২০ ইঞ্চি, ৪ মাইল উপরে ১৫ ইঞ্চি, ৬ মাইল উপরে ১০ ইঞ্চি আর ১১ মাইল উপরে মাত্র ৪ ইঞ্চি। উপরে উঠলে তাপও কমতে থাকে। আমাদের দেশে সাগর-সমতল থেকে মাত্র ৩ মাইল উপরেই বাতাসের গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা হচ্ছে ৩২ ডিগ্রি ফারেনহাইট।

উপরের হিসাব থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এভারেস্ট শিখর থেকে প্রতিফলিত আলো পাতলা বাতাস থেকে উত্তরোত্তর ঘনতর বাতাসের ভিতর দিয়ে পর্যবেক্ষকের চোখে এসে পৌঁছয়, কারণ বাতাসের উপরের চাপ বাড়লেই তার ঘনত্বও বাড়ে। এর ফল ৪নং চিত্রে দেখান হয়েছে।

ক-শ রেখা শিখর থেকে প্রতিফলিত
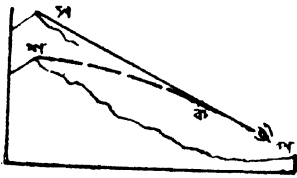
৪নং চিত্র

আলো যে বাঁকা পথ অনুসরণ করে, তার সম্ভাব্য রূপ। প-স্থানের পর্যবেক্ষক আলোর এই বাঁকা পথ মোটেই বুঝতে পারেন না, তাই তার মনে হয় এভারেস্ট শিখরের অবস্থান শ-তে নয়, তার চেয়ে একটু উঁচুতে স-বিন্দুতে; তার মানে এভারেস্টের প্রকৃত উচ্চতার চেয়ে তাকে একটু বেশী উঁচু মনে হয়।

কতখানি বেশী উঁচু মনে হয়, সেইটে নির্ধারণ করা নিয়েই বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল। আলোক-রশ্মির বেগ বাতাসের বিভিন্ন স্তরে কতখানি ব্যাহত হয়, তা নির্ভুলভাবে জানবার কোনও উপায় ছিল না, তাই নানা মুনির নানা মত নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল বিস্তর।

বহুদিনের অক্লান্ত সাধনার পর এভারেস্ট শিখরে মানুষ পৌঁছতে পেরেছে; জেট-চালিত বিমান এখন ৪০ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে আনাগোনা করে, বিমান-চালনার আদর্শ আবহাওয়া নাকি অত উঁচুতেই পাওয়া যায়; ১৯৩৫ সালে স্টিভেন্স ও অ্যাণ্ডারসন বেলুনে করে সাগর-সমতল থেকে ৭০ হাজার ফুটেরও বেশী উঁচুতে উঠেছিলেন; ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরও উচ্চস্তরের বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তাই মনে হয় যে এভারেস্ট শিখরের উচ্চতা নতুন করে নির্ভুলভাবে মাপবার সময় হয়ত এসে গিয়েছে।

এইবার দ্বিতীয় কারণ। জলের উপরিভাগ সর্বদাই সমতল ও দিকরেখার সমান্তরাল, কারণ ধরিত্রী মাতা তাঁর সব অংশকেই সমানভাবে নিজের কোলের দিকে টানছেন। তরল জিনিসের এই স্বভাবকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে মানুষের নিত্য-প্রয়োজনীয় একটি সামগ্রী, যার ইংরেজি নাম স্পিরিট লেভেল, যা দিয়ে রাজ-মিস্ত্রীরা দালান গাঁথবার সময় দেখে নেয় যে, পাশাপাশি ইঁটগুলি ঠিক সমান উঁচুতে রাখা হচ্ছে কিনা। পাহাড়-পর্বতের উচ্চতা নিরূপণের অথবা জরিপের জন্য যে সব যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাদের দিকরেখার সঙ্গে সমান্তরাল করে বসাবার ব্যবস্থা হয় ঐ স্পিরিট লেভেলের সাহায্যে।

স্পিরিট লেভেলের তরল পদার্থটিকে যদি পৃথিবী ছাড়াও ভূপৃষ্ঠের অপর কোন আকর্ষণ শক্তির পাল্লায় পড়তে হয়, তবে তার লেভেলত্ব বজায় থাকে না। হিমালয় পাহাড়ের কাছে ঠিক এই ব্যাপার ঘটে। হিমালয় তার বিপুল কলেবর নিয়ে সব পদার্থকেই আকর্ষণ করে। ভারতের এক প্রান্ত থেকে শুরু করে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সুদীর্ঘ দেড় হাজার মাইল জুড়ে ছড়িয়ে আছে এই বিরাট পর্বতশ্রেণী; চওড়াও কম নয়, ১৩০ থেকে প্রায় ১৭০ মাইল। এর আকর্ষণ শক্তি একেবারে তুচ্ছ নয়।

কঠিন পদার্থে এই আকর্ষণের প্রভাব বিশেষ বোঝা যায় না, কারণ ধরণীর প্রবলতর আকর্ষণ তাদের নিজের নিজের জায়গায় রেখে দেয়। তরল পদার্থের বেলায় তা হয় না, হিমালয়ের আকর্ষণ তাদের উপরিভাগকে একদিকে একটুখানি নীচু করে দেয়। দিকরেখার থেকে এর কৌণিক ব্যবধানের পরিমাণ দার্জিলিংএ ৩৬ সেকেণ্ড, শিলিগুড়িতে ২৩ সেকেণ্ড আর দেরাদুন ও মুসৌরিতে প্রায় ৩৭ সেকেণ্ড।

এভারেস্ট শিখরের সর্বোচ্চ বিন্দু, পর্যবেক্ষকের যন্ত্রে দিকরেখার সঙ্গে যে কোণ সৃষ্টি করে, তাই থেকে শিখরের উচ্চতা নির্ণয় করা হয়। এই দিকরেখার সমতলটি আন্দাজ করতেই যদি ভুল হয়ে যায়, তবে নির্ভুলভাবে উচ্চতা মাপা সম্ভব হয় না। সৌভাগ্য এই যে, এ ভুলের পরিমাণ জানা অসম্ভব নয়।

দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখরের উচ্চতা নির্ভুলভাবে 'আবিষ্কার' করা সহজ নয়, কারও একলার চেষ্টাতে জানা একেবারেই অসম্ভব। সেইজন্য এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব সমগ্রভাবে ট্রিগনমেট্রিকাল সার্ভের প্রাপ্য। সেই হিসাবে এই শিখরের নাম মাউণ্ট এভারেস্ট হওয়া অন্যায় নয়, অসংগতও নয়।

অনেককাল আগেই এর নাম বদলে রাধানাথ শিকদারের নামানুসারে নতুন নামকরণের প্রস্তাব উঠেছে। মাউণ্ট এভারেস্ট আমাদের দেশের শিখর নয়; আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী মহলে এর নাম সুপ্রতিষ্ঠিত। এখন এ নাম বদলে দেওয়া সহজ নয়। তাছাড়া আরও একটি দিক বিচার করবার আছে। স্যার জর্জ এভারেস্ট প্রমুখ বিদেশী বিজ্ঞানীদের তথ্যানুসন্ধানের ফলে এদেশ অনেক দিক দিয়ে উপকৃত হয়েছে, এদের অবদান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বলেই সেসব আমরা সব সময় ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারি না। এঁরা শুধু বিদেশী বলেই কি আমরা এঁদের ভুলে যাব?

সমুদ্রের আধমাইল নীচে

শিপ্রা রায়

মানুষ তার দুর্জয়শক্তির বলে পৃথিবীর সব অজানা দেশগুলিই একে একে জয় করতে আরম্ভ করেছে। এই দুর্জয়শক্তিরই এক বিরাট সাফল্য গিরিশৃংগ এভারেস্ট বিজয়। মানুষ কেবল পৃথিবীর উপরিভাগের এই সুসজ্জিত দেশ আর পর্বতমালা জয় করতে প্রয়াসী হয়েছে তা নয়—সমুদ্রের তলদেশে আজও যে বিস্ময়কর, অনাবিষ্কৃত রাজ্য রয়ে গেছে, তাও আবিষ্কারের জন্য বহুদিন থেকে ব্রতী হয়েছে। ১৯৩৪ সালে, যখন ডাঃ চার্লস উইলিয়াম বিব্, মিঃ ওটিস বারটনের সহযোগিতায় সমুদ্রের তলদেশে ৩০২৮ ফুট নামলেন তখন তা-ই পৃথিবীর রেকর্ড হয়েছিল। কিন্তু বিব্-স্থাপিত এই রেকর্ড আজ ভংগ হয়েছে—কারণ মানুষের প্রচেষ্টা কখনও কোথাও ক্ষান্ত হয়ে থেমে থাকে নি। এরপর ১৯৫০ সালে ১৬ই আগস্ট স্মাগলার কোভ, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে একটি সংবাদ আসলো—"নৌ-অনুসন্ধানকারী, ওটিস্ বারটন, আজ তার "বেনথোস্কোপ ডাইভিং বেলের" (Benthoscope diving bell) সহযোগে প্রশান্ত মহাসাগরের ৪৫০০ ফুট তলায় নামতে সক্ষম হয়েছেন। সমুদ্রের-তলদেশে এটাই মানুষের গভীর-তম অবতরণ। সেই বেনথোস্কোপের তিন ইঞ্চি লম্বা জানালা দিয়ে তিনি তলদেশের উজ্জ্বল চক্চকে বিস্ময়কর মাছ ও প্রাণী দেখেছেন ও এক চমৎকার বিবরণী দিয়েছেন। ৪,১০০ ফুট নামবার পর, পার্শ্ববর্তী সব আলো বিলীন হয়ে যায়। অবশেষে তিনি ৪,৫০০ ফুট তলায় পৌঁছালেন এবং আট মিনিট অবস্থানের পর, উপরে উঠার সংকেত দেন। ১৯৩৪ সালে বারমুডার উপকূল থেকে, তিনি নিউ-ইয়র্কের খ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ্ ডাঃ বিবের সাথে সমুদ্রের তলায় যতফুট অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এবার তিনি আরও ৫০০ ফুট অধিক নীচে নামতে সক্ষম হলেন। মিঃ বারটন স্থানীয় সময় সকাল ১১-৫৩ মিনিটে নীচে নামেন ও প্রায় দু'ঘণ্টা ন' মিনিট তলদেশে ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা তিনি ৬০০০ হাজার ফুট তলায় নামবেন —এটাই হলো তাঁর ৬০০০ ফুট তলায় নামবার তৃতীয় প্রচেষ্টা।" বলাবাহুল্য বারটন কর্তৃক স্থাপিত এই রেকর্ড অল্পদিনের জন্য স্থায়ী হলো। কারণ কিছুদিন পরই দু'জন ফরাসী নৌ-অফিসার সমুদ্রের আরও অধিক তলদেশে পৌঁছতে সক্ষম হলেন। কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টাও যে অধিকদিন স্থায়ী হবে না, সে খবর আমরা ১৯৫৩ সালে ৬ই জুন নেপলস থেকে পেলাম—"প্রফেসার পিকার্ড, যিনি বেলুনের সাহায্যে পৃথিবীর সবচেয়ে উপরে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন, তিনি একটি 'লৌহবলের' (Steel ball) সাহায্যে সমুদ্রের সবচেয়ে গভীরতম প্রদেশে অবতীর্ণ হবার জন্য ব্রতী হয়েছেন। তিনি তার পুত্রের "বাথিস্ফিয়ার" (bathy spher)-এর সহযোগে সমুদ্রের নীচে নামবার চেষ্টা করবেন। শুক্রবার—৬৯ বছর বয়স্ক প্রফেসার তার ৩১ বছর বয়স্ক পুত্র জ্যাকুইসের সাথে ভূমধ্য সাগরের তলদেশে ৩০০০ হাজার মিটার অর্থাৎ ৯,৮০০ ফুট নীচে নামবার আশা প্রকাশ করেন। প্রফেসার পিকার্ড এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, তার পুত্রকেই এই প্রচেষ্টার নেতা করে তিনি খুশী কারণ তার পুত্রই "বাথিস্ফিয়ারের" সকল আয়োজন ঠিক করেছে। এই বাথিস্ফিয়ারটি দশ টন ওজনের একটি ইস্পাত নির্মিত বলের মত ও বর্তমানে এটি নেপলসের একটি ডকে পরীক্ষাধীন আছে।" প্রফেসার পিকার্ডের এই প্রচেষ্টা শীঘ্রই সাফল্য-মণ্ডিত হলো—সে খবর আমরা ১৯৫৩ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর, নেপলস থেকে পেলাম—"সুইস নৌ অনুসন্ধানকারী আগস্ট পিকার্ড আজ তার বাথিস্কেপ (bathyscaphe)-এর সাহায্যে ইটালীর পশ্চিম উপকূলে ভূমধ্যসাগরের ৩,১৫০ মিটার তলদেশে নেমে রেকর্ড স্থাপন করলেন। এটা হলো ১০,৩৩৫ ফুট দীর্ঘ। গত মাসে মার্সেলাসে দু'জন ফরাসী নৌ-অফিসার সমুদ্রের তলদেশে ২,১০০ মিটার অর্থাৎ ৬৯০০ ফুট নেমে যে রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন, প্রফেসার পিকার্ড আজ তা ভাংগলেন এবং তিনি তলদেশে প্রায় দু'ঘণ্টা ১৫ মিনিট অবস্থান করেন। ৬৯ বছর বয়স্ক প্রফেসার ভূমধ্যসাগর এলাকার সবচেয়ে গভীরতম স্থান ৩,৬০০ মিটার অর্থাৎ ১১৮১১ ফুট নিম্ন 'টাইরেহেনিয়ান পিট" বেছে নিয়েছিলেন। তিনি পোন্জা দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল থেকে গ্রিনীচ সময় ০৭১৮ মিনিটে নীচে নামতে আরম্ভ করেন এবং ০৯৩৩ মিনিটে উপরে উঠে আসেন। ইটালীর একটি জাহাজ তাকে এই

বাথিস্ফিয়ারের মধ্য থেকে ডাঃ বিব্ বেরিয়ে আসছেন

বিষয়ে সহযোগিতা করে। গতকালই প্রফেসার তার ৩১ বছর বয়স্ক পুত্র জ্যাকুইসের সাথে পরীক্ষামূলকভাবে নীচে নেমেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ ঝড় আসাতে তাদের সেদিনকার মত ক্ষান্ত হতে হয়।"

পিকার্ড যে রেকর্ড স্থাপন করলেন তা মাত্র এক বছরও স্থায়ী হলো না। ১৯৫৪ সালে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ডাকার থেকে আর একটি সংবাদ প্রচারিত হলো—"একটি ফরাসী নৌ-বার্থিসস্কেপ আটলান্টিক সাগরে ১৩২৮৭ ফুট তলায় নেমেছে এটাই এখন পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম প্রদেশে মানুষের গমন। দু'জন ফরাসী নৌ-অফিসার জর্জ ও পিয়ারী উইলিয়াম (Piecre William) এই চেষ্টায় সাফল্যমণ্ডিত হয়েছেন। গত বছর ভূমধ্য-সাগরে ১০,৩৩৫ ফুট নীচে নেমে প্রফেসার পিকার্ড রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন।"

ফরাসী নৌ-বহর কর্তৃক স্থাপিত এই রেকর্ড অধিকদিন স্থায়ী হবে না—তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। কারণ যতদিন যাবে, মানুষ আরও উন্নতযানের সাহায্যে সমুদ্রের সব-চেয়ে গভীরতম স্থানে গিয়ে উপনীত হবে—যেমন মানুষ গিয়ে পৌঁছিয়েছে, পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ এভারেস্টে। প্রফেসার পিকার্ড, বারটন, জর্জ বা পিয়ারী উইলিয়াম—কারোরই সমুদ্র তলদেশের চমকপ্রদ ভ্রমণ বিবরণী—এখনও আমাদের কাছে ভালভাবে পৌঁছায় নি। তবে ডাঃ চার্লস বিব্, যাকে এই প্রচেষ্টার প্রথম নায়ক বলা যেতে পারে, তিনি তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার বহু বিবরণী বই-এর পাতায় রেখে গেছেন। তাঁর লিখিত "আধ মাইল নীচে" (Half a mile down) বইই তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। বিবের সমুদ্র অবতরণ সংক্রান্ত বিবরণ পাঠ করলে এই প্রচেষ্টার পশ্চাতে মানুষের কতখানি দুর্জয় সাহস, অজানাকে জানবার আকুল ইচ্ছা ও কষ্ট বরণের ইতিহাস রয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

উইলিয়াম বিবের সেই রোমাঞ্চকর বিবরণে দেখিঃ

১৯৩০ সালের ৬ই জুন, বার-মুডার ননসাচ দ্বীপের তীর থেকে আট মাইল দূরে একটি বাষ্পীয়তরী (tug) ও একটি বজরা (barge) নোঙ্গর ফেললো। সে দুটোর মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল না, যা সাধারণ দর্শকের বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারে। সেই তরীর একজন ব্যক্তিও কল্পনা করতে পারে নি যে, তাদের তরীর ডেক থেকে পৃথিবীকে বিস্ময়ে একেবারে হতবাক করে দেবে এরকম এক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আরম্ভ হবে। শীঘ্রই এরকম এক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এখান থেকে শুরু হলো।

একটি উজ্জ্বল নীল রং-এর ইস্পাত তৈয়ারী বলের মধ্যে দু'জন মানুষকে

সামুদ্রিক মৎস্য ও জলজ গুল্ম

সমুদ্রের তলদেশে ধীরে ধীরে নামিয়ে দেওয়া হতে থাকে। এর গতি ছিল প্রতি মিনিটে পঞ্চাশ ফুট আর গতিস্থান ছিল সমুদ্রের নীচে ৮০০ ফুট অর্থাৎ এর আগে মানুষ সমুদ্রের তলদেশে যত নীচে যেতে পেরেছে তারও ৩০০ ফুট অধিক। কিন্তু এই দুঃসাহসী পরীক্ষার কি প্রয়োজন? দু'জন বৈজ্ঞানিক, এ পর্যন্ত অজানা সমুদ্রের তলদেশে যে বিচিত্র চমকপ্রদ সামুদ্রিক জীবন অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে তা আবিষ্কারের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেন।

এই দু'জন নির্ভীক অনুসন্ধান-কারীর মধ্যে একজন আমেরিকার বিখ্যাত প্রাকৃতত্ত্বজ্ঞ ও পক্ষী বিশারদ ডাঃ চার্লস উইলিয়াম বিব্। বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতে করতে গ্রীষ্মমণ্ডলীর সমুদ্রের তল-দেশের সামুদ্রিকজীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ইনি ব্যগ্র হয়ে পড়েন। মাঝে মাঝে দেখা যেতো, বিব্ মাথায় একটা তামার শিরস্ত্রাণ যাতে একটি বায়ু চলাচলের নলসংযোজিত থাকতো, আর স্নান করবার সামান্য সাধারণ একটি পোশাক—এবং রবারের একজোড়া জুতো পায়ে দিয়ে তার ছোট্ট নৌকা থেকে জলের নীচে প্রায় ৬০ ফুট নেমে যেতেন। জলের নীচে বিচিত্র সুন্দর সামুদ্রিক জীবগুলোকে পরীক্ষা করতে করতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রবাল উপকূল অতিক্রম করে তিনি নামতেন। কখন কখন সেই বিচিত্র প্রাণীগুলির ছবি তুলে নিতেন। তাদের সম্বন্ধে বহু চমকপ্রদ বইও তিনি লিখেছেন। কালক্রমে জলের নীচে এই সামুদ্রিকজীবন তার কাছে এত পরিচিত হয়েছিল, যেমন তার কাছে পরিচিত ছিল পৃথিবীর সূর্য আলোকিত উপরিভাগের ষাট ফুট বিস্তৃত এলাকা।

তার বন্ধুরা হয়তো বার বার তাকে জিজ্ঞাসা করেছে—"তোমার কি একটুও ভয় করে না? ওখানকার হাঙ্গরগুলো কেমন? ওখানে কিরকম বিপদ আছে?" ডাঃ বিব্ উত্তর দিয়েছেন যখন তিনি এই অদ্ভুত অজানা পারিপার্শ্বের মধ্যে গিয়ে পড়েন, তখন তিনি এত মুগ্ধ আর হতবাক হয়ে পড়েন যে বিপদের কথা ভাববার অবসর তিনি পান না।

বিপদ অবশ্যই আছে—তিনি স্বীকার করেছেন। তিনি একবার কেমন করে এক হাঙ্গর মাছের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার বর্ণনাও অন্যত্র করেছেন—কিন্তু এমন ভাবে যে ঘটনাটা যেন উল্লেখ না করবার মত সামান্য একটা অভিজ্ঞতা।

একবার তিনি জাহাজের উপর থেকে মাছগুলোকে প্রলোভিত করবার জন্য পচা গলিত মাংস টুকরো টুকরো করে ছুঁড়ে দিলেন—সমুদ্রের তলায় "কোনি" নামে একরকম মাছ আছে সেগুলোকে ধরবার তার ইচ্ছা ছিল। তারপর সেই তামার শিরস্ত্রাণ পরে তিনি মই বেয়ে নৌকা থেকে জলে নেমে পড়লেন ও পাহাড়ের এক ফাটলের ভিতর দিয়ে পথ করে নিলেন। কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার পর তিনি লক্ষ্য করলেন একটা—

"কোনি" মাছ সেই ফাটলের মধ্যে ঢুকলো। তিনি পূর্বেই একটা ছোট্ট ডিনামাইট একটা কাঠিতে বেঁধে এনেছিলেন—এবার তিনি ওটা মাছটার দিকে নিক্ষেপ করলেন, কারণ তিনি জানতেন যে, এই হঠাৎ বিস্ফোরণ মাছটাকে হতচকিত করে ফেলবে ও ফলে ওটাকে ধরাও সহজ হবে। কিন্তু 'কোনি' মাছটা মুহূর্তের মধ্যে দৃষ্টি বহির্ভূত হলো এবং পরমুহূর্তে বিব্ দেখলেন আর এক রকম নাক ছুঁচোলো মাছ (সেগুলিকে পাফার (puffer) বলা হয়)।

"আমি সেটাকে জালে ধরে ফেললাম"—সেই বৈজ্ঞানিক লিখে চলেছেন—'এবং কাঠিটাকে ফেলে দিলাম, তারপর সেই চ্যুত প্রস্তর খণ্ড অতিক্রম করে আমি ফাটল দিয়ে 'কোনি' মাছটাকে খোঁজবার চেষ্টা করলাম। আমি নানা দিক খুঁজতে লাগলাম ও সামনে আরও ঝুঁকে পড়লাম, হঠাৎ একটা মস্ত বড় ধূসর গোলাকৃতি প্রাণী আমার সামনে এগিয়ে এল। আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম, আর দেখলাম, ওটা একটা পাঁচ ফুট লম্বা হাঙ্গর মাছের শুঁড়। ওটা কাছাকাছি কোথাও কিন্তু ছিল না—মাংসের গন্ধে প্রলোভিত হয়ে এদিকে এসেছিল আর আমারই মত— হতচকিত মাছটাকে খুঁজতে লাগলো।"

"কিছুক্ষণ বাদেই"—সে নির্ভীক অনুসন্ধানকারী লিখে চলেছেন—"ওটা আরও সামনে এগিয়ে এলো, ঠিক আমার হাতের কাছে এবং আমি দেখলাম, 'পাফার' মাছটা ইত্যবসরে জাল থেকে পালিয়ে গেছে এবং হাঙ্গর মাছের হেলানো চোখ দেখে মনে হলো, সে-ও সেটা উপলব্ধি করেছে। এবার আমার দেহটাকেই সে তার শিকার ঠিক করে নিলো।"

"আর সহ্য করা অসম্ভব ভেবে জাল থেকে হাত সরিয়ে নিলাম এবং সবলে হাতল দিয়ে ওর গোলাকৃতি শুঁড়ে আঘাত করলাম। কয়েক ফুট দূরেই একটা ভয়ংকর জলোচ্ছ্বাস দেখলাম, মাছটার পক্ষপুঞ্জ একেবারে খণ্ডিত হয়ে গেছে। হাঙ্গরটা পিছু হটে গেলো তারপর উপরের দিকে উঠলো ও আমার মাথার উপরকার জল কাঁপিয়ে সেই প্রবাল উপকূল ও উপরের নৌকা কম্পিত করে চলে গেলো। আমি 'পাফার' মাছটা আবার ধরে ফেললাম। —কিন্তু কোনি মাছটা, যদি মরে গিয়েও থাকে, আমার একেবারে দৃষ্টিবহির্ভূত হয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ওটার আশা ত্যাগ করলাম।"

ডাঃ বিব্ যখন উপরে উঠে এলেন, দেখলেন তাঁর সঙ্গীরা ভয়ংকর উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। তারা সেই স্বচ্ছ জলের ভেতর দিয়েই সব দেখেছে এবং মনে করেছে এটা যেন বিবের জীবনমরণ

সমুদ্র-তলদেশের দৃশ্য

যুদ্ধ। ডাক্তার কিন্তু খুব হাল্কা করেই তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বললেন, কিন্তু তবু স্বীকার করতে হবে—এটা তাঁর কাছে মৃত্যুর সামিল হতে পারতো।

কয়েক বছর এইভাবে জলের নীচে ঘুরে দেখবার পর ডাঃ বিবের ভীষণ ইচ্ছা হলো—তিনি আরও গভীরতম প্রদেশে গিয়ে ওখানকার জলচরদের জীবনপ্রণালী ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবেন। তিনি জানতেন যে, একজন অভিজ্ঞ ডুবুরী, সম্পূর্ণ ডুবুরীর পোশাক পরেও, মাত্র—তিনশো ফুটের কিছু বেশি জলের তলায় নামতে পারে। আর বর্মসমন্বিত পোশাক পরে একজন ডুবুরী মাত্র ৫২৫ ফুট পর্যন্ত নামতে পেরেছে। তিনি এও জানতেন যে, এগুলো পরে সমুদ্রের নীচে গেলে ভালভাবে সকল প্রাণীকে পরীক্ষা করে দেখার বিঘ্ন ঘটে। সমুদ্রের ফুট নীচে যে কোন স্থানে জলের চা ভয়ংকর যে, মানুষ সেখানে মাত্র সময়ের জন্য থাকতে পারে এবং ধীরে তাকে উপরে উঠিয়ে না আনলে তা জলবুদবুদে (air bubbles) পরি হয়ে যাবে ও সে দ্রুত মৃত্যুমুখে প হবে।

কাজেই ডাঃ বিব ইস্পাতনি একটা কক্ষ তৈয়ারী করবার পরিক চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন—যার ভি এক বা ততোধিক ব্যক্তি বসতে পারে যেটাকে অনায়াসে সমুদ্রের আধ মাইল ন নামিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। এটাকে প্র স্কোয়ার ইঞ্চিতে প্রায় আধ টন জলের চ সহ্য করতে হবে।

তিনি তখন মিঃ বারটনের সাথে ব্যাপার নিয়ে আলাপ-আলোচনা শু করলেন। এই আলাপ-আলোচনার ফলে ৬ই জুন, ১৯৩০ সালে তারা দু নন্‌সাচ দ্বীপ থেকে খোলা একটি ক করে সমুদ্রে পাড়ি দিলেন। এটা টেনে নিয়ে চললো "গ্ল্যাডিসফেল" না একটি বাষ্পীয় তরী। তারা স এক ধাতু নির্মিত অদ্ভুত কক্ষ নি চললেন—আকারটি অনেকটা গোলাক এটা হলো ফাঁপা বলের মত। পরে এ "বাথিস্ফিয়ার" নামে পরিচিত হলো এরই সাহায্যে এরা এতদিন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত সমুদ্রের তলদেশে নামা ব্রতী হলেন। এই 'বাথিস্ফিয়ারটি' ইঞ্চি চওড়া ইস্পাতের তৈয়ারী এবং এ ব্যাস হলো চার ফুট নয় ইঞ্চি। এর ভিতর বৈজ্ঞানিকরা চৌদ্দ ইঞ্চি চওড়া একটা গর্তের ভিতর দিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করলেন। প্রবেশপথের ঠিক উল্টো দিকে জানালার জন্য তিনটে গর্ত ছিল—এর মধ্যে দুটো জানালা তিন ইঞ্চি চওড়া কোয়ার্টস পদার্থে ঢাকা—তখন কোয়ার্টসই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী স্বচ্ছ-বস্তু। তৃতীয়টিতে একটি ইস্পাতের প্লাগ লাগানো ছিল। প্রথম দু'টি জানালার মধ্যে একটি জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখা হতো ও আর একটি দিয়ে বাইরে সার্চলাইট ফেলা হতো।

এই "বাথিস্ফিয়ারে" মধ্যে বায়ু যোগানের জন্য দু'টি অক্সিজেন ট্যাংক ও

...ায়নিক পদার্থ ছিল; এগুলো ...চুত কার্‌বন-ডিওক্সাইড টেনে নিতো। ...ভেতর একটি টেলিফোনও ছিল যাতে ...জ্ঞানিক কি দেখছেন তা বর্ণনা করতে ...রেন। প্রয়োজনবোধে এটাকে উঠানোর ও ...মানোর নির্দেশ দেওয়ার কাজে এবং ...আরও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক কাজে লাগান ...তো।

এই বদ্ধ স্বল্পপরিসর স্থানে ডাঃ বিব্ ও মিঃ বার্‌টন হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করলেন। সেই গোলাকৃতি ...রজাটি, যার ওজন প্রায় চারশো পাউন্ড ছিল, সেঁটে দেওয়া হলো। ঠিক দুপুর একটার সময় বাষ্পীয় হুইলটি নড়তে আরম্ভ করলো এবং 'বাথিস্ফিয়ার'টিকে ডেক থেকে উঠিয়ে 'ইয়াড্রামে' রাখা হলো। একটু বাদেই এটা দুলে উঠলো ও তারপর ধীরে ধীরে এটাকে জলের মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হলো। এই সময় একটা প্রবল জলোচ্ছ্বাস উঠলো—একটা চলন্ত নৌকাকে এই জলোচ্ছ্বাস মুহূর্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারতো।

এরপর তলদেশের যাত্রা শুরু হলো! প্রথমে এই "বাথিস্ফিয়ারে"র ভিতরটা একটা নম্র সবুজ আলোকে পরিপূর্ণ হলো এবং যখন ডাঃ বিবের সহকারী মিস্ হলিস্টার উপর থেকে ফোনে বৈজ্ঞানিকদের জানালেন যে, প্রায় একশো ফুট কাছি ছাড়া হয়েছে তখন বৈজ্ঞানিকরা একটু শুধু তফাৎ লক্ষ্য করলেন যে, একটা "মৃদু স্নিগ্ধ সবুজ গোধূলি আলো" বাথিস্ফিয়ার পূর্ণ করেছে। ধীরে ধীরে এটা আরও নীচে নামতে লাগলো—যখন প্রায় এটা ৩০০ ফুট তলায় পৌঁছিয়েছে মিঃ বার্‌টন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন কারণ সেই ভারি দরজার ঠিক নীচেই একটা ফুটো দেখা দিয়েছে। আর শীঘ্রই সেই ফুটো দিয়ে জলের ফোঁটা 'বাথিস্ফিয়ারে'র মেঝেতে এসে পড়তে লাগলো।

ডাঃ বিব্‌ও তাঁর কাজ দ্রুত শুরু করলেন। তিনি জানতেন যে, যত তলায় এটা নামতে থাকবে ভেতরকার চাপ তত বাড়তে থাকবে; তাই তিনি আদেশ দিলেন বাথিস্ফিয়ার নীচে নামবার কাজ আরও দ্রুত হোক। প্রায় ছ'বার দরজার উপর ফ্ল্যাসলাইট ফেলে ফুটো পরীক্ষা করা হলো—তবে সৌভাগ্যক্রমে সেই ছিদ্রটি কেবল একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রই রয়ে গেলো।

অবশেষে তাদের জানানো হলো তারা ৬০০ ফুট তলায় নেমেছেন। বৈজ্ঞানিকদের শেষপর্যন্ত জয়লাভ হলো। তারা সেখানে গিয়ে পৌঁছালেন, যেখানে আজ পর্যন্ত কোন জীবিত মানুষ যেতে পারেনি।

ভেতরকার আলো ক্রমশ সবুজ থেকে নীল হলো—একটা মৃদু স্বচ্ছ নীল আলো যা বৈজ্ঞানিকরা উপরকার জগতে কোনদিন দেখেনি। উদ্ভুত, উজ্জ্বল-আলোকিত বহু জলচর তাদের জানালার কাছে দৃষ্ট হলো ও পরে মিলিয়ে গেলো। ডাঃ বিব্ বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে গেলেন।

'বাথিস্ফিয়ার' আরও যত নীচে নামতে লাগলো, সেই নীল আলো তার উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেললো। ধীরে ধীরে একটা রহস্যময় গাঢ় নীল রং-এ পর্যবসিত হলো ও পরে একেবারে কালো নীলে পরিণত হলো।

ডাঃ বিব্ লিখলেন, "এই সময় আমরা খুব কম কথা বলছিলাম। বার্‌টন বারবার জলসিক্ত মেঝে পরীক্ষা করতে লাগলো, সেখানকার তাপমাত্রা নিলো, অক্সিজেন ট্যাঙ্ক পরীক্ষা করে ঠিক করতে লাগলো এবং বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলো—"আমরা কত নীচে এখন আছি?" "হ্যাঁ, আমরা ভাল আছি।" "না, ফুটোটা আর বাড়ে নি।"

আটশো ফুট তলায় ডাঃ বিব্ 'বাথিস্ফিয়ার' থামাবার আদেশ দিলেন। ডাঃ বিবের একটা অদ্ভুত ভাব হলো—তার মনে হলো আর অধিক নীচে না নামাই বুদ্ধিমানের কাজ। এরপর এরা উপরে উঠতে আরম্ভ করলেন এবং একঘণ্টা পরে 'বাথিস্ফিয়ার' জলের উপর উঠে এলো। বৈজ্ঞানিক দু'জন সূর্যালোকিত উপরের

জগতে আবার ফিরে এলেন। তাঁরা দু'জনেই বেশ সুস্থ ও সবল ছিলেন—তবে কিছুটা হতবিস্মিতভাব ছিল। এমনি-ভাবে নির্বিঘ্নে এরা এমন এক রাজ্য জয় করলেন, যা বহু শতাব্দী ধরে দুর্ভেদ্য ও অজেয় ছিল।

পরবর্তী চার বছর ডাঃ বিব্ এবং মিঃ বারটন বাথিস্ফিয়ার সহযোগে বহু-বার সমুদ্রের তলদেশে গিয়েছিলেন। পরে এর নক্সারও বহু উন্নতি হয় এবং ধীরে ধীরে আরও অধিক নীচে নামতে আরম্ভ করে। এরকম এক অবতরণের সময় ডাঃ বিব্ টেলিফোনযোগে তলদেশে যে বিস্ময়ের বর্ণনা করেছিলেন তা বিস্মিত পৃথিবীকে শুনানো হলো ও এই বিবরণী বেতারে পুনঃ প্রচার করে শ্রোতাদের কাছে পরিবেশিত হলো।

১৯৩৪ সালের ১১ই আগস্ট তিনি বহু নীচে অর্থাৎ ২৫১০ ফুট তলায় নামলেন। চারদিন পরে আরও নীচে অবতীর্ণ হলেন। তাঁর বন্ধু বারটনকে সঙ্গী করে তিনি বাথিস্ফিয়ারের সাহায্যে ৩০২৮ ফুট অর্থাৎ আধ মাইলেরও বেশী নীচে নামতে সক্ষম হলেন।

তিনি বর্ণনা করলেন, "এবার যেন সম্পূর্ণ অন্ধকারে নামতে হলো।" ২৫০০ ফুট তলায়, পঁচিশ ফুট লম্বা মস্ত বড় এক মাছ তাঁদের আলোর সামনে এসে পড়লো। যখন এই আলো নিবিয়ে দেওয়া হলো—একটা ভয়ংকর অন্ধকার চারদিকে বিরাজ করতে লাগলো—মাঝে মাঝে কতকগুলি অজানা জলচরের দেহ থেকে আলো বেরোতে লাগলো তার কারণ এই গভীর তলায় সূর্যের এককণা আলোও প্রবেশ করে নেপচুনের রাজ্যের বিস্ময়কে আলোকিত করতে পারে না। কতকগুলি জলচরের এরকম ভগবান প্রদত্ত নিজস্ব আলো থাকে—এবং পথচলার জন্য নিজের আলোর উপরই এদের নির্ভর করতে হয়।

যদিও এই দুঃসাহসী বৈজ্ঞানিকরা সর্বদাই নিজেদের বিপদের গুরুত্ব হ্রাস করেছেন—কিন্তু সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তিও যখন ভাবে যে, সমুদ্রের আধমাইল নীচে 'বাথি-স্ফিয়ারকে' প্রতি স্কোয়ার ইঞ্চিতে আধ টন জলের চাপ এবং প্রত্যেকটি জানালাকে উনিশ টন জলের চাপ বহন করতে হয়েছিল তখনই তারা বিপদের গুরুত্ব সহজে উপলব্ধি করতে পারে। যদি কোনক্রমে ইস্পাতের গায়ে বা জনালায় কোন ফাট দেখা দিত, তাহলে মুহূর্তের বৈজ্ঞানিকরা চাপে একেবারে দে যেতেন। সেদিন 'প্রকৃতির গুপ্ত বিস্ম আবিষ্কারকদের মৃত্যুতে পৃথি অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যেতো।"
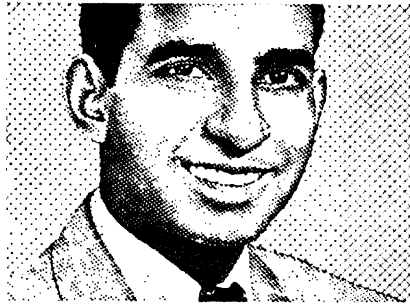
রম্য রচনা

লৌহকপাট—জরাসন্ধ। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—৩৸৹ টাকা।

জেলের অভিজ্ঞতা নিয়ে বাঙলা ভাষায় কম বই রচিত হয়নি। কিন্তু তার অধিকাংশই হ'ল রাজবন্দীদের লেখা। সে সব লেখায় জেলের চেয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন এবং আন্দোলনকারীদের বিচিত্র জীবনযাত্রাই বেশি বর্ণিত হয়েছে। লৌহকপাটও জেলেরই কাহিনী কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে। জেলের একজন অফিসার জেলের বিচিত্র জীবনযাত্রা, জেলের বাড়িঘর, কয়েদী, কর্মচারীদের যেমন যেমন দেখেছেন বর্ণনা করেছেন। শুধু জেলের জীবনযাত্রাটুকুই যে লেখক বর্ণনা করেছেন, তা নয়; তার সংগে বাইরের বৃহত্তর জীবনের যে যোগ রয়েছে, সে কথা কখনও ভোলেন নি। চোর বা ডাকাতদের কয়েদী-জীবন ছাড়াও বাইরে আর একটা জীবন আছে, নিজের সমাজ, সংসার আছে, লেখক এই দুই জগৎকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। লেখক তাঁর জেলের কাজে বহু সাধারণ অপরাধী এবং রাজবন্দীর সংস্পর্শে এসেছেন। তাঁর দৃষ্টি কোথাও কোন বিশেষ সেণ্টিমেণ্ট দ্বারা রঞ্জিত হয়নি। রাজবন্দীদের দেখা মাত্রই তাঁদের হিরো বানিয়ে চিত্রিত করার চেষ্টা করেন নি, বরঞ্চ তাঁদের আন্দোলনের এবং জেলে তাঁদের বিভিন্ন আচার ব্যবহারের দোষত্রুটির তিনি আলোচনা করেছেন। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি কখনও শ্রদ্ধা হারান নি। নিজে অনেক সময় জেলের অফিসার হিসেবে তাঁর অনেক কর্তব্যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, অনেক কাজের জন্য দুঃখ পেয়েছেন। তাতে আন্তরিকতার অভাব নেই। লেখকের মনের এই দ্বন্দ্ব বইটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে। তিনি নিজেই নিঃসংকোচে তাঁর মনের পরিবর্তন বর্ণনা করেছেন। মানুষ হিসেবে অনেক কর্তব্যকাজ বাধ্য হয়ে তাঁকে না করেই এড়িয়ে যেতে হয়েছে। রাজবন্দী ভূপেশের প্রতি বৃটিশ সিভিলিয়নের অন্যায় ব্যবহার ও তার অন্যায় বিচার তাও সয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু মনের গোপন বেদনা বেরিয়ে পড়েছে সহকর্মী হৃদয়দার উত্তেজিত উক্তি এবং তাঁর বৃটিশ শাসনের প্রকৃত ইতিহাস রচনার স্বপ্নবর্ণনায়।

সাধারণ চোর ডাকাতদের কথাও আছে। ডাকাত মুন্সীর নীচতা, ক্রূরতার সংগে তার ভণ্ডও ধরা পড়েছে বর্ণনায়। রাজবন্দীদের প্রতি যেমন লেখকের অতিরিক্ত অন্ধ ভক্তি নেই; সাধারণ কয়েদীদের প্রতিও তেমনি অতিরঞ্জিত সহানুভূতি নেই। কিন্তু লেখকের মন সর্বদাই উন্মুক্ত। তাই আপনা থেকেই

এই কয়েদীদের দুঃখ ও সহানুভূতির স্পর্শ লেখায় এসেছে।

এ ছাড়া ডাঃ থাপা ও তাঁর স্ত্রীর কাহিনী, গগন ডিপ্‌টির রাউণ্ড, জেলের পাহারাদারদের ফাঁকি দেওয়ার বিচিত্র উপায়, জমাদার সাহেবের বালতি ভর্তি দুধ খাওয়ার অসংখ্য বিচিত্র মজার কাহিনী বইটির উপভোগের পরিসর বাড়িয়েছে।

জেলের বাইরের জীবনের কয়েকটি নর-নারীর সুন্দর চরিত্রচিত্রণ লেখকের ক্ষমতার পরিচয় দেয়। তার মধ্যে মিঃ হ্যারল্ড রয়ের ইউরোপীয় স্ত্রী মিসেস্ রয়ের চরিত্র সবচেয়ে আকর্ষণীয়। দূরে দেশে আত্মীয়স্বজন, আপন সমাজ ছেড়ে আসা এই মহলাটির অসীম নির্জনতার একটি ছবি লেখক এঁকেছেন। ছবিটি বই শেষ হবার পরেও মনে লেগে থাকে। চরিত্রচিত্রণে লেখক অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন—তাঁর সহকর্মী হৃদয়বাবু, যতীশদা, নিতাই বক্সী এবং গগন ডিপ্‌টি; ডাঃ থাপা ও তাঁর স্ত্রী এবং কাঞ্চি; কয়েদী রহিম, ডাকাত মুন্সী, পাহাড়ী ধনরাজ এবং মিঃ হ্যারল্ড রয় আর সব জমাদার পাহারাদাররা বর্ণনার গুণে সজীব মানুষের মত চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়।

সবচেয়ে ভাল লেগেছে ভাষার ভঙ্গী। এমন অনায়াস সৌন্দর্যে অনেক প্রতিষ্ঠিত লেখক হার মানবেন। আজকাল গদ্যে দুটি রীতি খুব চালু হয়েছে—একটি বাজারী শব্দে ভরা চেষ্টাকৃত স্বাভাবিকতার রীতি, আরেকটি ইংরেজি বাচনভঙ্গীর অনুবাদে ভরা, অতিরিক্ত সজ্জা ও সৌখিনতার রীতি। জরাসন্ধের ভাষার ভঙ্গীতে এর একটিও নেই। ভাষা অতি সুন্দর, শালীন কিন্তু প্রাণহীন নয়; স্বাভাবিক, সজীব কিন্তু অসংযত নয়। লেখক সহজভাবেই কথা বলেন, চ্যাঁচামেচি হৈ হল্লা করেন না, আবার অতি মার্জিত ক্ষীণকণ্ঠও তাঁর নয়।

জরাসন্ধ তাঁর প্রথম বইয়ে উৎকৃষ্ট কাহিনী বর্ণন, চরিত্রচিত্রণ এবং ভাষাপ্রয়োগের পরিচয় দিয়ে মুগ্ধ করেছেন। ১৩০।৫৪

সম্ভবা—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থ-জগৎ, ৭জে, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা—২৯। দু' টাকা চার আনা।

রম্যরচনার সার্থক-লেখক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার সংগেও পাঠক-সাধারণের পরিচয় দীর্ঘ দিনের। তাঁর কবিতার মূল সুরটি রোমাণ্টিক। দ্রুত ছন্দের সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে বিদ্রূপের হঠাৎ-ঝিলিক অনেক কবিতায় নতুন স্বাদ এনেছে। এই শ্রেণীর উপভোগ্য কবিতার সংখ্যাও নগণ্য নয়। একটি প্রধান সুর ছাড়াও অনেক কবিতায় অন্যবিধ সুরও ঝংকৃত হয়েছে, কিন্তু সম্ভবার সমগ্রতার ওপর, উপেক্ষণীয় না হলেও, সঠিক কোন ছাপ রাখতে পারে নি। সম্ভবার সব কটি কবিতা পড়া শেষ করে বই বন্ধ করলেও যে সুর মনে গুন্‌গুন্ করে, সে হলো—

'তোমার দেহ উঠতি ধানের মঞ্জরী।
আঁটো গড়ন, নধর চিকণ, কচি কাঁপন শিষের
কেমন করে ধরি?'

অথচ সংকলনের কবিতার সংখ্যানুপাতিক প্রকৃতি দৃষ্টে মনে হয় কবির ইচ্ছা ছিল অন্যবিধ। ১৫৮।৫৪

বৈপ্লবিক বক্তৃতাবলী

SWADESHI AND SWARAJ: (The rise of New Patriotism—Bipin Chandra Pal)

শ্রীনারায়ণ পাল এম-এ কর্তৃক যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড, ৪১।এ, বলদেওপাড়া

রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৬৲ টাকা।

মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের লিখিত প্রবন্ধ এবং বক্তৃতার সংগ্রহ। প্রবন্ধগুলি ১৯০২—১৯০৭ সালের মধ্যে অধিকাংশ তাঁহার সম্পাদিত "নিউ ইণ্ডিয়া" নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হয়; বক্তৃতা পাঁচটি ১৯০৭ সালে মাদ্রাজে প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রবন্ধগুলি এবং বক্তৃতা কয়েকটি ১৯০৭ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিতও হইয়াছিল। আলোচ্য পুস্তকখানিতে সেগুলি একত্র সঙ্কলিত করিয়া পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল পুণ্যশ্লোক পুরুষ। তাঁহাকে ভারতের নব জাতীয়তাবাদের উদ্বোধক বলা যাইতে পারে। বিপিনচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ এই তিনজনের সাধনায় ভারতের রাষ্ট্রীয় সাধনার অগ্নিবীর্য সঞ্চারিত হয়, দেশের মুক্তিব্রতে যজ্ঞের আগুন জ্বলিয়া উঠে। ইহার পূর্বে কংগ্রেসকে ভিত্তি করিয়া বৃটিশ প্রভুদের কাছে আবেদন-নিবেদনের পথে এদেশে যে রাজনীতির আন্দোলন চলিতেছিল, তাহা কেবল ধোঁয়াই ছড়াইয়াছে, আগুন জ্বলে নাই। বাঙলার নবজাতীয়তাবাদ এই গ্লানি হইতে জাতির আত্মাকে মুক্ত করে। বিদেশীয় আনুগত্যের দিক হইতে জাতির অন্তর-সত্তার অভিমুখে জাতীয় আন্দোলনের মোড় ঘুরাইয়া দেয়। বিপিনচন্দ্রের লিখিত প্রবন্ধ এবং বক্তৃতাগুলিতে ভারতের এই নবজাতীয়তাবাদের দার্শনিকতা পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই দর্শন আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত, দৃষ্টি এখানে বৈদান্তিক। জড়শক্তির মোহনির্মুক্ত মানুষের আত্মশক্তিরই এখানে স্বীকৃতি। জনগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট যিনি নারায়ণ, এই সাধনায় তাঁহারই উদ্বোধন, দাস মনোভাবের আড়ষ্টতা হইতে মুক্তির আনন্দে মানবাত্মার ইহাতে অনপেক্ষ উজ্জীবন।

প্রকৃতপক্ষে সেই দার্শনিকতার সাধনাঙ্গ ধরিয়াই ভারত পরবর্তী যুগে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ বা নিষ্ক্রীয় প্রতিরোধের বীজ এই বাঙলার মাটিতেই প্রথমে উপ্ত হইয়াছিল, পরে তাহা বিভিন্ন ধারা ধরিয়া বৈচিত্র্যের পথে সমগ্র ভারতে বিস্তার লাভ করে। বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধ এবং তাঁহার মাদ্রাজ শহরে প্রদত্ত বৈপ্লবিক বক্তৃতাগুলিতে সে সত্য জীবন্তভাবে উপলব্ধি হইবে। স্বাধীন ভারতেরও বিপিনচন্দ্রের এই অবদানের গুরুত্ব কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই; কারণ বিপিনচন্দ্রের রাষ্ট্র-সাধনার আদর্শে সমাজ-জীবনের মূলীভূত সনাতন সত্য রহিয়াছে। নরনারায়ণ স্বরূপে দেশের নরনারীর সেবার পথেই যে জাতির শক্তির প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে, তিনি এই সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষ এই সম্বন্ধে নিষ্ঠাবুদ্ধি যদি আমরা হারাই এবং পরকীয় আদর্শের অন্ধ আবর্তে পড়ি, তবে স্বাধীনতা লাভ করিয়াও আমাদের বিড়ম্বনা সকল রকমে বৃদ্ধি পাইবে। এই দিক হইতে বিপিনচন্দ্রের অবদাননিচয় আমাদের পক্ষে বিশেষভাবেই অনুধ্যান, শ্রদ্ধার সহিত সেগুলির মনন এবং চিন্তনের প্রয়োজন রহিয়াছে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। ২২৭।৫৪

বিপ্লবের ইতিহাস

বিপ্লবী বাংলা—শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী, মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—সাড়ে চার টাকা।

বিপ্লবী বাংলা বলিতে অগ্নিযুগ এবং তাহার পরবর্তী অধ্যায়ের বাংলাকেই সাধারণত আমরা বুঝিয়া থাকি। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধেই এই বিপ্লব প্রয়াস; ইহা শুধু বিপ্লবী বাংলার রাজনৈতিক দিক বা চরিত্র, সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের বিপ্লবকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। 'বিপ্লবী বাংলা' বলিতে আলোচ্য গ্রন্থে সেই রাজনৈতিক বিপ্লবকেই লেখক গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বিপ্লবী বাংলার চিত্র-অঙ্কনে তিনি পূর্বোক্ত অগ্নিযুগের বাংলা অপেক্ষা বৃহত্তর পটভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রন্থকার যে পটভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ১৭৫৭ সাল হইতে ১৯১২ সাল পর্যন্ত প্রসারিত। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতা লুপ্ত হয় এবং দেশ ইংরাজের শাসনে চলিয়া যায়। লেখক দেখাইয়াছেন যে, বৃটিশ শাসনের সূত্রপাত হইতেই এই বিপ্লবী বাংলার প্রকাশ এবং প্রয়াস সুরু হয়। প্রারম্ভে বৈদেশিক লুণ্ঠনের প্রথম যুগটির বর্ণনা করিয়া লেখক এই বিপ্লবের সূত্রপাতের অধ্যায়ে আসিয়া "জঙ্গল মহালের বিদ্রোহ"-এর বিবরণ দিয়াছেন। ইহার পরে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের বিস্তৃত বিবরণ দিয়া পরবর্তী অধ্যায়-কয়টিতে একে একে চুয়াড় বিদ্রোহ, ওয়াহবী বিদ্রোহ এবং সাঁওতাল বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তিনি বিবৃত করিয়াছেন। বিপ্লবের ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিয়া লেখক সিপাহী বিদ্রোহের অধ্যায়ে উপনীত হইয়াছেন। এখানে তিনি বিশদ তথ্যাদির সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, বাংলার মাটিতেই এই বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া ক্রমে সারা ভারতে তাহা দাবাগ্নিরূপে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহার পরে নীল বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শেষ করিয়া অগ্নিযুগের আদিতে 'গুপ্ত সমিতির গোড়ার কথায়' লেখক আসিয়াছেন এবং অবশেষে অগ্নিযুগের বাংলার ইতিহাস আলোচ্য খণ্ডে ১৯১২ সাল পর্যন্ত বিশদ ও বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করিয়াছেন। তথ্য, ঘটনা, কাহিনী, ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক ডাকাতি ও হত্যা ইত্যাদির বিবরণে গ্রন্থের এই অংশ অতীব সমৃদ্ধ। এই অংশের রচনায় গ্রন্থকারকে বহু রিপোর্ট ও পুস্তকের সাহায্য লইতে হইয়াছে।

ইহা তাঁহার বহু অধ্যয়নেরই প্রমাণ। বিপ্লবী বাংলার এই দিকটি বা অংশটি উপন্যাসের মতই রোমাঞ্চকর এবং বিপ্লবীদের জীবনদানের বহু বিবরণে তাহা মর্মস্পর্শী। গ্রন্থখানি আদ্যন্ত ইতিহাস এবং ঐতিহাসিকের শ্রম, বিশ্লেষণশক্তি, তথ্যের মর্মোদ্ঘাটনে অনলস চেষ্টা। নিরপেক্ষতা হইতে গ্রন্থকার কোথাও বিচ্যুত হন নাই। কোথাও কোথাও হয়তো তথ্যের ছোটখাটো ভুলভ্রান্তি থাকিয়া থাকিবে, কিন্তু তাহা ধর্তব্য বা উল্লেখযোগ্য নহে। বিপ্লবী বাংলার পরিচয় এবং ইতিহাস জানিবার আগ্রহ যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের জন্য আলোচ্য গ্রন্থখানি আমরা নিশ্চয় সুপারিশ করিতে পারি।

(১১৯।৫৪)

স্তালিন : (১) অক্টোবর বিপ্লব ও রুশ কমিউনিস্টদের কর্মকৌশল। মূল্য—৷৷৹ আনা। (২) **সোবিয়েত রাষ্ট্রের কৃষিনীতির সমস্যা।** মূল্য—চার আনা। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড, কলিকাতা—১২।

প্রথম পুস্তিকাটিতে অক্টোবর বিপ্লবের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক পটভূমিকা ও যে বৈদেশিক পরিস্থিতির সুযোগে সাম্রাজ্যবাদ দ্রুত উচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয়েছিল, সে বিষয়-গুলি আলোচিত হয়েছে। কি কি কারণে এই বিপ্লব নিছক জাতিগত ঘটনা মাত্রই নয়, আন্তর্জাতিক মর্যাদার অধিকারী তাও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পুস্তিকাটি 'Problems of Agrarian Policy'র [illegible]। যৌথ কৃষিজোত আন্দোলনের স্বরূপই শুধু বিবৃত হয়নি, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের ব্যবহারিক সাফল্যের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। অবশ্য এ-সবের পাশাপাশি বুর্জোয়া কুসংস্কারের চরিত্র-নির্ণয় আছে, আছে পুঁজিবাদীদের সর্বনাশা প্রথা সম্বন্ধে সাবধানবাণী। সমস্ত সমস্যাই অবশ্য বিশেষ এক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে সমাধান করার প্রয়াস। একচক্ষু কুরঙ্গের মতন প্রশ্ন ও সমস্যার একটা দিক সম্পূর্ণ উপেক্ষিত ও অবহেলিত থাকে, এই জাতীয় পুস্তিকার এই এক অসুবিধা। তৌলদণ্ডে সমস্যার দোষগুণ নিরূপিত করার চেষ্টা হয় না। কারণ অনুমেয়।

১৭৬।৫৪, ১৭৭।৫৪

সাহিত্যালোচনা

গল্পকার শরৎচন্দ্র—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুচরিতা রায়। বাণী প্রকাশনী, ৪।১, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট (রুম নং ২৫) কলিকাতা—২০। মূল্য—পাঁচ টাকা।

সীজারের মত শরৎচন্দ্রও বলতে পারতেন, 'এলাম, দেখলাম, জয় করলাম।' অসিমুখে দেশ জয় নয়, লেখনীমুখে অন্তর জয়। তাঁর সংবেদনশীল মন বাঙালী মনের চিরন্তন রূপটিকে তুলে ধরেছে কারুকর্মবর্জিত গতি-শীল স্বচ্ছন্দ ভাষায়। কারুকর্মবর্জিত, কিন্তু চারুশিল্পে অপরূপ। এ ভাষা মরমী গল্পকারের সহজাত, সচেতন গদ্যলেখকের প্রয়াসলব্ধ নয়। ভাষাকে দিয়ে তিনি তাঁর গল্প বলিয়েছেন, সেখানেই তার সীমা নির্দিষ্ট। গল্পকার শরৎচন্দ্রের এইখানে জিত, গদ্যলেখক শরৎচন্দ্রের এইখানে হার। কিন্তু সবার ওপর তিনি তো গল্পকার।

আলোচ্য গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের গল্পকার সত্তারই বিভিন্নমুখী বিশ্লেষণ করেছেন লেখক-লেখিকা। তাঁর গল্পধর্মী উপন্যাস অথবা উপন্যাসধর্মী গল্পগুলির বিশ্লেষণাত্মক ব্যাপক আলোচনা এ গ্রন্থের লেখক-লেখিকার আন্তরিকতার স্বাক্ষর বহন করছে। আলোচনায় প্রধানত দুটি জিনিসের ওপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। চরিত্র বিশ্লেষণ এবং আংশিক পর্যালোচনা। প্রতিটি গল্পের খুটিনাটি আলোচনায় ধৈর্যশীল যে গবেষক মনের পরিচয় মেলে তা ভবিষ্যতে বাঙলা সাহিত্যের এই প্রায়-অবজ্ঞাত শাখাকে সমৃদ্ধ করবে এমন আশা নিঃসন্দেহে পোষণ করা যায়। এতাবৎকাল সাহিত্যের এ-শাখায় যাঁরা বিহার করেছেন তাঁদের অধিকাংশেরই, দৃষ্টিভঙ্গী বিদ্যায়তনী (একাডেমিক) ভঙ্গী রসবির্বর্জিত। আশার কথা উক্ত গ্রন্থের লেখক-লেখিকা এর ব্যতিক্রম।

লেখক-লেখিকার বক্তব্যের সঙ্গে অনেক স্থলে হয়তো পাঠক ঐকমত হতে পারবেন না। যেমন, 'তাঁর প্রত্যেকটি গল্প এবং উপন্যাসে জটিলায়িত সম্পর্কের মধ্যে যে আক্ষেপ, নৈরাশ্য এবং অতৃপ্তি চিরজাগ্রত সেখানে সমাজ-সত্তার পটভূমিকায় ব্যক্তিসত্তারই প্রাধান্য'। এবম্বিধ মতামত গ্রহণে অনেকেই দ্বিধান্বিত হবেন। প্রকৃতপক্ষে শরৎ-সাহিত্যে সমাজ শাসনের ওপর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদাহরণ খুঁজতে গলদঘর্ম হতে হবে। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। কিন্তু সে নিতান্তই ব্যতিক্রম। কিন্তু এহবাহ্য। লেখক-লেখিকার যৌথ প্রচেষ্টা বাঙলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছ থেকে যথোচিত সংবর্ধনা পাবে বলেই বিশ্বাস।

(২০২।৫৪)

প্রাপ্তি-স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

অবিশ্বাস্য—সৈয়দ মুজতবা আলী
চিড়িয়াখানা—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ১ম খণ্ড—শ্রীঅনন্তকুমার বসু
ভাষাতাত্ত্বিক পশ্চিমবঙ্গ—পুলকেশ দে সরকার
হীরে পান্না মুক্তো—প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়
পাড়ি—গৌরীশংকর দে
নবযুগের বাংলা—১ম অংশ ও ২য় অংশ—বিপিনচন্দ্র পাল
ভুতুড়ে-অম্ভুতুড়ে—শিবরাম চক্রবর্তী
সংকরী—রঞ্জন
কায়কল্প—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
প্রবোধকুমার সান্যাল-এর স্ব-নির্বাচিত গল্প—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত
হাজি মুরাদ—লিও তলস্তয়। **অনুবাদক**—প্রফুল্ল চক্রবর্তী
কাক-বন্ধ্যা—শ্রীছবি বন্দ্যোপাধ্যায়
পলাতক—সুবোধচন্দ্র মজুমদার
শ্রীমদ্ভগবদগীতা (১৩শ খণ্ড)—**শ্রীঅনিল-বরণ রায়**
সংগ্রাম—শ্রীনীলাপদ ভট্টাচার্য
প্রবাহ—গিরিশংকর

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

পুরনো মদ, পুরনো চীজের কদর কিছু বেশী। কিন্তু সাধারণভাবে নতুন জিনিসেরই আদর। নতুন কাপড়, নতুন বাড়ি মানুষ একটু স্বতন্ত্রভাবেই দেখে; কিন্তু কোনও ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী প্রমাণ করেছেন যে, নতুন বাড়ি যদি পুরনো মশলা দিয়ে তৈরী হয়, তাহলে সে বাড়ির দর নাকি অনেক বেশী। এঁরা একশত বছর ধরে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, বাড়ি তৈরীর কংক্রীট ও মশলাপত্র যদি বহুকাল ধরে বাইরে খোলা জায়গায় ফেলে রাখা হয়, তাহলে সেই মালপত্রে বাড়ি হলে বাড়ি খুব শক্ত ও মজবুত হয়। প্রমাণ হিসাবে তাঁরা বলেন যে, ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের সময় কয়েকটি বাড়িঘর তৈরীর পর যে মশলা-পাতি বেঁচেছিল, সেগুলো ঐভাবে খোলা অবস্থায় পড়ে থাকে। বর্তমানে ৪৩ বছর পরে সেইসব মশলা দিয়ে যে বাড়ি তৈরী হচ্ছে, সেগুলো তৎকালীন ঐ মশলার নতুন অবস্থায় তৈরী বাড়ির চেয়ে প্রায় তিনগুণ শক্ত ও মজবুত হয়েছে।

*

অজেয় মাউন্ট এভারেস্ট জয় করার পর আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগতে পারে, পৃথিবীতে আর কি কোন অজেয় পাহাড় নেই? যদিও এভারেস্ট উচ্চতার দিক থেকে সর্বোচ্চ পাহাড় তবুও এমন কোন পাহাড় আছে কিনা যা মানুষ কোনদিন জয় করতে পারবে না। এভারেস্টের চেয়ে উচ্চতায় কিছু কম যেমন ২৮,২৫০ ফুট থেকে আরম্ভ ক'রে ২৬,০০০ ফিটের মধ্যে হিমালয়ে খুব কম করেও এখনও ২৪টা চূড়া আছে যাতে মানুষ চড়তে পারেনি। অবশ্য বহু দেশেই এইসব চূড়ায় চড়ার অভিযান বহুকাল থেকে চালিয়ে যাচ্ছেন এইসব সুউচ্চ শিখরের মধ্যে মাউন্ট কে টু যাকে মাউন্ট গডউইন অস্টিন বলা হয়—এটি উচ্চতায় ২৮,২৫০ ফিট এবং পাকিস্তান এবং ভারতবর্ষের সীমানায় অবস্থিত। এছাড়াও কাঞ্চন-জঙ্ঘা, নাঙ্গা পর্বতের নাম করা যায়। মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ার পরও বিভিন্ন অভিযানকারীরা দলে দলে এইসব শিখরে চড়বার চেষ্টা করছেন, এবং যতদিন না এইসব শিখরে মানুষ উঠতে পারছে ততদিন বোধ হয় এই অভিযানও শেষ হবে না।

*

কুয়াশাচ্ছন্ন দিনটি কবির মনে কাব্য জাগাতে পারে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে

কুয়াশা প্রতিরোধক টুপি

বেশ অস্বস্তি ও অসুবিধাজনক। এই-রকম আবছা দিনে সাধারণের কাজকর্মে মন বসে না, বিশেষত এইরকম আবহাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে সর্দি, কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি হওয়ার আশংকা থাকে। এমন দিনে ঠাণ্ডা লেগে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে। আজকাল কুয়াশা-প্রতিরোধক একরকম টুপির প্রচলন হয়েছে। বিশেষত, মেয়েদের পক্ষে এইরকম টুপি ব্যবহার করা খুব সুবিধাজনক। কুয়াশার সময় নাক-মুখ বেশ করে ঢেকে নেওয়া যায়, আবার কুয়াশা কমে গেলে এটা খুলে ফেলে দিলেই চলে। টুপিটার মধ্যে নতুনত্ব বিশেষ কিছুই নেই, শুধু সাধারণ টুপি সঙ্গে একটা ঘোমটার মত জিনি লাগান থাকে।

*

মানুষ পাগল হয়ে গেলে আম ধরে নি যে, কোন মানসিক কারণে এ ঘটেছে। আর এই কারণে পাগলকে কো মনস্তত্ত্ববিদকে দিয়ে চিকিৎসা করান হয় ডাঃ রিনকেল বোস্টনের একজন ব মনস্তত্ত্ববিদ। তাঁর মতে মানুষ শু মানসিক কারণেই পাগল হয় না—শরীরে ভেতরে এক ধরনের রাসায়নিক বস্তু তৈর হওয়ার জন্য হয়। অন্ততপক্ষে এ রাসায়নিক কারণটিকে পাগল হবার একা প্রধান কারণ বলা যায়। ডাঃ রিনকে বলেন যে, মানুষের শরীরের এড্রিন্যা গ্রন্থি থেকে যে হরমোন বের হয়, সেট শরীরের অন্য রাসায়নিক বস্তুর সঙ্গে মিশে 'এড্রিনক্সিন' নামক এক বস্তু সৃষ্টি করে। আর এই এড্রিনক্সিনের জন্যই মানুষ পাগল হয়ে যায়।

*

ইনজেকসন নেওয়া কষ্টকর না হলেও ইনজেকসন নেবার নামে প্রায় সকলেই একটু-আধটু অস্বস্তি বোধ করেন। তাও অন্য লোকে ইনজেকসন দিয়ে দিলে খুব একটা অস্বস্তি নাও লাগতে পারে। কিন্তু এমন লোক আছেন, যাঁদের ইনজেকসন নিজেদের দিয়ে নিতে হয়। এই সমস্ত লোকদের নিজের শরীরে সূঁচ ফোটাবার আগে বেশ একটু ইতস্তত করতে দেখা যায়। এই অসুবিধা স্বয়ংক্রিয় ইনজেকসনের ব্যবস্থায় দূর হবে বলা যায়। ডেনমার্কের এক ভদ্রলোক এই নতুন ধরনের ইনজেকসন দেবার উপায়টি আবিষ্কার করেছেন। তিনি ইনজেকসন সিরিঞ্জের সঙ্গে একটা স্প্রিং লাগিয়ে নিয়েছেন। তারপর ইনজেকসন দেবার আগে স্প্রিংটাকে এমনভাবে বন্দোবস্ত করা যায় যে, একটি নির্ধারিত সময়ের পর সিরিঞ্জের সূঁচটি স্প্রিংএর চাপে শরীরের যেখানে ইনজেকসন দেওয়া হবে, সেখানে ঢুকে যায়। আর সেই সঙ্গে সিরিঞ্জের ভেতরে যে তরল ওষুধটা থাকে, সেটা আস্তে আস্তে ঢুকতে থাকে।

রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলন

অল্প কয়েকদিন পূর্বেই রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র-সঙ্গীত এবং সাহিত্য নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়ে গেছে। গানবাজনা, নৃত্য, নাটক, বক্তৃতা প্রভৃতি বহু হয়েছে বটে, কিন্তু কেমন যেন এলোমেলো গোছের একটা হৈ-চৈএর ওপর দিয়ে এইসব অনুষ্ঠানগুলি সারা হয়েছে। আমাদের উৎসাহ যতটা কাজের ধারা ততটা সুসম্বদ্ধ নয় অতএব এইসব অনুষ্ঠান থেকে অনেক কিছু ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি এবং বহু ব্যাপারে বহু বিকৃতিও এসে গেছে। এই উৎসাহের আবেগটা কমে আসবার পর রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলনের সুপরিকল্পিত রূপটি রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে ব্যাপকভাবে এবং যথাযথভাবে বোঝবার অবকাশ এনে দিয়েছে, এই কারণে উক্ত সম্মেলনের প্রবর্তক দক্ষিণী প্রতিষ্ঠান আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলন প্রথম আহ্বান করা হয় ১৯৪৮ সালে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত রচনার ধারাবদ্ধ আলোচনা এবং পরিবেশনের ব্যবস্থা সেই প্রথম হয়েছিল বল্লে অত্যুক্তি হয় না। তারপর সর্বসম্মতিক্রমে প্রতি তিন বৎসর অন্তর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এই রকম স্থির হয়েছে। বর্তমান সম্মেলনটি তৃতীয় অনুষ্ঠান। এই বৎসরও সম্মেলনটি সার্থক করবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে বহু শিল্পী বহু জায়গা থেকে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন এবং সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ অনুষ্ঠানটি এমন তৎপরতার সঙ্গে সুসম্পন্ন করেছেন যে এঁদের সুষ্ঠু কর্মপন্থা সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে এবং প্রীতিদায়ক হয়েছে। অনুষ্ঠান যথাসময়ে আরম্ভ হয়েছে, অবিরাম গতিতে চলেছে এবং ব্যবস্থাপনার কোন উল্লেখযোগ্য ত্রুটি ঘটে নি। এই সম্মেলনের পরিচালনা অপরাপর প্রতি-ষ্ঠানের আদর্শস্থল হয়ে রইল।

বাইরে থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি এঁদের আগ্রহ এবং শিক্ষা বিশেষ প্রশংসনীয়। এঁদের মধ্যে কলিম সরাফি ইতিপূর্বেই কলকাতায় জনপ্রিয় ছিলেন—এবারেও তাঁর পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। মেয়েদের মধ্যে আফ্‌সারী খানম বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। লায়লা আর্জুমান্দ বানু এবং হুসনা বানু খানম—এঁদের গানেও আমরা পরিতৃপ্ত হয়েছি। পূর্ব পাকিস্তানের এই সহযোগিতা আমাদের বিশেষ আনন্দ দিয়েছে। কলকাতার এবং বাংলার বাইরে থেকে যে সব শিল্পী এসেছেন এঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় নি সুতরাং এবিষয়ে বিশেষ করে কিছু বলা গেল না।

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

সম্মেলনের সচিবের ভাষণে আমরা জানতে পারলাম যে কলকাতার কোন একটি বিশিষ্ট সঙ্গীত শিক্ষায়তন সম্মেলনের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করেছেন এবং তৎসংশ্লিষ্ট শিল্পীদের ওপরেও এই সম্মেলনে যোগাদন সম্পর্কে বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই মনোভাব প্রশংসনীয় নয় এবং এই দৃষ্টান্ত অপরাপর প্রতিষ্ঠান অনুকরণ করবেন না এটাই আমরা আশা করি। সহযোগিতার মনোভাব আত্ম-মর্যাদা বৃদ্ধি করে, ক্ষুণ্ণ করে না এবং সহযোগিতা করলে অনুষ্ঠানটি সর্ব-সাফল্যের দাবীতে সার্থক হয়ে উঠত।

যাক্, যেসব শিল্পী অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁদের সংখ্যাও কম নয় এবং তাঁদের অনুষ্ঠানও সব মিলিয়ে প্রীতিকরই হয়েছে। তবে এই সম্মেলনে বহু গান শুনে যেমন প্রশংসার সুযোগ মিলেছে তেমনি শিক্ষার দিক থেকে কয়েকটি ত্রুটি এবং অসম্পূর্ণতাও চোখে পড়ল। এগুলির একটু বিশেষ উল্লেখ আবশ্যক, যাতে করে ভবিষ্যতে এইসব ত্রুটি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়। আর একটি নৈরাশ্যজনক ব্যাপার হচ্ছে পুরুষ কণ্ঠের অভাব এবং যতটুকু পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল তার মধ্যেও পৌরুষ এবং গাম্ভীর্যের বিকাশকে যেন অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছে করেই দমিত করে

রাখবার একটা প্রয়াস দেখা গেল। পুরুষ-কণ্ঠের উপযোগী স্বতোৎসারিত স্বাভাবিক গায়নপদ্ধতি রবীন্দ্রসংগীতের গায়কগণকে আয়ত্ত করতেই হবে নতুবা তাঁদের প্রতিষ্ঠা অর্জনের কোন উপায় দেখি না। অনেকের ধারণা মাইকের সামনে গলা যতটা চেপে গাওয়া যায় ততই শ্রুতিমধুর হয়। এই ধারণা ভুল, মাধুর্য সব ক্ষেত্রে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে, মাইকের মাধ্যমে কিছুই এসে যায় না। যাই হোক শুধু রবীন্দ্রসংগীতই নয় রবীন্দ্রেতর সংগীতেও দেখছি ছেলেরা ক্রমেই পিছু হটছেন। পুরুষ প্রতিভা যদি সংগীতজগতে বিরল হয়ে আসে তবে মেয়েরা কতটা অগ্রসর হতে পারবেন। সংগীতে স্বভাবতই পুরুষের যোগ্যতা অনেক বেশী সুতরাং যেভাবেই হোক সুযোগ করে নিয়ে সংগীতে তাঁদের কিছুটা আত্মনিয়োগ করতেই হবে।

শিক্ষার দিক থেকে প্রধান ত্রুটি হল লয়জ্ঞানের অভাব। অনেকেরই গানের গতি কতকটা এলোমেলো ধরণের এবং অতি সহজ তালও অনেকেই রাখতে পারেন নি। রবীন্দ্রসংগীতের তালবৈচিত্র্য দেখিয়ে দেবার যাঁরা প্রয়াসী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ তালভ্রষ্ট হয়েছেন। এটি একটি অমার্জনীয় ত্রুটি। উচ্চারণগত দোষও ব্যাপকভাবে ঘটেছে। জড়িত এবং অর্ধোচ্চারিত আওয়াজের মধ্যে কী বাহাদুরি আছে আমরা ভেবে পাই নে। প্রায় ক্ষেত্রেই অকারকে আকার ঘেঁষা উচ্চারণ করাটা ক্রমেই আমাদের কাছে অসহ্যভাবে পীড়াদায়ক হয়ে উঠছে। এবিষয়ে আমরা আর কত সাবধানবাণী উচ্চারণ করব? তারপর আর একটা ব্যাপার হচ্ছে অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে গান করে যাওয়া। সব সময় যেন সামান্য এদিক ওদিক হবার ভয়ে গায়ক গায়িকাগণ সন্ত্রস্ত। লোকে গান করে মনের আনন্দে কিন্তু এমন ভয়ে ভয়ে যদি গান করতে হয় তবে তো গানের আর কোন মাধুর্য থাকে না। শিক্ষার সার্থকতা হচ্ছে স্বাভাবিক প্রকাশ এবং প্রয়োগে। যতই শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে ততই গায়নভঙ্গিতে আয়াসের লক্ষণ অন্তর্হিত হবে, শুনলে মুগ্ধ হয়ে বলতে ইচ্ছে করবে—"তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী আমি অবাক হয়ে শুনি কেবল শুনি"। কিন্তু তেমন গুণীর সাক্ষাৎ বড় একটা মেলে না এবং আজকাল দুর্লভ হয়ে উঠেছে।

এবারে সম্মেলনের বিষয়বস্তুতে আসা যাক। প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধন সংগীত বেদগানের পর স্বস্তিবচন উচ্চারণ করলেন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন। তারপর সংগঠন সচিব একটি ক্ষুদ্রভাষণে সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সকলকে পরিজ্ঞাত করলেন। অতঃপর শুরু হল সাংগীতিক অনুষ্ঠান। প্রথমে কাব্যগীতি। এতে অংশ গ্রহণ করলেন শ্রীসুশীল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী রমা ভট্টাচার্য, শ্রীঅরূপ গুহঠাকুরতা, আফসারী খানম্, শ্রীমতী পূরবী দত্ত এবং শ্রীমতী গীতা ঘটক। গানগুলি মন্দ লাগল না, তবে শ্রীঅরূপ গুহ-ঠাকুরতা "কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি" গানটি না বেছে অপর কোন গান নির্বাচন করলে আরো প্রশংসা অর্জন করতে পারতেন। গানে কোন ত্রুটি পাওয়া গেল না কিন্তু তবু সব মিলিয়ে যেন বিশেষত্বটুকু পরিস্ফুট হল না। ঠিক এই গলার এ গান নয়। এইটাই মনে হল। আফসারী খানম গাইলেন "আরো কিছুখন না হয় বসিয়ো পাশে"। সুন্দর গলা—গানটি চমৎকার লাগল। শ্রীমতী গীতা ঘটকের গাওয়া "আজি যে রজনী যায়" গানটি বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এর প্রধান কারণ শিল্পীর অনুপম দৃ[illegible] গায়নভঙ্গী। কোথাও একটু অস্বাভাবিকতা নেই, গানটি যেন স্বতঃ উৎসারিত হয়ে চলেছে—কণ্ঠস্বর বলিষ্ঠ শ্রীমতী গীতা ঘটক আমাদের সংগীত জগতে একটি স্থান করে নিতে পারবে বলে মনে হয়। তবে গান গাইবার সম[য়] তাঁর কতকগুলি মুদ্রাদোষ প্রকাশ পেয়েছে এগুলি বর্জনীয়। লোকসংগীত পর্যায়ে গাইলেন শ্রীসুনীলকুমার রায়, লায়ল আর্জুমান্দ বানু, শ্রীমতী ঝর্ণা হাজরা শ্রীমতী দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রসাদ সেন হুসনা বানু খানম এবং শ্রীমতী শোভা রায়চৌধুরী। সব গানগুলিই মামুলিভাবে গাওয়া হয়েছে। কীর্তন গানগুলি অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে গাওয়া হয়েছে বলে মনে হল এবং কীর্তনের যে একটা বিশেষ আবেদন আছে তা কিছুমাত্র পরিস্ফুট হয়নি, যেন যান্ত্রিকভাবে স্বরলিপিটি সুরে পঠিত হয়ে গেল। প্রেমসংগীত পর্যায়ে গাইলেন শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষ, শ্রীচিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী চিত্রা সেন, শ্রীমতী অমলা সরকার, শ্রীমতী তপতী দেবী, শ্রীমতী মঞ্জুলা দত্ত এবং শ্রীপ্রীতিভূষণ গোস্বামী। শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষের গাওয়া "বুঝেছি বুঝেছি সখা ভেঙে গেছে ভুল" গানটি খুবই মিষ্টি লাগল। অপরাপর গানগুলিও মন্দ লাগে নি তবে শ্রীযুত চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় "তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা" গানটির মাধুর্য পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করতে সক্ষম হন নি। পরিশিষ্টে আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে মৃত্যুদিনের গান করেন শ্রীমতী সুপূর্ণা ঠাকুর, বর্ষশেষের গান করেন শ্রীমতী মঞ্জু রায়চৌধুরী এবং হলকর্ষণের গান করেন শ্রীমতী রিতু গুহঠাকুরতা।

দ্বিতীয় অধিবেশনের গোড়ায় "রবীন্দ্র-সংগীতে ধ্রুপদ ও ধামার" এই বিষয়ে আলোচনা করলেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি গানও গাওয়া হল। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ দরবারি গানের বিকাশ নিয়ে প্রধানত আলোচনা করলেন এবং এই উপলক্ষ্যে ধ্রুপদের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধারণা ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে নাট্যশাস্ত্রকার ভরতোক্ত ধ্রুবা নামক গীতপদ্ধতির সঙ্গে পরবর্তী যুগের ধ্রুবপদের কোন সম্বন্ধ নেই এবং ধ্রুবপদের উদ্ভব তিনি চারশ' বছরের বেশি পুরাতন

বলে মনে করেন না। ধ্রুপদের চারটি বাণীর উল্লেখ করে তিনি বলেন যে গৌড়হার বাণীটি ধ্রুপদের গৌড়ীয় রীতি। এবিষয়ে অবশ্য অনেকে তাঁর সঙ্গে একমত হবেন কিনা সন্দেহ। প্রথমত ভরতোক্ত ধ্রুবার সুসম্বন্ধ রূপ যে কী ছিল তা নাট্যশাস্ত্র পাঠ করেও সম্যক উপলব্ধি করবার উপায় নেই এবং ধ্রুবা একরকমের নয় বহুরকমের ছিল। জাতিরাগ প্রভৃতি কয়েকটি বিচ্ছিন্নভাবে বর্ণিত বিষয় থেকে ধ্রুবার আকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা অসম্ভব। এক্ষেত্রে ধ্রুবা যে পরবর্তী যুগের প্রবন্ধরূপের সঙ্গে মিলে যায় নি এমন কথা জোর করে বলা যায় না। সুপ্রাচীন প্রবন্ধগানের শেষ সংগঠন প্রয়াসের ফলই হচ্ছে ধ্রুবপদ। ধ্রুপদের লক্ষণ এবং প্রাচীন প্রবন্ধগানের লক্ষণ প্রায় একই রকমের অতএব চারশ কি পাঁচশ বছর আগে এই পদ্ধতি হঠাৎ সৃষ্ট হয় নি। ধ্রুবপদ প্রাচীন প্রবন্ধ-সঙ্গীতেরই ক্রমপরিণতি। ধ্রুপদের যে একটি গৌড়ীয় রীতি ছিল এবিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। প্রথমত প্রাচীন বাংলা গ্রন্থে কোথাও ধ্রুপদের উল্লেখ নেই। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা গ্রন্থে ধ্রুপদের অতি সামান্য উল্লেখ একটু আধটু আছে। ধ্রুপদ যদি প্রাচীন বাংলায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকত তবে তার কিছু বর্ণনাও অন্তত থাকত, কিন্তু তা নেই। এক্ষেত্রে বাংলার বাইরে দূরাঞ্চলে একটি গৌড়ীয় রীতি স্থাপিত হবে এটা অনুমান করা কঠিন। তা ছাড়া এই গৌড়হার কথাটিই নানাভাবে প্রচলিত—যেমন গৌরহার, গওহরবাণী, গোবরহার ইত্যাদি। এ থেকে শব্দটি যে কী তাই স্পষ্টভাবে জানা যায় না। অতএব—থাক অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে যাচ্ছি অতঃপর সম্মেলনের বৃত্তান্তে আসি।

রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদাঙ্গ গানগুলি সম্বন্ধে স্বল্প আলোচনার পর দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কয়েকটি গান গেয়ে দেখান হয়। এতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীসুনীল রায়, শ্রীসুবিনয় রায়, শ্রীমতী নীলিমা মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী রমা ভট্টাচার্য এবং শ্রীশুভ গুহঠাকুরতা। এই অনুষ্ঠানটি অতিশয় মনোজ্ঞ হয়েছে এবং বোধ হয় এই সম্মেলনে এইটিই শ্রেষ্ঠ অধিবেশন। শ্রীসুবিনয় রায়ের গাওয়া "আজি মম মন চাহে সেই জীবন-বন্ধুরে" গানটি একটি সঙ্গীতের পরিবেশ সৃষ্টি করে। সুরে তালে লয়ে এই গানটি আমাদের মুগ্ধ করেছে।

এর পরে হাস্যরসাত্মক সঙ্গীতে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ "ও ভাই কানাই কারে জানাই দুঃসহ মোর দুঃখ" গানটি গেয়ে শোনান। বলাবাহুল্য গানটি চমৎকার রসোত্তীর্ণ হয়। এসব গানে তাঁর সমকক্ষ বোধ হয় আর কেউই নেই।

তারপর ছোট মেয়েরা কয়েকটি শিশু-সঙ্গীত গেয়ে শোনায়। পরবর্তী অনুষ্ঠান রবীন্দ্রনাথের টপ্পাভঙ্গীম গান। এর মধ্যে কয়েকটি গানে টপ্পার বৈশিষ্ট্য খুবই কম, কিছু কিছু টপ্পার আন্দোলনযুক্ত সুরের কাজ আছে মাত্র। ঘোষণায় এগুলি যে ঠিক টপ্পা নয় তা অবশ্য বলে দেওয়া হল। এই অনুষ্ঠানে ছিলেন শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, আফসারী খান, শ্রীঅশোক-তরু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কমলা বসু। এর মধ্যে শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় "এ কী করুণা করুণাময়" গানটি যে লয়ে এবং যে ঢঙে গাইলেন তাতে টপ্পার ভঙ্গী আদৌ প্রকাশ পায় নি। গানটির গতি অধিক বিলম্বিত হওয়াতে এমন একটা ধরণ এসে যাচ্ছিল যে এই গাওয়াকে কোন বিশেষ পর্যায়ভুক্ত করাই দায়। অপর গানগুলি সুগীত হয়েছে।

এরপর কতকগুলি গান গাওয়া হল যাদের নামকরণ হয়েছে "উদ্দীপনার গান"। এই রকম শ্রেণী বিভাগের তাৎপর্য বোঝা গেল না। কেননা সব গানই ভাবোদ্দীপক। উদ্দীপনা এক্ষেত্রে উৎসাহসূচক অর্থেই অনেকটা ব্যবহৃত হয়েছে বুঝতে পারছি কিন্তু প্রত্যেকটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই উদ্দীপনা হতে পারে যেমন প্রেম, ভক্তি, ধর্ম ইত্যাদি ভাবগুলি। এই শ্রেণীর গানে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীপ্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিম সরাফী, লায়লা আর্জুমান্দ বানু, শ্রীপ্রশান্ত সেন, শ্রীমতী বনানী ঘোষ ও শ্রীদিলীপকুমার রায়। গানগুলি সুগীত হয়েছে।

তৃতীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম যুগ সম্বন্ধে স্বল্প আলোচনা করলেন। উদাহরণ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের কয়েকটি গানের কিছু কিছু গেয়ে শোনালেন শ্রীমতী সুপর্ণা ঠাকুর। ভারি চমৎকার মিষ্টি গলা এঁর—গীতাংশগুলি ইনি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুললেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগ সম্বন্ধে ধারণা করতে গেলে যতটুকু জানা দরকার তা কিন্তু আমাদের আজও জানা হয়নি। এইটি বুঝতে গেলে সেই যুগের প্রচলিত অন্যান্য গানগুলি শোনা দরকার। সেকালকার টপ্পা, খেমটা, আড়খেমটা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের গান সম্বন্ধে এখনও কোন বিশেষ গবেষণা হয় নি। এটি অবিলম্বে আরম্ভ করা দরকার কেননা যাঁরা এখনও এসব গান জানেন তাঁরা দ্রুত যাবার পথে এবং তাঁদের কাছ থেকে এসব গানের পুঁজি আমাদের সংগ্রহ করে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রাক্-রবীন্দ্র যুগে আধুনিক বাংলা ভাষায় রচিত কেবলমাত্র প্রেমের গানের সংখ্যা দু হাজারের ওপর। এগুলি ছাপা বইতে পাওয়া যায়। বাকি আরও কত গান আছে যা মুখে মুখে প্রচলিত। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের গান তো আছেই। এইসব গানের অনেক ভঙ্গী

রবীন্দ্রনাথের গোড়ার দিকের গানে পাওয়া যায়। বিষয়টি উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করলে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের রচনা সম্বন্ধে একটা ভাল ধারণা করবার অবকাশ পাওয়া যাবে। আশা করি, ভবিষ্যৎ সম্মেলনে এইরকম একটি বিষয়বস্তুর পরিকল্পনা হবে।

এর পরের অনুষ্ঠান দেশাত্মবোধক সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমতী নূপুর দাশগুপ্ত, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পালিত, শ্রীসুমিত্রা সেন, শ্রীশ্যামল মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী করুণা চক্রবর্তী। এ'দের মধ্যে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পালিতের গাওয়া "এ ভারতে রাখ নিত্য" গানটি চমৎকার-ভাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে। এ'র বলিষ্ঠ এবং খোলা গলায় গাইবার পদ্ধতি অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

রবীন্দ্রনাথের নতুন তালের গানের অনুষ্ঠানটিতে শ্রীমতী কৃষ্ণা বসুর ঝম্পক এবং শ্রীদিলীপ রায়ের রূপকড়া তালে কিছু এদিক ওদিক হয়েছে। অপর তাল-গুলি পরিচ্ছন্নভাবে দেখানো হয়েছে।

এর পরের ঋতুসঙ্গীতে শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্তের গাওয়া 'বন্ধু রহো রহো সাথে' এবং শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্তের গাওয়া এসো শরতের অমল মহিমা' গান দুটি ভালো লাগল। শ্রীমতী গীতা ঘটকের গাওয়া 'কোথা যে উধাও হোলো' গানটিতে সুরের দিক থেকে কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা গেল যদিও তার গাইবার ঢংটি মন্দ লাগল না। শ্রীমতী রিতু গুহ ঠাকুরতার 'আনন্দ-ধারা বহিছে ভুবনে' গানটি সুগীত হয়েছে।

পরবর্তী খেয়াল ও ঠুংরি অঙ্গের গানে 'কখন দিলে পরায়ে স্বপনে' গানটিকে কেন ঠুংরি বলা হল বোঝা গেল না। গানটি যেভাবে গাওয়া হল তাতে তাকে অনেকটা টপ্-খেয়ালের অনুরূপ বলা চলে। কিন্তু ঠুংরি একে কোনক্রমেই বলা যায় না। 'আজি গন্ধবিধুর সমীরণে' গানটিকে খেয়ালের অঙ্গীভূত না করলেই ভাল হত। কেননা এর স্বরূপটি প্রধানত কাব্য-সঙ্গীতের।

চতুর্থ অধিবেশন আরম্ভ হ'ল ধর্ম-সঙ্গীত পর্যায়ের গান দিয়ে। এতে অংশ গ্রহণ করলেন শ্রীমতী মাধুরী চৌধুরী, শ্রীমতী রুবি মজুমদার, হুসনা বানু, শ্রীসুশীল চট্টোপাধ্যায়, লায়লা আর্জুমান্দ বানু, আসরফী খানম্, কলিম সরাফী, শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্ত এবং শ্রীমতী নীলিমা সেন। এই অনুষ্ঠানের গানগুলি সুগীত হয়েছে। কেবল শ্রীসুশীল চট্টোপাধ্যায় গানের সময় ভাবাবেগের আতিশয্য একটু প্রশমিত করলে তাঁর গানটির রস গ্রহণে সুবিধা হত। ইনি অধিকাংশ অনুষ্ঠানেই অংশ গ্রহণ করেছেন এবং এর পূর্বের গানগুলি মন্দ হয় নি। এ বিষয়ে শ্রীমতী রমা ভট্টাচার্য'ও প্রশংসার দাবী করতে পারেন। লায়লা আর্জুমান্দ বানুর কণ্ঠে 'খোলো খোলো দ্বার' গানটি খুব মিষ্টি লাগল। এই অনুষ্ঠানে তবলা সংগত সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলবার আছে। কয়েকটি গানের সঙ্গে ঠেকা আশানুরূপ হয় নি। যেখানে একতালা বাজানো দরকার সেখানে ইনি দুলকি ছন্দে দাদরা বাজিয়ে গেছেন। একতালাও যেখানে বাজিয়েছেন সেখানে বোলগুলি মোটেই স্পষ্টভাবে ফোটে নি এবং ঝোঁকগুলি ভালভাবে বোঝা যাচ্ছিল না। বাঁয়ার ওপর একটি টোকা মেরে খুব ছোট্ট করে যেভাবে ইনি 'কৎ'টি তুলছিলেন তাতে ফাঁকটি মোটেই ভাল ধরা যাচ্ছিল না। এই বাজানোর দোষে অনেক গান তেমন জমে নি। বরং পাখোয়াজে এ'র হাত অনেক ভাল খুলেছে। পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানগুলিতেও এ'র তবলা সঙ্গতের প্রশংসা আমরা করতে পারছি না। ছন্দপ্রধান বাংলা গানে বোল স্পষ্ট এবং প্রত্যেকটি ঝোঁক ভাল-ভাবে দেখানো দরকার কিন্তু এ'র বাদন-ভঙ্গী ক্ষীণ এবং অতিশয় জড়িত।

পরবর্তী ভাঙা গানের অনুষ্ঠানে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করলেন। এই আলোচনাটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং খুব objective ভাবে করা হয়েছে। ধ্রুপদ তার দুন বাঁট নিয়েই সম্পূর্ণভাবে ধ্রুপদ, টপ্পাও তার তানাদি নিয়েই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ এই সব রীতি থেকে আহরণ করে যে সঙ্গীত রচনা করেছেন তা একান্তভাবেই রবীন্দ্র-সঙ্গীত। এর গায়ন পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। সুতরাং এই রচনায় ধ্রুপদ এবং টপ্পাকে আরোপ করে তান বিস্তারের আলোচনা অনেকাংশে অর্থহীন। আলো-চনার সময় তিনি উদাহরণস্বরূপ 'ভয় হতে তব অভয় মাঝে", "সফল কর প্রভু আজি সভা", "আধেক ঘুমে নয়ন চুমে" এবং "কবে তুমি আসবে" এই ক'টি গান গেয়ে তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট করেন। উপসংহারে তিনি বলেন আমরা এখনও রবীন্দ্রনাথের গানের প্রকৃত উপলব্ধির পথ খুঁজে পাইনি। কেউ ভাবের এবং রসের দিক উপেক্ষা করে তান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আছেন আবার কেউ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সূক্ষ্ম গায়নপদ্ধতি নিয়েই বিচার বিবেচনা করছেন। ফলে রবীন্দ্রনাথের

গানের রসঘন প্রকৃত রূপটিই উপেক্ষিত হয়ে চলেছে।

এর পরে শ্রীমতী সাবিত্রী কৃষ্ণণ কয়েকটি মূল দাক্ষিণী গান গেয়ে শোনান এবং রবীন্দ্রনাথ এইসব গান ভেঙে যে গীত রচনা করেছেন সেগুলি গেয়ে শোনান শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্ত এবং শ্রীমতী রমা ভট্টাচার্য। ভাঙা গানের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমতী ইলা সেন, শ্রীমতী হেনা সেন, শ্রীমতী ইলা দেব, শ্রীমতী শীলা সেন, শ্রীমতী পারমিতা নাগ এবং শ্রীবীরেশ্বর বসু। শ্রীবীরেশ্বর বসুর "বারে বারে ফিরালে" গানটি বলিষ্ঠ গায়নভঙ্গির জন্য আমাদের ভাল লেগেছে।

পরবর্তী দুটি অনুষ্ঠান—নৃত্য পরিকল্পনায় ভানুসিংহের পদাবলী এবং নাট্যরূপায়ন ফাল্গুনী মনোরম হয়েছে।

এই পাঁচটি অধিবেশনের অনুষ্ঠানগুলি সব মিলিয়ে বিচার করে দেখলে সম্মেলনের উদ্দেশ্য যে অনেকাংশে সফল হয়েছে একথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে। রবীন্দ্রসংগীতের যাবতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সংগীত সহযোগে বৈচিত্র্যগুলি রূপায়িত করা হয়েছে এবং এর সঙ্গে সমগ্র ভারতীয় সংগীতের বিবিধ বিষয়ের আলোচনা শোনবার সুযোগও আমাদের ঘটেছে। এই মূল্যবান পরিকল্পনাটির জন্য দক্ষিণীকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংগীতে ডিগ্রী প্রদানের সিদ্ধান্ত

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টি অফ ফাইন আর্টসের এক সভায় সংগীত বিষয়ে স্বতন্ত্র ডিগ্রী পরীক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে সংগীত ও ললিতকলার ক্লাস খোলবার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে একটি সুন্দর ভবন দান হিসেবে পেতে পারেন। এই পরিকল্পনাটিকে রূপ দেবার জন্য আংশিক ব্যয় হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কিছু সাহায্যও পাবেন বলে মনে হয়। ফাইন আর্টস ফ্যাকাল্টির উক্ত সভায় আই-এ এবং বি এ পরীক্ষায় সংগীত ঐচ্ছিক পাঠ্য বিষয়রূপে প্রবর্তন করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে। আর একটি প্রস্তাবে স্থির হয়েছে যে, সংগীত অধ্যাপনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় একটি কলেজ খোলবার উদ্যোগ করবেন। এই উপলক্ষ্যে একটি সংগীত কমিটিও গঠন করা হয়েছে কিন্তু এর মধ্যে প্রকৃত সংগীতজ্ঞের সংখ্যা তেমন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সংগীত সম্বন্ধে স্বল্পাভিজ্ঞ বা একেবারে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও আজকাল পদ এবং খ্যাতির সুযোগে সংগীত সম্বন্ধে নানারকম বেপরোয়া উক্তি করতে আরম্ভ করেছেন। এটাই হোলো বিশেষ ভয়ের কারণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় যদি সত্যিকারের কাজ করতে চান তবে আশা করি তাঁরা এ বিষয়টি ভাল করে ভেবে তাঁদের কাজের জন্য প্রকৃত গুণীজনদের আহ্বান করবেন।

আসরের খবর

মন্মথনাথ মল্লিক স্মৃতিমন্দির

গত ২৯শে মে ৬১।১ পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটে স্বর্গীয় মন্মথনাথ মল্লিকের ৭৫তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীবৃন্দাবন মল্লিক কর্তৃক স্থাপিত সংগীত শিক্ষা কেন্দ্র মন্মথ মেমোরিয়াল হলের উদ্বোধন করেন মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায়। হলটির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ এবং শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বক্তৃতা করেন। সকলেই উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রসারকল্পে মন্মথনাথের প্রচেষ্টার উল্লেখ করে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সাধুবাদের সঙ্গে আনন্দ প্রকাশ করেন। মন্মথনাথের জীবনী পাঠ করে শোনান তাঁর অন্যতম পুত্র শ্রীরাসবিহারী মল্লিক। শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক অভ্যাগতদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীদ্বিজেন মুখোপাধ্যায় উদ্বোধন ও সমাপ্তিতে দুটি রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছেন। উদ্বোধন সংগীতের পর তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় আজকাল মাইকে অভ্যস্ত গায়কদের খোলা গলায় গাইতে অনুরোধ করেন। অনেক সময় সুকণ্ঠ গায়কেরা ইচ্ছাপূর্বক চাপা গলায় গেয়ে থাকেন সামনে মাইক থাকলে এবং পরে সেটা তাঁদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। গায়কদের এই অভ্যাসটি পরিত্যাগ করতে তিনি অনুরোধ জানান এবং উপস্থিত পরিণত বয়স্ক গায়কবৃন্দ (যাঁরা নিজেদের 'অ-মাইক' গায়ক বলে ঘোষণা করলেন) তাঁকে সমর্থন করলেন। এবিষয়ে আমাদেরও সমর্থন আছে। অনুষ্ঠানের পরে ডাগর ভ্রাতৃদ্বয় ধ্রুপদ গেয়ে শোনান। ডাগরদের গানে যথারীতি মাধুর্যের আস্বাদ পাওয়া গেল।

সুর-ছন্দম

গত ৩০শে মে সিংহীভবনে সুর-ছন্দমের প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পর্যায়ের গান গেয়ে শোনানো হয়। কয়েকটি গানের সঙ্গে নৃত্য পরিকল্পনাও ছিল। সংগীতাংশে সুরের দিক থেকে এবং গায়নভঙ্গীতে কিছু কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। "নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জ ছায়ায় সম্বৃত অম্বর" গানটি অতি দ্রুত লয়ে করায় গাম্ভীর্য অতিশয় ক্ষুন্ন হয়েছে। এই ধরনের নূতনত্বের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় নয়। নৃত্যাংশ দুর্বল। এর মধ্যে কয়েকটি গান অবশ্য মন্দ হয়নি। তবে সব মিলিয়ে অনুষ্ঠানটি খুব সাফল্য অর্জন করতে পারে নি।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, কোন্ এক অতীত যুগের কথা শুনছি। যে ভারতবর্ষকে দেখছি, এ যেন সে ভারতের কাহিনী নয়। কোনও এক হিন্দু যুগের। সন্ন্যাসীকে বাধা না দিয়ে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'এসব কত বছর আগের কথা?'

সন্ন্যাসী বলল, 'তা আজ প্রায় পনর ষোল বছর আগের কথা।'

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে রামজীদাসের বয়স কত?'

হেসে বলল সে, 'কত অনুমান করেছেন বাবুজী?'

অনুমান? অনুমান করে নারীর বয়স বলার সাধ্য আমার ছিল না। তবু বললাম, 'বছর পঁচিশ ছাব্বিশ।'

সন্ন্যাসী তেমনি হেসে বলল, 'আরও কম বললে দোষ হত না। কিন্তু বাবুজী, আরও আট দশ বছর বাড়িয়ে দিন।'

আরও আট দশ বছর! চকিতে সেই রূপশিখা মূর্তি ধরে দাঁড়াল আমার সামনে। আশ্চর্য!

শুধু দেহ নয়। মুখখানিতে কোথাও বয়সের দাগ পড়েনি। কম বললে সত্যি ক্ষতি ছিল না।

সন্ন্যাসী বলল, 'মনে আছে, সে যেদিন এল, আমাদের আশ্রমের শূন্য বাগানে যেন ফুল ফুটে উঠল। সন্ন্যাসী হলে তো তার চোখ অন্ধ হয়ে যায় না। হৃদয় মরে যায় না। সে এল। সঙ্গে তার স্বামী। ঝোলা কাঁধে নিতান্ত গেঁয়ো মানুষ। চৈত্র মাস। হরিদ্বারে তখন এমনিতেই ভিড়। কেদারবদ্রির যাত্রীরা আসতে আরম্ভ করেছে। বরফ-গলা জলের ঢল নেমেছে এদিকে-ওদিকে। রুক্মিনির স্বামী মোহান্তের অনুমতি নিয়ে খানা পাকাবার আয়োজন করল আশ্রমে। তারা এসেছে আরও উত্তর থেকে। পূর্ব পাঞ্জাবের সীমানা থেকে। যাবে বদরি-নারায়ণ দর্শনে। আশ্রমের পেছনেই একটি আশ্রমের গুপ্তাবাস ছিল। একটি মস্ত গুহামুখ। সেইখানে নবরাত্র ব্রতের ভিড়। আশ্রমের অনেকে সেখানেই ব্যস্ত। তা ছাড়া ভক্তও এসেছে অনেক। কয়েকজন এসেছে সস্ত্রীক। নবরাত্র ব্রত বড় গোপন বিষয়। তার আয়োজনও চলছিল গোপনে।'

বলে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হঠাৎ হেসে উঠল সন্ন্যাসী। বলল, 'বড় অদ্ভুত মানুষ ছিল রঘুনন্দন। গুপ্তাবাস থেকে বার বার বেরিয়ে আসে, আর মোহান্তর কাছে এসে খালি বসে। আমার সঙ্গে যতবার চোখাচোখি হয়েছে, ততবারই হেসেছে। অস্বীকার করব না, সে হাসি সন্ন্যাসীর শোভা পায় না। সে হাসি গৃহী জোয়ান ছেলের। গোপন প্রেমের। তবে, রঘুনন্দনের মুখে একটা চিন্তাও ছিল বাবুজী। মাঝে মাঝে কালো দেখাচ্ছিল তার আন্ধেরী মুখ। আমি ছিলাম কোতোয়াল। নবরাত্র ব্রতে নিমন্ত্রণ করতে যাব অন্যান্য আশ্রমের সহধর্মীদের। হঠাৎ রঘুনন্দন এসে বলল, 'কোতোয়ালী, আমি চক্রে থাকতে পারব না রাত্রে।' আমি তাজ্জব। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। নিত্য মন্ত্র পাঠ করে, নতুন বেশে সেজেছে সে। নেংটির চেয়ে হাঁটু অবধি গেরুয়া ধারণ তার পছন্দ ছিল। গলায় ছিল ধুমরার মালা। রুদ্রাক্ষের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাল গাঁথা হার। হাতে বদরিকা-কঙ্কণ। আর প্রবালের মালা দিয়ে জড়ানো জটা। আগুনের মত তার গায়ের রংএ ভস্ম মাখা। বুকে, গলায় আর কপালে রক্তচন্দন। যেন সাক্ষাৎ শিব-স্বরূপ। মহাজ্ঞানী রঘুনন্দন। তার ঢিলাঢালা হাসিখুশি চরিত্রের জন্য সে মোহান্ত হতে পারেনি। সন্ন্যাসীর আখড়া আছে। আবার মঠও আছে। সেখানে মোহান্ত কেউ কাউকে করে দিয়ে যায় না। সন্ন্যাসীরা সবাই মিলে যাকে মোহান্ত করে, সেই হতে পারে। কিন্তু মোহান্তের নিজের খুশিতে কাজ চলে না। সন্ন্যাসীদের সকলের মত নিয়ে তাকে কাজ চালাতে হয়। রঘুনন্দনের পক্ষে এমন সম্ভব ছিল না। কিন্তু ধর্মের ইতিহাস ও জ্ঞান পেয়েছিলাম আমরা তার কাছ থেকে। সে বেদান্ত আর বুঝত সকলের চেয়ে বেশী। তার মুখে ওই কথা শুনে আমি ভয়ে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলাম। শুধু বললাম, 'কেন?'

সে বলল, 'আমার কোন উৎসাহ নেই।'

আমি বললাম, 'চক্রে বসলে উৎসাহ পাবে।'

সে বলল, 'তা হয় না কোতোয়ালজী। হৃদয়ের আগল বন্ধ। ভগবান আমার সেবায় খুশি হবেন না।' এমন সময়ে রুক্মিনি এসে দাঁড়াল সামনে। আমাকে নয়, রঘুনন্দনকে নমস্কার করল। রঘু-নন্দন বলল, "নারায়ণো, বেঁচে থাকো।' বলেছিলাম বাবুজী, রুক্মিনি এলে যেন আশ্রমে ফুল ফুটে উঠল। তার রূপ, তার সহজ কথা ও নির্মল হাসি, সকলেরই বড় চোখে লেগেছিল। সে একটু চঞ্চল। ঝরণার মত ছলছল তালে চলে। অল্প-সময়ের মধ্যেই সকলের স্নেহ পেয়েছিল সে। রঘুনন্দনকে দেখে রুক্মিনি নির্বাক

নিথর। চোখে তার আলোর শিখা। তার লজ্জা হল না, ভয় হল না, জোড় হাতে দাঁড়িয়ে রইল সে। শুধু বাতাসে উড়ছে তার খোলা চুল। বাবুজী, রঘুনন্দনের চোখেও দেখলাম তেমনি আলো। সন্ন্যাসীর মুগ্ধতা! সে তো ভাল কথা নয়; কিন্তু দুজনেই কী সুন্দর। আমি জ্ঞানী নই, সাধনা নেই আমার। তবু আমার মনে হল, আমার সামনে স্বয়ং হর-গৌরী রয়েছে দাঁড়িয়ে। আমার সময় চলে যায়। যেতে হবে অনেক দূরের আশ্রমে। আমি চলে গেলাম। আজ নবরাত্রের শেষ রাত্রি। জ্যোত্‌মার্গে যান যেসব সন্ন্যাসীরা, তাঁদের অনেককেই সংবাদ দিতে হবে।

ফিরে যখন এলাম, তখন সাঁঝ উৎরে গেছে। আশ্রম নিঝুম। কিন্তু কাজ-কর্ম চলেছে ঠিক। তখনো সন্ধ্যাপুজো শেষ হয়নি। মন্দিরে ছিল পাথরের শিবমূর্তি। কিন্তু আখড়া চলে বড় নিয়মে। এ সময়ে সন্ন্যাসীর কর্তব্য হল মানসী পুজো। চোখ বুজে ভাবতে হয় গুরুর মূর্তি। কল্পনায় বসাতে হয় মন্দিরের বেদীতে। নিত্য গুরু দর্শনের ওই পন্থা। গুরুর পা ধোয়াবে, অস্নান করাবে, ধানকেশে লেপে দেবে তার সর্বাঙ্গে বিভূতি। পুজো করবে ফুল চন্দন দিয়ে। কি বললে বাবুজী? সন্ন্যাসীর গুরু থাকবে না? সন্ন্যাসীর কি একজন গুরু। তার যে গুরু অগণন। মূল গুরু, শিখা গুরু, বভূত গুরু। সন্ন্যাসীর সাত গুরু। কেউ তাকে দেয় ডোর কৌপীন, কেউ দেয় বিভূতি। কেউ তার শিখা-মুক্তিদাতা গুরু। ষটকর্মের দীক্ষাগুরু হল আচার্য।

এসে দেখলাম, মোহান্ত স্বয়ং মানসী ধ্যানে লিপ্ত। আমাকে বসতে হবে। দেরি হয়ে গেছে। এদিকে হাত-পা-মুখ ভরে গেছে ধুলোয়। আখড়ার কিছু সন্ন্যাসীর চোখে-মুখে একটি চাপা আনন্দ ও ব্যস্ততা। নবরাত্রে অংশ গ্রহণে খুব উৎসুক তারা। কলিকাল কিনা! সন্ন্যাসী হয়েও সুখের মুখ দেখতে চায় সবাই। আসল সাধক আছে কজনা?

ভাবলাম, একবার রঘুনন্দনকে দেখে আসি। মন্দিরের পেছনে গিয়ে দেখলাম, মহা-আয়োজন। জনা পাঁচেক অওরত্‌কে দেখলাম, তারা সকলেই গেরুয়া ধারণ করেছে। জনা বারো গৃহী সাধক এসেছে। তারাও পরেছে গেরুয়া কাপড়। সন্ন্যাসীর বেশে সেজেছে সবাই। সকলেই আমাকে নমস্কার করল। আমি জবাব দিতে পারলাম না। এদের এসব আচার-অনুষ্ঠান আমার কোনদিনই ভাল লাগেনি। আমাদের গুহ্য ষটকর্মে কোনদিনও কোন বাইরের লোক ঢুকতে পায় না। কিন্তু জ্যোত্‌মার্গে বাইরের লোককে ঢোকবার অধিকার দিয়ে গেছে আগের সিদ্ধ-পুরুষেরা। কবে থেকে জানিনে, কিন্তু আমার জীবনে চিরকালই এই নিয়ম চলতে দেখছি।

সে পাথরের নীচের গুহাঘরে ছিল রঘুনন্দন, সেখানটি একেবারে জনহীন। দূর থেকে দেখলাম অন্ধকার। কাছে এসে ঘরে ঢোকবার মুখে থমকে দাঁড়ালাম। দুটি মূর্তি কালো পাথরের গায়ে রয়েছে লেপটে। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, রুক্‌মিনি আর তার স্বামী। আরও অবাক হয়ে দেখলাম, রুক্‌মিনির গায়ে গেরুয়া বসন। বাবুজী, রুক্‌মিনি যে এত সুন্দরী, আঁধার যে জ্যোতিতে ভরে ওঠে রূপে, সন্ন্যাসিনী বেশে তাকে দেখে তা বুঝলাম। আমার চোখের পলক পড়ল না কয়েক মুহূর্ত। রুক্‌মিনির হাসিতে সম্বিত ফিরে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা কি চাও?'

রুক্‌মিনি জবাব দিল, 'আমরা পুজো করব।' আর বলবার দরকার ছিল না। বুঝে নিলাম, রুক্‌মিনির সঙ্গে মুখে হোক, মনে মনে হোক কোন বোঝাপড়া হয়েছে রঘুনন্দনের।

রঘুনন্দনের সঙ্গে দেখা করবার অবসর মিলল না। দেখলাম, দীপ জ্বলে উঠেছে ঘরের দুধারে দুটি। একটি মহাদেবের। অপরটি মহাদেবী কালীর। অন্যান্য সন্ন্যাসী সাধকেরা এসে পড়ল। সেই সঙ্গে ভৈরবীরূপী অওরতেরা। আরম্ভ হল শিব-শক্তি ভৈরবের উপাসনা, তার-পরে প্রসাদ খাওয়া। সে প্রসাদ শুধু জ্যোত্‌মার্গের কুলাচারীরাই সন্ন্যাসী হয়েও গ্রহণ করতে পারে।

রুক্‌মিনি গিয়ে দাঁড়াল রঘুনন্দনের কাছে। রঘুনন্দন তাকে প্রসাদ দিল।

তারপর চক্র মধ্যে যা হয়ে থাকে, তন্ত্রমতে সে সবই আরম্ভ হল।

পরে দুদিন আর আমার সঙ্গে রঘুনন্দনের দেখা হয়নি। এমন কি রুক্মিনিকেও দেখতে পাইনি। রুক্মিনির স্বামীকেও নয়। বাইরে থেকে বিশেষ কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু এ ব্যাপারের পর আশ্রমে কিছু কিছু অনিয়ম দেখা দেয়। ক্রিয়াকাণ্ডে গণ্ডগোল হয়।

তৃতীয় দিনে দেখলাম রঘুনন্দন গঙ্গা থেকে চান করে আসছে। কিন্তু এ সেই আগের রঘুনন্দন নয়। সেই মহাজ্ঞানী হাসিমুখ সন্ন্যাসী নয়। তার সারা মুখে এক অদ্ভুত ভাবের পাগলামী। চোখ আধবোজা। সামনাসামনি হলে বললাম, 'ও' নমো নারায়ণ!' সন্ন্যাসীর মত জবাব না দিয়ে রঘুনন্দন আমার হাত ধরে বলল, 'মহাবীর ভাই।' কথাটা বড় কানে ঠেকল। সাধারণ মানুষের মত এমন গদগদভাবে কথা বলছে কেন রঘুনন্দন। বললাম, 'কি বলছ?'

সে বলল, 'ভাই, নতুন জ্ঞান লাভ করেছি।' অমনি আমারও বুকের মধ্যে আনন্দে ভরে উঠল। জ্যোত্‌মার্গচক্রে নিশ্চয়ই কিছু দর্শন ঘটেছে রঘুর। তাকে হাত ধরে আড়ালে নিয়ে গেলাম। যেমন করে ছোট ছেলে খাবার লুকিয়ে নিয়ে যায়। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি জ্ঞান লাভ করলে?'

রঘুনন্দন বলল, 'তা তো জানিনে।' বলতে বলতে বাবুজী, দেখলাম, তার চোখভরা জল। আর জলভরা মুখে হাসি। চোখের নজর সামনে নেই, পেছনে নেই। উদাসীন স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টি। হঠাৎ চমকে উঠে বলল, 'শুনেছ?'

বললাম, 'কি?'

বলল, 'শুনতে পাচ্ছ না?'

কান পাতলাম। কিছুই তো শুনতে পাচ্ছি না।

রঘুনন্দন বলল, 'শুনতা নহি, চিরিয়া ফুকারতি মিঠে বুলি?'

হ্যাঁ, চারদিকে, গাছে গাছে অনেক পাখী ডাকছে। সে তো সব সময় শুনি।

সে বলল, 'ওই তো সেই আনন্দ মহানন্দ! তুমি শোন সব সময়? কই আমি তো এতদিন শুনতে পাইনি! দেখতে পাইনি ওই আসমান। এমনি পাগল বাতাস তো লাগেনি আমার গায়ে। সহজ করে দেখিনি কোনদিন কিছু। যা সহজ, তাই তো সুন্দর। কিছু দেখলাম না, কিছু শুনলাম না, শুধু ছাই মেখে আখড়া নিয়ে পড়ে আছি। জ্ঞান নিয়ে বড়াই করেছি। জ্ঞান কাকে বলে? বুদ্ধিকে? না, ভুল মহাবীর ভাই। বুকের রস না হলে মাথার ফুল ফোটে না। মাথার সেই ফুলের নাম হল জ্ঞান। শিকড় তার হৃদয়ে। সে হৃদয় আমার অন্ধ ছিল। সে অন্ধ চোখ মেলেছে। যখন প্রাণ মানে না, তখন পূজা আপনি করতে হয়। কিন্তু নিয়মের দাস হয়েছি আমরা। এ আর চলে না। মন্ত্র কি? মন্ত্র কি কেউ শেখায়? সে তো প্রাণ থেকে আপনি উঠে আসে। যে সুরদাস পথে পথে গান গেয়ে বেড়ায়, ওই গানই তো তার মন্ত্র। অমনি সেবা না হলে সব

মিথ্যে। আর অমনি সেবা কেমন করে হয়? যখন সহজে চোখে পড়ে বিশ্বরূপ। সেই বিশ্বরূপে তুমি ভাই মহাবীর।'

আমি চমকে উঠে বললাম, 'এসব কি বলছ রঘুনন্দন?'

সে বলল, 'মিথ্যে বলিনি তো। তুমি, এই মাটি, এই বাতাস, জল, ওই গান-পাগল পাখী, ওই আকাশ। এর মধ্যেই সেই রূপ ফুটে রয়েছে, দেখতে পাইনি এতদিন!'

বললাম, 'শিখাসূত্র ত্যাগী সন্ন্যাসী তুমি, ষটকর্ম শেষ করে পূর্ণ সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত, সৎগুরুর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কালিকানন্দের আখড়াশ্রয়ী অবধূত, এসব কি বলছ?'

রঘুনন্দন বলল, 'ঠিকই বলেছি ভাই। সৎগুরু কেন? গুরু আমার তুমি, এই প্রকৃতি, গুরু আমার রুক্মিনি, এই সংসার, সংসারের সব আদমি আর আওরত। যা অপরূপ, তাই গুরুর রূপ। এর শুরু কোথায় জানিনে। জানিনে শুধু এর শেষ কোথায়।' বলে সে নিজে নিজে গান গেয়ে উঠল। গানে গানে সে বলল, 'ওই যে গঙ্গা বয়ে চলেছে, কত [illegible] তার চোখে। সেই রূপ দেখে ই নাচতে নাচতে চলেছি গঙ্গা। কিন্তু যেখানে তোর শেষ, সেখানে তোর শুরু।

যার বুকে ঝাঁপ দিলি তুই, সে যে অসীম, কুলকিনারাহীন। আমিও তেমনি ঘাটে ঘাটে ভেসে যাব, মন ভরব রূপের হাটে হাটে। বাবুজী রঘুনন্দনের এই রূপ যেন বাওরা সন্তের হাসি-কান্নাভরা বিচিত্র ও অপরূপ। ওই গান সে নিজের মন থেকে বানিয়ে গাইলে। আমার মনে হল, যেন ঠিকই বলছে রঘুনন্দন। মনে হল, ঝুটো আমার এই বিভূতি মাখা, জটা রাখা আর আখড়ায় থাকা। মনে হল, এসব আমার চারপাশের নিগড়। ছুটে ভেঙে বেরিয়ে পড়ি। জানতাম, নিষ্ঠাবান সন্ন্যাসী বলতে যা বোঝায়, রঘুনন্দন ঠিক তা ছিল না। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে তার এই বিচিত্র পরিবর্তন কি করে হ'ল।

সে আবার বলল, 'সব দেখব, তার আগে নিজেকে দেখতে হবে না? মনো রত্নোতি বাজনাৎ। এত কথা তোমাদের বলেছি মহাবীর ভাই, তাকিয়ে দেখি মনের আঁধার যে বড় ভারী। যে তিমিরে কিছুই চোখে পড়ে না। নমোমহত্বং। কিন্তু কোন্ সাহসে নমস্কার করব নিজেকে। খুঁজি, দেখি। এতদিন হরিদ্বারে আছি, তার গাছ পাথরটুকুও দেখিনি কোনদিন নিরালায় বসে। মানুষকে মনে করেছি সব ব্যাটা টাকাখোর আর কামুক। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। যে নিজেকে চেনে না, সে পরকে দেখবে কেমন করে।'

সন্ন্যাসীর কথা, অর্থাৎ মহাবীরের কথা শুনে আমি বিস্ময়ে হতবাক্। সে কি! সন্ন্যাসী রঘুনন্দনের কথা তো দেখছি বাউলের গান হয়ে উঠেছে। এ যে সহজিয়া বাউলের কথা। যেন উঁকি দিচ্ছে বলরাম। রঘুনন্দনের এ সহজ কথা, সহজ ভাব আমার মনকেও নাড়া দিয়ে দিল। হৃদয়ের রস দিয়ে যে জ্ঞানের ফুল ফোটাতে চায় মস্তিষ্কে। রূপে পাগল হওয়া ছাড়া তার গতি কি?

চাঁদ উঠে এসেছে আরও খানিকটা। মাঝে মাঝে মেঘ উড়ে চলেছে চাঁদের মুখ চাপা দিয়ে। হিমালয় থেকে সমুদ্রে, উত্তর থেকে দক্ষিণে তার গতি। মেঘের ছায়া পড়ছে বালুচরে। আলো ঝিকিমিকি বালুর হাসি চাপা পড়ে যাচ্ছে, যেন আচমকা কপট অভিমানে। কিন্তু কী শীত! আর এখনো কত ভিড়। কত কোলাহল।

মহাবীর আবার বলল, 'বাবুজী, রঘুনন্দন চোখের আড়াল হ'ল। মনে এল আমার কুসন্দেহ। ভুলে গেলাম তার প্রাণভোলানো কথা। মনে করলাম, রঘু-চরিত্রে দুর্বলতা ঢুকেছে। কেন? না, তার কথাগুলি যত মনে আসতে লাগল, সবই যেন ওই রূপবতী রুক্মিনির কথা মনে করিয়ে দিল। ও তো কথা নয়, বুঝি কথা দিয়ে রুক্মিনির রূপের আরতি। কপ্নি-আঁটা সন্ন্যাসী অন্তরের সর্বনাশী মায়াজালে ধরা পড়ে মাথার ঠিক রাখতে পারছে না।

ক্রমশঃ

শৈলজানন্দের নতুন ছবি

পরিচালনায় শৈলজানন্দ এখনও রত আছেন দেখে বলা যায় তিনি তার এখন-কার দক্ষতা সম্পর্কে বোধ হয় সচেতন নন। তা যদি হতেন তাহলে 'বাঙলার নারী' দেখে তার আগের দিনের কথা ভেবে মন অনুশোচনায় ভরে তুলতে হতো না। আরম্ভ করেছিলেন তিনি 'বাঙলার সিরাজ' কিন্তু সেইটাই শেষ হয়ে বেরিয়ে এলো 'বাঙলার নারী' হয়ে। অর্থাৎ তিনি গড়তে গিয়েছিলেন এক জিনিস, কিন্তু গড়ে উঠলো আর এক। 'সিরাজ'-কে "নারী"-তে রূপান্তরিত করতে তার মনের সেই খেই হারানো সংশয়নিপীড়িত অবস্থাটা ছবি-খানির মধ্যেও স্পষ্টই ধরা পড়ে যায়। ছবির গোড়ার অর্ধেক অংশে তিনি যা পরিবেশন করেছেন তার মধ্যে "বাঙলার নারী" নামের একটা যাথার্থ ধরে দেওয়া যায়, কিন্তু বাকি অর্ধেকে তিনি দিয়েছেন তাকে "বাঙলার সিরাজ" ... যদিও না আখ্যাত করা যায়, ... "বাঙলার নারী" নামে অভিহিত ... গেলে বাধ্য করাই হবে। ... সমগ্রভাবে ছবিখানি ধরলে তিনি যে ... সামনে এনেছেন সেটির কল্পনায় ... মনের গতি ও পরিণতির এক বিচিত্র ... পাওয়া যায়। ভাবতে ভাবতে ... ফুরিয়ে অন্য পথে চলে যাওয়ার ... দৃষ্টান্তও বড়ো একটা পাওয়া ... না।

*   *   *

যে আখ্যানবস্তু শৈলজানন্দ অবলম্বন ...রছেন, শেষ পর্যন্ত তার প্রতিপাদ্য ...য় দাঁড়ায় এই যে, সিরাজউদ্দৌল্লা ... অতি অলক্ষণে অপয়া ব্যক্তি ... নাম করলে দুর্ভোগের অন্ত ...ক না। একজন সিরাজের ভূমিকায় ...ভনয় করতে গিয়ে পুলিসের খপ্পরে ...ড় আন্দামানে চালান হয়ে গেলো রাজ-...তিক অপরাধে; সেই ব্যক্তির কন্যার ...গ আত্মীয়ার বিবাদ বাঁধলো অন্ধকূপ ...ার কাহিনী মিথ্যা প্রমাণ করতে গিয়ে; ... কন্যার সপত্নীপুত্র মাস্টারের কাছে ...খেলো ঐ একই কারণে এবং শেষে ...লটি মরণাপন্ন অসুখে পড়লো

—শৌভিক—

সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রে অভিনয় করার জন্য প্রস্তুত হতে গিয়ে।

*   *   *

শুধু গল্পকার হিসেবে যদি শৈলজা-নন্দ নিজেকে নিযুক্ত রাখতেন তাহলে অন্য-কোন মাত্রাজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির হাতে পড়ে ছবিখানি হয়তো কিছু হতে পারতো। কারণ এতে গল্প তৈরী করার বস্তুর অভাব নেই, কিন্তু যথাযথভাবে গুছিয়ে পরিবেশন করার মতো দক্ষতার অভাবটাই কাল হয়েছে। একটা দীপ্ত আদর্শ নারী চরিত্র আছে যাকে পেয়ে দর্শক বেশ খানিকটা উদ্দীপনা উপভোগ করতে পারে, কিন্তু শেষপর্যন্ত চরিত্রটির সে-ভাবটা রেখে দেওয়া সম্ভব হয়নি। ছবি আরম্ভতেই একটা অন্ধকূপে সিরাজকে দেখে মনে হয় কোন ঐতিহাসিক চিত্রকাহিনীর সূত্রপাত হলো। মহেন্দ্র গুপ্ত সিরাজ, অভিনয়ে যেন নিজেকেই ব্যঙ্গ করছেন এমনি ভাব, তবে একটু পরেই বোঝা যায় ওটা সত্যিই মঞ্চাভিনয়ই হচ্ছিলো। হঠাৎ পুলিসের আবির্ভাব; এক সশস্ত্র ইন্সপেক্টরের সঙ্গে সিরাজরূপী ব্যক্তির গুলি বিনিময় এবং শেষে আহত হয়ে আত্মসমর্পণ। প্রথমে কথাবার্তায় ঠিক বোঝা যায়না কি ধরনের অপরাধী, পরে আন্দাজ করে ধরে নিতে হয় সিরাজরূপী ভূপতিনাথ সশস্ত্র বিপ্লবী দলের এক নেতা। আন্দামানে যাবার আগে ভূপতিনাথ তার একমাত্র মাতৃহারা সন্তান শিশুকন্যা ভারতীকে রেখে গেল তার এক বন্ধু মাস্টারের কাছে। তারপর এলো দেশের স্বাধীনতা, পূর্ববঙ্গ থেকে শরণার্থীদের ভিড় এবং তারপরই আন্দা-মান থেকে মুক্তিলাভ করে ভূপতিনাথের দেশে প্রত্যাবর্তন। খোঁজ খবর নিয়ে ভূপতিনাথ গিয়ে হাজির হলো পলাশ-ডাঙা উদ্বাস্তু উপনিবেশে, যার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে তার পূর্ববন্ধু মাস্টার; ভারতীরও দেখা পাওয়া গেল সেখানে। ভারতী তখন তরুণী; উপনিবেশেরই এক কবি চরণদাকে সে ভালোবাসে। উপনিবেশ স্থাপন করার জন্য সেখানকার জমিদার বিনা সর্তে উদ্বাস্তুদের জমি দান করেছিলেন, কিন্তু এক নতুন ম্যানেজার এসে উদ্বাস্তুদের জমিতে জল সরবরাহের উপায় বন্ধ করে সংকটের সৃষ্টি করে দিলে। উপনিবেশের পক্ষ থেকে ভারতী নিজে গেল জমি-দারের সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু জমিদারের ঘরে কথা বললো তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। জমিদার-গৃহিণী জানালে যে, উপনিবেশিকদের চাষের জমিতে জল

সরবরাহের পথ খুলে দেওয়া যেতে পারে এক সর্তে, ভারতী যদি তার মাতদার দাদাকে বিয়ে করে। এতগুলো লোকের উপকারের কথা চিন্তা করে ভারতী তার পিতা ও প্রতিপালক মাস্টারকাকার কথা অগ্রাহ্য করে বিয়েতে রাজী হলে। বিয়ে হলেও ভারতী তার জমিদার স্বামীর মন অধিকার করতে পারলে না। সপ্তদ্বীপের রাজার শিক্ষয়িত্রী রেণুর ওপরেই তার স্বামীর যেন আকর্ষণ বেশী। রেণু অন্ধকূপ হত্যা যে মিথ্যে এটা মানতে রাজী নয়, এই নিয়ে ভারতীর সঙ্গে তার ঝগড়া, ফলে ভারতী তাকে বরখাস্ত করলেও রেণু তার দাপটের কথা অপ্রকাশ রাখলে না। ওদিকে ভারতী তার স্বামীকে বশে আনতে না পারায় পলাশডাঙার সেই জমিদার-গৃহিণী তার প্রতিশোধ নিলে উপনিবেশে আগুনে ধরিয়ে দিয়ে। আগুনে উপনিবেশ পুড়ে ছাই হলো, আর ভূপতিনাথও আহত হয়ে মারা গেলো। ভূপতিনাথকে দেখবার জন্য চরণ গিয়েছিল ভারতীকে নিয়ে আসতে; চরণের সঙ্গে ভারতীর হৃদ্য কথাবার্তা আড়াল থেকে শুনে ভারতীর স্বামী লালমোহন ওদের মধ্যে অবৈধ প্রণয়ের সম্পর্ক আন্দাজ করে নিলে এবং সেজন্য ভারতীকে লাঞ্ছিতও করলে। অপমানে চরণ একাই ফিরে গেল। ভারতী রাজাকে সঙ্গে নিয়ে তার বাবাকে দেখতে যাত্রা করলে।

* * *

এই পর্যন্ত যেমন-তেমনভাবে দৃশ্য তোলা হলেও অন্তত গল্পটা একটা পথ ধরে এগিয়ে এসেছে, অনেক বিপরীতধর্মী ঘটনা থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু এর পর গল্প আর বাগ মানেনি, এলোমেলো যেদিক দিয়ে পেরেছে 'সমাপ্ত' এনে দেওয়া পর্যন্ত লাফা-লাফি করেছে। এরপরের সব ঘটনা একে-বারে হঠাৎ এসে হাজির হয়েছে। ভারতী রাজাকে নিয়ে উপনিবেশে পেণছলো কিন্তু বাবার সঙ্গে শেষ দেখা হলো না। এরপর দেখা গেলো মাস্টার এক গ্রামের স্কুলের হেড মাস্টার; রাজা একা তার বাবার কাছে ফিরে যেতে চায় না, আর ভারতীও তার স্বামীর কাছে ফিরতে চায় না, ফলে উভয়েই মাস্টারের কাছে থেকে গেল। রাজা স্কুলে ভর্তি হলো। প্রথম দিনেই ক্লাসে ওর হাত থেকে পাওয়া গেল 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি-খাতা। ভারতীর বাবার লেখা ভারতীই রাজাকে দিয়েছিল পড়তে। শিক্ষক রাজাকে সিরাজউদ্দৌলা সম্পর্কে জেরা করতে লাগলো, রাজাও জবাব দিলে ঠিকভাবেই, কিন্তু বিতর্ক বাঁধলো অন্ধ-কূপ হত্যার কথা নিয়ে। শিক্ষক বলে ঘটনা সত্যি, রাজা দৃঢ়ভাবে বলে ঘটনা মিথ্যে। চোটপাট করায় রাজা মার খেলে। শিক্ষক পরদিন তার অনুতাপ প্রকাশ করে জানালে যে, নাটকখানি সেও পড়েছে এবং স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ উৎসব উপলক্ষে ছেলেদের দিয়ে ওটা অভিনয় করাবে আর রাজাই সাজবে সিরাজ।

* * *

ওদিকে ভারতীর স্বামী লালমোহন ওদের কোন খোঁজ না পেয়ে প্রায় হতাশ হয়ে মদ্যপান আরম্ভ করলে। একদিন রেণু হাজির। জানা গেল রেণু লাল-মোহনের মৃতা স্ত্রীর সহোদরা এবং লাল-মোহনকে পাবার তার লোভ ছিল, কিন্তু মুখফুটে সে কথা জানাতে পারেনি; রেণু লালমোহনের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে চলে গেল। হঠাৎ একদিন ভারতীর চরণদা এসে জানিয়ে গেল যে, ভারতী আর তার সম্পর্কে লালমোহন যা ভেবেছিল সেটা মিথ্যে, ভারতী তার সহোদরা সমা। লালমোহনের চোখ খুললো এবং ওদের খোঁজ না পেয়ে মদ খাওয়া বাড়িয়ে দিলে। ভারতীদের দিকে, রাজা দিনরাত সিরাজের ভূমিকায় মহড়া দিতে দিতে টাইফয়েডে পড়ে গেলো। স্কুলের আর একজনকে ঠিক করা হলো ভূমিকাটিতে অভিনয় করার জন্য। ওদিকে স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় লালমোহন রাঁচীতে যেতে ট্রেনে আমড়া-তলার মাতাল জমিদারের সঙ্গে দেখা। খুব হৈচৈ করে দুজনে ট্রেনে চললো। ঘটনাগতিকে লাল-মোহনকেও আমড়াতলায় নামতে হলো। লালমোহন বন্ধু জমিদারের সঙ্গে হাজির হলো সেখানকার স্কুলের পারি-তোষিক বিতরণ উৎসবে। সিরাজউদ্দৌলা অভিনয় করবে ছেলেরা। অভিনয় চলতে লাগলো। ওদিকে রাজা অসুখের ঘোরে প্রলাপ বকতে বকতে বিছানা ছেড়ে অভিনয় ক্ষেত্রে হাজির হয়ে জ্ঞানহারা হয়ে লুটিয়ে

পড়লো। লালমোহন ছেলেকে পেয়ে আশ্চর্য হলো; ভারতী রাজার খোঁজে ছুটে এসেছিল পিছু পিছু, স্বামীর সঙ্গে দেখা হলো। মনে হয়েছিল রাজার বোধহয় জ্ঞান ফিরবে না; কিন্তু শেষ-পর্যন্ত জ্ঞান ফিরলো। লালমোহন স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে গৃহে ফিরলো।

* * *

গোঁজামিলের আর অন্ত নেই। প্রথম উদ্বোধন দৃশ্যেই আম্রকানন দেখে বোঝার উপায় নেই যে ওটা মঞ্চেরই একটা দৃশ্য। পুলিশ এসেই গুলি ছুঁড়তে লাগলো, আর ভূপতিনাথ গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালাচ্ছে তারই মাঝে পুলিস দেখে পালাবার সময় হুটোপাটিতে পা মাড়িয়ে দেওয়া নিয়ে দর্শকদের মধ্যে ঝগড়া, সাড়ীপরা বাড়ী-ওয়ালাকে নিয়ে খানিকটা তামাসার দৃশ্য। ভূপতিনাথ আহত হবার পর ইন্সপেক্টরের সঙ্গে ফাঁসী অথবা দ্বীপান্তর নিয়ে বিতর্ক। সেই কবেকার কথা কিন্তু টেলি-ফোনের রিসিভারটা হালফিলের। যাই-হোক, স্বাধীনতা পাবার পর ভূপতিনাথ ছাড়া পেয়ে আসতে তাকে তার কন্যা ও মাস্টারকে খুঁজে নিতে হবে কেন? আন্দামানে থাকতেই তো চিঠির দ্বারা এদের খবর রাখতে পারতো। মাস্টার যে পূর্ববঙ্গে ছিল তাতো বোঝা গেল না, অথচ দেখা গেলো সে-ও শরণার্থীদের দলে ভিড়ে গিয়েছে। পলাশডাঙার জমিদার উদ্বাস্তুদের জমি দান করে, শেষে কেন ম্যানেজারকে দিয়ে উৎখাত করতে চাইলে? জমিদার গৃহিণীর ভারতীর ওপরে সর্তও কি অদ্ভুত! আর ভারতী তার সর্ত মেনে নেবার পরও উপনিবেশ জ্বালিয়ে দেওয়া কেন? ভূপতিনাথকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলে কাহিনীর কি আরব্ধ সাধিত হলো! যে মাস্টার উপনিবেশ গড়ে তুলবে বলে তার আগের চাকরি এমন কি ঘর-বাড়ী ছেড়ে উদ্বাস্তুদের দলে জুটেছিল, উপনিবেশ পুড়ে যাবার পর সে সব ছেড়ে এক গ্রামে হেডমাস্টারি নিয়ে স্থিতি হয়ে গেলো কি করে! অন্য সব উদ্বাস্তুদেরই বা কি হলো? ভারতী যে ওদের জন্যে অতো বড়ো ত্যাগ স্বীকার করলে তার কি প্রয়োজন ছিল যদি গল্পে সেই উদ্বাস্তুদের কথা একেবারে চেপেই যাওয়া হলো? ভারতী রাজাকে নিয়ে এসে উঠলো মাস্টারকাকার আশ্রয়ে। লালমোহন ওদের খোঁজে একজায়গায় লোক পাঠিয়েই হতাশ হয়ে গেলো, এই বা কি কথা! আর রাজাকে তার পিতার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ারও ভারতীদের তেমন জোর অভিপ্রায়ও দেখা গেলো না। রাজা অসুখে পড়লো, একেবারে টাইফয়েড, কিন্তু তখনও তার বাবার কাছে খবর গেলো না। রাজা প্রলাপের ঘোরে স্কুলে এসে মঞ্চে প্রবেশ করে সিরাজের ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে জ্ঞানহারা হয়ে লুটিয়ে পড়লো; লালমোহন বসে অভিনয় দেখছে কিন্তু তখনও ছেলেকে চিনতে পারলে না, পারলে কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখবার পর। ভারতীও রাজার পিছন পিছন এসে তাকে অজ্ঞান অবস্থায় পাবার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকেও সেখানে দেখেই ছুটে বেরিয়ে এলো সেখান থেকে, রাজাকে ঐ অবস্থায় ফেলে রেখেই। পরেও রাজাকে যখন বাড়ীতে এনে শুইয়ে রাখা হয়েছে তখন ভারতী তার কাছে না থেকে রয়েছে বারান্দায়। আরও পরে রাজার জ্ঞান ফিরে আসতেই ভারতী এলো তার পাশে আর তক্ষুনি লালমোহনের প্রথম কথা হলো ভারতীকে বাড়ী যাবার জন্য অনুরোধ; ছেলের অসুখ প্রসঙ্গে কোন কথাটি নয়, এমন কি কোন বিস্ময় প্রকাশও নেই! আরও কতো যে অসঙ্গতি তা বলে শেষ করা যায় না।

* * *

ছবিখানিতে নাট্যরস ও হাস্যরস উপ-ভোগের কয়েকটি পরিস্থিতি আছে। পলাশডাঙ্গার জমিদারের কাছে জমিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়ে দেবার জন্য ভারতীর প্রতিনিধিত্ব করতে যাওয়া, এবং

পরে জমিদার গৃহিণীর সর্তে রাজী হওয়ার অংশটিতে বেশ একটি দীপ্ত তেজস্বিনী এবং পরার্থে আত্মত্যাগী আদর্শ নারী চরিত্র পাওয়া যায় যা উদ্দীপনা এনে দিতে পারে। ভারতীর তেমনি দীপ্তি ফুটে উঠেছে লালমোহনের সংগে বিয়ের পর স্ত্রীর অধিকার পাওয়া নিয়ে সংঘাতময় কয়েকটি দৃশ্যে। এ দৃশ্যগুলি জমেছে এবং সেজন্যে বেশীটা কৃতিত্ব অভিনয় শিল্পী মঞ্জু দের। অভিনয়শিল্পীদের জন্যে হাল্কা রসের কয়েকটি দৃশ্যও জমেছে, যেমন পশুপতি কুণ্ডু জমিয়েছেন আন্দামান ফিরত ভূপতিনাথকে ভারতীদের পাত্তা বলে দেওয়া নিয়ে। পলাশডাঙগার বৃদ্ধ জমিদার, যে ভৃত্যের পিঠে তেল মালিশ করে নিজে আরাম পায়, এই দু'টি চরিত্রে যথাক্রমে তুলসী লাহিড়ী ও আশু বোস হাসবার সুযোগ দেন। আর একটা হাসির পরিস্থিতি লালমোহনের রাঁচী যাবার সময় ট্রেনে আমড়াতলার জমিদারের সংগে—যথাক্রমে ছবি বিশ্বাস এবং প্রমোদ গাংগুলি চরিত্র দু'টিতে অভিনয়

করেছেন। তবে দৃশ্যগুলি প্রয়োজনের চেয়ে বেশী মাত্রায় প্রযুক্ত হওয়ায় গল্পকেও দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। গোড়া থেকে একটা সামঞ্জস্য রেখে অভিনয় করে গিয়েছেন মাস্টারের ভূমিকায় ভূপেন চক্রবর্তী। আর অভিনয়ে আছেন রবীন মজুমদার, করবী গুপ্তা, অপর্ণা দেবী, মাস্টার সুখেন প্রভৃতি। খানতিনেক গান আছে কিন্তু প্রযুক্ত হয়েছে বম্বের মতো বেমক্কাভাবে। কলাকৌশলের কোনদিকেরই প্রশংসা করার কিছুই নেই।

হাসির ছবির রকম একই

বাঙলা চলচ্চিত্রে হাসির ছবির এখন যেন একটা বৈ আর দ্বিতীয় কোন কাঠামো নেই। সেই যে 'বরযাত্রী' পাড়ায় রকবাজ ছেলেদের প্রেম অভিসার দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল তারপর যতো হাসির ছবি তৈরী হয়েছে তার সবগুলিই মূলত প্রায় ঐ একই কাঠামোর ছাঁচে তৈরী। সেই সেয়ানা বয়েসের ছেলেমেয়েদের ফষ্টিনষ্টি, ধাপ্পা ধোঁকা, দলাদলির হুল্লোড়। অবশ্য সব কাণ্ডই কোন মেয়েকে বিয়ে করা নিয়ে। তবে তফাৎ হচ্ছে "বরযাত্রী"-তে পাকা সাহিত্যিকের মৌলিক ইনটেলেক্টের যে পরিচয় ছিলো অন্যগুলোতে সেজায়গায় দেখা দেয় কাঁচা মাথার অসঙ্গতি আর অপ্রকৃতি। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে তোলা "লেডিস সীট"-ও এর ব্যতিক্রম নয়। এ ছবিখানি "পাশের বাড়ী"-র স্রষ্টারই এক কীর্তি তবে নিউ থিয়েটার্সে তোলার জন্য ছবির আংগিক পারিপাট্যটাই যা আগের চেয়ে উন্নততর হয়েছে, নয়তো মৌলিক জিনিস পরিবেশনে এ ছবিখানি কাহিনীকার প্রযোজক পরিচালক অরুণ চৌধুরীর আগের মতো নয়। কেমন একটা আলতো-ভাব, দেখতে দেখতে হাসি আসে অনেকবার, কিন্তু রস উপভোগটা এমন হয় না যে খানিকটা বাড়ী পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, বা পরে আলোচনা প্রসংগে আবার হাসি উথলে উঠতে পারে।

আগেকারই সেই সব পাড়ার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ব্যাপার। রাস্তার নাম পদ্দী-ঠানদির গলি; বাড়ীর নম্বর ফরটি-নাইন। বাড়ির মালিক ল্যাংচা মামা তার সংগে থাকে চিংড়ী ভাগনে। সামনের বাড়ির মিনুরাণীকে চুয়াল্লিশখানা চিঠি পাঠিয়েও ল্যাংচা প্রেম জমাতে পারেনি, মিনুর অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়। মেয়েদের ওপর চটে গিয়ে ল্যাংচা মাছ মাংস সব ছেড়ে গেরুয়া পরে রাধেকৃষ্ণ বুলি অবলম্বন করলে। একদিন ওদের বাড়িতে ভাড়াটে এলো ক্ষিতীশবাবু, তার স্ত্রী লক্ষ্মী ওরফে লাকি, ষোড়ষী কন্যা বেবী আর অকালপক্ক বালকপুত্র সানি। লক্ষ্মী-দেবী একটু "আধুনিকা" হয়ে থাকতে চান ফলে মাস্টারি করা রোজগারে ক্ষিতীশ-বাবু ঋণের দায়ে ব্যতিব্যস্ত। বেবীকে দেখেই ল্যাংচার মন একটু চনমন করে উঠলেও কোন রকমে সামলে থাকার চেষ্টা করতে লাগলো। ওদিকে পাড়ার ছেলে ধাপ্পাবাজ পরেশ আস্তে আস্তে এদের সংগে বেশ জমিয়ে তুললে। লক্ষ্মী দেবী জানলেন পরেশের মস্ত জমিদারী কলকাতায় খানকতক বাড়ি। বেবীকে তিনি এমন সুপাত্রটির প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতে লাগলেন। ওদিকে চিংড়ীর উস্কানীতে ল্যাংচা তলে তলে বেবীকে হাত করার অন্য ফন্দী করলে। একদিন ক্ষিতীশবাবুকে রাস্তায় পাওনাদারের হাতে অপদস্ত হতে দেখে ল্যাংচা তার সব দেনা শোধ করে দিলে, আর কেউ জানলে না সে কথা। কিন্তু বাড়িতে লক্ষ্মী দেবী বেবী ও সানির উৎপাতের অন্ত রইলো না। স্নানঘর সারাদিন বেবীদের দখলে: চিংড়ী একটা 'গেঁড়াকল' তৈরী করে ওদের শায়েস্তা করলে। বেবীরা ওর শোধ নিতে গেলে ছাদে গিয়ে দমাদাম শব্দ করে ল্যাংচাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে। চিংড়ী ওদের জব্দ করলে ভূত

সেজে ভয় দেখিয়ে। ছাদে তালা পড়লো। ক্ষিপ্ত হয়ে পরেশ ল্যাংচাদের শিক্ষা দেবার জন্য পাড়ার দলবল নিয়ে মহা ঝামেলার সৃষ্টি করলে। বেবীরাও ভয়ানক ক্ষেপে উঠেছে ঠিক তখনই জানা গেল যে, ল্যাংচা বেবীর বাবার কাছ থেকে ভাড়া তো নেয়ই না, উপরন্তু তার সব দেনা শোধ করে দিয়েছে। সেই থেকেই বেবীর নজর পড়লো ল্যাংচার ওপরে। ল্যাংচাও ভোল পালটে ফেললে; দাড়ীগোঁফ কামিয়ে এলো। গেরুয়ার বদলে বেবীর হাতের সেলাই করা পাঞ্জাবী চড়লো ল্যাংচার গায়ে। বেবী কাটলেট ভেজে দেয়, ল্যাংচা খেয়ে তারিফ করে। চিংড়ী মামার কাণ্ড দেখে অবাক হয়। বেবী হাতছাড়া হয়ে যায় দেখে পরেশ তার ঠাকুমার কাছে আবদার জানালে বেবীকে বিয়ে করতে না পেলে সে বিবাগী হয়ে যাবে। পরেশের বাবার ধারণা ছিল বেবীরা মস্ত বড়োলোক, ছেলের বিয়েতে একটা দাঁও মারবেন আর সেইসঙ্গে ল্যাংচা ক্ষিতীশবাবুর যেরকম কথা শোনে তাতে চেষ্টা করে ল্যাংচার কাছে বন্ধক রাখা বাড়ির কবালাটাও বাগিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু সে ফন্দী খাটলো না উল্টে পরেশের বাবা বেবীর কাছে অপমানিত হয়ে ফিরে গিয়ে তার জ্বালা মেটালে পরেশকে রাস্তায় পেয়ে কষে চড়িয়ে দিয়ে। পরেশ ক্ষেপে গিয়ে দল নিয়ে হাজির হলো ল্যাংচাদের মেরে ঠাণ্ডা করতে। এতদিনে ল্যাংচা তার অহিংস ব্রত ত্যাগ করে হিংস্র হয়ে ঘুষি বাগিয়ে পরেশদের সামনে এসে দাঁড়ালো। ঘুষোঘুষির হুল্লোড়ে সবাই কাৎ এবং একে একে পৃষ্ঠদেশ পরিদর্শন। ল্যাংচা হিড়হিড় করে বেবীর হাত ধরে টেনে একেবারে হাজির হলো ক্ষিতীশবাবুর সামনে এবং নিজেই বিয়ের প্রস্তাব পেশ করে দিলে।

ছেলেমানুষি দেখে যে ধরনের হাসির উদ্রেক হয় তার বেশী কিছু পাওয়া যায় না পরিণত বয়সের দর্শকদৃষ্টিতে। রস-বুদ্ধির জেল্লা নেই, না গল্পেতে, আর না গল্পের বাঁধুনীতে। অবশ্য সেয়ানা বয়সের ছেলেমেয়েদের কাছে ছবিখানি উপভোগ্য হবার উপাদান যথেষ্টই আছে। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় আর ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য রয়েছেন যথাক্রমে ল্যাংচা চিংড়ী ও পরেশের চরিত্রে। ওদের সঙ্গে বেবীর ভূমিকায় রয়েছেন মায়া মুখোপাধ্যায়। 'জ্যাঠা ছেলে' সানির ভূমিকায় বিভুও কম হাসায় না। লক্ষ্মী দেবীর ভূমিকায় রাজলক্ষ্মীর বিকৃত উচ্চারণ করে ইংরিজী বলাও হাসাবে। কথাবার্তায় ইংরিজীটা একটু বেশী বলা হয়েছে। তাছাড়া ক্ষিতীশবাবুর ভূমিকায় তুলসী চক্রবর্তীও কম হাসাবেন না। অভিনয়ে আরও আছেন হাসাবার জন্যে যেমন অজিত চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, হরিমোহন বসু, আশা দেবী, নরেশ বসু প্রভৃতি। আলোকচিত্র ও শিল্পনির্দেশে ভালো কাজ দেখিয়েছেন যথাক্রমে নির্মল গুপ্ত এবং সুনীতি মিত্র। গান সুবিধের নয়, আর আবহসংগীত পরিচালনায়ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য সবচেয়ে অসার কাজ দেখিয়েছেন।

খেলার মাঠে

একলব্য

আবার কলকাতা ময়দানের বুকে গণ-বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। অবশ্য রাজনৈতিক বিক্ষোভ নয়, এ বিক্ষোভের মধ্যে সে প্রচণ্ডতাও প্রত্যক্ষ করা যায়নি। আমরা খেলার মাঠের দর্শক-বিক্ষোভের কথাই উল্লেখ করছি। গত মঙ্গলবার ক্যালকাটা মাঠে এবং ক্লাব-তাঁবুতে নির্বিচারে ইটপাটকেল ও জুতো বিক্ষিপ্ত হওয়ার ঘটনা ময়দানের কলঙ্কমলিন অধ্যায়েরই এক অতীত ছবি, তবে এর মধ্যে রাজনীতির একেবারেই গন্ধ ছিল না, একথা বলা যায় না। দলের প্রাধান্য বজায়ের চেষ্টাই তো রাজনীতি। খেলার ক্ষেত্রেই বা এর ব্যতিক্রম কোথায়? জনপ্রিয় দলের জয়লাভের আশা তিরোহিত হলেই দল-সমর্থক জনতার জাগ্রত রোষে শান্তিকামী দর্শকদের জীবন সংশয় হয়ে ওঠে। গত মঙ্গলবার রাজস্থান এবং ইস্টবেঙ্গলের লীগের খেলায় তারই প্রমাণ পাওয়া গেছে। অথচ এই অশোভন আচরণের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। রেফারীর পরিচালনায়ও কোন ত্রুটি ছিল না। আর যদি রেফারীর কোন ভুলচুক হয়েই থাকে তবে স্মরণ রাখতে হবে রেফারীও মানুষ,—তাঁর শরীরও রক্তে মাংসে গড়া। সুতরাং তার সব সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত হবে এমন আশা করা বৃথা। তবে এ অশোভন বিশৃঙ্খল আচরণ কেন? খেলোয়াড় গোলের সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করলে আমরা তাকে ক্ষমা করতে পারি, ক্লাব পরিচালক ভুল করলে তার প্রতি সম্মান দেখাতে পারি, আই এফ এ'র স্বেচ্ছাচার সহ্য করতে পারি, খেলার মাঠে পুলিশের বেটন এবং পুলিশ-বাহন অশ্বের ক্ষুর-তাড়নাও মুখ বুজে সহ্য করি কেবল সহ্য করি না রেফারীর ভুলচুক। এটা ব্যাধি —না সুস্থ মস্তিষ্কের বিকার?

* * *

সুইজারল্যাণ্ডে বিশ্ব ফুটবলে প্রতিযোগিতার মূল খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। ২১শে জুন থেকে লণ্ডনে আরম্ভ হচ্ছে উইম্বলডন টেনিস। উইম্বলডন টেনিস বিশ্ব প্রাধান্য প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। বিশ্বের যে কোন শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়েরই উইম্বলডন বিজয়ের স্বপ্ন জীবনের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কামনা। কোন খেলোয়াড় দুবার উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করতে পারে না বলে একটা প্রবাদ আছে। আমেরিকার কীর্তিমান খেলোয়াড় বিল টিলডেন অবশ্য ১৯২০ ও ১৯৩০ সালে উইম্বলডন বিজয়ী হয়ে এ প্রবাদবাক্যের অসারতা প্রমাণ করে ছিলেন। কে জানে, যুক্তরাষ্ট্রের অপর খেলোয়াড় বাজ পেটি এবার আবার টিলডেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন কি না? রয়টারের টেনিস সমালোচক অবশ্য টনি ট্রাবার্ট অথবা লুইস হোডেরই চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করবার সম্ভাবনা বেশী বলে মন্তব্য করেছেন। ট্রাবার্ট ও যুক্তরাষ্ট্রের খেলোয়াড়। হোড অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী। সমগ্র বিশ্বের প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী হবেন, অল্পদিনের মধ্যেই তা প্রত্যক্ষ করা যাবে।

* * *
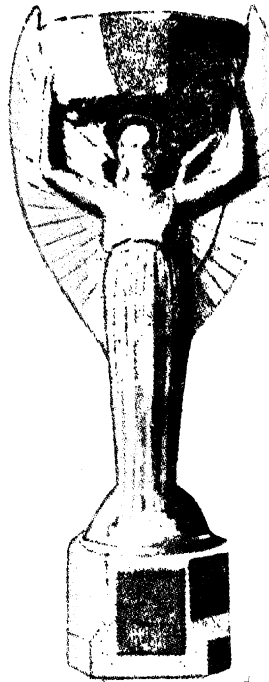
বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দেশের পুরস্কার—জুলেস রিমেট কাপ। সম্প্রতি সুইজারল্যাণ্ডে ১৬টি শক্তিশালী দলের মধ্যে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার মূল খেলা আরম্ভ হয়েছে

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার বিজয়ী দেশ যে পুরস্কারের অধিকারী তার না[ম] 'জুলেস রিমেট' কাপ। এফ আই এফ এ অর্থাৎ ফেডারেশন অব ইণ্টারন্যাশন্যাল ফুটবল এসোসিয়েশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৩০ সাল থেকে ৪ বছরের ব্যবধানে বিশ্ব প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। দ্বিতীয় যুদ্ধের মহা প্রলয়ের জন্য ১৯৪২ ও ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠান বন্ধ ছিল। ১৯৫০ সালে শেষবার ব্রেজিলে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা পরিচালিত হয়েছে। সুতরাং এবার বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার পঞ্চম অনুষ্ঠান। ১৯৫০ সালে ভারত ফুটবলের এই শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবার সংকল্প গ্রহণ করেও শেষ পর্যন্ত নাম প্রত্যাহার করে। ভারত এবারও অংশ গ্রহণ করেনি।

অলিম্পিক ফুটবলের সঙ্গে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার পার্থক্য—অলিম্পিক শুধু শৌখীন খেলোয়াড়দের জন্যই সীমাবদ্ধ। পেশাদার খেলোয়াড় অর্থাৎ খেলাকেই যারা জীবনের বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন, অলিম্পিকে তাঁদের যোগদানের অধিকার নেই; কিন্তু বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা বাধানিষেধ-হীন, সবার জন্যই উন্মুক্ত। সেজন্য এ প্রতিযোগিতা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা। সমস্ত বিশ্বের ফুটবল প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব যাচাই করবার উদ্দেশ্যেই ১৯২৮ সালে এফ আই এফ এ'র লুক্সেমবার্গ অধিবেশনে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। 'ফিফা'র ১৯২৬ সালের পরম ক্রীড়ানুরাগী সভাপতি মিঃ জুলেস রিমেটের নামানুসারে পুরস্কারের নামকরণ করা হয় "জুলেস রিমেট" কাপ।

বহু দেশ বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করায় আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রাথমিক খেলার পর ১৬টি দেশকে নিয়ে মূল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে সমস্ত সংবাদই দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন শক্তিশালী হাঙ্গেরী দল এবার জুলেস রিমেট কাপ বিজয়ী হবে সকলে আশা করছে। বিশেষ করে ইংলণ্ডকে ৭—১ গোলে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করবার পর হাঙ্গেরীর শক্তি সম্পর্কে কারো মনেই আর সন্দেহের অবকাশ নেই। ১৯৫০ সালের বিজয়ী উরুগুয়ে তার পুরানো শক্তি হারিয়ে ফেলেছে বলে ক্রীড়াসমালোচকরা মনে করেন। ব্রেজিল, অস্ট্রিয়া এবং চেকোশ্লোভেকিয়ারও জয়লাভের সম্ভাবনা আছে। নীচে পূর্বেকার ফাইন্যালের ফলাফল ও ১৯৫০ সালের সমগ্র প্রতিযোগিতার অবস্থা দেওয়া হলঃ—

ইস্টবেংগল ও বি এন রেল দলের লীগ খেলার একটি দৃশ্য। রেল দলের গোলরক্ষক পি ভট্টাচার্য ডাইভ দিয়ে একটি বল 'ফিস্ট' করবার পর ব্যাক ক্লডিয়াস বলটি ক্লিয়ার করছেন। ডানদিকে নারায়ণকে দেখা যাচ্ছে। নারায়ণ এইদিন ইস্টবেংগলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড খেলেন

১৯৩০ সালের ফাইন্যাল

উরুগুয়ে (৪) আর্জেণ্টিনা (২)

১৯৩৪ সালের ফাইন্যালে

ইটালী (২) চেকোশ্লোভাকিয়া (১)

১৯৩৮ সালের ফাইন্যাল

ইটালী (৪) হাঙ্গেরী (২)

১৯৫০ **সালে বিশ্ব প্রতিযোগিতার শেষ পর্যায়ের খেলার ফলাফল**

'এ' গ্রুপ

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পয়েঃ
ব্রেজিল	৩	২	১	০	৮	৩	৫
যুগোশ্লেভিয়া	৩	২	০	১	৭	২	৪
সুইজারল্যাণ্ড	৩	১	১	১	৪	৬	৩
মেক্সিকো	৩	০	০	৩	২	১০	০

'বি' গ্রুপ

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পয়েঃ
স্পেন	৩	৩	০	০	৬	১	৬
চিলি	৩	১	০	২	৫	৪	২
ইংল্যাণ্ড	১	১	০	২	২	২	২
ইউ এস এ	৩	১	০	২	২	৮	২

'সি' গ্রুপ

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পয়েঃ
সুইডেন	২	১	১	০	৫	৪	৩
ইটালী	২	১	০	১	৪	৩	২
প্যারাগুয়ে	২	০	১	১	২	৪	১

'ডি' গ্রুপ

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পয়েঃ
উরুগুয়ে	১	১	০	০	৮	০	২
বলিভিয়া	১	০	০	১	০	৮	০

ফাইনাল টেবল

উরুগুয়ে	৩	২	১	০	৭	৫	৫
ব্রেজিল	৩	২	০	১	১৪	৪	৪
সুইডেন	৩	১	০	২	৬	১১	৪
স্পেন	৩	০	১	২	৪	১১	১

(উরুগুয়ে দল অপরাজিত থেকে জুলেস রিমেট কাপ লাভ করে)

* * *

ইংলণ্ডের কাউণ্টি দলগুলির বিরুদ্ধে পাকিস্থান ক্রিকেট দলের অভাবনীয় সাফল্যের ফলে ইংলণ্ড ও পাকিস্থানের প্রথম টেস্ট খেলার উপর সমগ্র ক্রিকেট বিশ্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল; কিন্তু বিধি বাম। বরুণ-দেবের করুণ প্রকোপ আপাতত উভয় পক্ষেরই মান বাঁচিয়েছে। বৃষ্টির ফলে 'লর্ডস' মাঠ তিনদিনই জলে ডুবে রইলো। টেস্ট খেলার ইতিহাসে এটা অভূতপূর্ব ঘটনা। পাঁচদিন-ব্যাপী খেলার অনুষ্ঠানে প্রথম তিনদিনের মধ্যে খেলা আরম্ভ না হবার দ্বিতীয় নজির খুঁজে পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডে এমন বৃষ্টিও নাকি কম হয়েছে। ওদেশে আমাদের দেশের মত মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে না। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যেও খেলা চলতে থাকে। বৃষ্টির বেগ একটু বাড়লে দু' পক্ষই 'পাততাড়ি' গুটিয়ে প্যাভিলিয়নে ঢুকে পড়ে, আবার বৃষ্টি থামতেই ব্যাটবল হাতে বেরিয়ে আসে। কিন্তু এবার তিনদিন ধরে এত জল হয়েছে, যার ফলে লর্ডস মাঠের নীচু দিকের জমানো জলে হাঁসকেও চরতে দেখা গেছে, খেলা তো দূরের কথা। যাই হোক, বিশ্রামের দিন রবিবার সহ পুরো চারদিন সময় অতিবাহিত হবার পর ইংলণ্ড ও পাকিস্থানের প্রথম টেস্ট খেলা আরম্ভ হল। ভারত এবং পাকিস্থানের খেলোয়াড়েরা নরম মাঠে খেলতে মোটেই অভ্যস্ত নয়। তাই ইংলণ্ড 'টসে' জিতেও পাকিস্থানকে প্রথম ব্যাট করতে দিলো, কিন্তু পাকিস্থান শেষ দু' দিনে বুদ্ধির খেলায় এবং ক্রিকেটনৈপুণ্যে ইংলণ্ডের সঙ্গে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে সমমর্যাদার অধিকারী হয়েছে। খেলার ফলাফল :—

পাকিস্থান—প্রথম ইনিংস—৮৭ রান (হানিফ ২০, আলীমুদ্দিন ১৯; স্ট্যাথাম ১৮ রানে ৪ উইঃ, ওয়ার্ডেল ৩৩ রানে ৪ উইঃ)

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—(৯ উইঃ ডিঃ) ১১৭ (সিম্পসন ৪০, মে ২৭, ইভান্স **২৫**; ফজল মামুদ ৫৪ রানে ৪ উইঃ, খান **মহম্মদ** ৬১ রানে ৫ উইকেট)

পাকিস্থান—দ্বিতীয় ইনিংস—(৩ উইঃ) ১২১ (ওয়াকার হাসান ৫৩, হানিফ ৩৯ ও মাকসুদ আমেদ নট আউট ২৯)

(খেলা অমীমাংসিত)

ইস্টবেংগল ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের লীগ খেলায় মহমেডান গোলরক্ষক এফ রহমান একটি বিপজ্জনক সট 'ফিস্ট' করে বাঁচাচ্ছেন। সাতটি খেলায় জয়লাভের পর এই খেলায় ইস্টবেংগল ক্লাবকে প্রথম একটি পয়েন্ট নষ্ট করতে হয়

ফ্‌টবল খেলার সাপ্তাহিক আলোচনা

৯ই জ্‌ন থেকে ১৫ই জ্‌নের খেলার ফলাফল নিয়ে লীগের সাপ্তাহিক আলোচনা আরম্ভ করছি। লীগ খেলার গতি ক্রমশই ইস্টবেংগল ও মোহনবাগানের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র প্রশস্ত করছে। আলোচ্য সপ্তাহে লীগ কোঠার শীর্ষস্থানের অধিকারী ইস্টবেংগল ক্লাবকে দ্‌টি পয়েন্ট নষ্ট করতে হয়েছে। সাতটি খেলায় পর পর জয়লাভের পর তারা মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কাছে প্রথম একটি পয়েন্ট নষ্ট করে। মংগলবার রাজস্থান ক্লাবের কাছে দ্বিতীয় পয়েন্ট নষ্ট করেছে। মোহনবাগান ক্লাবকে এ সপ্তাহে কোন পয়েন্ট হারাতে হয়নি। তাদের রক্ষণব্যূহও অক্ষত আছে। মোহনবাগানই একমাত্র ক্লাব যাদের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোন গোল হয়নি। ইস্টবেংগল ও মোহনবাগানের অর্জিত পয়েন্টের মধ্যে বর্তমানে কোন পার্থক্য না থাকলেও ইস্টবেংগলের চেয়ে মোহনবাগান একটি ম্যাচ বেশী খেলেছে এবং গোলের সংখ্যানুপাতে লীগ কোঠার শীর্ষস্থানে অবস্থান করে আছে।

লীগ কোঠা সাজাবার ক্ষেত্রে একটা নিয়ম অনুসরণ করা হয়। খেলা কম-বেশীতে কিছু যায় আসে না। দুই দলের অর্জিত পয়েন্টের মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকলে যে দল বেশী গোল দিয়েছে এবং কম গোল খেয়েছে, তাদের নাম প্রথম লেখা হয়। গোল 'এভারেজ'ই এখানে প্রধান বিবেচ্য। যেমন ইস্টবেংগল ও মোহনবাগানের অবস্থা। এবারের লীগ কোঠায় দেখা যাচ্ছে, দুই দলের পয়েন্ট সমান থাকলেও ইস্টবেংগল বেশী গোল দিয়েছে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে দুটি গোল হওয়ায় 'এভারেজ' খারাপ হয়ে গেছে। তাই মোহনবাগানই শীর্ষে স্থান পেয়েছে। অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, ইস্টবেংগলের খেলা তো কম আছে। কিন্তু লীগ কোঠা সাজাবার ক্ষেত্রে খেলা কম-বেশীর প্রশ্ন বিবেচনা করা হয় না। যে খেলাটি কম আছে, সে খেলায় কোন পয়েন্ট না হতেও পারে। তাই সমান পয়েন্টের ক্ষেত্রে গোল এভারেজ হিসাবেই দলকে উপরে নীচে স্থান দেওয়া হয়। পূর্বে গোল এভারেজ হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বেরও মীমাংসা হত। লীগ কোঠা সম্পর্কে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ায় এ আলোচনা করতে হল।

লীগ কোঠার নীচের দিকের অবস্থাও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। ক্যালকাটা সার্ভিসেস ছাড়া আর কোন দলকে তাদের সংগে দ্বিতীয় ডিভিসনে নামতে হবে তা নিয়ে রীতিমত জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হয়ে গেছে। স্পোর্টিং ইউনিয়ন, বি এন আর, জর্জ টেলিগ্রাফ, খিদিরপুর, ভবানীপুর সবারই প্রায় এক অবস্থা। ভবানীপুরের অবস্থা অবশ্য সবচেয়ে সংগীন। ক্যালকাটা সার্ভিসেস এবং ভবানীপুর এতদিন কারো বিপক্ষে কোন গোল করতে পারে না। সম্প্রতি দুটি ক্লাবই একটি করে গোল লাভ করেছে।

দলগত শক্তি হিসাবে ভবানীপুর ক্লাবের ৯টি খেলায় মাত্র ৪ পয়েন্ট অর্জন করবার কথা নয়! কতকটা ভাগ্যবিড়ম্বনাই তাদের এই সংগীন অবস্থার অন্যতম কারণ। প্রথমত ভবানীপুর ক্লাবের তিনজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় রবি দাশ, অরুণ মিত্র ও এম ঘটক লীগের সূচনায় আহত হন। তারপর কটি খেলায় ভবানীপুরকে অনেকটা দুর্ভাগ্যবশত পরাজয় স্বীকার করতে হয়। অবশ্য কয়েকজন নূতন খেলোয়াড়ের অন্তর্ভুক্তির ফলে ভবানীপুর ক্লাব এখন বেশ শক্তিশালী। যে কোন ক্লাবকেই বেগ দিতে তারা এখন সক্ষম।

দ্বিতীয় ডিভিসনে সবচেয়ে যারা ভাল খেলছিলো, সেই কাস্টমস দলকে পরপর ২টি খেলায় হার স্বীকার করতে হয়েছে। দ্বিতীয় ডিভিসনের উপরের দিকের গুটি পাঁচেক দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে এবং এখন পর্যন্ত সবাই চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করে প্রথম ডিভিসনে উঠবার আশা রাখে। সালকিয়া ফ্রেন্ডস, সুবার্বন, ক্যালকাটা, কাস্টমস, পোর্ট কমিশনার্স কেউ কারো চেয়ে কম নয়।

তৃতীয় ডিভিশনেরও প্রায় এক অবস্থা। এখানেও সিটি, বেনেপুকুর, রেঞ্জার্স, এলবার্ট, ক্যালকাটা পুলিশ, কে এফ আর, ইন্টারন্যাশনাল সবাই উপরে উঠবার চেষ্টা করছে। তৃতীয় ডিভিসনের নীচের দিকে মেসোরার্স ও বড়িয়া স্পোর্টিংয়ের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ।

চতুর্থ ডিভিসনে উপরের দিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমাবদ্ধ রয়েছে বাটা ও ঐক্য সম্মিলনীর মধ্যে। আর কারো পক্ষে এদের অর্জিত পয়েন্টের নাগাল পাওয়া কষ্টকর। নীচের দিকে তিন চারিটি দলের অবস্থা সংগীন। শেষ পর্যন্ত কাকে ডিভিশনচ্যুত হতে হবে বলা শক্ত। এবার বেংগল সকার লীগেও ভাল খেলছে তিন চারটি দল—স্টার স্পোর্টিং, বেহালা, ন্যাশনাল এ সি, ইস্ট ক্যালকাটা এই চারটি দলের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এলেন লীগের দুটি গ্রুপে শীর্ষ স্থান দখল করে আছে বেতড় স্পোর্টিং আর ভিক্টোরিয়া। এলেন ও বেংগল সকার লীগের চ্যাম্পিয়ন দুটি টীমের খেলায় যে দল জয়ী হবে, সেই দল ক্যালকাটা ফুটবল লীগের চতুর্থ ডিভিসনে খেলবার অধিকারী।

নীচে গত সপ্তাহের প্রথম ডিভিসনের ফলাফল এবং লীগ কোঠা দেওয়া হল।

৯ই জুন, '৫৪'

রাজস্থান (২) — এরিয়ান (০)
বি এন আর (১) — পুলিশ (০)

১০ই জুন, '৫৪'

ইস্টবেংগল (০) — মহঃ স্পোর্টিং (০)
মোহনবাগান (১) — স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০)
কালীঘাট (১) — ভবানীপুর (০)

১১ই জুন, '৫৪'

এরিয়ান (১) — ই আই আর (১)
পুলিশ (১) — ক্যালকাটা সার্ভিসেস (০)

১২ই জুন, '৫৪'

ইস্টবেংগল (২) — বি এন আর (০)
মোহনবাগান (১) — খিদিরপুর (০)
উয়াড়ী (১) — রাজস্থান (০)

১৪ই জুন, '৫৪'

এরিয়ান (১) — মহঃ স্পোর্টিং (০)
ই আই আর (৩) — ক্যালঃ সার্ভিসেস (১)

কালীঘাট (১)	খিদিরপুর (১)

১৫ই জুন, '৫৪'

মোহনবাগান (১)	জর্জ টেলিগ্রাফ (০)
রাজস্থান (১)	ইস্টবেংগল (১)
ভবানীপুর (১)	বি এন আর (১)

প্রথম ডিভিসন লীগ কোঠায় বিভিন্ন দলের অবস্থা

[১৫ই জুন পর্যন্ত]

টীমের নাম	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
মোহনবাগান	১১	৭	৪	০	১১	০	১৮
ইস্টবেংগল	১০	৮	২	০	১২	২	১৮
উয়াড়ী	৯	৬	২	১	১৫	৫	১৪
এরিয়ান	১০	৫	৩	২	১০	৬	১৩
রাজস্থান	১০	৪	৪	২	৮	৫	১২
পুলিশ	১০	৩	৪	৩	৫	৯	১০
মহঃ স্পোর্টিং	১১	৩	৪	৪	৭	৮	১০
কালীঘাট	৮	৩	৩	২	৮	৬	১০
ই আই আর	১০	৩	৩	৪	৮	১০	৯
স্পোর্টিং ইউঃ	৮	২	২	৪	৫	৬	৬
বি এন আর	৯	২	২	৫	৭	১২	৬
জর্জ টেলিঃ	৯	২	২	৫	৫	৮	৬
খিদিরপুর	১০	১	৩	৬	৫	১০	৬
ভবানীপুর	৯	০	৪	৫	১	৬	৪
কালঃ সার্ভিস	৮	০	০	৮	১	১৫	০

টমাস কাপে ভারতের খেলা

আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা টমাস কাপের খেলায় থাইল্যান্ডের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য ভারতের ১২জন খেলোয়াড়কে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। বোম্বাইয়ের ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে এদের খেলার পর নৈপুণ্য বিচার করে চূড়ান্তভাবে দল গঠন করা হবে। ভারত জুলাই মাসের ৩০শে ও ৩১শে ব্যাংককে থাইল্যান্ডের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। গতবারের টমাস কাপ প্রতিযোগিতায় ভারতের অধিনায়ক দেবীন্দার মোহন ব্যক্তিগত কারণে এবারের দলে নির্বাচিত হবার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। নির্বাচিত ১২জন খেলোয়াড়ের নাম—

জর্জ লুইস, নন্দু নাটেকার, হেনরী ফেরেরা, ফ্লাইট লেঃ মজুমদার, আর এ ডোংগরে ও এম কে ভোপদকার (বোম্বাই); অমৃত দেওয়ান, পি এস চাউলা ও সি এল ম্যাডান (দিল্লী); টি এন শেঠ (উত্তর প্রদেশ); মনোজ গুহ ও জি হেমাডি (বাংলা)।

ডেভিস কাপ থেকে ভারতের বিদায় গ্রহণ

ডেভিস কাপের খেলায় ভারত অস্ট্রিয়াকে হারিয়ে দিয়ে ইউরোপীয় অঞ্চলের কোয়ার্টার ফাইন্যালে উন্নীত হয়। কিন্তু কোয়াটার ফাইনালে ফ্রান্সের নিকটে ৪—১ খেলায় হার স্বীকার করে ভারতকে ডেভিস কাপের খেলা থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে। চারটি সিংগলস ও একটি ডাবলসের খেলার মধ্যে ভারত মাত্র একটি সিংগলস খেলায় বিজয়ী হয়েছে। তাও আবার ফ্রান্সের নির্বাচিত খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে নয়। ভারতের অধিনায়ক নরেন্দ্রনাথের সম্মতি নিয়ে পল রেমির বদলে জিন ক্রড মলিনারী কৃষ্ণণের সংগে একটি সিংগলস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই খেলাটিতেই কৃষ্ণণ বিজয়ী হয়েছেন। অবশ্য এই খেলার কোনই গুরুত্ব ছিল না। দুটি সিংগলস ও একটি ডাবলসের খেলায় পর পর জয়লাভ করায় ফ্রান্স ৩—০ খেলায় অগ্রগামী হয়। সুতরাং এখানের কোয়াটার ফাইনালের মীমাংসা হয়ে যায়। বাকী দুটি খেলায় ফ্রান্স পরাজয় স্বীকার করলেও কিছু যেতো আসতো না।

ডেভিস কাপের খেলায় ভারত ইতিপূর্বে আরও তিনবার ফ্রান্সের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। এর মধ্যে ১৯২১ সালে ভারত ৪—১ খেলায় ফ্রান্সকে হারিয়ে দিয়েছিল। ১৯২৪ সালে ৪—০ খেলায় এবং ১৯৪৭ সালে ৫—০ খেলায় ফ্রান্স ভারতকে পরাজিত করে। সমস্ত খেলাই প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নীচে এ বছরের খেলার ফলাফল দেওয়া হচ্ছে :—

সিংগলস

জিন ড্রকোস ডি'লা' হেলেট (ফ্রান্স) ৬—৪, ৬—৪ ও ৮—৬ সেটে আর কৃষ্ণণকে (ভারত) পরাজিত করেন।

পল রেমি (ফ্রান্স) ৬—৩, ৬—৪ ও ৬—১ সেটে নরেশ কুমারকে (ভারত) পরাজিত করেন।

আর কৃষ্ণন (ভারত) ৬—৪, ৬—৪ ও ৬—২ সেটে জিন ক্রড মলিনারীকে (ফ্রান্স) পরাজিত করেন।

ডি'লা' হেলেট (ফ্রান্স) ৩—৬, ৯—১১ ৬—৪, ৮—৬ ও ৬—০ সেটে নরেশ কুমারকে (ভারত) পরাজিত করেন।

ডাবলস

পল রেমি ও ডি'লা' হেলেট (ফ্রান্স) ৬—২, ৬—২, ৩—৬ ও ৭—৫ সেটে নরেন্দ্র নাথ ও নরেশ কুমারকে (ভারত) পরাজিত করেন।

খেলাধুলার অন্যান্য খবর

গত সপ্তাহে দু'টি মজাদার খবর—তাস খেলায় আদালতের আশ্রয় গ্রহণ আর মহিলা কুস্তিগীরের সংগে পুরুষ মল্লবীরের লড়াইয়ে বোম্বাই সরকারের আপত্তি। তাস খেলার ঘটনাটি ঘটেছে কৃষ্ণনগরের দেওয়ানী আদালতে। অকসান ব্রিজ প্রতিযোগিতার 'ফল' নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে গণ্ডগোল সৃষ্টি হলে একপক্ষ আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে ইনজাংশনের প্রার্থনা জানান। আদালত ইনজাংশন জারী করেছেন কি না, খবরে অবশ্য তার উল্লেখ নেই। কিন্তু বোম্বাইয়ের বল্লভভাই স্টেডিয়ামে মহিলা কুস্তিগীর হামিদা বানুর সঙ্গে বোম্বইয়ের মল্লবীর হাসান আলী ইরাণীর কুস্তির আয়োজন বোম্বাই সরকার বন্ধ করে দিয়েছেন। দু' মাস আগে ভাগলপুরের এক কুস্তি প্রতিযোগিতায় দুই পক্ষের মারামারির ফলে দশ-বারোজন লোকের প্রাণহানি এবং বহু লোক আহত হওয়ায় শহরে ১৪৪ ধারা জারী করতে হয়েছিল। সেই ঘটনা স্মরণ করেই হয়তো বোম্বাই সরকার হামিদা বানু ও হাসান আলীর কুস্তির অনুমতি দেন নি। কিন্তু পুরুষের সঙ্গে পুরুষের লড়াইয়ে যে উত্তেজনা দেখা যায়, পুরুষ ও নারীর মল্লক্রীড়ায় কি সেই উত্তেজনা দেখা যেত? তবে যে নারী মল্লক্রীড়ায় পুরুষকে চ্যালেঞ্জ করে, বোম্বাই সরকার হয়তো তাকে নারী বলে কল্পনা করতে পারেন নি।

ও'ব্রায়েনের রেকর্ডের আরও উন্নতি—লৌহ বল নিক্ষেপে ১৯৫২ সালের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন প্যারী ও'ব্রায়েন তাঁর নিজ রেকর্ডের আরও উন্নতি করেছেন। আমেরিকার এই কৃতী এ্যাথলীট অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ৫৭ ফুট ১½ ইঞ্চি দূরে লৌহ বল নিক্ষেপ করেন। তিনি গত মাসেও ৬০ ফুট ৫½ ইঞ্চি দূরে লৌহ গোলক নিক্ষেপ করেছেন, কিন্তু সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে, ও'ব্রায়েন ৬০ ফুট ১০ ইঞ্চি দূরে লোহার বল ছুড়ে নিজ রেকর্ডের আরও উন্নতি করেছেন। এ রেকর্ড এখনো সরকারী অনুমোদন লাভ করে নি।

দারা সিংয়ের ভারত চ্যাম্পিয়ন আখ্যা লাভ—ভারতের প্রখ্যাত মল্লবীর দারা সিং ফ্রি স্টাইল কুস্তি প্রতিযোগিতায় টাইগার যোগীন্দার সিংকে হারিয়ে দিয়ে ভারত বিজয়ী কুস্তিগীর বলে পরিচিত হয়েছেন। আন্তর্জাতিক কুস্তি ফেডারেশনের পরিচালনায় বোম্বাইয়ের বল্লভভাই স্টেডিয়ামে এই কুস্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিকে দারা সিং এবং যোগীন্দার সিং দুজনেই এক রাউন্ড করে বিজয়ী হন, কিন্তু যোগীন্দার সিং ক্রমশ আইন বিগর্হিত পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকেন। সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও সপ্তম রাউণ্ডে যোগীন্দার সিং নিয়মবিগর্হিত পন্থা অবলম্বন করায় রেফারী তাঁকে প্রতিযোগিতা থেকে 'নাকচ' করে দেন।

দারা সিং ভারতশ্রেষ্ঠ কুস্তিগীরের সম্মান লাভ করবার পর জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজা তাঁর হাতে বিজয়ীর পুরস্কার প্রদান করেন।

বিশ্ব ফুটবলে ইংলণ্ড দল—বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় বেলজিয়ামের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ইংলণ্ডের নিম্নলিখিত ১১ জন খেলোয়াড় :—

হেরিক (বার্মিংহাম); স্ট্যানীফোর্থ (হাডার্সফিল্ড) ও বার্ন (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড); রাইট (উলভস), আওয়েন (লাটন) ও ডিকিনসন (পোর্টসমাউথ); স্ট্যানলী ম্যাথুজ (ব্ল্যাকপুল), বুডিস (নিউক্যাসেল), লফটহাউস (বল্টন), টেলর (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড) ও টম ফিনে (প্রেস্টন)।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৭ই জুন—শ্রীনগরে পুনর্বাসন মন্ত্রী সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সমস্যার আশু সমাধানের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন, পশ্চিম পাকিস্থানের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের এখন উচিত পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রতি মনোযোগ দিয়া দ্রুত উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান করা।

ভারতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তাহার রূপায়নের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার একটি শিল্প বোর্ড গঠন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারসমূহের প্রতিনিধিদের লইয়া এই বোর্ড গঠিত হইবে।

আজ কলিকাতায় লেক রোড ও সাদার্ন এভেনিউর সংযোগস্থলের নিকট অবস্থিত একটি টালির শেড সহসা ভূমিসাৎ হয়। উহার ফলে ঐ শেডের অধিবাসীদের মধ্যে ১৪ জন আহত হন। ২১টি উদ্বাস্তু পরিবারের প্রায় ৯১ জন ঐ শেডে বসবাস করিতেছিলেন।

৮ জুন—ভারত সরকার হাওড়া ও বর্ধমানের (ব্যান্ডেল হইয়া) মধ্যবর্তী রেলপথ এবং শেওড়াফুলি হইতে তারকেশ্বর পর্যন্ত রেলপথ বৈদ্যুতিকরণের জন্য ১১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত ও ললিতকলা বিষয়ে স্বতন্ত্র ডিগ্রী পরীক্ষা প্রবর্তনের এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। ঐ দুইটি ডিগ্রীর নাম যথাক্রমে 'বি মিউজিক' এবং 'বি এফ এ' (ফাইন আর্টস) করার প্রস্তাব হইয়াছে।

৯ই জুন—বে-আইনীভাবে ভাগচাষী উচ্ছেদ বন্ধ করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আজ ১৯৫০ সালের পশ্চিমবঙ্গ বর্গাদার আইন এবং ১৯৫৩ সালের জমিদারী দখল আইন সংশোধন করিয়া দুইটি অর্ডিন্যান্স জারী করেন।

ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী আর কে নেহরু অদ্য বিমানযোগে প্যারিস হইতে নয়াদিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতে ফরাসী উপনিবেশসমূহের সমস্যার মীমাংসার জন্য ভারত-ফরাসী আলোচনায় ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে তিনি সেখানে গিয়াছিলেন। পালাম বিমান ঘাটিতে তিনি বলেন, ফরাসী ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মূল সমস্যা সম্পর্কে উভয় পক্ষে মতবিরোধের কোন মীমাংসা সম্ভব হয় নাই, তবে ভারত এই ব্যাপারে ফরাসী জাতি ও ফরাসী সরকারের নিকট স্বীয় মতামত ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

১০ই জুন—আজ নয়াদিল্লীতে অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ আর জি কেসী প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জেনেভা সম্মেলনের বিভিন্ন সমস্যা বিশেষ করিয়া ইন্দোচীনের যুদ্ধ বিরতির প্রশ্নটি আলোচনা করিয়াছেন। মিঃ কেসী প্রস্তাবিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়ার মনোভাব শ্রী নেহরুকে জানাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

১১ই জুন—পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় এক বিবৃতিতে জানান যে, শ্রীনগরে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈনের সহিত তাঁহার আলোচনার পর পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সাহায্য দান সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা রায় জানান যে, পশ্চিমবঙ্গে আগত ২৬ লক্ষ উদ্বাস্তুর মধ্যে এ পর্যন্ত ১৬ লক্ষ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত সাহায্য লাভ করিয়াছে।

১২ই জুন—ভারত ও ফরাসী উপনিবেশ-সমূহের মধ্যে যাতায়াত নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত সরকার পুনরায় অবিলম্বে কঠোর পারমিট প্রথা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভারতের ফরাসী উপনিবেশসমূহের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্যারিস আলোচনার প্রাক্কালে এই পারমিট প্রথা শিথিল করা হইয়াছিল।

১৩ই জুন—দিল্লী রাজ্যের সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্য পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল অদ্য দিল্লীর উপকণ্ঠবর্তী প্রায় ৫০ মাইলব্যাপী অঞ্চল পরিদর্শন করেন। প্রধান মন্ত্রী এই উপলক্ষে প্রায় ৬টি গ্রাম পরিদর্শন করেন।

অন্ধ্র রাজ্যের অন্তর্গত ফরাসী উপনিবেশ ইয়েনাম আজ ফরাসী শাসনমুক্ত হইয়াছে।

আজ কলিকাতার আহিরীটোলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সভাপতি কলিকাতার মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখার্জি ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে প্রবল সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাইবার জন্য কলিকাতার যুবকদিগকে আহ্বান জানান।

বিদেশী সংবাদ

৮ই জুন—জেনেভায় শান্তি সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ বিদো ঘোষণা করেন যে, ইন্দোচীন সম্মেলন যদিও শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে গুরুতর মতবিরোধ দেখা দিয়াছে।

কলম্বোর এক সংবাদে প্রকাশ, সিংহল ও ভারতের মধ্যে যাতায়াত সম্পর্কে নূতন ভিসা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় সিংহলের বাগিচা-সমূহের প্রায় আট লক্ষ ভারতীয় শ্রমিক কার্যত আটক হইয়া পড়িয়াছে।

৯ই জুন—পূর্ববঙ্গের গভর্নর মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা ঘোষণা করেন যে, পূর্ববঙ্গে গভর্নরী শাসন বলবৎ হওয়ার পর যে ৭০২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তন্মধ্যে দেড়শত কম্যুনিস্ট ও তাহাদের সমমতাবলম্বী লোক আছে। তিনি বলেন যে, জনাব ফজলুল হক বার্ধক্যের জন্য কারাভোগ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। তিনি পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগকে যুক্ত বাঙলা গঠনের স্বপ্ন পরিহার করিতে বলেন।

কলিকাতায় এরূপ গুজব শোনা যায় যে, গত মঙ্গলবার পূর্ববঙ্গের কুমিল্লায় গভর্নরী শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে পুলিশ ও মিলিটারী গুলী চালাইয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন।

১০ই জুন—পূর্ববঙ্গের বরিশাল, পটুয়াখালি ও ভোলাতে ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে এবং বরিশাল শহরে বালুচ রেজিমেণ্টের সৈন্যদল টহল দিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। করাচীর সংবাদে প্রকাশ, পূর্ববঙ্গকে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ এই দুইটি প্রদেশে বিভক্ত করার চেষ্টা চলিতেছে।

১১ই জুন—সাইগনের সরকারী মহলের সংবাদে প্রকাশ, হাজার হাজার ভিয়েৎমিন সৈন্য হানয়ের দিকে নিম্নমুখী অভিযান চালাইবার উদ্যোগপর্ব হিসাবে ধান হোয়ার সমতল ক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন।

১২ই জুন—অদ্য ফরাসী জাতীয় পরিষদে লানিয়েল মন্ত্রিসভার পরাজয় ঘটিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী জোসেফ লানিয়েল ইন্দোচীন নীতি সম্পর্কে আস্থাজ্ঞাপক যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তাহা ২৯৩—৩০৬ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। প্রধান মন্ত্রী লানিয়েল অদ্য ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্টের নিকট তাঁহার মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন।

১৩ই জুন—সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র "প্রাভদা" আজ ঘোষণা করিয়াছে যে, মার্কিন স্বার্থে গুপ্তচরের কার্যে নিযুক্ত থাকার অপরাধে সোভিয়েটের সর্বোচ্চ সামরিক আদালত দুই ব্যক্তিকে ২৫ বৎসর হিসাবে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

প্রতি সংখ্যা—/৫ আনা, বার্ষিক—২৫০ ষান্মাসিক—১০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড ৬নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২১ বর্ষ
সংখ্যা ৩৪

দেশ

শনিবার
১১ আষাঢ় ১৩৬১

DESH
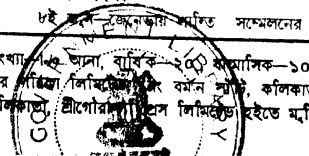
SATURDAY, 26TH JUNE 1954

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্যামাপ্রসাদের স্মৃতি

গত ৫ই আষাঢ় দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠার শত বর্ষ পূর্তি উৎসব সম্পন্ন হয়। সভাপতি স্বরূপে ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁহার অভিভাষণে একটি বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন কথা বলিয়াছেন। তাঁহার কথাটি খুবই ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য। ডাঃ মজুমদার বলেন, শত বর্ষ পূর্বে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। একশত বৎসর একটা জাতির জীবনে কিছুই নহে, বাংলা দেশে অথবা ভারতবর্ষে মন্দির প্রতিষ্ঠা নূতন কথাও নয়। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠার পর একশত বৎসরের মধ্যে ভারতের জাতীয় জীবনে যে পরিবর্তন আসিয়াছে, বিগত পাঁচশত বা হাজার বৎসরেও তাহা হয় নাই। ভারতের এই গুরুতর পরিবর্তনের জন্য আমরা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের নিকট ঋণী। ডাঃ মজুমদার খ্যাতনামা ঐতিহাসিক, তাঁহার উক্তিতে একটুও অতিশয়োক্তি নাই, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় জীবনের মূলে এ যুগে যে প্রাণশক্তি বিভিন্ন ধারায় এবং বিচিত্রভাবে কাজ করিয়াছে, তাহার মূল খুঁজিতে গেলে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরেই প্রধান উৎস পরিলক্ষিত হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণকেই আমরা যুগপ্রবর্তক পুরুষস্বরূপে পাই। ঠাকুরের মহদাবির্ভাবের পূর্বে হিন্দু-ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, বিশেষভাবে এই বাংলা-দেশে মনীষী এবং সাধকগণ কত কঠোর সাধনা করিয়াছেন। জাতীয়তার ভাব জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যেও মনস্বীবর্গের তপঃপ্রভাব বহুভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের সেই সাধনা, সে তপস্যা ব্যর্থ হইয়াছে, এমন কথা আমরা বলি না। তবে ইহা সত্য যে, জাতির মনোমূলে তাহা বৈপ্লবিক শক্তি সঞ্চার করিতে পারে নাই। সাধকবর্গের তপঃপরামর্শ-প্রবন্ধ বহিঃ আমাদের সমাজের অন্তরে উদার বীর্য উত্তপ্ত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার উপযোগী মনোবলকে উদ্দীপ্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। জাতিকে দুর্গত অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা এদেশে হইয়াছে; কিন্তু সেগুলি অনেকটাই অবাস্তব ভাসা ভাসা রকমে সমাজের উচ্চস্তরে কাজ করিয়াছে, গোড়া ধরিয়া নাড়া দেয় নাই। প্রকৃতপক্ষে ঠাকুরের বাণীতে এদেশের সর্বস্তরে প্রাণধারা সঞ্চারিত হয় এবং হিন্দুধর্মের সার্বভৌম উদার সত্য দীর্ঘ পরাধীনতায় অভিভূত সমাজে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। ক্রমে প্রাণধর্মের এই উজ্জীবন রাজনীতিক সাধনাকে স্পর্শ করে এবং বাংলায় নব জাতীয়তা-বাদের উন্মেষের পথ প্রশস্ত হয়। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের জীবন-সাধনায় বাংলার এই নব জাতীয়তার প্রাণধর্মের পরিচয়ই আমরা পাইয়াছি। বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলগত মানবতার বলিষ্ঠ মনোবৃত্তি, দেশের নরনারী সেবা তাঁহার চরিত্রকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। অনন্যসাধারণ সেই চরিত্রবল তাঁহার স্বদেশপ্রেমকে শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ এবং উদগ্র করিয়া আত্মোৎসর্গের প্রেরণায় তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। এই গুণে তিনি জাতির নরনারীর অন্তর অধিকার করিয়াছিলেন—এমন লোকপ্রিয় হইয়া-ছিলেন যে তাঁহাকে হারাইয়া জাতি তাহার মনের মানুষকে হারাইয়াছে। শ্যামাপ্রসাদের তিরোধান তিথিতে এই ভাবনা আমাদের চিত্তকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে।

কলঙ্ককর ব্যাপার

পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত বিহার রাজ-নীতিক সম্মেলনে অসংযত ভাষায় এবং উৎকটভাবে বাঙালী সমাজের বিরুদ্ধে যে প্রচারকার্য পরিচালিত হয়, তাহার ফল প্রসব করিতে বিলম্ব ঘটে নাই। গত ১৯৫৩ সালে সিন্ধির সার প্রস্তুতের কারখানায় কর্মিগণ সেখানে সুভাষচন্দ্রের একটি মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন, সম্প্রতি আজাদ হিন্দ্ ফৌজের খ্যাতনামা অধিনায়ক মেজর-জেনারেল শা নওয়াজের সভাপতিত্বে এই মর্মর-মূর্তির প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন হইবে স্থির হইয়াছিল। কিন্তু একদল লোক ইহার প্রতিবাদী হইয়া দাঁড়ায় এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামার আশঙ্কায় সেখানে ১৪৪ ধারা জারী করিতে হয়; এজন্য অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হইতে পারে নাই। সুভাষচন্দ্র বাঙালী সুতরাং বিহারে তাঁহার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে দেওয়া হইবে না, বিরোধী দল স্পষ্টত এই মনোভাবের দ্বারা পরি-চালিত হইয়া এমন অনর্থের সৃষ্টি করে।

প্রাদেশিকতার মনোভাব কতটা নীচ আকার ধারণ করিলে এইরূপ প্রতিবেশের উদ্ভব হইতে পারে বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। সুভাষচন্দ্র এরূপ বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ এবং তাঁহার জীবনাদর্শ স্বদেশের স্বাধীনতা-সাধনায় এমনই উজ্জ্বল যে, তিনি বাঙালী কি অবাঙালী এই প্রশ্ন আদৌ তাঁহার সম্বন্ধে উঠে না। এই ভারতের কোন অংশে যে সে প্রশ্ন উঠিতে পারে, এমন ধারণা আমাদের পক্ষে কল্পনারও অতীত ছিল। কিন্তু আজ বিহারে ইহাই সম্ভব হইয়াছে। বিহারী নেতৃবর্গের প্রাদেশিক মনোবৃত্তি আমাদের জাতীয় জীবনকে কতটা বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে, ইহাতে সে পরিচয় পরিস্ফুট দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছি। বস্তুত এই ব্যাপারে অনর্থ-সৃষ্টিকারীদের কার্য এতটাই ঘৃণ্য যে, এ সম্বন্ধে তাহাদের সঙ্গে যুক্তি-বিচার করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। ইহাদের কাজের দ্বারা ইহারা জাতির-জনক মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র স্মৃতির অমর্যাদা করিয়াছে। জাতির আদর্শকে ইহারা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, এই শ্রেণীর প্রাদেশিকতা-অন্ধ মনোবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহারা সমগ্র জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। ইহারা দেশের উপদ্রবস্বরূপ। জাতির বৃহত্তর কল্যাণের দিকে চাহিয়া ইহাদের এমন দুষ্প্রবৃত্তিকে কঠোর হস্তে দমন করা কর্তব্য। বাঙালী বিদ্বেষের উৎকট উন্মাদনায়, ইহারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্মভূমি বাঙলা দেশেই যে শুধু অসন্তোষ ও উদ্বেগের সৃষ্টি করিতেছে, ইহাই নয়; পরন্তু ইহাদের কাজে সমগ্র ভারতের স্বার্থ ব্যাহত হইতে চলিয়াছে। ফলে বিহারেরও অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল কিছু ঘটিবে না। প্রাদেশিকতার জিদে এবং নিজেদের হাতে লব্ধ ক্ষমতার পরিস্ফীতিতে ইহারা অদ্যাপি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। কিন্তু ইহাদিগকে সে সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিবার সময় আসিয়াছে। সিন্ধির ঘটনা হইতে দেশের কল্যাণকামীদের দৃষ্টি অবিলম্বে এদিকে আকৃষ্ট হয় ইহাই বাঞ্ছনীয়।

শিশু স্বাস্থ্য নিকেতন

দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই জাতির ভবিষ্যৎ, তাহারাই সমাজের সম্পদ। কলিকাতা কর্পোরেশনের বিদ্যালয়-সমূহের তথ্যানুসন্ধানমূলক পরীক্ষায় আনুমানিক এদেশের এই সব ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় সে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পরীক্ষায় প্রকাশ পইয়াছে, শতকরা ৫৬টি বালক বালিকাই ভগ্নস্বাস্থ্য এবং ইহাদের মধ্যে শতকরা ২৮ জন পুষ্টির অভাবে পীড়িত। দেশ ও জাতির উন্নতিকামী মাত্রেই ইহাতে উদ্বিগ্ন হইবেন এবং এই অবস্থার প্রতীকার সাধনের উপায় সম্বন্ধে সচেতন হইবেন। বস্তুত, দেশকে বড় এবং জাতিকে সমুন্নত করিয়া তুলিতে হইলে শিশু যাহাতে নীরোগ হয়, তৎপ্রতি অবহিত হওয়া সকলেরই কর্তব্য। সুখের বিষয় এই যে, পশ্চিমবঙ্গে শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নকল্পে প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা মহানগরীতে শিশুদের জন্য একটি আদর্শ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাকল্পে কিছুদিন হইতে কল্পনা চলিতেছিল, সম্প্রতি তাহা কার্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। কলিকাতার কেন্দ্রস্থলে উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী শিশু স্বাস্থ্য নিকেতন নামে একটি উচ্চ শ্রেণীর আদর্শ শিশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হইবে স্থির হইয়াছে। জাতি ও ধর্মনির্বিশেষে এখানে প্রত্যেকটি শিশুর চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকিবে। ধনী দরিদ্রের ভিতর এখানে কোন তারতম্য করা হইবে না। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করিবার জন্য প্রচার কার্য চালানো এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্মসূচী থাকিবে। এই শিশু স্বাস্থ্য নিকেতনের জন্য গৃহ নির্মাণকল্পে কলিকাতা কর্পোরেশন দুই বিঘা জমি দান করিয়াছেন। এতৎসম্পর্কিত কর্ম পরিচালনার উদ্দেশ্যে কলিকাতা হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুত ফণিভূষণ চক্রবর্তীকে সভাপতি করিয়া একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। কার্যকরী সমিতির সম্পাদক ডাঃ ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী এই কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানটির জন্য জাতির সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ এবং মানব-হিতৈষী মহানুভব ব্যক্তিগণের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহার আবেদনে দেশবাসী সর্বান্তঃকরণে সাড়া দিবেন, আমরা ইহাই আশা করি। এই পুণ্য ব্রতে যিনি যাহা দান করিতে চাহেন, তাহার পরিমাণ যতই সামান্যই হউক না কেন, সাদরে গৃহীত হইবে। কলিকাতা স্ট্র্যান্ড রোডস্থিত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অফিসে অথবা সম্পাদক, 'শিশু স্বাস্থ্য নিকেতন' ৫৬।২, ক্রীক রো, কলিকাতা—১৪, এই ঠিকানায় অর্থ সাহায্য প্রেরণ করিতে হইবে।

পূর্ববঙ্গের রাজনীতিক পরিস্থিতি

পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলী তুরস্ক পরিদর্শন করিয়া করাচীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তিনি করাচী হইতে ফিরিয়া বলিয়াছেন যে, প্রয়োজন হইলে তিনি নিশ্চয়ই পূর্ববঙ্গে যাইবেন। এই প্রয়োজন কখন দেখা দিবে, প্রধানমন্ত্রী সে কথা কিছু বলেন নাই, তবে এ সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গের গভর্নরের অবলম্বিত নীতির পরিণতির উপরই সম্ভবত তাহা অনেকখানি নির্ভর করিতেছে এবং সে নীতির গতি দেখিয়া কোন লক্ষ্যে তাহার পরিণতি তাহাও কিছু অনুমান করা যায়। পূর্ববঙ্গের সর্বত্র গ্রেপ্তারের কাজ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সম্পন্ন হইতেছে। সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া হাজারের উপর উঠিয়াছে। যাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে সমাজের শীর্ষস্থানীয় বহু ব্যক্তি আছেন, হিন্দুর সংখ্যাও কম নয়। ইহার ফলে হিন্দুদের মধ্যে বিভীষিকার সৃষ্টি হইবে, ইহা স্বাভাবিক। পূর্ববঙ্গের গভর্নর হিন্দু সমাজের প্রতি তাঁহার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে এ সম্বন্ধে অবহিত থাকিবেন, ইহাই আমাদের কাম্য।

বৈদেশিকী

পণ্ডিত নেহরুর নিমন্ত্রণে চীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ-এন লাই জেনেভা থেকে ফেরবার পথে তিন দিন দিল্লীতে ভারত গভর্নমেণ্টের অতিথি হয়ে যাবেন। সংবাদটি অপ্রত্যাশিত। ব্যাপারটা হঠাৎ ঠিক হয়েছে বলে মনে হয়। পিকিং থেকে জেনেভায় যাবার পথ হয় রাশিয়া অথবা ভারতবর্ষ হয়ে। মিঃ চৌ যাবার সময়ে মস্কো হয়ে গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের পথে তিনি ফিরতে পারেন, এই সম্ভাবনা থাকাতে পণ্ডিত নেহরু অনেক পূর্বেই অবশ্য তাঁকে ভারতের আতিথ্য গ্রহণ করার জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। অন্য কথা ছাড়াও এটা আন্তর্জাতিক সৌজন্যের রীতি। তবে মিঃ চৌ ভারত সরকারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন কি না, সেটা অল্প-দিন পূর্ব পর্যন্ত অনিশ্চিত ছিল। শেষে বোধ হয় হঠাৎ ঠিক হয়েছে। জেনেভা কনফারেন্স যেভাবে চলছিল তাতে বেশি আগে থাকতে চীন প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের তারিখ স্থির করাও হয়ত কঠিন ছিল। তবে এখন যা হোল তাতে চীনের কূটনৈতিক চাতুর্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল।

ঠিক এই সময়ে যখন চার্চিল সাহেব প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারের সঙ্গে আলোচনা করতে ওয়াশিংটন যাচ্ছেন—মিঃ চৌ ও পণ্ডিত নেহরুর মধ্যে নূতন দিল্লীতে তিন দিন ধরে কথাবার্তা চলবে —এতে মার্কিন সরকারের মনের নানা সন্দেহ আরো ঘনীভূত হবে এবং চার্চিল-আইজেনহাওয়ার বৈঠকের পক্ষে এটা একটা নূতন উপদ্রবের মতো কাজ করবে। জেনেভা কনফারেন্স কোরিয়া সম্পর্কে নিষ্ফল হয়েছে, কিন্তু ইন্দোচীন সম্পর্কে ঠিক যে কি হয়েছে বর্তমানে তা বলা মুশকিল—সফল হয়েছেও বলা যায় না আবার সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়েছে তাও বলা যায় না। কনফারেন্স যখন ভেঙে যায়-যায় হয়েছিল তখন কম্যুনিস্ট পক্ষ এরূপ কয়েকটি প্রস্তাবে সম্মতির ভাব দেখায় যাতে আপসের আশা আবার পুনরুজ্জীবিত হয়।

তার মধ্যে একটা বিষয় হলো, লাওস ও কাম্বোডিয়া সম্পর্কে। কম্যুনিস্ট পক্ষের আগের দাবী ছিল যে, লাওস ও কাম্বোডিয়ায় ফরাসী ইউনিয়ন বাহিনীর সঙ্গে যারা লড়ছে তারা লাওস ও কাম্বোডিয়ারই জাতীয় "মুক্তি ফৌজ", তারা ভিয়েৎমিনের সৈন্য বা আজ্ঞাবাহী নয়, ভিয়েৎনাম সম্পর্কে ভিয়েৎমিনের সঙ্গে যে ধরনের রাজনৈতিক আপস হবে লাওস ও কাম্বোডিয়ার মুক্তি-আন্দোলন-কারী দলদের সঙ্গেও সেই রকম করতে হবে। অ-কম্যুনিস্ট পক্ষ এটা মানতে রাজী নয়, তাদের বক্তব্য যে, লাওস ও কাম্বোডিয়ার উপর ভিয়েৎমিনই আক্রমণ চালিয়েছে। কম্যুনিস্ট পক্ষ শেষ পর্যন্ত ভিয়েৎনাম থেকে লাওস ও কাম্বোডিয়ার সমস্যা ভিন্ন রকমের বলে স্বীকার করার ভাব দেখিয়েছে এবং তদনুসারে ফ্রান্স প্রস্তাব করে যে, লাওস ও কাম্বোডিয়াতেও যুদ্ধবিরতি লক্ষ্য করে দুই পক্ষের সেনা-পতিদের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হোক! কম্যুনিস্ট পক্ষ এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হয়েছে। ভিয়েৎনামের যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ-বিরতি সম্পর্কে দুই পক্ষের সামরিক কর্তাদের মধ্যে আলোচনা কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত অনুসারে পূর্ব থেকেই চলছিল। যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক কমিশনে কোন্ কোন্ দেশ থাকবে সে প্রশ্নের মীমাংসা এখনও হয়নি। এই অবস্থায় প্রধান দেশগুলির পররাষ্ট্র সচিবরা জেনেভা ত্যাগ করেছেন, তাঁদের মধ্যে মিঃ চৌ সকলের শেষে দেশে ফিরছেন।

প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার যখন চার্চিল সাহেবকে ওয়াশিংটনে যেতে আমন্ত্রণ করেন তখন সকলের এই রকম ধারণা ছিল যে, ইতিমধ্যে জেনেভায় একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু কম্যুনিস্ট পক্ষের চালে মার্কিন সরকার অসুবিধায় পড়েছেন। কম্যুনিস্ট পক্ষ টিপে টিপে কথা ছেড়ে পরিস্থিতিকে "তরল" করে রেখেছে যাতে আমেরিকার পক্ষে কোনো জবরদস্ত নীতি গ্রহণের জন্য তার মিত্রদের উপর চাপ দেয়া কঠিন হচ্ছে। শেষ

পর্যন্ত জেনেভা কনফারেন্স এমন জায়গায় এসে ঠেকল যে, পরিণামে কি হবে তা নিশ্চিত বলার কোনো উপায় নেই।

তার মধ্যে আবার ফ্রান্স আরো মুশকিল বাধিয়েছে। ফ্রান্সের নূতন প্রধান মন্ত্রী এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে কার্যভার নিয়েছেন যে, তিনি এক মাসের মধ্যে ইন্দোচীনে শান্তি আনবেন তা না হলে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেবেন। আমেরিকার মতে এতে কম্যুনিস্ট পক্ষ আরো পেয়ে বসবে। আর এই এক মাসের মধ্যে ফ্রান্সকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে কোনো সামরিক চুক্তির আলোচনায় ভিড়ানো যাবে না।

তারপর মিঃ চৌ-এর এই চাল ভারত-বর্ষে এসে পন্ডিত নেহরুর সঙ্গে আলোচনা। চার্চিল গভর্নমেণ্ট আবার ভারত সরকারের সহযোগিতার জন্য যে রকম উৎসাহ দেখাতে আরম্ভ করেছেন তাতে চৌ-নেহরু আলোচনা সম্পর্কে আমেরিকার উদ্বেগ আরো বাড়বে। মোটের উপর আমেরিকা ও তার মিত্রদের মধ্যে মতভেদ স্থায়ী করার কম্যুনিস্ট প্রচেষ্টা বেশ ভালোভাবেই চলেছে। এ বিষয়ে মিঃ চৌ মিঃ মলোটভের চেয়েও দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন। মিঃ ইডেন, পন্ডিত নেহরুর প্রতিনিধি শ্রীকৃষ্ণ মেনন, ফ্রান্সের নূতন প্রধান মন্ত্রী মঃ মেঁদে ফ্রান্স সকলকেই তিনি অল্পবিস্তর মুগ্ধ করেছেন বলে মনে হয়, ফলে আমেরিকার উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা বাড়ছে। মিঃ চৌ-এর ভারত আগমনে মার্কিন গভর্নমেণ্টের অস্বস্তি আরো বৃদ্ধি হবে।

চীনের প্রধান মন্ত্রী ভারতে আসছেন। উভয় দেশের পক্ষেই এটা আনন্দের কথা। যদি জগতের অবস্থা স্বাভাবিক হত তাহলে মিঃ চৌ-এর আগমনে ভারতের এই আনন্দ আরো সহজ ও সরল হোত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পৃথিবীতে জাতির সঙ্গে জাতির সম্পর্ক আজ নানা সন্দেহ ও আতঙ্কের দ্বারা কণ্টকিত। আজ যদি আমেরিকার কোনো প্রধান ব্যক্তি ভারতে আসেন, তবে চীন এবং রাশিয়ার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়, তেমনি চীন অথবা রাশিয়ার কোনো প্রধান ব্যক্তির ভারতে আগমন আমেরিকার সন্দেহ, এমন কি ক্রোধ উৎপাদন করে। পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় সহজ এবং অনুদ্বিগ্ন মনে অতিথি সংকারও অসম্ভব হয়ে উঠছে। নিজেদের মনই সন্দেহমুক্ত করা যায় না। কারণ কেবল প্রীতি প্রদর্শনের জন্য কেউ আসছেন একথা বিশ্বাস করাও উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে পড়ছে। বর্তমান ক্ষেত্রে অবশ্য কূটনৈতিক উদ্দেশ্য গোপন নেই, গোপন করার চেষ্টা করাও বৃথা হত।

* * *

গুয়াতেমালার ব্যাপারে মার্কিন সুনামের গুরুতর ক্ষতি হয়েছে, কারণ গুয়াতেমালার উপর হন্ডুরাস ও নিকারাগুয়া থেকে যে আক্রমণ হয়েছে তার প্রতি মার্কিন সহানুভূতির প্রমাণের অভাব নেই। গুয়াতেমালার বর্তমান গভর্নমেণ্টকে কম্যুনিস্ট আখ্যা দিয়ে চালে তার উচ্ছেদ সাধনের গর্হিত প্রচেষ্টা সর্বত্র নিন্দিত হচ্ছে। পোল্যান্ড থেকে গুয়েতামালা কিছু অস্ত্রশস্ত্র কিনেছিল বটে। কিন্তু না কিনে করবে কী? মার্কিন গভর্নমেণ্ট গুয়েতামালায় অস্ত্র দেবেন না অথচ গুয়েতামালার প্রতি বৈরীভাবাপন্ন নিকারাগুয়া এবং হন্ডুরাসকে অস্ত্র সরবরাহ করে যাচ্ছিলেন। গুয়েতামালার গভর্নমেণ্টের আসল অপরাধ হচ্ছে নূতন জমি সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, যাতে বিদেশী জমিদারদের (তার মধ্যে বিখ্যাত মার্কিন ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানী প্রধান) স্বার্থ আহত হয়েছে। গুয়েতেমোলা ইউনো'র নিরাপত্তা পরিষদের কাছে নালিশ করাতে পরিষদ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে আবেদন জানিয়েছেন যেন ইউনো'র কোনো সদস্য এমন কিছু না করে যাতে রক্তপাত ঘটে। তারপরেও কিন্তু সংঘর্ষ চলছে বলে সংবাদ এসেছে। ২৩।৬।৫৪

বনস্থলী

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
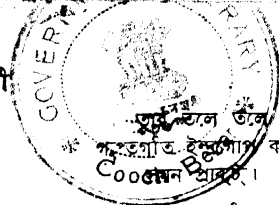
আমার এ বনস্থলী পূর্ণ কবিতায়।
সরল শাল্মলী শাল
বাল্মীকির অনুষ্টুপ্ প্রায়,
বিস্তারিত বটচ্ছায়া রচেছে অধ্যায়
বনপর্ব মহাভারতের,
এর
গলিতে গলিতে
ছায়ানট বৃক্ষরাজি লতার ললিতে
মিশেছে অপূর্ব রাগে;
ফাল্গুনের আগে
বনের নির্মোক খসে পাতায় পাতায়,
তরুর মাথায়
কুসুমের পূর্বরাগ রক্ত কিশলয়ে,
বেদনার লয়ে
আসে তপ্ত মধ্যাহ্ন পবন
চুরি ক'রে নিয়ে যায় বনশ্রীর মন
কোন্ দূরান্তের প্যানে;
তন্দ্রাহীন গানে
নন্দনের শেখা-সুর সাধে বসি একা
সঙ্গীহীন পিক;
দশদিক্
উঠি মর্মরিয়া
পুরূরবা হতাশ্বাস দেয় বিস্তারিয়া।

আজি শীত মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধ প্রহরে
সুখস্বপন ভরে
আমীলিত নেত্র ধরণীর;
শুধু ধীর
জপমালা আবর্তন ঘুঘুর বিলাপে;
দিঙ্মণ্ডল কাঁপে
প্রচণ্ড ব্যথায়;
টুপ্ টাপ্ শব্দ শুনি স্খলিত পাতায়,
বিশ্বের সঙ্গীত যেন ফল্গুরূপ ধরি
গেছে কোথা সরি,
শুধু দু'এক অঞ্জলি
তরুর মর্মর আর পাখীর কাকলি।

তারপর একদিন অকস্মাৎ প্রাবৃটের মায়া
দিগ্‌দিগন্তে মেলি দেয় ইন্দ্রজালচ্ছায়া,
অরণ্যে অঙ্কুর জাগে, পর্বতে নির্ঝর,
নদীতে তরঙ্গমালা, প্রান্তরের 'পর
নবশষ্প লেখা জাগে নবীন কবির
প্রথম প্রেমের গীতি,
বর্ষান্তের স্মৃতি
জাগে তৃণপুষ্পদলে
[illegible]তলে তলে
পুঞ্জিত ইন্দ্রগোপ কীট,
[illegible]ন প্রা[illegible]।

আকাশের আলিঙ্গনে নিশ্চল পৃথিবী,
মেঘান্তরালে তার দিগন্তের নীবী
বহুক্ষণ অপসৃত,
বিচ্ছিন্ন লুণ্ঠিত
বিদ্যুতের সূত্রে গাঁথা অপরাজিতার
বরমাল্য তার।

পড়ে না পায়ের চিহ্ন
ঘনশষ্প মোর বনভূমে,
ভুঁইচাঁপা আঁখি খিন্ন
যেন যজ্ঞধূমে
বধূবেশী বৈদেহীর;
উর্বশীর
লাবণ্য নিক্ষেপ মৃদু
মালতী কুসুমে;
যক্ষের আর্তির দূত নীলকান্ত মেঘ
নত হ'য়ে বনশ্রীরে শুধায় বারতা
দূর অলকার,
ময়ূরের কণ্ঠে বন ক'য়ে ওঠে কথা,
মত্ত হাহাকার
স্তব্ধতারে দীর্ণ করা কর্কশ ক্রেংকার।

আমার এ বনস্থলী পূর্ণ কবিতায়।
তাই আজি পউষের পড়ন্ত বেলায়
চিক্কণ বদরীগুচ্ছে চমকে আলোক,
ডুবে যায় চোখ
সুগভীর নীলে,
যতখানে যত ব্যথা আছিল নিখিলে
ঘুঘুর করুণ সুরে করিছে কাকলি;
খর্জুর বৃক্ষের গাত্রে পড়িতেছে স্খলি
সুরাগন্ধী রসবিন্দু ধরণীর সীধু;
আকাশের এক প্রান্তে গতপ্রাণ বিধু;
পর্বতের পরপারে অস্ত গেল রবি
নীলচ্ছবি
গিরিমালা নীলতর করি।
অরণ্যে একান্তে ব'সে আছে বিভাবরী;
আমি হেথা শুয়ে
তপ্ততৃণ ভুঁয়ে
পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পুটে করিতেছি পান
বনশ্রীর দান
ক্লান্ত শিশু প্রায়,
আমার এ বনস্থলী পূর্ণ কবিতায়॥

'বেণুবনে কাঁপে ছায়া'

শ্রীনন্দলাল বসু

ধারাবাহী চিত্রকলায় গাছপালার রূপ

আলংকারিক রূপ। হরাপ্পা
খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ

কিছুটা আলংকারিক
মিশরীয়। খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দ

ঐরূপ
ফ্লোরেন্স্
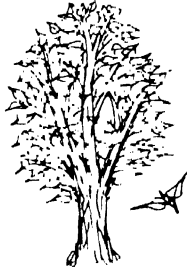
আলংকারিক
পারস্য

আলংকারিক রূপ
সাঁচী স্তূপ। খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দ
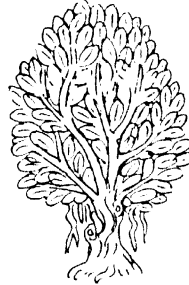
জৈন। মন-গড়া
decorative শুধু নয়
conventional

আলংকারিক। রাজস্থানী
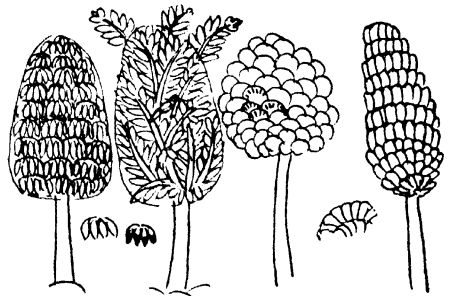
আলংকারিক। রাজস্থানী

রাজস্থানী। আলংকারিক
কিছুটা আলোছায়ার প্রয়োগ দেখা যায়

পাতার স্তবক বাধ্য হয়েই আলংকারিকভাবে সাজাতে হয়। উপরের কোণে একটি পাতার নানা রকম-ফের

পারস্য

গাছের খসড়া। কাংড়া

একটি পাতা একটি ইউনিট

একটি স্তবক একটি ইউনিট

আলোছায়ার যোগে রূপ ফুটেছে

দূরের গাছ

গাছের খসড়া। মোগল
কিছুটা আলংকারিক

কালী তুলির কাজ

কুল গাছ

পলাশ

তাই নে রে মন তাই নে
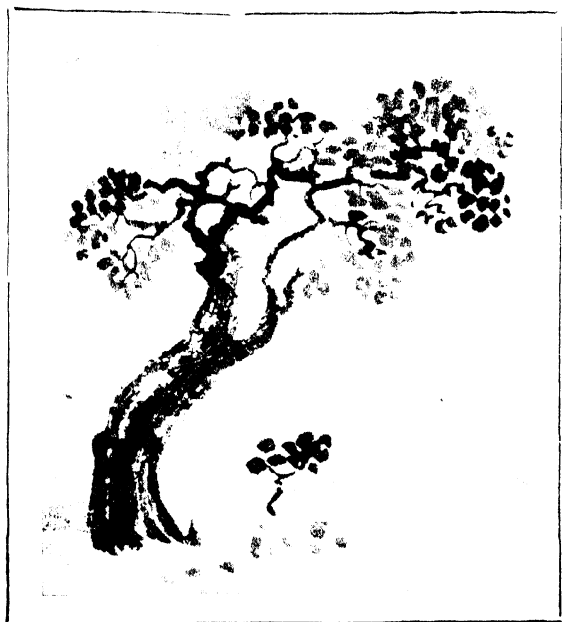
কলিকাতার সমৃদ্ধ এবং আধুনিক অঞ্চলে একটি বাড়ির ড্রয়িং রুম। আসবাবপত্র মহার্ঘ রুচির পরিচায়ক। ঘরের কোণে টেলিফোন যন্ত্র।

১৯৪৬ সালের একটি অপরাহ্ন।

ঘরের মাঝখানে দুটি গদিমোড়া চেয়ার ও একটি সোফা। চেয়ারে বসিয়া আছে একটি যুবক, সোফায় একটি যুবতী। যুবকের বয়স ২৭।২৮, মাঝারি দৈর্ঘ্যের মজবুত চেহারা, সুশ্রী মুখ; সে অলসভাবে একটি সচিত্র পত্রিকা পাঠ করিতেছে। যুবতী সোফার কোণে ঠেস্ দিয়া শাদা বেবি-উল দিয়া একটি ছোট্ট জামা বুনিতেছে। যুবতীটি সুন্দরী, বয়স ১৯।২০, মুখে সদ্যফোটা ফুলের মত একটি সতেজ সরসতা; ঠোঁট দুটি চটুল।

দু'জনে থাকিয়া থাকিয়া একে অন্যের মুখের পানে চোখ তুলিতেছে। একটু হাসিয়া আবার নিজের কাজে মন দিতেছে; কথাবার্তা নাই। পরস্পরের সান্নিধ্যই যেন তাহাদের তৃপ্ত করিয়া রাখিয়াছে।

এইভাবে কয়েক মিনিট কাটিবার পর যুবক হাতের পত্রিকাখানা নামাইয়া রাখিল।

যুবক—আমি এবার বাড়ি যাই।

যুবতী—(বুনিতে বুনিতে চোখ তুলিয়া) আর একটু থাকো না।

যুবক—আর বেশী থাকলে লোকে ভাববে তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারি না।

যুবতী—ভাবলেই বা।

যুবক—(উঠিবার উপক্রম করিয়া) তা ছাড়া এমনও ভাবতে পারে যে, আমি সর্বদা তোমাকে আগলে থাকি। সেটা তোমার পক্ষে খুব প্রশংসার কথা নয়।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

যুবতী ঘাড় বাঁকাইয়া কিছুক্ষণ যুবককে নিরীক্ষণ করিল।

যুবতী—আসল কথাটা কী? টেনিস খেলবার জন্যে মন ছটফট করছে?

যুবক—(আবার বসিয়া পড়িয়া) না না না—তা নয়। তবে—

যুবতী—তবে চুপ করে রোসো।—চা খাবে?

যুবক—এই তো খেলুম। এত ঘন ঘন চা খেলে চায়ের দাম বেড়ে যাবে।

যুবতী—না, সত্যি, আর একটু থাকো। আমি বাড়িতে একা। জামাইবাবু দিদিকে নিয়ে সেই দুপুরবেলা মেটার্নিটি হোমে গেছেন। হয়তো এখনি খবর আসবে।

যুবক—(ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) তা এক কাজ কর না। তুমিই না হয় ফোন করে খবরটা নাও না।

যুবতী বোনা রাখিয়া উঠিল।

যুবতী—এই কথাটা এতক্ষণ মনে

য়নি। এইজন্যই তো তোমাকে সব সময় দরকার হয়।

যুবতী গিয়া টেলিফোন তুলিয়া লইল।

যুবতী—(নম্বর দিয়া) হ্যালো—জননী সদন? দেখুন, মিসেস্ সুবিমল রায় ওখানে গেছেন প্রসব হবার জন্যে...মিস্টার রায়ও ওখানেই আছেন......একবার ডেকে দেবেন তাঁকে? আমি তাঁর বাড়ি থেকে বলছি......জামাইবাবু! দিদির খবর কি? ...ও......ও......আপনি ভয় পাননি তো? আচ্ছা, হলেই খবর দেবেন কিন্তু—

যুবক উঠিয়া যুবতীর কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যুবতী ফোন রাখিয়া শঙ্কা-শীর্ণ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল।

যুবক—কী?

যুবতী—এখনও ঘণ্টাখানেক।—বাবা, যত জ্বালা এই পোড়া মেয়েমানুষের।

যুবক—পোড়া পুরুষ মানুষের জ্বালা আরও বেশী।

যুবতী—ওমা তাই নাকি? তোমাদেরও জ্বালা আছে!

যুবক—জ্বালা নেই! এক তো নিজেদের জ্বালা, তার ওপর তোমাদের জ্বালা। মেয়েমানুষকে ভালবাসলে জ্বালার শেষ নেই। সারাজীবন জ্বলে-পুড়েই মলুম আমরা।

যুবতী—থাক, আর বাহাদুরীতে কাজ নেই। বসে থাক গিয়ে, যতক্ষণ না একটা খবর পাচ্ছ, ততক্ষণ যেতে পাবে না।

যুবক—বেশ। কিন্তু এখনি হয়তো পাড়া-পড়শিরা খবর নিতে আসবে, আমাকে দেখলেই ঠাট্টা-ইয়ার্কি শুরু করে দেবে। (দরজার ঘণ্টি বাজিল) ঐ! আমি পাশের ঘরে পালাচ্ছি—

যুবতী—আচ্ছা—

যুবক সচিত্র পত্রিকা তুলিয়া লইয়া দ্রুত পাশের ঘরে অন্তর্হিত হইল। যুবতী গিয়া দ্বার খুলিল, তারপর সবিস্ময়ে পশ্চাৎপদ হইল।

যুবতী—কে!

আগাগোড়া মিলিটারী বেশ পরিহিত একটি পুরুষ প্রবেশ করিল। কাঁধে ক্রস্-বেল্ট, কোমরে চামড়ার খাপে পিস্তল। চেহারা লম্বা অথচ গোলগাল, বড় বড় চোখ, গোঁফ কামানো। বয়স আন্দাজ ২৫।২৬। সে প্রবেশ করিয়া নিজেই দ্বার বন্ধ করিয়া দিল, একদৃষ্টে যুবতীর পানে চাহিতে চাহিতে ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

মিলিটারী—এতদিনে পেয়েছি!

যুবতী—(উৎকণ্ঠিত) কাকে চান? কে আপনি?

মিলিটারী—কে আমি চিনতে পারলে না! তা চিনবে কি করে? এখন যে তুমি—। (বাঙ্গভরে টুপি তুলিয়া) আমার নাম ক্যাপ্টেন অংশুমালী ধর। এবার চিনতে পারছ?

যুবতী—আপনাকে কখনও দেখিনি, নামও শুনিনি।

আচ্ছা, হলেই খবর দেবেন কিন্তু—

অংশুমালী যুবতীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, যুবতী দুই পা পিছাইয়া গেল।

অংশুমালী—(আবেগভরে) কমলা! তুমি আমাকে ভুলে গেছ! না এ হতে পারে না, তুমি মিছে কথা বলছ। পাঁচ বছরে তুমি আমাকে ভুলে যেতে পার না। মনে আছে, তুমি বলেছিলে জন্ম-জন্মান্তরেও তুমি আমাকে ভুলতে পারবে না?—

কমলা স্থিরদৃষ্টিতে অংশুমালীর পানে চাহিয়া রহিল। উৎকণ্ঠা আর নাই, মুখের ভাব স্বাভাবিক হইয়াছে।

কমলা—কিছু মনে করবেন না, কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বলুন তো?

অংশুমালী—তাও বলে দিতে হবে? তুমি কি আমার সঙ্গে পরিহাস করছ? সিমলা পাহাড়ে দেখা হয়েছিল। আমি তখন মিলিটারী ট্রেনিং নিচ্ছি, আর তুমি গিয়েছিলে বেড়াতে। এবার মনে পড়েছে? (কমলা অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়িল) এখনও মনে পড়ছে না? আমার চেহারা কি এতই বদ্‌লে গেছে? তুমি কিন্তু ঠিক তেমনি আছ, এই পাঁচ বছরে একটুও বদলাওনি।

কমলা—তা হবে। —আচ্ছা, আপনি এখানে আমার সন্ধান পেলেন কি করে?

অংশুমালী—সন্ধান কি সহজে পেয়েছি! আজ ছ'মাস হ'ল ফ্রন্ট থেকে ফিরেছি, সেই থেকে ক্রমাগত তোমার খোঁজ করে বেড়াচ্ছি। তুমি যে ঠিকানা দিয়েছিলে, সেখানে গিয়ে দেখি তুমি নেই—পাগলের মত চারিদিকে খুঁজে বেড়াতে লাগলুম। তারপর হঠাৎ খবর পেলুম তোমার বিয়ে হয়ে গেছে, তুমি এখানে আছ—

কমলা—বিয়ে হয়ে গেছে জেনেও এলেন?

অংশুমালী—হ্যাঁ, হাজার বার বিয়ে হলেও তুমি আমার—চিরদিনের জন্যে আমার। কমলা, গত পাঁচ বছর আমি পৃথিবীময় যুদ্ধ করে বেড়িয়েছি। কখনও প্রশান্ত মহাসাগরে, কখনও আফ্রিকার মরুভূমিতে। কিন্তু যেখানেই থাকি, তোমাকে এক মুহূর্তের জন্যে ভুলতে পারিনি। কানের কাছে যখন কামান গর্জন করেছে, মাথার ওপর বিমান বোমারুর বজ্রনাদ শুনেছি, তখনও তোমার ঐ মুখখানি আমার চোখের সামনে ভেসেছে—এ ভালবাসার চেয়ে কি বিয়ে বড়?

কমলা—বসুন বসুন, আপনি বড় উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।—চা খাবেন?

অংশুমালী—চা খেতে আসিনি। আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

কমলা—সে কি! কোথায় নিয়ে যাবেন?

অংশুমালী—আর্মি-নেভি হোটেলে, যেখানে আমি থাকি। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।

কমলা—কিন্তু সেটা কি ভাল দেখাবে?

অংশুমালী—বিয়ে-ফিয়ে আমি মানি

না—ওসব সংস্কার। ভালবাসাই হচ্ছে আসল জিনিস।

কমলা—কিন্তু—

অংশুমালী—কিন্তু নয়। কোনও কথা শুনব না, আমার সঙ্গে আসতে হবে। আজ এস্পার কি ওস্পার। এস—। (কমলা সোফায় বসিয়া পড়িল)—আসবে না? তবে এই দেখ পিস্তল।

অংশুমালী কোমর হইতে পিস্তল বাহির করিয়া কমলার দিকে নির্দেশ করিল।

কমলা—আমাকে খুন করবেন? তবে যে বললেন ভালবাসেন!

অংশুমালী—ভালবাসি বলেই খুন করব। খুন করে ফাঁসি যাব। ওঠ—চল আমার সঙ্গে। আসবে না? দেখ, তিন গুণতে যত সময় লাগে, ততক্ষণ সময় দিচ্ছি, তারপরই গুড়ুম। ওয়ান্—টু—থ্রি! শুনলে না কথা? আচ্ছা আবার বলছি—ওয়ান—টু—

কমলা—(দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) তাহলে সত্যি কথা বলতে হ'ল। আপনি ভারি চমৎকার লোক, তাই বলতে কষ্ট হচ্ছে।

অংশুমালী—সত্যি কথা? কী সত্যি কথা?

কমলা—আমি কমলা নই, কমলার ছোট বোন অমলা।

অংশুমালী—(পিস্তল নামাইয়া) কমলা নও! হতেই পারে না, তুমি অবিকল কমলা। দু'জন মানুষের কখনও একরকম চেহারা হয়!

অমলা—আমাদের বোনে-বোনে প্রায় একরকম চেহারা। পাঁচ বছর আগে দিদি আমার মতই দেখতে ছিল।

অংশুমালী পিস্তল খাপে রাখিয়া হতাশভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

অংশুমালী—কিন্তু, কিন্তু—কমলা তাহলে কোথায়?

অমলা—দিদিকে মেটার্নিটি হোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—তার ছেলেপিলে হবে।

অংশুমালী—(মাথায় হাত দিয়া) কমলা—ছেলেপিলে—! যাকে আমি পাঁচ বছর ধরে এত ভালবেসেছি—যে আমাকে এত ভালবেসেছে—

অমলা—ঐখানে আপনার একটু ভুল হয়েছে।

অংশুমালী—ভুল? কি ভুল?

অমলা—দিদি ভারি ফাজিল, ভারি দুষ্টু। আপনার মতন—ইয়ে—ভালমানুষ পেলে তাকে বাঁদর-নাচানো চিরদিনের অভ্যেস।

অংশুমালী—(তড়িদ্বেগে উঠিয়া) ক... বাঁদর-নাচানো! আমাকে বাঁদর নাচা... অসহ্য। আমি চললুম।

অংশুমালী দ্বারের দিকে চলিল।

অমলা—চা খেয়ে যাবেন না?

অংশুমালী—(সগর্জনে) না।

দ্বার পর্যন্ত গিয়া অংশুমালী দাঁড়াইল, ঘাড় ফিরাইয়া অমলার পানে চাহিল।

অংশুমালী—তোমার কি নাম বললে?

অমলা—অমলা।

অংশুমালী—হুঁ। (দু'পা ফিরিয়া আসিল) তোমার বিয়ে হয়েছে?

অমলা—না, এখনও হয়নি।

অংশুমালী—হুঁ। (এদিক-ওদিক চাহিয়া হঠাৎ) আমাকে বিয়ে করবে?

অমলা—(উঠিয়া) সে কি! আপনি দিদিকে এত ভালবাসেন, কামান গর্জনের মধ্যেও তাকে ভোলেন নি। আর আমাকে দেখেই ভুলে গেলেন?

অংশুমালী—না না—মানে—তুমিও তার মতন দেখতে কিনা—অর্থাৎ আমাকে বিয়ে করবে?

অমলা—আপনি তো বিয়ে-ফিয়ে মানেন না—ওসব কুসংস্কার—

অংশুমালী—হাঁ—না—আসল কথা—করবে বিয়ে?

অমলা—দেখুন ক্যাপ্টেন ধর, আপনি সব দিক দিয়েই সুপাত্র, কিন্তু—আমার উপায় নেই।

অংশুমালী—(আরও কাছে আসিয়া) কেন? কেন উপায় নেই?

অমলা—আবার পিস্তল বার করবেন নাকি?

অংশুমালী—না না—মানে—কেন?

অমলা—বাধা আছে।

অংশুমালী—বাধা! কৈ বাধা? কোথায় বাধা?

যে যুবক পাশের ঘরে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিল, অংশুমালীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিদ্রালুভাবে আলস্য ভাঙিল।

যুবক—এই যে বাধা।

অংশুমালী—আঁ—আপনি কে?

যুবক—আমিই বাধা। নাম জ্যোতিষ মিত্র।

অংশুমালী—মানে—

জ্যোতিষ—মানে আমার সঙ্গে অমলার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। আপনি একটু দেরিতে এসে পৌঁচেছেন।

অংশুমালী কিছুক্ষণ মূচ্ছিভঙ্গভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর মর্মভেদী নিশ্বাস ফেলিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। অমলা ও জ্যোতিষ একবার কটাক্ষ বিনিময় করিল।

জ্যোতিষ—আপনি দেখছি ভারি মুষড়ে পড়েছেন। আসুন, সিগারেট খান—

অংশুমালী নির্জীবভাবে সিগারেট লইল। জ্যোতিষ লাইটার জ্বালিয়া তাহা ধরাইয়া দিল।

অংশুমালী—(সিগারেটে লম্বা টান দিয়া) আমার জীবনটাই মরুভূমি হয়ে গেল। এর চেয়ে যদি যুদ্ধে মারা যেতাম—

জ্যোতিষ—সে কি কথা! (পাশে বসিয়া) দেখুন, আপনি খুব বেঁচে গেছেন, এদের দু'বোনের কাউকে যে বিয়ে করতে হল না, এটা আপনার পরম সৌভাগ্য। (নিশ্বাস ফেলিয়া) আমি ধরা পড়ে গেছি, পালাবার উপায় নেই।

অংশুমালী—কিন্তু আমার এখন কী উপায়?

অমলা—শুনেছি, এ অবস্থায় অনেকেই নাকি গেরুয়া-আলখাল্লা প'রে হিমালয়ের দিকে যাত্রা করেন। আপনিও যদি কিছুদিনের জন্যে—

জ্যোতিষ—না না, অমলা, তুমি ওসব বুদ্ধি দিও না। এমনিতেই সাধু-সন্নিসী এত বেড়ে গেছে যে, কুম্ভমেলায় জায়গা হয় না। তার ওপর মিলিটারীরাও যদি সন্নিসী হয়ে যায়, তখন দেশ রক্ষে করবে কে? নাগা পল্টন?

অমলা—আচ্ছা, তাহলে সন্নিসী হয়ে কাজ নেই।

জ্যোতিষ—দেখুন, আপনি এক কাজ করুন, বছর পাঁচেক চোখ-কান বুজে কাটিয়ে দিন। অমলাদের একটি ছোট বোন আছে, তার নাম রমলা। পাঁচ বছর পরে সে বেশ বড়-সড় হবে, তখন তাকে বিয়ে করবেন।

অমলা—রমলা পাঁচ বছর পরে আমাদের মতই দেখতে হবে। আমাদের তিন বোনেরই চেহারার ছাঁচ একরকম।

জ্যোতিষ—স্বভাবও একরকম।

অংশুমালী—(ঈষৎ সজীব হইয়া) রমলার বয়স কত?

জ্যোতিষ—এখন তের-চৌদ্দ হবে।

অংশুমালী—(সনিশ্বাসে) পাঁ—চ বছর!

অমলা—ও কিছু নয়, পাঁচটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। হয়তো ইতিমধ্যে আবার একটা যুদ্ধ বাধবে। আপনি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে রমলাকে বিয়ে করবেন।

জ্যোতিষ—যুদ্ধ-টুদ্ধ এখন ভুলে যান। রমলাকে যদি বিয়ে করতে চান, এক দণ্ড তাকে চোখের আড়াল করবেন না। ওদের স্বভাব আপনি জানেন না, একবার চোখের আড়াল করলে আর রক্ষে নেই, পট্ করে আর একজনকে বিয়ে করে ফেলবে। দেখছেন না, আমি অষ্ট প্রহর অমলাকে চোখে চোখে রেখেছি।—আমার পরামর্শ শুনুন, এখন থেকেই জোঁকের মত রমলার পেছনে লেগে যান, যদ্দিন না বিয়ে হয় কড়া নজর রাখবেন। এ যদি না করেন আপনার বিয়ের কোনও আশা নেই।

অংশুমালী—হুঁ। রমলা কোথায়?

অমলা—সে স্কুলে পড়ে, স্কুল হোস্টেলে থাকে। ছুটিতে বাড়ি আসে।

অংশুমালী—ও — তা—(বিষণ্ণভাবে উঠিয়া) আজ তাহলে উঠি।

অমলা—আবার কবে আসছেন?

অংশুমালী—আবার—মানে—দেখি—

টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। অমলা তাড়াতাড়ি গিয়া ফোন ধরিল।

অমলা—কে—জামাইবাবু? অ্যাঁ—ছেলে! আট পাউন্ড! দিদি ভাল আছে? বাঁচলুম। (ফোন রাখিয়া) ছেলে! দিদির ছেলে হয়েছে।

জ্যোতিষ—থ্রি চিয়ার্স!

অংশুমালী (ক্ষীণকণ্ঠে) থ্রি চিয়ার্স। এবার আমি যাই।

অমলা—চললেন? খোকার আট-কৌড়ের দিন কিন্তু আপনাকে আসতে হবে।

অংশুমালী—আটকৌড়ে? সে কবে?

অমলা—আজ থেকে আট দিনের দিন। নিশ্চয় আসবেন, আপনাকে কুলো বাজাতে হবে।

অংশুমালী—কুলো—তা—রমলা সেদিন আসবে নাকি?

অমলা—আসবে। তাকে স্কুল থেকে আনিয়ে নেব। বেশী দূরে নয় কলকাতার মধ্যেই।

অংশুমালী—আচ্ছা—আসব। টা টা!

জ্যোতিষ ও অমলা—টা টা!

অংশুমালী প্রস্থান করিল। তাহাকে বিদায় দিয়া জ্যোতিষ ও অমলা পরস্পরের খুব কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দুজনের মুখেই চাপা হাসি।

অমলা—কী মজা!

জ্যোতিষ—লোকটিকে তোমার বেশ পছন্দ হয়েছে দেখছি।

অমলা—বেশ মানুষ, তোমার মতন বিচ্ছু নয়। ও রকম মানুষ একটা বাড়িতে থাকা ভাল।

জ্যোতিষ—হ্যাঁ, যত ইচ্ছে নাচাতে পারবে। রমলারও মিলিটারীর দিকে ঝোঁক, ভালই হ'ল। খুব আহ্লাদ হ[illegible] তো?

অমলা—হচ্ছেই তো। এদিকে রমল[illegible] জন্যে একটি কাপ্তেন, ওদিকে দি[illegible] ছেলে—

জ্যোতিষ—তবে সন্দেশ খাওয়াও।

অমলা—(হাসিমুকুলিত মুখে) সন্দে[illegible] কোথায় পাব? বাড়িতে তো সন্দে[illegible] নেই।

জ্যোতিষ—সন্দেশ যদি না পা[illegible] সন্দেশের চেয়ে মিষ্টি জিনিস কেড়ে খা[illegible] আজকের দিনে মিষ্টিমুখ না ক[illegible] ছাড়ছি না।

জ্যোতিষ খপ্ করিয়া অমলার আঁচ[illegible] ধরিল।

অমলা—আঁ—না না—ছেড়ে দা[illegible] ভাল হবে না বলছি......আচ্ছা আচ্ছা সন্দেশ আছে, সন্দেশ আছে—পাশের ঘ[illegible] এস দিচ্ছি—

জ্যোতিষ অমলার আঁচল ধরি[illegible] পাশের ঘরের দিকে চলিল।

[যবনিকা]

গ্রীষ্ম ঃ অনুভূতি

মোহাম্মদ মাহ্ফুজ্উল্লাহ্

গ্রীষ্মের সুতীব্র দাহে জ্বলে মাটি করুণা-বিহীন,
আকাশে রোদের ছায়া ম্লান হয়ে দিগন্তের তীরে—
ক্রমে ক্রমে মিশে যায়, কোনো পাখী পরিচিত নীড়ে
হাঁপায় একান্ত-একা; তারপর শেষ হয় দিন ঃ
দুপুরের চিলেকোঠা মনে হয় আকাশে বিলীন—
অজস্র চিন্তার স্রোত, সঙ্গীহীন ক্ষুদ্র জানালায়
কা'রো দৃষ্টি মিশে থাকে ঃ বহু দূরে-দূরান্তে হারায়—
অশেষ তৃষ্ণায় কা'র পুলকের সুর রিন্-ঝিন!

আকাশে শিকারী চিল, উড়ন্ত সে পাখার আওয়াজে—
নিস্তব্ধ দুপুরে তবু অপরূপ সুরের মিছিল—
পার হয় এ আকাশ, পার হয়ে দিগন্তের তীর
কোথা যেনো মিশে যায়; যে আকাশ রোদ ঝিল্‌মিল
কিছু ছায়া রেখে যায়, গোধূলির ধূসর আবীর—
আলগোছে আঁকা থাকে। কোনো সুর ক্ষীণ হয়ে বাজে!

ব্রহ্মপুরা গাড়োয়াল

২

পরিব্রাজক হুয়েন সাংয়ের আমলে ব্রহ্মপুরার সীমানা কতদূর অবধি প্রসারিত ছিল, সে খোঁজ এখন আর কেউ নেয় না। কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তখনও পৌরাণিক ব্রহ্মপুরা ঐতিহাসিক গাড়োয়ালে এসে পৌঁছয়নি। অথচ সমগ্র পশ্চিম তিব্বত ভারতেরই একটা অংশ, এটি ঐতিহাসিক সত্য। ধর্মাচরণে, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে, সামাজিক রীতি ও অভ্যাসে—উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কম। এটা অস্পষ্ট নয় যে, তখনকার ব্রহ্মপুরার সীমানার মধ্যে ছিল কৈলাস পর্বতমালা ও তার শিখরচূড়া এবং তার সঙ্গে মানস সরোবর ও রাবণ হ্রদ। গঙ্গাকে মর্ত্যে আনার জন্য ভগীরথ শিবের তপস্যা করতে গিয়েছিলেন কৈলাসে—এই পৌরাণিক গল্পের ভিতরে যে সকল আধুনিক ভূতত্ত্ববিদ্ ভুল বার করতে চান, তাঁরাও কি ভ্রান্ত নন? তাঁরা বলেন, গাড়োয়ালের আধুনিক সীমানাস্থিত গোমুখে যখন গঙ্গা প্রথম দৃশ্যমান হয়, সেইটিই হলো গঙ্গার প্রথম জন্ম! এটা ভুল। গঙ্গার উৎপত্তি নির্ভুলভাবে যেখান থেকে হচ্ছে, অর্থাৎ বিগলিত তুষারস্তর যেখানে প্রথম তরলো পরিণত হচ্ছে,—সেই নিশ্চিত ভূভাগটি যে কৈলাস গিরিশ্রেণীর মধ্যে নয়, এর নিঃসংশয় প্রমাণ কারো হাতে নেই। কেদারনাথ ও বদরিনাথের চূড়ার পিছনে তিনটি বিরাট গিরিশিখর দণ্ডায়মান। শ্বেতবরুণ, শিবলিঙ্গ এবং সুমেরু। এই পর্বতচূড়াদলের কেন্দ্রে গোমুখ থেকে নিঃস্রাবিত গঙ্গার শোভা পৃথিবীর যে কোনো দেশের বিজ্ঞানীদের কাছেও পরম বিস্ময়কর। কিন্তু এই সকল শিখরদেশের উপর দিয়ে যে হিমবাহ স্তরে স্তরে শত শত মাইলব্যাপী প্রসারিত রয়েছে, তার সেই জটিল তলপথের সন্ধান করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ভূতত্ত্ববিদরা এখানেই নিরস্ত হয়ে বলেছেন যে, গঙ্গার উৎপত্তি গাড়োয়াল সীমানার মধ্যেই। বাল্মীকি বলেছেন, বেগবতী ভাগীরথীর খরতর প্রবাহ লক্ষ্য করে কৈলাসপতির টনক নড়ে। যদি অবাধ মুক্তির পথে এই উন্মাদিনী দিশাহারাকে ছেড়ে দেওয়া যায়, তবে কুলনাশিনীর হাতে সর্বনাশ ঘটে যাবে। আকাশের দেবতারা ভয়ে কম্পমান, সৃষ্টি বুঝি রসাতলে যায়! কিন্তু সত্যই ইন্দ্রের ঐরাবত যখন ভেসে গেল, তখন দেবাদিদেব কৈলাসপতি আর স্থির থাকতে পারলেন না। গঙ্গাকে সংহত করে তিনি তাঁর জটিল জটারাশির মধ্যে উদ্দামিনীকে ধারণ করলেন! সেই জটারাশির মধ্যে গঙ্গা হারালেন তাঁর পথ। গোমুখের উত্তরভাগে তুষারচূড়াগুলির পার্বত্য জটিলতাকে মহাদেবের জটাজটিলতা মনে করলে ভুল হবে না। তুষার নদী ও হিমবাহস্তরের ফাঁকে ফাঁকে ঘনকৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরচূড়ারা মাঝে মাঝে মাথা তুলে রয়েছে। যেমন সুদূর দক্ষিণে মৈনাক পর্বতশ্রেণী সাগরলহরীর ভিতর থেকে মাথা তুলেছে সেতুবন্ধের সমুদ্রপ্রণালীতে, ঠিক এখানেও তেমনি,—তুষারশুভ্র হিমসাগরের অন্তহীন দিকদিগন্তের ভিতর থেকে কালো কালো পাথরের চূড়া দাঁড়িয়ে উঠেছে। এখানকার তুষার-তলপথের সঙ্গে কৈলাস পর্বতমালার যোগাযোগ অদৃশ্যমান, কিন্তু অস্পষ্ট নয়। ভূতত্ত্ববিদের হিসাব থেকেই ধরে নেওয়া

অংশুমালী—হুঁ। রমলা কোথায়?

অমলা—সে স্কুলে পড়ে, স্কুল হোস্টেলে থাকে। ছুটিতে বাড়ি আসে।

অংশুমালী—ও — তা—(বিষণ্ণভাবে উঠিয়া) আজ তাহলে উঠি।

অমলা—আবার কবে আসছেন?

অংশুমালী—আবার—মানে—দেখি—

টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। অমলা তাড়াতাড়ি গিয়া ফোন ধরিল।

অমলা—কে—জামাইবাবু? অ্যাঁ—ছেলে! আট পাউন্ড! দিদি ভাল আছে? বাঁচলুম। (ফোন রাখিয়া) ছেলে! দিদির ছেলে হয়েছে।

জ্যোতিষ—থ্রি চিয়ার্স!

অংশুমালী (ক্ষীণকণ্ঠে) থ্রি চিয়ার্স। এবার আমি যাই।

অমলা—চললেন? খোকার আট-কৌড়ের দিন কিন্তু আপনাকে আসতে হবে।

অংশুমালী—আটকৌড়ে? সে কবে?

অমলা—আজ থেকে আট দিনের দিন। নিশ্চয় আসবেন, আপনাকে কুলো বাজাতে হবে।

অংশুমালী—কুলো—তা—রমলা সেদিন আসবে নাকি?

অমলা—আসবে। তাকে স্কুল থেকে আনিয়ে নেব। বেশী দূর নয় কলকাতার মধ্যেই।

অংশুমালী—আচ্ছা—আসব। টা টা!

জ্যোতিষ ও অমলা—টা টা!

অংশুমালী প্রস্থান করিল। তাহাকে বিদায় দিয়া জ্যোতিষ ও অমলা পরস্পরের খুব কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দুজনের মুখেই চাপা হাসি।

অমলা—কী মজা!

জ্যোতিষ—লোকটিকে তোমার বেশ পছন্দ হয়েছে দেখছি।

অমলা—বেশ মানুষ, তোমার মতন বিচ্ছু নয়। ও রকম মানুষ একটা বাড়িতে থাকা ভাল।

জ্যোতিষ—হ্যাঁ, যত ইচ্ছে নাচাতে পারবে। রমলারও মিলিটারীর দিকে ঝোঁক, ভালই হ'ল। খুব আহ্লাদ হচ্ছে তো?

অমলা—হচ্ছেই তো। এদিকে রমলার জন্যে একটি কাপ্তেন, ওদিকে দিদির ছেলে—

জ্যোতিষ—তবে সন্দেশ খাওয়াও।

অমলা—(হাসিমুকুলিত মুখে) সন্দেশ কোথায় পাব? বাড়িতে তো সন্দেশ নেই।

জ্যোতিষ—সন্দেশ যদি না পাই সন্দেশের চেয়ে মিষ্টি জিনিস কেড়ে খাব। আজকের দিনে মিষ্টিমুখ না করে ছাড়ছি না।

জ্যোতিষ খপ্ করিয়া অমলার আঁচল ধরিল।

অমলা—আঁ—না না—ছেড়ে দাও ভাল হবে না বলছি......আচ্ছা আচ্ছা সন্দেশ আছে, সন্দেশ আছে—পাশের ঘরে এস দিচ্ছি—

জ্যোতিষ অমলার আঁচল ধরিয়া পাশের ঘরের দিকে চলিল।

[যবনিকা]

গ্রীষ্ম ঃ অনুভূতি

মোহাম্মদ মাহ্ফুজ্উল্লাহ্

গ্রীষ্মের সুতীব্র দাহে জ্বলে মাটি করুণা-বিহীন,
আকাশে রোদের ছায়া ম্লান হয়ে দিগন্তের তীরে—
ক্রমে ক্রমে মিশে যায়, কোনো পাখী পরিচিত নীড়ে
হাঁপায় একান্ত-একা; তারপর শেষ হয় দিন ঃ
দুপুরের চিলেকোঠা মনে হয় আকাশে বিলীন—
অজস্র চিন্তার স্রোত, সঙ্গীহীন ক্ষুদ্র জানালায়
কা'রো দৃষ্টি মিশে থাকে ঃ বহু দূর-দূরান্তে হারায়—
অশেষ তৃষ্ণায় কা'র পুলকের সুর রিন্-ঝিন!

আকাশে শিকারী চিল, উড়ন্ত সে পাখার আওয়াজে—
নিস্তব্ধ দুপুরে তবু অপরূপ সুরের মিছিল—
পার হয় এ আকাশ, পার হয়ে দিগন্তের তীর
কোথা যেনো মিশে যায়; যে আকাশ রোদ ঝিল্মিল
কিছু ছায়া রেখে যায়, গোধূলির ধূসর আবীর—
আলগোছে আঁকা থাকে। কোনো সুর ক্ষীণ হয়ে বাজে!

ব্রহ্মপুরা গাড়োয়াল

২

পরিব্রাজক হুয়েন সাংয়ের আমলে ব্রহ্মপুরার সীমানা কতদূর অবধি প্রসারিত ছিল, সে খোঁজ এখন আর কেউ নেয় না। কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এখনও পৌরাণিক ব্রহ্মপুরা ঐতিহাসিক গাড়োয়ালে এসে পৌঁছয়নি। অথচ সমগ্র পশ্চিম তিব্বত ভারতেরই একটা অংশ, এটি ঐতিহাসিক সত্য। ধর্মাচরণে, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে, সামাজিক রীতি ও অভ্যাসে—উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কম। এটা অস্পষ্ট নয় যে, তখনকার ব্রহ্মপুরার সীমানার মধ্যে ছিল কৈলাস পর্বতমালা ও তার শিখরচূড়া এবং তার সঙ্গে মানস সরোবর ও রাবণ হ্রদ। গঙ্গাকে মর্ত্যে আনার জন্য ভগীরথ শিবের তপস্যা করতে গিয়েছিলেন কৈলাসে—এই পৌরাণিক গল্পের ভিতরে যে সকল আধুনিক ভূতত্ত্ববিদ্ ভুল বার করতে চান, তাঁরাও কি ভ্রান্ত নন? তাঁরা বলেন, গাড়োয়ালের আধুনিক সীমানাস্থিত গোমুখে যখন গঙ্গা প্রথম দৃশ্যমান হয়, সেইটিই হলো গঙ্গার প্রথম জন্ম! এটা ভুল। গঙ্গার উৎপত্তি নির্ভুলভাবে যেখান থেকে হচ্ছে, অর্থাৎ বিগলিত তুষারস্তর যেখানে প্রথম তারল্যে পরিণত হচ্ছে,—সেই নিশ্চিত ভূভাগটি যে কৈলাস গিরিশ্রেণীর মধ্যে নয়, এর নিঃসংশয় প্রমাণ কারো হাতে নেই। কেদারনাথ ও বদরিনাথের চূড়ার পিছনে তিনটি বিরাট গিরিশিখর দণ্ডায়মান। শ্বেতবরুণ, শিবলিঙ্গ এবং সুমেরু। এই পর্বতচূড়াদলের কেন্দ্রে গোমুখ থেকে নিঃস্রাবিত গঙ্গার শোভা পৃথিবীর যে কোনো দেশের বিজ্ঞানীদের কাছেও পরম বিস্ময়কর। কিন্তু এই সকল শিখরদেশের উপর দিয়ে যে হিমবাহ স্তরে স্তরে শত শত মাইলব্যাপী প্রসারিত রয়েছে, তার সেই জটিল তলপথের সন্ধান করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ভূতত্ত্ববিদরা এখানেই নিরস্ত হয়ে বলেছেন যে, গঙ্গার উৎপত্তি গাড়োয়াল সীমানার মধ্যেই। বাল্মীকি বলেছেন, বেগবতী ভাগীরথীর খরতর প্রবাহ লক্ষ্য করে কৈলাসপতির টনক নড়ে। যদি অবাধ মুক্তির পথে এই উন্মাদিনী দিশাহারাকে ছেড়ে দেওয়া যায়, তবে কুল-নাশিনীর হাতে সর্বনাশ ঘটে যাবে। আকাশের দেবতারা ভয়ে কম্পমান, সৃষ্টি বুঝি রসাতলে যায়! কিন্তু সত্যই ইন্দ্রের ঐরাবত যখন ভেসে গেল, তখন দেবাদিদেব কৈলাসপতি আর স্থির থাকতে পারলেন না। গঙ্গাকে সংহত করে তিনি তাঁর জটিল জটারাশির মধ্যে উন্মাদিনীকে ধারণ করলেন। সেই জটারাশির মধ্যে গঙ্গা হারালেন তাঁর পথ। গোমুখের উত্তরভাগে তুষারচূড়াগুলির পার্বত্য জটিলতাকে মহাদেবের জটাজটিলতা মনে করলে ভুল হবে না। তুষার নদী ও হিমবাহস্তরের ফাঁকে ফাঁকে ঘনকৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরচূড়ারা মাঝে মাঝে মাথা তুলে রয়েছে। যেমন সুদূর দক্ষিণে মৈনাক পর্বতশ্রেণী সাগর-লহরীর ভিতর থেকে মাথা তুলেছে সেতু-বন্ধের সমুদ্রপ্রণালীতে, ঠিক এখানেও তেমনি,—তুষারশুভ্র হিমসাগরের অন্তহীন দিকদিগন্তের ভিতর থেকে কালো কালো পাথরের চূড়া দাঁড়িয়ে উঠেছে। এখানকার তুষার-তলপথের সঙ্গে কৈলাস পর্বতমালার যোগাযোগ অদৃশ্যমান, কিন্তু অস্পষ্ট নয়। ভূতত্ত্ববিদের হিসাব থেকেই ধরে নেওয়া

উখীমঠ

যায়, কোনো এককালের প্রলয়ে অর্থাৎ হিমালয়ের অন্তস্তলের ভয়াবহ কাঁপনে উপরস্থ পার্বত্যলোকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে! সেই বিপর্যয়ে পাহাড় হয় স্থানচ্যুত, বিদীর্ণ হয় পার্বত্যপ্রকৃতি, নদীনালা তাদের আপন পথ সৃষ্টি করে এবং বন্দিনী ভাগীরথী গঙ্গোত্তরী হিমবাহের বিচিত্র জটিলতা অতিক্রম করে গোমুখ থেকে ছুটে নেমে আসেন নীচের দিকে। সুতরাং এখন গঙ্গার প্রথম প্রকাশ গাড়োয়ালে। কিন্তু এই গাড়োয়ালের উত্তর সীমানা থেকে যেমন উত্তরকাশীর পথ ধরে নেমে এসেছেন ভগবতী গঙ্গা, তেমনি একই অঞ্চল থেকে অলকানন্দা চলে গিয়েছেন বদরিকাশ্রমের দিকে। তারপর যোশীমঠের নীচে ধবলীগঙ্গার সঙ্গে মিলেছেন। গঙ্গোত্তরীর দিকে গঙ্গার সঙ্গে যে নদীর প্রথম যোগ হয়েছে, তার নাম কেদারগঙ্গা,—এ নদীর উৎপত্তি কেদারনাথ পর্বতের মধ্যে।

দেবতাত্মা হিমালয়ের সমস্ত কাহিনী ও পরিচয়ের সঙ্গে ভাগীরথীর ইতিহাস আগাগোড়া বিজড়িত। যে হেতু গঙ্গার মূলধারা হিমালয়ের হিমবাহের সঙ্গে যুক্ত, এবং এর জলধারার চিরস্থায়ী সরবরাহ নিশ্চিত,—সেই কারণে ভাগীরথীর তীর-ভূমিতে গ'ড়ে উঠেছিল ভারতের প্রথম সভ্যতা। ভারত-সংস্কৃতির প্রথম মন্ত্র হলো গঙ্গার মন্ত্র। প্রথম মন্দির উঠেছিল গঙ্গার কূলে, প্রথম জনপদ সৃষ্টি হয়েছিল গঙ্গার তটে। সহস্রধারা চারিদিক থেকে নেমে এসে গঙ্গায় মিলে যেমন তাকে ঐশ্বর্যশালিনী করেছে, তেমনি গঙ্গাকে কেন্দ্র করে ভারত-সভ্যতা ও ঐতিহ্যের সহস্রধারা চলে গিয়েছে নানা দিকে। সগর রাজবংশের ষাট হাজার সন্তানের ভস্মীভূত দেহ গঙ্গার পুণ্য-স্পর্শে জীবনলাভ করেছিল, একথা সেদিনের মতো আজকেও সত্য। কেননা, প্রকৃতির কোনো যাদুমন্ত্রবলে যদি আজ গঙ্গার ধারা ব্রহ্মপুত্রার কোথাও হঠাৎ শুকিয়ে যায়, তবে ভারতের দশ কোটিরও বেশী নরনারীর জীবন বিপন্ন হবে। গঙ্গাকে কেন্দ্র করেই উত্তর ভারতের যত প্রাকৃতিক সম্পদ, গঙ্গাই হলো উত্তর ভারতবাসীর জীবনের মূলমন্ত্র। গঙ্গা মানে মর্ত্যগামিনী—যিনি গতিশীলা। গতি মানেই জীবন, গতিহীনতাই মৃত্যু!

জনৈক বিদেশী পর্যটকের কয়েকটি কথা এই সূত্রে মনে পড়ছে। তিনি গঙ্গা প্রসঙ্গে বলেছেন, "পৃথিবীতে নদীর সংখ্যা কম নয়। দু' হাজার থেকে চার হাজার মাইল লম্বা নদী কয়েকটি আছে বৈকি। আমেরিকায় মিসিসিপি, রাশিয়ায় লেনা, চীনে ইয়াং-সি-কিয়াং, দক্ষিণ আমেরিকায় আমেজান, মিশরে নাইল,—এরা কোটি কোটি মানুষের জন্য ফসল ফলায়, জীবন দান করে, মানুষের ঐহিক উন্নতির পথে এসব নদী প্রধান সহায়! কিন্তু গঙ্গার উদ্দেশে আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের কোটি কোটি নরনারী তাদের প্রতিদিনকার জীবনে যে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে থাকে, তার তুলনা পৃথিবীতে কোথাও নেই। স্তব-স্তুতি, পূজা, প্রীতি, মন্ত্রপাঠ, প্রার্থনা, ভক্তি ও অনুরাগ,—মানুষের হৃদয়ের সর্ব-শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রতি সময়ে একটি নদীর প্রতি নিবেদিত হচ্ছে, এই বিচিত্র দৃশ্য বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে যিনি না দেখেছেন তিনি বিশাল ভারতের মহাজনতাকে কোন-দিন চিনতে পারবেন না!" গঙ্গাকে বলা হয় পতিতপাবনী এবং সর্বপাপনাশিনী। পর্যটক মশায় এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, "এ কথাগুলির মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত। গঙ্গার জলে এমন সব ধাতব পদার্থ মিশ্রিত যে, এর জলধারা কখনও দোষদুষ্ট হয় না, অথবা এর জল দীর্ঘকাল কোনো পাত্রে জমা রাখলে কোনো বীজ জন্মে না। গঙ্গায় অবগাহন স্নান করলে শরীরে চর্মরোগ আসে না এবং ব্যাধি বিকার নষ্ট হয়,—মন প্রফুল্লিত হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, অবগাহনের পর সর্বক্ষণ নিজেকে পবিত্র বলে মনে হতে থাকে। গঙ্গায় কোনো মালিন্য দাঁড়ায় না এবং মড়ক ও মহামারীর বিপজ্জনক বীজাণুকে অতি অল্প সময়ে এর জল নষ্ট করে দেয়। যোগে, পার্বণে, গ্রহণে, পুণ্যতিথিতে, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রতিদিন প্রাতঃকালে একটি নদীতে অবগাহন স্নানের মধ্যে করযোড়ে দাঁড়িয়ে প্রভাতসূর্যকে বন্দনা করছে,—এ কাজটিও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। কেননা দেহের প্রতি লোমকূপের দ্বারা একদিকে তারা গ্রহণ করছে ধাতবপদার্থ মিশ্রিত প্রবহমান জল, অন্য দিকে দুই চোখের একাগ্র দৃষ্টির দ্বারা সূর্যের রঞ্জনরশ্মি। ভারতের সমস্ত শাস্ত্রানুশাসন ও ধর্মানুষ্ঠান পর্যালোচনা করলে বৈজ্ঞানিক সত্যের ব্যাখ্যা স্পষ্টতই চোখে পড়ে!"

গঙ্গার পথই হলো ব্রহ্মপুত্রার পথ। হিমালয়ের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হলো ব্রহ্মপুত্রা। ভারতের অধ্যাত্ম সংস্কৃতির মুকুটমণি হলো ব্রহ্মপুত্রা,—কোনো সন্দেহ নেই।

সমগ্র হিমালয়ে আছে অনেক পর্বতচূড়া, অনেক তুষারকিরীট, কিন্তু ব্রহ্মপুরার গিরিশৃঙ্গমালার মতো পূজো পায় না কেউ। অমন যে গোরীশৃঙ্গ আর গোরীশঙ্কর, অমন যে ধবলগিরি আর কাঞ্চনজঙ্ঘা, অমরাবতীর তীরে অমন যে ভৈরবঘাটের নয়নাবমোহন চূড়া, অমন যে ধবলাধার আর নাঙ্গা আর হরমুখ, ওরা ওদের সমস্ত অমর্ত্যমহিমা সত্ত্বেও কেমন যেন অনাদরে পড়ে রইলো এখানে ওখানে। কৃষ্ণগিরির দিকে তাকালে না কেউ, পীর পাঞ্জাল সরে রইলো উপেক্ষিত হয়ে, কোথায় রইলো কোলাহাই আর শেষনাগের হিমবাহ তাদের অভ্রভেদী গৌরব নিয়ে,—কিন্তু সবাই চললো গঙ্গার ধারে ধারে। ব্রহ্মপুরার শিরা উপশিরায় গঙ্গা, শাখা-প্রশাখায় গঙ্গা। প্রতি মানুষের কণ্ঠে, প্রতি জপের মন্ত্রে গঙ্গা। ভক্তির পিছনে আছে কৃতজ্ঞতাবোধ, অনুরাগের পিছনে আছে আনন্দ। গঙ্গার জলে জীবনধারণ করি তাই গঙ্গা পূজ্য, মেঘের বৃষ্টি থেকে খাদ্যলাভ করি, তাই আকাশ সুন্দর, হিমালয় গিরিশ্রেণী দেশের প্রকৃতিকে সমৃদ্ধ করে, তাই হিমালয় আরাধ্য। উপকার পাই বলেই ভক্তি করি, সঞ্জীবনী রস পাই বলেই ভালোবাসি। আপাতদৃষ্টিতে যেটি অহেতুক, পিছনে হয়ত তার বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত। গঙ্গার মতো প্রাণদায়িনী নদী আছে বলেই ব্রহ্মপুরা স্বর্গসুষমামণ্ডিত। নচেৎ গঙ্গাহীন গাড়োয়াল মানুষকে কোনোদিন আকর্ষণ করতো না।

ব্রহ্মপুরার মতো হিমালয়ের আর কোনো অঞ্চল মানুষের এত প্রিয় নয়, তাই তীর্থযাত্রীদলের কলকণ্ঠে ব্রহ্মপুরা নিত্য মুখরিত। গোরীশৃঙ্গ মানুষের দৈহিক বিক্রমকে আহ্বান করে, কিন্তু সেখানে তীর্থযাত্রীর আকর্ষণ নেই। নেপালে আছেন ভদ্রকালী আর গুহ্যেশ্বরী মন্দির,—পীঠস্থান, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটি একান্ন পীঠের অন্যতম, তার বেশী কিছু নয়। আছেন পশুপতিনাথ, কিন্তু তিনি ব্রহ্মপুরার তুলনায় আধুনিক। কাশ্মীরে আছে গুহাতীর্থ অমরনাথ, কিন্তু এই তীর্থস্থানের বয়স কমবেশী দেড়শো বছর মাত্র। পাঞ্জাব হিমালয়ের কাংড়ায় আছেন বজ্রেশ্বরী, আর কিছুদূরে গিয়ে জ্বালামুখীতে কালিধর পাহাড়ের উপরে দেবী
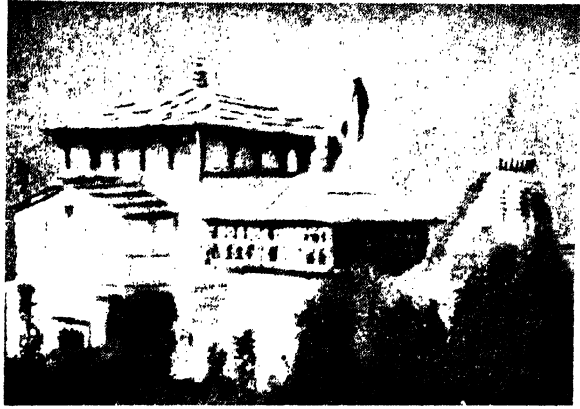
যোশীমঠের মন্দির

জ্বালামুখী অম্বিকা এবং উন্মত্ত ভৈরবের মন্দির, কিংবা ধবলাধার গিরিশ্রেণীর মধ্যে বাণগঙ্গার উপরে বৈজনাথের বিশাল মন্দির,—এরা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু আকর্ষণ কম। নদীর বহুমুখী ধারা এদের আশেপাশে নেই, স্থানীয় অঞ্চল ছেড়ে তাই বাইরের দিকে এদের যোগাযোগ সামান্যই। হিমালয়ের গিরিজটলা পেরিয়ে বহু দুর্গম অঞ্চলে আছে অগণ্য দেবস্থান, কিন্তু মানুষের কল্যাণকল্পনাকে তারা একান্ত নিবিড়ভাবে অনুপ্রাণিত করে না—যেমন করে গঙ্গাবিধৌত ব্রহ্মপুরা। সেই কারণে আচার্য শংকরের অধ্যাত্ম প্রতিভা তার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি লাভ করে এখানে। দেড় হাজার বছর হতে চললো তিনি গিয়েছিলেন উত্তরধামে অর্থাৎ ব্রহ্মপুরায়, কিন্তু তাঁর যাবার বহু আগে,—তার তারিখও নেই, নিরীখও নেই—এই গঙ্গাপথ ধরে গিয়েছে ভারতের জনতা যুগযুগান্তকাল ধরে। শুধু প্রস্তরমন্দির তীর্থ নয়, কারণ সে হলো মানুষের তৈরি। নিজের হাতে মানুষ মন্দির বানায়, নিজের হাতে ছেনি দিয়ে কেটে মানুষ মনের মতন বিগ্রহ তৈরি করে,—আবার তারই নীচে ঠোকে নিজের মাথা। মন্দিরটা তীর্থ নয়, এমন কি দেবদর্শনও নয়। কেননা সংখ্যাতীত দেবমন্দির ত হাতের কাছেই রয়েছে! কলকাতা অঞ্চলে অন্তত পাঁচ শো দেবমন্দির দাঁড়িয়ে, কিন্তু কে রাখছে তাদের হিসেব? কাশীতে যাও,—সেখানে তো পথেঘাটে; অসতর্ক পা বাড়ালে শিবের গায়ে হোঁচট খেতে হয়! যেখানে খুশি, যে কোনো প্রদেশে! করাচীতে যাও, যাও গোয়াতে, পণ্ডিচেরীতে, শ্রীলঙ্কায়, চট্টগ্রামে,—কোথায় নেই দেবমন্দির? তবু ভারতের লোকে যুগে যুগে বলে এসেছে ব্রহ্মপুরার তুলনা নেই ভূ-ভারতে! মন্দির নয়, পথই হোলো তীর্থ, এবং সেটি হলো গঙ্গাবতরণের পথ। পথ ফুরোলেই তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ, অর্থাৎ পূর্ণযাত্রা। মন্দির নয়, দেবতা নয়, তীর্থপরিক্রমা। গঙ্গাপথে যাবো, দেখবো তার উৎপত্তি ব্রহ্মলোকের গিরিসংকটে এবং গঙ্গাকে অনুসরণ করে যাবো যতদূর তার গতি,—এরই নাম তীর্থ পরিক্রমা। এই আনন্দলাভের নাম দেওয়া হয়েছে ভগবৎভক্তি, এই গঙ্গাপথকে বলা হয়েছে তীর্থযাত্রা! কিন্তু পথের সঙ্কেত কই? হৃদয়ানুরাগকে প্রকাশ করবো কোন্ কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে? তীর্থযাত্রার প্রতীক কই? তখন বানানো হলো মন্দির! বিষ্ণু হলেন সৃষ্টিকর্তা, সুতরাং তাঁকে রাখো শীর্ষস্থানে,—তাঁর সঙ্গে গঙ্গাকে জড়িয়ে নাম রাখো বিষ্ণুগঙ্গা। একই ধারা, কিন্তু উত্তরাপথে তাঁর নাম হয়েছে অলকানন্দা। স্বর্গলোকের সমস্ত হাস্যোচ্ছলতা এনেছেন তিনি, এসেছেন উদ্দাম আনন্দে। পলকে পলকে নীলনয়নার অপরূপ নগ্নশোভা ঢাকা পড়ছে আলুলায়িত ঘনকৃষ্ণ কেশ

রাশিতে। হঠাৎ আবার কোথাও তিনি থমকে দাঁড়িয়েছেন—শত শত বৈদূর্যমণির বিচ্ছুরিত জ্যোতির্ময়তা নিয়ে,—এপাশে ওপাশে উপবন আর তপোবন, শত বরণের গোলাপ আর মল্লিকার সুগন্ধে আবেশ লেগেছে তাঁর নয়নের নীলাভায়। কিন্তু সে ক্ষণকাল—তারপর আবার গিরিসংকটের পঞ্জরাস্থি ভেদ করে তিনি চলেছেন মর্ত্য অমরাবতীর আশে-পাশে—যেখানকার চন্দ্রহসিত মায়াকাননে নেমে আসে অলকাপুরীর অপ্সরীরা যৌবন-উৎসবে।

দেবতাত্মা হিমালয়ের রহস্যালোকে এই অলকাপুরীর দর্শনপিপাসায় ছোটে মর্ত্যবাসী তীর্থযাত্রীরা। দুস্তর চড়াই পথে বুক ফেটে মরেছে কত মানুষ, নিঃশ্বাসের বায়ু খুঁজে না পেয়ে মরেছে, অভ্রভেদী গিরিচূড়ার সংকীর্ণ সংকটে পদস্খলন ঘটে মরেছে কত লোক, তুষার-ঝটিকায় আহত-প্রতিহত হয়ে মরেছে, ব্যাধি-পথশ্রম-উপবাস সইতে না পেরেও মরেছে কত শত,—ইতিহাসে তার হিসাব নেই কোথাও। বন্য জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পায়নি, বিষধর ভীষণ সর্প ক্ষমা করেনি, তুষারদংশনে ক্ষত-বিক্ষত দেহের অবসান,—তবু কোনোকালের মানুষকে স্থির থাকতে দেয়নি ওই ব্রহ্মপুরার গঙ্গাপথ। গিরিসংকটের ভিতর দিয়ে যেমন চলেছে উন্মাদিনী গঙ্গার দুরন্ত জলধারা, তেমনি চলেছে তার পাশে-পাশে দুর্বার গতিতে তীর্থযাত্রী দলের অজেয় প্রাণধারা। সুখ দুঃখ স্নেহ মাহ বেদনা দয়া প্রীতি,—ওরাও চলেছে ওদের সঙ্গে সঙ্গে। চারিদিকে অনন্ত হামৌনী গিরিশৃঙ্গশ্রেণী,—নীচের দিকে চীর্থযাত্রী দলের কলমুখরতায় যেন তার ীরবতা আরও গভীর। কখনও ঝড়ে, র্ষায়, ঠাণ্ডায়, ঝঞ্ঝায়, মহাসূর্যের অগ্নি-াবী প্রখরতায় তারা উদ্‌ভ্রান্ত; আবার খনো বা ঋতুরাজের নবঘনশ্যাম বসন্ত মারোহের মাঝখানে তারা দিগ্‌ভ্রান্ত।

ওদের ওই আনন্দ-বেদনার তরঙ্গ-ালায় আমিও নিজেকে বারবার মিলিয়ে য়েছি। কান্না-হাসির গঙ্গা-যমুনায় ডুব য়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়! দের মধ্যে আমি। ওদের আনন্দে, ওদের দনায় আমি। ওরা দুই পায়ের যন্ত্রণায় দিতে বসলে আমার চোখে জল আসে; ঃশ্বাস টানতে না পারলে আমার নিজের

মানা গিরিসংকটের পথ

দম আটকে যায়। ওরা শত সহস্র, ওরা প্রতি বছরের প্রতি ঋতুর,—কিন্তু ওরা যতকাল ধরে এসেছে এই পথে, আমার ধারাবাহিক হৃদয় এসেছে ওদের সঙ্গে সঙ্গে, এসেছে আমার প্রাণ যুগ থেকে যুগে, কল্প থেকে কল্পান্তে। ওরা সবাই আমারই অভিব্যক্তি, আমারই ইচ্ছা, আমারই একাগ্রতা। আমি এক, কিন্তু আমি বহু ওদের মধ্যে। আমি ওদের সঙ্গে অভিন্ন, অচ্ছেদ্য। ওদের সবাইকে মিলিয়ে আমারই জীবনের ব্যাখ্যা।

যোশীমঠের পথ

পিছনে গগনচুম্বী মহাহিমবন্তের অসংখ্য শিখরচূড়া, পুরাণে তারা কেউ নাম নিয়েছে কনককান্ত, মণিরত্নাভ, শোণিতশিখর, কেউ বা নাম পেয়েছে স্ফটিকপর্বত। ওদের নাম শুনে এক আবিষ্কার থেকে ভিন্ন আবিষ্কারে যেতে চেয়েছি কতবার। দুই চোখে দুই বাসনার প্রদীপ জেলে জানতে গিয়েছি কোথায় সেই প্রাচীন হৈমবতের হারানো গিরিচূড়া,—একদা যাদের নাম ছিল কদম্ব-কুক্কুট, গোতম আর বাসব, শ্যামাঙ্গ আর শোভিতা! তারা আজও আছে, কিন্তু ভিন্ন নামে। ওদের অন্ধকার গুহাতলে আজও হয়ত সেই সেবমলের বনাশিকড়-বিচ্ছুরিত দ্যুতি-শিখা জ্বলে,—যার হিরণ্য আভায় প্রাচীন হিমালয়ের সিংহশিকারী কিরাতের দল আর যক্ষ-রাক্ষসরা লুকিয়ে রাখতো তাদের চীরবাসা অর্ধনগ্না রমণীগণকে! তুষারাচ্ছন্ন কৈলাস আর মন্দারের প্রত্যন্তদেশে সেই অনবতপ্তার জলরাশি,—পরবর্তী যুগে যার নাম হয়েছে মানস সরোবর,—তুষারের পটভূমিতে যার হৃদয়ের উপর আজও ফোটে শ্বেত ও রক্তকমল! ওই গন্ধমাদন আর চিত্রকূটের আশেপাশে—ওই যে-অঞ্চলকে সেকালে বলা হোতো কিন্নরখণ্ড, আজও কি সেখানে কলহাস্য-মুখরিতা নিরাবরণা মোহিনীদের কণ্ঠস্বরে গুহাবাসী পশুরাজ সিংহ উচ্চকিত হয়? সর্বনাশিনী উর্বশীরা কি আজও সুমেরু-শিখরের আশেপাশে বিশ্বামিত্রের তপোবন খুঁজে বেড়ায়?

কিন্তু ব্রহ্মপুরার পথে চলে আজ তীর্থযাত্রীরা। পিপাসার্ত, ক্লান্ত-কাতর, স্বপ্নাবিষ্টচক্ষু,—উৎকণ্ঠ কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব। পিপীলিকাশ্রেণীর মতো তারা চলে,—যেন চিরকাল ধ'রে চলেছে। মুখ ফিরিয়ে নাও, আর ফিরে তাকাও,—তারা চলেছে, কিন্তু যেন চলছে না; গতিশীল, কিন্তু গতিবেগ যেন নেই। তারা কখনও ভাগীরথী তীরে, কখনও অলকানন্দায়, কখনও মন্দাকিনী, নন্দাকিনী আর বিষ্ণু-গঙ্গায়, কখনও পিন্দারে আর নায়ারে, কখনও মূলগঙ্গায় আর নীলধারায়। বিরাটের পটভূমিকায় চলতে চলতে কতবার শুনেছি ওদের জীবনের ছোট ছোট ইতিহাস। সামনে ওদের নন্দাদেবী আর দ্রোণগিরির বিশাল চূড়া; ত্রিশূল আর

নীলকণ্ঠ, বন্দরপঞ্চ ও শ্রীকান্ত- অনন্ত গিরিশৃঙ্গমালা ওদের চারিদিকে, কিন্তু পিছন থেকে মাঝে মাঝে ওদের মোহ-বন্ধনের সূত্রে টান পড়ছে। কেউ হারানো সুখের স্মৃতি এসেছে খুঁজতে, কেউ এসেছে জীবনের জ্বালা জুড়োতে। দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছে স্বামী, সুতরাং প্রথম স্ত্রী চলেছে তীর্থে। সন্তানের অভাবে সম্পত্তি যায় রসাতলে, মস্ত জমিদার চলেছে সন্তান কামনায়। সংসারের কোনো আখড়ায় ঠাঁই হয়নি, গোঁসাইজী চলেছে বৈষ্ণবীকে সঙ্গে নিয়ে। একমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের মৃত্যু ঘটেছে, অশ্রুসিক্তা জননী চলেছে তার সমস্ত বেদনাকে সমগ্র হিমালয়ে প্রসারিত ক'রে দিতে। বিশ্বাস-ঘাতিনী নারীর মোহ ত্যাগ ক'রে প্রেমিক চলেছে দূর থেকে দূরান্তরে। সংশয়াচ্ছন্ন দার্শনিক চলেছে আত্মশুদ্ধির কামনায়। রোগী চলেছে আত্মতাড়নায়। ওদের সঙ্গে চলেছে ভ্রাম্যমান, ব্যবসায়ী, ফকির, আতুর, বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, নিষ্ঠাবতী গৃহিণী, নায়ক আর নায়িকা, পাঞ্জাবী আর দাক্ষিণী, গুজরাটি আর মারাঠি, সাধু আর সন্ন্যাসী। কেউ ফেলে এসেছে ঘরকন্না, কেউ ভেঙ্গে এসেছে অবরোধ, কেউ ছেড়ে এসেছে বাসের শয্যা, কেউ বা ছিঁড়ে এসেছে বন্ধন।

ঐতিহাসিক যুগ ঠিক কবে থেকে ধরা হবে আমি বলতে পারিনে। কিন্তু ঐতিহাসিক যুগে এসে দেখছি, ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে ব্রহ্মপুরাকে [illegible] ফেলা হয়েছে। একথা আমরা ভুলতে বসেছি যে, আধুনিক পাঞ্জাবের একটি অংশ, সমগ্র গাড়োয়াল সাহারানপুরের একটি অংশ, দ্রোণাচার্যভূমি, (আধুনিক দেরাদুন) কুর্মাঞ্চল, (আধুনিক কুমায়ুন) [illegible] পশ্চিম তিব্বত এবং পশ্চিম নেপাল [illegible] সম্মিলিত ভূভাগ নিয়ে ছিল ব্রহ্ম-[illegible]। এই ভূভাগের পথ হলো [illegible] পথ, সেই কারণে ব্রহ্মপুরা হলো [illegible]তের প্রথম তীর্থপথ, ভারতবাসীর প্রথম তীর্থযাত্রার চেতনা উন্মেষিত এই অঞ্চলে। ইতিহাসের কোনো [illegible]থ নেই, শ্রুতি আর স্মৃতির অতীত, [illegible] জানে না কবে বিশাল ভারতের সংহতি এবং ঐক্যের সাধনা এই [illegible]রায় প্রথম শুরু হয়। কেউ জানে না কবে এই ব্রহ্মপুরার প্রান্তে বসে মহাকবি ব্যাস সমগ্র বেদশাস্ত্রকে চার অংশে ভাগ করেছিলেন। তারপর ঐতিহাসিক যুগে এসে দেখি, দক্ষিণ ভারত এসে প্রাধান্য নিয়েছে ব্রহ্মপুরার উত্তরাপথে। আজ সমগ্র গাড়োয়ালে অধিকাংশ প্রসিদ্ধ পার্বত্য মন্দিরে দেখি, পূজারী, মহন্ত ও রাওল—প্রায় সকলেই পুরুষপরম্পরায় দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ। এর কারণ খুঁজতে গেলে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে চ'লে যেতে হয়। সে যুগ হোলো বৌদ্ধ ভারতের সঙ্গে সনাতনী-দের অধ্যাত্ম সংঘর্ষের যুগ। বৌদ্ধ যুগের জয়যাত্রা ঘটেছিল সমগ্র হিমাচলের স্তরে স্তরে। তাঁরা তাদের চিহ্ন রেখে গেছে মন্দিরে স্থাপত্যে ভাস্কর্যে। তারা জয় করতে করতে চ'লে গেছে হিমালয়ের পর-পারে সমগ্র তিব্বতে, চীনদেশে, মঙ্গোলিয়ায় এবং জাপানে। আজও হিমালয়ের বহু অঞ্চলে—যেমন কাশ্মীরে, লাডাকে, কাংড়া-কুলুতে, পূর্ব পাঞ্জাবে, উত্তর গাড়োয়ালে ও কুমায়ুনে, সমগ্র নেপালে, সিকিম, ভূটান ও উত্তর আসামের কোনো কোনো অঞ্চলে কী দেখি? কী দেখি নাগা পর্বতে, লুসাই পাহাড়ে, মণিপুর অঞ্চলে এবং ব্রহ্ম-দেশে? এই হিমালয়কে কেন্দ্র করে প্রাচ্য
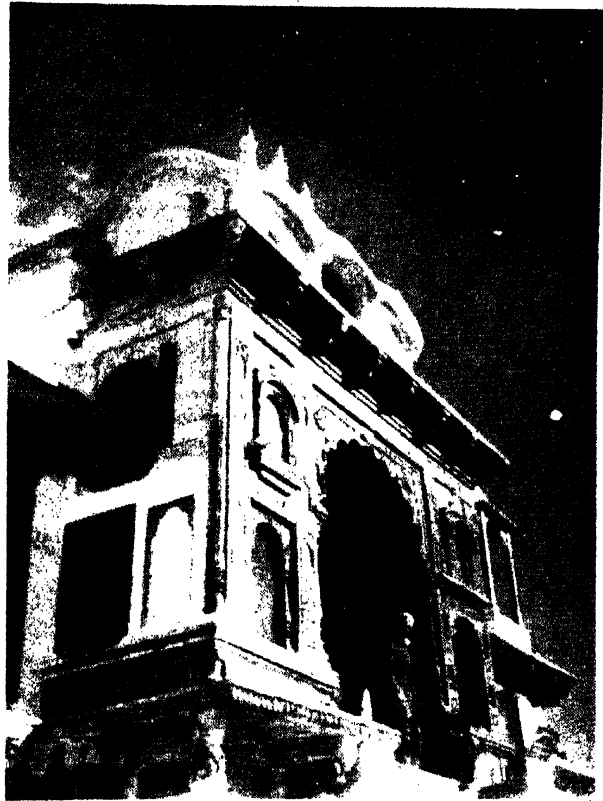
বদরিনাথ

বিজয়ী বৌদ্ধ ধর্মের জয়যাত্রা। দেখতে পাই হিমালয় এবং তিব্বত অতিক্রান্ত মঙ্গোলীয় স্থাপত্যের সংখ্যাতীত কীর্তি-কলাপ। যে-মন্দির এবং স্থাপত্য দেখি আমরা যোশীমঠে, বদরিকাশ্রমে, ত্রিযুগী-নারায়ণের এবং আরো বহু স্থানে—তাদের সঙ্গে ভারতীয় স্থাপত্যের মিল অতি কম। যা দেখা আমাদের অভ্যাস তা আমরা দেখিনে। লাডাকের সঙ্গে সিকিমের মিল দেখি, যোশীমঠের সঙ্গে মিল দেখি তিব্বতের বৌদ্ধগুম্ফার, মানস সরোবরের পথের খোচরনাথের সঙ্গে মিল দেখি উখীমঠের। এই বৌদ্ধ এবং মঙ্গোলীয় বৌদ্ধ স্থাপত্যরেখা চলেছে শত শত মাইল। এই রেখা পশ্চিম তিব্বত ছেড়েও গেছে আরো উত্তরে কৃষ্ণগিরি অর্থাৎ কারাকোরাম ছাড়িয়ে পামীর গিলগিট হিন্দুকুশ আফগানিস্তান ও পারস্য দেশ অবধি। দ্রাবিড় মঙ্গোলীয়, আর্য, তুর্ক, ইরাণী, এদের উপর দিয়ে একে একে চলেছে বৌদ্ধের জয়যাত্রা। কিন্তু একদা এই ব্রহ্মপুরায় সমস্ত প্রকার ধর্মমতের পরীক্ষা চলে। শৈব শাক্ত জৈন বৌদ্ধ বৈষ্ণব—সমস্ত। গুরু নানক, কবির, মহাবীর, রামানুজ, শঙ্কর, দীপঙ্কর, তুকারাম, কেউ বাদ যায়নি। ব্রহ্মপুরা হোলো সেই আদিম কষ্টি-পাথর, যেখানে যুগে যুগে ধর্মমত ও বিশ্বাসের কঠিন পরীক্ষা হয়ে এসেছে। রামায়ণের সংস্কৃতি এসে এই ব্রহ্মপুরাকে অধিকার করতে চেয়েছে—রামপুর, রাম-ওয়াড়া, রামগঙ্গা, হনুমানচটির রাম মন্দির, অগস্ত্য মুনি, রামনগর, লছমন-ঝুলা, ভরত ও শত্রুঘ্ন মন্দির তার প্রমাণ। তারপর এসেছে মহাভারত। হরি-দ্বারের ভীমগোড়া থেকে তা'র আরম্ভ। দ্রোণভূমি তা'র পাশে। এগিয়ে গেলে ব্যাসগুহা ও গঙ্গা। মন্দাকিনীর ধারে ভীম সেন ও বলরাম এবং উখীমঠ। বিষ্ণুপ্রয়াগের পরে পাণ্ডুকেশ্বর। পিন্দার ও অলকানন্দায় কর্ণপ্রয়াগ। তারপর বদরিনাথ ছেড়ে স্বর্গারোহণী পথ। এছাড়া কেদারখণ্ড ও শিবপুরাণের আগা-গোড়া আধিপত্য। বৌদ্ধযুগে এসে প্রাধান্য লাভ করেছে ব্রহ্মপুরার একটি অতি দুস্তর পার্বত্য অঞ্চল। কেদারনাথে যাবার পথে বাঁ দিকে গুপ্তকাশী এবং ডানদিকে মন্দাকিনীর পারে উখীমঠ। এদেরই কেন্দ্র করে নালাচটি ও বেথুয়া চটির চারিদিকে এককালে বৌদ্ধ বিহার, বৌদ্ধস্তূপ এবং বোধিসত্বের মূর্তি নির্মিত হয়। এখানকার প্রসিদ্ধ জয়-স্তম্ভের সঙ্গে বৌদ্ধস্তূপের সৌসাদৃশ্য দেখলে থমকে দাঁড়িয়ে যেতে হয়। প্রমাণ পাওয়া যায়, স্বয়ং বদরিনাথ ছিল বৌদ্ধ-প্রধান।

কিন্তু আমার জ্ঞান ও বিদ্যা সামান্য। আমি কেবল দেখে বেড়িয়েছি, কিন্তু বিচার করিনি। বর্ণনা করেছি বার বার, কিন্তু বিশ্লেষণ করিনি। একালে ব্রহ্ম-পুরার সীমানা সংকীর্ণ হয়েছে; তার নাম বদলে রাখা হয়েছে গাড়োয়াল। কিন্তু তবু তা'র প্রাচীন প্রকৃতি আজও হারায়নি। এই ব্রহ্মপুরায় এলে, এর তীর্থপথে অভিযান করলে এর দুর্গম পার্বত্য চড়াই আর উৎরাইতে প[illegible] বাড়ালে—কেউ আর কারো অপরিচিত থাকে না। একজন যেন আরেকজনের কতকালের বন্ধু। একই শিক্ষা, একই সংস্কৃতি, একই ভাবনা নিয়ে সবাই চলে হাজার হাজার নরনারী—যারা তীর্থ-যাত্রী, সবাইকে মিলিয়ে একই পরিবার। পুরুষের আড়ষ্টতা নেই, মেয়েদের প[illegible] নেই, যৌবনের লজ্জাজড়তা নেই। একই আহার, একই স্থানে চালার তলায় [illegible] বাস, একই পথে সকলের মিলন। [illegible] তামাসা ও আনন্দের একই বিষয়, একই দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণা ও কায়ক্লেশে প্র[illegible] পরস্পর অপরিচিত যাত্রীর সম[illegible] জ্ঞাপন। পদে পদে পথে পথে দেখি[illegible] হৃদয়ের সুর দিয়ে মেলানো পাঞ্জাব [illegible] বাঙলা, বিহারী আর মারাঠি, [illegible] আর আসামী, সিন্ধী আর মাদ্রাজী: [illegible] আশ্চর্য ঐক্য সমগ্র ভারতের! মন্ত্র, [illegible] পুজো, প্রণাম, শ্রাদ্ধ তর্পণ, আচার ব্যবহার,—আশ্চর্য সমন্বয়। যার স[illegible] কোনো পরিচয় নেই, তা'র কাছে সাহ[illegible] পাচ্ছি পরমাত্মীয়ের মতো। যার স[illegible] কখনো কথা বলতে ভরসা হতো [illegible] রেলগাড়ীর কামরায়, এখানে তাদের ম[illegible] গায়েপড়া গলাগলি। হোক সম্পূ[illegible] অপরিচিত, কি মেয়ে কি পুরুষ,—এক-জন অবলীলাক্রমে আরেকজনের হাত ধ[illegible] এগোয়, কষ্টের সময় জলপান কর[illegible] রান্নায় সাহায্য করে, শয়নের জন্য শয্যা বিছিয়ে দেয়। কেউ কারোকে চেনে [illegible] এক মিনিটেরও পরিচয় নেই, একজনের ভাষা অন্য জন জানে না, কিন্তু পরমাশ্চ[illegible] নদী মেখলী পার্বত্যশোভার দি[illegible] তাকিয়ে হঠাৎ থমকে গেল দুই অপরিচি[illegible]

বদরিনাথের পথে

মেয়ে আর পুরুষ, পথশ্রমের মধ্যেও হাসি ফুটলো দুজনের মুখে, সাংকেতিক ভাষায় [illegible]বার্তা বিনিময় হলো। তারপর ওই বিশাল পটভূমির নীচে দাঁড়িয়ে দুজনের ক্ষণকালের বন্ধুত্ব চিরকালের নিবিড় স্পর্শ রেখে চ'লে গেল।

কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীরের কৃষ্ণগিরি, দ্বারকা থেকে ব্রহ্মদেশ, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে অখন্ড ভারতের [illegible] মহাদেশ, তারা গিয়ে পৌঁছয় [illegible] পথে, ওই ব্রহ্মপুরা গাড়োয়ালে। নানা মত সকল পথ মিলেছে ওখানকার ওই গিরিসংকটে, ওই মন্দিরে আর সোপানে, ওই গংগা ভাগীরথী অলকানন্দা মন্দাকিনীর কূলে কূলে। দেবতাত্মা হিমালয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়, সর্বাপেক্ষা পূজ্য এবং বোধ হয় সর্বাপেক্ষা নয়নশোভাময় ভূভাগ হলো এই অবিভক্ত গাড়োয়াল। বহুকালের প্রচারকার্যের দ্বারা কাশ্মীরকে ভূস্বর্গ ব'লে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে। কিন্তু দুই চোখ মেলে যারা কাশ্মীর এবং গাড়োয়ালকে বিচার করেছে, তা'রা জানে, গাড়োয়ালে অসংখ্য ভূস্বর্গের ছড়াছড়ি। বহির্ভারতীয় পর্যটকরা কাশ্মীরে গিয়ে সুইজারল্যান্ড অথবা আলপাইন আবহাওয়াকে খুঁজে পায় তাই তা'রা কাশ্মীরের সুখ্যাতিতে শতমুখ। কিন্তু কাশ্মীরী হিমালয়ে দেবতাত্মার স্বাদ কম। কৌতুকে আনন্দে পরিভ্রমণে সুযোগ সুবিধায় বিলাসে ও ব্যসনে—কাশ্মীর আধুনিক ভ্রাম্যমানদের কাছে অতীব আরামদায়ক সন্দেহ নেই; কিন্তু গাড়োয়াল ব্রহ্মপুরার প্রকৃতি ভিন্ন। এখানে আজও আধুনিক কালের বিজ্ঞান সভ্যতা আত্মশ্লাঘা প্রচার করে না। এ যেন অনাদ্যন্তকালের আধুনিক, লক্ষ লক্ষ বছরেরও বেশী আধুনিক, এক খন্ড অনন্তকালকে যেন এ আপন সর্বাংগে ধ'রে রেখেছে। এখানে এলে চোখে পড়বে ভারতের মৌলিক প্রতিভা, ভারতের আদি সংস্কৃতি, ভারতের সর্বকালজয়ী সংহতি মন্ত্র। এখানে সুখ নেই, আছে আনন্দ। আরাম নেই, আছে অনন্ত মধুর অবকাশ। পর্যাপ্ত পরিমাণ আহার নেই, আছে বিদুরের খুদ। কাশ্মীর হলো কোট-প্যান্ট; ব্রহ্মপুরা হলো গেরুয়া। গেরুয়া নিয়ে কাশ্মীরে গেলে সেখানকার লোকে একটু অবাক হয়; কোটপ্যান্ট প'রে সাহেব সেজে ব্রহ্মপুরায় এলে নিজেকে বেমানান মনে হ'তে থাকে। ওখানে ভোগ, এখানে ত্যাগ। ওখানে

বদরিনাথের পথে গংগার ধারা

ধনাঢ্যতার প্রাধান্য, এখানে নিঃস্বতার গৌরব। সর্বত্যাগী সাধুরা যাতে সর্ব-নীতিভ্রষ্ট ভিখারীতে পরিণত না হয়, সেজন্য এই ব্রহ্মপুরাতেই পুরুষশ্রেষ্ঠ 'কালী কম্বলী বাবার' আবির্ভাব ঘটে-ছিল। তিনি এখানে দেখেছিলেন জীব মাত্রই শিব, নর মাত্রই নারায়ণ। গোমুখী গঙ্গোত্তরী উত্তরকাশী অন্নপূর্ণা বুদ্ধ কেদার ভৈরবনাথ কিংবা অসি-বরুণা-ভাগীরথী সংগমে, সর্বত্র ওই একই কথা। কেদারনাথে, বদরিনাথে, তুঙ্গনাথে ত্রিযুগী-নাথে কিংবা কমলেশ্বরে, গোপেশ্বরে, পান্ডুকেশ্বরে একই পাথরের মন্দির সর্বত্র। কিন্তু প্রতি মন্দিরের বেদীমূলে নিত্য প্রণাম নিবেদন করছে যুগে যুগে ভারতের মহাজনতা!

(ক্রমশঃ)

মালিনী

বটকৃষ্ণ দাস

তাই নাও তুমি আমার এ ফুল তুলে নাও তুমি, মালিনী,
শেষ গ্রীষ্মের মুগ্ধ বিকেলে দ্বিধা-কম্পিত বৃন্তে
স্বর্ণচাঁপার উষ্ণ আকৃতি বুক ভ'রে নাও, মালিনী,
এখনো রোদের শিল্পকলায় মাঠ ভ'রে আছে স্বপ্নে।

এই তরুমূলে বারি-সিঞ্চন তুমিই করেছো, মালিনী,
তুমিই এনেছো নিবিড় সূর্য আয়ত সুনীল চক্ষে,
এনেছো মেঘের মদির বন্যা খোলা এলোচুলে, মালিনী,
দিনরাত্রির মালঞ্চে তুমি জেগেছো অধীর চিত্তে।

আমার দীর্ঘ দিন কেটে গেছে তোমার আঁচলে, মালিনী,
অপরাহ্নের আকাশ এখন কাঁপে সন্ধ্যার তীর্থে;
দিনাবসানের বিশ্রামে আজ আমাকেও নাও, মালিনী,
অগ্নিকামনা ফুরিয়েছে, তবু এ ফুল তোমারই জন্যে॥

চোর-বাজার

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ছাত্র-জীবনের সেই মেসটির কথা কি ভুলব কোনোদিন? দোতলার ারান্দায় পাঁচ-সিকের এক ঈজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে নিচের রাস্তার অবিশ্রাম জনস্রোত দেখে দেখে কত অলস প্রহর কাটিয়েছি সে-বাড়িতে। এখনও মনে পড়ে, দৃষ্টি কিছুক্ষণ স্থির রাখবার পর পূর্ব-পশ্চিমে-লম্বা বউবাজার স্ট্রীট সহসা এক অপরিসর নদীতে পরিণত হ'ত আর পথচারীদের ঠাস-বুনুনি ঝাপসা হয়ে এসে যেন দেখতুম ফেনশীর্ষ এক তরল স্রোত শেয়ালদা'র মোহনায় গিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। পরদিন সকালে, নদীর সেই সংকীর্ণ খাঁড়িতে জোয়ার আসত আবার; উজানস্রোত বয়ে যেত ...হৌসি স্কোয়ারের অলিগলি ভাসিয়ে। সারা দুপুর থিতিয়ে জুড়িয়ে থেকে, বিকেলে ভাঁটা নামত মোহনার দিকে। এইরকম সোম থেকে শনি অবধি।

আশ্চর্য, শেয়ালদা-সঙ্গমের এত কাছে থেকেও, বলতে গেলে আমার মেসের ঠিক ...দিকেই চোর-বাজার আমি কখনও দেখিনি। দেখলুম এই সে-দিন আর ...বিলম্বের জন্যে আফসোসের যেন অন্ত হ'ল না। উত্তর-কৈশোরের সেই সব ...দেখা দিনগুলিতে এই আসবাবপাতি, এই দোকানপাট হয়ত রহস্যে বেদনায় ভরা ... আশ্চর্য কাহিনীর সন্ধান দিতে ...রত। আজ সে-সব কষ্টকল্পনা। ...লি খরিদ-বিক্রীই যদি উদ্দেশ্য না ..., তবে চোর-বাজার দেখবার প্রকৃষ্ট সময় ...ম যৌবন যখন কল্পনার নিরঙ্কুশ ...খায় ভর দিয়ে যে-কোনো দিকে, যে-কোনো দূরত্বে উধাও হবার কোনো ...ধা নেই।

চোর-বাজারে নাকি না পাওয়া যায় ...ন জিনিস নেই। আভাসে-ইঙ্গিতে কোথাও বলা হয়ে থাকে যে, নিজেরই ...ারানো জিনিস, চুরি-হওয়া জিনিস খুব সস্তা দরে আবার খরিদ করতে হলে চোর-বাজারই একমাত্র গতি। বউবাজারের ওরের ফুটপাথ থেকে ফটক গলিয়ে যখন অন্ধকার এক গলিতে ঢুকলুম, তখন ...নের জানালায় এসব হুঁশিয়ারি যে উঁকি দেয়নি এমন নয়। হাতে-নাতে চুরি-চামারিও হয় নাকি এখানে? খদ্দেরকে ধাপ্পা দিয়ে ঘড়ি, ফাউন্টেন পেন উধাও করবার হাত-সাফাই? কলকাতার পথে-ঘাটে অহরহই ত এরকম হয়ে থাকে। সাবধানের মার নেই ভেবে বেশ সতর্ক হয়েই রইলুম।

জুতোর বাজার এ-দিকটায়। পুরনো, সেকেন্ড-"হ্যান্ড" জুতোই বেশী। টুটো-ফাটা মেরামত করে, রঙ-পালিশ চড়িয়ে,

কত দেউলিয়া বনেদি ঘরের শখের জিনিস

সার দিয়ে সাজিয়ে বসেছে দোকানীরা। সদ্যলব্ধ জুতোর বাণ্ডিল খুলে, আমদানির জলুস ফেরাবার বিহিত ব্যবস্থাও চলছে একদিকে। মুচি, "সু-শাইন" আর দোকানদার—এখানকার জুতোর ব্যাপারীরা এক দেহে এই ত্রিমূর্তি। বেশ ঝকঝকে নতুন জুতোও অপ্রতুল নয়। ইঙ্গিত করতে চাইনে, কেননা আমার বক্তব্য যে অভ্রান্ত তা কি ক'রে বলব? তবু, যে-জিজ্ঞাসার কোনো জবাব নেই—নেমন্তন্ন বাড়িতে হারানো জুতোগুলোর কি হয়—সে-প্রশ্ন এখানে মনে না এসে পারে না। আমি ত' আজও এ-প্রশ্নের কোনো সদুত্তর বার করতে পারিনি। উৎসবের ভীড়ের মধ্যে, তাড়া-তাড়ির মধ্যে, নতুন মালিকেরা যে সব সময়েই হুবহু পায়ের মাপ মিলিয়ে জুতো লোপাট করতে পারেন এমন ত মনে হয় না। নিতান্তই যেগুলি বেঢপ হয়ে পড়ে তাদের শেষ আশ্রয় কোথায়? পুঁটুলি খুলে, নতুন পুরনো অসংখ্য জুতো হুড়মুড় করে মেঝের ওপর ঢেলে ফেললে এক দোকানী। যেন আমার এসব ন্যাকা-ন্যাকা প্রশ্নের ওপরই একরাশ পাদুকা বর্ষিত হ'ল।......

দু'পা এগুতেই লোহালক্কড়ের বাজার। শুধু লোহালক্কড় বললে এ-দোকানগুলির বুঝি কিছুই বর্ণনা দেওয়া হয় না। হরেক রকমের হাতিয়ারের পাশেই ভাঙ্গা লণ্ঠন আর মোটরকারের হেড-লাইট। কলাই-করা বেডপ্যান আর চীনেমাটির ওয়াশ-বেসিনের গা-ঘসাঘসি করে চোঙ-ওয়ালা পুরনো গ্রামোফোন আর কালো রবারের গামবুট। অচল ঘড়ি, নোংরা কাপ-ডিস, তোবড়ানো স্যুটকেশ, আধ-ভাঙা টেনিস র‍্যাকেট, সাইকেলের সরঞ্জাম আর ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতির ভীড়ে এক-একটি দোকান একেবারে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি হয়ে রয়েছে। আর তার ঠিক মধ্যিখানে হয়ত সূক্ষ্ম কাজ-করা কাশ্মীরি টিপয়ের ওপর ছোট্ট একটি মোরাদাবাদি ফুলদানি। বিপরীত কিসিমের হাজারো জিনিসের এমন উৎকট সন্নিবেশ অন্য কোথাও কল্পনা করাও শক্ত। কিন্তু এগুলিও চোর-বাজারের আসল দোকান নয়, যেমন নয় অসংখ্য ফার্নিচারের দোকান যেখানে নতুন-তৈরী আসবাবই কুলীন, ভাঙা-ফুটো, হাত-ফেরত মালেরা ব্রাত্য। চোর-বাজারের কলিজার কাছ ঘেঁষে যে-দোকানগুলি তাদের দেখা পেলুম একটু পরেই।

ছাত-ঢাকা সরু অন্ধকার গলি; দু'পাশে খুপরি খুপরি ঘর। দিন-দুপুরেও আলো জ্বলছে ঘরে ঘরে। অন্ধকার তা'তে দূর হয়নি, একটু হয়ত বা ফিকে হয়ে থাকবে। সেই রহস্যময় আলো-আঁধারে এক-একটি দোকানের সামনে আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম। চাঁদনির বাজার বা অভিজাত-পাড়ার 'মার্কেট'র মত "আসুন, আসুন; কিনুন, কিনুন"—শব্দে পরিত্রাহি চীৎকার

নেই। খদ্দের ধীরে সুস্থে তারিয়ে তারিয়ে জিনিসপত্র দেখতে পারে, নিরুপদ্রবে পছন্দ-অপছন্দ করতে পারে, জবাবদিহি না করে পথ দেখতে পারে। আসবাবপাতি অধিকাংশই প্রাচীন; বেচা-কেনার আদব কায়দাও মন্থর। যেন প্রদর্শনীর দেওয়ালে-টাঙানো ছবি দু'-দশ বার দেখে, কদর যাচাই করে, তারপরে একটি-দু'টি সেরা জিনিস সংগ্রহ করা। আভিজাত্য নেই বললেই হয়; বোধ করি, নিছক সেই কারণেই ভদ্রব্যক্তির বাজার করবার পক্ষে পরিপাটি জায়গা।

চোখ আটকে গেল এক দোকানের সামনে এসে। পলস্তারা-খসা দেওয়ালে কয়েকটি বহুমূল্য পেইন্টিং। রঙের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে এসেছে; গিল্টি-করা চওড়া ফ্রেমের চটা উঠে গেছে এখানে-সেখানে। আর আশ্চর্য, (চোর-বাজারে অবশ্য এ কিছুই বেমানান নয়) সেই দামী ছবিগুলির সামনেই দড়ি দিয়ে টাঙানো কয়েক জোড়া বক্সিং গ্লাভস্! ভাঙা এক টেবিলের এক পাশে চীনেমাটির বড় ফুলদানি কয়েকটি। কারিগরির ধরনে আর রঙ-বার্নিশের মুনসিয়ানায় সহজেই চেনা যায়, এরা খাঁটি চৈনিক। আর সেই টেবিলেরই ওপাশে দু'টি ইলেকট্রিক টেবল-ফ্যান আর ফাটাফুটো এক হারমোনিয়ম। আলমারিতে ড্রেসডেনের সাঁচ্চা পুতুলের গা-ঘেঁসাঘেঁসি টাইমপিস কয়েকটি, আবার তার পাশেই ভেনেশিয়ান কাট-গ্লাসের টুকিটাকি। আশ্চর্য সুন্দর এক ব্রোঞ্জের মূর্তি একলাটি দাঁড়িয়ে রয়েছে এক কোণে আর তার পদতলে তোবড়ানো স্যুটকেশ আর ধূল্যবলুণ্ঠিত টেনিস-র‍্যাকেট।

বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ এসব দেখছিলুম মনে নেই। ভিতরে উঠে আসতেই কোথা থেকে যেন প্রশ্ন ভেসে এল—"কিছু নেবেন নাকি বাবু?" চমকে উঠলুম। এই পুরনো আসবাবের একটিতে কথা কয়ে উঠল নাকি?

আলমারির পাশের ছায়া-ঢাকা জায়গাটিতে বসে ছিল লোকটি; এতক্ষণ তাকে লক্ষ্যই করিনি। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধ। মাথার চুল শণের মত শাদা। খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ মুখে। নাকের ডগায় পুরু কাঁচের চশমা। উঠে দাঁড়ান'র পরিশ্রমটুকুতেই খক্ খক্ করে কাশতে লাগল। হাত ধরে নিয়ে গিয়ে নিজের জায়গাটিতে তাকে বসালুম। তারপরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার কাছ থেকে শুনলুম, এ-বাজারের দুঃখ-সুখের ইতিহাস।

বাজারের সাবেককাল থেকেই গগন পালের ব্যবসা এখানে। কত জোয়ার-ভাঁটাই না সে দেখেছে। গত যুদ্ধের মরশুমে যে-এলাহি কারবার হয়েছে এইসব ছোট ছোট ঘুপসি দোকানে তেমন বুঝি আর জীবনে দেখবে না গগন পাল। আমেরিকান সৈন্য গিজগিজ করেছে

স্মৃতি বিজড়িত কত সামগ্রীঃ সেতার থেকে ট্রাইসাইকেল

অলিতে-গলিতে; যা' কিছু দেখে তাই সাঁচ্চা 'কিউরিও' বলে ঠাওরায়। আর ছিল হঠাৎ-বড়লোক কণ্ট্রাক্টরের দল। কিভাবে তারা ঘর সাজাবে, প্রাণপাত করে কিভাবে পাঁচজনের কাছে জাহির করবে যে, এত আসবাবপাতি যার সে একটা হেঁজিপেঁজি নয়, এই চিন্তায়, পয়সার দাপটটা ছিল যতদিন, তারা হন্যে কুকুরের মত ঘুরে বেড়িয়েছে। সেই এক গেছে ব্যবসার সময়। তেমনটি বুঝি আর কোনোদিন হবে না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল গগন পাল। যুদ্ধের ফেনা ত মিলিয়েছে সেই কবে; একেবারে চুকে বুকে গিয়েছে সব। এখন চলছে নিরবচ্ছিন্ন মন্দার বাজার।......

বাইরে বৃষ্টি নেমেছে বোধ হয়। দূরে থেকে একটানা ঝরঝর শব্দ ভেসে আসছে আর থেকে থেকে হানা দিয়ে যাচ্ছে এলে মেলো ঝোড়ো বাতাস। টুলটার ওপ নড়ে চড়ে বসে গগনের মুখের দিে তাকিয়ে রইলুম। অতীতের অন্ধকা হাতড়ে হাতড়ে কি একটা কথা যে ভাবছে গগন। নীরবে কথাটা যেন ওজ করে, সাজিয়ে গুছিয়ে দেখে নিে তারপরে ধীরে ধীরে বললে—"আম সেকালের বড়লোকদের কাছে কিনি বা আর বেচি একালের বড়লোকদের কাছে এই একটিমাত্র কথায় এ-বাজারের হৃ স্পন্দন যেন শুনতে পেলুম। দু বিপরীতধর্মী কালের মাঝখানে এ-দোকা গুলি যেন এক সেতু। দেউলে সাবেকিয়া সেতুর এক প্রান্তে শত স্মৃতিমণ্ডি সাধের ঘরকন্না বিকিয়ে দিয়ে জাহান্নামে অতলে নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে অহরহ অ অপর প্রান্তে ব্যগ্র লোভাতুর হাত বাড়ি অপেক্ষা করে আছে এ-কালের অ কৌলীন্য। কত ভদ্রাসন নীলা উঠতে দেখেছে গগন পাল আর বাল্যবেলায় মহাসমারোহে ঘরবাঁ দেখেছে কত। আধুনিক রৌপ স্রোতের নিচে এ-দোকানের যেখা সেখানে কত নীল রক্ত যে জমাট বে আছে তা কি গগনও সব জানে? রা যখন তালাবন্ধ করে সে বাড়ি যায় ত বুঝি একে একে জেগে ওঠে এই পুরো আসবাবের দল, গৃহসজ্জার এই উপকরণ। নিস্তব্ধ অন্ধকারে নিম্নক বুঝি আলোচনা হয় দুর্জ্ঞেয় পুরো ভাগ্যের আর দুঃখসুখের আবর্তনের।

অথবা কি এমনও হয় কখনো? সেই পুরনো খানদানের কোনো নিঃ প্রতিভূ কাঙ্ছীপঠেরই এক খোলার বা থেকে ময়লা ছেঁড়া জামা গায়ে দি এ-বাজারে এসে ঘুরে বেড়ায় প্রে মত? একদা বহু-ব্যবহারে অন্তর কোনো গৃহোপকরণ যদি চোখে প অকস্মাৎ, তবে কী ভয়ংকর দীপ্তি জ্বলে ওঠে তার কোটরগত দুই চোখ কী উত্তাল ঢেউ আছড়ায় তার শী পাঁজরের কানায় কানায়? অদৃশে নাগপাশের কবলে আর একবার বু মুক্তি-কামনায় থরথর করে কেঁপে ও সেই স্মৃতি-জর্জর দেহ? তারপরে অত ঐশ্বর্যের সেই অবসন্ন ছায়ামূর্তি না

মস্তকে বুঝি ফিরে যায় তার কেরোসিনের-ডিবে-জ্বালা খোলার খুপরির অন্তিম আশ্রয়ে? কত রাত্রে ঘুম আসে তার?...

এ-বাজারে দোকানদারদের সৌভাগ্য যে ভূত-ভবিষ্যতের এত কচকচি নিয়ে, ক্রেতারা মাথা ঘামায় না। ঘামালে, বাজার উঠে যেত কোনদিন। একালের বড়লোক ধনী মাত্র, রইস নয়। তারা ধাক্কা দিয়ে চলে, পকেটে নোটের তাড়ায় হাত রেখে কথা কয়। গণেশজির-দেওয়া রুপোটা তাদের ব্যাঙ্কে আর খোদার দেওয়া সীসেটা খুলির তলায়। এ-কালের পাশুপত অস্ত্র, ক্রয়-শক্তি, তাদের মুঠোয়। তাদের আর ঠেকায় কে! যে কোনো উপায়েই হোক, পয়সা যখন কামানো গেছে তখন সুরুচি-চর্চা আর অত্যাবশ্যক নয়। টাকা ফেললেই পাওয়া যায় এমন যাবতীয় ভোগ্য বস্তু সুড় সুড় করে এবার এসে পড়বে। পড়ছেও। আর এহেন বিক্রেতা ও ভারতে কোথায় আছে যে, ক্রেতার মনোরঞ্জনে তৎপর নয়? বহুমূল্য পেইন্টিংয়ের সামনে সেইজন্যই এ-বাজারে টাঙ্গানো থাকে ক্যালেণ্ডারের ট্যাবার। অপরূপ কারিগরির চীনেমাটির বাসনের গায়ে তাচ্ছিল্য-ভরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গলফ্ স্টিক্ আর টেনিস র‍্যাকেট। নিখুঁত ইটালিয়ান কোণকে চারপাশ থেকে ঢেকে দেয় সিনেমা স্টারের কুৎসিত ছবি। ঝাড়-লণ্ঠনের বাতিদানে রঙিন বাল্ব না লাগালে এ-কালের 'রইসে'র চোখে আর নেশা ধরে না। হাতীর দাঁতের সূক্ষ্ম চারুকলার চেয়ে ঢের বেশি কদর পায় ডিনার-সেট অথবা লন-মোয়ার। একটা কাঁটদণ্ট অপসৃয়মান যুগের দৃষ্টিভঙ্গি ভেঙে, দুমড়ে, পরিবর্তিত হয়ে আজ কোথায় এসে যে ঠেকেছে, তার তিল তিল করে আঁকা আলেখ্য যেন উৎকীর্ণ রয়েছে এই শ্রীহীন দোকানগুলিতে।

বাইরে বৃষ্টিটা বুঝি থেমেছে এতক্ষণে। উঠি এবার; রাত হচ্ছে। ওকি! ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি গগন পাল? "পাল মশাই, ও পাল মশাই!" সাড়াশব্দ নেই। আলমারির পাশের টুলটিতে দেয়ালে হেলান দিয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে গগন পাল। চিবুক নেমে এসেছে বুকে, চশমা নাকের ডগায়। আহা! বুড়ো মানুষ, এই বাদলা হাওয়ায় আর কতক্ষণ বকবক করবে আমার সঙ্গে। এখন আর ডাকা-ডাকি করব না বেচারিকে। থাকুক ও যতক্ষণ খুশি এই পুরনো কালের মায়ায়-ভরা আবহাওয়ার নিশে। একেবারে যাবার আগে জাগিয়ে দিয়ে যাব। ততক্ষণ আর একবার ভাল করে দেখি গগনের দোকানটুকু।

মেঝেতে একপাশে স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে এক জীর্ণ কার্পেট। এককালে হয়ত বহুমূল্যই ছিল। এখন দর-যাচাইয়ের শুরুতেই খদ্দের নিশ্চয় তারস্বরে ঘোষণা করবে, কত খরচ তার পড়বে ধুলো পরিষ্কার করতে, তালি-তুলি লাগিয়ে চলনসই অবস্থায় দাঁড় করাতে। এ-গালচের অদৌ আর কোন ক্রেতা জুটবে কি না, কে বলতে পারে। এই প্রখর বাস্তব ও বাস্তবতার যুগে কে আজ আর খোঁজ নেবে কত উৎসব-রজনীর স্মৃতি, কত ইন্দ্রসভার আড়ম্বর হয়ত এখনও জড়িয়ে রয়েছে এর প্রতি তন্তুতে, প্রতি ধূলি-কণায়। প্রশস্ত হলঘরের মেঝেতে বিছানো এ-কার্পেটের চারপাশে কতদিন সন্ধ্যায় সমবেত হয়েছেন মার্জিত-বেশবাস শ্রোতারা। সহস্রদীপ ঝাড়-লণ্ঠনের দ্যুতিতে সভাস্থল আলোকিত। তবলচি, বাজিয়েদের এলাকা থেকে সংগতের মৃদুমন্দ তাল উঠছে। আসরের ঠিক মাঝখানে পিনদ্ধ-দেহবল্লরী সুদর্শনা নটী নূপুর বাঁধছে পায়ে। আতর, গোপাল-জল, তবকে-মোড়া খিলি পান বিতরিত হচ্ছে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে। পিছনের অলিন্দে, চিকের আড়ালে পুরমহিলারাও সমবেত হয়েছেন। প্রস্তাবনা-পর্বের শেষে নৃত্য ও সুরের দুর্লভ ধারাবর্ষণ হয়েছে আসরের বুকে। মুগ্ধ বিস্ময়ে শ্রোতারা বাহবা দিয়েছেন; সময় কেটে গেছে সুমধুর স্বপ্নের মত। ......গগনের দোকানে এসে কোন খরিদ্দার আজ আর অতীতের এই বিস্মৃত-স্মৃতির উদ্ঘাটন করবে? এই ধূলি-ধূসরিত শতচ্ছিন্ন গালচেটির নানা রঙের দিনগুলির কথা মনে পড়বে কোন বিকৃত মস্তিষ্কের? সময় এখন মহা-মূল্যবান আর কার্পেটের চেয়ে লাইনো-লিয়ামেরই কদর বেশি।

নিদ্রিত গগন ডান হাতটা রেখেছে একটি সুদৃশ্য দেওয়াল-আয়নার টানার ওপর। ড্রয়ারগুলি আজ শূন্য। একটু তেলের ছোপ, একটু সিঁদুরের দাগ হয়ত আজও কোথাও নিভৃতে লেগে আছে কাঠের এই খোপগুলিতে। প্রসাধনের পাঁচটা উপকরণ একদা হয়ত সযত্নে রক্ষিত ছিল এখানে। জরির ফিতে, রুপোর কাঁটা,
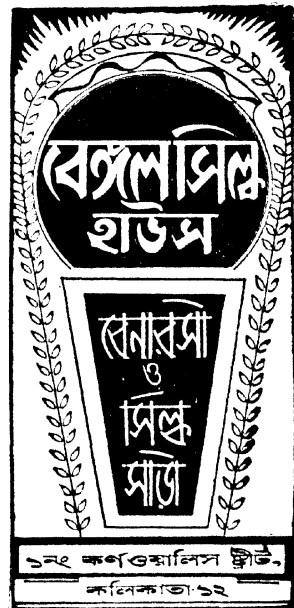
সি'দুর কৌটা, গন্ধ তেল, হয়ত বা একটু পাউডার, একটু সুর্মা। আর প্রতিদিন অপরাহ্নে প্রসাধনস্নিগ্ধ একটি কল্যাণী মুখ বুঝি প্রতিবিম্বিত হত এই দর্পণে। মাজা সোনার মত রঙ, অবগুণ্ঠনহীন সজ্জিত কেশপাশ, দীর্ঘ আঁখি পল্লবের নিচে আয়ত দৃষ্টির প্রসন্নতা—পরিপূর্ণ সুন্দর এক বাঙালি গৃহলক্ষ্মীর মূর্তি। আজ কোথায় সে সব! পুরুষ-ভাগ্যের দগ্ধ আকাশে অপ্রত্যাশিত কালবৈশাখী ঝড়ে কোথায় উড়ে গেছে কোনদিন। এ অতীত স্মৃতি-বিলাসের সুপ্রচুর সময় কারই বা আজ থাকবে? অন্তত সেই কালোবাজারীর নিশ্চয়ই থাকবে না যে কড়কড়ে নোট গগনের হাতে গুণে দিয়ে তার নবতম রক্ষিতার জন্যে এ-আয়নাটি কিনে নিয়ে যাবে একদিন।

ঘরের কোণে টেবিলের ওপর একটি অপরূপ পুতুল। মাথা-ভরা কোঁকড়ানো সোনালি চুল, বড় বড় নীল চোখ, আপেলের মত টুকটুকে গাল, নরম নরম মোলায়েম হাত-পা। তবু সহজেই বোঝা যায়, সাবেক শ্রী আর নেই। জামার রঙ ফিকে হয়ে এসেছে, নাকের আর আঙুলের ডগাগুলি অক্ষত নেই, চটা উঠে গেছে এখানে-সেখানে। কোন্ এক অবোধ শিশু সমস্ত প্রাণ দিয়ে বুঝি একদা ভালবাসত এ-পুতুলটিকে। বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করেছে রাত্রিদিন, সন্তর্পণে শুইয়েছে, ঘুম পাড়িয়েছে, আরাম-স্বাচ্ছন্দ্যের কত ব্যবস্থা করেছে এ-পুতুলটির। এমন সময় অতর্কিতে কোথা দিয়ে যে কি হল—তার বাবা একদিন অগ্নিমূর্তি হয়ে এসে ছিনিয়ে নিলেন পুতুলটি তার হাত থেকে। আঘাতের আকস্মিকতায় কান্নাও বুঝি সে ভুলে গেল। তারপরে জন্মাবধি যে-বাড়িতে সে মানুষ, সে-বাড়ি ছেড়ে কেন যে মায়ের হাত ধরে এক ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়িতে এসে উঠল, কেন যে নির্বাসিত হল শহরতলীর এক পূতিগন্ধময় পল্লীতে—সে কিছুই জানে না। পুতুল খেলার বহুমূল্য বিলাস ঘুচে গেল তার জীবন থেকে চিরদিনের মত। আজ সেই পুতুল গগনের দোকানের এক কোনে নতুন সাথীর আশায় দিন গুণছে। আর কারও কাছে আবার কি পাবে সেই অকৃত্রিম প্রীতি,

সংসারে যা নিত্য প্রয়োজনীয় ছিল

যা পেয়ে হারিয়েছে। ভাঙা-ফুটো মূর্তি দেখে কে-ই বা আর তাকে সানন্দে ঘরে নিয়ে যাবে। কে-ই বা তাকে ঘিরে আবার সৃষ্টি করবে শৈশবস্নেহের সেই স্বপ্নলোক। সম্ভবত কেউ না। এইখানে, গগনের দোকানের এই অন্ধকার কোণে, অনির্দিষ্টকাল মাথা হেঁট করে বসে থাকতে হবে যতদিন না ক্ষয়ে খসে গিয়ে বিক্রয়ের একেবারে অযোগ্য হয়ে যায়। তারপরে একদিন দোকান-ঝাঁটের সঙ্গে গগন হয়ত ফেলে দেবে তাকে বাইরের রাস্তায়।

গগনের মাথাটা হেলে পড়েছে আয়নাটার দিকে। আহা! বুড়ো মানুষ ঘুমোক। রাত হলে রোজ আর কে এসে তাকে জাগায়? নিজেই ত যথাসময়ে দোকান বন্ধ করে বাড়ি যায় রোজ। আজও যখন ঘুম ভাঙবে, যাবে। ধীরে ধীরে বার
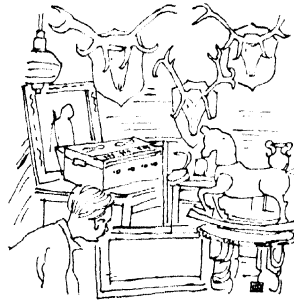
একদা যা বনেদী বৈঠকখানা ও ইন্দ্রসভার আসর সাজাতো

হয়ে এলুম দোকান থেকে। রাস্তার জল-কাদায় আলো পড়ে চিকচিক করছে। টুং টাং শব্দে ঘণ্টা বাজিয়ে সওয়ারী খুঁজছে রিক্সাওয়ালা। যানবাহনের সারা-দিনব্যাপী হুহুংকার স্তিমিত হয়ে এসেছে এতক্ষণে। সামনেই সেই তিনতলা বাড়ি, যেখানে একদা বাস করে গেছি বহুদিন। এখনও কোন মেস আছে নাকি এ-বাড়িতে? "আমার" ঘরটিতে আলো জ্বলছে।

হায়! সেই প্রখর অনুভব শক্তির দিনগুলিতে কেন এ-বাজার দেখতে আসিনি একবারও। আজ গগনের দোকানের পুরনো কার্পেটটি দেখে সহসা যে নৃত্যসভা চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল সে ত শুধু মামুলি কল্পনা। সহস্র-দীপ ঝাড়-লণ্ঠনের আলো পর-কলার ভেতর দিয়ে ঠিকরে ঠিকরে পড়ে রঙের ইন্দ্রধনু ত কই সৃষ্টি করল না। আসরের রাজকীয় আড়ম্বর, নূপুরের মৃদু মৃদু তান, নটীর চোখের বিদ্যুদ্দাম কটাক্ষ কিছুই ত মনকে একেবারে উধাও করে নিয়ে গেল না। অথবা সেই লক্ষ্মী-স্বরূপিনী কল্যাণী মুখখানি। ব্রীড়া ও শালীনতার জীবন্ত মূর্তির মত তাকে ত কই দেখলুম না। যেন তার কাঠামোটাই দেখলুম—ফ্যাকাশে, নিষ্প্রাণ, একটা কাঠামো। অদৃষ্টের নির্দয় পেষণে সেই আয়ত দুটি চোখে যে শান্ত মহিমা দীপ্ত হয়ে উঠেছিল, তীক্ষ্ণ নাসিকায়, দৃঢ়-সংবদ্ধ অধরে যে অচঞ্চল ঋজুতা বিকশিত হয়েছিল একদিন তা ত কই একেবারে চোখের ওপরে জ্বল জ্বল করে উঠল না। আর সেই ভাগ্যহীন শিশুটি। তার আকস্মিক বিস্ময়, হৃদয়বেদনা, আকুল ক্রন্দন যেন দূরাগত বিলাপের মত আমার চেতনাকে এসে স্পর্শ করল। আমার সমগ্র সত্তা, সমস্ত অস্তিত্বকে তার মর্মান্তিক শোক অনুরণিত করতে পারল কই। আবেগের তীব্রতায়, বর্ণবিন্যাসের চমৎকারিত্বে যে ছবিগুলি প্রায় চোখে দেখতে পেতুম, হাতে ছুঁতে পেতুম, সেগুলি আমার অনুভূতির প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে হায় আজ কতদূরে সরে গেছে। এ যে কী আপসোস কি করে বোঝাই।

ঘণ্টা বাজিয়ে ট্রাম এল একটি। হাত তুললুম। রাত হয়েছে।...

৫

তা নতুন নতুন ঘটনা তো ঘটবেই। বারোটা পরিবার। একটা দু'টো নয় ক'রে প্রায় সকলের সংসারেই ঘটনা ঘটছে রোজ, দিবারাত্র, চব্বিশ ঘণ্টা। কিছুই ঘটেন না ঘটিয়ে সুখে পেটভরে ভাত খেয়ে হাওয়া খাবে, গল্প করবে, সেই ধরনের যুগ পৃথিবীতে হয়ত কোনদিনই ছিল না। এখন এসব অঘটনকে লোকে বাড়াবাড়ি ক'রে দেখছে খামকা।

পরম নিশ্চিন্ততা, নির্ভরতা শান্তি অনন্ত সুখ স্বর্গেই সম্ভব—মাটির পৃথিবীতে নেই, থাকবেও না।

আর কত তুচ্ছ জিনিস নিয়ে কত বড় ঘটনা হয়।

এক ঘরের ঘটনা তিন ঘরকে জড়িয়ে যে রাত্রে রুচি এ বাড়িতে এল, সেই রাত্রেই ঘটল একটা।

শেখর ডাক্তারের ঘরে।

কি, না রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ডাক্তারের স্ত্রী প্রভাতকণা বড় মেয়ের মনের ইচ্ছাটা জানতে পারল। কি, না, টেলিফোনে চাকরি করবার মতলব করেছে সুনীতি।

শুনেই প্রভাতকণা সাঁই সাঁই করে উঠল।

আর, ডাক্তারনীর চিৎকার একবার আরম্ভ হলে থামতে চায় না। একটু আগে বলছিল কে গুপ্ত। এ বাড়ির ছোট-বড় সবাই জানে।

সুনীতি গত বছর ম্যাট্রিক পাশ করেছে। বিয়ের আলাপ এসে গেছে এর মধ্যে তিনটা। এই জন্যও শেখর ডাক্তার একটু ব্যস্ত। একটু তাড়াতাড়ি চাইছিলেন বাসাটা পাল্টাতে, যদি শহরের দিকে, টালিগঞ্জ বালিগঞ্জে না হোক, অন্তত শ্যামবাজার বাগবাজারের দিকেও চলে যেতে পারতেন তো এসোসিয়েশনটা ভাল পেতেন, হয়তো পসারও জমত ভাল। রাজসাহী থেকে এসে রাজেন ঘোষাল, কি এক সূত্রে শেখর তরফদারের মামাতো ভাই, প্রায় দেড় বছরের প্র্যাক্টিসেই গাড়ি-বাড়ি করে ফেলল। বসেছিল দর্জিপাড়ায়। ঘিঞ্জি হলেও কত ভাল সেসব জায়গা। কত বড় ঘরের মানুষ থাকে। এ কি আর এই বস্তি। বেলেঘাটার ধুলো, মশা, মাছি, নর্দমার পচা গন্ধ শোঁকা মানুষ।

এদের অসুখ হলেও পয়সা খরচ করতে চায় না। তা ছাড়া পয়সা নেইর দলে বেশিরভাগ। পয়সা এবং হ্যাঁ, মেয়ের বিয়ে, অন্তত ভাল জায়গায় গিয়ে না বসা পর্যন্ত ভাল ছেলে পাওয়া যাবে না। বেলেঘাটায় ভাল ছেলে নেই শেখর এবং প্রভাতকণা দুজনেই মর্মে মর্মে টের পেয়েছিল।

সুনীতির বিয়ে। ও যাতে সুখে থাকে, এই ভাবনার মধ্যে হঠাৎ ওর টেলিফোনে ঢুকবার ইচ্ছাটা প্রভাতকণার কানে বেখাপ্পা ঠেকল। 'কেন, ও'র কি রোজগারে ভাঁটা পড়েছে যে, তুই চাকরি করতে যাচ্ছিস। কে পরামর্শ দিয়েছে তোকে, কার কথায় নাচছিস আগে বল্।' প্রভাতকণা প্রবলবেগে ধমক দিয়ে উঠল মেয়েকে। প্রভাতকণা অনেকটা আঁচ করে নিয়েছে। 'কে বলেছে বলো!' চক্ষু রক্তবর্ণ করল ডাক্তারের স্ত্রী। চোখের জল মুছে ভয়কাতুরে গলায় সুনীতি বলল, 'প্রীতি।'

ন' নম্বর ঘরের ভুবনবাবুর মেয়ে। প্রীতি বড়, বীথি ছোট, ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। বাড়ির সবাই বলে ভুবনের মাছির ঝাঁক। ভুবন চৌধুরী আজ তিন বছর শয্যাশায়ী। বৌবাজারে কত সুন্দর বাড়িতে ছিল। ধাঁস রাধাবাজারে এক পার্শির ঘড়ির দোকানে চাকরি করত। ভাল ঘড়ি সারাতে পারে ভুবন। গ্যাস্ট্রিক আলসারে শেষ করে দিয়ে গেছে তার সব। চাকরি গেল, জমানো টাকা ছিল কিছু, তা-ও গেল। বীথির মা'র গয়নাগাটি বিক্রী হ'ল। এদিকে ছেলেমেয়ে হয়ে গেল দেখতে দেখতে অনেকগুলো। কোলকাতার বাড়ি-ভাড়া চালাতে না পেরে চলে এসেছে বেলেঘাটায়। সস্তা ঘরে। তা উপোসে মরতে হ'ত সবাই'কে, যদি বড় মেয়ে প্রীতি কোনরকমে ম্যাট্রিকটা পাশ দিয়ে তাড়াতাড়ি টেলিফোনে ঢুকে না পড়ত।

'তাই বল্, যত সব ছোটলোকের আড্ডা এই বাড়ি, হুঃ, আমার মেয়ের মাথা খাবার জন্য তোমরা তৈয়ার। বলি, অ প্রীতির মা, প্রীতির মা ঘরে আছেন?' প্রভাতকণা লাফিয়ে উঠানে নেমে ন'নম্বর ঘরের দরজার কাছে ছুটে যায়।

কেরাসিনের ডিবি জেবলে ঘরের মেঝেয় ব'সে প্রীতির মা একটা কাঁথা বিছিয়ে সবে সেলাই করতে বসেছে। বাচ্চাগ্বলোকে খাইয়েদাইয়ে ঘ্বম পাড়িয়ে এ সময়টায় তার একট্ব অবসর। প্রীতি ফিরতে এখনো দেরি। প্রীতির বাবা মেঝের একপাশে শ্বয়ে নিজের হাতেই বাতের তেল মালিশ করছে।

প্রভাতকণার চিৎকার শ্বনে প্রীতির মা উঠে ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

'কি রকম আক্কেল শ্বনি আপনার মেয়ের। বলি আপনার কি শাসন নেই, ডাকচাপ নেই ?'

'কেন, কি করেছে আমার মেয়ে ?' প্রীতির মা প্রভাতকণার ম্বর্তি দেখে অবাক।

'কি কইরেছে, কি না কইরেছে!' প্রভাতকণা বিকৃতম্বখে গর্জন ক'রে উঠল। 'আর একদিন শ্বনছি প্রীতি ফোস্‌লানি দিচ্ছে আমার মেয়েকে আপিসে ঢোকাতে। আপনি শাসন না করেন, আমি প্রীতির মাথার চুল টেনে ছিঁড়ব ব'লে রাখছি। যত সব বেলেল্লাপনা, যত সব বদমাইসী।

'আপনি আস্তে কথা বল্বন, আপনি ভাল করে কথা বল্বন।' প্রীতির মা চৌকাঠ পার হয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। 'আমার মেয়ে কবে বলেছে, আপনার মেয়েকে আপিসে ঢ্বকতে,—আপনাদের অন্বমতি ছাড়া মেয়ে আপিসে ঢ্বকবেই বা কেন।'

'চাইছে, প্রীতি চাইছে স্বনীতিকে দলে টানতে। আমার জানতে বাকি নাই।' চোখ পাকিয়ে দ্ব'হাত ঘ্বরিয়ে প্রভাতকণা নাটকীয় ভঙ্গিতে আরম্ভ করলঃ 'আপিসের কীর্তি শ্বনতে আমার বাকি আছে কিছ্ব! দ্যাশে থাকতে বেবাক হ্বনছি, এখানে আইস্যা তো চোখেই দেখছি। ক্যান্ আমার ভাতের হাড়িতে কি ঠাডা পড়ছে যে, পেটের মাইয়্যাকে বেশ্যা বানাম্ব।' যখন রাগ হয় দেশী উচ্চারণগ্বলো ডাক্তার-গিন্নীর জিহবায় খরখরে হয়ে ওঠে।

রাগে, দ্বঃখে প্রীতির মা ঠক ঠক কাঁপছিল। প্রভাতকণার চিৎকার শ্বনে অন্য সব ঘরের লোকেরাও এসে বাইরে দাঁড়িয়েছে। উঠানে রীতিমত ভিড়।

'আপনি এসব কি আবোলতাবোল বকছেন। আপনাদের ইচ্ছা না থাকে, মেয়েকে কাজে দেবেন না, সে আলাদা কথা; কিন্তু বেশ্যা-ফেশ্যা এসব কি, এখানে আরো পাঁচটা ভদ্রপরিবার থাকে ভুলে যাচ্ছেন।' কমলার গলা।

'আ-রে আমার সব ভদ্দরলোকরে!' প্রভাতকণা গলার স্বরকে আরো বিকৃত ক'রে তুলল। 'ভদ্দরলোকের মাইয়া-ছাইল্যা ব্যাটাছেলের গতরে গতর লাগিয়ে খ্বব আপিস কর্বক। আমি দিম্ব না আমার মেয়েরে ফর্সা কথা। তা আপনাকে এখানে ডাকল কে মোক্তারী করতে। আপনার গা অত জবলছে কেন।' কটমট করে প্রভাতকণা কমলার দিকে তাকায়। 'অ, আপনি যে আপিসের দলের মনে ছিল না, সেইজন্যই প্রীতির হয়ে উকিলগিরী করছেন।'

'কে ইতর-ছোটলোক, দশজন এখানে আছে জিজ্ঞেস কর্বন। আপনার মত এমন ছোটলোক ম্বখ এ বাড়িতে কারোর নেই।' কমলা স্বযোগ ব্বঝে কথা বলতে ছাড়ল না।

'ছোটলোক তুই, তোরা।'

উঠোনের এধারে গণ্ডগোল পাকাতে আরম্ভ করেছে, দেখতে দেখতে ওধারে আর এক গণ্ডগোলের স্বষ্টি। কি? না প্রমথর দিদিমা নিজের চোখে দেখেছে বলাইর বৌকে আট নম্বর ঘরের কয়লা নিয়ে পালাতে। হিরণের নতুন আধ মণ কয়লা, সবে তো কাল বিকেলে কিনে আনা হ'ল। আর সবাই যা ক'রে অর্থাৎ শোবার ঘরের ভিতর একধারে যেভাবে হোক, জায়গা করে কয়লা-ঘ্বঁটে কি কাঠ ঠেসে ঠেসে না রেখে হিরণ কয়লাটা বাইরে বারান্দায় রেখেছিল এবং শেষ রাত্রে যখন প্রস্রাব করতে বেরোয়, তখন নাকি প্রমথর দিদিমা দেখে বলাইর বৌ দ্ব'চাকা কয়লা তুলে কাপড়ের নিচে সেটা তাড়াতাড়ি ল্বকিয়ে ফেলে নিজের ঘরের দিকে সরে পড়ছে। অন্ধকার রাত হলেও সাদা-কালো জিনিসটা বেশ মাল্বম হচ্ছিল। 'আধ মণ কয়লা এখানে কে বললে? কিছ্বতেই আধ মণ হবে না। ক'বেলা আর রান্না হয়েছে। তাইতো বলি, কয়লাওলা এবার ওজনে কম দিলে নাকি। ভাবছি আর জগৎকে বকছি।' চিৎকার করছিল বিমল চাকলাদার। ফ্যাক্টরী[illegible] ওভারটাইম খেটে রাত সোওয়া আটটায় [illegible] ঘরে ফিরেছে। ফিরে হিরণের ম্ব[illegible] প্রমথর দিদিমার নিজ-চোখে দেখা কয়[illegible] চুরির কাহিনী শ্বনে বিমল ভয়ানক চ[illegible] গেছে। 'যত সব হাড়হাভাতে এসে এখা[illegible] ঠাঁই নিয়েছে। তাই তো বলি, কয়[illegible] থাকে না, ঘ্বঁটে থাকে না, কাঠ কি[illegible] কুলোতে পারি না। যায় কোথায় এসব[illegible] এমন ধারা চুরি হতে থাকলে রাজার ধন[illegible] কি আর চোখে ঠেকে! যত সব চো[illegible] ছোটলোক এসে বাসা বেঁধেছে এ[illegible] বস্তিতে।'

'চোর ছোটলোক তুই, তোরা।' ঘরে[illegible] ভিতর আর থাকতে না পেরে বলাই[illegible] চৌকাঠের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। কেনন[illegible] বিমল চাকলাদার তাকেই, তার পরিবার[illegible] লক্ষ্য করেই এসব কথা বলছিল, এখ[illegible] আর তা ঢাকা-চাপা নেই। বিকে[illegible] কলতলায় সবাই যখন লাইন দিয়ে জ[illegible] ধরতে দাঁড়িয়েছিল, তখন ময়নাকে ম[illegible] ওপর হিরণ জেরা করছিল, তার মা কয়[illegible] পেল কোথায়? রাত্রে হিরণের কয়[illegible] চুরি করে নিয়ে গিয়ে তবে আজ ওরা উন[illegible] ধরাতে পেরেছে। ড্যাবড্যাবে চোখে ম[illegible] হিরণের দিকে তাকিয়ে কথাগ্বলো শ[illegible] করেছে। তারপর ঘরে ফিরে গিয়ে মা[illegible] বলেছে। নিত্য অভাব-অনটনে জর্জরি[illegible] হয়ে বলাই বলাইর স্ত্রী এ বাড়ির ম[illegible] সকলের চেয়ে বেশি নীরব হয়ে গেছে[illegible] পাশের ঘরের লোকটির সঙ্গেও ক[illegible] বলতে তারা সঙ্কোচবোধ করে। পর[illegible] কাপড় নেই, রাত্রে ঘরে আলো জবলে ন[illegible] সপ্তাহে চারদিন উনোনে আগ্বন পড়ে ন[illegible] এই হীনতাবোধ, এই অসহায়তার ম[illegible] দিন থেকে দিন তারা ম্বতপ্রায় হয়ে আছে[illegible] আজ সরাসরি চুরির কুৎসা তাদের ঘ[illegible] ছ্বঁড়ে মারতে তারা ম্বখ খ্বলতে বা[illegible] হয়েছে। বলাই ঘরে না ফেরাতক ময়ন[illegible] মা চুপ ছিল। বলাই সব শ্বনে গর্জ[illegible] করে উঠেছে। 'বটে! সব কাঠ-কয়লাও[illegible] রাজা-বাদশা এসে জ্বটেছেন এখানে[illegible] ক'পহা কামাচ্ছেন গেঞ্জির কলে মজ্ব[illegible] খেটে, আমার কি জানা নেই—' ইত্যাদি।

বিমল ঘরে ফিরে সব শ্বনে ত[illegible] চেয়েও জোরে চিৎকার করে বাড়ি মাথ[illegible] তুলেছে। 'আমি প্বলিসে খবর দে[illegible]

বাড়িওয়ালার কাছে রিপোর্ট করব। চোর-ছ্যাঁচড়দের না তাড়ালে আমরা এবাড়ি কালই ছেড়ে দেব সব—'

'কত শালা এবাড়ি ছেড়ে দিয়ে রাজপুরীতে গিয়ে ঠাঁই নিচ্ছে, আমার জানা আছে,—লম্বা কথা বলতে সব শালাকেই শুনি।'

'ছোটলোক, রাস্তার কুকুর, খেতে পায় না তবু কত বড় গলা, তুমি যাও না, গিয়ে কাঁধা মুখে বসিয়ে দাও।' চৌকাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে ফিসফিসে গলায় হিরণ স্বামীকে তাতাচ্ছে। বিমল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাগে দাঁতে দাঁত ঘষছে। সাহস পাচ্ছিল না রোগা টিঙটিঙে শরীর নিয়ে বিশালদেহ বলাইর সঙ্গে গিয়ে লড়ে। অনাহারে, অর্ধাহারে থেকে থেকেও মানুষের শরীর এত বড় থাকে কি ক'রে ভাবছিল সে; কিন্তু বিমল লক্ষ্য করেনি বলাইর কাঠামোটাই বড়, আসলে গায়ের মাংস ঝুলে পড়ছে, স্নায়ু ঢিলে হয়ে গেছে, কোটরগত চক্ষুদ্বয়, বিশীর্ণ গণ্ডদেশ।

'থাক বাবা, আর চেঁচিয়ে কাজ নেই।' চৌকাঠের ওধারে দাঁড়িয়ে ময়না বাবাকে ডাকছে। 'বনমালীকে অনেক ব'লে-কয়ে চার পয়সার মুড়ি ধারে আনতে পেরেছি, তুমি ওই দিয়ে জল খাও, সারাদিন আজ মুখে কিছু দাওনি।'

'গেঞ্জির কারখানায় কাজ ক'রে লাট হয়ে গেছেন, হুঁ, বাড়িওয়ালার কাছে রিপোর্ট করবেন। কত শালার রিপোর্ট পাড়িকে কানে তুলছে, আর তার বিহিত করছে আমার জানা আছে—' একটা আধপোড়া বিড়ি তৃতীয়বার ধরাবার চেষ্টা করতে করতে রাগে আক্রোশে বলাই কাঁপছিল। আর ঘরের ভিতর দুঃখে অপমানে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলাইর স্ত্রী মনোরমা কাঁদছিল। কান্নার শব্দ ছাপিয়ে তার কথাগুলো পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। 'আমরা গরিব বটে, কিন্তু আজ অবধি এবাড়ির কারো কুটোটা হাত দিয়ে ছুঁয়েছি, কেউ দেখেছে বলতে পারবে.....'

ইতিমধ্যে শিবনাথ ঘরে ফেরে। রুচি চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। মঞ্জুর খাওয়া হয়ে গেছে। ওকে ঘুম পাড়িয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে সে নতুন আস্তানার বিচিত্র কলরব শুনছে। শিবনাথও একটু সময় কান পেতে শুনল। 'তোমার খুব খারাপ লাগছে রুচি?' শিবনাথ অল্প হেসে প্রশ্ন করল।

'লাগলেও উপায় কি।' রুচি সংক্ষেপে উত্তর করল। শিবনাথ আর কিছু বলতে সাহস পেলে না।

বলাই ও বিমলের ঘরের গোলমাল হয়তো তখন থেমে গেছে। প্রভাতকণা ও কমলার ঝগড়ায় একটু ভাঁটা পড়েছে, এমন সময় শোনা গেল আর এক দিকের হৈচৈ। কি? না হিরুর মা অর্থাৎ রমেশবাবুর স্ত্রী মুখ খুলে অমল হালদারের বৌ কিরণকে যাচ্ছে-তাই গালাগাল করছে। কমলা কাল ওদের ঘর থেকে আধ সের আটা ধার নিয়েছিল, আজ সকালে ফিরিয়ে দেবার কথা, সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা পার হয়ে রাত এখন ন'টা বাজতে চলল, কমলা আটা ফিরিয়ে দিলে না। রমেশ-গিন্নী প্রথমটায় অসন্তুষ্ট, তারপর রেগে নিজের মনে গজ গজ করতে করতে সারাটা বিকেল কাটিয়েছে। এখন সরাসরি কিরণের ঘরের দরজায় গিয়ে হানা দিতে ইতস্তত করল না।

'বলি, যদি সময়মত জিনিস ফিরিয়ে না দিতে পার তো পরের কাছ থেকে হাত পাতো কেন? মুখে আঙুল গুঁজে পড়ে থাকতে পার না।'

কিরণ অনুনয়ের কণ্ঠে বার বার বলছে, 'আজ উনি মাইনে পাননি মাসীমা, পাওয়ার কথা ছিল। মাইনে পেলে আপিস থেকে ছুটি নিয়ে চলে এসে রেশন তুলতেন। কাল টাকা পাবে, কাল রেশন এনে আপনার আটা ফিরিয়ে দেব।'

'যত সব হাভাতে এসে জুটেছে এখানে।' মল্লিকা অর্থাৎ রমেশবাবুর স্ত্রী ফোঁস করে উঠল। 'আমরাও রেশনের চাল-আটা খাই,—তাতেও কুলোয় না, চোরাবাজার থেকে ডবল দাম দিয়ে হপ্তার শেষে সের দু'সের করে কিনতে হচ্ছে—ভাবলাম, সারাদিনে যখন পেলাম না সন্ধ্যাসন্ধি আটাটা ফেরত পাব। ওমা, এ কি কাণ্ড, আজ না কাল, বলি আমি কি সোয়ামী-বাচ্চার মুখে এখন উনোনের ছাই তুলে দেব, আঁ, এদিকে আমার উনোনের কয়লা ধরে গন-গন করছে, ভাজা হ'ল, ডাল করলাম, এই দিই, এই দিচ্ছি ক'রে তিনি রাত দশটায় এসে এখন আমায় মহামন্ত্র শোনাচ্ছেন, কাল দেব,—না বাপু, তুমি আর কারো কাছ থেকে আমায় আটা ধার করে এনে দাও। ঘরে কি আর আমার চাল নেই, আছে,—আমি আর বাচ্চা দুটো না হয় খেলাম, কর্তার রাতে আটা ছাড়া আর কিছু হজম হয় না, তা আমরাই-বা অমন নতুন ছোলার ডালটা করলাম, রুটি না খেয়ে ভাত খাই কোন্ দুঃখে। এবাড়ির রকমসকম দেখে দেখে আমার চোখে কড়া পড়েছে,—কারো কাছ থেকে আমি সুপুরিটাও ধার করি না। এখন আমি আটা চাইতে পরের দরজায় যেতে পারব না। আমার আটা দাও। আটায় টান পড়েছে।'

কিরণ অসহায় চোখে মল্লিকাকে দেখছে। ঘরের ভিতর অমল মাথায় হাত দিয়ে চুপ করে বসে ভাবছে। তিনদিন আগে তাদের মাইনে হবার কথা ছিল। কিন্তু কারখানায় স্ট্রাইক চলেছে বলে সেটি আটকে গেছে। অমলের হাত
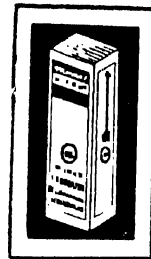
শূন্য। আজ দেব, কাল দেব ক'রে দোকান থেকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জিনিসপত্র ধারকর্জ ক'রে দু'দিন চালিয়েছে। কালও যে সে মাইনে পাবে, তার নিশ্চয়তা নেই। কালও রমেশবাবুর ঘরের আটা ফেরৎ দিতে পারা যাবে না, এই দুশ্চিন্তায় সে মরে যাচ্ছিল। এ-বাড়ির আর কেউ ধার-কর্জ দেয় না। সবাই নাকি ঠেকে শিখেছে। ধার দিয়ে সময়মত তা আদায় করা কঠিন। তবু নিরুপায় হয়ে কমলা শেষটায় রমেশ রায়ের স্ত্রী মল্লিকার কাছে আটা চেয়ে এনেছিল। কিন্তু এক সন্ধ্যা পার না হতে যে মল্লিকা এমন মারমুখী হয়ে তাদের দরজায় এসে হানা দেবে, কিরণ ও অমল বুঝতে পারেনি।

'বলো, বৌ, এখন আমি কি করি?' মল্লিকা ভদ্রতার মাথা খেয়ে কিরণের হাতে হ্যাঁচকা টান মারল। 'আমার কয়লা পুড়ে যাচ্ছে।'

ফাঁসির আসামীর মত দাঁড়িয়ে কিরণ। ভয়ে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বিধু মাস্টারের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা ছুটে এসেছে কিরণের দরজায়, এগারো নম্বরের ঘরের লোকেরা এসেছে, নিজেদের ঘরের গোলমাল থামতে প্রীতি, বীথি এসে উঁকি দিয়েছে আট নম্বরের ঘরের দরজায়। ব্যাপার কি! মল্লিকা দু'হাত শূন্যে ঘুরিয়ে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, 'ভালমানুষের মত এসে চাইতে ঘরের জিনিস বার ক'রে দিলাম, এখন সেটি আদায় করতে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, এর বিচার তোমর করো ভাই, উপকার করে আমি মহ ঠকেছি।' মল্লিকা একে একে সকলে মুখের দিকে তাকাল। কিরণও তাকায় কিন্তু সাহায্য বা সহানুভূতির প্রশ্র একটি চোখেও সে দেখতে পেলে না কারো মুখে হুঁ-হাঁ শব্দ নেই। বর সকলের চেহারা দেখে মনে হ'ল এ ব্যাপারে কিরণই অপরাধী। কণ্ট্রোলে দিনে ছটাক কাঁচ্চার ওজনে সবাই খা পায়। কাজেই ধারের আটা ফিরিয়ে দিয়ে অমল চাকলাদারের বৌ খুব অন্যা করছে। এমন সময় ভিড় ঠেলে হঠা একজন এসে দাঁড়াল। বারো নম্বরে নতুন ভাড়াটে। রুচি। দূরে থেকে

দাঁড়িয়ে সে সব শুনছিল। মল্লিকাকে বলল, 'আমার কিছু আটা আছে, এখন চালিয়ে দিচ্ছি নিন।'

বীথি বলল, 'আপনারা এখানে নতুন এসেছেন, রেশন কার্ড করা হয়নি নিশ্চয়, ঘরের জিনিস ছেড়ে দিলে শেষটায় অসুবিধা হবে।'

এক সেকেন্ড কি ভেবে রুচি বলল, 'তা একরকম চালিয়ে নেয়া যাবে।'

বীথি নীরব।

পিছন থেকে কে একবার কেশে উঠল।

মল্লিকা গলা নামিয়ে বলল, 'আপনার কাছ থেকে নেয়াটা তো বড় কথা নয় দিদি, আজ না হয় চালিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু কাল যখন আপনার আটা আমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে, আমাকে চোরাবাজারের ডবল দাম দিয়ে কিনে তবে তো সেটা শোধ করতে হবে। কি বলিস বীথি?'

বীথি মাথা নাড়ল।

রুচি বলল, 'কাল আপনাকে দিতে হবে না। সোম-মঙ্গলবার রেশন এনে সেটা ফেরৎ দিলেও আমার অসুবিধা হবে না।'

'অই একই কথা।' মল্লিকা আবার গলা চড়া করল। 'আমার এক সের যতক্ষণ না ফিরিয়ে পাচ্ছি, আর একজনেরটা শোধ করতে হলে দেড়া দাম দিয়ে কিনে তা করতে হবে। তাছাড়া সোম-মঙ্গলবারও যে কিরণ আটা ফেরৎ দিতে পারবে, আমার ভরসা হয় না।'

এতক্ষণ কিরণ আশ্বস্ত হয়ে রুচির দিকে তাকিয়েছিল। এবার মাটির দিকে তাকাল। মল্লিকা আর সেখানে না দাঁড়িয়ে রাগে গজগজ করতে করতে সরে পড়ল। গায়ে পড়ে কিরণের পক্ষ হয়ে নবাগতা রুচির এই উপকার করতে আসা রমেশ-গিন্নী ভাল চোখে দেখল না। যেন দাঁড়িয়ে কিরণকে আরো কতক্ষণ অপমান করার ইচ্ছা ছিল, সেটি হ'ল না দেখে বিরক্ত হয়ে মল্লিকা সরে গেল।

রুচিও আর সেখানে দাঁড়াল না। আস্তে আস্তে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। প্রীতি, বীথি ও বিধু মাস্টারের ছেলেমেয়েরা মল্লিকার পিছু পিছু সরে পড়েছে। কিরণ একটা লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে আস্তে আস্তে দরজার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিলে। অমল চাকলাদারের ঘরে আজ আলোও জ্বলল না, উনোনেও আগুন পড়ল না।

ঝগড়াঝাটি কতক্ষণের জন্যে বন্ধ হলেও বাড়ির কলগুঞ্জন থামে না। একটু কান পাতলে শোনা যায় ঘরে ঘরে রান্নাবান্না খাওয়াদাওয়ার শব্দ। শব্দ এবং নানা রকমের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। শেখর ডাক্তারের ঘরে ইলিশ মাছ ভাজা হচ্ছে, তার গন্ধ। বিধু মাস্টারের ঘরে এবেলা কাছিমের মাংস রান্না হচ্ছে, তার গন্ধ। হীরুর বাবা রমেশ রায় ফেরার পথে বেলেঘাটা পুলের ধার থেকে সস্তায় দুটো কুমড়ো কিনে এনেছেন। রুটি দিয়ে খাবে ব'লে মল্লিকা ঘটা করে সেগুলি ভাজছে। কিরণের ওপর, তার চেয়েও বোধ করি রুচির ওপর রেগে গিয়ে জোরে জোরে খুন্তি নাড়ছে। কমলা এবেলা কয়লা ধরায়নি। স্টোভ জেলে পরটা ভাজছে। স্টোভের ভস্ ভস্ শব্দ এবং পরটা ভাজার ঘিয়ের গন্ধ সারা বাড়ি ছড়িয়ে পড়েছে। দালদা কি অন্য ভেজাল ঘি, না খাঁটি গাওয়া ঘি। এই ঘি কমলা কোথায় পায়, তা নিয়ে কারো কারো ঘরে আলোচনা হচ্ছে। প্রীতির মা'র ঘরে এবেলা বিশেষ কিছু হয়নি। বেগুনভাজা আর বিউলি ডাল। বিউলি ডাল সিদ্ধ হতে আরম্ভ করলে তার গন্ধটাও কম যায় না। প্রীতির মা ডাল ভেজে নেয় বলে গন্ধটা আরো বেশি কড়া হয়। বিমল চাকলাদারের ঘরে রান্না হচ্ছে নতুন মুলো ও চিংড়ি মাছ দিয়ে চচ্চড়ি। মাছটা নরম। ফেরার পথে বৈঠকখানা বাজার থেকে সে একটু সস্তা দরে কিনে এনেছিল। পচা চিংড়ি মাছের গন্ধ বাড়ির অন্য সব গন্ধকে টেক্কা দিয়েছে এবং চিংড়িচচ্চড়ি দিয়ে ভাত মেখে খেতে খেতে চড়া গলায় সে হিরণকে বলছিল, 'ওয়া'ডারফুল রান্না হয়েছে তোমার, মাছটা একেবারে ফ্রেস ছিল।' শুনে পাশের ঘরের অমল হালদার বিছানায় শুয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। অবশ্য অভুক্ত হালদার দম্পতীকে শোনাতে বিমল তার স্ত্রীর রান্নার প্রশংসা করছিল না, তার লক্ষ্য ছিল বলাইর ঘর। তেমনি শেখর ডাক্তার ইলিশ মাছ খেতে খেতে মাছ ও রান্নার প্রচুর প্রশংসা করছিল গলা বড় ক'রে। বিধু মাস্টারের ছেলে-মেয়েরা ঘরে মাংস পাক হচ্ছিল বলে আহ্লাদে প্রচণ্ড চিৎকার ও দাপাদাপি শুরু করেছিল। আর শব্দ হচ্ছিল পাঁচু ভাদুড়ীর ঘরে। সন্ধ্যার পর খালপারের শুঁড়িখানায় পুরো দু'পাইট সাবাড় ক'রে এই মাত্র ভাদুড়ী ঘরে ফিরে হৈ-হল্লা আরম্ভ করেছে, বৌকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করছে। 'কাউকে বাজারে পাঠিয়ে ইলিশ মাছ কি মাংস আনিয়ে রান্না ক'রে রাখতে ক্ষতি ছিল কি ছোট-লোকের মেয়ের। ঘরে কি পয়সা ছিল না, না পাঁচুর পয়সার কিছু অভাব আছে। মদ খেয়ে এসে সে শুধু ডাল দিয়ে ভাত খাবে কেন?' এই ছিল তার বক্তব্য। শব্দ ও কোনরকম গন্ধ ছিল না বলাইর ঘরে, অমল হালদারের ঘরে। রুচির রান্না ও খাওয়া সকাল সকাল সারা হয়েছে বলে সে-ঘরও নীরব ছিল। আর নীরব ছিল রুচির পাশের ঘর। এগারো নম্বর

ঘরে কেউ তখন উঁকি দিলে দেখতে পেত কে গুপ্ত তখনো ঘরে ফেরেনি। স্ত্রী সুপ্রভা একটা সুজনি মুড়ি দিয়ে চুপচাপ শুয়ে আছে। ঘরের এক পাশে একটা ডিট্‌জ লণ্ঠন জ্বলছে। আলোটা যতটা সম্ভব কমিয়ে রাখা হয়েছে। আর সেই স্বল্প আলোয় ব'সে পনেরো ষোল বছর বয়সের একটি ছেলে। কাগজ জ্বালিয়ে এলুমিনিয়মের বাটিতে ক'রে জল গরম করছে। কে গুপ্তর বড় ছেলে। নাম রুণু। মাথার চুল বড় হয়ে কপালে ঘাড়ে এসে পড়েছে। যেন কতকাল চুল কাটা হয়নি। গায়ে একটা ছেঁড়ামতন হাওয়াই শার্ট। হাফপ্যাণ্ট্ পরনে। কাগজের ধোঁয়ায় ঘরের ভিতরটা অন্ধকার হয়ে আছে। যেন কাগজটা ভিজা ব'লে ভাল জ্বলছে না। একবার নিভে যেতে হ্যারিকেনের চিমনি তুলে এক টুক্‌রো কাগজ জেলে রুণু ফের জল গরম করছে। কেট্‌লির ঢাকনা তুলে এক একবার আঙুল ডুবিয়ে দেখছে জল কতটা গরম হ'ল। কিন্তু যথেষ্ট গরম হয়নি বলে মুখে মৃদু বিরক্তিসূচক শব্দ ক'রে আবার কেটলির ঢাকনা বন্ধ ক'রে দিয়ে রুণু কাগজ জ্বালছে। বাড়িতে এক সন্ধ্যার মধ্যে তিন চারটে ঝগড়া হয়ে গেল। কিন্তু সুপ্রভা একবারও উঠে বাইরে যায়নি। কারা ঝগড়া করছে, কি নিয়ে কলহ সেসব জানবার কি দেখবার এতটুকু আগ্রহ নেই তার। সেই বিকেল থেকে সুপ্রভার চায়ের তেষ্টা পেয়েছে। ঘরে চা চিনি কি জল গরম করার কাঠ ঘুঁটে কিছুই ছিল না। চা খাবে না ঠিক করেছিল সুপ্রভা। কিন্তু শেষ-পর্যন্ত তৃষ্ণা দমন করতে না পেরে মেয়ে বেবিকে পাঠিয়েছিল বনমালীর দোকানে ধারে চা চিনি আনতে। দোকানের সামনে বাবাকে বসে থাকতে দেখে বেবি সাহস পায়নি সেখান থেকে ধারে কিছু আনতে। বেবি ফিরে এসেছিল। সুপ্রভা তাকে আবার পাঠিয়েছে, মোড়ে ক্ষিতীশের চায়ের দোকানে। ক্ষিতীশ এই বাড়ির রমেশ রায়ের ভাই। ছোটখাট একটা দোকান খুলেছে। সেখানে এমনি চা চিনি বিক্রী হয় না। তৈরী চা বিক্রী হয়। কিন্তু দোকান বেশি রাত অবধি খোলা থাকে না। সন্ধ্যাসন্ধি উনুন নিভিয়ে দেওয়া হয়। বেবি একটা কাচের গ্লাস সঙ্গে নিয়ে গেছে। যদি পায় তৈরী চা নিয়ে আসবে, নয়তো চেয়ে ক্ষিতীশের দোকান থেকে এমনি একটু চা ও চিনি আনবে। যদি তৈরী চা এসে যায় তবে রুণুর গরম জলের দরকার পড়বে না। কিন্তু রুণু বলছে, তবু সে খানিকটা জল গরম ক'রে রাখবে। সুপ্রভার যতটা চায়ের দরকার গ্লাশে রেখে বাকি যেটুকু থাকবে তা-ই গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে রুণু সেটাকে পরিমাণে বাড়িয়ে একটু চা খাবে। ঠাণ্ পড়েছে, তারও আজ চা খেতে ইচ্ছে হচ্ছে বস্তুত পার্কসার্কাসের বাড়িতে থাক সুপ্রভা রুণু বেবি সকলেই দু'বেলা খেত। এখানে এসে সেসব বন্ধ হ গেছে। কেবল গুপ্ত সাহেব সকালে এ কাপ চা খান। বিকেলে আর তাঁ চায়ের দরকার হয় না। বিকেল পাঁচটা পর থেকে কিসের তৃষ্ণায় তিনি ছটফট করেন বেবি রুণুও টের পায়। সুপ্রভা বটেই।

রুণু কেটলির জল পরীক্ষা করতে আর একবার ঢাকনা তুলল। কাগজ জ্বালতে আবার হ্যারিকেনের চিমনি খুলল। অত্যধিক নাড়াচাড়ার দরুণ আলোর শিখাটা কাঁপছে। সেই সঙ্গে উল্টোদিকের টিনের বেড়ায় রুণুর চুল বোঝাই প্রকাণ্ড মাথার ছায়াটা নাচছে। ঘরে টেবিল চেয়ার আলনা খাট ইত্যাদি কিছুই নেই। এ-বাড়িতে রমেশ রায় ও শেখর ডাক্তার, আর হ্যাঁ, কমলার ঘর ছাড়া অন্য কোনো ঘরে কাঠের জিনিস নেই। সুপ্রভা মেঝের ওপর একটা রাগ্ বিছিয়ে শুয়ে আছে। তার শিয়রের দিকে একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স। বাক্সের ওপর কয়েকটা খালি টি সাজানো। এককালে এই পরিবারে হর-লিক্‌স্, ওভ্যালটিন, বাটার জ্যাম জেলি প্রচুর আসত টিনগুলো তার নিদর্শন। শূন্য টিনগুলো যে পার্কসার্কাসের বাড়ি থেকে বিনা কারণে বয়ে আনা হয়েছে তা নয়। দামী বোয়ম ও অন্যান্য পাত্র বিক্রী করে দেয়ার পর সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস রাখবার জন্যে এখন এগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে। কে গুপ্তর রূপোর বাটি গ্লাশ চামচ তো বটেই বেশির ভাগ কাঁসার বাসনকোসনই বিক্রী করা হয়েছে। এখন একসঙ্গে রুণু বেবি এবং গুপ্ত সাহেব যদি ভাত খেতে বসেন তবে থালা গ্লাশ কুলোয় না। আগে পরে খেতে হয়। পার্কসার্কাসের বাড়িতে তারা টেবিল চেয়ারে বসে খেয়েছে। টেবিলে গোল হয়ে সুপ্রভা বসত, গুপ্তসাহেব বসতেন, রুণু বসত, বেবি বসত। সকালবেলা অফিসের তাড়া থাকত বলে বেশির ভাগ রাত্রেই গুপ্ত সাহেব সকলকে নিয়ে একসঙ্গে বসে গল্প করতে করতে খেয়েছেন। সুপ্রভা নিজের হাতে বেবি ও রুণুকে কাঁটা-চামচ ব্যবহার

রতে শিখিয়েছিল। কাঁটা-চামচ দূরে থাক রে এখন একটা সাধারণ চায়ের চামচও ই। বেবিকে এখন চা করতে হলে য়ানক অসুবিধেয় পড়তে হয়। কখনো ...তির ডাঁটা কখনো বা গরম চায়ে আঙুল ...িয়ে বাটির দুধ চিনি মেশাতে হয়। ...রের কাজকর্ম বেশির ভাগ এখন বেবিই ...রে। মাঝে মাঝে রুণু সাহায্য করে। ...প্রভা এসব করেও না দেখেও না। তা ...ড়া বেলায় বেলায় ভারি কিছু যে রান্না ...য় তা-ও না। ভাতে ভাত ফুটানো কি ...ল সিদ্ধ করা বা রুটি করা। এসবের ...ন্যে সুপ্রভা আর উনোনের ধারে যায় না। ...ধিকাংশ সময়ই সুপ্রভার শুয়ে কাটে। ...ছাড়া কে গুপ্তর অফিসে যাওয়ার তাড়া ...ই বলে এখন যত বেলায় খুশি যদি ...া চাপানো হয় তাতে অসুবিধা হয় না। ...র প্রত্যহ নিয়মিত রন্ধনোপযোগী খাদ্য-...ম্ভার ঘরে না থাকলে কাজকর্মের যে ...শৃঙ্খলা দেখা দেয় এই সংসারেও সেটি ...শ ভালভাবে দেখা দিয়েছে। কদিন দেখা ...য় হাঁড়িতে জল ফুটছে। টাকার অভাবে ...শন আনা হয়নি। রুণু গেছে ধারে ...থাও চাল আনতে। বেবি বনমালীর ...োকানের সামনে ঘুর ঘুর করছে কখন কে ...ত সামনের বেঞ্চিটা থেকে উঠে যাবে ...র ও গিয়ে বনমালীকে এটা ওটা ধারে ...তে পারে কিনা জিজ্ঞেস করবে। এমন ...যে কে গুপ্ত উঠে গেলে বনমালী ...িকে বেশি ধার দেবে। ইচ্ছা না থাকলে ...েই না এবং অধিকাংশ সময় বেবিকে ...ফলমনোরথ হয়ে ঘরে ফিরতে হয়। ...ু এমনি, বিশেষ করে এ-বাড়ি আসার ...র থেকে বাবার সামনে যেতেই যেন ...বির লজ্জা করে। যেন সে হঠাৎ বড় ...য়ে গেছে। গুপ্ত সাহেব অধিকাংশ ...ময় বাড়িতে থাকেন না বলে বেবি ...স্তিবোধ করে। রুণুর মনের অবস্থাও ...নেকটা তাই। আশ্চর্য সুপ্রভারও মেজাজ ...ল থাকে স্বামী বাড়ি না থাকলে। বেকার ...রুষ সংসারে কতটা অবাঞ্ছিত কে গুপ্ত ...র প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মদ খাওয়ার জন্যে ...য়। পাঁচু ভাদুড়িও মদ খায়। কিন্তু ...লিগালাজ না করলে ভাদুড়ীর বৌ ...দুড়ী যতক্ষণ বাড়িতে থাকে খুশিবাসি ...কে।

এবার রুণুর কেটলির জল ফুটতে আরম্ভ করে। সুপ্রভা একটা হাই তুলল। রুণু একবার উঠে বারান্দায় উঁকি দেয়। 'বেবি এল?' সুপ্রভা প্রশ্ন করল। 'না।' চৌকাঠ থেকে ফিরে এসে রুণু বলল, 'ওটা ভয়ানক আড্ডাবাজ হয়ে গেছে, মা। যেখানে যায় এমন গল্প জমিয়ে বসে।' সুপ্রভা নীরব। রুণু বলল, 'ক্ষিতীশ এই বাড়ির লোক। জানাশোনা। তার সঙ্গে গল্প করুক ক্ষতি নেই, সেদিন আমি দেখলাম সেই কোথায় রাসমণির বাজারে পালেদের মুদির দোকানে বসে আড্ডা মারছে। মদন পালের ছেলে মোহনটার সঙ্গে দিব্যি গল্প জুড়ে দিয়েছে।'

সুপ্রভা তথাপি নীরব। রুণু অনেকটা নিজের মনে বলতে লাগল, 'এসব জায়গা ভাল না। মদন পালের ছেলে মোহনটা এই বয়সেই বিয়ে করে ফেলেছে। ওদের কি। দেদার পয়সা। লেখাপড়া করারও দরকার নেই। ক্লাশ ফোর অবধি বোধ করি পড়েছে। হাতে তিনটে আংটি। আমার চেয়ে একবছরের বেশি বড় হবে কি! বিয়ে করে ফেলল। সিগ্রেট তো মুখে লেগেই আছে। সেদিন মোহনকে দেখলাম বাজারের একটা গলির মধ্যে ঢুকতে। গলিটা খারাপ আমি টের পেয়েছি।'

'আঃ, কি বকর বকর আরম্ভ করলি রুণু!' সুপ্রভা হঠাৎ ধমক দিয়ে উঠল। রুণু চুপ করল। বারান্দায় কার পায়ের শব্দ হয়। সুপ্রভা ও রুণু দুজনেই চকিতে কান খাড়া করে ধরে। শব্দ মিলিয়ে যায়। ঘাড় ফিরিয়ে মার দিকে তাকিয়ে রুণু আস্তে আস্তে বলে, 'না, আমি বলছিলাম বেবিটা যেখানে-সেখানে যার-তার দোকানে যাচ্ছে কেন। ওর কি—'

বাধা দিয়ে বিরক্তকণ্ঠে সুপ্রভা বলল, 'ওর দোষ কি। বনমালী আর ধারে কত জিনিস দেবে। সেদিন মদন পালের দোকান থেকে বেবি ধারে সর্ষেতেল নিয়ে এল। তোরা বসে বসে খাবি। একটা পয়সা আর নেই। ধার-কর্জ করতে বেবিকে এখন যেখানে সেখানে যেতে হচ্ছে, আমি করব কি।'

রুণু চুপ ক'রে রইল। সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে ওর পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। রুণু একটু অবাকই হ'ল মার কথা শুনে। এখানে এসে অবধি দুঃখ করছিল সুপ্রভা ছেলেমেয়ে দুটোর আর লেখাপথা হ'ল না ব'লে। আজ হঠাৎ রুণুর কিছু করা না করার কথায় সে ভীষণ চমকে উঠল। চমকে মার মুখের দিকে তাকিয়ে ফের কালিপড়া লণ্ঠনটার দিকে স্থির নিবিষ্ট

চোখে চেয়ে রইল। ভাবল, কেবল কি বাবা কিছু করছে না বলে মার মনে দুঃখ সংসারে এই অনটন। রুণু এখনই চাকরি-বাকরিতে ঢুকে পড়ুক মার এই ইচ্ছে। 'মা!' মুখ তুলে রুণু আস্তে ডাকল। কিন্তু সুপ্রভা সাড়া দিলে না। রুণু টের পেল মা নিঃশব্দে কাঁদছে। মা অনেক সময় মুখভার করে থাকে, মন খারাপ করে থাকে। কিন্তু কাঁদতে সে এই প্রথম দেখল, দেখল না ঠিক, টের পেল। স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে কিশোর ভাবতে লাগল তবে তো তার আর বসে থাকা ঠিক না, যা-হোক একটা কিছু চাকরিবাকরি ক'রে। 'কে?'

'আমি।' বলতে বলতে বেবি এসে ঘরে ঢুকল। হাতে কাচের গ্লাশে ভর্তি চা। গ্লাশ গরম বলে বেবি ফ্রকের তলার দিকটা গুটিয়ে গ্লাশের নিচে রেখে সেটা ধরে এনেছে।

'অনেক চা নিয়ে এলি।' চোখ বড় ক'রে রুণু বেবির মুখের দিকে তাকায়। বিষণ্ণতা কেটে গিয়ে তার চেহারা একটু হাসিখুশি হয়ে উঠেছে। বেবি শব্দ করল না। গ্লাশটা মেঝের ওপর নামিয়ে রেখে কোচকানো ফ্রকটা টেনেটুনে ঠিক করতে লাগল। রুণুর ঠিক এক বছরের ছোট বেবি। তা ছাড়া বেশ বাড়ন্ত গড়ন। দেহের অনুপাতে ফ্রকটা ছোট-ছোট ঠেকছে। যেন আঁট জামা না পরে কাপড় পরলেই ওকে ভাল মানায়। এত বড় মেয়ে বেবির ফ্রক পরা নিয়ে এবাড়িতে বেশ কথাবার্তা হয়ে গেছে। বিধু মাস্টারের স্ত্রীতো সেদিন সুপ্রভার মুখের ওপর বলল, 'মেয়ের শরীরের গড়ন ফ্রকে আর লুকোনো যাচ্ছে না দিদি,—এই বেলা শাড়িটাড়ি পরতে দিন।' সুপ্রভা কোনো কথা বলেনি। বেবি এখুনি শাড়ি পরতে আরম্ভ করবে। এতকাল তার চিন্তায় ছিল না। ফ্রক পরে বেবি স্কুলে গেছে। বাড়িতেও ফ্রক পরেছে। সুপ্রভা বেবিকে লরেটোতে ভর্তি করে দিয়েছিল। কেবল লরেটোর ছাত্রী ব'লে নয় পার্কসার্কাস যতদিন কাটিয়ে এসেছে, বেবি কি তার চেয়েও বড় বাড়ন্ত শরীরের মেয়েদের কোনোদিন শাড়ি পরতে দেখেছে সুপ্রভার মনে পড়ে না। 'কিন্তু এটা পার্কসার্কাস নয়। এটা বেলেঘাটা।' বিধু মাস্টারের বৌ গম্ভীর গলায় বলছিল, 'তা ছাড়া বস্তিবাড়ি। পাঁচ রকমের লোকের বাস, দিদি। মেয়েছেলেকে একটু রেখেঢেকে চলতে শিখতে দেওয়া ভাল।' হয়তো অন্য সময় হলে অর্থাৎ আগের অবস্থা থাকলে সেদিনই রাগ ক'রে সুপ্রভা নিজে দোকানে গিয়ে মেয়ের জন্যে তিন জোড়া শাড়ি কিনে আনত। বিধু মাস্টারের বৌয়ের মুখ যাতে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সে-অবস্থা তো নেই, আঁট ফ্রকটার বদলে একটু বড় ঢিলেঢালা ক'রে আর একটা জামা বেবিকে তৈরি ক'রে দেওয়ার সংগতি আজ সুপ্রভার নেই। নিজের অক্ষমতা এবং পাঁচজনের কথা ইত্যাদির দরুণ সুপ্রভার সকল রাগ গিয়ে পড়ে মেয়ের ওপর। যেন বেবিকে দেখলেই সুপ্রভা বিরক্ত হয়ে ওঠে, বিরক্ত হয়ে ওঠে আর তার বুকের ভিতর টনটন করতে থাকে। এই ক'মাসে বেবি যেন বেশি বড় হয়ে গেছে।

নিজের জন্যে একটুখানি একটা কাপে ঢেলে গ্লাসের বাকি চা সুপ্রভা ছেলেকে দিয়ে দেয়।

'তুই একটু খাবি, বেবি?' রুণু বোনকে প্রশ্ন করে। 'না আমি ক্ষিতীশদার দোকান থেকে খেয়ে এসেছি।' বেবি রুণুর দিকে না তাকিয়ে মার দিকে তাকায়।

'পয়সার কথা কিছু বলল ক্ষিতীশ?'

'না তো।' একটা ঢোক গিলল বেবি। 'বরং বলল, তোরা বাড়ির লোক। যখন ইচ্ছে চা নিয়ে যাস খেয়ে যাস। পয়সার দরকার হলে আমি গিয়ে মাসীমাকে বলব।'

সুপ্রভা আর কিছু বলল না। ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে চা খেতে লাগল।

'তোর কথা জিজ্ঞেস করছিল ক্ষিতীশদা।' বেবি ভাইয়ের দিকে তাকায়। 'সবাই আমার দোকানে আসে তোমার ভাইকে একদিন দেখলাম না।'

মুখের চাটুকু গিলে রুণু জিহ্বার একটা শব্দ করল। 'বেলেঘাটার রেস্টুরেণ্ট। কত বড় দোকান ক্ষিতীশের। এসব দোকানে গিয়ে জানো মা, চা খেতে আমার এমন গা ঘিন ঘিন করে।'

তা করা স্বাভাবিক। শহরে বড় বড় রেস্টুরেণ্ট দেখেছে ছেলেমেয়েরা। অবশ্য রুণু বা বেবিকে সুপ্রভা কোনোদিন একলা কোনো খাবার বা চায়ের দোকানে পাঠায়নি। সবাই একসঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে কি সিনেমা দেখতে গেছে। ফেরার পথে গুপ্ত সাহেব ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বড় বড় রেস্টুরেণ্টে বসে খেতেন। চা খাওয়া শেষ হলে সুপ্রভা বাটিটা হাত থেকে নামিয়ে রাখল।

'অ, তুই বসে বসে সেখানে চাটা খেলি, তাই এত রাত হ'ল।' রুণু বেবির চোখের দিকে তাকায়।

'চাটা নয়।' কপালের চুলগুলো হাত দিয়ে পিছনের দিকে ঠেলে দেয়। 'এক কাপ চা শুধু, আর একটা বিস্কুট। এখানকার বিস্কুট ভাল না—'

রুণু আর একটা কি প্রশ্ন করতে থেমে গেল। বাইরে বারান্দায় গুপ্তের গলার শব্দ শোনা গেল। ঢেকুর তুলছে। চা খেতে সুপ্রভা উঠে বসেছিল। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল। রুণু মাথা গুঁজে পোড়া কাগজের টুকরোগুলো পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। যেন হাতের কাছে হঠাৎ কোনো কাজ না পেয়ে বেবি বিমূঢ় ভীত চোখে দরজার দিকে তাকায় কিন্তু বাবা তখনি ঘরে ঢোকে না। যেন বারান্দায় ছেঁড়া মোড়াটার ওপর বসে অন্ধকারে ছেঁড়া মোড়ার ওপর বসে বে গুপ্ত হপকিন্স আওড়াচ্ছিল, give

beauty back, beauty, beauty, beauty.

অন্য ঘরের বাসিন্দারা তখনো ঘুমোয়নি। গড়গড়া টানতে টানতে শেখর ডাক্তার নিম্নকণ্ঠে স্ত্রীকে বলল, সাহেব আজ পুরো একটা পাঁইট ঢেলে এসেছে, মেজাজ খুলেছে। কবিতা আওড়াচ্ছে শোন।'

বিধুমাস্টারের বৌ স্বামীকে বলছিলঃ 'পয়সা নেই, হাঁড়ি চড়ে না ঘরে, কিন্তু মিনসের গলা কোনোদিন শুকনো থাকে না। আজ আবার কোথা থেকে খেয়ে এল।'

'এরা হ'ল উদ্যোগী লোক।' বিধু-মাস্টার চাপা গলায় হেসে স্ত্রীর কথার জবাব দেয়। 'বনমালীর দোকান থেকে উঠে একলা খালের দিকে যাচ্ছিল তখন দেখলাম। শেষ অবধি কোনো মক্কেল জুটিয়েছে আর কি।'

'হাইলি এডুকেটেড। তা ছাড়া ভাল ঘরের ছেলে।' চাপা মৃদু গলায় শিবনাথ রুচিকে বলছিল। 'এই হ'ল ফ্রাশট্রেশ্যান। করবার ইচ্ছা ছিল, ক্ষমতা ছিল, কিন্তু কিছুই হ'ল না; শেষ পর্যন্ত সব আশা আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হ'ল। তাই না ওর এ অবস্থা।'

'তোমার তো চাকরি নেই, গুপ্ত সাহেবের মত বেকার হলে। মনের দুঃখে মদ ধরবে নাকি।' রুচির ঠাট্টার সুর। 'পাশাপাশি ঘরে রয়েছ। ছোঁয়াচ লাগতে কতক্ষণ।'

'পাগল।' শিবনাথ পাশ ফিরে শোয় মদ খাওয়ার লোক অন্যরকম, তাদের জাতই আলাদা।'

রুচি আবার কি বলতে যাচ্ছিল থেমে গেল।......নম্বর ঘরের পুরুষের গলা। 'একশ দিন বলেছি তোমায়। বদমায়েসটা যখন বারান্দায় বসে থাকে রাত্রে তুমি বাইরে যাবে না।'

'আমি কি জানতুম বেবির বাবা অন্ধকারে ওখানে ব'সে আছে।' স্বামীর কাছে ধমক খেয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল কিরণ। 'আমি তো রোজ বলি তোমাকে বাড়ি ছেড়ে দাও।'

'যখন ছাড়বার ঠিকই ছাড়ব। কিন্তু তোমার চলাফেরা সংশোধন কর।' বৌয়ের ওপর ভয়ানক চটে গেছে অমল হালদার। রাগে অন্ধকার ঘরে তর্জন-গর্জন করছে। 'একশ দিন বলেছি রাত্রে বাইরে গিয়ে কাজ নেই। জায়গা ভাল না। পর্যন্ত একটা অতিরিক্ত হাঁড়ি কিনে আনলাম সেদিন। কিন্তু কথা মোটেই কানে ঢোকে না তোমার, কেমন?'

যেন কিরণ আর কিছু বলছে না। তার কান্নার ফোঁপানি শুধু শোনা যায়।

তিন নম্বর ঘরে স্ত্রীলোকের হাসির শব্দ শোনা গেল। বিধুমাস্টারের স্ত্রী লক্ষ্মীমণির গলা। তা যত অনুচ্চ স্বরে কথা বলুক লক্ষ্মীমণির প্রত্যেকটি বচন বস্তির সব ঘরের বাসিন্দাই পরিষ্কার শুনতে পেলঃ 'খেতে দিতে পারিস না পরনের কাপড় নেই বৌয়ের শাসনের বহর দেখ। পুরুষ কেউ বারান্দায় উঠোনে থাকলে বৌকে রাত্রে পাইখানায় প্রস্রাব-খানায় যেতে দিতে আপত্তি, ফুটোনি কত!'

'ছোকরার খুঁতখুঁতে মন। এসব লোকের উচিত পরিবার নিয়ে আলাদা ফ্ল্যাটবাড়ি ভাড়া ক'রে থাকা।' লক্ষ্মীমণির স্বামী বিধুমাস্টারের উপদেশাত্মক মন্তব্য শোনা যায়।

'ফ্যালেট বাড়ি!' আর এক ঘরে বিকৃতস্বরে কে মন্তব্য করেঃ 'ছাল নাই কুকুরের বাঘা নাম। হপ্তার রেশন আসে না ঘরভাড়া আটকে গেছে সে-লোক কিনা আলাদা বাড়ি আলাদা ঘরে গিয়ে থাকবে বৌ নিয়ে, তবেই হয়েছে।'

রুচি বুঝতে পারল মন্তব্যটা রমেশগিন্নীর। একটু আগে আটা নিয়ে কিরণের সঙ্গে যিনি কোঁদল ক'রে এসেছেন। কিন্তু এত সব মন্তব্য শোনা সত্ত্বেও, রুচি অবাক হ'ল, অমল হালদার চুপ ক'রে থাকেনি। অনর্গল সে বৌকে শাসাচ্ছে। 'এম-এ, বি-এ পাশ করিনি ব'লে কি বিউটি কথার মানে আমি বুঝি না, অ্যাঁ,—তোমায় দেখলেই ওই শালা এসব বলে কেন আমায় বোঝাতে পার! আরো দশটা মেয়েছেলে তো আছে এবাড়ি, কই আর কারো বেলা তো শালা এসব বলে না, কি বল, চুপ ক'রে আছ কেন, এ-প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পার তুমি, অ্যাঁ?'

স্ত্রীকণ্ঠ নীরব। কান্নার শব্দও আর শোনা যাচ্ছে না। এধারের বারান্দায় একলা অন্ধকারে ব'সে কে গুপ্ত তখনো অবিশ্রাম হপ্‌কিন্স আওড়াচ্ছেঃ Beauty...... মশার কামড় কার্তিকের হিম এঘর ওঘরের কটূক্তি কিছুই তাকে নিবৃত্ত করছে না। সুপ্রভা সব দেখছে শুনছে কিছু বলছে না। দারিদ্র্যের প্রথম অবস্থায় হিম ও শিশিরের ফোঁটাকে সে ভয় করত। কিন্তু যখন দেখলে সমুদ্রে তার শয্যা বিছানো হয়েছে তখন আর এসবে সে ভয় করে না। আগে স্বামীর যেটুকুন উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল তা বাড়ির বাইরে থেকে যেত, বাড়িতে এলে সেটা আর প্রকাশ পেত না। এখন ঘর বাইর সমান ক'রে ফেলেছে গুপ্ত। কেবল কি স্বামী, এতবড় মেয়ে বেবি ধারে দু'পয়সার নুন আনতে একটু চা খেতে রাতদিন হন্যে কুকুরের মত এখানে ওখানে ঘুরছে দেখে সুপ্রভা চুপ ক'রে আছে, চোখ বুজে আছে। হাল ভেঙে গেলে নৌকা স্রোতের টানে ভেসে যায় তলিয়ে যায় এ তো জানা কথা। সুপ্রভা প্রতিবাদ করবে কার বিরুদ্ধে, কিসের বিরুদ্ধে।

(ক্রমশঃ)

গ্রেজ ইনে মাইকেল

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

মধুসূদনের শিক্ষা আরম্ভ সাগরদাঁড়ীর চণ্ডী-মণ্ডপে, সমাপ্তি লণ্ডনের গ্রেজ্ ইনে। গ্রামে ও কলিকাতায় নানা শিক্ষায়তনে তিনি যে বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে বহু তথ্য কবির দুই জীবনীকার সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার ছাত্রজীবন সম্বন্ধে নানা কাহিনীও এই দুই জীবনীগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাগরদাঁড়ীর পাঠশালায় বাংলা ও গণিত শিক্ষা, তারপর সেখপাড়ার মৌলবীর নিকট ফারসী শিক্ষা, হিন্দু কলেজ ও বিশপস্ কলেজে ইংরাজী ও অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্যের অধ্যয়ন ইত্যাদি সকল বৃত্তান্ত নানা গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। কিন্তু গ্রেজ্ ইনে মাইকেলের আইন অধ্যয়ন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি অল্প। লণ্ডন ও ভার্সাই হইতে লিখিত মাইকেলের পত্রসমূহই এই বিষয়ে আমাদের একমাত্র সম্বল। কিন্তু এইসকল পত্রে আইন-অধ্যয়নের উল্লেখ একরূপ নাই বলিলেই চলে। অবশ্য বিদেশ হইতে লিখিত মাইকেলের সব পত্র রক্ষিত হয় নাই। এবং এই সময়ের যে পঁয়ত্রিশখানি চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আইন-চর্চা সম্বন্ধে নীরব। তাহার প্রধান বিষয় অর্থ, কারণ এই বস্তুটির অভাবেই তখন কবি ও তাঁহার পরিবার বিদেশে বিপন্ন। পঁয়ত্রিশখানি চিঠির মধ্যে একত্রিশখানিই বিদ্যাসাগরের নিকট লিখিত এবং প্রত্যেকখানিই মূলত সাহায্য-প্রার্থনা। অন্য প্রসঙ্গও অবশ্য আছে, যেমন ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা ইত্যাদি। কিন্তু লণ্ডনে তাঁহার ছাত্র-জীবন সম্বন্ধে কোন উল্লেখই নাই।

ইহার কারণ অবশ্য সুস্পষ্ট। মাইকেল যখন গ্রেজ্ ইনের ছাত্র তখন বাংলা দেশে তিনি শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকৃত। ভাষাবিদ পণ্ডিত হিসাবেও তখন তিনি যশস্বী। এবং আইনের জ্ঞানও সে সময়ে তাঁর অল্প নয়। পুলিশকোর্টের কেরানী

লণ্ডনে মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ও ইণ্টারপ্রিটারের কার্যে তাঁহার দক্ষতা পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট রে ও ফেগান সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। শুধু তাহাই নয়, পুলিশকোর্টে কার্যকালে তিনি আইন-পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন পর্যন্ত আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৫৯-এর ৯ই জানুয়ারী তারিখের এক পত্রে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিতেছেনঃ "I am dreadfully busy, reading up for the Law Examination that is coming." কবিপ্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও আইনজ্ঞতায় যাঁহার এই প্রতিষ্ঠা তিনি যে বিদেশে প্রৌঢ় বয়সে তাঁহার ছাত্রত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদাসীন হইবেন তাহা স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া, মাইকেলের বিদেশ যাত্রার মূলে উদ্দেশ্য যদিও ব্যারিস্টার হওয়া, বিলাত-দর্শনের আকাঙ্ক্ষাও যে তাঁহাকে বহুলাংশে এই ব্যাপারে উৎসাহিত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আরও এক কথা এই যে, মাইকেল সাধারণত তাঁহার পত্রে তাঁহার পেশা সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন না। এবং যাঁহার পেশা সম্বন্ধে কথা বলিতে অনিচ্ছা তাঁহার পেশাদারী শিক্ষা সম্বন্ধেও যে কথা বলিতে অনিচ্ছা হইবে তাহা একান্ত স্বাভাবিক। মাদ্রাজ হইতে লিখিত তাঁহার পত্রসমূহের মধ্যে এগারখানি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে তাঁহার অধ্যাপনা ও পত্রিকা সম্পাদনের উল্লেখ নামমাত্র। চিঠিগুলির প্রধান বিষয় তাঁহার সাহিত্য-চর্চা। ইউরোপের পত্রে ব্যারিস্টারী পরীক্ষা ও আইন-ব্যবসার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা প্রসঙ্গত মাত্র। তাহার প্রধান কথা অবশ্য টাকা পয়সার কথা। কিন্তু যেখানেই অন্য কথা সেখানে সাহিত্য-চর্চার কথা, বিদেশী ভাষা শিক্ষা, চতুর্দশপদী কবিতা রচনা ইত্যাদি প্রসঙ্গ। যে সমস্ত পত্র বিনষ্ট হইয়াছে অথবা এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই তাহাতেও যে আইন-চর্চা সম্বন্ধে কোন বিস্তারিত উল্লেখ ছিল এমন মনে হয় না।

বিলাতে মাইকেলের আইন-অধ্যয়ন সম্বন্ধে কিছু তথ্য-সংগ্রহের ইচ্ছায় গ্রেজ্ ইনের কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র দিয়াছিলাম। তথাকার বর্তমান লাইব্রেরীয়ান হোল্ডন্ সাহেব অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং নানা পুঁথিপত্র পরীক্ষা করিয়া সামান্য কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। মাইকেলের কবি-কর্ম ছাড়া তাঁহার জীবনের অন্যান্য ঘটনা সম্বন্ধে সাধারণ বাঙালী পাঠকের কিছু অনুসন্ধিৎসা থাকিতে পারে মনে করিয়াই সেই কয়েকটি কথা এখানে প্রকাশ করিলাম।

হোল্ডন্ সাহেব তাঁহার পত্রে (১২ই জানুয়ারী) কবির গ্রেজ্ ইনের প্রবেশের তারিখটি জানাইয়াছেন—১৯শে আগস্ট, ১৮৬২। এই তারিখটি কবির কোন

জীবনীকার উল্লেখ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি জানাইয়াছেন যে, ফস্টারের এড্‌মিশন রেজিস্টারে এবং অফিসিয়াল ল লিস্টে মাইকেলের নাম দত্ত বলিয়া লেখা আছে—ডাট্ বলিয়া নয়। (However in Foster's Admission Register he is shown as Michael Madhusudan Datta and it was under the name of Dutta that he was called to the bar on the 17th November 1866. His name also appears in the official Law list of the period under Datta and not as Dutt). ভার্সাই হইতে মাইকেল ইতালী-রাজকে যে পত্র দেন তাহাতেও তিনি তাঁহার নাম দত্ত লিখিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে বিদেশে মাইকেল পুরা বাঙালি। দত্ত শব্দটিকে বিকৃত করিয়া ইংরাজীতে ডাট্ লেখার মধ্যে যে এক বিদেশীপনা তাহা তিনি বিদেশে এড়াইয়া চলিয়াছেন। সেখানে তিনি দত্তপরিবারের একজন দত্ত বলিয়া পরিচিত হইতে তৎপর। দেশে ফিরিয়াও সরকারী কাগজপত্রে তিনি দত্ত (Datta) লিখিতেন, যেমন কলিকাতা হাইকোর্টের চীফ্ জাস্টিসের নিকট পত্রে। হাইকোর্টের কাগজপত্রেও তিনি দত্ত (Datta) বলিয়া উল্লিখিত। ১৮৭০ খৃস্টাব্দের জুন মাসে মাইকেল হাইকোর্টের অনুবাদ বিভাগে চীফ্ এগ্‌জামিনার নিযুক্ত হইলে ইংলিশম্যান ও হিন্দু প্যেট্রিয়ট্ পত্রিকায় তাঁহার নাম দত্ত (Datta) বলিয়াই উল্লিখিত হয়। সমাধি-ক্ষেত্রের রেজিস্টারে তাঁহার নাম দত্ত (Datta) লেখা হয় কবি এইরূপ নির্দেশ দিয়াছিলেন অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ সেখানেও লেখা আছে Datta। এবং কবির মৃত্যুর পর তাঁহার অনেক বন্ধু ইংরাজীতে তাঁহার নাম লিখিতে হইলে দত্ত (Datta-ই) লিখিতেন। হাই-কোর্ট মাইকেলকে ব্যারিস্টাররূপে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে বিদ্যাসাগর প্রভৃতি তাঁহাকে সুপারিশপত্র দেন তাহাতেও তিনি দত্ত (Datta)। মৃত্যুর পর যিনি 'দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন' বলিয়া স্মরণীয় হইতে চাহিয়াছিলেন তিনি জীবিতাবস্থায়ও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিজের নামে দত্তই লিখিতেন।

'মধুস্মৃতি' গ্রন্থে নগেন্দ্রনাথ সোম লিখিয়াছেন "ম্যাজিস্ট্রেট রে সাহেব মধুসূদনকে Dutt-এর পরিবর্তে Mr. Datta বলিতেন। তাঁহার পরবর্তী ম্যাজিস্ট্রেট ফেগান সাহেবও তাঁহাকে ঐ নামে সম্বোধন করিতেন।" অবশ্য পুলিশ-কোর্টে কর্ম গ্রহণের সময় মাইকেল Datta বলিয়া নাম সহি করিয়াছেন কিনা তাহা জানিবার উপায় নাই। কারণ সেইসব কাগজপত্র বিনষ্ট হইয়াছে। হিন্দু কলেজে যে তাঁহার নাম সাহেবী কায়দায় Dutt লেখা হইয়াছিল তাহার অবশ্য লিখিত প্রমাণ আছে।

মাইকেলের সময় ব্যারিস্টার হইতে হইলে ১২ টার্ম অর্থাৎ তিন বৎসর ইনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিতে হইত। এই ১২ টার্মের প্রত্যেক টার্মে ৬টি ভোজে উপস্থিত থাকা চাই। অর্থাৎ ৭২টি ভোজে অন্নগ্রহণ না করিলে ব্যারিস্টার হইবার যোগ্যতা স্বীকৃত হইত না।

মাইকেল যখন ১৮৬২-র আগস্ট মাসে ভর্তি হইয়াছিলেন তখন যে তিনি মিকেলমাস্ টার্ম হইতে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং ১৮৬২ সালের মিকেলমাস্ টার্মে পড়া শুরু করিলে ১৮৬৫ সালের ট্রিনিটি টার্মে অর্থাৎ ১৭ই জুন তাঁহার ব্যারিস্টার হইবার কথা। কিন্তু অর্থাভাবের জন্য মাইকেল পড়া বন্ধ করিয়া সপরিবারে ভার্সাই শহরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন। ভার্সাই হইতে লিখিত মাইকেলের পত্র হইতে দেখা যায় যে, তিনি প্রথমে মাত্র ৫ টার্ম অর্থাৎ ১৮৬৩র মিকেলমাস্ টার্ম পর্যন্ত (২৫শে নবেম্বর) ইনের ছাত্র ছিলেন। তারপরের পাঁচ টার্ম তাঁহার নষ্ট হয়। এই সময় তিনি ভার্সাই শহরে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ, ভাষা শিক্ষা এবং সনেট-রচনায় ব্যস্ত। ইহার পর ১৮৬৫ সালের মিকেলমাস্ টার্মে তিনি আবার অধ্যয়ন শুরু করেন এবং ১৮৬৬ সালের মিকেলমাস্ টার্মে অর্থাৎ নবেম্বর মাসে তিনি ব্যারিস্টার হন।

১৮৬৪ সালের ১৭ই জুনের পত্রে মাইকেল বিদ্যাসাগরকে জানাইতেছেন: "The Benchers of Gray's Inn from whom I was compelled to draw 450 Rs. have suspended me"।

এই বিষয়ে হোল্ডন্ সাহেব লিখিয়াছেন: As he was called to the Bar there is no reason to believe that he was struck off the rolls at any time because of his financial difficulties. He was unduly long in gratifying for his call to the Bar but may have been campelled to lose two or three terms for financial reasons, but that would not entail his being struck off the rolls, it would however mean that this call would be delayed until he had kept the requisite number of terms"।

মাইকেলের পাঁচটি টার্ম নষ্ট হইয়া-ছিল জানাইলে হোল্ডন্ সাহেব এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করিয়া লিখিলেন: (২৫শে ফেব্রুয়ারী): "I have made a rather more thorough search of our arckives and have been able to discover a little extra information for you. Michael asked and received £ 20 from his deposit monies in the Michaelmas Term of 1863 and in the following Term asked for a further £ 25. The Committee recommended and the pension approved the loan but with the condition that it was understood that he would be allowed no further Terms until he had repaid both sums of money. I can find no entry as to when be paid the £ 45 back but he certainly must have done because he was called to the Bar.." এই ৪৫ পাউন্ড ধারের জন্য মাইকেল গ্রেজ্ ইন ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ এই ধারের সর্ত এই যে, ইহা শোধ না করা পর্যন্ত টার্ম পাওয়া যাইবে না। তবে কবির যে আরও অর্থের প্রয়োজন ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

কবি প্রায় সাড়ে চার বৎসর বিদেশে ছিলেন। ইহার মধ্যে তিনি কতকাল লন্ডনে ছিলেন এবং কত কাল ভার্সাই

শহরে কাটাইয়াছেন ইহা দেখিবার জন্য তাঁহার টার্মগুলির একটি হিসাব দেওয়া গেল। তাঁহার পত্র এবং হোল্ডন্ সাহেবের অনুসন্ধানের ফলের উপর নির্ভর করিয়াই এই হিসাব দেওয়া সম্ভব। ইহার দ্বারা সনেট্গুলির রচনাকাল সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হইবে; কারণ কবি ভার্সাই শহরেই সাহিত্য-সৃষ্টি ব্যাপারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

allowed two terms to enable him to be called to the Bar.

যে ইন্ ৪৫ পাউণ্ড অনাদায়ের জন্য মধুসূদনকে টার্ম রক্ষা করিতে দেন নাই তাহারা যে মাত্র অর্থাভাবের কারণে তাঁহাকে দুই টার্ম মাপ করিয়াছেন মনে হয় না। এখানে অনুমান করিতে হইবে তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় পাইয়াই ইনের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে এই বিশেষ

১৮৬২	মিকেলমাস্ (১১ই জানুয়ারী—৩১শে জানুয়ারী)	লণ্ডন
১৮৬৩	হিলেরি (১৫ই এপ্রিল—৩রা মে)	"
১৮৬৩	ইস্টার (২৭শে মে—১৭ই জুন)	"
১৮৬৩	ট্রিনিটি (২রা নভেম্বর—২৫শে নভেম্বর)	"
১৮৬৩	মিকেলমাস্	"
১৮৬৪	হিলেরি	ভার্সাই
১৮৬৪	ইস্টার	"
১৮৬৪	ট্রিনিটি	"
১৮৬৪	মিকেলমাস্	"
১৮৬৫	হিলেরি	"
১৮৬৫	ইস্টার	"
১৮৬৫	ট্রিনিটি	"
১৮৬৫	মিকেলমাস্	লণ্ডন
১৮৬৬	হিলেরি	"
১৮৬৬	ইস্টার	"
১৮৬৬	ট্রিনিটি	"
১৮৬৬	মিকেল্মাস্	"

এখানে দেখিতেছি কবি গ্রেজ্ ইনে ১২ টার্ম অধ্যয়ন করেন নাই। দশ টার্ম অধ্যয়ন করিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারী করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া মাইকেল চীফ জস্টিস্কে যে পত্র দেন তাহাতেও দেখি তিনি দশ টার্মই গ্রেজ ইনের ছাত্র ছিলেনঃ "The number of Terms, which I formally kept was ten"। এই সম্বন্ধে হোল্ডন্ সাহেব তাঁহার তৃতীয় পত্রে (৬।৫।৫৪) জানাইয়াছেনঃ "I have made a further search of our records and find that in the year 1866 the matter of giving special dispensation of terms to Indian students was considered by the four Inns of court. It therefore seems quite safe to assume, that Michael, if he still had two terms to complete was upon application, অধিকার দিয়াছিলেন।

মাইকেলের সময় পরীক্ষা না দিয়াও ব্যারিস্টার হওয়া যাইত। তিনি এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের নিকটে লিখিত এক পত্রে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে অনুমান করা যায় তিনি কোন পরীক্ষা দেন নাই। "There are examinations: but you are not bound to go up for them"। হোল্ডন্ সাহেব কাগজপত্র দেখিয়া জানাইয়াছেনঃ "I have had enquiries made through the council of Legal Education of Mr. Dutt's Tutorial Record etc. but as the taking of examinations was not compulsory until about 1872 and members were called without an examination, and as there is no entry whatever in the Council's Records of Mr. Dutt having taken any part in an examination, it can only be asumed that he did not sit.

হোল্ডন্ সাহেব লিখিয়াছেন "his name was never struck off the rolls"; কবি বলিতেছেন ইন আমাকে suspend করিয়াছে। এই দুই উক্তির মধ্যে অসঙ্গতি থাকিলেও দুইটিই সত্য। ধার শোধ না দিতে পারিয়া মাইকেল ইন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এই কথা যেমন সত্য, রোল হইতে তাঁহার নাম কাটিয়া দেওয়া হয় নাই তাহাও তেমন সত্য। এবং ইহা কবি নিজেই দুই স্থানে স্বীকার করিয়াছেন। ১৮৬৬ সালের ১০ই মের পত্রে তিনি বিদ্যাসাগরকে লিখিতেছেনঃ "The steward of our Inn tells me that as my name was on the list I shall have to pay for the Terms I have not kept, just as if I had done so. চীফ জস্টিসের নিকট প্রেরিত আবেদন-পত্রেও তিনি লিখিতেছেন—My name stood on the roll for seventeen Terms.

হোল্ডন্ সাহেব মাইকেলের লণ্ডনের ঠিকানা সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ "The only address in our records is Callcutta and we have no means of finding where he lived during his stay in London"। লণ্ডন হইতে লিখিত মাইকেলের পত্রে দেখা যায় ১৮৬৬ সালে তাঁহার বাসস্থান ছিল ১৬ নম্বর উড্ লেন, সেফার্ডস্ বুস্, লণ্ডন, ডবলিউ। তবে তিনি লণ্ডনে একমাত্র এই বাড়িতেই বাস করিয়াছেন কিনা জানিবার উপায় নাই। মনে হয়, যেখানে বাড়ির ঠিকানা উল্লেখ করিবার কথা সেখানে কবি ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার কলিকাতার ঠিকানা দিয়াছেন। দেশে ফিরিয়া তিনি "বামুন-পাড়ায়" অর্থাৎ সাহেব পাড়ায় বাস করিবার জন্য ব্যস্ত—বিদেশে তিনি নিজের নাম লেখেন Datta, ঠিকানা লেখেন—কলিকাতা। ইহাই মাইকেলের স্বভাব। এই স্বভাব বসেই "সাহেব" মাইকেল তাঁহার শেষ পরিচয় লিখিয়া যান—"দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন"।

চিত্রপ্রিয়

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে একটি প্রাচীরপত্র (Poster) প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভারত সরকারের যানবাহন, স্বাস্থ্য, জলসেচ ও সংবাদ ও বেতার মন্ত্রীসদনের উদ্যোগে এই প্রদর্শনী পরিচালিত হয় ও বিশিষ্ট জনসাধারণের সম্মুখে নিখিল ভারত শিল্প ও চারুকলা সমিতি হলে রেল ও যানবাহন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ইহার উদ্বোধন করেন।

বিভিন্ন বিভাগের প্রয়োজন ও নির্দেশ অনুযায়ী ভারতের নানা প্রদেশ হইতে আগত সর্বসমেত ১১৫টি চিত্র এই প্রদর্শনীতে পেশ করা হয়। প্রদর্শনীটি ছিল প্রতিযোগিতামূলক এবং সেইজন্য কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি। প্রথমত কয়েকটি বিভাগের চিত্রের নমুনা দেখিলেই বুঝা যায় যে, সাধারণের সমক্ষে পেশ করিবার পূর্বে এগুলি প্রদর্শনীতে আদৌ স্থান পাইবার উপযুক্ত কিনা সে বিষয়ে কেহই চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। ফলে, কয়েকটি বিভাগে, বিশেষ করিয়া জলসেচ ও স্বাস্থ্য বিভাগে এমন কয়েকটি চিত্র দেখা গিয়াছিল যেগুলি প্রাচীরপত্র হিসাবে কোনো প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনীতে স্থান পাইবার উপযুক্ত নহে। দ্বিতীয়ত কয়েকজন ব্যতীত শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই প্রাচীরপত্র ও সাধারণ চিত্রের মধ্যে সূক্ষ্ম ও স্বাভাবিক পার্থক্যটুকু বুঝিতে পারেন নাই। সকলেই প্রাচীরপত্র শিল্প অনুযায়ী বর্ণই ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র, তাহাতে তীব্রতা আছে এমন কি বাহুল্যও আছে। কিন্তু এহেন চিত্রের মৌলিক ও সর্বপ্রধান প্রয়োজনটুকুর ধার দিয়াও কেহ যাইতে পারেন নাই। সেইজন্য একমাত্র যানবাহন বিভাগ ব্যতীত অন্যান্য সব বিভাগের অধিকাংশ চিত্রের মধ্যেই দীর্ঘাকার কভার ডিজাইন হইতে শুরু করিয়া সাধারণ মাসিক পত্রিকার বিজ্ঞাপনের বর্ধিত সংস্করণের নমুনা পর্যন্তও দেখা গিয়াছে।

ললিতকলা ও প্রাচীরপত্র চিত্রের মধ্যে অনেক প্রভেদ। নিজস্ব অবসর ও সুযোগ অনুযায়ী আপনি যে কোনো ললিতচিত্রের রস উপভোগ করিতে পারেন। চিত্রের রস আস্বাদন ও আহরণ করিবার অন্তর্নিহিত দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাই এক্ষেত্রে আপনার একমাত্র চাহিদা। কিন্তু প্রাচীরপত্র চিত্রের বিষয়ে একথা খাটে না। ইচ্ছা না থাকিলেও শহরের পথের দুইধারে আপনাকে বাধ্য হইয়া এহেন চিত্র দেখিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, অনিচ্ছাসহকারে মাত্র মুহূর্তের জন্য দেখিয়াও যদি আপনার অন্তর ইহার প্রচারবাণীতে সাড়া দেয় তবেই বুঝা যাইবে সেই প্রাচীরপত্রের সার্থকতা। সুতরাং প্রচারবাণীর (Slogan) সরল অথচ সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ও দূরদৃষ্টি (Vision) হইল প্রাচীরপত্র শিল্পের প্রধান ভিত্তি। কল্পনা ও বাস্তবের সমন্বয় সহযোগে যে শিল্পী মাত্র সামান্য কয়েকটি তীব্র বর্ণ ব্যবহার করিয়া সহজ-

যানবাহন বিভাগে প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাচীরপত্র শিল্পী—বিমল দাশগুপ্ত

বোধ্য প্রতীকের মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তুটি বিন্যাস করিতে পারিবেন তিনিই এই শিল্পক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করিতে পারিবেন। আকাশের বুকে ঘনায়মান মেঘদলের মধ্য হইতে মাত্র ক্ষণিকের জন্য বিদ্যুৎরেখা প্রকাশিত হইয়া আপনার জ্যোতি ও প্রভাব বিস্তার করে। জগতের গতিশীল জীবনের পথে সেইরূপ সহস্র সহস্র দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে যদি কোনো স্থানে কোনো প্রাচীরপত্র মাত্র চকিতের জন্যও সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তবেই বুঝিব সেই চিত্রের সার্থকতা। যে চিত্র এইভাবে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে না পারে তাহা প্রাচীরপত্র নহে তাহা সস্তা ও সাধারণ বিজ্ঞাপনের বর্ধিত সংস্করণ মাত্র।

প্রদর্শনীটির মধ্যে যানবাহন বিভাগের চিত্রগুলি সর্বপ্রথমেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বস্তুতঃপক্ষে এই বিভাগে অধিকসংখ্যক চিত্র আসিয়াছে এবং তাহাদের মধ্য দিয়া বিভিন্ন শিল্পী সত্যই আপন আপন রুচি, কল্পনা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। সরলতা ও স্বাভাবিকতার দিক দিয়া বিমল দাশগুপ্তের চিত্রখানি প্রথমেই চোখে পড়ে। দূরে পৃষ্ঠভূমিতে কাশ্মীরের দীর্ঘ তুষারমণ্ডিত পর্বতশিখরগুলি নীল আকাশের সহিত মিশিয়া গিয়াছে—তাহারই নিম্নে স্নিগ্ধশ্যামল, সমান্তরাল, সুদীর্ঘ বনানী শ্রেণী প্রহরীর মত স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে এবং পাদভূমিতে স্তবকে স্তবকে সজ্জিত রক্তবর্ণবহুল চেরীপুষ্পরাজির মধ্য দিয়া কাকচক্ষুস্বচ্ছ সরোবরসলিলের উপরে ভাসমান একটি সুসজ্জিত শিকারার কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। চিত্রখানির মধ্যে কোনোস্থানে এতটুকু বাহুল্য নাই অথচ দেখিবামাত্রই যেন মনে হয় কবিকল্পলোকের একান্ত কাম্য কাশ্মীরভূমি হৃদয়ের সমগ্র ঐশ্বর্যসম্ভার লইয়া আপনাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে। ইহার পরেই এ এস মেনন রচিত চিত্রখানি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিল্পী একটি সহজ ও পরিচিত প্রতীকের মধ্য দিয়া ভারতের শক্তি ও অরণ্যসম্ভার বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। গভীর অরণ্যের মধ্যে একটি হস্তী ও হস্তিশিশু

যানবাহন বিভাগে প্রদর্শিত আরেকটি প্রাচীরপত্র

শিল্পী—এ এস মেনন

আপনার মনে বিচরণ করিতেছে ইহাই চিত্রের বিষয়বস্তু। মাত্র অল্প কয়েকটি বর্ণে এই চিত্রখানি রচনা করিয়া শিল্পী অতিশয় মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়াছেন—বিশেষ করিয়া তাঁহার অংকণপারিপাট্য ও অতি সংক্ষেপে অথচ সুকৌশলে প্রচারবাণী প্রকাশ করিবার ক্ষমতা দেখিয়া সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে আর এস ভাটনগর ও জে জি ব্যাঙেলের নাম করা যাইতে পারে। জলসেচ বিভাগে অধিক চিত্র দেখা যায় নাই। যে কয়টি দেখা গিয়াছে তাহার মধ্যে চিত্ত পাকড়াশী রচিত চিত্রখানিই চোখে পড়ে। বর্ষকালে ভারতের বিভিন্ন নদীর দুকুলপ্লাবিত জলোচ্ছ্বাসকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া নানাবিধ পরিকল্পনার মধ্য দিয়া কিরূপে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে শিল্পী সেই বিষয়ে একটি সমগ্র রূপ রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বিভাগে এ এস মেননের চিত্রখানি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান সুতরাং কৃষির সর্ববিধ উন্নতির উপরেই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। আধুনিক যুগে কলকোলাহলমুখরিত শহরের সুখ সুবিধা এবং মিথ্যা ও ক্ষণস্থায়ী আনন্দপ্রলোভনের মোহে না ভুলিয়া গ্রামের অতি পরিচিত কৃষকদল নগ্নগাত্রে আপনার মনে দেশীয় প্রথায় লাঙ্গল চালাইতেছে—শিল্পী এই সর্বজনপরিচিত গ্রাম্য দৃশ্যটুকুই অতিশয় কৌশলের সহিত ফুটাইয়া তুলিয়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি বিশিষ্ট অধ্যায়ের উপর দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। চিত্রখানি দেখিবামাত্রই ইহার সরল ও সহজবোধ্য প্রচারবাণী সকলেরই চোখে পড়ে। ইহার পরেই জ্যোতিষ ভট্টাচার্য রচিত চিত্রখানি উল্লেখযোগ্য। এ শিল্পীও কৃষিকার্যকেই বিষয়বস্তু হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু বলিষ্ঠ কল্পনা ও নূতন দৃষ্টিভংগীর জন্য চিত্রখানি একটি বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছে। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে এম পুরুষোত্তম রাও-এর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

স্বাস্থ্য বিভাগে আগত চিত্রগুলির মধ্যে বিষয়বস্তুর নূতনত্ব না থাকিলেও কয়েকটি রচনার মধ্য দিয়া প্রাচীরপত্র চিত্রের অন্তর্নিহিত আবেদনটুকু বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ শংকর নন্দীর চিত্রখানির নাম করা যায়। একটি সবল বেগবান অশ্বের দুর্নিবার গতি ও অফুরন্ত চঞ্চলতাকে শিল্পী টি বি রোগের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন ও সেই সংগে সুনিপুণ অংকনরীতি ও প্রচারবাণীর দ্বারা বিষয়বস্তুটিকে সাবলীল ও সহজবোধ্য করিয়াছেন।

মোটের উপর প্রাচীরপত্র প্রদর্শনীটি নূতনত্বের দিক দিয়া খুবই উপভোগ্য হইয়াছে এবং বিশেষভাবে বিচার করিলে যানবাহন বিভাগের চিত্রগুলির সত্যই প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। দেশের সর্বাংগীন উন্নতির উপায় হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চবার্ষিক যোজনার বিভিন্ন অধ্যায়গুলিকে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত করিবার জন্য সরকার যে দেশের শিল্পীদের সাহায্য লইয়াছেন সেজন্য শিল্পী ও তথা দেশবাসী সরকারের নিকট কৃতজ্ঞ। আশা করা যায় যে, প্রতিযোগিতামূলক এহেন প্রদর্শনী প্রতিবৎসরই অনুষ্ঠিত হইবে ও দেশের শিল্পীগণও সব দিক দিয়া ইহাকে উন্নততর করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইবেন।

আমার এই ছোট ঘরে, ছোট জায়গাটিতে বড় মন না হোক্ ভুলো মন নিয়ে এই আমি বেশ আছি। ভেবে দেখলুম ছোট মন নিয়ে কলকাতায় বাস করা যায়, কিন্তু ভুলো মন নিয়ে প্রাণ বাঁচানো দায়। কলকাতার মতো বড় জায়গায় থাকতে হ'লে নজর অমনিতেই একটু ছোট করতে হয়। দূরদৃষ্টির প্রয়োজন নেই, কেবল সামনে পেছনে তাক্ রেখে চললেই হ'ল—নইলে কে কোত্থেকে ধাক্কা দেবে কিম্বা চাপা দেবে কে জানে। শুধু ছোট নজর নয় নিচু নজরও চাই নতুবা কলার খোসায় পা পিছলে গিয়ে একটা বিদ্ঘুটে কাণ্ড ঘটে যেতে পারে। ঘর থেকে বেরোলেই যেখানে প্রাণ বাঁচানো, মান বাঁচানো, পকেট বাঁচানো এক দায় হয়ে ওঠে সেখানে বাস করায় আর যাই থাক্ সোয়াস্তি থাকে না। সেদিক থেকে এখানে বেশ আছি, ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করেও দিব্বি নিশ্চিন্তে রাস্তায় চলা যায়। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। আমার বন্ধুরা মনে করেন ছোট জায়গায় থেকে থেকে বড়র প্রতি আমার বিভীষিকা জন্মেছে। সেটা মূলত ঠিক নয়; কারণ আমাদের এই স্থানটি আয়তনে ছোট হলেও আয়োজনে বড়। সেদিক থেকে আমার আবাসস্থলটি কলকাতার চাইতে বড় না হোক্ ছোট কিছুতেই নয়। কিন্তু সে কথা এখানে অবান্তর।

কলকাতার একটা মস্ত দোষ ও লোকের কাছে বড্ড বেশি অ্যাটেন্শন্ দাবি করে। আমার মতো ভুলো মানুষ অতখানি দিতে পারে না। আমার কথা হল, আমি থাকি আমার মতো, তুমি তোমার মতো। সারাক্ষণ তোমাকে বাপু তোয়াজ করে চলতে পারব না। আর তোয়াজ করলেও সহজে ওর মন পাওয়া যায় না, ধাক্কাটা গুঁতোটা খেতেই হয়। এইজন্যে কলকাতার সঙ্গে তেমন বনিবনা কোন কালেই আমার হয়নি। স্বভাবের দিক থেকেও আমাদের দুই-এর অমিল ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। কলেজে যখন পড়তুম তখন একরকম ছিল। তখন আমিও অর্বাচীন, সেও অর্বাচীন। স্বভাবের শৈথিল্য আমার যতখানি ছিল তারও ততখানি। সেটা তখন চোখেও পড়ত না, গায়েও লাগত না। এখন বয়সে আমি প্রবীণ; বয়সোচিত গাম্ভীর্য সকলের কাছেই লোকে প্রত্যাশা করে। কলকাতার বেলায় দেখলুম বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় একটু ভার ভাত্তিক হবে, না বয়স যত বাড়ছে ওর ছ্যাবলামি সেই পরিমাণে বাড়ছে। আগের চাইতে এখন ঢের বেশি চেঁচায়, ঢের বেশি হুড়মুড় করে চলে, হাসি হুল্লোড় ফুর্তি দিন দিনই বাড়ছে।

আমাদের সময়ে কলকাতা অনেক কৃশাঙ্গিনী ছিল। বয়সের সঙ্গে দেহে একটু মেদবৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক। ইদানীং কলকাতা রীতিমতো স্থূলকায়া হয়ে উঠেছে। এর ফলে কোথায় ও স্থবিরতা লাভ করবে, না কায়াবৃদ্ধির সঙ্গে মনে হচ্ছে কায়কল্প করে বয়েস দিব্বি কমিয়ে নিয়েছে। আমাদের কায়া বৃদ্ধি হ'লে আমরা কায়ক্লেশে চলি। আর কলকাতা তার বিশাল বপু নিয়ে যেমন উদ্দাম গতিতে চলছে তাতে ওকে ঠিক গজগামিনী বলা চলে না। ওর প্রগল্ভ আচরণ দেখে লজ্জাই পেতে হয়। একদিন আমরাই ছিলাম ওর সমঝদার। এখন আমাদের চিনতেই পারে না, এখন ওর অনেক খদ্দের।

শুধু দেহের স্থূলতা নয়, মনেও স্থূলতা এসেছে। আচার ব্যবহারে আগের সেই মার্জিত রুচি নেই। নিজের কথা এক কাহন—সুরুচির পরিচায়ক নয়। কলকাতার তাপমাত্রা ১০৯ ডিগ্রিতে উঠেছে তো সব খবরের কাগজ মিলে এমন চেঁচাতে শুরু করল যেন এমন কাণ্ড ভূভারতে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। এদিকে আমরা যে নিত্য ১১২ ডিগ্রিতে সিদ্ধ হচ্ছিলাম সে খবর কে রাখে। কলকাতা নিজেকে নিয়ে এমন ব্যস্ত যে, অপরের কথা ভাববার তার সময়ই হয় না। কলকাতায় বৃষ্টি হয়েছে—প্রচারের বহর দেখলে মনে হবে—বৃষ্টি নয়তো, পুষ্পবৃষ্টি। কালিদাস কোথায় লাগে, স্টাফ্ রিপোর্টারের বৃত্তান্ত প'ড়ে লোকে বলবে এতদিনে যথার্থ মেঘদূত রচনা হলো। সব তাতেই বাড়াবাড়ি। হাওড়া ব্রীজের মাস্তুলের উপরে কোথাকার কে উঠে বসেছে তো হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। ডাক্ সেপাই সান্ত্রী ফায়ার ব্রিগেড্ খবরের কাগজের রিপোর্টার। সাব্যস্ত হ'ল লোকটা নাকি পাগল। সেটা যে কোন ন্যায়শাস্ত্রমতে সে আমি বুঝিনে। হাওড়া ব্রীজের উপরে যে ওঠে সে বদ্ধ পাগল আর এভারেস্টের উপরে যে ওঠে সে জগজ্জয়ী বীর!

স্নায়ু উত্তেজনার ব্যাধি কলকাতায় বরাবরই আছে। তবে আগে এমন কারণে অকারণে ক্ষেপে উঠতে দেখিনি। সব ব্যাপারে খানিকটা সঙ্গতিবোধ ছিল। এমন যে ইংরেজ সরকার তার সঙ্গেও কলকাতা লড়াই করেছে। তখন বীরের যোগ্য লড়াই হতো। এখন বীরত্ব এমন অসম্ভব পরিমাণে বেড়েছে যে, কারণে অকারণে ফেলা ছড়া যাচ্ছে। পরীক্ষার প্রশ্ন শক্ত হ'লেও লঙ্কাকাণ্ড ঘটে। আগে গুলি-গোলা চলত এখন গালিগালাজটাই বেশি চলে। নিজের নাক কেটে সত্যি সত্যি যদি পরের যাত্রা ভঙ্গ করা যায় তাতেও না হয় কিঞ্চিৎ সার্থকতা থাকতে পারে; কিন্তু নিজের বাস্ পুড়িয়ে নিজের যাত্রা-ভঙ্গ করা যে কোন্ বুদ্ধির কাজ সেটা বোঝা বড় শক্ত। আজকাল যাকে আমরা জনসংগ্রাম বলি সেটা কেন জানিনে বারোয়ারী ফুর্তির আকার ধারণ করেছে। সংগ্রাম, আনন্দ এবং হল্লা এই তিনের রূপ কখনোই এক হতে পারে না। ইদানীং এই তিনে মিলে এমন একাকার

হয়েছে যে, কোন্‌টা যে কি বুঝে ওঠা দায়। জীবনে সত্যিকার আনন্দের যখন অভাব হয় তখন রুচি এমনি বিকৃত হয় যে, অত্যন্ত মর্মান্তিক ব্যাপারকে—খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাবকেও—লোকে ফুর্তির ব্যাপার ক'রে তোলে।

আরেকটি ব্যাপার বলে আজকের মতো বক্তব্য শেষ করি। কলকাতার একটা ভাষা ছিল। এখন পথে ঘাটে ট্রামে বাসে যে ভাষা শুনি সেটা তো কলকাতার ভাষা নয়। মার্জিত এবং শ্রুতিমধুর ব'লে কলকাতার চলতি ভাষাকেই আমরা সাহিত্যের ভাষা ব'লে গ্রহণ করেছিলাম। সাধু ভাষা এবং চলতি ভাষার বিরোধ বহু-দিন ধরে চলছে এবং শেষপর্যন্ত সাধু ভাষারই পরাজয় ঘটেছে। এই সম্পর্কে সাহিত্যিক বন্ধুদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে। আমি যে ভাষায় এই প্রবন্ধ লিখছি সেটা চলতি ভাষা না সাধু ভাষা? কলকাতার ভাষা ব'লে যে ভাষা এতদিন পরিচিত ছিল সেটি এখন আর চলতি ভাষা নয়, অচল ভাষা। অর্থাৎ কলকাতার ভাষা এখন সাধুভাষায় পরিণত হয়েছে। আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে—চলতি ভাষার যাঁরা পক্ষপাতী তাঁরা কি এখন অধুনা বিলুপ্ত কলকাতার ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করবেন?

রস-রচনা

শ্রীদিলীপকুমার সান্যাল

রসিকতা নাতি-নাতনীর আসরেই জমে ভাল। ক্বচিৎ শ্যালিকা-সংসদে। নচেৎ যাঁহারা রসিকতা করিয়া আড্ডা, মাইফেলে, ট্রামে-বাসে, সিনেমা থিয়েটারে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন সামনা-সামনি তাঁহাদের কথায় কখনও বা একটু হাসিলেও আড়ালে আবডালে আমরা বড় একটা তাঁহাদের রুচির প্রশংসা করি না। চাঁড়ামি বা প্রগল্‌ভতার চমক অবশ্যই আছে; কিন্তু সে চমক আকস্মিকতার। অভ্যাসেই সে চমকের সমাধি। 'রস-রচনা' কথাটি চালু হইতে দেখিয়া তাই পরলোক-গত কুশলী শিল্পী পরিমল রায়ের কথা মনে পড়িল। তাঁহার লেখ-শৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যঙ্গ। পরিচ্ছন্ন বিদ্রূপের রসে তিনি জীবনের লঘু অসঙ্গতিকে অভিসিঞ্চিত করিতে পারিতেন। তাহাতে হাসির খোরাক অবশ্যই ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার লেখাকে রসিকতার পর্যায়ে ফেলা যায় না। "রস-রচনা" লেখার বায়না পাইলে তাই পরিমলবাবুর পরিহাসদীপ্ত মুখে তির্যক হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিত। সত্যই ত, "রস-রচনা" আবার কি বস্তু?

সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন বন্ধু-সমাগমেও যাঁহারা খুব তামাসাবাজ বা রগুড়ে বলিয়া খ্যাত তাঁহারাও শুধু ছেঁদো কথা বা বাসি রসিকতা বা বাগ্‌ভঙ্গী পুঁজি লইয়া বেশী দিন কারবার চালাইতে পারেন না। গল্পের কথাই ধরুন। যাহাকে মজার গল্প বলেন তাহার আসল আকর্ষণ গল্পকে সজীব করিবার নাটকীয় ভঙ্গীতে। পেশাদার রসিক মজার গল্প মক্স করিয়াও সে আনন্দ দিতে পারেন না, সত্য রসিকের রূপানুভূতির রসে সিঞ্চিত হইলে অতি সাধারণ আখ্যানও যে আনন্দ দিতে পারে। আর রসিকতার প্রতিষ্ঠা যেখানে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ বৃহত্তর ক্ষেত্রে সে প্রতিষ্ঠার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়া স্বাভাবিক। একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে কলিকাতায় একদিন বাসে চড়িয়াছি। আফিসের টাইম। ভয়ানক ভীড়। দোতালা বাসের সিঁড়ির হাতল ধরিয়া লোক গিজ-গিজ করিতেছে। পাদানীর ঠিক উপরে একটি নব্য-বঙ্গ। চারিপাশে তাহার ইয়ার বক্স। যতক্ষণ বাসে বসিয়াছিলাম অবিশ্রান্ত হাসির গররায় কান ঝালাপালা। উৎসুক হইয়া এই রসিকতা-গোমুখীর উৎস-সন্ধানে ক্ষণকাল ব্যাপৃত হইয়া দেখিলাম বাবাজী নবদ্বীপ হালদারের অনুকরণে গলা দিয়া অদ্ভুত স্বরবিন্যাস করিতেছেন। মুগ্ধ ভক্তমণ্ডলী হাসির তোড়ে ভাসিয়া যাইতেছেন। ইহাকেও ত আমরা রসিকতা বলি।

অবশ্য নবদ্বীপ হালদারের স্বর-ভঙ্গের অনুকৃতি রস-রচনার অবলম্বন এমন কথা কেহই ভাবিতে পারে না। কিন্তু রসহীন রচনার ত্রুটি কি রসিকতার অভাব? রসিকতা দিয়া হাসাইবার ব্যর্থ চেষ্টা রসনার গণ্ডী পার হইয়া লেখনীকেও আশ্রয় করে না কি? জগন্নাথ কবিরাজের রসবিচার কতখানি কোমলাঙ্গী যবনী দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল বলিতে পারি না কিন্তু সেই রসগঙ্গাধরের দেশে বাস করিয়া আমরা 'রস-রচনার' মত উদ্ভট কথা কল্পনা করিলাম কি করিয়া? রসই ত চরম কথা; বিরস কাব্যই ব্যর্থ কাব্য। রচনা সার্থক হইতে হইলে তাহাকে রসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইবে। সুতরাং রস-রচনা একেবারেই সোনার পাথর-বাটী। আর রস-রচনা বলিতে যদি আমরা অভিনব কোনও সাহিত্য রূপ বুঝি যাহাকে ইংরেজীতে 'এসে' বলা হয়, তাহা হইলেই বা 'প্রবন্ধ' কি অপরাধ করিল? যদি বলেন প্রবন্ধ মাত্রই রস-রচনা নয় আমি শিক্ষক জীবনের অভিজ্ঞতা অবলম্বন করিয়া বলিব জীবনে বহু সহস্র 'এসে' আমাকে পাঠ করিতে হইয়াছে রসের বিচার যেখানে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। এই নিতান্ত প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্য বীরবম, বেলক, লিন্ড, চেস্টারটনকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে কি? আমাদের দেশেও রূপসমৃদ্ধ প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে। ভবিষ্যতেও হইবে। প্রবন্ধকার যদি শিল্পীর দৃষ্টি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া

থাকেন তাঁহার রচনায় রসের অভাব ঘটিবে না।

যদি না করিয়া থাকেন তাঁহার প্রয়াসে রসাভাব পরিলক্ষিত হইবে। আয়ারল্যাণ্ডের মরমী কবি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "We have really nothing to write about except ourselves." একথা নূতন নয়; প্রমাণও বুদ্ধিগ্রাহ্য। কিন্তু আসল প্যাঁচ ঐ ব্যক্তিত্বে। ব্যক্তিত্ব ছাড়া আর কীই বা সম্পদ আছে শিল্পীর। দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকের মত নূতন কিছুই ত তাঁহার দেয় নাই। যাহার থাকে সে সমগ্র জীবনের উপলব্ধির রহস্য দার্শনিক বা গাণিতিক সূত্রে গ্রথিত করিয়া যায়। তারপর 'অথ' বা 'অতঃ' লইয়া তুমুল কলহের সৃষ্টি হয়। শিল্পীর যাহা অবলম্বন তাহার না আছে রূপ, না আছে সংজ্ঞা; যাহা বাহন তাহাও নিতান্ত জীর্ণ, সহস্রের স্থূল হস্তাবলেপে মলিন, শিথিল। বলার নূতন কথা নাই, বলিবার নূতন ঢং নাই; অথচ কি আগ্রহে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াই শিল্পীর তৃপ্তি। কথা একই বটে। কিন্তু স্বর যে অনন্ত। কাহারও কণ্ঠস্বর অন্য কাহারও কণ্ঠস্বরের অবিকল প্রতিরূপ নয়। শিল্পীর সার্থকতা তাই এই কণ্ঠস্বরকে রূপায়িত করায়। যাঁহারা সিদ্ধকাম তাঁহাদের রচনা পড়িতে আরম্ভ করিলেই কণ্ঠস্বর কানের কাছে দানা বাঁধিয়া উঠে। বলি, হাঁ এই কালিদাস, এই সেক্সপীয়র, এই পাসকাল। কিন্তু সাহিত্যে ব্যক্তিত্ব বলিতে যাহা বুঝি তাহার সহিত জৈব ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধ পরোক্ষ।

কথাটা আর একটু বিশদ করিয়াই বলি। শিল্পীর যে ব্যক্তিত্ব তাহাও শিল্পসৃষ্টিরই অঙ্গ। এমন কথা বলিতেছি না যে, নিতান্ত জঘন্য বা হীন প্রকৃতির ব্যক্তি মিথ্যার কুহকে আমাদের মুগ্ধ করিতে পারেন। তথাপি ইহাও সত্য নয় কি যে, ভাঁইয়োঁ, বা মোপাসাঁ, বা তুলুজ লোত্রেকের প্রত্যক্ষ ব্যক্তিত্বের সহিত তাঁহাদের শিল্পী ব্যক্তিত্বের পার্থক্য সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে দুই পৃথুলদেহী জনসনই তাঁহাদের অতীব প্রত্যক্ষ জৈব ব্যক্তিত্বকে রসোপলব্ধির পর্যায়ে উন্নীত করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। তাই বলিতেছিলাম, ব্যক্তিত্ব বিলাইতে গিয়া দেউলিয়া হইলেই শিল্পী হওয়া যায় না। কোন আমির কতটুকু সাধারণ্যে প্রকাশ্য, সেইটুকু আমার উপলব্ধিতে কি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে নির্মম ও নির্মল মন লইয়া তাহাকে বিচার না করিতে পারিলে শিল্পী হওয়া যায় না। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন ভণ্ডামি ঢাকিয়া রাখা যায় না, আর্টেও তেমনি চেষ্টা করিয়া নিজেকে জাহির করা যায় না। তবুও আপনার অন্তরের গহনবাসীকে প্রকাশ করাই শিল্পীর লক্ষ্য। সেই অন্তরচারীকে বাস্তব রূপ দিতে সক্ষম হওয়াতেই আর্টের সার্থকতা। নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মোহ হইতে মুক্তি না পাইলে শিল্পীর দৃষ্টিতে নিজের মানসলোক প্রত্যক্ষই হয় না। দৃষ্টি অচঞ্চল, স্থির হইলে তবেই সেই অনুভূতি পরিস্ফুট, রূপময় হয়। নিজের মানস অভিজ্ঞতার নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশের নামই আত্মপ্রকাশ। নিজেকে এমন করিয়া দেখিতে যোগী পারেন; আর্ট যোগেরই অন্যতম অভিব্যক্তি। আমি যাহা কিছু লিখিব অবশ্য আমাকেই আশ্রয় করিয়া। কিন্তু সেই আমি ত রক্ত মাংসের আমি নই, যে আমাকে আপনারা জানেন সে বড় অকিঞ্চন, তাহার হীনতা আমার কাছেই গ্লানিকর। সুতরাং অন্য আর এক আমিকে স্রষ্টার মত গড়িতে হয়। যদি পারি আমার রচনায় রসের ঘাটতি পড়িবে না। যদি না পারি, ছেঁদো কথার ভিয়েনে ডুবাইয়া রাখিলেও আমার রচনায় রসের ছোঁয়া লাগিবে না।

শিরসি মা লিখ

সত্যকাম

ললিতকলার বিচিত্র নিকেতনে আমার প্রবেশাধিকার নেই। আমি শুধু বাইরে থেকে দেখে বেড়াই, দূরের থেকে কান পেতে শুনি, আর তার থেকেই যেটুকু আনন্দ পাই তাই নিয়েই খুশী থাকি। যেখানে আনন্দ পাই না সেখান থেকে আমি নিজের মনেই নিরাশ হয়ে ফিরে আসি, কিন্তু বলার ক্ষেত্রে অভিমত প্রকাশ করতে আর আমার ভরসা হয় না। অনেকবার অনেক রকমে ঠকে, এইটুকুই আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকাটা যে একটা ছেলেমানুষী ব্যাপার এ সম্বন্ধে আর পাঁচজনের সঙ্গে আমিও একমত ছিলাম। কারণ, কয়েকটি সাময়িক পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের চিত্রের কতকগুলি প্রতিলিপি দেখে আমার ভাল লাগেনি। চোখ ফুটল, যখন সেই ছবির আসলগুলিকে দেখলাম। পত্রিকায় ছাপা প্রতিলিপির সঙ্গে এর যেন জড়-জীবন্তের প্রভেদ। রঙের জলুস, তুলির আঁচড়, সব মিলিয়ে ওগুলো যে ছবিই সে কথা আর অস্বীকার করতে পারলাম না। সবচেয়ে আশ্চর্য, যত বেশী করে দেখা যায় ততই যেন ছবির ভিতরের অর্থ নিজের থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে জিনিস ছবিতে আঁকা নেই, দেখতে দেখতে তেমন সব জিনিসের কথাও ভাবতে আরম্ভ করি, আর সেগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠে ছবির সঙ্গে মিলে মিশে গিয়ে ছবিখানাকে আরও বড় করে তোলে।

তবু মনে হলো, ওরকম ছবি আঁকা বিশেষ কিছু শক্ত নয়। বাড়ী ফিরে সেইদিনই নানা রকম রঙ, তুলি, কাগজ কিনে ঐ রকমের ছবি আঁকতে বসে গেলাম। অনেক রঙ ফলাই, অনেক কিছু ভাবি, তুলি দিয়ে আঁচড়ের পর আঁচড় কাটি,—বুঝলাম আমারটা কিছুই হচ্ছে না, রবীন্দ্রনাথের একটা কিছু হয়েছে। সেই "একটা কিছু" ভাল না মন্দ সেটা বিচার করার জ্ঞান আমার নেই, তাই রবীন্দ্রনাথের ছবি আমার ভাল লাগেনি। এ ছাড়া আর কিছু নয়।

ওস্তাদী গান সম্পর্কে আমার একটা বিভীষিকা ছিল। আমাদের পাড়ার এক ভদ্রলোক সকাল সন্ধ্যা হার্মোনিয়ম বাজিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা চিৎকার করতেন। মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য দু একটা কথা শোনা যেত, আর সারাক্ষণই নানা রকমভাবে আ অক্ষরটা তাড়িয়ে তাড়িয়ে গলার ভিতর ঘোড়দৌড় করাতেন। শুনেছিলাম তারই নাম ওস্তাদী গান। সেই থেকে, কোথাও ওস্তাদী গান হচ্ছে শুনলে আমি পারতপক্ষে সেদিকে ঘেঁষতাম না। নিজের কাছে নিজে কানমলা খেলাম যেদিন প্রথম হীরাবাঈয়ের গান শুনলাম। গান হচ্ছিল ভজন। সেই দু একটি কথা, সেই আ-আ-আ-আ-র তান, সবই আছে। কিন্তু সেদিকে আমার খেয়াল নেই। আমি শুনছিলাম মধুর সুর। সুর মধু হয়ে ঝরছে কি মধু সুর হয়ে ঝরছে, সে কথা ভাবার অবকাশ অবধি নেই, এমনই মুগ্ধ অবস্থা। শুধু বুঝতে পারছিলাম কার যেন হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনা উজাড় করে কোন এক অজানিতের উদ্দেশে সমর্পণ করে দেওয়া হচ্ছে, সুরে সুরে তারই মূর্ছনা,—আ-আ নয়; ব্যথার বিস্তার।

শেষ রাত্রে শুনলাম ফৈয়াজ খাঁর খেয়াল। গলা খুলল, আর ধ্বনি যেন দিগন্তকে সংকেত জানাল। কোথাও যে রাত পোয়াচ্ছে, অন্ধকার ফিকে হয়ে এসে ঊষার আলোক ফুটি ফুটি করছে, সে বিষয়ে কোনো আর সন্দেহ রইল না। এই আলো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, এই আবার অন্ধকারে স্তিমিত হয়ে যায়, আ-আ-আ-আ-র কি কলা-কৌশল, সমস্তই কান দিয়ে অনুভব করা যায় চোখে দেখার প্রয়োজন হয় না। শুধু বোঝা যায়, সব কিছুর ভিতর দিয়ে রাত্রিশেষের দেবতার প্রতি একটা সুগম্ভীর আরাধনা, সুরের আলোয় দিক্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

ওস্তাদী গান ওস্তাদের মুখে শুনিনি তাই আমার সে সম্পর্কে ভুল ধারণা ছিল। তাছাড়া এর রস সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে হলে তান, লয়, রাগরাগিণী সম্বন্ধে অনেকখানি জ্ঞানের দরকার। সে জ্ঞান আমার নেই, তাই অনেক সময় অনেকের গান আমার ভাল লাগে না। সেটা ওস্তাদী গানের দোষ নয়, আমার জ্ঞানের দৈন্য।

নাচ আমার বরাবরই ভাল লাগত। কিন্তু তার ভিতর একটা কথা ছিল। নাচ বলতে আমি বুঝতাম দু রকমের। এক রকম, যা আমি কোনোদিনই দেখিনি কেবল লোকের মুখে শুনেছিলাম, তার চলন ছিল পেশাদার থিয়েটারে আর টপ্পা-যাত্রার আসরে। শুনেছিলাম সে নাকি এক বিকৃত রুচির অঙ্গভঙ্গী, লাস্যময়ী কটাক্ষ আর নিতম্বের যথেচ্ছ হিল্লোল। এইগুলিই নাকি ছিল তার বৈশিষ্ট্য। এক কথায় তার নাম ছিল "খেমটা", ভদ্র-সমাজে সে নাচের উল্লেখ করাটাও নিন্দার বিষয় ছিল। সে নাচ আমি দেখিনি, কিন্তু ধারণা করে নিয়েছিলাম সে এক কুৎসিত ব্যাপার। আজ এতদিন পরে মনে হচ্ছে সে নাচটাও একবার নিজের চোখে দেখলেই হয়ত ভাল হত। সেদিন লোকের মুখে পাঁকের কথা শুনেই দূরে রয়ে গেলাম। জানি না, হয়ত বা তারি জন্য কোন এক অনাদৃত পঙ্কজ আমার কাছে চিরদিন অদেখা হয়ে রইল।

আমার কাছে যে নাচ ভাল লাগত তা হ'ল শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের রবীন্দ্রনাট্য অথবা রবীন্দ্রসঙ্গীত সহযোগে নাচ। অপরূপ কথার সঙ্গে অপরূপ সুর মিশিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের

সৃষ্টি; তার সঙ্গে লীলায়িত দেহভঙ্গী আর সচ্ছন্দ পদবিক্ষেপ যে বিচিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করত, আমার কাছে তা ছিল এক চিত্তহারী আকর্ষণ। তবু এক এক সময় আমার মনের ভিতর একটা প্রশ্নের ইশারা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেত,—রবীন্দ্র সংগীতের অসামান্য কথা আর অপূর্ব সুর থেকে আলাদা করে দেখলে এ নাচের মূল্য কতখানি থাকে? মনে মনে যোগ বিয়োগ চলত, কিন্তু বিয়োগ ফল যেটুকু পাওয়া যেত মনে হত তারই যেন তুলনা নেই।

ধীরে ধীরে শান্তিনিকেতনের নৃত্যকে অনুসরণ করে ছোট ছোট মেয়েদের ভিতর এক ধরনের নাচের প্রচলন শুরু হল, লোকের মুখে তার নাম দাঁড়াল "ওরিয়েণ্টাল ডান্স"। কোনও সুপরিচিত গান অথবা তার সুরের সহযোগে এ নাচও মন্দ লাগত না দেখতে। মনে হত, শিল্প জগতে অবনীন্দ্রনাথের মত রবীন্দ্র-নাথের হাতের স্পর্শে ভারতীয় নৃত্যকলার বুঝি নতুন করে পুনর্জন্ম হল। কেরালা, উত্তর প্রদেশ, মণিপুরের নাচের হাটে তখনও যে নটরাজের হীরাপান্নার বেসাতি চলেছে, সে খবর সেদিন আমার জানা ছিল না।

এমন সময় আবির্ভাব হল উদয়-শংকরের। প্রথম কয়েকটি অভিনয়ের টিকিট সংগ্রহ করতে পারিনি। সে ক'দিন লোকের মুখে শুনে আর খবরের কাগজ পড়ে মন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাই সেদিন প্রথম শংকরের নৃত্য দেখার সুযোগ ঘটল সেদিন ভারতীয় নৃত্যের চরম উৎকর্ষ দেখার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। যা দেখলাম তাই ভাল লাগল। লোকে বলেছিল উদয়শংকর সাক্ষাৎ শংকর, দেখলাম সত্যিই তাই; কাগজে পড়েছিলাম অজন্তার মূর্তির জীবন্ত প্রকাশ, দেখলাম ঠিক, অজন্তাই বটে। মন ভরে টইটম্বুর হয়ে একেবারে উপচে উঠল। মনে হল, এর উপরে আর নাচ হয় না, এই শেষ কথা। তারপর অনেকবার শংকরের প্রদর্শনী দেখবার পর কখনো মনে হয়েছে, পিছনের সংগতকারী ঐ সব নাম করা সুরের গুণীদের বাদ দাও, ঐ চটকদার পোশাক আর দৃশ্যসজ্জা সরিয়ে নাও, ঐ নানা রকমের আলোক-সম্পাত বন্ধ রাখ, শংকরের নাচ তখনও কি এতটা ভাল লাগবে? মন বলত, লাগবে; আর ঐ সব জড়িয়েই ত নাচ, ওগুলো বাদ দেওয়ার কথা কেন? ভারতীয় নৃত্যের এ সমস্তই আংগিক। চুপ করে যেতাম। ভারতীয় নৃত্যের চরম উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি উদয়শংকরের নাচের কোনো রকম বিরুদ্ধ সমালোচনা আমার নিজের কাছেই হাস্যকর মনে হত। যাঁরা নিজেরা নাচিয়ে আর যাঁরা নাচ সম্বন্ধে সত্যিকারের খোঁজখবর রাখতেন, তাঁদেরও শংকরের প্রতিভার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে শুনিনি, শুধু মৃদু গলায় মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে এক আধজন জানিয়ে দিতেন, শংকর ছাড়াও এদেশে আরও নর্তক আছেন, নাচও আছে অনেক রকমের। তুড়ি মেরে তাদের কথা উড়িয়ে দিয়ে বলতাম "জেলাস"; ভাবতাম ওদের কলচার নেই। শান্তিনিকেতন আর উদয়শংকরের নাচ উপভোগ করার সংগে কালচারের একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের ধারণাটা যে কখন আমার মনের ভিতর শিকড় গেড়ে বসেছিল তা আমি নিজেই টের পাইনি। মোট কথা, নিজের মনে তখন আমার দৃঢ়বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল, ভারতীয় কলার অন্তত একটা বিভাগের চরম জিনিস আমার দেখা হয়ে গেছে, এ ছাড়া আর যা আছে তা দেখার যোগ্য নয়। হ্যাঁ, তখন নিজেকে ভারতীয় নৃত্যকলার বেশ একজন সমঝদার বলেই আমি মনে করতাম, এ কথা লুকিয়ে গিয়ে আজ লাভ নেই।

সুধাকণ্ঠ সায়গলের বাড়ীতে আলাপ হল শোহনলালের সংগে। ছিপছিপে পাতলা চেহারার শোহনলাল শুনলাম কথ্থক নৃত্যের একজন সেরা গুণী। এতদিন কথ্থক নৃত্যের কথা কানেই শুনে-ছিলাম, একদিন আসর ডেকে শোহনলাল চোখের আশা মিটিয়ে দিলেন। নিজে নাচলেন না, নাচলেন তাঁর এক ছাত্রী, সংগে শোহনলাল তবলা সঙ্গত করলেন। বসে আছি। আমার দুর্বোধ্য ভাষায়

একটা গানের সংগে তবলা বাজতে লাগল, আর তবলার বোলগুলি মেয়েটির পায়ের যাদুতে ঘুঙুরের দানায় দানায়, মুক্তোর মত ফুটে উঠতে লাগল। যাদু, এ ছাড়া এর আর কোনো উপমা হয় না। এক একবার এক একটা "বোল" আরম্ভ হয়, ধি রি রি রি, নাগে ধেগে, ধিন্ ধিন্ করে ঝলকে ঝলকে ফুটতে থাকে ছন্দের ফুল, মেয়েটি দুলতে থাকে এদিক সেদিক আর নাচতে থাকে ঝি রি রি রি, ঝি রি রি রি করে। ধা ধা ধা—সোমের মাথায় তেহাই দিয়ে এক ঝটকায় ছিটকে গিয়ে একটি বিশেষ ভঙ্গিমায় স্থাণুর মত আটকে যায় মেয়েটি। আবার গান চলে, মেয়েটি সহজ হয়ে দাঁড়ায়, আবার চলে নাচ ঝি রি রি রি। যতবার ঐ রকম ঝি রি রি রি চলে, আমার বুকের ভিতর কি রকম যেন অস্বস্তি লাগতে থাকে। মেয়েটি এদিক সেদিক দোলে মনে হয় একটা সাপ যেন আমার হৃদপিন্ডটায় ছোবল মারবার জন্য তাগ করছে; ধা ধা ধা, যেই ঝট্‌কা মেরে দাঁড়ায় মেয়েটি মনে হয় সত্যি ছোবল মারল সাপটা। বারকতক এই রকম হবার পর স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলাম আর খানিকক্ষণ এরকম ধারা চললে আমার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বোধ হয় বন্ধ হয়ে যাবে। এক সময় নাচ থামল, কিন্তু নাচ বন্ধ হবার অনেকক্ষণ পরেও আমার বুকের ভিতর আড়ষ্ট ভাবটা রয়ে গেল। কেবলমাত্র ছন্দ, শুধু "রিদম্" যে এমন সম্মোহন বিস্তার করতে পারে, সেদিন প্রথম সেটা অনুভব করলাম। বুঝলাম, কথ্‌থক নাচ এক অদ্ভুত ব্যাপার, এ এক নাচের যাদু। তবু সে দিন নাচ দেখিয়েছিলেন শোহনলালের ছাত্রী, শোহনলাল নয়।

একবার কি একটা কাজে মাদ্রাজ যেতে হল। সেখানে নাচ দেখলাম গোপীনাথের, কথাকলির নামকরা-নাচিয়ে গোপীনাথ। দেখলাম, সাজপোশাক আছে কিন্তু আলোর কলাকৌশল নেই; যন্ত্র বাজছে, কিন্তু মাত্র একটি বীণা, আর একটি বাঁশী আর মৃদঙ্গ; আর কিছু নেই। সংগে যে সুরটা বাজছিল সেটাও কেমন বেসুরো লাগছিল আমার কানে, দক্ষিণ ভারতের সুরের সংগে উত্তর ভারতের একই সুরের পর্দার যে এক জায়গায় তফাৎ আছে, সে কথা তখন আমার জানা ছিল না। সেই সাদামাঠা আলোয়, সেই সামান্য কয়েকটি যন্ত্রের বেসুরো আবহাওয়ায় নাচছিলেন একলা গোপীনাথ! তবু আমি চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। পালা হচ্ছিল বামনাবতার, মহাভারতের সেই তিন পাদ ভূমির কাহিনী। পুরো এক ঘণ্টার নাচ। কিন্তু নাচিয়ে একা গোপীনাথ, তিনিই সব। কি অদ্ভুত নৈপুণ্য। এই বামন হয়ে ভিক্ষা চাইছেন গোপীনাথ, পরক্ষণেই বদলে গিয়ে হয়েছেন বলী রাজা। এই বামন-রূপী বিষ্ণু নিজের শরীর বিস্তৃত করতে থাকেন, পা রাখার জায়গা হয় না ত্রিলোকে। বামনরূপী গোপীনাথ চোখের সামনে দেখতে দেখতে অতি মানব হয়ে ওঠেন। আবার পরমুহূর্তে ভয়ার্ত বলীরাজ কাঁপতে কাঁপতে কুঁকড়ে ছোট হয়ে যান, গোপীনাথ শরীর দুমড়ে হয়ে যান যেন বালখিল্য। এ এক অলৌকিক ব্যাপার। তবু সব কিছুই নাচের মধ্যে চলছে; ছন্দ ছাড়া, তাল ছাড়া, একটি ভ্রূ কাঁপছে না, একটি আঙুল নড়ছে না। সবার উপরে, ভাবের কি অপূর্ব অভিব্যক্তি! কথা নেই, তবু বুঝতে কষ্ট হয় না। একই লোক বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় একই সংগে একই পোশাক পরে একটানা করে চলেছেন, তবু অস্বাভাবিক মনে হয় না কিছু। বিরামের পর আরম্ভ হল, শিকারী নৃত্য। সেই একলা গোপীনাথ, কখনো ব্যাধ হয়ে মারছেন, কখনো হরিণ হয়ে মরছেন। পাশের থেকে এক মাদ্রাজী বন্ধু মাঝে মাঝে আমায় বুঝিয়ে চলেছিলেন, "ঐ যে দেখছেন বুড়ো আঙুল আর তার পরের আঙুল ফাঁক করে দেখানো হচ্ছে, ও একটা মুদ্রা, ওর মানে হরিণ, দু আঙুলে হরিণের শিংয়ের আভাস। আর ঐ যে মাঝের আঙুল বুজিয়ে তার দু পাশের দুটো আঙুল শক্ত করে সামনের দিকে ফিরিয়ে কাঁপাচ্ছে, ওর মানে তীর, শিকারী তীর ছুঁড়ছে।" অবাক হলাম। প্রতি অংগভঙ্গি, প্রতি ইংগিতের ভিতর এত অর্থ, এত সাংকেতিক ভাষা? এ না বুঝেও যে নাচ দেখে আমার এত ভাল লাগে! অনেকদিন আগে উদয়শঙ্করের নাচ দেখার সময় অভিজ্ঞ লোকদের মুখে যে কথাটা শুনেছিলাম সেটা হঠাৎ মনে পড়ল, "উদয়শঙ্কর ছাড়াও এদেশে আরও নাচিয়ে আছেন, নাচও আছে অনেক রকমের।" সে দিন 'জেলাস' ভেবে, কালচারের অভাব ভেবে, তাদের আমল দিইনি, নিজের সমঝদারি জাহির করার জন্য তর্কও করেছি তাল ঠুকে। তারা চুপ করে গেছে। সে দিন ভেবেছি, নির্বোধদের হারিয়ে দিলাম, আমার জিৎ হল। গোপীনাথের নাচ দেখতে দেখতে মনে হল, বোধ হয় সেদিন তারা আমায় অনুকম্পা করেছিল, বুঝতে পেরেছিল নাচ সম্বন্ধে কথা বলার যোগ্যতা আমার নেই, তাই কথা কয়নি।

ওরকম ভুল আর হবে না। গুরু মেনেছি কালিদাসকে, যিনি ভাগ্যদেবতার কাছে একটিমাত্র প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—"অরসিকদের কাছে রসের কথা নিবেদন করার দুর্ভাগ্য, আমার কপালে তুমি লিখো না।" সেই দেবতার কাছে এক এক সময় আমিও জানাই, "আর যাই কর সত্যিকারের রসিকদের কাছে অরসিকের মত কোনো উক্তি করার মূঢ়তা, শিরসি ম লিখ, শিরসি মা লিখ।"

অনুবাদ সাহিত্য

ভ্রমর গীত—শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী কর্তৃক অনূদিত। মহাকবি নন্দদাস বিরচিত বিখ্যাত হিন্দী গীতিকাব্য "ভঁবর গীত"-এর বাঙলা কাব্যানুবাদ। প্রাপ্তিস্থান, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

ষোড়শ শতকের হিন্দী কাব্যসাহিত্যকে নূতন ভাবমাধুর্যে মণ্ডিত করিয়াছিলেন যে-সকল কবি, তাঁহাদিগের মধ্যে কবি নন্দদাস তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের গুণে বিশেষ প্রখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থসমূহ একাধারে দার্শনিক তত্ত্ববিচার ও কাব্যিক উৎকর্ষের নিদর্শন হিসাবে হিন্দী-সাহিত্যের ক্লাসিক সৃষ্টিরূপে মর্যাদা লাভ করিয়াছে। একটি অভিমত প্রচলিত আছে যে, মহাকবি নন্দদাস হইলেন মহাকবি তুলসীদাসের ভ্রাতা, যদিও এই ধারণা ঐতিহাসিকের বিচারে সমর্থিত হয় নাই। 'ভঁবর গীত' শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্ধব-সংবাদের বিশেষ একটি ঘটনা অবলম্বনে রচিত। মথুরা হইতে উদ্ধব ব্রজধামে আসিয়াছেন। কৃষ্ণ-বিরহিণী গোপিকাদিগের বেদনাভিভূত চিত্তে সান্ত্বনা দানের জন্য জ্ঞানবাদীর যুক্তি ও তত্ত্বের সাহায্য করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভাগবত মহিমা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন:

"জ্ঞান আঁখি মেলি দেখহ চাহিয়া
শ্যাম নহে বহুদূর"

কিন্তু জ্ঞানবাদী উদ্ধবের অদ্বৈত তত্ত্বকেই যেন পাল্টা সান্ত্বনা দিয়ে প্রেমরসসাধিকা গোপললনাদিগের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল:

"প্রেমরসঘন শ্যামের মূর্তি আঁকা
আমাদের প্রাণে"

জ্ঞানবাদী উদ্ধবের চিত্তই গোপিকাদিগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম ও ভক্তির ব্যাখ্যার কাছে হার মানিয়া নূতন ভাবের অভিষেক লাভ করিল। বিস্মিত উদ্ধব দেখিলেন—

"মুগ্ধতনুর অনুতে অনুতে শ্যাম-
রূপ ছবি জাগে
নয়নে তাদের কোথা ভূত আর
ভাবীকাল ব্যবধান"

প্রেমরসরঙ্গিনীদিগের সত্তা শ্রীকৃষ্ণেই লীন হইয়া রহিয়াছে; প্রভেদবোধও নাই। কবি নন্দদাস তাঁহার এই কাব্যের তত্ত্ব হিসাবে শেষ পর্যন্ত দ্বৈতাদ্বৈতেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রয়াস করিয়াছেন।

রসময়ী শ্রীরাধার পায়ের উপর অকস্মাৎ একটি ভ্রমর উড়িয়া আসিয়া বসিল। সেই ভ্রমরকে উদ্দেশ্য করিয়াই উদ্ধব এবং গোপীদিগের বক্তব্য নিবেদিত হইয়াছে। এই কারণেই কাব্যের নাম হইয়াছে ভঁবর গীত তথা ভ্রমর গীতি। হিন্দী সাহিত্যের অন্যান্য কতিপয় বৈষ্ণব কবিও ভ্রমর গীতি রচনা করিয়াছেন।

হিন্দী কাব্যসাহিত্যের ভাব ও ভাষার অত্যুচ্চ উৎকর্ষের নিদর্শন বহন করিতেছে 'ভঁবর গীত' নামে আখ্যাত বিশেষ শ্রেণীর কাব্য। বাঙলায় ইহার অনুবাদ পূর্বে কখনো হয় নাই, অথচ ইহার অনুবাদের কতই না প্রয়োজন ছিল। শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী স্বয়ং বর্তমান বাঙলার অন্যতম লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি এবং আলোচ্য গ্রন্থে তিনি হিন্দী ক্লাসিক ভাষার সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদে অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। মূলের ভাব ছন্দ ও ভাষাগত সৌষ্ঠব এবং গরিমা অনুবাদে অত্যদ্ভুত নিপুণতার সহিত পরিবেশন করা হইয়াছে। কাব্যিক মাধুর্যের গুণে তত্ত্বের দুরূহতা আপনি সরল হইয়া গিয়াছে। তত্ত্বান্বেষী এবং কাব্যরসগ্রাহী, উভয় শ্রেণীর পাঠকের নিকট গ্রন্থটি অভিনব আনন্দের উপহাররূপে সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

সাম্প্রতিক কালে হিন্দী ক্লাসিকের বঙ্গানুবাদের প্রয়াস খুব বেশি দেখা যায় না। প্রসঙ্গত শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিহারী সতসই'-এর অনুবাদের কথা মনে পড়ে। শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী রচিত 'ভ্রমর গীতি' আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াসের দৃষ্টান্ত। হিন্দী সংস্করণ 'ভক্তমাল' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ দুই শতাধিক বৎসর ধরিয়া বাঙলারই ঘরে ঘরে সমাদৃত হইয়া আসিয়াছে, এই ঘটনাই প্রমাণিত করে যে হিন্দীর ক্লাসিকসমূহ ভাবের দিক দিয়া বাঙালীরও অন্তরঙ্গ সম্পদ, এক্ষেত্রে প্রাদেশিক কোন ব্যবধান নাই। সুতরাং সকৃতজ্ঞ চিত্তে ইহাই স্বীকার করিব যে, জগদানন্দবাবু বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি সাংস্কৃতিক প্রয়োজনের কর্তব্যও পালন করিলেন।

অনুবাদ গ্রন্থে মূল হিন্দীও প্রদত্ত হইয়াছে। দেশের বয়স্ক শিক্ষার এবং সাধারণ জনশিক্ষার জন্য সরকারী পরিকল্পনা যাঁহারা পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহাদিগের দৃষ্টি এই গ্রন্থটির প্রতি আকর্ষণ করিতে চাহি। হিন্দী-ভাষী জনসাধারণের পক্ষে বাঙলা শিখিবার এবং বাঙলাভাষী জনসাধারণের পক্ষে হিন্দী শিখিবার স্বাভাবিক সহায়তা এই গ্রন্থে নিহিত রহিয়াছে। বহুবর্ণের প্রচ্ছদপট এবং প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা বিচিত্রিত, গ্রন্থটী সৌষ্ঠবেও সুন্দর হইয়াছে। কবি পরিচিতি এবং শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকায় কবির জীবন, কাব্যের ভাবধর্ম এবং প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক তথ্যও বিবৃত হইয়াছে। ১৪৯।৫৪

উপন্যাস

শ্রীমতী কাফে—সমরেশ বসু। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—পাঁচ টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনী শুরুতেই যেভাবে সন-তারিখ দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে, তাতে মনে হয়েছিল লেখক বুঝি বা আমাদের গল্প শোনাবার নাম করে ইতিহাস শোনাচ্ছেন,

---

যে ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের মুক্তি-আন্দোলন বিশেষভাবে জড়িত। কিন্তু কয়েক পৃষ্ঠা পড়ার পর সে আশংকা দূরে হয়েছে। অতীতকে স্মরণ করলেও লেখক কোথাও তা নিয়ে 'পণ্ডিতী' গবেষণা করেন নি। কাহিনীর মাধ্যমে তিনি আমাদের বিস্মৃত জীবনের ইতিহাসকে উজ্জীবিত করেছেন। কল্পনাপ্রসূত হলেও আলোচ্য উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী বিশেষ একটি কালের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা, হতাশা-নিরাশার সাক্ষ্য দেয়। বিশেষ একটি সময়ের হতচেতনাকে এমনভাবে ঘটনা-সমাবেশের দ্বারা ফুটিয়ে তুলতে পারা কম দক্ষতার পরিচয় নয়। এদিক দিয়ে লেখক অসাধ্য সাধন করেছেন। মহাত্মার নির্দেশে অসহযোগ আন্দোলন যখন প্রত্যাহৃত হলো, তখন জনমনের সেই বিভ্রান্তকর হতাশাকে বুঝতে পারি শ্রীমতী কাফের স্বত্বাধিকারী ও তার আশপাশের মানুষ দলের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করে। বোধ হয় এমনি ক'রে গল্প না করলে সে-কালকে সম্যক বোঝা যেত না।

ভজনানন্দ মূর্তিমান ফ্রাসট্রেশন, কিছু তার ভাল লাগে না, কিছু তার কামনা নেই, মনোমত নয় কিছু—না দেশসেবা দাদার মত জেল-খেটে, গা আড়াল দিয়ে, না স্বার্থপরতা সাধারণ মানুষের মত। তখনকার দিনে উচ্চশিক্ষা পেয়েও সে বয়ে গেল বলা যায় শ্রীমতী কাফের মায়ায়। নেশা তার মদ নয়, নেশা তার আপাতনিষ্ক্রিয় দেশকর্মীদের সাহচর্য। ভজনানন্দ 'লাট' কি না জানা যায় না, কিন্তু এটা বুঝতে বাকি থাকে না তখনকার ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনোভাবটা। এ কাহিনীর চমৎকারিত্ব বা উৎকর্ষ ঘটনার ঘনঘটায় নয়, যতটা তার অন্তরমুখী বিশ্লেষণে। এক অদ্ভুত নিরাশক্তিতে ঘটনা এবং চরিত্র পরস্পরের প্রতি যুক্ত হয়েছে। ভজুলাট এবং তার কাফের চোখ দিয়ে লেখক যা দেখাতে চেয়েছেন—আমাদের জাতীয় জীবনের আলো-আঁধারি খেলা—তা স্পষ্টই প্রতিভাত হ'য়েছে। বইটি পড়ে অনেকক্ষণ ভাবতে হ'বে, কিন্তু ঠেলে রাখতে পারা যাবে না। উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক নূতন সৃষ্টি ব'লে অভি-নন্দন করতেই হ'বে। আর একটি কথা প্রকৃতি এবং জড়ের বর্ণনায় লেখক যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তা তাঁর অভিনিবিষ্ট, সন্ধানী শিল্প-চেতনার পরিচায়ক, নিঃসন্দেহে তিনি প্রথম শ্রেণীর। বইটির ছাপা, বাঁধাই সম্বন্ধে প্রকাশকের হেলা-ফেলা অসহ্য। এত বানান ভুল অমার্জনীয়। ১৭।৫৪

ছোট গল্প

মালাচন্দন—গজেন্দ্রকুমার মিত্র। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য—২৸০ আনা।

মালাচন্দন দশটি গল্পের সংকলন। রচনা-রীতি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং সংক্ষিপ্ত, লিনো-কাটের মত। অথচ সেইটুকুতেই প্রশান্তের মত লোক ঠকানো ছেলে, স্বামীর মৃত্যুর পর সংসারে পরিত্যক্ত এবং ছেলেমেয়েদের কাছে লাঞ্ছিত মনোরমা, আদর্শবাদী সতীশ মাস্টার, গর্বিতা স্ত্রী সুচিত্রার স্বামী বিজয় প্রভৃতির দুঃখ, মনস্তত্ব, চরিত্রচিত্রণ অতি উপভোগ্য হয়েছে। গল্পের মধ্যে ঘটনার পরিকল্পনায়ও লেখক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এবং অধিকাংশ গল্পেই নরনারীর জীবনের ভিতর মহলের খবর দিয়েছেন। বাইরে থেকে যে জীবন অত্যন্ত সহজ এবং সুখের মনে হয়, তার ভিতরে অনেক সময় অনেক দুঃখ বেদনা লুকিয়ে থাকে—প্রতিটি গল্পে সেই অন্দর মহলের দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে। যে রহস্য সাধারণ হয়েও দুর্জ্ঞেয় তাই লেখক দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। পরিচিত দৈনন্দিন জীবনের সূক্ষ্ম এবং স্বচ্ছ চিত্র লেখক এঁকেছেন। ১২৫।৫৪

ঠাকুরমার ঝুলি—দেবসাহিত্য কুটীর, ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯। দাম—৩, টাকা।

দেবসাহিত্য কুটীর ছোটদের উপভোগ্য রঙচঙে বই অনেক প্রকাশ করেছেন এবং এখনও করে যাচ্ছেন। এ সব বইয়ের সবই যে ভাল তা নয়, আবার সবই মন্দ নয়। কিছু ভালো আছে, কিছু মন্দও আছে। তাঁদের সদ্য প্রকাশিত 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে চোদ্দটি রূপকথা ঠাঁই পেয়েছে। রূপকথাগুলি ছোটদের ভালো লাগবে ঠিক।—বিশেষ করে বইটিতে রঙীন ও রেখা-ছবির প্রাচুর্য যখন রয়েছে। তবু একটি কথা বলতেই হয় এবং তা এই যে, 'ঠাকুরমার ঝুলি' এই নামকরণ বর্তমান বইটির না হওয়াই উচিত ছিল, কেননা সেই অবিস্মরণীয় 'ঠাকুরমার ঝুলি' যখন আজও বাংলা দেশের বইয়ের বাজার থেকে উধাও হয়ে যায় নি। তুলনায় দেবসাহিত্যের বইটি যে নিকৃষ্ট তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ২১২।৫৪

কিশোর সাহিত্য

সুন্দরবনের গুপ্তধন—শ্রীগোপেন্দ্র বসু। দেবসাহিত্য কুটীর, কলিকাতা। মূল্য—দেড় টাকা।

ইদানীং বাঙলা সাহিত্যে কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী পুস্তকের অভাব নেই। ভূতপ্রেত, জন্তুজানোয়ার, খুনখারাপী, গ্রহান্তরে অভিযান প্রভৃতি নানা ধরনের কাহিনীকে উপজীব্য করে পরিবেশনের চেষ্টা চলেছে। দুঃখের বিষয় বহু কাহিনীই অবৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বলিত ও অলৌকিক ব্যাপারকে কেন্দ্র ক'রে রচিত হওয়ায় মুহূর্তের ভালো লাগা ছাড়া এ সব সাহিত্যের আর কোন স্থায়ী মূল্য থাকে না।

অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। আলোচ্য পুস্তকটি এই ব্যতিক্রমেরই অন্তর্ভুক্ত। সুন্দরবন শুধু যে হিংস্র জন্তু দ্বারা অধ্যুষিত তাই নয়, হিংস্র মানুষেরও অভাব নেই। এমনি এক পরিবেশে দুঃসাহসিক তিনটি কিশোরের অভিযানকাহিনী। কোথাও অতি-রঞ্জিত কিছু নেই, কিশোর মনোরঞ্জনের জন্য অবাস্তব রং লাগানোর প্রয়াস নয়, সহজ সরল বলিষ্ঠ কাহিনী।

গ্রন্থকার কিশোরসাহিত্যে অপেক্ষাকৃত নবাগত। জানি না এই পুস্তকটি এঁর প্রথম রচনার প্রয়াস কি না। তা যদি হয়, তবে লেখকের মুন্সিয়ানা অনস্বীকার্য। এঁর সুষ্ঠু রচনায় কিশোরসাহিত্য ভাণ্ডার পূর্ণ হ'য়ে উঠুক, এই আমাদের কামনা।

ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদচিত্রণ সুরুচিসম্মত। ১৭৯।৫৪

জীবনী সাহিত্য

সোনো—হেলেনা ববিনস্কা। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা—১২। মূল্য—এক টাকা চার আনা।

ইংরেজি ছাড়া বেশীর ভাগ অন্য ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের ভাষান্তর করায় মূলের অসুবিধা প্রচুর। প্রথম এক দফায় পুস্তকটি ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয় এবং পরে বাঙলা ভাষায় রূপান্তরিত হয়। এর ফলে প্রায়শঃই মূল রচনার রস ঠিকভাবে পরিবেশিত হয় না। অনেকটা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতন সাময়িক পিপাসা নিবারিত হয়তো হয়, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়।

কাজেই সে ক্ষেত্রে মূল কণ্টিনেণ্টাল ভাষা থেকে সরাসরি বাঙলা ভাষায় অনূদিত বইয়ের মর্যাদাই স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। আলোচ্য গ্রন্থটি এমনই এক অনুবাদ। মূল পোলিশ ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন মার্তা মালিস্কা-গুহ ও রণজিৎ গুহ।

এ ছাড়া বইটি ববিনস্কার সর্বশেষ রচনা এবং এটি পোল্যাণ্ডের "জাতীয় সাহিত্য পুরস্কার" অর্জন করেছে। সাহিত্যের

[বা]রবারে এ ধরনের পুরস্কারের মূল্য হয়তো খুব বেশি নয়; কারণ রাজনীতিগত মতবাদ নির্বাচনের মূলে অনেকাংশে সক্রিয় থাকে।

পুস্তকটির উপজীব্য জোসেফ স্তালিনের বাল্যজীবনের ঘটনাবলী। ভাষা সাবলীল, রচনাভঙ্গী মনোজ্ঞ। যারা সোসোর মতবাদে বিশ্বাসী, বইটি তাদের কাছে ভালোই লাগবে। অন্যথায় সাধারণভাবে কিশোর-কিশোরীদের কাছে খুব যে জনপ্রিয় হবে এমন মনে হয় না।

১৮০।৫৪

ধর্মোপদেশ

স্বামী **সারদানন্দের পত্রমালা**—সাধক ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য। গ্রন্থকার কর্তৃক ২৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—২, টাকা।

নামেই পুস্তকখানির পরিচয়। ২০ বৎসর পূর্বে গ্রন্থকার সারদানন্দ মহারাজের অপ্রকাশিত পত্র সংগ্রহ করিয়া দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন। সম্প্রতি দুই খণ্ডকে একত্র করিয়া বর্তমান সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। উপদেশাত্মক বই আজকাল অনেকেই বাহির হইতেছে। অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলিকে পড়ে না [illegible] দার্শনিক বক্তৃতা বা পাণ্ডিত্যাত্মক [illegible] হয়। আলোচ্য পত্রগুলি সে [illegible] নয়, সহজ সরল ভাষায় দুই একটি [illegible] এগুলিতে বক্তব্য পরিস্ফুট। [illegible] নিরপেক্ষ পাণ্ডিত্যের প্রজ্ঞানময় [illegible] স্পর্শে উজ্জ্বল। অনাড়ম্বর, [illegible] জীবনের ঊর্ধ্ব স্তর হইতে [illegible] আলো আসিয়া পড়িয়াছে। পত্র-[illegible] সবই অমূল্য। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ [illegible] এবং তাঁহার দিব্যলীলার ব্যাপকতা [illegible] মহারাজের পত্রমালা ভগবৎ-সাধন [illegible] মণিমঞ্জুষা, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তিপথের [illegible] সকলেরই পরম সহায় এবং নৈরাশ্যময় [illegible] আশার আলোকস্বরূপ।

বিশ্বসমস্যা ও জীবনসমস্যায় শ্রীশ্রীসন্তদাস বাবাজী—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার। গ্রন্থকার [illegible] ৩নং অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—1০ আনা।

ভারতের সভ্যতা এবং সাধনা বিশ্বকে কোন দিন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখে নাই; পরন্তু এক অখণ্ড চৈতন্যময় সত্তাকে বিশ্বের সর্বত্র উপলব্ধি করিয়াছে। এই সত্যের উপলব্ধির উপরেই আমাদের ব্যক্তিগত সমস্যা এবং বিশ্বসমস্যার সমাধান সমভাবে নির্ভর করিতেছে। ফলতঃ একটি অপরটি ছাড়া নয়। শ্রীশ্রীসন্তদাস বাবাজী মহারাজের উক্তির সাহায্যে গ্রন্থকার ভারতীয় সভ্যতার এই সমন্বয়ের আদর্শটি সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কথার ভিতর দিয়া সার্বভৌম উদার সত্যের আলোকে অন্তর উদ্দীপ্ত হয়। সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষের বাণীর এইখানেই বৈশিষ্ট্য, বৃহৎ ভাবনার এবং ব্যাপ্তিচেতনার সেগুলির প্রজ্ঞানময় স্বরূপ সহজভাবেই মনকে আকর্ষণ করে বলিয়া সেগুলি মন্ত্রশক্তি-বিশিষ্ট। এই ধরণের মহদুক্তির মর্ম যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যেমন কঠিন, শব্দে ভাবটি উন্মেষের উপযোগী পরিবেশটি অল্প কথায় জমাইয়া তোলা ততোধিক দুষ্কর। শ্রীশ্রীসন্তদাস বাবাজী মহারাজের বাণীর পরিবেশন-পটুত্বে গ্রন্থকারের অধ্যাত্মদৃষ্টি পুস্তিকাখানিতে পরিস্ফুট হইয়াছে। মণি-খণ্ডের মত ইহার ঔজ্জ্বল্য, অধ্যাত্মরস-পিপাসু মাত্রকেই আকৃষ্ট করিবে।

সাময়িক পত্র

উজ্জীবন—ত্রৈমাসিকপত্র। প্রথম বর্ষ। প্রথম সংখ্যা। সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র রামানুজ দাস। কার্যালয়—উজ্জীবন, শ্রীবলরাম ধর্মসোপান, খড়দহ, ২৪ পরগণা।

ধর্ম ও নীতি বিষয়ক ত্রৈমাসিকপত্র 'উজ্জীবনে'র প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। প্রবন্ধগুলি সবই সুলিখিত এবং সারগর্ভ। শ্রীযুত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'বৈদিক ধর্ম', শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিত 'সমাজে ধর্মের স্থান', শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদার লিখিত 'আদর্শবাদ', শ্রীকুমুদবন্ধু সেন লিখিত 'ভক্তিসাধন' এবং কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় লিখিত 'জীবন্মুক্তি', কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক লিখিত 'বৈরাগী' সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। কীর্তন গানের স্বরলিপি 'উজ্জীবনে'র একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বিভাগটি যথারীতি পরিচালিত হইলে পত্রিকাখানি বাংলায় একটি বিশেষ অভাব মোচন করিতে সমর্থ হইবে। 'উজ্জীবনে'র সম্পাদন সর্বত্র সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। আমরা সুসম্পাদিত পত্রিকাখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

গোয়েন্দা কাহিনী

কঙ্কার পরিচয়, অগ্নিশিখা—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। দেবসাহিত্য কুটীর, ২২।৫, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯। মূল্য—দেড় টাকা ও বারো আনা।

ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, মেয়েদের দেহধর্ম ছেলেদের মতন নয়, তাই শিকল কেটে জেল থেকে পালানো অথবা জাগ্রত প্রহরীর সঙ্গে মল্লযুদ্ধ ক'রে আত্মরক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আকস্মিক বিপদে পড়ে শুদ্ধ উপস্থিত বুদ্ধির দৌলতে কেমন করে উদ্ধার পাওয়া যায়, তার হদিস মিলবে এই ধরণের বই পড়লে।

একথা কতদূর সত্য জানি না। তা' ছাড়া বই পড়ে উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারিণী হ'য়ে বিপদ থেকে বেঁচেছেন এমন দৃষ্টান্তও আমার জানা নেই। বই দুটি মোলায়েম জাতের গোয়েন্দাকাহিনী। রহস্যজনক খুন থেকে শুরু ক'রে ছুরি, পিস্তল সব কিছুই আছে। বলা বাহুল্য দু' একটি সাহসিকতার সাক্ষাৎ মেলে, বুদ্ধিবলে যাঁরা রহস্যের জট ছাড়াতে পারদর্শিনী এবং ছাড়ানও শেষ পর্যন্ত। কিছু কিছু অবিশ্বাস্য ঘটনা আর চরিত্রের সমাবেশ দেখা যায়, তা' সত্ত্বেও বই দুটি উপভোগ্য, অন্তত এই ধরনের রহস্য-সিরিজের যাঁরা অনুরাগী, তাঁদের কাছে।

ছাপা ও প্রচ্ছদচিত্রণ প্রকাশকদের ঐতিহ্যের মান অক্ষুণ্ণ রাখবে।

।৫৪, ১৬৯।৫৪

কবিতা

কাব্যকাকলি—শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক। সাহিত্য-তীর্থ, ৬৭, পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—এক টাকা।

তারুণ্য, বিশেষত সাহিত্যে, সর্বথা সমর্থনীয়। সেই কারণে অনভিজ্ঞতাহেতু ত্রুটিবিচ্যুতি যদি প্রতিভার বিন্দুমাত্র স্বাক্ষরও থাকে, ক্ষমনীয়। একথা মনে রেখেও কাব্য-কাকলির কোথাও পাঠযোগ্য একটি পঙক্তি খুঁজে পাওয়া গেল না। কাব্যের কথা ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র নির্ভুল ছন্দ মিলে একটি পদ্যাংশ খুঁজে পেলেও সান্ত্বনার কারণ হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সমালোচকের সে আশাও অপূর্ণ থেকে গেল।

২১১।৫৪

প্রাপ্তি-স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

ফরমান—নচিকেতা ভরদ্বাজ

ছোটদের গালিভার—শ্রীমনোরম গুহ-ঠাকুরতা

কর্মের পথে—অখণ্ডমণ্ডেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস

সন্তকবীর জীবন ও বাণী (স্বরলিপি সহ)—শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদার

মহাজাতি—হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

রক্ত বিপ্লবের এক অধ্যায়—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

"কশ্চিৎ কান্তা"—শ্রীঅনিলেন্দু চৌধুরী

NATION—Sri Mohendranath Dutt.

গৌড়মল্লার—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

নিয়ন্ত্রণী—গুরুদাস

ওগো ছলনাময়ী—শ্রীস্বপনকুমার

সন্ধ্যারাগ—শ্রীস্বপনকুমার

স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা—নরহরি কবিরাজ

ইস্পাত—নিকোলাই অস্ত্রোভ্স্কি। অনুবাদক: রবীন্দ্র মজুমদার

বানর হইতে মানুষের বিবর্তনে শ্রমের ভূমিকা—ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

মালশ্রী—সাবিত্রী রায়

চক্রদত্ত

আজকাল জনসংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে না। সেইজন্য কি উপায়ে খাদ্য বাড়ান যায় তার নানা-বিধ প্রচেষ্টা বৈজ্ঞানিকেরা অবিশ্রান্ত করে চলেছেন। জনৈক ইংরাজ শূকর জগতে এক অভিনব উপায়ে শূকর কুলের বৃদ্ধি-সাধনের ব্যবস্থা করেছেন। শূকরের বাচ্চা-গুলো জন্মাবার পরেই মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে এনে যন্ত্রের সাহায্যে বড় করবার ব্যবস্থা হয়েছে। একটা বাক্সর মত যন্ত্রে

শুয়োর বাচ্চাগুলি মনের সুখে দুধ খাচ্ছে

দুধ ভরে সেটার ফুটোগুলোয় বাইরে থেকে চুষি লাগিয়ে দিয়েছেন। ছোট্ট ছোট্ট শুয়োরের বাচ্চাগুলো এই চুষি চুষে চুষে মায়ের দুধের মত দুধ খেতে থাকে। যন্ত্রটার ওপরে একটা ইনফ্রারেড আলো লাগান থাকে। শুয়োরের বাচ্চাগুলো দুধ খাওয়ার সময় ঐ আলোর তাপ এদের শরীরে লাগায় এদের দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, ক্ষিধে বাড়ে, স্বাস্থ্য ভাল হয় ফলে তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়। ঐ ইংরাজ ভদ্রলোকের মতে বাচ্চা শুয়োরগুলো মায়ের দুধ খাওয়ার সময় মায়ের দেহের চাপে মারা পড়ে সেই কারণে এইভাবে দুধ খাওয়ার ব্যবস্থা করায় বহু শিশু শূকর অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। সুতরাং শূকরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের খাদ্য সমস্যার কিছুটা মীমাংসা হয়।

*

তড়িতাহত হয়ে মৃত্যুর খবর আমরা অনেক সময় শুনি। আমেরিকায় তড়িৎ-চেয়ারে বসিয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অনেক সময় আমরাও ঘরের বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাতে নেভাতে গেলে শরীরে হঠাৎ একটা ধাক্কা খাই। সাধারণ-ভাবে আমরা বলি যে, 'শক' খেয়েছে। বৈদ্যুতিক শক্তির তারতম্য অনুসারে এই ধরনের শকের অনুভূতির কম-বেশী হয়। এখন মনে এই প্রশ্ন জাগে—মানুষের শরীরে কতটা পরিমাণে বৈদ্যুতিক শক্তি গেলে তবে সে সেটা অনুভব করতে পারে। এই শক্তি অনুভব বা প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা সব মানুষেরই সমান নয়। কোন কোন লোক খুব বেশি ভোল্টের বিদ্যুৎকে সহ্য করতে পারে—আবার কোন কোন লোক খুব নীচু ভোল্টের বিদ্যুতেই কাবু হয়ে পড়ে। এই নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রফেসার গবেষণা করছেন। তাঁর মতে যদি কোন লোকের শারীরিক ক্ষমতা খুব বেশী না থাকে, তাহলে খুব সামান্য শকেই মৃত্যু ঘটতে দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে যে, লোকটির বৈদ্যুতিক শকের চেয়ে বেশীরভাগ স্নায়বিক কারণে মৃত্যু হয়েছে। প্রফেসার ভদ্রলোকটি গবেষণা করে বার করেছেন যে, শরীরের পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে জিহ্বাই সর্বাপেক্ষা বৈদ্যুতিক অনুভূতিসম্পন্ন ইন্দ্রিয়। মানুষ জিভের সাহায্যে এক এম্পেয়ারের ৪৫ লক্ষ ভাগ বিদ্যুৎ অনুভব করতে পারে। এইটিই হচ্ছে বৈদ্যুতিক শক্তি মাপবার মাপকাঠি।

প্রফেসার তাঁর গবেষণায় দুই ধরনের বৈদ্যুতিক প্রবাহ নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। এই প্রবাহ দুটি হচ্ছে সরল-প্রবাহ ('ডিরেক্ট কারেণ্ট') এবং একান্তর প্রবাহ (অলটারনেট কারেণ্ট)। প্রথমটিতে বিদ্যুতের প্রবাহ সোজাসুজি চলতে থাকে। আমরা সংক্ষেপে একে 'ডি-সি' বলি। দ্বিতীয়টিতে প্রবাহ মাঝে বাদ দিয়ে দিয়ে আসতে থাকে। একে সংক্ষেপে 'এ-সি' বলা হয়। প্রফেসার বিভিন্ন ভোল্টের দুই রকমের প্রবাহ মানুষের হাতে এবং পায়ের তলায় প্রয়োগ করে পরীক্ষা করে দেখছেন। এতে তিনি দেখছেন যে, পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের চেয়ে বিদ্যুৎকে বেশী সহ্য করতে পারে। এ ছাড়াও এটা দেখা গেছে যে, মানুষ শরীরে ডি-সি'র জন্য একরকম আর এ-সি'র জন্য আর একরকম অনুভব করে। এ-সি'র শক মানুষের শরীরে বিভিন্ন অনুভূতির সৃষ্টি করে, যেমন প্রথমে শকটা খাওয়ামাত্রই শরীরটা ঝন ঝন করে ওঠে, তারপর একটা ধাক্কা লাগে, এরপর একটা ব্যথা অনুভব করা যায়—অবশ্য ঠিক সেই মুহূর্তে পেশী নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় না। অবশ্য শেষকালে পেশী নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং বৈদ্যুতিক তার থেকে শরীর সরিয়ে নেবার ক্ষমতা থাকে না—শরীর তারের সঙ্গে আটকে থাকে। এই অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট আরম্ভ হয় এবং যদি বৈদ্যুতিক প্রবাহ তখনো শরীরে চলতে থাকে, তাহলে মৃত্যু ঘটে। অনেক সময় দেড় এমপেয়ার একান্তর বিদ্যুৎ-প্রবাহে এক সেকেণ্ডের চেয়ে কম সময়ের মধ্যে মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে। সরল বিদ্যুৎ-প্রবাহের বেলাতেও এ-সি'র মত প্রায় সবটাই ঘটে, শুধু তফাৎ হচ্ছে যে, মানুষ প্রবাহের ফলে তারের সঙ্গে আটকে থাকে না। এছাড়া ডি-সিতে মানুষ শরীরে উত্তাপ অনুভব করে এবং বেশী পরিমাণে প্রবাহের ফলে শরীর পুড়ে যেতে পারে।

*

শরীরে অস্ত্রোপচারের সময় অথবা বাইরে থেকে শরীরের ভেতরে রক্ত দেবার সময় ঐ সব স্থানে রক্তের চাপ বেড়ে যেতে দেখা যায়। এই সময় যদি রক্তের প্রবাহকে বন্ধ করা যায় তাহলে রক্তের চাপ বাড়তে পারে না—আর এতে ডাক্তারদেরও কাজের খুব সুবিধা হয়। 'আরফোন্যাড' নামে একটা নতুন ওষুধ বার হয়েছে যেটার সাহায্যে প্রায় বলতে গেলে অস্ত্রোপচার অথবা রক্ত দেওয়ার সময় ঐ সব স্থানের রক্তের প্রবাহ প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যেতে পারে। দুজন ইংরাজ ডাক্তার ৩০০টি রোগীকে এই আরফোন্যাডের সাহায্যে প্রায় বিনা রক্তপাতেই অস্ত্রোপচার করতে পেরেছেন।

ট্রামে-বাসে

ইস্কিন্দার মির্জা সাহেব নাকি বলিয়াছেন যে, মোল্লারা পাকিস্তানের দুই নম্বর শত্রু।—"মোল্লারা সামনাসামনি কিছু না বললেও মনে মনে নিশ্চয় বলছেন—যার ভাগ্যে রহিমের মা, তারে তুমি চেন না"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

* * *

সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, জনাব মহম্মদ আলির তুরস্ক পরিভ্রমণের ব্যাপারে "মুসলমানী" কিছু নাই। শ্যামলাল বলিল—"অনেকের ভাবনা তো সেই জন্যেই, মুসলমানী হলে না হয় একটা মানে করা যেতো, খানিকটা ইয়াঙ্কি আছে বলেই হয়ত লোকেরা শুধু টার্কিস্ বাথের কথাই ভাবছে!!"

* * *

আমেরিকা সমূহ বিপদের সম্মুখীন—এই মন্তব্য করিয়া প্রেসি-

ডেণ্ট আইসেনহাওয়ার নাকি তাঁর দেশবাসী এবং এই সংগে সমস্ত পৃথিবীকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"কিন্তু আমরা এতে বিস্মিত হইনি। বিপদের জিগিরটা অনেকটা সংক্রামক ব্যাধির মতো। হামেশা 'ইস্‌লামের বিপদ' জিগির তোলা যাদের অভ্যেস তাদের সংগে অবাধ মেলামেশাতেই হয়ত প্রেসিডেণ্ট সাহেব বিপদ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন।"

* * * *

একটি সংবাদে প্রকাশ পূর্ব পাকিস্তানকে নাকি ভাগ করিবার ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা হইতেছে।—"প্রথম যোগ হলো, তারপর এলো বিয়োগ, তারপর চেষ্টা হলো হরণ-পূরণের। এবারে কাজে কাজেই ভাগ। কিন্তু ভাগে পাশ করলেই কৃতিত্ব হয় না সুতরাং এর পর ভগ্নাংশ এবং ক্রমে কাঠায় কাঠায় ধূল পরিমাণ"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

পাকিস্তানের সংগে বিলাতের টেস্ট খেলা প্রথমদিকে বৃষ্টির জন্য হয় নাই। আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন—"অনেক ক্ষেত্রেই পাকিস্তানকে প্রথমদিকে কোনো টেস্টই খেলতে হয়নি; ভাঙ্ খেয়েছেন তারা কিন্তু বরাবর কড়ি গুণেছেন নিধিরা!"

* * *

ভেজাল দ্রব্য বিক্রয়ের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করার জন্য নাকি কলিকাতার মেয়রকে প্রাণনাশের ভয় দেখাইয়া কে বা কাহারা একটি গৈবি চিঠি লিখিয়াছেন।—"কিন্তু খুন গুম করা সহজ নয়; তার চেয়ে তাঁরা ঘি-তেল-চা যা-হয় একটা-কিছু বিনামূল্যে মেয়র সাহেবকে খাওয়াতে থাকুন, কালক্রমে দেখা যাবে তাতে সাপ মরবে, অথচ লাঠিও ভাঙবে না"—বলিলেন বিশু খুড়ো।

* * * *

কী করিয়া ভালো বক্তা হওয়া যায়—সে সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ

করিলাম।—"কিন্তু তার চেয়ে কী করে বক্তৃতা দেওয়ার লোভ সম্বরণ করে মৌন থাকা যায় সেই কৌশল আয়ত্ত করাই বর্তমানে দরকার, কেননা দেখা যাচ্ছে আজকাল বক্তার সংখ্যা শ্রোতার সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে"—বলে শ্যামলাল।

* * * *

করিমগঞ্জের এক সংবাদে প্রকাশ সেখানে নাকি একটি কুকুর এবং একটি শেয়ালের মধ্যে প্রণয় জন্মিয়াছে।—"সংবাদটা নিশ্চয়ই খুব অদ্ভুত, অবশ্য যদি এর পেছনে কোন রাজনৈতিক চাল না

থেকে থাকে। রাজনীতি ক্ষেত্রে তেলে-জলে মিশ্ খাওয়া গোছের প্রণয়ের খবর অবশ্য তেমন নূতন-কিছু নয়"—বলে শ্যামলাল।

* * * *

শুনিলাম সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে একাধিক পত্নী গ্রহণ উচিত কি না সে সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে; কেহ কেহ বলিয়াছেন একাধিক পত্নী গ্রহণ অন্যায় আবার কেহ এই ব্যবস্থা সমর্থনও করিয়াছেন।—"কিন্তু আমরা বলি শুধু সরকারী কর্মচারীদের বেলাতেই এই কড়াক্কড় কেন? তিন শত পয়ষট্টিটি বিয়ে করে যারা বছরের তিনশত পয়ষট্টি দিন শ্বশুরালয়ে অবস্থানের গৌরবময় ঐতিহ্যে অতীতের ইতিহাসকে সমুজ্জ্বল রেখেছেন, সেই জাতির জাতীয় গভর্নমেণ্টের আমলে জাতীয় সংস্কৃতিকে পর্যুদস্ত করার এই প্রচেষ্টা কেন?"...... বক্তা তাঁর পল্লবিত ভাষায় আরো যেন কী বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় ভিড়ের মধ্য হইতে কে সোজা বাংলায় বলিয়া উঠিলেন—"একাধিক পতি গ্রহণের রেওয়াজ একবার চালু হলে বাছাধনরা আপনি ঢিট্ হয়ে যাবেন!!"

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আশ্রমে এসে দেখি, রুক্মিনি। গায়ে তার গেরুয়া নেই। পরেছে নিজের শাড়ী। তার রূপের ছটা আখড়ার ঘরে-মন্দিরে। শুধু দেখতে পেলাম না তার স্বামীকে।

মোহান্ত ডেকে বলল, 'বদরিনাথ দর্শনে যাবে না তুমি?'

রুক্মিনি হাসল। সে কি হাসি! সারা দেহ ভরে তার এক বিচিত্র আনন্দ যেন ঝরে পড়ছে। রূপ তার দ্বিগুণ আলোয় উঠেছে ভরে। বলল, 'না বাবা! এখানে থেকেই তাকে সেবা করে যাব। তোমরা আমাকে আশ্রমে থাকতে দাও। আমি ভগবানের সেবা করব।'

এরকম অনেক ছিল বাবুজী। ঘর ছেড়ে আসা অভাগিনী চিরজীবন আশ্রমের সেবা করে কাটিয়ে দিয়েছে। আশেপাশের গাঁয়ের অনেক বউ-ঝি সারাদিন কাজ করে আশ্রমে। সন্ধ্যা হলে ফিরে যায় ঘরে। কিন্তু এই আগুন কোথায় রাখা হবে সন্ন্যাসীর আখড়ায়? মোহান্ত জিজ্ঞেস করল, 'তোমার স্বামী কোথায়?' বলল, 'তাকে দেখতে পাচ্ছিনে বাবা।'

সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেউ বললে থাকুক। আপত্তিও ছিল কারুর কারুর। কিন্তু ব্যাপারটার কোন ফয়সালাই হ'ল না। সে থেকে গেল আশ্রমে।

মুখে কেউ কিছু বলল না; কিন্তু ভেতরে ভেতরে সকলেই কৌতূহলিত। সন্দেহ ঘনীভূত হল। সকলেই চোখে চোখে রাখে রঘুনন্দনকে। আমিও। সবাই ওৎ পেতে আছি। কবে একদিন ধরে ফেলব রঘুনন্দনের অপকীর্তি।

কিন্তু বাবুজী, রঘুনন্দন সে ধার দিয়েও গেল না। না, সে জটা মুড়োয়নি, ছাড়েনি বিভূতি লেপন। কিন্তু সে মানুষটি আর নেই। সকাল-সন্ধ্যায় পূজো-অর্চনায় মন নেই তার। পদে পদে গাফিলতি। সেজন্য কোন অনুশোচনা নেই। বাওরা সন্তের মত দিবানিশি শুধু গান, আত্মভোলা হাসি। ঘোরে এখানে সেখানে। সে ঘোরে বাইরে বাইরে। রুক্মিনি ঝাঁট দেয় আখড়ার উঠোন, লেপাপোছা করে, জল তোলে, প্রসাদ পায়। কতদিন গেছি রঘুর পেছনে পেছনে। সে যেত নিরালায়। গান গাইত আপন মনে, 'আমার পাখায় যেদিন হাওয়া লাগবে, সেদিন ছুটে যাব তোমার খোঁজে। কখনো বসব তোমার গিরিশৃঙ্গে, ভাসা মেঘে ঠোঁট চুবিয়ে মেটাব আমার পিয়াস। তোমার এই ভুবনের কানে কানে শোনাবো তোমারই রূপ গাঁথা।' গান শোনার জন্য ভিড় করত লোক তার পিছে। তার মত জ্ঞানী পুরুষের এই রূপ দেখে অবাক হ'ল অনেকে।

আমি খালি ভাবতাম, ওই গানের মালা কে পরিয়ে দিল তার গলায়। কে খুলে দিল এই গীত-নির্ঝরের উৎস-মুখ। সন্ধ্যাবেলা মানসীপূজায় বসে, গুরু-মূর্তি কল্পনা করতে গিয়ে বার বার দেখি রঘুনন্দনকে। কানে শুধু তারই কথা,—

ব্রহ্ম নামে একটি ফুল ফুটেছে।
তার গন্ধ পাগল করেছে আমাকে॥
সে ফুলের রূপে আগুন আছে।
তবু আমার চোখ জ্বলেনি।
শুধু আমার অন্ধ হৃদয়ে জ্বালিয়ে
দিয়েছে বাতি॥

বাবুজী, রুক্মিনির সঙ্গে যখন দেখা হ'ত রঘুনন্দনের, তখন তারা নমস্কার ক'রত পরস্পরকে। কিন্তু রুক্মিনি চঞ্চল হয়ে উঠত। বুঝতে পারতাম রঘুনন্দনের সঙ্গ-কামনায় পাগলিনী হয়েছে সে। লোকলজ্জার ভয় ভুলে কোন কোন সময় ছুটে যেত রঘুর পেছনে পেছনে। রঘু হেসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে ফিরে আসতে বললেই ফিরে আসত সে।

বাবুজী, রঘুর প্রতি বিদ্বেষ অসম্ভব না কারুর। লজ্জার কথা, যাদের আসক্তি, তারা সকলেই রুক্মিনির প্রতি আসক্ত ছিল। গৃহী শিষ্যকুল আসত ঘন ঘন। নজর শুধু ওইদিকে। আখড়ারও বড় অস্বাভাবিক অবস্থা।

হঠাৎ একদিন আখড়ার সকলেই শুনল, রঘু গাইছে, 'হে ব্রহ্ম ও জল, তোমার নাম রুক্মিনি। হে পৃথিবী, তোমার নাম রুক্মিনি। এই হিমাচল ও গঙ্গা, এই বিহঙ্গ ও গাছ, এই আকাশ ও মাঠ, সকলেই রুক্মিনি নামে ও রূপে সুন্দরী। হে অবধূত-হংস, তুমি আমার দেহস্থিত একটি নাড়ি। তোমারও নাম রুক্মিনি। এবার আমি যাব তোমার সন্ধানে। সময় হয়ে গেছে আমার। ডাক পড়েছে।'

বাবুজী, আরও তাজ্জব, নির্ভয়ে রুক্মিনি এসে ফুল জল, চন্দন দিল রঘুর পায়ে। সকলে স্তম্ভিত। অনেকে রেগে উঠল। মোহান্ত বলল, অন্যান্য আখাড়ায় খবর দিতে হয়। আমাদের আছে অনেক আশ্রম, নির্বাণী, নিরঞ্জনী, অটল, যুজা, আনন্দ। সকলের মতামত প্রয়োজন।

কিন্তু তার দরকার হ'ল না। সেই রাত্রি থেকে রঘু নিরুদ্দেশ। রুক্মিনি রয়েছে। চকিত হরিণীর মত কেবলি খুঁজছে। সে যাকে খুঁজছে, আমরা, বিশেষ আমি খুঁজেছি তন্ন তন্ন করে। সারা হরিদ্বারে পাত্তা মেলেনি তার। তাকে কে পাগল করল বুঝলাম না, কিন্তু সে আমাকে পাগল করে কাঁদিয়ে চলে গেল।

দু'মাস ধরে এই ব্যাপার চলছিল। সকলের মনে যে অস্বস্তিটুকু ছিল

রুক্মিনির জন্য, দু'মাস পরে তার স্বামী স সেটুকু দূর করল। তার স্বামী ল। একলা নয়। সঙ্গে আরও য়েকজন লোক। ছি ছি ছি, আখড়ার নাম। সন্ন্যাসীরা জোর করে রেখে য়েছে নাকি তার বউকে। তাই সে ড়ে নিতে এসেছে। যাদের নিয়ে সেছে, তাদের মধ্যে দুজন তলোয়ারধারী শিখও ছিল। লোকগুলি যে নিষ্ঠুর প্রকৃতির, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না।

কে রেখেছে? নিয়ে যাক রুক্মিনিকে। আমরাও তাই চাই। কিন্তু বেঁকে বসল রুক্মিনি। সে যাবে না। তা বললে তা হয় না। এ ব্যাপারের পর আখড়া তাকে এমনিতেই সরিয়ে দেবে। বদনাম যা হওয়ার, তা তো হয়েছেই।

শেষে ওরা জোর করে নিয়ে গেল রুক্মিনিকে। বাবুজী, মিথ্যে বলব না, আমার বুকে বড় বেজেছিল। কেন বেজেছিল? তাহলে বলি, কে অস্বীকার করবে, সে ছিল আমাদের প্রিয়তম রঘুনন্দনের সাধন-প্রেয়সী। রঘু-রুক্মিনি যে একাকার হয়েছিল। বাবুজী, কুলাচারে নারীর সাথ-মধ্যে হৃদয় ও প্রেমের কিছু আছে কিনা জানিনে। থাকলেও বিশ্বাস করতে মন চায় না। ও শুধু সাধন-মার্গের যান্ত্রিক ক্রিয়া।

কিন্তু রঘু আর রুক্মিনি। কুলাচারের চেয়েও প্রেম বড় হয়ে উঠেছে সেখানে। বাবুজী, হৃদয়ের রসহীন যে চারাগাছ উঠেছিল রঘুর মাথায়, রুক্মিনি তাতে ফুল ফুটিয়েছিল। রঘুর জ্ঞান ও হৃদয়ের মাঝামাঝি বন্ধ দরজার চাবি নিয়ে এসেছিল রুক্মিনি। এর পরে রঘুকে কে কি দিয়ে রাখবে বেঁধে।

বলে মহাবীর উঠে দাঁড়াল। কথা যে এখানেই শেষ করবে, একেবারে বুঝতে পারিনি। বললাম, 'তারপর?'

'তারপর কি বাবুজী?'

'রুক্মিনির কি হল?'

মহাবীর জবাব দিল, 'কি হল, তা ঠিক বলতে পারিনে বাবুজী। তবে বছর না ঘুরতে দেখলাম, রুক্মিনি মনিয়াবাঈ হয়েছে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ক'রে?'

সে বলল, 'তাও ঠিক জানিনে। যতদূর শুনেছি, তা'তে মনে হয়েছে, রুক্মিনির স্বামীর সঙ্গে যে লোকগুলো এসেছিল তাকে উদ্ধার করতে, তাদেরই কীর্তি এটি। রুক্মিনিকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি তার স্বামী। তার সাঙ্গোপাঙ্গরা নিয়ে তুলেছিল একটা ডেরায়। শুনেছি, সেখানে ছিঁড়ে খাওয়া হয়েছিল তাকে। আর তার কাপুরুষ স্বামী পালিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে।

'বাবুজী রুক্মিনিকে উদ্ধার করার কিছুই ছিল না। রঘুনন্দন তো আগেই চলে গিয়েছিল। তবু, বদনাম রটে গিয়েছিল আমাদের আশ্রমের নামেই। এমন কি, আমাদের বিভিন্ন আখড়ার দু' একজন রঘুকে খুঁজে ধরে নিকেশ ক'রে দেওয়ার প্রস্তাব পর্যন্ত করেছিল। সেটা যত না আখড়ার দুর্নামের জন্য, তার চেয়েও বেশী ধর্মাচরণে বিরুদ্ধতার জন্য। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। তা' হ'লে ঘটনা অনেক দূর গড়িয়ে পড়ত। আর রুক্মিনি! তার তো অপরাধের সীমা ছিল না। আখড়ার থেকে তবু-বা তার স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিল। কিন্তু, অতগুলো লোকের দ্বারা যে দিনের পর দিন ধর্ষিতা হয়েছে, তাকে কি কখনো ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। সে পালিয়ে বেঁচেছিল। তবে, এর জন্য সে আর ডাকেনি লোক লস্কর, যায়নি পুলিশের কাছে। জানিনে, কে তাকে প্রতিষ্ঠা করে দিল লক্ষ্ণৌয়ের বাঈজী মহলে। কিন্তু নামে তার সারা শহর চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।'

একটু থামল মহাবীর। দাঁড়িয়েছিলাম দুজনেই। সে দূরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখেছিলাম একদিন। খুবই কৌতূহল ছিল। সেবার লখনৌ গিয়েছিলাম। তখন দুনিয়াজোড়া যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। শহরের বাতিগুলো সব বোরখা পরেছিল। অন্ধকার। কানের পাশ দিয়ে একটা কথা শুনলাম, 'মনিয়াবাঈ দাঁড়িয়ে আছে।' চমকে উঠল বুকের মধ্যে। কোথায়? ফিরে দেখলাম, সামনে রাজ-ইমারত। দোতালা কুঠি। উপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রুক্মিনি। রুক্মিনি নয়, মনিয়াবাঈ। একটু আলো এসে পড়েছে ঘরের থেকে। দেখলাম, আঁধারে বিদ্যুৎ শিখা, স্থির। বাতির সামনে কয়েকটি মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। দোতোলার বারান্দায় ছায়ার মত ঘুরছে কয়েকজন লোক। ব্যাপারটা কি হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারলাম না। শুধু দেখলাম, ছায়াজগতে এক মূর্তিমতী রূপসী। উর্বশী। সেখানে কি, অন্য কোথাও বাজছিল সরোদের চাপা বাজনা। পুরুষ গলার চাপা হাসি। কিন্তু মনে হল, বাঈজী যেন অন্য জগতে রয়েছে। কিসের ঘোরে সে আচ্ছন্ন। কিংবা, সে শুধু তার বাঈজীসুলভ অভিনয়। তার রূপ-পাগলদের একটু নাচানো। সরে এলাম তাড়াতাড়ি। রঘুনন্দনের কথা মনে পড়ছিল। আমার রঘুনন্দন।"

থেমে আবার বলল, 'তারপর রামজী-দাসীকে দেখছি আজ কয়েক বছর। জানিনে, এর কি দরকার ছিল। এতে

করে ধর্ম কতখানি এগুল, জানিনে। কেন সে ওই জীবন ছেড়ে এল চলে। বাবুজী, মানুষের মন। রামজীদাসী আজ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের এক রহস্যময়ী নারী। তার ধর্মপ্রচারে কতখানি কাজ হবে, আমি বুঝিনে। সাধারণ মানুষ দূরের কথা, সাধু সন্ন্যাসী মহলে তাকে নিয়ে রীতিমত আলোচনা হয়। নিজের চোখে দেখে এলেন। সে যে আগুন। আগুনের শিখা। কোন্‌দিন আবার কি প্রলয় উপস্থিত হবে, কে জানে। আমার সেই ভয়।

'তবে যতদূর শুনি, সে এখন নাকি সবসময়েই নামের ঘোরে থাকে। অষ্টপ্রহর নামকীর্তনই তার কাজ। লোকে বলে, রঘুনন্দনের সঙ্গে নাকি তার দেখা হয়েছিল। সেই থেকে সে এ পথে এসেছে। আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। এখনো করিনে। রঘুনন্দন আর রামজীদাসী আকাশ পাতাল তফাৎ। তা'ছাড়া আর একটি কথা শুনেছি...'

মহাবীর থামল। বললাম, 'কি?' মহাবীর বলল, 'গুজব বলেই মনে হয়। ওই যে দেখলেন সরোদ বাজাচ্ছে একটি লোক। লোকটি ছিল একজন সরকারী কেরানী। ভাল সরোদের হাত। ওটি ওর সাধনার জিনিস। ভারী ওস্তাদ বাজিয়ে। কোন বাঈজী ওকে পেলে বর্তে যেত। লোকটি নাকি নিজের ইচ্ছেয় মনিয়াবাঈয়ের ওখানে যন্ত্র বাজাতে যেত। সে-ই নাকি মনিয়াকে এ পথে নিয়ে এসেছে। সকলেই তো কেটে পড়েছে আজ। শুধু ওই লোকটি ছায়ার মত, ওই মিঠে যন্ত্রটি কাঁধে নিয়ে ছায়ার মত ফিরছে রামজীদাসীর সঙ্গে সঙ্গে। শুনতে পাই, লোকটি নাকি খুব ভাল। একরকম মৌনব্রতী বলা যায়। কথা বলে না কারুর সঙ্গে। এমন কি, রামজীদাসীর সঙ্গেও নাকি তাকে কেউ বড় একটা কথা বলতে দেখে না। ওই সরোদের সুরেই তার কথা। ওটি না বাজলে, রামজীদাসীর রাম-ভজনের নাচ আসে না, পা ওঠে না।'

ব'লে মহাবীর একটু হাসল। বলল, 'বাবুজী, অনেকেই জানে এসব কথা, তাই বললাম। এবার আমি চলি।'

বললাম, 'আপনার রঘুনন্দনের'—

আবার হাসল সে। সে হাসির অনেক অর্থ। বলল, 'আমার রঘুনন্দন। ঝুটা বলেননি। তবে আমার একলার নয়। আমাদের অখড়ার সুখের সংসারে সে ভাঙন ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। বদনামে নয়, একটা নতুন ভাবের ঘোর এনে দিয়েছিল সে।' বলতে বলতে দেখলাম, মহাবীরের মুখে একটি চাপা বেদনার হাল্‌কা অন্ধকার চেপে বসল। চাপা গলায় বলল, 'সে যে আমাকে পাখীর গান শুনিয়ে গেল, সে যে আমাকে বিশ্বরূপ দেখিয়ে গেল, সে যে আমাকে এক পাগল প্রেমের পথ দেখিয়ে গেল, সে-ই হ'ল আমার কাল। বাবুজী, আমি আর সন্ন্যাসী নই। ঘরে ফিরে যাওয়ার মনস্থ করেছিলাম, পারিনি। সেই সহজ আর অসীমকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। ভাবি, সহজ আর অসীম, সে যে বুকের রসে মাথায় ফুল ফোটানোর সাধনা। সে যে বড় যন্ত্রণার, বড় ব্যথার, মহা সুখের, মহা আনন্দের। কোনটাই যে খুঁজে পাইনে।

'বাবুজী, কুলাচারীর চক্র সাধনে হৃদয়ের স্থান কতটুকু আছে, জানিনে। কিন্তু এ জৈব-সাধনই ধর্মান্তরিত ক'রে গেল সন্ন্যাসীকে। ভেঙে দিয়ে গেল তার আচার বিচার। তন্ত্র সাধনায় অভ্যস্ত হয়নি সে। তার জ্ঞানের সুধা হৃদয়ের রসে মিশে ভেসে গেল। যেমন ক'রে হিমালয় থেকে নেমে ওই গঙ্গা চলেছে দু' কূল ভাসিয়ে। প্রেম ও সহজের ঐ তো পথ। রুক্‌মিনির সঙ্গে রঘুনন্দনের প্রেম ছাড়া আর কি ছিল? কিছু না। নইলে আচারের নিগড় ভাঙতে কি ক'রে? তবু ভাবি, একদিনের যে দেখা রুক্‌মিনির সঙ্গে। এত আলোড়ন আসে কি ক'রে? কি জানি। প্রেমের কাজই নাকি অমনি। কখন কোন্‌দিকে চলে, কে জানে। গতি তার নিমেষে সব ওলট পালট করে দিয়ে যায়।'

বলে হেসে উঠল আবার। কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, 'নমস্তে বাবুজী।'

ব'লে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না ক'রে পূবদিকে চলে গেল। অদূরেই নয়নজুলির মত একটি অল্প গভীর খাদ বয়ে গিয়েছে উত্তর দক্ষিণে। আশেপাশে তখনো চলাচল করছে অনেক লোক। সেই বালি খাদের আড়ালে, লোকারণ্যে হারিয়ে গেল মহাবীর।

সুদীর্ঘ কাহিনী। যেন কোন্ অতীত যুগের কাহিনী শুনলাম। সব কথার সঠিক অর্থ অনুমান করতে পারিনি। কি ক'রে পারব। আমার নেই কোন আধ্যাত্মবাদের অনুভূতি। নিতান্ত বিজ্ঞানাশ্রিত মানুষ। জীবনে আছে অনেক বিড়ম্বনা। তার মাঝে ফাঁকতালে এসেছি ছুটে। এসেছি জনসমুদ্রের মহাসঙ্গমে।

তার মাঝে এই কাহিনী, যেন কোন্ অতীত অধ্যায়ের পাতা মেলে দিল আমার সামনে। যে রক্তমাংসের উচ্চ নীচ মানুষ নিয়ে আমাদের কারবার, এ কাহিনীর নায়ক নায়িকারা সে আওতার বাইরে। বেদাশ্রিত সন্ন্যাসীর প্রেম, সে-ই তো বিচিত্র। অথচ চোখে দেখে এসেছি রামজীদাসীকে। আধ্যাত্মবাদ না বুঝি, রঘুনন্দনের সঙ্গে রুক্‌মিনির প্রেম অনুমান করতে পারি। যে প্রেম তাকে ঘরছাড়া করেছিল। ঘর-ই তো। আখড়া, আচার, নিয়ম, পূজো আর খাওয়া, এই মিলে যে অভ্যাসের ঘর তৈরী হয়েছিল, সেই ঘর ভেঙে গিয়েছিল তার।

রঘু-রুক্মিনির প্রেম আমাদের প্রেম । তবু পুলক শিহরণে কত বিচিত্র ন তো আমাদেরও ঘটে থাকে। প্রেমে নতুন অনুভূতির বীজ অংকুরিত হয় ন। কত সময়, বেলা শেষের রক্তিম কাশ দেখে চোখ ভুলে যায়। হাওয়া-লা শস্যের হরিৎ সাগরে নিজের প্রাণে ণে লাগে ঢেউ। দূর গ্রামের কোন্ ক অনামী স্টেশনে, ডাগর চোখো কিষাণী মেয়েটিকে দেখে মনে আমাদের ছোঁয়া াগে অপরূপের। স্টিয়ারিং হুইল্ চেপে ধরা যন্ত্রী, আর উদয়াস্ত কলম পেষা ানুষের দল আমরা আচমকা এক সময়ে গুন্গুনিয়ে উঠি,

এমনি করেই যায় যদি দিন যাক্ না।
মন উড়েছে উড়ুক না রে,
মেলে দিয়ে গানের পাখ্না॥

নি দিন যাবে না ওমনি করে। জানি, নের রংগীন পাখা মেলে থাকবে না ানিশি। তবু, জীবনযুদ্ধের মাঝে, মনি করেই আমরা হৃদয়ের একটি দিক, াঁকড়ে ধরে রয়েছি। হাজার দুঃখ যন্ত্রণা বেদনার মধ্যেও ওই বস্তুটি ছাড়তে রাজী নই।

রুক্মিনির প্রীতি রঘুর প্রেম, আমাদের চোখে কিছু রহস্যময়। রহস্যে ঘেরা। মনো ব্রহ্মেতি ব্যাজাত্। কথাটি আমাদের মনে সৃষ্টি করে রহস্যবাদের।

কিন্তু সৌন্দর্য-পিপাসুর চোখে এক নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছিল। যে দিক তার চোখে বুলিয়ে দিয়েছিল শিল্পীর অঞ্জন। যে চোখ গাছগাছালি দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। যে প্রাণ ভুলেছিল বিহংগ-কুলের গানে। এতো রক্তমাংসেরই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি। রঘুর সেই সহজ সুন্দরের উপাসনা, সে তো আছে সকলের মনে মনে। আছে অন্যরকমে। আছে সকল বুকে বুকে। রং-এর হেরফের ক'রে আছে।

নইলে ভুলি কেন বাউলের গানে। বাউল তো আমাদের কাছে সাধক নয়। সে শিল্পী। মনের মানুষের খোঁজে সে ফিরছে। ফেরার আনন্দ-ই তার কাছে বড়। সেই আনন্দে গান গেয়ে উঠছে তার মনেরই মানুষ, 'আমি কী গান গাব যে ভেবে না পাই॥ সে কণ্ঠে কণ্ঠ দিয়ে আমরাও 'উঠি যে ফুকারি ফুকারি।'

বুঝলাম, বেদাশ্রিত সন্ন্যাসী রঘু বাউল হয়েছিল। আর রুক্মিনি, রামজীদাসীর অপূর্ব রূপের মাঝে রয়েছে কোন্ রহস্যময়ী, তা কে জানে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে এ যেন কোন অতীত যুগের নায়িকা এসেছে এ যুগের মানুষের সামনে। কে জানে তার হৃদয়তলে কোন্ রহস্যের আধার। তার রক্তিম ঠোঁটের কোণে বংকিম রেখায় কোন্ গূঢ়তত্ত্বের উঁকিঝুঁকি।

কিন্তু সরোদ হাতে সেই মানুষটি হঠাৎ বড় হয়ে উঠল চোখের সামনে। সেই সরকারী কেরানী। যে সব ছেড়ে, সরোদের বুকে সুর বাজিয়ে ফিরছে রামজীদাসীর সংগে সংগে। যার সরোদের ঝংকার বিনা রামজীদাসীর সুঠাম পদ-যুগলে আসে না নাচের জোয়ার।

বহুরূপী ভারতের এও এক রূপ। এই কাহিনী। যা শুনলাম, তা'তে সারা বালুচর যেন এক বিচিত্র ঝাপসা চেহারায় ভেসে উঠল চোখের সামনে।

যাই, ফিরে গিয়ে দেখি আর একবার সেই সরোদবাদককে। কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। ভেংগে গিয়েছে হয়তো আসর।

এখনো চারদিকে অনেক মানুষ। প্রচণ্ড শীত।' হাল্কা কুয়াশায় ছায়ার মত চলেছে সব আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে। বোঝা যায়, তাঁবু কোটরের দিকেই সকলের গতি। আর দেরী সইছে না কারুর। সারাদিনের পুণ্য সঞ্চয় এবার শীতের কামড়ে কাত্ করে দিয়েছে।

আকাশে চাঁদ এসেছে প্রায় মাঝামাঝি। মেঘ ভেসে চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। আকাশের কোন্ সীমানায় গর্জন করে অদৃশ্য উড়ো জাহাজ।

সপাং ক'রে চাবুকের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। বালুচরে ঢুকেছে টাংগা চাকা বসে যাচ্ছে। ঘোড়া দৌড়ুতে পারে না। যাত্রী ও যাত্রীনিরা সকলেই ঘু ঢলুঢলু। তাকিয়ে দেখি, চাবুক কোমে গুঁজে টাংগাওয়ালা ঝাঁপিয়ে পড়েছে চাকা উপর। বুঝলাম, একটু বেশী বালি গভীরে ডুবে গিয়েছে চাকা। চাকাটির প্রতি কটূক্তি করে, নিজের হাতে চাকা টেনে টাংগা এগিয়ে নিয়ে চলল সে। শুনলাম জড়ানো যাত্রী কণ্ঠ, 'ক্যায়া, বিমারীবাল ঘোড়া লে আয়া? ভাড়া ঠিক নাি মিলেগী।'

টাংগাওয়ালা যা বলল; তার মানে, 'হ্যাঁ, কুম্ভমেলায় ভগবান খালি তোমাদেরই ঘাড়ে চেপে রয়েছে। আর আমি শালা খালি হাতে ঘরে ফিরে যাব।'

কোন জবাব শুনতে পেলাম না। টাংগাওয়ালার কথা শুনে হাসতে যাচ্ছিলাম। হাসতে পারলাম না। সত্যি, পুণ্য সঞ্চয় তো নয়, যেন সওদাগর এসেছে স্বর্ণরেণুর সন্ধানে।

ফিরতে যাব। কে একজন সামনে এসে দাঁড়াল। আমার কাছেই এসেছে, বুঝলাম। কেননা, লোকটি তার বড় বড় দাঁত বের ক'রে গোল গোল চোখে তাকাল আমার দিকে। কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই হিন্দীতে জিজ্ঞেস করল, খানিকটা চাপা উল্লসিত গলায়, 'কিছু পাওয়া গেল?'

অবাক হলাম। লোকটির আপাদ-মস্তক দামী শাল দিয়ে ঢাকা। বয়স অনুমান করা মুশকিল। কুহকী চাঁদের আলোয় যেন এক ষড়যন্ত্রীর মুখ ভেসে উঠেছে সামনে। নিশ্চয়ই লোক ভুল করেছে।

বললাম, 'আমাকে বলছেন?'

লোকটি বিগলিত গলায়, ঘাড় নেড়ে বলল, 'আরে মহারাজ, তবে আর কা'কে বলব?'

আরও বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কি বলছেন?'

লোকটি অদ্ভুত ভঙ্গিতে তেমনি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কিছু মিলল?'

কি মিলবে, কিছুই বুঝতে পারলাম না। বরং খানিকটা ঘাবড়েই গেলাম। বললাম, 'কিসের কি মিলবে, বুঝতে পারছি না তো।'

লোকটি এক মহা-বুদ্ধিমানের মত ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বলল, 'কেন গোপন করছেন মহারাজ। আমি যে সেই অনেক-ক্ষণ থেকে দেখছি। হুঁ হুঁ, ফাঁ[illegible] দেবেন কি ক'রে? আমাকে তো আ[illegible] দেবেন না। ওকি আর কেউ কাউকে দেয় কিন্তু, কিছু পেলেন কিনা, সেইটি জিজ্ঞেস করছি।'

একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, 'কি [illegible] তা বলছেন। কার কাছ থেকে কি পাব[illegible]

লোকটি বলল, 'কেন, এই যে দ[illegible] ঘণ্টা ধ'রে সাধুজীর সঙ্গে ক[illegible] বলছিলেন। ফিস্ ফিস্ ক'রে [illegible] বলছিলেন সাধুজী। হুঁ হুঁ, বাবুজ[illegible] সব দেখেছি। আপনার কপাল ভা[illegible] তাই ওরকম পেয়েছিলেন। কি[illegible] মহারাজ, একটু বলে যান, কি পেলে[illegible] থোড়া বহুত।'

আশ্চর্য! হাসব কি কাঁদব, বু[illegible] পারলাম না। কি বিচিত্র এই [illegible] মানুষের মেলা।

(ক্রমশ)

যে নাম শুধু

শ্রীসুধীরকুমার রায়

আমার মুখে তোমার কানে
যে নাম শুধু বাজতো,
কোথায় গেল—হারিয়ে গেল
পাইনে খুঁজে আজতো।

আমার মুখে তোমার কানে
যে সুর শুধু ঝরতো,
পরান দু'টি সেই সুরেতে
গোলাপ হয়ে ফুটতো।

পাইনে খুঁজে তোমার দিশা
কান্না শুধু কান্না,
হৃদয় জুড়ে গোপন ব্যথা
সয়না প্রাণে আর না।

কেউ জানে না যে সব কথা
তুমিই সে সব জানতে,
সোহাগভরা রূপের ছোঁয়া
হৃদয় জুড়ে আনতে।

আর না সখি, দোহাই ওগো
সবই যদি মিথ্যে,
বেদন-ঝরা স্মৃতির নেশা
তবুও কেন চিত্তে!

পাইনে খুঁজে হৃদয় তলে
মিলিয়ে গেল আজ তো,
আমার মুখে তোমার কানে
যে নাম শুধু বাজতো।
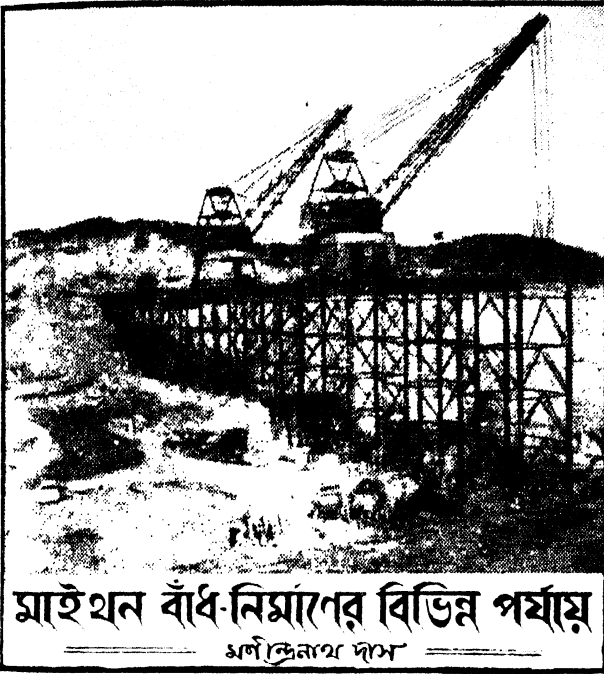
মাইথন বাঁধ-নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়

মণীন্দ্রনাথ দাস

মাইথন কেন্দ্রের বাঁধ-নির্মাণের কাজকে মোটামুটি ছয়টি গোষ্ঠী বা পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে।

(১) বরাকর নদীর উভয় তীরে মাটি ফেলে দুইটি সংযোজক-বাঁধ বা 'ডাইক্' নির্মাণ।

(২) মূল নদীর বুকে ইস্পাতের পাত বসিয়ে তার উপর মাটি ফেলে প্রধান বাঁধ প্রস্তুত।

(৩) নদীর দক্ষিণ তীরে সমান্তর খাল কেটে এবং সেই খালের উপর জল-নিয়ন্ত্রণের জন্য দরজা বা গেট বসিয়ে কন্‌ক্রিট অথবা জমানো পাথর-এর বাঁধ নির্মাণ।

(৪) বাঁধ বাঁধাকালীন নদীর গতি ফিরিয়ে জল বের করে দেবার জন্য এবং পরে ঐ জলধারা নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কাজে লাগানোর জন্য নদীর বাম তীরে সুড়ঙ্গ বা 'টানেল' কাটা।

(৫) মাটির নিচে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বা underground power house নির্মাণ।

(৬) ৬০,০০০ হাজার কিলোওয়াট শক্তিবিশিষ্ট জল-বিদ্যুৎ-উৎপাদন যন্ত্র বসানো।

কর্ম-সংযোজনা:

মাইথন বাঁধের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'লো যে, নদীর বুকে প্রধান বাঁধ হবে মাটি ফেলে বাঁধা, আর জল-প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করার জন্য নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে যে সমান্তর খাল কাটা হবে, সেই খালের উপর প্রধান বাঁধের সংলগ্ন ও পরিপূরক হিসাবে ঢালাই করা পাথর দিয়ে পাকা বাঁধ প্রস্তুত করা। ভারতবর্ষে এ পর্যন্ত যে সকল বাঁধ নির্মাণ হয়েছে বা পরিকল্পিত হয়েছে, তার সবই হলো, নদীর বুকের প্রধান বাঁধ হ'লো জমাট পাথরের পাকা বাঁধ এবং পাকা বাঁধের সংযোজক বা পরিপূরক হিসাবে হয়েছে মাটির বাঁধ। এদিক দিয়ে মাইথন বাঁধ পরিকল্পনার মৌলিকত্ব রয়েছে যথেষ্ট। আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'লো যে, কেবলমাত্র সুড়ঙ্গ কাটার কাজটি ছাড়া আর সব কাজই হবে কর্তৃপক্ষের নিজেদের বিভাগীয় তত্ত্বাবধানে। এত বড় কাজ আর কোথায়ও বিভাগীয় তত্ত্বাবধানে হয়নি—বড় বড় ঠিকাদার মারফৎ হয়েছে। ছোট খাটো ঠিকা কাজ এখানেও দেওয়া হয়, তবে তার সংখ্যা খুবই কম। তিলায়ার বাঁধের বেলাও উহা কর্তৃপক্ষের নিজ তত্ত্বাবধানে হয়েছে, যদিও সেই বাঁধের পরিধি মাইথন অপেক্ষা অনেক ছোট।

কর্ম-শৃঙ্খলা:

বিভিন্ন পর্যায়ের কাজগুলোকে নিম্ন পর্যায়ক্রমে সাজানো হয়েছে।

(১) 'ডাইভারসন টানেল' বা সুড়ঙ্গ কাটা;

(২) দক্ষিণ-তীরের সংযোজক বাঁধ বা ডাইক নির্মাণ;

(৩) নদীর বুকে মাটি ফেলে প্রধান বাঁধ প্রস্তুত এবং ঐ কাজের সঙ্গে সঙ্গে নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে সমান্তর করে খাল বা চ্যানেল কাটা;

(৪) খালের উপর কন্‌ক্রিট বা পাথরের পাকা বাঁধ প্রস্তুত;

(৫) বাম তীরে সংযোজক বাঁধ বা ডাইক তৈরি;

(৬) মাটির নিচে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ;

(৭) বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র বসানো।

সুড়ঙ্গ বা টানেল কাটা:

এই কাজটিকে আবার দুইটি উপ-বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১ম হলো—বাঁধের মেরুদণ্ডের উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে অর্থাৎ নদীর উজান ও ভাঁটি অংশে সুড়ঙ্গের মুখ কাটা এবং ২য় হলো—মূল সুড়ঙ্গ খনন।

মুখ দুটি কাটার কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে এবং শেষ হয়েছে ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে। এই কাজ শেষ করতে নদী গর্ভের ভেতর দিয়ে প্রায় ৩ লক্ষ ঘন-গজ পাথর কাটতে হয়েছে।

মূল সুড়ঙ্গ খননের কাজ আরম্ভ হয় ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে। এ কাজ
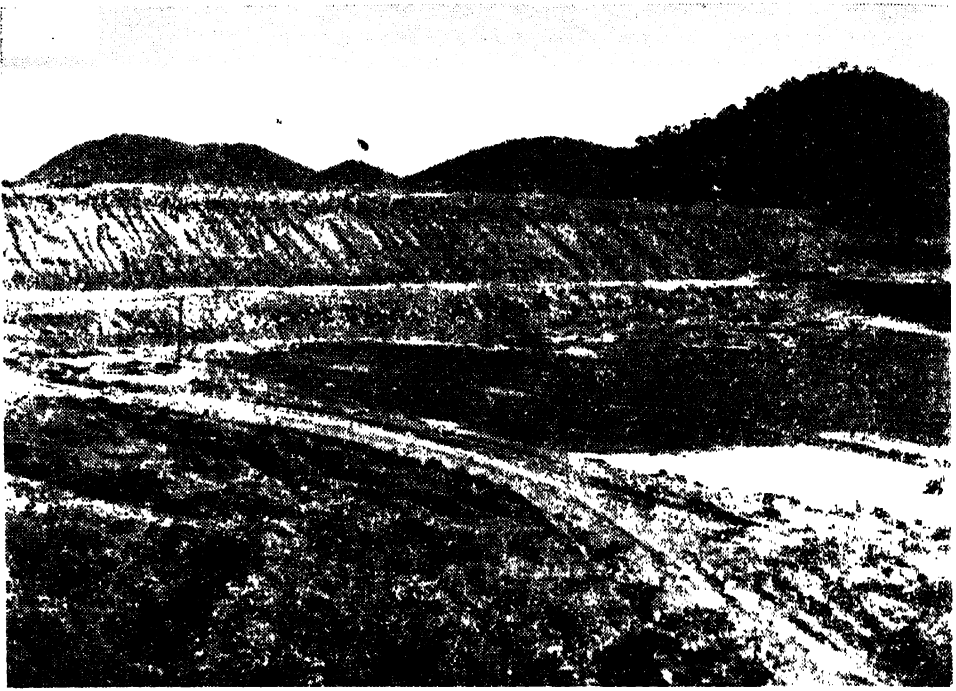
নির্মাণের পথে মাইথন বাঁধ। সামনের উ'চু মাটি ফেলে বাঁধা বাঁধের ওপাশে পাহাড় ঘেরা নদীর জল ধরে রাখা হয়েছে

শেষ হ'বার কথা ছিল ১৯৫২ সালের অক্টোবর অর্থাৎ ৭ মাসের মধ্যে। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে আয়ত্তবহির্ভূত এমন কতকগ্‌লি সমস্যার সম্ম‌্খীন হ'তে হয়, যার ফলে ডিসেম্বর-এর শেষভাগে অর্থাৎ আরও দ্' মাস পরে কাজ শেষ হয়। এই স্‌ড়ঙ্গটির পরিমাণ হ'লো ১১৫৫' ফ্‌ট দীর্ঘ, ৩১' ফ্‌ট থেকে ৩৬' ফ্‌ট প্রস্থ বা ব্যাস এবং গভীরতা ২৮' ফ্‌ট থেকে ৪০' ফ্‌ট।

দক্ষিণ সংযোজক বাঁধ বা 'রাইট ডাইক':

স্‌ড়ঙ্গ খননের সাথে সাথে এর কাজও শ্‌র্‌ হয়। এই বাঁধের জন্য প্রায় ৪ লক্ষ ঘন-গজ মাটি ফেলতে হয়েছে। বর্ষা শ্‌র্‌ হবার প্‌র্বে যে সময় ছিল তার সদ্ব্যবহার এবং যন্ত্রপাতি নিয়ে মাটি কাটার কাজে কর্মীদের অভ্যস্ত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে এ কাজে হাত দেওয়া হয়। এই সংযোজক বাঁধের উত্তর পার্শ্বে পাথর বিছানো এবং দক্ষিণ পার্শ্বে সমান করে ঘাস লাগানোর কাজ এখন দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।

মাটির প্রধান বাঁধ এবং জল নিষ্কাশনের খাল খনন

১৯৫২ সালের বর্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় এই কাজ আরম্ভ হ'তে খানিকটা দেরী হয়ে পড়ে। মাটি ফেলে বাঁধ বাঁধা এবং সাথে সাথে খাল খনন, এই উভয় কাজ পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কারণ, খাল কাটতে যে মাটি উঠবে, সেই মাটি ফেলেই বাঁধের কাজ এগোবে। অভিজ্ঞ স্থপতিবিদগণ নির্মাণ কাজের এই পর্যায়টিকে চরম পর্যায় বলে অভিহিত করেছেন, কারণ এই উভয় কাজের সফলতার উপরই নির্ভর করে সমস্ত কেন্দ্রের সফলতা। যদি উপযুক্ত গভীরতা পর্যন্ত খাল কাটা না হয়, তা হ'লে বাঁধের পাড়ের উচ্চতাও কমে যাবে, ফলে ঐ বাঁধ বর্ষার জলের গতিরোধ করতে পারবে না এবং যে মাটি ফেলা হয়েছে সবই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এর পরিণামে সমস্ত কাজই পণ্ড হয়ে যাবে। তাই অসীম সতর্কতা ও তৎপরতার সঙ্গে ১৯৫২ সালের ১৬ই অক্টোবর থেকে ১৯৫৩ সালের ১৫ই জ্‌ন এই আট মাসের মধ্যেই প্রায় ১৬ লক্ষ ঘন-গজ মাটি ও পাথর খ্‌ড়ে খাল কাটার কাজ শেষ করতে হয়েছে। কাজটি শেষ করতে সাতটি বড় বড় মাটি-কাটার যন্ত্র (Shovel) নিয়োগ করা হয়েছিল। ১৫ই জ্‌নের মধ্যে বাঁধের উচ্চতা (সম্‌দ্রপৃষ্ঠ থেকে) দাঁড়ায় ৪২০ এবং নদীবক্ষের উচ্চতা হ'লো ৩৫০। খালের পরিধি

ভাবে খনন করা হয়, যা'তে, বাঁধের চূড়া থেকে অনেক নীচু স্তর দিয়ে ৫,০০০ 'কসেক্' জল বেরিয়ে যেতে পারে।

বর্ষার পর বাঁধের কাজ আবার শুরু হয়, ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাস থেকে। পর্যন্ত বাঁধের শতকরা ৫৬ ভাগ কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। এ পর্যন্ত বাঁধের উপর ১৪,০০,০০০ ঘন-গজ মাটি ফেলা হয়েছে। আশা করা যায় ১৯৫৫ সালে ফেব্রুয়ারী মাস মধ্যে এই বাঁধের কাজ শেষ হয়ে যাবে।

পাথরের বাঁধ বা কন্‌ক্রিট্ স্পিলওয়ে:

এই বাঁধের জন্য যে পাথরের-মশলা প্রয়োজন হবে, সেই পাথর ভেঙ্গে বালু ও বিলাতী মাটি মিশিয়ে মশলা তৈরী করার যন্ত্রটি হ'লো 'কনস্ট্রাকশন প্ল্যাণ্ট।' ১৯৫২ সালের জুলাই থেকে যন্ত্র বসানোর কাজ আরম্ভ হয়েছে। এই বিরাট যন্ত্রটি নিম্নলিখিত অংশে বিভক্ত করা হয়েছে।

(ক) পাথর-ভাঙ্গার যন্ত্র।

(খ) চূর্ণীকৃত পাথরকে বিভিন্ন আকারে চালনী করে জমা করার জন্য চালনী যন্ত্র বা 'স্ক্রীনিং প্ল্যাণ্ট'।

(গ) বালি ধোয়া ও জমা করার যন্ত্র।

(ঘ) পরিবহন যন্ত্র বা কন্‌ভেয়ার-এর সাহায্যে চূর্ণীকৃত পাথর বিভিন্ন চালনীতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং চালনীর পর পৃথকীকৃত পাথরকে মিশ্রণ-যন্ত্রের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়।

(ঙ) সিমেণ্ট-সাইলো—বিলাতী মাটি সংরক্ষণের আধার। এগুলোর মধ্যে সিমেণ্ট ভরে রাখা হয় এবং পাম্পের সাহায্যে ঐ সিমেণ্ট মিশ্রণ যন্ত্রের মধ্যে ফেলা হয়।

(চ) মিশ্রণ যন্ত্র বা 'ব্যাচিং-প্ল্যাণ্ট'। এখানে পাথর, বালি ও সিমেণ্ট পরিমিত-ভাবে ওজন করে—মিশানো হয় এবং সেই মিশানো পাথরের মশলা ঢালাই করে বাঁধের কাজ হয়।

(ছ) কন্‌ক্রিট ট্রেন বা পাথরের মশলা পরিবহনকারী গাড়ি। বড় বড় বালতি বা গামলাতে মশলা ভর্তি করে এই গাড়ির উপর বসিয়ে বাঁধের গোড়ায় যেখানে ঢালাই হয়, সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়।

(জ) রিভল্‌ভিং ক্রেন বা ঘূর্ণমান বকযন্ত্র। এর সাহায্যে গাড়ির উপর থেকে বড় বড় কন্‌ক্রিট বোঝাই গামলাগুলো তুলে বাঁধের কাছে ঢালাই করা হয়।

পাথর ভাঙ্গা যন্ত্রের শক্তি হলো—প্রতি ঘণ্টায় বড় বড় পাথর ভেঙ্গে ২০০ টন পরিমাণ ৬'' থেকে ¼'' আকারের টুকরো পাথর তৈরি করতে পারে।

মিশ্রণ যন্ত্রের উৎপাদন শক্তি হচ্ছে, এই যন্ত্র প্রতিদিনে ৪,৩০০ ঘন-গজ পাথরের মশলা প্রস্তুত করতে পারে। এত শক্তিশালী যন্ত্র বসানোর উদ্দেশ্য হলো যা'তে বর্ষার পূর্বেই যত শীঘ্র সম্ভব পাকা-বাঁধের কাজ শেষ হয়। এই বাঁধটি বাঁধতে প্রায় ৩২ লক্ষ ঘন-গজ কন্‌ক্রিটের মশলা লাগবে।

পাকা বাঁধের দক্ষিণ অংশের নেওয়ার-খোঁদার (foundation) কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। বক-যন্ত্র যে পায়ার উপর দাঁড়িয়ে কাজ করবে সেই পায়ার গাঁথনির কাজ গত ফেব্রুয়ারী মাস হ'তে শুরু হয়েছে এবং কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।

এই কাজের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত, ৬' ফুট দীর্ঘ লোহার পাত দিয়ে ফর্মা বেঁধে তাতে মশলা ঢালাই হয়। ঢালাই-এর কাজ হ'তে আগামী সালের, অর্থাৎ ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত সময় লাগবে।

বাম-সংযোজক বাঁধ বা লেফ্‌ট্ ডাইক:

দক্ষিণ-সংযোজক বাঁধ অপেক্ষা এই বাঁধ দৈর্ঘ্যতায় অনেক ছোট, প্রথমটির প্রায় ½ অংশের সমান। এর কাজ শুরু হয়েছে। তবে এর মাটি কাটার ব্যবস্থা হয়েছে, মজুর দিয়ে, যন্ত্র দিয়ে নয়।

বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা পাওয়ার হাউস্:

যথাসম্ভব শীঘ্রই এর কাজ শুরু হবে। বর্তমানে এই সংক্রান্ত যে সমস্ত কাজ হচ্ছে, তা হ'লো—(১) উত্তরাংশে অর্থাৎ নদীর উজান গর্ভে ড্রিল-যন্ত্র দিয়ে গর্ত করা, (২) উভয় পার্শ্বের অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রবেশ পথের জন্য সুড়ঙ্গ মুখ কাটা। এই সুড়ঙ্গ দিয়ে জলস্রোত প্রবাহের পথ এবং ভূগর্ভস্থিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের পথ হবে।

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ভূগর্ভ খনন-এর কাজও শীঘ্রই আরম্ভ করা হবে।

বিদ্যুৎ-যন্ত্র:

এই সংক্রান্ত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কাজ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে এবং আশা করা যায় ১৯৫৪ সালের শেষ ভাগে সমগ্র যন্ত্রপাতি সংগৃহীত হবে।

বিভিন্ন সমস্যা:

এ রকম বড় বড় নির্মাণ কাজের সময় প্রায়ই নানাপ্রকার দুরূহ সমস্যা দেখা যায় এবং তার ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সমাপন করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিভিন্ন সমস্যা উদ্ভবের ফলে মৌলিক পরিকল্পনার পরিবর্তন করতে হয়। মাইথনের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

এখানে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে—তা হলো—

(১) সুড়ঙ্গ খননে বিলম্ব:—এই কাজের দেরি হওয়ায়, সমগ্র নদীর উপর একসঙ্গে বাঁধের স্তর বাঁধা সম্ভব হয়নি। জল বেরিয়ে যাবার জন্য বাম-তীরের দিকে অনেকটা ফাঁকা রাখতে হয়েছিল। সুতরাং স্থানের অপ্রসারতার জন্য যন্ত্র-

পাতি চলাফেরার অসুবিধা হয় এবং পূর্ণ-গতিতে কাজ চলতে পারেনি।

(২) নদীর বুকে লোহার পাত প্রোথিত করে, তার উপর মাটি দিয়ে বাঁধ বাঁধার প্রণালী। কিন্তু লোহার পাত আসতে বিলম্ব হওয়ায় এই কাজ পিছিয়ে যায়। ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে মাটি ফেলার কাজ শুরু হয় কিন্তু লোহার পাত বসানো শেষ হয় ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে, প্রায় ৩ মাস পর। এই জন্য মাটি ফেলার কাজটিকে তিন অংশে ভাগ করা হয়। উজান—মধ্য ও ভাঁটি অংশ। মধ্য অংশে মাটি ফেলার কাজ, পাত-পোতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকে এই জন্য কার্যস্থানের সংকীর্ণতা দেখা যায় এবং এর ফলে যন্ত্রগুলো পূর্ণ-গতিতে কাজ করে যেতে পারেনি।

(৩) কর্দম-চাপ (Clay pockets) নদীর বুক চেঁছে যখন মাটি ফেলার জন্য সমান করা হচ্ছিল, তখন দেখা গেল দক্ষিণ তীরের সংলগ্ন অংশে ভূগর্ভে কর্দম-চাপ রয়েছে। এই কাদার উপর মাটি ফেল্‌লে বাঁধের বাঁধন নরম হয়ে পড়বে এবং ভবিষ্যতে জলের চাপ সহ্য না করতে পেরে বাঁধ ভেঙ্গে পড়তে পারে। এই কাদার চাপ তাই যন্ত্র দিয়ে চেঁছে খুঁড়ে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কাদা ফেলে, বালি দিয়ে স্তর পূর্ণ করে তবে মাটি ফেলতে হয়েছে। তা ছাড়া ভবিষ্যত-সতর্কতার জন্য—যা'তে বাঁধ ধসে না পড়ে, সেই জন্য এই অংশে বাঁধের প্রস্থ যথেষ্ট পরিমাণ সম্প্রসারণ করতে হয়। এর জন্য ৩ লক্ষ ঘন গজ অতিরিক্ত মাটি কাটতে হয় এবং স্বভাবতই কাজ পিছিয়ে পড়ে এবং নির্মাণের ব্যয় বেড়ে যায়।

(৪) পরিমিত মাটির দুষ্প্রাপ্যতাঃ—যদিও পূর্বাহ্নে যথেষ্ট অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করে উপযুক্ত মাটি সরবরাহ কেন্দ্র নির্ধারিত হয়েছিল, তথাপি কাজের অগ্রগতির মুখে দেখা গেল মাটি সরবরাহ কেন্দ্রে যা মাটি পাওয়া যাচ্ছে তা রাসায়নিক দিক দিয়ে বাঁধ বাঁধার উপযুক্ত নয়। এই জন্য উপযুক্ত মাটি বের করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল এবং সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বহনকারী ও খননকারী যন্ত্রগুলিকে মাটি আনতে হয়। এর জন্য যেমন সময় লাগলো বেশী, তেমনি ব্যয়ের মাত্রার সাম্যও রক্ষা হ'লো না।

(৫) খাল-এর গর্ভে বা ডাইভারসন চেনেলে বড় বড় পাথরের মাত্রাধিক্যঃ—বিরাট বড় বড় পাথরের অবস্থিতির জন্য খাল কাটার অগ্রগতি ব্যাহত হয় যথেষ্ট। পাথরগুলিকে ডিনামাইট দিয়ে ফাটিয়ে গুড়ো না করে দিলে খননের কাজ চলে না। সাধারণ নিয়মে ড্রিল দিয়ে গর্ত করে ডিনামাইট পুরে যেভাবে কাজ করা হয়, সেই নিয়মে এই বিরাটাকৃতি পাথর-গুলো গুঁড়ো করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই ভিন্ন উপায়ে T—29, বড় ড্রিল যন্ত্র দিয়ে, ৮''পরিধি এবং ২০'—৩০' ফুট গভীর গর্ত খুঁড়ে তাতে বারুদ বেশী পরিমাণে দিয়ে ফাটানো হ'লো। এর ফল ভাল দেখা গেল। ঘন ঘন গর্ত ও সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণের ফলে পাথরগুলি চূর্ণীকৃত হ'তে লাগলো এবং যন্ত্র দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গুড়ানো পাথর সরিয়ে ফেলা হলো। দ্রুত গতিতে বিস্ফোরণ ও মাটি কাটার ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খাল খনন সুসম্পন্ন হতে পেরেছে।

(৬) বিভিন্ন সমস্যার অন্যতম সমস্যা হলো, যে সকল যন্ত্রপাতি কাজে নিয়োগ করা হয়েছে, সেই সকল যন্ত্রপাতির অতিরিক্ত অংশ বা spare parts-এর অভাব। অনবরত কাজের ফলে যে সব অংশ নষ্ট বা ক্ষয় হয়ে পড়ছিল, সঙ্গে সঙ্গে তা নূতন অংশ দিয়ে সারিয়ে না দিলে যন্ত্রগুলিকে বিকল হয়ে পড়ে থাকতে হতো। বিদেশী 'পার্টস্'-এর দুষ্প্রাপ্যতা হেতু দেশী কোম্পানীর প্রস্তুত পার্টস এবং স্থানীয় কেন্দ্রীয় কারখানায় প্রস্তুত পার্টস দিয়ে কাজ চালানো হয়েছিল। স্থানীয় কারখানায় প্রায় [illegible] হাজার টাকা মূল্যের যন্ত্রাংশ উৎপাদন করা হয়। তৎপরতার সঙ্গে পার্টস সংগ্রহ না হলে যন্ত্রগুলিকে চালু রাখা সম্ভব হতো না।

তুমি

অমর ষড়ংগী

স্মৃতির পথে এসেছো তুমি, কখন জানিনে তো
আষাঢ় দিনের সজল কালো প্রথম মেঘের মতো।
হঠাৎ দেখি একটি মৃদু পরশ আমার মনে
বাঁধলো নীড় হাসি-খুশীর, কি এক প্রয়োজনে!

সকাল গেল, বিকেল গেল, সন্ধ্যে হ'ল শেষে
তোমার আমার স্বপ্ন দুটি মিল্‌লো বুঝি এসে।
সহসা দেখি তোমার সেই মধুর পরশখানি
মিলিয়ে গেল। থাক্‌লে শুধু আমার মাঝে তুমি।

বম্বাই ছবির কাহিল অবস্থা

গত ক'মাসে বম্বের বহু প্রযোজক পরিচালক কলকাতা পরিভ্রমণে এসেছেন এবং তাঁরা সকলেই বম্বের চলচ্চিত্র শিল্পের মারাত্মক অবস্থার কথা বর্ণনা করে গিয়েছেন। কলকাতারও অবস্থা মোটেই ভালো নয়, কিন্তু কলকাতার বর্তমান অবস্থা নাকি বম্বের প্রযোজক পরিচালকদের মতে বম্বের তুলনায় অনেক ভালো। বম্বের চিত্রশিল্পের যদি অমন দুরবস্থা ঘটে থাকে তো তার জন্যে সম্পূর্ণরূপে দায়ী বম্বেরই প্রযোজক, পরিচালক, কলাকুশলী ও শিল্পীবৃন্দ নিজেরাই। পুরনো কথা—টাকার যখন উচ্ছল অবস্থা ছিল তখন তারা দুহাতে টাকা লুটিয়েছেন ও লুটেছেন। আর সেই টাকার আণ্ডিল ঘুরে নিয়ে ছবির এমন যাচ্ছেতাই চেহারা করে দিয়েছেন বছরের পর বছর ধরে যে, এখনকার বম্বের ছবি দেশের লোককে রীতিমত বিরক্ত ও ঘৃণাভাবাপন্ন করে তুলেছে। মাত্র কয়েকদিন আগে দিল্লীর তের হাজার মহিলা প্রধান মন্ত্রীর কাছে এখনকার ছবির বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে এক স্মারকলিপি পাঠিয়েছেন। স্বাক্ষরকারী মহিলারা স্বতঃই বোঝা যাচ্ছে বম্বের ছবির বিরুদ্ধেই নালিশ জানিয়েছেন, অবশ্য হলিউডের ছবির কথাও তারা উল্লেখ করেছেন। বম্বের ছবির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জমে আসছিল অনেকদিন ধরেই, এবারে তা বিস্ফোরিত হতে আরম্ভ করেছে। দিল্লীর পর হয়তো, কলকাতা, কি লক্ষ্মৌ কি মাদ্রাজ কি খাস বম্বে থেকেই হয়তো অমনিধারা নালিশ জানানো স্মারকলিপি দেশের মন্ত্রীদের কাছে পেঁছতে থাকবে। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

* * *

বম্বের ছবির অপরাধের অন্ত নেই। বম্বের সঙ্গীত পরিচালকরা ছবিতে

রঙ্গজগৎ

—শৌভিক—

বিলিতি বাজনায় বাজানো বিলিতি সুর জুড়ে দিয়েছেন। আপত্তি উঠেছে, প্রযোজকরা তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি। আকাশবাণী থেকে ছবির গান বন্ধ করে দেবার ভয় দেখানো হয়েছে, বম্বের প্রযোজকরা কোমর বেঁধে সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লড়ায়ে নেমেছেন এবং তারাই বেতারে তাদের ছবির গান বাজাতে দেবেন না বলে পাল্টা জব্দ করতে চেয়েছেন এই বলে যে, ছবির গান না বাজালে আকাশবাণীর গ্রাহক কমে যাবে। কিন্তু আকাশবাণী তাতে জব্দ হওয়া তো দূরের কথা, বেশীর ভাগ গ্রাহকই দেখা যাচ্ছে "লারে লাপ্পা" শ্রেণীর গান শোনা থেকে রেহাই পেয়ে স্বস্তিই লাভ করছে। দেশের নিজস্ব সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে একেবারে বিদেশীয়ানায় ভরিয়ে দেওয়ার পরিচয় কোন দেশেই এমন পাওয়া যায় না। বিদেশীয়ানা নিয়ে আসার রীতিটা বম্বের ছবির সর্বাঙ্গেই ব্যাপৃত। গল্প ওরা নেয় বিদেশী ছবি দেখে এবং সেই অনুকরণে; এদেশের মাটি-জল-হাওয়াতে মানুষ লোকের কাছে সেটা কি পরিমাণ পাচা হবে সেদিকে কোন গ্রাহ্যই করে না তারা। বাড়ি, ঘর, দালান সব এমনি তৈরী করবে ওরা যা এদেশের প্রকৃতিতে নিতান্তই বেমানান। ইউরোপীয় স্যুট করা নেই বম্বের ছবিতে এমন পুরুষ চরিত্র স্বপ্নাতীত। এমন কি গ্রাম্য চাষাকেও ওরা ট্রাউজার পরিয়ে মেক্সিকোর কিম্বা ঐ ধরনের কোন দেশের অধিবাসীতে রূপান্তরিত করে দেয়। মেয়েদের যে পোশাক ওরা পরায় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে, নিজেরা মেয়ে হয়েও অভিনেত্রীরা যে 'চোলি' সর্বস্ব বসনের নামান্তর অঙ্গে ধারণ করেন সেটা যেমনি শালীনতা বিরোধী তেমনি নির্লজ্জতার চূড়ান্ত পরিচয়। দেশের মতিগতিরও কোনই ধার ধারতে চান না বম্বের প্রযোজকরা—তারা নিজেদের সর্বজ্ঞ এবং নৈতিক মান নির্ধারণকর্তা বলে ধরে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করে চলেছেন। একেবারেই দেশের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ সব জিনিস তারা পরিবেশন করে আসছেন। বম্বের ছবি নাচ দেবে 'রম্বা' বা ঐ জাতীয় বিদেশী কোন নাচ। দিশী লোকের দ্বারা সে নাচ যদি সম্ভব না হয় তাহলে খাস বিদেশী নাচিয়েকেই নামিয়ে দেওয়া হয়। আসবাব, অসন-বসন, বাসন-কোসন থেকে বিষয়বস্তু, ভাবভঙ্গী, চালচলন সবই বিদেশী চরিত্রই মূর্ত করে তোলে। বহু বছর ধরে দেশের লোকে তা সহ্য করে এসেছে; সহ্য করেছে এই ভেবে যে বম্বের প্রযোজক পরিচালকদের সুমতি একদিন হয়তো দেখা দেবেই। কিন্তু অপেক্ষার মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। বম্বের ছবি মাত্রকেই এখন লোকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছে। ফলে ভালো প্রচেষ্টাও ওরই মধ্যে যে দু-একটা হঠাৎ সামনে এসে হাজির হয় সেগুলোও মার খেয়ে যায় লোকে সম্পূর্ণরূপেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে বলে। বম্বের ছবির নৈতিক অধঃপতনই আর্থিক দুর্গতি ডেকে আনার একটি প্রধান কারণ। যে ছবির মধ্যে নিজেদের প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না, যার মধ্যে জীবন ও প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি নেই, বরং একটা বিরোধী সংস্কৃতির ধারাকে জোর করে সামনে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, যার চেহারা ও আচারবিচার সমাজ-বিরোধী ও অসামাজিক বলে মনে হয়, যা মনকে আনন্দ দেওয়ার বদলে ঘোলাটে করে দিচ্ছে—সে ছবির ওপরে কতোদিন আর আকর্ষণ থাকতে পারে। তার ওপর বম্বের প্রযোজক ও পরিচালকদের দেমাকও

এমনি চড়া হয়ে রয়েছে এখনও যে, তাদের ছবি বম্বের সমগ্র চলচ্চিত্র শিল্পকে দুর্নামের কালিমায় আচ্ছন্ন করে তুলেছে সেটা তারা মানতে তো চাইছেনই না, উপরন্তু তাদের ছবি না চলার জন্যে দেশের লোকের রুচিজ্ঞানহীনতা, সাধারণ বোধ-শক্তির অভাব এবং সর্বোপরি আর্থিক দুরবস্থার ওপরে দোষটা চাপিয়ে দিচ্ছেন।

* * *

দেশের আর্থিক অবস্থা সত্যিই ভালো নয়। কিন্তু তাই বলে এতো খারাপও নয় যাতে চলচ্চিত্র শিল্প পথে বসতে পারে। আগের চেয়ে ছবি দেখানো হচ্ছে বেশী সংখ্যায় এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় তোলা ছবির সঙ্গে হিন্দী ছবির সংখ্যা জুড়লে দেখা যায় সারা দেশে মোট ছবি সংখ্যায় বেশীই তোলা হচ্ছে। আগের চেয়ে চিত্রগৃহের সংখ্যাও বাড়ছে এবং সেইসঙ্গে দর্শক সংখ্যাও। অর্থাৎ ছবির দরুণ সারা দেশ জুড়ে মোট যতো টাকা বিক্রী হতো, আজ তার চেয়ে বেশীই হচ্ছে। কিন্তু বম্বের প্রযোজকদের তাতে কোন সাশ্রয় হচ্ছে না, তাদের অবস্থা খারাপ থেকে খারাপতর হচ্ছে। তার কারণ আঞ্চলিক ভাষার ছবি সংখ্যায় বেড়েছে এবং সেইসঙ্গে বিক্রীও হচ্ছে ভালো। কাজেই বম্বের সর্বভারতীয় ছবির প্রদর্শনও কমছে আর সেইসঙ্গে আয়ও। কর আদির দরুণ গভর্নমেণ্টের যে ভাগ তা আগেও ছিল, এখনও আছে। বম্বের ছবির যে

অতিরিক্ত লোকসান যাচ্ছে সেটা প্রদর্শনে যাবার জন্যেই। অধিকন্তু রয়েছে বম্বের ছবির খরচের বিপুল আয়তন। দেশে যা নেই তা ছবিতে পুরে দেবার আশা পরিতুষ্ট করার জন্য বম্বের প্রযোজকদের সব কিছুই তৈরী করে নিতে হয়। একখানি ছবিতে শুনেছিলাম সাজপোশাক তৈরী করতেই লাখ খানেক টাকা খরচ হয়ে যায়; কাজেই সে ছবির মোট খরচ যদি বারো লাখ টাকায় গিয়ে পেঁছিয় তা আর এমন কি বেশী হলো! কিন্তু ঐ বারো লাখ টাকা তুলতে সারা দেশ জুড়ে যে প্রায় ষাট লাখ টাকার টিকিট বিক্রীর দরকার, অতো মর্যাদা বা আকর্ষণ বম্বের ছবির এখন নেই। একখানি ছবিতে ...তৈরী করতেই ষাট হাজার টাকা খরচ করা হয়েছিল। অপর একখানি ছবিতে বিদেশী নাচিয়ে ও বাজিয়ে নিয়োগ করতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করা হয়। বহু লক্ষ টাকা 'স্যামসন এণ্ড ডিলাইলা'-র অনুকরণে একখানি ছবির পিছনে উড়িয়ে দেওয়া হয়। এমনি অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়, যেসব খরচ বাহুল্যই শুধু নয়, অতিমাত্রায় ... ও অবান্তর। উপরন্তু এদেশের ... ও পারমার্থিক সংগীতিতে খাপও ... না। কিন্তু একথা কে বুঝবে বম্বের প্রযোজকদের মধ্যে?

* * *

বম্বের ছবির খরচের একটা মস্ত বহর হচ্ছে অভিনয়শিল্পীদের পারিশ্রমিক দেওয়াতে। প্রথম সারির তারকাদের পারিশ্রমিকের হার তিরিশ হাজার থেকে লাখ টাকা পর্যন্তও হতে দেখা যায়। তাও কাউকে কোন প্রযোজক যে ইচ্ছেমতো পাবেন তারও কোন স্থিরতা নেই। সপ্তাহ দুই আগে মুক্তিপ্রাপ্ত একখানি ছবির কথা শোনা যায় যার প্রযোজক বছর চারেক আগে কলকাতায় এসে এই ছবিখানি তোলার কথা শুনিয়ে গিয়েছিলেন। ছবি তোলাও আরম্ভ হয়েছিল প্রায় সেই সময়েই কিন্তু এতোদিন শেষ হ'তে পারেনি, কারণ ওতে যাকে নায়িকার ভূমিকায় অবতরণ করিয়েছেন তাঁর চাহিদা এতো বেশী যে, বছর দুই তিনি উল্লেখিত ছবিখানির কথা ভাবতেই পারেননি। তারপর ভাববার যখন সময় এলো তখনও এতো ছবিতে তাঁর কাজ যে, মাসে দিন দুয়ের বেশী এ ছবিতে কাজ করার সময়ই দিতে পারেননি। ফলে ছ' থেকে ন মাসে যে ছবি শেষ হবার কথা সে ছবিখানি শেষ হতে সময় লাগলো চার বছর। এই চার বছর টেনে যেতে ছবির খরচ স্বতঃই চতুর্গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, উপরন্তু ধার নেওয়া টাকা সুদেও বেড়ে গিয়েছে অনেক। ফলে এ ছবিখানি যদি জনপ্রিয়তা অর্জনও করে তাহলেও পুরো টাকা তোলা খুবই শক্ত। তাছাড়া ছবি যারা বাজারে চালায় অর্থাৎ পরিবেশক ও প্রদর্শকদের কথায় একখানি ছবিতে অন্তত দু' তিন চারজন প্রথম সারির তারকাকে রাখতেই হয়। সুতরাং দু-আড়াই লক্ষ টাকা যদি অভিনয়শিল্পীদেরই দিতে হয় তাহলে ছবির মোট খরচ, অন্যান্য দিকে টানাটানি ক'রে চললেও পাঁচ-ছ লাখ টাকার কমে কিছুতেই হয় না। অর্থাৎ এই খরচ তুলতে টিকিটঘরে অন্তত পঁচিশ-তিরিশ লক্ষ টাকা আদায় হওয়া দরকার। কিন্তু তাও আজকাল আর বম্বের ছবি থেকে উঠতে পারছে না। আজকাল পাঁচ-ছ লাখ টাকার ছবিই বেশী হচ্ছে, আর বেশীর ভাগ প্রযোজকই মার খেয়ে যাচ্ছেন।

* * *

সংগীত যোগ করতে বম্বের ছবিকে একটা খুবই মোটা খরচ পোয়াতে হয়। কোন কোন ছবির ক্ষেত্রে খানকতক গান আর আবহসংগীত যোগ করতেই লাখ-দেড় লাখ টাকা খরচ হওয়ার কথাও শোনা যায়। কোন কোন সংগীত পরিচালক পঞ্চা... ষাট জন বিভিন্ন যন্ত্রবাদকও নিয়োগ ... থাকেন। অতো বাজিয়ে এবং অতো ... খরচ করে তাঁরা এমনি জিনিস পরিবে... করছেন যা আজ দেশশুদ্ধ লোকে ... করছে। এইসব সঙ্গীত পরি... বিলিতি ছবিতে অর্কেস্ট্রার ... দেখে অনুকরণ করেন, যেম... পরিচালকরা বিলিতি ছবির বাক... অনুকরণ করেন। আশ্চর্যের বিষ... এইসব সংগীতপরিচালকদের নিয়ে...

বিমল রায় পরিচালিত "বিরাজ বৌ"-তে কামিনী কৌশল ও কিশোরকুমার

হৈ হৈ হয় এবং এদেরই নাম ও ডাক বেশী। দেখা যায়, ভারতের অতুলনীয় সংগীত ঐশ্বর্যকে যে যতো বিকৃত করে পাশ্চাত্ত্য সংগীতের ভেজাল মিশিয়ে বাজারে ছাড়তে পারবেন প্রযোজক মহলে তাঁর প্রভাব তত বেশী। গোড়াকার দিনে নতুনত্ব হিসেবে লোকে তা সহ্য করেছিল, আর প্রযোজক ও সংগীত-পরিচালকরা সেইটেই লোকের পছন্দের স্থায়ী নিরিখ ব'লে ধরে বসে আছেন। আর এমনই নির্বোধ এরা যে, যে-জনসাধারণ একদিন বিলিতি ভেজাল দেওয়া সংগীত কেবলমাত্র একটা নতুন কিছু ব'লে আমল দিয়েছিল আজ তা সেই জনসাধারণের কাছ থেকে ধিক্কার লাভ করলেও সংগীত প্রযোজক ও পরিচালকরা তা মেনে নেওয়া তো দূরের কথা উল্টে তাঁরা জনসাধারণের সংগীত-রুচির ওপরে কটাক্ষপাত করছেন।

* * *

যে কোন দিক বিচার করলে দেখা যায়, বম্বের চলচ্চিত্র শিল্প দেশের স্বভাব ও প্রকৃতি-বিরুদ্ধ জিনিস দীর্ঘকাল ধ'রে পরিবেশন করতে করতে আজ এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁচেছে যেখানে তারা তাদের দোষত্রুটি বিচার করে দেখার মনোবল ও যুক্তি দেখতে পায় না এবং যত দোষ দেখে কেবল গভর্নমেণ্টের আর জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা ও নৈতিক বিচারবুদ্ধির। এটা ঠিকই যে, ব[illegible] কয়েক আগেও লোকে আমোদ-প্রমো[illegible] জন্য যে পরিমাণ খরচ করতে পার[illegible] এখন অতোটা আর পেরে উঠছে [illegible] কিন্তু সেই সংগে এটাও দেখতে হবে [illegible] প্রমোদের জন্য যাওবা খরচ লোকের [illegible] কুলোচ্ছে তার অনেকখানিই তারা অন্য ধরনের প্রমোদে ব্যয় করাটা বেশী যু[illegible] যুক্ত বলে মনে করছে। নাটক অভি[illegible] গানের জলসা, নাচের আসর, খেলা [illegible] ইত্যাদি যে প্রভূত বৃদ্ধি লাভ কর[illegible] পেরেছে তার একটা মস্ত কারণ সিনে[illegible] আকর্ষণ কমে যাওয়ায়। আর এর [illegible] দায়ী রূপ-রস-সুর-বিকৃত এবং সংস্কৃ[illegible] ও নীতিবিচ্যুত বম্বের ছবি। চলচ্চি[illegible] যে অতুলনীয় ক্ষমতা—সমাজসেবায়, [illegible] শিক্ষায় এবং সংস্কৃতির প্রসারে চল[illegible] যে অপরিসীম কাজে লাগতে পারে, [illegible] ছবি তা ব্যর্থ প্রমাণ করে দিয়ে[illegible] চলচ্চিত্রের কথা উঠলেই দেশের [illegible] জনসাধারণ যেমন, তেমনি সর[illegible] মহলেও ঘৃণার অন্ত নেই। চল[illegible] রাষ্ট্রের একটুও সহানুভূতি লাভ [illegible] মতো মুখ রাখেনি আজ।

* * *

বম্বের ছবিতে শুদ্ধমাত্র তারিফ[illegible] হচ্ছে আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণ কুশল[illegible] এ ব্যাপারে বম্বের ছবি পৃথিবীর যে [illegible] দেশের সংগে প্রতিযোগিতায় নামতে পা[illegible] সেদিন বম্বের এক প্রযোজক-পরিচাল[illegible] একটা ভালো প্রস্তাব দেন। তিনি বলে[illegible] বাঙলা ছবির দেশের মধ্যে আদর্শ [illegible] পরিগণিত হবার সব রকম গুণই [illegible] এবং বাঙলা ছবির খাতিরও সর্বত্র [illegible] জন্যেই। কিন্তু কলাকৌশল সৌষ্ঠ[illegible] একান্ত অভাব ব'লে বাঙলা ছবিকে দেশে সর্বত্র পরিবেশন করার জন্য কেউ নিতে চা[illegible] না। উক্ত প্রযোজক বলেন, বাঙলার গল্প অভিনয়, সংগীতের সংগে বম্বের কলা[illegible] কৌশল গুণ যদি যুক্ত করা যায় তাহলে তাঁর বিশ্বাস, সমগ্রভাবেই ভারতীয় চিত্রে জনসাধারণের হৃদ্যতার মধ্যে আবা[illegible] ফিরিয়ে নিয়ে আসা যাবে। কিন্তু বম্বে ভ্রষ্টবুদ্ধি প্রযোজক এবং পরিচালক[illegible] দেমাক কি এ সম্ভাবনা ভেবে দেখা[illegible] চাইবে!

এ সপ্তাহের নতুন বাঙলা ছবি 'মরণের পরে'-তে ভারতী

খেলার মাঠে

একলব্য

ডেভিস কাপ, উইম্বলডন টেনিস, জুলেস রিমেট কাপ প্রভৃতি বিশ্ব প্রাধান্য প্রতিযোগিতার মধ্যে এ্যাথলেটিকসের একটি ছোট সংবাদ গত সপ্তাহের খেলাধূলোর সকল সংবাদের উর্ধ্বে স্থান পেয়েছে। এ সংবাদ হচ্ছে—অস্ট্রেলিয়ার তরুণ এ্যাথলীট জন ল্যাণ্ডির এক মাইল দৌড়ে নূতন বিশ্ব রেকর্ডের প্রতিষ্ঠা।

গত মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ইংলণ্ডের উদীয়মান এ্যাথলীট রজার ব্যানিস্টার সুদীর্ঘ ৯ বৎসর পরে সুইডেনের গুন্দার হেগ কৃত রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়ে এক মাইল দৌড়ে নূতন বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। জন ল্যাণ্ডি ব্যানিস্টারের এ রেকর্ডও ভেঙ্গে দিয়ে ক্রীড়া-জগতে বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন। ৪ মিনিটের কম সময়ে এক মাইল পথ অতিক্রম করাকে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক এবং এ্যাথলেটিকসের বোদ্ধারা বাতুলতা বলে মনে করতেন। ব্যানিস্টার ৪ মিনিটেরও কম সময়ে অর্থাৎ ৩ মিনিট ৫৯.৪ সেকেণ্ডে মাইল পথ অতিক্রম করে অসাধ্য সাধন করেছিলেন। এর পর আরও কম সময়ে মাইল পথ দৌড়ে পার হবার সম্ভাবনাকে উন্মাদের মানসিক বিকার বলেই ধরা যেতে পারে। কিন্তু অস্ট্রিয়ার সুস্থ মস্তিষ্ক তরুণ এ্যাথলীট জন ল্যাণ্ডি ৩ মিনিট ৫৮ সেকেণ্ড সময়ে মাইল পথ দৌড়িয়ে উন্মাদের কল্পনাকেই হার মানিয়েছেন। অধ্যবসায় ও সাধনার গুণে রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ এর পর বৈজ্ঞানিক যানের সঙ্গে ক্ষিপ্রতার পাল্লা দেবে নাকি? ধন্য সাধনা।

* * *

হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন রকি মার্সিয়ানো এজার্ড চার্লসকে হারিয়ে দিয়ে নিজ সম্মান অক্ষুন্ন রেখেছেন। রয়টারের সংবাদদাতা, নিউইয়র্কে মার্সিয়ানো ও চার্লসের ১৫ রাউণ্ডব্যাপী এই মুষ্টি-যুদ্ধের যে বিবরণ দিয়েছেন, তাকে বাঘ-সিংহের লড়াইয়ের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কেউ কারো চেয়ে কমতি নয়। পরস্পরের প্রচণ্ড মুষ্ঠাঘাতে দুজনেরই রক্তাক্ত কলেবর, কিন্তু রণে ভঙ্গ দেবার কোন লক্ষণ নেই। চার্লসের মারের দাপটে এক সময় মার্সিয়ানো অত্যন্ত কাবু হয়ে পড়েন। তাঁর বাঁ-চোখের উপরে গভীর ক্ষত দিয়ে অঝোরে রক্ত পড়তে আরম্ভ করে। একটু পরেই আবার দেখা যায়, চার্লসের আর এক ঘুষির চোটে মার্সিয়ানোর নাক ফেটে রক্ত পড়ছে। তবু রণে ভঙ্গ নেই। রেফারী অবস্থার গুরুত্ব বুঝে চিকিৎসকের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ডাক্তার মার্সিয়ানোর ক্ষত পরীক্ষা করে দেখেন। সবারই ধারণা জন্মে, লড়াই বন্ধ করে দিয়ে রেফারী চার্লসকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করবেন।

কিন্তু এও কি সম্ভব। একবার চ্যাম্পিয়নশিপ হারিয়ে বিশ্বের কোন মুষ্টিযোদ্ধাই দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়নশিপের গৌরব লাভ করতে পারেননি। ১৯৫১ সালে ১৪ বারের বিশ্বজয়ী জগৎপূজ্য মুষ্টিযোদ্ধা জো লুইকে হারিয়ে চার্লস বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আখ্যা লাভ করেছিলেন। কিন্তু পরের বছরেই জো ওয়াল-

নিউ ইয়র্কের 'ইয়াঙ্কি স্টেডিয়ামে' বিশ্ব হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধে রকি মার্সিয়ানো ও এজার্ড চার্লসের লড়াইয়ের দৃশ্য। ১৫ রাউণ্ডব্যাপী লড়াইয়ের চতুর্থ রাউণ্ডে মার্সিয়ানোর মুষ্টাঘাতে চার্লসের সঙ্গীন অবস্থা হয়েছে। বাঁ হাতের দ্বারা আঘাত করে মার্সিয়ানো ডান হাতে ঘুসি মারবার জন্য উদ্যত হয়েছেন

Hitting an opponent who is down | Hitting below the Belt | Kicking with the Knee | Hitting on the Back | Butting | Any Blow on back of neck | Hit with the Elbow
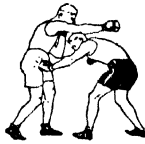
Holding below belt line | Ducking below the belt line | Pressing with the Forearm | Any use of the ropes | Clinching with straight arms | Holding opponent's Arm | Completely passive defence
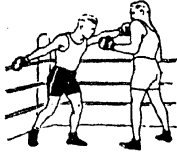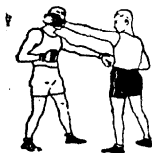
Hit with the open glove | Pulling and Hitting | Holding and Hitting | Hanging on to opponent | Wrestling | Both Competitors are Wrestling | Hit with the Forearm
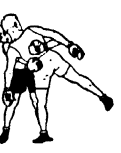
মুষ্টিযুদ্ধের আইন বিরুদ্ধ রীতিগুলি চিত্রযোগে দেখান হচ্ছে। অবনমিতকে আঘাত, কোমরের নীচে আঘাত, হাটুর ব্যবহার, পৃষ্ঠে আঘাত, মাথা দিয়ে গুঁতোমারা, কনুইয়ের ব্যবহার, ধরে রাখা, চাপ দেওয়া, দড়ির সাহায্য গ্রহণ করা, নিশ্চেষ্ট প্রতিরোধ, গ্লোভ মেলে মারা, টেনে মারা, ধরে মারা, মুষ্টিযুদ্ধ না করে কুস্তি করা প্রভৃতি মুষ্টিযুদ্ধে আইন বিগর্হিত

কটের কাছে চার্লসকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। ১৯৫২ সালে রকি মার্সিয়ানো আবার ওয়ালকটকে হারিয়ে বিশ্বজয়ী হন, এখন পর্যন্ত মার্সিয়ানোর শ্রেষ্ঠত্বই বজায় রয়েছে। সেই মার্সিয়ানো হৃত-গৌরব চার্লসের কাছে পরাভব স্বীকার করবেন? তার শিরায় শিরায় আগুন খেলে গেল। দ্বিগুণ বিক্রমে পরের রাউণ্ডে চার্লসকে মারতে আরম্ভ করলেন মার্সিয়ানো। কিন্তু চার্লসও দমবার পাত্র নয়। দুজনে কোন সময় আক্রমণমুখী এবং কোন সময় পলায়নপর হয়ে সে রাউণ্ড শেষ করলেন। দশম রাউণ্ড থেকে মার্সিয়ানো প্রকৃত বিজয়ীর মত লড়তে থাকেন। তিনি এজার্ড চার্লসকে রিংয়ের চারিদিকে রীতিমত তাড়া করে ঘুষির উপর ঘুষি চালাতে থাকেন। চার্লসের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে আসে। কিন্তু ভূতলশায়ী হন না, রিংয়ের উপরেই টলতে থাকেন চার্লস। মার্সিয়ানোর তীব্র মারে তার ডান চোখের উপরে এবং মুখের দুই স্থানে ক্ষত হয়। শেষ রাউণ্ডে দুজনেই দুজনকে নক আউট বা ভূতলশায়ী করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। রেফারী মার্সিয়ানোর জয় ঘোষণা করলে বিপুল জনতার গগনভেদী আনন্দরোলের মধ্যে বিশ্বের দুই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা দর্শকদের অভিবাদন জানিয়ে রক্তাক্ত দেহে নিজ নিজ ড্রেসিং রুমে প্রবেশ করেন।

* * *

একেই বলে মুষ্টিযুদ্ধ। মুষ্টিযুদ্ধকে অনেকে বর্বর যুগের আসুরিক স্পোর্টস বলে ঘৃণা করে থাকেন। আবার অনেকের মতে মুষ্টিযুদ্ধ "King of sports"। অবশ্য উদার অর্থে 'King of sports' বলতে ক্রিকেটকেই বোঝায়। খেলাধুলোর মধ্যে কোন্ খেলাটা রাজা খেলা, আর কোনটা মন্ত্রী সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। তবে যিনি যে খেলা থেকে বিজ্ঞানসম্মত সূক্ষ্ম নৈপুণ্যের স্বাদ পেয়েছেন, হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছেন ক্রীড়াসুষমার চারু বিকাশ, তাঁর কাছে সেই খেলাই ভাল লেগেছে। বাংলা তথা ভারতীয় মুষ্টিযুদ্ধের জনক পি এল রায় বলেন—

—"Boxing is the King of sport. No other sports requires such all round fitness of mind and body and abo[ve] all courage and iron discipline."

স্বনামধন্য মুষ্টিক শ্রীরায়ের এই মত থেকেই বোঝা যায়, বক্সিংকে তিনি কি-ভা[বে] গ্রহণ করেছিলেন। মুষ্টিযুদ্ধের প্রতি তা[র] প্রথম জীবনের আসক্তিও বৃথা যায়নি ১৯১৩-১৪ সালে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রি[জ] বিশ্ববিদ্যালয়ের মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা[য়] ব্যাণ্টমওয়েট চ্যাম্পিয়ন হয়ে তিনিই সাগ[র] পারের খেলাধুলোর ক্ষেত্রে প্রথম বাঙ্গালী[র] মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন। বাস্তবিক প[ক্ষে] বিজ্ঞানসম্মত কলাকৌশল ছাড়াও মুষ্টিযুদ্ধে[র] জন্য একাগ্রতা, নিয়মনিষ্ঠা, দৈহিক পটু[তা] এবং সর্বোপরি চারিত্রিক দৃঢ়তার যে একা[ন্ত] প্রয়োজন, তা সম্প্রতি জো লুইয়ের জীবন অবলম্বনে রচিত ছায়াচিত্র যারা দেখেছে[ন] তাঁরাই একবাক্যে স্বীকার করবেন। শু[ধু] হাতের জোর আর কব্জির কসরতেই মুষ্টি যুদ্ধ করা যায় বলে যাদের ধারণা ছিল—জো লুইয়ের জীবনভোর সাধনার চিত্র দে[খে] নিশ্চয়ই তাদের মত পরিবর্তিত হয়েছে।

* * *

মুষ্টিযুদ্ধ আলোচনা প্রসঙ্গে এর আদিম ইতিহাস আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কালের কোন এক অখ্যাত অধ্যায়ে মুষ্টিযুদ্ধ পৃথিবীতে প্রথম আরম্ভ হয়েছিল ইতিহাসের ছেঁড়া পাতায় তার হদিশ পাওয়া যায় না। তবে এইটুকু বলা যায়, পৃথিবীতে যতরকমের খেলাধূলা আছে মুষ্টিযুদ্ধ তার মধ্যে সবচেয়ে পুরানো খেলা। ঘুষোঘুষি বা মুষ্টিযুদ্ধের কৌশলকে ইংরেজীতে 'পিউজিলিজম' (Pugilism) বলা হয়। এ শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ পিউজিল থেকে। কোন কোন ঐতিহাসিক এই কারণে মনে করেন রোম এবং গ্রীসেই প্রথম মুষ্টিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। আমাদের দেশে ধর্মগ্রন্থ মহাভারতেও মুষ্টিযুদ্ধের উল্লেখ আছে। গদাযুদ্ধ, ধনুর্বিদ্যা, মল্লক্রীড়া ও খড়্গ যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে কুরুপাণ্ডবগণ মুষ্টিযুদ্ধও শিক্ষা করতেন এবং মধ্যমপাণ্ডব ভীমই মুষ্টিযুদ্ধের কলাকৌশল ভাল আয়ত্ত করেছিলেন।

খৃষ্টজন্মের ১৭৫০ বছর পূর্বে মেসোপটেমিয়ায় কিছু কিছু লোকের মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধের প্রচলন ছিল বলে কোন কোন ঐতিহাসিক দাবী করেন। গ্রীসে খৃষ্টজন্মের ৯০০ বছর পূর্বে মুষ্টিযুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়। রাজা এগাসের পুত্র থেসাসের রাজত্বকালে রোম দেশের মুষ্টিযুদ্ধের বিবরণ যেমন বীভৎস, তেমন রোমহর্ষক। রাজরাজড়ার যেমন একটি বিশেষ খেয়াল থাকে, থেসাসেরও তেমন মুষ্টিযুদ্ধ দেখবার খেয়াল ছিল। কিন্তু এই মুষ্টিযুদ্ধ খেলাধূলার অন্তর্গত ছিল বললে ভুল হবে। সত্যিকারের যুদ্ধ। প্রকৃত প্রাণ নিয়ে যুদ্ধ। প্রতিদ্বন্দ্বী দুজন মুষ্টিযোদ্ধাকে দুখণ্ড পাথরের উপর খুব কাছাকাছি বসতে হত। দুজনের হাতই চামড়ার বর্মে আচ্ছাদিত থাকতো। তারপর রাজার আদেশ পেলেই শুরু হত মুষ্টিযুদ্ধ এবং একজন যোদ্ধার জীবন একেবারে শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ যুদ্ধের অবসান হত না। কিন্তু মুষ্ট্যাঘাতে একজন লোককে মেরে ফেলতে বেশ কিছু সময় প্রয়োজন। রাজার ছেলে থেসাস। একজন সাধারণ লোকের মৃত্যু দেখবার জন্য এত সময় নষ্ট করাকে সময়ের অপব্যবহার বলে মনে করতেন। মুষ্টিযোদ্ধার মৃত্যু ত্বরান্বিত করবার জন্য তিনি হাতের চামড়ার বর্মের উপর উঁচু উঁচু তীক্ষ্ণ লোহার বা পেতলের কাঁটা বসিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। এই ব্যবস্থায় মুষ্টিযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর দুচার আঘাতেই একজন বা দুজন মুষ্টিযোদ্ধা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তেন।

এই সর্বনাশা খেলার ঢেউ রোম থেকে গ্রীসে গিয়ে পৌঁছালো। এই সময়ে গ্রীসে থিয়াগিনী নামে এক মুষ্টিযোদ্ধার আবির্ভাব ঘটে, যাকে সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা বলে উল্লেখ করেছেন। থিয়াগিনীর ঘুষিতে প্রচণ্ড জোর ছিল এবং তিনি প্রতিপক্ষকে কোন সুযোগ না দিয়েই এমনভাবে আঘাত করতে পারতেন যে, সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকেই তার কাছে পরাজয় স্বীকার করে মৃত্যু বরণ করতে হত। থিয়াগিনী মোট ১৪২৫ জন প্রতিদ্বন্দ্বী মুষ্টিককে নিহত করেছেন বলে উল্লেখ আছে।

এই সময়ে পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধাদের বলা হত গ্লাডিয়েটার। গ্লাডিয়েটারদের এই মরণ আলিঙ্গন লড়াই দেখে জনসাধারণও অপারসীম আনন্দ উপভোগ করতো। বিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধাকে প্রচুর অর্থ এবং রাজ সম্মানে সম্মানিত করবার ব্যবস্থা ছিল। রোমের শক্তিমান মুষ্টিযোদ্ধারা গ্রীসের মুষ্টিযোদ্ধাদের একে একে পরাজিত বা নিহত করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে তুললো যে, গ্রীসে আর 'একটিও না রহিল বংশে দিতে বাতি'। অগত্যা রোমের মুষ্টিযোদ্ধারা নিজেদের দেশেই পরস্পরের মধ্যে লড়াই শুরু করে দিল। রাজা থেসাস প্রবর্তিত এই সর্বনাশা ও বীভৎস মুষ্টিযুদ্ধ একশ বছর পর্যন্ত চালু থাকার পর বন্ধ হয়ে যায়। রোম এবং গ্রীসের পরবর্তী রাজাদের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় হল। তারা বুঝতে শুরু করলেন রাজকীয় আনন্দের জন্য দেশের শক্তিমান যুবকদের এভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবার কোন অর্থ হয় না। ফলে খৃষ্টজন্মের শুরু থেকেই এই অমানুষিক ও দানবীয় মুষ্টিযুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেল। শুরু হল অপেক্ষাকৃত আইনসিদ্ধ বক্সিং। অন্ধ কবি হোমারের লেখায় পাওয়া যায়, এই সময়ে বিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধাদের পুরুষ গাধা উপহার দেওয়া হত। বিজিতের পুরস্কার ছিল রৌপ্যাধার। মুষ্টিযুদ্ধের আদিম ইতিহাসের মধ্যেই রয়েছে রক্তের নেশা, তাই যদি কেউ একে আসুরিক স্পোর্টস বলে অপবাদ দেন, তবে তার নিন্দা করা চলে না। বক্সিংই একমাত্র স্পোর্টস যেখানে দেখা যায় সমর্থকগণ তাদের প্রিয় মুষ্টিযোদ্ধাকে উৎসাহ দেবার জন্য 'কিল হিম', 'কিল হিম' বলে চীৎকার করছেন। এর থেকেও বোঝা যায় আদিম যুগে একজন যোদ্ধাকে একেবারে মেরে ফেলাই ছিল মুষ্টিযুদ্ধের রীতি।

* * * *

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের যুবকদের মধ্যে বক্সিং করবার খুব বেশী আগ্রহ দেখা যায়। এই সময়ে ইংলণ্ডে ফিগ নামে এক কৃতী মুষ্টিযোদ্ধা ১৫টি লড়াইতে জেতবার পর আর কেউই তার সঙ্গে লড়তে রাজী হয় না। ফলে ফিগ বাধ্য হয়ে মুষ্টিযুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে মুষ্টিযুদ্ধের এক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে 'ফিগ একাডেমী ফর বক্সিং' নামে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ফিগ এ্যাম্পিথিয়েটার ফিগ স্কুলেরই রূপান্তরিত নাম। মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা দেবার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ফিগের স্কুলই বিশ্বের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান। ক্রমে ইংলণ্ডে আরও বারো তেরটি স্কুল গড়ে ওঠে। মুষ্টিযুদ্ধের আইনও ফিগ সর্বপ্রথম রচনা করেছিলেন। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে ব্রাউটন এই আইনের কিছু কিছু পরিবর্তন করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মার্কুইস অব কুইনসবেরীর নিয়ম প্রচলিত হয়। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় মুষ্টিযুদ্ধের প্রচার আরম্ভ হয় এবং বর্তমানে এমেচার এ্যাথলেটিক ইউনিয়ন অব আমেরিকার আইনকানুন সর্বত্র প্রচলিত। আমেরিকায় বক্সিং যত জনপ্রিয়, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে বক্সিং এত জনপ্রিয় নয়। ওদেশে একটা লড়াই দেখবার জন্য এক লক্ষ বিশ হাজার দর্শক এবং ২৬ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬ শত ৬০

বারাণসীর প্রসিদ্ধ দশহরা সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ওয়াটার পোলো খেলায় বিজয়ী কলকাতার ওয়াই এম সি এ ওয়াটার পোলো টীম। ফাইন্যালে ওয়াই এম সি এ ৫—৩ গোলে বারাণসীর সরস্বতী সুইমিং ক্লাবকে হারিয়ে দিয়েছে

ইস্টবেঙ্গল ও ভবানীপুরের লীগের খেলায় ভবানীপুর গোলের মুখের এক দৃশ্য

ডলার অর্থ সংগৃহীত হবার নজির আছে। বক্সিং থেকে জো লুই জীবনে যে কি বিপুল অর্থ উপার্জন করেছেন, তা শুনলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। পরে এসম্বন্ধে আলোচনার ইচ্ছে রইলো। দেহের ওজন অনুযায়ী যে আটটি ভাগে মুষ্টিযুদ্ধকে ভাগ করা হয়েছে নীচে তার হিসাব দিচ্ছি।

ফ্লাইওয়েট—ওজন ১১২ পউণ্ডের মধ্যে।

ব্যাণ্টমওয়েট—১১৩ থেকে ১১৯ পাউণ্ড।

ফেদারওয়েট—১২০ থেকে ১২৭ পাউণ্ড।

লাইটওয়েট—১২৮ থেকে ১৩৬ পাউণ্ড।

ওয়েল্টারওয়েট—১৩৭ থেকে ১৪৭ পাউণ্ড।

মিডলওয়েট—১৪৮ থেকে ১৬০ পাউণ্ড।

লাইট-হেভিওয়েট—১৬১ থেকে ১৭৬ পাউণ্ড।

হেভিওয়েট—১৭৬ পাউণ্ডের বেশী।

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা

সুইজারল্যাণ্ডে 'জুলেস রিমেট' কাপ বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা কোয়ার্টার ফাইন্যাল পর্যায় পেঁছেছে। এ পর্যন্ত খেলাগুলির ফলাফল দেখে মনে হয় গতবারের বিশ্ব কাপ বিজয়ী উরুগুয়ে অথবা অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হাঙ্গেরীরই কাপ লাভের সম্ভাবনা বেশী। ব্রেজিলও রীতিমত শক্তিশালী দল। নীচে এপর্যন্ত যেসব খেলা মীমাংসিত হয়েছে তার ফলাফল দিচ্ছি।

প্রথম গ্রুপ

যুগোশ্লাভিয়া (১) : ফ্রান্স (০)
ব্রেজিল (৫) : মেক্সিকো (০)
ব্রেজিল (১) : যুগোশ্লাভিয়া (১)
ফ্রান্স (৩) : মেক্সিকো (২)

দ্বিতীয় গ্রুপ

হাঙ্গেরী (৯) : দক্ষিণ কোরিয়া (০)
জার্মানী (৪) : তুরস্ক (১)
হাঙ্গেরী (৮) : জার্মানী (৩)
তুরস্ক (৭) : দক্ষিণ কোরিয়া (০)

তৃতীয় গ্রুপ

অস্ট্রিয়া (১) : স্কটল্যাণ্ড (০)
উরুগুয়ে (২) : চেকোশ্লোভেকিয়া (০)
উরুগুয়ে (৭) : স্কটল্যাণ্ড (০)
অস্ট্রিয়া (৫) : চেকোশ্লোভেকিয়া (০)

চতুর্থ গ্রুপ

ইংল্যাণ্ড (৪) : বেলজিয়াম (৪)
সুইজারল্যাণ্ড (২) : ইটালী (১)
ইংল্যাণ্ড (২) : সুইজারল্যাণ্ড (০)
ইটালী (৪) : বেলজিয়াম (০)

সেমি ফাইন্যালের তালিকা

ইংল্যাণ্ড : উরুগুয়ে
হাঙ্গেরী : ব্রেজিল
যুগোশ্লাভিয়া : জার্মানী অথবা তুরস্ক
অস্ট্রিয়া : সুইজারল্যাণ্ড অথবা ইটালী।

ফুটবল লীগ খেলার সাপ্তাহিক আলোচনা

২২শে জুন পর্যন্ত খেলার ফলাফল নিয়ে এসপ্তাহের লীগ খেলার আলোচনা আরম্ভ করছি। আলোচ্য সপ্তাহের সবচেয়ে বড় ঘটনা এরিয়ান ক্লাবের হাতে দুর্ধর্ষ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শোচনীয় পরাজয়। এক দুই গোলে **নয়**। ৪—০ গোলে এরিয়ান ইস্টবেঙ্গলকে **হারিয়ে** দিয়ে ক্রীড়া ঐতিহ্যের পরিচয় দিয়েছে। একটা অভাবনীয় ফলাফল সৃষ্টির ক্ষেত্রে এরিয়ান চিরদিনই সিদ্ধহস্ত। অবশ্য ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে এখন আর দুর্ধর্ষ টীম বলা যায় না। এখনকার ইস্টবেঙ্গল টীমকে পুরানো দিনের ছায়া বলা যেতে পারে। তবুও ইস্টবেঙ্গল,—জন মাতানো মন মাতানো **দুই** প্রধান ফুটবল দলের অন্যতম ইস্টবেঙ্গল। ইতিপূর্বে কোন ভারতীয় দলের কাছেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে এত শোচনীয়ভাবে পরাজয় স্বীকার করতে হয়নি। এরিয়ান ক্লাবের সংগে ইস্টবেঙ্গল যেভাবে খেলেছে, সেটা তাদের সুমহান ক্রীড়া ঐতিহ্যের উপর কলঙ্কের প্রলেপ বলা যেতে পারে। শুধু এরিয়ান ক্লাবের কাছে পরাজয়ের জন্যই নয়, ঘটনা বিপর্যয়ে ইস্টবেঙ্গলকে উয়াড়ীর খেলাটিও ছেড়ে দিতে হয়েছে। ফলে ১২টি খেলার মধ্যে তারা ১৯ পয়েণ্ট লাভ করে লীগ কোঠার তৃতীয় স্থানে নেমে গেছে। সম খেলা এবং সম পয়েণ্ট অর্জন করেও গোল এভারেজের জন্য উয়াড়ী ক্লাব উঠেছে দ্বিতীয় স্থানে। প্রথম ডিভিসন লীগের একমাত্র অপরাজিত দল মোহনবাগান ক্লাব ১২টি খেলায় ২৩ পয়েণ্ট সংগ্রহ করে লীগ কোঠার শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। আসছে শনিবার লীগের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় চ্যারিটি খেলায় দুই প্রধান মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল পরস্পরের সম্মুখীন হচ্ছে।

১৫টি টীমের মধ্যে যে দুটো টীম এতদিন জয়লাভে অসমর্থ ছিল, তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্যালকাটা সার্ভিসেস দল জয়লাভ করায় একমাত্র ভবানীপুর ক্লাবই এখন পর্যন্ত জয়লাভে বঞ্চিত রয়েছে। নীচের দিকে ভবানীপুর, খিদিরপুর, জর্জ টেলিগ্রাফ, [illegible] এর আর কারো অবস্থাই ভাল নয়।

দ্বিতীয় ডিভিসনে গত সপ্তাহে [illegible] অবস্থা ছিল, তার কোন পরিবর্তন হয়নি। সালকিয়া ফ্রেণ্ডস, সুবার্বন, কাস্টমস, ক্যালকাটা, পোর্ট কমিশনার্স সবারই চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের আশা আছে। নামবার ভয়ও অনেকের।

তৃতীয় ডিভিসনে সিটি, বেনেপুকুর, এলবার্ট, রেঞ্জার্স, ইণ্টারন্যাশনাল, ক্যালকাটা পুলিশ এই ছয়টি দলের মধ্যে প্রাধান্যের লড়াই চলছে। নীচের দিকে মেসারার্স ও ইস্টবেঙ্গলের অবস্থা সঙ্গীন।

চতুর্থ ডিভিসনে বাটা স্পোর্টস ক্লাব অনেকখানি এগিয়ে আছে। ঐক্য সম্মিলনীও তাদের পিছু পিছু ছুটছে, এর পরেই বেলেঘাটা, বাণী নিকেতন, ইউনাইটেড স্টুডেণ্ট ও তালতলা দীপ্ত সঙ্ঘের স্থান—সবাই চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের আশা রাখে। নীচের দিকে মোহন ক্লাব ও শ্যামবাজার ইউনাইটের অবস্থা মোটেই ভাল নয়।

ক্যালকাটা ফুটবল লীগের চারটি ডিভিসনের ৬৩টি টীমের মধ্যে প্রথম ডিভিসনে মোহনবাগান, দ্বিতীয় ডিভিসনে সালকিয়া ফ্রেণ্ডস ও সুবার্বন, তৃতীয় ডিভিসনে বেনিয়াপুকুর, ইণ্টারন্যাশনাল ও ক্যালকাটা পুলিশ এখন পর্যন্ত অপরাজিত থাকবার গৌরব অধিকার করে আছে। অপরদিকে প্রথম ডিভিসনে ভবানীপুর এবং তৃতীয় ডিভিসনে মেসারার্স এখন পর্যন্ত একটি খেলাতেও জয়লাভ করেনি।

নীচে গত সপ্তাহের প্রথম ডিভিসনের ফলাফল ও লীগ তালিকা দিচ্ছি—

১৬ই জনু, ৫৪

উয়াড়ী (১) এরিয়ান (০)
স্পোর্টিং ইউনিয়ন (২) সার্ভিসেস (১)

১৭ই জনু, ৫৪

ইস্টবেঙ্গল (০) ভবানীপুর (০)
মোহনবাগান (৩) কালীঘাট (২)
ই আই আর (২) খিদিরপুর (০)

১৮ই জনু, ৫৪

মহঃ স্পোর্টিং (২) পুলিশ (১)
উয়াড়ী (০) সার্ভিসেস (০)
স্পোর্টিং ইউনিয়ন (৩) জর্জ টেলিগ্রাফ (০)

১৯শে জনু, ৫৪

এরিয়ান (৪) ইস্টবেঙ্গল (০)
মোহনবাগান (১) রাজস্থান (০)
ভবানীপুর (০) খিদিরপুর (০)

২১শে জনু, ৫৪

বি এন আর (২) রাজস্থান (১)
মহঃ স্পোর্টিং (০) কালীঘাট (০)
ই আই আর (১) জর্জ টেলিগ্রাফ (০)

২২শে জনু, ৫৪

মোহনবাগান (০) পুলিশ (০)
সার্ভিসেস (১) ভবানীপুর (০)
উয়াড়ী (ওঃ ওঃ) ইস্টবেঙ্গল (স্ক্র্যাচ)

প্রথম ডিভিসন লীগ কোঠায় বিভিন্ন দলের অবস্থা

[২১শে জনু পর্যন্ত]

	খে	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	পয়ে
মোহনবাগান	১৪	৯	৫	০	১২	২	২৩
উয়াড়ী	১২	৮	৩	১	১৬	৫	১৯
ইস্টবেঙ্গল	১৩	৮	৩	২	১২	৬	১৯
এরিয়ান	১২	৬	৩	৩	১৯	৬	১৭
মহঃ স্পোর্টিং	১৩	৪	৫	৪	৯	৯	১৩
রাজস্থান	১২	৪	৪	৪	৯	৮	১২
ই আই আর	১২	৫	৩	৪	১১	১০	১২
কালীঘাট	১০	৩	৫	২	১০	৯	১১
পুলিশ	১২	৩	৪	৫	৬	১১	১১
স্পোর্টিং ইউঃ	১০	৪	২	৪	১০	৭	১০
বি এন আর	১০	৩	২	৫	৯	১৩	৮
খিদিরপুর	১২	১	৫	৬	৫	১২	৭
জর্জ টেলিঃ	১১	২	২	৭	৭	১৬	৬
ভবানীপুর	১২	০	৬	৬	১	৭	৬
কালঃ							
সার্ভিসেস	১১	১	১	৯	৩	১৭	৩

(ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে উয়াড়ীর 'ওয়াক-ওভার' এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছে)

উপর্যুপরি দুটি খেলায় পাকিস্থানের কৃতিত্ব

ইংলণ্ডে পাকিস্থান ক্রিকেট দল উপর্যুপরি দুটি খেলায় স্কটল্যাণ্ডকে ১০ উইকেটে এবং নটিংহামশায়ারকে ৮ উইকেটে পরাজিত করায় মোট ১২টি খেলার মধ্যে তারা ৪টি খেলায় জয়লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেছে। মামুদ হোসেন এবং ফজল মামুদের মারাত্মক বোলিংয়ের ফলেই শেষ দুটি খেলায় স্কটল্যাণ্ড ও নটিংহামশায়ারকে শোচনীয়ভাবে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। দুটি খেলার ফলাফল ঃ—

পাকিস্থান ঃ স্কটল্যাণ্ড

স্কটল্যাণ্ড—১ম ইনিংস (৭ উইঃ ডিঃ) ৩৫৩ (নিকল ৯৩, এ্যাচিসন ৬১, মেণ্ডল ৪৮, চীজহোম ৪৪; সুজাউদ্দিন ৬১ রানে ৩ উইঃ)

পাকিস্থান—১ম ইনিংস—২৯৫ (ওয়াকার হাসান ৭২, আলীমুদ্দিন ৩৫, গজালী ৩৫, কারদার ৪৪; নিকল ৪৬ রানে ৪ উইঃ, এডওয়ার্ড ৫৯ রানে ৪ উইঃ)

স্কটল্যাণ্ড ২য় ইনিংস—৫১ (মামুদ হোসেন ১৭ রানে ৬ উইঃ, গজালী ৫ রানে ২ উইঃ, খালিদ হোসেন ৩ রানে ১ উইঃ)

পাকিস্থান—২য় ইনিংস (নো উইঃ) ১১৪ (মাকসুদ ৫৫ ও আলীমুদ্দিন ৫৩)

(পাকিস্থান ১০ উইকেটে বিজয়ী)

পাকিস্থান ঃ নটিংহামশায়ার

পাকিস্থান—১ম ইনিংস—৩৭৩ (ইমতিয়াজ ৮১, গজালী নঃ আঃ ৬৭, কারদার ৫৭, হানিফ ৫৩, মাকসুদ ৪৬; ওয়াকার ৯১ রানে ৪ উইঃ)

নটিংহামশায়ার—১ম ইনিংস—১৫৫ (ওয়াকার ৬১; ফজল মামুদ ৬৬ রানে ৮ উইঃ)

নটিংহামশায়ার—২য় ইনিংস—২৭৪ (স্টেকস ৯৫, কেলী ৫১; মামুদ হোসেন ৭১ রানে ৫ উইঃ ও ফজল মামুদ ৩১ রানে ৩ উইঃ)

(পাকিস্থান ৮ উইকেটে বিজয়ী)

পিটার মের সহস্র রান

ইংলণ্ডের ক্রিকেট মরসুমে এ বছর উরস্টার কাউন্টির ডন কেনিয়ন সর্বপ্রথম সহস্র রান পূর্ণ করেছেন। কেনিয়নের পর যিনি সহস্র রান করবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তিনি হচ্ছেন সারের সুনিপুণ খেলোয়াড় পিটার মে। পিটার মে এ মরসুমে দুবার ডবল সেঞ্চুরীও লাভ করেছেন।

খেলাধুলোর টুকরো খবর

দিল্লী ফুটবল—দিল্লী ফুটবল লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক খেলায় নিউ দিল্লী হিরোজ ৩—১ গোলে দিল্লী মোগলস
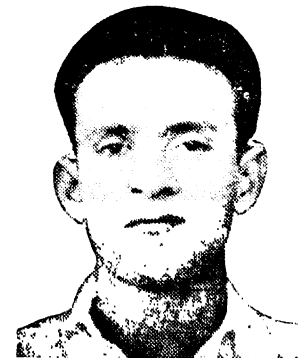
পাকিস্থানের ক্রিকেট খেলোয়াড় মকসুদ আমেদ ইংলণ্ডে এবছর সবচেয়ে কম সময়ে শতরান লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন

ইস্টবেঙ্গল ও ভবানীপুরের লীগের খেলায় ভবানীপুরের গোলের মুখের আর একটি চমৎকার দৃশ্য। ইস্টবেঙ্গল সেন্টার ফরোয়ার্ড গাজী এবং ভবানীপুরের গোল-কিপার আর গুহ ও ব্যাক এস ঠাকুরকে একই সংগে শূন্যে লাফিয়ে উঠে একটি বলকে ফেলবার চেষ্টা করতে দেখা যাচ্ছে

টিমকে হারিয়ে দিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে। গতবছরের চ্যাম্পিয়ন হিরোজ দল এবার অপরাজিত থেকেই এই কৃতিত্বের অধিকারী হল। ১৯৪৫ সালে এরা আর একবার লীগ বিজয়ী হয়।

দিল্লীর পুরানো ফুটবল ক্লাব রাইসিনা স্পোর্টিং—যারা ১৯৫২ সালে দ্বিতীয় ডিভিসনে নেমে গিয়েছিল, তারা এবার দ্বিতীয় ডিভিসনের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করায় আগামীবার থেকে আবার প্রথম ডিভিসনে খেলবার অধিকার অর্জন করেছে।

কার্ল ওলসনের সাফল্য—বিশ্বের মিডল-ওয়েট চ্যাম্পিয়ন মুষ্টিযোদ্ধা কার্ল ওলসন হনলুলুতে দশ রাউণ্ডব্যাপী মুষ্টিযুদ্ধের অষ্টম রাউণ্ডে সেণ্ট লুইস-এর মুষ্টিযোদ্ধা জোসি টার্নারকে টেকনিকাল নক আউটে হারিয়ে দিয়েছেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১৪ই জুন—প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করেন যে, পশ্চিমবঙ্গে কতকগুলি পুনর্বাসন পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে অথবা নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে নাই। ইহার অর্থ এই যে, পরিচালনা ব্যবস্থা আরও যোগ্যতাসম্পন্ন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

১৫ই জুন—নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্থানের প্রচার বিশারদের দল ভারতের উপর কলঙ্ক আরোপের উদ্দেশ্যে পাকিস্থান এবং মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতে ভারতবিরোধী প্রচারকার্য আরম্ভ করিয়াছে।

অন্ধ্র রাজ্যের অন্তর্গত ফরাসী উপনিবেশ ইয়েনামের স্বাধীনতা ঘোষণার পশ্চাতে ভারতের যোগসাজস ছিল বলিয়া প্যারিসে ফরাসী সরকার যে অভিযোগ করিয়াছেন, অদ্য নয়াদিল্লীর সরকারী মহল তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সরকারী মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, ইয়েনামের নাগরিকদের স্বাধীনতা ঘোষণায় ভারত সরকার, রাজ্য সরকার বা কোন সরকারী কর্মচারী কোন প্রকার প্ররোচনা দান করেন নাই।

আজ কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থিত চাংহোয়া রেস্তোরাঁ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি (লক্ষ্মীনারায়ণ পোদ্দার) এবং ২৮ বৎসর বয়স্কা জনৈকা স্ত্রীলোককে (গীতা মুখার্জি) সংজ্ঞাহীন এবং মুমূর্ষু অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। হাসপাতালে নীত হইবার অল্পক্ষণ পরেই তাহাদের মৃত্যু ঘটে। বিষক্রিয়ার ফলে তাহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। ইহা আত্মহত্যার ব্যাপার বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে।

১৬ই জুন—নয়াদিল্লীতে এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ফরাসী অফিসারদের পরিচলনাধীন পূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত একদল ফরাসী সৈন্য পণ্ডিচেরীতে অবতরণ করিয়াছে। ইন্দোচীনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী এই সৈনাদল ইন্দোচীন হইতে পণ্ডিচেরীতে আসিয়া পৌঁছায়। ভারত সরকার এ সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন।

১৭ই জুন—আজ নয়াদিল্লীতে ফরাসী দূতাবাসের উপদেষ্টা কাউণ্ট দ্য মারোল ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরে যাইয়া পররাষ্ট্র সচিব শ্রী আর কে নেহরুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি পণ্ডিচেরীতে সৈন্যাবতরণের সংবাদ অস্বীকার করেন। প্যারিসের সরকারী ইস্তাহার সমর্থন করিয়া তিনি বলেন, পণ্ডিচেরী উপনিবেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যাহাদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহারা পুলিশ বাহিনী মাত্র এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীন।

অদ্য দিল্লী কংগ্রেস এম এল এ এবং বিশিষ্ট স্থানীয় কংগ্রেসকর্মীদের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনেহরু বলেন, নবভারত গঠনের জন্য কংগ্রেসের এখনও গুরুত্বপূর্ণ বহু কাজ করিতে হইবে। সুতরাং কংগ্রেসের মধ্যে কোনরূপ দল গঠন বা বিশৃঙ্খলা সহ্য করা হইবে না। যাঁহারা কংগ্রেসের সম্মানহানিকর কার্যে লিপ্ত আছেন, তিনি তাঁহাদের তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ গবেষণার জন্য পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনকে ১৯৫৪ সালের জন্য 'সরোজিনী সুবর্ণ পদক' দানে সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

১৮ই জুন—আজ দমদম বিমান ঘাঁটির শুল্ক বিভাগীয় কর্মচারিগণ ফ্রান্স হইতে ইন্দোচীনগামী একখানি ফরাসী বিমানের যাত্রীদের মালপত্র তল্লাসী করিয়া কয়েকটি রিভলবার, লৌহ শিরস্ত্রাণ ও সামরিক সাজসরঞ্জামের সন্ধান পান।

ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের পূর্ব এসিয়া হেড কোয়ার্টারের প্রাক্তন জেনারেল সেক্রেটারী ও আজাদ হিন্দ সরকারের, ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীদেবনাথ দাস কলিকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে পুনরায় এইরূপ দাবী উত্থাপন করেন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর 'মৃত্যু রহস্য' সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধানের জন্য ভারত সরকারের পক্ষ হইতে অবিলম্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা আবশ্যক। ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট টাইহকুতে (ফরমোজা) নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনার উল্লেখ করিয়া শ্রী দাস বলেন, তাঁহার সুদৃঢ় ধারণা এই যে, হাসপাতালেই নেতাজীকে নিহত করা হয়।

১৯শে জুন—আজ নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সমস্যার আলোচনা করেন। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও সাহায্যদানের কার্য ত্বরান্বিত করার জন্য যথারীতি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

গতকল্য দমদম বিমান ঘাটির শুল্ক বিভাগীয় কর্মচারিগণ ফ্রান্স হইতে ইন্দোচীনগামী যে ফরাসী বিমানখানি আটক করেন, আজ সেই বিমানটিকে দমদম ঘাটি হইতে প্রস্থানের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু শুল্ক বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ঐ বিমান হইতে প্রাপ্ত ২৫টি প্যাকেজ এবং তিনটি রিভলবার আটক করিয়া রাখেন।

পুরীর জগন্নাথ মন্দির হইতে মদনমোহনদেবের ৩০ হাজার টাকা মূল্যের মুকুট অপহৃত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

২০শে জুন—পণ্ডিচেরীর সংবাদে প্রকাশ, ফরাসীরা পণ্ডিচেরীর সমগ্র সীমান্ত বরাবর পরিখা খনন করিতেছে এবং ফরাসী-ভারতের থানাগুলিতে মেসিনগান ও বেতার যন্ত্র বসান হইতেছে। গত কয়েকদিনে সীমান্ত এলাকায় ফরাসী পুলিসের নূতন নূতন ফাঁড়ি স্থাপিত হইয়াছে।

অদ্য কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক মহিলা সভায় নেতৃস্থানীয় মহিলাগণ বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতীয় নারীদের বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সভার উদ্বোধন করেন।

বিদেশী সংবাদ

১৪ই জুন—তুরস্ক ও পাকিস্থান সরকারের এক যুক্ত ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, দেশরক্ষা পরিকল্পনা রচনার জন্য উভয় দেশের সামরিক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অবিলম্বে আলাপ আলোচনা আরম্ভ হইবে।

১৬ই জুন—পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলি আজ দামাস্কাসে পৌঁছেন। 'রয়টারের' প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, মধ্য প্রাচ্যের সমস্ত দেশই তুরস্ক পাকিস্থান চুক্তির অংশীদার হইতে পারে। শুধু ইসরাইলকে ইহাতে যোগ দিতে দেওয়া হইবে না।

১৭ই জুন—পূর্ববঙ্গে গভর্নর শাসন প্রবর্তন সম্পর্কে পাক পার্লামেণ্টে বিরোধীপক্ষ হইতে তিনটি মূলতুবী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। প্রধান মন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলি আশ্বাস দেন যে, আগামী সপ্তাহে বা তাহার পরবর্তী সপ্তাহে পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ বিতর্কের জন্য তিনি একটি দিন নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

১৮ই জুন—মঃ পিয়ের মেঁদে ফ্রাঁস অদ্য প্রাতে ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি বামপন্থী র‍্যাডিক্যাল দলভুক্ত।

১৯শে জুন—কম্যুনিস্ট বিরোধী 'মুক্তিফৌজ' প্রতিবেশী রাষ্ট্র হণ্ডুরাস হইতে আক্রমণ চালাইয়া ২১ ঘণ্টার মধ্যে মধ্য আমেরিকার গুয়াতেমালা প্রজাতন্ত্রের আনুমানিক এক-তৃতীয়াংশ দখল করিয়াছে।

পূর্ববঙ্গের বরখাস্ত ফজলুল হক মন্ত্রিসভার সদস্য জনাব ইউসুফ আলি চৌধুরীকে (মোহন মিঞা) আজ ঢাকায় গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষান্মাসিক—১০৲

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২১ বর্ষ
সংখ্যা ৩৫

দেশ

শনিবার
১৮ আষাঢ় ১৩৬১

DESH

SATURDAY, 3RD JULY, 1954
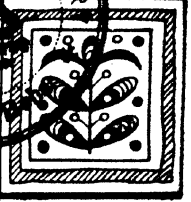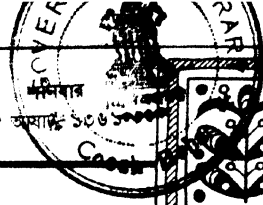
সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

বঙ্কিম স্মৃতিপূজা

গত ২৮শে জুন কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব-তিথি উদ্‌যাপিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র জাতিকে কি দিয়াছেন, এই বিচার করিবার আগে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান হইতে যদি আমরা বঞ্চিত হইতাম, তবে আমাদের অবস্থা কোথায় গিয়া দাঁড়াইত, এই বিচারই আমাদের কাছে সমীচীন বলিয়া মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে ভাষা দিয়াছেন, তিনি আমাদের সুগঠিত সাহিত্য দিয়াছেন, এ সবই সত্য। তাঁহার অবদানের পরিমাণ মনীষিবর্গের বিচার্য। এদিক হইতে তাঁহার সৃষ্টির নিরিখ তাঁহারাই করিতে পারেন। সাধারণভাবে দেখিতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্র জাতিকে জীবন দিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে 'বন্দে-মাতরম্' এই মন্ত্র দান করিয়াছেন। অন্তরের উৎস হইতে যে দান, সে দান এবং তেমন দানই জাতির মনোমূলে প্রাণশক্তি সঞ্চার করিতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র সাধক। তিনি তাঁহার অন্তরে এই শক্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন। তিনি শুধু বাহির হইতে খুঁটিয়া-খাটিয়া কতকগুলি নীতি বা সূত্রকেই তাঁহার জ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন নাই। জাতির আত্মার চিন্ময়ী মূর্তিকে বঙ্কিমচন্দ্র মনের মূলে উজ্জ্বল আলোকে লীলায়িত দেখিয়াছিলেন। ভারতের আত্মার মনোময়ী মূর্তিতে অভিব্যক্তি ইতঃপূর্বে মুনি-ঋষি কাহারো সাধনায় এভাবে ঘটে নাই। মায়ের লীলারসে নিজেকে নিবেদন করিয়া তিনি নবসৃষ্টির প্রেরণাকে জাতির অন্তরে উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন। প্রাণরসে নিসিক্ত শক্তির এই প্রমূর্ত সংস্পর্শেই অমৃত, জড়-জীবন হইতে দিব্য-জীবনের রূপায়ন। বঙ্কিমচন্দ্র ঋষি, তিনি মন্ত্রদ্রষ্ট পুরুষ। তিনি অমৃতে অভিষিক্ত হইয়াছেন। আমাদিগকেও জীবন-সাধনায় সেই অমৃতের স্পর্শ দিয়া গিয়াছেন। সমগ্র জাতির তিনি মন্ত্রদাতা, পিতা। তিনি আমাদের সকলের গুরু। বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব দিবসে তাঁহার চরণমূলে প্রণত হইয়া দুর্গত জাতি মৃত্যু হইতে সেই অমৃতই ভিক্ষা করিয়াছে, অন্ধকার হইতে আলোকের নির্দেশ চাহিয়াছে।

ভারতে চীনের প্রধান মন্ত্রী

চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই'র ভারতে আগমন আমাদের মনে নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সহিত চীনের প্রধান মন্ত্রীর আলাপ-আলোচনা শুধু সৌজন্যগত ব্যাপার নয়, ইহার মূলে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব রহিয়াছে এবং সেই দিক হইতে ইহা ঐতিহাসিক ব্যাপার। ভারতের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক আজ নূতন নয়। প্রত্যুত ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সহিত চীনের সম্বন্ধ দুই হাজার বৎসরের পুরাতন। এই দুই দেশের দার্শনিকতা উভয় দেশের মনীষী-বর্গের সাধনা এবং অবদানকে ভিত্তি করিয়া প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যায়কে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। বোধিদ্রুমমূলে যে মহান্ সত্য জগতে প্রকটিত হয়, ভারত হইতে চীবরধারী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ উত্তুঙ্গ হিমগিরির দুর্লঙ্ঘ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া সেই আর্য সত্যের আলোকবর্তিকা মহাচীনে বহন করিয়া লইয়া যান এবং চীন হইতে পরিব্রাজকের দল জিজ্ঞাসুবেশে ভারতের পুণ্যতীর্থে সমাগত হন। কিন্তু পরাধীনতার প্রভাবে চীন এবং ভারতের পারস্পরিক সংস্কৃতিগত এই সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায় এবং একটা ব্যবধান-বোধ জমিয়া উঠে। স্বাধীন ভারতে চীন সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রনায়কের আগমন অন্ধকারের এই যবনিকা উত্তোলন করিয়া বর্তমান আন্তর্জাতিক আকাশের দুর্যোগসমাচ্ছন্ন দিক্‌চক্রবালে অভিনব আশার আলোক উদ্দীপ্ত করিল। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে এশিয়ার এই দুইটি বৃহত্তম জাতি এক হইয়া চলিয়াছে। বস্তুত নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির হীন প্রয়োজনে যাঁহারা চীন সাধারণতন্ত্রের মত বৃহৎ এবং সুপ্রতিষ্ঠ শক্তিকে অস্পৃশ্য পর্যায়ে পরিণত করিবার চেষ্টায় আছে, তাহাদের প্রয়াস ব্যর্থ হইতে বাধ্য। এশিয়া আজ নবজীবনে জাগ্রত হইয়াছে, সাম্রাজ্যবাদের শোষণ, পীড়ন এবং অনাচার আর সেখানে চলিবে না। শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে স্বার্থের খেলা আর সেখানে খাটিবে না। এশিয়ার স্বার্থ-শোষণে লোলুপ শক্তিনিচয় চীন এবং ভারতের এই মৈত্রীকে শংকার দৃষ্টিতে দেখিবে, ইহা স্বাভাবিক। বিশেষ রাজনীতিক মতবাদের সম্বন্ধে বিভীষিকা জাগানোও এক্ষেত্রে বিচিত্র নয়। কিন্তু ভারত ইহাদের পাকচক্রে কোনক্রমেই পড়িতে প্রস্তুত নহে। স্বাধীন ভারত বিশ্বের শান্তিকামী এবং সেই প্রয়োজনে ভারত নিরপেক্ষভাবেই

অগ্রসর হইবে। ভারতের এই নিরপেক্ষতা বলিষ্ঠ এবং সক্রিয়। সে নিরপেক্ষতার মূলে শক্তি আছে, আদর্শ আছে। আত্মপ্রতিষ্ঠ ভারত সুদৃঢ় সঙ্কল্পশীলতার সহিত নির্ভীক পদক্ষেপে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আজ অগ্রসর হইতেছে চীনের প্রধান মন্ত্রীর সর্বজনীন অভিনন্দনে এই সত্যটি সুস্পষ্ট হইয়াছে। জনগণের কণ্ঠে এশিয়ার জাগ্রত আত্মার বাণী আমরা শুনিতে পাইয়াছি।

পঞ্চায়েতের পুনরুজ্জীবন

সম্প্রতি সিমলা শহরে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রীদের একটি সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে রাজকুমারী অমৃত কাউর ও ভারতীয় লোকসভার স্পীকার শ্রীযুত মবলঙ্কর উভয়ে পঞ্চায়েত পদ্ধতি সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ভারতের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। ভারতের ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার গ্রামের মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র ১ লক্ষ গ্রামে পঞ্চায়েতী প্রথায় স্বায়ত্তশাসনের নীতি আংশিকভাবে প্রবর্তিত হইয়াছে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী পঞ্চায়েতী প্রথার উপর ভিত্তি করিয়াই গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা এদেশে সম্প্রসারিত করিবার নীতি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সর্বোদয় সমাজ গঠনের মূলে সেই আদর্শই রহিয়াছে। ভারত সরকার অবশেষে এই নীতির গুরুত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পাঞ্চায়েতী পদ্ধতিতে প্রথম উন্নয়নের রীতিকেই ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছে। সমগ্র ভারতে স্বাধীনতার উদার প্রতিবেশ সৃষ্টি করিবার ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় এবং স্বাবলম্বনের পথে সংগঠনের আগ্রহ এবং উৎসাহ সমাজ-জীবনে সার্থকরূপে জাগাইয়া তোলা এই উপায়েই সম্ভব। কিন্তু এই কাজ দ্রুততার সহিত সম্পন্ন করিতে হইলে শাসন ব্যবস্থার কাঠামোর সংস্কার সাধন করা আবশ্যক। বিভিন্ন গ্রাম কেন্দ্রগুলি যাহাতে অখণ্ড রাষ্ট্রীয় চেতনায় সংহত থাকিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে, রাষ্ট্রের অর্থনীতিক পরিবেশ তদনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। বস্তুত ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করিতে চায় না, মানুষের ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ অভিব্যক্তির পথেই ভারতের সভ্যতা রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের উন্নয়ন চায়। পঞ্চায়েতী প্রথা সম্প্রসারণের মূলে মানুষের এই আদর্শটি সুস্পষ্ট রাখিতে হইবে। শাসনতান্ত্রিক গোষ্ঠী-স্বার্থগত আভিজাত্য বোধের বিলোপ সাধন করিয়া জনগণের সেবার ভাবটিকে প্রতিষ্ঠা দেওয়াই পঞ্চায়েতী প্রথা সম্প্রসারণের নীতির মূলে থাকা দরকার। এদেশের শাসন-বিভাগের সহিত আমলাতান্ত্রিক একটা সংস্কার একান্তভাবে জড়াইয়া মিশাইয়া গিয়াছে। শাসকশ্রেণীর সংস্কারের সেই গ্রন্থি ছিন্ন করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। সরকারী নীতিতে এই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং অর্থনৈতিক যে বৈষম্য শাসক এবং জনগণের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিতেছে তাহা ভাঙিগয়া দিতে হইবে। বস্তুত মান, যশ, প্রতিষ্ঠার চক্রে পড়িয়া সমাজ-জীবনের বিকাশ এখানে আজও ব্যাহত হইতেছে। মানুষ গড়িয়া তুলিতে হইলে সর্বাগ্রে মানুষেরই প্রয়োজন।

সম্পর্ক ছেদন

গত ১লা জুলাই হইতে দক্ষিণ আফ্রিকা রাষ্ট্রের সহিত ভারতের কূট-নীতিক সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে। ভারত সরকার দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয় হাই-কমিশনারের আফিস বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ফলত ভারত সরকার নিজেরা ইচ্ছা করিয়া এ কাজ করেন নাই, দক্ষিণ আফ্রিকার মালান সরকারের সিদ্ধান্তের ফলেই তাঁহাদিগকে এই কাজ করিতে হইয়াছে। আমাদের মতে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে পূর্বেই এই কাজ করা উচিত ছিল। কারণ মালান সরকার পদে পদে ভারত সরকারকে যেভাবে অপদস্থ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা রাষ্ট্রনীতিগত সৌজন্য এবং সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। ভারত সরকারের ইহা বুঝা উচিত ছিল যে, মধ্যযুগীয় বর্বরতার সঙ্গে গণতান্ত্রিকতার কোন আপস-নিষ্পত্তি চলে না এবং পশুমনোবৃত্তির সহিত মানবতার নীতি সূত্রের সামঞ্জস্য সাধন কোন ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। আদর্শের দিক দিয়া উভয় রাষ্ট্রের প্রভেদ এবার স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহাতে ভারতের কোন ক্ষতি হইবে না। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্বর বর্ণবৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে ভারতের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। বিশ্বের জনমত এক্ষেত্রে ভারতের পক্ষেই জাগ্রত হইয়াছে। বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের নীতির নিন্দাই করিয়াছেন, কিন্তু মালান সরকার সেকথা গ্রাহ্য করেন নাই। এক্ষেত্রে বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের অন্যায়ের প্রতিকারের অসামর্থ্যই একান্তভাবে উন্মুক্ত হইয়াছে। কিন্তু মানবতার বিরুদ্ধে যাহারা নির্বিবেকভাবে পশুশক্তি প্রয়োগ করিয়া চলিয়াছে, তাহারা যে বিশ্বের সর্বত্র নিন্দিত এবং ধিক্কৃত হইতেছে, ইহারও একটা মূল্য আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের কূট-নীতিক সম্পর্ক এইভাবে ছিন্ন হইলেও দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের মানবিক অধিকার ও মর্যাদার সংকটকে ভারত উপেক্ষা করিতে পারিবে না। মানবীয় সভ্যতার বৈরী বর্ণবৈষম্যকারীদের বিরুদ্ধে সে তাহার সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইবে না। বিশ্বমানব-সমাজকে এই সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে যে, মালান সরকারের দুষ্ট নীতি যদি উৎখাত সাধিত না হয়, তবে সমগ্র এশিয়ায় আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। জাগ্রত মানবের আত্মা পশুত্বের পীড়ন বেশী দিন মাথা পাতিয়া বরদাস্ত করিবে না। ফলত শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্ববাদের পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত ভারতের কূটনীতিক সম্পর্ক ছেদন ইতিহাসের সেই অধ্যায়কেই আগাইয়া আনিল।

চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই দিল্লীতে তিনদিন ভারত সরকারের আতিথ্য গ্রহণ করে সোমবার রেঙ্গুনে যান এবং সেখানে দুদিন থেকে স্বদেশে ফিরে যাচ্ছেন। মিঃ চৌ ভারতে আসছেন, এ সংবাদ যেমন সহসা প্রকাশিত হয়, তেমনি তাঁর বর্মায় যাবার সিদ্ধান্তের আভাসও পূর্বে থেকে পাওয়া যায় নি। সম্ভবত বেশি আগে সেটা স্থিরও হয়নি। অবশ্য চীন প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে বর্মা সরকারের আলোচনা করার এমন সব বিষয় আছে, যেগুলি কেবল "বিশ্বশান্তি" রক্ষার ব্যাপার নয়, যেগুলির সঙ্গে উভয় দেশ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ভারতবর্ষ ও চীন পরস্পরের প্রতিবেশী বটে, কিন্তু উভয়ের কোথাও সীমানাঞ্চলের অবস্থা উপদ্রুত নয়, যেমন চীন ও বর্মার সীমানাঞ্চল উপদ্রুত। যে কুমিনটাং সৈন্যেরা দীর্ঘকাল ধরে বর্মার মধ্যে আস্তানা নিয়েছে, তাদের দূর করা এখনও সম্ভব হয়নি। তাদের ফরমোজায় পাঠাবার পরিকল্পনাও ঠিক-মতো কার্যে পরিণত করা হয়ে উঠছে না। কুমিনটাং সৈন্যদের বর্মার মধ্যে থাকা বর্মা গভর্নমেণ্টের পক্ষেও যেমন অস্বস্তিকর ও বিপজ্জনক, পিকিং সরকারেরও সেটা তেমনি অনভিপ্রেত। এই উৎপাত বর্মা গভর্নমেণ্টের একটা বড়ো দুশ্চিন্তার বিষয়। আরো মুশকিল এই জন্য যে, বর্মার আভ্যন্তরিক শান্তি এখনো পূর্ণ-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি, বিদ্রোহীদের সঙ্গে এখনো বহু অঞ্চলে লড়তে হচ্ছে। বিদ্রোহীদের মধ্যে আবার কম্যুনিস্টও আছে। বর্মার অধিবাসীদের মধ্যে বিশেষ করে রেঙ্গুন প্রভৃতি শহরাঞ্চলে চীনার সংখ্যা নগণ্য নয়, এদের মধ্যেও আবার কম্যুনিস্ট-দরদী ও কম্যুনিস্ট-বিরোধী দুই রকমই আছে। সমস্ত মিলে অবস্থাটা এইরকম, যাতে বর্মা সরকারের যথেষ্ট অস্বস্তিবোধ করার কারণ আছে এবং চীন সম্বন্ধে খুব সতর্ক অথচ বন্ধুভাবাপন্ন ভাব রক্ষা করার প্রয়োজন। বর্মা কম্যুনিস্ট চীনের দ্বারা কবলিত হতেও চায় না, আবার কম্যুনিস্ট চীনকে চটানোও তার পক্ষে মারাত্মক হবে। সুতরাং বর্মার পক্ষে কোন ব্লকে যোগ না দিয়ে নিরপেক্ষতা রক্ষার চেষ্টাই একমাত্র আত্মরক্ষার উপায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইউ নুর গভর্নমেণ্ট সেই চেষ্টাই করছেন এবং এই জন্যই বর্মা সরকার ভারতের নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির সবচেয়ে আন্তরিক সমর্থক ও অনুসরণকারী।

মিঃ চৌ অবশ্য এই নিরপেক্ষতাকে কিঞ্চিৎ লালাভ করে দেবার চেষ্টায় আছেন। কলম্বো কনফারেন্সে যে পাঁচ দেশের প্রধান মন্ত্রীরা যোগ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে পাকিস্থান ও সিংহলের গভর্নমেণ্ট খোলা-খুলিভাবে কম্যুনিস্টবিরোধী বলে নিজেদের জাহির করেছেন। ভারত, বর্মা এবং ইন্দোনেশিয়া নিজেদের বৈদেশিক নীতিতে নিরপেক্ষ ভাব বজায় রাখতে চায়। মিঃ চৌ পাকিস্থান বা সিংহলের কাছে ঘেঁষতে চান না, তারাও তাঁকে ঘেঁষতে

দিতে চায় না। অন্যদিকে ভারত, বর্মা ও ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ আছে এবং সেই সুযোগ তিনি নিচ্ছেন। মিঃ চৌএর ভারতবর্ষ ও বর্মায় আগমন একটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলে প্রতিভাত হবে, কারণ দিল্লী ও রেঙ্গুন তাঁর পথে পড়েছে বলা যায়। ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জ্যাকর্তা যদি সেইরকম তাঁর পথে পড়ত, তবে মিঃ চৌ জ্যাকর্তায় নেমে এক-আধদিন থেকে যাবার ইচ্ছা হয়ত প্রকাশ করতেন। কিন্তু জ্যাকর্তায় যেতে হলে একটু ঘুরে যেতে হয় এবং সেটা করলে স্পষ্টই দেখা যেত যে, মিঃ চৌ কলম্বো কনফারেন্সের এক ভাগকে—যেটা বড়ো ভাগ, সেটাকে কাছে টানার চেষ্টা করছেন। ব্যাপারটা এতো স্পষ্ট হলে তার মূল্য কমে যেতো। তবে তথাকথিত "কলম্বো শক্তি"দেরও যে দুই ব্লকের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়ার চেষ্টা চলছে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। "কলম্বো কনফারেন্সের" সম্মিলিত একটা নৈতিক প্রভাব সৃষ্টির আশা অনেকে করেছিলেন, সেটা ব্যর্থ হয়ে গেছে।

এখানে আর একটা কথা উল্লেখযোগ্য। ইন্দোনেশিয়ার নিরপেক্ষতা ভারতবর্ষ ও বর্মার নিরপেক্ষতার চেয়ে কিঞ্চিৎ কম মজবুত হতে পারে। অবশ্য আসল সঙ্কটের দিনে ভারত সরকার ও বর্মার নিরপেক্ষতার অবস্থাই বা কী হয় কে জানে! যাই হোক, ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে আর একটা প্রভাবের কথা মনে রাখা দরকার। বালি দ্বীপ বাদ দিলে ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীরা সব মুসলমান। তুর্কী ও পাকিস্তান ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং এদের সহায়তায় সারা মুসলিম অধ্যুষিত মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের বন্ধন সুদৃঢ় করার চেষ্টা চলছে। ঐস্লামিক ঐক্যের দোহাই দিয়ে ইন্দোনেশিয়াকেও এক সূত্রে গাঁথার চেষ্টা যে হচ্ছে না তা নয়। এখন পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ায় বামপন্থীদের প্রভাব অল্প নয়। মার্কিন সাহায্য নেয়ার প্রস্তাবে স্বীকৃত হওয়ার জন্য এক মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। সুতরাং ইন্দোনেশিয়াকে খুব সহজে নিরপেক্ষতার নীতি থেকে বিচ্যুত করা হয়ত যাবে না। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার আভ্যন্তরিক অবস্থা ভালো নয়, দেশ দুর্বল। এ অবস্থায় বাইরে থেকে সাহায্য করে—বিশেষ করে তার সঙ্গে যদি একটা ধর্মীয় দোহাই জুড়ে দেয়া যায়, তবে অনেক কিছু করা যেতে পারে। যাই হোক, এখন পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া নিরপেক্ষ নীতিই অনুসরণ করছে।

দিল্লীতে আলাপ-আলোচনার পরে মিঃ চৌ ও পণ্ডিত নেহরু যে দীর্ঘ যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে নূতন কথা তেমন কিছু নেই। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শান্তি স্থাপনের পক্ষে কোন বিশেষ নূতন প্রস্তাব যদি উভয়ের মধ্যে আলোচিত হয়ে থাকে, তবে বিবৃতিতে তার কোন আভাস নেই। ইন্দোচীনের ব্যাপারে মিঃ চৌ জেনেভাতে যতখানি বলে এসেছেন, তার চেয়ে বেশি কিছুর ইঙ্গিত দিল্লীর বিবৃতিতে নেই। তবে ভিতরে আরো কিছু কথা হয়ে থাকতে পারে, যা প্রকাশ করা হয়নি।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবহার কিরূপ হলে আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সে বিষয়ে তিব্বত সম্পর্কিত চীন-ভারত চুক্তির ভূমিকায় উল্লিখিত নীতিগুলিকে চৌ-নেহরু বিবৃতিতে খুব উচ্চস্থান দেয়া হয়েছে। নীতি হিসাবে সেগুলি খুবই ভালো এবং কোন গভর্নমেণ্টই মুখে সেগুলি অস্বীকার করে না। কিন্তু মুশকিল হয় কাজের বেলায়। সমানে সমানে যখন মামলা এবং উভয়পক্ষ যখন নিজ নিজ স্বার্থে আপসের জন্য প্রস্তুত হয়েছে, তখন পরস্পরের সার্বভৌমত্বের সম্মান রক্ষা, একে অপরের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হাত না দেওয়া প্রভৃতি কথা মেনে নেয়া সহজ, কিন্তু যেখানে বড়ো ও ছোটোর মধ্যে মামলা, যেখানে শক্তি ও সুবিধার বৈষম্য বর্তমান, সেখানে নীতিবাক্য শুনেছে কে? যাঁরা বলছেন, তাঁরাই কি শোনেন?

ওয়াশিংটনে প্রেসিডেণ্ট আইজেন-হাওয়ার ও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিলের কথাবার্তার পরে যে বিবৃতি দেয়া হয়েছে, তার সুর আলাদা। তার মধ্যে নীতিকথা অল্প। এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আমেরিকা ও বৃটেনের মনোভাব কী এবং তারা কী করতে চায় তা যে সবই অকপট প্রকাশ করা হয়েছে তা নয়, তবে মোটামুটি বুঝা যায় যে, কম্যুনিস্টপক্ষের উপর চাপ—রাজনৈতিক এবং সামরিক উভয় প্রকারের চাপ বজায় রাখার নীতি আমেরিকা ও বৃটেন চালিয়ে যাবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তার জন্য একটি সামরিক চুক্তির ব্যবস্থার উদ্যোগ আয়োজনও চলতে থাকবে। ইন্দোচীনে একটা সমঝোতা হয় কিনা তার উপর হয়ত সে চুক্তির রূপ কিছুটা নির্ভর করবে, কিন্তু ইন্দোচীনে সমঝোতা হোক বা না হোক, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তার জন্য একটা চুক্তির ব্যবস্থা করতে আমেরিকা এবং তার সঙ্গে বৃটেন এখন কৃতসংকল্প। ওয়াশিংটনের বিবৃতি থেকে মনে হয় যে, ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের ধারণা যে চাপ দিতে থাকলে কম্যুনিস্ট পক্ষ আরো নরম হবে।

৩০।৬।৫৪

তারের যন্ত্র যারা বাজান এবং যারা শোনেন দুই পক্ষেরই অনেকক্ষণ এক জাতীয় যন্ত্র বাজাতে এবং শুনতে ভাল নাও লাগতে পারে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, ইচ্ছা থাকলেও যে যন্ত্রটি বাজান হচ্ছে সেটিকে রেখে আবার আর একটি নতুন বাদ্যযন্ত্র জোড়াজোড় করে নিয়ে বাজাতে বসা ঘটে ওঠে না। এই অসুবিধা বোধ হয় দূর করা সম্ভব হবে—যদি যন্ত্র 'ফোর ইন

'ফোর ইন ওয়ান' বাদ্যযন্ত্র

ওয়ান' বাদ্য যন্ত্র নিয়ে কোন বাজিয়ে বাজাতে বসেন। এটিতে চার রকমের তারের যন্ত্র যেমন বেহালা, আন্তলীন, গিটার এবং ব্যাঞ্জো এক সঙ্গে লাগান আছে। বাদ্যকার ইচ্ছা করলেই একটা যন্ত্রের বাজনা থামিয়ে আর একটা বাজাতে পারেন।

*   *   *

শব্দকে চড়া করে বা বড় করে শোনার জন্য আজকাল কী বহুলভাবে যে লাউড্-স্পীকারের প্রচলন হয়েছে শহরে যাঁরা বাস করেন তাঁদের কাছে তা আর নতুন করে বলার দরকার নেই। শব্দকে কম করে শোনার কোন যন্ত্র আছে কি না তাই এখন জানার বিশেষ দরকার হয়েছে। শরীর ও মন যখন রীতিমত বিশ্রাম চায় তখন যেন শহরের এই সব গোলমাল কলকারখানার

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

আওয়াজ ইত্যাদি থেকে দূরে গিয়ে বাস করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সব সময় তা সম্ভব হয় না। সুখের বিষয় যে, আজকাল একরকম যন্ত্র বার হয়েছে যেগুলো এই রকম কলকারখানার আওয়াজ কমিয়ে দিতে পারে। এগুলোকে 'সনোমেরবার্স' বলা হয়। যন্ত্রটি ছোট একটি ফুটো ফুটো এলুমিনিয়মের বাক্সে বসান থাকে। এক একটি বাক্স যন্ত্রসহ ওজনে দু পাউণ্ডের কিছু বেশী হয়। এই যন্ত্রটি উঁচু, চড়া, গম্ভীর ইত্যাদি যে কোনও রকম আওয়াজই কমিয়ে দিতে পারে। এই যন্ত্রে এমন ব্যবস্থা থাকে যে, বাইরের সমস্ত শব্দতরঙ্গ নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে হয় এই তরঙ্গটা নিজের মধ্যে লুপ্ত করে ফেলে না হয়তো টুকরো টুকরো করে হাওয়ায় ভাসিয়ে দেয়। যে সব জায়গায় অনবরত খুব বেশী আওয়াজ হওয়ার জন্য শহরের লোকের অস্বস্তি ঘটে সেখানে এই 'সনোমেরবার্স' অনেকগুলো একসঙ্গে বসিয়ে দিলে আওয়াজ কম হয়।

*

গল্পে শোনা যায় কোনও ব্যক্তি তীর্থযাত্রাকালে এক সিন্দুক টাকাকড়ি বন্ধুর কাছে গচ্ছিত রাখেন। ফিরে এসে সেই টাকার সিন্দুক ফিরে চাইতে উত্তর পেয়েছিলেন সে সব না কি উই-এ খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। এ কাহিনী নাকি নিছক বানানো গল্প এর মধ্যে সত্য নেই অর্থাৎ উই-এ সিন্দুক খেয়ে শেষ করতে পারে না। কিন্তু আমরা যখন দেখি বড় কাঠের জিনিস, দপ্তার জিনিস এমন কি সিমেন্টের মধ্যে উই পোকা রীতিমত মৌরসী পাট্টা গেড়ে বসে তারপর সেগুলো ঝাঁঝরা করে দেয় তখন আর কিছুই অবিশ্বাস্য মনে হয় না। কলোরাডো দ্বীপে উই পোকা ধ্বংস করার জন্য একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার তৈরী হয়েছে। এখানে দেখা হয়েছে এ সব উই পোকাদের ধ্বংস করা খুবই শক্ত। যে সব পদার্থে উই লাগে তাতে নানা রকমের বিষ দিয়ে দেখা গেছে যে, এতে এদের কোনই ক্ষতি হয় না। এই গবেষণাগারে প্রায় ৪০০ রকম ভাবে কাঠে বিষ এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য লাগিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এই পরীক্ষায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা হয়েছে যে, উইএ অনায়াসে কাঠ খেয়ে ফেলেছে বিষ এবং রাসায়নিক দ্রব্য এদের প্রতিরোধ করতে পারেনি। কেন যে উইদের বিষ কাবু করতে পারে না—কারণ উই কাঠের সেলুলোজ তার খাদ্য হিসাবে খায় বটে, তবে সেটা সে নিজের ক্ষমতায় হজম করতে পারে না। এটা হজম করবার জন্য এক ধরনের ব্যাকর্টিরিয়ার প্রয়োজন। আর এই ব্যাকর্টিরিয়া উইদের পাকস্থলীতে থাকে। সাধারণভাবে যে বিষ কাঠে লাগান হয় সেগুলো দেখা গেছে যে ব্যাকর্টিরিয়ার কোন ক্ষতি করতে পারে না। এখন যদি এই ব্যাকর্টিরিয়াকে কোন রকম বিশেষ ধরনের বিষ অথবা রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে মারা যায় তাহলে খাদ্য হজম করতে না পেরে উই পোকারা সহজেই ধ্বংস হবে। তবে এ সম্বন্ধে একটা সাবধানতার প্রয়োজন। যেমন অনেক ব্যাকর্টিরিয়ার পেনিসিলিন এবং স্ট্রেপটোমাইসিন জাতীয় ওষুধ বেশী প্রয়োগের ফলে একটা প্রতিরোধের ক্ষমতা জন্মায় সেই রকম বেশী বিষ দিলে এই উইদের পেটের মধ্যের ব্যাকর্টিরিয়ারও একটা প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মাচ্ছে দেখা যায়। আর এর ফলেই উইপোকারা বেশ স্বচ্ছন্দে বিষ মাখান কাঠ অথবা অন্য কোন বস্তু কেটে কিম্বা গর্ত করে নষ্ট করতে পারে।

সিস্‌ গাছ　　　　　　　　　　শ্রীনন্দলাল বস্‌
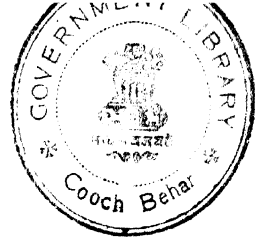
কলকাতায় আজীবন

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

সেই দিন আর আসবেনা।
বাগানে থাকত যদি হেনা
তারি ফুল দিত স্বপ্ন নীল
ফল রং দিয়ে যেতো সবুজ-কমলা,
ওই ফল-ফুল নিয়ে মনে-মনে কতো কথা বলা!

আসবেনা কাছে উড়ে চিল
একটি পালকে তার দিয়ে যেতে দেনা।
মেটে কাগজের নাম ছিল বুঝি বালি
তার গায়ে মিহিমোটা লেখা পেতে ফোঁটা-ফোঁটা কালি
আর পড়বেনা,
পাখের কলমে সাধ ফিরবেনা বুঝি!

আজ কতো কথা-লেখা খুঁজি
মহানগরীর গলি, উপগলি, শাখাগলি বেয়ে
ভাঙা পাঁচিলের গায়ে শ্যাওলার ছবি থাকে চেয়ে
বলে ছোটবেলাকার পুঁজি
এখানেও ছিল, ছিল স্বপ্নে দেখা মেয়ে।

ভাঙন

হরপ্রসাদ মিত্র

কোথাও প্রখর বেগ,
কোথাও-বা ঢেউহীন খাড়ি।
অনেক ঘূর্ণিময় সরু মোটা সোজা বাঁকা স্রোত
নানা দেশে, মহাদেশে
কূলে কূলে উছল কুটিল।
কিছু তার জানা, আর,
বেশি তার অজানা বটেই।

আমাকে দিয়েছ নদী—
ঢেউ, জল
রস, রসাতল!
আমার স্বদেশ জানি সে এলাকা ছাড়িয়ে আরও
অনেক, অনেক বড়ো!
—এ ভাবনা রোদের চমক
রয়েছে সমস্ত জুড়ে
তটে ঘাটে নিয়ত জাগর!

একথা নানান ক্ষণে মনে হয় কোন্ ছাঁদে ধরি—
কেবলি কিনারা ভাঙে তাই মোর অশান্ত লহরী।

শিল্পচর্চা

শ্রীনন্দলাল বসু

জীবন্ত প্রাণীর রূপ অঙ্কন

প্রত্যেক জীবের আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের মেরুদণ্ডের এক-একটি স্থায়ী ভঙ্গী আছে। আবার বিশেষ উত্তেজনার বশে ঐ-সব ভঙ্গীর সাময়িকভাবে বিশেষ পরিবর্তন হয়। জীবন্ত প্রাণীর ছবি করতে হলে দরকার—

১। ঐ জীবটির শিরদাঁড়ার স্থায়ী ভঙ্গী ঠিক করা।

২। স্থায়ী ভঙ্গী ঠিক হল তো, ভাব-অনুরূপ শিরদাঁড়ার পরিবর্তিত সাময়িক ভঙ্গীটি আঁকা—মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত শিরদাঁড়ার কতক অংশ যে-কোনো ভাব প্রকাশের কালেও স্থির থাকে, কতক অংশ ঘোরানো-ফেরানো যায়—ঈর্ষা, দ্বেষ, ক্রোধ ইত্যাদি ভাবের আবেশে দেহ সংকুচিত হয় আর হর্ষ-উৎফুল্লভাবে দেহ বিকশিত ও লীলায়িত হয়।

৩। মাথার মাপের তুলনায় শরীরের লম্বা, চওড়া ও উঁচার মাপ, এক-একটি অঙ্গের মাপ, ঠিক করা দরকার।

৪। জীবদেহের ছবিতে লাবণ্য যোগ করা। জীবটির সামগ্রিক রূপ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রূপ, স্বভাবের মধ্য বস্তুর রূপের সাদৃশ্য দ্বারা একটি সরল সলীল ছন্দে গাঁথা। এটি শিল্পীর ব্যক্তিগত দক্ষতা, রুচি ও প্রতিভার ব্যাপার; তবে পূর্বগামী শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কাজ দেখে এ বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করা বা দিগ্‌দেশের ইঙ্গিত পাওয়া সম্ভব। প্রাচ্য চিত্রে সাদৃশ্যের ব্যবহার সম্পর্কে 'শিল্পকথায়' বা শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের 'ভারত শিল্পে মূর্তি' গ্রন্থে বিশদ আলোচনা আছে
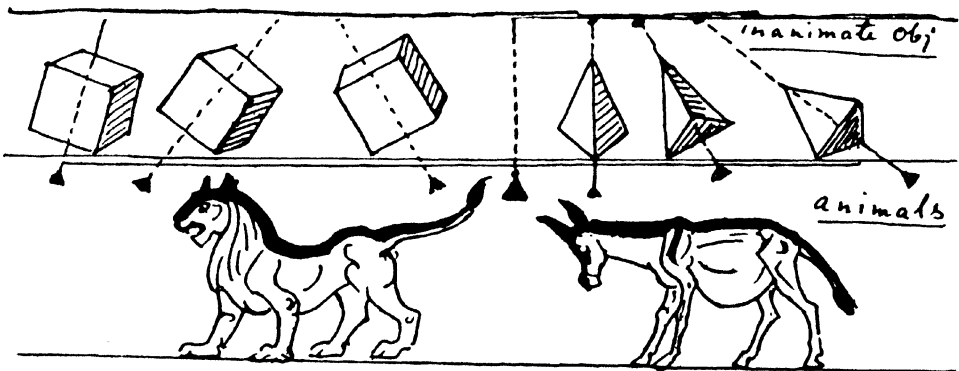
বস্তুর ঘোরা-ফেরা নির্ধারিত হয় বস্তুর একটি 'মধ্যরেখা'র আশ্রয়ে। জড় বস্তুর বেলায় সেটিকে বলি ব্রহ্মসূত্র (plumb line) আর জৈব বস্তুর বেলায় সেটি হল জীবের শিরদাঁড়া।

৩

ক, খ, গ, ঘ অংশ নোয়ানো ও ঘোরানো যায়। 1, 2, 3 সেরূপ যায় না; স্থির অংশ।

হাঁটু থেকে পা পিছন দিকে মুড়বে ও ঘুরবে।

কনুই থেকে হাত সামনে ভিতর দিকে মুড়বে ও ঘুরবে।
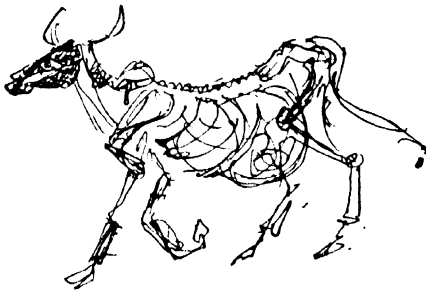
যেমন মানুষের বেলায়, তেমনি জীবজন্তুর বেলাতেও, বিভিন্ন হাড়ের জোড় কোথায় কেমন এবং তার আশ্রয়ে কোন্ অংগ কোন্ দিকে ঘোরে-ফেরে জানা চাই।

৮।।
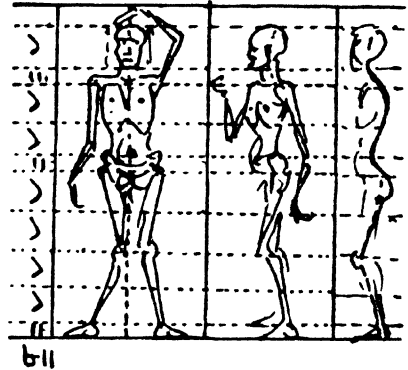
এ দেশের শিল্পশাস্ত্রে ও শিল্পীদের কাজে মাথাকে ইউনিট ধ'রে শরীরের মান-পরিমাণ নির্ধারণের সহজ রীতি বহুকাল থেকে চলে আসছে। পূর্ণবয়স্ক মানুষের মাপ দেখানো হল, বয়সভেদে তফাৎ হয়।

কুকুর
সিংহ
হাতি
হরিণ
হাঁস
মুরগী
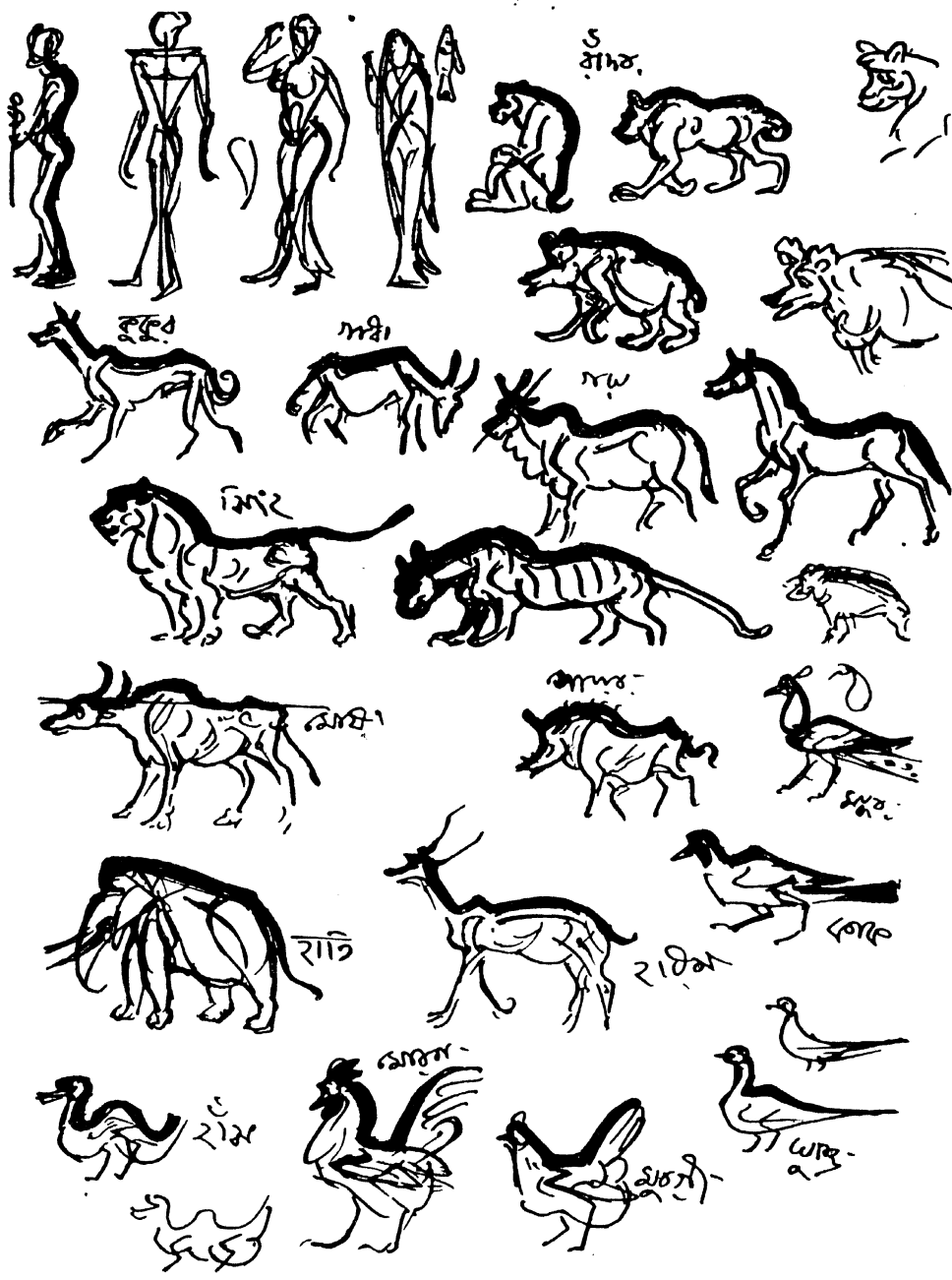
এ রচনায় যাকে শিরদাঁড়ার স্থায়ী ভঙ্গী হিসাবে বর্ণনা করা হল সেইটিকেই বিশ্বভারতীর 'শিল্পকথা' বইয়ে ('শিল্পে শারীরস্থান বিদ্যার প্রয়োগ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) 'প্রাণছন্দ' নাম দিয়ে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার নক্সাগুলিতে বিভিন্ন জীবের প্রাণছন্দ অর্থাৎ শিরদাঁড়ার বিশেষ বিশেষ স্থায়ী ভঙ্গী, আর তারই আশ্রয়ে বিশেষ বিশেষ রূপ এ'কে দেখানো হল। পরবর্তী নক্সায় দেখা যাচ্ছে—হরিণ ছুটে পালাচ্ছে ভয়ে, ভয়ের রেখা সঙ্কুচিত। আর অন্য নক্সায় তার খুশির চেহারা, রেখা তাই প্রসারিত বা লীলায়িত।

সাদৃশ্য॥ সকল মনুষ্যেরই দুই দুই হস্ত ও পদ চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি এবং ঐ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মোটামুটি গঠনও একই রূপ সত্য, কিন্তু......নানা লোকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য আমাদের এতই চোখে পড়ে যে, শিল্প হিসাবে দেহগঠনের একটা আদর্শ বাছিয়া লওয়া......দুর্ঘট হইয়া কিন্তু ইতর জীবজন্তু এবং [illegible] ইহাদের জাতিগত আকৃতির আমাদের নিকট অনেকটা [illegible] বোধ হইয়া থাকে। যেমন [illegible] হয়হস্তী ময়ূরেম [illegible] অধিক নহে। [illegible] অন্য পত্রগুলির মতে [illegible]কার; এক কুক্কুটা [illegible] মতোই সুডৌল [illegible] আমাদের [illegible] অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের [illegible] [illegible] হস্তপদাদির তুল্য [illegible] পুষ্প অম্বুক জীব [illegible] ইত্যাদির অনুরূপ [illegible] করিয়াছেন। —অবন.

প্রাণছন্দ॥ প্রাণ বলতে প্রথ[illegible] [illegible] স্পন্দন বোঝায়। তারপর বস্তু ঘনত্ব ও ভার অনুযায়ী কতকগুলি স্বাভাবিক গতির সৃষ্টি হয়, যেমন ওঠা, পড়া, ঘোরা......ইত্যাদি; আবার প্রাণীর [illegible] অনুযায়ী কতকগুলি গতি ও ভঙ্গী আছে, ঐগুলি তার বিভিন্ন মনোবেগ (emotion) আশ্রয় করে প্রকাশ পায়। এই সব আবেগের রূপ আলাদা ক'রে দেখাবার উপায় নেই। প্রাণীর অন্তরের এক-একটি বিকারের সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে এক-একটি ভঙ্গী প্রকাশ পায়, সেই ভঙ্গীকেই সেই আবেগের রূপ ব'লে ধ'রে নিতে হবে। বিশেষ প্রাণীতে বিশেষ কোনো আবেগ সর্বদা দেখা যায়, ফলে ঐ প্রাণীর দেহে তার ছাপ স্থায়ী হয়ে ঐ ভাবের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। বাঘ [illegible] খরগোস [illegible] ক'রে থাকে আর শিরদাঁড়ার রেখাটি পাশ থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। এই প্রাণছন্দের রেখার আশ্রয়েই শরীরের ভারসমতা, কাঠামো এবং ঘনত্ব (volume) লক্ষ্য [illegible] যেমন ঐগুলিকে [illegible] দ্বারা [illegible]

ন
ছল
তার-
ছায়া—
ধীরে
তে চটুল
ুক্ল দশমীর
্যোৎস্না। ইতর

নেই কোথাও আশে পাশে
পর্বতমালার ফাঁকে এই
রটুকু হলো একটি উপ-
শরায় গিরিনদীরা নেমে
ধারার সঙ্গে এখানে মিলে
শস্ত করে তুলেছে। পাইন
এমন বিশাল বিস্তার হিমালয়ে
খে পড়ে না। দার্জিলিং শিলঙ
াছে। গুলমার্গ কিংবা কুলু
াকা ভুলিনি। ভুলিনি মারী পাহাড়
া কোহালার পথ। কিন্তু এখানকার
ইন অরণ্যের বিশালতার সঙ্গে কেমন
যেন জড়ানো আছে এক রাজমহিমা; মন
থেকে কেবল যে ভালো লাগে তাই নয়,
শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে ভ'রে ওঠে। শুক্লপক্ষের
ভরা জ্যোৎস্না হিমালয়ে দেখেছি কত শত
বার। এই জ্যোৎস্না ধ'রে ব'সে থেকেছি
হৃষিকেশে কতবার—ওই যেখানে চক্রাকারে
ঘুরেছে নীলধারা সগর্জনে, যার তীরে
তীরে ঋষিকুলের তপোবন। এখানে তপো-
বন চোখে পড়ছে না, কিন্তু জ্যোৎস্না
রাত্রির যাদুমন্ত্র ছড়িয়ে পড়েছে পর্বত-
মালায় আর নীলগঙ্গার অধিত্যকায়।

নের বেলা স্পষ্ট ছিল পহলগাঁওর শোভা সৌন্দর্য। জলের ধার থেকে উঠে উপত্যকা পেরিয়ে পাইনের বন চ'লে গেছে পর্বতের দূরে দূরান্তরে, যেমন তার সঙ্গে গেছে নন্দেশ নীলগঙ্গা,—অতুলনীয় সে-শোভা। কিন্তু জ্যোৎস্নালোকে সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতি হয়ে গেল মায়াপুরী। আমি যে দাঁড়িয়ে আছি বাস্তব পৃথিবীর কঠিন প্রস্তরসংকুল পথে, একথা ভুলেছি আমার অজ্ঞাতসারে—আমার সমগ্র অস্তিত্বের অবলুপ্তি ঘটেছে এই স্বপ্নলোকে,—চেতনার বিন্দু একেবারে নিশ্চিহ্ন! আশ্চর্য সেই জ্যোৎস্নারাত্রি।

আমি যাচ্ছিলুম অমরনাথে। মনে ছিল হিমালয়ের অভিনবত্বের লোভ। মন্দিরের বদলে এবার গুহা। বিগ্রহ নয়, প্রস্তর শিলা নয়—একটা তুষার-আয়তন! ধীরে ধীরে সেটা নাকি চান্দ্রমাসের যোগ অনুসারে শিবলিঙ্গের আকার ধারণ করে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই লিঙ্গ দর্শন করে এমনভাবে একদা সমাধিস্থ হন যে, তীর্থ-যাত্রীদের অনেকে গিয়ে তাঁকেই অমরনাথ ব'লে সাওরান। সেটা মহারাজা প্রতাপ সিংহের আমল। আরও একটা বড় লোভ, এদিকের হিমালয়ের চেহারা ও চরিত্রের বৈচিত্র্য। হিমালয় কখনও ধূসর, ঊষর, কখনো বর্বর কখনও বা রুক্ষ। কখনও সে রুদ্রলোচন কখনও বা নিমীলিত নেত্র। তাকে কখনও দেখলে জ্বালা করে চোখ, কখনও চোখ দুটো মধুর তন্দ্রায় জড়িয়ে আসে। কখনো সে হিংস্র শার্দুলে ভয়াল হয়ে অথবা উন্মত্ত হস্তীতে ভীষণ, আবার কখনও সে গৈরিকাবাস সন্ন্যাসী-দের তপোবনের প্রান্তে সামগানে মুখরিত। এখানে হিমালয়ের বিচিত্র চেহারা। সমগ্র কাশ্মীর এবং তার চতু-র্বেষ্টনী পর্বতমালার বহুলাংশে হলো তৃণময়। প্রস্তরময় নয়। এ চেহারা আমার কাছে নতুন। কাশ্মীর বড় কোমল—এত কোমল আগে মনে হয়নি। কিন্তু সে কথা এখন থাক্। এখান থেকে হিমালয়ের উত্তরাদিকে বিস্তার শুরু হলো—সোজা উত্তরে। তিব্বতকে ডান দিকে রেখে উত্তর হিমালয় চ'লে গেছে কারাকোরাম পর্বতমালার শেষ পর্যন্ত। আশে পাশে দেখছি অসংখ্য পায়েচলা পথ চ'লে গেছে উত্তরে ও পূর্বে। কোনোটা গেছে কোলা-হাই হিমবাহের দিকে কোনোটা লাডাকে, কোনোটা লিডারবৎ ছাড়িয়ে সিন্ধু উপত্যকায়; কোনোটা তিব্বতে, কোনোটা বা দক্ষিণ লাডাক হেমিস গুম্ফার দিকে—যেখানে যীশুখৃষ্টের ভারতবাসের সমস্ত তথ্য প্রমাণাদি গুম্ফার মধ্যে আজও সযত্ন-রক্ষিত আছে। অনেক পথ অপ্রত্যক্ষ, সেগুলি পাহাড়ী গুজ্জরদের করায়ত্ত। আমরা যেসব অঞ্চলকে আমাদের অভ্যস্ত সংস্কারের দিক থেকে দুঃসাধ্য ও অগম্য বলি, একজন স্থানীয় মেষপালক তা বলে না। তারা অনায়াসে আনাগোনা করে পাহাড় থেকে পাহাড় পেরিয়ে তিব্বতে লাডাকে পামীরে কারাকোরামের গিরি-

পহলগাঁও

সংকটে অথবা মধ্য এশিয়ায়। কিন্তু এই পহলগাঁও থেকে প্রত্যক্ষ একটি পথ নীল-গঙ্গার ধারে ধারে গেছে শেষনাগের দিকে—যেখানে শেষনাগের বিশাল সরোবর। যেমন শতদ্রু কিংবা সিন্ধু নদের তীর ধরে গেলে পাওয়া যাবে মানস সরোবর। কিন্তু কারো পক্ষে সেই নদীপথ ধ'রে যাওয়া সম্ভব নয়। আমরা যাবো শেষনাগের দিকে, শেষনাগের পথ ধরে গিরিসংকটের ভিতর দিয়েই অমরনাথের উদ্দেশে আমাদের যাত্রাপথ। অনেকে বলে অমরনাথ এখান থেকে মাত্র তিরিশ মাইল, অনেকে বলে আরো কম। অর্থাৎ মোটামুটি তিনটি পর্বতশ্রেণী পেরিয়ে গেলে আমরা পৌঁছতে পারবো। আমরা যাবো উত্তর-পূর্ব পথে। আমি নিজের হিসাবে পাই, দেড়দিন অথবা দুদিনে পোঁছবো। কিন্তু আমার পাণ্ডা পণ্ডিত বদরিনাথ বলে, না আপনারা চারদিনের দিনের দিন পৌঁছবেন তার আগে পারবেন না। তার কথায় কিছু বিস্ময়বোধ করেছিলুম। তখন বুঝতে পারিনি এ পথের ক্ষেপ আছে, আবশ্যিক বিরতি আছে এবং পথের অনুশাসন মেনে চলতে আমরা বাধ্য।

তরণীযাত্রায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গোপিনী-গণকে প্রশ্ন করেছিলেন, তাদের মধ্যে কা'র ওজন কত পরিমাণ! গোপিনীরা মনে করলো, যে যত ভারি তা'র তত ভালো-বাসা। সুতরাং কেউ বললে দেড় মণ, কেউ বললে দু মণ কেউ বা বললে আড়াই মণ। অবশেষে বাজি জিতলেন শ্রীমতী। তিনি বললেন, আমার ওজন এক মণ! এক মন নিয়ে তোমাকে দেখি, আমি একাগ্র একান্ত!

অতএব পহলগাঁও আপাতত থাক্—আমার একমাত্র লক্ষ্য হলো অমরনাথ। আমি এক মন।

হোটেলে আমাদের জিম্মায় দুটি ঘর, কিন্তু বাইরে যেতে গেলে আমার ঘরটি পেরিয়ে যেতে হয়। চমৎকার বসবাসের ব্যবস্থা আসবাবপত্র সমেত। বাথরুম, ড্রেসিং রুম আলাদা। দুটি ঘর মিলিয়ে দৈনিক চার টাকা। পাশের ঘরটিতে আছেন আমার সাময়িককালের বন্ধু হিমাংশু বসু। কলকাতার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের হেড আপিসে চাকরি করেন এবং

পহলগাঁওয়ের লিডার নদী

সুবিধা পাবামাত্র তীর্থদর্শনে বেরিয়ে পড়েন। সদালাপী এবং মিষ্টভাষী ব্যক্তি; উৎসাহী এবং কর্মঠ। কিন্তু একটু বেশী বয়স অবধি অবিবাহিত থাকলে যা হয়, অর্থাৎ মঠ ও আশ্রমের সাধু-স্বামীজীদের মতো স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি দৃষ্টি তাঁর সজাগ। এসব লক্ষণ ভালো, পথে-ঘাটে এসব দরকার। তাছাড়া তাঁর শরীরটাও বেশ হাল্কা, পাহাড়-পর্বতে ওটা খুব কাজে লাগে। এখানে একটু অবান্তর কথা ব'লে ফেলি। বাইরে গিয়ে আমার সামান্য আত্মপরিচয়টুকু চিরদিনই আমি গোপন করি, বিশেষ ক'রে প্রবাসী বাঙগালী সমাজে। ওতে আমার স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতাটা অব্যাহত থাকে। দিন তিনেক আগে শ্রীনগর হোটেলের খাতায় আমার নাম সই দেখে হিমাংশুবাবু তেতলা থেকে নেমে আসেন। ভদ্রলোকের মুখের ওপর মিথ্যে বলতে গিয়ে থতিয়ে গেলুম। সেই থেকে আলাপ। পহলগাঁও এসে দ্বিতীয় বিপত্তি। কলেজ স্ট্রীটের পাড়ার দুটি যুবক যাচ্ছিলেন অমরনাথে—তাঁরা আমাকে পথের মাঝখানে চিনে বা'র করলেন। ফলে পরবর্তীকালে 'কুণ্ডু স্পেশালের' বাঙগালী যাত্রীদের মাঝখানে আমাকে যেতে হয়েছিল ভুরিভোজের আসরে। ভাটপাড়া থেকে এসেছেন রেল কোম্পানীর বাবু ভটচার্যি মশায়ের দল—অতি অমায়িক লোক তাঁরা। তাঁরাও জুটে গেলেন গায়ে গায়ে। এঁরা ছাড়াও দেখি আমাদের হোটেলের একটি শিখ ছোকরা বাহাদুর সিং—স্বত্বাধিকারীর ভাইপো। সে এমন ন্যাওটা হোলো যে, সহজে জট ছাড়াতে পারিনে। রাত্রে নৈশভোজনের আসরে গিয়ে দেখি, কয়েকজন পাঞ্জাবী তরুণ-তরুণীর মাঝখানে বসে আছে বাহাদুর সিং আমাকে পরিচিত করাবে ব'লে। এপাশে হিমাংশুবাবুর সহাস্যবদন। বুঝলাম ক্ষেত্রটা আগে থেকেই প্রস্তুত করা। হঠাৎ ওদের ভিতর থেকে একটি মেয়ে উঠে এলো। তিনি কিন্তু বাঙগালী। বুনো হাঁসের মধ্যে রাজহাঁসকে এতক্ষণ দেখতে পাইনি। তরুণীটি বিনীত নমস্কার জানিয়ে শান্ত কণ্ঠে আলাপ করলেন। মুখ তুলে দেখি সাজসজ্জায়, দৈর্ঘ্যে, প্রসাধনে, ভ্যানিটি ব্যাগে—তাঁকে মানায় চৌরঙগীর পাড়ায়, কিংবা সিনেমায়। আঙগুলের ডগায় নেইল্-পালিশের ফলে প্রত্যেকটি নখের উপরে যেন রক্তিম হীরার আভা জ্বলছে,—সুশ্রী চেহারার সঙ্গে প্রসাধন-সজ্জার পারিপাট্যে সেই আভা মানিয়ে গেছে।

আহারাদির পর হিমাংশুবাবু নিয়ে গেলেন পান খাওয়াবার জন্য তাঁর দিদির বাংলোয়। দিদি? আজ্ঞে হ্যাঁ—আ কেমন অভ্যেস, মেয়েদের সঙ্গে এব পরিচয় হলেই আমি তাঁদেরকে ভগি মতন দেখি, দিদি বলি। উনি হা শ্রীনগর ইম্পিরিয়ল ব্যাঙ্কের এজেণ্ট রায়ের স্ত্রী। উনিও যাচ্ছেন অমরনা সঙ্গে আছেন একটি পাঞ্জাবী যুব মহিলা খুব সামাজিক সন্দেহ নেই।

জ্যোৎস্নার আলোয় পথ চিনে আ একটি ফুলবাগান-ঘেরা বাংলোয় উ এলুম। নীচেই নদীর খরতর প্র চলেছে। মিসেস রায় মিষ্টহাস্যে আমা অভ্যর্থনা করলেন। পান এনে দি সযত্নে। মুখ তুলে দেখি তাঁর দুই চে ঈষৎ সুর্মাটানা। ভদ্রমহিলার ব আন্দাজ—না থাক, মহিলাদের বয়স নি মাথা ঘামাতে নেই। তিনি জানা পহলগাঁওর বহু অধিবাসী ও দোকান তাঁকে 'বহিনজী' ব'লে ডাকে। এখ এলে তাঁর কিছু নগদ খরচ হয় শ্রীনগরে তাঁর স্বামীর কাছে বিল্ চ যায়,—টাকাটা জমা পড়ে ব্যাঙ্কে। পাও দারের একাউণ্টে। এখানে আসেন তি যখন-তখন। যেখানেই দরকার হ আমরা যেন বলি শ্রীনগরের 'বহিনজী' লোক আমরা—বাস, আমাদের আর কো অসুবিধা হবে না। আর এই যে মে —আমার পাঞ্জাবী ভাই,—আমিই ও বাঙগলা শিখিয়েছি অনেক যত্নে।

পান খেয়ে খুশি হয়ে আমরা হোটে ফিরে গেলুম। আগামীকাল মধ্যা আহারাদির পর আমাদের যাত্রা স্থি হলো।

যা বললুম এতক্ষণ তা আগে-ভা ব'লে রাখা ভালো। এতে আমাদের যা আবহাওয়াটা বুঝতে পারা যায়। অ হিমাংশুবাবুর সারাদিনের তৎপরত যাত্রার ব্যবস্থাগুলি প্রায় প্রস্তুত। প্র হলো দু'জনের জন্য চারটি ঘোড়া, দু তাঁবু, পাটকরা খাটিয়া,—এছাড়া টুকিটা বহু আবশ্যিক সামগ্রী। যে পথে যা সেখানে লোকালয়, খাদ্য, অথবা মা বলতে কিছু নেই, পশুপক্ষ মেলে না। পাণ্ডারা ব'লে রেখে চন্দনবাড়ী ছাড়ালে মানুষের চিহ্ন ত পাবেন না। জাস্কার পর্বতমালার

ঘ'ষে আমরা যাবো জোজিলা গিরি-সঙ্কটের দিকে, তারপরেই হলো সিন্ধু-নদবেষ্টিত কৈলাসপর্বতমালার উত্তর-বিস্তার। তার আশেপাশে ভারতের মানচিত্রের রাজনীতিক জরীপটা যথেষ্ট স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয়।

আমরা আছি লিডার উপত্যকার মধ্যকেন্দ্রে। স্বর্গলোক থেকে নেমে এসেছে গিরিনদীরা, এই পহলগাঁওতে তাদের প্রথম অবতরণ, এখান থেকে তারা চললো সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকায়। এজন্য এই নদীটির নামও হয়েছে লিডার নদী, ওরফে নীলগঙ্গা। এখান থেকে দুটি পাহাড় অতিক্রম ক'রে গেলে সিন্ধু উপত্যকা,—সেখানে সিন্ধুনদ প্রথম নেমেছে দুর্গম পর্বতমালা থেকে। তার এপাশে আরুবস্তি পেরিয়ে হলো লিডারবৎ এবং ওপাশে কোলাহাই হিমবাহ। চিরতুষারে আবৃত। এখান থেকে আরুর পথ হলো বন্ময় এবং নির্জন, যেমন পহলগাঁওর দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের গভীর চিড়ের অরণ্য। আরু গিয়ে লিডার নদী এক সময় পাহাড়ের নীচে কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায়। সে স্থলের নাম হলো 'গুরু-গুম্ফা'। পহলগাঁও দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটি নদীর সঙ্গমস্থলে। এক নদীপথের পাশে চলে গেছে শেষনাগের চড়াই, অন্য নদী-পথ চলে গেছে লিডারবৎ ও কোলাহাই হিমবাহের দিকে। আমাদের আগামী-কালের গতি শেষনাগের উদ্দেশে। শেষ-নাগের প্রকৃত নাম শ্রীশনাগ, শীর্ষনাগ অথবা শিষনাগ কি না, আমার জানা নেই। রাত্রে এ নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি।

প্রভাতে প্রথম সংবাদ পাওয়া গেল, আকাশ পরিচ্ছন্ন। এর মতো সুসংবাদ সেদিন প্রভাতে আর কিছু ছিল না। গত-রাত্রের জ্যোৎস্না যতবার ঘোলা হয়েছে ততবারই যাত্রীদের মুখ বিবর্ণ দেখেছি। হিমালয়ের আর কোনো দুস্তর তীর্থে এই প্রকারের উদ্বেগ দেখা যায় না। কেদার বদরির পথে যাও—আশ্রয়ের অসুবিধা কোথাও নেই। কৈলাসের অধিকাংশ পথ—অর্থাৎ লিপুলেক গিরি-সঙ্কট পর্যন্ত কথায় কথায় আশ্রয় মেলে। সুতরাং প্রাকৃতিক দুর্যোগ যখন যেভাবে দেখা দিক না কেন, দুচার মাইল পর পুর মাথা গোঁজবার জায়গা মিলে যায়। এখানে সব বিপরীত। যাত্রী সংখ্যা বুঝে খাবারের দোকান দুচারটে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। 'ফার্স্ট এইড্' অর্থাৎ ডাক্তারী সরঞ্জাম সঙ্গে যাবে। তার সঙ্গে পুলিশ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। পাশে পাশে কিছু অবশ্য প্রয়োজনীয় মনোহারি ও পান-চুরুটের বিকিকিনিও যাবে।

পাশের ঘর থেকে হিমাংশুবাবু সেই সুসংবাদটি নিয়ে যখন আমার বিছানার সামনে এসে বসলেন,—চা আসছে এক্ষুণি, ঠিক সেই সময় দরজার বাইরে নারী-কণ্ঠে শোনা গেল, ভেতরে আসতে পারি কি?

আসুন, আসুন—ব'লে সোৎসাহে উঠে দাঁড়িয়ে হিমাংশুবাবু গতকাল রাত্রির সেই চৌরঙ্গিনীকে অভ্যর্থনা করলেন। মেয়েটি সোজা সামনে এসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনার অসুবিধে হোলো না ত?

বিলক্ষণ, বসুন—

কম্বল ছেড়ে একটু উঠে বসলুম। এমন সময় চা এলো। হিমাংশুবাবু তাঁকেও চায়ে আহ্বান করলেন। আমি একটু বিব্রত বোধ করছি। ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে এর জন্য প্রস্তুত ছিলুম না। তবু ওর মধ্যেই একটু গুছিয়ে নিতে হলো। হিমালয়ে এলে আমি পরিচ্ছন্ন চেহারাটা রক্ষা করতে পারিনে।

তরুণী বললেন, পহলগাঁও বেড়াতে এসেছিলুম ক'দিনের জন্যে। কিন্তু আজকেই চ'লে যেতে হচ্ছে শ্রীনগরে। আমার স্বামী আছেন দক্ষিণ ভারতে। আজ গিয়ে তাঁর চিঠি পাবার আশা আছে।

হিমাংশু প্রশ্ন করলেন, কি করেন আপনার স্বামী?

গায়ের ওভারকোটটি গুছিয়ে ঢেকে তিনি বললেন, উনি কাশ্মীরের মিলিটারীতে আছেন। বিমানঘাটির গ্রাউন্ড ইঞ্জিনীয়ার। কিন্তু পদোন্নতির জন্য সেখানে একটি পরীক্ষা দিতে গেছেন। আমরা শ্রীনগরের কাছেই থাকি। দিন আমি আপনাদের চা ঢেলে দিই।

এবার তিনি দুখানি হাত বার করলেন। সেই নেইল-পলিশ! কিন্তু আঙ্গুলগুলি দীর্ঘ নধর। অত্যন্ত সহজ ক্ষিপ্রহস্তে তিনি চায়ের ভরা পেয়ালা বিতরণ করলেন। হিমাংশুবাবুর জরুরী হাঁকাহাঁকিতে বয় এসে আরেক কেটলী চা দিয়ে গেল।

প্রথম প্রস্ত চা-পানের পর একটু নড়াচড়া ক'রে ব'সে তিনি বললেন, লেখকদের লেখা পড়ি মন দিয়ে, কত প্রশ্ন মনে আসে, কিন্তু লেখককে দেখলুম আমার জীবনে এই প্রথম। আপনাকে তাই দু' একটি কথা জিজ্ঞেস করবো ব'লে সাহস ক'রে এসেছি। যদি কিছু না মনে করেন—

হাসিমুখে বললুম, একটু ভয় পাচ্ছি— !

হিমাংশুবাবুর সঙ্গে তিনিও হাসলেন, ভয় কেন?

বললুম, প্রশ্নকর্তা সামনে থাকে না তাই অনেক লেখক বেঁচে যায়। আপনার কথাটা আন্দাজ করতে পাচ্ছিনে। তাছাড়া লেখকের পরিচয়টুকু বাঙলা দেশেই ফেলে এসেছি, এখানে আমি হিমালয় যাত্রী!

তরুণী বললেন, আমারটা হিমালয় ভ্রমণেরই প্রশ্ন।

তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। ভুল করেছিলুম কাল রাত্রে। অত্যন্ত আধুনিক প্রসাধনসজ্জার আড়ালে একটি অতি ভদ্র এবং বিনয়ী মেয়ে রয়েছে। এমন দীর্ঘাঙ্গী তন্বী এবং পরিচ্ছন্ন স্বভাবের মেয়ে এযাত্রায় আর চোখে পড়েনি। কিন্তু মনে মনে ভয় ছিল, এই অতি-আধুনিক সাজ পরিচ্ছদের অন্তরালে কি অনুরূপা দেবীর বাসা আছে? হিমাংশুবাবুর দিদির আঁচলে কি দিদিমা বাঁধা?

কিন্তু এমন মিষ্ট ভূমিকার পর তিনি যে প্রশ্নটি উত্থাপন করলেন, সেটি আমার পক্ষে ক্লান্তিকর। কেননা বিগত বাইশ বছর ধ'রে সেই একই প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে হয়রান হয়েছি। মহা-প্রস্থানের পথে'র 'রাণী' মেয়েটি কে? এখন তিনি কোথায়? আপনার সঙ্গে কি আজও তাঁর দেখা হয়? তাঁর আসল পরিচয় কি?

আমার উত্তরটা কিছু রূঢ় পরিহাস-পূর্ণ ছিল। উভয় শ্রোতা ও শ্রোত্রী কিছুক্ষণ হেসেই অস্থির। পুনরায় কত-

ক্ষণ চা ঢালাঢালি চললো। পরে তিনি বললেন, আপনারা অমরনাথ থেকে ফিরে কি শ্রীনগরে থাকবেন কিছুদিন?

ইচ্ছে আছে বৈকি। বেড়ানোটা সব এখনও বাকি।

তিনি সসঙ্কোচে বললেন, বলতে ভরসা হয় না। যদি আপনাদের অসুবিধে না হয়, আমার ওখানে থাকলে ভারি আনন্দ পাবো।

হিমাংশুবাবু বললেন, কিন্তু দিদি, আমি যে 'বোট্ হাউসে' থাকবো ব'লে স্থির ক'রে রেখেছি! আমাকে ক্ষমা করুন!

অতএব আমার দিকে তিনি ফিরলেন। বললেন, আপনি না বললে শুনবো না। অন্তত দু' একদিন আমার ওখানে আপনাকে থেকে যেতে হবে,—এই অনুমতি দিন। আমার স্বামী আপনার কথা শুনলে এত খুশী হবেন কি বলবো।

বললুম, অমরনাথ থেকে বেঁচে ফিরলে তবে আতিথ্য নেবার কথাটা ওঠে।

তিনি সোৎসাহে জানালেন, তাঁর নাম শ্রীমতী মায়া গুপ্তা এবং স্বামীর নাম সার্জেণ্ট কে সি গুপ্ত। তারপর শ্রীনগরের শহরতলীর ঠিকানাটা দিয়ে বললেন, কোনো অসুবিধে আপনার হবে না, সে-ব্যবস্থা আমি করবো। এবার আমি উঠি। বেলা দশটার বাস-এ যাবো, গোছগাছ আছে! অনেক বিরক্ত করলুম, কিছু যেন মনে করবেন না। আজ ফিরেই আমার স্বামী, আত্মীয়বন্ধু সবাইকে চিঠি দেবো যে, আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, আর আপনি আমার ওখানে গিয়ে উঠবেন।

এই ব'লে নত নমস্কার জানিয়ে তিনি বিদায় নিলেন।

আমাদের তাড়া ছিল। চারটি ঘোড়া ঠিকাদারের জিম্মায় রাখা আছে। দুটি মালবাহী ঘোড়া আটত্রিশ টাকায় ভাড়া পাওয়া গেছে, আর বাকি দুটি চড়বার ঘোড়া চল্লিশ টাকায়। প্রত্যেকটি এক-জনকে তাঁবু ছ' টাকায়। খাটিয়া দু টাকা, তোশক এক টাকা। অশ্বরক্ষীরা সঙ্গে সঙ্গে লাগাম ধ'রে হেঁটে যাবে।

সিন্ধু উপত্যকা ও সিন্ধুনদ
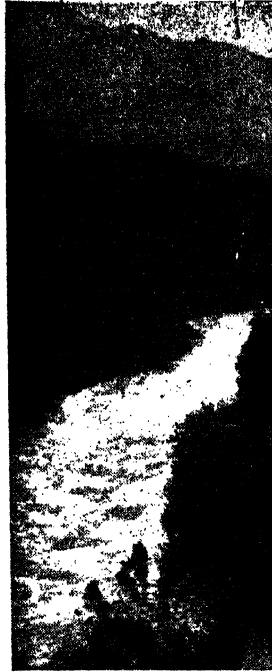
সকলেই কাশ্মীরের গ্রাম্য মুসলমান। এদিকে আমাদের তোড়যোড় করতেই এগারোটা বেজে গেল। আজ যাত্রীদের প্রথম গন্তব্যস্থল হলো চন্দনবাড়ী। চন্দনবাড়ী পর্যন্ত গিয়ে আজকের মতো যাত্রা শেষ হবে।

ঘোড়া নিয়ে যে কাড়াকাড়ি আছে আগে জানতুম না। মধ্যাহ্নের ঠিক পরেই যাত্রাকালে খবর পাওয়া গেল, দুটি ঘোড়া আমাদের নিরুদ্দেশ। তখনই ছুটো-ছুটি প'ড়ে গেল। একই দিনে একই সময়ে শত শত যাত্রী মিলে একত্র যাত্রা না করলে নির্দিষ্ট শ্রাবণী পূর্ণিমায় কোনোমতেই অমরনাথে পেঁছানো যাবে না। অজানা পথের যাত্রী আমরা সবাই। কোনো ব্যক্তি পিছিয়ে পড়লে অথবা এক বেলার জন্য যাত্রা স্থগিত রাখলে তাকে গিয়ে একা একা জনশূন্য তুষার প্রান্তরে দিগন্তজোড়া আতঙ্কের মধ্যে নির্বাসিত হতে হবে। সে চেহারা দেখেছি, পরে বলবো। সুতরাং আমরা ওই পহলগাঁও উপত্যকার মাঠে-মাঠে বিপন্নভাবে এদিক ওদিক ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতে লাগলুম। ঠিকাদার তশীলদার, পুলিশ, কোতোয়ালী ইত্যাদি নানাস্থলে উমেদারী ও সুপারিশ করতে করতে ঘণ্টা দুই পরে অবশেষে আমাদের সুরাহা হোলো। ঘোড়া চারটিকে এবার আঁকড়ে ধ'রে রইলুম। দুর্গম তীর্থ-পথের এই অকৃত্রিম বন্ধু কয়টিকে সকাল থেকে চোখের সামনে বেঁধে রাখলেই ভালো হতো। আমরা প্রত্যেকেই যেন স্বার্থসচেতন হয়ে উঠেছি।

'কুণ্ডু স্পেশালের' প্রায় শ' দেড়েক যাত্রী আগে ভাগে বেরিয়ে গেছে। তাদের মধ্যে বহু সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত বাঙালী মহিলা ও পুরুষ আছেন। অনেকেই গেছেন পায়ে হেঁটে, অধিকাংশ ঘোড়ায়, কয়েকজন উচ্চমূল্য ডাণ্ডিতে। এছাড়া পাঞ্জাবী স্ত্রীপুরুষের সংখ্যাও কম নয়। এবারে রাজনীতিক কারণে যাত্রিসংখ্যা কম। তবুও সব মিলিয়ে আন্দাজ সাত আট শো। এদের মধ্যেই আছে সাধু-সন্ন্যাসী, আছে যোগীফকির। কেদার বদরি অথবা কৈলাসের দিকে যাত্রাকালটা যেমন দীর্ঘকাল অবধি প্রসারিত, এখানে তেমন নয়—ওই একটিমাত্র দিন শ্রাবণী পূর্ণিমা! পেঁছতে যদি পারো তবে যাও, নৈলে আবার আসছে বছর। এযাত্রায় সকলের আগে গেছে প্রথম অমরনাথের পূজারির দল, তারা প্রথম অভিযাত্রী, গেছে পায়ে হেঁটে। তাদের সঙ্গে আছে শ্রীঅমরনাথের আসাসোঁটা আর রাজছত্র, আছে পূজার উপকরণাদি, আছে শঙ্খ-ঘণ্টা। এরা প্রতি বছরই সকল যাত্রীর আগে গিয়ে গুহায় পেঁছয়। মার্তণ্ড শহর থেকে ওরা প্রথম রওনা হয়। রাজ সরকার থেকে ওরা সাহায্য পায়।

আমরা প্রায় সকলের পিছনে পড়েছি। তবু এখনো অপরাহ্ন আড়াইটে বোধ হয় বাজেনি। রৌদ্র বেশ প্রখর। মেঘ যদি না করে আমাদের অসুবিধা কিছু নেই। প্রথমটা পথ যথেষ্ট প্রশস্ত নয়, পাশাপাশি দুটি ঘোড়া যাওয়া অসুবিধা। শান্ত পাহাড়ী ঘোড়া অনেকটা তার নিজের ইচ্ছায় ধীরে ধীরে আমাদেরকে নিয়ে চললো উত্তরপথে। মাঝে মাঝে কোনো

কোনো বাঁকে দেখতে পাচ্ছি সুদীর্ঘ পথে শ্রেণীবন্ধ ঘোড়ার ক্যারাভান। পহলগাঁও ছাড়ালেই লিডার নদীর নড়বড়ে সাঁকো পাওয়া যায়, তারপরেই সরকারি টোল আপিস। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাই, দরিদ্র অশ্বরক্ষীদের কাছ থেকে এখানে অবস্থার অতিরিক্ত ট্যাক্স আদায় করা হয়। তীর্থপথে কোনো ট্যাক্স নির্ধারিত থাকলে মন ছোট হয়ে আসে। দরিদ্র ব'লে রেহাই পায়না কেউ।

পথ ক্রমশ সংকীর্ণ হচ্ছে, আমাদের ঘোড়া চলেছে সার বেঁধে। একের পিছনে আর একজন সারবন্দী। কেউ কেউ পাশ কাটিয়ে ঘোড়া নিয়ে সোৎসাহে এগিয়ে যেতে চায়। প্রশস্ত উপত্যকা ক্রমশ সংকীর্ণ ও সংকটাপন্ন হয়ে এলো। ক্রমশ নগাধিরাজের রহস্যদ্বার আমাদের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে। আকাশ ছোট হয়ে আসছে। নদীর ঝরো ঝরো আওয়াজ বেড়ে উঠছে। আমরা নরলোক থেকে যাচ্ছি দেবলোকে। এখানে পথ চার ফুট থেকে ছয় ফুট আন্দাজ প্রশস্ত, কিন্তু অতিশয় বন্ধুর। যে-ব্যক্তি আমার অশ্বরক্ষী, তার নাম গণিশের। জাত কাশ্মীরী, কিন্তু চেহারায় আর্য। ঘন সবুজের সঙ্গে নীলাভ দুটি চোখ টানা টানা। দীর্ঘকায় সুশ্রী, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। মানুষটি যেমন নিরীহ, তেমনি ভদ্র। কাশ্মীরের মুসলমানরা সাধারণত দাড়ি গোঁফ রাখে না। আচরণে দেখেছি এদের ত্রিসীমানার মধ্যে অসাধুতা, অশিষ্ট আচরণ, যাত্রীর প্রতি অবহেলা কি ঔদাসীন্য, এসব কিছু নেই। এদের কোনো ব্যক্তিকে নমাজ পড়তে দেখিনি কোনো পথে। মুখেচোখে সর্বদা সহাস্য বন্ধুত্ব, নিরন্তর স্নেহ ও সহযোগিতা। অনেক সময়ে ওদেরকে পরমাত্মীয় ব'লে মনে করেছি। এরা পাহাড়ের সন্তান, পাহাড়ের কাঠিন্য এবং সৌন্দর্য দিয়ে এদের দেহমন তৈরী, উদার পর্বতমালার থেকে এরা আপন স্বভাবকে আহরণ করেছে। গাড়োয়ালে ঠিক এই দেখেছি—এই স্নেহ, এই সাধুতা, এই সহযোগিতা। দেখেছি সীমান্তের পাঠান মহলে, দেখেছি নেপালে, ভীমতালে, দেখেছি কামরূপে, দেখেছি কৌশল্যা নদীর পারে সোমেশ্বরে। সমগ্র হিমালয়ের থেকে এরা
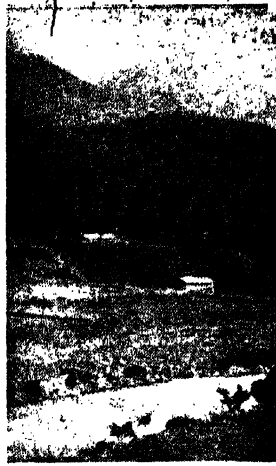
পহলগাঁওয়ে পাইন বন

পেয়ে এসেছে বন্য সাধুতা আর সরলতা।

চড়াইপথে চলেছি, কখনো নামছি, কখনো বা উঠছি। মাঝে মাঝে কাশ্মীরী মেয়েরা সামনে এগিয়ে এসে ভিক্ষা চাইছে। সেই ঘনকৃষ্ণ চোখ বনহরিণীর, পরনে ঘাঘরা, মাথায় কাপড়ের টুকরো বাঁধা, দুধে আর রক্তে মেলানো বর্ণ। এরা গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, কিন্তু দরিদ্র। মুসলমান, কিন্তু পর্দা নেই। বাঙলার গ্রামের যে দারিদ্র্য, তার সঙ্গে এখানে বর্ণে বর্ণে মেলে। তবে তফাৎ এই, বাঙলায় অর্ধনগ্ন অথবা উলঙ্গ থাকলে সহজে মরে না, আর এখানে উলঙ্গ থাকা যায় না। এদের চেহারা দেখলে আমি বিস্মিত হই, কারণ অবিভক্ত ভারতের কোনো মুসলমানের সঙ্গে এদের চেহারার মিল নেই। তুর্ক ইরাণী রক্ত নয়, এরা আগাগোড়া আর্য। রক্তের মধ্যে হিংসা ও বর্বরতা আনেনি। সেই কারণে সীমান্তের থেকে যখন পাঠান দস্যুরা এই সেদিন কাশ্মীরকে আক্রমণ করে, কাশ্মীরের আর্য মুসলমানরা তাদের সঙ্গে হাত মেলায়নি। রক্তের মূল পার্থক্য আছে ব'লেই পূর্ব পাকিস্থানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্থানের মিল কোনোমতেই ঘটতে পারছে না। অমন সুন্দর মেয়েদের চোখ, অমন ব্যাকুলতা—কিন্তু কারুণ্যে এবং মিনতি সুস্পষ্ট। হাজার হাজার বছরে ওদের এ দারিদ্র্য ঘোচেনি। পীর পাঞ্জাল পর্বতমালার বাইরে যে ভারতবর্ষ নামক একটি দেশ আছে, কিংবা পৃথিবী অনেক বড়—এ ওরা জানে না। ওরা জানে, যারাই আসে কাশ্মীরে, তারাই ধনী, তারাই দাতা। ওরা কেঁদেছে অনেক কাল, মার খেয়েছে হাজার হাজার বছর ধ'রে। আফগানীরা মেরেছে, আফ্রিদী পাঠানরা মেরেছে, তুর্কীরা মেরেছে, হূন-

পহলগাঁও থেকে অমরনাথের পথ

দের হাতে মার খেয়েছে, তাতাররা মেরেছে বারম্বার—এমনকি এই সেদিনের শিখ রাজত্ব—তাদেরও হাতে ওদের হাড়-পাঁজরা গঁ‌ুড়িয়ে গেছে। মোগল অথবা ইংরেজ ওদের মারেনি। মহারাজা গ‌ুলাব সিংহের আমল থেকে ওরা আর মার খায়নি। এই সহস্র সহস্র বছরের অপমান-জনক ইতিহাসকে সরিয়ে ওরা আজও ঘর গ‌ুছিয়ে তুলতে পারেনি, আজও কর্মী প‌ুর‌ুষকে মান‌ুষ ক'রে তুলতে পারেনি। তাই ওরা পথের মাঝখানে এসে শত শত হাত পেতে দাঁড়ায়, সভ্য জাতিদের কাছে প্রাণের আবেদন জানায়। আমাদের কাছে কাশ্মীর ভূস্বর্গ, ওদের কাছে চির দারিদ্র্যের নরককুণ্ড।

পথ ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। পাহাড়ের গা-বেয়ে চলছি। পাশেই নীল গঙ্গার গভীর নীচু খদ। দ‌ুইধারে পর্বত-মালার বন্য শোভা। মাঝে মাঝে জল-প্রপাত এপাশে ওপাশে সগর্বে নামছে। এখনও লোকালয় পাওয়া যাচ্ছে, এখনও স‌ুশ্রী বলিষ্ঠ আর্যনাসা ও চক্ষ‌ুয‌ুক্ত পার্বত্য স্ত্রীপ‌ুর‌ুষকে মাঝে মাঝে দেখছি। এপারে ওপারে একট‌ু আধট‌ু গ্রামের চিহ্ন—কোথাও কাঠের কাজ, কোথাও বা দর্জির ঘর। তাদের মাঝখান দিয়ে আমাদের স‌ুদীর্ঘ ক্যারাভান চলেছে দীর্ঘবিলম্বিত বিরাটকায় প্রাগৈতিহাসিক সরীস‌ৃপের মতো। নীল গঙ্গার অবিশ্রান্ত ঝরো ঝরো আওয়াজ শ‌ুনতে শ‌ুনতে অশ্বারোহী যাত্রীর দল শান্ত মনে পাহাড়ীপথ অতিক্রম ক'রে চলেছে। ডাণ্ডি চলেছে বাঙালী মহিলাকে নিয়ে। ভাটপাড়া চলেছে হেঁটে তর‌ুণ দলের সঙ্গে। পাঞ্জাবী মেয়ে আর শিশ‌ু চলেছে ঘোড়ায়। এদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মালবাহী ঘোড়ার দল, গাছের ডাল হাতে নিয়ে আমরা চলেছি ঘোড়সওয়ার—আশঙ্কায় কণ্টকিত, কোমরের ব্যথায় আড়ষ্ট। কখনো অজস্র বহ‌ুবর্ণ বন্য ফ‌ুলের গন্ধ, কখনো পতঙ্গদলের রঙ্গীন পাখার গ‌ুঞ্জন, কখনো বা অনামা পাখী দলের এপার থেকে ওপারে যাবার ডানা চালনার আওয়াজ। স্তব্ধ পার্বত্যপথ, শব্দহীন অরণ্যলোক। চোখে ম‌ুখে সকলের নির্বাক বিস্ময়, এক পথ থেকে আর পথে যেন একটির পর একটি অজানালোক আমাদের চোখের সামনে তাদের সত্য পরিচয় উদ্ঘাটন করছিল। আমরা চলেছি ভূস্বর্গে।

সহসা সামনের দিক থেকে একটা কলরব ভেসে এলো পিছন দিকে। আমরা একটি নির্ঝরিণীকে অতিক্রম ক'রে এগিয়ে গেল‌ুম। কাছে গিয়ে দেখি একটি অপঘাত ঘটেছে। ছোট একটি পাঞ্জাবী মেয়ে-প‌ুর‌ুষের দল যাচ্ছিল। তাদের ভিতর থেকে একটি মহিলা ঘোড়া থেকে নদীর খদের দিকে প'ড়ে যান। মাথাটা পড়েছিল নীচের দিকে, তাই কান ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে, সর্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন‌গ‌ুলি রক্তাক্ত। কয়েক মিনিটের জন্য জ্ঞান ছিল না, এখন প'ড়ে রয়েছেন পথের ওপর। আত্মীয়রা অপেক্ষা করছে আশেপাশে। 'ফার্স্টএইড' দেওয়া হচ্ছে। কারণটা হোলো, সঙ্কীর্ণ পথে ঘোড়ার সঙ্গে ঘোড়ার ধাক্কা লেগে খদের দিকে তিনি ছিটকে পড়েন। অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন, নদীর নীচে গড়িয়ে যাননি। বলা বাহ‌ুল্য, এই ঘটনার থেকে সবাই শিক্ষা গ্রহণ করলো।

মাঝে মাঝে পথ নেই, আছে পায়ে চলার দাগ, আছে বড় বড় গাছপাথরের ফাঁক। সেটাকে পথ বলো, স্বীকার করবো। কখনো মাথা হেঁট হয়ে ঘোড়ার পিঠে উপ‌ুড় হতে হচ্ছে, মাথায় লাগতে পারে গাছের ডাল, কিংবা পাথরের খোঁচা। কখনো ঘোড়ার পিঠে ব'সে হাঁট‌ুতে লাগছে পাথরের ধাক্কা, কিন্তু পা সরাবার উপায় নেই, ভারসাম্য রক্ষা হয় না। চোখ দ‌ুটো থাকে পথের রেখায়, পার্বত্য সৌন্দর্য উপভোগের অবকাশ কম। নীচে থেকে উঠছি উপরে, উপর থেকে নীচে। যাঁরা ডাণ্ডিতে চড়েছেন চারটে মান‌ুষের কাঁধে, তাঁদের পাদ‌ুটো কখনো উপরদিকে এবং মাথাটা নীচের দিকে। কখনো পাদ‌ুটো এত নীচে ঝোলে যে, ডাণ্ডি থেকে পিছলে না প'ড়ে যান। মাঝে মাঝে নদীর নীচের দিকে শষ্পাচ্ছন্ন লতাগ‌ুল্মে সমাকীর্ণ গ‌ুহাগহ্বরে অন্ধকারের দল পাকানো। পাথরের উপরে দ‌ুগ্ধফেননিভ গর্জমান জলপ্রবাহ আছাড় খেয়ে ধ‌ূমেল শিকরকণা উৎক্ষিপ্ত করছে। ছায়াচ্ছন্ন অরণ্যবিটপীর নীচে উন্মত্ত তরঙ্গের সেই উদ্দাম মাতামাতি চোখ ভ'রে দেখলে মন বিভ্রান্ত হয়ে যায়। যেমন দেখেছি কত শতবার অলকানন্দায় আর কোশীতে, বাগমতীতে আর তিস্তায়, বিপাশায় আর চন্দ্রভাগায় নীলধারায় আর মন্দাকিনীতে। ওদের তীর থেকে কতদিন কত পাখী উড়ে গেছে আমার মনের খবর নিয়ে, কত তৃষ্ণার্ত তীর্থপথিক জলপান ক'রে উঠে গেছে নির‌ুদ্দেশে, কত জন্তু আর সরীস‌ৃপ ওদের ধার থেকে আমায় দেখে স'রে গেছে গ‌ুহাগহ্বরে আমারই উদ্গ্রীব রহস্য-বোধের ক্ষ‌ুধা নিয়ে। টের পাই আমার মধ্যে আছে একটি কীট, সেই কীট কেবলই খোঁজে এই হিমালয়ের পথ আর পাথর। তার বন্যপ্রকৃতি কামড়ে থাকে এই নগাধিরাজের প্রতি পাথরের ট‌ুকরো, প্রতি নির্ঝরিণীর তটপ্রান্তের শৈবালের ম‌ূল, প্রতি ব‌ৃক্ষের কোটর, প্রতি লতার পাতায় শষ্পে গ‌ুল্মে তুষারে বরফে নদী-পথে, প্রতি তীর্থে, প্রতি পথিকের পায়ের তলায়,—সে বাসা বেঁধে থাকে বড় আনন্দে। সে থাকে হিমালয়ের প্রতি ধ‌ূলিকণায়, প্রতি রন্ধ্রে আর গহ্বরে, প্রতি মন্দিরের প্রাচীন পাথরে, প্রতি ব‌ৃক্ষের শাখা-প্রশাখায়। অম‌ৃত য‌ুগে, সম‌ুদ্র মন্থনে, দেবাস‌ুরের সংগ্রামে, ত্রেতায‌ুগে, বাল্মীকি-বেদব্যাসে, ভারতের আদিম সভ্যতায়, আর্য-অনার্যের সংঘর্ষণে, বেদে উপনিষদে, প‌ুরাণে ইতিহাসে,—সেই কীট চ'লে এসেছে কল্পে-কল্পান্তে, য‌ুগ থেকে য‌ুগান্তরে, মান‌ুষের বংশপরম্পরায়, অস্তিত্বের পর্বে পর্বে। আমি সেই কীট হিমালয়ের,—সেই কীটান‌ুকীট সভ্যতার ধারাবাহিক বিবর্তনক্রমে।

থাক্, আমাদের পথ আজকের মতো ফ‌ুরিয়ে এসেছে। উত্ত‌ুঙ্গ পর্বতমালার শীর্ষে দিনান্তের রক্তিম রোদ দেখা যাচ্ছে। দ‌ূরে থেকে চন্দনবাড়ীর অধিত্যকাটি চোখে পড়ছে। প্রায় আট থেকে ন' মাইল পথ পেরিয়ে এল‌ুম। সাড়ে নয় হাজার ফ‌ুটে এসে এবার যেন বেশ শীত ধরেছে।

(ক্রমশঃ)

মিশরের অন্ধকবি ডাঃ তাহা হোসেন

রেজাউল করীম

মিশরের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে তিনজন দেশ-প্রেমিকের দান অপরিসীম—মুফতী আব্দুহু, সাদ জগলুল পাশা এবং অন্ধকবি ডাঃ মোহম্মদ তাহা হোসেন। সৈয়দ জামালুদ্দিন আফগানির অন্যতম শিষ্য মুফতী আব্দুহু মিশরের আদর্শ ও চিন্তাধারার পরিবর্তন সাধন করেন। তাঁরই প্রভাবে মিশর মধ্যযুগের আদর্শ অতিক্রম ক'রে নতুন যুগে পদার্পণ করে। সাদ জগলুল পাশা মিশরের রাজনৈতিক চেতনা সম্পাদন করেন: তিনি বহু দিক দিয়ে মিশরকে বৈদেশিক শাসন থেকে মুক্ত করেন। এই দুইজনই আজ পরলোকে। ডাঃ মোহম্মদ তাহা হোসেন এখনও জীবিত আছেন। তিনি পণ্ডিত, কবি ও পরম বিদ্যোৎসাহী। তিনি মিশরে ব্যাপক শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা করেন। সারা মিশরে 'অজ্ঞজনের অন্ধ গুহায়' তিনি করেছেন আলোক বিস্তার। মিশরের রাজনৈতিক গণ্ডগোলের মধ্যেও তাঁর প্রভাব একটুও ক্ষুন্ন হয়নি।

অন্ধ কবি তাহা হোসেন শুধু কাব্য-চর্চাই করেন না, তিনি সক্রিয়ভাবে দেশের সংগঠনের কাজেও আত্মনিয়োগ করতে কুণ্ঠিত নন। এজন্য যতটুকু রাজনীতি চর্চার প্রয়োজন ততটুকু তিনি করে থাকেন। কবি আর রাজনীতি এ যুগে একই জনে প্রায় দেখা যায় না। তাহা হোসেন তার ব্যতিক্রম। মিশরের সাম্প্রতিক সামরিক বিপ্লবের পূর্বে তিনি কিছুদিন শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর অধিকার করে-ছিলেন। আজ তাঁর হাতে কোন ক্ষমতা নেই। কিন্তু তবুও তিনি সকল দলের শ্রদ্ধার পাত্র। জেনারেল নেজিব তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। নেজিব রাজতন্ত্র রহিত করে দিয়েছেন। কিন্তু এখনও মিশরের শাসন-

ডাঃ তাহা হোসেন

তন্ত্র রচিত হয়নি। সেনাদলের হাতেই মিশরের শাসনভার ন্যস্ত। একদিন নেজিব তাঁর সেনাদলের বড় বড় অফিসারের এক সভা আহবান করেন। আর এই চৌষট্টি বছরের অন্ধকবি তাহা হোসেনকে অনুরোধ করেন, তাদেরকে কিছু বলবার জন্য। এই সভায় স্বাধীনচেতা কবি গণতন্ত্র সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত ভাষণ দান করেন। তিনি সেনাদলকে সাবধান করে দেন যে, কেবল শৃঙ্খলা আর নিয়মানু-বর্তিতা যথেষ্ট নয়। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যে কোন সরকার শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারে। কিন্তু অস্ত্রের সাহায্যে যে সরকার শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা আদায় করে, সে সরকার জনসাধারণের কল্যাণ করতে পারে না। এই ধরনের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার চাপে মানুষ অমানুষ হয়ে পড়ে। কারাগারের মধ্যে যে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা থাকে, স্বাধীন দেশে জনসাধারণের মধ্যে সেই ধরনের আনুগত্য ও শৃঙ্খলার নিয়ম প্রবর্তন করলে জাতির আত্মা নির্জীব হয়ে পড়ে।—তাঁর এই অমূল্য উপদেশ সেনাদলের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করল কিনা জানা যায়নি তবে তাঁর সৎসাহসকে ধন্যবাদ দেওয়া যেতে পারে যে তিনি সেনাদলের সামনে স্পষ্ট কথা বলতে একটুও কুণ্ঠিত হননি জেনারেল নেজিব কিন্তু তাঁর ভাষণ শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি সেনাদলকে আহবান করে বললেন, "আমি আশা করি আপনারা ডাঃ তাহা হোসেনের কথাগুলি মুখস্থ করবেন। তাঁর এই কথাগুলি আমাদের সংগ্রামের প্রধান ভিত্তি হওয়া উচিত।"

প্রায় ত্রিশ বছর ধরে ডাঃ তাহা হোসেন মিশরের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নানা প্রভার বিস্তার করে আসছেন। একদিকে অজ্ঞতা দূর করবার জন্য তাঁর অক্লান্ত সাধনা, আর অন্যদিকে শাসক-শ্রেণীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর অবিরাম সংগ্রাম। রাজা ফারুককে পদচ্যুত করতে তিনিও কম সাহায্য করেননি। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বহু প্রবন্ধ লিখে তিনি দেশ-বাসীর মনোভাবের পরিবর্তন করেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, বাক্-স্বাধীনতা, স্বাধীন চিন্তার প্রয়োজনীয়তা—এই ত্রিবিধ স্বাধীনতার জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন। আর এইজন্য তিনি রাজশক্তির চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিলেন। প্রত্যেক মিশরবাসীকে লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধা দিবার জন্য তিনি বহু চেষ্টা করেছেন। তাঁর চেষ্টার ফলে সর্বসাধারণের জন্য অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। সমগ্র আরব জগতে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারের এইটাই প্রথম প্রচেষ্টা।

ডাঃ তাহা হোসেন দরিদ্র কৃষক পরি-বারের সন্তান। যখন তাঁর বয়স মাত্র তিন বছর, তখন তাঁর চোখ দুটি চিরকালের তরে নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু অন্ধ হয়েও তিনি হতাশ হননি। মিশরে পল্লী অঞ্চলে আধুনিক ব্রেল-প্রথায় অন্ধ বালকের লেখা-পড়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সাধারণ চক্ষুষ্মান বালকের সংগে তিনি লেখাপড়ায়

প্রতিক্রিয়াশীল। তাঁর পূর্বপুরুষ মহম্মদ আলির কোন গুণই তাঁর মধ্যে ছিল না। কিন্তু দৃঢ়চেতা ডাঃ তাহা হোসেন এহেন দাম্ভিক রাজাকেও পরোয়া করতেন না। তিনি প্রয়োজন হলে

ফারুককে এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গকে কঠোর-ভাবে সমালোচনা করতেন। তাঁর পরিচালিত সংবাদপত্র 'দি ইজিপশিয়ান স্ক্রাইব' স্বাধীন সমালোচনার জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। এই পত্রিকাখানি এরূপভাবে গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রচার করত যে, রাজদরবার ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠত। এই সময় ডাঃ তাহা হোসেন এই পত্রিকায় 'অনেস্টি ইন গভর্নমেণ্ট' (শাসনকার্যে সততা) এই শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ লিখলেন। এই প্রবন্ধটির ফলে তিনি সরকারের বিরাগভাজন হলেন। রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজনামূলক লেখার জন্য তিনি ধৃত হলেন। এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। রাজা ফারুক তাঁকে অপদস্থ করবার কোন সুযোগ ছাড়তেন না। একবার রাজার মনোনীত একটি কমিটি ডাঃ তাহা হোসেনকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু রাজা তাঁকে সে টাকা ত' দিলেনই না, তদুপরি সেই কমিটিকে ভেঙে দিলেন।

শিক্ষা বিস্তারের প্রধান শত্রু ছিলেন রাজা ফারুক। তিনি ক্রমেই স্বৈরাচারী হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু তাঁর এ স্বৈরাচার বেশীদিন টিকল না। ১৯৫২ সালে জেনারেল নেজিব ফারুককে পদচ্যুত করেন। এই পদচ্যুতি গণবিপ্লবের ফলে হয়নি—হয়েছে সামরিক বিপ্লবের ফলে। এর পেছনে ডাঃ তাহা হোসেনের কোন হাত ছিল না। যখন রাজা পদচ্যুত হলেন, তখন ডাঃ তাহা হোসেন ইউরোপে ছিলেন। তবে একথা সত্য যে ডাঃ তাহা হোসেন দীর্ঘদিন ধরে রাজা ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অক্লান্ত অভিযান চালিয়ে আসছিলেন। দেশের জনসাধারণ রাজতন্ত্র-বিরোধী হয়ে উঠেছিল, তাঁরই প্রচারকার্যের ফলে। সেই-জন্য দেশবাসীর মন থেকে ফারুকের প্রভাব কমে গিয়েছিল। মিশরের বর্তমান সরকার একেবারে ডিক্টেটোরিয়াল। কবি তাহা হোসেন নেজিব-সরকারকে সমর্থন করেন। তার কারণ এই যে, নেজিব-সরকার দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতে মিশরে গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হবে। নেজিব গণতান্ত্রিক শাসন রচনা করবার জন্য যে কমিটি গঠন করেছেন, তাতে ডাঃ তাহা হোসেন অন্যতম সদস্য মনোনীত হয়েছেন।

জেনারেল নেজিব এই অন্ধ কবির একজন গুণমুগ্ধ সমর্থক। কবি অবৈতনিক উচ্চ শিক্ষার জন্য যে স্কীম রচনা করেছেন নেজিব তাকে বাস্তব রূপ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

বর্তমানে কয়েকটি কমিটির সদস্য পদ তিনি গ্রহণ করে শান্তভাবে কাজ করছেন। তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়েছেন। এখন তিনি মিশরের একটি দূরবর্তী শান্ত অঞ্চলে সাদাসিধে-ভাবে বাস করেন। তাঁর ঘরে গ্রীক, ফরাসী, আরবী ভাষার হাজার হাজার গ্রন্থ আলমারিতে সাজান আছে। প্রতিদিন কেউ না কেউ তাঁকে এইসব বই পড়ে শুনায়। বৃদ্ধ বয়সে মিলটনকে যেমন বই পড়ে শুনান হ'ত, মিলটনের মতই তাঁর একটি প্রিয় জিনিস হচ্ছে সংগীত। তিনি আরবী ও পাশ্চাত্য গান ভালবাসেন। তাঁর ঘরে সংগীতের সরঞ্জামের অভাব নেই।

মিশরের নূতন শাসনতন্ত্র রচনার কাজ আরম্ভ হয়েছে। ডাঃ তাহা হোসেন এই কাজে বহু সাহায্য করেছেন। প্রবন্ধ কবিতা রচনা—এসব কাজও সমান তালে চলছে। তদুপরি আছে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সপক্ষে বক্তৃতা। একবার নেজিবই বলেছিলেন অন্য কোন আমোদ আহ্লাদে সময় কাটান অপেক্ষা ডাঃ তাহা হোসেনের বক্তৃতা শুনলে অনেক লাভ হ'বে। লেখার জন্য মিশরের বাইরেও তাঁর যথেষ্ট সমাদর আছে। ১৯৪৭ সালে যখন আঁদ্রে জিদ্ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, তখন কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, নোবেল প্রাইজ পেতে পারে এমন ক'জন কবি ও শিল্পীর নাম করতে পারেন? উত্তরে আঁদ্রে জিদ্ বলেছিলেন—"I have but one choice—Taha Hossain." বাস্তবিকই তিনি মিশরের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি। তাঁর খ্যাতি পাশ্চাত্য জগতে প্রতিষ্ঠিত। অক্সফোর্ড, রোম প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অনারারী ডিগ্রি প্রদান করেছে। গত বৎসর Unesco তাঁকে একটি শাখার ডিরেক্টার জেনারেল করতে চেয়েছিল। কিন্তু নেজিব তাঁকে ছাড়তে রাজী হননি। নেজিবের ইচ্ছা যে, শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মিশর তাঁকে কোথাও যেতে দিতে পারে না।

নিষ্ঠুর বোমা

অমরেন্দ্রকুমার সেন

মার্কিন সামরিক বিভাগ মার্চ মাসে প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে দুটি হাইড্রোজেন বোমা ফাটিয়ে তার ফলাফল নিরীক্ষণ করেছেন। একটি বোমা ফাটানো হয়েছিল ১লা মার্চ, আর অপরটি ২৬শে মার্চ। বোমা দুটি ফেটে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, তার এক সুদীর্ঘ বিবরণী মার্কিন আটমিক এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান অ্যাডমিরাল লিউইস এল স্ট্রাউস গত ৩১শে মার্চ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের কাছে পেশ করেছেন। এর পর পুরো দু মাস পার হয়ে গেছে হাইড্রোজেন বোমা ফাটার জের এখনও মেটেনি।

টোকিয়োর ২রা জুনের এক খবরে প্রকাশ যে, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করবার জন্য শিনকোকু দ্বীপের কেপ মুরোতোতে যে একদল কর্মী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে পাঁচজন তেজস্ক্রিয় বৃষ্টিধারা পান করার ফলে তাঁদের শরীরের শ্বেত রক্তকণিকা কমে যাচ্ছে।

ঐ তারিখের আরও একটি খবরে প্রকাশ যে, একটি জাপানী মাছ ধরার নৌকো কিছু মাছ ধরে কাগোশিমায় নোঙর করেছে। ঐ মাছগুলির মধ্যে আটটি উর্গাকিন তেজস্ক্রিয়। বিশ্বাস যে, বিকিনি দ্বীপে হাইড্রোজেন বোমা ফাটানোর ফলেই এই তেজস্ক্রিয়ার প্রভাব দেখা যাচ্ছে।

জাপানী সংবাদপত্র আশাহি একটি সংবাদে বলছেন যে, তেজস্ক্রিয় সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য শুনকোতসু মারু নামে যে সরকারী অভিযাত্রী জাহাজটি প্রশান্ত মহাসাগরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার নাবিকগণ জাহাজের বিজ্ঞানীদের ফিরে যাবার জন্য ক্রমাগত অনুরোধ করছেন, কারণ জাহাজটি নাকি প্রশান্ত মহাসাগরে তেজস্ক্রিয়াধীন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং ক্রমশ অধিক তেজস্ক্রিয়াধীন অঞ্চলে প্রবেশ করছে।

নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ৩রা জুনের এক সংবাদে প্রকাশ যে, হাইড্রোজেন বোমা ফাটবার ফলে যে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা তার জন্য অভিযোগ করেছেন। অভিযোগে বলা হয়েছে যে, বোমা ফাটবার পর থেকে রঙ্গিলের এবং উয়েরিকা নামে দুটি প্রবাল দ্বীপের অধিবাসীরা নানারকম রোগে ভুগছে, তার মধ্যে প্রধান হল বমনেচ্ছা এবং বমন, চামড়া ঝলসে যাওয়া এবং মাথার চুল উঠে যাওয়া। দ্বীপবাসীরা বলছেন যে, হয় বোমার পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়া হোক কিংবা অন্যত্র পরীক্ষা করা হোক।

টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট এবং একজন বিখ্যাত জাপানী দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী নেতা ডক্টর এস মাৎসুমাই ইটালিয়ান সোস্যালিস্ট পার্টি কংগ্রেসে যোগদান করতে যাবার পথে রেঙ্গুনে ৫ই জুন এক প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন যে, বর্মা, ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির ওপর তেজস্ক্রিয় বারিপাত হতে পারে। তেজস্ক্রিয় বারিপাত অথবা ধূলিকণার প্রতিক্রিয়া কিছু বিলম্বে শুরু হয় এবং তার ফল মারাত্মক হতে পারে। যে সকল জাপানী ধীবর তেজস্ক্রিয় ধূলিকণায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, তারা বেশিদিন বাঁচবেন না বলেই তিনি মনে করেন।

ইতিমধ্যে কলকাতা শহরের ওপর ২৯শে এপ্রিল তেজস্ক্রিয় বারিপাত হয়ে

হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের একটি দৃশ্য
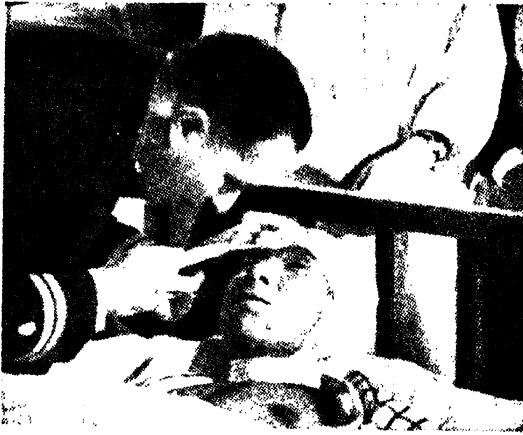
হাইড্রোজেন বোমায় আহতদের হাসপাতালে পরীক্ষা করা হচ্ছে

গেছে, যদিও তার শক্তি খুব ক্ষীণ। মানুষের কোন ক্ষতি করতে পারেনি।

রয়টারের ৬ই জুনের এক সংক্ষিপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, জিন্তশুগোওয়া মারু নামে একটি জাপানী মালবাহী জাহাজের পাঁচজন নাবিককে ৪ঠা জুন ওকাসার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সন্দেহ করা হচ্ছে যে, তারা 'অ্যাটমিক' রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

ওসাকার চারটি বড় মৎস্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান মার্কিন সরকারের কাছ থেকে ১২৬৮০৭২০০ ইয়েন ক্ষতিপূরণ দাবী করেছে। তাদের অভিযোগ হচ্ছে যে, জাপানে ১৭ই মার্চ তেজস্ক্রিয় মাছ আমদানী হওয়ার পর থেকে তাদের মৎস্য ব্যবসায়ে বিপুল ক্ষতি হয়েছে।

এখন দেখা যাক, অ্যাডমিরাল স্ট্রাউস প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের কাছে কি রিপোর্ট দিয়েছেন:

"জানুয়ারি মাসের গোড়া থেকেই মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষার জন্য লোকজন ও মালপত্র পাঠানো হচ্ছিল। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, হাইড্রোজেন বোমায় কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই একচেটিয়া অধিকার নেই, কারণ সোভিয়েট রাশিয়া ইতিপূর্বে ১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসে সাইবেরিয়ায় হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষা করেছে, যার বিধ্বংসী ক্ষমতা ১৯০৮ সালে পতিত উল্কার সমতুল। এই উল্কা সবদিকে পনের মাইল এলাকার মধ্যে একটিও গাছকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেয়নি। সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল।

মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের এই পরীক্ষার বিশেষ একটি নাম দেওয়া হয়েছিল, 'অপারেশন ক্রসরোডস'। ১লা মার্চ একটি এবং ২৬শে মার্চ আর একটি বোমা ফাটানো হয়। বোমা ফাটাবার আগে হাওয়ায় গতি ভালো করে পরীক্ষা করে নেওয়া হয়, সম্ভাব্য বিপৎসঙ্কুল এলাকার মধ্যে কোন জাহাজ বা স্টিমার আছে কি না, পর্যবেক্ষণকারী বিমানের সাহায্যে তাও দেখে নেওয়া হয়।

যখনি কোন বড় রকমের বিস্ফোরণ হয়, তখনই তার নীচে যা কিছু থাকে, মাটি বা জল বা আর কিছু তার অনেকটা অংশ সেখান থেকে চূর্ণ চূর্ণ হয়ে আকাশে ব্যাপ্ত হয়ে যায়, ভারি চূর্ণ মাটিতে পড়ে যায়, হাল্কা চূর্ণ হাওয়ার স্রোতে ভেসে যায়। পারমাণবিক বোমা সংক্রান্ত হলে এই সব চূর্ণ তেজস্ক্রিয় হয়।

এখানে বোমা ফাটবার অনতিবিলম্ব পরেই দেখা গেল যে, হাওয়ার গতি যেদিকে হওয়া উচিত, সেদিকে যায়নি, যার জন্য রঙ্গিলাপ, বাঙ্গারিক ও ইউটেরিক নামে এই দ্বীপগুলির ও চূর্ণ বৃষ্টি হয়। 'ফর্চুনেট ড্রাগন' ন একটি জাপানী মাছধরার জা দৈবক্রমে বিপজ্জনক এলাকায় থাকায় তা ওপর এ চূর্ণপাত হয়েছিল। যাই হে দ্বীপগুলির ২৩৬ জন অধিবাসী এ ২৮ জন মার্কিন আবহাওয়া পর্যবেক্ষ কারীকে কওয়াজেলিন দ্বীপে মার্কি নৌবহরের চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠিয়ে পরী করে দেখা যায় যে, ভাগ্যক্রমে ত বিপন্মুক্ত। জাপানী মাছধরা জাহাজে ২৩ জন নাবিককে মার্কিন কর্তৃপ ভালো করে পরীক্ষা করবার সুযো পায়নি। তবে বর্তমানে যেসব বিবর পাওয়া যাচ্ছে, তাতে জানা যায় যে, অব আয়ত্তাধীন।

যেমন আশা করা যাচ্ছিল, বোম বিস্ফোরণ ও প্রতিক্রিয়া তার দ্বিগু হয়েছে। এই বোমা যেমন ইচ্ছে আকারে করা যায় এবং এমন বড়ও করা যায়, য দ্বারা নিউ ইয়র্কের মতো বড় শহ সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া যায়।"

এই হল অতি সংক্ষেপে অ্যাটমি এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান অ্যাডমিরাল স্ট্রাউসের সংবাদপত্রে প্রকাশের জন রিপোর্ট। এছাড়া তিনি আরও যদি কিছ মার্কিন রাষ্ট্রপতির কাছে বলে থাকেন তা গোপন রাখা হয়েছে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, জাপানের বরাতই মন্দ, তার যেন কোন অভিশাপ লেগেছে। অ্যাটম বোমা জাপানের ওপরই প্রথম প্রয়োগ করা হল। তারপর হাইড্রোজেন বোমাতেও জাপানই প্রথম আঘাত সহ্য করল। কিভাবে জাপানের কপালেই এই আঘাত পড়ল, তার যেটুকু বিবরণ পাওয়া গেছে, তা জানানো গেল:

পয়লা মার্চ প্রশান্ত মহাসাগরে যে হাইড্রোজেন বোমাটি ফাটল, তার শক্তি হিরোশিমার ওপর পতিত অ্যাটম বোমা অপেক্ষা ৭৫০ গুণ অধিক এবং বিজ্ঞানীরা যা আশা করেছিলেন, তার চেয়েও তেইশ গুণ অধিক শক্তিশালী। তাহলে কী প্রচণ্ড তার শক্তি, যেন কল্পনা করাও যায় না।

ফুকুরিউ মারু যার বাংলা অর্থ 'ভাগ্যবান ড্রাগন' একটি টুনা মাছ ধরবার ৯৯ টন ওজনের জাপানী ট্রলার। ঘটনার দিন ট্রলারখানি বিকিনি অ্যাটল, যেখানে বোমা ফাটে, সেখান থেকে ৭১ মাইল এবং নিষিদ্ধ এলাকা থেকে ১৪ মাইল দূরে ছিল। সমুদ্র বেশ শান্ত ছিল, আবহাওয়াও বেশ পরিষ্কার ছিল। সকাল ৬-৯ মিনিটে সূর্যোদয় হল। ট্রলারের ২৯ বৎসর বয়স্ক ক্যাপ্টেন তাদাইচি সুৎসুই জাল তোলা লক্ষ্য করছিলেন, তখন ৬-১২ মিনিট। এমন সময় সানজিরো মাসুদা নামে একজন নাবিক এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। সূর্য অপেক্ষা জোরালো লকলকে আগুনের শিখায় আকাশ যেন ছেয়ে গেল, আকাশের রং হল প্রথমে টকটকে লাল, তারপর হলদে। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল আরে, সূর্য কেমন অদ্ভুত ভাবে উঠছে, ছুটে এস, শীগগির এস। কিন্তু এ ত সূর্যোদয় নয়, এ যে পশ্চিম দিক। তাহলে নিশ্চয়ই এটা পিকাডন, যার অর্থ অ্যাটম বোমা।

আকাশের রং বদলাতে লাগল। দু' মিনিট পরে বহু বজ্রপাতের সম্মিলিত এক তীব্র আওয়াজ যেন কানে এসে পৌঁছল। তাদের মনে তখন কোন প্রতিক্রিয়া হল না, কিন্তু ট্রলারটা যেন দুলে উঠল। তারপর যেন একটা পিরামিডাকৃতি মেঘ আকাশে উঠল, এই মেঘও যেন দ্রুত বহুবার রং বদলাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ঐ মেঘ মিলিয়ে গেল। আকাশে একটা পাতলা মেঘের আস্তরণ রয়ে গেল।

তারপর মাঝিরা নিজের নিজের কাজে ফিরে গেল, জাল টানতে সকলে ব্যস্ত, বেশ মাছ উঠছে। এরকম প্রায় ঘণ্টা তিনেক চলল। তারপর আকাশ থেকে খুব সূক্ষ্ম পাউডারের মতো সাদা গুঁড়ো পড়তে লাগল। মাসুদা ও ক্যাপ্টেন সুৎসুইয়ের চোখে কিছু পড়তে চোখ জ্বালা করতে লাগল। ক্যাপ্টেনের নাকেও কিছু ঢুকে গিয়েছিল। ক্যাপ্টেন নাক ঝেড়ে ফেললেন, টুপির ওপর যেগুলি পড়েছিল, সেগুলিও হাত দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করলেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন বিস্মিত হলেন, যখন দেখলেন যে তাঁর হাতের সুতীর দস্তানা, যা

তেজস্ক্রিয় ধূলিকণায় জাপানী জেলেটির কণ্ঠদেশ দগ্ধ হয়েছে

রবারের ব্যাণ্ড দিয়ে বাঁধা ছিল, সেই রবারের ব্যাণ্ড যেন কঠিন হয়ে গেছে আর সহজেই তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। শরীর যেন সকলের গরম হয়ে উঠল, কিন্তু সমুদ্রের বুকে যারা রোদে পোড়ে, তারা এই তফাৎটা লক্ষ্য করল না।

কিন্তু ক্যাপ্টেন সুৎসুই ক্রমশ অস্বোয়াস্তি বোধ করতে লাগলেন। তিনি বাড়ি ফেরবার হুকুম দিলেন। তাঁর ভয় হ'ল প্রবাল দ্বীপে অ্যাটম বোমার পরীক্ষার ফলে দ্বীপের প্রবাল সব ধূলিসাৎ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এতে ক্ষতি হবে। ফিরে যাওয়াই এখন নিরাপদ। সেই দিনই ট্রলার দু' হাজার মাইল দূরে জাপানের পথে পাড়ি জমালো।

ওয়ারলেস অপারেটর তাইকিচি কুবোইয়ামা বলে যে, সে রাত্রে কেউ খেতে পারল না, কারও ক্ষিধে নেই, তাছাড়া ভয়ও খুব। কে জানে কোন আগ্নেয়গিরি না পিকাডন না কিসের ধূলিকণা এসে সব যেন ভূমিসাৎ করে দেবে। বিপদ যেন ঘনিয়ে আসছে। অমন যে প্রিয় ভাতের মদ তাও কারও ভাল লাগল না।

একজন নাবিক তাদাশি ইয়ামামটো বলে যে, মনে হতে লাগল যে সমস্ত মুখটা যেন জ্বলছে, এমনই গরম হয়েছে। মুখের সব রং বদলে পেন্সিলের সিসের মতো হয়ে গেছে। আমরা যদি জানতুম আমাদের বিপদের পরিমাণ কতখানি, তাহলে হয়ত আমরা মিডওয়ে দ্বীপে অবতরণ করে মার্কিনদের সাহায্য চাইতুম। আমরা বুঝতেই পারিনি।

মাসুদার শরীরের যে সব অংশ সেই ধূলিবৃষ্টির সময় ঢাকা ছিল না সে সব অংশ ভীষণ চুলকাতে থাকে, মুখটা ভীষণ ফুলে ওঠে। অনেকেরই মাথাধরা, বমনেচ্ছা ও চুলকানি দেখা দিয়েছে। অবশ্য ইতিমধ্যে অনেকে স্নান করে সেই ধূলিকণা পরিষ্কার করেছে কিন্তু ওদিকে আবার সকলে সেই ধূলিধূসরিত জাল নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। কিন্তু চুলকানি ক্রমশ তীব্র ও অসহ্য হয়ে উঠল, গায়ে চাকা চাকা ফোস্কা পড়ে গেল। আমরা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়লাম।

১৪ই মার্চ ট্রলার জাপানে পৌঁছলো। তারপর অবশ্য তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'ল। হাজার হাজার পাউণ্ড টুনা মাছ

মাটিতে পর্'তে ফেলা হল। পরীক্ষা করে দেখা গেল সেই ধ্লিকণা তেজস্ক্রিয় হয়ে গেছে যার জন্য নাবিকদের অনাবৃত অংশ রীতিমতো পুড়ে গেছে তা ছাড়া অন্য লক্ষণ তো আছেই।

জাপান নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। তার মাছের ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেছে। হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের ফলে তার দেশে নানারকম প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। পয়লা জুন টোকিয়োতে যে বৃষ্টিপাত হয়েছে তার রং রীতিমতো কালো, কালির মতো।

জাপান প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে বিকিনির উদ্দেশ্যে শুনকোৎসু মারু নামে এক ল্যাবরেটরি জাহাজ পাঠিয়েছে। ঐ জাহাজে ২২ জন বিজ্ঞানী আছেন, আর আছে তেজস্ক্রিয়া পরীক্ষা করবার জন্য ১২টি গাইগার মুলার কাউন্টার যন্ত্র। এই অভিযানের জন্য জাপান সরকার ৩৯০০০ ডলার বরাদ্দ করেছেন। জাহাজটি সমুদ্রবক্ষে ৯০০০ মাইল ঘুরে জুলাই মাসের মাঝামাঝি জাপান ফিরবে। এই অভিযানে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের এবং বিকিনি দ্বীপের জল, সামুদ্রিক মাছ বিশেষ করে টুনা এবং বাতাস ও ধুলি-কণা পরীক্ষা করে দেখা হবে।

ইতিমধ্যে টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের বারো জন নবীন বিজ্ঞানী 'ফর্চুনেট ড্রাগন' ট্রলারে পতিত ধ্লিকণা উত্তমরূপে পরীক্ষা করে জানতে পেরেছেন যে, ঐ ধ্লিকণার মধ্যে সতেরোটি বিভিন্নপ্রকার তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ আছে।

ডক্টর মাসাও সুজুকি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিখ্যাত অধ্যাপক, পারমানবিক তেজস্ক্রিয় বিজ্ঞানে তাঁর তুল্য বিজ্ঞানী আর একজনও নেই। তিনি বলেন যে, ঐ ধ্লিকণাতেই তিনি প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সন্ধান পেয়েছেন। এর অর্থ হ'ল এই যে, এই ক্যালসিয়াম কার্বনেট কোনো প্রবাল বাঁধ ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তিনি সন্দেহ করেন যে, হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের ফলে এবারও কোনো ছোট-খাটো প্রবাল দ্বীপ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

মার্কিন বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, এই বোমাগুলির 'হাইড্রোজেন বোমা' নামকরণ ঠিক নয় কারণ তাদের বিস্ফোরক পদার্থ হাইড্রোজেন গ্যাস নয়, অন্য কিছু। এদের 'থার্মোনিউক্লিয়ার বোমা' বললেই ঠিক বলা হবে। এই থার্মোনিউক্লিয়ার প্রতিক্রিয়ার জন্যই সূর্য ও নক্ষত্রগুলি কিরণ দিচ্ছে। এই প্রতিক্রিয়ার ফলেই প্রচণ্ড তাপে হাইড্রোজেন কণিকা হিলিয়াম কণিকায় রূপান্তরিত হয়। হিলিয়াম হ'ল হাইড্রো-জেনের পরবর্তী হালকা পরমাণু। অ্যাটম বোমা ফাটবার আগে পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে থার্মোনিউক্লিয়ার প্রতিক্রিয়া ঘটানো মানুষের কল্পনাতীত ছিল; এত প্রচণ্ড উত্তাপ যে সৃষ্ট হ'তে পারে তা কেউ বিশ্বাস করে নি।

আজকালকার উন্নত ধরনের অ্যাটম বোমা যা হিরোসিমায় পতিত অ্যাটম বোমা অপেক্ষা পঁচিশ গুণ শক্তিশালী সেই বোমা যখন ফাটে তখন কল্পনাতীত কম সময়ের জন্য প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্ট হয় যা সূর্য অপেক্ষা বেশি। এই অতি ... সময়ে কি করে হাইড্রোজেনকে জ্বাল... যাবে যাতে নতুন ধরনের একপ্রকার ... ফাটানো যাবে? তাই হাইড্রোজেনের ... দ্রুত জ্বলে যায় তার খোঁজ চলতে চ... ট্রাইটিয়ামের খোঁজ পাওয়া গেল যা অ... একপ্রকার দুষ্প্রাপ্য হাইড্রোজেন। ... ট্রাইটিয়াম প্রকৃতিতে দুষ্প্রাপ্য তাই ... লক্ষ টাকা খরচ করে কারখানা ব... ট্রাইটিয়াম তৈরি করা হচ্ছে যাতে থা... নিউক্লিয়ার প্রতিক্রিয়া ঘটানো যায়। ১৯... সালের পয়লা নবেম্বর প্রথম পরীক্ষা ... যাতে এনিওয়েটেক দ্বীপপুঞ্জের এক... ছোটখাটো দ্বীপ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফ... যেন উবে যায়। সেই হ'ল পৃথিবীর প্র... হাইড্রোজেন বোমা, যার শক্তি হ'ল ... লক্ষ টি এন টি বোমার সমান অর্থাৎ প... মেগাটন। এক মেগাটন দশ লক্ষ টি এন... বোমার সমান।

এই হাইড্রোজেন অথবা থার্মোনি... ক্লিয়ার বোমার মধ্যে আছে অ্যাটম ... সেটি বন্দুকের ঘোড়ার মতো কাজ কর... ঐ অ্যাটম বোমা ফাটার সঙ্গে সঙ্গেই ... ট্রাইটিয়াম উৎপন্ন হয় তার সঙ্গে ড... টেরিয়াম নামে আর একপ্রকার হাইড্রোজে... যেভাবেই হোক মেশানো হয়। এই দুইয়ে... মিশ্রণ একা ট্রাইটিয়াম অপেক্ষা আর... দ্রুত বিস্ফোরিত হয়ে দ্বিতীয় 'ঘোড়া... কাজ করে, তারপরই হয় আসল থার্মো... নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ। কিন্তু প্রথ... অ্যাটম বোমা, তারপর ট্রাইটিয়াম-ডয়টে... রিয়াম মিশ্রণ এই দুইয়ে মিলে মূল কোন... পদার্থকে বিস্ফোরিত করে যার ফ... এই প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হয়? অনুমান কর... হচ্ছে যে, সেই পদার্থটি হ'ল লিথিয়াম। লিথিয়াম হালকা ধাতু, প্রকৃতিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, রুপোলি রং। হাওয়ায় তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় বলে লিথিয়ামকে ন্যাফথায় ঢেকে রাখতে হয়। সেইজন্যে এই বোমাকে লিথিয়াম বোমাও বলা হচ্ছে। এই বোমা যত ইচ্ছে বড় করা যেতে পারে, কিন্তু যে বিমান থেকে এই বোমা ফেলা হবে, বিস্ফোরণের পূর্বেই তাকে অন্তত পনেরো মাইল দূরে পালাতে হবে নইলে বিমানখানি ঝল্সে যাবার আশঙ্কা আছে।
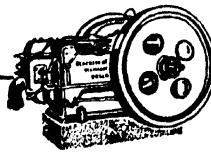
— ৬ —

পাখি সব ক'রে রব রাতি পোহাইল নয় শিশুদের কলরবে এখানে রাত্রি প্রভাত হয়। যে-ঘরের শিশুরা পেটপুরে খেয়ে ঘুমিয়েছিল সকালে উঠে আবার খাবে বলে তারা চিৎকার করতে থাকে। যে-ঘরের শিশুরা রাত্রে অভুক্ত থেকেছিল রাত ভোর না হতে তারা তো কাঁদবেই। আর সেই কান্না থামাবার জন্যে চলে কিল চড় চোখ রাঙানি। ঘরে ঘরে চিৎকার প্রবল এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। কিন্তু খেয়ে ঘুমোক কি না খেয়ে রাত কাটাক সকালে চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে যাতে বাচ্চারা খাওয়ার কথা ভুলে থাকে তার একটা সুন্দর উপায় আবিষ্কার করেছে বিধুমাস্টারের স্ত্রী লক্ষ্মীমণি। হাজার রকমের ছড়া তার মুখস্ত। নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে; হাট্টিমা টিম টিম তারা মাঠে পাড়ে ডিম; গর্দভ সাইকেল চড়ে বর্ধমান যায় ইত্যাদি হাল্কা ছড়া থেকে আরম্ভ করে আজি এ প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল প্রাণের পর অথবা দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী প্রভৃতি গুরুগম্ভীর গান কবিতা লক্ষ্মীমণির ছেলেমেয়েরা সুন্দর গাইতে পারে, আবৃত্তি করতে পারে। লক্ষ্মীমণি আগে আগে বলে যায় সন্তানেরা মাকে অনুসরণ করে। এমন কি যে-শিশুটি কথা বলতে পারে না, সেটিও মার বুকের দুধ খাওয়া ভুলে গিয়ে ভাইবোনদের মতন ছড়া আওড়ায় আ টিম টিম দিম্ দিম্...... তারপর একটু ফর্সা হতেই লক্ষ্মীমণি শয্যাত্যাগ করে। বলতে কি এবাড়িতে সকলের আগে বিধু মাস্টারের স্ত্রী ঘরের দোর খুলে বেরিয়ে উঠোনে নামে। তত-ক্ষণে ঝাঁটা হাতে মেথর এসে গেছে। এবং উঠোনে কেউ জল দিক না দিক তার জন্যে অপেক্ষা না ক'রে দড়ি-বালতি নিয়ে লক্ষ্মী-মণি পাতকুয়ার দিকে ছুটে যায় তারপর বালতি বালতি জল এনে উঠোনে নর্দমায় ঢালতে থাকে আর চড়া গলায় মেথরকে হুকুম দেয় এজায়গা সাফ কর, ওখানে শ্যাওলা জমেছে ভাল করে ঝাঁটা মার, উঁহু হল না, ময়লা রয়ে গেছে এধারটায়। জল ঢালতে লক্ষ্মীমণির এতটুকু অলস্য নেই। বরং এ-কাজে তার উৎসাহ বেশী। অথচ পালা করে সব ঘরের বৌ ঝি একদিন একদিন মেথর এলে বাড়ির উঠোনে নর্দমায় জল ঢালার কথা। কাল রমেশ গিন্নীর জল ঢালার পালা ছিল। কিন্তু আলস্যবশত হোক কি পায়ে একটু বাতের জোর হয়েছিল বলে হোক তিনি বেলা না হওয়া তক শয্যা ছেড়ে উঠেননি। তাই বলে উঠোন ধোয়ানো বাকি থাকে নি, লক্ষ্মী-মণিই বালতি বালতি জল ঢেলে সে-কাজ করিয়েছে। আজ জল ঢালার পালা কমলার। কিন্তু কমলার ঘুম ভাঙ্গছে না। মেথর এসে ডাকাডাকি করতে লক্ষ্মীমণির আর শুয়ে থাকা হয় না। অর্ধেক উঠোন ধোয়ানো হয়ে যাবার পর দোর খুলে বেরিয়ে আসে কমলা। হাতে টুথ ব্রাস, তোয়ালে সাবান। লক্ষ্মীমণি জল ঢালছে দেখে কমলার মুখখানা হাসিতে ভরে ওঠে, 'আহা, আমার উঠতে দেরি হয়ে গেল। দিদি আজও জল দিচ্ছেন।'

'তাতে কি।' সবগুলো দাঁত বার করে লক্ষ্মীমণি হাসে। 'আর একদিন ঢালবেন, আজই তো জল ঢালা শেষ হল না। আজ না হয় আমিই ধুইয়ে দিলাম।'

'সত্যি দিদির একাজে আলস্য নেই।' কমলা উঠোনে নেমে আসে। 'আজ সকালে আমার এখানে আপনার চা খাওয়ার নেমন্তন্ন রইল।'

'আহা, একটুখানি জল ঢেলেছি কি না ঢেলেছি তো আবার,—বেশ, নেমন্তন্ন করেছেন যখন সেটা রক্ষা করবই। আমার এত গুমোর নেই। আমি সকলের ঘরেই যাই, সবার সাথে মিশি।'

'তা কি আমি জানি না, তা কি আর চোখে দেখছি না।' কমলা মুখে দাঁতন গুঁজল। 'আমি এক্ষুণি মুখ ধুয়ে এসে স্টোভ ধরাচ্ছি। চট্ ক'রে জলটা ঢেলে দিয়ে আপনিও মুখ-হাত ধুয়ে আসুন।'

'মতলববাজ, ভয়ানক ফাঁকিবাজ মেয়েটা।' শিবনাথ রুচির দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় হাসে। রুচি বলে, 'সংসারের নিয়মই তাই। কৌশলে মানুষ মানুষকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। এক কাপ চা খাওয়ার নেমন্তন্ন করল, তার মানে আর একদিন জল ঢালার পালা এলে আবার বেলা ক'রে শয্যা ত্যাগ করবে, তারপর উঠোন ধোয়ানো শেষ হলে দোর খুলে বেরিয়ে এসে হেসে বলবে, 'দিদি, আহা, এ কি করছেন। যাকগে আপনার সকালের চা-টা আমার এখানেই হবে।'

একটা চোখ বুজে শিবনাথ আরো জোরে মাথা নেড়ে নিঃশব্দে হাসে, 'যা বলেছ। তুমিও অই করবে। বাব্বাঃ, এত বড় উঠোনে বালতি বালতি জল ঢালতে হলে হয়েছে আর কি। তার চেয়ে যদি এক বাটি চা ঘুষ দিয়ে ডিউটিটা মাস্টারের বৌয়ের ঘাড়ে চাপাতে পার,—মন্দ কি?'

রুচি কথা বলল না। স্বামীর প্রস্তাবটা সে অনুমোদন করতে পারছে না। মুখের এমন ভান করে দরজার ফাঁক দিয়ে লক্ষ্মী-মণির জল ঢালা দেখতে লাগল। শিবনাথ ঘাড় বাড়িয়ে রুচির কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'ছেলেমেয়ে হবে মহিলার।'

'হুঁ।' রুচি মুখ না ফিরিয়ে উত্তর করল, 'দেখতেই তো পাচ্ছ।'

'সাত আট মাস এটা ও'র। তার কম হবে না, কি বল?'

রুচি শিবনাথের কথার জবাব দিলে না।

শিবনাথ স্ত্রীর কানের কাছ থেকে মুখ না সরিয়ে গুনগুন করে হাসল। 'সাংঘাতিক মেয়ে, বাবা! এসময়েও এত জল ঢালতে পারে।'

'কি করবে, আর কেউ উঠোনে জল দেয় না দেখে ও'কেই ঢালতে হচ্ছে, উপায় কি। উঠোন ধোয়ানো তো আর ফেলে রাখা যায় না।'

'আহা সে কথা হচ্ছে না।' শিবনাথ অবশ্য হাসি বন্ধ করল না। 'বলছিলাম এই অ্যাডভান্সড স্টেজে এমন পরিশ্রম সবাই করতে পারে না। এত বড় উঠোনে জল ঢালা কি মুখের কথা!'

রুচি নীরব।

'বস্তির মেয়েরা এসব কাজ খুব পারে। পাঁই মুলোর ঘণ্ট খেয়েও গায়ে কেমন জোর রাখে দ্যাখো।'

রুচি চোখ বড় ক'রে শিবনাথের দিকে ফিরে তাকাল। একটা বিস্ময়, একটা বেদনা সেই চোখে। কিন্তু তা ছাড়াও আর একটা জিনিস ছিল রুচির তাকানোর মধ্যে। ভৎর্সনা। শিবনাথ সেটা ধরতে পারল কি। তখনো সে দাঁত বার ক'রে হাসছে। অগত্যা চোখের ধার কমিয়ে রুচিও বেশ একটু মোটা ক'রে হাসল। 'ভালই তো হ'ল। আস্তে আস্তে এখানে থেকে আমার গায়েও এমন জোর আসবে এদের মত শক্তসমর্থ হয়ে উঠব।'

এবার শিবনাথ ফ্যালফ্যাল্ চোখে স্ত্রীর দিকে তাকাল। 'কিন্তু তাই ব'লে তুমি তো আর ছেলেমেয়ে পেটে ধরছ না। মঞ্জু হবার পরে তুমিই প্রমিজ করে বসে আছ ওই একটিই যথেষ্ট আর না। কাজেই তোমার এ-অবস্থা আর হবার ভয় নেই।'

রুচি নীরব। স্থির চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

'তা ছাড়া এখানে এই বাড়িতে যে আমরা চিরকাল থাকতে এসেছি তা-ই বা তোমাকে কে বললে। বলছি তো, আমার একটা সুবিধা হলেই—'

'লক্ষ্মীমণির স্বামীও ছ' বছর ধরে চেষ্টা করছে এখান থেকে নড়তে। পারেনি।' অতি সংক্ষেপে অত্যন্ত স্পষ্ট গলায় কথাটা বলে রুচি শয্যাত্যাগ করল। মঞ্জুর ঘুম ভেঙেছে। কাঁদছে না ঠিক। চোখ ছলছল করছে পাশের কোন্ ঘরের উনোনের ধোঁয়া গলগল ক'রে এঘরে এসে ঢুকে চোখ কানা ক'রে দিচ্ছে। ধোঁয়ায় ওর চোখে জল এল বুঝি।

'ডেন'—মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন অসহায় চাপা গলায় শিবনাথ গর্জন করে উঠল। 'এই নরকে বেশিদিন বাস করলে টি বি না হয়ে যায় না।' যত শীগ্‌গীর সম্ভব আমাদের এখানকার আস্তানা গুটোতে হবে।'

'কিছু হবে না।' রুচিও উনোনে আঁচ দেবার উদ্যোগ আয়োজন করছিল। 'থাকতে থাকতে সব সয়ে যায়। এখানে আর দশটি শিশুর মত মঞ্জুরও ধোঁয়াটোয়া সয়ে যাবে।'

রাগ ক'রে রুচি কথাগুলো বলেছে কি না মঞ্জুকে কোলে নিয়ে হাত দিয়ে ওর চোখ মোছাতে মোছাতে শিবনাথ ভাবে।

•

আর এবাড়িতে নতুন ভাড়াটের সঙ্গে যেচে সকলের আগে আলাপ পরিচয় করে লক্ষ্মীমণি। কাল নিতান্তই পথে পরিচয় ক'রে কমলা আগেভাগে রুচির ঘরে ঢুকে জমিয়ে ফেলেছিল, কতকটা এই কারণে, আর সারাক্ষণ শিবনাথ রুচির প্রায় গায়ের সঙ্গে লেগে ছিল ব'লে লক্ষ্মীমণি ওধারে ঘেঁষেনি।

না হলে পরিচয় করতে আলাপ জমাতে লক্ষ্মীমণি সকলের চেয়ে বেশি ওস্তাদ।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর শিবনাথ একটু বেরিয়েছে কি লক্ষ্মীমণি প্রায় ভিজা কাপড়ে রুচির ঘরে এসে ঢুকল। 'আমার সংসারের খাওয়া-দাওয়া শুরু ও শেষ হ'তে সেই বেলা তিনটা। বলে কিনা রাবণের ঝাঁক।'

আলাপের শুরুতেই বিধু মাস্টারের বৌ হাসল। 'দিদির ছিমছাম সংসার দেখলে চোখ জুড়ায়।'

বিছানায় সবে একটু কাত হয়ে শুয়ে মঞ্জুকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে রুচি একটু ঘুমের চেষ্টা করছিল। কাল জিনিসপত্র টানা-হেঁছড়া পথের কষ্ট, এখানে এসেই আবার নতুন ক'রে সব গুছানো সাজানোয় রুচি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এরকম হবে ও জানে। তাই ইস্কুলে বাড়ি বদলের জন্যে পুরো দু'টো দিনের ছুটি চেয়ে নিয়েছে।

হেসে রুচির ঠোঁটের দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে লক্ষ্মীমণি বলল, 'দিদির পান খাওয়ার অভ্যেস নেই?'

'না।' সংক্ষেপে উত্তর ক'রে বেশ সতর্ক চোখে রুচি তিন নম্বর ঘরের প্রতি-বেশিনীকে দেখতে লাগল। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের দিকে প্রথমটায় সব মেয়েই যেমন সতর্ক ভয়ে তাকায়।

'কি দেখছেন?'

রুচির দেখা শেষ হয়ে গেছে এমন একটা সময় অনুমান ক'রে লক্ষ্মীমণি খুক্ করে হাসল।

'আগো দিদি হাসিও পায় দুঃখও লাগে। কিন্তু করব কি। বলে কিনা কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, স্বামী মোদের ধর্ম।'

মেয়েমানুষ রুচি, তাই ওই একটা প্রসঙ্গেই অন্তরঙ্গতা নিবিড়তম হয়ে উঠেছে ভেবে তেমনি খুক খুক ক'রে হাসতে হাসতে লক্ষ্মীমণি মাথাটা নুইয়ে উপবিষ্ট রুচির মাথার সমান্তরালে এনে ফিসফিসিয়ে বলল, 'কি ক'রে পারেন বোন, সত্যি আপনাদের দেখলে দেবতা মনে হয়। কিন্তু কি করব। সংসার তরী চালাবার হাল যার হাতে, সে যদি অবুঝ হয় তো আমি স্ত্রীলোক করব কি, করবার কে। আসে অসুক। বার্লি খেয়ে বাচ্চা বড় হচ্ছে দেখতে যদি অসাধ না লাগে, খারাপ না লাগে হোক না একটার পর একটা। এই নিয়ে আমার তেরো বার গর্ভ হ'ল। বয়েস? আমি আপনার চেয়ে বড় হব না দিদি।'

যেন কথার শেষে হঠাৎ একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস শুনল রুচি। চমকে নবপরিচিতার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল সত্যি সেখানে হাসি নিভে গেছে। মেঘলা আকাশের মত মুখখানা করুণ থমথমে।

'আপনি বসুন।' এই এতক্ষণ পর রুচি যেচে আলাপ করতে আসা ভদ্র-মহিলাকে বসতে বলল। 'না দিদি বসব না। নেয়ে এলাম ভিজে কাপড় পরনে।'

দেখা গেল সেসব ভাবনা ধরাবাধা সৌজন্যতার পালিশ রক্ষার মাথাব্যথা বিধু মাস্টারে স্ত্রীর তিলমাত্র নেই। সহজ ঠান্ডা হাসি হেসে মুখের গুমোট মেঘটা কাটিয়ে দিয়ে বলল, 'দিদির ওই একটি মেয়েই বুঝি। সাত বছরে পা দেবে দেখে বেশ মনে হ'ল। আর বুঝি চান না?

রুচি গম্ভীর হয়ে চুপ করে রইল।

এবার যেন লক্ষ্মীমণি একটু সতর্ক হ'ল। এবং সেভাবেই আলাপটা গড়াতে দিলে। 'খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে আপনার?

'হ্যাঁ।' রুচি মাথা নাড়ল এবং চুপ ক'রে রইল।

'কর্তা আপিসে বেরোলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।' রুচি মিথ্যা কথাই বলল।

'আপনাদের রেশন কার্ড করিয়েছেন?'

'না।' রুচি বলল, 'এদিকে শুনেছি ব্ল্যাকে খুব চাল পাওয়া যাচ্ছে?'

'জানি না দিদি।' আলাপটা বড় বেশি ঘষামাজা। পরিচয়ের মধ্যে ফাঁক রাখতে চাইছে অনুমান করে লক্ষ্মীমণি চেহারা কেমন অপ্রসন্ন করে তুলল।

'মাস্টার মানুষ। সরল সিধা লোক। ব্ল্যাক-ফ্ল্যাক জানেও না। যাবেও না এই পথে। ঠিকা ঝিকে পাকা ঝি নাম লিখিয়ে দশখানা রেশন কার্ড করিয়েছি। ঠিকে ঝি-ও অবশ্য বেশিদিন রাখতে পারলাম না দিদি। একলা হাতে এখন সব করি। তা কি বলছিলাম। হ্যাঁ রেশন। না ব্ল্যাক কেন। দশখানা কার্ডের সব চাল আনলে আমার সংসার খেয়ে তুষ্ট থাকে। কর্তা নিয়মের বাইরে পা বাড়ান না। সেই দশখানা কার্ডের সব চাল কেনবার টাকা কি আমাদের মত গরীব লোকের ঘরে সব সময় থাকে দিদি। দু হপ্তা পুরো রেশন আনি, দু হপ্তা অর্ধেক। তাই তো বলছি, খুব কাজের কথা দিয়ে আলাপটা আরম্ভ করেছিলাম দিদি, খুব বেঁচে গেছেন। আমাদের মত লোভী বেড়াল নন। যে ভাজা খাবার আশায় আশায় বার বার গরম হাঁড়ির দিকে জিভ বাড়াবেন, আর জিভ পুড়িয়ে কালো করবেন। স্বামী-স্ত্রীর জীবন কি আর সুধার ভাণ্ড আছে দিদি, পোড়ার যুদ্ধের আগুনে লেগে সেই যে হাঁড়ি গরম হয়ে আছে আর ঠাণ্ডা হচ্ছে না। ছেলেমেয়ে কম থাকলে ছেলেমেয়ে না থাকলে ঘরদুয়ার নিমল করে কত ভাল লাগে দেখতে জামা-কাপড়, জুতো-গামছা বাসন-কোসন বিছানা-পাটি। কি নাম আপনার খুকুর? হাঁ, মঞ্জু। খুকির বাবাকে তখন ডাকতে শুনলাম।' একটু থেমে লক্ষ্মীমণি বলল, খুকির বাবা কোন্ আপিসে চাকরি করেন দিদি?'

রুচি একটা মিথ্যা আফিসের নাম বলল ও চুপ ক'রে রইল।

খুব বেশি না, তবু খানিকটা সতর্ক-ভাবে পা বাড়াবার মতন ক'রে লক্ষ্মীমণি বলল, 'আমাদের কর্তা আর আপনার কর্তা বয়সে খুব বেশি বেশকম হবে না। তখন আমার বড় মেয়ের কামিজটায় সাবান মাখতে পাতকুয়ায় যেতে যেতে দেখলাম। একটা আধটা চুল পেকেছে কানের ধারে। কেমন দিদি, আপনার ও'র বয়েস প'য়ত্রিশের ওপারে গেছে খুব ভুল আন্দাজ করলাম কি।'

শিবনাথের বয়েস যথার্থ আন্দাজ করতে কৃতকার্য হয়েছেন আশ্বাস দিয়ে যেন একটু করুণা ক'রেই রুচি মহিলাকে প্রশ্ন করল, 'কোন হসপিটালে যাচ্ছেন। ধারেকাছে রাত-বেরাতে বেড খালি পাওয়ার সুবিধা আছে তো।'

'তা দিদি থাকেই।' এবার গালভরা হাসি হেসে লক্ষ্মীমণি আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতন হঠাৎ মুহুর্মুহু দু-তিন-বার রুচির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল। পরে যেন কিছুটা হতাশ হয়ে বলল, 'না থাকলেও ওরা ক'রে দেয়। কংগ্রেসের আমলে আমার তো মনে হয় দিদি অই একটা বিষয়ে সুবিধা হয়েছে। ফেরায় না কাউকে। খাট খালি না থাক মেজেতে শুতে দেবে। দেশি লোক এখন সব হাসপাতালে হাসপাতালে কাজ করে, নার্স চৌদ্দ আনা বাঙ্গালী মেয়ে। মার ব্যথা বোনের ব্যথা ওরা বোঝে। মাছ দেয় না এখন আর, তবু পেট ভরে তিনদিন বিউলি ডাল পুঁই শাক খাওয়ায়। গরীব দেশ, পারবে কোথায় মাছ-মাংস খাওয়াতে। শুনি তো বলাবলি করে সব। আর তিন দিনেই খালাস দেয়। তা দিদি, আমার তো মনে হয় ভাল করে ওটা। সাতদিন ধরে রাখলে আমাদের মত লোকের সংসারের এদিকের কি হ'ত। আমার রাণী যখন হয়, কণি সাত বছরের। ও পারে নিচের ছোট-ছোট পাঁচটা ভাই-বোনকে সামলাতে? তবু তো কর্তা সাতদিন ইস্কুলে ছুটি নিলেন। নিজের হাতে রাঁধল বাড়ল, অজয়কে শশাঙ্ককে হিরণকে নীলিমাকে রোজ দুপুর বেলা নাওয়াল খাওয়াল, নিজে ঘুমিয়ে ওদের ঘুম পাড়াল। রাত্রে পারেনি, রাতে টাইশনি ছিল। তখন কণি একলা হাতে সব করেছে, গুছিয়েছে। এদিক থেকে আমি সুখী দিদি। বরং কর্তা যদি আর ক'টা দিন বেশি ছুটি পেতেন, দিন পনেরো হাসপাতালে পড়ে থাকতেও আমার খারাপ লাগত না। আ, চারদিকে খালি ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ সে এক মজা দিদি সেই এক দৃশ্য! আর নার্সদের ধমক। 'চুপ করান শিশুকে, বাচ্চা সামলান। শিশু পেটে নেই আপনার এখন মনে রাখবেন। হাত পা অসাবধানে নাড়াচাড়া করলে হুঁশ না রেখে ঘুমোলে শিশুর কি অবস্থা হয়, কাল সকালে উঠে দেখবেন। চ্যাপ্টা হয়ে দলা পাকিয়ে একেবারে আমসি।' বলে হঠাৎ খিল্ খিল্ হাসতে হাসতে প্রায় রুচির গায়ের ওপর ঢলে পড়ে লক্ষ্মীমণি। কিন্তু রুচি তা হতে দিলে না। খাট ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার কারণও ছিল। ঘরে আর দুটি মেয়ে এসে ঢুকেছে। কমলা আর প্রীতির ছোট বোন বীথি। দুজনকে দেখে লক্ষ্মীমণিরও হাসি এবং কথা হঠাৎ একসঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল।

'আমরা শুনেছি। আর চুপ থাকছেন কেন।' যেন চোখ বড় ক'রে কমলা নার্স বিধু মাস্টারের স্ত্রীকে শাসালো।
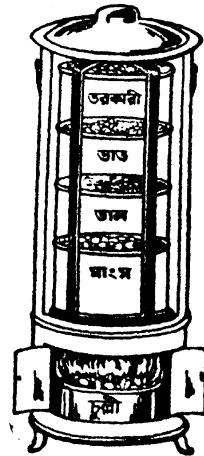
'কেবল হাসপাতাল আর হাসপাতালের গল্প। ছেলে হওয়া আর বাচ্চা হওয়ার ঘ্যানঘ্যানানি।' বাপ্‌রে বাপ, বৌদির হাসপাতালে গিয়ে গিয়ে আর সাধ মেটে না!'

বীথি ঠিক শাসালো না। খোঁচা দিলে। মেয়েটিকে দেখে রুচির মনে হ'ল উনিশ-কুড়ি হবে বয়েস। পরনের কাপড়টা একটু ময়লা। কিন্তু তা হলেও বেশ টেনেটুনে ঘুরিয়ে পরা। সবুজ আঁচলটা পিঠ থেকে আল্‌গা হয়ে কাঁচা কচি ধানের ছড়ার মতন ঝুলছে। যেন আঁচল ঝুলিয়ে কথা কওয়াতেই ওর আনন্দ। তাই কথার সঙ্গে কোমরটা ঈষৎ আন্দোলিত করছিল মেয়েটি। খুব মৃদুভাবে প্রায় দেখা যায় না মতন করে। রুচি দেখল বিধু মাস্টারের স্ত্রী দেখল না। কেন না বীথির কথার খোঁচায় লক্ষ্মীমণি সেই যে মাটির দিকে চোখ নামাল আর চোখ তুলতে পারলে না। 'আপনাদের মতন মূর্খ মায়েরা এখনো অনেক, অনেক আছেন বলে এজাতটা আজ ভাল হাতে ডুবছে। হাজার বছর। ভারত স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন দেশ। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলে কি হবে। কুড়িতে পা দিতে না দিতে ছটির মা হাওয়া, ছিঃ।

বলতে বলতে বীথি নিজেই লক্ষ্মীমণির কাছ থেকে তিন হাত দূরে, অর্থাৎ টিনের বেড়াটা ঘেঁষে দাঁড়ালো, রুচির একটা ক্যালেণ্ডারের সঙ্গে গাল ঠেকিয়ে।

'বীথির বাড়াবাড়ি এটা। বেশি পাকামি।' কমলা একটু ধমকের সুরে বলল, 'শত হলেও তিনি তোর মার বয়েসী। তোর মা আর লক্ষ্মীদি সমান হবে।' কথাটা বলে ফেলেই অবশ্য কমলা ঠোঁট টিপে হাসে আর আড়চোখে লক্ষ্মীমণিকে একবার দেখে রুচির দিকে তাকায়। কিন্তু রুচি গম্ভীর। রুচি লক্ষ্য করল লক্ষ্মীমণির মুখ পাংশু হয়ে গেছে। মহিলার জন্য রুচির কেমন কষ্ট হ'ল। একটু পর তিনি আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'আহা, সেজন্যে কি আর মাকে আমরা কম কথা শোনাই।' ভুরু উঁচিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে বীথি তখন কমলাকে বলছে, 'দিদি আর আমি রাতদিন বলছি কী দরকার ছিল আমাদের এতগুলো ভাইবোন দিয়ে, কী লাভ হ'ল আড়াই গণ্ডা ছেলে-মেয়ে সংসারে এনে। গায়ের কাপড় নেই, পেট ভরে খেতে পারছে না। এসব মূর্খতা ছাড়া আর কিছু না।'

এবার কমলাও গম্ভীর।

একটু চুপ থেকে বীথি বলল, 'যাকগে আমার কাজের কি করলে কমলাদি বলো, সেজন্যেই তোমাকে ডেকে নিয়ে এলাম। মার সঙ্গে আজ সকালেও খুব ঝগড়া করলাম।'

'কেন?' কমলা বীথির চোখে চোখ রাখল।

'দিদি যে-টাকা ঘরে আনে তাতে তেরো দিনের বেশি চলে না। তারপর থেকে সারা গোষ্ঠির উপোস চলে। মা বলছিল আমাকে একটা কাজে ঢুকে পড়তে। বললাম ট্রেনিংয়ে আছি, আর মাস চার বাকি আছে। ট্রেনিংটা পাশ করতে পারলে একটা ইস্কুলে টিস্কুলে ঢুকতে পারব। কিন্তু ঐ যে বলে রাঁধতে সয় বাড়তে সয় না। আমাদের অবস্থা তা-ই। চার মাস অপেক্ষা করার উপায় নেই। মার ইচ্ছা আজই আমি কোনো আফিসেটাফিসে ঢুকে পড়ি।'

'কেন, প্রীতি পারলে না তোকে ওর আফিসে ঢোকাতে। অনেকদিন তো ও টেলিফোনে আছে।'

'টেলিফোনে শিগ্গির ছাঁটাই আরম্ভ হবে শোননি বুঝি? এখন আর নতুন লোক নিচ্ছে না। তা ছাড়া—' বীথি হঠাৎ থামল।

'কি, বল্।'

'আমি ম্যাট্রিক পাশ নই তুমি জানো, সেজন্যই আরো বেশি অসুবিধা হচ্ছে। আফিসে ঢুকতে কি আর আমি চেষ্টা কম করছি। মা সেসব জানে না, বাড়িতে ব'সে থেকে দেখে না। ভাবলাম, এমনি যখন সময় যাচ্ছে, তার চেয়ে বিনি পয়সায় গুরু-ট্রেনিংটা নিয়ে রাখি। টাইপরাইটিং শিখতে পারতাম, কিন্তু তা শিখতে পয়সা লাগে।'

'তাতে আর পয়সা লাগে' কথাটা প্রায় বলতে বলতে কমলা থেমে গেল। ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'দেখি, আমি তো তোর জন্যে চেষ্টা করছি, সুবিধা হচ্ছে কোথায়।' যেন হঠাৎ প্রসঙ্গটা চাপা দিতে কমলা রুচির দিকে তাকিয়ে অল্প হাসল, 'আপনার আজ ছুটি?'

রুচি মাথা নাড়ল।

'খাওয়া-দাওয়া শেষ?'

রুচি মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে বলল 'বসুন।'

কিন্তু কমলা বসল না। ঘুরে ঘুরে ঘরের জিনিসপত্র দেখতে লাগল। 'ও আপনিও এই সাবান গায়ে মাখেন।' ঘরে শেল্ফ নেই। একটা কাঠের বাক্সের ওপর পুরোনো খবর কাগজ বিছিয়ে রুচি তেলটা সাবানের কেসটা কোনোরকমে রাখতে পেরেছে। কমলা সেই বাক্সটার সামনে দাঁড়িয়ে। বীথিও সরে গিয়ে সেখানে দাঁড়ায়।

'কি সাবান?' বীথি কেসটার দিকে হাত বাড়ায়। কমলা বলল, 'অনেক দাম একটা কেকের। তোমাদের এই খালপাড়ের দোকানে এসব পাবে না।' এমন সুর করে কথাটা বলল, কমলা এবং ভুরু ও চোখের এমন ক্ষুরধার ভঙ্গি করল যে, এই সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন করতেই যেন বীথি সাহস পেলে না। কমলা রুচির দিকে চোখ ফেরালো। 'যাকগে আপনার সঙ্গে আমার অন্তত একটা দিকে রুচির মিল আছে। সত্যি, আছি বটে এ-বাড়িতে কিন্তু, ঐ এক প্রীতি ছাড়া কারো সঙ্গে মিশব, দুদণ্ড বসে কথা বলব এমন মানুষ পাই না। লো টেস্ট, বুঝলেন ভয়ানক লো টেস্ট এখানকার মানুষের। ইচ্ছেই করে না কারো সঙ্গে কথা বলি।'

রুচি অবশ্য তখনো সাবানটার কথা ভাবছিল। এটা ওরা এখানে এসে কেনেনি। কবে মোক্তারামবাবু স্ট্রীটে থাকতে এক বাক্স পীয়ার্স সোপ কিনে এনেছিল শিবনাথ। তখন ওর চাকরি ছিল। দুটো অনেক দিন আগে শেষ হয়ে গেছে। কৃপণের ধনের মত রুচি একটা কেক ট্রাঙ্কের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর একদিন ভুলে গেছে। ওর মনেই ছিল না। সব ভাল ভাল জিনিস বিক্রী করে হাত ছাড়া ক'রে খুইয়ে ফেললেও এমন একটা সম্পত্তি তার ঘরে এখনো আছে যে এই বাড়ির লোকেরা দেখলে অবাক হয়ে যাবে। বাক্স-পেটারা নাড়াচাড়া করতে গিয়ে পরশুদিন এটা বেরিয়ে পড়েছে। দেখে রুচি যত খুশি হয়নি, শিবনাথ হয়েছে তার চতুর্গুণ। তৎক্ষণাৎ ওটা, যেন সন্দেশ পেয়েছে, রুচির হাত থেকে কেড়ে নিয়ে শিবনাথ নিজের কেসে পুরেছে। সাবান দেখে কমলার হঠাৎ খুশি হওয়ায় রুচির এখন সেই কথা মনে পড়ল।

'ঐ যে বলে পাঁকে থাকি তবু পাখায় তা আটকাতে দিই না, সেই হাঁসের মতন কোনোরকমে এই বস্তিতে বেঁচে আছি আর কি।' কথার শেষে কমলা খিলখিল হাসল। রুচি চুপ। অবাক হ'ল সে ভেবে তবু কেন কমলা দিনের পর দিন এখানে আছে, কী উদ্দেশ্য,—আর কোথাও ভাল-ভাবে বাস করার সংস্থান ওর আছে যখন। কিন্তু কমলা যেমন তার কারণ বলে না, বলবে না কাউকে, রুচিও সে-প্রশ্ন করা থেকে নিবৃত্ত রইল।

'ঘরে ডিসইনফ্যাকটান্স মানে, ফিনাইল লাইজল কিছু রেখেছেন তো? ফ্লিট আছে।'

'হ্যাঁ।' রুচি সংক্ষেপে উত্তর করল।

'উঃ, মাছি, কী ভীষণ মাছি এখানে

আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। একটু গরম পড়লে দেখবেন। আলপিনটি রাখবার জায়গা থাকে না কোথাও, মেজে বারান্দা যেন মাছি দিয়ে বুনে রাখা হয়েছে এমন। তেমনি মশা। রাত বলে রাত দিনের বেলাই কামড়ে গায়ের চামড়া ঝাঁজরা ক'রে দেয়। বাপ্! সেইজন্যে আমি, যেদিন হাসপাতালে ডিউটি নাও থাকে, ঘরে থাকি না, বেরিয়ে যাই, তাই বলে বেলেঘাটা চিংড়িঘাটায় কি আর থাকি। কোলকাতায় চলে যাই। ফুটপাথে ঘুরি। শহরের ফুটপাথেরও একটা চার্ম আছে, কি বলেন?' কমলা আবার খিলখিল হাসলে।

রুচি হ্যাঁ, না কিছু বলল না। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ইনি। যেন টের পেয়ে কমলা একটু দমে গেল।

'কেবল মশা মাছি! গরমের দিনে টিন তেতে কী অবস্থা হয় বৌদিকে একবার ব'লে দাও।' বীথিও হাসে।

'হ্যাঁ, টিকটিকি আরশোলাগুলো পর্যন্ত টিকতে পারে না। কিছু পালিয়ে যায়, বাকিগুলো গরমে ভাজা হয়ে ঝুরঝুর ক'রে ঝরে পড়ে মাথায় ঘাড়ে।'

রুচি এবার বিশীর্ণ একটু হাসল।

আবহাওয়া তরল হয়ে এসেছে টের পেয়ে বীথি হুট ক'রে কথাটা তুলল। এখানে হালে মেয়েদের একটা সমিতি করা হয়েছে। 'দীপালি সংঘ' এর নাম। বীথি সম্পাদিকা। আগে তার বড় বোন প্রীতি ছিল। কিন্তু টেলিফোনের চাকরিতে ঢুকে ও আর সময় পাচ্ছে না ব'লে বীথি ওটা এখন দেখাশোনা করছে। বড় মেয়ে এতে খুব বেশি নেই। ছোট মেয়েদের নিয়েই মুখ্যত এই সমিতি। নাচ গান সূঁচের কাজ রান্না রুগীর সেবা ইত্যাদি সবকিছুই একটু একটু শেখানো হয়। কিছু বই রাখা হয়েছে। একখানা মাসিক পত্রিকা, একটা সাপ্তাহিক এবং একখানা বাংলা দৈনিক কাগজ রাখা হচ্ছে। প্রেসিডেণ্ট পারিজাতবাবুর স্ত্রী শ্রীমতী দীপ্তি রায়। কমলা বলল, 'আমার মনে হয় এ-ধরনের সমিতি সংঘ হওয়া খারাপ না। বড়দের মন বিষিয়ে গেছে। কিন্তু যারা কাঁচা, যাদের মন এখনো বরফের মত শাদা, ছাপ পড়েনি কিছুর, হোক না ধনী হোক গরীব, একসঙ্গে এক জায়গায় এসে মিশতে পারলে পরস্পরের ব্যবধানটা অনায়াসে ভুলে যায়। বীথির বোন কুঙ্কুমের গায়ে সুতীর জামা আর পাড়ার নিবারণ ঘোষের মেয়ে চম্পার গায়ে সিল্ক এটা তখনকার মত, যতক্ষণ সমিতির উঠোনে ছুটোছুটি ক'রে ওরা কানামাছি খেলে মনে রাখে না। পারিজাত একটু দাম্ভিক, কিন্তু দীপ্তি চমৎকার লোক। মিশুক, অমায়িক, অহঙ্কার নেই, এই ধরনের একটা সমিতি এপাড়ায় গড়ে উঠছে শুনে নিজে থেকে ভাল টাকা চাঁদা দিয়েছে। এই বছরের জন্যে দীপ্তিকে প্রেসিডেণ্ট করা হয়েছে।'

'আমাকে কি করতে হবে?' কমলার দিকে মুখ ফিরিয়ে রুচি প্রশ্ন করল।

মানে কোন বাধ্যবাধকতা, জোর জুলুম নেই,—যার যেমন খুশি, যার যতটুকুন সামর্থ্য, সাহায্য করেন আমরা সন্তুষ্ট হই।' বলা শেষ করে বীথি পিঠের আঁচলটা আন্দোলিত ক'রে হাত দিয়ে কপালের চুল পিছনে ঠেলে দিলে।

'আট আনা এক টাকা যা খুশি আপনি দিতে পারেন, বিশ পঞ্চাশ দিলেও যে ওরা খুব পেয়ে গেছে বলে লাফাবে তা নয়.' কমলা রুচিকে বোঝাল, 'কেননা, টাকাটা তত না, যতটা আপনার সদিচ্ছা সহানুভূতির ভিকিরি ওরা।'

'অবশ্য এখুনি আপনাকে যে দিতে হবে তা নয়—সবে তো কাল এলেন। জানিয়ে রাখলাম। কমলাদি'কে ধরে নিয়ে এসে আপনার সঙ্গে পরিচয় করলাম।'

বীথির চোখে চোখ রেখে রুচি বলল, 'বেশ, আমি সাধ্যমত সাহ… করব। আমার পুরো সহানুভূতি আ… আপনাদের সমিতির প্রতি।'

কমলার হাত ধ'রে বীথি বেরি… গেল। রুচি হাল্কা নিঃশ্বাস ফেলল… না, এখানকার সবটাই মাছি মশা নো… বছর বছর সন্তানের জন্ম দেওয়া, দারি… কলহ, নিন্দা, পরশ্রীকাতরতায় ভরা নয়… আলো আছে, আলোর একটা শিখা যে… কতক্ষণের জন্যে চোখের সামনে জ্ব… ধরে গেল……নম্বর ঘরের মেয়েটি… বীথির গায়ের ময়লা রং বেশভূষা… মলিনতা সত্ত্বেও ওর চোখের উজ্জ্ব… দীপ্তি ভ্রূরেখার উদ্ধত গরিমা কে… কিছুক্ষণের জন্যে রুচির চোখের সাম… ভাসতে লাগল। শিক্ষা, সুযোগ যত্ন… স্নেহ পেলে আরো ভাল হ'ত, একটা… কিছু করতে পারত ওই মেয়ে, মনে মনে… বলল রুচি।

কিন্তু একটু পর তার এই কিন্তু… ভাব কেটে গেল। শুনল কোন্ ঘ… কে চীৎকার করছে। আর একজন… কাঁদছে যেন। রুচি কান খাড়া করল…

'মুখপুড়ি! মার বয়সী তো… অসম্মান করতে পারিস তুই, আ… স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। এই কি… তোর সমিতির শিক্ষা। না না এসব… হবে না, সেজন্যেই বলছি একটা কিছুতে… তুমি ঢুকে পড়ো, গরীব মানুষ আমি… ঘরে পয়সা আসা নিয়ে কথা। তোমার… ভাই বোন উপোস আধপেটা হয়ে দি… কাটায় আর ওদিকে পারিজাতের স্ত্রী… সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কেবলই সমিতি করবে… নাচ-গান নিয়ে মেতে থাকবে আমি হতে… দেব না। ছি ছি, এত ভাল মানুষ… লক্ষ্মীদি, তাকে তুই এসব কি বলেছিস… এ্যাঁ!'

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল একজন।

রুচি অনেকক্ষণ কান পেতে থেকেও বুঝল না এই কান্না লক্ষ্মীমণির না বীথির। বাইরে একটা কাক ডাকছিল। কাদের ঘরে এখনো উনুন জ্বলছে। নতুন ক'রে কয়লা দিয়েছে যেন আবার। রাশি রাশি ধোঁয়া ঢুকছে জানলা দিয়ে। রুচি জানালা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

(ক্রমশ)

মাধবীমণ্ডপের সুস্নিগ্ধ ছায়াও ভাল লাগেনি একদিন স্বর্গকন্যা নাগদত্তার; ক্লান্তিহর গন্ধদূর্বার শীতল-কোমল শয্যাও আকর্ষণ করেনি তাকে। বকুল আর বনমল্লিকার মৃদু মধুর সৌরভে ভরা ছিল তার কানন, কিন্তু কি আশ্চর্য, কুসুম-দ্রব সে বাতাসও ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে বার বার। কে জানে, কোন্ অজ্ঞাত বেদনায় নাগদত্তার নয়ন আজ অশ্রুসিক্ত, কিসের ব্যর্থতা হাহাকার হাওয়ার মতন বুকভরে ছড়িয়ে পড়েছে! আর বল, এ কোন্ অসহ রিক্ততা পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামা মেঘের মতন আজ তার মনের আকাশ ছেয়ে ব্যাপ্ত, বিক্ষিপ্ত!

প্রিয়পথ-প্রতীক্ষিতা অভিমানিনীর বিরহ ক্লেশ কি এতই তীব্র? অথবা এ ছলনা? শোক আর বৈরাগ্যের একটি নিপুণ মূর্তি রচনা করেছে চতুরা সুকৌশলে। নিষ্ঠুরের মত বঞ্চিত করেছে ধবলগ্রীবার বিমোহন শোভা, খুলে ফেলেছে মণিময় কণ্ঠভূষণ। মৃণালকোমল সুডৌল ভুজলতা কেয়ূর কঙ্কণ বর্জিত। কর্ণমূলে কুন্দকলি-হীন; ধূলায় লুটিয়েছে বকুলদামকাঞ্চী। বেণীবন্ধন শিথিল; সন্ধ্যাকাশের নিঃসঙ্গ তারার মত একটি শুধু চন্দনের তিলক ললাটে। অঙ্গে তার শ্বেতবাস, কনকবরণ কঞ্চুলিকা। আবরণ আর আভরণের এত দৈন্যতাও যেন সম্পূর্ণ রিক্ততা আর নিঃসঙ্গতাকে প্রকাশ করতে পারছে না, একটা অভাব থেকে গেছে কোথাও, আর তাই মঞ্জির-মন্দিরাখানি তুলে নিয়েছে নাগদত্তা; বিষণ্ণ একটি সুর ছড়িয়ে দিয়েছে বাতাসে।

সখী সন্দর্শনে আসার পথে সেই সুর শুনেছে সৌরভেরী। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে ক্ষণকালের জন্যে। তারপর আপন মনে নিঃশব্দে হেসেছে; ভেবেছে, বিরহ-বেদনায় বড়ই অধীর হয়েছে সখী নাগদত্তা।

পরিহাস আর মিষ্টবাক্যের পশরা ওষ্ঠে বয়ে সৌরভেরী এসেছে মাধবী-মণ্ডপে। কাছে এসে স্তব্ধ হয়ে গেছে তার চটুল ওষ্ঠ।

মঞ্জির-মন্দিরাও থেমে গেছে। অর্ধ-শূন্য সজল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থেকেছে নাগদত্তা সৌরভেরীর মুখপানে।

গভীর সহানুভূতিতে সখীর কোমল ভুজলতা দুটি আকর্ষণ করে বলেছে সৌরভেরী, 'এত অধীর কেন সখী? তোমার বল্লভ সুশীল এবং সুজন। তিনি

ছলনাপটু নন। যথাসময়ে আসবেন। মনক্লেশ দূর কর।'

তিনি আসবেন! হয়ত আসবেন। তবু একটি দীর্ঘশ্বাস গোপন করা যায় না। বেদনাবিহ্বল কণ্ঠে নাগদত্তা বলে, 'সখী সৌরভি, প্রিয়পথ প্রতীক্ষায় আমি কাতর হইনি। এক অজ্ঞাত আশংকা আমায় বিচলিত করেছে। ওই দেখো সখী, আমার কাননের রক্তাশোক বৃক্ষ তার সমস্ত রক্তিমা হারিয়েছে, নাগকেশরের কুঞ্জ আজ শূন্য, বকুল বনমল্লিকার সুরভিত স্পর্শও আমায় বঞ্চনা করছে।'

সৌরভেরী সচকিত দৃষ্টি মেলে ইতস্তত নিরীক্ষণ করে। লঘু সুরে বলে, 'বিরহের অঞ্জন তোমার নয়নে কালিমা মাখিয়েছে সখী। পুষ্পিত কাননের রূপ বর্ণ গন্ধ সব ত' তেমনই আছে।'

আছে? নাগদত্তা চমকে ওঠে, একটি শিহরণ বয়ে যায় সর্বাঙ্গে। কেঁপে ওঠে সেই কৃশ-করুণ অঙ্গ। দুটি চোখে আরও ঘন হয়ে ওঠে উদ্বেগ, আশংকা। ভীত কণ্ঠে বলে, 'পরিহাস করো না, সখী।'

—পরিহাস নয়।

—তবে ছলনা।

—না, ছলনা নয়।

—অসম্ভব কথা কেন বল, সৌরভি। অশ্রুসলিল আমায় অন্ধ করেনি। আমার কাননের অশোক কিংশুক সত্যই বর্ণহীন, বকুল চম্পক সুরভি বঞ্চিত।

—দেবকন্যা, এ তোমার ভ্রম। তুমি বিস্মৃত হচ্ছ দেবলোক জরা এবং ক্ষয়হীন। স্বর্গকাননের তরু, পুষ্প, পল্লব কখনো জরা দ্বারা পীড়িত হয় না, ক্ষয় তাদের অধিকার করতে পারে না। কি কারণে তারা তাদের বর্ণ এবং সুরভি হারাবে? অসম্ভব কি সম্ভব হয়, সখী!

না হলেই তৃপ্ত হতে পারত নাগদত্তা, এই মুহূর্তেই। কিন্তু অসম্ভবই যে সম্ভব হতে বসেছে, তাই ত' এ উদ্বেগ। সৌরভেরীর কথায় সে উদ্বেগ আরও তীব্র হল। এবং আরও একটি অনতিক্রমনীয় বিস্ময় তাকে হতবাক্ করলে। না কি, এ সত্যই ভ্রম! অন্ধই হয়েছে নাগদত্তা, পুষ্পিত কাননের রূপ-বর্ণ আজ আর আলোকে আলোময় হয়ে চোখের ওপর ভেসে উঠছে না, শুধু একটা ছায়া হয়ে আড়ালে সরে রয়েছে। কিন্তু গন্ধ? কোথায় সেই চেতনামাদির সুরভি-সুবাস? কেমন করে তা হারিয়ে গেল একটি রাত্রে?

কৃশ শশাংক বুঝি আরো কৃশতর হল। মলিনতর হল কৌমুদী। আশংকাবিহ্বল কণ্ঠে নাগদত্তা বলে, 'বুঝি অসম্ভবই সম্ভব হতে চলেছে, সৌরভি। ভয়ংকর এক দুঃস্বপ্নও দেখেছি বিগতরাত্রে।'

দুঃস্বপ্নই দেখেছে নাগদত্তা। সত্যই দুঃস্বপ্ন। নিশিশেষে শিয়রের প্রদীপ নিভেছে। হয়ত হাওয়ায়। শূন্য তার কক্ষ। গন্ধপাত্রের ধূমশিখাগুলিও যেন কখন বিলীন হয়েছে অন্ধকারে, অন্তর্ধান করেছে ব্যজনরতা সহচরী। গবাক্ষপথে দুটি সতর্ক ছায়া নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে। সেই যুগলমূর্তি যেন কৃষ্ণাজিন আর ভস্মে আচ্ছাদিত করেছে তাদের সমগ্র অস্তিত্ব। সে দুটি দেহে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষীণতম স্পন্দনও নেই। শুধু লুব্ধ যুগল দৃষ্টি আলিঙ্গন করছে নাগদত্তাকে।

চমকে উঠে চোখ মেলেছে নাগদত্তা। নিবিড় নিকষ কালো কক্ষকে আরও ভয়াবহ শূন্যতায় নিক্ষেপ করে যুগলমূর্তি অপসৃত হয়েছে। অসহায়, নিস্পন্দ একটি কামিনী বিস্ফারিত দুটি চোখ মেলে শুধু সত্য অসত্যের নিরসন দ্বন্দ্বে কালক্ষয় করেছে।

স্বপ্নবিবরণ বিভ্রান্ত করে সৌর-ভেরীকেও। এখন মনে হয়, হয়ত এ ভ্রম নয়; সখী নাগদত্তা যথার্থই কোন একটি অশুভকে প্রত্যক্ষ করছেন। কিন্তু কেন? সৌরভেরী বার বার পুষ্পিত তরুশাখার বর্ণসমারোহ নিরীক্ষণ করে আর ফিরে ফিরে দেখে নাগদত্তার পাণ্ডুর আনন। যেন একটি অজ্ঞেয় রহস্যের অর্থ উদ্ধার করতে চায় ও।

অদূরে অকস্মাৎ মৃদু পত্রমর্মরের ধ্বনি ওঠে। চকিত দৃষ্টিপাতে আগন্তুককে প্রত্যক্ষ করে সৌরভেরী আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়।

—সখী, তোমার চিন্তা আমায় ব্যাকুল করছে। জানি না, কোন অশুভ গ্রহ তোমায় স্পর্শ করেছে। গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র-সেন আসছেন, তাঁর কাছে সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।

কথা শেষে সৌরভেরী পত্রান্তরালে অদৃশ্য হয়ে যায়—চিত্রসেন মন্থরগতিতে মাধবীমণ্ডপের সামনে এসে দাঁড়ান। ওষ্ঠের সুস্মিত হাসিটুকু তাঁর মুছে যায়; বিস্মিত হন চিত্রসেন। শোকাচ্ছন্না প্রিয়ার রিক্ততা তাঁকে বিচলিত করে। ব্যথাহত দৃষ্টিতে অপলক নয়নে দীর্ঘক্ষণ তিনি নিরীক্ষণ করেন নাগদত্তাকে। এ নারী যেন তাঁর পরিচিত নয়। এতই পার্থক্য! একটি রাত্রির ব্যবধানে সেই সমুজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি পেলব দেহলতা যেন কোন অভিশাপে দগ্ধতরুর মত হতশ্রী হয়ে গেছে।

নাগদত্তার করুণ, আশংকাবিহ্বল, অশ্রুসিক্ত মুখখানি কতক্ষণ নীরবে অব-লোকন করেন চিত্রসেন; বলেন, 'সুতনুকে তোমার এ রূপ কেন? প্রভাতের হিমাচ্ছন্ন নদীতীরের মত তুমি সজলকৃশ, নিরাভরণ এ কি কপট অভিমান?'

নাগদত্তা। না দেব। সৌভাগ্য আমার বুঝি কোন অজ্ঞাত অশুভের প্রতি আকর্ষণ করছে। সুরলোকের সকল সুখ থেকে আমি বঞ্চিত।

চিত্রসেন অনুরাগবশে নাগদত্তাকে বাহুলতায় বক্ষে আকর্ষণ করেন। মৃদু মন্দপবনের মতন তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'অভিমানিনী, স্মরণ করে দেখ, শত বসন্তের ব্যাকুলতায় তোমায় এ হৃদয় তোমার প্রেমে ধন্য হয়ে এসেছে। সুরলোকের সকল সুখের শ্রেষ্ঠ সুখ তো তোমার কৃপা ভিক্ষা করছে। এখন কোথায়?'

নাগদত্তা। আমার বাক্যে সন্দেহ করবেন না, প্রভু!

চিত্রসেন। আমার অনুরাগের প্রতি তুমিই বা সন্দিগ্ধ কেন?

নাগদত্তা। মার্জনা করবেন, ধীমান। আপনার অনুরাগ অকৃত্রিম, চন্দ্রকিরণের মত তা স্নিগ্ধ, নির্মল; সে অনুরাগের স্পর্শে মুহূর্তে যুগান্তের বিরহের অবসান হয়। কিন্তু প্রভু, প্রকৃতই আমি সুর-লোকের সর্বসুখ থেকে বঞ্চিত।

প্রিয় করস্পর্শ থেকে মুক্ত করে নিতে চায় নিজেকে নাগদত্তা। তার ঈষৎ কম্পিত ওষ্ঠাধর দুটি ক্ষণেক নিস্তব্ধ হয়ে থাকে। দৃষ্টির শূন্যতা নীড়হারা পাখির মত আকাশপথে ভেসে বেড়ায়।

নাগদত্তা। মৃত্যুর দুশ্চিন্তা আমায় তিলে তিলে দগ্ধ করছে।

চিত্রসেনের আলিঙ্গনের মধ্যে একটি নিঃস্বতা হাহাকার করে ওঠে। রোদনাচ্ছাস দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়।

চিত্রসেন স্তব্ধ। অমর্ত্যবাসী অপ্সরা দেবলোকে মৃত্যু এবং ভয়কে অনুভব করেছে। পরিণাম—? পরিণাম বড় ভয়ংকর। নাগদত্তা তা হয়ত জানে না। জানবে।

রাত গভীর হয়ে আসে। চিত্রসেন বিদায় নেবার জন্যে প্রস্তুত হন।

চিত্রসেন। সখী, আমায় বিদায় দাও।

নাগদত্তা। আমায় নিঃসঙ্গ রেখে যাবেন, সখা?

চিত্রসেন। তোমায়ও বিদায় নিতে হবে, নাগদত্তা। তোমার যাত্রাও নিঃসঙ্গ, একাকী।

নাগদত্তা প্রশ্নার্ত চোখ মেলে তাকায়। চিত্রসেন বেদনাসিক্ত কণ্ঠে বলেন, 'জানি না, কোন্ দুষ্কার্যবশে, কোন্ অভিশাপে তোমার এ দণ্ড!'

নাগদত্তা। দণ্ড?

চিত্রসেন। অমোঘ দণ্ডই নেমে এসেছে, সখী। দেবলোকে আর তোমার স্থান নেই। এই অমরা রাজ্য থেকে চিরকালের মত নির্বাসিত হলে তুমি।

নাগদত্তা। নির্বাসন—?

চিত্রসেন। অমর্ত্য রাজ্যে মৃত্যুর স্থান নেই এবং ভয়ের। এরা মর্ত্যলোকে নিজ অধিকার বিস্তার করেছে। মর্ত্যলোকে মৃত্যু গর্ভজাত সন্তানদ্বয়কে তুমি দেখবে হতভাগিনী, তারা নরক এবং যাতনা নামে সুবিদিত।

চিত্রসেন অদম্য একটি দীর্ঘনিশ্বাস বহুকষ্টে গোপন করে উঠে দাঁড়ান।

নাগদত্তা পাষাণের মত স্থির, নিস্পন্দ। দেবলোকের অবশিষ্ট একটি আশীর্বাদ থেকেও যে সে বঞ্চিত হতে চলেছে, এ বোধটুকুও তার চেতনা থেকে নিশ্চিহ্ন।

* * *

নিশিশেষে একটি ম্লান নক্ষত্রের আলোয় নাগদত্তা যেন তার শেষ অশ্রু-বিন্দুটুকু চিনতে পেরে চমকে ওঠে। এমনি একটি অশ্রুবিন্দু এখনও বুঝি আর্দ্রতায় কোমল হয়ে মর্ত্যের সেই ছিন্ন মালিকাটির একটি কুসুমকে সজীব করে রেখেছে।

ধীরে ধীরে সকল রহস্য তার অর্থ নিয়ে ফুটে ওঠে নাগদত্তার মানসপটে। মনে পড়ে যায়, মহারাজ কুশনাভকে। মনে পড়ে মর্তলোকের একটি প্রাণীর প্রেম আর ব্যাকুলতা।

দেবলোকবাসিনী অপ্সরী নাগদত্তা

দেবকার্যে নিয়োজিত হয়ে মর্ত্যলোকের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল একদা। প্রত্যাবর্তন-পথে আসন্ন বর্ষণস্তব্ধ বনানীর তমাল বনানীর সমারোহ দেখে ক্ষণিক বুঝি থেমেছিল। কেকাস্বরে তখন বনভূমি মুখর, নব কদম্বের হিল্লোল, সবুজের স্নিগ্ধাঞ্জন মেখে তরুলতা সবুজ-সজল। হঠাৎ বুঝি চোখে পড়ল আর একটি নব-জলদ। উচ্ছলস্রোতা তটিনীর শিলাসনে সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে মিশে আছে। শুধু মৃদঙ্গ ধ্বনির মতন একটি সুর ধ্বনিত হচ্ছে বাতাসে। কৌতূহলবশে সতর্ক চরণে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নাগদত্তা। পুষ্পস্তবকের অর্ঘ সাজিয়ে সেই নবজলদ শ্যামরূপ কাকে যেন বন্দনা করছে—তার কণ্ঠের সুগম্ভীর শব্দ নদী-স্রোতের কল্লোলের সঙ্গে ছন্দে সুরে একাকার।

ধরা পড়ে গিয়েছে নাগদত্তা আকস্মিক-ভাবেই। মর্ত্যলোকের বন্দনা-নম্র কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেছে, পুষ্পার্ঘ স্খলিত হয়ে নদীপ্রবাহে ভেসে গেছে।

—বনচারিণী, আপনি কে?

পরিচয় দেয়নি নাগদত্তা। কেমন এক অজ্ঞাত কৌতূহলবশে ছলনা করেছে মর্ত্যবাসীকে।

—আর্য, আপনি কার বন্দনা করছিলেন?

—প্রকৃতির।

—প্রকৃতির—?

—হ্যাঁ, শোভনাঙ্গী, প্রকৃতির। ওই তিমিরাবৃত মেঘ এবং আকাশ, এই শ্যাম মেখলা আবরিত তরুলতার। পশু, পাখী, পত্র, পল্লব, স্থল, জল—আমি মর্ত্যলোকের বন্দনা করছিলাম।

—আর্য, বিষাদবিষন্ন এ প্রকৃতির বন্দনায় কি সুখ ও আনন্দ আছে?

—কল্যাণী, এর সুখ অপ্রকাশ্য। এর সুখেই কেকা স্বেচ্ছায় হর্ষোৎফুল্ল হয়ে নৃত্য করে, বলাকাদল শূন্য থেকে শূন্যে ভেসে যায়, কদম্ব কেশর, যূথী, যাতি থেকে থেকে ফুটে ওঠে, বনানী বিধুরা হয়, স্রোতস্বিনী কিঙ্কিনী বাজিয়ে ছুটে চলে। রূপ বিষাদ বলেই ত বিরহের নিবিড়তায় এই ঋতু এত মধুর।

মধুর? সত্যই মধুর। দেবলোক-বাসিনী নাগদত্তা মর্ত্যলোকের আসন্ন বর্ষার মেঘভারে একটি অনন্ত বিরহের আশ্চর্য নিবিড় সুখকে যেন অনুভব করেছে এবং বিস্মৃত হয়েছে অমর্ত-লোক।

তারপর? তারপর সেই জলধারায় মহারাজ কুশনাভের হাত ধরে চঞ্চলা লীলা-মত্ত হয়ে উঠেছে। সবুজ দূর্বাদল পীড়িত করে ছুটে চলে গেছে ওরা, তমাল তলায় অসম্বৃত বসন বর্জন করে বল্কল পরিধান করেছে, গলায় দুলিয়েছে কনক-চাঁপার মালা, কুন্তলে তার কুশনাভ একটি শ্বেত কমলের অর্ধস্ফুট কুঁড়ি দিয়েছেন গুঁজে, রক্তজবায় বাহুমূলে অগ্নিশিখার মত জ্বলে উঠেছে।

চঞ্চল দুটি মৃগ কখন যে লীলাশেষে পরস্পরের কণ্ঠলগ্ন হয়ে চুম্বনে আলিঙ্গনে একটি একান্ত সুখক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউ জানে না।

ঘুম যখন ভাঙল, আকাশভরা নীলের কোলে চাঁদ ফুটে উঠেছে। বনভূভাগ তিমিরাবৃত। একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র যেন মর্ত্যলোকের ওপার থেকে হাতছানি দিচ্ছে নাগদত্তাকে।

কুশনাভ ওর দুটি হাত ধরে ফেলে-ছিলেন।

—প্রাসাদে চল, তোমায় আমি ধর্মাচরণ দ্বারা বধূ হিসেবে বরণ করে নেব, প্রিয়া! ইহজীবন একটি নিশ্চিন্ত ভালবাসা দিয়ে তোমায় পূর্ণ করব।

নাগদত্তা হেসে ওঠে, 'তা হয় না মহারাজ।'

—কেন?

এ কেনর কোন উত্তর নেই। দেব-লোকের কন্যা মর্ত্যলোকের বধূ হবে? ইহজীবনের ভালবাসা? তার পরিধি আর কতটুকু—একটি আয়ুতেই তার হিসাব-নিকাশ।

—মহারাজ, আমায় মার্জনা করুন। এ মর্ত্যলোক হয়ত সুন্দর, কিন্তু তা ক্ষণকালের সৌন্দর্য। এখানে অনন্ত হয়ে থাকে শুধু রোদন, বেদনা, যাতনা, শোক।

—নিষ্ঠুরা, প্রেম কি অনন্ত নয়?

—আয়ু যদি মুছে যায়, তবে কোন অনন্ত অবশিষ্ট থাকে, মহারাজ!

মহারাজ কুশনাভ হাহাকার করে উঠেছিলেন—তাঁর সবল দুই বাহুতে একটি ছলনা এবং মোহকে উন্মত্তাবশে আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন অনন্ত-কালের জন্যে। পদ্মপাত্রের জলবিন্দুর সেই সৌরস্বপ্ন বিস্মিত করেছে অমর্ত্য-বাসিনীকে।

কিন্তু অবসর ছিল না স্বর্গবনিতা নাগদত্তার মর্ত্যলোকের একটি বিরহী হৃদয়ের হাহাকার শোনার।

মহারাজ কুশনাভকে আজ মনে পড়েছে নাগদত্তার। আর মনে পড়েছে সেই আসন্ন বর্ষণস্তব্ধ মর্ত্যলোকের বনভূমি। কেকাস্বরে যা মুখর, নবকদম্বের হিল্লোলে, সবুজের মেখলায় স্রোতস্বিনীর উপলাঘাত-ছন্দে বিষণ্ণমধুর। আর মনে পড়েছে সেই কথা—!

মনে পড়ছে, কিন্তু আর যেন বিরাগ নেই মর্ত্যলোকের প্রতি। শত রোদন, বেদনা, যাতনার মধ্যেও সেই মর্ত্যলোকেই একটি হাহাকার শুধু আর্তনাদ করে বলতে পারে, 'নিষ্ঠুর, প্রেম কি অনন্ত নয়?' দেবলোকের কোন গন্ধর্ব এমন ভয়ঙ্কর অথচ বড় মধুর এই আর্তনাদটি করতে জানে না। মোহবশেও একটি ক্ষণিক-সুখকে সবল বাহুতে আঁকড়ে ধরে রাখার জন্যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে না। ক্ষণিকের জন্যে পায় বলেই মর্ত্যে হাহাকার আর অশ্রু আছে, একটি পলকের জন্য চাওয়া বলেই ওদের খদ্যোত সহজে জ্বলে ওঠে, মৃত্যু আছে বলেই মদিরতা আর সর্বনাশা প্রেম। এবং বিরহ। আর ব্যর্থতা, শোক, দুঃখ, যাতনা, হিংসা। নরক আর নন্দনকানন।

নাগদত্তা স্খলিত চরণে মাধবীমণ্ডপ ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়। নিশিভোরের প্রশান্তি তখন তার মনে। মর্ত্যের একটি ছায়া নয়নে নেমে এসেছে—আর কোন উদ্বেগ নেই। কোন আশঙ্কাও।

লিগনাইটের কথা

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষ তার পরিশ্রমের দ্বারা ধরিত্রীর বুকে সোনার ফসল ফলায় এবং সে ফসল নিঃশেষ হয়ে গেলে পুনরায় তা উৎপাদনের উপায় মানুষের জানা আছে। কিন্তু প্রকৃতির ভাণ্ডারে যে খনিজসম্পদ সঞ্চিত আছে, তা একবার শূন্য হলে কোনো উপায়েই তার কণামাত্র সৃষ্টির ক্ষমতা নেই মানুষের। এইখানে মানুষ সম্পূর্ণ অসহায়। মানুষের এই অসহায়ত্ব বিজ্ঞানীরা কিন্তু স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নন। তাই তাঁরা চেষ্টা করেন, কোনো একরকম খনিজের অভাব ঘটলে অন্য কোনো বিকল্প খনিজকে তার কাজে লাগাতে। এইরকম এক খনিজ হলো লিগনাইট, যা পাথুরে কয়লার বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটি অতি প্রয়োজনীয় খনিজ পাথুরে কয়লা। এই খনিজটি এদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলেও তা একেবারে অপরিমিত নয়—তার ভাণ্ডার একদিন শূন্য হবেই। সেদিন আমাদের অবস্থা কি হবে? দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রেই অচলাবস্থা কি ঘনিয়ে আসবে না? সেই পরম অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্যে লিগনাইটের সম্ভাব্য উপযোগিতা বিচার করে দেখা প্রয়োজন আমাদের। কারণ লিগনাইট এদেশে নিতান্ত কম পাওয়া যায় না এবং কয়লার বিকল্প হিসেবে একে অনায়াসেই ব্যবহার করা যেতে পারে।

লিগনাইট আসলে কয়লারই জাতভাই—কয়লার অর্ধ পরিণত রূপে এটি। তবে সাধারণ কয়লার মতো এর রং কালো নয়—ব্রাউন বা লালচে ধরনের। রাসায়নিক উপাদানের অনুপাতেও তারতম্য আছে খানিকটা, সাধারণ কয়লার তুলনায় এতে কার্বনের ভাগ কম এবং অক্সিজেনের ভাগ বেশি। আমাদের দেশে লিগনাইটের প্রধান আকর আছে মাদ্রাজ প্রদেশের দক্ষিণ আরকট জেলায় নেইভেলী নামক স্থানে। পাঞ্জাব, বিকানীর ও কচ্ছ প্রদেশেও কিছু পরিমাণ লিগনাইট পাওয়া যায়। পৃথিবীর অন্যান্য যে কটি দেশে এই খনিজের আকর আছে এবং এই খনিজটিকে অল্পবিস্তর কাজে লাগানো হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জার্মানী ও অস্ট্রেলিয়া।

ভারতে লিগনাইটের সন্ধান পাওয়া গেছে খুব বেশিদিন নয়। ১৯৩৭ সালে দক্ষিণ আরকটে একটি আর্টেজীয় কূপ খননকালে এর প্রথম সন্ধান মেলে। তদানীন্তন ভারত সরকারের নির্দেশে ভূতত্ত্ব সমীক্ষা বিভাগ সম্ভাব্য অঞ্চলে বহু অনুসন্ধান কাজ চালান এবং তার ফলে মাদ্রাজের সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে লিগনাইটের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৭ সালে মাদ্রাজ সরকার দক্ষিণ ভারতের এই অবজ্ঞাত স্বল্পপরিচিত খনিজটির প্রতি বিশেষভাবে নজর দেন এবং খ্যাতনামা ভূতত্ত্ববিদ্ ও খনিজ-বিশারদ শ্রীযুত এইচ কে ঘোষকে এই কাজে নিযুক্ত করেন। শ্রীযুত ঘোষ প্রথমে মার্কিন দূতাবাসের খনিজজ্ঞ আর এস সানফোর্ড এবং তারপর মার্কিন খনিজ সংস্থার ইঞ্জিনীয়ার পল এরিচের সহযোগিতায় বহু স্থানে খননকার্য চালান এবং ১০০ বর্গমাইল অঞ্চলে লিগনাইটের অস্তিত্ব নির্ধারণ করেন। শ্রীযুত ঘোষই সর্বপ্রথম জানান, দক্ষিণ ভারতের লিগনাইটের সম্ভাব্য পরিমাণ হবে প্রায় ২০ হাজার লক্ষ টন এবং এই পরিমাণ লিগনাইটের দ্বারা ভারতের কলকারখানা, রেলগাড়ি ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে কয়লার চাহিদা প্রায় ১০০ বছর ধরে মেটানো যাবে।

খনিজবিশারদ পরীক্ষামূলক খনির অভ্যন্তর লক্ষ্য করছেন।

আগেই বলা হয়েছে, সাধারণ কয়লা ও লিগনাইট সমগোত্রীয় হলেও এদের বর্ণ এক নয় এবং রাসায়নিক উপাদানের অনুপাতে কিছু তারতম্য আছে। লিগনাইটে জলীয় অংশের ভাগ বেশ বেশি—শতকরা প্রায় ৩০-৩৫ ভাগ। জলীয় অংশের এই মাত্রাধিক্য থেকে একটা সন্দেহ স্বতঃই জাগতে পারে—শিল্পক্ষেত্রে ও গৃহস্থালী প্রয়োজনে জ্বালানী হিসেবে লিগনাইটের তাহ'লে উপযোগিতা আছে কতখানি? ভারতের অনুরূপ লিগনাইট জার্মানীতেও পাওয়া যায়। সেখানে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, জলীয় অংশের মাত্রাধিক্যের দরুণ জ্বালানী হিসেবে লিগনাইটের উপযোগিতা বিশেষ কিছু কমে না। জার্মানীতে লব্ধ পরীক্ষার ফল অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্পাদিত পরীক্ষার দ্বারাও সমর্থিত হয়।

অতএব আমরা বলতে পারি, দক্ষিণ আরকটে প্রাপ্ত লিগনাইটকে যদি যথাযথভাবে কাজে লাগানো যায় তাহ'লে দক্ষিণ ভারতের শিল্পায়নে তা বিপুলভাবে সহায়তা করবে। কথাটা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। আমরা জানি, শিল্পক্ষেত্রে বিদ্যুৎ অপরিহার্য এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে কয়লা একান্ত

মাদ্রাজের আরকট জেলায় লিগনাইট এলাকার একাংশ

প্রয়োজনীয়। বর্তমানে দক্ষিণ ভারতে কয়লা সরবরাহ করা হয় প্রধানত বাংলা দেশ ও বিহার থেকে। এক হাজার মাইলের অধিক দূর থেকে এভাবে কয়লা নিয়ে যেতে রেল-ভাড়া পড়ে যথেষ্ট এবং অসুবিধেও হয় অনেক। সুতরাং দক্ষিণ ভারতের কলকারখানায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে কয়লার পরিবর্তে লিগনাইট ব্যবহার করলে সব দিক থেকে সুবিধে হবে।

কয়লার সাহায্য ছাড়া জলশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা দক্ষিণ ভারতে আছে অবশ্য। কিন্তু জলের জন্যে প্রকৃতির ওপর নির্ভর করতে হয় এক্ষেত্রে। বিগত কয়েক বছর ধরে দক্ষিণ ভারতে বারিপাতের অপ্রাচুর্যের জন্যে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে এবং তার ফলে কলকারখানায় ও ঘর-বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ কমিয়ে দেওয়া হয় বেশ কিছু পরিমাণে। সুতরাং এক্ষেত্রেও মুশকিল-আসানের ভূমিকা লিগনাইট গ্রহণ করতে পারে অনায়াসে।

শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নয়, আরও বহু ক্ষেত্রে লিগনাইটের উপযোগিতা আছে। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, গৃহস্থালী কাজে আদর্শ জ্বালানী হিসেবে লিগনাইট ব্যবহৃত হতে পারে। তৈল ও সার-শিল্পে হাইড্রোজেন গ্যাস একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ, এই হাইড্রোজেন পাওয়া যেতে পারে লিগনাইট থেকে। পেট্রোলের মতো কৃত্রিম তরল জ্বালানী প্রস্তুতের অন্যতম মূল উপকরণ হিসেবেও লিগনাইট ব্যবহৃত হতে পারে। এছাড়া অ্যালকোহল, অ্যাসিড, মোম ও নানারকম রাসায়নিক দ্রব্যও প্রস্তুত করা যায় লিগনাইট থেকে। লিগনাইটে ফেনল জাতীয় যে উপাদান আছে তা থেকে প্ল্যাস্টিক প্রস্তুত হতে পারে। লিগনাইটের খনিতে খনিজের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ মাটি মিশ্রিত থাকে, এই মাটি সেরামিক ও ফায়ারব্রিক শিল্প স্থাপনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। লিগনাইট থেকে যে সমস্ত উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায় সেগুলোকে বাজারে যদি চালু করা যায়, তাহ'লে এই জিনিসগুলো বিক্রী করে যে টাকা পাওয়া যাবে তার দ্বারা খনি থেকে লিগনাইট উত্তোলনের বিপুল ব্যয়ভার কালক্রমে প্রায় সবটাই পুষিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

খনি থেকে লিগনাইট উত্তোলনের সময় যে জল ওঠে তাও কাজে লাগানো যেতে পারে। খনির নিকটবর্তী অঞ্চলে অরণ্যসম্পদ গড়ে তোলার জন্যে জল-সেচের ব্যবস্থা হতে পারে এর দ্বারা। পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেছে, ৬০০ বর্গফিট পরিমিত গর্ত খুঁড়লে যে পরিমাণ জল ওঠে তাতে প্রায় ২০০০ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জল, মাটি ও লিগনাইট যে তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে খনির সৃষ্টি, সে তিনটি জিনিসই কাজে লাগানো যায়।

এ সমস্ত প্রত্যক্ষ উপযোগিতা ছাড়া দক্ষিণ ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে দেবে লিগনাইট। কিছুকাল থেকে জানা গেছে; মাদ্রাজ রাজ্যের কুর্নুল, ত্রিচিনাপল্লী, সালেম ও আরকট জেলায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহপিণ্ড প্রচুর পরিমাণে বর্তমান আছে। ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা হিসেব করে দেখেছেন, শেষোক্ত তিনটি জেলায় ৫০০০ লক্ষ টন বা তার বেশি লৌহপিণ্ড আছে। কয়লার অভাবে এতদিন এই লৌহসম্পদের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি, লিগনাইটের সহায়তায় তা সম্ভব হতে পারে।

ট্রলিতে লিগনাইট ভর্তি করা হচ্ছে

জার্মানী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকৃতিজ লিগনাইটকে (যার জলীয় অংশ হচ্ছে শতকরা ৩৭ ভাগ) বাষ্প উৎপাদনের জন্যে চুল্লীতে পোড়ানো হয়। ভারতে প্রাপ্ত লিগনাইটের সম্ভাব্য উপযোগিতা সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের জন্যে মাদ্রাজ সরকার যে বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করেন তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বৃহদাকারের শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র (Power Station) যেখানে স্থাপন করা হবে সেখানে লিগনাইটকে অনুরূপভাবে ব্যবহার করা চলতে পারে। পক্ষান্তরে, লিগনাইটে জলীয় অংশ বেশি থাকার দরুণ দূরান্তরে বহন করে নিয়ে যাবার অসুবিধে আছে এবং এদিক দিয়ে বিটুমিনাস কয়লার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিগনাইটকে হটে আসতে হবে। তবে খনির নিকটবর্তী ২৫০—৩০০ মাইল এলাকার মধ্যে লিগনাইটের আধিপত্য অপ্রতিহত, সেখানে লিগনাইট ব্যবহার করাই হলো বেশি লাভজনক।

১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে নেইভেলীতে লিগনাইট উত্তোলন পরিকল্পনার প্রারম্ভিক কাজ শুরু হয়। কিন্তু মাটির তলা থেকে লিগনাইট আহরণ সহজ ব্যাপার নয়। এজন্যে নানারকম যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় কতকগুলো যন্ত্রপাতি স্থাপিত হয়েছে। এবং আরও যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আনানো হচ্ছে। সেগুলো এসে গেলেই লিগনাইট উত্তোলনের কাজ পুরোদমে শুরু হবে। এই পরিকল্পনার ইঞ্জিনীয়ারদ্বয় শ্রীযুত ঘোষ ও মিঃ এরিচ বর্তমানে শেষ পর্যায়ের অনুসন্ধানকার্যে ব্যাপৃত রয়েছেন।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বাৎসরিক ১০ লক্ষ টন লিগনাইট উত্তোলনের জন্যে আনুমানিক ২৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে। প্রারম্ভিক কাজের জন্যে এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৮ লক্ষ টাকা। পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান থেকে জানা গেছে, মাদ্রাজ রাজ্যে এক টন সাধারণ কয়লার তুলনায় লিগনাইটের দাম হবে তিন-চার গুণ কম। দ্বিতীয়ত, লিগনাইটের সঙ্গে যে প্রচুর পরিমাণ মাটি উঠবে তা স্টোনওয়ার প্রস্তুতের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু নেইভেলী পরিদর্শন করে সেখানকার কাজকর্ম দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। লিগনাইট উত্তোলনের পরিকল্পনা যে বিরাট সম্ভাবনাময় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। লিগনাইটের যথাযথ সামগ্রিক ব্যবহার যেদিন চালু হবে সেদিন দক্ষিণ ভারত, তথা সমগ্র ভারতের শিল্পজগতে এক নবযুগের উদয় হবে বললে অত্যুক্তি হবে না।

প্রশ্ন

গৌতম রায়

একটি অতন্দ্র প্রতীক্ষার বেদনা,
একটি নিভৃত স্বপ্নের আকুতি,
বিরল সন্ধ্যার ছায়া,
আর দুপুরের মায়া—
এর চেয়ে কি বড়
ঐ জনতার জয়ধ্বনি?
যেখানে হারায় তোমার
স্বপ্ন, সুর আর গান!

শার্ঙ্গদেব

গত ছ' মাসের মধ্যে যত সংগীতানুষ্ঠান হয়েছে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় তার পরিমাণ অনেক বেশি বলেই আমাদের ধারণা। রাগসংগীতের এত অধিক অধিবেশন এবং জনপ্রিয়তা এই ক'বছরের মধ্যে দেখা যায়নি। নিখিল বঙ্গ সংগীত সম্মেলনের পর সারা শীতকালটাই উচ্চাঙ্গ সংগীতের নানা অনুষ্ঠানে কেটে গেছে এবং এখনো মাঝে মাঝেই এখানে ওখানে চলছে। বাংলা গানের আসরও এবার বহু বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। লোকসংগীত এবং কাব্যসংগীতের বিবিধ অংশ আমাদের গোচরে আনবার চেষ্টা করা হয়েছে। যাঁরা এইসব আসরে উপস্থিত থেকেছেন তাঁরা নানাভাবে উপকৃত হয়েছেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

গায়নশিল্পের দিকে এই ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ অত্যন্ত সুখের বিষয় এবং আমরা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে বাঙালী শিল্পীরা ধীরে ধীরে ভারতীয় সংগীতের পুরোভাগে স্থান করে নিতে সচেষ্ট হচ্ছেন। এই যে প্রচেষ্টা এ অত্যন্ত প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই কিন্তু এটা সংগীতের একটা দিক—শিল্পের দিক, প্রকাশের দিক। এছাড়া আরও একটা মস্তবড় দিক রয়েছে সেটা ইতিহাসের দিক, আলোচনার দিক, যা দিয়ে আমরা আমাদের সাংগীতিক ঐতিহ্যের পরিচয় পাই, সংগীতের যথার্থ মূল্য নিরূপণ করতে পারি। এই দিকটা সম্বন্ধে আমরা এখনো সম্পূর্ণ সচেতন হয়েছি বললে অতিশয়োক্তি করা হবে। বস্তুত আমাদের সংগীত-সাহিত্য এখনো অপরিণত।

সংগীত সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা হয় না বলাটা সংগত নয়, কেননা, সেটা হয়ে থাকে। প্রায় প্রতি মাসিক, সাপ্তাহিক এবং দৈনিকে সংগীত সম্বন্ধীয় আলোচনার ব্যবস্থা রয়েছে—বহু সাংগীতিক রচনাও চোখে পড়ে কিন্তু তা সত্ত্বেও সংগীত-সাহিত্য এখনও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়নি, অধিকাংশ রচনা দেখে এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে। প্রধানত আমাদের আলোচনার সূত্রপাত সাময়িক চাহিদা মেটাবার জন্য, কেবলমাত্র কতকগুলি অনুষ্ঠানের ভাল-মন্দ বিচার। এর বাইরে যে সমস্ত সাংগীতিক প্রবন্ধ দেখা যায় তার মধ্যে অধিকাংশই সাধারণ সাহিত্যিক প্রবন্ধেরই নামান্তর—হয়তো কোন কোন সংগীত রচয়িতার রচনা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি এবং তার ব্যাখ্যা। আসলে তেমনভাবে সংগীতের রীতি, সাংগীতিক ইতিবৃত্ত বা সংগীতশৈলী সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্রও তো আমাদের দেশে নেই। বলতে গেলে সারা উত্তর ভারতে সংগীত বিষয়ক একখানি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা আছে কিনা সন্দেহ। সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা সাধারণ পত্রিকা মারফৎ করা হয় সাধারণ পাঠকদের জন্য অতএব সংগীতের প্রকৃত বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনার অবকাশ খুবই কম। সব পত্রিকায় আবার স্বরলিপি উদ্ধৃত করে আলোচনার সুযোগ পাওয়া যায় না। পূর্বে আমাদের দেশে সংগীত প্রকাশিকার মত উচ্চাঙ্গের পত্রিকা ছিল এবং তাতে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক আলোচনা হয়েছে। সংগীতবিজ্ঞান প্রবেশিকাতেও অনেক প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ বেরিয়েছে এক সময়। উক্ত পত্রিকার অস্তিত্ব এখনো আছে শুনেছি কিন্তু কোথাও বড় একটা চোখে পড়ে না।
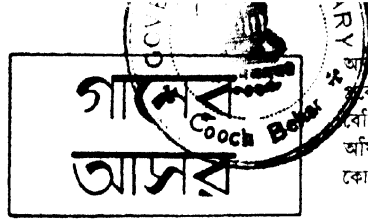
এই সবের মূল কারণ হচ্ছে আমরা সংগীত সাহিত্য বিষয়ে তেমন মনোযোগী নই। সংগীতের ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক দিকে আমরা তেমন দেশব্যাপী কৌতূহল জাগ্রত করতে সমর্থ হয় নি। অপরাপর বিষয়ে আমরা যেমন সম্যক্ জেনে শুনে অগ্রসর হই সংগীত সম্বন্ধে ততটা জানবার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না এবং অনেক সময় সাধারণ বুদ্ধির ওপর নির্ভর করেই বিচার করতে বসি। অতএব আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র সংকীর্ণ এবং সংগীত বিষয়টি যে কতখানি ব্যাপক তা আমাদের অনেকের ধারণায় আসে না। এইসব কারণেই সংগীতালোচনার ক্ষেত্রে বহিরঙ্গ সম্বন্ধে যতটা উৎসাহ দেখা যায় প্রকৃত সংগীতের ভিতর প্রবেশ করবার প্রচেষ্টা তেমন দেখা যায় না। শিল্পীরা যত কষ্ট করে শিল্পকলা আয়ত্ত করেন সমালোচক বা লেখকদেরও তেমন বা বোধ করি তদপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করে শাস্ত্রে প্রবেশ করতে

হবে এবং সাংগীতিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে নতুবা পরিণত শিল্প যতই প্রচারিত হোক না কেন, অসার এবং অপরিণত আলোচনা ক্রমেই বাড়তির পথে চলবে।

সংগীতের আলোচনাটা আপাতদৃষ্টিতে যেমন সহজ মনে হয় আসলে ততটা নয়, রীতিমত কঠিন ব্যাপার। কেবল এটা ভাল ওটা মন্দ এইটুকু বল্লেই হয়তো কাজ সারা হতে পারে কিন্তু সমালোচনা হয় না। এর জন্য ব্যাপক জ্ঞানের প্রয়োজন। ব্যবহারিক সংগীতের দিকটাই ধরা যাক। কোন আসরে যদি টপ্পার চালে একটা গান শোনা যায় সেখানে টপ্পার দানাটা কেমন উঠছে, তালটা ঠিক আছে কি না, উপযুক্ত লয় রাখা হচ্ছে কিনা, এটা যেমন দেখতে হবে, তেমনি এই টপ্পার কাজগুলি কোন শ্রেণীর সেটাও যাচাই করে নিতে হবে। এই বাংলাদেশে নানা ধরনের টপ্পা প্রচলিত আছে। তাদের কোনটার সংগে এ গানের কী সম্বন্ধ সেটা নির্ণয় করতে হলেই বাংলাদেশের টপ্পার যুগ সম্বন্ধে রীতিমত পরিচয় থাকা দরকার। সংগীতের সংগে মিলবে সাহিত্য আর তার সংগে ইতিহাস আবার আর একদিকে সুর, গায়নশিল্প, তাল এবং তাদের ব্যবহার এগুলিও নখদর্পণে থাকা চাই। অতএব ব্যাপার খুব সহজ নয় এবং বিচার যদি করতেই হয় তাহ'লে এইভাবেই করতে হয় যাতে করে শিল্পী বুঝতে পারেন তাঁর পরিশ্রমের এবং শিক্ষার মর্যাদা সমালোচক রক্ষা করতে পেরেছেন।

আমাদের সংগীতের শাস্ত্র আবার এমনি যে নানা বিষয় না জানলে তাকে সম্যক্ উপলব্ধি করা অসম্ভব। সংগীত শাস্ত্রের আলোচনা প্রসংগে নানা বিষয় এসে গেছে যেমন দর্শন, অলংকার, ছন্দ, সাহিত্য প্রভৃতি—আর এইসব বিষয়ের ওপরে রয়েছে ইতিহাস, কোন্ যুগে কিভাবে আমরা একটির পর একটি বিষয় ধরে অগ্রসর হয়ে চলেছি তার বৃত্তান্ত। ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে জানতে গেলে ভারতীয় ইতিহাস একটু নয় গভীরভাবেই জানতে হবে—একটির পর একটি জাতির অভ্যুত্থান পতন তাদের সংস্কৃতি সবই। কত জাতির সংগে কত রাগ কত সাংগীতিক পদ্ধতি জড়িত। অতএব শাস্ত্রের দিক থেকে অগ্রসর হতে গেলেও জ্ঞানমার্গে অনেকখানি অগ্রসর হওয়া দরকার। আমাদের সাধারণ সাংগীতিক আলোচনা দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় এতটা আমরা ভেবেও দেখছি না আর দেখলেও পরিশ্রম স্বীকার করতে রাজি নই।

বাংলা গানের প্রসংগেই দেখা যায়, বাংলা গানের ইতিহাস তার ক্রমবিকাশ আমাদের স্বল্পই জানা আছে। এমন কি দেড় শ বছরের পুরোনো বাংলা গানের বহু রীতি আজ আমাদের অজ্ঞাত। বাংলার সংগীতের প্রাচীন যুগের যদি বা কিছু পুরাতন নানা গ্রন্থ ঘেঁটে ঘুঁটে পাওয়া যায় মধ্যযুগের অনেকখানি একেবারেই অন্ধকারে। কীর্তনের অভ্যুত্থান এবং তার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধেও তেমন তথ্যবহুল কোন গ্রন্থ নেই। বর্তমান বাংলা গানের কয়েকজন রচয়িতা সম্বন্ধে আমরা জানি এবং অনেকের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা নেই বললে হয়।

আমাদের সংগীতের উপপত্তিক বিষয়ে এই যে অনগ্রসর অবস্থা এটা গৌরবের বিষয় নয়। সম্মেলন এবং গানের আসর যেভাবে চলেছে সংগীত সাহিত্য সেভাবে চলবার সুযোগ পায় নি। বস্তুত শিক্ষিত মহল এদিকে তেমন নজরই দেন নি। বহুকাল পূর্বে বাংলাদেশই কিন্তু এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছিল। প্রসিদ্ধ সংগীতরত্নাকরের স্বরাধ্যায় কলকাতা থেকেই প্রথম ছাপা হয়ে বেরোয়। সংগীত-সার সংগ্রহ একটি অতি মূল্যবান সংকলন গ্রন্থ। রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আনুকূল্যে এটি সম্ভব হয়েছিল। সংগীত-দর্পণও ছাপা হয়েছিল এই কলকাতা থেকেই। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সংগীত-সার কিছু ভুলত্রুটি সত্ত্বেও তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ এবং কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতসূত্রসার তো আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় গ্রন্থ বললে অত্যুক্তি হয় না। তারপরে এই ধরনের পরিশ্রমসূচক গ্রন্থ অনেকদিন প্রকাশিত হয়নি এবং আজ পর্যন্ত অল্প দু এক-খানি ভিন্ন সাহিত্যকারের খেটে লেখা তথ্য-বহুল বই আর বেরোয় নি।

সংগীত সম্বন্ধে যাঁরা চিন্তা করেন তাঁরা নিশ্চয়ই একমত হবেন যে সাংগীতিক গবেষণায় আমাদের অচিরেই আত্মনিয়োগ করা উচিত। যে গ্রন্থগুলির কথা বলেছি সেগুলির কোনটিরই দ্বিতীয় সংস্করণ আজ পর্যন্ত বেরোয় নি অথচ এগুলির পুনর্মুদ্রণ হওয়া কত দরকার। সংগীত দামোদর বলে একখানি গ্রন্থ আছে যেটি বাঙালীর লেখা বলে দাবি করা হয়, তার খণ্ডিত বা সম্পূর্ণ পুঁথি যে পাওয়া যায় না তা নয় কিন্তু সেটি আজ পর্যন্ত ছাপা হল না। শোনা যাচ্ছে, ভারতের অধিবাসী এক ফরাসী পণ্ডিত কোথা থেকে এর একখানি পুঁথি সংগ্রহ করে ছাপিয়ে বের করছেন। এ ছাড়াও আরো অনেক পুঁথি রয়েছে যেগুলি ভালভাবে দেখা দরকার। সবাই মিলে সচেষ্ট হলে বাংলার মধ্যযুগের সংগীত সম্বন্ধে আমরা হয়তো অনেক কিছুই জানতে পারব। ভক্তিরত্নাকর নামক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থের সংগীতাংশটি বিশেষ মূল্যবান এবং অন্তত এই অধ্যায়টির পুনর্মুদ্রণ হওয়া উচিত। রাগতরঙ্গিণী নামক একখানি গ্রন্থ আছে যা বাংলার সংগীতের ইতিহাসে একটি

গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী অথচ এই দেশের দিকে আমাদের এখনো নজর পড়েনি।

এই যে বিরাট দায়িত্ব এর ভার তুলে নেবে কে? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজ পর্যন্ত একটি সংগীত শাস্ত্রও সম্পাদিত করবার ব্যবস্থা করেন নি। তাঁদের কি আমরা এ বিষয়ে অনুরোধ করতে পারি না? কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ইংরেজি অনুবাদ বের করেছেন। এটি একটি অতি প্রশংসনীয় উদ্যম। আমরা তাঁদেরও অনুরোধ করছি তাঁরা যেন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালায় অনেকগুলি সংগীতবিষয়ক পুঁথি আছে, এগুলির কোন পরিচিতি তাঁদের গ্রন্থাগারে নেই। তাঁরা যদি এইসব পুঁথির বর্ণনাত্মক ক্যাটালগ বের করেন তবে অনেক উপকার হয়। সাহিত্য পরিষদের দ্বারা এই কাজটি কতখানি সম্ভব আমরা জানি না এবং উক্ত গ্রন্থাগারে সংগীত-বিষয়ক পুঁথির খোঁজ পাইনি। কিন্তু যদি থেকে থাকে, আশা করি, তাঁরা নিশ্চেষ্ট থাকবেন না।

চোখের সামনে দেখছি মাদ্রাজ এ বিষয়ে কত এগিয়ে গেল। মূল্যবান গ্রন্থের সম্পাদনা, মূল্যবান গবেষণা এবং মূল্যবান প্রবন্ধাদি সবই তো দক্ষিণ ভারত থেকেই বেরুচ্ছে। অতিসুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ এই ব্যাপারে সহায়তা করছেন। এর তুলনায় শুধু বাংলা কেন সমগ্র উত্তর ভারতই এখনও পৌঁছিয়ে আছে।

বাংলাদেশে সাংগীতিক গবেষণা বিশেষভাবে হওয়া দরকার, কেননা বাংলার সংগীতের ইতিবৃত্ত যা পাওয়া যায় তা খুবই অল্প। অনুসন্ধান করলে এমন বস্তু মিলতে পারে যাতে শুধু সংগীতের নয়, সাধারণভাবে ইতিহাসেরও কোন কোন লুপ্ত অধ্যায় আলোকিত হয়ে উঠবে।

পরিশেষে বড় বড় সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের বলি, হাজার হাজার টাকা গান শোনাবার জন্য এবং পুরস্কার বাবদ ব্যয় হচ্ছে, এর কিছু অংশ গবেষণার উদ্দেশ্যে খরচ করলে বোধ হয় অপব্যয় হবে না এবং তাঁদেরও একটা চিরস্থায়ী কীর্তি থেকে যাবে।

গানের আসর

সাহিত্যতীর্থ

গত ১লা আষাঢ় ৬৬।১ পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীটের মন্মথনাথ মল্লিক স্মৃতি মন্দিরে সাহিত্য তীর্থের একটি অধিবেশন হয়ে গেছে। সভাপতি ছিলেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র এবং অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন শ্রীযতীন্দ্র সেন, শ্রীঅখিল নিয়োগী, শ্রীকরুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক। অনুষ্ঠানে বর্ষাসংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী ঝরণা হাজরা, শ্রীমতী বাণী দাশগুপ্তা, শ্রীদ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী সবিতা গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীতরুণ মৈত্র, শ্রীসন্দীপ ঠাকুর, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মাইতি প্রভৃতি এবং তবলা সংগত করেন শ্রীমহানন্দ চক্রবর্তী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক।

পূর্ণিমা সম্মেলন

গত ৫ই আষাঢ় মন্মথনাথ মল্লিক স্মৃতিমন্দিরে বাণীমন্দির সাহিত্যসভার উদ্যোগে পূর্ণিমা সম্মেলনের একটি অধিবেশন বসেছিল। সংগীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল, শ্রীঅমর ভট্টাচার্য, শ্রীহীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীরাজীবলোচন দে।

অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবেই ঘরোয়া সুতরাং তেমন সমালোচনার মনোভাব নিয়ে আমরা এখানে উপস্থিত হইনি প্রবীণ ব্যক্তিদের গানবাজনা শুনতেই গিয়েছিলাম। তবে কিয়ৎপরিমাণে নিরাশ হয়েছি সে কথা স্বীকার করতে বাধা নেই। তানপুরার বাঁধা সড়ক ধরে যদি প্রবীণ গায়কের কণ্ঠস্বর চলতে না পারে তবে সেটা গৌরবের বিষয় নয় এবং না-ধ্রুপদ না-খেয়াল গোছের সংগীত পরিবেশন করে তার সঙ্গে ভারতবিখ্যাত তবলাবাদককে প্রায় ধরে বেঁধে লহরা তুলতে বাধ্য করাটাও প্রবীণ সংগীতজ্ঞের উপযুক্ত কাজ হয়নি। গানের সঙ্গে থেকে থেকে প্রবল মুখভঙ্গীও শ্রোতাদের বিরক্তির কারণ হয়েছে।

সদারং সংগীত সংসদ

উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রচার এবং দুঃস্থ গুণী সংগীত-শিল্পীদের সাধ্যমত সহায়তা দানের কর্মসূচী নিয়ে এলগিন রোডে সম্প্রতি সদারং সংগীত সংসদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। দিনকয়েক আগে এক সাংবাদিক বৈঠকে সংসদের সভাপতি শ্রীবীরেন্দ্র-কিশোর রায় চৌধুরী সংসদের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, সংগীত শিক্ষায় ইচ্ছুক গরীব ছোট ছেলেমেয়েদের বড় ওস্তাদদের কাছে শিক্ষালাভের জন্য সাহায্য করার চেষ্টাও সংসদের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

গত ১৫ই জুন সংসদ আশুতোষ কলেজ হলে তাদের প্রথম জলসার অনুষ্ঠান করে। কুমারী অনুরাধা দাশের কথক নাচ দিয়ে জলসা আরম্ভ হয় এবং শেষ হয় শ্রীচিন্ময় লাহিড়ীর গান দিয়ে। মাঝে সরোদ বাজিয়ে শোনান শ্রীরাধিকা-মোহন মৈত্র। এঁদের সকলের সঙ্গে তবলায় সংগত করেন ওস্তাদ কেরামৎউল্লা খাঁন। প্রাথমিক আসর হিসেবে জমায়েৎটা ভালোই হয়েছিল এবং সংসদ সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করার সুযোগ পাওয়া যায়। গুণী সংগীতজ্ঞদের সাহায্য-পরিকল্পনানুসারে ইতোমধ্যেই প্রথম কিস্তীতে সংসদ ৯১ বৎসর বয়স্ক সংগীতজ্ঞ শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১০১, টাকা পুরস্কার দান করেছেন। সংসদের কর্মকর্তাদের মধ্যে আছেন, সহঃ-সভাপতি—মহম্মদ দবীর খান, মিঃ এইচ এস কাওয়াসজী মেটা, শ্রীজগদীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রী এস জে সাভাত, শ্রীকানাইলাল সরকার, শ্রীগোপাল মিত্র, শ্রী জি ডি নন্দ, শ্রীএস আর ঝুন-ঝুনওয়ালা এবং সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হচ্ছেন যথাক্রমে শ্রীকালিদাস সান্যাল ও শ্রীপ্রভাতপ্রসূন মোদক।

বঙ্গসাহিত্যের প্রথম আত্মজীবনী

দেবীপদ ভট্টাচার্য

॥ ১ ॥

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা গড়ে উঠলেও আত্মজীবনী শাখার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সমালোচকের সজাগ ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আজ পর্যন্ত পড়েনি। অথচ এই শাখাটি বাংলা সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ ও পুষ্পিত প্রকাশ। ইউরোপীয় সাহিত্যে আত্মজীবনী পর্যায়ের রচনাগুলি বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করেছে। সেন্‌ট অগস্‌টিনের 'কন্‌-ফেসন্‌স্‌', রুশোর 'কন্‌ফেসন্‌স্‌', গ্যয়টের 'ট্রুথ এণ্ড ফিকশন' থেকে একান্ত আধুনিককালের আদ্রে জিদ্‌-এর 'ইফ ইট্‌ ডাই' গ্রন্থগুলি পূর্বলিখিত মন্তব্যের পরিপোষক। এই রচনাগুলি কথাসাহিত্যের সমপর্যায়ভুক্ত। একদিক থেকে মহত্তর শিল্প সৃষ্টিও বটে। কেননা, আত্ম-জীবনীগুলির মূলে প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবন, যার মধ্যে কল্পনার স্থান নেই। তাই আমরা এই রচনাগুলি পড়ে চকিত, বিস্মিত ও মুগ্ধ হই। তাছাড়া আমাদের মনে একটি সদাজাগ্রত কৌতূহল বিদ্যমান অপরের ব্যক্তি-জীবনটিকে জানবার। বিশেষ করে প্রথিতযশা ও স্মরণীয় ব্যক্তি-দের জীবনের অন্তর-পরিচয়টি, যা ঐ আত্মজীবনীগুলির মধ্যে বিধৃত, তাকে জানতে পারলে, সবলতা-দুর্বলতা মিলিয়ে গোটা মানুষের পরিচয়টি লাভ করি। এই আত্মজীবনীগুলির মূল্য নির্ণয় করতে গিয়ে জনৈক সমালোচক লিখেছেন, 'much better than novels or stories and more valuable than the passionate utterences of personal emotion. For future historians the illuminative value of such writing will be incom-parable'. (J. A. Symonds) কাজেই শুধু সাহিত্যিক গুণের দিক থেকে নয়, সমসাময়িক সমাজেতিহাসের রূপ উপলব্ধি ও বিচারের জন্যও এই বর্গের সাহিত্যের মূল্য অপরিসীম।

॥ ২ ॥

বাংলা সাহিত্যের প্রাক্‌-আধুনিক যুগে আমরা 'আত্মজীবনী' পর্যায়ের সচেতন বা পূর্ণাঙ্গ রচনা পাই না। তবে ভণিতা, গ্রন্থারম্ভ, আত্মপরিচয়, আত্ম-বিবরণী, পুষ্পিকা প্রভৃতির মধ্যে বহু আত্মজীবনীমূলক (autobiographical) উপাদান পাওয়া যায়। কবির পিতৃ-গোত্র-গুরু পরিচয়, কবিদের ব্যক্তিগত ও সমাজ-গত বহু তথ্য ঐ বিষয়গুলির মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম বা রূপরায়ের আত্মবিবরণী। শুধু ব্যক্তি-পরিচয় নয়, ব্যক্তির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে সমাজ-পরিধি তার নিখুঁত ইতিহাস ঐ আত্মবিবরণীর মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যায়। কিন্তু খাঁটি 'আত্মজীবনী' বলতে যে 'সচেতন' শিল্পসৃষ্টি বুঝি— সেই আত্মপ্রকাশী ও আত্মবিচারী সাহিত্য আমাদের দেশে উনিশ শতকে সৃষ্ট হয়েছে। সেই শিল্প প্রয়াসের সার্থক রূপ রাস-সুন্দরী, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মচরিত।

॥ ৩ ॥

বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী পর্যায়ের সাহিত্যের সংখ্যা নগণ্য নয়। যদি বলি এই সাহিত্যধারার প্রথমে দাঁড়িয়ে আছে একখানি মহিলাচরিত গ্রন্থ তাহ'লে অনেকেই অবাক হবেন। কিন্তু কথাটি ঐতিহাসিক দিক থেকে সত্য, কেননা বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মজীবনী রাস-সুন্দরী রচিত 'আমার জীবন'। অন্য কোন দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে এমন

সাহিত্য ... প্রথম ... সেই দেশে একটি গ্রামীণ গৃহস্থ পরিব মহিলার আত্মকথা ১৮৭৬ খৃষ্টা ডিসেম্বর মাসে প্রথম প্রকাশিত হ কম বিস্ময়ের কথা নয়। শুধু বিস্ম নয়, এ গৌরবের জিনিস। বিদ্যাস মহাশয়ের মৃত্যু হয় ১৮৯১এর ২৯ জুলাই। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পু নারায়ণচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বরচি আত্মকথা 'বিদ্যাসাগর চরিত' নামে সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশ করেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা দেওয় কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মচরিত ১৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৩০৩ সালে বৈশাখ সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রিকায় এ গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হ যে, 'স্বর্গীয় বিদ্যাসাগরের অসম্পূর্ণ আত্ম জীবনচরিত ভিন্ন এ বিষয়ে এখনও আর কিছু প্রকাশিত হয় নাই'। সমালোচকে এই মন্তব্য ভুল। কেননা বিদ্যাসাগ মহাশয়ের 'আত্মচরিত' প্রকাশিত হবে পনের বৎসর পূর্বে রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন' প্রকাশিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী কর্তৃক ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত হয় "১১ই পৌ, ১৮১৬ শক" অর্থাৎ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে।

রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। অবশ্য গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে আছে এই আত্মচরিত যতদূর পর্যন্ত লিখিত হইয়াছিল তাহার পরও ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ২৪।২৫ বৎসর জীবিত ছিলেন।' রাজ-নারায়ণের মৃত্যু হয় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে। চব্বিশ-পঁচিশ বছর আগে রচনা শেষ হয়ে থাকলে ১৮৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দকে রচনাকাল হিসেবে ধরতে হয়। কিন্তু যেহেতু গ্রন্থটি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ছাপা হয়ে বার হয়েছে, সেজন্য আমরা এই বইটিকে দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিতের পরবর্তী আসন দান করতে চাই কালানুক্রমিকতার দিক থেকে। তাহলে এই তথ্য স্বীকারে আর কোনও দ্বিধা থাকা উচিত নয় যে, বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মজীবনী রচিত হয়েছে শতবর্ষ

র একজন গৃহস্থ পরিবারের বধূর —সেই বধূ রাসসুন্দরী।

॥৪॥

পুরুষ-রচিত আত্মজীবনী ও মহিলা-রচিত আত্মজীবনীর মধ্যে একটি ভেদরেখা টানাই নির্ণেয়। পুরুষের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ও বিচিত্র, নারীর বিশেষত বাঙলা দেশের কন্যা বা বধূর জীবনের পরিধি সংক্ষিপ্ত। নারী আজকের বিশ শতকের শেষার্ধের বাঙলা দেশে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার সঙ্গে যুদ্ধপূর্ব কালের নারী-জীবনের কোন মিল নেই। কিন্তু আজও যে মহিলারা নিজেদের আত্মকথা বা স্মৃতিকথা লিখছেন, সেগুলির সঙ্গে পুরুষ-রচিত আত্মকথাগুলি মিলিয়ে পড়লেই পার্থক্যটি ধরা পড়বে।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'আত্মকথা'র সূচনাতে স্বীকার করেছেন যে, বাঙলা সাহিত্যে মেয়েরাই সবচেয়ে ভালো আত্ম-জীবনী লিখেছেন। কথাটি যদিচ সর্বাংশে সত্য নয়, তবুও চৌধুরী মহাশয় মেয়েদের রচনাগুলির সহজ, অনাড়ম্বর রূপটির কথা ভেবেই মন্তব্যটি করে-ছিলেন। তিনি ঐ প্রসঙ্গে রাসসুন্দরীর নামোল্লেখ উল্লেখ করেছেন। রাজনারায়ণ, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্যক্তিরা উনিশ শতকের বাঙলা দেশের জাতীয়-আকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বাঙলা দেশের নবজাগরণ যুগে মননের ও চিন্তার, গঠনে ও রূপান্তরে তাঁদের দান চিরস্মরণীয়। তাঁদের আত্মকথাগুলিতে উনিশ শতকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাসই শুধু বিধৃত হয়নি, তার সঙ্গে নিজেদের চিন্তা-ভাবনা, হৃদয়-মনের পরিচয়ও লিপিবদ্ধ রয়েছে। ব্যক্তি ও যুগ উভয়কে চিনবার ও জানবার সবচেয়ে বড়ো উপায় এই আত্মজীবনী-সাহিত্য। কিন্তু মহিলা-রচিত আত্মকথায় রাজনৈতিক-সামাজিক উত্থান-পতনের বিচিত্র ইতিহাস নেই। জনসমুদ্রের গর্জন নেই। নিজেদের বাড়ি, স্বামী-শ্বশুরের ঘর-সংসার, পারিবারিক জীবনের আনন্দে উচ্ছল, শোকে দুর্বহ অথবা কৌতুকে সমুজ্জ্বল দিনগুলি মহিলাদের রচনায় প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

পুরুষরচিত আত্মকথাগুলির ভাষা, বর্ণনা-রীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুরুগম্ভীর ও তথ্য-আকীর্ণ। কিন্তু মহিলাদের রচনা-রীতি কত স্বচ্ছ, বর্ণনাভঙ্গি কত ঘরোয়া, ভাষা কত সরল ও প্রাঞ্জল। রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন' এই মন্তব্যের সাক্ষ্য দেবে। ইংরেজিতে যাকে বলে 'ডোমেস্টিক' ঠিক সেই রূপটি, সেই অন্তরঙ্গ রূপটি রাসসুন্দরীর রচনায় প্রস্ফুট।

॥৫॥

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'আমার জীবন' প্রকাশিত হয়। ১৩০৫ সালে অর্থাৎ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ২য় সংস্করণ ও ১৩১৯ সালে অর্থাৎ ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

১৩০৫ সালে প্রকাশিত সংস্করণে লিখছেন :

"১২১৬ সালে চৈত্র মাসে আমার জন্ম
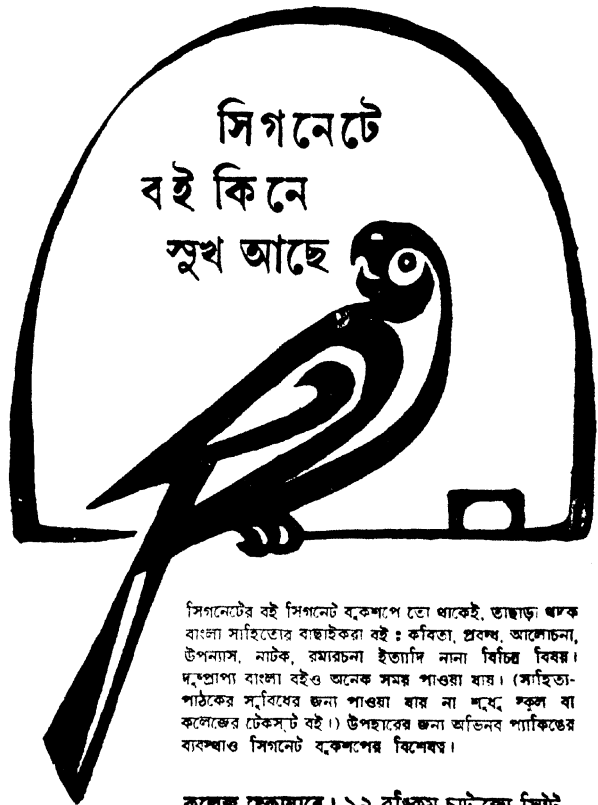
হয়, আর এই ১৩০৩ সালে আমার বয়ঃক্রম ৮৮ বৎসর হইল। আমি ভারতবর্ষে আসিয়া এত দীর্ঘকাল যাপন করিলাম।

আমার এই শরীর, এই মন, এই জীবনই কয়েক প্রকার হইল। আমার শরীরের অবস্থা, মনের ভাব কোন সময়ে কি প্রকার ছিল এবং কোন অবস্থায় কত দিবস গত হইয়াছে সে সমুদয় আমার স্মরণ নাই। যৎকিঞ্চিৎ যাহা আমার মনে আছে তাহাই লিখিতেছি....."

এইভাবে তিনি তাঁর বাল্য থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবনের নানা পর্বের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনার বৈশিষ্ট্য অকৃত্রিমতা। তাঁর বালিকা-জীবন, বধূজীবন, মাতৃত্ব সব স্তরের সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর স্বল্পবৃত্ত জীবনটি সার্থক ও আনন্দ রূপ লাভ করেছে ভগবদ্‌নির্ভরতায়। শাস্ত্র নয়, তত্ত্ব নয়, প্রাণের সহজ বিশ্বাস জীবনকে যে কি মহান মূল্য দান করে, তার অপূর্ব দৃষ্টান্ত রাসসুন্দরীর জীবন। বালিকা-বয়সে মায়ের কাছে শুনেছিলেন—

"বাস্তবিক পরমেশ্বর যে কি বস্তু তাহা আমি এ পর্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। সকল-লোক পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলে তাহাই শুনিয়া থাকি এই মাত্র জানি। মা বলিলেন তিনি ঠাকুর এজন্য সকলের মনের ভাব জানিতে পারেন। মার ঐ কথা শুনিয়া আমার মন অনেক সবল হইল। বিশেষ সেই দিবস হইতে আমার বুদ্ধির অঙ্কুর হইতে লাগিল। আর পরমেশ্বর যে আমাদের ঠাকুর, তাহাও আমি সেই দিবস হইতে জানিলাম। আর আমার মনে অধিক ভরসা হইল। পরমেশ্বরকে মনে মনে ডাকিলেও তিনি শুনেন, তবে আর কিসের ভয়, এখন যদি আমার ভয় করে, তবে আমি মনে মনে পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলিয়া ডাকিব। আর ঐ কথা আমার চিরস্থায়ী হইয়াছে, মা বলিয়াছেন, আমাদের পরমেশ্বর আছেন।"

বাল্যজীবনের এই ভগবদ্‌নির্ভরতা তাঁর সমগ্র জীবনকে পরিচালিত করেছে। দুঃখে-সুখে, বিপদে-সম্পদে, সর্বক্ষেত্রে তিনি উপলব্ধি করেছেন ভগবানের স্পর্শ। তাঁর জীবনে ক্ষোভ নেই, অসন্তোষ নেই, অতৃপ্তি নেই।—স্বামীর পরলোকগমনে তাই তাঁরই পক্ষে লেখা সম্ভব হয়—

"পরমেশ্বর আমার মস্তক মুণ্ডন করিয়াছেন। ঐ ১২৭৫ সালে ২৯ মাঘী শিবচতুর্দশীর দিবসে আড়াই প্রহর বেলার সময় কর্তাটির মৃত্যু হয়। আমার শিরে স্বর্ণমুকুট ছিল; কিন্তু এতকাল পরে সেই মুকুটটি খসিয়া পড়িল। যাহা হউক আমি তাহাতে দুঃখিত নহি, পরমেশ্বর আমাকে যখন যে অবস্থায় রাখেন, সেই উত্তম।"

রাসসুন্দরীর লেখা পড়া শেখার জন্য গভীর আগ্রহ ও চেষ্টা কত বাধা পার হয়ে সার্থকতা লাভ করেছিল তার বিস্তৃত বিবরণ তিনি দিয়েছেন। শেষে নিজের চেষ্টায়—

"ক্রমে ক্রমে সকলি পড়িলাম—চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, আঠার পর্ব, জৈমিনি ভারত, গোবিন্দ লীলামৃত, বিদগ্ধ-মাধব, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, বাল্মীকি পুরাণ। এই সকল পুস্তক ঐ বাটীতে ছিল।"

গৃহস্থ বধূ রাসসুন্দরীর শুধু ভক্তি-নম্র জীবনের ছবিই যে আমরা পাই তা নয়, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাঁর তেজোদ্দীপ্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ও আমরা এই বইটি পড়ে লাভ করি। কিন্তু জীবনকে মধুর করে রাখে আমাদের জীবনের স্মিত বা মুখর কৌতুকের মুহূর্তগুলি। রাসসুন্দরী তাঁর জীবনের কৌতুক-উজ্জ্বল বহু ঘটনার উল্লেখ করেছেন, তবুও তার মধ্যে যেটি সকলেরই মনোহরণ করেছে তার থেকে একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

"ঐ বাটীতে একটা ঘোড়া ছিল তাহার নাম জয়হরি। এক দিবস আমার বড় ছেলেটিকে সেই ঘোড়ার উপর চড়াইয়া, বাটীর মধ্যে আমাকে দেখাইতে আনিল। তখন সকল লোক বলিল, এ ঘোড়াটি কর্তার। তখন আমাকে সকলে বলিতে লাগিল,—দেখ। ছেলে কেমন ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছে, এ দেখ। আমি ঘরে থাকিয়া শুনিলাম কর্তার ঘোড়া, সুতরাং মনে মনে ভাবিলাম কর্তার ঘোড়ার সম্মুখে আমি কেমন ক যাই, ঘোড়া যদি আমাকে দেখে, তবে লজ্জার কথা। আমি মনে মনে এই প্র ভাবিয়া ঘরের মধ্যে লুকাইয়া থাকিলাম। সকলে বার বার বলিতে লাগিল বা আসিয়া দেখ ভয় কি? আমি ঘরে থাকিয়াই ভয়ে ভয়ে একটুকু দেখিলাম।"

॥ ৬ ॥

শতবর্ষ পূর্বের গ্রামীণ বাঙালী হি পরিবারের সামাজিক চিত্র গ্রন্থখানির স সম্পদ। রচনার কাঠামো (Structur বিচার করলে দেখি প্রাক্‌-আধুনিক কা মঙ্গল বা চরিত কাব্যের গড়নের প্রভ এই গড়নই রাসসুন্দরীর হাতে স্বা ও সংগত। তিনি প্রত্যেকটি অধ্যায় প্রারম্ভে 'বন্দনা' রচনা করেছেন। গ্রন্থারম্ভে 'মঙ্গলাচরণ' করেছেন। এবং গ্রন্থের শে লিখেছেন :

"ধন জন পুত্র কন্যা সব অকারণ।
মরণ সময় কেবল আছেন শ্রীমধুসূদন।
ওহে বিপদবারি রাসসুন্দরী ভেবে ব্যাকুল মন
রাসসুন্দরীর সেই সময়ে দিও হে দর্শন"

এই 'বন্দনা' 'মঙ্গলাচরণ' 'স্তব' পর্যায়ের রচনাগুলি সাক্ষ্য দেয় যে রাসসুন্দরী কবিতা রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

॥ ৭ ॥

রাসসুন্দরী তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে তাঁর ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবন ক বিবৃত করেছেন। কাজেই রাসসুন্দরীর গ্রন্থ কেবল প্রথম আত্মজীবনী নয়, প্রথম পূর্ণাঙ্গ রচনাও বটে। বিদ্যাসাগরের গ্রন্থে তাঁর ছাত্রজীবন পর্যন্ত, দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্রের আত্মচরিত 'প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত', দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে ১৮ বৎসর হইতে ৪১ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত' বর্ণিত হয়েছে। রাজনারায়ণ বসুর গ্রন্থ বাদ দিলে রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন' ঊনিশ শতকের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ আত্মচরিত।

জনসন মনে করতেন 'every man's life may best be written by himself'। রাসসুন্দরীর গ্রন্থ তার জ্বলন্ত স্বীকৃতি।
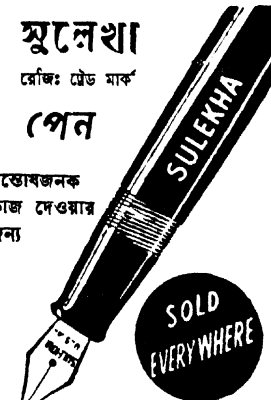
পুস্তক পরিচয়

অর্থনীতির কথা

সমবায় নীতি: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্ব-বিদ্যা সংগ্রহের শততম সংখ্যাস্বরূপ বিশ্ব-ভারতী কর্তৃক প্রকাশিত। দাম আট আনা।

রাজনীতির জটিল আবর্ত থেকে কবিরা সাধারণত দূরে থাকতেই ভালোবাসেন। দ্বন্দ্ব কলহের ধুলোটে কাব্যলক্ষ্মীর আসন মলিন হয়ে পড়ে। সেইজন্যই কবিদের গজদন্ত-মিনারে বাস এমন কথা প্রচলিত আছে। কিন্তু একথা কবিদের পক্ষে সাধারণত সত্য হলেও সকল কবির পক্ষে সত্য নয়, বিশেষত মহাকবিদের পক্ষে। রাজনীতিরও রকমফের আছে। তার বাইরের দিকে থাকে ঈর্ষা-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, থাকে নানারকম কৌশল, ক্ষমতা-অধিকারের নানা চেষ্টা বা অপচেষ্টা। কিন্তু রাজনীতিতেও সেই কথাটাই সবটা নয়। কারণ মানুষের মৌলিক চিন্তা ভাবনার একটা দুর্বার স্রোত আছে, সেই স্রোত ধীরে ধীরে—এমন কি নিজের অজ্ঞাতেও একটি ধারা রচনা করে চলতে থাকে। সেই ধারাকে অস্বীকার করে চলা কোনও রাজনৈতিক কৌশলীর পক্ষেই সম্ভব নয়। ইতিহাসের গতি শেষ পর্যন্ত এইরকম বৃহৎ দুর্বার মৌলিক স্রোতের দ্বারাই নিয়মিত হয়ে থাকে। যে নেতারা সেই ধারার প্রকৃতি বুঝে তাকে ঠিক পথে চালাবার চেষ্টা করেন বা সে চেষ্টায় সফল হতে পারেন তাঁরাই শ্রেষ্ঠতম নেতা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকেন। আর যে নেতারা তাঁদের কলাকৌশল বা চাতুরীর জোরে সেই গতিকে অস্বীকার করতে চান তাঁরা শেষ পর্যন্ত তাতে সফল হো হন না, বরং ইতিহাসের পাতা হতে মহাকাল তাঁদের নাম নিশ্চিহ্ন মুছে দেয়। সেইজন্য যেখানে রাজনীতির বাইরের মহলে অনবরত ধুলোর ঝড় উড়তে থাকে সেখানকার দম বন্ধ করা আবহাওয়ায় কবিরা অস্বস্তি বোধ করতে পারেন বটে; কিন্তু তার পিছনে যে বৃহৎ মানসিক চিন্তাধারা ধীরে ধীরে কালে কালে রাজনীতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটায় সেখানে কবিদের স্থান সম্ভবত সকলের আগে। তাঁদের সূক্ষ্ম-সংবেদনশীল মনে বর্তমানকালের বেদনা ও ভবিষ্যতের আশা যেমন তীব্র তরঙ্গ তোলে তেমন অন্য লোকের মনে তোলে না। তাই যুগে যুগে কবিদের গানেই অনাগত-যুগের প্রথম চারণগীতি শোনা যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম ঘটনা বার বার দেখা গিয়েছে। মিলটন শেলি হতে বহু কবিই তার প্রমাণ।

যেসব দেশে প্রচুর শিক্ষা আছে, জনসাধারণ রাজনীতিতে বহুকাল অভ্যস্ত এবং তাদের অধিকার সম্বন্ধে খুব সজাগ, সেসব দেশের পক্ষে একথা যতখানি সত্য, অনগ্রসর দেশের পক্ষে একথা আরও বেশি সত্য। বহুদিন যেসব দেশ নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ছিল আজ প্রচণ্ড রূঢ় নাড়া খেয়ে তারা জেগেছে। যে জীবনযাত্রায় তারা নিরুদ্বিগ্নে কালযাপন করেছে আজ সে জীবনযাত্রা পর্যুদস্ত। যে সমস্ত বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে তারা এতকাল চলে এসেছে সে সমস্ত বিশ্বাস আজ লুপ্ত। যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে তাদের নিস্তরঙ্গ জীবন ধীরগতিতে চলত আজ সে কাঠামো নেই। তার উপর পড়েছে মানুষ হিসেবে তাদের আত্মসম্মানে আঘাত। পৃথিবীতে পদানত থাকবার জন্যই কি আমাদের জন্ম? এমন বিধান চলতে পারে না। তাই য়ুরোপ যখন তার বিজ্ঞানবুদ্ধির বলে সমস্ত পৃথিবীময় প্রভুত্ব অর্জন করে তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধার আহার সংগ্রহে রত ছিল তখন তার সেই বিজ্ঞানবুদ্ধির মধ্যেই তার মারণাস্ত্র লুকিয়ে ছিল। বিজ্ঞানবুদ্ধির বলে, কয়েকটি দেশ সকল দেশকে পদানত করে স্বকীয় স্বার্থে তাদের শোষণ করবে এমন বিধান বিধির বিধান নয়। সাম্রাজ্য এইরকম সর্বগ্রাসীর আহারে যখন সমস্ত সত্য মথিত হতে থাকে তখন চিত্তের যে উদ্বোধন ঘটে তা একমুখীন নয়, তা সর্বাঙ্গীণ। স্বদেশী আমল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন, "ইংরেজের সহিত সংঘর্ষে আমাদের অন্তরে যে একটি উত্তাপ সঞ্চার করিয়া দিয়াছে তাহাতে আমাদের মুমূর্ষু জীবনীশক্তি পুনরায় সচেতন হইয়া উঠিতেছে।" এই জীবনীশক্তির উদ্বোধন কবির হাতে ঘটেই স্বাভাবিক। বিশেষত মহাকবির হাতে এবং রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবির হাতে। একালের বাঙালীর সমস্ত মনোময় ও বাঙ্ময় জগতের কেন্দ্রস্থ তিনি, তাঁর মনের আকাশে বিশ্বজগতের পরিবেশে সুদূর বিপুল ভারতবর্ষ, ইতিহাসের ভারতবর্ষ, ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ, মাটির মানুষের ভারতবর্ষ নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। কাজেই এই সর্বাঙ্গীণ উদ্বোধনের পুরোভাগে রবীন্দ্রনাথ থাকবেন সেইটেই স্বাভাবিক। স্বদেশী আমলে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে খুব সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে এই কারণেই বিস্ময়ের কারণ নেই। তার পরে রাজনীতির ধারা এদেশে অনেক এগিয়ে চলেছে, নানারকম বদল ঘটেছে, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মত সব সময় মেলে নি। 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধ এবং চরকা সম্বন্ধে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ। সে সময় রাজনীতির উন্মত্ততায় কবির সাবধানবাণী আমাদের সব সময় ভাল লাগেনি। অধৈর্যের চণ্ড বেগে আমরা তাড়িত হয়েছি। কবির মৌলিক কথা শুনবার অবকাশ, হয়তো আমাদের ছিল না। কিন্তু তার ফল আজ

আমরা প্রত্যক্ষ করছি। মানুষ না গড়ে জনতা গড়বার ভুলের মাশুল আজ আমাদের দিতে হচ্ছে। গান্ধীজীও একথা বলেন নি তা নয়, গঠনকর্মের দিকে তাঁর এত আগ্রহ এই কারণেই ছিল। কিন্তু তাঁর কথাও আমরা গ্রাহ্য করি নি। রবীন্দ্রনাথ এসব কথা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও স্পষ্টভাবে বহুকাল আগেই বলেছিলেন। "আগুনে লাগলে আগুন নেবানো চাই, একথাটা আমার মতো মানুষের কাছেও দুর্বোধ নয়। এর মধ্যে দুরূহ ব্যাপার হচ্ছে কোনটা আগুন সেইটে স্থির করা, তার পরে স্থির করতে হবে কোনটা জল"—এই হল রবীন্দ্রনাথের কথা। সেইজন্যই তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন "ছাইটাকে আমরা যদি আগুন বলি তা হলে ত্রিশ কোটি ভাঙা কুলো লাগিয়েও সে আগুনে নেবাতে পারব না।... বিদেশী আমাদের রাজা, এটাও আগুন নয়, এটা ছাই; বিদেশীকে বিদায় করলেও আগুন জ্বলবে, এমন কি স্বদেশী রাজা হলেও দুঃখদহনের নিবৃত্তি হবে না।" একথার নিদারুণ সত্যতা আজ আমরা অনুভব করছি। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসংগেই বলেছিলেন, "ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণের মনের ক্ষেত্র কর্ষণ করে বিচিত্র ও বিস্তীর্ণভাবে বুদ্ধিকে ফলিয়ে তুলতে পারলে, তবেই সে সভ্যতা মনস্বী হয়।" হয়তো আরও কিছুকাল নানা আঘাত পাবার পর তাঁর এ কথাটির সত্যতাও আমরা অনুভব করতে পারব।

সেই কারণে সমবায় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলি একত্রে গ্রথিত করে 'সমবায় নীতি' নামে একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করে বিশ্বভারতী সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। স্বাধীনতা লাভের পরে আমাদের রাষ্ট্রকে সমবায়মূলক করে তুলতে হবে একথা বহুবার বিঘোষিত হয়েছে। সমবায়মূলক রাষ্ট্র গড়বার নীতিও আমরা গ্রহণ করেছি। এই অবস্থায় সমবায়ের প্রকৃত রূপ কি, তার প্রয়োজন কেন, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনা এই পুস্তিকাটিতে একত্রিত হওয়ায় এ সম্বন্ধে কবির চিন্তার সহজে পরিচয় পাবার সুযোগ সকলের ঘটল। বিশেষত এর কয়েকটি রচনা বহুকাল হতেই দুষ্প্রাপ্য ছিল। পুস্তিকাটিতে ভূমিকা ও পরিশিষ্ট ছাড়া সমবায় সম্বন্ধে দুটি প্রবন্ধ এবং [illegible] সমবায়ের [illegible] এবং সমবায়নীতি নামে আরও দুটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। [illegible] আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যে সকল ক্ষেত্রে [illegible] [illegible] আছে সেইখানেই সকলের [illegible] [illegible] যেখানেই অজ্ঞান বা অক্ষমতার [illegible] [illegible] কোনো বাধা ঘটে সেইখানেই [illegible] পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই [illegible] এই বাধা ঘটে। সে হচ্ছে [illegible] কাছে। এইখানেই [illegible] সামাজিক শক্তি [illegible] যায়।" রবীন্দ্রনাথের কথায় "যেখানে মূলধন ও মজুরির মধ্যে [illegible] আছে সেখানে [illegible] পদে পদে [illegible] হতে বাধ্য।......এইজন্যে, যথার্থ পরিমাণ স্বাধীনতাকে সর্বসাধারণের সম্পদ করে তোলবার মূল উপায় হচ্ছে ধন অর্জনে সর্বসাধারণের শক্তিকে সম্মিলিত করা। তা হলে ধন টাকা-আকারে কোনো একজনের বা এক সম্প্রদায়ের হাতে জমা হবে না; কিন্তু লক্ষপতি ক্রোরপতিরা আজ ধনের যে ফলভোগ করবার অধিকার পায় সেই ফল সকলেই ভোগ করতে পারে। সমবায়-প্রণালীতে অনেকে আপন শক্তিকে যখন ধনে পরিণত করতে শিখবে তখনই সর্বমানবের স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপিত হবে।"

আমাদের দেশের অবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এদেশে "তখনকার কালে ঐশ্বর্যের ভোগ একান্ত সংকীর্ণভাবে ব্যক্তিগত ছিল না। এক-একটি মূল ঐশ্বর্যের ধারা থেকে সর্বসাধারণের নানা ব্যবহারের বহু-শাখাবিভক্ত ইরিগেশন-ক্যানালগুলি নানা দিকে প্রসারিত হত।......আগে গ্রামে গ্রামে একটি সর্বস্বীকৃত সহজ ব্যবস্থায় ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ সকলের মধ্যেই যে একটা সামাজিক যোগ ছিল বাইরের আঘাতে এই সামাজিক স্নায়ুজাল খণ্ড খণ্ড হওয়াতে গ্রামে গ্রামে আমাদের প্রাণদৈন্য ঘটল।......মানুষের ভিতরে যে সত্য তার মূলে হচ্ছে তার ধর্মবুদ্ধিতে; এই বুদ্ধির জোরে পরস্পরের সঙ্গে মানুষের মিলন গভীর হয়, সার্থক হয়। এই সত্যটি যখনই বিকৃত হয়ে যায়, দুর্বল হয়ে পড়ে, তখনি জলাশয়ে জল থাকে না, তার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ফলে না, সে রোগে মরে, অজ্ঞানে হয়ে পড়ে। মনের যে দৈন্যে মানুষ আপন অন্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে সেই দৈন্যেই সকল দিকেই মরতে বসে, তখন বাইরের থেকে কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না।" [illegible] গুলি ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের [illegible] শহরের কিছু কিছু অভ্যুত্থান হয়েছে কিন্তু এ শহরগুলি গ্রামের [illegible] প্রতিষ্ঠিত নয়। "যত কিছু সুবিধা সুযোগ যত কিছু ভোগের আয়োজন, সমস্ত [illegible] পুঞ্জিত হয়। গ্রামগুলি দাসের মতো [illegible] জোগায় এবং তার পরিবর্তে [illegible] ধারণ করে মাত্র। [illegible] একটা [illegible] [illegible] আর একদিকে [illegible] এ অবস্থার প্রতিকার [illegible] রবীন্দ্রনাথ [illegible] [illegible]

আজ আমাদের সমবায় [illegible] [illegible] আর্দশিত হচ্ছে। [illegible] হবার পথ এখনও স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে নি। এইসময় [illegible] আমাদের ভাবক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধান দেবে।

শ্রী[illegible]

২১২।৫৮

বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস—শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য প্রণীত; প্রকাশক—ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২; মূল্য ৫, টাকা।

বাংলার পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ইতিহাসই এখন পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয় নাই। সেই হিসাবে উহার অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস দুঃসাহস বলা চলে। আলোচ্য পুস্তকের গ্রন্থকার এই বিষয়ে সচেতন। এজন্য আলেকজাণ্ডারের সময়ের পূর্বেকার বাংলা ও বাঙগালীর অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কোন গবেষণা না করিয়া তিনি আলোচ্য পুস্তকে গুপ্ত পূর্ব যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃটিশ যুগ পর্যন্ত সময়ে বাঙগলার অর্থনীতিক ক্ষেত্রের বিবিধ দিকের একটা পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টায় তিনি সম্পূর্ণ

কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। মুসলমান রাজত্বের সময় হইতে বৃটিশ যুগের প্রথম অবস্থা পর্যন্ত সময়ে বাংলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকের উপর এই পুস্তকখানা বিশেষভাবে আলোকপাত করিয়াছে। বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের ভূমিকা হিসাবে পুস্তকখানা একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া দাবী করিতে পারে।

গ্রন্থকারের নিকট আমাদের একটি নিবেদন রহিয়াছে। এক সময়ে বাঙ্গলার পণ্যবাহী জাহাজ পণ্যসম্ভার লইয়া দেশ বিদেশে যাতায়াত করিত। বাঙ্গলায় নির্মিত জাহাজ এক সময়ে ইউরোপীয় দেশসমূহে সুপরিচিত ছিল। ইংরাজ আমলের সূত্রপাতে বাঙ্গালী প্রধানগণ ব্যাঙ্ক, জাহাজ কোম্পানী এমন কি রেলপথ পর্যন্ত গড়িয়াছিলেন। ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের বেনিয়ান হিসাবে বাঙ্গালীরাই প্রধান ছিল। বাঙ্গলা ও বিহারের কয়লার খনিগুলি বাঙ্গালীর চেষ্টাতেই উন্মুক্ত হয়। [illegible] বাঙ্গালীর প্রায় একচেটিয়া ছিল। আমদানী ও রপ্তানি বাণিজ্যেও তখন বাঙ্গালী অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। বাঙ্গলার মসলিন ও সূতীর শিল্পজাত দ্রব্য এবং অন্যান্য দ্রব্য [illegible] সমগ্র জগতের বিস্ময় অর্জন করিয়াছিল। [illegible] ইতিহাস [illegible] গ্রন্থকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। ২২২।৫৪

উপন্যাস

পান্থপাদপ: প্রভাবতী দেবী সরস্বতী; [illegible] পাবলিশার্স, ১৩৩।১, [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৩্।

[illegible] রচিত একখানি উপন্যাস। লেখিকা যে পরিকল্পনায় কাহিনীর শুরু করেছেন শেষ পর্যন্ত সেই [illegible] নয়, এঁর মেয়ে [illegible], [illegible] পুলিশ অফিসার [illegible], মধুসূদন প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে অবলম্বন করে পেশ করতে সক্ষম হলেও একঘেয়েমির হাত থেকে রেহাই দিতে পারেননি। পরিবর্তনশীল আধুনিক জগতে বাস করেও [illegible] যুগের অনেক লেখক-লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গী যে বিশেষ প্রসারলাভ করেনি তারই আদর্শ উদাহরণ এই উপন্যাসটি। চলতি ভাষা ব্যবহারে লেখিকা মোটামুটি উৎরে গেলেও 'দিবার', 'চাচ্ছি', 'মুজরা' (মুজরি) ইত্যাদি অনেক শব্দের ব্যবহার আবার সুললিত নয়। বইটির ছাপা ও বাঁধাই মনোরম। ১৪২।৫৪

সহচরী: রতীশচন্দ্র দাশ; প্রকাশক—প্রভাবতী প্রকাশনী, ১৪, শোভারাম বসাক স্ট্রীট, কলিকাতা—৭। মূল্য—১৷৹।

ছবি ও কবিতা দুই সহচরী। শেষ অবধি কল্যাণময় পথে ছবি কী করে কবিতার প্রতি সখীর কর্তব্য পালন করল তাই বর্ণিত হয়েছে। কাহিনী, পরিবেশ ও চরিত্র-চিত্রণ মামুলী ধারায়। পড়তে অবশ্য নেহাৎ খারাপ লাগে না। ১৬৪।৫৪

তুমি কোথায়: মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়; প্রকাশ—কারেন্ট বুক শপ, ৫৭-এ, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—৩্।

ইদানীং বাঙ্গলা ভাষায় এক শ্রেণীর লেখকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে যাঁদের লক্ষ্য রচনার উৎকর্ষের চেয়ে গ্রন্থকার হবার বাসনা। আলোচ্য উপন্যাসটিও চর্বিতচর্বণ ছাড়া কিছুই নয়—ছককাটা পথে কাহিনীর অগ্রগতি ও মিলনান্তর বেশ নিয়ে যবনিকাপাত। প্রথম দিকে উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার কৈশোর অবস্থার চপলতার সঙ্গে লেখকেরও ছেলেমানুষী প্রকাশ পেয়েছে। কাহিনীর পরিকল্পনা দুর্বল হলেও পরিবেশনা চলনসই—ভাষায় ইচ্ছাকৃত চাকচিক্য না থাকলে আরও হৃদয়গ্রাহী হত। ১১৭।৫৪

কিশোর সাহিত্য

পঞ্চশিখা: গৌরেন্দ্র সাহা; প্রাপ্তিস্থান—আনন্দ পাবলিশার্স, ১৮-বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—১৷৷৹।

সতী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ও বেহুলা—এই পাঁচজন আদর্শ ভারতীয় নারীর জীবনকাহিনী সংক্ষেপে সরল ও চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বইখানি পড়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা আনন্দলাভ করতে পারবে ও সেই সঙ্গে সাধারণ পাঠিকারাও পৌরাণিক যুগের এইসব মহীয়সী নারীদের নানাগুণের পরিচয় পেয়ে পারিবারিক জীবনে উপকৃত হতে পারবেন। ২০৩।৫৪

সাধক-জীবনী

শ্রীশ্রীবন্ধুতত্ত্ব সুধানিধি ও বন্ধু সুন্দরের উপদেশামৃত—প্রেমদাস ব্রহ্মচারী সঙ্কলিত। মহানাম সম্প্রদায় কর্তৃক ৫৯, মানিকতলা মেইন রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৷৹ টাকা।

ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ প্রেমদাসজী ফরিদপুরস্থ প্রভু জগদ্বন্ধুর শ্রীঅঙ্গনের সেবাইত। প্রভু জগদ্বন্ধুর পত্র, তাঁহার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রাচীন ভক্ত মুখে শ্রুত প্রভুর আদেশ ও উপদেশ মুখ্যভাবে অবলম্বন করিয়া তিনি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ভাগে প্রভুর আদেশ ও উপদেশ এবং দ্বিতীয়ভাগে অনুকূল যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্রভুর আদেশ, উপদেশ ও আচরণ হইতে মানব জীবনের কর্তব্য নির্ধারণের প্রয়াস। বলা বাহুল্য, এই দুই কাজের কোনটিই সহজ নয়। প্রভু জগদ্বন্ধুর ন্যায় মহামানবগণ স্বতন্ত্র পুরুষ। ইঁহারা কখন কোথায় থাকেন এবং কাহাকে কি

...১১-এ, হাজরা রোড, কলিকাতা হইতে ...শিত। মূল্য ৩॥০ টাকা।

...শাস্ত্র পাঠে এবং অর্থানুপ্রবেশে ...রণের পক্ষে ন্যায়, নীতি, ঔচিত্য ...চিত্য সম্বন্ধে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশ্ন ..., আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সেইরূপ ...য়ের নিরসন করা হইয়াছে। লেখকের ... ও বিশ্লেষণ ভঙ্গী সুন্দর এবং ...চীন যুক্তি বিন্যাসে তাঁহার দক্ষতা ... পরিলক্ষিত হয়। পুস্তকখানি ...কারের প্রভূত পাণ্ডিত্য এবং নিষ্ঠা-...র পরিচায়ক। গ্রন্থকার মণ্ডণকে ভিত্তি ...ই খণ্ডন করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার ...চনায় ভগবৎ-প্রীতির প্রগাঢ় স্পর্শ প্রাণে ...যায়। পুস্তকখানি পাঠ করিলে ...ই উপকৃত হইবেন। ছাপা, বাঁধাই ..., শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীমৎ ... [illegible]জীর দুইখানি ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত ... [illegible] ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, ... [illegible], রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজীর ...নীন সদৃশ্য চিত্রে গ্রন্থখানি সুসজ্জিত।

২১১।৫৪

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—(১৩শ খণ্ড)— [illegible] প্রণীত। গীতা প্রচার [illegible], ১০০।১১, মনোহরপুকুর রোড, [illegible] কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। [illegible]

[illegible] কারণ সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষানুভূতির [illegible] হইয়া থাকে।

২৩৭।৫৪

...ধ

কাঞ্চনজঙ্ঘার ঘুম ভাঙ্গছে—সত্যেন্দ্র-... মজুমদার। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী ... কলিকাতা—১২। মূল্য—এক টাকা চার ...

...গাধিরাজ হিমালয় ভারতের যুগ-যুগান্তের প্রহরী। অতীতকালের আবর্তন-বিবর্তনের নীরব সাক্ষী। শুধু রাজনৈতিক বিপর্যয়ই নয়, সামাজিক ভাঙা-গড়ার কাহিনীও রূপায়িত হয়েছে তুষারমৌলী এই পাষাণদেবতার সামনে। ভারতের ঐতিহ্যের প্রতীক, বহু শতাব্দীব্যাপী অতন্দ্র প্রহর কাটিয়েছে বুঝি ভারতেরই কল্যাণ মানসে। এই মহাদেশের ইতিহাস আর ধর্মকাহিনীর সঙ্গে, উপকথা আর রূপকথার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়ানো এই পর্বতপ্রহরীর জীবন। ভারতের কৃষ্টিগত জীবনেও এর দাম কম নয়।

"কাঞ্চনজঙ্ঘার ঘুম ভাঙছে।" নাম শুনে স্বতঃই মনে হয় বৈদেশিক শাসনের অবসানে নতুন সূর্যের অভ্যুদয়ে বুঝি চঞ্চল হয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। গঙ্গা-যমুনার উদ্বেলিত প্রবাহ বেয়ে নেমে আসবে পূত আশীর্বাদ। হিমালয়শৃঙ্গের অন্তর্নিহিত নিদ্রাতুর আত্মা আজ সজীব হয়ে উঠবে। কিন্তু মিথ্যা আশা। হিমালয়ের সানুদেশে অবস্থিত চা-বাগানের হাজার হাজার শ্রমিকের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কাহিনী। ধর্মঘট, অন্তর্বিপ্লব, ইউনিয়নের পত্তন, কংগ্রেসী সরকারকে বিপর্যস্ত প্রভৃতির চোরা সিঁড়ি বেয়ে উঠে উঠে বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। সংগ্রামী জনতার প্রাণ-স্পন্দন নয়, রাজনৈতিক মতবাদপিষ্ট সরল শ্রমিকদের অন্তিম আর্তনাদ।

রাজনৈতিক বুকনীভরা উদ্দেশ্যমূলক এমন একটি গ্রন্থ সাহিত্যপদবাচ্য তো নয়ই, দলীয় পোস্টারের অন্য এক রূপ মাত্র।

১৭৯।৫৪

Hindusthan Year—Book, 1954—S. C. Sarkar, M. C. Sarkar & Sons Ltd., 14, Bankim Chatterjee Street, Calcutta.-2.

এম সি সরকার এণ্ড সন্সের বর্ষপঞ্জী সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১৯৫৪ সালের বর্ষপঞ্জী সেই গৌরব সমধিক বর্ধিত করিবে। 'রাজনৈতিক সংজ্ঞাসমূহের অভিধান' এই শীর্ষক পরিচ্ছেদটি কয়েক বৎসর বন্ধ করা হইয়াছিল, আলোচ্য সংস্করণে তাহা পুনরায় সংযোজিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। বর্তমান সমাজ-জীবনে ব্যবসা-বাণিজ্য সংবাদপত্র সংক্রান্ত কাজকর্মে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহের সর্বদাই প্রয়োজন হইয়া থাকে, পারিবারিক ক্ষেত্রেও সে প্রয়োজন না দেখা দেয়, এমন নয়। এমন একখানা সর্বাঙ্গ সম্পন্ন বর্ষপঞ্জী হাতের কাছে থাকিলে সে অভাব সহজেই পূরণ হইবে। বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপকতায়, বিন্যাসে এবং সঠিক তথ্যের সন্নিবেশপটুতায় এই বর্ষপঞ্জী যে কোন উচ্চ শ্রেণীর বিদেশী বর্ষপঞ্জীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে। ছাপা, কাগজ সবই সুন্দর।

প্রাপ্তি-স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

প্রবন্ধ সংগ্রহ (২য় খণ্ড)—প্রমথ চৌধুরী
বৈশেষিক দর্শন—শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য
প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান—প্রমথ চৌধুরী
গ্রন্থাগার—শ্রীবিমলকুমার দত্ত
সপ্তপদা—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
চণ্ডীদাস—ভবানীপ্রসাদ চক্রবর্তী
সহজ মানুষ—পশুপতি ভট্টাচার্য
চীনের উপকথা—অনুবাদক-শ্রীজয়ন্তকুমার
তির্মিরাভিসার—হরপ্রসাদ মিত্র
শ্রীগদাধর (নাটক)—শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
বিয়ের আগে—শ্রীশম্ভু ভদ্র
চণ্ডীমঙ্গলের গল্প কালকেতু—শ্রীপ্রহ্লাদ-কুমার প্রামাণিক ও শ্রীকালিদাস রায়।
সমাজ—রমেশচন্দ্র দত্ত
অ্যাডভেঞ্চার অব টার্জন—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
উদ্বোধন শ্রীশ্রীমা (শতবর্ষ জয়ন্তী সংখ্যা)—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ
উদ্বাস্তুর নির্বাসন—শ্রীনিত্যগোপাল রায়

গুয়াতেমালা

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

বহুদিন আমরা কোরিয়ার লড়াইয়ের খবর শুনেছি। শুধু খবর শুনেছি নয়, কোরিয়ার লড়াইয়ের প্রত্যক্ষ ফলও আমাদের মর্মে মর্মে অনুভব করতে হয়েছে। তাই একদিন ওখানে যখন ঘটা করে যুদ্ধ বন্ধ হ'ল তখন আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ভাবলামঃ একটা বিপদ কাটানো গেল। এবার বেশ কিছুদিন শান্তিতে কাটানো যাবে। কিন্তু খোদ শান্তিদেবীরই বিধি বাম, অন্য পরে কা কথা! কোরিয়ার যুদ্ধ থামতে না থামতেই তাই লড়াই শুরু হল ইন্দোচীনে। সেখানে লড়াই এখন চরম পর্যায়ে, তাই পাঁয়তারা কষা হচ্ছে যুদ্ধ বিরতির। কিন্তু যুদ্ধ এখনও চলছে। কি হবে বলা যায় না। এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল গুয়াতেমালার হাঙ্গামার। কোরিয়া আর ইন্দোচীনের মত এটাও গৃহযুদ্ধ আর পেছনে রয়েছে দুটি বৃহত্তর শক্তির উস্কানি। তাই এই লড়াই কোনখানে গিয়ে শেষ হবে বলা কঠিন। বিশ্বের লোকেরই বিপদ!

গুয়াতেমালায় লড়াই বাঁধবার কারণ নিয়ে আলোচনা করার আগে দেশটার সম্বন্ধে কিছু জেনে নেওয়া দরকার। তাতে আজকের এই গৃহযুদ্ধের কারণটা বুঝতে সুবিধা হবে।

মধ্য আমেরিকা ছয়টি প্রজাতন্ত্র নিয়ে গঠিত। এদের নাম, হচ্ছেঃ পানামা, কোস্টারিকা, নিকারাগুয়া, হোণ্ডুরাস, স্যালভেডর আর গুয়াতেমালা। এর মধ্যে গুয়াতেমালাই হচ্ছে খুব জনবহুল। এর লোকসংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ। আয়তন প্রায় সুইজারল্যাণ্ডের তিন গুণ। মধ্য আমেরিকায় গুয়াতেমালাই হচ্ছে দ্বিতীয় বৃহত্তর দেশ। এর পূর্বে হচ্ছে বৃটিশ হোণ্ডুরাস আর ক্যারাবিয়ান সাগর, পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর, উত্তরে মেক্সিকো আর দক্ষিণে স্যালভেডর আর হোণ্ডুরাস।

গুয়াতেমালার মোট জনসংখ্যার শতকরা অন্তত ৬০ ভাগ হচ্ছে ইণ্ডিয়ান, ৩০ ভাগ হচ্ছে শ্বেত ও ইণ্ডিয়ান জাতির সংমিশ্রণে সৃষ্ট সংকর জাতি, ৫ ভাগ নির্ভেজাল শ্বেত জাতি আর বাকী ৫ ভাগের কিছু নিগ্রো আর কিছু অন্যান্য জাতি। ঐ সংকর জাতিদের বলা হয় মেস্‌টিজো অর্থাৎ দো-আঁসলা। দাস-ব্যবসায় যখন খুব চলতি ছিল তখনই নিগ্রোদের এখানে আমদানি করা হয় কফি আর কলার চাষের জন্য। ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে

গুয়াতেমালার স্থানচিত্র

মায়া জাতির কিছু কিছু লোক দেখতে পাওয়া যায়। এরা দেখতে খ কিন্তু ভারী মজবুত আর খাটিয়ে। কারুকার্যের পরিচয় এখনও গুয়াতে দেখতে পাওয়া যায়।

গুয়াতেমালা পাঁচটি অংশে বি এখানে জলাভাব প্রায় নেই। দেশে ক কয়েকটি হ্রদ, তার গাঢ় নীল জল অদূরস্থিত সপ্ত আগ্নেয়গিরি মিলিয়ে নাকি একটা অপরূপ সৌন্দ সৃষ্টি করেছে। গুয়াতেমালার জলব খুব স্বাস্থ্যকর।

গুয়াতেমালায় সোনা, রূপা, দ টিন, পারা, কয়লা, লবণ আর গন্ধক ইত খনিজ দ্রব্য এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় অরণ্য সম্পদও এর কম নয়। রঙ করার প্রয়োজনীয় কাঠ ছাড়াও আসবাবের প্রয়োজনীয় সিডার, মেহগনী প্রভৃতি দা কাঠও এখানে পাওয়া যায়। ফল, শস্য ও ওষধি বনস্পতিও এখানে প্রচুর জন্মে।

কোকো, ইক্ষু, কমলানেবু, সিনকো তামাক, নীল, রবার ইত্যাদি ছাড়া কফি ও কলা এখানে প্রচুর হয়। এককালে গুয়াতে মালায় কফি উৎপাদনই ছিল প্রধান শিল্প দেশের মোট রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে শতকরা ৭০।৮০ ভাগই ছিল কফি। পরবর্তীকালে কফির দাম পড়ে যাওয়ায় কদলী চাষের উপরই জোর দেওয়া হয়। কদলী উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি পায় এবং অন্য দেশে জাহাজ চলাচলের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ এই শিল্পটি জাতীয় আয় বৃদ্ধির প্রধান সহায়ক হয়। তাই গুয়াতেমালাকে বলা হয় 'কদলী প্রজাতন্ত্র'। গুয়াতেমালায় মোট ৪৬৪৯৮ একর জমিতে কলার চাষ হয়।

গুয়াতেমালায়, শুধু গুয়াতেমালায় কেন, সারা মধ্য আমেরিকায় কদলী চাষের একচেটিয়া অধিকার হল ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানী নামক একটি প্রতিষ্ঠানের। এর মালিক হল বিদেশী। এরা এক গুয়াতেমালাতেই ১৬ হাজার একর জমির মালিক। এই পরিমাণ জমিতে কলার চাষ করা ছাড়াও অন্যদের কাছ থেকে এরা কলা কিনে নেয় (এক ১৯৩৭ সালেই প্রায় ৬৬৩১৭৪ ডলারের কলা এরা অন্যদের কাছ থেকে

মায়াজাতি অধ্যুষিত একটি অঞ্চল

নিয়ে ছিল)। এদের অধীনে প্রায় ৫ হাজার কর্মী খাটে। কোম্পানী ঐ সব কর্মীদের বেতন দেয় বৎসরে প্রায় সাড়ে সতর লক্ষ ডলার। আর সরকারকে বাৎসরিক কর দেয় ৫ লক্ষ ডলার।

কাঁচামালের দিক থেকে এত সমৃদ্ধিশালী হলেও দেশের লোকগুলো কিন্তু বড্ড গরীব। বিপদ সেখানেই এবং বিপত্তির আরম্ভও সেখান থেকে।

এবার গুয়াতেমালার পুরনো ইতিহাসে আসা থাক।

সে প্রায় ৪ শত বৎসর আগের কথা। গুয়াতেমালা তখন ঘন বনজঙ্গলে আবৃত। ইণ্ডিয়ানরা তার একচ্ছত্র মালিক। সেই সময় হেরনানডো কোর্টেসের সহকারী ও প্রতিনিধি হিসেবে পেড্রো ডি এলভারডো নামক ব্যক্তি মেক্সিকোর ভিতর দিয়ে সৈন্য চালনা করে গুয়াতেমালা আক্রমণ করেন। ইণ্ডিয়ানরা তাঁকে বাধা দেয়, কিন্তু পরাজিত হয়ে স্পেনের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয় (১৫২২-২৩)। মেক্সিকো থেকে পানামা পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল দখল করে নিয়ে স্পেন তখন শোষণ ও শাসন দুই-ই চালাচ্ছিল। প্রায় তিনশ' বছর একটানা এই শাসন চলে। তারপর একদিন গুয়াতেমালা নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে। কিছু রক্তপাতের পর ১৮২১ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর গুয়াতেমালা স্বাধীন বলে স্বীকৃত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় মেক্সিকোর সম্রাট ইটারবি কর্তৃক বিজিত হয়ে তাঁর সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু দু' বছরের বেশী এই বিশাল সাম্রাজ্যটি টেকেনি। তাঁর মৃত্যুর পর মধ্য আমেরিকার পাঁচটি দেশ, কোস্টারিকা, নিকারাগুয়া, হোণ্ডুরাস, স্যালভেডর আর গুয়াতেমালা মিলে ১৮২৩ সালে নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করল এবং গঠন করল মধ্য আমেরিকা ইউনিয়ন। গুয়াতেমালার রক্ষণশীল দলের লোকেরা কার্যত পরিচালনা করতে লাগল এই ইউনিয়নকে। আর আর রাজ্যগুলির তা ভাল লাগল না। হোণ্ডুরাসই প্রথম ইউনিয়নের বাঁধন কেটে বেরিয়ে গেল। তারপর অন্যেরা। সকলেই নিজেদের স্বাধীন সত্ত্বা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল। হোণ্ডুরাসের পর নিকারাগুয়া আর কোস্টারিকা খসে পড়ল ইউনিয়ন থেকে। পরে ১৮৩৯ সালে গুয়াতেমালাও ইউনিয়ন পরিত্যাগ করল। এই হল গুয়াতেমালা তথা মধ্য আমেরিকান রাজ্যগুলির রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রথমাংশ।

দ্বিতীয়াংশে আমরা পাই ইউনিয়ন গড়ার চেষ্টায় পাঁচটি দেশের মধ্যে হানাহানি আর দেশে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল। সে হচ্ছে গুয়াতেমালা আর হোণ্ডুরাসের মধ্যে সংঘর্ষ। সম্প্রতি গুয়াতেমালার

কফি উৎসবের জন্য সজ্জিত একটি গরুর গাড়ি

উপর যে আক্রমণ হয়েছে তাও এসেছে হোণ্ডুরাসের দিক থেকে। যদিও সে দেশের কোন লোক নেই এই হামলায়, গুয়াতে-মালার লোকেই পরিচালনা করছে এই অভি-যান, তবু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই হামলা হোণ্ডুরাসের সাহায্যপুষ্ট এবং তার পিছনে রয়েছে বহুদিনের বিরোধের ইতি-হাস। যাক্।

ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর গুয়াতে-মালায় পৃথক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল এবং র‍্যাফায়েল ক্যারেরা তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। নূতন শাসনতন্ত্র চালু হল গুয়াতেমালায়। ক্যারেরা ক্ষমতা লাভ করে চার্চকে আবার তার পূর্ব ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। হোণ্ডুরাসের প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সিসকো মোরাজিনের তা ভাল লাগল না। তিনি গুয়াতেমালার ক্ষমতা খর্ব করার জন্য অভিযান চালালেন, কিন্তু পরাজয় বরণ করতে হল তাঁকে। ফলে ফাঁসীকাষ্ঠে তাঁকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হল।

ইউনিয়নকে জীইয়ে তুলে মধ্য আমে-রিকায় আপন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নানা দিক থেকে চলতে লাগল। ক্যারেরা একবার কোস্টারিকা আর নিকারাগুয়ার সহায়তায় স্যালভেডরকে দখল করে নিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর (১৮৩৯-৬৫) প্রেসিডেন্ট হলেন জেনারেল সার্না (১৮৫৬)। এ সময় লিবারেলরা দেশে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল। ফলে সার্নাকে পদত্যাগ করতে হল। ১৮৭৩ সালে জাস্টো রুফিনো ব্যারিওস গুয়াতেমালার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। তিনি ছিলেন লিবারেলপন্থী। তিনি সেই পুরাতন ফেডারেশনকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি আক্রমণ করলেন স্যালভেডর। কিন্তু যুদ্ধে তিনি নিহত হলেন। তারপরে প্রেসিডেন্ট হলেন ম্যানুয়েল ব্যারিলাস। তিনি প্রেসিডেন্ট হয়েই তাড়াতাড়ি স্যাল-ভেডর এবং মধ্য আমেরিকার অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে ফেললেন। এর পর ১৮৮৭ সাল, ১৮৯২, ১৮৯৫, ১৮৯৭ এবং ১৮৯৮ সালে বিভিন্ন প্রেসিডেন্টের শাসনকালে ইউনিয়নকে জীইয়ে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা হয়।

১৮৯৭ সালে ম্যানুয়েল এসট্রাডা ক্যাবেরেরা গুয়াতেমালার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। তিনি রাজত্ব করেছেন ১৯২০ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত। বৈপ্লবিক আন্দোলনের ফলে তাঁকে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করতে হয়। গুয়াতেমালার ডিক্টেটর হিসাবে তিনি রাজ্যের বহু উন্নতিসাধন করেন। তাঁর সময়েই দেশের শিক্ষা, রেলপথ আর শিল্পের বহুল উন্নয়ন সাধিত হয়।

১৯০৬ সালে আবার গুয়াতেমালার সঙ্গে মধ্য আমেরিকান দেশগুলির লড়াই বেধে যায়, কিন্তু প্রেসিডেন্ট রুজ-ভেল্ট এবং মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট দিয়াজ হস্তক্ষেপ করায় ব্যাপার বেশীদূর গড়াতে পারেনি। তাঁরা পাঁচটি দেশের প্রতিনিধি-দের নিয়ে ওয়াশিংটনে একটি বৈঠক বসান। এই বৈঠকের ফলে ১৯০৭ সালে কোস্টারিকা, হোণ্ডুরাস, স্যালভেডর আর গুয়াতেমালার মধ্যে একটা নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র আর মেক্সিকোর প্রেসিডেন্টগণ ঐ চুক্তির সর্তগুলিতে সম্মতিজ্ঞাপন করেন।

ইউনিয়নিস্ট আন্দোলনের ফলে ক্যাবেরেরা পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। জাতীয় পরিষদ কার্লো হেরেরাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেন। হেরেরা রাজ্যের পুনর্গঠনের কার্যে মনোনিবেশ করেন। তিনি হোণ্ডুরাস ও স্যালভেডরের সঙ্গে একটি চুক্তি করেন। ১৯২১ সালের ৭ই ডিসেম্বর লিবারেলরা তাঁকে গদিচ্যুত করেন। পরবর্তী মার্চ মাসে যোশি ম্যারিয়া ওরিলনা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর সময় গুয়াতেমালার নানা দিক থেকে উন্নতি হয়। তাঁর পরে জেনারেল লেজারো চাচন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু জেনারেল ম্যানুয়েল ওরিলনার বিদ্রোহের ফলে গদীচ্যুত হন। তাঁকে ফাঁসী দেওয়া হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে চুক্তি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন লাভ করতে না পারায় ওরিলনা পদত্যাগ করেন। তারপর জেনা-রেল জর্জ উবিকো ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ছ' বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন পুরাদস্তুর ডিক্টেটর। তাঁর সময় জনগণের অনেক অধিকার খর্ব করা হয়। তারপর আরও দুজন প্রেসিডেন্ট গুয়াতেমালা শাসন করেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় মহাসমর বেধে যায়। প্রথমে গুয়াতেমালা নিজেকে নিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করেন। পরে অবশ্য যুক্তর চাপে পড়ে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে ঘোষণা করতে হয়।

এই গেল গুয়াতেমালার রাজনৈ[illegible] ইতিহাসের আর একটি অধ্যায়। পরবর্তী অধ্যায় বলার আগে দেশের ব্যবস্থার কথা কিছু বলেনি।

বর্তমানে যে শাসনতন্ত্র গুয়াতেমালায় চালু আছে তা রচিত হয় ১৮৭৯ সালের ১১ই ডিসেম্বর। এর আগে মধ্য আমে-রিকান ফেডারেশন থেকে পৃথক হবার পর ১৮৫১ ও ১৮৭৬ সালে এই দুই শাসনতন্ত্র রচনা করা হয়।

যাঁরা গুয়াতেমালা প্রজাতন্ত্রে জন্ম করেছেন, অথবা যাঁদের পিতামাতা কেউ জন্মগ্রহণ করেছেন মধ্য আমেরিকার অন্যান্য অধিবাসী যাঁরা পাকাপাকিভাবে গুয়াতেমালায় থাকেন তারাই নাগরিক সুবিধা ভোগের অধিকারী। শিক্ষা এখানে বাধ্যতামূলক, ধর্মসম্পর্কহীন এবং এজন্য কোন অর্থব্যয় করতে হয় না। গঠনতন্ত্রে যেসব অধিকার দেওয়া হয়েছে বিপদের সময় শাসন কর্তৃপক্ষ তা রদ করে দিতে পারেন তবে তাঁর জন্যে মন্ত্রিসভার সমর্থন দরকার।

গুয়াতেমালায় আইন পরিষদ মাত্র একটি। দেশের প্রতি ৩০ হাজার লোকের জন্য মাত্র একজন নির্বাচিত হন ঐ পরিষদে। চারি বৎসর অন্তর জাতীয় পরিষদের সভ্যগণ জনপ্রিয় ভোটে নির্বাচিত হন। দুই বৎসর অন্তর অর্ধেক সদস্যের নির্বাচন হয়। জাতীয় পরিষদই প্রেসি-ডেন্টের জন্য ভোট সংগ্রহ করেন। রাষ্ট্রীয় পরিষদের ৭জন সভ্যের মধ্যে ৩জনকেই জাতীয় পরিষদ নির্বাচন করেন। বন্ধের সময় কাজ করার জন্যে নয়জন সভ্য নিয়ে গঠিত স্থায়ী কমিশনের ৮জনকে নিজেদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করে দেন।

শাসন ক্ষমতার অধিকারী প্রেসিডেন্ট। গণভোটে তিনি ছ' বছরের জন্য নির্বাচিত হন। এই ছ' বছর শেষ হলে পরে ১২ বৎসর আর তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনপ্রার্থী হতে পারেন না। অবশ্য তারপর তাঁর প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে দাঁড়াবার পথে কোন বাধা নেই। ভাইস প্রেসিডেন্ট বলে কোন পদ গঠনতন্ত্রে নেই।

প্রেসিডেন্টই মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তাঁদের কাজের জন্য প্রেসিডেন্টের কাছেই দায়ী থাকেন। পরিষদে যোগদান ও বিতর্কে অংশ গ্রহণের অধিকার তাঁদের রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় সভার সাতজন সদস্যের মধ্যে তিনজন প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত আর চারজন জাতীয় পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত। এটা নিছক উপদেষ্টা পরিষদ হলেও এর গুরুত্ব কম নয়। সদস্যেরা ৪ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

গুয়াতেমালার প্রেসিডেন্ট কর্নেল আর্বেঞ্জ ও তাঁর পত্নী। সম্প্রতি ইনি পদত্যাগ করেছেন

একটি সুপ্রীম কোর্ট, ছ'টি আপীল আদালত এবং কতকগুলি নিম্ন আদালত—এই নিয়েই বিচার বিভাগ। জনপ্রিয় ভোটে বিচারক নির্বাচিত হন। তাঁরা ৪ বছরের জন্য কর্মে বহাল থাকেন।

পৌরসভাগুলি পরিচালনা করেন মেয়র আর ভোটে মনোনীত একটি পরিষদ।

গুয়াতেমালার সৈন্যবাহিনী প্রধানত ইণ্ডিয়ান ও সংকর জাতির লোকজন দ্বারা গঠিত। ১৮ বছর হলেই সেখানকার সকল পুরুষ তরুণকেই সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। ১৯২৩ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী গুয়াতেমালা ও অন্যান্য মধ্য আমেরিকান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে চুক্তি হয় সেই চুক্তি অনুযায়ী গুয়াতেমালা ৫২০০ সৈন্য রাখতে পারে। তবে দেশে কর্মক্ষম সৈন্যের সংখ্যা প্রায় ৫৭০০ এবং রিজার্ভ সৈন্যের সংখ্যা ৩০,০০০।

এবার গুয়াতেমালার রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের তৃতীয় পর্যায়ে আসা যাক।

১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তিনজন বিপ্লবী অফিসার মিলে গুয়াতেমালাকে শাসন করেছেন। তা বলে তাঁরা যে গায়ের জোরে শাসন চালিয়েছেন তা নয়। গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র অনুসারেই তাঁরা শাসন কার্য পরিচালনা করেছেন। শ্রমিকদের জন্য একটা কোডও তাদের ছিল। সামাজিক নিরাপত্তার কিছু কিছু ব্যবস্থাও তাঁরা করেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যেও রাজ্যে ষড়যন্ত্রের অভাব হয়নি। কয়েকবার তা চরম অবস্থায় এসে দাঁড়ায়। কিন্তু বিশ্বে তা তেমন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারেনি।

তারপর প্রেসিডেন্ট হন কর্নেল জাকোবো আর্বেঞ্জ গুজম্যান। তিনি ক্ষমতা পাবার পরেই (১৯৫০ সালের নবেম্বর মাসে) গুয়াতেমালার আভ্যন্তরীণ ঘটনা আর তার দেশের চৌহদ্দির মধ্যে থাকেনি; তা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির রূপ ধারণ করে এবং যুক্তরাষ্ট্রও তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এর কারণটা কি?

কারণ হচ্ছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরই আমেরিকা বুঝতে পারে যে তার প্রধান শত্রু হচ্ছে রুশিয়া তথা কম্যুনিজম। একদিন তাকে তার বিরুদ্ধে লড়াই করতেই হবে এবং সে পরিপ্রেক্ষিতেই সে তার স্ট্র্যাটাজি ঠিক করে নেয়। এই স্ট্র্যাটাজিরই একটি অংশ হল মধ্য আমেরিকায় ও ল্যাটিন আমেরিকায় কম্যুনিজম ঠেকানো। কারণ পানামা ক্যানেল যদি কোন রকমে হাতছাড়া হয়ে যায়, তবে ল্যাটিন আমেরিকার প্রচুর কাঁচামাল আর সে নিরংকুশভাবে শোষণ করতে পারবে না। রাশিয়া এসে তাতে ভাগ বসাবে। সুতরাং মধ্য আমেরিকার কোন রাষ্ট্রে যেন কম্যুনিজম বাসা বাধতে না পারে। কিন্তু তার এত সতর্ক দৃষ্টি সত্ত্বেও অবস্থা তার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। মার্কিণ বিশেষজ্ঞদের মতে তার প্রথম বহিপ্রর্কাশ হল ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানীর উপর গুয়াতেমালার আঘাত।

পূর্বেই বলেছি গুয়াতেমালায়, শুধু গুয়াতেমালায় কেন সারা মধ্য আমেরিকান রাষ্ট্রসমূহে কদলী চাষ করার প্রায় একচেটে অধিকার ঐ ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানীর। বর্তমান প্রেসিডেন্ট ১৯৫২ সালের ১৭ই জুন যে জমি সংক্রান্ত আইন চালু করেন তাতে বহু জমি কোম্পানীর হাত ছাড়া হয়ে যায়, এতে মার্কিনী কর্তাদের টনক নড়ে। কোস্টারিকায় কদলী চাষের বিরুদ্ধে ধর্মঘট, হোণ্ডুরাসে ধর্মঘটও খুব তাৎপর্যমূলক বলে তাঁরা মনে করেন।

গুয়াতেমালার পররাষ্ট্রসচিব গুইলেরমো টোরিয়েলো

ঐ সব ধর্মঘটের উস্কানিদাতারা কম্যুনিস্ট বলে আমেরিকা মনে করে।

১৯৪৪ সাল থেকেই কম্যুনিস্টরা গুয়াতেমালার গবর্ণমেণ্টে ঢুকে পড়েছে বলে আমেরিকা সন্দেহ করত। কারণ সেই সময় থেকেই কতকগুলি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার দেশে প্রবর্তিত হয়। কম্যুনিস্ট পার্টি গুয়াতেমালান লেবর পার্টি নামে দেশের কোয়ালিশন সরকারে যোগদান করে। এতে শংকিত হয়ে মধ্য আমেরিকা ও ল্যাটিন আমেরিকাকে কি করে কম্যুনিস্ট প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা যায় তা আলোচনা করবার জন্যে আমেরিকা ২৯টি আমেরিকান প্রজাতন্ত্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের একটি বৈঠক ডাকেন। ক্যারাকাসে এই বৈঠক হয়। যুক্তভাবে কম্যুনিস্ট

ঠেঙাবার যে প্রস্তাব হয় একমাত্র গুয়াতেমালাই সে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন না। রাগ করে আমেরিকা গুয়াতেমালাকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেন। যদিও নিকারাগুয়া, হোণ্ডুরাস প্রভৃতি দেশ মার্কিন অস্ত্র ঢালাও ভাবে পেতে থাকেন।

এর পরে অবস্থা কিছুদিন শান্তই ছিল। সম্প্রতি গুয়াতেমালায় এক জাহাজ বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র গোপনভাবে আমদানি হয়। জানা গেছে এই অস্ত্র এসেছে রুশ প্রভাবিত পোল্যাণ্ড থেকে। প্রায় ১ কোটি ডলারের অস্ত্র গুয়াতেমালায় আমদানি করা হয়েছে। এত অস্ত্র আমদানির ফলে গুয়াতেমালা অস্ত্রশস্ত্রে খুব শক্তিশালী হয়ে গেল এবং তা ল্যাটিন আমেরিকার পক্ষে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করল বলে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

এইভাবে অস্ত্র আমদানির কথা গুয়াতেমালার কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করেননি। গুয়াতেমালার পররাষ্ট্রসচিব গুইলেরমো টোরিয়েলো বলেছেন যে, আমেরিকা আমাদের অস্ত্রশস্ত্র এমন কি ছোটখাট রিভলবার, বন্দুক সরবরাহ করতে অস্বীকার করার ফলে আমাদের পুলিশকেও অস্ত্রসজ্জিত করা এক সমস্যায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তাই বিদেশ থেকে ঐ ধরণের ক্ষুদ্র অস্ত্রাদি আমদানি করা ভিন্ন আমাদের উপায় ছিল না।

তাঁর একথা অবশ্য মার্কিন মুলুকের কর্তারা বিশ্বাস করেননি। ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানীর সঙ্গে সরকারের একটা বোঝাপড়া হলেই গুয়াতেমালা-মার্কিন মন-কষাকষি দূর হয়ে যাবে বলে তিনি যে বিবৃতি দিয়েছেন, তাতেও মার্কিন কর্তারা খুব গুরুত্ব আরোপ করেননি। তাঁরা বলেন, অবস্থা অনেকদূর গড়িয়েছে। এখন ফ্রুট কোম্পানীর সঙ্গে আপোষ করলে, এমন কি তাদের সব জমি ফিরিয়ে দিলেও কোন ফল হবে না।

জাহাজ বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর পর মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডালেস এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, গুয়াতেমালার সবাই যে কম্যুনিস্ট তা নয়। তবে বর্তমান সরকার কম্যুনিস্ট পরিচালিত লেবার পার্টি দ্বারা প্রভাবিত। এ অবস্থায় এত অস্ত্র আমদানীর ফলে পানামা খালেরই বিপদ বেড়ে গেল হয়ত ঐ সব অস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের জন্য মধ্য আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের কম্যুনিস্টদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। তাতে ল্যাটিন আমেরিকায় কম্যুনিস্ট প্রভাব বিস্তৃতির পথ সহজতর হবে। এই সঙ্গে আমেরিকান কর্তৃপক্ষ দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বনের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আমেরিকার অপর নয়টি রিপাব্লিক যুক্তভাবে ঘোষণা করেছেন যে, গুয়াতেমালার পরিস্থিতি পশ্চিম গোলার্ধের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক, তাই কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার, তার জন্যে এক বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে।

কিন্তু ততদিন আমেরিকা নিশ্চেষ্ট বসে নেই। তার যা ট্যাক্‌টিক্‌স তাই সে এখানে খাটাচ্ছে, অর্থাৎ দেশের লোককে দেশের লোকের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে। তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাচ্ছি আমরা 'মুক্তি-ফৌজে'র আক্রমণে। তাছাড়া দেশের অভ্যন্তরেও কম্যুনিস্ট তথা সরকারবিরোধী জনমত গঠন করবার চেষ্টার ত্রুটি নেই। খবর এসেছে গুয়াতেমালার প্রেসিডেণ্ট আর্বেঞ্জ পদত্যাগ করেছেন। তিনি নাকি সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষের হাতে কার্যভার অর্পণ করেছেন।

কম্যুনিস্ট-প্রভাবিত সরকারের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে যে অভিযান আরম্ভ হয়েছে, তার উদ্যোক্তা হচ্ছেন কর্নেল কার্লো ক্যাস্টিলো আরমাস নামে একজন নির্বাসিত সামরিক কর্মচারী। সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগে দেশ থেকে যাঁরা পলাতক হয়েছেন, তাঁদেরও অনেকে ওর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। আমেরিকান অস্ত্র ও বিমানে পুষ্ট হয়ে ও'রা হোণ্ডুরাস থেকে আক্রমণ চালিয়ে কিছু জায়গা দখল করেছেন সত্য, কিন্তু বর্তমান অবস্থাটা ঠিক কি, তা বলা শক্ত। কারণ কড়া সেন্সরের ফলে সত্যিকারের খবর পাওয়া সম্ভব নয়। তবে অবস্থা যে ঘোরালো এবং জল যে অনেকদূর গড়াবে, তা সহজেই বলা চলে।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মনের মাঝে ভিন্ন তরঙ্গ। সেই তরঙ্গে চলেছিলাম ভেসে। ঠেকে গেলাম। মন পাগল হয়েছিল সরোদ-বাদককে দেখব বলে। যে সরোদ বাজিয়ে ফিরছে রামজীদাসীর পিছে পিছে। বাজিয়ে দেখব, তেমন দুঃসাহস ছিল না। আপনি বেজে উঠেছে আপন মনের তার। তারে টান বড় চড়া। তার মাঝে এ লোকটি কো ভিন্ন সুরে ঘ্যাং ঘ্যাং করে উঠল। কে জানত, মহাবীরের সঙ্গে কথার ফাঁকে হয়ে পড়েছি তার নজরবন্দী।

আবার বিরক্ত হয়ে বললাম, 'কি পাব বলুন তো?'

লোকটি ঘাড় কাৎ করে হেসে বলল, 'আরে বাপ্‌রে, সে যদি আমিই জানব, তবে আর ভাবনা ছিল কি?' কিন্তু কি যে পাবো, তা কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। তাকে যত বলি, কিছুই পাইনি, তত সে চেপে ধরে। ছাড়ালে ছাড়ে না।

সে বলল, 'ওই দেখে দেখে আমার চুল পেকে গেল ভাইয়া। আমাকে তো ফাঁকি দেওয়া যাবে না।'

অতএব আমার কালোচুলের কথায় সে মানবে কেন? মনে মনে বললাম শুধু, 'কি বিপদ!'

সে বলে চলল ঘাড় নেড়ে নেড়ে, 'মেলায় ঢোকবার মুখে, বাঁধের ওপারে দেখেছেন মস্তবড় পাথরের দোকান?'

বললাম, 'না তো?'

ভ্রূ নাচিয়ে দুর্বোধ্য হাসি হাসল সে। বলল, 'তবে আর কি দেখেছেন? ওই একটি লোক মশাই। লাখপতি। কে চিনত ওকে? ও তো লক্ষ্ণৌয়ের রাস্তায় ভিখ্ মেগে বেড়াতো।' গলা নামিয়ে বলল ফিস্‌ফিস্ করে, 'তারপরে একদিন দেখি, ব্যাটা এক সাধুর পেছনে ঘুরছে। কি ব্যাপার? না, দুদিন বাদে দেখি, শহরে এক ছোট্ট খুপরির ঘর নিয়ে দোকান করেছে। পাথরের ছোট ছোট ক'টা শিব-লিঙ্গ, মহাদেব, বিষ্ণু, এইসব। আরে বাপ্‌রে, ক' বছরের মধ্যে দেখি, একেবারে একচেটিয়া কারবার করে ফেলেছে। বুঝেছেন? সেই সাধু-সঙ্গ। হুঁ হুঁ, আপনি ভেবেছেন, আমি ব্যাটা কিছু বুঝিনে?'

হা করে রইলাম। গূঢ়-বস্তু সন্ধানীই বটে। একেবারে পরমার্থ। সিঁড়ি খুঁজছে মোক্ষলাভের। কি ভাগ্যি, রঘুনন্দনের উপাখ্যান পেড়ে বসেনি তার কাছে। সে পরমার্থ যে এখানে অনর্থ ঘটাতো।

জানিনে, কি সে অলৌকিক বস্তু। মনের অগোচরে দেখি হয়তো লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন। কিন্তু কুম্ভমেলায়? এই বালুচরে? সাধুর পেছনে পেছনে? কই, সেরকম কোন পন্থার কথা তো মনে আসেনি। পাথর কেন? রক্ত বিক্রী করে লাখপতি হওয়ার কল্পনা করতে পারিনে।

বললাম, 'কই, তেমন কিছু পাইনি তো?'

আকুল-সুরে জিজ্ঞেস করল, 'তবে কি পেলেন?'

মনে মনে বললাম, যা পেয়েছি তা যে বলার নয়। সে তো একটি সুর। ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ট্যাঁকে গোঁজা যায় না। পোরা যায় না পকেটে। শুধু কানে শোনা যায়। বললাম, হেসে ঘাড় নেড়ে বললাম, 'কিছুই পাইনি।'

বুঝলাম, বিশ্বাস করতে পারল না আমাকে। চোখে তার তীক্ষ্ন দৃষ্টি। মুখের হাসিরেখা হয়েছে উধাও। ক্লান্ত জীবের মত বেরিয়ে পড়েছে জিভ। শাল ঢাকা সত্ত্বেও গায়ে তার মৃদু মৃদু কাঁপুনি। এ কি রাগ না হতাশা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

এমন সময়, ঝন্‌ঝন্ শব্দে ফিরে তাকালাম দুজনেই। অদূরেই। এক বিশালমূর্তি চলেছে পূর্বদিকে। একেবারেই উলঙ্গ মূর্তি। মাথার জটা ঠেলে উঠেছে আকাশে। গলায় এক রাশ মালা। হাতে একটি সুদীর্ঘ ত্রিশূল। তার গলায় কিংবা ত্রিশূলেই বাঁধা আছে হয়তো কিছু। তারই চাপা ঝন্‌ঝন্ শব্দ বাজছে।

আশপাশের চলমান নরনারী সকলেই একবার থম্‌কে দাঁড়িয়ে দেখছে। কেউ কেউ হাত ঠেকাচ্ছে কপালে। চলে যাওয়া পদচিহ্নের ভেজা বালু নিয়ে দিচ্ছে মাথায়।

আমার সামনের লোকটির গলা দিয়ে একটি বিচিত্র শব্দ উঠল। তা ভয়ের কি পুলকের, বুঝতে পারলাম না। তাকিয়ে দেখি, সারা মুখে তার হাসির দীপ্তি। হতাশা উধাও। চোখে রোশনাই হাজার আলোর। চকিতে শাল খুলে বাঁধল কোমরে। চাপা গলায় ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'পেয়েছি, পেয়েছি।'

তারপর আমার দিকে তার দীপ্ত চোখের একটি খোঁচা দিয়ে সরে গেল।

পা টিপে টিপে অনুসরণ করল এই দিগম্বর মূর্তিকে। ছায়ার মত চলল তার পিছে পিছে। যেন নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে, শিকারী চলেছে শিকারের কাছে।

হাসতে গেলাম। হাসতে পারলাম না। বালুচরে তাকিয়ে দেখি লক্ষ লক্ষ পদচিহ্ন। বর্ষার ভেজা মাঠে গরুর পালের পায়ের দাগের মত লক্ষ মানুষের পায়ের ছাপ সারা চরে। লক্ষ মনে লক্ষ কামনা, বাসনা ও প্রবৃত্তি। সকলেই পাগলের মত ছুটে চলেছে ঈপ্সিত বস্তুর পেছনে।

আর ওই লোকটি। এই সংসারের বেড়াজাল তাকে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখিয়েছে। ও-ই তার সাধনা, ধ্যান-ধারণা। তার ভগবান, তার পুণ্য। মিথ্যা সন্দেহে আমার কাছে হতাশ হয়েছে সে। কিন্তু আশা তার মরেনি। মুখে চোখে তার যে হাসি ও দীপ্তি দেখলাম, সে তো শয়তানের মত নয়। শয়তান তাকে পেয়েছে কি না জানিনে। কিন্তু চোখে মুখে তার শিশুর সারল্য। লোভ? তা' আছে। সংসার তাকে ওই পথ দেখিয়েছে। বয়স হয়েছে তার। এতখানি জীবন সে কাটিয়ে এসেছে ওই স্বপ্ন দেখে। হয়তো অবশিষ্ট আয়ুটুকু নিঃশেষ হবে ওই লাখ টাকার পেছনে। সংসারের এমনি নিয়ম। সারা সংসার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখেছে এতদিন। কেউ ফিরিয়ে আনেনি। আজ সময় হয়ে গিয়েছে। স্বপ্ন আজ আর স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন সাধনা। সাধন-পাগল।

জানিনে তার ঘর ও ঘরের মানুষের কথা। জীবন ভোর হয়তো সে এমনি 'পেয়েছি' 'পেয়েছি' বলে উল্লাসে বুক বেঁধে ছুটে চলেছে। ছুটবে ও ওই ভয়ংকরী সুন্দরী মরীচিকার পেছনে। তারপর একদিন আসবে। হয়তো শেষদিন। তার পলকহীন চোখে ফুটে থাকবে অভাবিত বিস্ময়, তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি। দু' ফোঁটা জল।

সেদিন সে সময় তার চোখে ভাসবে কি এ রাতের দৃশ্য? মনে পড়বে কি আমাকে?

হাসতে পারলাম না। বিদ্রূপে বেঁকে উঠল না ঠোঁট। সে হলেই ভাল হত। নিষ্কৃতি পেতাম মনের কাছে। হেসে চলে যেতে পারতাম পাগল দেখে।

কিন্তু এই মানুষ! ফিরে দেখি, উধাও হয়ে গিয়েছে। মিশে গিয়েছে পায়ের দাগে দাগে। ঝাপসা জ্যোছনালোকিত বালুচরে পাগলা সংসারের প্রেত হয়ে ফিরছে সে। হা হা করে ছুটছে, পেয়েছি পেয়েছি। ভাবি, কোনও এক পাওনা কি একদিন জুটবে না তার কপালে? ঘুচবে ফাঁকির পাওনা? যেদিন বুক ভরে উঠবে দুঃসহ আনন্দ ও বেদনায়। নিঃশব্দে তার মন গেয়ে উঠবে, পেয়েছি, পেয়েছি।

শীত লাগছে। হিম-ঝাপটা লাগছে পুরু জামা ভেদ করে। কোলাহল ঝিমিয়ে আসছে। দ্রুত পায়ে ফিরে গেলাম আশ্রমের দিকে।

ভাঙ্গা আসর। তবু আসর আছে। রামজীদাসী নেই, সরোদবাদক চলে গিয়েছে। চলে গিয়েছে কীর্তন মণ্ডলেশ্বরের দল। মাইকের সামনে বসে দুটি লোক আধা সুর করে, ছড়া কাটে হিন্দীতে। আসল কিছু নরনারী, কে শুনছে, কেউ ঢুলছে ঘুম-ঘোরে।

সে ভিড় নেই। গেটের কাছে ... হাড্‌সন্ অস্টিন। সরোদবাদককে ... করে দেখব বলে এসেছিলাম। ... হল না।

সে ঘুরছে। খুঁজছে কি না কিছু কে জানে? অমনি কোন লাখ টাকা মরীচিকার মত?

ঘুম থেকে উঠে দেখি, কেউ ... তাঁবুতে। গুলতানি শুনতে পা... পেছনে। জামা কাপড় পরে, মুখ ধু... গেলাম। পেছনটাই দেখছি আস... সাংসারিক ব্যস্ততা। হাঁড়ি-কুঁড়ি উনু... জলের কলে লাইন। যে রকম ভিড় দেখ... কলে, মুখ ধুতে পাব কিনা কে জানে।

রোদ উঠেছে। রোদ তো নয়, ... কাঁচা সোনা। শীতে আড়ষ্ট শরীর যেন কার দুই উষ্ণ বাহুতে ধরা পড়ে। সরে গিয়ে দাঁড়ালাম বেড়ার সামনে, এক... একলা খানিকটা রোদ ভোগের ... সরু সরু তল্‌তা বাঁশের বেড়া। ... খানিকটা ফাঁক ফাঁক।

রাতে মেলা, দিনে মেলা। ... দেখছি অষ্টপ্রহর জেগেই আছে। ... মধ্যেই ভেসে আসতে আরম্ভ করে মাইক-নিনাদ। মানুষেরও ভিড় দেখ... পাচ্ছি চারদিকে। ভিড় যেন একটু বে... বেশী লাগছে। এর মধ্যেই টাঙ্গাওয়ালা... চীৎকার, গাধার ভেঁপু। লরী ... প্রাইভেট কারও দুচারটে ছুটতে দে... যাচ্ছে বালুচরের রাস্তায়। বালুচ... রাস্তা তৈরী হয়েছে। বালুর ব... সাজিয়ে দিয়েছে বিচুলির মত একর... ঘাস। তার উপরে মাটি। কিন্তু ম... খারাপ হয়ে যায় ভাবলে, ওই রাস্ত... উপরেও ঝাড়ুহাতে কেন ঝাড়ুদারনী... উৎপাত। ধুলো ওড়া তো আছে... মাটিটুকুও যে বালিতেই মিশে যাবে।

ঘোমটা খসা একদল মেয়ে চলে বেড়ার পাশ দিয়ে। কেউ কেউ গ... করছে গলা ছেড়ে। কেউ হাসছে খিল খিল্ ক'রে। মস্ত মস্ত গাই-গরু নি... চলেছে গোয়ালা। হাঁকছে, দোধ, দে...

চাহি। আর গরম গরম দোধ হাঁকছে, বড় বড় হাঁড়ি কাঁধে দুধওয়ালারা। মুখে গ'ুজেছি টুথ্ ব্রাশ। এ সময়ে একটু চায়ের হাঁক শুনতে পাইনে?

'বাবু! মেরী বাবু।'

চমকে উঠলাম নারী কণ্ঠে। একেবারে কানের কাছে। ব্যাকুল আর ব্যস্ত কণ্ঠ। চকিত, ত্রস্ত।

'বাবু, মেহেরবাণী বাবু।'

বলতে না বলতেই গায়ে এসে ঠেকল হাত। বেড়ার ফাঁক দিয়ে। ময়লা হাত, কিন্তু ফরসা। কিছুটা তামাটে। নখে ময়লা। কিন্তু সরু সরু পুষ্ট আঙ্গুল। মনিবন্ধে কয়েকটা রঙিন কাচের চুড়ি।

তাকিয়ে দেখি, একটি মেয়ে। এলো চুল ঘাড়ের পাশে ছড়ানো। পাশ দিয়ে উঠেছে ছোট্ট ঘোমটা। চোখের অস্থির তারা দুটিতে তীক্ষ্ম দৃষ্টি। ঠোঁটের কোণে হাসি। সরু নাকে ময়লা পেতলের নাকছাবি। সকালের রৌদ্রদীপ্ত মুখে পড়েছে বাঁশের বেড়ার ছায়া। ছায়ার ঝিলিমিলি।

জিজ্ঞেস করলাম, কি চাও।'

আঙ্গুল দিয়ে টিপুনি দিল গায়ে। আর এক হাত স্পর্শ করল তার কপালে। ঠোঁটে যেন একটু নতুন রোশনাই। একটি বঙ্কিম ঝিলিক চকিতে দিল দেখা। ওই হাসিকে কি নাম দেওয়া যায়, জানিনে।

হাসি মুখে বলল করুণ স্বরে, 'দুঠো পাইসা, মেরী বাবু।'

পয়সা! অর্থাৎ ভিক্ষে। তাই ভাল। ভেবেছিলুম, না জানি কি ঘটতে চলেছে। ভিক্ষে চাওয়ার এ কি রীতি? ঠোঁটে হাসি, চোখে আলো। গায়ে হাত। ভিক্ষের কারুণ্য কোথায়। গলায়? সেটুকু আব্দার বললেই বা ক্ষতি কি?

পকেটে হাত দিয়ে, দেখতে চেষ্টা করলাম তার আপাদমস্তক। শাড়ীখানি মিলের, কিন্তু পাতলা। পালতোলা নৌকা চলেছে কালো পাড়ের ঢেউ জলে। পরেছে কুঁচিয়ে, ডানদিকে আঁচল এলিয়ে। গায়ে লাল টুকটুকে সস্তা কাপড়ের জামা। একহারা গড়ন। পুষ্ট দেহ। একটু বা বন্য।

ভিখারিনী বটে। পকেটে হাত দিয়ে পয়সা তুলতে না তুলতেই কানে এল আর্ত চীৎকার: ওগো সামলাও। সেই সর্বনাশী এসেছে গো, সেই হারামজাদী।'

পরমুহূর্তেই নারী কণ্ঠে কল কণ্ঠের কোরাস্ ঘটনাটা কলের কাছেই। ফিরে তাকাবার আগে হাতে উঠে এল দুয়ানি একটি। সেটি দিয়ে ফিরে তাকাতেই সামনে দেখি নারীবাহিনী। আমি ব্যূহ মধ্যে বন্দী। আর তীক্ষ্ম নারীকণ্ঠের হাসি, যেন সমস্ত কোলাহলকে খান্ খান্ করে হারিয়ে গেল বালুচরে।

প্রথমেই, সেই বিপুলকায়িনী খন পিসী ঠেলে এল সামনে। বলল, 'ভিক্ষে দিয়েছ বেটিকে?'

সমস্ত ঘটনাটি ঘটল এত চকিতে যে, প্রথমে ঠাহর করতে পারলাম না কিছু। খনপিসীর ভয়ংকর মুখের দিকে তাকিয়ে হকচকিয়ে গেলাম। চারদিকে ক্ষুব্ধ সন্দেহান্বিত কৌতূহলিত রকমারি নারী-মুখ। কোতোয়ালজীও ছুটে এসেছে।

খনপিসী মুখখানি আরও ভয়ংকর ক'রে জিজ্ঞেস করল, 'দিয়েছ কি না?'

ভিক্ষে চেয়েছে। মন চেয়েছে দিতে। দেব না কেন? খানিকটা ঝিমুনো সুরেই বললাম, 'দিয়েছি।'

'কত?'

'দু' আনা।'

'দু' আ—না?' খনপিসী চোখ কপালে তুলে খালি বলল, 'মুখ দেখে দিয়েছ বুঝি?' রীতিমত ভর্ৎসনার সুর তার গলায়।

মুখ দেখে নয়। আপাদমস্তক দেখে দিয়েছি। কিন্তু অপরাধ?

একটি নারী কণ্ঠের চাপাধ্বনি, 'ম গো! কি বলে দিলে?'

সামনে দেখি ব্রজবালা। দিদিমা সকলের চোখেই সেই একই দৃষ্টি।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছে?'

খনপিসী ঝামটা দিয়ে উঠল, 'কি হয়েছে? ও হারামজাদী যে নষ্ট মেয়ে-মানুষ, চোর, সর্বনাশী, তা জানো না?

সর্বনাশী? ও! সেই, শুধু চোর নয়, ছেলে-চোর মেয়ে। সর্বনাশ! তা জানব কি করে? ভুলেই গিয়েছিলাম। তাই তো, ভিখারিনীর চোখে মুখে যে অনেক সর্বনাশের দ্যুতি ছিল।

তাকিয়ে দেখি, ছি ছি! সকলের চোখে ছিঃ ছিঃ কারের তীক্ষ্ম খোঁচা। তবু, দেখে ভোলবার অবসর পাইনি। কোন রকমে ভিক্ষে দিয়েছি মাত্র। কিন্তু মূঢ়-বিস্ময়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কি বা উপায় আছে আমার।

(ক্রমশ)

ট্রামে-বাসে

"দিল্লী রাজ্যের সর্বত্র ছাড়া-গরু একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে" —একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য। বিশুখুড়ো মন্তব্য করিলেন—"সেই জন্যেই হয়ত আমরা দিল্লীর—কার বা গোয়াল, আর কে বা দেয় ধোঁয়া—নীতির পরিচয় মাঝে মাঝে পাই"!!

* * *

পণ্ডিচেরিতে ফরাসী সামরিক তৎপরতা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের জনৈক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"Madness France যেখানে মন্ত্রী প্রধান সেখানে সুবিবেচনা প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র"—বুঝিলাম, সহযাত্রী Mendes France কে Madness বলিয়া ভুল করিয়াছেন।

* * *

প্রশান্ত মহাসাগরে হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের কোন প্রতিক্রিয়াই পাকিস্তানের উপর হয় নাই বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন পাক দেশরক্ষা উজীর। শ্যামলাল সংক্ষেপে মন্তব্য করিল,—"হয়েছে, Zাপিত পারনি।"

* * *

আমেরিকার প্রতি পাকিস্তানবাসীর (অধিকাংশ পাকিস্তানীর) বিরূপ মনোভাবের পরিবর্তনের জন্য আমেরিকা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া
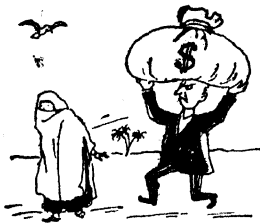
মনস্থ করিয়াছেন। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"কে নাকি কবে—বাজার হুন্দা কিন্যা আইন্যা পায়ে ঢাইল্যা দিয়াও মনডা —পার্নান, সুতরাং"......

* * *

কর্ম ও সামাজিক জীবনে মহিলা-দের সুযোগ-সুবিধা দানের কথা এক সাম্প্রতিক সভায় আলোচনা করিয়াছেন সর্বভারতীয় মহিলা Standing Council. শ্যামলাল বলিল—"মহিলাদের Standing Council-এর মতামত না-জানা পর্যন্ত আমরা এ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করতে অক্ষম।"

* * *

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায় মহাশয় নাকি তাঁর এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, কাশ্মীরে মন্ত্রীরা

নাকি পালা করিয়া রাস্তার ধারে কোন গাছতলায় আসিয়া বসেন এবং জন-সাধারণের অভাব-অভিযোগের কথা শুনেন। সাধারণের সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধার জন্য ডাঃ রায় নাকি এ ব্যবস্থা সর্বত্র চালু হইলে ভালো হয় বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।—"আমরাও এ প্রস্তাব সমর্থন করি; তবে আমাদের দেখতে হবে অতি-উৎসাহের আতিশয্যে মন্ত্রীরা জন-সাধারণকে গাছে তুলে যেন মই কেড়ে না নেন"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, কলিকাতায় নাকি কিছু পরিমাণ অতি-সরু চাউল আমদানী করা হইয়াছে।—"সরু চালের স্মৃতি বড়দের মনে ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে, ছোটরা সরু চাল যে কী তা জানেই না। তাই আমাদের মনে হয়,

জনসাধারণের সুবিধার জন্যে সরু চাল সম্বন্ধে কিছু পরিমাণ সচিত্র প্রচার পুস্তিকা বিতরণ করলে ভালো হয়"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

অন্য এক সংবাদে জানা গেল সম্প্রতি বম্বেতে প্রচুর বারিপাতের ফলে নাকি একদিন যান-বাহন বন্ধ হইয়া যায়। —"এটা মোরারজী দেশাই মশাইর "শুষ্ক" নীতির উত্তরে প্রকৃতির প্রতিশোধ কিনা তা বলা শক্ত"—বলেন আমাদের এক সহযাত্রী।

* * *

শুনিলাম, এ বৎসর নাকি প্রচুর ইলিশ মৎস্যের আমদানী হইবে। বিশু-খুড়ো বলিলেন—"শুনেছ ঠিকই, তবে আমদানীটা হবে নদীর জলে, বাজারেও নয়, পাতেও নয়। বিশ্বাস না হয়, মৎস্য বিভাগে অনুসন্ধান করে দেখ্‌তে পার।"

* * *

এরিয়ান্সের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের পরাজয়ের পর ট্রামে-বাসে আমরা আবার সেই পুরাতন রসিকতার পুনরাবৃত্তি শুনিলাম। এক নম্বর যাত্রী বলিলেন— "এদের ফোর-টু-নিল্ খেলার ফলে সব চেয়ে ক্ষতি হলো ইল্‌শে মাছ ব্যবসায়ীর। শুনলুম, খদ্দেরের অভাবে সব মাছ নাকি গঙ্গায় ফেলে দিতে হয়েছে"। দুই নম্বর যাত্রী বলিলেন—"ঠিক্ খদ্দেরের অভাব নয়। ১৯৪১ সালে এমনি খেলার ফলে একদিন খদ্দেররা এতো ইলিশ কিনেছিল যে তার শুটকী দিয়েই এখনো খাওয়া চলছে"—আলোচনাটা আর চলিল না, ট্রাম ততক্ষণে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া গিয়াছে।

রঙ্গজগৎ

—শৌভিক—

বিষয়বস্তুতে অভিনব চিত্র

বাঙলা চিত্রজগতে ছেলেমানুষী বড়ো আস্কারা পেয়ে যাচ্ছে আজকাল। সেদিন "লেডিজ সিট" সম্পর্কে একথার উল্লেখ করতে হয়েছিল, আজ বলতে হচ্ছে "এই সত্যি" সম্পর্কে। অবশ্য গোড়াতে এরা একই দলেরই ছিলেন, "লেডিজ সিট"র অরুণ চৌধুরী এবং "এই সত্যি"-র সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন ওরা আলাদাভাবে পাল্লা দিয়ে চিত্রকাহিনী লিখছেন এবং সেই লেখা নিয়ে ছবিও তুলছেন এবং আরও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে ছবি তোলার জন্যে টাকাও জোটাতে পারছেন এরা। বাঙলা দেশে মস্ত গর্ব করার জিনিস হচ্ছে এখানকার কথাসাহিত্য—এতো ভালো গল্প পৃথিবীর খুব কম দেশেই পাওয়া যায় এবং ভালো গল্পকারও এতো বোধ হয় আর কোথাও নেই। তবুও কেন যে বাঙলা ছবিতে কাহিনীর দীনতা থাকতে দেওয়া হয় ভেবে উঠতে পারা যায় না। কোন একটা নতুন আইডিয়া যদি মগজে কিলবিল করেই ওঠে তো সেটা কোন ভালো লিখিয়েকে দিয়ে লিখে সাজিয়ে নিলে কি খুব একটা অপমানজনক ব্যাপার হয়? "এই সত্যি"-র ক্ষেত্রেই তো দেখা যায়, বিষয়বস্তুর পরিকল্পনার মধ্যে বেশ একটা অভিনবত্ব আছে; পাকা লোকের হাতে পড়লে সত্যিই একটা দারুণ কিছু হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু একে কাঁচা লেখা, তার ওপর লিখিয়ে নিজেই প্রধান চরিত্রের অভিনেতা—এ অবস্থায় মাত্রা ঠিক রেখে দেওয়া যায়নি। লেখক নিজেই অভিনেতা হয়ে নিজের কোলেই সব ঝোলটুকু টেনে নিয়েছেন। দেখা গেল, যেটা একটা পার্শ্বচরিত্রের চেয়ে বেশী কিছু দাবী করতে পারে না তাকেই কচলে কচলে প্রধান চরিত্রে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

* * * *

এক পক্ষাঘাতগ্রস্থ বিকলাঙ্গ ব্যক্তির কামবৃত্তির বিকাশ, মানসিক দ্বন্দ্ব এবং পরিসমাপ্তিতে আত্মবিনাশের গল্প "এই সত্যি"। অবশ্য "সত্যি"-টা যে কি সেটা ঠিক ধরতে পারা যায় না শেষ পর্যন্ত, তবে একটা এই ছাপ মনে ধরে যে, বিকলাঙ্গ লোকও মানবিক আচরণ প্রত্যাশা করে এবং তাদেরও মন বলে একটা জায়গা আছে যেখানে সব রকমের স্বাভাবিক অনুভূতিগুলি দোলা দিয়ে যায়; সে-মনেও হাসি কান্না জাগে, প্রেমাতুর হয়ে ওঠে। দুই ভায়ের ছোটটি দাশু পক্ষাঘাতগ্রস্থ; নুলো হাবা গোছের। ভালো করে চলতে পারে না; টেনে টেনে কোনরকমে কথা বলে। তার সঙ্গী একটা কুকুর আর তার ভাইপো মিণ্টু। এই জড় ছোটকাকাটির প্রতি মিণ্টুর বড়ো দরদ। মিণ্টুর মা অঞ্জলি কিন্তু অথর্ব দেবরটিকে মোটেই দেখতে পারে না। কথায় কথায় গঞ্জনা; অবিরাম নির্যাতন করে চলে দাশুর ওপরে। দাদা কমল পিতার মৃত্যুশয্যায় শপথ নিয়েছিল ভাইকে দেখবে বলে; পুরনো আমলের চাকর বিশুরও যতো মায়া দাশুকে ঘিরে। দাশুর ওপরে বৌদির অত্যাচার সইতে না পারার ফলে বিশুকে চাকরি ছেড়ে চলে যেতে হলো। অঞ্জলি বিশুর কাজ অক্ষম দাশুকে দিয়ে করাবার চেষ্টা করলো, ফলে কাজের চেয়ে অকাজই হতে লাগলো আর দাশুরও নাকালের সীমা রইল না। কমল স্ত্রীকে এর জন্যে ভর্ৎসনা করলে এবং একটি চাকরকে বাড়ির কাজের জন্য বহাল করে দিলে। নতুন চাকর কালিরাম দাশুকে নানারকমে উত্যক্ত করে তুলতে লাগলো। কালিরাম পরোক্ষভাবে অঞ্জলির সহায়তা পেতে লাগলো। কমলের বন্ধুর ছোট ভাই তপন এলো বিলেত থেকে। অঞ্জলি তার ছোট বোন অমিতাকে নিয়ে এলো তপনের সঙ্গে বিয়ে দেবার চেষ্টায়। অমিতাকে দেখার সঙ্গেই দাশুর প্রেমাতুর মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। তপনের সঙ্গে অমিতা মেলামেশা করে দাশুর তা'তে ভারি ক্ষোভ। কালিরাম দাশুর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ওর সঙ্গে একটা কদ্

"চালিশ বাবা এক চোর" ছবিতে ব্রজরাজ ও কামিনী কৌশল

রসিকতা করে বসলো। অমিতার বকলমে দাশুকে প্রেম নিবেদন করে একখানা চিঠি কালিরাম দাশুর হাতে দিলে, দাশু যেন রাত একটায় অমিতার ঘরে যায়। দাশু সেইমতো অমিতার ঘরে গেলো এবং অমিতার ভয়ার্ত চিৎকার শুনে পালাতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে আহত হলো। দাশুর শুশ্রূষার ভার নিলে অমিতা এবং ক্রমে এমন হলো যে, অমিতা না হলে তার এক মুহূর্তও চলে না। অমিতা খাইয়ে দিলে খায়, হাতে করে ওষুধ দিলে তবে সেবন করে, এমন কি অতো আদরের মিণ্টুরও কথা শোনে না। দেখতে দেখতে অমিতার চলে যাবার দিন এলো। দাশু জানালে, সে যাবে অমিতার সঙ্গে, না হলে সে বাঁচবে না। অমিতা তপনকে জানালে, বিয়ের পর দাশুকে সে তাদের কাছে রাখবে। তপন আর অমিতা ছাদে দাঁড়িয়ে; তপনের বুকে অমিতার মাথা হেলান দেওয়া। মিণ্টুর কাছ থেকে দাশু খবরটা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠতে চেষ্টা করতে মাথার ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ হয়ে নেতিয়ে পড়লো, আর সে চোখ খুললো না।

* * * *

দাশুর প্রেমোন্মাদনাটাই হচ্ছে গল্পের সার। ছবি আরম্ভ হতেই দেখা যায়, দাশু তার ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে সামনের বাড়ির তরুণ দম্পতির প্রেমালাপ দেখে খুশীতে মেতে উঠছে। দাশুর বিকল অঙ্গের অন্তস্তলের সুপ্ত কামনার ওপরেই গল্পের যা কিছু ঝোঁক। অমিতা না আসা পর্যন্ত দাশু সামনের বাড়ির দম্পতিকে দেখেই তার আশ পরিতৃপ্ত করে। তারপর অমিতা এসে পড়া থেকেই দাশুর সব ঝোঁক অমিতার ওপরে। দাশুর ওপরে তার বৌদির নির্যাতন আরম্ভ থেকেই এবং সেটা নিয়ে এতো বাড়াবাড়ি করা হয়েছে যা অমানুষিকতার ধাপ ছাড়িয়ে অস্বাভাবিকতায় গিয়ে পোঁছয়। অঞ্জলিকে যতোবারই দেখা গিয়েছে কেবল দাশুকে নির্যাতন করতেই এবং শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত একঘেয়ে হয়ে যায়। আর ঘটনাগুলোরও তেমন জোর নেই। স্বল্পতার ফাঁক সর্বত্র; কেমন একটা অপুষ্টতার ভাব। ফিনফিনে সব চরিত্র, একমাত্র দাশু ছাড়া। এবং সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় কাহিনীকার হিসেবে কাঁচা কাজ দেখালেও ছবিখানি শেষ পর্যন্ত টেনেও নিয়ে গিয়েছেন বলতে গেলে তিনি একাই, দাশুর চরিত্রাভিনয়ে। কৌতুক অভিনেতা-রূপেই সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয়, অমন এক পক্ষাঘাতগ্রস্থ নুলো গোঙার চরিত্রে দেখলেই লোকে হেসে ফেলার কথা, কিন্তু তিনি তা হতে দেননি। প্রথম দর্শন দেওয়ার মুহূর্ত থেকেই তিনি চরিত্রটির অভিনবত্বের একটা চমক এনে দেন এবং এমনভাবে শেষ পর্যন্ত দর্শকের অনুভূতি ধরে রাখেন যে, দর্শকও দাশুর হাসি-কান্না, রাগ-বিরাগ, মান-অভিমানের ভাগ না নিয়ে থাকতে পারে না। ছবিখানি

দেখবার একমাত্র টান হচ্ছে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কৃতিত্বপূর্ণ অভিনয় এবং চরিত্রচিত্রণটি স্মরণীয় হয়েও থাকবে। আর কিছুটা ভালো লাগবে শ্রীমান অলোককে —অক্ষম কাকাটির প্রতি মিণ্টুর দরদ, মাকে লুকিয়ে খাবার চুরি করে কাকাকে খাওয়ানো, কাকার সঙ্গে খেলাধুলো গল্প করা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে মিণ্টুই যা খানিকটা রিলিফ এনে দেয়। আর বাকি সব অভিনয়ে কোন জোরই নেই।

* * * *

ঘটনা বিন্যাসের মধ্যে যুক্তির ছুটও জায়গায় জায়গায় ধরা পড়ে। দৃশ্য সংগঠন ও উপস্থাপনে যেমন, তেমনি অন্যান্য সব চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে একটা একচোরি অসম্পূর্ণতা অনুভূত হয়। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন সুরেশ হালদার। কলাকৌশলের দিকে বিশেষভাবে প্রশংসনীয় হচ্ছে সত্যেন চট্টোপাধ্যায়ের শব্দযোজনা। আলোকচিত্রগ্রহণ অতি সাধারণ এবং সুরযোজনা একেবারেই বৈচিত্র্যহীন। ও দুটি বিভাগে কাজ করেছেন যথাক্রমে সন্তোষ গুহরায় ও অরুণলাল ঘোষ। অন্যান্য অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে আছেন নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, দিলীপ রায় চৌধুরী, দেবকুমার, কবিতা রায়, সাধনা রায় চৌধুরী প্রভৃতি।

জাতিস্মরবাদ নিয়ে ক্রাইম-ড্রামা

পূর্বজন্মের কথা বর্তমান জন্মেও হুবহু মনে আছে এমন এক একটি চরিত্রের কথা মাঝে মাঝে খবরে পাওয়া যায়। "মরণের পরে" তার চেয়েও কিছু বেশী দেখিয়েছে জন্মান্তর গ্রহণ করে এক দুরাত্মার মুখোস খুলে দিয়ে। অত্যন্ত মরবিড ক্রাইম-ড্রামা, প্রায় বীভৎসই বলা যায়। দেখতে দেখতে মাথা ঝিমঝিম করে। মানুষের নির্মমতার চরম। অর্থলোলুপ মানুষ যে কতটা পাষণ্ড হতে পারে "মরণের পরে"-তে তার এক দৃষ্টান্ত-চরিত্র পাওয়া যায়। প্রাণদাতাকে হত্যা, পরস্বাপহরণ, খুন, নারীর প্রতি নির্যাতন, বিশ্বাসঘাতকতা আর সেই সঙ্গে মদ আর বাঈজী নিয়ে তৈরী কাহিনী আর যাই হোক আমুদে হয় না। একটা গুমোটে হাওয়া মাথাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। "মরণের পরে" ঠিক এই জাতীয় জিনিস তবে এর একটা তীব্র সম্মোহন শক্তি আছে, যে জন্যে দেখতে বসে শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেন স্বস্তি পাওয়া যায় না। ঘটনায় ঠাসা গল্প এবং এসকেপিস্ট মনের তুষ্টির জন্যে যে সব সামগ্রী কাজে আসে, তারও কিছু অভাব নেই। দর্শকমনকে তর তর করে টেনে নিয়ে যাবার একটা দাপটও আছে ঘটনাস্রোতের মধ্যে।

নিছক ক্রাইম-ড্রামা হলেও গল্পের মধ্যে একটা বৈচিত্র্য অবশ্য আছে। এক জাতিস্মর মেয়েকে নিয়ে গল্প যে তার পূর্বজন্মের কাহিনী স্মরণে ফিরিয়ে এনে সে-জীবনে তার ওপর অত্যাচারী দুরাত্মাকে ধরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। গরীব বাপ-মা মরা স্মৃতিকণা মানুষ হয় মামার কাছে। সর্বস্ব বিক্রী করে মামা স্মৃতিকণার বিয়ের ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু তবুও পণ ব্যাপারে গোলমাল বাধিয়ে বরপক্ষ পাত্রকে তুলে নিয়ে চলে যায়। জেদি ঘটক নরহরি সেই রাতেই জমিদার রায়বাহাদুর ভুজঙ্গ চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেললে। শুভদৃষ্টির সময় চোখ মেলতেই স্মৃতিকণা ভুজঙ্গ চৌধুরীকে দেখে চমকে উঠে 'কে', 'কে' বলে অজ্ঞান হয়ে গেল। ভুজঙ্গ ভাবলে স্মৃতিকণা বোধ হয় বৃদ্ধ বর দেখেই মর্মাহত হয়েছে। ভুজঙ্গ নতুন বৌকে নিয়ে কলকাতার বাড়িতে এসে উঠলো। ভুজঙ্গর কন্যা তনিমা নতুন মা'কে আদর করে ঘরে তুললে। এখানে এসেও স্মৃতিকণা মাঝে মাঝে জ্ঞানহারা হয়ে যা তা কাণ্ড করতে থাকে, সবাই ভাবে পাগলামী। একদিন স্মৃতিকণা ভুজঙ্গর একখানা ছবি দেখে ক্ষেপে উঠে জিনিসপত্তর ভেঙে তচনচ করে ফেললে, ভুজঙ্গ তাকে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসক কর্নেল চ্যাটার্জীর তত্ত্বাবধানে চিকিৎসার জন্য পাঠালে। হাসপাতালে এসে কর্নেল চ্যাটার্জীর সহকারী অশোককে দেখে স্মৃতিকণা "কে" বলে অজ্ঞান হয়ে গেল এবং তারপর থেকে অশোককে সে পুত্রবৎ দেখতে লাগলো। তনিমা তার নতুন মা'কে দেখতে অশোকের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে করতে দুজনের মধ্যে প্রেম সঞ্চারিত হয়। তনিমা চাইলেও অশোক কিন্তু বিয়েতে রাজী নয়, কারণ হিসেবে বলে যে, সে তার বাপ-মার পরিচয় জানে না, কর্নেল চ্যাটার্জী তাকে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে মানুষ করেছেন। কর্নেল চ্যাটার্জী তনিমা ও অশোকের কথা জানিয়ে ভুজঙ্গকে চিঠি দিলেন। এ বিষয়ে একদিন কর্নেল চ্যাটার্জী অশোকের সঙ্গে কথা বলতে বসলেন; স্মৃতিকণা ওদের জন্য জলখাবার নিয়ে এলো। ঠিক সেই সময়ে রুটি চুরি করার জন্য একটা পাগলাটে গোছের লোক তাড়া খেয়ে ওখানে এসে উপস্থিত হলো। স্মৃতিকণা তাকে দেখে "গুরুদাস" বলে চেঁচিয়ে উঠে অজ্ঞান হয়ে পড়লো এবং সেই অবস্থাতেই সে একটা কাহিনী বর্ণনা করে যেতে লাগলো। এইটেই হলো তার পূর্বজন্মের কথা।

* * *

দূরে নাগাদের এক গ্রামে এক বাঙালী ডাক্তার তার স্ত্রী ও শিশুপুত্র নিয়ে থাকে। হঠাৎ একদিন এক বাঙালী রোগীর সন্ধান এলো, নাম অহীন্দ্র চৌধুরী। ডাক্তার অহীন্দ্রকে বাড়িতে এনে চিকিৎসা করতে লাগলেন এবং তাঁর স্ত্রী করতে লাগলেন শুশ্রূষা। অহীন্দ্র সুস্থ হয়ে ওঠার পর একদিন পাশের ঘর থেকে ডাক্তারের মুখে ওদের কাছে এক গুপ্তধনের অস্তিত্বের কথা শুনতে পেলে। অহীন্দ্র সেই গুপ্তধন পাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলো। অসুস্থতার জন্য ডাক্তার দীর্ঘ প্রবাসের পর দেশে ফিরে যেতে চাইলে। অহীন্দ্র গেলো কলকাতায় বাড়ি ঠিক করার জন্য। এবার অহীন্দ্রের আসল পরিচয় পাওয়া গেল। পুরানো দুর্বৃত্ত সে, তার সহচর তারই শ্যালক গুরুদাস। অহীন্দ্রের স্ত্রী ও একটি শিশুকন্যা আছে। অহীন্দ্রের অত্যাচারে তার স্ত্রী সতী অতিষ্ঠ। অহীন্দ্র গুরুদাসের সহায়তায় এক নিরিবিলি জায়গায় ডাক্তারদের জন্যে একটা বাড়ি ঠিক করে দিলে। সতীকে অহীন্দ্র ভয় দেখিয়ে গুরুদাসের ভগ্নি পরিচয় দিয়ে ডাক্তারের স্ত্রীর কাছে মেলামেশা করে গুপ্তধনের সন্ধান করার জন্য নিযুক্ত করে দিলে। সখিত্বের টানে সতী তার কন্যার সঙ্গে ডাক্তারের পুত্রের বিয়ে দেবে বলে কথা দিয়ে রাখলে। এদিকে অহীন্দ্র আর গুরুদাস একটা

ষড়যন্ত্রকরে সতীর অসুখের খবর পাঠিয়ে ডাক্তারকে এক রাত্রে সতীর ঘরে এনে হাজির করলে। তার আগে ডাক্তারের চরিত্র সম্পর্কে সতীর মনে একটা খারাপ ধারণা করে দেওয়া হয়েছিল। ডাক্তারকে একা দেখে সতী চীৎকার করে উঠতেই মাতাল অবস্থায় গুরুদাস এসে ডাক্তারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। গুরুদাসের কাছে রিভলবার ছিল, সেটা নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে গুলী ছুটে যায় এবং গুরুদাস লুটিয়ে পড়ে। অহীন্দ্র এসে ডাক্তারকে খুনের দায় থেকে বাঁচাবার জন্য এক গুপ্তস্থানে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখে। সবই সাজানো ব্যাপার। রিভলবারে ছিল ফাঁকা কার্তুজ। ডাক্তারকে সরিয়ে অহীন্দ্র পরম হিতৈষীর মুখোস প'রে ডাক্তারের স্ত্রীর কাছ থেকে গুপ্তধনের সন্ধান পাবার চেষ্টা করতে থাকে; অবশেষে সন্ধানটা পেয়ে যায়। সতী তখন অহীন্দ্রর স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়েছে। অহীন্দ্র ডাক্তারের স্ত্রী-পুত্রকে বন্দী করে রাখলে। সতীকে সে গলা-টিপে হত্যা করে খুনের দায়টা কৌশলে মাতাল গুরুদাসের ওপরে চাপিয়ে দিলে; গুরুদাসের দ্বীপান্তর হয়ে গেল। ওদিকে অহীন্দ্র ডাক্তারের স্ত্রীকে অসতী দেখিয়ে ডাক্তারকে আত্মহত্যায় বাধ্য করলে। ডাক্তারের স্ত্রীকে বন্দী অবস্থা থেকে পালাতে সাহায্য করলে অহীন্দ্রেরই দলের এক বাঈজী; অহীন্দ্রের নৃশংসতায় তারও চোখ খুলে যায়। ডাক্তারের স্ত্রী পুত্রকে বুকে জড়িয়ে পালাতে গিয়ে ট্রেনে কাটা প'ড়ে মারা যায়। স্মৃতিকণার বিবৃতিতে তার পূর্বজন্মের কাহিনী এইখানেই শেষ।

স্মৃতিকণার কাহিনী শেষ হতেই সেখানে ভুজঙ্গ এসে উপস্থিত; তাকে দেখেই গুরুদাস ঝাঁপিয়ে পড়লো তার দিকে। এই ভুজঙ্গই আগেকার সেই অহীন্দ্র চৌধুরী। গুরুদাসের হাত থেকে ভুজঙ্গ বাঁচবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না, গুরুদাস তাকে গলা টিপে হত্যা করলে। দেখা গেল এই স্মৃতিকণাই ছিল আগের জন্মে ডাক্তারের সাধ্বী স্ত্রী এবং অশোকই তার পূর্বজন্মের সন্তান, যাকে কর্নেল চ্যাটার্জী কুড়িয়ে এনে মানুষ করে। স্মৃতিকণা তার আগের জন্মের প্রতিশ্রুতি মতো অশোকের হাতে ভুজঙ্গ ওরফে অহীন্দ্রের কন্যা তনিমার হাত তুলে দিলে।

* * *

গুরুদাসকে দেখে অজ্ঞান হয়ে স্মৃতিকণা পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত আরম্ভ করার আগে পর্যন্ত অংশ হাসি-কৌতুকে হাল্কা। ছবির আরম্ভই ঘটকরূপি হরিধনকে নিয়ে। তারপর ভুজঙ্গের কলকাতার বাড়িতে বিলেত-ফেরৎ রজট গ্যাংগলেরূপে শ্যাম লাহা আর দুটি চাকরের একজন ভানু আর একজন স্নাশু বোস। এর ওপরে আছে কর্নেল চ্যাটার্জীর আস্ত একটা পাগলা গারদ। প্রচুর হাসির অনেকখানি জুগিয়ে দেন শ্যাম লাহা দিশী সাহেবের ক্যারিকেচার করে, কিন্তু সবার ওপরে টেক্কা মেরে গিয়েছে ভানু—পাগলা গারদে রজতকে নিয়ে পাগলাদের সঙ্গে তুলনা করে ওর বিদ্রূপ এখনও মনে করলে হেসে ফেলতে হয়। অনেক ছবির পরে ভানুকে তার অনবদ্যতার মধ্যে পাওয়া গেল। হাসির খোরাক ছাড়া গোড়ার এই অংশে প্রণয়ও রয়েছে অশোক ও তনিমাকে নিয়ে। রজট ছিল তনিমার পানিপ্রার্থী, কিন্তু অশোক উপস্থিত হবার পর তনিমার মন অশোকের ওপরই পড়ে। এ দুটি চরিত্রে উত্তমকুমার এবং সুচিত্রা সেনের অভিনয়ে বেশ একটা প্রাণোচ্ছলতা পেয়ে খুসী হওয়া যায়। এদের মধ্যে গাম্ভীর্যের রেশটা টেনে গিয়েছেন স্মৃতিকণার ভূমিকায় প্রণতি ঘোষ—অভিনয়ে চরিত্রটির প্রতি কৌতূহল জাগিয়ে তোলায় তিনি সক্ষম হয়েছেন। আর এ অংশে আছেন কর্নেল চ্যাটার্জী, যে ভূমিকায় বীরেন চট্টোপাধ্যায় বেশ একটা ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। নায়কের চেয়ে এ ধরণের চরিত্রে তাঁকে মানায়ও যেন ভালো। ভুজঙ্গ ওরফে অহীন্দ্রের ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্যের এ অংশে আবির্ভাব কম।

* * *

স্মৃতিকণার বিবৃতি ধরে পূর্বজন্মের কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে—বলা বাহুল্য, ফ্লাশ ব্যাকে। গল্পের দ্বিতীয় ধাপের সবটা অহীন্দ্রের একচেটিয়া বলা যায়। চরিত্রটিতে ধীরাজ ভট্টাচার্য যুবকবেশে আবির্ভূত হয়েছেন এবং এই ধরণের দুর্বৃত্তের চরিত্রাভিনয়ে তিনি যে অসাধারণ দক্ষ, আর একবার তিনি সে পরিচয় দিলেন। অহীন্দ্রকে তিনি এমনি এক দুরাত্মা করে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, লোকে দেখতে দেখতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে; ওর নির্মম ক্রিয়াকলাপে রাগে দর্শকরা নিসপিস করতে থাকে। চরিত্রটির অভিনয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ নিমগ্ন করে ফেলার একটা ঘটনার উল্লেখ করা যায়। ডাক্তার আত্মহত্যা করার পর ডাক্তারের লেখা চিঠিখানি হাতে নিয়ে অহীন্দ্রের জয়ের উল্লাস প্রকাশ করতে অট্টহাসি হাসতে গিয়ে তিনি ঘুরে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যান। উপস্থিত কলাকুশলী ও শিল্পিবৃন্দ অভিনয়ে এতোই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, ধীরাজের প'ড়ে যাওয়াটা অভিনয়েরই অংশ বলে মনে ক'রে সকলেই চুপচাপ দেখে যাচ্ছিলেন; সকলের হুঁস ফিরতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগেছিল। অহীন্দ্রের সহচর কাণা গুরুদাসের ভূমিকায় শম্ভু মিত্র বিদ্রূপমাখা একটা দুর্বৃত্ত চরিত্র সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু মোট ফলটা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে মনে হলো তিনি যেন চরিত্রটাকেই বিদ্রূপ করে গিয়েছেন। ডাক্তারের ভূমিকায় অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ও মনে ধরবে। সতী এবং ডাক্তারের স্ত্রীর ভূমিকায় যথাক্রমে শোভা সেন ও ভারতী দেবী করুণ রসটা ফুটিয়ে তুলেছেন। ছবিখানির সবচেয়ে বড়ো গুণ হচ্ছে ওর অভিনয়ের দিকটা; বেশ শক্তিশালী অভিনয় ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় অনেকেরই কাছ থেকে। তবে উনপঞ্চাশজন তারকা আছে ব'লে যে প্রচার করা হয়েছে, সেটা একেবারেই ভুয়ো। ওপরে যাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা ছাড়া আর নাম করা যেতে পারে, এমন ক'জন হচ্ছেন—বেচু সিংহ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, জয়নারায়ণ, নবদ্বীপ, ধীরাজ দাশ, নীলিমা দাস, স্বাগতা চক্রবর্তী ও রেখা চট্টোপাধ্যায়।

* * *

ছবিখানি আরম্ভ থেকেই সাসপেন্স গ'ড়ে উঠেছে খুবই তীব্রভাবে এবং গল্পের বাঁধুনী বহু যুক্তির খেলাপ থাকলেও দর্শক-মনে উদগ্র কৌতূহল জাগিয়ে সর্বক্ষণ নিবিষ্ট করে ধরে রাখে। পরিচালনায় এই বাহাদুরীটাই সবচেয়ে

বি আর চোপরা পরিচালিত 'চন্দন চৌক্' চিত্রে মীনাকুমারী

বেশী দেখা যায়। তাছাড়া সংগতির অভাবও বড়ো কম নেই। স্মৃতিকণার বিবৃতিতে ফ্ল্যাশব্যাকের সাহায্যে গল্পের অবতারণা করা হয়েছে, অর্থাৎ পূর্বজন্মের যেসব ঘটনায় ও নিজে উপস্থিত ছিল, শুধু সেগুলিরই বর্ণনা তার কাছ থেকে দেখানো ব্যাকরণসম্মত; অহীন্দ্রের অন্যান্য গতিবিধি সে জানলো কি করে? গোড়াতেই স্মৃতিকণার বিয়ের সময় বর উঠে চলে যেতে নরহরি ঘটকের তৎক্ষণাৎ ভুজঙ্গের কাছে হাজির হওয়াটা জোর করে ঘটানো; নয়তো যুক্তির দিক থেকে ওর তো গ্রামেই চেষ্টা করা উচিত ছিলো। তেমনি জোর করে ঘটিয়ে দেওয়ার ব্যাপার গুরুদাসকে এনে হাজির করে দেওয়া। অহীন্দ্র নাগার দেশে পুলিসের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, দিনকতক পরেই সে কলকাতায় ফিরে এলো, কিন্তু তখন পুলিসের ভয় কেটে গেল কি করে? আর ডাক্তারদের কাছে আছে বলে অতিরিক্ত রহস্যই বা কেন? আর ছবির চেহারাটায় পালিসেরও অভাব; অত্যন্ত রুক্ষ। কতকগুলো ছোটখাটো ব্যাপার খট্‌কা জাগায়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে অহীন্দ্র এক গুণ্ডার সঙ্গে ডাক্তারকে ফাঁদে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে; কিংবা অহীন্দ্রর বাড়ির ভিতরের চেহারা এক, কিন্তু বাইরে বারান্দার আধুনিক প্যাটার্নের জানলা-সার্সি দেখলে আর এক ধারণা হয়ে যায়।

ছবিখানির গঠনশিল্পীদের মধ্যে আছেন পরিচালনায় সতীশ দাশগুপ্ত, আলোকচিত্রগ্রহণে সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, শব্দযোজনায় শিশির চট্টোপাধ্যায়, সুর-যোজনায় 'সরগম' ছদ্মনামে গোপেন মল্লিক ও চিত্ত রায় এবং কাহিনী ও সংলাপ রচনায় অজিত মুখোপাধ্যায়।

কংস-বধ নৃত্যনাট্য

অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কলেজ অব আর্টস এণ্ড ক্রাফট্‌স্‌এর বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে উক্ত কলেজের ছাত্রীরা আগামী ১১ই জুলাই সকাল ৯টায় 'ইন্দিরা' প্রেক্ষাগৃহে শ্রীমৎ ভাগবত অনুসরণে কংস-বধ নৃত্য-নাট্যরূপ পরিবেশন করবেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন কলকাতার মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি হবেন মিঃ বি এন সরকার।

ভ্রম-সংশোধন

গত সপ্তাহে প্রকাশিত ছবিখানি ভুলক্রমে "বিরাজ-বৌ"য়ের দৃশ্য বলে বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ছবিখানি ছিল বিমল রায় প্রযোজিত ও পরিচালিত "নোকরি"র একটি দৃশ্যে শীলা রমানি ও কিশোরকুমার।

একলব্য

কলকাতার দুই শক্তিশালী ও জনপ্রিয় ফুটবল টীম—মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে মরশুমের দ্বিতীয় চ্যারিটি খেলা হয়ে গেল। দুই প্রধানের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করে বছর-বছরই নানা রকমের জল্পনা-কল্পনা, গুজব-গবেষণা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা ময়দানের আবহাওয়াকে সরগরম করে তোলে। এ বছরও তার ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল—এই দুইটি ক্লাবের নামের সঙ্গেই খেলাপ্রিয় দর্শক-সমাজের অন্তরের যে যোগাযোগ রয়েছে তাতে ক্রীড়ামোদীর উৎসাহ যে চরমে উঠবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এবার অবশ্য একদিন আগে থেকে সাধারণের নির্দিষ্ট গ্যালারীতে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য উৎসাহী ক্রীড়ামোদীদের লাইন দিয়ে দাঁড়াতে দেখা গেছে; কিন্তু মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখবার জন্য ৭২ ঘণ্টা আগে থেকে দূর-দূরান্তের খেলা-পাগলের দল লাইন বেঁধে মাঠে দাঁড়িয়ে আছে তার ছবিও কাগজে বের না হয়েছে, এমন নয়। তবুও ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির পীঠভূমি এই কলকাতা মহানগরীতে আজ পর্যন্ত 'স্টেডিয়াম' গড়ে ওঠেনি।

* * *

কলকাতা তথা ভারতীয় ফুটবলের ক্রীড়ামান নিম্নমুখী। বিশেষ করে এবার থেকে বুট পরে খেলার নিয়ম চালু হওয়ায় ক্রীড়া-নৈপুণ্যের উৎকর্ষের আরও অপচয় ঘটেছে। কোন খেলাই দর্শক-মনকে আনন্দ দিতে পারছে না। তবুও ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের 'চ্যারিটি' খেলা দেখবার জন্য ময়দানে যে বিশাল জনতার সমাবেশ হয়েছিল তাকে স্ফীতমান মহানগরীর বিরাট এক অংশ বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু এই বিশাল জনতার মাত্র এক-চতুর্থাংশ ক্রীড়াঙ্গনে প্রবেশাধিকার পেয়েছিল কি না সন্দেহ। জনতার বাকী অংশকে খেলার ফলাফল জানবার অধীর আগ্রহে মাঠের আশপাশ এবং পেছন দিকের উঁচু জমিতে ভীড় জমিয়ে থাকতে দেখা যায়। হতাশ দর্শকদের ক্রমবর্ধমান চাপ এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঘটনায় এইদিন ৫০।৬০জন দর্শককে অল্পবিস্তর আঘাতও পেতে হয়েছে। সুব্যবস্থা এবং কড়া পাহারা ঘটনা রোধ করা সম্ভবপর কেন? বিক্ষুব্ধ জনতার শান্তিপ্রিয় ক্রীড়ারসিকদের স্টেডিয়ামের অভাবেই তা বেষ্টন আর অশ্বের ক্ষুরে ৮ হচ্ছে। ইট, কাঠ, লোহা, সি সৌধপুরীতে খেলার জন্য এ কি সতাই সম্ভব নয়? স আর কতদিন ধৈর্য ধরে তাদের ধৈর্যের বাঁধ যে পঞ্চাশ ষাট হাজার দর্শকের চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হাজার প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত; তাদের রয়েছে অশান্ত উত্তেজনা, সেখানে ...লিশে শান্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তব পুলিশ বাহিনীর সুব্যবস্থায় বড় রকম কোন সংঘর্ষ ঘটেনি; অল্পের উপর দিয়ে যাত্রার ফাঁড়া কেটে গেছে।

* * *

খেলা দেখবার জন্য লোকে যে কত ফ কত রকমের আশ্রয় গ্রহণ করে ময়দান ক্রী তীর্থের যাত্রী ছাড়া আর কারো পক্ষে জানবার কথা নয়। কলকাতা ময়দানে আ তিনটি ঘেরা মাঠ। এই তিনটি মাঠেই বড় খেলা হয়ে থাকে। উত্তর-দক্ষিণ প্রসারি তিনটি মাঠেরই দক্ষিণ দিক খোলা। খো অর্থে একেবারে খোলা নয়। অন্য তিন দি গ্যালারীর পেছনে মাঠ ঘিরে কাঠের যে প্রাচী খাড়া আছে, এদিকে তা নেই। গ্যালারী নেইই। কাঠের প্রাচীরের বদলে দক্ষিণ দি রয়েছে মানুষের বুক সমান উঁচু সন্নিবিষ্ট বাঁশের প্রাচীর। তার উপর কাঁ তার জড়ানো। প্রাচীরের উপরেও লম্বালম্বি ভাবে কাঁটাতার টানা আছে, যাতে কেউ বে ডিঙিয়ে মাঠে প্রবেশ করতে না পারে মাঠের দক্ষিণ দিক খোলা রাখবার রী ব্রিটিশ আমল থেকেই চলে আসছে। দুটি সুবিধা। প্রথমত দক্ষিণ দিকের খো হাওয়ায় খেলোয়াড়দের শ্রমকাতরতা লা হয়; সঙ্গে সঙ্গে দর্শকেরও শরীর-মন ঠা থাকে। দ্বিতীয় সুবিধা তাদের, যাদের ভ খেলা দেখবার সখ আছে অথচ পকেটে পয় নেই। দক্ষিণ দিকের খোলা জায়গায় এ শ্রেণীর দর্শকদেরই ভীড়।

* * *

ক্যালকাটা মাঠ এবং মোহনবাগান-ইস্ট বেঙ্গল মাঠে দক্ষিণ দিকে রয়েছে কে সংলগ্ন ঢালু জমি, যাকে ইংরাজীতে আম 'র‍্যামপার্ট' বলি। ফোর্ট উইলিয়াম থে ক্রমশ নীচু হয়ে এই জমি মাঠের সা মিশেছে। সুতরাং ক্যালকাটা মাঠ এবং ইস্ট বেঙ্গল-মোহনবাগান মাঠের পেছন দিকে ঢালু জমিতে কয়েক সহস্র লোক জমায়ে হয়ে খেলা দেখতে পারে। কিন্তু এরিয়া

ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের চ্যারিটি খেলায় ইস্টবেঙ্গল গোলরক্ষক বি দে'কে একটি তীব্র সট প্রতিরোধ ▬▬ দেখা যাচ্ছে

বিশ্বের ক্ষিপ্রতম মহিলা এ্যাথলীট ডায়না লেথারকে এক মাইল দৌড়ের শেষ সীমারেখায় দেখা যাচ্ছে। ইংলণ্ডের এই মহিলা সম্প্রতি ৪ মিনিট ৫৯.৬ সেকেণ্ড সময়ে এক মাইল পথ দৌড়ে মহিলা এ্যাথলীটদের দৌড়ের ইতিহাসে নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন

মহমেডান মাঠের পেছনের জমি ঢালু নয়। তাই এখান থেকে বেশী লোকের খেলা দেখারও সুবিধা হয় না। অন্য দুই মাঠের পেছন দিক থেকে কয়েক সহস্র লোকের খেলা দেখবার সুযোগ থাকলেও এরা কি খেলা দেখে সত্যিকারের আনন্দ পায়, না অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়? সত্য কথা বলতে কি, বাঁশের বেড়ার কাছাকাছি দু' তিনটি লাইন ছাড়া পেছনের দিকে যারা দাঁড়ায় তারা ক্রীড়াসৌন্দর্যের কোনই স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না। তাদের চোখের সামনে থাকে ক্রীড়াধারার একটা আবছা ছবি। লোকের ঠেলাঠেলির মধ্যে কখনও উ'কি মেরে, কখনও উ'চু হয়ে, কখন বা কাঠের বাক্সের উপর দাঁড়িয়ে আবার কখন বা ঠেলাগাড়ির উপর দণ্ডায়মান থেকে এরা খেলা থেকে আনন্দ পেতে চেষ্টা করে, কিন্তু যেমন "ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার পথিকে ধাঁধিতে।" তেমন বিনা টিকিটের এই সব দর্শক-মনে ক্রীড়াসুষমার সাময়িক আলোকচ্ছটা তাদের অতৃপ্ত বাসনাকেই খেলা দেখার আকাঙ্ক্ষায় পাগল করে তোলে।

* * *

মাঠের দক্ষিণ দিকের খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে বেশি লোকের খেলা দেখবার সুবিধা না থাকায় মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি এক যন্ত্র আবিষ্কার করে বসলো। ময়দানের 'বাক্সকল' নামেই এই যন্ত্র পরিচিত। বিজ্ঞানের দুরূহ নিয়মের নব নব ধারা মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণ, সুবিধা-অসুবিধার ক্ষেত্রে নিতী নূতন পন্থায় প্রযোজিত। সম্ভবত খেলা দেখার বাক্সকলও খেলা দেখার প্রয়োজনে সৃষ্ট এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। সূত্র খুবই সহজ। একটা হাল্কা লম্বা ধরনের বাক্সের মধ্যে দুখানা আর্শি এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যে, খেলার মাঠের প্রতিবিম্ব একখানা আর্শির উপর পড়ে অপর আর্শিতে তার ছবি প্রতিফলিত হয়। লম্বা চৌকো বাক্সের উপরের অংশের পেছন দিকে এবং নীচের অংশের সামনের দিকে দুরূহ কোণে দুখানা আর্শি স্থাপন করলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। অবশ্য দু'খানা আর্শির মাঝপথে কোন বাধা থাকলে একের ছবি অন্যে প্রতিফলিত হবে না। এখন এই হাল্কা লম্বা বাক্সটি সবার মাথার উপরে উ'চু করে ধরলে উপরের আর্শিতে খেলার মাঠের ছবি প্রতিফলিত হবে, সেই ছবিই আবার ধরা পড়বে নীচের দিকে দুরূহ কোণে স্থাপিত আর্শির উপর। সুতরাং নীচের আর্শির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই তার মধ্যে খেলার মাঠ, খেলোয়াড়দের দৌড়াদৌড়ি, বল মারা, গোল করা সবই দেখা যাবে। 'বাক্সকল' কোন্ উর্বর মস্তিষ্কের আবিষ্কার, জানা নেই। কিন্তু এই উপায়ে কত শত দর্শক খেলা দেখার সখ মেটাচ্ছে তার হিসাব কে রাখে? খেলাপ্রিয় রোজকার ময়দানযাত্রীদের অনেকেরই নিজস্ব 'বাক্সকল' আছে। আবার ময়দান এলাকায় এ যন্ত্রটি ভাড়াও পাওয়া যায়। কোনো ভাল খেলার দিন একটু সকাল করে মাঠে গেলে কাস্টমস মাঠের আশেপাশে 'বাক্সকলে'র দর্শন পাওয়া যাবে।

* * *

'র‍্যামপার্টে' দাঁড়িয়ে, গাছে উঠে, কাঠের বাক্স বা গাড়ি ভাড়া করে এবং 'বাক্সকলে'র মুকুরে যাঁরা খেলা দেখতে অভ্যস্ত স্টেডিয়াম হলেই তাঁরা পয়সা দিয়ে খেলা দেখবেন একথা বলছি না বা বড় খেলায় ময়দানে যে বিশাল জনতার সমাবেশ হবে এটাও আশা করা যায় জনতার সমাবেশ হয় স্টেডিয়ামেও এমনি না; তবে একথা নিশ্চিত যে, কলকাতার আকর্ষণীয় ফুটবল খেলায় ৪০ হাজার দর্শক সমাগম হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বর্তমানে চ্যারিটি খেলার টিকিটের যে অগ্নিমূল্য ধার্য আছে তা হ্রাস করলে দর্শকসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা। দারুণ অর্থনৈতিক চাপের মধ্যেও ৫০ মিনিটের খেলা দেখবার জন্য ৩ টাকা মূল্যের ৫ হাজার টিকিট কর্পূরের মত উবে যাচ্ছে। এর থেকেও প্রমাণ হয় কলকাতার আকর্ষণীয় খেলায় কোনদিন দর্শকের অভাব হবে না। জাল টিকিট এবং ৩ টাকার টিকিট কালোবাজারী মূল্যে ৮, ১০ টাকায় বিক্রী হবার সংবাদও টিকিটের অসম্ভব চাহিদার কথা প্রমাণ করে। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলাতেই ব্ল্যাক মার্কেটিং এবং জাল টিকিটে

বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ক্ষিপ্রগতি এ্যাথলীট জন ল্যাণ্ডির দৌড়াবার দৃশ্য। অস্ট্রেলিয়ার এই তরুণ এ্যাথলীট এক মাইল দৌড়ে রজার ব্যানিস্টারের বিস্ময়কর রেকর্ড ভেঙে দিয়ে ৩ মিনিট ৫৮ সেকেণ্ডে নূতন বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। ল্যাণ্ডির কল্পনাতীত সাফল্যে সমগ্র এ্যাথলেটিক বিশ্ব আজ আলোড়িত হয়ে উঠেছে

এরা সত্যিকারের উদ্বাস্তু নয়। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের খেলা দেখবার জন্যই এরা বাস্তু ছেড়ে খেলার আগের দিন মাঠের কোলে আশ্রয় নিয়েছে

মাঠে প্রবেশ করার চেষ্টা করায় কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

* * *

চ্যারিটি ম্যাচের টিকিটের বিলি-বাঁটোয়ারা সম্পর্কে ক্রীড়ামোদী মহলে গুজব গবেষণার অন্ত নেই। চ্যারিটি টিকিটের একচেটিয়া অধিকার সম্পর্কে আই এফ এ-র নেতৃস্থানীয়দের উপর ক্রীড়ামোদীরা যে কটাক্ষ করে আসছেন এপর্যন্ত তার কোন সন্তোষজনক উত্তরও দেওয়া হয়নি। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের চ্যারিটি খেলার পূর্বদিন এক দৈনিক পত্রিকায় সরাসরি অভিযোগ করা হয়েছে যে, আই এফ এ-র সভাপতি শ্রী পি গুপ্ত এবং সম্পাদক শ্রী এম দত্ত রায় ৬ হাজার টিকিট নিয়ে অদৃশ্য হয়েছেন। তবুও এ সম্পর্কে আই এফ এর তরফ থেকে কোন আলোক-সম্পাত করা হয়নি। সাধারণ ক্রীড়ামোদীর নিকট চ্যারিটি টিকিটের বিলি-বাঁটোয়ারার গূঢ়তত্ত্ব রহস্যাবৃত হয়ে আছে। শুধু সাধারণ ক্রীড়ামোদী কেন, আই এফ এ পরিচালক সমিতির তিনজন সভ্য এই খেলার অব্যবহিত পূর্বে চ্যারিটি খেলার টিকিট বিলি-বাঁটোয়ারার হিসাব জানবার জন্য সভাপতির নিকট যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন তারও কোন উত্তর দেওয়া হয়নি। যাই হোক মাঠের আসন-সংখ্যা এবং চ্যারিটি টিকিটের বিলি-বাঁটোয়ারা সম্পর্কে আমরা যে হিসাব অবগত হয়েছি তার উল্লেখ করছি। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল মাঠ সম্পর্কে এ হিসাব দেওয়া হচ্ছে। ক্যালকাটা মাঠের অসনসংখ্যা কিছু কম।

আসন সংখ্যা

৩৲ টাকার সাদা আসন	৪৫৭০
৩৲ টাকার নম্বরহীন স্ট্যান্ডিং টিকিট	৫০০
২৲ টাকার সবুজ আসন	৮০১৫
১৲ টাকার সাধারণ দর্শক আসন	৩৫০০
১৲ টাকার মিলিটারী আসন	৩০০
১৲ টাকার রেফারী আসন	১১২
নিমন্ত্রিত অতিথি (চেয়ার)	২৫০
সংবাদপত্র প্রতিনিধি (কম্‌প্লিমেণ্টারী)	৫০
মোট আসন	১৭৪৫৭

(এর মধ্যে রেডিওর প্রতিনিধি আই এফ এ স্টাফ প্রভৃতি ধরা হয়নি)

টিকিট বিলির হিসাব

১ম ডিভিসনের ১৫টি ক্লাবের মধ্যে	
ইস্টবেঙ্গল	৪২৭৫ খানা
মোহনবাগান	৩৮৫০ "
অপর ১৩টি ক্লাব ৫০ খানা করে	৬৫০ "
২য় ডিভিসনের ১৬টি ক্লাব ৩০খানা করে	৪৮০ "
৩য় ডিভিসনের ১৬টি ক্লাব ২০খানা করে	৩২০ "
৪র্থ ডিভিসনের ২০ খানা করে	৩২০ "
এলেন ও বেঙ্গল সকার লীগে ৪২টি ক্লাব......মোট	১৫৬ "
অফিস লীগ ১১টি ক্লাব মোট	২৫২ "
১৪টি জেলা এসোসিয়েশন ৫খানা করে	৭০ "
৩৪জন আই এফ এ সদস্য ১০খানা করে	৩৪০ "
রেফারী	১১২ "
মোট	১০৯০৫

নিমন্ত্রিত অতিথি, সংবাদপত্র প্রতিনিধি, মিলিটারী ও সাধারণ দর্শক আসন বাদে ১৩,৩৫৭ দর্শক আসনের মধ্যে ১০,৯০৫ খানা টিকিট বিলি করবার পর আই এফ এ-র নেতৃস্থানীয়দের হাতে থাকে ২,৪৫২ খানা টিকিট। এই টিকিট তারা নিজেদের খেয়াল খুশীমত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, লালবাজার, লালকুঠী এমনকি কংগ্রেস ভবন প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্থানের V. I. P.-দের নিকট বিলি করে থাকেন। [এই হিসাব আই এফ এ সম্পাদকের নিকট হইতে সংগৃহীত।]

ফুটবল লীগের সাপ্তাহিক আলোচনা

বিগত সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য খেলাগুলির মধ্যে শক্তিহীন জর্জ টেলিগ্রাফের হাতে মোহনবাগানের প্রথম পরাজয় এবং ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের চ্যারিটি খেলার কথাই প্রথম মনে আসে। প্রথম ডিভিসনের ১৫টি ক্লাবের মধ্যে একমাত্র মোহনবাগান ক্লাবই এতদিন অপরাজিত ছিল। গত মঙ্গলবার মোহনবাগানের পরাজয়ের পর লীগ তালিকার পরাজিতের কোঠা হতে 'শূন্য অঙ্ক' নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

মরসুমের প্রথম চ্যারিটি খেলায় মোহনবাগান ক্লাব ২—০ গোলে এরিয়ান ক্লাবকে হারিয়ে দিয়েছিল। এ খেলাতেও তারা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে ৩—১ গোলে হারিয়ে দিয়ে ক্রীড়া কুশলতার পরিচয় দিয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের তুলনায় মোহনবাগান এদিন অনেক ভাল খেলে। তারা আরও বেশী গোল করলেও কিছু অশোভন হত না। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের পরাজয়ের প্রথম কারণ ছিল তাদের দুর্বল টীমে অসংগতিপূর্ণ খেলা। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এইদিন এমন একজন খেলোয়াড়ের উপর তাদের গোল রক্ষার গুরুভার অর্পণ করে যাকে ইতিপূর্বে কোনদিন প্রথম বা দ্বিতীয় ডিভিসন লীগের কোন খেলায় অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। ফলে তিনটি গোলের মধ্যে গোলকিপারের ত্রুটির জন্যই ইস্টবেঙ্গলকে দুটি গোল খেতে হয়। তাদের পরাজয়ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। জীবনে কোন বড় খেলায় অংশ গ্রহণ না করেও ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের খেলায় প্রথম যোগদান করায় এই গোলরক্ষকের দৃঢ়চিত্ততা এবং দুঃসাহসের প্রশংসা করি। সমভাবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ খেলার সর্বাপেক্ষা দায়িত্বপূর্ণ স্থানে একজন কাঁচা খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নির্বাচক মণ্ডলীর অদূরদর্শিতার নিন্দা না করে পারি না। গোলরক্ষকের ত্রুটিপূর্ণ খেলা ছাড়াও ইস্টবেঙ্গলের ক্রীড়াধারার মধ্যে ছিল যথেষ্ট অসংগতি। আক্রমণভাগ এবং রক্ষণভাগের মধ্যে যেন কোনই সম্পর্ক ছিল না। আক্রমণ-

ভাগ যখন বল নিয়ে প্রতিপক্ষ গোলে হানা দিয়েছে, তখনও রক্ষণ বিভাগকে প্রতি আক্রমণের ভয়ে নিজেদের গোলের মুখেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে, ফলে দুই বিভাগের মাঝখানে এক বিরাট 'ফাটলের' সৃষ্টি হয় এই 'ফাটলই' মোহনবাগানের জয়লাভের পথ সুগম করে। মোহনবাগানের কাছে হার এবং তার আগের দুটি খেলায় পুরা চারিটি পয়েণ্ট নষ্ট হওয়ায় লীগ কোঠায় ইস্টবেঙ্গলকে তৃতীয় স্থানে নেমে আসতে হয়। মঙ্গলবার ফিরতি লীগের খেলায় ভবানীপুর ক্লাবকে পরাজিত করে আবার তারা দ্বিতীয় স্থানে উন্নীত হয়েছে।

জর্জ টেলিগ্রাফের মত শক্তিহীন ক্লাবের কাছে মোহনবাগানের প্রথম পরাজয় এ মরসুমের অন্যতম অপ্রত্যাশিত ফলাফল। প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সুস্পষ্ট প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশত মোহনবাগান ক্লাবকে এ খেলায় একটি 'আত্মঘাতী' গোলে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। মোহন-

ইংলণ্ড ও পাকিস্থানের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ইংলণ্ডের নূতন অধিনায়ক ডেভিড শেফার্ড

বাগানের এই পরাজয়ে লীগ প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থানীয় দলগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র পুনরায় প্রশস্ত হয়েছে। লীগের দৌড়ে অগ্রগামী চারটি দলের মধ্যে উয়াড়ী ক্লাব এ পর্যন্ত সবচেয়ে কম ৬ পয়েণ্ট হারিয়েছে; মোহনবাগান হারিয়েছে ৭ পয়েণ্ট, ইস্টবেঙ্গল এরিয়ান ৯ পয়েণ্ট করে।

বর্ষা শুরু হয়েছে। মাঠ পিচ্ছিল ও কর্দমাক্ত। বুটেড ফুটবলে যে কোন দিন অপ্রত্যাশিত ফলাফল হবার সম্ভাবনা। তাই শেষ নিষ্পত্তি পর্যন্ত লীগের আকর্ষণ বিদ্যমান থাকবে বলেই মনে হয়।

গত সপ্তাহে ই আই রেল দলের বিরুদ্ধে ভবানীপুর ক্লাবের প্রথম জয়লাভও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অবশ্য এই জয়লাভে ভবানীপুরের বিপন্মুক্ত হবার মত কোন সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। সার্ভিস টীমের সঙ্গে খিদিরপুর, ভবানীপুর, বি এন আর জর্জ টেলিগ্রাফ সবারই দ্বিতীয় ডিভিসনে নামবার আশংকা আছে।

কাস্টমস ক্লাব পুনরায় দ্বিতীয় ডিভিসন লীগ কোঠায় শীর্ষস্থানে আরোহণ করেছে। তবে দ্বিতীয় ডিভিসনের উপরের দিকে যেরূপ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাতে কারো পক্ষেই এ স্থানটি নিরাপদ নয়। প্রতিদিনই স্থানচ্যুত হবার সম্ভাবনা। সালকিয়া ফ্রেন্ডস, ক্যালকাটা ও সুবার্বন ক্লাব পিছু তাড়া করে চলেছে। জোড়াবাগান ও আরোরা এতদিন বেশ নীচের দিকে ছিল তারাও উপরে উঠে এসেছে। নীচের দিকে টাউন ক্লাবের অবস্থা সবচেয়ে সঙ্গীণ।

তৃতীয় ডিভিসনের তিনটি অপরাজিত দল বেনেপুকুর, ক্যালকাটা পুলিশ ও ইন্টারন্যাশন্যালের অবস্থাই ভাল। এলবার্ট স্পোর্টিংয়ের অবস্থাও মন্দ নয়। সুতরাং চ্যাম্পিয়ানসিপের লড়াইয়ে এখানেও জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নীচের দিকেও তিন চারটি দলকে ডিভিসনচ্যুত হবার আশংকা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হচ্ছে।

চতুর্থ ডিভিসনে এগিয়ে চলছে বাটা ও ঐক্য সম্মিলনী। এই দুটি টীমের একটির চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভের সম্ভাবনা। গত সপ্তাহের প্রথম ডিভিসন লীগের ফলাফল।

২৩শে জুন '৫৪

স্পোর্টিং ইউনিয়ান (২)	বি এন আর (০)
মহঃ স্পোর্টিং (০)	জর্জ টেলিগ্রাফ (০)

২৪শে জুন '৫৪

কালীঘাট (৩)	রাজস্থান (০)

২৫শে জুন '৫৪

এরিয়ান (২)	স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০)
ভবানীপুর (৩)	ই আই আর (১)
জর্জ টেলিগ্রাফ (০)	বি এন আর (০)

২৬শে জুন—চ্যারিটি ম্যাচ

মোহনবাগান (৩)	ইস্টবেঙ্গল (১)

২৮শে জুন '৫৪

কালীঘাট (২)	বি এন আর (০)
উয়াড়ী (০)	স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০)
পুলিশ (০)	খিদিরপুর (০)

২৯শে জুন '৫৪

জর্জ টেলিগ্রাফ (১)	মোহনবাগান (০)
ইস্টবেঙ্গল (১)	ভবানীপুর (০)
এরিয়ান (৪)	কালঃ সার্ভিস (১)

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা সমাপ্তির মুখে এসে পৌঁছেছে। হাঙ্গেরী এবং ব্রেজিলের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার যে বিবরণ দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে তা পড়ে অনেকেই স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। বিশ্ব প্রাধান্য প্রতিযোগিতার খেলাতেই যদি খেলোয়াড়দের মধ্যে অখেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তবে অন্য ক্ষেত্রে কি আশা করা যেতে পারে! এ সম্পর্কে পরে আলোচনার ইচ্ছে রইলো। গত সপ্তাহে বিশ্ব প্রতিযোগিতার কতগুলি খেলার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। পরের খেলাগুলির ফলাফল এ সপ্তাহে প্রকাশ করছি।

মূল প্রতিযোগিতা

সুইজারল্যাণ্ড (৪)	:	ইটালী (১)
জার্মানী (৭)	:	তুরস্ক (২)

কোয়ার্টার ফাইন্যাল

উরুগুয়ে (৪)	:	ইংল্যাণ্ড (২)
হাঙ্গেরী (৪)	:	ব্রেজিল (২)
অস্ট্রিয়া (৭)	:	সুইজারল্যাণ্ড (৫)
জার্মানী (২)	:	যুগোশ্লাভিয়া (০)

সেমি-ফাইন্যালের তালিকা

উরুগুয়ে	:	হাঙ্গেরী
অস্ট্রিয়া	:	জার্মানী

পাকিস্থানের অধিনায়ক আব্দুল হাফিজ কারদার

ইংলণ্ডে পাকিস্থানের প্রথম পরাজয়

ইংলণ্ডে পাকিস্থান ক্রিকেট দল ১৩টি খেলার মধ্যে চারটি খেলায় জয়লাভ এবং বাকী ৯টি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করবার পর চতুর্দশ খেলায় ইয়র্কশায়ারের নিকট প্রথম পরাজয় স্বীকার করেছে। তিনদিনব্যাপী খেলার শেষ দিনে ইয়র্কশায়ার দল পাকিস্থানকে ৭ উইকেটে পরাজিত করে।

১লা জুলাই থেকে ইংলণ্ড ও পাকিস্থানের মধ্যে আরম্ভ হচ্ছে দ্বিতীয় টেস্ট খেলা। হাটন অসুস্থ থাকায় সাসেক্স কাউণ্টির খেলোয়াড় ডেভিড শেফার্ডের উপর ইংলণ্ড দলের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২১শে জুন—পূর্ববঙ্গে গভর্নরী শাসন বলবৎ হওয়ার পর মিলিটারী ও পুলিশের দৌরাত্ম্য, বেপরোয়া তল্লাসী ও গ্রেপ্তার এবং ভীতি প্রদর্শনের ফলে হিন্দুদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে এবং তাঁহাদের বাস্তুত্যাগের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতকে বর্তমান আর্থিক বৎসরে ১০ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার সাহায্য দানের সুপারিশ করিয়া মার্কিন সরকার কংগ্রেসের নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার আর্থিক সাহায্যের আকারে ৪ কোটি ডলার গম, তুলা ইত্যাদি কৃষি পণ্য বাবদ এবং ১ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার কারিগরী সাহায্য বাবদ দেওয়া হইবে বলিয়া ভারতস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ জর্জ এলেনের এক বিবৃতি হইতে জানা যায়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনারের নির্দেশে শহরের মারাত্মক জীর্ণ ভবন ভূমিসাৎ করার কাজ আজ হইতে আরম্ভ করা হয়।

আগামী ৩০শে জুন যোধপুরে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দৃশ্য হইবে বলিয়া ভারত সরকারের মানমন্দির বিভাগ এ সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। ১৮৯৮ সালে জানুয়ারী মাসের পর এই প্রথম ভারতে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দৃষ্ট হইবে।

২২শে জুন—ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আজ আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় সভাপতি রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি বলেন যে, শ্যামাপ্রসাদ যাহা কিছু করিয়াছেন, দেশের প্রতি গভীর ভালবাসার প্রেরণায়ই করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপিত নির্দিষ্ট এলাকায় কৃষকগণ যাহাতে ময়ূরাক্ষীর বাঁধের জল বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহার করে, তজ্জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি অর্ডিন্যান্স জারী করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

২৩শে জুন—স্বর্গত দেশনায়ক শরৎচন্দ্র বসুর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা বিভাবতী বসু আজ রাত্রি ১০-১২ মিনিটের সময় তাঁহার উডবার্ন পার্কের ভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৫৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

আজ প্রাতে কলিকাতা হইতে প্রায় ২৫ মাইল দূরে হুগলী জেলার অন্তর্গত চাম্পসারা গ্রামের পাট ক্ষেতে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একখানি ডাকোটা বিমান বিধ্বস্ত হয়। বিমানে ভারতীয় বিমান বাহিনীর ৫ জন অফিসার ও ১ জন সার্জেণ্ট মোট ছয়জন আরোহী ছিলেন; তাঁহারা সকলেই নিহত হন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ডিগ্রিতে প্রারম্ভিক ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যক্ষ্মারোগের একটি আরোগ্যোত্তর স্বাস্থ্য নিবাস ও কলোনী স্থাপনের এক পরিকল্পনা করিয়াছেন।

২৪শে জুন—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু আজ ঘোষণা করেন যে, পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সমস্যার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি এইরূপ আশ্বাস দান করেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় সরকার এই সমস্যার প্রতি সর্বতোভাবে দৃষ্টি দিবেন।

পণ্ডিচেরীতে ফরাসী ভারতের কর্তৃপক্ষের নিকট জাহাজযোগে তিন শতাধিক পেটি গোলাবারুদ আসিয়া পৌঁছিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। অদ্য পণ্ডিচেরী বন্দরে জাহাজটি উপনীত হয়।

২৫শে জুন—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরুর আমন্ত্রণে চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই অদ্য বিমানযোগে নয়াদিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিলে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। অপরাহ্ন সাড়ে তিন ঘটিকায় নয়াদিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরুর বাস ভবনে এশিয়ার দুইটি প্রধান রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রিদ্বয় শ্রী নেহরু ও চৌ এন লাই-র মধ্যে ঐতিহাসিক বৈঠক আরম্ভ হয়। এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইবে, এইরূপ আশা ও আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে এই বৈঠকের সূচনা হয়।

মিঃ চৌ এন লাই সাংবাদিকগণের নিকট এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে বলেন, চীন ও ভারতের ৯৬ কোটি অধিবাসীর বন্ধুত্ব এশিয়ায় ও বিশ্বে শান্তিরক্ষার দিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আসাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত গোয়ালপাড়া জেলার বঙ্গ ভাষী অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করা হইয়াছে তাহাতে গোয়ালপাড়াকে পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করার দাবী উত্থাপিত হইয়াছে।

২৬শে জুন—নয়াদিল্লীতে নেহরু-চৌ এন লাই আলোচনা শেষ হইয়াছে। প্রকাশ, শ্রীনেহরু বর্তমান বৎসরের কোন সময়ে চীন ভ্রমণে যাইবেন।

আজ শিয়ালদহ স্টেশনে পাকিস্থানগামী মালপত্র তল্লাসীর ফলে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলের ২১টি গুরুত্বপূর্ণ 'ব্লু প্রিন্ট' পাওয়া গিয়াছে এবং স্থল শুল্ক বিভাগ ঐগুলি আটক করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

শিলিগুড়ীর সংবাদে প্রকাশ, দার্জিলিং জেলাকে বিহারের অন্তর্ভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে আন্দোলন সৃষ্টির জন্য বিহারী নেতৃবৃন্দ চা শ্রমিকদের মধ্যে অর্থ বিতরণ এবং ঘৃণিত প্রচারকার্য করিতেছেন।

২৭শে জুন—চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই আজ নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, গত কয়দিনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত তাঁহার যে আলোচনা হইয়াছে তাহা এসিয়া তথা সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ততর করিবার পক্ষে সহায়ক হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন।

বিদেশী সংবাদ

২১শে জুন—গুয়াতেমালায় রক্তপাত বন্ধ করিতে আহ্বান জানাইয়া রাষ্ট্রপুঞ্জ নিরাপত্তা পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

গুয়াতেমালার প্রেসিডেণ্ট আরবেন অদ্য সমগ্র দেশে সামরিক আইন জারী করেন।

২২শে জুন—গুয়েতামালা সেনা কর্তৃপক্ষের ইস্তাহারে প্রকাশ, সরকারী বাহিনী ও হানাদার 'মুক্তি ফৌজের' মধ্যে প্রথম সংঘর্ষের পর বিদ্রোহীরা পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়।

হক মন্ত্রিসভা ক্ষমতাচ্যুত হইবার পর পূর্ব পাকিস্থানে এ পর্যন্ত ১০৬৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

২৩শে জুন—পূর্ববঙ্গে মার্কিন ইঞ্জিনীয়ারদের তত্ত্বাবধানে আরও ১০টি বিমান ঘাটি নির্মিত হইবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, মার্কিন বিশেষজ্ঞগণ বড় বড় স্টেশন ও বন্দরের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিতেছেন। আরও প্রকাশ যে, মুসলিম লীগের প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমেরিকা পাকিস্থান গভর্নমেণ্টকে ৫০ কোটি টাকা খয়রাতি দান হিসাবে দিবেন।

২৫শে জুন—বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিল অদ্য বিমানযোগে ওয়াশিংটনে পৌঁছেন। রাত্রি ৯-৩০ মিনিটের সময় হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ও স্যার উইনস্টন চার্চিলের মধ্যে বিশ্বের সমস্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয়।

২৭শে জুন—গতকল্য রাত্রে গুয়াতেমালা শহরে বিমান আক্রমণের ফলে সাতজন নিহত হইয়াছে। বিদ্রোহীরা অভিযানকারী দলের নেতা কর্নেল ক্যাস্টিলো আরমাসের নেতৃত্বে একটি অস্থায়ী সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করিয়াছে।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষান্মাসিক—১০৲

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : **আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।**

২১ বর্ষ
সংখ্যা ৩৬

দেশ

DESH

SATURDAY, 10TH JULY, 1954.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ
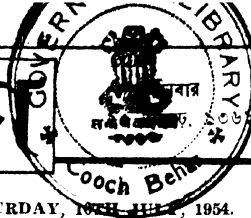
নেতৃত্বের মর্যাদা

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের ত্রিপঞ্চাশৎ জন্ম-তিথি উপলক্ষে কলিকাতা এবং বাঙলার বিভিন্ন স্থানে তাঁহার স্মৃতিপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্যামাপ্রসাদের জীবন-ব্যাপী সাধনা এবং দেশ ও জাতির উদ্দেশে তাঁহার আত্মোৎসর্গ দেশবাসীর অন্তরে তাঁহাকে অমর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তিনি কর্মী ছিলেন। তিনি অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ এবং প্রতিভা-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। কিন্তু শুধু কর্মের আড়ম্বর কিংবা রাজনীতিক জ্ঞান বা প্রতিভাই মানুষকে অমরত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। কর্মের মূলে প্রাণবত্তা এবং রাজনীতিক প্রতিভার মূলে দেশের প্রেরণায় ত্যাগ, তপস্যা এবং আত্ম-দানের বীর্য নেতৃত্বের মর্যাদাকে পরিস্ফুট করিয়া তোলে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, নেতা হওয়া কি সহজ কথা; সকলের সেবায় নিজেকে বিকাইয়া না দিলে নেতা হওয়া যায় না। শ্যামাপ্রসাদ নেতার এই যে বিশিষ্ট গুণ, ইহার অধিকারী ছিলেন। রাজনীতিক সাধনায় তাঁহার প্রখর নির্ভীকতার পরিচয়ে তাঁহার বিরোধীপক্ষ স্তম্ভিত হইত, সন্ত্রস্ত এবং শঙ্কিত থাকিত, কিন্তু দেশের বিপুল জনসাধারণ নিজেদের দুঃখ-দুর্গতিতে শ্যামাপ্রসাদকে একান্তই আপনার করিয়া পাইয়াছিল। ফলত শুধু কথার প্যাঁচ খেলিয়া দেশের সকলের এমনভাবে আপন জন হওয়া সম্ভব নয়, ত্যাগধর্মে জীবনকে দীপ্ত করিয়া তবে সমষ্টি মনের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা জমাইয়া তোলা যায়। বাঙলার জাতীয় জীবনে ত্যাগের বিভূতি-প্রলিপ্ত, প্রদীপ্ত কর্মসন্ন্যাসীর আরও আবির্ভাব ঘটিয়াছে এবং তাহা ঘটিয়াছে বলিয়াই বাঙ্গালী বহু বিপর্যয় এবং দুর্গতি সত্ত্বেও আজও বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। শ্যামাপ্রসাদের জীবনে বাঙলার প্রাণ-ধর্মের সেই প্রদীপ্তিই আমরা উপলব্ধি করিয়াছি। আমরা তাঁহার কর্ম-মূলে বীর্যগর্ভ তাঁহার অন্তরের স্পর্শ নিজেদের মধ্যে পাইয়াছি এবং সেই স্পর্শে দেশ ও জাতির বৃহত্তর ভাবনার প্রতিবেশ আমাদের নিকট উজ্জ্বল হইয়াছে। বাঙলা দেশে নেতার অভাব নাই, এ পরিচয় তো প্রত্যহই নানাভাবে পাইতেছি। কিন্তু কোথায় বৃহতের বেদনায় আত্মোৎসর্গের অগ্নিময় সেই উদ্দীপনা? শ্যামাপ্রসাদের স্মৃতিপূজায় জাতি সেই অগ্নিরই উদ্বোধন করিয়াছে। নেতাদের উপদেশের কূটচক্র কাটাইয়া খুঁজিয়াছে আত্মারই উন্মেষ।

বাঙলা ভাষার বিরুদ্ধে অভিযান

সম্প্রতি বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রিদ্বয়ের মধ্যে পাটনায় একটি বৈঠক হইয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত অতুল্য ঘোষ এবং বিহারের অপর কয়েকজন মন্ত্রী এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষা সম্পর্কে অবলম্বিত নীতির সম্বন্ধেই শুধু এই আলোচনা হয়। সীমানা পুনর্গঠনের প্রশ্ন এই আলোচনায় একেবারেই উঠে নাই। বলা বাহুল্য এই আলোচনার সম্বন্ধে আমরা বিশেষ আশা-শীল নহি। কয়েক ঘণ্টা আলোচনার ফলেই যে বিহার সরকারের এতাবৎ-কাল অবলম্বিত নীতি বা তাঁহাদের মতিগতির পরিবর্তন ঘটিবে, ইহা আশা করা যায় না। সৌজন্যের মামুলী ধারা এই ধরণের আলোচনায় সব ক্ষেত্রেই অক্ষুণ্ণ থাকে, কারণ সবই কাগজে-পত্রে কেতাদুরস্ত ব্যাপার। বাঙলা ভাষার মহিমার কথা মুখে মুখে বিহারের নেতারা অনেকে কীর্তন করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের কাজের ধারা চলে অন্যদিকে। সম্প্রতি শিলচর, হাইলাকান্দি ও করিম-গঞ্জ সফরে বাহির হইয়া আসামের মুখ্য-মন্ত্রী এবং পুনর্বাসন সচিবের মুখেও আমরা বাঙলা ভাষার মাহাত্ম্য কীর্তন শুনিয়াছি। আসামের মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন —বাঙলা ভাষা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। রবীন্দ্রনাথের অবদানে বাঙলাভাষা আজ বিশ্ববন্দিত। জোর করিয়া এই ভাষা দমনের কথা কল্পনাও করা যায় না। পুনর্বাসন মন্ত্রী বৈদ্যনাথ মুখার্জী নিজে বাঙালী। তিনি বলিয়াছেন, আমাকে যদি মন্ত্রিত্বের জন্য বাঙলাভাষা ত্যাগ করিতে হয়, তবে আমি মন্ত্রিত্বের উপর পদাঘাত করিয়া চলিয়া আসিব। কথাগুলি শুনিতে খুবই ভাল। কিন্তু সম্প্রতি করিমগঞ্জে আসাম-ত্রিপুরা-মণিপুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্মেলনে আসাম সরকারের ভাষা সম্পর্কিত নীতির তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে। সম্মেলনে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের সংবিধানসম্মত মৌলিক অধিকার হইতে আসামের বাঙ্গালী সমাজকে বঞ্চিত করিয়া বাঙ্গালীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটাইবার জন্য আসামের সরকারী নীতি পরিচালিত হইতেছে এবং সেই সঙ্গে বেসরকারী ষড়যন্ত্রও আছে।

সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তথ্য সহযোগে আসাম সরকারের নীতির স্বরূপ উন্মুক্ত করিয়াছেন। এইসব উক্তি এবং বিবৃতি উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার বলিয়া উপেক্ষিত হইবার যোগ্য নিশ্চয়ই নয়। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা লাভ করিবার পর ভাষাকে ভিত্তি করিয়া প্রাদেশিকতার ভাব উত্তরোত্তর তীব্র আকার ধারণ করিতেছে। আসামের মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি যে নীতি ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা বাস্তব ক্ষেত্রে কতটা কার্যে পরিণত হইতেছে, তৎপ্রতি সচেতন থাকা বর্তমানে আসাম সরকারের একান্ত কর্তব্য। বিভিন্ন ভাষার উন্নতি এবং সম্প্রসারণ সুযোগের ভিতর দিয়াই সমগ্র ভারতের বৃহত্তর সংহতি সাধন সহজ এবং স্বাভাবিক, এ সত্য তাঁহারা যেন বিস্মৃত না হন।

উত্তরবঙ্গে বন্যা

তিস্তা নদীতে প্রবল বন্যার ফলে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হইয়াছে। ১৫ হাজার অধিবাসী নিদারুণ দুরবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াছে। জলপাইগুড়ি বন্যা সাহায্য কমিটির সম্পাদক দুর্গত জনসাধারণের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবার জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন করিয়াছেন। উত্তরবঙ্গে বন্যা প্লাবন এই নূতন নয়। ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে তিস্তা নদীর বন্যায় বহু নরনারী বিপন্ন হয়। বর্তমান বৎসরের বন্যা সেই বন্যার অপেক্ষাও ভয়াবহ বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বন্যাপীড়িত নরনারীর সাহায্যের জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া ভরসা দিয়াছেন। কিন্তু হাজার হাজার নরনারীর অন্ন, আশ্রয় এবং গৃহের সংস্থান করার সমাধান সামান্য নয়। বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলের শস্য একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কয়েক মাস পর্যন্ত বিপন্ন নরনারীর সাহায্য ব্যবস্থা বলবৎ রাখিতে হইবে। আর্ত এবং পীড়িতের আবেদন বাঙ্গালী কোনদিন উপেক্ষা করে নাই। বস্তুত জনগণের সেবায় আত্মনিবেদনের আদর্শকে অবলম্বন করিয়াই বাঙলার বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদ বিকাশ লাভ করিয়াছে। আমরা আশা করি, উত্তরবঙ্গের বন্যাপীড়িত নরনারীর রক্ষা-কার্যে বাঙ্গালী অবিলম্বে অগ্রসর হইবে এবং বাঙলার বিভিন্ন বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মিগণ এই পুণ্য ব্রতে আত্মনিয়োগ করিবেন। সরকারী সাহায্য ব্যবস্থা এই সব কর্মীদের সহযোগিতায় পীড়িত অঞ্চলের সর্বত্র সম্প্রসারিত হওয়া আবশ্যক। বলা বাহুল্য, সাহায্য ব্যবস্থায় বিলম্ব ঘটিলে সমস্যা নানা আকারে জটিল হইয়া উঠিবে এমন আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে, এই ধরনের দুর্বিপাকের পর সত্বর প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে নানাবিধ সংক্রামক রোগ দেখা দেয় এবং লোকের প্রাণহানির কারণ ঘটে। এক্ষেত্রে তেমন সংকট যাহাতে দেখা না দেয়, তজ্জন্য পূর্বে হইতে ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, দেশবন্ধু দাশ, সুভাষচন্দ্রের দেশ—পশ্চিমবঙ্গ মানবসেবার এই মহান্ ব্রতে উদ্বুদ্ধ হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রাষ্ট্রভাষা প্রসারের পথ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনারের নিকট পশ্চিমবঙ্গের সীমানা পুনর্গঠনের দাবী করিয়া স্মারকলিপি দাখিল করিয়াছেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস যে স্মারকলিপি ইতঃপূর্বে দাখিল করিয়াছেন, সরকারী স্মারকলিপি তাহারই অন্তর্ভুক্ত। স্মারকলিপিতে পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, সিংহভূম এবং আসামের গোয়ালপাড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদের স্মারকলিপিতে একটা কথা খুবই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, হিন্দী ভাষাভাষী রাজ্যে রাজ্য সরকারের অন্য প্রাদেশিক ভাষার সম্বন্ধে যতই সদিচ্ছা থাকুক না কেন, অন্য প্রাদেশিক ভাষাকে দমন করিবার প্রতিবেশ সেখানে সৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা নানা কারণেই রহিয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দী, হিন্দীর সম্প্রসারণের জন্য সব রাজ্য সরকারই চেষ্টা করিবেন, ইহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ইচ্ছার সঙ্গে রাজ্যের প্রাদেশিক ভাষাকে উন্নয়নের ইচ্ছা যদি যুক্ত হয়, এবং সেজন্য আগ্রহটা কিছু বেশী রকমে দেখা দেয়, তবে উক্ত রাজ্যের অন্য ভাষাভাষী শ্রেণীর মনে অভিযোগে[র] কারণ দেখা দিবে এবং বিক্ষোভও সৃ[ষ্টি] হইবে। ইহার ফলে সমগ্র রাষ্ট্রের সং[হতি] ক্ষুণ্ণ হইতে বাধ্য। কিন্তু যে রাজ্য হি[ন্দী] ভাষাভাষী নহে, সেখানে হিন্দী ভা[ষা]ভাষীদের পক্ষে সেরূপ আশঙ্কার কা[রণ] নাই। কারণ, হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হওয়া[য়] কোন রাজ্য সরকারই হিন্দীকে দ[মন] করিতে পারিবেন না, পরন্তু সব রা[জ্যে] হিন্দীর সম্প্রসারণ সুযোগ থাকি[বে]। এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দী[র] সম্প্রসারণ এবং সেই সঙ্গে অখণ্ড ভা[রতের] সংহতি সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে হ[ইলে] হিন্দী ভাষাভাষী রাজ্য হইতে [অ]-প্রাদেশিক ভাষাভাষী অঞ্চলগুলিকে য[থা]সম্ভব সেই ভাষাভাষী রাজ্যের অ[ন্তর্ভুক্ত] হইতে দেওয়াই সমীচীন। শুধু এই প[থে] ভাষাগত জটিল সমস্যার সহজে স[মাধান] হইতে পারে এবং হিন্দী শিক্ষার [প্রতি] সব রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে [আগ্রহ] জাগ্রত হওয়া সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গ সর[কার] তাঁহাদের স্মারকলিপিতে এ ক[থা] স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, [ভাষার] ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি ... বৎসর হইতেই আদর্শ বলিয়া ... হইয়া আসিয়াছে। কংগ্রেস সে নী[তি] সমর্থন করিয়াছে এবং ঐ ... মহাত্মা গান্ধীর আশীর্বাদ লাভ করিয়া[ছে]। বাস্তবিক পক্ষে রাজ্য পুনর্গঠনের ক্ষে[ত্রে] অন্যদিকে বিবেচনা করিবার কিছুই ন[াই] আমরা একথা বলি না; কিন্তু ভা[ষার] গুরুত্বই এক্ষেত্রে সমধিক। স্বাধী[নতা] লাভ করিবার পূর্ববর্তীকালে ভা[রতের] বিশিষ্ট রাজনীতিকগণ প্রধানত ভা[ষার] ভিত্তিতেই রাজ্য পুনর্গঠনের প্রয়ো[জনীয়তা] দেখিতে পাইয়াছিলেন এব[ং] তাঁহারা ঐ বিষয়টিকে বিশেষ গু[রুত্ব] দিয়াছেন। বিদেশীর কূট শাসন-নীতি[র] মূলে তাঁহারা একদিন যে অন্যায় [ও] অবিচার একান্তভাবে উপলব্ধি করি[য়া]ছিলেন, বিদেশীর শাসন উৎখা[ত] হইবার পরে সেইগুলিই আমাদের প[ক্ষে] কল্যাণকর হইয়া পড়িয়াছে, এমন ... গতানুগতিক রীতির অনুকূলে হই[তে] পারে, কিন্তু স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রী[য়] অভিব্যক্তির পক্ষে নিশ্চয়ই অনুকূ[ল] নহে।

উত্তর ইন্দোচীনে, হ্যানয় শহরের নিকটবর্তী ১৬০০ বর্গমাইল পরিমাণ একটি এলাকা থেকে ফরাসীরা সরে এসেছে। এর তাৎপর্য কী সেই নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলছে। ফরাসীদের এই পশ্চাদপসরণ ভিয়েৎমিনের পক্ষে একটা বড়ো সাফল্য সন্দেহ নেই। তবে শুনা যাচ্ছে ফরাসীরা নাকি কিছুদিন পূর্ব থেকেই এর উদ্যোগ করছিল। যতদূর পর্যন্ত রক্ষা করা সম্ভব তার চেয়ে বেশি এলাকায় বিক্ষিপ্ত হয়ে থেকে লাভ নেই, ফরাসীরা এটা বুঝেছে। কেউ কেউ বলছে দুই পক্ষের মধ্যে ভাগরেখা কোথায় টানা হবে তার একটা আন্দাজ উভয়পক্ষই করে নিয়েছে এবং সেই লক্ষ্য করেই ফরাসীরা সরে এসেছে। অবশ্য উভয় পক্ষই মুখে বলছে যে ইন্দোচীনের রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকটির ঐক্য রক্ষা করে ইন্দোচীনের সমস্যার সমাধান করতে হবে। কোরিয়ার ঐক্য সম্বন্ধেও তো অনুরূপ কথা আমরা শুনেছি ও শুনছি। কিন্তু কার্যত কী হচ্ছে? ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতি হতে হলেও সেখানেও একটা ভাগরেখা টানতে হবে এবং যুদ্ধবিরতির জন্য যে সামরিক ভাগরেখা টানা হবে সেইটেই যে রাজনৈতিক ভাগরেখা হয়ে দাঁড়াবে সেকথা উভয় পক্ষই জানে। সেই হয়েছে মুশকিল।
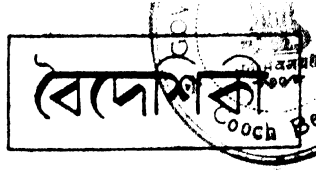
নূতন ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মঃ মেঁদে ফ্রাঁস ফরাসী পার্লামেণ্টকে কথা দিয়েছেন যে এক মাসের মধ্যে যদি তিনি শান্তি আনতে না পারেন তবে পদত্যাগ করবেন, ২০এ জুলাই পর্যন্ত তাঁর সেই সর্তের মেয়াদ আছে। এর মধ্যে যদি যুদ্ধবিরতি না হয় তবে পরে হওয়া আরো কঠিন হবে, কারণ আমেরিকার মন অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হয়ে রয়েছে। মঃ মেঁদে ফ্রাঁস যদি সফলকাম না হন এবং পদত্যাগ করেন তবে তার পরের অবস্থা কী হবে বলা যায় না। মঃ মেঁদে ফ্রাঁসের পক্ষেও এমন সর্ত স্বীকার করে নেয়া সম্ভব নয় যা ফ্রান্সের 'আত্মসমর্পণের' মতো দেখাবে। সামরিক দিক থেকেও ফ্রান্স ইন্দোচীন থেকে এখনই সরে আসবে—এরূপ কোনো কল্পনা মঃ মেঁদে ফ্রাঁসের নেই কারণ ইন্দোচীনে ফরাসী বাহিনীকে জোরালো করার জন্য ফ্রান্স থেকে আরো সৈন্য পাঠাবার ব্যবস্থা তিনি করছেন। মঃ মেঁদে ফ্রাঁসের সঙ্গে একটা সমঝোতা না হলে পরে মার্কিন প্রভাবে ঘটনার স্রোত এমন ধারায় প্রবাহিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে যা কম্যুনিস্ট পক্ষের আদৌ বাঞ্ছিত হবে না—এই ধারণা যদি কম্যুনিস্ট পক্ষের হয়ে থাকে তবে যুদ্ধবিরতি হওয়ার আশা রয়েছে। সম্প্রতি যুদ্ধক্ষেত্রে দুই পক্ষের অফিসারদের মধ্যে কথাবার্তা হয়ে আহত ও পীড়িত যুদ্ধবন্দীদের বিনিময়ের যে চুক্তি হয়েছে তা থেকে যুদ্ধবিরতির অনুকূল মনোভাবের একটা আভাস পাওয়া যায়।

চীন প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই দিল্লীতে এবং রেঙ্গুনে যান। সেখান থেকে পিকিং যাবার পথে চীন-ভিয়েৎনাম সীমানার কাছাকাছি কোথাও ডক্টর হো চি মিন-এর সঙ্গে তাঁর দেখা ও কথাবার্তা হয়েছে বলে সংবাদে প্রকাশ। মিঃ চৌ ডক্টর হোকে কি পরামর্শ দিয়েছেন তার উপর ইন্দোচীনের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে। মিঃ চৌ-এর যদি ধারণা হয়ে থাকে যে, এখন একটা সমঝোতা না হলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন প্রভাবান্বিত সামরিক জোটবন্দির প্রচেষ্টা অচিরে জোরদার হয়ে উঠবে এবং এমন একটা অবস্থারও উৎপত্তি হতে পারে যাতে চীনকে সাক্ষাৎভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হবে, তাহলে মিঃ চৌ ডক্টর হোকে ফরাসীদের সঙ্গে একটু নরম সুরে কথা কওয়ার পরামর্শ দেবেন যাতে যা-হোক অন্তত সাময়িক ভাবেও একটা যুদ্ধ নিবৃত্তির ব্যবস্থা হয়, যেমন কোরিয়ায় হয়েছে। কারণ চীন নিশ্চয়ই সাক্ষাৎভাবে এখন কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চায়
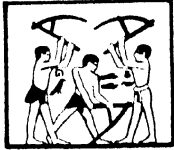
না। যদি চীন বোঝে যে আমেরিকার হুমকি ভবিষ্যতে ফাঁকা আওয়াজে পরিণত হবে না তাহলে অনেক দাবী ছেড়ে দিয়েও হো চি মিনকে একটা মিটমাট করার জন্য চীন পরামর্শ দেবে।

এতদিন পর্যন্ত বৃটেন ইন্দোচীনে সাক্ষাৎভাবে ফ্রান্সের পক্ষে নামতে রাজী হচ্ছে না বলেই আমেরিকার পূর্বেকার হুমকি ফাঁকা আওয়াজে পরিণত হয়েছে কিন্তু মঃ মেঁদে ফ্রান্সের চেষ্টা বিফল হলে তারপর কি হবে বলা যায় না। বৃটেন যতই ইতস্তত করুক না কেন চার্চিল সাহেবকে এবার ওয়াশিংটনে নিশ্চয়ই পূর্বের চেয়ে একটু বেশি বাঁধাবাঁধির মধ্যে আসতে হয়েছে অর্থাৎ একটা কোনো সীমা নির্দিষ্ট হয়েছে যার এদিকে কম্যুনিস্ট প্রভাবের বিস্তার সামরিক উপায়ে প্রতিহত করার উদ্যোগে বৃটেনকেও সাক্ষাৎভাবে যোগ দিতে হবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 'প্রতিরক্ষার' জন্য যে সামরিক প্যাক্টের প্রস্তাব আমেরিকা করেছে সে প্রস্তাব কার্যে পরিণত করার প্রচেষ্টাও আরম্ভ হয়ে গেছে। এটা ঠেকানো সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। ভারতবর্ষের সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও যেখানে পাক-মার্কিন চুক্তি ঠেকানো যায়নি সেখানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সম্পর্কে মার্কিন প্রস্তাবিত সামরিক চুক্তি ঠেকানো যাবে, এরূপ আশা বৃথা বলে মনে হয়।

* * *

তিউনিশিয়া ও মরক্কোতে ফরাসীরা প্রবল চণ্ডনীতি প্রয়োগ করেও স্বাধীনতা-কামী জাতীয়তাবাদীদের দমন করতে পারছে না। তিউনিসিয়া ও মরক্কো উভয় দেশেই অশান্তি ক্রমশ বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি অবস্থা এমন হয়েছে যে, ফ্রান্স থেকে বহু নূতন সৈন্য তিউনিসিয়া ও মরক্কোতে আনতে হয়েছে। ইন্দোচীনের চেয়ে মরক্কো ও তিউনিসিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া ফ্রান্সের পক্ষে আরো কঠিন সেই-জন্য যতদিন সম্ভব মরক্কো ও তিউ-নিসিয়াকে স্বকবলিত করে রাখা যায় ফ্রান্স সেই চেষ্টা করবে। ইন্দোচীনের জাতীয়তাবাদী শক্তি অবশ্য মরক্কো ও তিউনিসিয়ার স্বাধীনতাকামীদের শক্তির তুলনায় অনেক বেশি। ইন্দোচীনের স্বাধীনতার যোদ্ধাদের আরো অনেক সুবিধা আছে যা মরক্কো ও তিউনিসিয়ায় নেই। তাছাড়া তিউনিসিয়া ও মরক্কো ফরাসীদের ঘরের কাছে। তবে ইন্দোচীনে যদি ফরাসী ঔপনিবেশিক শক্তির হার হয় তবে তার প্রতিক্রিয়া মরক্কো ও তিউ-নিসিয়াতে অবশ্যই প্রবলভাবে অনুভূত হবে।

* * *

গুয়াটেমালার 'বিপ্লবের' সফল অবসান হয়েছে। নূতন গভর্নমেন্টের যে কর্মসূচী প্রকাশিত হয়েছে তাথেকে এই ধারণাই দৃঢ় হলে যে বিদেশী, বিশেষ করে মার্কিন স্বার্থের খাতিরেই এই 'বিপ্লব' সাধিত হোল। প্রেসিডেন্ট আরবেঞ্জের গভর্নমেন্টে কম্যুনিস্ট প্রভাব কতখানি ছিল তা ঠিক করে জানার উপায় নেই। তবে বর্তমানে যাদের হাতে শক্তি এলো তারা যে কেবল উগ্র দক্ষিণপন্থী তা নয়, তারা বিদেশী পুঁজিপাতিদেরও পরম বন্ধু দেখা যাচ্ছে।

৭।৭।৫৪

কলহপর

শঙ্খ ঘোষ

যতো তুমি বকোঝকো, মেরে কেটে করো কুচিকুচি—
আমি কিন্তু তবু বলব এ-সবেই আন্তরিক রুচিঃ
ঘরে থাকতে অল্প মতি, রোদে রোদে পথে ঘুরে ফেরা,
আকাশে বিচিত্র মেঘ নানা ছন্দে তোলে যে অপেরা
তাতে লুপ্ত হতে হতে রুক্ষ চুলে বাড়ি ফিরে আসা—
পোড়া মুখে চিহ্ন তার অকুণ্ঠ বিস্মিত ভালোবাসা!
ক্ষিদের তৃষ্ণায় টলে কণ্ঠাবধি সমস্ত শরীর,
অভ্যাস মরে না জেনে দুই চোখে তুমি তোলো তীর
তা সত্ত্বেও বিনা স্নানে ভালো লাগে মধ্যাহ্ন ভোজন!

স্বাস্থ্যকে তা ক্ষুণ্ণ করে, দিনে দিনে কমায় ওজন,
ভদ্রতা বিপন্ন হয়, নানা জনে করে কানাকানি,
এ সবই যে দুঃখপ্রদ—সন্দেহ কী—অবশ্য তা মানি।
কিন্তু তবু নিরুপায়, স্বভাবে যে পৃথিবীর মুঠি
তাকে আলগা করা তার সাধ্য নয়! প্রকাণ্ড ভ্রূকুটি
প্রকাণ্ড দুর্বৃত্ত দিন মুষড়ে পড়ে যে-আমার পায়ে—
সে যে মরে ছুটে ছুটে মগ্ন হয়ে বিবিধ অন্যায়ে
তাকে কী ফেরাব আমি! অসম্ভব অসম্ভব প্রিয়,
আমাকে ভুবন দাও আমি দেব সমস্ত অমিয়!!

আমাদের এখানটায় যাতায়াতের একমাত্র যান সাইকেল রিক্সা। একটি বাস আছে, সে আবার ধরাবাঁধা পথে যাতায়াত করে, অন্য পথ মাড়ায় না। কাজেই আমরা যারা পথ ছেড়ে বিপথেই বেশি চলি তাদের রিক্সা ছাড়া গত্যন্তর নেই। একটি ট্যাক্সিও আছে; কিন্তু একম্ এবং অদ্বিতীয়ম্ বলে স্বভাবতই তার গুমোর বেশি, মূল্যেও বেশি। ইদানীং শহরে বন্দরে নাবালক ট্যাক্সি বেরিয়েছে তার ফলে সাবালকদেরও মূল্য হ্রাস হয়েছে। আমাদেরটি সাবালক না হয়ে যদি নাবালকও হতো তাহ'লেও বোধ করি জ্যাঠামি করতে ছাড়ত না। কারণ তার প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। ফলে এখানে দিনে দিনে শুধু যে রিক্সার সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছে এমন নয়, শ্রীবৃদ্ধিও হচ্ছে। সত্যি বলতে কি, এখানে যত ভালো এবং সুদৃশ্য রিক্সা দেখেছি এমন আর কোথাও নয়।

যত রকম যানবাহনে সচরাচর আমরা যাতায়াত করি, তার মধ্যে আমার মতে রিক্সা সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি নিম্ন মধ্যবিত্তের কথাই বলছি। যে মুষ্টিমেয় সংখ্যকের ঘরে গাড়ি আছে, তারা আমার কাছে নগণ্য। রিক্সা এই কারণে শ্রেষ্ঠ যে ওতে বসে যাওয়া চলে আরাম—গরুর গাড়ির মতো ঢিমিয়ে চলে না, বাস্ ট্যাক্সির মতো হুড়মুড় করেও ছোটে না। সুস্থ মতে সচ্ছন্দ গতিতে যেমনটা চলা উচিত ঠিক তেমনটি। হাতে টানা যখন ছিল তখন গতি যথেষ্ট বেগ ছিল না। দ্বিচক্রযান জুড়ে দেওয়ার পর থেকে সদ্গতি লাভ হয়েছে বলতে হবে।

এহেন রিক্সা চড়াটা মানবিক নীতি বিগর্হিত, একথা শুনে সেদিন আমার মেজাজ বিষম বিগড়ে গিয়েছিল। এমনিতেই আমার মেজাজ সারাক্ষণ তিরিক্ষি হয়ে থাকে, নেহাৎ ভালো কথা বললেও বৈপরীত্য ঘটে। অযথা সাধুবাক্য একেবারে শুনতে পারিনে। পুরোনো রসিকতা আর বাসি নীতিকথা শুনলে রীতিমতো গা জ্বালা করতে থাকে। রিক্সার জন্মকাল থেকে এই নীতিবাক্য শুনে আসছি যে মানুষে টানা বাহনে চড়তে নেই। নীতিবাক্য এমনি জিনিস, মানুষকে একটু রইয়ে সইয়ে বলতে হয়। যখন তখন আচমকা শুনলে আমার তো বুক ধড়ফড় করতে থাকে। 'বাঁশরী'র সতীশের মতো আমার অবস্থা। সেই যে শৈলকে বলেছিল

—ঐ দেখ আবার একটা সত্য কথা। সদ্য বিছানা থেকে উঠেই দু দুটো খাঁটি সত্য কথা সহ্য করি এত আমার মনের জোর নেই। আমার অবস্থা সতীশের চাইতেও খারাপ। মনের জোর তো নেই-ই, শরীরেরও নেই। আমার আবার লিভার খারাপ; খারাপ লিভারের উপর নীতিকথা মারাত্মক।

এখন ব্যাপারটা হয়েছে কি শুনুন। ভদ্রলোক আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি। ওঁকে আনবার জন্যে একটি সাইকেল রিক্সা পাঠানো হয়েছিল। একটি অনতিপ্রশস্ত ঘরে উৎকট গরমের মধ্যে আমরা জন কুড়ি পঁচিশ লোক বসে বসে ঘামছি; উনি আর আসেন না। বহুক্ষণ পরে এলেন তো এলেন পদব্রজে। আমরা ঘর্ম জ্বালায় মর্মপীড়িত আর উনি কিনা এসেই ঘোষণা করলেন, আমি মানুষকে ভারবাহী জীব বানিয়ে অপমান করতে রাজি নই। এক ঢিলে এমন দ্বিবিধ ফললাভ করতে বড় একটা দেখা যায়না। একদিকে রিক্সাওয়ালা বেচারীকে আট গণ্ডা পয়সা থেকে বঞ্চিত করে তাকে যথোচিত সম্মানিত করেছেন আর এদিকে এতগুলি লোককে গরমে সিদ্ধ করে রীতিমতো সিদ্ধ পুরুষ বানিয়ে ছেড়েছেন। ইনি একজন প্রখ্যাত সমাজকর্মী। রিক্সা সংক্রান্ত ব্যাপারটিকে উপলক্ষ্য করে সমাজসেবা কি ক'রে করতে হয় সে বিষয়ে অনেক উপদেশাদি দান করলেন। শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই বোধ করি অতিশয় রোমাঞ্চিত বোধ করছিলেন। আমি ততক্ষণ ভাবছিলুম ভদ্রলোক রিক্সাটিকে বিদায় করে না দিয়ে দয়া করে যদি সঙ্গে নিয়ে আসতেন তো সেইটি চড়ে আমি দিব্য বাড়ি ফিরতে পারতুম।

বলা বাহুল্য, রিক্সা চড়ায় আমার কোন লজ্জা নেই এমনকি সেটি যদি সাইকেল রিক্সা না হয়ে হাতে টানা রিক্সা হয় তাতেও লজ্জার কোন কারণ দেখিনে। অপরকে খাটিয়ে নিলে যদি তার ইজ্জত নষ্ট হয় তবে সংসারে কোন মানুষেরই ইজ্জত নেই। এই দেখুন না কেন ছেলে পড়ানো আমার ব্যবসা। ছেলেমেয়ের শিক্ষার দায়িত্ব পিতামাতার। তাঁরা নিজে সেই কাজটি না ক'রে যখন আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেন তখন বুঝি আমার ইজ্জত নষ্ট হয় না। হাঁ, এইভাবে যদি ব্যাপারটাকে দেখেন তবে আমি আপনাদের সঙ্গে একমত। কিন্তু লোকের ধারণা বড় অদ্ভুত। যে মানুষ আমার চালের বস্তা কয়লার বস্তা ঘাড়ে বয়ে এনে ঘরে পৌঁছে দেয় তার ইজ্জত নষ্ট হয় না। আমাকে রিক্সায় বসিয়ে বয়ে আনলেই ইজ্জত নষ্ট হ'ল! তাও যদি ঘাড়ে করে আনত। মানুষের ঘাড় ভাঙলে অন্যায় হয় না, ঘাড়ে চড়লে অন্যায় একথা কোন্ শাস্ত্রে বলেছে?

ভদ্রলোক তারই কিছুক্ষণ আগে রেল ট্রেনে এখানে এসে পৌঁচেছেন। উনি বোধ করি ভেবেছেন এঞ্জিনটাই ওঁকে বয়ে নিয়ে এসেছে। এঁদের নিয়ে ঐ বিপদ। যেটুকু চোখে দেখা যায় সেটুকু দেখেন, তার বাইরে দেখবার তৃতীয় নেত্রটি নেই। যে স্টোকার এঞ্জিনে কয়লা যোগায় তার কাজটা কি রিক্সাওয়ালার চাইতে কম কষ্টসাধ্য। মানুষ মানুষকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে এটা যদি নীতি বিগর্হিত হয় তবে সব যানবাহনই বর্জনীয়, কেবলমাত্র রিক্সা নয়।

কি আর বলব, মানুষের দেবদ্বিজে ভক্তি ক্রমেই কমে যাচ্ছে। যখন ছিল তখন দেবতাকে যতখানি ভক্তি করত তার বাহনকে ততখানি। সরস্বতীর বাহন হাঁস, লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা, শিবের বাহন ষাঁড়,—এঁরা সবাই ভক্তির পাত্র ছিলেন। আজকেও কলকাতার রাস্তায় ষাঁড় দেখলে সবাই সসম্ভ্রমে রাস্তা ছেড়ে দেয়। কেন?—দেবাদিদেব মহাদেবের বাহন বলেই তো। শুনেছি পরমহংসদেব প্রায়ই চিড়িয়াখানায় যেতেন সিংহ দেখবার জন্যে। বলতেন, আহা, মা দুর্গার বাহন। সে ভক্তি এখন কোথায় গেল? আসল কথা কি জানেন, এখন কোন মানুষই কোন মানুষকে শ্রদ্ধা করে না। আমাকে যদি শ্রদ্ধা করত তো আমার বাহন রিক্সাওয়ালাকে কখনই অশ্রদ্ধা করতে পারত না।

আজকাল সবই হয়েছে উল্টো, যা অত্যন্ত স্বাভাবিক তাতেই মানুষের আপত্তি। আপনারাই বলুন তো, মানুষ যদি মানুষের ভার বহন না করবে তো কে করবে? মানুষকে ভারবাহী করতে আজকে যাঁদের আপত্তি দেখব মরবার পরে তাঁদের ঘাড়ে করে কে শ্মশানে নিয়ে যায়।

ট্রামে-বাসে

সাম্প্রতিক পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ যাঁহাদের কাছে যেরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, বিশুখুড়ো আমাদিগকে তাহার একটা তালিকা পাঠ করিয়া শুনাইলেনঃ—"নেহরু-চৌ সাক্ষাৎকার আমেরিকার কাছে এক বিরাট পূর্ণগ্রাস-রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে; পূর্ব পাকিস্থান ইস্কিন্দারী শাসনরূপে সূর্য-গ্রহণ প্রত্যক্ষ করেছেন; কোলকাতার গড়ের মাঠে জর্জ টেলিগ্রাফরূপী রাহুর গ্রাস যে কতজন দেখেছেন, তার ইয়ত্তা নেই!!"

* * *

সংবাদে প্রকাশ, সাংবাদিকদের অসংখ্য প্রশ্নের মধ্যে চৌ এন লাই জবাব দিয়াছেন মাত্র পাঁচটির।—

"সুতরাং কিছু প্রেস্ না দিলে পাশের কোন আশাই নেই" বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

শুনিয়াছি অতিথি চৌ এন লাই'র জন্য নাকি সর্বভারতীয় খাদ্য পরিবেশের ব্যবস্থা হইয়াছিল। —"কী কী খাবার তাঁকে দেওয়া হয়েছে, তা জানিনে, শুধু লিচু আর ল্যাংড়ার কথাই শুনেছি। এত বড়ো একটা মওকায় তক্তাঘাটের ইলিশের ব্যবস্থা না হওয়ায় আমরা বিস্মিত হয়েছি এবং মৎস্য বিভাগ সম্বন্ধে আবার নূতন করে নিরাশ হয়েছি"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

যে সময়ে নেহরুজী নয়াচীনের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন, ঠিক সেই সময় স্যার চার্চিল সাক্ষাৎ করিয়াছেন প্রেসিডেন্ট আইসেন-হাওয়ারের সঙ্গে। সংবাদে প্রকাশ, স্যার চার্চিল নিজের পারিবারিক প্রশ্নই আলোচনা করিয়াছেন, আর চৌ এন লাই আলোচনা করিয়াছেন ৯৬০ কোটি পরিবারের। শ্যামলাল বলিল—"তফাৎটা ওখানেই, একপক্ষ নিজের পাতে ঝোল-টানার কথা আলোচনা করেছেন, অন্যপক্ষ সকলের পাত পাড়বার কথাই চিন্তা করেছেন।"

* * *

শ্রীযুক্ত নেহরু নাকি শুনিলাম শীঘ্রই চীন পরিভ্রমণে যাইবেন। ঠিক কবে কোন্ তারিখে তিনি যাইবেন, এই প্রশ্নের উত্তরে জওহরলালজী নাকি বলিয়াছেন যে, রাশিচক্র এবং দিন-ক্ষণ আলোচনা করার আগে তিনি এ প্রশ্নের জবাব দিতে অক্ষম। —"সপ্তাহটা কেমন

যাবে, তাহলে নেহরুজীও পড়েন" —বলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

* * *

পাঁচ বৎসর পূর্বে রাষ্ট্রপতি-ভবনের বাগানে বন-মহোৎসব উপলক্ষে যে সমস্ত বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছিল, তাহারই একটি আমগাছে নাকি এ বৎসর আটটি আম ফলিয়াছে। —"কিন্তু আমরা তো জানতাম বন-মহোৎসবের ব্যাপারে—ফল ফলাবার আশা আমি মনে রাখিনি রে—কথাটাই ছিল সবচেয়ে বড়ো কথা"—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

* * *

পাকিস্থানের প্রধান উজীর সাহেব বলিয়াছেন যে, গভর্নর ইস্কিন্দার মীর্জা কৃতিত্বপূর্ণ কাজ

করিতেছেন। —"একবারে ক্রিকেট গাবনার ম্যাকার্টনির মতো, ৯২ রান তুলেছেন, সেঞ্চুরির আট রান মাত্র বাকী"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

আর্জেন্টাইনের এক মহিলা সাড়ে তিন বৎসরের মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে ১৭ হাজার মাইল পরিভ্রমণ করিয়াছেন। পুরুষের চেয়ে মহিলারা যে কোন অংশে কম নহেন, ইহাই নাকি তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়। মহিলাটির নাম আনা বেকার। শ্যামলাল বলিল—"বেকার বসে থাকার চেয়ে খৈ-ভাজা যদি ভালো হয়, তবে ঘোড়ায় চড়াই বা হবে না কেন?"

* * *

জর্ডানের এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানে কোন এক গীর্জার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছাত্রীরা নাকি মেরী মাতার মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছে। —"ঘটনাটা ঘটেছে ছাত্রীদের পরীক্ষার পরে না আগে, তা অবশ্যি সংবাদে বলা হয়নি"—বলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

* * *

শ্রীযুক্ত নেহরুর নিকট একটি আবেদন-পত্রে দিল্লীর তের হাজার জননী এবং গৃহিণীরা নাকি সিনেমার কুফল নিয়ন্ত্রণের দাবী জানাইয়াছেন। শ্যামলাল একটি অসমর্থিত সংবাদের উল্লেখ করিয়া বলিল—"ছেলে-মেয়েরা সিনেমার কুফলটা যাতে only for the adultএ সীমাবদ্ধ না থাকে, তার জন্যে নাকি পাল্টা নিয়ন্ত্রণ দাবী জানিয়েছে"!!

শিল্পচর্চা

শ্রীনন্দলাল বসু

সমুদ্র-পর্বত আঁকবার কৌশল

১) পাহাড়ের গায়ে ছায়াযুক্ত উপত্যকা আঁকতে হলে উল্টো গাছ আঁকা যায়।

২) উপত্যকার ভিতর যেখান দিয়ে জলের স্রোত চলে সেখানেই গাছপালা গজায়; জঙ্গলও ঐ উপত্যকা জুড়ে থাকে। উঁচু জায়গায় পাথরের স্তূপ, বাড়ি ইত্যাদি।
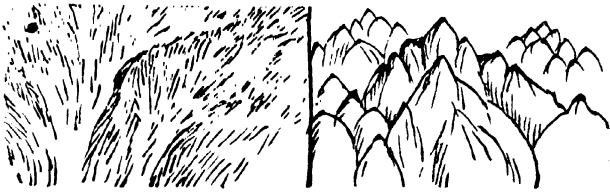
৩) পাহাড়ের গায়ে যে জায়গায় আলো পড়ে, সেখানটা আলো-ছোঁওয়া সোজা গাছের মতো দেখায়। উপত্যকা আঁকার মতো ক'রে উল্টো গাছ আঁকা নয়।

৪) ভারতের পর্বত পদ্মকোরকের মতো দেখতে হয়; মন্দির-শিখর হয়েছে ওরই অনুকরণে।

সমুদ্র আঁকার রীতি

সমুদ্রের সর্বত্র সমান আকারের ঢেউ হলেও দূরেরগুলি ক্রমশ ছোটো হতে হতে দিগন্তে যেন একটি সরল রেখায় মিলিয়ে যায়। আকাশ-সমুদ্রের মিলন-স্বরূপ এই দিগন্ত-রেখাটি আঁকতে হলে রেখাটি বাঁদিকে একটু গাঢ় রঙের হয়ে ডানদিকে হাল্কা হয়ে ক্রমশ মিলিয়ে যাবে। তা হলেই সমুদ্রের বিস্তার ও বৃত্তাকার ব্যঞ্জিত হবে; নইলে ছবিটি দিগন্তরেখাতে দ্বিখণ্ডিত দেখাবে।
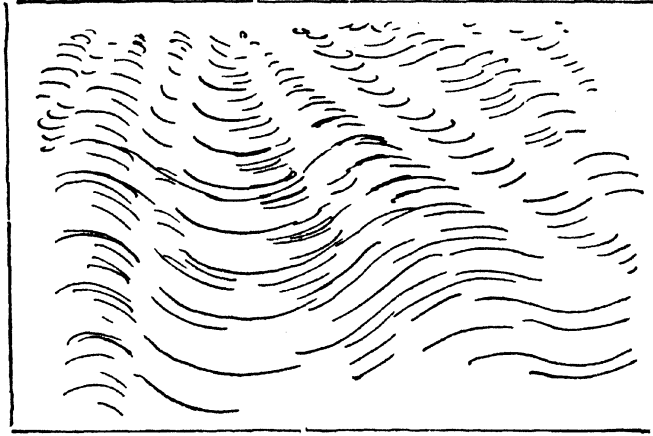
দূরের সমুদ্রে শান্ত ও সমান রেখা, নিকটের সমুদ্রে উন্নত ও ধাবমান ঢেউ।

ঢেউ চঞ্চল ব'লে চোখে দেখে করা বড়ো কঠিন। তাই, মনে ধারণা করার জন্যে কোনো সাদৃশ্য, কোনো উপমা অবলম্বন করা যেতে পারে—হাজার-ফণা অনন্তনাগ, মাছের আঁশ, ড্রাগনের পাঞ্জা, ঘোড়ার পাল, আঁচড়ানো বা কোঁকড়ানো কেশের রাশি ইত্যাদি।
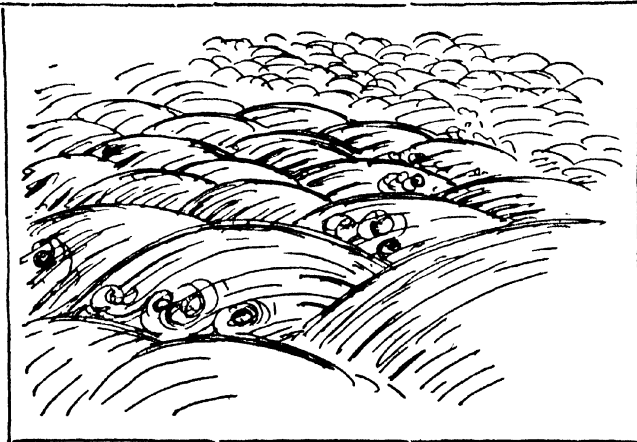
প্রথম ও দ্বিতীয় নক্সায় কোঁকড়ানো চুলের সাদৃশ্যে সমুদ্রের কল্পনা করা হয়েছে।

তৃতীয় চিত্রে মাছের আঁশের সংগে ঢেউগুলির তুলনা দেখা যায়।

সমুদ্রের রূপ অনন্ত, নিত্যগতিশীল।

সমুদ্র দেখে কখনো মনে হয় সহস্রশীর্ষ অনন্ত নাগ গজ্‌রাচ্ছে, ছুটে যাচ্ছে।

নইলে মনে হয় বরুণ দেবতার বল্গা-বিহীন বুনো ঘোড়ার পাল লাফিয়ে চলেছে।

তার ছুটন্ত ঢেউয়ের মাথায় মাথায় চকিতে দেখা যায়, আগুনের হল্কা আর ড্রাগনের পাঞ্জা। তাকে স্থির পটে বন্দী করা একরকম অসাধ্য-সাধন।

অথচ ভূপৃষ্ঠ আঁকা যায় ঐ সমুদ্রের মতো ক'রেই। সমুদ্রের মতোই হবে, কেবল মাটি-পাথরের জমাট ঢেউগুলির যেগুলি নিকটবর্তী, তাতে খানিকটা পাথুরে ভাব, কোণ-উঁচানো ভাব দেখাতে হবে।

চক্রদত্ত

'ফ্লেক্সোরাইটার' নামে এক নতুন ধরনের টাইপরাইটার বার হয়েছে। এটি বিদ্যুৎচালিত। ফ্লেক্সোরাইটারের সব চেয়ে সুবিধা হচ্ছে যে এতে দরকার হলে টাইপ করবার জন্য খবর জমা করে রাখা যায়। একটা ফিতের ওপর প্রয়োজনীয় কথা-গুলো ফুটো ফুটো করে লেখা থাকে—আর এর থেকে পরে এগুলো নিজে নিজে টাইপ হয়ে যায়। যেমন চিঠির ওপরের পাঠটুকু যদি ফিতেতে লেখা থাকে তাহলে সেটা পরে খামের ওপরে নিজেই টাইপ হয়ে যাবে। এতে আবার এমন বন্দোবস্ত করা আছে যে, প্রয়োজন হলে একটা চাবি টিপে লেখা ফিতেটাকে সরিয়ে রাখা যায়। তখন এটাকে আবার একটা সাধারণ টাইপরাইটারের মত ব্যবহার করা যাবে। তাছাড়া এতে এমনও ব্যবস্থা আছে যে, লেখা ফিতার যদি খানিকটা অংশ টাইপ করার পর আর টাইপ না করতে হয় তাও করা যায়। মিনিটে ১০০ করে কথা এই টাইপরাইটারের সাহায্যে ফিতে থেকে নিজে নিজে টাইপ হয়ে যায়।

*

আমেরিকার কোনও মহিলা বৈজ্ঞানিক একটি নতুন রকম স্টোভ বার করেছেন। সূর্যের তাপের সাহায্যে স্টোভটি কাজ করে। একটা বাক্সের মধ্যে স্টোভটি বসান থাকে। যে ধাতু নিজের মধ্যে তাপ ধারণ করতে পারে সেই ধাতু দিয়ে বাক্সটা তৈরী হয়। বাক্সের চারদিকে কাঁচের জানলা থাকে আর মধ্যে চারটি সাধারণ আয়না রাখা থাকে। একটা রাসায়নিক পদার্থও বাক্সটার মধ্যে থাকে ঃ ঐ পদার্থটা সূর্যের তাপটা সংগ্রহ করে গরম হয়ে ওঠে তারপর সমস্ত স্টোভটা গরম করে। এইভাবে আধঘণ্টার মধ্যে ৩৫০ ফারেনহাইট ডিগ্রী তাপ সংগৃহীত হয়। শেষ পর্যন্ত ৪৫০ ডিগ্রী তাপ উঠতে পারে। বাক্সের মধ্যের আয়না চারখানি বাইরের সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করে বেশী পরিমাণ তাপ বাক্সের মধ্যে আনতে পারে। ঐ বৈজ্ঞানিক বলেন যে, ভারতবর্ষ এবং ইজিপ্টে এই স্টোভ খুব কার্যকরী, কারণ এ সব দেশে জ্বালানী পদার্থের বিশেষ অভাব। ইনি বলেন, ভারতবর্ষে যদিও "সোলার কুকারের" প্রচলন আছে কিন্তু এই নতুন ধরনের "সান স্টোভটি" অনেক বেশী সস্তায় কাজ দেবে এবং এর ব্যবহার প্রণালীও সহজ, সেজন্য এটিই জনসাধারণের মনোমত হবে। বাণিজ্যিক উপায়ে এর হিসাব কষে দেখা গেছে যে, এর দাম প্রায় পাঁচ ডলার।

*

বড় বড় হোটেলে, অফিসে, কিম্বা জাহাজে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মেঝে ঝাঁট দিয়ে পরিস্কার করতে হয়। দেখা গেছে যে, একজন লোকের হাতে করে ঠেলা ঝাড়ু দিয়ে ১৫,০০০ থেকে ২২,০০০ বর্গ ফুট স্থান পরিস্কার করতে প্রায় ২½ ঘণ্টা সময় লেগে যায়। এখন একটা চাকা দেওয়া ব্রাস লাগান যন্ত্রের সাহায্যে সেই স্থান প্রায় ১ ঘণ্টার মধ্যে পরিস্কার করা সম্ভব হচ্ছে। অবশ্য এটাও লোককে ঠেলে চালাতে হবে। পরিস্কার করবার সময় এই যন্ত্র আপনাআপনি মেঝে থেকে শুকনো এবং ভিজে কাগজ, ধুলো, কিম্বা অন্য কোন রকম আবর্জনা অথবা ছোট ধাতুর টুকরো কুড়িয়ে নেবে। যন্ত্রটার একদিকে একটা আলাদা ব্রাস লাগান আছে যেটা দেয়ালের পাশ থেকে অথবা কোণাঘুঁচি থেকে অনায়াসেই ময়লা তুলে নেবে।

কলের ঝাড়ু

সমস্ত যন্ত্রটার ওজন হচ্ছে মাত্র ৪৮ পাউন্ড।

*

শিশুদের পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি হয় পাঁচ বছর বয়স থেকে। শিশুর জন্মাবার পর থেকে তিন মাস বয়স পর্যন্ত কোনরকম কিছু দেখবার ক্ষমতা জন্মায় না। ঠিক তিন মাস বয়সে সে তার নিজের হাত ঘুরিয়ে দেখবার মত দৃষ্টিশক্তি পায়। ছ' মাস বয়সে শিশু তার চোখ এবং হাত দুটোই ব্যবহার করতে আরম্ভ করে—সে যে জিনিসটা দেখবে সেটা তখন হাতে করে আঁকড়ে ধরতে পারে। এক বছর বয়সে সে কাছের এবং দূরের জিনিস দেখতে শেখে, অবশ্য কোন একটা জিনিসের দিকে খুব বেশীক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকতে পারে না। দেড় বছর বয়সে শিশুর দূরত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়, কিন্তু তখন তারা অসাবধানে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় দৌড়য়। এই বয়সে শিশুরা ছবির বই বেশ পছন্দ করে এবং তারা তখন তাদের কতকগুলো চেনা ছবির দিকে লক্ষ্য করে। একুশ মাস বয়সে এরা অচেনা অজানা লোক এবং স্থানের সম্বন্ধে বেশ সাবধান এবং সজাগ হয়। দু' বছর বয়সে শিশু যা দেখে তাই অনুকরণ করবার চেষ্টা করে। চাঁদ দেখে অথবা কোন কিছু ঘুরতে দেখলে খুব আনন্দ পায়। আড়াই বছর বয়সে শিশুর চোখের সামনে যে কোন বস্তুই আসুক না কেন, বিশেষ করে যে সব বস্তু নড়া চড়া করে, তাদের সম্বন্ধে খুব বেশী রকম সজাগ হয়। তিন বছর বয়সে শিশু তার মাথা না ঘুরিয়ে অনায়াসেই চোখ প্রয়োজন অনুযায়ী ঘোরাতে পারে। তাছাড়া যখন সে তার হাত দিয়ে কোন কাজ করে তখন তার দৃষ্টি সব সময় তার ওপর না রাখলেও চলে। সাড়ে তিন বছর বয়সে শিশুর উচ্চতা সম্বন্ধে একটা আতঙ্কের ভাব মনে জাগে। চার বছর বয়সে শিশুর নিজের ওপর একটা বিশ্বাস জাগে এবং রাস্তাঘাট পার হওয়ার সময়ে রাস্তার দু'পাশ দেখে নেবার ক্ষমতা জন্মায়। কিন্তু এই বয়সে শিশুর হঠাৎ দৌড় দিয়ে যাওয়ার অভ্যাসটা থেকে যায়। পাঁচ বছর বয়সে শিশু অক্ষর, সংখ্যা চিনতে পারে। অক্ষর নকল করতে পারে। ঢালু ছাত-ওয়ালা বাড়ি আঁকতে পারে।

আর্টের আধুনিক ধারা

কৃষ্ণা চৌধুরী

আধুনিক চিত্রকলার যে সব নমুনা আমরা দেখতে পাই সেগুলি আমার মত যারা চিত্রদ্রষ্টা মাত্র, চিত্র-সমঝদার বা চিত্রসমালোচক নয়, তাদের মনে অনেক সময়েই অস্বাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি করে। উদ্ভট রসের প্রতি আধুনিক চিত্র-শিল্পীদের অতিরিক্ত আগ্রহ শুধু যে আমাদের চক্ষুপীড়াদায়ক হয়ে ওঠে তাই নয়, যখন পটের ওপর দু'একটা তুলির আঁচড় টেনে সেটাকে কোন সুন্দরীর চন্দ্রবদন অথবা বসন্তের আগমনে পত্রপুষ্পভারে সজ্জিত প্রাকৃতিক দৃশ্য বলে মেনে নিতে বলা হয়, তখন এ অসংগত অনুরোধ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির উপর রীতিমত অপমান বলেই মনে হয়।

আধুনিক চিত্রশিল্পী আমাদের কাছে তথ্যের বিকৃতি ঘটানোর অভিযোগে অভিযুক্ত। আমরা বলি, চিত্রকর যখন একটি গাছ কি একটা মানুষ আঁকতে প্রবৃত্ত হন তখন কেন আমরা একটা গাছ কি মানুষ যেমন দেখি তেমনি এঁকে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন না। রঙে ও রেখায় তিনি যা সৃষ্টি করলেন তার সংগে সত্যিকারের গাছ বা মানুষের সাদৃশ্য খুঁজে বার করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে কেন?

হয়ত, শিল্পীর পক্ষে তথ্যের প্রতি সত্যনিষ্ঠ হওয়া সব সময় সম্ভবপর নয়। বস্তুজীবনের ফটোগ্রাফিক প্রতিলিপি দেওয়া শিল্পীর কাজও নয়। চিত্রকর যখনই কিছু সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত হন তখনই তাতে তার শিল্পিমনের বিশেষ একটা ভাবের ছায়া এসে পড়বেই। তবুও বস্তুজীবনকে ভিত্তি করেই শিল্পী অগ্রসর হন, তারপর তার শিল্পিমন হয়ত তাতে তথ্যাতিরিক্ত কিছু দেয়। কিন্তু আধুনিক চিত্রশিল্পী অনেক সময় তথ্য থেকে এত-দূরে সরে যান, তথ্যকে এমন বিকৃত করে রূপ দেন, যে তখন তার সৃষ্টি আমাদের মনে কোন সাড়া জাগাতে পারে না।

কিছুদিন আগে ক'লকাতায় বিভিন্ন দেশের সমসাময়িক চিত্রকলার একটি প্রদর্শনী হয়েছিল। সেই প্রদর্শনীতে ঘুরে দেশবিদেশের বর্তমান চিত্রশিল্পীদের ভাবা-দর্শের নিদর্শন দেখতে দেখতে এই প্রশ্নই মনে জাগছিল যে নব্য চিত্রকরদের বাস্তব-বস্তু আমরা চোখে যেমন দেখি তেমন না-আঁকার এই যে মনোবৃত্তি, এর পিছনে আমাদের তাক্ লাগিয়ে বোকা বানিয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন মহত্তর উদ্দেশ্য আছে কি?

চিত্রশিল্পের ইতিহাস তো বলে আছে, তা নব্য চিত্রকলার গোলকধাঁধায়, শুধু গোলক কেন ত্রিকোণ চতুষ্কোণ সর্বপ্রকার ধাঁধায় দিগ্‌ভ্রান্ত দর্শক যাই বলুন না কেন। চিত্রশিল্পের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই এক এক যুগে শিল্পী এক এক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। সমাধান খুঁজতে গিয়ে তিনি যে সব বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তার ভিতর থেকেই এক একটি বিশেষ চিত্রাংকন-রীতি জন্ম নিয়েছে। কি সনাতন, কি নব্য, সকল চিত্রকলার ক্ষেত্রেই একথা খাটে। তবে বহু শতাব্দীর লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমে চিত্রশিল্পী বুঝতে পেরেছেন, বাস্তববস্তুর অবিকল প্রতিচ্ছবি দিতে পারা কখনোই সম্ভবপর নয়, কিছু না কিছু বিকৃতি তাকে স্বীকার করে নিতেই হবে। কিন্তু এ বিকৃতি যেখানেই মেনে নেওয়া হয়েছে সেখানেই দেখা গেছে কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন তার লক্ষ্য ছিল। শিল্পীর চিত্তবিনোদন বা দ্রষ্টার চিত্ত-বিভ্রান্তি তার উদ্দেশ্য নয়।

বাস্তবের অবিকল প্রতিচ্ছবি প্রিমিটিভ আর্টেও দেখা যায় না। প্রিমিটিভ বা আদিযুগের শিল্পী জানতেন না কেমন করে কোন বস্তু আমরা চোখে যেমন দেখি তেমন আঁকতে হয়। পুরঃসংকোচনের কায়দা, পরিপ্রেক্ষিতের নিয়মকানুন, আলোছায়ার তারতম্য ঘটিয়ে পটের উপর বাস্তবের ভ্রম সৃষ্টি করা—এ সবই তার অজানা ছিল। কিন্তু অংকনরীতির বিভিন্ন কৌশল সম্বন্ধে অজ্ঞতা ছাড়াও এর অন্য আরো একটা কারণ ছিল বলে মনে হয়। আদিযুগের শিল্পীর কাছে চিত্রকলা ছিল ধর্মানুষ্ঠানেরই অংগ। তার চিত্রে বাস্তবের যে বিকৃতি আছে চিত্রকলার অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করলে সে বিকৃতি মেনে নিতেই হত।

বাইসন, বল্গা হরিণ প্রভৃতি জানোয়ারের বা শিকারের যে সমস্ত ছবি প্রাগৈতিহাসিক গুহার গায় আঁকা রয়েছে দেখতে পাওয়া যায়, সেই আঁকার মধ্যে শিল্পসৃষ্টি ছাড়া অন্য কারণও ছিল। লোকের বিশ্বাস ছিল দেওয়ালের গায়ে বাণবিদ্ধ পশু এঁকে রেখে শিকারে গেলে শিকার সফল হবে, বন্য পশুকে পরাস্ত করা যাবে। প্রাচীন মিশরীয় আর্টের কথাই ধরা যাক না কেন। পিরামিডের দেওয়ালের গায়ে যে সমস্ত চিত্রাবলী রয়েছে সেগুলিও ঐ ধরনের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আঁকা হয়েছিল। লোকের বিশ্বাস ছিল মৃত ব্যক্তির ও তার প্রিয় বস্তুগুলির প্রতিলিপি সমাধিমন্দিরের গায়ে নিখুঁতভাবে চিত্রিত করে রাখলে তার আত্মার কল্যাণ হবে, স্বর্গে যাওয়ার পথ প্রশস্ত হবে। এই বিশ্বাস থেকে আঁকতে হত বলে ছবি থেকে যাতে কিছু বাদ না

পড়ে যায় সেদিকে শিল্পীর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হত। সুতরাং পুরঃসঙ্কোচন করা বা কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অদৃশ্য রেখে জীব-জন্তু বা মানুষের ছবি আঁকা চলত না। প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় অংশের উপর জোর দেওয়া হত। অর্থাৎ চিত্রে বাস্তবানু-কৃতির নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে শিল্পী পালন করতে চাইতেন। আমরা যখন চোখে দেখি দৃশ্যবস্তুর সমস্তটাই আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়না—খানিকটা দেখি খানিকটা অদশ্য থাকে। কিন্তু আদিযুগের শিল্পী বস্তুর দৃশ্যরূপ না এঁকে তার সমস্ত অবয়ব বা তার যা যা থাকা উচিত, যা যা আছে জানি, সবই এঁকে বসতেন। পটের উপর বাস্তবতার ভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সেই শিল্পী হয়ত পারতেন না, কিন্তু তাতে তার চিত্রের সৌন্দর্যের কোন হানি হত বলে কেউ মনে করত না। বরং ধর্মানু-ষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে শিল্পকর্মের প্রতি শিল্পীর একান্ত দরদ ছিল বলেই—আমাদের চোখে এক এক সময়ে ছেলে-মানুষি বলে মনে হলেও—শুধু মিশরীয় আর্টে কেন, সমস্ত আদিম আর্টে এমন একটা ছন্দোবন্ধ সুসমঞ্জস ভাব আছে যা আমাদের প্রশংসা অর্জন না করে পারে না।

কিন্তু প্রিমিটিভ আর্টিস্ট না হয় জানতেন না কেমন করে পটের উপর বাস্তবের অবিকল প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলতে হয়। আধুনিক প্রিমিটিভিস্টরা আর্টের টেক্‌নিক বা কৌশল সব জেনে-শুনেও অবহেলা করেন কেন? আধুনিক চিত্রকরের এ স্বেচ্ছাকল্পিত বিকৃতির অর্থ কি?

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মনে হয়েছিল চিত্রশিল্পে শেষ কথা বলা হয়ে গিয়েছে, এখন আর নতুন কিছু বলবার নেই। বহু বৎসরের অভিজ্ঞতায় অর্জিত পুরঃ-সঙ্কোচন, পরিপ্রেক্ষিত আলোছায়ার তারতম্য ইত্যাদি—বাস্তবানুকৃতির সব-গুলি কৌশলই তখন শিল্পীর জানা। শিল্পী ইচ্ছা করলেই তখন আমরা চোখের সামনে যা যেমন দেখব তার হুবহু প্রতিলিপি ফুটিয়ে তুলতে পারেন। কিন্তু এমনি সময়েই চিত্রজগতে পর পর কতকগুলি আন্দোলনের ঢেউ এসে উপস্থিত হয় এবং তা আর্টের চিরাচরিত পন্থায় ওলটপালট এনে দেয়।

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ফরাসী চিত্রকর মানে' ও তার কয়েকজন শিল্পী বন্ধু চিত্রজগতে যে আন্দোলন এনেছিলেন তা ইম্‌প্রেশনিজম নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। ইম্‌প্রেশনিস্টদের মতে, শিল্পীর এতকালের বাস্তবানুকৃতির প্রচেষ্টা, একদিক থেকে দেখতে গেলে, ব্যর্থ হয়েছে। স্টুডিওতে মডেল বসিয়ে যখন প্রতিকৃতি আঁকা হয় তখন আলো-ছায়ার তারতম্য করে, কতকগুলি রেখাকে ধীরে ধীরে আবছা করে এনে পটভূমির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে ছবিকে যাতে সত্য ও জীবন্ত বলে চোখের ভ্রান্তি ঘটে তারই চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সত্যই কি ঘরের ভিতর একটা মুখের দিকে তাকালে রঙের অমন ধীর পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়, না অমনি করে ধীরে ধীরে রেখাগুলি আবছা হয়ে আসে? আমরা তো দেখতে পাই যেখানে আলো বেশী পড়েছে সেখানে অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য। যেটুকু অন্ধকারে সেখানেও রং সর্বত্র সমান নয়, ধীরে ধীরে আলো থেকে ছায়ায় মিলিয়ে আসাও নেই। প্রাক্-ইম্‌প্রেশনিস্ট যুগের শিল্পীরা ধীরে ধীরে রঙের গাঢ়তা কমিয়ে আনা ও মোলায়েম করে রঙ লাগানোর এই কৌশল বহির্দৃশ্য আঁকবার সময়ও ব্যবহার করতেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে বাইরের সূর্যের আলোতে নানা বিপরীত রঙের বিভিন্নতা আরো তীব্র হয়ে ধরা পড়বার কথা। ইম্-প্রেশনিস্টরা দাবী করলেন যথার্থ বাস্তবানুকৃতির কৃতিত্ব তাঁদেরই প্রাপ্য। তাঁদের বক্তব্য ছিল এই যে, আমরা যখন কোন দৃশ্যবস্তুর দিকে তাকাই তখন তার বিভিন্ন অংশের রঙ ও আকৃতি আমাদের কাছে পৃথকভাবে ধরা পড়ে না, ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির ও রঙের একত্র সমাবেশ আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে মাত্র। শিল্পীর কাজ হল বিষয়বস্তুর দিকে একনজর চেয়ে মনে যে ইম্‌প্রেশন্ বা ছাপ পড়ে পটের উপর রঙে ও রেখায় তাই ফুটিয়ে তোলা।

বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে চিত্রকে বাস্তবানুগ করবার যে প্রচেষ্টা শিল্পীরা করছিলেন ইম্‌প্রেশনিজম্ যেন তারই শেষ ধাপ। কিন্তু বাস্তবকে জয় করার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর মন থেকে বাস্তবানুকৃতির মোহ চলে গেল। ইম্‌প্রেশনিস্ট-উত্তর শিল্পীরা অনেকে তাই বস্তুজীবন সম্পর্কে উদাসীন, আলংকারিক চিত্রের প্রতিই তাদের ঝোঁক। ইমপ্রেশনিস্টদের মতো দৃশ্যবিশেষের সমস্ত অংশই চিত্রে গ্রহণ না করে তাঁরা কোনটা গ্রহণযোগ্য, কোনটা বা বর্জন করতে হবে বিশেষভাবে বিবেচনা

করে চিত্রের বিভিন্ন অংশ সুপরিকল্পিত-ভাবে সংস্থাপন করতেন। এই সুপরিকল্পিত সংস্থাপনার কথা চিন্তা করতে গিয়ে পোস্ট-ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীরা দৃশ্যের চাক্ষুষ অনুভূতিকে পটের উপর বিশুদ্ধ মণ্ডনকলাসম্মত অলংকারে রূপান্তরিত করতেও চেষ্টা করেছিলেন। চিত্রকলা একেবারে বস্তু-নিরপেক্ষ হতে পারে কি না সে একটা ভিন্ন প্রশ্ন। কিন্তু বস্তু-নিরপেক্ষ, বিশুদ্ধ অলংকরণ যে-সব শিল্পীর উদ্দেশ্য নয়, চিত্রের অর্থপূর্ণতা যে সমস্ত শিল্পীর অভিপ্রেত, তাদের চিত্রেও দুর্বোধ্যতা কেন এল সে কথা বিশ্লেষণ করতে গেলে তিনটি চিত্রশৈলীর কথা বলতে হয় এবং সেই তিনটি চিত্রশৈলীর স্রষ্টা বলে যাদের গণ্য করা হয় সেই তিনজন শিল্পী—সেজান, ভান গোগ্ ও পল গোগ্যাঁর নাম একসঙ্গে করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে এই তিনজন শিল্পীকে যথাক্রমে কিউবিজম (বা চতুষ্কোণবাদ), এক্সপ্রেশনিজম্ (বা অভিব্যক্তিবাদ) ও প্রিমিটিভিজম (বা আদিমতাবাদ) এই তিন চিত্রশৈলীর স্রষ্টা বলে মেনে নেওয়া হয়। ভিন্নপন্থী এই তিন শিল্পী, বিভিন্ন কারণে, প্রায় একই সময়ে বাস্তবানুকৃতি বর্জনের সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

সেজান দেখলেন চিত্রকে বাস্তবানুগ করবার প্রচেষ্টায় ইম্‌প্রেশনিস্টদের কাজে কেমন একটা তারল্য ও সংস্থাপনার অভাব এসে গিয়েছে। সেজান চিত্রে স্থূলত্ব (সলিডিটি) ও ছন্দোবদ্ধ ভাব (সেন্স অফ্ অর্ডার) ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেন। এর জন্য প্রয়োজন হলে তিনি নিখুঁত রেখাংকনও বর্জন করতে প্রস্তুত ছিলেন। পথের অন্বেষণ করতে গিয়ে বস্তুর আকার ও রূপ নিয়ে সেজান যে-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন তার থেকেই পরে কিউবিস্টরা প্রেরণা পান।

পরবর্তীকালে অবশ্য বস্তুকে সর্বদা, সেজানের কথায়, কিউব কোণ ও সিলিণ্ডারের মাধ্যমে চিন্তা করতে করতে শিল্পীরা কিউবিজমকে একটা পাগলামীতে পর্যবসিত করে ফেলেছিলেন। তবু সে পাগলামীতে "মেথড্" ছিল না, বলা যায় না। পিকাসোর বেহালার ছবিটার কথা ধরা যাক্। যদি কিউব, কোণ ও সিলিণ্ডারের মাধ্যমে বস্তুকে চিত্ররূপে দেওয়াতে আমাদের কোন আপত্তি না-ও থাকে তবু আমাদের মনে হতে পারে বেহালা আঁকতে গিয়ে শিল্পী পটের উপর সমস্তটা জুড়ে বেহালার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে রেখেছেন কেন? কোথাও খানিকটা তার কোথাও কয়েকটা কান—পিকাসো না হয়ে আর কেউ হলে হয়ত তার শিল্প-দক্ষতা সম্পর্কেই আমাদের মনে সংশয় জাগত। কিন্তু পিকাসোর কারিগরী দক্ষতা সম্পর্কে তার ভিন্ন সময়ের ছবি সন্দেহের অবকাশ রাখেনি। এখন কিউবিস্ট চিত্রকরেরা বলবেন আমরা যখন একটা বেহালার কথা মনে ভাবি তখন কি কোন বেহালার নিখুঁত প্রতিরূপ আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বেহালার ভিন্ন ভিন্ন বিক্ষিপ্ত অংশের একত্র সমাবেশ আমাদের মনে জেগে ওঠে মাত্র। অতএব চিত্রকর যে বিকৃতি ঘটিয়েছেন তা বিশেষ অর্থপূর্ণ, যথেচ্ছ নয়।

ভান গোগ্ দেখলেন বাস্তবানুকৃতির কথা ভাবতে গিয়ে শিল্পী তার সৃষ্টি থেকে অবেগ ও গভীরতা হারিয়ে ফেলছেন। ভান গোগ্ বললেন, বস্তু-জীবনের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি দেওয়া শিল্পীর কাজ নয়। তাঁর কাজ হল দৃশ্যবস্তু মনে যে আবেগ সৃষ্টি করে পটের উপর তা-ই তর্জমা করা এবং দ্রষ্টার মনে অনুরূপ মানস আবেগের সৃষ্টি করতে পারা। এর জন্য কিছু যদি বিকৃতি ঘটে, চিত্র যদি যথাযথ বাস্তবানুগ না হয় ভান গোগ্ দুঃখিত হতেন না। আরল্'এ তার নিজের ঘরের যে ছবি তিনি এঁকেছেন তা উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। তার ঘরের হুবহু প্রতিলিপি দেওয়া তার উদ্দেশ্য ছিল না। নরম রঙ ও স্থূল রেখার সাহায্যে ঘরের শান্ত পরিবেশটি ফুটিয়ে তুলে একটা নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামের আভাস দেবার চেষ্টা ছবিটিতে আছে। তাঁর এই পটের উপর মনের আবেগ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা থেকে পরবর্তীকালে এক্সপ্রেশনিস্টরা অনুপ্রেরণা পান।

পল গোগ্যাঁকে ধরা হয় প্রিমিটিভিজমের স্রষ্টা বলে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল আমাদের তথাকথিত সভ্যতার হাত থেকে নিষ্কৃতি না পেলে চিত্রে আন্তরিকতা ও সারল্য ফিরিয়ে আনা যাবে না। তিনি ফ্রান্সের অতিসভ্য বা সফিস্টিকেটেড আবহাওয়া ছেড়ে তাহিতি দ্বীপের আদি-

বাসীদের সংগে বসবাস শুরু করেন। তাঁর প্রখর বর্ণ-বিলেপন ও দ্বিমাত্রিক বা দুই ডাইমেনশ্যনাল ধরনে আঁকা ছবিতে বাস্তবের অনুকরণ ও প্রতিফলনের চাইতে অলংকরণের প্রয়াসই বেশী।

চিত্রশিল্পের ইতিহাস আলোচনা করলে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে যেখানেই চিত্রকে প্রতিবিম্বধর্মী করে তুলতে শিল্পী অস্বীকার করেছেন সেখানেই তার পিছনে বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। শিল্পীর বাস্তববিমুখিনতার কারণ তার পারদর্শিতার অভাব নয়, আমাদের হতবাক্ করে দেওয়াও উদ্দেশ্য নয়। বিশেষ কোন একটা সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে বাস্তবের বিকৃতি ঘটাতে বাধ্য হয়েছেন শিল্পী। কিন্তু চিত্রে উদ্দেশ্যহীন বিকৃতি ক্ষমা করা যায় কি না আমাদের সমসাময়িক চিত্রকরদের সম্পর্কে আমাদের তা-ই হল প্রশ্ন।

শিল্পজগতে কোন না কোন সময়ে একজন বিরাট পুরুষের আবির্ভাব হয়, তিনি হয়ত একটা নতুন স্টাইল উদ্ভাবন করে যান, শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে একটা প্রেরণার সঞ্চার হয়। কিন্তু তারপর সেই স্টাইল একটা বাঁধাধরা গতানুগতিক নিয়ম মাত্রে পর্যবসিত হয়, শিল্পজগতের এটাই হল ট্রাজেডি। একাধিক শিল্পী তখন একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে থাকেন। চিত্র থেকে মৌলিকতা সম্পূর্ণ বর্জিত হয়। তারপর হয়ত কোন নবীন শিল্পী এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নতুন চিত্রশৈলীর স্রষ্টারূপে খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু তাঁর বেলাতেও একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়।

আধুনিক চিত্রকলা এখন আর মোটেই "আধুনিক" নেই, সনাতনেরও অধম হয়ে পড়েছে। অর্ধশতাব্দী পূর্বে চিত্রকলার কতকগুলি বিশেষ প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে গিয়ে আমাদের তথাকথিত 'আধুনিক' চিত্রকলার জন্ম হয়েছিল। তারপর এই এত বৎসর ধরে সেই চিত্র-রীতিই প্রচলিত রয়েছে। কোন এক সময়ে বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে শিল্পী প্রয়োজনের তাগিদে চিত্রে যে বিকৃতি ঘটাতেন এখন নবীনতর শিল্পীরা বিনা প্রয়োজনে শুধু ফ্যাসানের খাতিরে সেই প্রথা অনুসরণ করে চলেছেন।

চিত্রকলা সর্বজনবোধ্য হলেই তা রসোত্তীর্ণ হয়েছে বলে মনে করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। ছবি দেখবার চোখ খানিকটা তৈরী করেই নিতে হয়, চিত্ররস-গ্রাহিতা অর্জন করে নেবার জিনিস, সহজাত নয়। তবু সত্যিকারের প্রাণ থেকে আঁকা ছবির একটা অন্তর স্পর্শ করবার ক্ষমতা থাকে তা সে চিত্র যত প্রতিবিম্ব-ধর্মীই হোক আর যত অ্যাবস্ট্রাক্ট বা অবিশেষ্যধর্মীই হোক্ না কেন। আমাদের সমসাময়িক চিত্রকলায় এই জিনিসটির একান্ত অভাব ঘটেছে মনে হয়। আধুনিক চিত্রকলা আমাদের প্রাণ স্পর্শ করতে পারে না। অনেক সময় শিল্পচাতুরী দেখে চমৎকৃত হই, তারিফ্ করি কিন্তু প্রাণ থেকে স্বতউৎসারিত প্রশংসা উচ্চারিত হতে চায় না।

গত আন্তর্জাতিক চিত্রপ্রদর্শনীতেই দেখলাম হতচকিত,, বিস্ময়াবিষ্ট দর্শক-বৃন্দকে ছবির অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছেন কর্তাব্যক্তিরা। এ যেন কোরিয়ার যুদ্ধ-বন্দীদের কাছে ব্যাখ্যা কার্য চলছে। সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা সবই শিল্পীর অন্তরের বিশেষ কোন ভাবের অভিব্যক্তি। কোন বিশেষ চিত্র কিসের অভিব্যক্তি তা যদি অত সবিস্তারে ব্যাখ্যান করবার প্রয়োজন হয় তবে কি তাকে সার্থক চিত্র-সৃষ্টি বলে স্বীকার করা যায়?

মৌলিক কিছু আর সৃষ্টি হচ্ছে না, একাধিক শিল্পী, তা তিনি ইরাক, ইরাণ, আফগানিস্থান যে দেশেরই হোন না কেন, একই ভঙ্গী অনুসরণ করে চলেছেন। মৌলিকতা বর্জিত অন্ধ অনুকরণের ফলে চিত্রকলা হয়ে পড়েছে প্রাণহীন। মানুষের নতুন কিছু সৃষ্টির ক্ষমতা কমে গিয়েছে বলেই যেন আরও বেশী করে কিম্ভূত-কিমাকার কিছু সৃষ্টি করার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন শিল্পী। "অজ্ঞাতনামা রাজবন্দী" বা "আনুনোন্ পলিটিক্যাল প্রিজনার"এর পিছনে বোধ হয় শিল্পীর মৌলিক কিছু সৃষ্টি করতে পারার অক্ষমতার ইতিহাসই রয়েছে।

কিন্তু বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে থেমে আছে বলে চিত্রকলার ইতিহাস এখানেই থেমে থাকবে মনে করার কোন কারণ দেখি না। হয়ত সনাতন 'আধুনিক'দের সরিয়ে দিয়ে নবীনপন্থী আধুনিকদের আবির্ভাবের সময় হয়ে এসেছে। বর্তমান চিত্রকলার অস্থিরচিত্ততা তারই ইঙ্গিত মাত্র।

চিরদিনের গান

শ্রীআশিস দত্ত

যে গানখানি ভুলিতে চাও তুমি
ভোলা তো তারে যায় না সহজে
যতো না নব সুরের জালে তব
যাতনা তার নিত্য সহ যে!

দিনের স্মৃতি ভোলাতে চায় রাত্রি এসে ওড়না টেনে কালো
ওই রাতের ভস্ম মাঝে লুকিয়ে থাকে দিনের যতো আলো,
রঙগরবী ওই গোধূলির হৃদয়মাঝে

রাতের সেতার কেমন ক'রে লুকিয়ে বাজে
সূর্য হতে ঝরে তারার স্মৃতি
তারায় তারায় রবির আলোকগীতি
ভুলতে গিয়ে তাই তো বারেবার

আমারি কথা কেবলি কহ যে
হৃদয়মধুভাণ্ড মাঝে তব
সুবাস তার নিত্য বহ যে।

গুহাতীর্থ অমরনাথ

২

প্রায় ঘণ্টা চারেক লাগলো চন্দনবাড়ী পৌঁছতে। পথের শেষ অংশটা বড়ই বন্ধুর ছিল। যারা বরাবর হেঁটে এসেছে তাদের পায়ের ইতিহাসটা আমার জানা। মনে মনে তাই সমবেদনা বোধ আসে। আমরা ঘোড়ায় আসছি, কিন্তু তাতে পায়ের কিছু স্বস্তি থাকলেও মেরুদণ্ডের নেই। কাঠ হয়ে ব'সে থাকতে থাকতে পিঠের দিকে টনটন করে। তা ছাড়া ঘোড়ার পায়ের ওপর বিশ্বাস আসে না। খদের ধার ঘেঁষে চললে আতঙ্কিত শরীর ঢোল হয়ে আসে পলকে পলকে। সবচেয়ে নিরাপদ হোলো পায়ে হাঁটা, কেননা সেটা নিজের আয়ত্তের মধ্যে।

চন্দনবাড়ী অধিত্যকা হোলো একটুখানি অবকাশ মাত্র। চারিদিকে পাহাড়ের অবরোধ, মাঝখানে এইটুকু ফাঁক। সামনে কয়েকখানি লাল রংয়ের করোগেটের চালা, লোহার ফ্রেমে আঁটা। বছরে দু' একটি দিন এসে গরীব তীর্থযাত্রীরা ঠাণ্ডা ও বৃষ্টি বাঁচিয়ে এখানে আশ্রয় পায়, তারপর সমস্ত বছর শূন্য চালা হা হা করে। অত্যধিক তুষারপাতের সময় পাহাড়ী ভালুকরা এখানে এসে জায়গা নেয়, কিংবা উপত্যকার অন্যান্য জন্তু। পাশ দিয়ে অনেক নীচে খরতর প্রবাহে চলেছে নীল গঙ্গা বা লিডার নদী। আমরা এসে যখন ঘোড়া থেকে নামলুম, তখন সন্ধ্যার ঠাণ্ডা বাতাস আমাদের একটু কাঁপিয়ে দিল। অশ্বরক্ষী গণিশের এবং তা'র সহকারী মিলে খোঁটা পুঁতে আমার ও হিমাংশুবাবুর তাঁবু দুটি খাটিয়ে দিল। তাঁর একটু জ্বরভাব থাকলেও উৎসাহটা ঢিলা নয়। সন্ধ্যার ছমছমে ছায়ায় এদিক ওদিক ঘুরে দেখি আমাদের আগে এসেছে প্রায় সবাই এবং সমস্ত অধিত্যকাটি জুড়ে তাঁবু পড়েছে এবং নানা জিনিসের দোকান ব'সে গেছে। তাঁবুর পর তাঁবু—পা বাড়াবার উপায় নেই। কোথাও কেউ জেলেছে কাঠের আগুন, কেউ ময়লা হারিকেন, কেউ বা মোমবাতি। শীত ধরেছে সকলের, অনেকে জবুথবু হয়ে কম্বলের রাশির তলায় ঢুকেছে। সাধু, মহন্ত, বাবাজী, সন্ন্যাসী, নাগা ফকির, গৃহস্থ স্বামী-স্ত্রী, এমন কি কয়েকটি কচি শিশু ও বালক-বালিকাও সঙ্গে এসে উপস্থিত। দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে এলো এবং ওপারের পাহাড়ের পাশের চাঁদ এপারের পাহাড়ের চূড়াটিকে ঈষৎ উজ্জ্বল ক'রে তুললো। আমাদের ছোট অসমতল প্রান্তরটুকু নীচের দিকে প'ড়ে ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হলো। শত শত লোক তাদের একটি রাত্রির জীবন নির্বাহের জন্য সম্পূর্ণ অন্ধকারে ডুব দিল। পথঘাট বলতে কিছু নেই। বর্ষার জলস্রোতের আঘাতে যেটুকু ভেঙে এসেছে, সেইটুকুই হোলো আনাগোনার পথ। আশে পাশে ঘন জঙ্গল, এখানে ওখানে একটু আধটু লোকালয়। আগেকার কালের তীর্থযাত্রায় যে শ্রেণীর লোক আসতো তা'রা সংসার থেকে প্রায় বরখাস্ত ছিল। অল্পবয়সী স্ত্রী-পুরুষ বড় একটা চোখে পড়তো না। ইদানীং চাকা ঘুরছে। কাঁচা বয়সের যাত্রীরা যায় সর্বত্র। সবটা অধ্যাত্ম পিপাসা নয়, কিছু দুর্গম ও দুঃসাধ্য পথের টান, কিছু অভিনব জীবনযাত্রার আকর্ষণ,
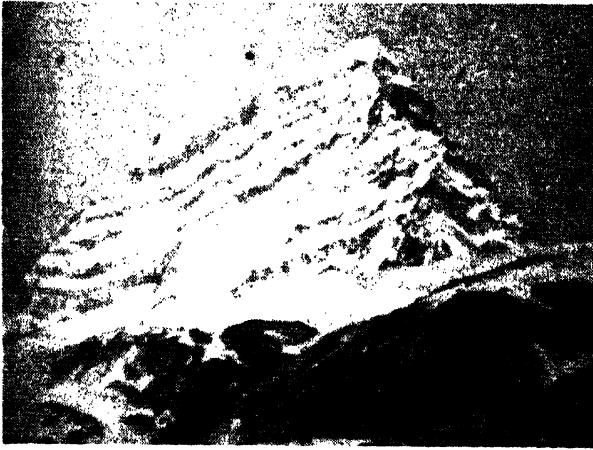
কোলাহাই গ্লেসিয়ার

কিছু বা আবিষ্কারের আনন্দ। সামাজিক জীবন থেকে সাময়িক একটা স্বচ্ছন্দ মুক্তি, সেটাও কম লোভনীয় নয়। আমরা আসবার সময় দেখেছি, অল্প বয়সের অসংখ্য মেয়ে-পুরুষ,—তাদের মধ্যে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, মাদ্রাজী অনেকেই আছে। একটি বাঙ্গালী দম্পতি এসেছে ছয় মাসের শিশুকে নিয়ে, তাদেরও দেখেছি। অসম-সাহস সন্দেহ নেই।

শীতে ঠকঠক করছে বহুলোক। ফুটন্ত চা গিলছে অনেকে। মিলিটারী এসেছে একদল, পুলিশের লোক এসেছে কয়েকজন। অদূরে শিখ দোকানদার রুটি সে'কছে, পরটা ভাজছে, চা বানাচ্ছে,—ভিড় জমেছে সেখানে। গণিশেরের দল ভাত আর ভাজি এনেছে তাদের পিঠে ঝুলিয়ে, —কাঠের আগুন সামনে রেখে তা'রা ব'সে গেছে। হিমাংশু গিয়ে জুটেছেন ওই শিখের দোকানে। তিনি আলাপী লোক, অতএব আসর জমিয়ে বসেছেন দোকানের বেঞ্চিতে। সামনে হারিকেন জ্বলছে।

অন্ধকার থেকে আলোয় এসে বসলুম বেঞ্চির এক কোণে। হিমাংশুর পাশেই জন দুই মিলিটারী যুবক খাবার খাচ্ছে। কথা কইতে কইতে জানা গেল ওদের মধ্যে একজন বাঙ্গালী। এ অঞ্চলে মিলিটারী বাঙ্গালী? হিমাংশুবাবু মহা খুশী হয়ে নতুন রসে আলাপ করতে শুরু করলেন। কাশ্মীরে ভারতীয় সামরিক বিভাগে যে মেডিক্যাল ইউনিট্ আছে, তার মধ্যে শতকরা ষাটজনই বাঙ্গালী অফিসার। এই যুবকটি কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে যাচ্ছেন অমরনাথ দর্শনে। তীর্থের মোহ ঠিক নয়, দুর্গমের আকর্ষণ। আমার সঙ্গে হিমাংশুবাবু তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। ফলে, সহসা যুবকটির চোখে মুখে সেই হারিকেনের আলোয় কেমন একটা নাটকীয় চমক লাগলো। আমার অলক্ষ্যে বার বার তিনি আমাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। শুনলুম তাঁর নাম মিঃ মজুমদার। চেহারাটা পল্টন দলেরই উপযুক্ত। যাই হোক, কোনোমতে আহারাদি সেরে বেশী কথাবার্তা আর না ব'লে সেদিনকার মতো তিনি বিদায় নিলেন। আলাপটা দীর্ঘস্থায়ী হোলো না।

আমাদের পাণ্ডা বদরিনাথ বুদ্ধিমান লোক। সে তার ভাই শিউজীকে রেখেছে আমাদের তত্ত্বাবধানে। সে এসে আমাদের তাঁবুর কাছ দিয়ে ঘুরে ফিরে যাচ্ছে, খবরদারি করছে। এইভাবে অনেক যজমানকেই সে নজরবন্দী ক'রে রেখেছে। আমাদের তাঁবু দুটো পড়েছিল নদীর ধার ঘে'ষে। তাতে কিছু দুর্ভাবনাও ছিল.— অর্থাৎ জন্তু-জানোয়ার অথবা সাপের ভয়; স্বস্তি কিছু ছিল—নিরিবিলি থাকা। গণিশের ও তার দলবলের লোকরা ঘোড়া-গুলির পা বে'ধে এখানে ওখানে ছেড়ে দিল,—সেগুলো সমস্ত রাত ধ'রে খুড়িয়ে খুড়িয়ে ঘাস খেয়ে বেড়াবে। নিজেরা শুলো লুই-কম্বল মুড়ি দিয়ে আশে-পাশে। আমরা গিয়ে ঢুকলুম নিজ নিজ তাঁবুর মধ্যে।

এর আগে বনভোজন উপলক্ষে দিনমানে তাঁবুর অভিজ্ঞতা আমার ছিল, কিন্তু একাকী এভাবে তাঁবুর মধ্যে রাত্রিবাস কখনো করিনি। আমার তাঁবুটি ছয় ফুট লম্বা-চওড়া,—টেনে বাঁধলে চারদিকে ফুটখানেক ক'রে বাড়ে। এই টুকুর মধ্যে আমার এই বিচিত্র বাহি সংসারযাত্রার সীমা। পাটকরা খাটিয়ার ওপর একখানা ভাড়াটে তোশক, বালিশটি আমার নিজের। সাজসজ্জাটা এবার কম নয়, উপকরণের কিছু বাহুল্যই আছে একখানা ফোল্ডিং চেয়ার ভাড়া ক এনেছি, তার হাতলের ওপর মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে নোট বইটির কাজ শে করলুম। রাত্রি ঘনিয়ে উঠলো।

মানুষের একটু-আধটু কণ্ঠস্ব কিছুক্ষণ অবধি শোনা যাচ্ছিল। তারপ সব চুপ। সেই নীরবতার পরিমাপ কর কঠিন। রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে পেচে শৃগাল-কুকুর—এদের ডাক শোনা আমাদে অভ্যাস। ঝি'ঝি' পোকা কিংবা ব্য ডাকে। জঙ্গলের ধারে থাকলে অনে সময় ফেউ ডাকে। গাছপালা ঘন হ থাকলে এক এক সময় সরীসৃপের ডাক শোনা যায়। কিন্তু এখানে প্রাণীশূ জগতে চেতনার চিহ্ন কোথাও নেই— একেবারে মৃত্যুর মতো অসাড় এ অবলুপ্ত। শুধু পার্শ্ববর্তী নীল গঙ্গায় তরঙ্গভঙ্গের আছাড়ি-পিছাি আর্তনাদ এবং তারই ফাঁকে ফাঁ প্রান্তরচারী শীতার্ত, ক্ষুধার্ত ঘোড়াগুলি কণ্ঠের বিচিত্র আওয়াজ। দেখতে দেখে সেই অবরোধ-ঘেরা অধিত্যকায় নে এলো জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নার আশ্চ চেহারা আমাদের কাছে পরিচিত নয় গাঙ্গেয় সমতল ভূভাগের জ্যোৎস্না নয়,—সেই জ্যোৎস্না হিমালয়ের গহ রহস্যালোকের। হঠাৎ যদি দেহের বিলো ঘটে এবং তারপরেও যদি থেকে য

জীবন-কল্পনা—আমরা ভেবে নিই একটা কিছু অবাস্তব মায়ালোক। সেটা স্বপ্নে, রঙে, কল্পনায়, তন্দ্রায় আলোছায়ায় যেমনই অবাস্তব, তেমনই অপ্রাকৃত। চেয়ে দেখি রাত্রির কোন অদৃশ্য প্রহরী এসে যেন সৌরলোক এবং মর্ত্যলোকের মাঝামাঝি দ্বার খুলে দিয়ে গেছে। নীচে প্রাণচ্ছায়াশূন্য প্রান্তরের উপরে মৃত্যুর অসাড়তা এবং উপরে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে অপ্সরালোক। কোনদিন কোন মানুষের দুটো চোখ যা দেখতে পায় না, যা জানতে পারে না, উপলব্ধির মধ্যে আসে না—তাই যেন দেখছি স্পষ্ট, জানছি অতি অনায়াসে, বোধ করছি নিবিড়ভাবে। জনতার ভিড়ের মধ্যে যারা চিরজীবন কাটিয়ে যায়, তারা বলবে—"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই—" কিন্তু সত্যি কি মানুষের উপরে কিছু নেই? যা আমাদের সংস্কারের, বুদ্ধির, চিন্তার, জ্ঞানের অতীত? যেটা ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে ভোলায়, বুদ্ধিজীবীকে দিশাহারা করে, বিষয়ীকে ঘরছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে, জ্ঞানী ব্যক্তিকে পাগল বানায়,—সে বস্তু কী? সে কেমন?

থাক্, আজ এই আরামের শয্যায় আর কাজ নেই। খোলা থাক্ বাকি জীবনের ওই তাঁবুর পর্দা। এর জবাব চাই, এর ব্যাখ্যা, এর ভাষ্য, এর চরম অর্থটা জেনে যাওয়া চাই। দেবতাত্মা হিমালয় তার শেষ কথাটা সহজে এবার বলুক আমার কানে কানে।

ভোরবেলায় সাড়া পেলুম হিমাংশুবাবুর। তাঁর শরীর যথেষ্ট সুস্থ নয়, কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর প্রভাতের পদচারণা হয়ে গেছে। এখানকার আয়ু অল্প, তল্পিতল্পা যথাসম্ভব শীঘ্র গুছিয়ে নিতে হবে। ভোরের আকাশ প্রসন্ন ছিল বলে বহু সাধু ও সন্ন্যাসী এবং মার্কামারা তীর্থযাত্রীর দল আগেভাগে হাঁটাপথে বেরিয়ে পড়েছে। পণ্ডিত শিউজী এসে জানিয়ে দিল, এখান থেকে কিছুদূরে সেই মস্ত চড়াই—সেই চড়াই দেখে অনেক যাত্রী ভয় পেয়ে পালায়। শীঘ্র শীঘ্র তৈরী হয়ে আমাদের বেরিয়ে পড়া দরকার।

শেষনাগের হ্রদ

চা-পানের জন্য বেরিয়ে পড়বো, এমন সময়ে কয়েকজন বাঙালী যুবক—সাহেবী পোশাকপরা—এগিয়ে এসে সহাস্যে নমস্কার জানালো। তারাও যাচ্ছে। সঙ্গে আছেন একজন সুইডেনবাসী ছাত্র—তিনিও চলেছেন ওদের সঙ্গে। সুইডিস যুবকটি নাকি বেরিয়েছে পৃথিবী ভ্রমণে। ভারতে এসে তুষারলিঙ্গ অমরনাথের নাম শুনেছে দিল্লীতে। তার অসীম কৌতূহল—কেমন ক'রে প্রকৃতির খেয়ালে এমন অদ্ভুত ধরনের তুষার-শিবলিঙ্গের আয়তন তৈরী হয়ে ওঠে! তিনি আলাপ করলেন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতন। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজি ভাষা। যুবকটির সঙ্গে আছে জনচারেক স্থানীয় শ্রমিক এবং পাচক। চার-পাঁচটি ঘোড়া। দুটি তাঁবু। বিছানা-পত্রে আর আসবাবে প্রচুর উপকরণ-বাহুল্য। সঙ্গে ভালো দুটি ক্যামেরা। আলাপের মাঝখানে তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের ছবি তোলা হোলো। বাঙালী যুবকরা সকলেই মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। অসামান্য তাদের উদ্দীপনা। স্বাস্থ্য, শ্রী ও শক্তিতে সকলের চেহারাই প্রদীপ্ত।

সকলের আগে বেরিয়ে গেল 'কুণ্ডু স্পেশ্যালের' যাত্রীরা। মেয়ে, ছেলে, বৃদ্ধ, প্রবীণ, প্রৌঢ় মিলিয়ে প্রায় দেড়শো। মস্ত তাদের আহারাদির আয়োজন, বিস্তৃত তাদের যানবাহনের ব্যবস্থাদি। তাদের দখলে আছে প্রায় চারশো ঘোড়া, পনেরো কুড়িটি ডাণ্ডি, গোটা পঞ্চাশেক তাঁবু এবং প্রচুর পরিমাণে ভোজ্যবস্তু। পরিচালনা ও বিধিব্যবস্থা দেখলে আমাদের মতো লোকের মাথা ঘুরে যায়।

ক্রমে ক্রমে দোকানপত্র অদৃশ্য হোলো, যাত্রীদল নিয়ে সারবন্দী ঘোড়াগুলি শান্তগতিতে দূর পাহাড়ের অন্তরালে মিলিয়ে গেল। একটি একটি তাঁবু উঠে গেল, পুলিস ও মিলিটারীর দল অগ্রসর হোলো। দেখতে দেখতে সেই পর্বত-মালার প্রাচীরঘেরা ক্রোড়ভূমি আবার হয়ে এলো জনশূন্য। আমরা পড়েছি প্রায় শেষের দিকে, কারণ আমাদের সব দেখে যাওয়া চাই। শোনা গেল, পহলগাঁও থেকে আজও মধ্যাহ্নের দিকে কিছু যাত্রী আসবে, তারা আজ সন্ধ্যায় পৌঁছবে বায়ুযানে। সুতরাং চন্দনবাড়িতে দু-একটি খাবারের দোকান থেকে যাবে বৈকি। আজ আমাদের গন্তব্য স্থল হোলো বায়ুযান,—শেষনাগের হিমবাহ আজ আমরা অতিক্রম করবো। যখন আমরা চন্দনবাড়ি থেকে অশ্বারোহণে বেরিয়ে পড়লুম, বেলা তখন নটা। রৌদ্র আজ আর প্রখর হ'তে পাচ্ছে না, মাঝে মাঝে একটু-আধটু মেঘের ছায়া দেখা যাচ্ছে। ঠাণ্ডা লাগছে বেশ,—

যারা পায়ে হেঁটে যাবে, ঠাণ্ডায় তাদের সুবিধা। যেদিকটায় পর্বতের ছায়া, ঠাণ্ডা সেদিকে বেশী। আজকের পথ বনময়। কোথাও কিছু পথ ভালো, কিছু পথ পাহাড়ের ভাঙ্গনে বিঘ্নসঙ্কুল। নীচের দিকে দেওদারের ঘন বন, মাঝে মাঝে চিড় আর শিশমু, ভূর্জপত্র আর আখরোটের জঙ্গল, এপাশে ওপাশে গিরিগাত্রের নির্ঝরিণীর ঝরঝরানির শব্দ। এই পর্যন্ত নাকি জন্তু-জানোয়ারের শেষ আশ্রয়, এর পর থেকে তাদের সংখ্যা বড়ই কম। গতকালকার রৌদ্রে আর রাত্রির তুহিন ঠাণ্ডায় যে কারণেই হোক আমাদের পথে প্রচুর হিমকণাপাত ঘটেছে। সমস্ত পথটা সেজন্য পিছল ও সপসপে। আমরা ধীরে ধীরে উঠছি উপরে। যারা পায়ে-হাঁটা, তাদের গতি মন্থর হয়েছে, তারা লাঠি ঠুকে চলছে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে, তাদের পাশ দিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে পেরিয়ে যেতে আমাদের কিছু কুণ্ঠাবোধ হচ্ছে—সন্দেহ নেই। অর্থাৎ মনের মধ্যে কোথায় যেন প্রচ্ছন্ন অক্ষমতা ও পরাজয়বোধ অনুভব করছি। উপায় নেই, এগিয়ে যেতে হচ্ছে।

প্রায় মাইল দেড়েক এসে আমরা সেই সুপ্রসিদ্ধ চড়াই-পথ পেলুম। এর নাম হোলো প্রথম এবং সর্বপ্রধান অগ্নি-পরীক্ষা। নীচের দিকে নিবিড় অরণ্য, আস্তে আস্তে উঠতে থাকলে অরণ্যলোক হাল্‌কা হয়ে আসে। পথের প্রথম দিকে এত পাথরের জটলা এবং সে-পাথর এত আল্‌গা যে, যদি দৈবাৎ একটি কি দুটি স্থানচ্যুত হয়, তবে সর্বনাশ! নীচের দিকে অসংখ্য যাত্রী হয়ত প্রাণ হারাবে। নাগা-সাধু, সন্ন্যাসী ও মহন্ত মহারাজরা চলেছে মন্ত্র জপতে জপতে। প্রতিটি পদক্ষেপ ক্লান্তিকর। লাঠির ভর দিয়ে দু-পা ওঠো, আবার দাঁড়াও, নিশ্বাস নাও, আবার ওঠো। পথ বিপজ্জনকভাবে পিছল। নীচের থেকে মাথা উঁচুতে তুললেও পর্বতের চূড়া দেখা যায় না। ঘোড়া উঠছে,—সামনের দুটো পা উঁচুতে, পিছনের পা দুটো নীচে। মানুষের মতো ঘোড়াও সন্তর্পণে পা তুলছে, পাছে পিছলে যায়, পাছে হোঁচট খায়। এ তাদের

অমরনাথের পথে শেষনাগ

অভ্যাস, এ তারা জানে। কিছুদিন আগে গিয়েছিলুম ভূটানের দিকে বক্‌সা দুর্গে। মাঝখানে আন্দাজ আধ মাইল এই প্রকার পথ ছিল। কিন্তু তার বিস্তৃত আঁকবাঁক ছিল ব'লে এতটা বুঝতে পারা যায়নি। এখানকার পাকদণ্ডিতে ঘোড়ার দেহের সামনের অংশটা যখন বাঁক নিয়ে উঠছে, পিছনের শরীরটা তখন আগেকার বাঁক-পথে থেকে যাচ্ছে,—অর্থাৎ পরিসর এত সামান্য। দিল্লীর কুতবমিনার উঁচু আড়াইশো ফুট, কিংবা কলকাতার মনু-মেণ্ট উঁচু দেড়শো ফুট। কিন্তু ও'রা যদি প্রায় চার মাইল উঁচু হোতো—তাহলে? কুতবমিনারের ভিতরে সিঁড়ি আছে, সোজা হয়ে এক একবার দাঁড়ানো যায়। এখানে সিঁড়ি নেই, পাহাড়ের খাঁজ নেই, জিরোবার স্থান নেই, দাঁড়াবার অবকাশ নেই। সবচেয়ে বিপদ তাদের, যারা নীচের দিক থেকে এখনও উপরে উঠছে। ঘোড়ার পায়ের ঠোকরে যদি একটি পাথর গড়ায়, তবে সেটি ঠেলবে আরেকটি পাথরকে দুটিতে গিয়ে তৃতীয়টিতে দেবে ধাক্কা,—তারপর? তারপর নীচেরতলাকার যাত্রীদের সেই শোচনীয় অপঘাত-মৃত্যু আর ভাবতে পারিনে। পাশ দিয়ে যাচ্ছেন ডাণ্ডিতে চ'ড়ে বাঙালী মহিলা। আতঙ্কে তাঁর চোখ দিয়ে এবার জল গড়িয়েছে। বিজ বিজ ক'রে বলছেন, জয় অমরনাথ! জয় বিপদতারণ মধুসূদন! চোখে আঁচল চাপা দিচ্ছেন ভদ্রমহিলা!

উপুড় হয়ে আমরা ঘোড়ার গলা দুহাতে জড়িয়ে ধরে আছি। খদের দিকে তাকাচ্ছিনে, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হ'তে পারে। উপর দিকে তাকাতে পাচ্ছিনে, মাথা ঘুরে যায়। শুনেছি যারা আত্মহত্যা করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, তারাও অপঘাত মৃত্যুকে ভয় করে! নীচের দিকে কোথায় চন্দনবাড়ির শূন্যে অধিত্যকা হারিয়ে গেছে, অরণ্যের শীর্ষস্থান আর খুঁজে পাচ্ছিনে, পৃথিবী আমাদের অনেক নীচে, অনেক পিছে প'ড়ে রইলো! তেরো চৌদ্দ বছর আগে পণ্ডিত নেহরু এসেছিলেন এখানে, শেষনাগের তুষার নদী দেখবার ইচ্ছা ছিল তাঁর,—কিন্তু এই পিসু চড়াই তাঁর পথে বাধা ঘটিয়েছিল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন খাঁন আবদুল গফ্‌ফর খান এবং শেখ মহম্মদ আবদুল্লা। পণ্ডিতজীকে তাঁরা এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এমন এক একটা বাঁক আসতে লাগলো যে, আমরা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়বার জন্য ব্যস্ত হচ্ছিলুম। সবচেয়ে বিপদ ছিল, এই অদ্ভুত পাহাড়ের এক একটি স্থলের মৃণ্ময় পিচ্ছিলতা, এক একটি স্থলে ধারালো পাথরের ফাঁকে মাত্র এক ফুট কিংবা ছয় ইঞ্চি পরিমাণ পা রাখার জায়গা। একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ, একটি মুহূর্তের অন্যমনস্কতা, সামান্য একটি হিসাবের ভুল,—তারপর মৃত্যু দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত। মাঝে মাঝে ঘোড়ার পিঠের উপর থেকে যাত্রীর মালপত্র প'ড়ে গিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে; ক্লান্ত ঘোড়া তার পিঠের সওয়ার এবং মালপত্র ফেলে দেবার চেষ্টা করছে,—সেখানে তার আত্মরক্ষণীবৃত্তির আদিম চেতনা। মাঝে মাঝে তাদের অবাধ্যতা, মাঝে মাঝে তাদের অবস্থান ধর্মঘট। গণি ধরেছে শক্ত হাতে আমার ঘোড়ার লাগাম। সতর্ক তার চক্ষু, সতর্ক প্রহরা। অভয় দিচ্ছে আমাকে, সান্ত্বনা দিচ্ছে, আশ্বাস দিচ্ছে। গণি নিজে হাঁপাচ্ছে, হাঁটতে হাঁটতে মুখের থেকে এক একটা আওয়াজ বার করছে। কখনো ঘোড়াদের দিকে শিস দিচ্ছে, কখনো ব... নিঃঝুম পাহাড়ের মধ্যে চেঁচাচ্ছে—'হোউস,—সাব্বাস! হোউস,—সাব্বাস

ওটা তাদের বুলি, ও বুলিটা ঘোড়ারা বোঝে। যে দুটি ঘোড়া আগে-পিছে চলে, তারা নিজদের মধ্যে মন জানাজানি করে, একজনকে ফেলে আরেকজন এগোয় না, উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলে পথের মাঝখানে দাঁড়ায়, চেঁচায়, অবাধ্য হয়। ওদের এই প্রকৃতি রক্ষকরা জানে এবং সেইমতো ব্যবস্থা করে। এই পথের সম্বন্ধে বায়ুযানের তাঁবুর মধ্যে ব'সে আমার নোটবইতে যেটুকু লিখে রেখে-ছিলুম, এখানে উদ্ধার করে দিচ্ছিঃ

"সর্বাপেক্ষা উঁচু চড়াইপথ পার হচ্ছি। সাড়ে তিন মাইলেরও বেশী সমস্তটা ভয়াবহ। আমার জীবনে এমন সঙ্কটসঙ্কুল চড়াই খুব কমই অতিক্রম করেছি। পথ অতিশয় পিছল, দুঃসাধ্য এবং দুরতিক্রম্য। অবকাশ নেই, নড়বার জায়গা নেই, বড় বড় পাথর সমস্ত পথে ছড়ানো। মালপত্র ফেলে দিচ্ছে ঘোড়ারা। মহিলারা প'ড়ে যাচ্ছে ঘোড়ার পিঠ থেকে। একটি ভুল মানেই মৃত্যু। আশেপাশে বিভীষিকাময় গহ্বর, তুষার-গলা প্রপাত, শক্ত বরফে আচ্ছন্ন নদী, তুষারাবৃত উত্তুঙ্গ পর্বত এবং সমস্ত পথের দুই পাশে মধ্য শরৎকালের বিবিধ রঙ্গীন বর্ণের অজস্র ফুলের সমারোহ শোভা। প্রত্যেক পদে পদে সাধু-সন্ন্যাসী, স্ত্রীলোক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, বালকবালিকা, অশ্বরক্ষক ও কুলীর দল,—প্রত্যেকে এক একবার হাঁ ক'রে নিশ্বাস টানবার চেষ্টা করছে। এই প্রকার মর্মস্পর্শী দৃশ্যের ভিতর দিয়ে আমরা প্রায় পাঁচ হাজার ফুট আরো উপরে উঠে এলুম—।"

নীচেরতলা থেকে উঠে ছাদের খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়ালুম। এটা উপত্যকা। চন্দনবাড়ি অপেক্ষা সংকীর্ণ, তবে লম্বা অনেকখানি। সামনে সুদীর্ঘ সমতল দেখে আমাদের মুখে-চোখে অসীম স্বস্তিবোধ। যারা এখনও পিছনে আসছে, তাদের কথা ভাবতে ভয় করে। কামনা করি, তারা নিরাপদে আসুক। আমরা প্রায় সাড়ে চোদ্দ হাজার ফুটের উপরে উঠেছি কাগজপত্রের হিসাবে। পর্বত-মালার তৃতীয় স্তরে আমরা এসেছি। চতুর্থ স্তর হোলো 'গ্লেসিয়ার'—অর্থাৎ বরফ-জমা নদী নীচে উপরে এবং চারি-ধারে। সেই নদীরা ঝুলে থাকবে

চন্দনবাড়ী তাঁবুতে লেখক, সুইডিস ছাত্র ও অন্যান্যরা

আমাদের চোখের সামনে। আশে-পাশে দেখি, কারো চোখ থেকে বেরিয়ে এসেছে আনন্দের কান্না, কেউ ধুঁকছে, কেউ বা বাক্রুদ্ধ। অনেকেই বিশ্বাস করেনি নিরাপদে উঠবে। শোনা গেল, জন আটেক বাঙালী পুরুষ এবং চার-পাঁচজন মাদ্রাজী মেয়ে-পুরুষ ভয় পেয়ে ফিরে গেছে। 'কুণ্ডু স্পেশালের' পরিচালক শ্রীমান শঙ্কর কুণ্ডু এই নিয়ে পরে আমার কাছে বড় দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। বাঙালীর উৎসাহ আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাকি তারা পিছিয়ে যায়। কিন্তু জাতি-চরিত্র বিচারের সময় তখন নয়। কণ্ঠ, তালু, টাগরা সব শুকে—আগে একটু চা খেয়ে বাঁচি। ছোট্ট একটি চা-কচুরীর দোকান আমাদের আগে-ভাগে এসে গেছে। এই উপত্যকাটির নাম হোলো যশপাল। কেউ বলে, যোজপাল। হিমাংশুবাবুর মুখে এতক্ষণে কথা ফুটেছে। ঘোড়া থেকে নামলেন কয়েকজন বাঙালী প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা। দুঃসাধ্য তীর্থযাত্রায় এরই মধ্যে আমরা সকলেই পরস্পরের আত্মীয় ও বন্ধু হয়ে উঠেছি। আশেপাশে গাছপালা ক'মে এসেছে,—তবু দেবদারু আর রুদ্রাক্ষের কয়েকটি গাছ চোখে পড়ছে। ঘাস-লতা আছে এখানকার উঁচু-নীচু প্রান্তরে। বৃষ্টির কাল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমাদের সমস্ত পরিশ্রম আর কষ্টস্বীকারের বাইরে পার্বত্য প্রকৃতি তার সমস্ত শোভা নিয়ে বিরাজমান। ঘাসে ঘাসে ফুল ফুটেছে অজস্র। যতদূর দৃষ্টি চলে, ফুলের বিছানা পাতা। একই বৃন্তে পাঁচ-সাত রংয়ের ছোট ছোট আশ্চর্য ফুল। প্রত্যেক পাপড়ির রং পৃথক, একটি বোঁটার সঙ্গে অন্য বোঁটার বর্ণের মিল নেই। কোন ফুলের নাম জানিনে, কোন ফুল চিনিনে,—তাই এত আনন্দ হচ্ছে। আগে বলেছি, সমগ্র কাশ্মীর হোলো মৃন্ময়। তার পাহাড়, তার প্রান্তর, তার অরণ্যলোক, তার নদী-পথ, তার উপত্যকা-অধিত্যকা,—সমস্ত মৃত্তিকাময়। এই মাটির ক্ষয় হয়ে চলেছে যুগে যুগে। আশেপাশে পর্বতমালায় অসংখ্য অগণ্য ক্লীফ্—কলমের ডগার মতো একটার পাশে আরেকটা দাঁড়িয়ে। সেই চূড়াগুলি মৃন্ময়—তাতে ক্ষয় ধরেছে বহুকাল থেকে। কেউ যদি বলে, হাজার পাঁচেক বছরের মধ্যে কাশ্মীরের পর্বত-মালার এ উচ্চতা থাকবে না—আমি অসঙ্কোচে বিশ্বাস করবো। কাশ্মীরের এত ফলন কেবল তার মৃন্ময়তার জন্য। যশপাল থেকে বেরিয়ে যত দূরে যাচ্ছি, এই ক্ষয়িষ্ণু পর্বতের একই চেহারা। অন্য কোন পার্বত্য দেশে—বিশেষ ক'রে

এই উচ্চতায় এ প্রকার ফলন হয় না। সমগ্র গাড়োয়ালে নেই, কুমায়ুনে নেই, হিমাচল প্রদেশে নেই, নেপালে কিংবা সীমান্তে নেই। সেখানে সর্বত্র গ্র্যানাইট্ পাথরের ভিড়,—দশ হাজার ফুট পর্যন্ত সেখানে ফলন। সেসব অঞ্চলে গেলে কাশ্মীরের চেহারাকে বিশ্বাস করা যায় না। কাশ্মীরকে লোকে ভূস্বর্গ ব'লে এসেছে বহুকাল থেকে, কিন্তু কাশ্মীরের মত ভূস্বর্গ সমগ্র হিমালয়ে শত-সহস্র আছে। আদি-অন্ত হিমালয়ে যেখানে-সেখানে ভূস্বর্গ। ব্রহ্মপুত্রে, সুরমায়, তিস্তায়, বাগমতীতে, কৌশল্যায়, শারদায়, গোমতী ও রাপ্তিতে, ব্রহ্মপুরা ও সমগ্র কুমায়ুনে, বিপাশা আর চন্দ্রভাগায়,—যেখানে অরণ্য-সমাকীর্ণ দুর্গম পর্বত-মালার আশেপাশে গিরিনদীরা চলে গেছে, সেখানেই ভূস্বর্গ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কাশ্মীরের কথা পৃথক। এখানে সমস্ত প্রকার খাদ্য, সব্জি ও ফলপাকড় অজস্র। এখানকার গ্রামে ঢুকলেই মনে হবে বাঙলা দেশ। সেই থোড়, মোচা, কাঁচকলা, সেই শশা, ঢেঁড়শ, ঝিঙে, সেই বেগুন, পটল, আর লাউ। আদা, লঙ্কা, তেঁতুল, সজনে আর নটে। নদীতে অজস্র মাছ, উঠোনের মাচানে লাউ আর কুমড়োর লতা। সেই অঙ্গন আর মাটির ঘর, সেই ধান-ঝাড়া আর চালকোটা। সেই মৌরীফুল, আর কাঁচা ডালিমের গন্ধ। সেই দারিদ্র্যের রুগ্নতা আর নগ্নতা, সেই রোগ আর জরা। ওর পাশে তাকাও,—আঙুর আর আপেলের বন, বাগুগোসা, খোবানি, বাদাম,—আরো কত রকমের ফল, কত মেওয়া। অজস্র খাঁটি ঘি, অজস্র সুন্দর সুগন্ধী চাউল। মাছ, মাংস, মাখন, ডিম,—চারিদিকে প্রাচুর্য। কিন্তু সমগ্র দেশে নেই পয়সা, রোগে ভুগে আর দারিদ্র্যে মরে কাশ্মীর। আর যারা বাইরের থেকে মোটা টাকা নিয়ে বেড়াতে যায়, তারা ফিরে এসে বলে—ভূস্বর্গ!

আরো চার মাইল এগিয়ে যাচ্ছি। আকাশে একটু-আধটু কালো মেঘের ইশারা দেখছি। ডানদিকে বিরাট পর্বতের সারি চলেছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। চেহারা প্রায় ওই একই, ক্ষয়িষ্ণু মৃন্ময়। মাঝখানে আবার গেছে কিছুক্ষণ প্রাণান্তকর চড়াই—প্রায় সাত আটশো ফুট। আমাদের আগে এগিয়ে গেছে বহুলোক। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে বরফ-ঢাকা পাহাড়ের চূড়া,—দক্ষিণে অনেক নীচে দিয়ে গেছে সেই নীলগঙ্গা। সেটি মিলেছে শেষনাগ নদীতে। চড়াই আর উৎরাই চলেছে—তবে চড়াই বেশী বরাবর। এদিকের পথ কিছু ভালো, কিছু সহ্য করা যায়, কিছু বা চওড়া। কিন্তু ঘোড়ার উপর থেকে নীচের দিকে তাকালে ভয় করে। মাঝে এক-আধবার যাযাবর গুজরদের এক-আধটি বস্তি চোখে পড়েছিল। তারপরে আর কিছু নেই। যতদূরে দেখছি, মহাশূন্য। পাখী, জন্তু, মানুষ, গাছপালা—কোথাও কিছু চোখে পড়ছে না। আকাশে এক-আধ টুকরো মেঘের চলাফেরা দেখে সকলেই উদ্বেগ বোধ করছে। আমাদের ক্যারাভান চলেছে সঙ্কটসঙ্কুল পর্বতমালার সঙ্কীর্ণ পথরেখা ধ'রে বিরাট সরীসৃপের মতো।

শেষনাগ এলো। হঠাৎ যেন খুলে গেল দিগন্তের পূর্বদ্বার। পশুরাজ সিংহ যেন ব'সে রয়েছে পূর্বদিগন্ত জুড়ে। সমগ্র দেহে ধবল তুষার শোভা। তারই নীচে বিশাল হ্রদ। এত বিস্তৃত এবং এত ব্যাপক তার পটভূমি যে, সেই হ্রদের আয়তন সহসা ঠাহর করা যায় না। স্থির ঘন নীলাভ জল। একটি তুষার নদী এসে নেমেছে হ্রদে এবং একটি নদী বেরিয়ে গেছে সেই হ্রদ থেকে। যেমন কৈলাসের চূড়ার অদূরে মানসসরোবর এবং রাবণ হ্রদ। শেষনাগ হ্রদের ওপারে সোজা উঠেছে পর্বতমালা, এপারে কিন্তু বালু-বেলা। বহু যাত্রী পাহাড়ের তলায় নেমে গেল স্নান করতে। আমাদের পথের থেকে আন্দাজ একশো ফুট নীচে সেই হ্রদ। সুতরাং সেই জল স্পর্শ ক'রে আসা কঠিন নয়। অনেক পাঞ্জাবী মেয়ে নেমে গেল, অনেক উৎসাহী যুবকও। আশ্চর্য শোভা ব'লেই তার দুর্বার আকর্ষণ। ওপারের নানা পাহাড়ের গা থেকে নেমে এসেছে তুষার নদী। এই হ্রদের জলে আছে নাকি নানা ধাতব পদার্থ মিশ্রিত,—যারা স্নান করে, তাদের আর এ জীবনে নাকি চর্মরোগ হয় না। তুষার-গলা জল, ডুব দিলে অসাড় হয়ে আসে সর্বশরীর। কিন্তু অনেককে বলতে শুনেছি, স্নানের পরে সকলে আশ্চর্যরকম সুস্থ বোধ করে। তারা আর ঠান্ড[illegible] কাতর হয় না। যদি কল্পনা ক[illegible] জ্যোৎস্না রাত্রে এই স্বচ্ছ নীল জ[illegible] অবগাহন করতে আকাশ থেকে নেমে আ[illegible] কিন্নরী আর অপ্সরীর দল,—তাহলে সে[illegible] সত্য মনে হবে। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসে[illegible] কোন নির্দিষ্ট নিরীখ সত্য সত্যই এখা[illegible] খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন এক[illegible] বিশাল সাম্রাজ্যের ভিতর দিয়ে আম[illegible] চলেছি, যেখানে আমরা ভিন্ন আর কে[illegible] প্রাণীর চিহ্ন নেই। হয়ত যারা এখা[illegible] আছে, তারা অশরীরী, আমাদের চর্মচ[illegible] তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। আম[illegible] তাদেরকে ধ্যানে পাই, ধারণায় পাই, কিন্তু ধারণে পাইনে। হয়ত আমা[illegible] দেখছে তারা সকৌতুকে। কিন্তু আম[illegible] যাদের দেখতে পাচ্ছিনে, তারা যে নেই, একথা কে বললে? থার্ড ডাইমেনশ[illegible] কেমন করে দেখতে পাচ্ছি? কেমন ক[illegible] দেখছি টেলিভিশানে? হয়ত একদি[illegible] আমরা নতুন ধরনের লেন্স আবিষ্ক[illegible] করবো,—তার সাহায্যে দেখতে পাবো। দেখবার জন্যে মানুষের এত আকু[illegible] বিকুলি, দার্শনিকদের এত খোঁজাখুঁ[illegible] মানুষ অনেকদিন ধ'রে চোখ বুজে রই[illegible] অনেক সাধু ঘর ছেড়ে যোগের আস[illegible] ব'সে জীবনপাত করলো, পাহাড়ের চূ[illegible] উঠে সবাইকে লুকিয়ে অনেকেই গা ঢ[illegible] দিয়ে রইলো,—যদি ঈশ্বরকে দেখা যা[illegible] চোখে দেখতে না পেয়ে বললে, বেশ[illegible] মন দিয়েই দেখবো! খৃষ্টান, হি[illegible] মুসলমান, বৌদ্ধ—ঐ একই চে[illegible] সকলের। তবে কি বিজ্ঞান দেখিয়ে দে[illegible] ঈশ্বরকে? এমন লেন্স আবিষ্কার ক[illegible] একদিন—যা চোখে দেবামাত্রই দেখ[illegible] পাবো—যা এতদিন চোখের সামনে থ[illegible] সত্ত্বেও দেখতে পাইনি! যন্ত্রের সাহা[illegible] যদি আসল মানুষের কণ্ঠস্বরকে ধ'রে র[illegible] যায়,—যেটা অশরীরী, তবে অশরীর[illegible] যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যাবে না কেন?

উপর থেকে ক্রমশ দেখা যা[illegible] বায়ুযানের শূন্য হিমকান্ত প্রান্ত[illegible] মধ্যাহ্ন পেরিয়েছে, কিন্তু শীত ধ[illegible] খুব। তুহিন বাতাস উঠেছে। [illegible] অবশ হয়েছে ঠাণ্ডায়। আমরা বায়ু[illegible] এসে পেঁছিলুম।

(ক্রম[illegible]

১৯৪২ সাল। আমি তখন সবে মাত্র রেড়াখোল রাজ্যের দেওয়ান হ'য়ে ... গিয়েছি। রেড়াখোল রাজ্যটি ... সম্বলপুর জেলার উত্তরে ... একটি করদ রাজ্য ছিল। এখন ... তার "রাজত্ব" লোপ পেয়েছে। ...টির আয়তন ৮৩৩ বর্গমাইল, আর ... প্রায় সবটাই গভীর জঙ্গলাবৃত ও ... ভাল্লুক, হাতী, বনমহিষ ও বিভিন্ন ...র হরিণের লীলাক্ষেত্র।

আশ্বিন মাস, বিজয়া দশমীর পরের ... রাজ্যের প্রচলিত প্রথা অনুসারে ...দিনে রাজা পাত্রমিত্র নিয়ে মৃগয়ায় ...র হন। কিন্তু রেড়াখোলের রাজা ... কিঞ্চিৎ বৃদ্ধ হ'য়ে পড়েছেন ব'লে ... আর মৃগয়ায় যান না। যুবরাজ ...র ও তাঁর অন্যান্য পুত্রেরা এবং ...ার প্রধান প্রধান কর্মচারীরাই ঐ ...টি সমাধা করে থাকেন। সুতরাং ...য়ান সাহেবের মৃগয়া গমন অনিবার্য। ভোরে চা খেয়েই আমরা মোটরে বেরিয়ে পড়লাম। এই মৃগয়ার দলে রয়েছেন যুবরাজ, পটায়েং (অর্থাৎ মেজ-রাজকুমার), লাল সাহেব (রাজার আত্মীয়) ও আমি। আমাদের গন্তব্য স্থান হ'ল মাইল দশেক দূরে। গিয়ে দেখি, বিরাট আয়োজন। কর্মচারী ও পাইক বরকন্দাজেরা সদলবলে উপস্থিত আর প্রায় তিন শ' বিটার (beater) চারিদিকে জটলা করছে। শিকারের ব্যবস্থা হয়েছে আরও মাইল দুই দূরে জঙ্গলের মধ্যে, যেখানে মোটরগাড়ির যাবার উপায় নেই, তাই হাতীর ব্যবস্থা। হাতীর পিঠে চড়ে ত যথাস্থানে পৌঁছান গেল। গিয়ে দেখি, ১০০ গজ অন্তর অন্তর প্রায় ১০।১২ ফুট উঁচু চারটে স্থায়ী মাচা রয়েছে। এই স্থায়ী মাচা-গুলি বেশ শক্ত চারটি করে শাল গাছের খুঁটির উপরে পাটাতন বিছিয়ে তৈরি। বেশ প্রশস্ত। সচরাচর রাজা বা রেসি-ডেন্ট বা পলিটিক্যাল এজেন্ট বা গভর্নর বা রাজ্যের কোনও গণ্যমান্য অতিথি এলে এগুলি ব্যবহার করা হয়। অবশ্য মাচা-গুলি এমন জায়গায় করা হয়েছে যে, তার চারিপাশে জন্তু জানোয়ার প্রচুর পাওয়া যায়।

শিকারের স্থানে পৌঁছে আবিষ্কার করা গেল যে, সেদিনকার মৃগয়া-পর্বের আমিই নাকি প্রধান অতিথি। অর্থাৎ নূতন দেওয়ান সাহেবের কেরামতিটা সবাই দেখবে। শুনেই ত চক্ষুস্থির। আমার নিজের না আছে বন্দুক, না আছে গুলি। তাছাড়া শিকার ব্যাপারটার প্রতি আমার কোনওদিনই খুব আগ্রহ ছিল না। তবে শিকারীদের দলে ভীড়ে হৈ হৈ করতে ও তার উত্তেজনাটুকু উপভোগ করতে বেশ লাগত। তাই মাঝে মাঝে দর্শক হিসাবে শিকারে গিয়েছিলাম বটে, সম্মুখ সমরে কখনও অবতীর্ণ হইনি। তবে মাঝে মাঝে পরের বন্দুক ধার করে ঘুঘু, গ্রিন পিজিয়ন, স্নাইপ আর হাঁস মেরেই শিকারের সাধ মেটান গিয়েছিল। তার চেয়ে বড় কিছু এতদিন পর্যন্ত মারতে চেষ্টাও করিনি, তাই ভাগ্যেও জোটেনি।

সুতরাং মৃগয়া গমন ও ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি শিকার করাটা যে ক্ষত্রিয়দেরই সাজে ও অবশ্য কর্তব্য সে সম্বন্ধে একটা ছোটখাট বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম। কিন্তু কে কার কথা শোনে। যুবরাজকুমার মুখে এক খিলি পান পুরে আরদালীকে কি একটা ইশারা করে দিয়ে তাঁর গ্রীনার, হল্যান্ড আর উইনচেস্টার বন্দুকগুলি নিয়ে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে যুবরাজকুমারের আরদালী এসে উপস্থিত। হাতে একটা পুরাতন মরচেপড়া একনলা বারো বোর বন্দুক। সে এসে লম্বা সেলাম ঠুকে জানাল যে, যুবরাজকুমার দেওয়ান সাহেবের জন্য বন্দুকটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর একটিমাত্র এল্-জি গুলি দিয়ে বলল যে, যুবরাজকুমার বিশেষ দুঃখিত, তাঁর কাছে আর বারো বোর বন্দুকের গুলি বেশী নেই। কেবল কয়েকটা রাইফেলের গুলি আছে, যুদ্ধের বাজারে গুলি একেবারেই পাওয়া যাচ্ছে না। বন্দুকটা হাতে নিয়ে দেখলাম যে, সেটা বু[...] মানুষের দাঁতের মত নড়বড় করছে, অ[...] বন্দুকটার বাঁটের সঙ্গে নলে[...] এ্যালাইনমেণ্ট ঠিক নেই। মাঝের [...] ক্ষয়ে গিয়ে এই অবস্থা হয়েছে। বুঝল[...] আমার সঙ্গে কিঞ্চিৎ রসিকতা [...] হয়েছে। কিন্তু কি আর করি, আরদাল[...] বলে দিলাম, যুবরাজ সাহেবকে [...] আমার বহুত বহুত ধন্যবাদ জান[...] অতঃপর হাতীর পিঠে চড়ে মাচায় উঠল[...]
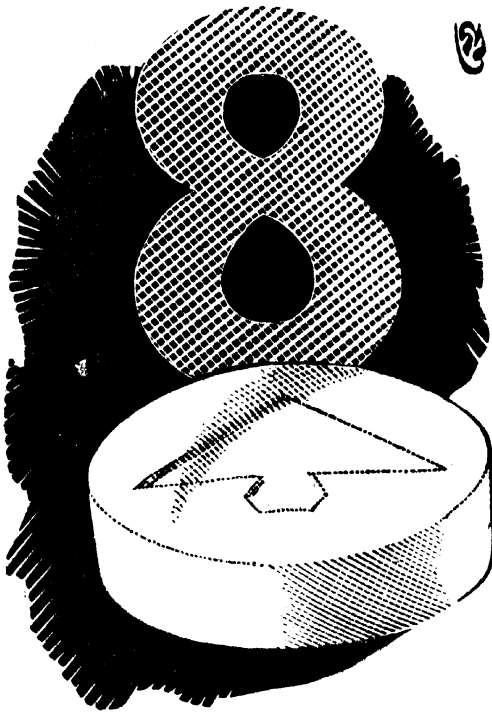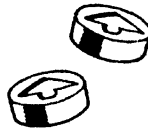
মনে মনে ভয় থেকে গেল যে, গুলি তো মাত্র একটি। তাও আপতকালে গর্জন করে উঠবে কিনা কে জানে। ইতিমধ্যে বিট আরম্ভ হয়ে গেল।

প্রথমবারের বিটে বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। কেবল লালসাহেব একটা চিতল্ মারলেন। এদিকে কোনো শিকার না পেয়ে যুবরাজকুমারের মন খারাপ। অগত্যা ঠিক হ'ল যে, মাইল দু'এক দূরে আরও কতকগুলো ঐরকম স্থায়ী মাচা আছে সেখানে একবার বিট করে দেখা যাক। বিটারদের রওয়ানা করে দিয়ে আমরা হাতীতে চড়ে গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছেছিলাম। আমরা যখন মাচায় গিয়ে বসলাম তখন বেলা প্রায় বারোটা। এবারকার মাচাগুলো বেশ একটা গভীর ও সরু শুক্‌নো নালার ধারে ধারে তৈরি। মাচার নিচে থেকে নালার নিচে পর্যন্ত প্রায় ১০০ ফুট গভীর। বিট হবে নালার ওপার থেকে। অর্থাৎ জন্তুরা বিটারদের তাড়া খেয়ে এপারে আসতে হ'লে নালাটা পেরিয়ে আসতে হবে। তখন মাচায় ব'সে গুলি করার বেশ সুবিধা। নালার দুপাশে 'চেক' রাখা হয়েছে, যাতে জন্তুরা নালা বেয়ে পালিয়ে যেতে না পারে।

আবার বিট আরম্ভ হল। বিটারদের চেঁচামেচি ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগল। আমার এবারকার মাচার সামনে একটা সরু জন্তু চলাচলের রাস্তা (অ্যানিম্যাল ট্র্যাক) নালাটার মধ্যে নেমে গিয়েছে। সেই দিকে চোখ রেখে বিটের আওয়াজ শুনছি, এমন সময়ে বুঝতে পারলাম সেই পথ বেয়ে কোনও জন্তু বেশ মন্থর গতিতে নালা থেকে উঠে আসছে। শুক্‌নো পাতার উপোরে তার চলার খড়খড় শব্দ। শব্দ শুনে মনে হ'ল বেশ ভারী জানোয়ার। যা হোক, সেই ভাঙ্গা বন্দুকটাই চেপেচুপে বাগিয়ে ধরলাম। একটু পরেই দেখতে পেলাম একটা প্রকাণ্ড ভালুক নালার ভিতর থেকে উঠে আমার মাচার দিকেই এগিয়ে আসছে আর মাঝে মাঝে থেমে পিছন ফিরে দেখছে যে, বিটাররা কতখানি এগিয়ে এল। ভালুকটা যখন মাচার প্রায় পঁচিশ গজের মধ্যে এসে পড়েছে, তখন বোধ হয় একটু নড়ে-চড়ে ভাল করে বসতে গিয়ে আমার মাচার উপর থেকে একটু খুট-খাট শব্দ হ'য়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গেই ভালুকটা মাচার দিকে ফিরে তাকাল। এবারকার মাচার চারিদিকে ডালপালা দিয়ে দিয়ে ঘিরে দেবার সময় হয়নি। সুতরাং চারি চক্ষের মিলন হতে মোটেই দেরী হল না—দেখতে দেখতে ভালুকটার চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠলো ভয়ঙ্কর হিংস্র। তার পরেই জানায়ারটা মাচার দিকে দৌড়ে এগিয়ে এসে প্রায় মাচার নিচেই সোজা দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সামনের থাবা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে দুলতে লাগল: ভাবটা যেন—"ওখানে বসে কি হচ্ছে, নিচে নেমে এসো না।" তখনও ভাবছি বন্দুকটা চালাব কি না। একটিমাত্র গুলী, তাও আবার যুদ্ধের বাজারের। কতদিন গুদামে পড়েছিল কে জানে! ট্রিগার টানার সঙ্গে সঙ্গে যদি গুলী না বেরোয়, তবেই ত গেছি। ওধারে আবার মাচাটা এমন সুন্দরভাবে চারটে শক্ত খুঁটির উপরে তৈরি যে, ভালুক মশায়ের তর তর করে মাচার উপরে উঠে আসতে মোটেই দেরি হবে না। সুতরাং আর অপেক্ষা করা নয়। কপাল ঠুকে ভালুকটার বিস্তৃত বক্ষ লক্ষ্য করে ঘোড়া টিপলাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিলেন, তাই গুলীটাও জঙ্গল-কাঁপানো গর্জন করে উঠল এবং মনে হ'ল ঠিক লক্ষ্যভেদ করেছে। ভালুকটার চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হ'ল যেন সে খুব আশ্চর্য হয়ে গেছে; এতটা বোধ হয় সে আশা করেনি। তারপরেই মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার উঠে যে রাস্তা দিয়ে এসেছিল, সেই রাস্তা ধরেই নালার ওপারে চলে গেল। আমি ভাবলাম যে, গুলীটা বোধ হয় ঠিক জায়গায় অর্থাৎ হার্টে লাগেনি। আর সঙ্গে গুলীও নেই যে, আরেকবার চেষ্টা করি বা মাচা থেকে নেমে ভালুকটার পিছু নিই। কি করা যায় তাই ভাবছি, এমন সময় দেখা গেল যে, নালাটার ওপারে খানিকটা পরিষ্কার জায়গায় একটা আম-গাছের নিচে গিয়ে ভালুকটা শুয়ে পড়ল, তারপর মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে তার সে কী কান্না! সেই কান্না শুনে মনে হ'ল—যেন একজন স্ত্রীলোক চিৎকার করে কাঁদছে আর বলছে,—"আমায় কেন মারলে, আমি তোমার কি করেছিলাম।" মধ্যাহ্নের সেই নিস্তব্ধ বনতল তার সেই অদ্ভুত করুণ মর্মভেদী আর্তনাদে ভরে গেল, আর আমি নিতান্ত অপরাধীর মতই মাচার উপরে বসে তার সেই মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখতে লাগলাম।

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ঐরকম কেঁদে কেঁদে ভালুকটা মরে গেল। ততক্ষণে বিট শেষ হয়েছে। সবাই মিলে হৈ-হৈ করে ভালুকটার মৃতদেহটা উঠিয়ে আনতে গিয়ে আবিষ্কার করল যে, গাছটার পিছনেই কয়েকটা বড় বড় পাথরের ফাঁকে ভালুকটা তার বাসা তৈরি করেছিল, আর সেখান থেকেই বেরলো দুটি বুভুক্ষু সদ্যমাতৃহারা ভালুকের ছানা। নিতান্ত অসহায়ভাবেই জড়োসড়ো হয়ে পাথরের ফাঁকে তারা ঢুকে আছে, চোখে তাদের বিহ্বল দৃষ্টি।

নূতন দেওয়ান সাহেব যে মস্ত বড় শিকারী, সেকথা সেদিন রাজ্যময় ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু সেদিনের পর আমি আর কখনও ভালুক শিকার করিনি।

—৭—

সমস্ত সন্ধ্যাটা শিবনাথ খালপাড় ধ'রে হাঁটল। নতুন জায়গায় সে বড়াতে এসেছে বটে, পরিচিতও হতে য়ায়।

পরিচিত হওয়া তার একান্ত দরকার।

আজকালই যে সে একটা চাকরি াগিয়ে ফেলবে তার স্থিরতা নেই,—মাজকাল কেন, অনেকদিনেও না।

শহরের বাইরে চলে এসেছে মানে কথায় কথায় এখন সে আর ড্যালহৌসী চৌরঙ্গী হাজির থাকতে পারছে না। একবার যাতায়াতেই অনেকগুলো পয়সা বেরিয়ে যায়। অথচ কর্মস্থল তার সখানেই।

তাছাড়া, এবার বাড়িবদলের পর হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট ও কিছু খুচরো পয়সা ছাড়া আর কিছু নেই।

এখন থেকে তাদের বেশ কিছুদিন, রুচির মাইনে পাওয়া অবধি টাইট হয়ে চলতে হবে।

এখানে হট্ করে ধার কর্জ পাওয়ারও সম্ভাবনা নেই। পাড়া প্রতিবেশী?

এদের ওপর লোকে ভরসা করে বটে।

প্রতিবেশী, মানে বাড়ির অন্য ভাড়াটে থেকে শেষ দিকটায় শিবনাথ কিছু ধার-কর্জ পায়নি এবং চায়ওনি। কেননা, তার চাকরি নেই মোক্তারামবাবু স্ট্রীটের বাড়ির লোকেরা জেনে ফেলেছিল।

তবু পানের দোকানটায়, রাস্তার ওপারের মুদি দোকানে ধারে অনেকদিন পর্যন্ত শিবনাথ জিনিস এনেছিল।

এখানে এখনি সে-সব হবে না।

বাড়ির লোক? যেন চৌদ্দ আনা ভাড়াটের অবস্থা শিবনাথ একটা রাত আর আজ এই সারাদিনে জেনে ফেলেছে।

কেউ না, কারো কাছে হাত পাতলে একটা আধলা ধার দেবে না। যদি হাজার বছরও শিবনাথ এ বাড়িতে থাকে এবং হাজার বছরেও ওরা জানতে না পারে শিবনাথ বেকার তবু না। বেড়াতে বেরিয়ে সে একথাটাই বেশি করে ভাবছিল।

একজনের আয়ে দশ পনেরো বিশজন খাচ্ছে।

টেলিফোনে চাকরি করে একটা মেয়ের আয়ের উপর বাপ মা আর তিন গণ্ডা ছেলেমেয়ে নিয়ে চৌদ্দটা মুখ খাচ্ছে। মাস্টারের এগারোটা মুখ, (বারোটা হবে শিগ্‌গির), ডাক্তারের পোষ্য বেশি না হলেও, খুব যে একটা ভাল আয় হালচাল দেখে শিবনাথ ভরসা করতে পারল না। বাড়ি ছাড়ছি, শহরে যাচ্ছি, মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি ব'লে হোমিওপ্যাথ যতই লাফাক।

রাস্তার ওপর কাঁঠালগাছ তলায় আর একটা টিনের ঘরেই ডিস্‌পেন্সারী। সাইবোর্ডে ডাক্তারের নাম দেখে শিবনাথ চিনেছে। একখানাও পুরো না, আলমারীর নিচেটা ভেঙ্গে গেছে ব'লে শিবনাথের সন্দেহ হয়েছে। কাঠ দিয়ে সামনের দু'-দিকের মুখ বন্ধ করে রাখা। ভাঙ্গা আল-মারীর ওপরের আধখানায় দু' সারিতে চার ছ' ডজন ওষুধের শিশি সাজিয়ে রেখে হোমিওপ্যাথের মাসিক রোজগারটা কত হবে শিবনাথ বেশ অনুমান করতে পারল। কৌতূহল বশত ডিস্‌পেন্সারীর দরজায় সে একবার উঁকি দিয়েছিল। শেখর ডাক্তার গভীর মনোযোগ সহকারে খবরের কাগজ পড়ছিল। ছ' পয়সা দামের বাংলা দৈনিক।

আর থাকে ওধারের ঘরে ফ্যাক্টরির ছেলে দু'টি। সকালে একটির কাজে বেরোনোর পোশাক দেখে, জুতোর রং দেখে শিবনাথ ধ'রে ফেলেছে ক' টাকা ডেইলী কামায় ছোঁড়া। আর একজন শিগ্‌গির ছাঁটাইয়ে পড়ছে শোনা যাচ্ছে।

আর থাকে সেই যে সাবান ফেরি ক'রে সংসার চালায়, সেলুনওলা এব কে গুপ্ত।

এক, কমলার অবস্থাই ভাল। শিব নাথের তাই ধারণা।

কেনই বা হবে না। শিবনাথ ভাবল খাটুনি বেশি বলে নার্সদের মাইনে মোটামুটি ভাল হয়। অন্তত ইস্কুলে টিচারদের চেয়ে বেশি।

রুচির চেয়ে কমলা বেশি রোজগার করে। শিবনাথ কাল সন্ধ্যায় প্রথম দেখেই টের পেয়েছে। বেশভূষা এবং কথাবার্তার কেমন একটু আভিজাত্যও আছে।

আর, কিছুটা স্বচ্ছল ওদিকের ঘরে রমেশের অবস্থা। শিবনাথ টের পেয়েছে

কিন্তু লোকটার চালচলন এবং কথা বার্তা শুনে শিবনাথের মনে হয়েছে ব্যাটা শাইলক নাম্বার ওয়ান। অনুরোধ বা ভিক্ষা নয়, বুকে ছুরি বসালেও হাতের মুঠ থেকে পয়সা ছাড়বে না, এমন। কেন জানি, লোকটার ভুরু দেখেই শিবনাথের এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে।

যদি কেউ ধার দেয়, অবশ্য দেবার ক্ষমতা থাকাটা খুব বড় কথা না, উদার ও মার্জিত দৃষ্টিভঙ্গিই আসল। এবং এ বাড়ির একজনেরই তা আছে। কমলার পোষ্য নেই। সিঙ্গল লাইফ। আনন্দে খাচ্ছে। মেজাজটা ভাল, হাঁটতে হাঁটতে শিবনাথ অনুমান করল। দু'টো চারটে টাকা ঠেকে গেলে রুচি চাইতে পারবে

হাঁটতে হাঁটতে শিবনাথ বেশ দূরে চলে যায়।

রাস্তার দু'পাশে বড় বড় গাছের গুঁড়ি। আস্ত অথবা টুক্‌রো। ছোট ছোট টিলার মত স্তূপ ক'রে সাজিয়ে রাখা। শাল গাছ আছে, সেগুন, পলাশ মহুয়া, সুন্দরী, জারুল। এত কাঠ দিয়ে কি হয়, কারা কেনে এবং কোথা থেকে এসব আসে ভাবতে ভাবতে শিবনাথ হাড়ের কল, চামড়ার কল পর্যন্ত চলে গেল। ধোঁয়া এ-তল্লাটে লেগেই আছে শহরতলী পরিচ্ছন্ন ফাঁকা, নির্ঝঞ্ঝাট নির্ঝঞ্ঝাট থাকবে শিবনাথের আশা ছিল কিন্তু এখন দেখছে এখানে বসতি আরো

বেশি, ধোঁয়া আরো গাঢ়। ট্রাম-বাস না থাকলেও ঠেলা গাড়ি ও মোষের ভিড়ে পথচলা কষ্টকর। তবু শিবনাথের হাঁটতে ভাল লাগছিল এইজন্যে যে, কোমল নীলাভ বেশ বড়সড় আকাশে রূপোর পাতের মত এক ফালিতে চাঁদ মাথার ওপর অনেকক্ষণ ধ'রে অনেক দূর এগোবার পরও সে দেখতে পাচ্ছিল। চারতলা ছাতালার বাধা ছিল না। গাছ এবং ইলেকট্রিকের খুঁটি থাকলেও তারা আকাশ ও চাঁদকে একেবারে ঢেকে রাখতে পারেনি। বরং পাতার ফাঁক দিয়ে, তারের নিচে দিয়ে চাঁদ ও আকাশকে আরো নতুন আরো সুন্দর ঠেকছিল। তারপর অবশ্য গাছের সারি শেষ হ'ল এবং আলোর খুঁটিগুলো আর দেখা গেল না। সেখানে আকাশ আরো বড়, চাঁদ আরো উজ্জ্বল। যেন জলের ওপর চাঁদ ঝুলছে। জ্যোৎস্নার ঝিলমিলে অনেকগুলো রেখা শিবনাথ একজায়গায় এক সঙ্গে দেখতে পেল। কই লেক? কাগজে যা নিয়ে জোর লেখালেখি চলছে। এই অঞ্চলের শিগ্‌গির ডেভেলপমেণ্ট হবে এ-সম্পর্কে শিবনাথ নিশ্চিন্ত। তখন অবশ্য আর লোকে নাক সিঁটকাবে না, নিন্দা করবে না এখানে টিনের ঘরে কেন সে রুচিকে নিয়ে মঞ্জুকে নিয়ে থাকতে এল। ঘরের জায়গায় ঘর হয়তো থাকবে, কিন্তু বারোটা পরিবারের সভ্য সুশ্রী ও সুস্থভাবে বাস করার উপযোগী বারোখানা পরিচ্ছন্ন কামরা হবে তখন। এই বারান্দা থেকে ও-বারান্দা দেখা যায় না; দেয়াল পার হয়ে তবে আর একটি ঘরের দরজা। হয়তো এটাই একটা খুব ফ্যাশনেবল্ ফ্ল্যাট বাড়িতে পরিণত হবে ভাবতে ভাবতে এবং তারপর, তখন অবধি কে কে এবাড়িতে থেকে যাবে যেন মনে মনে হিসাব করতে করতে শিবনাথ শরীরে মোচড় দিয়ে চাঁদ ও আকাশ পিছনে রেখে বাড়ি ফেরার রাস্তা ধরল।

রাস্তার পাশের অন্ধকার একটা গলি থেকে ছোট্ট মানুষটি বেরিয়ে এল। যথেষ্ট আলো না থাকলেও শিবনাথ প্রথম দেখেই চিনল। বিধুমাস্টার।......নম্বর ঘরের প্রতিবেশী।

দুই হাত তুলে শিবনাথকে নমস্কার জানিয়ে মাস্টার আগে কথা বলল, 'বেড়াতে বেরিয়েছেন?'

'হ্যাঁ; আপনি এখানে?'

'হ্যাঁ, একটি ছাত্রীকে পড়াই।'

'কোন্ ক্লাশের।'

'ফার্স্ট ক্লাশে পড়ে। বেশ ইণ্টেলিজেণ্ট মেয়ে। আমি পড়িয়ে আরাম পাই। অথচ দেখুন, এতবড় লোকের মেয়ে। না, ধনি মেয়েরা লেখাপড়া করে না। রাতদিন আমোদ ফুর্তি গানবাজনা সিনেমা পিক্‌নিকে সময় কাটায়, বদ্‌নাম থাকলেও বিদিশা দত্ত অন্য ধাঁচের মেয়ে। আমার তো খুব ভাল লাগে। ও এবার স্কলার শিপ্ পাবেই।'

কেন জানি একটু হাসতে গিয়ে শিবনাথ গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর প্রশ্ন করল, 'পড়ানো শেষ করে এখন বাড়ি ফিরছেন নাকি?'

'হ্যাঁ—না, আর এক জায়গায় আর একজনকে, ঠিক পড়ানো নয়। আকবরের প্যাসেজের দু'টো শক্ত লাইনের মানে বলে দিয়ে আসব। এই তো কাছেই।'

কে সে। ছাত্র কি ছাত্রী। ধনির মেয়ে না গরিব। আকবরের প্যাসেজের মাত্র দু'টো শব্দের মানে ব'লে দেওয়ার জন্যে মাসিক ব্যবস্থা বেশ ইচ্ছা হ'ল শিবনাথের জানতে, জিজ্ঞেস করতে, কিন্তু দেখা গেল, বিধুবাবু এক এক ক'রে নিজেই সব বলতে শুরু করেছেন।

'চামেলী চ্যাটার্জি। বাবা কি এক কমার্স চেম্বারের চেয়ারম্যান। হাজার টাকার ওপর, মশাই মাইনে। বিদিশার বন্ধু। যদি লেগে যায়। বিদিশা হঠাৎ আমায় সেদিন বলতে কথাটা খেয়াল হ'ল। বলল, আমার টিচার, আমাকে পড়াচ্ছেন পরিচয় দিয়ে চামেলীদের বাড়ি মাঝে মাঝে যাবেন। একটা দু'টো সাবস্টেন্স্, ট্রান্সলেশন দেখে টেখে দিতে থাকুন, দু'টো ইংরেজী শব্দের মানে বলে দিয়ে আসুন। রাখবে,—আমার তো মনে হয়, বিশেষ—চামেলীর মা লোক ভাল। আপনার বয়েস হয়েছে, গরিব এবং আমাকে বেশ কিছুদিন ধ'রে পড়াচ্ছেন জানতে পারলে চামেলীর জন্যও রেখে দেবে। ও ইংরেজীতে বেশ কাঁচা।'

বিধুবাবুর ক'টা ট্যুইশানি হাতে আছে শিবনাথের জানতে ইচ্ছে হ'ল। কিন্তু সে-সব প্রশ্ন না করে গম্ভীরভাবে বলল, 'চামেলীকে পড়িয়ে তারপর বাড়ি ফিরবেন বুঝি।'

'হ্যাঁ, পড়িয়ে ঠিক না, একটু দেখিয়ে।........প্যাসেজটা বেশ কঠিন। বিদিশাকে তিনবার কথাটার মানে ব'লে দিতে হয়েছে তারপর মনে রাখল।'

শিবনাথ চুপ করে রইল।

'না, কই, একটা ছাড়া ট্যুইশানি জোটাতে পারলাম না। আর, কী ক'রে পারব। উকিল মোক্তার মার্চেণ্ট অফিসের কেরানী সবাই কোমর কেছে ট্যুইশানি করতে লেগে গেছে, ওই যে বলে ডিমাণ্ডের চেয়ে সাপ্লাই বেশি। ঝুড়ি ঝুড়ি প্রাইভেট টিউটর গজিয়েছে মশাই খালের এপারে ওপারে।'

শিবনাথ অল্প হেসে শুধু মাথা নাড়ল।

'হ্যাঁ, সকালে তাই একটু এদিক-সেদিকে ঘোরাঘুরি করি। কিন্তু সুবিধা করতে পারছি কই।'

শিবনাথ চুপ।
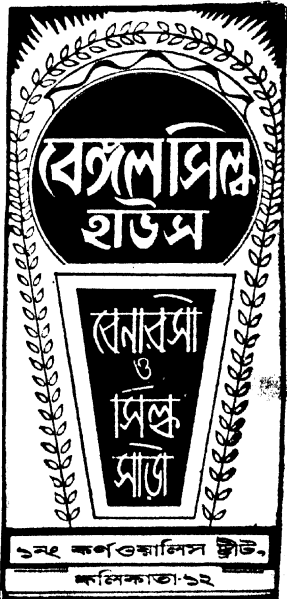
'আপনি সল্টলেক পর্যন্ত হেঁটে এসেছেন?'

শিবনাথ ঘাড় নাড়ল।

'মর্নিং-ওয়াক্ একটু একটু আরম্ভ করেছি। যদিও উদ্দেশ্য ঠিক সেটা না,—যেন নিজের মনে কথাগুলো ব'লে পরে মাস্টার কতক্ষণ কি ভাবল, তারপর শিবনাথের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'আমরা পারব না, আমার নিজের কথা অলাদা। আমি না পারি করতে হেন কাজ সংসারে নেই, মানে রিক্সা টানতেও লজ্জা করবে না। কী করব, উপোসে তো মরতে পারব না। কিন্তু ওরা ভদ্রলোক অতিরিক্ত বাবু হয়ে গেছে, আমাদের ছেলে মেয়ের কথা বলছি, মশাই, হঠাৎ অসহায়ভাবে বিধুবাবু শিবনাথের দিকে তাকালেন, 'হারামজাদাকে আমি নিজে ওর মাকে দিয়ে বলে বলে পারলাম না কানুটাকে। ফুলকপির সীজন এসে গেল। ধাপার ওধারে চাষীরা নিজেদের ক্ষেত থেকে তুলে আনে। সস্তায় ছাড়ে। হাতে ক'রে, দোষ কি যদি দু'চারটে মাথায়ও নিতে হয়, শেয়ালদা খুব বেশি দূর কি—প্রায় ডবল দামে এক একটা কপি বিক্রী করতে পারবি। নতুন ফসল। এই তো সবে বেরোতে আরম্ভ করেছে মশাই।'

'কানুর কত বয়েস?' হঠাৎ শিবনাথ প্রশ্ন ক'রে বসল। আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি।'

'তা আর প্রশ্ন করবেন না।' বিধুবাবু শিবনাথের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে হাসল। 'ষষ্ঠীর কৃপায় ছেলেমেয়ের সংখ্যা কম কি! বারোটি সন্তানের পিতা আমি। দু'টি মরেছে। দশটি জীবিত আছে। আর একটি শিগ্গির ভূমিষ্ঠ হবে।'

শিবনাথ নীরব।

'হ্যাঁ, কানু আমার বড় ছেলে।' বিধুবাবু বললেন, 'কিন্তু কথায় বলে—পণ্ডিতের ঘরে যত গাধা গরু জন্মায়। তিনবার হারামজাদা ম্যাট্রিক ফেল্ করেছে। তা চারবার একলা তোকে চান্স্ দেব যে, আমার সে-সামর্থ্য কোথায়। তার নিচে এতগুলো আছে। মমতা সাধনার এবার ফোর্থ সেকেন্ড ক্লাশ। কতগুলো বই লাগছে দু'জনের, কত টাকার ধাক্কা একবার হিসাব করতো?'

'ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে ফ্রি-শিপ পাচ্ছে তো? শিবনাথ প্রশ্ন করল।

'না গেলবার এক সাবজেক্টে ফেল্ করাতে সাধনার ফ্রি-শিপ কাটা গেছে, সেইজন্যেই তো আরো মুশকিলে পড়ে গেছি মশাই, পড়বে না, দেখতেও উনি মেনকা উর্বশী নন—বিয়ে হবে না। তার চেষ্টাও করব না, যাক্গে সে-কথা হচ্ছে না, মাথায় এত গোবর থাকলে তুই কোন্ জন্মে ম্যাট্রিকের দরজা পার হবি আমি বুঝতে পারছি না,—আমার সব ক'টা ছেলেমেয়ে মশাই এমন হবে, মমতাটা একটু ভাল, তা-ও অঙ্কে ভীষণ কাঁচা, চানু আর সুমু কেমন হবে এখনো বলা যায় না। আরগুলো তো দুধের। ওরা আমাকে ভাল ক'রে ঠেকিয়েছে, বড় ছেলেটা আর বড় মেয়েটা।' যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়ে বিধুবাবু হঠাৎ দাঁতে দাঁত ঘষলেন।

শিবনাথ চুপ থেকে হাঁটতে লাগল।

'বাজারে গিয়েছিলেন আজ? মাছ পেয়েছিলেন?'

'না, সুবিধা হয়নি।' শিবনাথ একটু কাশল।

'চালানি ইলিশ আর চিংড়ি ছাড়া আমি তো কিছু দেখলাম না।'

শিবনাথ চুপ। বিধুবাবু প্রশ্ন করলেন, ডাক্তারকে ডিস্পেন্সারীতে দেখলেন?'

'না।' শিবনাথ বলল। 'দু' একজন রুগী বসে আছে দেখলাম।'

'ঐ দু' একজনই।' যেন নিজের মনে বিধুবাবু হাসেন। 'মশাই, চোখে ধুলো দিয়ে আর ক'দিন লোকের পয়সা খাওয়া যায়।'

শিবনাথ মাস্টারবাবুর মুখের দিকে তাকায়।

'মশাই বলবেন না কারো কাছে। অবশ্য অনেকেই এখন জানে। শেখর হোমিওপ্যাথির 'হ' শেখেনি। ছিল ব্যাঙ্কের হেড্-ক্লার্ক,—এটা অবশ্য ওর মুখে শোনা,—আমার তো মনে হয় অর্ডিনারী লেজার ক্লার্ক ছিল। লেখাপড়ার দৌড় কত চেহারা দেখেই বুঝতে পারবেন। ব্যাঙ্কে কাজ করার সময় থেকেই নাকি হোমিওপ্যাথির চর্চা। আমি বিশ্বাস করি না। চাকরিটি খুইয়ে এসে এই ব্যবসা ধরেছিল। কথায় আছে না, যার নেই অন্যগতি সে ধরে হোমিওপ্যাথি।'—ব'লে বিধুবাবু বেশ শব্দ ক'রে হেসে উঠলেন। শিবনাথ পিছনে ও দু'পাশে তাকাল। ভদ্রলোকের পোশাক পরা তেমন কাউকে দেখা গেল না। মুটে, ঠেলাওলা, রিক্সাওলা এইসব। হঠাৎ শিবনাথের প্রায় কানের মধ্যে নাকটা ঢোকাবার চেষ্টা ক'রে বিধুবাবু ফিস্ফিসিয়ে উঠলেন। 'আমি কতদিন চোখে দেখেছি মশাই, স্পিরিটের সঙ্গে কলের জল মিশিয়ে ওষুধ ব'লে চালাচ্ছে। আর মানুষ অন্ধের মত তা পয়সা দিয়ে কিনে খাচ্ছে।'

'তাই নাকি!' শিবনাথ ফিস্ফিসিয়ে উঠল।

'তাই কি না নিজের চোখে দেখবেন। থাকুন না। দু'দিন পারিজাতের খোঁয়াড়ে বসবাস করুন। আস্তে আস্তে জন্তু-জানোয়ারগুলোকে চিনতে পারবেন।'

কথা শেষ ক'রে বিধুমাস্টার শব্দ ক'রে হাসেন। শিবনাথ চুপ থেকে হাঁটতে লাগল। বিধুবাবুও কিছুক্ষণের জন্যে নীরব থেকে হাঁটেন। বাঁ-দিকের আর একটা গলির কাছাকাছি এসে হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ান।

'আচ্ছা চলি।'

'চামেলীদের বাড়ি এসে গেছে বুঝি? এই রাস্তা? শিবনাথও হাঁটা বন্ধ ক'রে দাঁড়ায়।

'হ্যাঁ, আর একটু ভিতরের দিকে এগোতে হবে।' যেন কথাটায় তেমন জোর না দিয়ে বিধুবাবু তার চেয়ে প্রয়োজনীয় কথা পাড়েন। 'আপনি আবার কথায় কথায় না বলে দেন, অবশ্য বললেও কিছু হবে না; আমার আপনার চেয়ে ঢের বেশি পুরু শেখরের গায়ের চামড়া। হবেই। হাড়কিপ্টে চশমখোর। একটা টাকা, বুঝলেন, পারতপক্ষে আমি ওর কাছে হাত পাতি না, তবু আজ সকালে একটু বাজার সওদা করব ব'লে অনেক ভেবেচিন্তে ওর কাছে একটা টাকা কর্জ চেয়েছিলাম। টাকা তো দিলেই না, উল্টে ও আমাকে ইন্সাল্ট করলে।'

'কি রকম?' শিবনাথ ঢোক গিলল।

'বলে কিনা, মাসের দশ তারিখ না পেরোতে তোমরা সবাই এর-ওর কাছে ধার করতে লেগে যাও, একদিন না, একবার না, ফি মাসে, বছরভরা, এখানে এসে অবধি

দেখছি, তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখলে আমার লজ্জা করে।'

'আর কি বললে?' যেন প্রশ্ন করতে মনে মনে তৈরী হয় শিবনাথ।

'বললে এতগুলো ক'রে এক একজনের পুষ্যি, দারিদ্র্যের main cause এটা, আমার তো মনে হয় তোমাদের যাদের আয় কম তাদের ছেলেপুলে না হওয়াই উচিত, তাছাড়া, আজকাল বিজ্ঞানের যুগে ভাল ভাল উপায় বেরিয়েছে।'

একটু সময় চুপ থেকে পরে মৃদু হেসে শিবনাথ প্রশ্ন করল, 'ডাক্তার হ'য়ে আরম্ভ করেছে নাকি। তারও তো ছেলে-মেয়ে কম না।'

বৃদ্ধাঙ্গুলী তুলে এবং মুখের একটা বিকৃত ভঙ্গি ক'রে বিধুবাবু বললেন, তাই করছে, ওই মুখেই বলে, নিণ্টুর পর থেকে নাকি সে জন্মনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা ক'রে আসছে। আমি বিশ্বাস করি না। বুঝলেন মশাই, শেখর যদি তামা-তুলসী হাতে নিয়েও একথা বলে আমি বিশ্বাস করব না। নিণ্টুর চার বছর, তারপর আর ছেলের কোনো ইস্যু নেই এর কারণ আর কিছু, বলতে বলতে হঠাৎ আবার শিব-নাথের কানের ভিতর মুখ ঢোকাবার চেষ্টা ক'রে বিধুবাবু ফিস্‌ফিসিয়ে ওঠেন এবং কথা শেষ হ'তে মুখটা সরিয়ে এনে শব্দ ক'রে হাসেনঃ 'মুখে সকলের কাছে ব'লে বেড়ায় আমার স্ত্রীর চেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু বললে হবে কি। না হলে শেখর করে বার্থ কণ্ট্রোল তবেই হয়েছে। আর তাছাড়া, ওর নিজেরও হেল্‌থ ভেঙেগ পড়ছে, দেখছেন তো কেমন প্যাকাটির মত হাত পা'গুলো হয়েছে, হবে না? ক'দিন লোকের চোখে ধুলো দিয়ে পয়সা কামায়ের কথা যারা চিন্তা করে তাদের এই হয়। দেখবেন, শেখর একদিন করোনারি থ্রমবসীস কি ঐ ধরনের একটা সাংঘাতিক কিছুতে য়্যাটাক্‌ড হয়ে হঠাৎ মারা যাবে।'

শিবনাথ কথা বলল না।

'বার্থ কণ্ট্রোল! চোরের মুখে হরি-নাম।' বিধুবাবু এবার নিজের মনে বিড়বিড় ক'রে উঠলেন। 'এর জন্যে ওটা ইয়ে মানে সংযমের দরকার শেখরের নেই, আমি হলপ ক'রে বলতে পারি।' শিবনাথের দিকে তাকিয়ে) 'এসেছেন নিজের চোখেই দেখবেন; বাড়িতে এতগুলো মেয়েছেলে, হারামজাদা এমন হা ক'রে তাকিয়ে থাকে দেখে আমার নিজেরই লজ্জা করে। স্কাউণ্ড্রেল।'

শিবনাথ তথাপি নীরব দেখে বিধু বললেন, আচ্ছা আমি চলি, ওদিকে আবার চামেলী ব'সে থাকবে।'

'আচ্ছা আচ্ছা', শিবনাথ ঘাড় নাড়ল। মাস্টার গলির অন্ধকারে অদৃশ্য হ'তে সে আবার হাঁটতে আরম্ভ করে। টাকা কর্জ না পাওয়াতে ডাক্তার সম্পর্কে বিধুবাবুর এই বিষোদ্গার কিনা চিন্তা করে শিবনাথ এক সময় মনে মনে হাসল। (ক্রমশঃ)
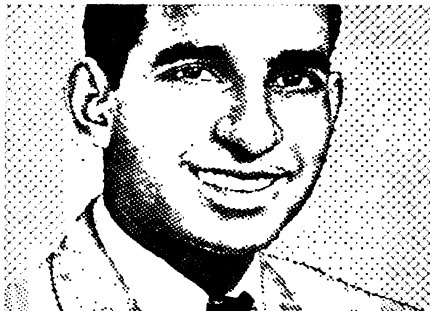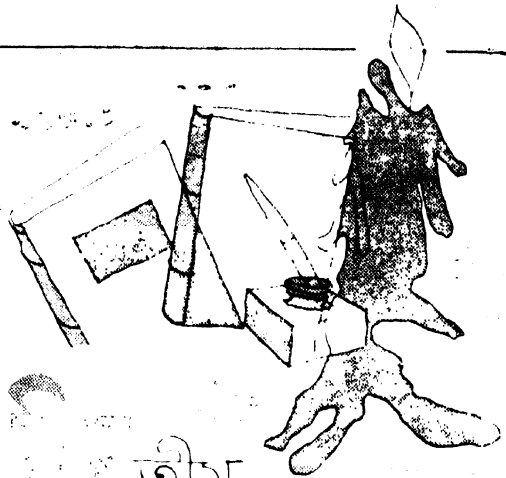
পাঞ্জাবী ড্রাইভারের প্রশস্ত কাঁধের দিকে তাকিয়েছিল সুরঞ্জনা। দু'টো ভারি লোমশ হাত স্টিয়ারিং ছুঁয়ে আছে আলতোভাবে, উঠছে নামছে। কখন হাত দু'টো একপাশে স্টিয়ারিংটাকে ঘুরিয়ে দেবে সুরঞ্জনা ভাবলো। গাড়িটা ঘুরবে, বেঁকে যাবে আর একটা রাস্তায়, একটা মোড় পেরোবে। জীবনের পথের মতো।

কিন্তু সোজা ছুটছে গাড়িটা। ট্যাক্সি। আধ-ঘুমন্ত কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, মাঝে মাঝে যাত্রিবিরল ট্র্যামগুলো। আসছে নিদ্রা-কাতর নীলাভ চোখ জ্বালিয়ে, দু'-একটা বাস গর্জন করে দৌড়চ্ছে। কত রাত হলো, এগারোটা? হাতঘড়িটা দেখলো সে। এগারোটা বেজে পনেরো। অনেক রাত হয়ে গেলো, ভাবলো সুরঞ্জনা। মা কি এখনও জেগে?

নিঃশব্দে ঠোঁটের কোণে হাসি জেগে উঠলো সুরঞ্জনার। মা কি ঘুমুতে পারেন? কি করে ঘুমোবেন তিনি, কেমন করে পারেন। তাঁর মেয়ে এত রাত করবে, এতখানি রাত, এত বেশি রাত, তিনি কি ভাবতে পারেন? কিন্তু সত্যি কি তিনি ভাবতে পারেন না? তাঁর মনে হতে পারে না, সুরঞ্জনা আজ অনেক রাত করে ফিরবে। এত রাত যে বেশীক্ষণ কথা বলতে হবে না মায়ের সঙ্গে, সব প্রশ্ন সব কৌতূহলকে চাপা দেওয়া যাবে অনেক ক্লান্তির ভান করে, আর ছোট্ট একটি কথা বলে, 'আমার বেজায় ঘুম পাচ্ছে কিন্তু।' তারপর নিজের ঘরে বাতি নিভিয়ে শুয়ে থাকা, চুপচাপ জেগে থাকা বিছানায়। চুপচাপ।

মা'রও কি ঘুম আসবে আজ? তার মার, তার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুর। মার মতো তার বন্ধু কে? অথচ বন্ধু কি? সকলে অবাক হয় মা-মেয়ের বন্ধুত্ব দেখে। যৌবনের প্রান্তে একজন, আরেক জনের শুরু। কিন্তু কি গভীর বন্ধুত্ব, আশৈশব, আজন্ম।

এই মাকেই কিনা ভয় করেছিল অমিয়। মাথা তুলে তাকাতে পারেনি সুরঞ্জনার দিকে। ভীরু, ভীরু অমিয়। ঝাপসা কাঠের শার্সি'টার দিকে তাকিয়ে দেখলো সুরঞ্জনা। কলকাতার রাত্রি প্রখর আলো নিষ্প্রভ। রাস্তায় ইলেকট্রিকের বাতি জ্বলছে, কিন্তু তবু একটু অন্ধকার, কিছু ছায়া জমে উঠেছে ফুটপাথে, বাড়ির দেওয়ালে, দু'টো বাতির থামের মাঝখানে। দোকানগুলো বন্ধ, কিন্তু খাবারের দোকানে এখনও কিছু লোক, কিছু আলো, কিছু কলরব।

কলরব। কলরব। একটা উচ্ছল উচ্ছ্বসিত কলরবের তরঙ্গ পেরিয়ে এসেছে সুরঞ্জনা। কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের যেখানে শেষ, তার কাছাকাছি একটা আলো-ঝলমল, বাজনা-উতরোল, লোক-গিসগিস নতুন রঙ-করা উজ্জ্বল বাড়ি হতে ফিরে চলেছে সুরঞ্জনা তার নিজের ছোট ঘরটিতে। কিন্তু ছোট ঘরটিতে যাওয়ার আগেই উদ্বেল মন নিয়ে মা এসে দাঁড়ালেন। ব্যাকুল চোখ নিয়ে তাকালেন তিনি মেয়ের চোখের কোণে, গালের ভাঁজে। কোথায়ও মুছে-যাওয়া কোন অশ্রুরেখার চিহ্ন আছে কি না। কি

...জে পাবেন তিনি, কি প্রশ্ন করবেন? তিনি কি জিজ্ঞেস করবেন, কত লোক ...য়েছিল বিয়েবাড়িতে, কেমন খাওয়া ...লো, মামা-মামীমা গিয়েছিলেন কি না। ...করে মা কি হঠাৎ একথা সে-কথার পর প্রশ্ন করবেন, 'অমিয় সুখী হয়েছে তো?'

অমিয় সুখী হয়েছে তো, একথাটা ...জের মনকেই জিজ্ঞেস করলো সুরঞ্জনা। সুখী হবে সুনন্দা? সুরঞ্জনার মাসতুতো বোন সুনন্দা, সে কি খুশি হয়েছে, সুখী? উৎসবমুখর বাড়িটা থেকে আসবার সময় সুনন্দা নিজে এসে ...গাড়িতে তুলে দিয়েছে সুরঞ্জনাকে।

কি সুন্দর মানিয়েছে সুনন্দাকে। ...লাল শাড়ি পরেছে সে, মনে হয় যেন রক্ত-...খার ঢেউ আগুনের তাপে জ্বলছে। খোঁপায় বেঁধেছে শাদা ফুলের মালা, যেন ঢেউ-এর মাথায় ঝলক। চাপা ঠোঁটের ...কোণে একটা নির্ভাজ হাসি, চোখে গানের ...তো একটা সুরলহরী। এত রূপ আছে সুনন্দার, এত ঐশ্বর্য, কই প্রতিদিন নানা ...কাজের মধ্যে এই চেহারা তো দেখা যায়নি ...র।

সুনন্দার মতো অমিয়ও কি সুখী হয়েছে? কে জানে। অমিয় কি একদিন ...শেষে ভুলে যাবে না সুরঞ্জনাকে। না ...দেখা এবং নিশ্চিহ্ন অনুপস্থিতিতে সুনন্দার মনোরম দেহ ও উষ্ণ প্রেমে সুরঞ্জনা কি মুছে যাবে না অমিয়র হৃদয় থেকে। কতকগুলি স্মৃতি থাকবে পুরনো চিঠির মতো অতীত দিনের রঙচটা বিবর্ণ ...জে। শুধু স্মৃতি, আর কিছু নয়।

কিন্তু একদিন অমিয় এসেছিল ঘটনা ...রে। মাসতুতো ভাই রণধীরের সঙ্গে অমিয় এসেছিল সুরঞ্জনাদের বাড়িতে। ...ইং রুমের ছোট কৌচটার ওপর বসেছিল লজ্জিত মুখ করে।

সেদিন সন্ধ্যায় অমিয় আসবে, এ কথাটা জানা ছিল সুরঞ্জনার। রণধীরের মুখে জানা ছিল অমিয় মুগ্ধ হয়েছে সুরঞ্জনাকে দেখে। সুরঞ্জনা সুলেখিকা, লেখক অমিয় প্রেমে পড়েছিল লেখা ...ড়েই। বলেছিল, এমন লেখা যার কলম ...থেকে বেরোতে পারে, সে সর্বকালের ...নোরমা। মনোরমা সুরঞ্জনা সেদিন ...স্তের নিবেদন গ্রহণ করেছিল সহাস্যে, মৃদু উল্লাসে, সংহত গভীরতায়, কিন্তু ভালোবাসা কি দান করতে পেরেছিল।

পর্দার ওপাশে অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল সুরঞ্জনা। নিজেকে কালো আঁধারের যবনিকায় জড়িয়ে তাকিয়েছিল উজ্জ্বল-ঘরে অপরিচিত অমিয়র দিকে। অত্যন্ত সাধারণ চেহারা, শীর্ণ দেহ, অনতিদীর্ঘ। কিন্তু আশ্চর্য তার চোখ। এতো উজ্জ্বল, এতো কাব্যময়, এত রোমাঞ্চ চোখে অমিয়র—সমস্ত দেহে শির-শিরানি বয়ে গিয়েছিল সুরঞ্জনার।

মা'র সঙ্গে গল্প করেছিল অমিয়। সাহিত্য, শিল্প, সংবাদপত্র। রণধীর বক্তৃতা জুড়ছিল কথার পিঠে, হেসে ভেঙে পড়ছিল। কিন্তু অমিয়, অমিয় এতো কম কথা বলে, এতো ভদ্রতার ভান করে, এতো প্রিয়বাদী হয়, যেন তাকে ধরা যায় না, দূরান্তবর্তী দূরে তার মনের বাস মনে হয়।

সুরঞ্জনা চা সার্ভ করছিল টেবিলে, চীপসের প্লেট এগিয়ে দিচ্ছিল। হাতের দিকে, শাড়ির দিকে তাকিয়েছিল অমিয় সুরঞ্জনার। কিন্তু সুরঞ্জনার মুখের দিকে তাকাতে পারেনি সেই সুন্দর আশ্চর্য নরম সন্ধ্যায়।

কিন্তু আর একদিন যখন তাকিয়ে-ছিল, সুরঞ্জনা কেঁপে উঠেছিল। সেই দীর্ঘ অপলক নির্নিমেষ দৃষ্টিতে কতক্ষণ, কতক্ষণ ধরে তাকিয়েছিল অমিয় নিঃশব্দে। সুরঞ্জনার চুল যেখানে মাথার ওপর লতিয়ে পড়েছে, সেখান থেকে তার চোখে নাকে ঠোঁটে বুকে কোমরে পায়ের গোঁড়ালিতে আঙুলের ডগায় তাকিয়েছিল অমিয়। কতক্ষণ, কতক্ষণ। মনে হয়েছিল শাড়ির আড়াল ভেদ করে তার দৃষ্টি গিয়ে স্পর্শ করছে শরীরের ঠান্ডা ত্বকগ্রন্থি। কি আশ্চর্য উদাস সেই দৃষ্টি, কামনাহীন উত্তাপহীন জাগিয়ে দেওয়া, ভরিয়ে তোলা পরিপূর্ণ দৃষ্টি। সুরঞ্জনা কেঁপে উঠেছিল। যেন তার মনের প্রতি গ্রন্থিতে ঘুরে বেড়িয়ে এলো অমিয়, হিমশীতল দৃষ্টি দিয়ে তার আত্মাকে ছুঁয়ে এলো।

থরথর কাঁপছিল সুরঞ্জনার হাত, সে হাতগুলি তুলে বলেছিল, প্রায় মনে মনে, 'ঈশ্বর জানেন, আমি তোমার।' আমি তোমার, ঈশ্বর জানেন। কি আশ্চর্য কথা। কত রোমাঞ্চিত সন্ধ্যায় কত ব্যাকুল নিঃসঙ্গ মুহূর্তে, কত জ্যোৎস্না-প্লাবিত নির্জন রাত্রিতে সুরঞ্জনা মনে মনে আবৃত্তি করেছে সেই আশ্চর্য কথা।

আর কি মিষ্টি নরম ভাষা অমিয়র। অক্ষরের পর অক্ষর বসিয়ে সুদীর্ঘ কথা রচনা ক'রে প্রতিদিন চিঠি লিখতো অমিয়, যে কোন উপলক্ষে, যে কোন অবসরে। কথাগুলো যেন টিপটিপ নরম বৃষ্টি, শরীরকে আস্তে আস্তে ছুঁয়ে যায়, ভাসিয়ে দেয়, ভিজিয়ে দেয়, তারপর একটা পুলক-কাঁপুনি সারা দেহে ব্যাপ্ত হয়ে যায়।

এতো মিষ্টি মধুর অমিয়, অমিয় সেন, একটা নিঃশ্বাস জড়িয়ে গেল সুরঞ্জনার।

আর একজনের চিঠির কথা মনে পড়লো সুরঞ্জনার। দামী লেফাপার ভেতর পুরু নয়নাভিরাম কাগজে লেখে অজাতশত্রু 'মাই ডিয়ার সুরঞ্জনা' এবং অবশেষে স্বাক্ষরের ওপর 'ইওরস্' অথবা 'ওনলি ইওরস'। হেসে উঠলো সুরঞ্জনা, হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল পেশীবহুল কৃতিমান অজাতশত্রুর কথা। সাদার্ন এভেনুতে যার বাবার চকমিলান বাড়ি, সেই পুরনো আই সি এসের একমাত্র বংশধর স্বাধীন ভারতের জবরদস্ত আই এ এস শ্রীযুক্ত অজাতশত্রু দাশগুপ্ত। ভালোবাসা, হেসে ওঠে অজাতশত্রু, ওসব মেয়েলী সেন্টিমেন্ট, জীবনটা শুধু টাকা-আনা-পাই, প্রভাব-প্রতিপত্তি-সাকসেস। 'সাকসেস', জোর দিয়ে বলে অজাতশত্রু, 'জীবনটাকে সাকসেস করে তোল সুরঞ্জনা।'

অজাতশত্রু যাক, আজ পরিপূর্ণ হয়ে আছে অমিয় সুরঞ্জনার মনে। একটি নিঃসঙ্গ নরম মন, অমিয় সেন। সুরঞ্জনা। সুরঞ্জনা সেন। না, না, সুনন্দা সেন। অমিয় সেন, সুনন্দা সেন। অমিয় কি সুখী হয়েছে, অমিয় কি সুখী হতে পারবে? কিন্তু কি মিষ্টি শোনায় কবিতার মতো অনুপ্রাসে জড়িয়ে সুরঞ্জনার নাম, কি মিষ্টি শোনাতে পারতো, সুরঞ্জনা সেন!

না, না, সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত। প্রবল-প্রতাপ ভাবী জেলা-শাসক শ্রীযুক্ত অজাত-শত্রু দাশগুপ্তের পরিণীতা স্ত্রী শ্রীসুরঞ্জনা দাশগুপ্ত। জেলাশহরে-

শহরে ইস্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভা ও মহিলা সমিতির সভানেত্রীত্ব করবার জন্য যার ভবিষ্যৎ সুনির্দিষ্ট। কোথায় কোন্ নবীন লেখক অমিয় সেন, তাকে কে মনে রাখে।

সেদিন সেই আশ্চর্য সন্ধ্যাকে কেমন করে ভুলবে সুরঞ্জনা, কেমন করে ভুলবে। তখন আকাশের আঁচল জড়িয়ে নেমেছে অন্ধকার, দু'-একটা মৃদু তারা দেখা যায় কি যায় না। ড্রইংরুমে নীলাভ আলো জ্বালিয়ে মা বসে আছেন কিছু চিন্তা, কিছু বিশ্রাম, কিছু আলস্য জড়িয়ে।

আচমকা এলো অমিয়, মনে হলো যেন উদ্‌ভ্রান্ত, যেন যোদ্ধা, যেন বীর-পুরুষ। সুরঞ্জনা ত্রস্তপায়ে এসে হাত ধরলো তার, বল্লে, 'আজই?'

ঘন নিঃশ্বাস, এলোমেলো চুল, অমিয় কানের কাছে মুখ এগিয়ে জবাব দিয়েছিল, 'আজই।'

চমকে উঠেছিলেন মা। যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তার, বললেন, 'তুমি?'

'হ্যাঁ, একটা জরুরী কথা নিবেদন করতে এসেছি।'

উজ্জ্বল শাদা বাতিটা জ্বালাতে গিয়েছিলেন মা। অমিয় বলেছিল, 'এই ভালো, এই আলোটাই থাকুক।'

সুরঞ্জনা এসে দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়, অন্ধকার জড়ানো পর্দায় আড়াল করা মসৃণ বারান্দার কোণে।

'সুরঞ্জনাকে আমি ভালোবাসি, তার পাণিপ্রার্থনা করি।'

কতক্ষণ জবাব দেন নি মা, অনেকক্ষণ কী? সুরঞ্জনা এমন শ্বাসরোধক কষ্ট অনুভব করেনি কোন দিন।

'কিন্তু'

মা কথা শেষ করবার আগেই অমিয় বলেছিল, 'জানি। সুরঞ্জনার বাবার আপত্তি। পঁচিশ হাজার টাকা সুরঞ্জনার নামে দান করেছেন তার বাবা। অতএব, কৃতী পাত্রের কাছে সুরঞ্জনাকে বিসর্জন করতে চান।'

একটু থামলো অমিয়। যেন অনেক পীড়া, অনেক জ্বালা তার কণ্ঠে, এমন শোনালো তার কথা। তারপর বললে, 'কিন্তু আমি তো অর্থ চাইনে, আমি চাই সুরঞ্জনাকে। আর সুরঞ্জনাও তাই চায়।'

সুরঞ্জনাও কি তাই চায়? হায়রে,

এমন করে, এতো করে আর কি চেয়েছে সুরঞ্জনা সেদিন?

মা বললেন, বিহ্বল-কণ্ঠ যেন আবেগ-রুদ্ধ, 'কিন্তু এ সম্ভব নয় অমিয়। তোমরা চাইলেও এ হতে পারবে না, এমন কি আমি চাইলেও নয়।'

একটু পর অমিয় এসেছিল হুড়মুড় করে তার কাছে। যেন অশ্রুতে তার রুদ্ধবাক, আবেগে কম্পিত দেহ, বলেছিল দু হাত দিয়ে তাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে, 'সুরঞ্জনা, তুমিও কি তাই চাও না?'

ভিজে চোখ, ভিজে কণ্ঠ, সুরঞ্জনা কথা বলতে পারেনি, কেবল দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল অমিয়কে।

অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলেছিল অমিয়, 'তুমি চলে এসো সুরঞ্জনা, তুমি চলে এসো আমার ঘরে। সাত দিন আমি কোথায়ও যাবো না, সাত দিন সর্বক্ষণ তোমার প্রতীক্ষা করবো।'

তারপর অমিয় চলে গিয়েছিল দ্রুত-পদে।

সাত দিন, কি নির্দয় সে সাত দিন। যেন সাত জন্ম নরক, সাত জীবন নির্মম, নিষ্ঠুর, নিঃসহায় বুকফাটা কান্না।

হঠাৎ চমকে উঠলো সুরঞ্জনা। ট্যাক্সি চলছে মন্থর গতিতে। এ কোথায়? ওয়েলিংটন স্কোয়ার, হিন্দ, বিধান রায়ের বাড়ি। আর একটু এগিয়ে যাক। ধর্মতলা, ওই রাস্তাটাই তো সুরেন ব্যানার্জী রোড। কত নম্বর? হ্যাঁ, ওই বাড়িতে, ওই বাড়িতে থাকে কমলাপতি দেব।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো সুরঞ্জনা, 'রোকো।'

কি আশ্চর্য! আজ এই মুহূর্তে, এই চাপা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বেদনার মর্মরিত অনুভূতিতে অকস্মাৎ মনে পড়ে গেলো কমলাপতি দেবকে। বিরাট দেহ ট্যাক্সিটা কাঁপিয়ে আর্তনাদ করে থেমে গেলো নির্জন ফুটপাথের গা ঘেঁষে।

কমলাপতি দেব, দরিদ্র, বিদ্বান, শিল্পানুরাগী কমলাপতি দেব। রোগা পাংশুটে দেহ, পুরু লেন্সের চশমা চোখে, অবিন্যস্ত উদ্ধত চুল। সুরঞ্জনার ছোট ভাইয়ের গৃহশিক্ষক।

হঠাৎ তাকে মনে পড়ে গেল সুরঞ্জনার। লাজুক মুখ, বিনয়ী ভাষা, বেশভূষায় সর্বদা অমনযোগী। আর? কমলাপতি দেব নির্বাক মন নিয়ে বহু-দিনের সঞ্চিত সংযম দিয়ে একটি গোপন ভালোবাসা পোষণ করে রাখছে তার হৃদয়ে।

অমিয়ই কথাটা প্রথম আবিষ্কার করেছিল। ব্যঙ্গে বিদ্রূপে সে ঝলসে উঠতো মাঝে মাঝে। যেন প্রবল হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরছে, এমন একটা কৃত্রিম ভঙ্গী করে বিরহী প্রেমিকের অভিনয় করতো।

একটা অন্ধকার নিরলংকার বাড়ি। কে যেন সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে কি যেন খুঁজছে, মোমবাতি না দেশলাই। সুরঞ্জনা এগিয়ে গেল তার কাছে। একজোড়া বিস্ময় নিয়ে লোকটা বললে, 'কাকে চান?'

'কমলাপতি দেব।'

'উপরে থাকেন। বাঁ-ধারে।'

ভাঙা নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো সুরঞ্জনা। ভূতুড়ে নিস্তব্ধতা ভেঙে আর্তনাদ করে উঠলো একটা পাখী, তারপর পাখা ঝটপটিয়ে উড়ে গেল আকাশের কোন্ দিগন্তে।

ঘরে আলো জ্বলছে। মিটমিটে আলো, জানালাটা ভালো করে ভেজান হয়নি। সুরঞ্জনা গিয়ে দাঁড়ালো জানালার সামনে। ভিতরে মোমবাতির শিখাটা কেঁপে উঠলো।

চারদিকে বইপত্র, কাগজ, জামা-কাপড়, উচ্ছৃংখল জীবনের মতো ছড়িয়ে আছে। আধপোড়া বিড়ি, দেশলাই, সিগরেটের বাক্স। বিছানাটা ভালো করে পাতা হয়নি, একটা মোটা বই-এর উপর হাত গুটিয়ে দেহটাকে কুঁজো করে ঘুমিয়ে আছে কমলাপতি দেব।

হঠাৎ একটা গভীর মমতা অনুভব করলো সুরঞ্জনা। সহানুভূতির বৃষ্টি টিপটিপ পড়তে লাগলো তার মনে। একটা ব্যর্থ বেদনাকে যেন অনুভব করলো নিজের মধ্যে।

এই বিচিত্র মুহূর্তে যেন কমলা-পতিকে আবিষ্কার করলো সুরঞ্জনা। দু' হাত একত্র করে সে নমস্কার করতো সুরঞ্জনাকে, কখনো মৃদুকণ্ঠে কুশল প্রশ্ন করতো, মাঝে মাঝে একথা সে-কথার পিঠে ছোট ভাইকে সুরঞ্জনার সংবাদ জিজ্ঞেস করতো, প্রশ্ন করতো, নতুন কি লিখেছেন তিনি, জীবনটাকে কি দৃষ্টিতে দেখেন।

প্রথম গল্পের বই যখন বেরোয় সুরঞ্জনার, সর্বপ্রথম অভিনন্দন জানিয়ে-ছিল কমলাপতি, চিরকুটে লিখেছিল, 'আপনার লেখায় আমার দেশ উজ্জ্বল হোক।'

কমলাপতি সুরঞ্জনাকে কি খুব ভালোবেসেছিল। নিরুত্তাপ চোখ দুটি মনে পড়লো সুরঞ্জনার। প্রত্যাশাহীন নিস্তরঙ্গ একটা জমাট হিমবরফ তার চোখের মধ্যে অনুভব করতো। অমিয় রসিকতা করলে কখনো মনে পড়তো তার। কিন্তু কই আর কখনো তো তা মনে পড়তো না নিরীহ গোবেচারী গৃহশিক্ষক কমলাপতি দেবকে।

আজ হঠাৎ এমন করে মনে পড়ে গেল কেন? জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ভূতুড়ে অন্ধকারে অজস্র ঝিঁ ঝিঁ শব্দের একটা দরিদ্র বস্তির জীর্ণ কাঠের বাড়িতে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হলো সুরঞ্জনার। অত্যন্ত নিরর্থক, অত্যন্ত ব্যর্থ। কমলাপতির বেদনার সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে তার নিজেরও, যেন অমিয় সেনের রঙীন বাড়িটার মধ্যে তাদের দুজনের জীবনেরই ভাঙারাগিণী এক সঙ্গে করুণ সুরে বাজছে।

মোমবাতিটা অভিভাবকহীন জ্বলছে। শিখাটা কাঁপছে বাতাসে। আর একটু অসতর্ক হলেই কাগজে, কাপড়ে বা কমলাপতির চুলে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে।

সুরঞ্জনা জোরে ফুঁ দিয়ে মোম-বাতিটা নিবিয়ে দিলো। অন্ধকার, চার-দিক কালো মেঘে ঢেকে গেল।

দ্রুত নেমে এলো সিঁড়ি দিয়ে সুরঞ্জনা, তারপর ট্যাক্সিতে উঠেই মৃদু গলায় বললে, 'চলো, সোজা, পার্ক স্ট্রীট।'

অতুলনীয় ওয়েম্বলি

রমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

এ শহরে খেলার স্টেডিয়াম তৈরি করা হবে, একথা আমরা বহুকাল ধরে শুনে আসছি। আজও একথা মাঝে মাঝে ছাপার অক্ষরে আমরা পড়ে থাকি। আশা—স্টেডিয়াম একদিন হবেই হবে। কিছুকাল হ'ল এই নিয়ে বাঙ্গলার মুখ্যমন্ত্রী খেলার দরদী ডাক্তার শ্রীবিধানচন্দ্র রায় এখানকার কয়টি ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের মাতব্বরদের ডেকে একটি কমিটি সৃষ্টি করেন। এই কমিটি একাধিক সভায় মিলিত হয়ে খেলার শাসন সংগঠনমূলক বিধিনিয়ম বেঁধে দিয়েছেন। কমিটির অনুমোদিত শাসন সংস্কার ও সংগঠনমূলক নিয়মাবলী সরকারের ঘরে পোঁচেছে বলে শোনা গেছে। কিন্তু এখনও স্টেডিয়াম সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন কিছু উক্তি শোনা যায়নি। এবার সরকার কি করবেন সঠিক কিছুই জানা যায়নি।

তাই বলা চলে, আমাদের সাধের স্টেডিয়াম এখনও শুধু আমাদের ইচ্ছার মধ্যেই আছে। কে জানে কত ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যে কবে হবে এর জন্ম। আমাদের এ স্টেডিয়াম আজও আছে আমাদের চিরকালের আশায়, পুরানো আমাদের খেলাঘরের আকাঙ্ক্ষায়। এ যেন নিত্যকালের চিরপুরাতন! একে নিয়েই—

"চারিদিকে তর্ক উঠে সাঙ্গ নাহি হয়
কথায় কথায় বাড়ে কথা।
সংশয়ের উপরেতে চাপিছে সংশয়
কেবলি বাড়িছে ব্যাকুলতা।"

এদিকে খেলার মান যে কত নেমে গেছে, তা মনে করে খেলার অনুরাগীজন দীর্ঘশ্বাস ফেলে থাকেন। শাসন পরিষদের অক্ষমতা নানান বিশৃঙ্খলতায় দেখা দিচ্ছে; চারিদিকেই যেন ভাঙ্গন ধরেছে। এই রকম অবস্থায় বাহিরের কোন দলের প্রদর্শনীর ম্যাচ বা মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দলের রেষারেষির খেলা ছাড়া স্টেডিয়ামের সত্যি কোন দরকার আছে বলেও মনে হয় না। কিন্তু এই যদি শেষ কথা হয়, তাহলে খেলার আদর্শ, ভবিষ্যতের জাতিগঠনে খেলার সহায়তা প্রভৃতি খেলার নানাবিধ কল্যাণ-আশা জলাঞ্জলি দিতে হয়। ইতিপূর্বে স্টেডিয়াম কেন দরকার, সে সম্পর্কে কয়েকটা যুক্তি দেখিয়েছি; আলোচনা করেছি দূরদূরান্তরের নামকরা স্টেডিয়ামের বৈশিষ্ট্য নিয়ে।

তাই স্টেডিয়াম চাই। পৃথিবীর সঙ্গে যোগ রেখে চলতে গেলে, জাতির ভবিষ্যৎ ঠিকমত গড়ে তুলতে গেলে, পরিকল্পিত অন্যান্য গঠনমূলক ব্যবস্থার মত খেলার অনুশীলন, উৎকর্ষতা, দেহমনের কল্যাণ, আস্তানা বা স্টেডিয়াম সবই চাই। তাই অন্যান্য বিষয়ের মত খেলার স্টেডিয়াম নির্মাণ করতে গেলেও ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে নানা দিক বিচার করে দেখতে হয়। শহরের কোথায় বা শহর ছেড়ে কত দূরে স্টেডিয়ামের জন্য স্থান নির্ণয় করা উচিত; সেখানে অনুশীলনের জন্য, ভবিষ্যতে অন্যান্য খেলার জন্য বাড়ি তৈরি করবার উপযোগী কতটা জায়গা বাড়তি রাখা উচিত, সে সব বিষয় ভাল করে ভেবে দেখা দরকার। স্টেডিয়ামে পৌঁছুতে গেলে বর্তমান ও ভবিষ্যতে কিরূপ যানবাহন হ'তে পারে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত।

স্যার আর্থার এলভিন—এ'র চেষ্টায় ওয়েম্বলি জগতের শ্রেষ্ঠ খেলার কেন্দ্র হ'তে পেরেছে

অপূর্ব ব্যবস্থা

এই প্রসঙ্গে ওয়েম্বলির কথা স্বভাবতই মনে পড়ে। মধ্য লণ্ডন থেকে আট মাইল দূরে শহরের উত্তর-পশ্চিম উপকণ্ঠে ওয়েম্বলি অবস্থিত। নানা দিক থেকে বিচার করে দেখলে ওয়েম্বলিকে বলা চলে অতুলনীয়, বলা চলে ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনের এও একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। সারা জগৎ জুড়ে ওয়েম্বলির খ্যাতি। ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামের চেয়ে আয়তনে অনেক বড় রাই-ও-ডি জেনেরিওর স্টেডিয়াম; এর গোটা স্টেডিয়ামের উপর যেমন পাকা ছাদ আছে ওয়েম্বলির তেমন নেই। কিন্তু অপূর্ব ব্যবস্থা ও নানাবিধ খেলার আস্তানা হিসাবে ওয়েম্বলি অতুলনীয়।

ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে বসেছে প্রদর্শনীর মেলা। এরই এফ এ কাপ ফাইন্যাল খেলার পূত পুণ্যভূমি জুড়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে একাধিক মহান ধর্ম-সম্মেলন। এখানকার সূর্যরশ্মিদীপ্ত দূর্বাদলের শান্ত, স্নিগ্ধ, সবুজ শোভা ঢাকা পড়ে গেছে বয়স্কাউটদের তাঁবুর ছাউনিতে; আহত, নিপীড়িত হয়েছে ফুটবলের নামে আমেরিকানদের ধাবন কুর্দনের ক্রূর ধর্ষণ ও আক্রমণ আঘাতে। এই প্রশস্ত ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ কেঁপে উঠেছে অগণিত সেনানীর ইংলণ্ড ইতিহাসের শতাব্দীর অভিনয়ে।

এরই মধ্যভাগে রচিত হয়েছে মুষ্টি-যুদ্ধের মঞ্চ; হাজার হাজার দর্শকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে যুদ্ধমান আততায়ীদ্বয়ের উপর—ঘোরাফেরা করেছে চারিধারের আবেগ-অধীর, উদ্বেলিত দৃশ্যাবলীর উপর দিয়ে। এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে আমেরিকানদের বেসবল খেলার প্রতি-যোগিতা; জনসাধারণের অবগতির জন্য বেতারে এই খেলার বিবরণ বর্ণনা করা হয়েছে; ওয়েম্বলির বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে

রচিত হয়েছে দর্শকদের জন্য বিরাট স্কোর বোর্ড। এখানকার আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে পাড়-উঁচু, ছাই বা ঘেঁষের তৈরি, বৃত্তাকার পথে উল্কাগতি মোটর সাইকেল রেস। এখানে আলোকোদ্ভাসিত সন্ধ্যায় শহর ভেঙে পড়েছে গ্রে-হাউন্ডের দৌড়ের আকর্ষণে।

এই ওয়েম্বলি! এখানে দেখা গেছে ১৯৪৮ সালের অলিম্পিক ক্রীড়ামহোৎসবের অধিবেশন সমারোহ। এই ওয়েম্বলির সূচনার যুগ ১৯২৩ সাল থেকে বছর বছর এফ এ কাপ ফাইন্যাল এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর দু' বছর বাদে এখানেই আরম্ভ হয়েছে রাগবী লীগের কাপ ফাইন্যালের বাৎসরিক খেলা; তার ২০ বছর ব্যবধানের পর থেকে প্রতি বৎসর অ্যামেচার কাপ ফাইন্যাল এখানেই ভিড় জমাতে শুরু করে দিয়েছে। আন্ত-স্কুল কাপ ফাইন্যাল এখানেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এও কিছু কম যায় না; একে এফ এ কাপের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা চলে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়ভীষণ দিনে ডানকার্ক প্রত্যাগত আর্ত, সন্ত্রস্ত সৈনিক এই ওয়েম্বলিতেই আশ্রয় পেয়েছিল। এখানেই রচিত হয়েছিল যুদ্ধোপকরণের বিরাট ভাণ্ডার ও সেনা-ব্যারাক। সে সময় রাত্রির আগমনে লণ্ডনবাসী বিভীষিকা দেখত। নিষ্প্রদীপ রজনী; শঙ্কাকুল শহর; উৎকর্ণ লণ্ডনবাসীর হৃৎকম্প হ'ত সাইরেনের আকুল ক্রন্দনে; একবার নয়, দুবার নয়, সারাক্ষণ মন জুড়ে এর অসহায় বিলাপের করুণ সুর লেগেই থাকত—আকাশ ছেয়ে যথানিয়মে একাধিকবার ঢেউ-এর মত জার্মান বোমারুগণ আসত; লণ্ডনের চারিদিক ধরেই চলত অগ্নিনিশার বহ্ন্যুৎসব; রচিত হ'ত পাহাড়-প্রমাণ ধ্বংসস্তূপ।

সেকালেও সৈনিক ও শহরবাসীর মনের খোরাক জুগিয়েছে এই ওয়েম্বলি। বেলা থাকতে যথারীতি এখানে বসেছে খেলার উৎসব; সৈন্যদের প্যারেড ও কুচকাওয়াজ-এর এখানেই যথারীতি ব্যবস্থা হয়েছে; জিমন্যাশিয়াম খোলা হয়েছে ওদেরই জন্য। ইউরোপের উদ্বাস্তুরা ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে পেয়েছে আশ্রয়। তারা সঙ্গে নিয়ে এসেছে প্রয়াণপথের

এফ এ কাপের ফাইন্যাল খেলার বহুপূর্বে টিকিট তন্নতন্ন ক'রে পরীক্ষা করা হয়; দপ্তরে থাকে এর সব তত্ত্ব। ছবিতে ওয়েম্বলির টিকিট আফিসের একাংশ দেখা যাচ্ছে; টানাগুলোর নম্বর মিলিয়ে টিকিট রাখা হয়। তারপর এফ এ-র কাছে এগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হয়

বিশ্বস্ত যান—সাইকেল। এর আগে ওয়েম্বলি কখনও এক সঙ্গে এত সাইকেল দেখেনি।

ওয়েম্বলির প্রথম কাপ ফাইন্যাল

ওয়াটারলু যুদ্ধের মরণাহবে যারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার গৌরব-কাহিনী যেমন ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে পুরুষানুক্রমিকভাবে চলে এসেছে, তেমনি চলে এসেছে যারা এফ এ কাপের ওয়েম্বলির মাঠে প্রথম ফাইন্যাল খেলায় উপস্থিত ছিল তাদের মুখের গল্পকথা। সেদিনকার এই ফাইন্যাল হয়ত পর্যবসিত হ'ত এক বিরাট শোকাবহ দুর্ঘটনায়; ভয়াবহ হয়ত হত এর দর্শকের মৃত্যুসংখ্যা। আজ খেলার অনুরাগী ইংরেজের মনে এ জেগে আছে—এক অতুলনীয়, মনোরম স্মৃতি।

এই খেলা হয়েছিল শনিবার, ২৮শে এপ্রিল, ১৯২৩ সালে। সেদিন ওয়েম্বলির ভিতর ও বাহিরে যেন দর্শকের রীতিমত বান ডেকে গিয়েছিল। সেদিনকার মত দৃশ্য আগে বা পরে আর কখনও দেখা যায়নি। তিন লাখের উপর লোক ভিড় জমিয়েছে স্টেডিয়ামের ভিতর ও বাহিরে। আরও কত লাখ লোক প্রকাণ্ড চওড়া

ওয়েম্বলির খেলার মাঠে গ্রীস থেকে আনীত হয়েছিল ১৯৪৮ সালের অলিম্পিক ক্রীড়া মহোৎসবের পুণ্য পাবক-শিখা

স্রোতের মত ওয়েম্বলির অভিমুখে চলে আসছে তার ইয়ত্তা নেই। সে সময় যদি আগে থেকে টিকিট বিক্রীর ব্যবস্থা থাকতো তাহ'লে তাদের অনেকেই হয়ত এমুখো হ'ত না।

স্টেডিয়ামে মোটমাট ১,২০,০০০ দর্শকের স্থান হতে পারে এই ছিল কর্ম-কর্তাদের অনুমান। পোনে দুটোয় স্টেডিয়ামের সব 'গেট' বন্ধ করে দেওয়া হল। তখনই দর্শকসংখ্যা সরকারী হিসাবে দাঁড়িয়েছে ১,২৬,০৪৭। অথচ যতদূর দৃষ্টি চলে, মাইলের পর মাইল আরো লোক স্টেডিয়ামের পথ ধরে কাতারে কাতারে চলে আসছে; কোনমতেই তাদের পথরোধ করা সম্ভবপর নয়। দেখতে দেখতে স্টেডিয়ামের ভিতরের চেয়ে বাহিরে বহুগুণ লোক বেড়ে গেল। উন্দাম, প্রমত্ত, জনসমুদ্র—আসন্ন প্লাবন—খেলার মাঠের চারিদিক ঘিরে যেন দুর্নিবার ধ্বংসোন্মুখ সমুদ্যত প্রলয়।

প্রথমে দু-একজন, তারপর ডজন হিসেবে, পরিশেষে শতেকের সংখ্যা ছাপিয়ে বিরাট জনতা গেট ভেঙে, টার্ন-স্টাইল উপড়ে, বাধা, অন্তরায় তচনচ করে, পাঁচিল টপকে স্টেডিয়ামে ঢুকে পড়ল। স্থানীয় পুলিশ সদলবলে উপস্থিত। তারা সবাই নাজেহাল হয়ে গেল। টেলি-ফোনের উপর টেলিফোন—"স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড পুলিস পাঠাও, আরো পুলিস, আরো, আরো, আরো......!" অবস্থা একেবারে আয়ত্তের বাহিরে।

এদিকে গেট বন্ধ হবার বহু আগেই টিকিট বিক্রির মুদ্রা ও নোটের তাগাড় স্টেডিয়ামের সুদৃঢ় মালখানা বা স্ট্রংরুমের সিলিং বা চালে গিয়ে ঠেকেছে। অর্থে ঢাকা পড়েছে এর মেঝের সবখানি। স্টেডিয়ামের ধাপগুলোয় লোক ধরে না—চাপে লোকের শ্বাসরোধ হবার উপক্রম। সকলের মনেই ত্রাস; স্টেডিয়াম উপচে খেলার মাঠে জনতা প্রাণের দায়ে ঢুকে পড়ছে—সারা মাঠ লোকে লোকারণ্য।

পোনে তিনটেয় রাজা পঞ্চম জর্জ সদলবলে উপস্থিত হলেন। কর্তৃপক্ষ সকলেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে ব্যস্ত; জাতীয় সংগীত বেজে উঠল; কারা মাঠের কোন অঞ্চল থেকে বাজাল, কেউ তা দেখতেও পেল না। জনতা নিজেকেই সামলাতে পারছে না; তাহ'লেও রাজাকে অভিনন্দন জানাল জাতীয় সংগীতে গলা মিলিয়ে।

অবস্থা যা তাতে ম্যাচ হতেই পারে না। এক ঘণ্টা হল খেলা শুরু হবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। হঠাৎ দেখা গেল এক দিকের গোলের কাছে একটুখানি ফাঁকা জায়গায় সাদা একটা ঘোড়ায় চড়ে একজন পুলিস। ঘোড়াটা জনতার মধ্যে ঢুকে একটু একটু করে জায়গা করছে; সে কখন তার থুতনি কখন [illegible] কাজে লাগাচ্ছে। পুলিসটা হেঁকে বলছে: "আপনারা খেলা দেখতে চান না? আমি তা চাই। সবাই মিলে গায়ের জোরে একটুখানি পেছিয়ে যান; লাইনটা ফাঁক করে দিন, তারপর মাটিতে বসে পড়ুন।" আস্তে আস্তে এইভাবে মাঠ খেলার জায়গাটুকু পুনরুদ্ধার হল। এ শুধু সম্ভব হয়েছিল পুলিসের শিষ্ট ব্যবহার, জনতার নিয়মানুবর্তিতা, আর ঘোড়াটির শান্ত প্রকৃতির জন্য।

দু' মিনিটের মধ্যেই বোলটনের পক্ষে ডেভিড জ্যাক গোল দিলে। ইতিপূর্বেকার দুরবস্থার কথা জনতা সহজেই ভুলে গেল। যখন গোল হল তখন ওয়েস্ট হ্যাম দলের রক্ষণভাগের একজন খেলোয়াড় ধারের লাইন ছাড়িয়ে দর্শকদের মধ্যে আবদ্ধ; মাঠে ফিরে আসা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। বিশ্রামের সময় দুই দলই মাঠের ভিতর শুয়ে বসে কাটাল। দ্বিতীয়ার্ধে বোলটন আবার একটি গোল দেয়। গোলের পিছনে ঘনসন্নিবিষ্ট জনতার গায়ে লেগে বল এত জোরে বেরিয়ে এসেছিল যে, সবারই মনে হয়েছিল বল খেলার মধ্যেই থেকে গেছে—গোলের ভিতর যায়নি। এমনিভাবে এফ এ কাপের স্টেডিয়াম-মাঠের প্রথম ফাইন্যাল নিষ্পন্ন হয়।

ওয়েম্বলির উৎপত্তি

সমগ্র সাম্রাজ্যকে পরিক্রমা করে ওয়েম্বলিতে বিরাট প্রদর্শনী খোলা হবে এই ছিল আদি উদ্দেশ্য। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে ১৯১৯ সালে যুবরাজ এডওয়ার্ডকে সভাপতি করে এই উদ্দেশ্যে এক সমিতি গড়া হয়। পরের বছর ৭ই জুন তারিখে যুবরাজ জানালেন তাঁর বাবা রাজা পঞ্চম জর্জ সমিতির পৃষ্ঠ-পোষক হতে রাজি হয়েছেন, তাছাড়া লয়েড জর্জের গভর্নমেণ্ট বিল পাশ করে ১,০০,০০০ পাউন্ড এর সাহায্যকল্পে দিতে রাজি আছেন যদি সমিতি ৫,০০,০০০ পাউন্ড অন্য কোথা থেকে তুলতে পারে। জনসাধারণের নিকট ১০ লক্ষ পাউন্ড মজুত আমানতের জন্য একটা আবেদন প্রচার করা হ'ল। লোকে তখনও মনমরা; ১৯১৪-১৮ যুদ্ধের ঘা তখনও শুকোয়নি। তাই আবেদন নিষ্ফল হল।

যুবরাজ কিন্তু দমবার পাত্র নন। তিনি জানেন কিসে লোকের মন পাওয়া যায়। ১৯২১ সালের গ্রীষ্মকালে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রধান মন্ত্রীরা এসেছেন। লণ্ডনে ভোজ-সভা বসেছে। যুবরাজ সেখানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন, প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য হবে এর খেলার মাঠ।

এতে বেশ ভাল ফলই হল। চাঁদার অঙ্ক দ্রুত আগাতে লাগল। ডিউক অব ইয়র্ক ১০ই জানুয়ারী ১৯২২ সালে ওয়েম্বলির মাঠে এক চাপড়া মাটি খুঁড়লেন। স্টেডিয়ামের ভিৎ খোঁড়া হল — ৩০০ দিনের মধ্যেই স্টেডিয়াম গড়ে উঠল—মালমশলা ও মজুর বাবদ খরচ হল ৭,৫০,০০০ পাউন্ড। কংক্রিটের ফর্মা তখনও ভাল মত শুকোয়নি। কাজ তাবদা হয়েছে কি না পরখ করবার জন্য স্টেডিয়ামের ধাপগুলোর উপর গোটা একটা পদাতিক বাহিনী ঘণ্টা খানেক ধরে মোটা বুট পরে তাল রেখে পা ঠুকতে লাগল। তারপর তিন মাস বাদেই স্টেডিয়াম মাঠে হ'ল এফ এ কাপের ফাইন্যাল খেলা। এ খেলার কথা আগেই বলা হয়েছে। গণ্যমান্য সবাই এ খেলা দেখতে এসেছিলেন।
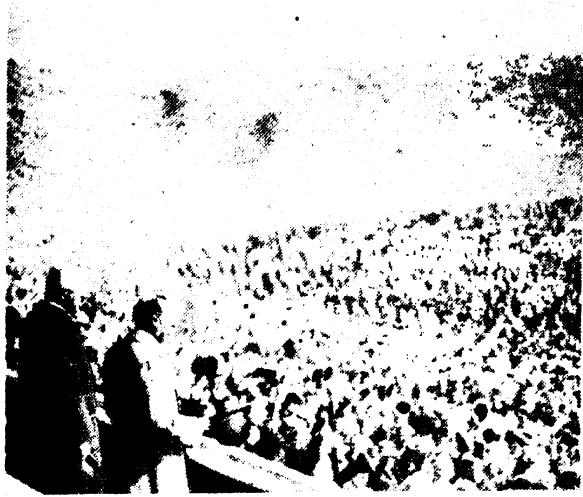
এফ এ কাপের ফাইন্যাল প্রথম খেলা হয় ওয়েম্বলিতে ১৯২৩ সালে। মাঠ ছেয়ে গেছে দর্শকের ভীড়ে। অবস্থা এমনই হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল যে, হয়ত বহুলোকের প্রাণনাশ হ'ত এই মাঠে। রাজা পঞ্চম জর্জ মাঠের অবস্থা দেখছেন

খেলার মাঠে এ এক নতুন রেকর্ড। এই ওয়েম্বলিতে আরো কত না রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। ইংলণ্ডের আর কোথাও খেলা নিয়ে এমন এলাহি ব্যবস্থা দেখা যায় না। প্রায় ৭১২ বিঘা জমির পরিক্রমা নিয়ে খেলার এই বিরাট আস্তানা তৈরি করা হয়েছে; এর মধ্যে রাস্তা ঘুরে গেছে ১৫ মাইল; ৩০টা প্রকাণ্ড অট্টালিকা গড়ে তোলা হয়েছে; খরচ হয়েছে ১,২০,০০,০০০ পাউন্ড। দু বছর ধরে এখানে প্রদর্শনী খোলা রইল—সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ লোক এখানে এসেছে। তারপর ১৯২৫ সালে অক্টোবর মাসে প্রদর্শনীর দরজা বন্ধ করা হ'ল।

নিলামে ওয়েম্বলি

এবার ওয়েম্বলিকে নিয়ে কি করা যায়? মাত্র একটা ভরসা এফ এ'র সঙ্গে একটা চুক্তি আছে, যাতে তারা স্টেডিয়াম মাঠে তাদের ইচ্ছানুযায়ী ভাল ম্যাচ খেলাবে। কিন্তু তাতে আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখা দুষ্কর। মিলিটারী 'টাটু', নৈশ সামরিক ক্রীড়া-প্রদর্শনী বা জমকালো কী তামাসার ব্যবস্থা করা যায়, যাতে ওয়েম্বলি বেশ সরগরম থাকবে। রোজগারের পথ সবই যেন একান্ত অনিশ্চিত। শেষে সমস্যার মীমাংসা হল: উপায়ান্তর না থাকায় লট ভাগ করে ওয়েম্বলিকে নিলামে চড়ান হবে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। নিলাম ডাকা হ'ল এবং তিন মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল—ডাক নেই বল্লেই চলে। তবু অবশেষে ওয়েম্বলি সত্যিই বিক্রি হয়ে গেল। ক্রেতা আর্থার এলভিন। প্রদর্শনীর ছোট্ট একটা স্টলে যাঁরা সিগারেট বিক্রি করতেন, এলভিন তাঁদেরই একজন। মনে হয় এলভিন ছিলেন স্বপ্নবিলাসী; হয়ত তিনি ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতে ভালবাসতেন। সে যাই হ'ক, এটা স্বীকার করতে হবে তাঁর মাথা ছিল ফন্দি ফিকিরে ভরা। তিনি বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। অর্থের অভাব হ'ল না। তাঁদের সাহায্যে তিনি ওয়েম্বলি কিনে নিলেন।

অল্পকালের মধ্যেই তিনি একটা কারবারী প্রতিষ্ঠান খুললেন। তিনি

প্রধান অংশীদার। প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হ'ল 'ওয়েম্বলি স্টেডিয়াম ও গ্রেহাউন্ড রেসকোর্স লিমিটেড।' তারপর মহা আড়ম্বরের সঙ্গে গ্রেহাউন্ড রেসের ব্যবস্থা হ'ল। নূতনত্বের আকর্ষণে স্টেডিয়াম মাঠে লোক ধরে না। খরচের অঙ্ক অল্পকালের মধ্যেই মুছে গেল, ব্যবসা বেশ ফুলে-ফেঁপে উঠতে লাগল। এলভিন এখানেই থামলেন না। তরুণেরা উত্তেজনামূলক একটা কিছু চায়। জুয়ার ফাঁদে তাদের ধরা শক্ত। ওয়েম্বলিতে এবার পত্তন হ'ল মোটর-সাইকেল রেস —'স্পিডওয়ে।' এর জন্য সিন্ডার বা অঙ্গারের ট্র্যাক তৈরি হ'ল, আলোর ব্যবস্থা করা হ'ল। দু'বছরের মধ্যেই খরচের অঙ্ক আবার মুছে গেল। বিশেষজ্ঞদের দিয়ে ট্র্যাক তৈরি করান হয়েছিল। ওয়েম্বলির ট্র্যাক সব থেকে সেরা ১৯৩১ সালে একথা সবাই মুক্তকণ্ঠে মেনে নিলে।

ওয়েম্বলির প্রসার কিন্তু এখানেই থামল না। এলভিনের মাথায় আরো কিছু খেলছে, এটা বেশ বোঝা গেল ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। স্টেডিয়ামের দোসর আরো একটা বিরাট অট্টালিকা চাই। এরই অভ্যন্তরে হবে নানাবিধ খেলা ও আমোদ-প্রমোদের আয়োজন। ওয়েম্বলিকে গড়ে তুলতে হবে ক্রীড়াজগতের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র করে। অচিরকালের মধ্যে ওয়েম্বলির এই খ্যাতি সত্যিই সারা জগৎ মেনে নিল। একই জায়গায় এত রকমের খেলা, এত ভাল সরঞ্জাম, এত ভাল ব্যবস্থা পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

স্টেডিয়ামের সন্নিকটেই সাড়ে ছয় বিঘা জমি নিয়ে একটি বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করা হ'ল। এটা দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি এর রচনা ও ব্যবস্থা অনুপম। ফেরো কনক্রীট ও কাচের তৈরি এই বাড়িটার ভিতরটা এমন স্বচ্ছ ও হাওয়ায় ভরা যে, দিনেরবেলা দর্শকের মনে হয় যেন সে খোলা জায়গায় বসেই খেলা দেখছে। আলাদীনের প্রদীপ ঘষার ফলেই যেন এই অপূর্ব ইমারত মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। মাত্র নয় মাস লেগেছিল খেলার এই মনোরম প্রাসাদ নির্মাণ করতে; ১৯৩৪ সাল ফেব্রুয়ারী মাসে এর দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়।

এই প্রাসাদের বৈশিষ্ট্য এর অন্তর্ভুক্ত অপূর্ব এক বাঁধান জলাশয় বা সুইমিং পুল। সন্তরণ ও নানাবিধ জলক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে এইটি তৈরি করা হয়। সর্ববিধ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এরই চারিপাশে ১২,৫০০ দর্শকের আসন নির্মাণ করা হয়। এত বড় ও এই ধরনের বাঁধান জলাশয় পৃথিবীর আর কোথাও নেই। লম্বায় এটা ২০০ ফুট, চওড়ায় ৬০ ফুট, এর সবচেয়ে কম ও সবচেয়ে বেশি গভীরতা যথাক্রমে ৪৷৷ ফুট ও ১৬৷৷ ফুট; যন্ত্রের সাহায্যে এর ৭,০০,০০ গ্যালন জলের এক ফোঁটা অপচয় হয় না। মাত্র চার ঘণ্টার মধ্যে সবখানি জল বিশুদ্ধ করে আবার জলাশয়ে ভরা চলে। ডিউক অব গ্লস্টার এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন ২৮শে জুলাই, ১৯৩৪ সালে। জলাশয়ের নিচে মাটির অভ্যন্তরে এর বিচিত্র ও জটিল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন।

এলভিনের মাথায় যতই ফন্দি, ফিকির থাকুক না কেন, তিনিও জানতেন না এখানে কত বিভিন্ন ধরনের খেলার ব্যবস্থা হতে পারে। শীতকালে এই জলাশয়ের জল জমিয়ে বরফের উপর স্কেটিং ও আইস হকি খেলার বিরাট প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ক্যানাডার সুবিখ্যাত দল এই বরফের উপর হকি প্রতিযোগিতায় নামেন। এরই চারিদিক ঘিরে ২,০০০ মাইল বৃত্তাকার পথে ছয়দিনব্যাপী সাইকেল রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে; স্টেডিয়াম মাঠ থেকে সরিয়ে এখানেই মঞ্চ তৈরি করে মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। বরফের উপর কাঠের মেঝে তৈরি করা হয়েছে। টেবিল টেনিস ও লন টেনিস প্রতিযোগিতা, সার্কাস, বয় স্কাউটদের প্যারেড এমন কি প্রহসন পর্যন্ত এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কত অল্প সময়ের মধ্যে বরফের স্কেটিং রিং ঢেকে এখানে কাঠের পাটাতন পাতা হয়, তা ভাবলে অবাক হতে হয়! জগদ্বিখ্যাত টেনিস-বীর টিলডেন যখন পেশাদারের দলে নাম লিখিয়ে এখানে খেলতে আসেন, তখন এক মজার ঘটনা ঘটে। টিলডেন এলভিনকে বল্লেন—"পেশাদার লন টেনিস প্রতিযোগিতা ক্যাম্বিসের কোর্টে পেতে খেলা হয়।" পিন মেরে বেশ টান করে ক্যাম্বিস পাতা হ'ল। তার উপর টেনিসের ঘর কাটা হ'ল। ম্যাচের আগের দিন সন্ধ্যায় টিলডেন এসে বল্লেন—"এ রঙের ক্যাম্বিস চলবে না।" এলভিন ইতস্তত করে ক্যাম্বিসের নিচের কাঠের পাটাতনটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: "এর উপর কোর্ট কাটা চলতে পারে?" টিলডেন দেখে বল্লেন: "এ ত চমৎকার; এতে খেলা ভালই হবে।"

অথচ এলভিন যখন প্রথমে এই কাঠের পাটাতনটা দেখিয়েছিলেন তখন সেটাকে টিলডেন বাতিল করে দিয়েছিলেন। অগত্যা ট্যাক্সি ছুটল; বাড়ি থেকে মিস্ত্রিদের ধরে আনা হল; সারারাত কাঠের উপর রং দিয়ে দাগ টেনে, শুকিয়ে, টেনিস কোর্ট করা হল। তারপর থেকে সারা পৃথিবীর পেশাদার লন টেনিস খেলোয়াড়দের প্রাধান্য প্রতিযোগিতা এখানেই হয়ে আসছে।

উইম্বলেডন ও ওয়েম্বলেডন

লন টেনিস খেলায় পেশাদার খেলোয়াড়দের সংখ্যা এখনও অল্প। যাঁরা একাধিকবার বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অপ্রতিহত থেকে গেছেন, তাঁরাই পরিশেষে উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাবে ও অর্থের কুহকে পেশাদারদের তালিকায় নাম লিখিয়ে থাকেন। প্রত্যেক পেশাদার খেলোয়াড়ের সম্পর্কে অবশ্য একথা খাটে না। খেলার জলুস ও নৈপুণ্য বিচার করলে পেশাদার টেনিসের আকর্ষণ বেশি হওয়া উচিত। কিন্তু আজও টেনিসের পেশাদার খেলোয়াড়দের অ্যামেচারদের সঙ্গে এক পংক্তিতে আসন দেওয়া হয় না।

এককালে ক্রিকেট খেলোয়াড়দেরও এই ধরনের ভেদাভেদ মেনে চলতে হ'ত। একালে তা আর নেই। কিন্তু একথা টেনিসের বেলা আজও বলা চলে না। মর্যাদা ও আভিজাত্যের সম্পদ আজও অ্যামেচার টেনিস খেলাকেই বড় করে রেখেছে। এই অ্যামেচার বা অবৈতনিক খেলোয়াড়দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতার কেন্দ্র লন্ডনের উইম্বলেডন। সারা পৃথিবীর পেশাদার খেলোয়াড়দের প্রাধান্য প্রতিযোগিতার কেন্দ্র ওয়েম্বলি। উচ্চাঙ্গের

ওয়েম্বলি স্টেডিয়াম—এইখানে এফ এ কাপ ফাইন্যাল খেলা হয়। এর খানিকটার উপর আছে আচ্ছাদন

খেলা, ব্যবস্থাপন ও জনপ্রিয়তার জন্য ওয়েম্বলির নামটা একটু ঘুরিয়ে আভিজাত্যভরা উইম্বলেডনের অনুকরণে ওয়েম্বলেডন বলতেও শোনা গেছে।

যাই হ'ক, বহুবিধ খেলার অপূর্ব কেন্দ্র বলে ওয়েম্বলির বৈশিষ্ট্য ও জনপ্রিয়তা ক্রমেই বেড়ে চলতে লাগল। তারপর একদিন আবার রণ-দামামা বেজে উঠল। মিউনিক চুক্তির পর থেকেই ওয়েম্বলির দর্শক-সংখ্যা ক্রমেই কমতে লাগল, তারপর ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই এর অনেক কিছু খেলার ফিরিস্তি, অনেক কিছু আয়োজন বাতিল করতে হ'ল। গোড়ার দিকে অনেকের মনে হয়েছিল হয়ত ওয়েম্বলির দরজায় তালা-চাবি পড়বে, হয়ত এর আনন্দ-মুখরিত খেলার মাঠ, এর নানাবিধ খেলার সরঞ্জাম-ভরা, অভিনব প্রণালীতে রচিত খেলার বাড়িগুলো ভগ্নস্তূপে পরিণত হবে।

অনেকের মনে ছিল আশঙ্কা—এই মহাজনারণ্য ওয়েম্বলি হয়ে পড়বে অনন্ত নির্জন। এই ওয়েম্বলি, যেখানে খেলার বন্যার উচ্ছলিত স্রোত শত শাখা-প্রশাখায় স্ফীত, তপ্ত হয়ে উপচে পড়ত,—সে হয়ে পড়বে নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ মহাশ্মশান। "পঙ্কশয্যা" থেকে "ভদ্রবেশী বর্বরতা প্রলয়মন্থনক্ষোভে" আবার জেগে উঠেছে—অকস্মাৎ আবার পরিপূর্ণ "স্ফীতিমাঝে দারুণ আঘাত"—আবার "কালঝঞ্ঝা-ঝঙ্কারিত দুর্যোগ আঁধার।" আবার পৃথিবী জুড়ে দেখা দেবে মহাযুদ্ধের অনিবার্য ব্যাপকতা। ইউরোপে আবার শুরু হয়েছে হিংসার উৎসব—তারি মাঝে আবার বেজে উঠেছে মরণের উন্মাদ রাগিণী। স্তব্ধ, স্তিমিত ওয়েম্বলি প্রথম কয়দিন অসাড়, নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল. তারপর এর অবরুদ্ধ, মুহ্যমান আনন্দ-স্রোত দেখা দিল নূতন কর্মধারায়; নিজেকে সার্থক করে তুলল "অজস্র, সহস্রবিধ চরিতার্থতায়।"

ত্রস্তচিত্ত নাগরিক। দীপহীন, "জীর্ণভিত্তি অবসাদপূর্ণ সন্ধ্যার আঁধারে নিরানন্দ ঘরে দীন-আত্মা শত লক্ষ ডরে কম্পমান!" রণাঙ্গন থেকে ফিরে এসেছে সৈনিক—আহত শরীর, আহত মন, আহত বুদ্ধি, আহত বিশ্বাস। আজও প্রয়োজন আছে আনন্দ উৎসবের। এই কঠোর কর্তব্যের দিনে ওয়েম্বলিকে দেখা গেল নূতন আয়োজনে ব্যস্ত। সে আয়োজন নূতন আশ্বাস, নূতন কল্যাণ, নূতন সন্তোষের সৃষ্টিকল্পে।

নীরব সভা

এ নিয়েও ওয়েম্বলির অভিজ্ঞতা কম নয়। ডানকার্ক থেকে যে সব সৈনিক প্রাণ নিয়ে কোনমতে পালিয়ে আসতে পেরেছিল, তারা সোজা এসে উঠল এই ওয়েম্বলির ক্রীড়াভবনে। তাদের উদ্দেশে এক খেলার জলসার আয়োজন করা হ'ল। চারিদিকে সর্ববিষয়ে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। ওয়েম্বলিকেও এসব মেনে চলতে হয়। নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে এর সর্বোচ্চ দর্শকসংখ্যা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দর্শক সমাগমে সেদিন ওয়েম্বলির প্রেক্ষাগার পরিপূর্ণ। খেলায় দেখা গেল উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য—কিন্তু

সভাস্থলের কোথাও উদ্দীপনার চিহ্ন পর্যন্ত দেখা গেল না। সভা রইল নীরব, উদাসী। সভাস্থ সৈনিক ও নাগরিক দর্শক অত্যন্ত ক্লান্ত, বিভ্রান্ত-চিত্ত সেদিনকার আয়োজন নিঃশেষিত হ'ল নিষ্ফল ব্যর্থতায়।

আবার এর ঠিক বিপরীত প্রতিক্রিয়াও দর্শকদের আচরণে দেখা গেছে। এফ এ কাপ প্রতিযোগিতা নিয়মিতভাবে যুদ্ধের অনিশ্চয়তার মধ্যে চালান সম্ভবপর হয়নি। এই সময়ের এফ এ কাপ ফাইন্যালের একটা খেলার শেষে দর্শকদের ব্যঙ্গসূচক কোলাহলে খেলার মাঠ মুখর হয়ে উঠে। এদিনকার ব্যঙ্গোক্তির অর্থ এ নয় যে, খেলার মান অতি নিম্নশ্রেণীর হয়েছে। দর্শকের বিক্ষোভের কারণ অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হলেও খেলা আর চালান হয়নি।

সেদিন হয়ত নিষ্প্রদীপের কথা দর্শকেরা ভুলে গিয়েছিল। সময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য ঐদিন নব্বই মিনিটের পর অতিরিক্ত সময় খেলা চালান সম্ভব হয়নি।

শত নিষেধের মধ্যেও ওয়েম্বলির খেলার আসর আবার জমে উঠল। গ্রেহাউণ্ডের দৌড়, এফ এ কাপ ফাইন্যাল, আন্তর্জাতিক ফুটবল, স্কেটিং, আমেরিকানদের বেস বল, ক্যানাডার আইস হকি, মুষ্টিযুদ্ধ সবই আবার ফিরে এল। তারই সঙ্গে নূতন ব্যবস্থায় খোলা হ'ল জিমনাশিয়াম। ছোটদের নিয়ে নিত্য-নিয়মিত সাড়ম্বর সামরিক মহলার ব্যবস্থা হ'ল। দেশের রক্ষীদল, নাগরিক সেনানী, দমকল বাহিনী সবাইএর জন্য খোলা রইল ওয়েম্বলির দরজা। যে কোন প্রতিষ্ঠানের পোশাকপরিহিত নরনারীর জন্য প্রবেশ ও দর্শনীর মূল্য নেই। এরও চেয়ে উল্লেখ-যোগ্য হ'ল ওয়েম্বলির বড়দিনের ভোজ। অতি সাদামাটা কথায় এলভিনের আমন্ত্রণ —"সৈন্যদলের যদি কেউ আমাদের এই সামান্য আয়োজনে যোগ দেন, তাহলে আমরা বাধিত বোধ করবো।"

দুর্দিনের এইসব কাহিনী এইখানেই শেষ হ'ক। এমনি করে সুদিন-দুর্দিনের মধ্যে কর্ম-চঞ্চল ওয়েম্বলির জীবনের একুশ বছর কেটে গেল। ১৯৪৪ সালের এপ্রিলে ওয়েম্বলি সাবালক হ'ল। এর চার মাস পরে একটা উড়ন্ত বোমা ওয়েম্বলির শরীরে যুদ্ধের প্রথম ক্ষত-চিহ্ন রেখে যায়। আঘাত সামান্য, কিন্তু তা হলেও বিস্ফোরণের ফলে দুটো গ্রেহাউণ্ড মারা যায় এবং ওদের খোঁয়াড়ের এক দিকটা উড়ে যায়। কুকুরগুলো প্রাণভয়ে ঝড়ের গতিতে পালায়। সাতদিন খোঁজাখুঁজির পর আবার তাদের ফিরিয়ে আনা হয়।

ইউরোপে আবার শান্তি ফিরে এল। মহাযুদ্ধের হ'ল অবসান। ধীরে ধীরে মানুষ আজন্ম অভ্যাসবশত আবার তার ছেঁড়া মন জোড়া দিতে শুরু করল। আবার বাঁচার অনির্বাণ আনন্দের আশা তাকে পেয়ে বসল; তার মনের কানে বাজলো আবার আদর্শের সুর; ফিরে এল আবার অলিম্পিক খেলার সাড়ম্বর মহোৎসব। পৃথিবী থেকে যুদ্ধ তাড়াবার জন্য মানুষ করেছে মহাযুদ্ধের সৃষ্টি; এই একই উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়েছে প্রলয়ংকর অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমা; এরই জন্য সভ্য মানুষ ধারণ করেছে জাতিপুঞ্জ-সংহতির রক্ষাকবচ, একাধিক শক্তিমান দল রচিত হয়েছে সম্মিলিত দেশ নিয়ে। স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে খেলার অবদান এই অলিম্পিক মহোৎসব। এর মূল কথা হ'ল সৌভ্রাতৃবন্ধন, এর আমন্ত্রণ জগতের তরুণদের নিকট; স্বাধীন, সবল, শান্ত, নিরভিমান, স্নেহস্নিগ্ধ এর আদর্শ।

নিখুঁত আয়োজন

ওয়েম্বলি ১৯৪৮ সালের অলিম্পিক ক্রীড়া-মহোৎসব নিয়ে মেতে উঠল। পক্ষকালব্যাপী এই উৎসবের জন্য করল অজস্র অর্থব্যয়; নিজের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখল নিখুঁত আয়োজন করে। এই প্রতিযোগিতার জন্য অনেক কিছু ঢেলে সাজা হ'ল। এর জন্য তিনতলা সমান উঁচু করে স্কোর-বোর্ড তৈরি করা হ'ল। ইংলণ্ডে সে সময় কাঠ মেলে না, তাই সুইডেন থেকে কাঠ আমদানী করা হ'ল।

ঘাসের উপর কুকুরের দৌড় হ'ত। সে ঘাস উপড়ে, বনেদ পর্যন্ত মাটি কেটে তার উপর টনের পর টন বিশেষভাবে তৈরি করা সিণ্ডার বা পাঁশ ঢেলে দৌড় প্রতি-যোগিতার জন্য ট্রাক তৈরি করা হ'ল। একে একেবারে নিক্তির ওজনে চৌরস করার জন্য ভার দেওয়া হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের উপর। মাপ জোখে এক চুলও ভুল যাতে না হয়, তার জন্য গণিতজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হ'ল।

বাঁধান জলাশয়টা ব্যবহার হয় নি প্রায় দশ বছর। সেটার সংস্কার পুরোদমে হ'ল।—ওটার ডবলডেকার বসবার গ্যালারী ঢেলে সাজা হ'ল। এবার জল জমিয়ে বরফ করে তার উপর কাঠের পাটাতন চাপালে চলবে না কারণ জলক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলি যাতে অব্যাহতভাবেই হতে পারে, তাই করা প্রয়োজন। অথচ এইখানেই মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য জলের উপর একটা সাঁকো এবং তারই মধ্যভাগে মুষ্টিযুদ্ধের উপযোগী একটা চাতাল তৈরি করা হ'ল

এই হ'ল ওয়েম্বলি! অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় দেশদেশান্তর থেকে যাঁরা এখানে এসেছিলেন, তাঁরা সবাই এর ব্যবস্থা, আয়োজন ও খেলার উপকরণের বিশেষ সুখ্যাতি করেছেন। প্রতিযোগিতার বিবরণ আজ ইতিহাসের পাতায় উঠেছে।

সর্বসমেত ৫৯টি দেশ থেকে প্রতিযোগীরা এসেছিলেন। নিজেদের বিশিষ্ট পোশাক পরে এদের প্রতিনিধিবাহিনী যখন শোভাযাত্রায় একের পর এক ইংরেজি অক্ষরের পর্যায়ক্রমে আগাতে থাকেন, তখন বিশাল জনতা তাদের অভিনন্দন জানিয়েছিল উচ্ছ্বসিত করতালি দিয়ে। মাল্টার জর্জ দ্বীপের তরফ থেকে একজন মাত্র প্রতিযোগী এসেছিলেন। ইনি একাই ছিলেন মাল্টার প্রতিনিধি দল। তাই মাল্টার এই সবে-ধন-নীলমণির সম্বর্ধনা হয়েছিল সকলের চেয়ে বেশি।

অনুপম আয়োজন ও ব্যবস্থার দৃষ্টান্তস্থল ওয়েম্বলি। কোথাও, কোন দিকে এতটুকু ভুল-ত্রুটি নেই; এখানে সব কিছু নিষ্পন্ন হয় যেন যন্ত্রের সাহায্যে। মনে করুন, একই দিনে এফ এ কাপ ফাইনাল ও গ্রে-হাউন্ড রেস হবে। ফাইন্যাল খেলার হাঙ্গামাটা কম নয়। এর জন্য তোড়জোড় শুরু হয় প্রায় এক বছর আগে থেকে, আর আসল মহলা বসে খেলার আগের দিন সকাল থেকে। রাস্তার কোন মোড়ে কারা থাকবে, কোন্ গেটে, কোন টার্নস্টাইলে কাদের কি কাজ করতে হবে, দর্শকেরা যে যার জায়গায় গেল কিনা, বসল কিনা; ৩,৫০০ মোটরগাড়ি ও ২০০০ কোচ নিরূপিত জায়গায় রাখা হল কিনা, আহার্য ও পানীয় ক্রেতার কাছে ধরে দেওয়া হল কিনা প্রভৃতি নানান কাজ; এই নিয়ে ২৫০ পুলিস, ফুটবল সঙ্ঘের ৫০০ কর্মকর্তা, ৪০০ তদারককার, ২৫০ গাড়ি চৌকি দেবার লোক সবাই এই মহলায় যোগ দেয়; যে যার নিরূপিত কাজ বুঝে নেয় ও রীতিমত নিরূপিত কাজের 'রিহার্সল' দিয়ে নেয়।

ত্রুটিহীন ব্যবস্থা

ফুটবলের কাপ ফাইন্যালের আগে মাঠে দাগ দেওয়া, গোল-পোস্ট পোঁতা সবই ঠিকঠাক করে রাখতে হবে। এছাড়া নম্বর করা আসনগুলো ভাল করে দেখে নিতে হবে,—এর মধ্যে আছে আবার স্থায়ী আসন ও ২২,০০০ সাময়িক আসন। কুকুরের দৌড়ের জন্য যে ভোজনালয়টা আছে, তার ভোল বদলে সাংবাদিকদের বসবার ব্যবস্থা করতে হবে। এফ এ কাপ ফাইন্যালের জন্য প্রায় ২০০ সাংবাদিক উপস্থিত থাকেন, এ'দের মধ্যে অন্তত ৫০ জন আসেন সাগর-পার থেকে। এ ছাড়া ফিল্ম কোম্পানীদের ব্যবস্থা করা চাই, রেডিও ও টেলিভিশানে যাঁরা খেলার বিবরণ বলে যাবেন, তাঁরাও আছেন। খেলার আগে গ্রে-হাউন্ড দৌড়ের বহুবিধ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ৪০টি আলোকস্তম্ভ সবই সরিয়ে ফেলতে হবে।

কাপ ফাইন্যাল খেলা শেষ হবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই এক লক্ষ দর্শক ওয়েম্বলি ছেড়ে যে যার গন্তব্য-পথে বেরিয়ে পড়ল, স্টেডিয়াম, খেলার মাঠ খালি হয়ে গেল। দু'ঘণ্টা পরেই আবার শুরু হবে গ্রে-হাউন্ডের দৌড়। এরই মধ্যে আবার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, আবার সেই ৪০টা আলোকস্তম্ভ যথাযথভাবে বসাতে হবে; আবার 'প্রেসবক্স' বা সাংবাদিকদের বসবার নির্দিষ্ট স্থানটাকে রেস্তরাঁয় পরিণত করে ফেলতে হবে। হাঙ্গামা কম নয়; কিন্তু আগে থেকে ভেবে-চিন্তে সর্ববিধ ব্যবস্থা করা হয়, তাই শেষ মুহূর্তে কোন কিছু বিভ্রাট দেখা দেয় না—সব কাজই জলের মত নিষ্পন্ন হয়ে থাকে।

ওয়েম্বলি নিজে এফ এ কাপ ফাইন্যালের টিকিট বিক্রী করে না। তা না হলেও এই সম্পর্কে ওয়েম্বলী অতিশয় বিচক্ষণ ব্যবস্থা করে থাকে। ভাল কাগজে রঙ্গীন নক্সা করা চমৎকার ছাপা এই টিকিটগুলো মঞ্জু শিল্পের পরিচয় দেয়। এমন নিপুণ, নিখুঁতভাবে রং মিশিয়ে, আসনের দাম ও শ্রেণী স্পষ্টতঃ দেখিয়ে, নম্বর, তারিখ প্রভৃতি সহজেই চোখে পড়বার মত করে এই টিকিটগুলো ছাপা হয়, যে সেগুলোর জাল করা একরকম অসম্ভব। নির্ধারিত সংখ্যার কিছু টিকিট সম্মানিত অতিথি ও আপন কর্মচারীদের জন্য রেখে, বিক্রির সব টিকিট ওয়েম্বলী, এফ এ বা ফুটবল সঙ্ঘের নিকট পাঠিয়ে দেয়। এই টিকিটের মধ্যে যে দুই দল ফাইন্যালে উঠেছে তারা পাবে শতকরা ২৮·২৩; কাউন্টি ফুটবল প্রতিষ্ঠানগুলো প্রত্যেকেই পাবে শতকরা

৪০·০২; ফুটবল লীগ ক্লাবগুলো ও স্থায়ী সদস্যেরা পাবে শতকরা ২০·৬১।

ভাগ বাঁটোয়ারা যাই হ'ক, ওয়েম্বলীর দপ্তরে প্রত্যেকটি টিকিটের সমুদায় তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লেখা থাকে। ফাইন্যাল খেলার দিন সকাল থেকেই ওয়েম্বলির টিকিট আফিস খোলা হয়। এখানকার কর্মকর্তা বা ম্যানেজার মিস্টার ফ্রেড্ জ্যাক্‌সন ও তাঁর অধীন কর্মচারীদের তখন থেকেই শুরু হয় কাজ। অনবরত চলেছে টিকিট পরীক্ষার কাজ—পরীক্ষা আর পরীক্ষা। কেউ এসে বল্লেন, "মশাই দেখুন কি সর্বনাশ হয়েছে; জামার পকেটে টিকিটটা ছিল, কেচে এসে এই একটুখানি দলা-পাকানো কাগজে পরিণত হয়েছে।" খুব সাবধানে একটু ছাই হাতে নিয়ে কেউ বা এসেছেনঃ বিগলিতভাবে বলছেনঃ "টিকিট রেখেছিলুম ঘরের ম্যান্টেলটার উপরে, হাওয়ায় উড়ে সেটা আগুনে পড়ে ছাই হয়ে গেছে।" কোন মহিলা কান্নার সুরে বলছেন, "আমার স্বামী ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছেন, তাঁর পকেটেই সব টিকিট আছে।"

টিকিটের যত কিছু হদিশ কর্মচারী-দের নখদর্পণে। যাঁরা এসেছেন তাঁদের দুর্ভাগ্য-কাহিনী সত্য কি মিথ্যা, তাঁরা সঠিক বলতে পারেন। সতর্কতামূলক ব্যবস্থার ও বিচক্ষণতার জন্য ব্যাংক অব ইংলণ্ডের যেমন নাম আছে, এই সব টিকিটের ব্যাপারে ওয়েম্বলীরও তেমনি নাম।

ফাঁকি দিয়ে খেলা দেখার চেষ্টা

ফাঁকি দিয়ে খেলা দেখবার লোভে পড়ে কত লোক চুরি, জুয়াচুরির চেষ্টা করে ধরা পড়ে গেছে। বছর বছর দেখা গেছে নিষ্ফল চেষ্টা, গেটের তলায় সুড়ঙ্গ কেটে ঢোকবার। কেউ বা দু তিন দিন আগে অন্য কোন খেলা উপলক্ষে টিকিট কেটে ঢুকে 'বাথ রুমে,' ষ্টেডিয়ামের কোণা খুপসিতে বা প্রকাণ্ড লোহার কড়ির উপর নিজেকে লুকিয়ে খেলা দেখবার চেষ্টা করেছে এবং অবশেষে ধরা পড়ে গেছে। আরো কত মজাদার জুয়াচুরি, ধাপ্পাবাজীর সাহায্যে খেলা দেখবার চেষ্টার কথা শোনা গেছে। ওয়েম্বলির বিচক্ষণ কর্ম-চারীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ান সহজ নয়। এক ভদ্রলোক ১৯৫২ সালের ফাইন্যাল দেখবার জন্য গটমটিয়ে চলে এলেন টার্ন-স্টাইলের সম্মুখে। এমন সপ্রতিভ তাঁর চালচলন, যে তাঁকে কোনরকম সন্দেহ করাই চলে না। টিকিট ধরে হাত বাড়িয়ে আছেন, তাতে স্পষ্ট তারিখ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ওয়েম্বলির কর্মচারীদের চোখে ধুলো দেওয়া খুবই শক্ত। এটা জাল টিকিট নয়; কিন্তু এর রং ও নক্সাগুলোয় রয়েছে অমিল; খেলার তারিখ মিললেও সাল মিললো না। এটা ছিল ১৯৩২ সালের ফাইন্যাল খেলার টিকিট। এতকাল যত্ন করে রেখে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ওয়েম্বলি সে যত্নের পুরস্কার দিল না—কোনরকম তারিফই করল না।

এই ওয়েম্বলি! বলতে গেলে মাত্র একজনের ব্যবসা-বুদ্ধি, কর্মতৎপরতা ও বিচক্ষণতার প্রভাবে এ হতে পেরেছে ক্রীড়া-জগতের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। আর্থার এলভিন এখন সার আর্থার। ওয়েম্বলির কথা ফেরে লোকের মুখে মুখে। ওয়েম্বলিকে নিয়ে পুস্তক রচনা হয়েছে। বহুবিধ খেলার সবচেয়ে বড় আড়ত ওয়েম্বলি, এর খেলার সরঞ্জাম, উপকরণ সবই নিখুঁত, এর ব্যবস্থার তুলনা নেই। ওয়েম্বলী ছিল বলে ইংলণ্ড পেরেছিল ১৯৪৮ সালের অলিম্পিক খেলার মহড়া নিতে।

এই ওয়েম্বলির মধ্যে হয়ত প্রতি-ফলিত হয়ে রয়েছে ইংরেজের কর্মদক্ষতা, ইংরেজের জাতীয় চরিত্রের একটুখানি আভাস। ওয়েম্বলির দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখবার আছে। এর কর্ম-নিয়ন্ত্রণ, এর বিচক্ষণতা, এর বাস্তবে-রূপায়িত দূরদৃষ্টি, এর সাধনা, এর একাগ্রতা, এর বিষয়বুদ্ধি, এর অপূর্ব সাফল্যের তাৎপর্য মনে রাখবার মত। হয়ত এই সবের কণামাত্র থাকলেও আমাদের এবারকার কল্যাণীর কংগ্রেস ও প্রদর্শনীর মধ্যে বিপর্যয়ের আভাস পর্যন্ত দেখা যেত না; হয়ত এবারকার প্রয়াগের কুম্ভ-মেলা নিয়ে সারা দেশময় শোকের বন্যা বয়ে যেত না।

আমরা আজও বসে আছি আমাদের খেলার মাঠের স্বপ্ন-প্রাসাদের প্রতীক্ষায়, আমাদের মনের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ায় গানের কলির সুর—"আর কত কাল রইব বসে......"

কথক নৃত্যের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত

নলিনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

কথক নৃত্য অতি প্রাচীন নৃত্য। প্রাচীন ভারতের পটভূমিকাতেই নৃত্যটির বিচার করিতে হইবে। এবং এই নৃত্যটি বুঝিবার জন্য প্রাচীন ভারতের একটি বিশিষ্ট রূপ আমাদের সম্মুখে থাকা প্রয়োজন। ভারতের ইতিহাসকে যদি আমরা ভালভাবে অনুধাবন করি তাহা হইলে দেখিব, উত্তর ভারত বা আর্যাবর্ত শুধু মাত্র বাহিরের বহু জাতি দ্বারাই আক্রান্ত হয় নাই, ভিতরেও বহু ভাব-বিপ্লব এবং ধর্মবিপ্লবও হইয়াছে। এক-দিকে যেমন এই আর্যাবর্ত আর্য, শক, হূন ও গ্রীকদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে অপরদিকে তেমনই বৈদিক ধর্ম ও দর্শনের পর বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন এবং তাহারও পর পুনরায় শংকরাচার্যের বেদান্ত দর্শনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বৌদ্ধাচারে ও তন্ত্রাচারে মিলন ইত্যাদিও ঘটিয়াছে। আর ইহার ফলে জাতীয় জীবনের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে নব নব ভাবধারা এমনকি পরস্পরবিরোধী ভাব-ধারাও ঘোষিত হইয়াছে। শিল্পকলায়ও তাই দেখা যাইতেছে। যেমন বৌদ্ধ দর্শনে ঈশ্বর বা ব্রহ্মের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় না। মূর্তি বা মূর্তিপূজার স্থানও বৌদ্ধ ধর্মে নাই। কিন্তু গ্রীকদের দ্বারা ভারত আক্রমণ ও রাজ্যস্থাপনের পর দেখা গেল সেই বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক স্বয়ং বুদ্ধদেবেরই মূর্তি নির্মাণের চেষ্টা হইতেছে। গ্রীক প্রভাবান্বিত গান্ধার শিল্পে এইরূপ অসংখ্য বুদ্ধমূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু তখনও বুদ্ধ-মূর্তি এমন শান্ত সমাহিত ও ভারতীয় শাস্ত্র অনুযায়ী দেব-লক্ষণযুক্ত হয় নাই। পরবর্তী কালে ইহা হইয়াছে। কোথায় নাস্তিবাদ আর কোথায় দশাবতারের এক অবতার।

কথক নৃত্যকলাকে বিশ্লেষণ করিলেও এইরূপ বহু পরস্পরবিরোধী ভাবধারা দেখা যায়। এই পরস্পরবিরোধী ভাব-ধারা যথাস্থানে দৃষ্টান্ত সহ উল্লেখ করিব। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আর্যাবর্তে এইরূপ যত আলোড়ন হইয়াছে দক্ষিণ ভারতে তত হয় নাই। দাক্ষিণাত্যে এই আলোড়নের ঢেউ স্পর্শ করিয়াছে মাত্র। কাজেই উত্তর ভারতের কোন প্রাচীন কলা-বিদ্যাকে বুঝিবার জন্য যে পরিমাণ শাস্ত্র গ্রন্থ ও অন্যান্য উপকরণ প্রয়োজন, তাহার বহু কিছুই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। উপরন্তু এই বিদ্যাসমূহের ধারক ও বাহক বিদ্বানেরা বিরুদ্ধবাদীর নিকট হইতে রক্ষার জন্য ইহাকে গুপ্ত ও গুরুমুখী বিদ্যায় পরিণত করিয়াছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজেরাই ইহার যথাযথ অর্থও ভুলিয়া গিয়াছেন। পক্ষান্তরে দক্ষিণ ভারতে শিল্পকলার বহু গ্রন্থই এখনও পর্যন্ত বর্তমান আছে। নানা কারণে উত্তর ভারতের ভাব-বিপ্লব ও নব ভাবধারা এইস্থানের কলা-বিদ্যাসমূহকে যত প্রভাবান্বিত, যত রূপান্তরিত, যত বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিয়াছে, দক্ষিণ ভারতের শিল্পকলাকে কিন্তু তত করে নাই। তাই উত্তর ভারতে যতপ্রকার মন্দির, যতপ্রকার মূর্তি ইত্যাদির দর্শন পাই, দক্ষিণ ভারতে ততপ্রকার পাই না। এই কারণে দক্ষিণ ভারতের কলাবিদ্যাকে বিশ্লেষণ করা যত সহজ উত্তর ভারতের এই বিদ্যাসমূহকে বিশ্লেষণ করা তত সহজ নয়। কথক নৃত্যটির ক্ষেত্রেও এই কথাই প্রযোজ্য। উত্তর ভারতের শিল্প-কলা, কলা-বিদ্যা যেন সপ্তবর্ণ-সমন্বিত রামধনু। এক লহমায় যাহা দেখা যায় না, কিন্তু স্বচ্ছ ও প্রখর দৃষ্টির মাধ্যমে অচঞ্চল নিরীক্ষণের দ্বারা সপ্তবর্ণই ক্রমশ আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ঠিক সেইরূপ স্বচ্ছ অচঞ্চল, অতুল অধ্যবসায়, ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞান-পূর্ণ দৃষ্টি দিয়া দেখিলে তবেই উত্তর ভারতের প্রাচীন কলাবিদ্যার প্রকৃত রূপকে অনুধাবন করা সম্ভব। অধিকন্তু ভারতীয় শিল্পকলা তাহা উত্তর বা দক্ষিণ ভারত যে স্থানেরই হউক না কেন, বুঝিতে হইলে ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞানের প্রয়োজন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত নৃত্যভঙ্গী

বেদের মধ্যে ঋক্‌বেদই প্রাচীনতম। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। ইহা হইতেছে বেদ শব্দ। বাংলা ভাষায় আজিও এই কথাটি প্রচলিত। একপ্রকার যাযাবর সম্প্রদায়কে আজিও আমরা বেদে বলিয়া উল্লেখ করি। মনে হইতে পারে বেদানুসরণকারীরা একস্থানে অব-স্থান না করিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে অগ্রসর হইতেছিল। এবং বেদে শব্দটিও কি সেই স্মৃতি বহন করিয়াই আজিও বাঁচিয়া আছে? যাহাই হউক ঋগ্বেদের একটি শ্লোকে আমরা পাই যে,—নৃত্য-দর্শনের পর ঋষি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,— "ইহা উহারা কোথা হইতে পাইল—?"

উহারা বলিতে কাহাদের বুঝান হইতেছে? অনার্যদের কি? অনার্য বলিতে ত অজ্ঞ বা অসভ্য বুঝায় না। আর আর্যপূর্ব যুগেও তদানীন্তন ভারতে একটি উন্নত ধরনের সভ্যতা ছিল। ঋগ্বেদের উল্লিখিত শ্লোক হইতে কি ইহাই বুঝায় না যে আর্য অনার্যের সাংস্কৃতিক মিলনের প্রথম অবস্থায় নৃত্য সৃষ্ট হইয়াছে? "ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ" খণ্ডেও দেখি যজ্ঞ-বেদীকে ঘিরিয়া শূদ্র রমণীরা মস্তকে পূর্ণকুম্ভ লইয়া দক্ষিণহস্তে তাহা ধারণ করিয়া বাম হস্তে জঙ্ঘায় তাল রক্ষা করিতে করিতে নৃত্য করিতেছে। আর্যদের দ্বারা মন্ত্র যাহা উচ্চারিত হইতেছে তাহা এই—"এহি এহি এহি মধুপিবাঃ মধুপিবাঃ মধুপিবাঃ।(১) ইহাতেও দেখা যাইতেছে আর্য নহে অনার্যরা এবং শুধুমাত্র অনার্য পুরুষেরা নহে অনার্য নারীরা পর্যন্ত যজ্ঞবেদীকে প্রদক্ষিণ করিবার অধিকার পাইয়াছে এবং নৃত্যবিদ্যাটি অনার্যদের হাতে এখনও পর্যন্ত রহিয়াছে। ক্রমে ক্রমে আর্যরা এই নৃত্য-পদ্ধতিকে গ্রহণ করিলেন। যদিও তাঁহারা এই নৃত্যপ্রকরণকে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু এই প্রকরণকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ করিলেন আপন ভাবধারাকে। এইভাবেই আর্যাবর্তে আর্যগণের মধ্যে নব নৃত্যধারা প্রবর্তিত হইল। এই নৃত্য পদ্ধতিই আজিও কথক নৃত্য নামে প্রচলিত। উপরে উল্লিখিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শ্লোকটি সপ্তদশ মাত্রায় এইভাবে পঠিত হয়—

। । । । । । । । । । ।
॥ এহি এহি এহি — মধু পিবাঃ
। । । । । । ।
মধু পিবাঃ মধু পিবাহ॥

পরবর্তীকালে উত্তর ভারতে এই সপ্তদশ মাত্রার 'ব্রহ্ম যোগ' নামক একটি তালের প্রচলন দেখা যায়। ইহার ঠেকা ও নৃত্য-পদ্ধতি আমার নিকট আছে। 'ব্রহ্ম যোগ' 'ব্রহ্ম তাল হইতে ভিন্ন।'

যাহা কিছু সুন্দর তাহারই দেবতা শিব। কলাবিদ্যারও দেবতা শিব। শিবের সহিত সত্য ও সুন্দরের নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। তাই আমরা বলি 'শিবম্ সত্যম্ সুন্দরম্'। পরবর্তীকালে আর্যদের পক্ষ হইতে শিবম্ সত্যম্ সুন্দরমের পর অদ্বৈতম্ ও আনন্দম্ এই দুইটি বাক্য যোজনা করা হইল। এই পঞ্চবাক্য শুধুমাত্র আর্য বা অনার্যের রহিল না কেবল মাত্র উত্তর বা দক্ষিণ ভারতের আদর্শ হইল না—ইহা সর্বভারতেরই আদর্শ হইল। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নৃত্যকলার আদর্শও সেইহেতু এক ও অভেদ। দুই স্থানের নৃত্যের অন্তর এক; ভিন্ন যাহা কিছু তাহা বাহিরের প্রকাশভঙ্গিতে মাত্র। যাহা হউক আর্যরা শিবকে বাধ্য হইয়া তাহাদের দেবতা বলিয়া স্বীকার করিলেও তাহাদের নৃত্য-

কালিদাসের বর্ণিত নৃত্যভঙ্গী

কলার ক্ষেত্রে কিন্তু নৃত্যের আদি দেবতা বলিয়া স্বীকার করিল না। শিবের স্থানে খাঁটি আর্য দেবতা শ্রীবিষ্ণুকেই স্থান দান করিল। শিবের স্থান হইল দ্বিতীয়। কথক-নৃত্যে সৃষ্টির কাহিনীও তাই এই-রূপঃ—কিছু তখন সৃষ্টি হয় নাই। কারণ সমুদ্রে অনন্ত শয্যায় শ্রীবিষ্ণু শায়িত। লক্ষ্মী পদসেবনরতা। এমন সময় শ্রীবিষ্ণুর কর্ণমূল হইতে মধু ও কৈটভ্ নামক দৈত্যযুগল সৃষ্ট হইয়া মহা অনর্থ সৃষ্টি করিয়া দিল। লক্ষ্মী ভয়ে ভীতা ও সন্ত্রস্তা হইয়া উঠিলেন। তিনি নিদ্রিত বিষ্ণুকে জাগরিত করিয়া দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করিতে সানুনয় অনুরোধ করিলেন। শ্রীবিষ্ণু তখন দৈত্যযুগলকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু করিয়া দিলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পরও জয় পরাজয় নির্ধারিত হইল না। ইহাতে দৈত্যযুগলের ঔদ্ধত্য আরও বাড়িয়া গেল। তাহারা শ্রীবিষ্ণুকে প্রসন্নতা দেখাইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিল। তখন শ্রীবিষ্ণু যাহাতে তাঁহার হস্তে তাহাদের মৃত্যু হয় এইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন। দৈত্যযুগল চতুর্দিকে চাহিয়া অনন্ত জলরাশি দেখিয়া শ্রীবিষ্ণুকে এই বর দিল যে তাহারা তাঁহারই হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে কিন্তু জলে নহে। এই কথা শুনিয়া শ্রীবিষ্ণু তখন তাহাদের জঙ্ঘার উপর স্থাপন করিয়া তাহাদের বিনাশ করিলেন। লক্ষ্মী সমস্তক্ষণই সেই ভয়ংকর যুদ্ধ নিবিষ্টচিত্তে নিরীক্ষণ করিলেন। যেহেতু শুধুই নিরীক্ষণ ও নিবিষ্টমনে নিরীক্ষণ এক নহে সেই হেতু অর্থাৎ নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণ করার ফলে লক্ষ্মী শুধুমাত্র যুদ্ধের প্রচণ্ডতা ও ভয়াবহতাই দেখিলেন না তিনি আরও যাহা দেখিতে পাইলেন তাহা হইতেছে যুদ্ধের অপূর্ব ভঙ্গিসমূহ। তিনি সেই ভঙ্গিসমূহ দেখিলেন ও মুগ্ধ হইলেন। যুদ্ধান্তে তাই লক্ষ্মী সানন্দে সেই সকল ভঙ্গি শিখিবার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু শ্রীবিষ্ণু লক্ষ্মীকে বলিলেন যুদ্ধের এই সকল ভঙ্গি কেবল মাত্র পুরুষদিগের জন্য। তৎপরে লক্ষ্মীর অভিমানক্ষুব্ধা মুখদর্শনে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার মানসে শুধুমাত্র নারীগণের যাহা শোভনীয় সেইরূপ বহু ভঙ্গি সৃষ্টি করিয়া লক্ষ্মীকে তাহা শিক্ষা দিলেন। তৎপরে বিষ্ণুর নিকট হইতে শিব ও লক্ষ্মীর নিকট হইতে পার্বতী এই ভঙ্গি-সমূহ শিক্ষা করেন। এইভাবেই নাকি নৃত্যের উৎপত্তি। ইহা ব্যতীত পুরাণে আরও একটি কাহিনী আছে। কাহিনীটি এইঃ—এক অসুর, (পরে ভস্মাসুর) কৈলাসে কঠোরতম সাধনায় মগ্ন ছিল। কিন্তু এই মহাসাধক অসুর হওয়ায় অন্যান্য দেবতারা তাহাকে সিদ্ধিদানে বিরত থাকিলেও আত্মভোলা ভোলানাথ কিন্তু স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহাকে বর প্রদানের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। গিরিরাজকন্যা পার্বতী সকলই শুনিলেন। তাহার পর কহিলেন, দেব— আপনি এ কার্য হইতে বিরত হউন। শম্ভুনাথ বিস্মিত হইয়া পার্বতীর নিকট

ইহার কারণ জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। সিদ্ধিলাভে একমাত্র সুরকুলই অধিকারী। এই কারণে কোন অসুরকে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে প্রথমে পার্বতী কহিলেন, সাধনার দ্বারা সুরত্ব প্রাপ্ত না হইয়া অসুরকুল যদি সাধনালব্ধ সিদ্ধি দ্বারা শক্তিমান হইয়া উঠে, তাহা হইলে বিশ্বজগতের মহা-অমঙ্গল হইবে। সুতরাং হে দেবাদিদেব, আপনি আপনার সংকল্প ত্যাগ করুন। মহামায়া বহু অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না। স্বয়ম্ভু তাঁহার সংকল্পে অটল রহিলেন। অসুর সমীপে উপস্থিত হইয়া শম্ভু তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সেই অসুর বর প্রার্থনা করিল যে, সে যাহারই মস্তক স্পর্শ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ ভস্ম হইয়া যাইবে। মহাদেব তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "তথাস্তু"। বর প্রাপ্তির পরমুহূর্তে অসুর তাহাকে বলিল যে, শিবমস্তকে হস্ত রাখিয়াই সে প্রথম দেখিবে শিবদত্ত বর সত্যই ফলদায়িনী কিনা। এই বলিয়া অসুর শিবমস্তকে হস্ত স্থাপনে উদ্যত হইল। স্বয়ম্ভু প্রমাদ গণিলেন ও তাহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে আত্মরক্ষার্থ তিনি দ্রুতগতিতে ধাবমান হইলেন। অসুরও তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিল। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল ত্রিভুবনের অধিবাসীরা শিবের এবম্বিধ দশা দর্শনে মহাচঞ্চল হইয়া উঠিল। স্বর্গের দেবতারা শিবরক্ষার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে দেবগুরু বৃহস্পতি বলিলেন, মহেশ্বরকে রক্ষার নিমিত্ত আমাদের বিষ্ণুর শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন। তখন সকলে মিলিয়া বিষ্ণুলোকে যাত্রা করিলেন। শ্রীবিষ্ণু সমস্ত শুনিয়া শিবকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়া দেবগণকে বিদায় দিলেন। বিষ্ণু ধ্যাননিমগ্ন হইয়া শিবরক্ষার একটি কৌশল আবিষ্কার করিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ ততক্ষণে ত্রিভুবন পরিক্রমা শেষ করিয়া বিষ্ণুলোক দ্রুত অতিক্রমে যত্নশীল। এদিকে শ্রীবিষ্ণু শিব পথের যে দিকে দ্রুত ধাবিত হইয়া আসিতেছেন, পথের সেই দিকেই মোহিনী মূর্তি ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পথিমধ্যে

যে স্থানে শ্রীবিষ্ণু মোহিনী মূর্তি ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই স্থান শিব কর্তৃক দ্রুত অতিক্রমণের সময় সেই মোহিনী মূর্তি দর্শনে শিব নিজেই মদন-তাড়িত হইলেন। শ্রীবিষ্ণু দেখিলেন, তাঁহার এই মূর্তি ধারণে বিপরীত ফল হইতেছে: কিন্তু তাঁহার এই কলাবিদ্যাটির সাফল্য দেখিয়া যাহা কথক নৃত্যেরই একটি অঙ্গ, অন্তরে গভীর প্রসন্নতা লাভ করিলেন। তৎপরে তিনি ত্রৈলোক্যনাথকে স্বরূপ দর্শন করাইয়া সমস্ত বলিয়া দিলেন। উপলব্ধি হইবামাত্র শম্ভু সম্মুখে অগ্রসর হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে অসুর অকুস্থলে উপস্থিত হইল ও মোহিনী মূর্তি দর্শনমাত্র তাহাকে বিবাহ করিবার অভিলাষ ব্যক্ত করিল। ত্রিভুবন বিভ্রমকারী সেই মোহিনী তৎক্ষণাৎ তাহার প্রস্তাবে প্রসন্নতা দেখাইল ও বলিল, আমি তোমার প্রার্থনাকে পূরণ করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু আমার একটি সর্ত আছে,—আমি নৃত্যগীতপ্রিয়া ললনা, এই কারণে তুমি যদি নৃত্যের দ্বারা আমাকে মোহিত করিতে পার, তাহা হইলেই তোমার স্পৃহা পূর্ণ হইবে। এই কথা শুনিবামাত্র অসুর "তাহাই হউক" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। শিব দূরের এক বৃক্ষান্তরাল হইতে এই নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন ও মোহিনীটি এই আসুরিক নৃত্যের মধ্যে মধ্যে বহু ভঙ্গি দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে ভঙ্গি দেখাইতে দেখাইতে এমন একটি ভঙ্গি দেখাইলেন, যাহাতে সামান্যতম বিমনা হইলে নিজ হস্ত নিজ মস্তকে স্পর্শ করিয়া যায়। অতঃপর সেই ভঙ্গিতে অসুরকে নৃত্য করিতে অনুরোধ করিল। অসুরও তৎক্ষণাৎ তাহাই শুরু করিয়া দিল ও মদন-প্রভাব ফলে অনবধানতাবশত নিজ হস্ত নিজ মস্তকে স্পর্শ করিয়া ভস্ম হইয়া গেল। এইভাবেই শিব অনধিকারীকে শক্তি প্রদানের ফলভোগ করিয়া শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক রক্ষিত হইলেন। এখন কথা এই যে, শেষোক্ত বিষ্ণু প্রদর্শিত ভঙ্গিটি কথক-নৃত্যের আদি ভঙ্গি বলিয়া কথিত হয়। দেখা যাইতেছে, বিষ্ণু কর্তৃক প্রবর্তিত ভঙ্গিই কথক নৃত্যের ভঙ্গি। এখানেও বৈষ্ণব-প্রভাব লক্ষ্যণীয় এবং যেহেতু বিষ্ণু-প্রদর্শিত ভঙ্গিসমূহই এই নৃত্যের ভঙ্গি, সেইহেতু এই নৃত্যের স্রষ্টাও যে শিব নয়, বিষ্ণু ইহা না বলিলেও চলে। কথক-নৃত্যের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সকলের চেয়ে ভাল প্রমাণ পাওয়া যায় মহাকবি কালিদাসের কাব্যে। মহাকবি লিখিত বেতাল পঞ্চবিংশতি কাব্যের প্রারম্ভেই মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক বত্রিশ সিংহাসন দানের একটি কাহিনী আছে। কাহিনীটি সহজে এই:—একবার স্বর্গ-

কথক নৃত্যের প্রণাম ভঙ্গি

ধামে উর্বশী ও রম্ভার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠা নর্তকী, এই লইয়া বিবাদ দেখা দিল। ইন্দ্রসভায় নৃত্যের আয়োজন হইল; দেবগণ তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন, কিন্তু কেহই উর্বশী ও রম্ভার মধ্যে কাহার নৃত্য উৎকৃষ্ট, তাহা বলিতে পারিলেন না। অবশেষে মর্ত্যধামের শ্রেষ্ঠ নৃপতি, অতুল গুণসম্পন্ন পুরুষ ও সুক্ষ্ম বিচারশীল মহারাজা বিক্রমাদিত্যকে আমন্ত্রণ করা হইল। মহারাজ বিক্রমাদিত্য দেবরাজের ইচ্ছা অনুমোদন করিয়া দেবদূতের সহিত স্বর্গে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর পুনরায় নৃত্যের আয়োজন হইল এবং তদ্দর্শনে বিক্রমাদিত্য উর্বশীকে রম্ভাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা নর্তকী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তখন দেবগণ উর্বশীকে শ্রেষ্ঠ বলিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে বিক্রমাদিত্য বলিলেন,—নৃত্যারম্ভের রীত্যানুযায়ী উর্বশী নৃত্য আরম্ভ করিয়াছিল। এই রীতি সমপদে দণ্ডায়মান হইয়া উভয় হস্ত উভয় বাহুকে লতার ন্যায় বেষ্টন করিয়া থাকিবে ও মুদ্রিত নয়নে ধ্যান হইতে নৃত্য শুরু হইবে। উর্বশী তাহাই করিয়াছে। এই কারণে তাহাকে শ্রেষ্ঠা নর্তকী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছি, ইত্যাদি। এই যে দক্ষিণ বাহুকে বাম হস্ত ও বাম বাহুকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা লতার ন্যায় বেষ্টন এবং মুদ্রিত আঁখি ও সমপাদযুক্ত সমভঙ্গ এই ভঙ্গি হইতে একমাত্র কথক-নৃত্যই শুরু হয়। ভারত-নাট্যমের রীতি অন্যপ্রকার।

বৈষ্ণব-প্রভাব বলিতে আজিকার দিনে আমরা যাহা বুঝি, কালিদাসের কাব্যে এই নৃত্য-বর্ণনায় সেই প্রভাব অবর্তমান। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় আজিকার ও মোগলযুগে এবং মোগলযুগ পূর্বের কথক-নৃত্যে যে কৃষ্ণের প্রভাব দেখিতে পাই, কবি কালিদাসের যুগে কথক-নৃত্যের সে রূপ ছিল না। তাই বলিয়া একথা আমাদের বিস্মৃত হইলেও চলিবে না যে, কৃষ্ণের আবির্ভাবও বৈষ্ণব ধর্মে বহুদিন হইল হইয়াছে। এই কারণেই কথক-নৃত্যে কৃষ্ণের আধিপত্যও বহু-পূর্ব হইতেই আসিয়াছে। এমন কি এক সময় এই নৃত্য কৃষ্ণ-নৃত্য নামেও প্রচলিত ছিল। এখন দেখা দরকার, আর্যরা তাঁহাদের অন্যান্য দেবতা থাকা সত্ত্বেও শ্রীবিষ্ণুকে নৃত্য তথা কলা-বিদ্যার দেবতা করিলেন কেন? আর্যরা তাঁহাকে শুধু যে নৃত্যেরই আদিগুরু বলিয়াছেন তাহাই নহে, তাঁহাকে প্রথম চিত্রশিল্পীও বলিয়াছেন। ইহার প্রমাণ "বিষ্ণুধর্মত্তরম"এ আছে। যাহাই হউক, আদিতে দেখি বিষ্ণুর নাভিকমলে জগৎ-স্রষ্টা ব্রহ্মা সৃষ্ট হইলেন। অর্থাৎ জগৎস্রষ্টাকেও বিষ্ণুই সৃষ্টি করিলেন। যেহেতু জগৎস্রষ্টারই জনক শ্রীবিষ্ণু, সেই হেতু তিনি প্রথম কলাবিদ্। কারণ কলাবিদ্যা ব্যতীত নবসৃষ্টি সম্ভব নহে। দ্বিতীয় বিষ্ণু নিজে পালনকর্তা। সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করিয়াই দায়িত্বমুক্ত। কিন্তু সেই সৃষ্টবস্তুকে রক্ষার দায়িত্ব পালনকর্তার। আর এই দায়িত্ব পালন আরও দুরূহ এবং ইহা রক্ষার জন্য প্রভূত কলার প্রয়োজন। এমন কি এই দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া নব নব কলা সৃষ্টিরও প্রয়োজন হয়। বৈদিক বিষ্ণু এই দায়িত্ব পালন করিতে গিয়াই প্রয়োজনবোধে নানা কলাবিদ্যার (যাহার মধ্যে নৃত্যও একটি) স্রষ্টা হইয়াছেন। তাই শ্রীবিষ্ণু আর্যাবর্তে নৃত্য তথা কলাবিদ্যার আদিগুরু। পূর্বেই আমি বলিয়াছি, উত্তর ভারতে ভাবসাগরের সৃষ্টি হইয়াছে, আর দক্ষিণ ভারতে তাহার তরঙ্গ আঘাত করিয়াছে মাত্র। এই আঘাতের ফলে তথাকার নৃত্য-কাহিনীতে শিবকে প্রধান রাখিয়া কৃষ্ণকেও মানিয়া লইয়াছে। ইহার কাহিনী ভারত-নাট্যমে আছে। অবশ্য ভরতমুনি লিখিত এই কাহিনীটি একটু মনোযোগ দিয়া পড়িলে বহু ত্রুটি ধরা পড়িবে। ভারত-নাট্যমে মর্ত্যে নৃত্য প্রচলনের যে সকল কাহিনী আছে, তাহার মধ্যে একটিতে দেখা যায় যে, 'তন্তু' মুনি কর্তৃক নৃত্যশিক্ষাকালে কৃষ্ণের পৌত্রবধূ, বানরাজ দুহিতা, অনিরুদ্ধের স্ত্রী উষা তথায় উপস্থিত ছিলেন ও পার্বতীর নিকট নৃত্য শিক্ষা করিয়া তিনি উহা প্রথম মর্ত্যধামে দ্বারকা ও সৌরাষ্ট্রে গোপিনীদিগকে শিক্ষা দেন। দ্বারকা কৃষ্ণের স্থান। কৃষ্ণের পৌত্রবধূ দ্বারা মর্ত্যের নৃত্য প্রচলনের কাহিনীর মধ্যে উত্তর ভারতের ভাবধারাকে মানিয়া লইবার একটি স্ব প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অথচ দেখা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই মর্ত্যধামে 'রাস' ইত নৃত্য করিয়াছিলেন। সে নৃত্য অ বৃন্দাবনে হইয়াছিল। আর এই বৃন্দা আর্যাবর্তেই অবস্থিত। কৃষ্ণ ভারত-নাট্যম্ নৃত্য করিয়াছিলেন নির্ভয়ে উত্তর দেওয়া চলে না। এ কৃষ্ণ-নৃত্যের আমরা যে বর্ণনা পা তাহার সহিত কথক-নৃত্যেরই ভাবধার ও নৃত্যধারার সম্বন্ধ দেখিতে পাই ইহা ব্যতীত ভারতীয় নৃত্য দ্বারকায় ও সৌরাষ্ট্রে প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল, ইহার কোন প্রমাণও নাই, যুক্তিও নাই। তারপর যখন দেখিতেছি, মর্ত্যধামে স্বয় শ্রীকৃষ্ণই নৃত্য করিয়াছিলেন, তখন এই কৃষ্ণেরই পৌত্রের স্ত্রী বাণ-রাজ-কন্যা উষা মর্ত্যের প্রথম নৃত্য-প্রবর্তিকা হইতে পারেন কিরূপে? তাই এই কাহিনীটিতে হরিহর মিলনের চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাই না। আর এই মিলন প্রচেষ্টার কারণ আর্যাবর্তের ভাব সাগরের তরঙ্গ দক্ষিণ ভারতের তটভূমির স্পর্শ। এই কাহিনীটিতে আরও একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হইতেছে লাস্য-নৃত্যের প্রথম প্রবর্তিকারূপে খ্যাতা বান-রাজ-দুহিতা উষা। ইনি অসুর-কন্যা এবং তাহার পিতা শিবোপাসক। এই কারণে এই কাহিনী হইতে আমরা ইহাও অনুমান করিতে পারি যে, আর্যাবর্তের নৃত্যের প্রকরণ অনার্যদের নিকট হইতে গৃহীত। আর্যদের দ্বারা কলা-বিদ্যায় বিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের আর একটি কাহিনী বলিলেই আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্তাকারে বলা হইয়া যাইবে। এক সময়ে শ্রীবিষ্ণু গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ইহাতে সিংহাসন হারাইবার ভয়ে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত কামদেবকে অধিপতি করিয়া তাহার সহিত কিছু গন্ধর্ব ও অপ্সরা পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা তাঁহার নিকট গিয়া মন-বিভ্রমকারী নৃত্য-গীত শুরু করিয়া দিল। তখন শ্রীবিষ্ণু তাহাদের অহঙ্কার চূর্ণ করিবার নিমিত্ত একটি সুন্দরী রমণীর চিত্র অঙ্কিত করিলেন। ইহাই নাকি প্রথম চিত্র। অতঃপর তাহার নাসিকায়

ফুৎকার দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই সুন্দরী রমণী চলমান হইলেন। ইহার পর তাহাকে নৃত্য-গীতে শিক্ষিত করা হইল ও তিনি স্বর্গের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী ও নর্তকী বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। ইহারই নাম নর্তকী-শ্রেষ্ঠা উর্বশী। এই কাহিনীটিতে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়াই বিষ্ণুকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে ও তাঁহার সৃষ্ট নর্তকী এবং নৃত্য-গীতও অপরাপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ, তাহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

পূর্ব-প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম কথক-নৃত্য অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখন বলিতেছি, এই নৃত্যের আদি স্রষ্টা শিব নহে, বিষ্ণু। তাহা হইলে প্রশ্ন এই বিষ্ণু-প্রবর্তিত এই নৃত্য বৈষ্ণব না হইয়া অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় কিরূপে? এখন ইহার বিচার হওয়া প্রয়োজন। ভারতবর্ষে অদ্বৈতবাদের ধারা লক্ষ্য করিলে আমরা তিনটি ধারা দেখিতে পাই। এক অদ্বৈতবাদ, দুই—দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, তিন—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। প্রথম ধারাটি বলে—একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর সকলই মায়া। দ্বিতীয়টি বলে—জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম তিনই সত্য। কিন্তু প্রথম দুইটি ব্রহ্মে কোনদিনই লীন হইবে না। তৃতীয়টি বলে—জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম তিনই সত্য এবং প্রথম দুইটি প্রতিনিয়তই ব্রহ্মে লীন হইতেছে ও তথা হইতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতেছে। প্রথম ধারাটি শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের পর, ভারত-ভূমিতে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধারাটিতে দেখিতে পাই সন্ন্যাস অর্থাৎ বৈরাগ্যই জীবনের মুখ্য কথা। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় যে চতুরাশ্রমের কথা বলা হইয়াছে এই মতানুযায়ী তাহাতে প্রথম তিনটির কোন স্থানই নাই। কাজেই জীবনের সব কিছুই যখন পরিত্যক্ত হইতেছে ব্রহ্ম ব্যতীত জীবনকে যখন অস্বীকার করা হইতেছে—সৃষ্টি নয়, লয়ই যাহার মুখ্য কথা, অদ্বৈতবাদের সেই ধারাটির উপর কোন কলাবিদ্যার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। সুতরাং এই ধারাটির উপর কথক নৃত্য প্রতিষ্ঠিত নয়। দ্বিতীয় ধারাটিকে বিশ্লেষণ করিলে ঠিক অদ্বৈতবাদ বলা যায় কিনা সন্দেহ। কেননা ব্রহ্মেই অর্থাৎ একেই জীব ও জগৎ লীন না হইতে পারে, তবে তাহাকে অদ্বৈতবাদ বলা যায় কিরূপে। সুতরাং ইহার উপরেও কতক নৃত্য প্রতিষ্ঠিত নয়। তাহা হইলে বাকি রহিল বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। ইহাতে দেখিতেছি জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম তিনকেই স্বীকার করা হইতেছে। এবং প্রথম দুইটি ব্রহ্ম অর্থাৎ একে যে প্রতিনিয়ত লীন হইতেছে তাহাও স্বীকার করা হইতেছে। এই মতানুযায়ী তাই চতুরাশ্রম ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস যাহা বৈদিক সভ্যতার মূলে বিকাশ তাহা পালনের অবকাশ রহিয়াছে। কাজেই কথক নৃত্য অদ্বৈতবাদের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ধারার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধারার শেষ ভাষ্যকার রামানুজ বোধনাচার্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বোধনাচার্য শঙ্করাচার্যের চেয়ে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ভাষ্যকার। শঙ্করাচার্য ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "অনন্য" অর্থাৎ যাহা অন্য নহে। আর এই ধারার ভাষ্যকারেরা বলিয়াছেন 'অবিশেষ' অর্থাৎ যাহা বিশেষ নহে। উভয়ের ভাবার্থ একই। সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদে কোন ভেদ নাই। ভেদ যাহা কিছু তাহা ভাষ্য বা টীকায় মাত্র। এই কারণে বলিয়াছি কথক নৃত্য অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখন বিষ্ণুর সহিত অদ্বৈতবাদের সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য শঙ্করাচার্য হইতে প্রাচীনতম ভাষ্যকার বিষ্ণু সম্বন্ধে কি বলেন দেখা যাউক। তাহাতেই বিষ্ণুর সহিত অদ্বৈতবাদের কি সম্বন্ধ জানা যাইবে ও এই নৃত্যের আদি স্রষ্টা বিষ্ণু হইয়াও যে অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা প্রমাণিত হইবে। অদ্বৈতবাদের একটি প্রাচীনতম ভাষ্য যাহা অধুনা অপ্রচলিত হইতে চলিয়াছে তাহার নাম আনন্দ ভাষ্য। এখন শঙ্করাচার্যের ভাষাই বহুল প্রচলিত। কিন্তু এই ভাষ্য শঙ্করাচার্যের পূর্ববর্তী। এই ভাষ্যে আছে :—

> "বিষ্ণুনামা ভবেৎ যস্তু বেদান্তেষু
> চ গীয়তে"

অর্থাৎ যাঁহার নাম বিষ্ণু তাঁহারই কথা সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রে গীত হইয়াছে। ইহাতে বিষ্ণুর সহিত বেদান্তের সম্বন্ধ নিরূপিত হইল এবং বিষ্ণু কথক নৃত্যের স্রষ্টা হইয়াও এই নৃত্য বেদান্ত বা অদ্বৈতবাদের উপর কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল বুঝা গেল।

ভারতের শিক্ষা গ্রহণের প্রণালী নবমেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ। কিন্তু সে দিন গত হইয়াছে। আজ আমরা কেবলমাত্র কাল অক্ষরের সাহায্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছি। এই কারণে আজ আমাদের রুচি বিকৃত। রুচির স্থানে 'ফ্যাসান' বা বাহ্যিক আড়ম্বর স্থান লাভ করিয়াছে এবং তাহা আমাদের চক্ষুকে পীড়া দিতেছে না। আজ আমাদের দেহ ভারতীয়, পোশাক পাশ্চাত্যের আর মন কোথায় কে জানে। তাই আজ ভারতীয় নৃত্যের নামে ইউরোপীয় প্রথার দেহ প্রদর্শন করিতেছি। প্রকরণ দৌর্বল্যকে উজ্জ্বল পোশাক ও লাল নীল বিজলীর সাহায্যে চাপা দিতেছি। এক কথায় ভারতীয় নৃত্যের নামে অনাচার হইতেছে। সর্বশেষে আমার বক্তব্য, এই প্রবন্ধ পড়িয়া বিশেষ কিছু জ্ঞান লাভ হইবে না। এই নৃত্য একবার নয় বহুবার দর্শন করিতে করিতে ইহার বিশ্লেষণ শুনিতে হইবে। তবেই প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইবে। যেমন ভাল গান শুনিবার জন্য কর্ণকে সূক্ষ্ম শ্রবণক্ষম করিতে হয় ঠিক সেইরূপ ভাল বস্তু দর্শনের নিমিত্ত চক্ষুকেও সূক্ষ্ম দর্শনক্ষম করিতে হয়। ইহার অভাবেই আমরা আজ পর পর কতকগুলি ভঙ্গি দেখিয়া তাহাকে নৃত্য ভাবিতেছি। এ সম্পর্কে কবিগুরুর সাবধানবাণী সর্বদা স্মরণ করা প্রয়োজন :—

> শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ,

ব্যর্থ

অনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বেদনা জড়িত ঘুম ভেঙে যায় — প্রভাত বেলা
চেয়ে চেয়ে দেখি বুক ভরা এই — অশ্রু মেলা;
ঝড় হয়ে গেছে, অসহায় পাখী
কুলায় ফেরেনি উড়িছে একাকী
—নভঃস্থলে
অবশ পাখার ঝাপটানি শুনি — বুকের তলে।

উষর মরুর শূন্যতা নিয়ে — শয্যা কাঁদে
কোনখানে তার আশ্বাস নেই — আপনা বাঁধে
অবুঝ প্রাণের মূক বেদনার
যত কথা আজ হল হাহাকার
—অশ্রুকণা,
প্রতিমা গিয়েছে পড়ে আছে আজ — আলিম্পনা।

কি জানি কোথায় ভুল হয়ে গেছে — বুঝিনে আমি
খুঁজে খুঁজে ফিরি হারান মানিক — দিবস যামি;
অলস প্রহর কোথা কেটে যায়
জীবনেরে ঘিরি সন্ধ্যা ঘনায়
—নিবিড়তমা
পাইনি যা কিছু আমি করি তার — হিসাব জমা।

এমন করিয়া কত দিন যাবে — কে জানে হায়
শুধু হাসি দিয়ে চির অশ্রুর — মেটাব দায়
ভিতরে বাহিরে রবে নাকো মিল
রূপে রসে ভরা আমার নিখিল
—রিক্ত রবে
তখনও যখন শেষের শঙ্খ — বাজিবে নভে।

মারুর শিলঙ্

অরুণ বাগচী

পাইনবন পাইনবন, মেঘের ডাকাডাকি...
পাইনবন পাইনবন, কেউ কি দিল ফাঁকি?

মন সে যখন বোবা সাগর কথার কোনো ঢেউ
তুলছে না আর কেউ,
তখন তুমি এসো পাইনবনে।
ঝর্না যেথায় ধীরে ধীরে বইছে আপনমনে;
নরম ঘাসে মুখ ডুবিয়ে সাদা ফুলের দল
বাতাস ছুঁয়ে করতেছে টলমল।
দূর থেকে কার পত্র এলো তারি,
দখল নিয়ে পাহাড়মেঘে নিত্য কাড়াকাড়ি;
ছিনিয়ে নিয়ে সূর্যতারা ছড়িয়ে দিল তাকে
কখন এক ফাঁকে।
কোলের পরে দুহাত করে জড়ো,
আকাশে সেই মস্ত চিঠি প'ড়ো।
মনে যখন অনেক কথা তখন তুমি এসো পাইনবনে;
একটি দুটি পাখির মৃদু পাখার কম্পনে
আকাশ যখন জড়িয়ে আসে ঘুমের পল্লবে,
আঁচল তোমার ঘাসের পরে মেলে
গানের মত গোপন ব্যথা বুকভরা সেই কথার পরে রেখো:
তোমার ভাষায় তোমার মনের মস্ত চিঠি লিখো।

পাইনবন পাইনবন, অবুঝ ডাকাডাকি...
পাইনবন পাইনবন, কেউ দেবে না ফাঁকি!
পাইনবনে সোনার মেয়ে মেঘের মন পেলে?

উত্তরণ

মাণিক মুখোপাধ্যায়

সমুদ্রের কাছে চেয়ে সঙ্গীতের মন,
বারবার ফিরেছে সে,
জানে না কখন;
পর্বতের কাছে চেয়ে বৈজয়ন্তী আশা,
ব্যর্থতায় ভরেছে সে,
জানে না কখন;
মৃত্তিকার কাছে চেয়ে অনাঘ্রাত প্রেম—
ফিরে এলো, ফিরেছে সে,
জেনেছে এখন!...
আত্মার সামীপ্যে তাই
খোঁজে উত্তরণ!...
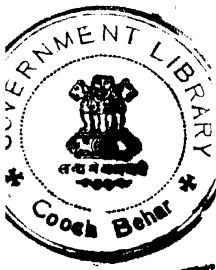
উপন্যাস

কৃশানু — শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৬ টাকা।

সরোজকুমার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তাঁহার লিখিত সদ্য-প্রকাশিত 'কৃশানু' পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। সরোজবাবুর দৃষ্টি গভীর। তিনি মনের তলে ডুবিয়া রূপ ফুটাইবার কৌশল জানেন। তাঁহার লেখায় ঘটনার চেয়ে অনুভাবনা বেশী। আলোচ্য উপন্যাসখানিতে ইহার কিছু ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। বইখানিতে ঘটনার প্রতিবেশ বেশ ব্যাপক। আগষ্ট বিপ্লব হইতে আরম্ভ করিয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, তারপর ভারতের স্বাধীনতা লাভ, কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতিষ্ঠা, এই বিস্তৃত রাজনীতিক পটভূমিকা অবলম্বন করিয়া তিন খণ্ডে ৩২টি অধ্যায়ে উপন্যাসখানির আখ্যানভাগ বিভক্ত করা হইয়াছে। পাকা হাতের রচনাশৈলীর সমৃদ্ধি, চরিত্র নৈপুণ্য, সর্বোপরি সরোজবাবুর লেখায় যাহা বৈশিষ্ট্য—সংলাপের সেই সৌষ্ঠব, বিভিন্ন ঘটনার বৈচিত্র্য আগ্রহ উদ্দীপ্ত করিয়া শেষ পর্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়।

রাজনীতিকে উপন্যাসখানির আঙ্গিকস্বরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রথমেই শুভেন্দুর তরুণী পত্নী শ্রীর চরিত্রটি চোখে পড়ে। শ্রী অসহযোগ আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্টা। ভুজঙ্গ রাজনীতি ক্ষেত্রে তাহার গুরু। শ্রীর স্বামী শুভেন্দু কল্পনা-বিলাসী। সে লেখাপড়া চর্চার ভিতর ডুবিয়া থাকে। শুভেন্দু শ্রীর আদর্শের মর্যাদা বুঝে। তাহার কোন কাজে সে আপত্তি করিবার কিছু দেখে না। শ্রী ভুজঙ্গের সঙ্গে আগষ্ট বিপ্লবে যোগ দিয়া আত্মগোপন করে। তাহারই সঙ্গে একদা বোম্বাইতে যায়। কলিকাতা হইতে পলাইয়া বোম্বাই যাত্রার পূর্বে ভুজঙ্গের সঙ্গে তাহার পূর্ব বন্ধু নৃপেনের সাক্ষাৎ ঘটে এবং সেই সূত্রে নৃপেনের স্ত্রী ব্রততীর সঙ্গে তাহার পরিচয় হয়। নৃপেন যুদ্ধের মাল সরবরাহ করে, সে কণ্ট্রাক্টর। সে এইভাবে অন্যায় অর্জিত অর্থে পরিস্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। সে মাতাল আর স্ফূর্তিবাজ। ব্রততী ভুজঙ্গের আদর্শে আকৃষ্ট হয়। ভুজঙ্গ এবং শ্রীকে সে বোম্বাইতে টাকা পাঠাইয়া সাহায্য করে।
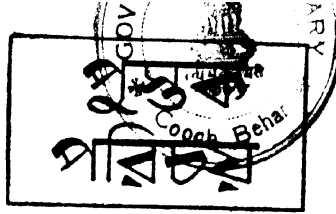
ইহার পর স্বাধীনতার যুগ। টাকার জোরে নৃপেন কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হয় এবং শ্রী হয় তাহার সেক্রেটারী। ক্রমে ইহাদের উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে থাকে। শ্রী নৃপেনের ভালবাসায় পড়ে। নৃপেনের চেষ্টায় শ্রী উপমন্ত্রী হয়। এদিকে ব্রততীর সঙ্গে নৃপেনের বিচ্ছেদের ভাব সুস্পষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। ব্রততী ভুজঙ্গের মধ্যস্থতায় শুভেন্দুর সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিল। সে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত শুভেন্দুর সেবা ব্রত গ্রহণ করে। শ্রী নৃপেনের সঙ্গে সেচ পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এরোপ্লেনে ইউরোপ যাত্রা করে। ভুজঙ্গকে মন্ত্রিসভায় লইবার জন্য প্রলুব্ধ করা হইয়াছিল; কিন্তু সে সেই প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া কাপাসডাঙ্গাবাসীদের সেবার জন্য গ্রামে যাত্রা করে। শুভেন্দু তখন হাসপাতালে, ব্রততী হৃদ্‌রোগে পীড়িতা। গ্রামবাসীদের সেবাব্রত লইয়া ভুজঙ্গের বিদায় গ্রহণের সঙ্গেই উপন্যাসখানির পরিসমাপ্তি।

উপন্যাসখানির বক্তব্য প্রধানত রাজনীতিক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহাও অনেকটা বাহ্য। স্বাধীনতা লাভ করিবার পর কংগ্রেস কর্মীদের আদর্শ হইতে বিচ্যুতি, মান, যশ প্রতিষ্ঠা, মন্ত্রিত্বের আকর্ষণ এবং কংগ্রেস রাজনীতিতে পুঁজিবাদীদের প্রভাব; এইভাবে জনগণের অন্তরের সম্পর্ক হইতে সেই রাজনীতির ব্যবধান বৃদ্ধি, এই সব কথা সরোজবাবু খুব খোলাখুলিই বলিয়াছেন। তাঁহার উক্তিতে ঝাঁজ আছে, তীব্রতাও রহিয়াছে। কিন্তু সরোজবাবু এইভাবে কম্যুনিস্ট মতবাদের যে সমর্থন করিয়াছেন, একথা বলা যায় না। তিনি অনেকটা ভাবাদর্শবাদী। মানুষের জীবন-সাধনায় শুধু বাস্তব বিচারই বড় নয়, স্বপ্নেরও সেখানে স্থান আছে, উপন্যাসখানির বিভিন্ন চরিত্রের বিন্যাসভঙ্গীতে এই তাৎপর্যই তিনি পরিস্ফুট করিয়াছেন। কর্মের মূলে তিনি নৈষ্কর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন; অর্থাৎ কর্মের মূলে প্রীতি এবং প্রেম, অন্য কথায় ভালবাসার ভাবটি বিগাঢ় থাকা প্রয়োজন এবং সেই বিগাঢ়তার পথেই কর্মীর জীবনের সার্থকতা, নহিলে প্রতিষ্ঠা নাই পরন্তু আছে বঞ্চনা। তেমন কর্মের মোহ নৈতিক ভিত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলে। সেই পথে জাতি এবং সমাজের বিড়ম্বনাই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে। এই সত্যের জীবন্ত চিত্র সরোজবাবু সূক্ষ্ম তুলিকায় আঁকিয়া দেশবাসীর কাছে ধরিয়াছেন। শুভেন্দু, ভুজঙ্গ এবং ব্রততীর চরিত্রের ভিতর দিয়া, কর্মের নৈষ্কর্ম স্বরূপের প্রভাব বা বৃহতের প্রেরণায় আত্মনিবেদনের অনপেক্ষ আস্পৃহার আঁচ আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে। আমরা ভিতরে আগুনের ছোঁয়া পাই। নিজেকে জ্বালাইয়া দেওয়া, পোড়াইয়া দেওয়াতেই সেখানে নিজেকে একান্ত সত্তায় পাওয়া। সরোজকুমার এই অগ্নিরই আবাহন করিয়াছেন। ব্রততী, সেই আগুনেরই জ্যোতিষ্মতী শিখা, ভুজঙ্গের চরিত্রে সেই আগুনের শুচিশুদ্ধ জ্বালার খেলা। প্রত্যুত, বড় বড় কর্মের ফর্দ শুধু বাড়াইয়া গেলেই দেশ বা জাতি বড় হয় না। পক্ষান্তরে দেশের উপর সেগুলি ভারস্বরূপেই চাপে। অহংকৃত, অনাত্ম সেই আড়ম্বর দেশের প্রাণকে পিষ্ট করে, ক্লিষ্ট করে। কোথায় কর্মের মূলে আগুন— দীর্ঘ পরাধীনতার ফলে যে সব আবর্জনা পুঞ্জীভূত হইয়াছে, সেই সব দগ্ধ করে, কোথায় সেই কৃশানু? শুভেন্দু রুগ্ন শয্যায় শায়িত

অবস্থায় সহোদরাস্বরূপে ব্রততীকে একটি মহাদেবের মূর্তি তাহার শেষ দান-স্বরূপে দিবে, এই ইচ্ছা জানায়। সে তাহাকে এই মূর্তি পূজা করিতে বলে। পাথরের মহাদেব। স্ফটিকের চোখ, ললাটের বাঁকা চাঁদ আর হাতের ত্রিশূল সোনার। সে ব্রততীকে বলিয়াছিল, 'পূজো করবি যতক্ষণ না ওই চোখ দিয়ে ধক্ ধক্ ক'রে আগুন বেরোয়।' এই পূজা কবে সম্পন্ন হইবে? শঙ্করের ললাট-নেত্র হইতে বিচ্ছুরিত হইবে স্বার্থকেন্দ্রিক দুর্নীতির সকল অনাচার দগ্ধকারী কৃশানু?

ছাপা, বাঁধাই, কাগজ সুন্দর। প্রচ্ছদপট সুদৃশ্য। ২৮৬।৫৪

সহজ মানুষ—পশুপতি ভট্টাচার্য। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। সাড়ে চার টাকা।

'সহজ মানুষের' দু'টি কথায় ছোট্ট একটু ভূমিকা আছে। লেখক জানিয়েছেন, তাঁর মূল চরিত্র আর ঘটনাগুলি বাস্তব থেকে নেওয়া। এতে কল্পনার কারিকুরি সামান্য। অবশ্য কোন কাহিনী কল্পিত কি বাস্তব পাঠকের কাছে সেটা বড় কথা নয়, রস গ্রহণই তাঁর আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু সহজ মানুষ পড়ে স্বভাবতই এর ভূমিকার সঙ্গে কাহিনীকে আর একবার মিলিয়ে নিতে ইচ্ছে হয় এবং এ ধারনা বদ্ধমূল হয় যে, ভূমিকার সহজ স্বীকৃতিটুকুর মধ্যে লেখকের অন্য কোন উদ্দেশ্য লুকিয়ে নেই। একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে যৌবন উন্মেষের সংগে সংগে কেমন করে নিষ্কাম দেহাতীত প্রেমের জন্য আকুল হয়ে উঠল, নানা সংশয় সন্দেহের মধ্য দিয়ে কেমন করে সমস্ত সত্তায় এক পরম উপলব্ধির স্বাদ পেল, কি করে সেই দুর্লভ অনুভূতিকে স্বামীর মধ্যে সংক্রমিত করে তুলল, অনায়াস অকৃত্রিম ভঙ্গির মাধ্যমে লেখক সেই সত্যটিকে পাঠকের কাছে বিবৃত করেছেন। তাঁর কাহিনী অসাধারণ হয়েও অলৌকিক নয়, অবাস্তব নয়। ইলা, রমা, অশোক, বাউল ঠাকুর এই মানুষগুলি শুধু সহজই নয়, সত্যও। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগতের অন্তরালে অতীন্দ্রিয় জগতের ক্রিয়াকলাপে যাঁরা বিশ্বাসী, সে জগতের নিঃশব্দ বার্তা যাঁদের মনে এসে পৌঁছয়, ক্ষণিকের জন্যেও মনকে চকিত করে তোলে 'সহজ মানুষ'-এর সহজ সত্যের গুণেই তাঁদের ভাল লাগবে। বইটির প্রচ্ছদব্যঞ্জনার সংগে কাহিনীর আশ্চর্য সংগতি লক্ষ্য করা গেল। ২৬৫।৫৪

অনুবাদ সাহিত্য

রেবেকা : দাফ্‌ণ দ্যুমরিয়র : অনুবাদ—শিউলি মজুমদার : সাহিত্যায়ন : ২৩ডি, কুমারটুলি স্ট্রীট, কলিকাতা—৫ : পাঁচ টাকা॥

এক নম্রহৃদয় সংসারানভিজ্ঞা তরুণী আর এক নিঃসংগ তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতিতাড়িত মধ্যবয়সী পুরুষ। দুজনের মাঝখানে আছে নায়কের মৃত স্ত্রী রেবেকার স্মৃতি। ম্যান্ডারলের (নায়ক ম্যাক্সিমের পৈত্রিক আবাস) সর্বত্র ছড়িয়ে আছে রেবেকার ব্যক্তিত্বের ছাপ। মৃত্যুর পরেও তা একবিন্দু ম্লান হয়নি। সাধারণের কাছে সুন্দরী রেবেকার পরিচয় সহৃদয় গৃহকর্ত্রী হিসেবে। কিন্তু সুনিপুণা অভিনেত্রীর সতীত্বের পরিচয় জানে তাঁর স্বামী ম্যাক্সিম। আর সেই জন্যেই রেবেকার স্মৃতি তাঁর কাছে এক ঘৃণ্য দুঃস্বপ্নের মত। রেবেকার নামও তাই তাঁর কাছে অসহ্য। অথচ ম্যাক্সিমের মনোভাবকে সবাই ভুল করে রেবেকার প্রতি ভালোবাসা বলে। এমন কি তাঁর নতুন স্ত্রীও। ম্যাক্সিমের নতুন স্ত্রীর (তাঁর জবানীতেই গল্প) ওপর শুরু হলো রেবেকার স্মৃতির উৎপীড়ন। রেবেকার আকস্মিক মৃত্যু যে হত্যা আর ম্যাক্সিমই সেই হত্যাকারী, এই সত্য উদ্‌ঘাটিত হবার সংগে সঙ্গেই ম্যাক্সিম আর তাঁর নতুন স্ত্রী মৃতের ব্যবধান অতিক্রম করে সত্যের আলোকে পরস্পরের কাছে ফিরে এলো।

দ্যুমরিয়ার-এর এই রহস্যময় প্রেমের কাহিনীটি গল্প বলার চমৎকারিত্বে অনুপম। এ উপন্যাস বহু পঠিত এবং বহু প্রশংসিত। অনুবাদে লেখিকাও গল্পের আমেজটি অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। কয়েক জায়গায় শব্দনির্বাচন শ্রুতিকটু। 'ফুলেরা' অথবা 'ডেইজিরা' ইত্যাকার বহুবচনান্তক শব্দ শুনতে কেমন ভালো লাগে না। লেখিকার হাতে বাংলা অনুবাদ-সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে, এমন আশা পোষণ করবার সংগত কারণ আছে। ২০৪।৫৪

কবিতা

ফরমান—নচিকেতা ভরদ্বাজ। প্রকাশক—সরোজ মিত্র, ৭।২ চন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—২৫। দাম—দু' টাকা।

শতাধিক পৃষ্ঠার কবিতা-পুস্তক। শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের কাছ থেকে যে ভূমিকা-পত্র নেওয়া হয়েছে সেটা প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এই রোগার্ত কবির প্রতি সহজেই মন আর্দ্র হয়ে ওঠে। তবে যিনি অধ্যবসায় সহকারে বইখানি শেষ করবেন, তিনি যদি সত্যই কাব্য-রসিক হন, তবে একথা মনে না হয়েই পারে না যে, এই কবির কবিতা-লেখার হাত, কান ও মন এখনো ঠিকমতো দুরস্ত হয়নি। এমন কি দু' একটি স্মরণযোগ্য পংক্তিও এতগুলো পৃষ্ঠার মধ্যে তিনি দিতে পারেন নি। এ রকম অনাত্মস্থ ও অপ্রস্তুত অবস্থায় নিছক আত্ম-প্রকাশের তাড়নায় তিনি ছাপাখানার [illegible] হয়ে ভালো করেন নি—সম্ভবত সুপরামর্শ পাননি। নিজের কথা নিজের মতো করে বলা দূরের কথা, অন্তত চলনসই রকম ভালো করে বলার ক্ষমতাটাও তিনি এখনো আয়ত্ত করতে পারেন নি। তবে কোনো কবিতার মধ্যেই যে কিছু নেই, এমন চরম হতাশার কথা নিশ্চয়ই বলবো না। স্থানে স্থানে প্রতিশ্রুতির অতি-স্পষ্ট স্বাক্ষর না হোক, ইঙ্গিতটুকুও আছে যাতে মনে হয়, এঁর পরের বইখানা ভালো হতে পারে। কারণ এঁর কবি-প্রাণ আছে এবং প্রাণে কথাও আছে—নেই কেবল যথাযোগ্য অনুশীলন। সেই সংগে উচ্ছ্বাসের সংযমও চাই—আবেগের রশ্মি দৃঢ় হাতে টেনে রাখাও দরকার। ভাষায় চাই কারুকার্য, বক্তব্যে চাই প্রসাধন-পারিপাট্য। এগুলোই কবিকৃতির অপরিহার্য অঙ্গ। এ সব ব্যাপারে কবিকে সর্বদা সচেতন ও সদাজাগ্রত লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ জানাই। যেখানে তিনি মেকি বৈদগ্ধ্যের অভিনয় করতে গেছেন, সেখানে

তিনি শোচনীয় ব্যর্থতার দৃষ্টান্তস্থল হয়েছেন--একথাও অনুল্লিখিত রেখে পারে না। আশা করছি, এই কবি পরে এ সব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠবেন এবং কামনা করি, তিনি রোগমুক্ত হোন, কিন্তু সেই সংগে এও তো ভুলতে পারি না যে, সত্য নির্মম ও কঠোর; সহানুভূতির উদ্রেক করিয়ে সে নিষ্ঠুরের মন ভোলানো যায় না। সেইজন্যই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতেই হয় যে, নীহারবাবুর হাড়পত্র এই কাঁচা হাতের কবিতাগুলোকে উদ্ধার করতে পারেনি। বাঁধাই ভালো, প্রচ্ছদও মন্দ না, মুদ্রণ-প্রমাদ প্রচুর। ২৪২।৫৪

ছোট গল্প

একালের কাহিনী : রণজিৎকুমার সেন : ঈগল পাবলিশিং কোং লিমিটেড : ১১-বি, চৌরংগী টেরাস, কলিকাতা—২০ : দুই টাকা॥

নিম্নবিত্ত আর বিড়ম্বিত মধ্যবিত্ত এরাই একালের কাহিনীর অধিকাংশ গল্পের উপজীব্য। যাদের কথা লিখেছেন তাঁদের সংগে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন শ্রীযুক্ত সেন তাঁর গল্পে। তিনি যাঁদের চেনেন, তাঁদের সংগে পরিচয়ের সেতুবন্ধন করেছেন পাঠক-সাধারণের সংগে একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও ছোটগল্প হিসেবে সবগুলি কাহিনী যে উত্তীর্ণ হয়নি, তার কারণ অনেকাংশে পরিমিতি বোধ এবং অতিকথন। কাহিনীর শেষে লেখকের নিজের মন্তব্য যে প্রায় ক্ষেত্রেই রসহন্তারক হয়, এতদিন লিখে এ সত্যটুকু লেখকের অজ্ঞাত থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

বিবিধ

লঘু লিপিকা : সুবোধকুমার চৌধুরী; প্রকাশক—স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশিং সিন্ডিকেট, ১—১বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য—৬।

আলোচ্য পুস্তকটি বাংলা শর্টহ্যান্ড বিষয়ক। ইংরাজী পিটম্যান পদ্ধতির সংগে সামঞ্জস্য বিধান করে রচিত হওয়ায় সহজবোধ্য হয়েছে। সভাসমিতিতে নানারকম আলোচনা ও বক্তৃতা ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করার জন্য সংকেত লিপির আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। বাংলা সংকেত লিপি শিক্ষার্থীদের উক্ত বিষয় আয়ত্ত করতে বইখানি বিশেষ সাহায্যে আসবে। ১৮১।৫৪

প্রাপ্তি-স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

খেলাধুলার জ্ঞানের কথা—শ্রীখেলোয়াড়।
শ্রীমদ্ভাগবতম্ (শতশ্লোকী)—শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী।
দ্রৌপদীর অপমানে—বররুচি।
স্বপ্নজাগর—অনিলেন্দু চক্রবর্তী।
শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন—অমিয় মজুমদার।
আগুন—শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।
বাস্তব ও অবাস্তব — শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
Begining of Freedom **Movement in Modern India—Bipin** Chandra Pal.
নব পদ্ধতিতে সেতার শিক্ষা—১ম ভাগ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
কথায় কথায়—রূপদর্শী।
স্বাধীনচেতা বাগ্মী মদনলাল মল্লিকের জীবন-কথা—শ্রীরাসবিহারী মল্লিক।
নূতন অতিথি—শ্রীস্বপনকুমার।
পৃথিবী থেকে দূরে—শ্রীস্বপনকুমার।
অনির্বাণ—রামপদ মুখোপাধ্যায়।

আলোচনা

রস-রচনা

মহাশয়,

গত ১১ই আষাঢ়ের 'দেশে' শ্রীদিলীপকুমার সান্যালের 'রস-রচনা' প্রবন্ধটি পড়িলাম। বর্তমানে রস-রচনা কথাটি কৌতুক-রচনা অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লেখক রসোত্তীর্ণ রচনা অর্থে রস-রচনা কথাটিকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তাঁহার মতে 'রসই চরম কথা। বিরস কাব্যই ব্যর্থ কাব্য। রচনা সার্থক হইতে হইলে তাহাকে রসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইবে। সুতরাং রস-রচনা একেবারেই সোনার পাথর-বাটি।' রস কথাটিকে যদি কাব্যরস অর্থে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে লেখকের বক্তব্য যুক্তিযুক্ত। কিন্তু প্রচলিত অর্থে রস-রচনা বলিতে যে কোন কাব্য রসসম্পৃক্ত রচনাকে বুঝায় না—কেবলমাত্র কৌতুকপূর্ণ রচনাকেই বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং রস রচনা কথাটি প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করিলে লেখকের যুক্তি গ্রহণীয় নয়।

প্রবন্ধটির দ্বিতীয়ার্ধে লেখক তাঁহার বক্তব্যকে অস্পষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। সাহিত্যে ব্যক্তিত্ব বলিতে কি বুঝায় লেখক তাহার কোন সম্যক ব্যাখ্যা দেন নাই। লেখক কি Super ego-র কথা বলিতেছেন? তিনি যে ব্যক্তিত্বের কথা বলুন না কেন, তাঁহার '......সাহিত্যে ব্যক্তিত্ব বলিতে যাহা বুঝি, তাহার সহিত জৈব ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধ পরোক্ষ' এই মত গ্রহণীয় নয়। শিল্পী-ব্যক্তিত্বের সহিত প্রত্যক্ষ-ব্যক্তিত্বের পার্থক্য থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধ পরোক্ষ নয়, প্রত্যক্ষ। আর যদি কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে উহা পরোক্ষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে দ্বৈতব্যক্তিত্বের (Double Personality) নিদর্শন। শিল্পী মাত্রকেই যে দ্বৈত-ব্যক্তিত্বের অধিকারী হইতে হইবে, এ মত সম্পূর্ণ অবাস্তব। আমাদের জীবনের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত নয় যে শিল্প, তাহাকে লইয়া আমরা কি করিব? জীবন ও জগৎ শিল্পীর মনে যে অনুভূতি জাগাইয়া তোলে তাহার অভিব্যক্তিই তো আর্ট। আর্টশিল্পী ব্যক্তিত্বের স্বপ্রকাশ--শ্রী সান্যালও একথা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি মনে করেন 'মানস-অভিজ্ঞতার নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশই আর্ট'। শিল্পীর ব্যক্তিত্বের পরিপ্রেক্ষী ব্যতীত শিল্প-বিচার সম্ভব নয়। যে প্রকাশ নৈর্ব্যক্তিক তাহা কখনও আর্টের পর্যায়ে পড়িতে পারে না। শিল্পীর জীবন ও জগৎবোধই আর্টের উপজীব্য। শ্রী সান্যাল বলেন, 'বলার নূতন কথা নাই, বলিবার নূতন ঢং নাই; অথচ কি আগ্রহে একই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াই শিল্পীর তৃপ্তি।' অর্থাৎ লেখকের মত শিল্পের বিষয় (Theme) এক, রচনাশৈলী (Style) বিভিন্ন। শ্রী সান্যালই বলেন, আর্ট শিল্পীর ব্যক্তিত্বেরই অভিব্যক্তি। বিভিন্ন শিল্পীর ব্যক্তিত্ব নিশ্চয়ই বিভিন্ন। তাহা হইলে বিভিন্ন শিল্পীর শিল্পবিষয় কখনই এক হইতে পারে না। শিল্পীরা কখনই একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করিয়া তৃপ্ত নন। শিল্পী-ব্যক্তিত্ব স্বীকার করিলে শিল্পবিষয়েরও বিভিন্নতা স্বীকার করিতে হইবে। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীঅনিমেষ রায়,
বরানগর।

অতিরঞ্জন

শ্রীত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনরকম অতিরঞ্জন না করেও একথা বলা চলে 'অতিরঞ্জন' মস্ত বড় একটা আর্ট। দৈনন্দিন জীবনে সরসতা ও মাধুর্ষ ফুটিয়ে তুলতে গেলে অতিরঞ্জনকে অস্বীকার করা যায় না। মানুষের সমস্ত জীবনটাতেই অতিরঞ্জন বা আতিশয্যের খেলা। কেননা যতটা প্রয়োজন জরুরী তাতেই আমাদের মন তৃপ্ত থাকে না, সে চায় অপ্রয়োজনের উপাদান সংগ্রহ করে তার রস উপলব্ধি করতে। কোন বাঁধাধরা বস্তু বা তথ্যের মধ্যে নিজেকে বন্দী করে রাখা রসের স্বভাব নয়, রসলিপ্সু মন তাতে তৃপ্তি পায় না। প্রাত্যহিক জীবনের আবেষ্টনকে অনির্বচনীয়ভাবে অতিক্রম করাই হল রসের ধর্ম। বিধাতার দেওয়া রূপ নিয়ে কে আর সন্তুষ্ট থাকে? সবাই চায় তাকে ঘষে-মেজে আর একটু পরিপাটি আর একটু ঝকঝকে করে তুলতে। ভ্রূ দুটিকে তুলি দিয়ে টেনে ধনুকের চাপের মত করলে যদি কটাক্ষের কমনীয়তা আর একটু বাড়ে, গৌর গাল দুটিকে সুরঞ্জিত করে গোলাপী আভা ফুটিয়ে তুলতে পারলে যদি লাবণ্য আর একটু বেশী ফোটে, লাল ঠোঁট দুটিকে রাঙিয়ে আরও একটু টুকটুকে করতে পারলে যদি তা আরও শোভাময় হয়, আঁখি-পল্লবে কাজল-রেখা এঁকে দিলে যদি দৃষ্টি-ভঙ্গিমা আরও একটু মনোহর হয়, তাহলে তা কে না চায়?

দেহের লাবণ্য-সুষমাকে বাড়িয়ে তুলতে গেলে যেমন অতিরঞ্জনের প্রলেপ দরকার হয়, তেমনি অতিরঞ্জন না থাকলে কল্পনার রাজ্যে সাহিত্য-সৃষ্টিই সম্ভব হয় না। যদি সহজ সরলভাবে ঘটনা-গুলিকে বলা হয়, তাহলে তাকে ইতিহাস বলা চলতে পারে, কিন্তু তাকে সাহিত্য বলা চলবে না। কল্পনার তুলিতে রং চড়িয়ে তাকে ফলাও করে চিত্রিত করা হলে তবেই তা সাহিত্যের কৌলীন্য লাভ করে। কবি-শিল্পী অতিরঞ্জনকে অবলম্বন করেই সাহিত্য সৃষ্টি করে থাকেন। তাঁদের মানসলোকে ভাবের যে অপরূপ মূর্তি ধরা দেয়, তাই ভাষা ও ছন্দের বিচিত্র ব্যঞ্জনায় সুললিত সাহিত্য হয়ে ওঠে। মহর্ষি বাল্মীকিকে লক্ষ্য করে কবি তাই বলেছেন,—

"সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

সাহিত্য-শিল্পীর কাছে কল্পনার অনুরঞ্জনে সৃষ্ট যে সাহিত্য, তা বাস্তব জীবনের চেয়ে অনেক বড়। তাই বাল্মীকির মানস-লোকে যে রামচন্দ্র জন্ম নিয়েছেন, তাঁর মর্যাদা ইতিহাসের রামচন্দ্রের চেয়ে অনেক বেশী। তিনি নিত্যকালের আরাধনার সামগ্রী হয়ে লোকের অন্তরে চির-অধিষ্ঠিত হয়ে রয়েছেন।

সাদামাঠা রূপকে বসন-ভূষণ দিয়ে সাজালে যেমন তা আরও নয়ন-লোভন হয়, তেমনি সহজ সরল বাক্যকে উপমা, রূপক, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি অলঙ্কার দিয়ে সাজালে তবেই তা রসাত্মক হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ থেকে একটু উদ্ধৃত করি,—

"স্নিগ্ধ দৃষ্টি সুগম্ভীর
স্বচ্ছ নীলাম্বর সম, হাসিখানি স্থির
অশ্রু শিশিরেতে ধৌত, পরিপূর্ণ দেহ
মঞ্জরিত বল্লরীর মতো, প্রীতি স্নেহ
গভীর সংগীত তানে উঠিছে ধ্বনিয়া
স্বর্ণবীণা তন্ত্রী হতে রণিয়া রণিয়া
অনন্ত বেদনা বহি।"

প্রিয়ার দৃষ্টি, প্রিয়ার হাসি, প্রিয়ার দেহ-সৌষ্ঠব, প্রিয়ার কণ্ঠধ্বনি—সব কিছুই প্রেমিকের কাছে এক অপরূপ অনুভবের সামগ্রী। অতিরঞ্জনের বিলাসে সে বর্ণনা আমাদের কাছে পরম আস্বাদনের বস্তু হয়ে ওঠে। হৃদি-সংবেদ্য এই রসাত্মক সাহিত্য অন্তরকে মুগ্ধ করে, স্নিগ্ধ করে। এক অনির্বচনীয় ভাব-লোকের লাবণ্য-সুঠাম মূর্তি মানস-মুকুরে ধরা দেয়।

কল্পনার রাজ্য ছেড়ে দিয়ে বাস্তব-জীবনেও আমরা সর্বত্র অতিরঞ্জনের অভিব্যক্তি দেখতে পাই। আমাদের ভাল-লাগা-না-লাগা সবই অতিরঞ্জন দিয়ে আমরা গাঢ় করে তুলি। প্রেমের অঞ্জন চোখে লাগিয়ে অতি কুৎসিতকে আমরা নয়নাভিরাম দেখি। বিশ্বের যা কিছু সুন্দর যা কিছু মধুর, সবই প্রেমাস্পদের প্রতি অঙ্গে আমরা প্রতিফলিত দেখতে পাই। প্রেমিক প্রিয়ার মুখে চাঁদের শোভা নিরীক্ষণ করেন, আবার চাঁদ দেখলে প্রিয়ার মুখখানি তাঁর মনে জাগে,—

"প্রিয়া মুখে হেথা দেখি গো চাঁদ,
চাঁদে হেরি প্রিয়া-মুখের ফাঁদ"
—কবি নজরুল

প্রাচীন ও অর্বাচীন—যে কোন সাহিত্যেই রূপ-বর্ণনা পড়লে এর যথেষ্ট নজির মেলে।

অশেষ দোষ-দুষ্ট হলেও নিজের শরীর কারও কাছে অপ্রিয় হয় না, তেমনি প্রিয় যে ব্যক্তি, সে গর্হিত আচরণ করলেও সে প্রিয়ই থাকে। প্রিয়ের দোষ-ত্রুটি ঢেকে তার গুণের কথা বাড়িয়ে বলাই প্রেমিকের স্বভাব, তাতেই তার তৃপ্তি। প্রেমের ব্যঞ্জনাকে মহিমান্বিত করতে অতিরঞ্জনই একমাত্র

...য়। স্নেহ বাৎসল্যময়ী জননী তাঁর কলাঙ্গ কুরূপ সন্তানকে কখনও ...সিত দেখেন না। তাঁর সন্তান কানা ...লও তাঁর কাছে সে পদ্মলোচন তার কালো হলেও সে তাঁর কাছে গোরা।

"সন্তান যদ্যপি হয় অসিত বরণ
জননীর কাছে তাহা কষিত কাঞ্চন।"

প্রেমিকের দৃষ্টিতে একথা যেমন ...য়, তেমনি আবার এর বিপরীত ভাব ...কাশ করতে গিয়ে অর্থাৎ যাকে দেখতে ...রিনে, যাকে দেখলেই ঘৃণা ও ...রক্তিতে মন ভরে যায়, তাকে বর্ণনা ...তে গিয়েও আমরা অতিরঞ্জনের ...শ্রয় নিয়ে থাকি। যেমন—অপ্রিয় ...ক্তির সম্বন্ধে আমরা বলে থাকি,— ...তির মত কান, পেঁচার মত মুখ, ...দালের মত দাঁত ইত্যাদি। অতি-...নের ভিতর দিয়েই অন্তরের এই ...রাগ তীব্রতর হয়ে ফুটে ওঠে।

শাস্ত্রকারগণ—যাঁরা পরলোকের শাশ্বত ...ী প্রচার করে লোকহিত ব্রত পালন ...র থাকেন, তাঁরাও অতিরঞ্জনের প্রভাব ...মুক্ত নন। পারত্রিক কল্যাণের ...থ পরিচালিত করবার উদ্দেশ্যে ...কে 'অক্ষয় স্বর্গ,' 'অক্ষয় পুণ্য,' 'অনন্ত সুখের' আশা দেখিয়ে পুণ্যব্রতে প্রলুব্ধ করে থাকেন। যদিও অতিরঞ্জন ছাড়া এসব উক্তির মধ্যে কোন শাস্ত্র-যুক্তি পাওয়া যায় না, তথাপি লোক-হিতের জন্য এইসব অতিশয়োক্তির প্রয়োজন আছে।

বিজ্ঞাপন-শিল্পে অতিরঞ্জনের ছড়া-ছড়ি খুবই দেখা যায়। কোনও গ্রন্থ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"প্রেমের শুকতারা, পারিজাতসম গল্পগুচ্ছ, মাতৃস্নেহের অলকানন্দা প্রবাহ, অনন্ত প্রেমের অফুরন্ত প্রস্রবণ, ইত্যাদি।" কোন গ্রন্থকার সম্বন্ধে লেখা হয়েছে—"উপন্যাস সাম্রাজ্যের সাহানুসা বাদশা, গল্প-সাহিত্যের মোপাসাঁ প্রভৃতি।" এইসব বিজ্ঞাপন প্রচারে জমকালো চটকদার ভাষার উচ্ছ্বাস স্বভাবতই পাঠকের মনকে নাড়া দেয়। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে রুচিবোধেরও পরিবর্তন ঘটেছে। এখন বাগ্-বিভূতির চাইতে রসের সূক্ষ্ম আবেদনের দিকেই নজর পড়েছে বেশী। ইউরোপীয় সাহিত্যেও অতিশয়োক্তি খুবই চোখে পড়ে। যেমন—স্বয়ং মনীষী এমার্সন প্লেটো সম্বন্ধে বলেছেন, 'প্লেটোই দর্শন, দর্শনই প্লেটো' (প্লেটো ইজ ফিলোজফি অ্যান্ড ফিলোজফি ইজ প্লেটো), বিখ্যাত দার্শনিক সোপেন-হাউআর কাণ্ট সম্বন্ধে বলেছেন, "কাণ্টের দর্শন যে না বুঝেছে, সে শিশু" (এনি ম্যান ইজ এ চাইল্ড আনটিল হি হ্যাজ আন্ডারস্টুড কাণ্ট)। অবশ্য এই সব সমালোচনা গুণমুগ্ধ সমালোচকের গুণ-গ্রাহিতার স্বাক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়।

ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপনে অতিরঞ্জন কত-খানি স্থান অধিকার করে আছে, তা খবরের কাগজের পাতা ওল্টালেই দেখা যায়। পেটেন্ট ওষুধ মাত্রেরই 'অব্যর্থতা' গুণ, সিনেমার প্রত্যেক ছবিটিই শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণ', প্রত্যেক দাঁতের মাজনেরই 'নড়া-দাঁতকে কড়া করবার' ক্ষমতা প্রভৃতি চটকদার বিজ্ঞাপন পড়লেই তা উপলব্ধি করা যায়। বিজ্ঞাপনগুলিকে এত মনোহরভাবে সাহিত্যের ছাঁচে ঢালা হয়, যাতে লোকে সহজেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। শুধু ভাষা নয়, তার সঙ্গে যেসব ছবি আঁকা হচ্ছে, তা ফাইন আর্টের পর্যায়ে-শিল্পে পৌঁছেছে। মানুষের মনে যে গোপন রসানুলিপ্সা আছে, তার কাছে ভাষা ও ছবির রসময় আবেদন শুধু কথার আড়ম্বরের চাইতে অনেক বেশী আকর্ষণের। আকৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধিৎসা জাগে এবং বিজ্ঞাপিত বস্তু কিনে দেখতে ইচ্ছা হয়। তাই ব্যবসায়ের দিক দিয়ে এটা যে একটা মস্ত বড় মূলধন, তা অনস্বীকার্য।

অতিরঞ্জন ছাড়া চিঠিপত্রের ভাব-

ব্যঞ্জনাকে গাঢ় করা বোধ হয়—সম্ভবই নয়। আবহমানকাল থেকে চিঠিপত্রে যেসব পাঠ প্রচলিত হয়ে আসছে, তার মধ্যে অতিশয়োক্তির বৈশিষ্ট্যটুকু পরিস্ফুট। বর্তমান যুগেও নানা ছাঁদের রকমারী পাঠ নিত্য-নতুন সৃষ্টি হচ্ছে। সেগুলির মধ্যে ব্যঞ্জনার লালিত্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। নিজের চেয়ে আর কাউকে ভাল না বাসলেও 'প্রাণাধিকেষু,' 'প্রিয়তমেষু,' পাঠ প্রচলিত হয়ে আসছে। গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি যাই থাক না কেন, 'শ্রীশ্রীচরণ-কমলেষু', 'সেবকাধম', 'প্রণাম শত কোটি' প্রভৃতি লেখাই চিরাচরিত প্রথা। পরিচিত অপরিচিত কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে পত্র ব্যবহারে 'বিপুল সম্মান পুরঃসর' নিজেকে 'বিনয়াবনত' লেখাই কিন্তু শিষ্টাচার। এইসব পাঠের ব্যবহারে নিজেকে খাটো করে অন্যকে বড় করার মধ্যে অতিরঞ্জনের যে প্রকাশ তাতে লেখকের অন্তরের মহত্ত্বেরই অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। এই সম্মান দান ভারতীয় কৃষ্টিরই একটা শিক্ষা।

কথিত আছে, "এক্সাজ্যারেশান ইজ দি হার্ট অব হিউমার, দি সোল অব স্যাটায়ার।" সামান্য দু'একটা উপমা বা রূপক দিয়ে পাকা লেখক সাহিত্যে যে রস ও রসিকতার সৃষ্টি করেন, একটা দীর্ঘ বর্ণনার চাইতে তার দাম অনেক বেশী। দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে কয়েক পংক্তি ধরা যাক্—

সেকালের সন্ধ্যার বর্ণনায়—

"সেই সেকালের সন্ধ্যা মোদের সন্ধ্যা ছিল সত্যি,
দিন-ভেঙানো ইলেকট্রিকের হয়নিকো উৎপত্তি।"

'রঙ্গ' কবিতায়,—

"মিথ্যে ভেল্কি, ভূতের হাঁচি,
মিথ্যে কাঁচের পান্না,
তাহার অধিক মিথ্যে তোমার
নাকি সুরের কান্না।"

অথবা 'নিষ্কৃতি' কবিতায়,—

বাপ একটু হাসল কেবল, ভাবলে "মেয়েমানুষ
হৃদয় তাপের ভাপে ভরা ফানুস।"

ক্ষুদ্র একটা শ্লেষোক্তি বা ব্যঙ্গোক্তির মধ্যে যে বৃহৎ ইঙ্গিত লুকানো আছে, তা পাঠকের মনকে কোন ব্যক্তি, বস্তু বা সমাজ সম্বন্ধে গভীরভাবে সচেতন করে তোলে এবং একটা অব্যক্ত রসে মনকে ভরিয়ে দেয়।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনের প্রভাব বড় কম নয়। বিগত বিশ্ব-যুদ্ধে এর প্রচলন খুব বেশী করে দেখা গিয়েছিল। যে পক্ষ যত ফলাও করে নিছক মিথ্যার বেসাতি নিয়ে চীৎকার করতে পারবে, তারাই লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে তত বেশী। মিথ্যা প্রচার জোর গলায় ছড়াতে থাকলে পরিণামে তা সত্য হয়ে দাঁড়াবে—এই ছিল তাদের বিশ্বাস। একথা সকলেই জানেন, যুদ্ধে প্রথম বলি দেওয়া হয় সত্যকে। গত যুদ্ধের বিবরণে প্রচার করা হয়েছিল, জার্মান ইউবোটগুলি ব্রিটিশ নৌবহরকে ঘায়েল করে ডুবিয়ে দিয়েছে সাতবারের বেশী। জার্মানীর লোকসংখ্যা যত, তার অনেক বেশী জার্মানকে রাশিয়ানরা হত্যা করেছে বলে দাবী জানিয়েছিল। এই সব অতিরঞ্জিত উক্তি যুদ্ধের সময়ে নিছক প্রচারকার্য ছাড়া আর কিছু নয়।

অতিরঞ্জন মানুষের স্বভাবগত একটা বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকৃত হলেও নীতিবিদ্ ও বৈজ্ঞানিকগণ কিন্তু এর ঘোর বিরোধী। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন, অতিরঞ্জনের উচ্ছ্বাসে বৈজ্ঞানিক তথ্য সমূহ চাপা পড়ে যায়, তাতে বিজ্ঞানের স্বরূপকেই জবাই করা হয়। নীতিবিদ্গণের ধারণা, অতিশয়োক্তির দ্বারা স্বরূপ প্রকাশ যে সত্য, তার অপলাপ ঘটে। তথাপি মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় সত্য-প্রতিষ্ঠ নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকেও অতিশয়োক্তির ব্যঞ্জনার মধ্যে ধরা দিতে হয়েছে। যেমন—তিনি নিজের ভুলের পরিমাণকে বড় করে দেখাতে গিয়ে বলেছেন, 'হিমালয়সদৃশ ভুল' (হিমালয়ান ব্লান্ডার্স), ক্রীপস্ সাহেবের প্রস্তাবকে অসমর্থনীয় বলে প্রতিপন্ন করতে গিয়ে তিনি সেটাকে 'পরের তারিখ দেওয়া চেক্' (পোস্ট-ডেটেড চেক্') বলে অভিহিত করেছেন। একথা ঠিক, অল্প কথায় বক্তব্যের স্বরূপকে প্রকাশ করতে গেলে এর চেয়ে স্পষ্ট করে অন্য কোন ভাবে বলা বোধ হয় সম্ভবপর হ'ত না। মহাত্মাজীর মত নিপুণ শিল্পীর পক্ষে এরূপভাবে বলা সম্ভবপর হয়েছে।

মাপজোখ করে পরিমিত কথা বলার মাঝে মানুষ তৃপ্তি পায় না। সে চায় নিরন্তর নিজেকে প্রকাশ করতে, প্রসারিত করতে। এই বিস্তৃতির পথে অতিরঞ্জনই হ'ল তার স্বাভাবিক অবলম্বন। "নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্"—অতিরঞ্জন হ'ল সেই সহজাত প্রেরণারই এক প্রকাশ।

সংশয়

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

কখনও এমন হয়—জ্বালামুখী বাসনার ভাষা
নিথর তুষার হ'য়ে হিমবাহে স্তব্ধ ভয়ে জমে,
হৃদয়ে আকুলগন্ধী তার সেই মগ্ন ভালোবাসা
কখনও মিলায় ভয়ে। চেতনার সুদূর অগমে
দিশাহারা বালুচরে ছি'ড়ে যায় প্রণয়ের বীণা,
কখনও এমন হয়, মনে হয় সেও প্রেমহীনা॥

গোজা৷৷মলের ৷পমন্দা৷ন

রাস্তায় রাস্তার পরিচয়হীন অনাথ ক যারা ঘুরে ঘুরে বেড়ায় তাদের হেলা ও পীড়ন করে চোর জোচ্চোর কটমার হতে বাধ্য না করে, যথাযথ হ ও মর্যাদার আসন দিয়ে তাদের জে ভালো হয়ে থাকবার সুযোগ র দেওয়াই কর্তব্য। এ বিষয়ে সকলকে চতন করার উদ্দেশ্যে 'মণি আর নিক'য়ের আবির্ভাব; বেশ মানবিক বেদনের কথা। কিন্তু আবেদনটা ক্ত করতে এমনভাবে গল্পের অবতারণা রা হয়েছে যা দেখতে দেখতে সেই ছাত্রের পটা মনে পড়তে থাকে। আঁকের মাস্টার লেন দুই আর দুয়ে চার কি করে হয় খিয়ে দিতে। চট্‌পটে ছাত্রটি এইভাবে অঙ্ক কষে দেখালেঃ

২−১=১+২=৩+১=২+২=৪

১ সংখ্যাটা কোথা থেকে এলো স্টার জানতে চাইলেন। ছাত্র বললে, তে ছিল। ৩ সংখ্যাটা দেখানোর দরকার ছাত্র জবাব দিলে ওটা ধরতে হয়, না অংক মেলে না। 'মণি আর নিক'য়ের গল্পটাও শৈলজানন্দ ঠিক ভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন। ছোট দুটি লে, মা মারা যাবার পর পথে এসে ড়ালো; তারপর শেষে তাদের জেল-রং বাবার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। সেই কাহিনী ব্যক্ত করতে শৈলজানন্দ কম হাতের-এক আর ধরে নেওয়া-তিন যে যেভাবে অংক মিলিয়েছেন, তার শেষ গোজামিলের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা র্জনের সুযোগ এনে দেয়।

*   *   *

তিনটি চরিত্র নিয়ে গল্প আরম্ভ। রীবের ঘর। রোগে শয্যাশায়ীনি মা; ছর চোদ্দ পনেরোর ছেলে মণি, আর তার ছর আটেকের ছোটভাই মানিক। মায়ের থা থেকে শোনা যায় এদের বাবা বাইরে গয়েছে এবং ফিরে এলেই ওদের অবস্থা রে যাবে। কিন্তু মণি এসে তার মার ছে নালিশ জানায় এই বলে যে, পাড়ার ছেলেরা তাকে ক্ষেপায় তাদের বাবা নাকি জেলে গিয়েছে। নিজের লেখাপড়া হয়নি লে মণির বড়ো ঝোঁক মানিককে স্কুলে র্তি করে পড়াবে; তাছাড়া মার অসুখের চিকিৎসার জন্যও টাকা দরকার। টাকার জন্যে মণি এক যাত্রা দলে ভর্তি হয়ে

রঙ্গজগৎ

—শৌভিক—

সেখান থেকে টাকা নিয়ে ডাক্তার সমেত বাড়ি ফিরে দেখলে মা আর ইহজগতে নেই। ঘটি-বাটি বিক্রী করে মায়ের শ্রাদ্ধ করতে গেলো কিন্তু জোচ্চোরে সে পয়সাও ঠকিয়ে নিলে। মণি মানিকের হাত ধরে পথে বেরিয়ে পড়লো। এখানে ছেদ পড়ে দেখা গেল একটা বাড়ির রান্নাঘরে চাকর দুধের কড়া থেকে খানিকটা সর তুলে মুখে মাখতে আরম্ভ করতেই গৃহিণী হঠাৎ এসে তাই দেখে মহা হৈচৈ আরম্ভ করলেন। চাকর জগুর ভয় তো দূরের কথা, মুখ টিপে সে হাসতে থাকে। গৃহিণী আরও রেগে গিয়ে কন্যা শিবানীকে ডাকলেন। শিবানী জগুকে তিরস্কার করে জানতে পারলে জগুর বিয়ে হবে, মার কাছ থেকে চিঠি এসেছে; সে দেশে যেতে চায়। শিবানী ছুটি মঞ্জুর করতে জগু জানালে যে, সে বদলিতে কাজ করার জন্য একজনকে জোগাড় করে দেবে। বেশ বোঝা গেল জগু যাকে জোগাড় করবে সে নিশ্চয়ই মণি। সাসপেন্স গেল ঘুচে।

*   *   *

হঠাৎ দেখা গেল রাস্তার পাশে ঘুমন্ত মানিককে তুলে নিয়ে মণি হাজির হয়েছে এক মেয়ে স্কুলের বোর্ডিংয়ে। সুপারিন-টেন্ডেন্ট গোছের এক মহিলা বেশ সহানুভূতি ও দয়া দেখিয়ে মানিককে থাকতে দিতে রাজী হলেন এই উদ্দেশ্যে যে তার বাপ-মা মরা ভাইপোর সংগী হয়ে মানিক থাকতে পারবে। অথচ মহিলা মণিকে জানালেন যে, মাসে বারোটা করে টাকা দিতে হবে। মানিককে একরকম গছিয়েই দিয়ে এলো।...রাস্তায় এক গাইয়ে জুড়ী তাদের বুকের মানিক হারিয়ে যাওয়ার গান গাইছে, মণি এসে দাঁড়ালো। গান শেষ হতে মণি ওদের দলে ভর্তি হবার কাকুতি জানিয়ে মেয়েটির গায়ে হাত দিতেই মরদটি তার গালে চড় কষিয়ে চলে গেল। ব্যথিত মণির পাশে এসে দাঁড়ালো জগু; জগু তার বদলি হিসেবে কাজে বহাল করার জন্য মণিকে নিয়ে গেল।... ...একটা বস্তীর ঘরে উপবিষ্ট এক ব্যক্তির কাছে এলো একটি কৌতুক চরিত্র, এর নাম ফটিকচাঁদ। ঘরের লোকটি নিজেই

জানালে তার নাম অনাদি মুখোপাধ্যায়। বোঝা গেল এই ব্যক্তিই মণি আর মানিকের জেল-ফেরৎ বাবা। ফটিক তার চৌর্যবৃত্তির সহচর। ফটিক একটি শিকারের খবর এনেছে—বিধবা মা আর একমাত্র অনূঢ়া কন্যা; প্রচুর সম্পত্তি; কোন ছলে বাগিয়ে নিতে হবে। খবরটা শিবানী আর তার মার সম্পর্কে। একটা .....মেয়ে স্কুলের বোর্ডিং। ভাইপোর বানানো অভিযোগ শুনে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নির্দয়ভাবে মণিকে পীড়ন করলে। ......শিবানীদের বাড়ির সদরের দাওয়া। মানিক ওরফে কেষ্ট বের হতেই ফকিরচাঁদ তার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলে। ফকির নিজেকে পাড়ার মস্ত বড়লোকের ছেলে বলে পরিচয় দিয়ে কেষ্টকে একটা অছিলায় টাকা দিয়ে হাত করতে চাইলে। কেষ্টও ফকিরকে ধোঁকা দিয়ে ভায়ের জন্যে সন্দেশ নিয়ে পিটটান দিলে।......বোর্ডিং। মণি মানিককে নতুন পোষাক ও সন্দেশ দিয়ে গেল। মানিকের সঙ্গী তাই নিয়ে আবার মিথ্যে করে তার পিসিমার কাছে মানিকের নামে লাগালে। মানিককে আবার নির্যাতন ভোগ করতে হলো।......এইভাবে গল্প মধ্যবিরতি পর্যন্ত এসে গেলো।

* * *

ইণ্টারভ্যালের পর গল্প আরম্ভ অন্যভাবে। পুরো একটা কমিক অধ্যায়। ......শিবানীদের বাড়ি। ফকির নিজেকে মস্ত বড়লোকের ছেলে এবং এক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন স্বামীজীর হনুমন্ত ভক্ত বলে পরিচয় দিয়ে শিবানীর মায়ের বিশ্বাস জয় করে নিলে।...... বোর্ডিংয়ে মানিকের ওপর আরও নির্যাতন; এবারে তার ওপরে চুরির বদনাম। খেতে না দিয়ে, এমন কি জল পর্যন্ত না দিয়ে তাকে একটা ঘরে বন্দী করে রাখা হলো। মণি আসতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মানিককে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বললে। মণি দুদিন মানিককে থাকতে বলে এবং মানিকের কাছে তার ঠিকানা দিয়ে চলে গেল। ......শিবানীদের বাড়ি। ফকিরের বর্ণনামত স্বামীজীরূপী অনাদির আগমন। চালাকি করে একটা মরা চড়াই পাখীকে 'জীবন্ত' করে দিয়ে অনাদি নিজের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করলে। ঠিক হলো দুদিন পর

ামীজী এসে ধুমধাম করে পুজো রবেন।......বোর্ডিং। নির্যাতনে মনমরা য় মানিক তার জিনিসপত্তর পোঁটলায় ধে দাদার দেওয়া ঠিকানা নিয়ে রাস্তায় রিয়ে পড়লো। পথে পড়লো মোটর পা। গাড়ী থেকে এক বিধবা মহিলা য়ে মানিককে কোলে তুলে নিলেন।...... বানীদের বাড়ি। পুজোর সব ব্যবস্থা পূর্ণ কিন্তু স্বামীজীর দেখা নেই। ামীজীর আসার আশা ত্যাগ করে কেষ্ট বানীকে তার ভাইকে নিয়ে আসার নুমতি নিয়ে মানিককে আনতে গেল। ...দেরী হলেও স্বামীজী এসে পুজোয় সলেন। একটু আগেই শ্যাকরা শিবানীর তুন হার গড়িয়ে দিয়ে গেছে। শিবানীর সব গহনা স্বামীজীর পায়ে ছুঁইয়ে শুদ্ধ রে নেবার জন্য পুজোর বেদীর কাছে খলেন। সেদিনই কথায় কথায় স্বামীজী নতে পারলেন শিবানীর বাবা বসত ড়ি আর মাত্র হাজার পাঁচেক টাকা রেখে য়েছেন। হতাশ অনাদি পুজো সেরে ড়ি ফিরে ফকিরকে একহাত নিতে েই ফকির হাত সাফাইয়ের কেরামতি খানে শিবানীর হারগাছা বের রে। এক বালিকার গহনা অপহরণ করার ন্য ফকিরকে অনাদি গালাগাল দিলে। ...বোর্ডিংয়ে গিয়ে মানিককে না পেয়ে ণি দিশেহারা হয়ে বেরিয়ে পড়লো। ...শিবানীর মা মানিক ওরফে কেষ্টকেই চার সাব্যস্ত করেছেন। স্বামীজী এলেন চুরির জন্য অনুশোচনা ব্যক্ত করতে। হঠাৎ মণি এসেই স্বামীজীকে তার বাবা বলে চিনতে পারলে এবং পাছে তার বাবার ঘাড়ে চুরির দোষ পড়ে এই আশঙ্কায় চুরির দায় নিজের ওপর নিয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়লো। অনাদি ছুটে এলো পিছনে; ছেলের কাছে অনুশোচনা জ্ঞাপন করলে। ওদিকে শিবানীর মা পুজোর বেদীতে হারটা ফিরে পেয়ে স্বামীজীর ওপরে আরও ভক্তি গদগদ হয়ে উঠলেন।...... মানিক আহত হয়ে যাদের বাড়ি এলো; মস্ত বড়লোক তারা। এক রায়বাহাদুর আর তার বিধবা পুত্রবধূ। এইখান থেকে গল্পের তৃতীয় পর্যায় আরম্ভ।

* * *

মানিককে যে মহিলা তুলে নিয়ে আসে সেই বিধবাই রায়বাহাদুরের পুত্রবধূ আভা। মানিকের চিকিৎসা চলছে, ডাক্তার এসে জানালে মানিক বোবা হয়ে গিয়েছে। আভার পরিতাপের অন্ত রইলো না; ছেলেটিকে সে মানুষ করবে ঠিক করলে এবং তাকেই দত্তক নিয়ে রায়বাহাদুরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে দেবে। রায়-বাহাদুর কিছুতেই তা হতে দেবেন না। ......একদিন মানিকের দেখা পাওয়া যাবেই এই আশায় মণি রোজ শিবানীদের বাড়ির সদর দাওয়ায় এসে বসে থাকে; কিছুদূরে থাকে অনাদি।......রায়বাহাদুরের চাকর একদিন মানিকের পকেট থেকে মার্বেলের সঙ্গে মণির দেওয়া ঠিকানা পেলেন। পুত্রবধূকে নিয়ে তিনি হাজির হলেন শিবানীদের বাড়ি মানিকের পরিচয় জানতে। তার আগে মণি এবাড়িতে এসে পৌঁচেছে। মানিককে দেখেই সে চিনতে পারলে। পিছন পিছন অনাদিও হাজির; নিজেকে সে মণি আর মানিকের পিতা বলে পরিচয় দিলে। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর দাদাকে পেয়ে মানিকের মুখে কথা ফুটলো। বোবা নয় এবং ব্রাহ্মণের সন্তান জেনে রায়বাহাদুর মানিককে দত্তক নেওয়ায় পুত্রবধূকে মত দিলেন।

* * *

গোড়াতে যে অঙ্ক মেলানোর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে 'মণি আর মানিক'-য়ে চরিত্র ও ঘটনার সংস্থাপন ঠিক তেমনি-ভাবেই শেষের উজ্জ্বল দৃশ্যটি এনে দিয়েছে। কোন যুক্তির ধার দিয়ে না গিয়ে জোর করে চরিত্র ও ঘটনা এনে বসিয়ে যাবার উদাহরণ আগাগোড়া। এখানে গল্পটা পড়লে যতোটা আন্দাজ করা যায়, ছবিখানি দেখবার সময় পাওয়া যাবে ঢের বেশী। ধরতে গেলে যেন তিনটে আলাদা গল্প। প্রথম গল্প শেষ হয়েছে মানিককে বোর্ডিংয়ে আশ্রয় জোগাড় করে দিয়ে শিবানীদের বাড়িতে মণির আশ্রয় পাওয়া পর্যন্ত। কিন্তু ছবি তো ওখানে শেষ করা যায় না, তাই গোড়ায় অমন দয়াময়ী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে অকারণ হঠাৎ অতি নির্দয়া করে তোলা হয়েছে এবং অত্যন্ত বেমানানভাবেই যাতে মানিক

ওখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আর একটা গল্পের পথে এসে দাঁড়ায়। ভেবে আশ্চর্য হতে হয়, এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ত্রী তার বাপ-মা হারা ভাইপোর জন্যে সাদরে মানিককে গ্রহণ করে তারপর তাকে কথায় কথায় কেবল প্রহার করতে পারে কি করে! মানিককে একটা ভালো জামাও সে মহিলা দিলেন না; উপরন্তু মানিকের জন্য মাসে বারো টাকা তার দাদার কাছে দাবী করতে দ্বিধা করলেন না। অথচ ভাইপোটি মানিকের সংগে, মনে হল, একসংগেই থাকে। কারণ মানিক যখন চলে আসবে বলে তার পোঁটলা বাঁধতে আরম্ভ করলে তখন দেখা গেল মানিকের জীর্ণ পোষাক ঐ ভাইপোটির পোষাকের পাশে এক আলনায় যত্ন করে রাখা, মানিকের ঘটিটাও যত্ন করে সাজিয়ে রাখা—কি যে সব বেতালা ব্যাপার! যেন মনকে করুণার্দ্র করে তুলতে হবে, আচ্ছা দাও মানিককে নির্যাতনের দৃশ্য; যুক্তি ও মাত্রা থাক আর নাই থাক। আরও বহু জায়গায় বেতালা ব্যাপার নজরে পড়ে। ফটিকের প্রথম আবির্ভাবে দেখা গেল তার মুদ্রাদোষ ইংরিজী শব্দ প্রয়োগ করে বসা এবং ওটা এমনি দোষ যে অনাদির তিরস্কারেও তা শোধরায়নি। কিন্তু মধ্য-বিরতির পর ফটিক যেন আর একজন; শিবানীর মার সংগে সে কথা বললে একেবারে বিশুদ্ধ বাঙলাতেই শুধু নয়, অধিকন্তু অত্যন্ত কাব্যিক ভাষায় অথচ এই ফটিক অনাথ আশ্রমের মানেই বুঝতে পারে না। এতে ফটিকের চারিত্রিক ছন্দই কেটে গিয়েছে। মণি শিবানীদের বাড়ি দিনকয়েক কাজ করার পর হঠাৎ শিবানী তার নাম বদলে রাখলে কেষ্ট। মায়ের গুরুজনের নাম বলে মণির নামতো প্রথম দিনেই বদল হবার কথা! মণি বোর্ডিংয়ে মানিকের দুর্দশা দেখে তাকে তার কাছে এনে রাখবার অভিপ্রায় করে থাকলে কথাটা তো তার ফিরে এসেই শিবানীকে জানাবার কথা,—ছোট-ভায়ের দুঃখে অতো উতলা যে দাদা! কিন্তু বললে দুদিন পরে, স্বামীজী যেদিন শিবানীদের বাড়িতে এলো পুজো করতে। অর্থাৎ স্বামীজী ওরফে অনাদির সামনে যাতে মণি না পড়ে যায় সেইটে কাটিয়ে দেবার জন্যে এই একটা ছুতো করে নেওয়া হয়েছে। শিবানীদের অবস্থা যাই হোক, কিন্তু বাড়িতে টেলিফোন থাকার মতো পরিবেশ ওদের বাড়িতে নেই। অথচ তার হারটি চুরি যাওয়ার কথা হতেই দেখা গেল শিবানীর হাতে টেলিফোন পুলিসে খবর দেবার জন্য। তা না হলে মেলোড্রামা আর জমে কি করে! মানিক গাড়ী চাপা পড়ে ধনী বিধবার বাড়িতে আসার পর তার পাত্তা বের করবার কথা শোনা গেলেও কোন চেষ্টা হলো না, অথচ তাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারি বলে পুত্রবধূ জিদ ধরার পর চাকর মানিকের পকেট থেকে ঠিকানা বের করে আনলে! লোক অজ্ঞান হলেই তো তার দেহ তল্লাসী করা হয় পরিচয় যোগাড় করার জন্যে!

* * *

অসংগতির দৃষ্টান্ত বহু। 'স্ট্রিট সিংগার' জুড়ীর মুখে যে 'থিম সঙ' শোনা গেল তাদের বুকের মানিক হারানো নিয়ে, সেটা রাস্তায় জমে না। আর মরদ গাইয়ে মণিকে থাপ্পড় মেরে চলে গেল অথচ সমগ্র জনতা পাথরের মতো নিথর, এই বা কেমন! হঠাৎ দেখা গেলো শিবানীদের বাড়ির নীচের তলায় এক জুড়ী ভাড়াটে; একজন স্নান করছে বলে ওপর-তলায় শিবানীরা জল পাচ্ছে না। এইখানেই এ কাণ্ডের শেষ, কিন্তু কেন যে এদের আবির্ভাব তার কোন কারণই পাওয়া যায় না। হারানো ছেলেদের খোঁজ পাবার আশায় অনাথ আশ্রম খুলবে বলে শিবানীদের যথাসর্বস্ব অপহরণে অনাদির ষড়যন্ত্র, এটা কি রকম নীতি? আবার সর্বস্ব অপহরণ করতে গিয়ে ফটিক যখন চুরিকরা হার এনে দেখালে তখন শিবানীর জন্য অনাদির মমতা উথলে ওঠাই বা কেন? এইভাবে পদে পদে গোঁজামিল দিয়ে গল্পকে এলোপাথাড়ি লম্বা করে শেষে শৈলজানন্দীয় ধারায় মহা হট্টগোল সৃষ্টি করে সব চরিত্রকে এক-ঠাঁই এনে উজ্জ্বল দৃশ্যে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।

* * *

কাহিনীর যেমন তেমনি একটিমাত্র চরিত্র ছাড়া অতো চরিত্রের কোনটির মধ্যে ধারাবাহিকতা বলতে কিছু নেই। একরকম-ভাবে তাদের আবির্ভাব তারপর হঠাৎ কোন কারণ না প্রকাশ করেই তাদের চরিত্রধারার পরিবর্তন। একমাত্র সংগতি রক্ষিত হয়েছে ধনী বিধবাটির চরিত্রে যার ভূমিকায় সন্ধ্যারাণী দরিদ্র অনাথদের জন্য তেজ্স্ব[illegible] ভাষায় দরদ প্রকাশ করায় দর্শকদের [illegible] জয় করে নেন। আর চরিত্রগুলির ম[illegible] দর্শকের মনে আবেগ সঞ্চার করে মানিব[illegible] ছোট্ট সুপ্রিয়কে ভালো লাগবে সকলের[illegible] মণির ভূমিকায় সুখেন্দুর মুখে এম[illegible] ভাষা দেওয়া হয়েছে যাতে অমন চরিত্রটি[illegible] ফক্কুড়িতে পরিণত করে দিয়েছে অধিকাংশ চরিত্রই মানানসই সংলাপে[illegible] অভাবে দমে গিয়েছে, আর সংলাপও এ[illegible] এবং এমনি একটানা লম্বা লম্বা যে শে[illegible] পর্যন্ত বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। কোন চরিত্র জমতে পারেনি এইজন্যে; এমন কি ভানু ফটিকচাঁদও নয়। অন্যান্য বিভিন্ন চরি[illegible] শিল্পীদের মধ্যে আছেন জহর গাঙ্গুলি[illegible] কমল মিত্র, অলোক, সলিল দত্ত (কলে[illegible] নীচে মাথা রেখে স্নান করার এক ক্ষু[illegible] দৃশ্য মাত্র), পশুপতি কুণ্ডু, শ্রীকণ্ঠ গু[illegible] মলিনা দেবী, প্রণতি ঘোষ, অপর্ণা দেবী পদ্মা দেবী, তপতী ঘোষ প্রভৃতি। কল[illegible] কৌশলের কোন দিক সম্পর্কেই প্রশংসা কিছু নেই।

নূতন রেকর্ড

জুলাই মাসে নিম্নোক্ত বাংলা রেকর্ড গুলি প্রকাশিত হইয়াছে ঃ—

"হিজ মাস্টার্স ভয়েস"—তরুণ ব[illegible] পাধ্যায়—N 82622 "আমার জীবনে প্র[illegible] অভিশাপ" এবং "কোন বন্যাধারার গ[illegible] এলো"—(আধুনিক), শ্রীমতী উৎপলা সে[illegible] —N 82623 "রাতের কবিতা শেষ ক[illegible] দাও" এবং "প্রেম শুধু মোর তোমা[illegible] ঘিরিয়া" (আধুনিক), শ্রীমতী প্রতি[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়—N 82624 "তুমি এ[illegible] আজ কি দেব তোমায়" এবং "প্রদীপ ক[illegible] দখিনা সমীরে" (আধুনিক), মৃণা[illegible] চক্রবর্তী—N 82625 "হারিয়ে গেল দি[illegible] গুলি মোর ছন্দে গড়া" এবং "যমু[illegible] কিনারে সাজাহানের" (আধুনিক)।

কলম্বিয়া — হেমন্ত মুখোপাধ্যায়—GE 24732 "ওগো নদী আপন বে[illegible] পাগলপারা" এবং "পথ দিয়ে কে যায় গো[illegible] (রবীন্দ্র সংগীত), দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়—GE 24734 "শ্রাবণ ঢল ঢল হায় কি ক[illegible] বল" এবং "পায়ে চলা পথের হল শুরু" শ্রীমতী রাধারাণী—GE 24735 "মলা[illegible] মলাম শ্যাম অনুরাগে" এবং "কি রু[illegible] হেরিনু মধুর মুরতি" (ভক্তিমূলক)।

খেলার মাঠে

একলব্য

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা এবং উইম্বলডন টেনিসের পরিসমাপ্তি, ইংলণ্ড ও পাকিস্থানের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার মীমাংসা এবং কলকাতায় অস্ট্রিয়ান ফুটবল দলের প্রদর্শনী খেলা প্রভৃতি অনেকগুলি জমকালো ক্রীড়ানুষ্ঠান এসপ্তাহের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার উপর রয়েছে আন্ত-র্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রের টুকরো খবর আর

উইম্বলডনের মহিলা চ্যাম্পিয়ন মিস মোরিন কনোলী। আমেরিকার এই মহিলা খেলোয়াড় উপর্যুপরি তিন বৎসর উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে টেনিস খেলায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন

কলকাতার ফুটবল লীগের সাপ্তাহিক আলোচনা। কোনও বিশেষ ক্রীড়ানুষ্ঠানের উপর অধিক গুরুত্ব না দিয়ে একে একে সমস্ত বিষয়েরই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করবার চেষ্টা করছি।

* * *

টেনিস আর ফুটবলের বিশ্ব প্রাধান্য প্রতিযোগিতার মধ্যে টেনিসের কথাই প্রথম ধরা যাক। উইম্বলডন টেনিস বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে পুরোনো প্রতিযোগিতা। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে উইম্বলডনেই সর্বপ্রথম লন টেনিসের প্রতিযোগিতামূলক খেলা আরম্ভ হয়েছিল। টেনিস প্রতিযোগিতায় ডেভিস কাপ, ব্যাড-মিন্টনে টমাস কাপ এবং টেবল টেনিসে সোয়েদলিং কাপ বিশ্ব প্রাধান্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দেশের পুরস্কার। সোয়েদলিং কাপের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব যাচাইয়ের জন্য যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা আছে, ডেভিস কাপ বা টমাস কাপের খেলার সংগে তেমন কোন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা নেই। সমগ্র বিশ্বের টেনিস প্রতিযোগিতার ফলাফল বিচারে ক্রম-পর্যায় অনুসারে টেনিস খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়ে থাকে। কিন্তু উইম্বলডন বিজয়ী যাঁরাই যে বিশ্বসভার সর্বাপেক্ষা সম্মানিত টেনিস খেলোয়াড় এবিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই বিশ্বের যে কোন টেনিস খেলোয়াড়ের পক্ষেই উইম্বলডন বিজয়ের সম্মান জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এ বৎসরের উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় এই সম্মানের অধিকারী হয়েছেন মিশরের প্রতিভাবান খেলোয়াড় জারোস্লাভ ড্রবনী। ৩৩ বৎসর বয়স্ক ড্রবনী ইতিপূর্বে আরও ১০ বার উইম্বলডনে প্রতিযোগিতা করেছেন; ১৯৪৯ এবং ১৯৫২ সালে তিনি রানার্স-আপের পুরস্কারও লাভ করেন। কিন্তু উঠতি বয়সে ড্রবনী যে সম্মানের অধিকারী হতে পারেননি, তার অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানসমৃদ্ধ প্রতিভা আজ তাকে সেই সম্মান দান করেছে। উইম্বলডন বিজয় ড্রবনীর জীবনভোর সাধনার অভীপ্সিত ফল বলা যেতে পারে।

চেকোস্লোভেকিয়ার অধিবাসী ড্রবনী পরে মিশরের নাগারিক হন। তাঁর পিতা 'প্রেগের' এক টেনিস কোর্টের মাঠ পরিদর্শক ছিলেন। ড্রবনী এখানে 'বলবয়' হিসাবে জীবন আরম্ভ করেন। টেনিস বল কুড়িয়ে কুড়িয়েই ড্রবনীর মধ্যে টেনিসের নেশা জেগে ওঠে, টেনিস খেলায় তিনি খুবই আসক্ত হয়ে ওঠেন এবং ক্রমে একজন পাকা খেলোয়াড়ে পরিণত হন। 'প্রেগ' মাঠের সেই 'বল বয়ের' উইম্বলডন বিজয়ে টেনিস বিশ্ব আজ তাই সত্যই আনন্দে উৎফুল্ল।

* * *

উইম্বলডনে ইতিপূর্বে ১০বারের ব্যর্থতার ফলে ড্রবনীর অতি বড় সমর্থকও আশা করতে পারেন নি, তিনি চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করবেন। বিশেষ করে ড্রবনী ন্যাটা খেলোয়াড়। গত ৪০ বছরের মধ্যে কোন ন্যাটা খেলোয়াড়ের পক্ষে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করাও সম্ভব হয়নি। তাই খেলোয়াড়দের উৎকর্ষের বাছাই তালিকায় ড্রবনীর স্থান ছিল একাদশের কোঠায়। কিন্তু একাদশ স্থানের এই ন্যাটা খেলোয়াড় বিশ্বের ধুরন্ধর খেলোয়াড়দের একে একে পরাভূত করে বিস্ময়েরও সৃষ্টি করেছেন। টেনিস বিশেষজ্ঞ সমালোচকেরা আমেরিকার কৃতি খেলোয়াড় টনি ট্রাবার্ট অথবা অস্ট্রেলিয়ার উদীয়মান খেলোয়াড় লুইস হোডের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের সম্ভাবনা বেশী বলে মন্তব্য করে-ছিলেন, কিন্তু ড্রবনীর বাঁ হাতের প্রচণ্ডগতি সার্ভিস এবং প্রচণ্ডতম মারের মুখে সমস্ত কল্পনাই ভেসে গেছে। উইম্বলডনের মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন আমেরিকার

উইম্বলডনের বিজয়ী বীর জারোস্লাভ ড্রবনীকে ডাসেস অব কেন্টের নিকট হতে বিজয়ীর পুরস্কার গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। মিশরের এই কৃতবিদ্ টেনিস খেলোয়াড় ১১ বছরের প্রচেষ্টার পর এবার উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন

উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নশিপের সিংগলস ফাইন্যালে ড্রবনীর নিকট পরাজিত অস্ট্রেলিয়ার উদীয়মান টেনিস খেলোয়াড় কেন রোজওয়াল

খ্যাতনাম্নী টেনিস খেলোয়াড় মিস মোরিন কনোলী। মিস কনোলী এবার নিয়ে উপর্যুপরি তিনবার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের কৃতিত্ব অর্জন করলেন। নীচে পূর্ববর্তী কয়েক বছরের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নদের তালিকা ও উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নশিপের সমস্ত বিভাগের ফাইন্যালের ফলাফল দিচ্ছি।

১৯৩৩ —জে ক্রফোর্ড (অস্ট্রেলিয়া)
১৯৩৪-৩৬—এফ পেরী (ইংল্যাণ্ড)
১৯৩৭-৩৮—জে বাজ (ইউ এস এ)
১৯৩৯ —আর রিগস (ইউ এস এ)
১৯৪০-৪৫—[খেলা হয়নি]
১৯৪৬ —ওয়াই পেট্রা (ফ্রান্স)
১৯৪৭ —জে ক্রামার (ইউ এস এ)
১৯৪৮ —কে ফল্কেনবার্গ (ইউ এস এ)
১৯৪৯ —টি শ্রোডার (ইউ এস এ)
১৯৫০ —বাজপেটি (ইউ এস এ)
১৯৫১ —আর সেভিট (ইউ এস এ)
১৯৫২ —এফ সেজম্যান (অস্ট্রেলিয়া)
১৯৫৩ —ভি সেক্সাস (ইউ এস এ)

পুরুষদের সিংগলস—ফাইন্যাল

জারোশলাভ ড্রবনী (মিশর) ১৩—১১, ৪—৬, ৬—২ ও ৯—৭ গেমে কেন রোজওয়ালকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস—ফাইন্যাল

মিস মোরিন কনোলী (ইউ এস এ) ৬—২ ও ৭—৫ গেমে লুই ব্রাউকে (ইউ এস এ) হারিয়ে দেন।

পুরুষদের ডাবলস—ফাইন্যাল

রেক্স হার্টউইগ ও মার্ভিন রোজ (অস্ট্রেলিয়া) ভিক সেক্সাস ও টনি ট্রাবার্টের (ইউ এস এ) বিরুদ্ধে ৬—৪, ৬—৪, ৩—৬ ও ৬—৪ গেমে বিজয়ী হন।

মহিলাদের ডাবলস—ফাইন্যাল

মিস লুই ব্রাউ ও মিসেস মার্গারেট ডু পণ্ট (ইউ এস এ) ৪—৬, ৯—৭ ও ৬—৩ গেমে মিস ডরিস হার্ট ও মিস শার্লি ফ্রাইকে (ইউ এস এ) পরাভূত করেন।

মিক্সড ডাবলস—ফাইন্যাল

ভিক সেক্সাস ও মিস ডরিস হার্ট (ইউ এস এ) ৫—৭, ৬—৪ ও ৬—৩ গেমে কেন রোজওয়াল (অস্ট্রেলিয়া) ও মিসেস মার্গারেট ডু পণ্টকে (ইউ এস এ) পরাজিত করেন।

জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপ

আর কৃষ্ণন (ভারত) ৬—২ ও ৭—৫ গেমে এ্যাসলে কুমারকে (অস্ট্রেলিয়া) হারিয়ে জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হন।

* * *

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায় পশ্চিম জার্মান ফুটবল টীম ৩—২ গোলে ১৯৫২ সালের অলিম্পিক ফুটবল চ্যাম্পিয়ন হাঙ্গেরীকে পরাজিত করে 'জুলেস রিমেট' কাপ লাভ করেছে। বিশ্ব ফুটবল আরম্ভের পূর্বে এবং খেলার সময়ে অলিম্পিক বিজয়ী হাঙ্গেরী দলের ক্রীড়াশক্তির যে পরিচয় পাওয়া গেছে, তাতে কারো পক্ষেই কল্পনা করা সম্ভব হয়নি যে, হাঙ্গেরী শেষ পর্যন্ত জার্মানীর কাছে পরাজয় স্বীকার করবে। তাই এবারের উইম্বলডন টেনিসের মত জার্মানীর 'জুলেস রিমেট' কাপ লাভ বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার অপ্রত্যাশিত ফলাফল।

অবশ্য প্রতিযোগিতার শেষ পর্যায় দূরদর্শী ফুটবল সমালোচকেরা জার্মানীকে "DARK HORSE" অর্থাৎ 'কালো ঘোড়া' বলে বর্ণনা করেছিলেন। কালো ঘোড়া কথাটি রেস খেলার জুয়াড়ীদের। ঘোড়ার রং কালো হতে হবে এমন কোন কথা নেই। সাদা এবং লাল রংয়ের ঘোড়াও 'ডার্ক হর্স' হতে পারে। যার নৈপুণ্য কালোর মধ্যে ডুবে আছে

ইংলণ্ড ফুটবলের গুরুজী স্টানলী ম্যাথুজ। প্রতিযোগিতামূলক খেলা থেকে ম্যাথুজ অবসর গ্রহণ করা সত্ত্বেও বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ড দলে ম্যাথুজের অন্তর্ভুক্তি অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল

অর্থাৎ যার শক্তিসামর্থ্য সম্পর্কে সাধারণে বিশেষ কিছু জানা নেই অথচ অভাবনী সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা আছে, তাকে 'ডার্ক হর্স' বলা যেতে পারে। বিশ্ব ফুটবলে হাঙ্গেরীকে হারিয়ে দিয়ে জার্মানী নিজেকে ডার্ক হর্স বলেই প্রমাণিত করেছে।

* * *

প্রতি চার বছরের ব্যবধানে বিশ্ব ফুটব প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সুতরা বিশ্বের সমস্ত ফুটবলপ্রিয় দেশই বিশ্বপ্রাধা প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জ নিজেদের উপযুক্ত এবং প্রস্তুত করবার যথে সময় পায়। ১৯৫০ সালে শেষবার 'জুলে রিমেট' কাপের খেলা হবার পর বিজয় উরুগুয়ে, বিজিত ব্রেজিল, স্পেন, চিলি প্যারাগুয়ে, হাঙ্গেরী, ইংল্যাণ্ড, যুগো স্লোভিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, মেক্সিকো, ইটাল অস্ট্রিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, তুর প্রভৃতি সমস্ত দেশেই পরবর্তী প্রতিযোগিত

সাজ সাজ রব পড়ে যায়। শৌখীন ও পেশাদার খেলোয়াড়দের বিশ্ব প্রস্তুতির মধ্যে হাঙ্গেরীর প্রস্তুতির কথাই বেশী করে কানে আসে। ১৯৫২ সালের অলিম্পিক সাফল্য হাঙ্গেরীকে আরও অনুপ্রাণিত করে তোলে। দেশে বিদেশে প্রদর্শনী খেলার মধ্য দিয়ে হাঙ্গেরী নিজেকে অধিকতর প্রস্তুত করতে থাকে। বিশ্ব ফুটবলের মূল প্রতিযোগিতা আরম্ভের পূর্বে এই সেদিনও হাঙ্গেরী ইংলণ্ডকে ৭—১ গোলে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলে ইংলণ্ডেরও চেতনা ফিরে আসে। ইংলণ্ড ফুটবলের কর্মকর্তারা ইংলণ্ড টীমকে শক্তিশালী করবার জন্য অবসরপ্রাপ্ত দিকপাল খেলোয়াড় স্টানলী ম্যাথুজকে দলভুক্ত করেন। ম্যাথুজের নামে ইংলণ্ড পাগল। অসাধারণ ফুটবল প্রতিভা তাঁর। দেশের সম্মান রক্ষার জন্য ম্যাথুজও এগিয়ে আসেন। ইংলণ্ড দল ভালই খেলে এবং কোয়ার্টার ফাইন্যালে গতবারের বিশ্বজয়ী উরুগুয়ের কাছে ৪—২ গোলে পরাজয় স্বীকার করে। জাতির সম্মান রক্ষার জন্য ইংলণ্ডের প্রচেষ্টার এটা একটা শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

বিশ্ব প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হলে হাঙ্গেরী তার ফুটবল দলকে কিভাবে সম্বর্ধনা করবে, তার সংক্ষিপ্ত সংবাদও কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। বুদাপেস্টে হাঙ্গেরী ফুটবল টীমের বিরাট প্রতিমূর্তি নির্মাণেরই তোড়জোড় চলছিল, কিন্তু জার্মানী তাদের অতি সাধে বাদ সেধেছে।

জার্মানীর কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যে পশ্চিম বার্লিনেও আনন্দের বান না ডেকেছে, এমন নয়। সংবাদে প্রকাশ, বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে খেলার বেতার বিবরণী শোনার জন্য বার্লিনের রাজপথ এবং রেস্তোরাঁর রেডিওর সম্মুখে আবালবৃদ্ধবনিতার ভীড় জমে যায়। যে সব ট্যাক্সিতে রেডিও আছে, জনতা সেইসব ট্যাক্সি রাস্তার মধ্যে থামিয়ে খেলার ধারা বিবরণী শুনতে থাকে। জার্মান দলের জয়লাভের সংবাদ ঘোষিত হলে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে সারা শহর মেতে ওঠে। প্রকাশ্য রাজপথে নৃত্য করতে আরম্ভ করে আবালবৃদ্ধবনিতা। খেলাধুলার মধ্য দিয়ে জাতির সম্মান যারা জগৎ সভায় উঁচু করে ধরেছেন সেই সব স্মরণীয় ও বরণীয় বীরবৃন্দের সম্বর্ধনার জন্য জার্মানী কি ব্যবস্থা করেছে, তার কোন বিবরণ এখনো পাওয়া যায়নি।

* * *

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইন্যালের একটি খেলা ছাড়া অন্য কোন খেলায় অপ্রীতিকর ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায়নি। বিশ্বের দুই দুর্ধর্ষ ফুটবল টীম হাঙ্গেরী ও ব্রেজিলের সংঘর্ষমূলক খেলাটি প্রতিযোগিতার ইতিহাসের কালিমালিপ্ত ঘটনা।

এবারকার খেলা থেকে আর একটি জিনিস প্রমাণিত হয়েছে, যেটা বিশ্ব প্রতিযোগিতার

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার রানার্স ও ১৯৫২ সালের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হাঙ্গারীর অধিনায়ক ফেরেঙ্ক পুসকাস। পুসকাস বর্তমানে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফরোয়ার্ড হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন

ক্ষেত্রেই সম্ভব। পরম শক্তিশালী দলের পক্ষেও দুই বা তিন গোলে অগ্রগামী হওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। যে কোন সময়ে সুযোগ পেলেই প্রতিপক্ষ দল গোল পরিশোধ করে বিজয়ীর সম্মান ছিনিয়ে নিতে পারে। হাঙ্গেরী ও জার্মানীর ফাইন্যাল খেলা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জগতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দল বলে অভিহিত হাঙ্গেরী ২—০ গোলে অগ্রগামী হয়েও শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করতে পারেনি।

জুলেস রিমেট কাপের পঞ্চম অনুষ্ঠানে এবার ৩৮টি দেশ যোগদান করেছিল। এর মধ্যে পোল্যান্ড ও চীন শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে। প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী এবং কিছু কিছু ফলাফল পূর্বে প্রকাশ করা হয়েছে। এ সংখ্যায় দুটি দল কিভাবে ফাইন্যালে উঠেছে, তার বিবরণ এবং পূর্ববর্তী বিজয়ীদের তালিকা দেওয়া হচ্ছে।

প্রাথমিক খেলা

জার্মানী (৩)	সারল্যান্ড (০)
জার্মানী (৩)	সারল্যান্ড (১)
হাঙ্গেরী (ওঃ ওঃ)	পোল্যান্ড (স্ক্র্যাচ)

মূল প্রতিযোগিতা

জার্মানী (৪)	তুরস্ক (১)
জার্মানী (৩)	হাঙ্গেরী (৮)
জার্মানী (৭)	তুরস্ক (১)
হাঙ্গেরী (৯)	দক্ষিণ কোরিয়া (০)
হাঙ্গেরী (৮)	জার্মানী (৩)

কোয়ার্টার ফাইন্যাল

জার্মানী (২)	যুগোস্লাভিয়া (০)
হাঙ্গেরী (৪)	ব্রেজিল (২)

সেমি ফাইন্যাল

জার্মানী (৬)	অস্ট্রিয়া (১)
হাঙ্গেরী (৪)	উরুগুয়ে (২)

ফাইন্যাল

জার্মানী (৩)	হাঙ্গেরী (২)

পূর্ববর্তী ফাইন্যাল—'১৯৩০'

উরুগুয়ে (৪)	আর্জেণ্টিনা (২)

ফাইন্যাল—'১৯৩৪'

ইটালী (২)	চেকোস্লোভেকিয়া (১)

ফাইন্যাল—'১৯৩৮'

ইটালী (৪)	হাঙ্গেরী (২)

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় হাঙ্গারী ও ব্রেজিলের খেলার পর সুইডিস পুলিশ ও খেলোয়াড়দের ধ্বস্তাধ্বস্তির দৃশ্য

অস্ট্রিয়ান গ্রেজার ক্লাব ও মোহনবাগান ক্লাবের প্রদর্শনী খেলার পূর্বে পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি ক্যালকাটা মাঠে খেলোয়াড়দের সংগে করমর্দন করছেন। মোহনবাগান ক্লাব এই খেলায় ২—১ গোলে অস্ট্রিয়ান দলকে হারিয়ে দেয়

ফাইন্যাল—'১৯৫০'

উরুগুয়ে (অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন)

ব্রেজিল (রানার্স)

(লীগ প্রথায় খেলা হয়)

* * *

অস্ট্রিয়ার গ্রেজার এ্যাথলেটিক ক্লাব কলকাতায় দুটি প্রদর্শনী খেলায় অংশ গ্রহণ করে মোহনবাগান ক্লাবের কাছে ২—১ গোলের ব্যবধানে হার স্বীকার করেছে আর ১—১ গোলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করেছে আই এফ এর দুর্বল টীমের সংগে। অস্ট্রিয়ান দলের ক্রীড়াধারায় নৈপুণ্যের কোনই ছাপ পাওয়া যায়নি। অতি সাধারণ ধরনের একটি শ্বেতকায় টীম অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দূরপ্রাচ্য সফরে যাত্রা করেছে। মাঝ পথে কলকাতা থেকে বেশ কিছু পাথেয় সঞ্চয় করে নিয়ে গেল। সম্প্রতি প্রায় প্রতি বছরই ইউরোপীয় মহাদেশের একটি করে দল দূর-প্রাচ্য সফরের উদ্দেশ্যে বের হয়ে কলকাতায় প্রদর্শনী খেলায় অংশ গ্রহণ করছে। ইতিপূর্বে ইসলিংটন কোরিন্থিয়ান, সুইডেনের হেলসিংবর্গ ক্লাব, গোটেবার্গ ক্লাব, অস্ট্রিয়ার লিজ এ্যাথলেটিক ক্লাব, জার্মানীর অফেনব্যাক কিকার্স প্রভৃতি দল কলকাতায় খেলে গেছে। তাছাড়া চীনের জাতীয় ফুটবল টীমও দুবার অলিম্পিক যাত্রার পথে কলকাতায় প্রদর্শনী খেলায় অংশ গ্রহণ করেছে। বর্মা দেশের ফুটবল খেলার সংগেও কলকাতার ক্রীড়া-রসিকরা পরিচিত। এইসব আগন্তুক দলের মধ্যে শক্তিসামর্থ্যে অস্ট্রিয়ার গ্রেজার অ্যাথ-লেটিক ক্লাব যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল, এবিষয়ে কারো দ্বিমত নেই।

মোহনবাগান ও অস্ট্রিয়ান দলের প্রদর্শনী খেলায় মোহনবাগানের ৬ ফিট লম্বা গোলরক্ষক এস চ্যাটার্জিকে লাফিয়ে উঠে একটি বল ধরতে দেখা যাচ্ছে

* * *

জলবৃষ্টির মধ্যে ইংলণ্ড ও পাকিস্থানের প্রথম টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ইংলণ্ড পাকিস্থান টীমকে শোচনীয়ভাবে এক ইনিংস ও ১২৯ রানে পরাজিত করেছে। দ্বিতীয় টেস্ট খেলার অব্যবহিত পূর্বে ইয়র্কশায়ারের কাছে পাকিস্থান ৭ উইকেটে হার স্বীকার করায় টেস্ট খেলা নিয়ে তারা মোট ১৫টি খেলার মধ্যে দুটি খেলায় পরাজিত হল। ইংলণ্ডে পাকিস্থানের খেলোয়াড়রা এতদিন খুবই খেলছিল, কিন্তু সম্প্রতি দুটি খেলায় তারা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় পাকিস্থানের অধিনায়ক কারদার সুষ্ঠুভাবে নিজ দলকে পরিচালিত করতে পারেননি বলেও ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে মন্তব্য করা হয়েছে। যাই হক 'টেণ্ট ব্রিজ' মাঠে ইংলণ্ডের এই জয়লাভের বিশেষত্ব, তারা দীর্ঘ ২৪ বছর পরে এখানে জয়লাভে সমর্থ

হল। ইংলণ্ডের সুদীর্ঘ ক্রিকেট ইতিহাসে মাত্র তিনবার ইংলণ্ড দল টেস্ট ব্রিজ মাঠে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তারা অস্ট্রেলিয়া দলকে এখানে প্রথম পরাজিত করে। ১৯৩০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পুনরায় জয়লাভ সম্ভব হয়। এবার পাকিস্থানকে হারিয়ে টেস্ট ব্রিজ মাঠে তৃতীয়বার বিজয়ী হল।

দ্বিতীয় টেস্টে কি বোলিং, কি ব্যাটিং, কি ফিল্ডিং, সমস্ত বিভাগেই ইংলণ্ড উন্নত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। প্রধানত টেস্টটীমে নবাগত এ্যাপলইয়ার্ডের মারাত্মক বোলিংয়ে পাকিস্থানের প্রথম ইনিংস অল্প রানে শেষ হয়ে যায়। আর সিম্পসন, কম্পটন ও গ্রেভনির প্রশংসনীয় ব্যাটিংয়ে ইংলণ্ড প্রচুর রান সংগ্রহ করে। ধুরন্দর খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটনের ২৭৮ রান লাভ যুদ্ধোত্তর টেস্ট ক্রিকেটে ব্যক্তিগত রানসংখ্যার সর্বোচ্চ হল। নীচে পাকিস্থানের সংগে ইয়র্কসায়ারের খেলার ফলাফল এবং টেস্ট খেলার ফলাফল দেওয়া হচ্ছে।

ইয়র্কসায়ার : পাকিস্থান

ইয়র্কসায়ার—১ম ইনিংস (৯ উইঃ ডিঃ) (ক্লোজ নঃ আঃ ১২৩, ওয়াটসন ৭২, ৭০; খলিদ হোসেন ৬৯ রানে উইঃ।)

পাকিস্থান—১ম ইনিংস—১৯৯ (ওয়াকার ন ৭৮, ক্লোজ ৫৪ রানে ৪ ও ওয়ার্ডল রানে ৩ উইঃ)।

পাকিস্থান—২য় ইনিংস ৩৫৬ (কারদার ১, ওয়াকার হোসেন ৭৫, আসলাম নঃ ৫৭, টেলর ৩৯ রানে ৩ উইঃ)।

ইয়র্কসায়ার—২য় ইনিংস (৩ উইঃ) ২৪ লসন ৪১, লিস্টার ৪০)।

(ইয়র্কসায়ার ৭ উইকেটে বিজয়ী)

পাকিস্থান : ইংলণ্ড—দ্বিতীয় টেস্ট

পাকিস্থান—১ম ইনিংস ১৫৭ (কারদার এ্যাপলইয়ার্ড ৫১ রানে ৫ উইঃ)।

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস (৬ উইঃ ডিঃ) (ডেনিস কম্পটন ২৭৮, **সিম্পসন** গ্রেভনি ৮৪, **খান মহম্মদ ১৫৫** ৩ উইঃ)।

পাকিস্থান—২য় ইনিংস ২৭২ (মকসুদ ৩৯, হানিফ ৫১, ওয়ার্ডল ৪৪ রানে উইঃ, স্ট্যাথাম ৬৬ রানে ৩ উইঃ।)

(পাকিস্থান এক ইনিংস ও ১২৯ রানে পরাজিত)।

ফুটবল লীগের সাপ্তাহিক আলোচনা

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের দুটি খেলায় ইস্টবেঙ্গলের পরাজয়ের ফলে প্রধানের মধ্যে পয়েন্টের যে পার্থক্য লক্ষিত হয়েছিল, পরবর্তী দুটি খেলায় একে ইস্টবেঙ্গলের জয়লাভ অপরদিকে মোহনবাগানের তিন পয়েন্ট নষ্ট হবার ফলে লীগ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আবার বি এন রেল দলের সংগে 'ড্র' করে এবং ই আই রেল দলের কাছে পরাজয় স্বীকার করে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হতে পিছিয়ে পড়েছে। ফলে সমসংখ্যক খেলায় মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের চেয়ে ৪ পয়েন্ট এগিয়ে আছে। কিন্তু মোহনবাগানের চেয়েও উয়াড়ীর অবস্থা ভাল, কারণ এ পর্যন্ত তারা মাত্র নষ্ট করেছে ৭ পয়েন্ট, আর মোহনবাগান নষ্ট করেছে ৮ পয়েন্ট। তবে মোহনবাগান খেলেছে ১৮টি ম্যাচ আর উয়াড়ী মাত্র ১৪টি। পয়েন্ট পাবার আশা করা আর খেলে পয়েন্ট সংগ্রহের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য।

প্রতিনিয়ত দল পরিবর্তন ইস্টবেঙ্গলের অসামঞ্জস্যপূর্ণ খেলার প্রধান কারণ বলে মনে

ডেনিস কম্পটন। পাকিস্থান ও ইংলণ্ডের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় কম্পটনের ২৭৮ রান যুদ্ধোত্তর টেস্ট ক্রিকেটে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

হয়। কেউই নিজের উপর আস্থা রেখে খেলতে পারছেন না। পরস্পর খেলোয়াড়ের মধ্যে বোঝাপড়া এবং যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রেও বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। দলগত শক্তি অনুযায়ী মোহনবাগানের ক্রীড়াধারারও প্রশংসা করা যায় না। অস্ট্রিয়ান গ্রেজার ক্লাবের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মোহনবাগান ক্লাব যে উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে, তার আগের দিন লীগের খেলায় লীগ কোঠার নীচেকার টীম ক্যালকাটা সার্ভিসেসের সংগে তার সিকি খেলা খেলতে পেরেছে কি না সন্দেহ। গুরুত্বপূর্ণ খেলায় এবং বাইরের টীমের সংগে মোহনবাগান চিরদিনই ভাল খেলে।

ক্যালকাটা সার্ভিস ছাড়া লীগ কোঠার নীচের দিকে খিদিরপুর, ভবানীপুর, জর্জ টেলিগ্রাফ এবং বি এন রেল সবারই দ্বিতীয় ডিভিসনে নামবার আশংকা আছে।

দ্বিতীয় ডিভিসনের অপরাজিত টীম সালকিয়া ফ্রেন্ডস এখনও লীগ কোঠার শীর্ষস্থানে। কাস্টমস, সুবার্বন, ক্যালকাটা, বেনেটোলা সবাই উপরের দিকে উঠবার চেষ্টা করছে। নীচের দিকে শ্যামবাজার ও টাউন ক্লাবের অবস্থা মোটেই ভাল নয়।

তৃতীয় ডিভিসনে দুটি অপরাজিত টীম বেনেপুকুর এবং ইণ্টারন্যাশনাল ছাড়া ক্যালকাটা পুলিশ এবং এলবার্ট স্পোর্টিং চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের আশা রাখে। নীচের দিকে তিন চারটি ক্লাব ডিভিসনচ্যুত হবার আশংকা করছে। চতুর্থ ডিভিসনে বাটা স্পোর্টস ক্লাব এগিয়ে চলেছে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের পথে। তাদের পিছুতাড়া করছে ঐক্য সম্মিলনী। নীচের দিকে শ্যামবাজার ইউনাইটেড ৯টি খেলায় মাত্র ৪ পয়েণ্ট লাভ করেছে আর গ্রেল ক্লাব লাভ করেছে সমসংখ্যক খেলায় মাত্র ২ পয়েন্ট।

গত সপ্তাহের প্রথম ডিভিসন লীগের ফলাফল দিচ্ছি।

৩০শে জুন '৫৪

রাজস্থান (১)	পুলিশ (১)
ই আই আর (১)	কালীঘাট (০)

১লা জুলাই '৫৪

ইস্টবেঙ্গল (১)	এরিয়ান (০)
খিদিরপুর (১)	মোহনবাগান (১)
বি এন আর (৪)	ক্যালঃ সার্ভিসেস (১)

২রা জুলাই '৫৪

উয়াড়ী (০)	ভবানীপুর (০)
রাজস্থান (০)	ই আই আর (০)

৩রা জুলাই '৫৪

মোহনবাগান (১)	ক্যালঃ সার্ভিসেস (০)
ইস্টবেঙ্গল (০)	বি এন আর (০)
স্পোর্টিং ইউনিয়ন (২)	কালীঘাট (০)

৬ই জুলাই '৫৪

ই আই আর (০)	ইস্টবেঙ্গল (১)
পুলিশ (২)	জর্জ টেলিগ্রাফ (১)
খিদিরপুর (৪)	কালীঘাট (১)

খেলাধুলার টুকরো খবর

জাতীয় ফুটবল—আগামী ২৪শে জুলাই থেকে মাদ্রাজে আরম্ভ হচ্ছে জাতীয় ফুটবল বা সন্তোষ ট্রফির খেলা। এবার ১৮টি রাজ্য জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছে। বাংলাকে দ্বিতীয় রাউণ্ডে মধ্য প্রদেশের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে আগামী ৪ঠা আগস্ট।

জেটোপেকের পরাজয়—দূরপাল্লার দৌড়বীর বিশ্বের বিস্ময় এমিল জেটোপেক ১০ হাজার মিটার দৌড়ে হাংগেরীর এ্যাথলীট কো ভ্যাকসের কাছে পরাজিত হয়েছেন। এই বিষয়ে জেটোপেকের বিশ্ব রেকর্ড অবশ্য এখনো কেউ ভাংগতে পারেন নি।

বিশ্ব জিমন্যাস্টিকস—রোমে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতায় রাশিয়া পুরুষ এবং মহিলা উভয় বিভাগেই চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে।

ভারতের জাতীয় বাস্কেট বল—ভারতের জাতীয় বাস্কেটবল খেলা আগামী ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে স্থির হয়েছে। ১৫ বছর পর কলকাতায় এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হল। পুরুষ বিভাগে ১৪টি এবং মহিলা বিভাগে ৮টি রাজ্য জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২৮শে জুন—চীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু আজ এক যুক্ত ইস্তাহারে বলেন, পর-প্রভাবমুক্ত, গণতন্ত্রী স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই ইন্দোচীনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রিদ্বয় চীন-ভারত সৌহার্দ্যের উপর গভীর আস্থা স্থাপন করিয়া বলেন যে, এই মৈত্রী বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিবে।

২৯শে জুন—তিস্তা নদীর সাম্প্রতিক বন্যার ফলে জলপাইগুড়ি জেলার পাঁচটি ইউনিয়নের প্রায় ৫৪ বর্গমাইল পরিমিত এলাকার ১৫ হাজার লোক গৃহহীন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভারতীয় নৌ-বহরের সহকারী প্রধান সেনাপতি কমোডর আর ডি কাটারি ভাইস এডমিরাল স্যার মার্ক পিজের স্থলে অস্থায়ীভাবে ভারতীয় নৌবহরের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

গোয়ার অবস্থার ক্রমাবনতিতে নয়াদিল্লীর কর্তৃপক্ষ আজ উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। নূতন দমনমূলক কার্যকলাপের সংগে সংগে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ ভারতের উপনিবেশসমূহে সশস্ত্রবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

৩০শে জুন—কলিকাতায় নিখিল ভারত শিল্পমালিক সংস্থার ২১তম বার্ষিক অধিবেশন উদ্বোধন করিতে গিয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দেশের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পমালিকগণের উদ্দেশে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষার জন্য সনির্বন্ধ আবেদন জানান।

আজ কলিকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিশু চিকিৎসক ডাঃ ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী শিশু-রোগ নিবারণ ও শিশু-স্বাস্থ্য উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় একটি শিশু-স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেন। প্রস্তাবিত ইনস্টিটিউটে শিশু-স্বাস্থ্য সম্পর্কে স্নাতকোত্তর উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা এবং একটি শিশু হাসপাতাল থাকিবে।

১লা জুলাই—পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আজ রাত্রে ১৯৫৪ সালের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফল প্রকাশ করিয়াছেন। এবার শতকরা পাশের হার এখন পর্যন্ত সঠিকভাবে হিসাব করা সম্ভব হয় নাই। তবে উক্ত হার শতকরা ৫৬।৫৭জন হইবে বলিয়া পর্ষদ মহলে আশা করা হইতেছে।

দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক, কর্মশক্তির মূর্ত প্রতীক পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ৭৩তম জন্মদিবস উপলক্ষে আজ কলিকাতায় কংগ্রেস ভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় ডাঃ রায়কে সম্বর্ধনার উত্তরে ডাঃ রায় বলেন, সেবাই মানুষের পরম সাধন। আমি দীনের সেবার তীর্থযাত্রী।

২রা জুলাই—ভারতের স্বাধীনতা দিবস ১৫ই আগস্ট গোয়ায় ৫ শত ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক সত্যাগ্রহ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

জাতীয় পরিকল্পনা ঋণপত্র দ্বারা ১০৩ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংস্থানকল্পে জাতীয় পরিকল্পনা ঋণপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়।

৩রা জুলাই—তিস্তা নদীতে প্রবল বন্যায় জলপাইগুড়ি জেলার ৫টি ইউনিয়নের ৫৫ বর্গ মাইলব্যাপী বিস্তীর্ণ এলাকা নিমজ্জিত হওয়ায় তথাকার ১৫ হাজার অধিবাসী নিদারুণ দুরবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াছে। এই বন্যায় ৩৩ হাজার একর উত্তম ধানের জমি জলপ্লাবিত ও তিন হাজার কুটীর বিধ্বস্ত হইয়াছে।

বর্ধমান জেলার বৈদ্যপুরে গতকল্য রথযাত্রা উৎসবের সময় রথচক্রে পিষ্ট হইয়া চারিজন নারীসহ পাঁচ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে এবং অপরাপর কয়েকজন আহত হইয়াছে।

গোয়ায় সত্যাগ্রহীদের সম্ভাব্য অভিযান বন্ধ করিবার জন্য গোয়ার পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ বোম্বাই-গোয়া সীমান্ত-বরাবর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে।

৪ঠা জুলাই—আজ পাটনায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মধ্যে উভয় রাজ্যের ভাষা ও শিক্ষাদান সংক্রান্ত নীতি সম্বন্ধে প্রায় পৌনে দুই ঘণ্টা কাল আলোচনা হয়। বিশেষ হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনার ফলে এই দুইটি প্রতিবেশী রাজ্যের প্রধানগণ উভয় রাজ্যে একইরূপ শিক্ষানীতি অবলম্বনে সম্মত হন বলিয়া প্রকাশ।

শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি কমিটির উদ্যোগে ভবানীপুরস্থিত আশুতোষ হলে অর্থনৈতিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ প্রসংগে ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ বেকার সমস্যার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বেকার কর্মসংস্থানের জন্য সরকারকে কুটীরশিল্পে পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিদেশী সংবাদ

২৮শে জুন—গুয়াতেমালার প্রেসিডেন্ট আরবেঞ্জ পদত্যাগ করিয়াছেন এবং সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ কর্নেল দিয়াজের হস্তে [illegible] পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়াছেন।

২৯শে জুন—স্যার উইনস্টন চার্চিল ও প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার অদ্য তাঁহাদের আলোচনা শেষ করিয়া ঘোষণা করেন যে তাঁহারা বিশ্বশান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের জন্য একযোগে চেষ্টা করিয়া যাইবেন।

অদ্য রেঙ্গুনে চীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই ও ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী উ নুর মধ্যে ইন্দোচীন ও [illegible] অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা [illegible]। এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে অনাক্রমণ [illegible] আবশ্যকতা সম্পর্কেও আলোচনা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

১লা জুলাই—ফরাসী সামরিক কর্তৃপক্ষের ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, ৩০ সহস্র [illegible] মিন সৈন্যের আক্রমণে বিপন্ন [illegible] বদ্বীপ এলাকার দক্ষিণাঞ্চল হইতে ফরাসী ভিয়েৎনাম সৈন্যদলকে অপসারণ [illegible]।

২রা জুলাই—পাকিস্থানের মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ হোরেস হিলড্রেথ অদ্য এখানে সাংবাদিকগণকে বলেন যে, আগামী [illegible] মাস হইতেই পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি [illegible] যায়ী সামরিক দ্রব্যসম্ভার পাকিস্থানে প্রেরণ শুরু হইবে।

গুয়াতেমালায় ১২ দিন যাবৎ যে যুদ্ধ চলিতেছিল, অদ্য তাহার অবসানকল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। সরকার ও বিদ্রোহীপক্ষের প্রধানগণ অদ্য এক বৈঠকে মিলিত হইয়া পাঁচজন সদস্য সমন্বিত এক শাসন পরিষদ গঠনের ভিত্তিতে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

৩রা জুলাই—বর্ষা আরম্ভের পর হইতে প্রায় অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে পূর্ববঙ্গে চট্টগ্রাম নোয়াখালি, ত্রিপুরা, রংপুর ময়মনসিংহ সহ কয়েকটি জেলায় আতঙ্কজনক বন্যা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

পাকিস্থান পার্লামেন্টে পূর্ববঙ্গে গভর্নর শাসন প্রবর্তন সম্পর্কে আজ পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হইলে স্বতন্ত্র সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতায় অবিলম্বে পূর্ববঙ্গ হইতে গবর্নরী শাসন প্রত্যাহারের দাবী জানান।

৪ঠা জুলাই—ভিয়েৎমিন বেতারে ঘোষণা করা হয় যে, ফরাসী ইউনিয়ন ও ভিয়েৎমিন প্রতিনিধি দল অদ্য হানয়ের ২৫ মাইল উত্তরে তুংগিয়া নামক স্থানে ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করেন।

প্রতি সংখ্যা—৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষান্মাসিক—১০৲

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২১ বর্ষ
সংখ্যা ৩৭

শনিবার
১ শ্রাবণ, ১৩৬১

DESH SATURDAY, 17TH JULY, 1954.

ম্পাদক—**শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন** সহকারী সম্পাদক—**শ্রীসাগরময় ঘোষ**

সাময়িক প্রসঙ্গ

বঙ্গের উদ্বাস্তুদের সমস্যা

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের র্বাসন সমস্যা সম্পর্কিত তথ্য ধ বিচার বিবেচনা করিবার উদ্দেশ্যে ত সরকারের অর্থসচিব, পুনর্বাসন র এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে য় একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। কমিটির রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত ছে। কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পুনর্বাসন সম্পর্কে র পক্ষের দোষত্রুটি ব্যক্ত করিয়াছেন। রা পুনর্বাসন সমস্যা সমাধানের জন্য গুলি কার্যকর পন্থা নির্দেশ য়াছেন। কমিটির মতে পশিচমবঙ্গের রে ব্যাপকভাবে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু- পুনর্বাসনের পরিকল্পনা ফলপ্রসূ ত পারে না এবং অতঃপর তেমন পরিত্যাগ করাই উচিত। কমিটি প্রান্ত উদ্বাস্তুদেরই দায়ী য়াছেন। তাঁহাদের অভিমত এই যে, বঙ্গের উদ্বাস্তুগণ পশিচমবঙ্গের রে যাইতে অত্যন্তই অনিচ্ছুক। অন্য শে গিয়া সেখানকার প্রতিবেশে দের উপযোগী করিয়া লইতে হইলে কষ্ট স্বীকার করা প্রয়োজন, তাহারা তে আদৌ আগ্রহশীল নয়। বলা ল্য কমিটির এই অভিমত আমরা শে স্বীকার করিয়া লইতে ত নহি। আমাদের মতে অন্য শে গিয়া বসবাস করিতে হইলে নে যেটুকু সহানুভূতি এবং সাহায্য করা দরকার, উদ্বাস্তুরা তাহা না; পরন্তু নূতন প্রতিবেশের প্রতি- ভাই তাহাদের জীবনে সকল দিক ত স্পষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু এই থার পুরাপুরি প্রতিকার সাধন করা সরকারী নিয়ম-নীতির নির্দেশের সাহায্যে সুকঠিন এরূপ অবস্থায় বিহার এবং উড়িষ্যায় পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিবার পক্ষে কমিটি যে সুপারিশ করিয়াছেন, বাস্তব অবস্থার দিক হইতে আমাদের মতেও কার্যকর পন্থা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ভিতরে যথারীতি পুন- র্বাসনের ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রথমেই জমির সমস্যা দেখা দেয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। পশ্চিম- বঙ্গের আয়তন ৩০ হাজার বর্গমাইল মাত্র। এই ক্ষুদ্র রাজ্যে পূর্ববঙ্গের ৪৫।৫০ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা কিভাবে সম্ভব হইতে পারে, এই প্রশ্ন খুবই গুরুতর। বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গে এজন্য আবশ্যক ভূমির সংস্থান করা অসম্ভব, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বিশেষত পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু- দের সমস্যা পশ্চিম পাকিস্থানের মত নয়। পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুদের সমাগম বন্ধ হইয়া যায় নাই। দেখা যাইতেছে, আবার ইহার গতি বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে অনির্দিষ্টকালের জন্য এই সমস্যা চলিতেই থাকিবে। এরূপ অবস্থায় বিহার এবং আসামের বঙ্গ-ভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিলে তবেই এই সমস্যা সমাধানের পথ সুগম হইতে পারে। সীমানা-সম্পর্কিত প্রশ্নটির বিষয়ে বিচার-বিবেচনার ভার রাজ্য কমি- শনের উপর রহিয়াছে, ইহা অবশ্য সত্য; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সম্প্রসারণ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিতে পারেন। বাস্তবিকপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা যদি সম্প্রসারিত না হয়, তাহা হইলে কমিটির সুপারিশ কিভাবে কার্যে পরিণত হইতে পারে, বুঝিয়া উঠা যায় না। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কমিটি পুনর্বাসন ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করিলেও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ব্যাপারে দুর্নীতির প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। লক্ষ লক্ষ টাকা যেভাবে লোপাট হইয়া গিয়াছে এবং এখনও যাইতেছে, তাঁহারা সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করাই সমীচীন বোধ করেন নাই। ভারত সরকারের পুনর্বাসন সচিব শ্রীযুত অজিতপ্রসাদ জৈন কয়েকদিন কলিকাতা থাকিয়া পুনর্বাসন ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, এদিকে তাঁহার দৃষ্টি অবিলম্বে আকৃষ্ট হইবে এবং কমিটির সুপারিশসমূহের সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করিতে তিনি সর্ববিধ ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যোগী হইবেন।

ছাত্র-সমাজের দুর্গতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস- চ্যান্সেলার ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ সেদিন একটি ভাষণে কলিকাতার ছাত্রসমাজের মর্মান্তিক চিত্র উদ্ঘাটন করিয়াছেন। ডক্টর ঘোষ তথ্য সহযোগে দেখাইয়াছেন যে, কলিকাতার ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৮৫ জনই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের। এইসব পরিবারের মাসিক আয় মাথাপিছু ৩০ টাকার বেশী নয়। ছাত্রদের মধ্যে শতকরা

৬০ জন পাটকলের শ্রমিকদের চেয়েও দুরবস্থার মধ্যে বাস করে। শতকরা ৪০ জন কাঁচা ঘরে থাকে। বাড়ীতে মাথা গুঁজিবার উপযুক্ত স্থান ইহাদের নাই। কলেজের অবস্থা তদপেক্ষা শোচনীয়। সেখানে তাহাদের বসিবার স্থানটুকু কোনরকমে জুটে কিনা সন্দেহ। ফলে ভাল ছেলেরা নানারকম অসুবিধার মধ্যে ক্লাস করিবার চেষ্টা করে, অন্যান্য ছেলেরা রাস্তায় ঘুরিয়া দিন কাটায়। ডক্টর ঘোষ বেসরকারী কলেজসমূহের এই শ্রেণীর অব্যবস্থা এবং কুব্যবস্থার বিবরণ দিয়া বলিয়াছেন, এইগুলিকে দস্তুরমত প্রতারণার ক্ষেত্র বলা যাইতে পারে। ছাত্রদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে এগুলির লক্ষ্য নাই, শিক্ষা বিধানের দিকে দৃষ্টির অভাব ততোধিক। লাইব্রেরীতে নূতন বই থাকে না, কমন রুম বলিতে এইসব কলেজে প্রকৃতপক্ষে কিছু নাই। খেলা-ধুলার ব্যবস্থা খুব কম কলেজেরই আছে। এরূপ অবস্থায় ছাত্রেরা যে নৈরাশ্যে অভিভূত হইবে এবং তাহাদের মধ্যে ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি প্রশ্রয় পাইবে, ইহাতে আশ্চর্য কি? প্রকৃতপক্ষে ডক্টর ঘোষ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছাত্রদের জীবনের যে মর্মান্তিক অবস্থার কথা বলিয়াছেন, ইহা গোপন কিছু নয়। সকলেই এই ছাত্রদের এই অবস্থার কথা জানেন, কর্তৃপক্ষও ইহা অবগত আছেন। কিন্তু প্রতীকারের কি ব্যবস্থা হইয়াছে? ডক্টর ঘোষ বলিয়াছেন, সরকার জলসেচ এবং অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব দিতেছেন, কিন্তু ছাত্রদের মানসিক উন্নতি সাধনের প্রয়োজনের গুরুত্ব নিশ্চয়ই তদপেক্ষা কম নয়। এ কথার উপর মন্তব্য করিবার কিছুই নাই। ভবিষ্যতের ভাবনাই আমাদিগকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিতেছে।

গুণ্ডামি দমন

কলিকাতার পুলিস গুণ্ডামি দমনে উদ্যোগী হইয়াছে। এ উদ্যোগ আগেই করা উচিত ছিল। কিছুকাল হইতে এই উপদ্রব কলিকাতা এবং শহরতলী অঞ্চলে সমাজ-জীবনকে একরকম বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে, অথচ কর্তৃপক্ষ ইতঃপূর্বে ইহার প্রতীকারে যথোচিত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। কলিকাতা শহরে গুণ্ডার উপদ্রব অবশ্য নূতন নয়। কিন্তু গত কয়েক বৎসর হইতে ইহা সমধিক ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে এবং ইহার রীতি-পদ্ধতিতেও অভিনব বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধ দেশের সমাজের নৈতিক আদর্শের ভিত্তি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। বিগত শতাব্দীকালের অধিক হইতে বাঙ্গলার রাজনীতিক সাধনার মূলে আধ্যাত্মিকতার একটি আদর্শ এদেশের সমাজে, বিশেষভাবে তরুণদের মধ্যে নৈতিক শক্তিকে সঞ্জীবিত এবং সুদৃঢ় রাখিয়াছিল। এখন সেক্ষেত্রে অর্থ প্রয়োজনের দিকটাই বড় হইয়া পড়িয়াছে এবং নৈতিক আদর্শ অপেক্ষাকৃত গৌণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার ফলে চরিত্রগঠনে উপযুক্ত উপাদানের অভাব ঘটিতেছে এবং স্বেচ্ছাচারিতার একটা ভাব সমাজ-জীবনে ছড়াইয়া পড়িতেছে। নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন গুছাইয়া লওয়াই বর্তমানে সাধ্য ও সাধনার ক্ষেত্র উত্তরোত্তর অধিকার করিতেছে। মানুষের ধন-প্রাণের কোন মূল্যই এখন যেন আর নাই। নূতন ধরণের এইসব গুণ্ডামীর মূল অনেকটা এমন সমাজদ্রোহী মনোভাবের মধ্যে রহিয়াছে। গুণ্ডামি দমনে পুলিসী ব্যবস্থার কঠোরতার অবশ্যই প্রয়োজন আছে, কিন্তু শুধু পুলিসের সাহায্যেই ইহার প্রতীকার সাধন সম্ভব নয়। কারণ গলদ ঢুকিয়াছে গোড়ায়। আমাদের সমাজ-জীবনে এবং রাজনীতিক ক্ষেত্রে নৈতিক সমুন্নতি সাধিত না হইলে এইসব দৌরাত্ম্য দূর হইবে না; প্রত্যুত গুণ্ডামির প্রক্রিয়ারই পরিবর্তন ঘটিবে মাত্র; আমাদের ইহাই বিশ্বাস।

অনর্থকর আন্দোলন

কংগ্রেস সভাপতি স্বরূপে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্প্রতি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিসমূহের সভাপতিদের নিকট একখানি চিঠি পাঠাইয়াছেন। এই চিঠিতে রাজ্য পুনর্গঠন সম্পর্কে কোন কোন কংগ্রেসকর্মীদের কাজের তিনি তীব্র নিন্দাবাদ করিয়াছেন। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, এক রাজ্যের লোক অপর রাজ্যের লোককে হুমকি দেখাইতেছে। শুধু তাহাই নয়, বেপরোয়াভাবে তাহাদের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মনে হয়, ইহারা যেন বিদেশী কিংবা পরের রাজ্যে জোর করিয়া ঢুকিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সব ঐতিহ্য বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইতে বসিয়াছে। ইহাদের কাছে ভারতের বর্তমান সংবিধান পর্যন্ত উপেক্ষিত হইতেছে। কংগ্রেস-সভাপতির উক্তির যাথার্থ্য সকলেই স্বীকার করিবেন, কিন্তু তাঁহার বিবৃতি পাঠে মনে হইবে, যেন জনসাধারণকে তিনি এই সম্পর্কে দায়িত্বে জড়িত করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে অপ্রীতিকর এমন প্রতিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে জনসাধারণ একেবারেই সংশ্লিষ্ট নয়। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কংগ্রেসকর্মী যাঁহারা, এমন কি, যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্পর্কে রাজ্য বিশেষের কংগ্রেসী সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাঁহারাই ঐরূপ সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার বশে পরিচালিত হইতেছেন। এই সম্পর্কে কিছুদিন পূর্বে পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত বিহার কংগ্রেস সম্মেলনের কথা উল্লেখ করা চলে। বিহার সরকারের দায়িত্বসম্পন্ন পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের কাজে যেখানে প্রাদেশিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। পণ্ডিতজী প্রশ্ন করিয়াছেন, আমরা কি এতটাই অধঃপতিত হইয়াছি যে, কংগ্রেসের মৌলিক আদর্শ আমরা বিস্মৃত হইব এবং এই শ্রেণীর বিদ্বেষবুদ্ধি বাড়িতে দিব? এই প্রশ্নের আমরা কি উত্তর দিব বুঝি না। আমরা দেখিতেছি, ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ সাধনের প্রেরণায় এবং জাতীয়তার সমর্থক স্বরূপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কূট নীতির প্রতিবাদকল্পে বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলকে বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য যে প্রদেশের প্রবীণ জননায়কগণ একদিন সংকল্পশীলতার সহিত দাঁড়াইয়াছিলেন, আজ সেই প্রদেশের কংগ্রেসকর্মীরাই উক্ত অন্যায়ের প্রতীকারের প্রসঙ্গ উত্থাপন মাত্র উত্তেজিত হইয়া কংগ্রেসের আদর্শ এবং ঐতিহ্যকে পদদলিত করিতেছেন।

মিঃ মলটভ ও মিঃ চৌ এন-লাই জেনেভায় ফিরে গেছেন। মিঃ ইডেন এবং মঁ মেঁদে-ফ্রান্সও জেনেভায় গিয়েছিলেন কিন্তু মিঃ ডালেসের টানে তাঁদেরকে প্যারিসে আসতে হয়েছে। মিঃ ডালেস জেনেভা কনফারেন্সে ফিরে যেতে রাজী নন—যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি আগাম বুঝতে পারছেন যে, কম্যুনিস্ট পক্ষ ইন্দোচীন সম্পর্কে এরূপ সর্তে মিটমাট করতে রাজী যা মার্কিন গভর্নমেণ্টের মেনে নিতে আপত্তি হবে না। অর্থাৎ দরাদরির দায়িত্বটা মিঃ ইডেন ও মঃ মেঁদে-ফ্রান্সকে বহন করতে হচ্ছে, তবে ফলটা গ্রাহ্য হবে কিনা সেটা মিঃ ডালেসের উপর নির্ভর করছে।
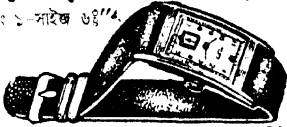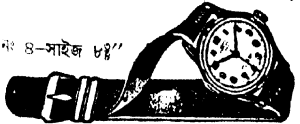
বৈদেশিকী

এই কায়দায় কোন্ পক্ষের সুবিধা হচ্ছে ঠিক বলা মুশকিল। বদনামের দিক দিয়ে মার্কিন সরকারের ক্ষতি হচ্ছে—অন্তত আপাতদৃষ্টিতে তাই দেখা যাচ্ছে সন্দেহ নেই। মিঃ ডালেস কনফারেন্স থেকে দূরে সরে থাকছেন কারণ আমেরিকা মিটমাট চায় না, ইন্দোচীনে যুদ্ধ-বিরতির জন্য আমেরিকার গরজ নেই—একথা প্রচারের পক্ষে খুব সুবিধা হয়েছে এবং বেশির ভাগ লোকের কাছে একথা বিশ্বাসযোগ্য বলেও মনে হবে। সোভিয়েট ও চীন শান্তি চায়, বৃটেন এবং ফ্রান্সও শান্তির জন্য আগ্রহান্বিত, কেবল আমেরিকারই শান্তির জন্য কোনো আগ্রহ নেই, ফ্রান্স অনেক ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে মেটাতে রাজী কিন্তু আমেরিকাই মেটাতে দিচ্ছে না—মিঃ ডালেসের বাহ্যিক ব্যাপারে এসব কথা সাধারণের নিকট খুবই বিশ্বাস্য করে তুলেছে। সুতরাং আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডার দিক থেকে কম্যুনিস্ট পক্ষের যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে সন্দেহ নেই।

কিন্তু আসল দরাদরির দিক থেকে মার্কিন ব্যবহারে কম্যুনিস্ট পক্ষের যে খুব সুবিধা হচ্ছে বোধ হয় তা নয়, বরঞ্চ অসুবিধাই হচ্ছে বলে মনে হয়। আমেরিকা ও তার মিত্রদের মধ্যে মনোভেদ সৃষ্টি করা এবং মার্কিন গভর্নমেণ্ট অন্যায় করে মিটমাটে বাগড়া দিচ্ছে—এটা প্রমাণ করতে হলে বৃটেন ও ফ্রান্সের নিকট কম্যুনিস্ট পক্ষকে যতদূর সম্ভব ভালোমানুষি করতে হয় এবং এমন সব সর্তে রাজীর ভাব দেখাতে হয় যেগুলি প্রত্যাখ্যান করলে আমেরিকার গোঁয়াতুমি সহজসিদ্ধ বলে প্রমাণিত হবে। এই অবস্থায় দরাদরি করতে মিঃ ইডেন ও মঃ মেঁদে-ফ্রান্সের একদিক দিয়ে সুবিধাই হচ্ছে বলা যায়। মিঃ ডালেস যদি উপস্থিত থাকতেন তাহলে কম্যুনিস্ট পক্ষের কাছ থেকে যতটা আদায় করা যেত তাঁর অনুপস্থিতিতে তার চেয়ে বেশি আদায় করা হয়ত হচ্ছে। সুতরাং মিঃ ডালেসের ব্যবহারকে যতটা পাগলামি বা অদ্ভুত বলে অনেকের মনে হচ্ছে আসলে তা নাও হতে পারে। যে কারণেই হোক কম্যুনিস্ট পক্ষ ইন্দোচীনে আপাতত যুদ্ধ-বিরতি চায়—একথা যদি ঠিক হয় তবে মিঃ ডালেস যে-পন্থা নিয়েছেন তাতে ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী পক্ষের কোনো ক্ষতি নেই, কারণ আমেরিকার সরে থাকার দরুণ কম্যুনিস্ট পক্ষকে যতদূর সম্ভব মিঃ ইডেন ও মঃ মেঁদে-ফ্রান্সকে খুশী করার চেষ্টা করতে হচ্ছে অথচ এটাও জানা কথা যে, আমেরিকার আপত্তি ঠেলে ফেলে ফ্রান্স অথবা বৃটেনের কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং মিঃ ডালেসের ব্যবহারে কম্যুনিস্ট পক্ষ নিছক কৌতুক অনুভব করছেন, এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই।

মিঃ ইডেন ও মঃ মেঁদে-ফ্রান্স

জেনেভায় মিঃ মলটভ ও মিঃ চৌকে বসিয়ে রেখে প্যারিসে মিঃ ডালেসের সঙ্গে দেখা করতে ছুটলেন—যখন পঞ্চশক্তির সম্মেলন চলার কথা তখন তিন পাশ্চাত্য শক্তির পররাষ্ট্র সচিবরা এমন আলাদাভাবে মিলিত হচ্ছেন—এতে মিঃ মলটভ ও মিঃ চৌয়ের রাগ হচ্ছে সন্দেহ নেই কিন্তু মিঃ ডালেসের সঙ্গে কথা বলে মিঃ ইডেন ও মঃ মেঁদে-ফ্রান্সের না ফেরা পর্যন্ত ধৈর্য-ধারণ করা ছাড়া কোনো পথও নেই। মিঃ ইডেন ও মঃ মেঁদে-ফ্রান্স জেনেভায় মিঃ মলটভ ও মিঃ চৌ-এর সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক কী ধারণা নিয়ে প্যারিসে মিঃ ডালেসের সঙ্গে আলাপ করতে গেছেন সেটা প্রকাশ হয়নি। যদি কম্যুনিস্ট পক্ষ এরূপ সর্ত স্বীকার করতে রাজী হয়ে থাকেন যা প্রকাশ্যে অনুমোদন করতে মার্কিন গভর্নমেণ্টের আপত্তি নেই তাহলে মিঃ ডালেস জেনেভা পর্যন্ত যেতে পারেন —এ সম্ভাবনাও যে একেবারে নেই তা নয়। তবে এক্ষেত্রে আমেরিকার "ধরি মাছ না ছুঁই পানি"র নীতির দিকেই বেশি ঝোঁক বলে মনে হয়।

এমন হতে পারে যে, ইন্দোচীনে যুদ্ধ-বিরতির একটা ব্যবস্থা হয়ে যায় তা আমেরিকা চাচ্ছে কিন্তু সেই ব্যবস্থার সঙ্গে আমেরিকা নিজে এমনভাবে জড়িত হতে চাচ্ছে না যাতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে আরো কিছু করার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার "নিরাপত্তা রক্ষার" জন্য কয়েকটি শক্তির মধ্যে একটা সামরিক চুক্তির যে পরিকল্পনা আমেরিকায় আছে সেটাকে রূপায়িত করার পক্ষে কোনো নূতন বাধা সৃষ্টি না হয় আমেরিকার দৃষ্টি সেই দিকে। কম্যুনিস্ট পক্ষের দৃষ্টিতে জেনেভা কনফারেন্সের উদ্দেশ্য কেবল ইন্দোচীনে যুদ্ধ-বিরতি নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জন্য মার্কিন-পরিকল্পিত সামরিক চুক্তির উদ্যোগ ব্যর্থ করাও কম্যুনিস্ট পক্ষের একটা প্রধান লক্ষ্য। কম্যুনিস্ট পক্ষ এই দুই উদ্দেশ্য এক সঙ্গে সাধন করতে চান। আমেরিকা তা হতে দিতে চায় না এবং দেবেও না।

সামরিক চুক্তির ব্যাপারটাতে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি প্রকাশ্যে স্বীকৃত হয়েছে—চার্চিল-আইসেনহাওয়ারের যুক্ত বিবৃতিতে। ইন্দোচীনের সম্পর্কে কী মিটমাট হয় তার উপর নির্ভর না করে অথবা মিটমাট হোক আর নাই হোক, সামরিক চুক্তির উদ্যোগ চলতেই থাকবে। ইন্দোচীনের সম্পর্কে চুক্তি ফ্রান্স ও ভিয়েৎমিনের মধ্যে হতে পারে, সেটা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তা চুক্তি আলাদা করে রাখা হবে—এই হচ্ছে আমেরিকার ইচ্ছা। অবশ্য ইন্দোচীনের সম্পর্কেও আমেরিকা যে-কোনোরকম চুক্তি হতে দিতে চায় না তবে এ বিষয়ে ফ্রান্সের চেয়েও আমেরিকার মত বেশি কঠোর—এই যে একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছে সেটা কতদূর ঠিক বলা যায় না।

ইন্দোচীনের যুদ্ধ-বিরতির আসল সমস্যা হচ্ছে—ভাগরেখা কোনখান দিয়ে টানা হবে, কতদূর পর্যন্ত কোন্ পক্ষের প্রভাবাধীন থাকবে। এ বিষয়ে মার্কিন এবং ফরাসী ও বৃটিশের মধ্যে কোনো গুরুতর মতভেদ হবার সম্ভাবনা নেই। এটা সম্পূর্ণরূপে কম্যুনিস্ট-অকম্যুনিস্ট সমস্যা। যুদ্ধ-বিরতির পরে ইন্দোচীনের বিভিন্ন রাষ্ট্রের ঐক্য ও স্বাধীনতা নিয়ে যে-সব প্রশ্ন উঠেছে সেগুলির বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। কোরিয়ার রাজনৈতিক সমস্যার যে গতি হয়েছে, যুদ্ধ-বিরতির পরে ইন্দোচীনের রাজনৈতিক সমস্যারও সেই গতি হবে।

১৪।৭।৫৪

তৃতীয়ার চাঁদ

নিশিকান্ত

শীর্ণ-জ্যোতির বাঁকা রেখা আঁকা, এ চন্দ্র ক্ষীণ তৃতীয়ার!
গাঁথা হয়নি তো গীতিহার,
সুরের সুতায় সবে শোভিয়াছে প্রথম-তানের গুঞ্জন-মঞ্জরী;
কূলের ধরণী পরশ করেনি তবু দেখা যায় তরী,
বহুদূরে থেকে ভেসে ভেসে আসে; প্রিয়া,
আর নিরাশার নিশীথে নিলীন রাখিও না তব হিয়া।

চেয়ে দেখো ঐ শুভ্র-সূচনা মোদের পূর্ণ-প্রেম-পূর্ণিমা-রজনীর,
আঁখি হ'তে তব মোছ নীর,
এলায়িত তব কালো কুন্তলে মোহন-কবরী-কুঞ্জ রচনা করো,
সেথায় অমল যামিনীগন্ধা-কুসুমের রাশি পরো,
বিষাদ-তিমির-অবগুণ্ঠন খোলো,
ও চাঁদের মত মৃদুহাসি হেসে মোর পানে মুখ তোলো।

কত বেলা কত বিফলে গিয়েছে দারুণ-বিরহ-যাতনায়,
মোদের মিলন-সাধনায়
কত জন্মের কত যে বাধার রঞ্জিত আলো, করাল অন্ধকার,
সখি, আমাদের বাঞ্ছিত আলো ঢেকে রেখেছিল, আর
ভুল পথে মোরা কত যে মরেছি ঘুরে,
কাছে আছি তবু দোঁহে দু'জনারে রাখিয়াছি দূরে দূরে।

কপট-প্রেমের জালে জড়াইয়া করিয়াছি মান-অভিমান,
এ অনিরুদ্ধ-অভিযান
রুদ্ধ করেছি কতবার কত ছায়াঘনবন-বীথিকার অঙ্গনে,
দুর্লভ-দিন করেছি বিলীন মরুমরীচিকা সনে,
মর-মিলনের চুম্বনে-আশ্লেষে
কতবার মোরা কাল-জলধির সংঘাতে গেছি ভেসে।

অনতলে ভাসা ফেনার মতন। এজীবন অগভীর নয়,
হয়ে গেছে তল নির্ণয়!
এল গভীরের মণি-সুধাংশু বিদীর্ণ করি' বিভাবরী-আবরণে,
চপল খেলার কাল চলে গেল এ জন্ম জাগরণে;
প্রিয়া, আমাদের মিলন-পূর্ণিমার
পূর্ব-আভাস অঙ্কিত করে এ চন্দ্র তৃতীয়ার।

ইংরেজী ১৯৫৪ সালের ৮ই জুলাই ভারতে পৃথিবীর বৃহত্তম খাল (ভাখ্‌রা নাঙ্গাল) খোলা হইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"খুবই আশা এবং আনন্দের সংবাদ। এই প্রসঙ্গে মনে না করে উপায় নেই যে, খাল কেটে পৃথিবীর বৃহত্তম কুমীরও একদিন এই ভারতই আমদানী করেছিল। আমরা আশা করে থাকব, খালের জলে দেশের কৃষি-সম্পদ বৃদ্ধি হোক আর বন্ধ হোক কুমীরের আমদানী !!

* * *

পল্লী উন্নয়নে একটি গৃহস্থালী বিভাগ খুলিয়া তাহাতে নারী কর্মী নিয়োগের কথা নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।—"অতঃপর বৈবাহিক বিজ্ঞাপনে শুধু নৃত্য-গীত পটীয়সীর সন্ধান নিয়ন্ত্রিত না হলে সরকারী গৃহস্থালী বিভাগে নারী কর্মীর অভাব ঘটবে বলেই আশংকা করছি—" মন্তব্য করিল আমাদের শ্যামলাল।

* * *

১৯৫১ সালের লোকগণনায় নাকি জানা গিয়াছে যে, পুরুষ অপেক্ষা নারীর আনুপাতিক সংখ্যা কিছু কম।

—"তাতে কিছু আসে যায় না, নারীরা বলতে পারেন—হতে প্যার ক্ষীণ, তবু নহি মোরা হীন"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

পাটনার এক সংবাদে প্রকাশ যে, পাহারায় মোতায়েন থাকাকালে নাক ডাকানো অপরাধে নাকি কয়েকটি পুলিশকে বরখাস্ত করা হইয়াছে। বিশু-

খুড়ো বলিলেন—"এদের ঠিক শাস্তিই হয়েছে। পাহারা দিতে গিয়ে ঘুম বরং চলতে পারে কিন্তু নাক ডাকানো যে মহা অপরাধ। ঘুম হবে অথচ নাক ডাকবে না

পুলিশরা সেই ট্রেনিং নিতে ভুল করবেন না।"

* * *

কলিকাতা কর্পোরেশন নাকি কলিকাতার বস্তি অঞ্চল উন্নয়নের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। জনৈক সহযাত্রী সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন—"এই নিয়ে ক'বার হলো, দাদা।"

* * *

এক সংবাদে জানা গেল এক একটি টেলিফোনের নাকি ৩৬৩টি করিয়া কলকব্জা রহিয়াছে।—"সুতরাং অনিবার্য ফলং নিরুত্তরম্, অবাঞ্ছিত নম্বরম্ এবং বহুধা বিভ্রাটম্"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন্-লাই নাকি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেননকে একটি নিরামিষ ভোজে আপ্যায়িত করিয়াছেন। —"আপ্যায়নের সংবাদে আমরা অবশ্য খুশীই হয়েছি, তবে চৌ-এন্-লাই চাউ-চাউ জাতীয় ভালোমন্দ এটা-সেটা খাওয়ালেও পারতেন। আমরা টেলিগ্রামের ভুল অর্থ করে চৌ-এন্-লাইকে নিরামিষ ভোজীই নয় মনে করেছিলাম কিন্তু সেই ভুল সংশোধন তো করেছি, সুতরাং—" —বলিল শ্যামলাল।

* * *

বিলাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানী জনৈক ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করেন। অভিযোগে বলা হয় যে, উক্ত ব্যক্তির গৃহে রীতিমত বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে, অথচ বিদ্যুতের বিল তিনি চুকাইতেছেন না। বিবাদী বলেন যে তাঁর গৃহে একটি আণবিক মুরগী আছে, মুরগীটি আণবিক ডিম্ব প্রসব করে এবং সেই ডিম্ব হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়। বিচারক অবশ্য এই কাহিনী বিশ্বাস করেন নাই। —সংবাদটি শুনিয়া জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"মুরগীর আণবিক ডিমের কথা জানিনে কিন্তু শুনেছি এখানে কারু কারু গৃহে নাকি ঘোড়ার ডিম থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়
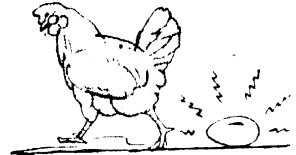
এবং অশ্ব Noble Animal বলেই কোম্পানীও ডিম-চেরা বিচারের জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন না।"

* * *

সিডনীর সংবাদে প্রকাশ সেখানে ভেড়াদের নাকি লিঙ্গান্তর হইতেছে। —"এতে আমাদের কিছু যাবে-আসবে না, শুধু ভেড়ার চামড়া পরে ন্যাকড়েদের গেরস্থ বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘোরার সুযোগ না ঘটলেই হয়"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

নারায়ণগঞ্জে তিনমাইলব্যাপী আদমজী জুট মিলের অঞ্চলটিকে 'সংরক্ষিত' এলাকা বলে ঘোষণা করা হইয়াছে।—"কিন্তু আমরা শুনেছি ইস্কন্দার মির্জা সাহেব নাকি গোটা পূর্ব পাকিস্তান এলাকাটাকেই সংরক্ষিত করে রেখেছেন"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

শিল্পচর্চা

শ্রীনন্দলাল বসু

ছবি ॥ মন-গড়া (conventional) নানাবিধ ছাঁদ

ছবি করতে হলে প্রকৃতির কাছে পাঠ
নওয়া একটা দিক, তাতে জগতের তাবৎ-
্পের গতি প্রকৃতি গড়ন সম্বন্ধে জ্ঞান
াভ হয়; আর একটা দিক হল মানসিক
াঁদ বা ছন্দের আরোপ---এই ছাঁদ বা ছন্দ
বভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে প্রাকৃতিক
িরিবেশ ও জাতির বিশিষ্ট চরিত্র
ভয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ক্রমিক বিকাশ
াভ করেছে আর তারই ফলে বিভিন্ন
াতির বিভিন্ন চিত্রধারা, তার ভিন্ন
ীতিপদ্ধতি দেখা যায়। আমাদের দেশের
ল্পে অনেক সময় কোনো ফুলের বা
াতার গড়নের আশ্রয়ে রূপ কল্পনা করা
য়েছে---তাতে গড়নের বিচিত্রতা, 'ভঙ্গী',
া ও ছন্দ এসেছে।

ফুলের পাপড়ির মতো বেশি কোণ। ঘেরটিতে শঙ্খের মতো, কল্কার মতো ভঙ্গী থাকায় মূর্তিটি সুন্দর হয়েছে এবং সমস্ত ব্লকটিকে পটভূমি থেকে কাঁচি দিয়ে কেটে নেওয়া চলে সহজেই।

পান

অশ্বত্থ
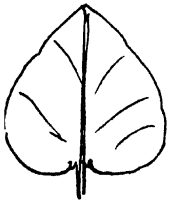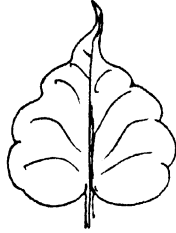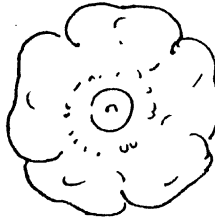
টগর
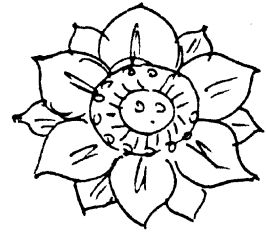
পদ্ম। চার দিকে বেশি কোণ বা বিচ্ছিন্ন অংশ

কল্কা

পদ্মমণি

ছাতিম পাতা

এবিষয়টি আমার Ornamental Art পুস্তিকায় আলোচিত হয়েছে। অন্যত্র বলেছি, 'মণ্ডন শিল্পে আলংকারিক চিত্রে) কোনো নক্সা করতে হলে তার সীমা (ঘের) বিভাগ ও গতি-ভঙ্গী আগে ঠিক করে নেওয়া হয়, পরে তাতে ইউনিট (motif, unit) যোগ করা হয়।'
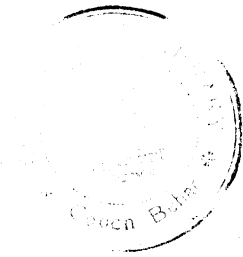
একটি বাঙালিবাবুর ছান্দসিক চেহারা; এ ব্লকটি কাঁচি দিয়ে পরিষ্কার কেটে নেওয়া চলে। অন্য ছবিটিতেও প্রাকৃতিক রূপকে মনগড়া ছাঁদে ফেলা হয়েছে; ছবি আর তার পটভূমি এক নজরেই বেশ আলাদা ক'রে নেওয়া যায়। এরকম রূপকল্পনা ভিত্তিচিত্রের বিশেষ উপযোগী; কারণ ভিত্তিচিত্র দূর থেকেই দেখতে হয়। ব্লক হাল্‌কা রঙে আঁকা হলে গাঢ় রঙের জমির উপর সহজেই ফুটে উঠবে।

প্রফুল্ল রায়

আবীর-গোলা বিকালটা একটা উন্মনা রক্তকমলের মত ফুটে **উঠেই** আবার ঝরে পড়েছে। দিগন্ত-**বিসারিত** আকাশের প্রচ্ছদপটে এক-**টুকরো** নিরীহ মেঘাভাস উঁকি দিয়েছিল। **তারপর** এক সময় দূরের গাছগাছালির **অস্পষ্ট** অরণ্যরেখায় সন্ধ্যার বিনীত **আবির্ভাব** ধীর-মন্থরতায় নেমে এসেছে।

মেঘনার আকাশে একটুকরো মেঘের আল্‌পনা। এক মুহূর্তে সমস্ত ঈশানী দিকচক্রটাকে সাপের চোখের মণির মত নিকষ কালো রঙের ক্রূরতায় ছেয়ে ফেলল। কালনাগিনী জলে মাত্‌লা উল্লাসের দোলা লাগল। আচক্রবাল উচ্ছৃংখল বাতাসের মাতামাতি। মেঘনার ঢেউ ফুঁড়ে ফুঁড়ে বাতাস উড়ে আসছে হু হু করে; দিশাহারা ক্ষ্যাপামিতে আছড়ে পড়ছে অর্জুন-হিজলের অবিন্যস্ত সারিতে; ঝাঁপিয়ে পড়ছে পাড়ের চৌচালা-দোচালা ঘরের চালে চালে। একসময় ঘনবর্ষণ শুরু হ'ল।

কালিঢালা নিঃসীম অন্ধকারে বয়রা বাঁশের মাচার ওপর অবসন্ন শরীরটা ঢেলে শুয়েছিল আকলিমা। রজিবুল উত্তরপাড়ায় গিয়েছে কিতাব্দী শেখের সাদির হিসাব-নিকাশ করতে। কিছু প্রাপ্তির সোনালী সম্ভাবনা আছে। এই মামুদপুরের ভাঙা মসজিদের মোল্লা সে।

মেঘনার বে-লাগাম বাতাসের দাপা-দাপি আর বৃষ্টির বল্লমের নির্মম আঘাতে ঘরের আড়াটা মচ করে আর্তনাদ করে উঠল। মাচার ওপর লাফিয়ে উঠে বসল আকলিমা। বাঁখারির জানালার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দিল বাইরের উন্মুক্ত অন্ধকারে। পৃথিবী এখানে নিরাবরণ, আকাশ এখানে চিহ্নহীন দিগন্ত পর্যন্ত উদার-ব্যাপ্ত। কিন্তু এই অনাবৃত আকাশের নীচে এমনি বৃষ্টিঝরা রাত্রিগুলোকে বড় দুঃসহ, আর বড় ভয়ংকর মনে হয় আক্‌-লিমার। আজকেও দরজায় তালা লাগিয়ে গিয়েছে রজিবুল। এ অনিবার্য, এ স্থির নিয়ম। বাঁশের মাচার অমসৃণ শয্যায় শুয়ে শুয়ে দরজাটা স্পর্শ না করেই নির্ভুল বলে দিতে পারে আকলিমা।

এখনও তার মধ্যে একটা নিশ্চিত বিশ্রামের ভিত্তিভূমি কি খুঁজে পায় নি রজিবুল চৌধুরী! মামুদপুরের ভাঙা মসজিদের মোল্লা সে। খোদাতাল্লাহ্ আর চাষীকৃষাণ, সাধারণ পরিশ্রমী মানুষ-গুলোর মধ্যে সে বিশ্বস্ত সেতুবন্ধ।

একসময় পশ্চিমের আকাশটা খড়্গধার বিদ্যুতের অগ্নিফলকে চিরে গেল, দক্ষিণদিকের আকাশ-সংকেত-করা তাল-গাছটার মাথা ঝলসে একটা বাজ গর্জন করে উঠল। দূরের আকাশ থেকে কয়েকটা বেনামী পাখীর গলায় মৃত্যুতীক্ষ্ম চীৎকার ভেসে এসেই একটা দমকা বাতাসে মুছে গেল।

এমনি বর্ষণমুখর রাত্রিগুলোকে এক-দিন মেঘসঞ্চারের রাগিণী বলে বিভ্রান্তি হ'ত; অর্জুন আর নারকেল পাতার ফাঁক দিয়ে শর শর করে বয়ে-যাওয়া বাতাসকে

...াগত বাঁশীর সুরের মত মোহময় মনে হ'ত। সে রাগিণী, সে সুর আজকেও বুকের মধ্যে আচম্‌কা আর একটা জীবনের ছায়া ফেলে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গেই এই অবিশ্বস্ত বন্দিনী দিনগুলো অসহ্য মনে হয়, ভয়ঙ্কর মনে হয় রজিবুলের আতঙ্কময় আবির্ভাবিকে। একরাশ ধেনো মদ গিলে একটু পরেই ডাকাত-পড়ার মত এসে হামলা করবে রজিবুল। মনটা একটা বর্ণহীন বিতৃষ্ণায় ভরে গেল আক্‌লিমার। এই ক্লান্তিভরা জীবন থেকে সে বহুবার পালিয়ে যেতে চেয়েছে মুক্তির সেই প্রসন্ন দিগন্তে, সেই দিনগুলোতে—যে দিনগুলো একদিন বৃষ্টির সানাই বাজিয়ে তার আঠারো বছরের যৌবনকে প্রথম পুরুষচেতনায় সুরভিত করে দিয়েছিল।

আচম্‌কা ভাবনাটা বিকেন্দ্রিত হ'য়ে গেল।

জানালার পাশ থেকে একটা অস্বস্তিকর শব্দ ভেসে আসছে। বৃষ্টির অবিশ্রাম ঝমঝমানিকে ছাপিয়ে ঘরের ভিত্‌ থেকে ঝুর ঝুর করে মাটির চাঙার খসার আওয়াজ।

প্রথমটা মনে হয়েছিল কোন বনখাটাশ কি শিয়াল মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে বৃষ্টির শরসন্ধান থেকে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে। কিন্তু একটু পরেই স্থিরনিশ্চিত হ'ল আক্‌লিমা। তার শিকারী কাণ দুটো এই শব্দের মধ্যে একটা অনিবার্য আভাস পেয়েছে।

বর্ষাস্নিগ্ধ মাখমের মত মাটিতে সিঁদকাঠি চলছে।

প্রথমটা স্নায়ুগুলোর মধ্যে একটা দুর্বোধ্য আতঙ্ক আবর্তিত হয়ে গেল আক্‌লিমার।

এই দোচালাঘর, তার পরে ভাঙা মসজিদের ওপারে ভাতারমারীর খালটা পেরিয়ে গেলে জনপদের হৃৎস্পন্দন শোনা যায়। এখান থেকে গলার সমস্ত জোর কেন্দ্রিত ক'রে চেঁচালেও এই বর্ষণ-ঝঙ্কৃত রাত্রিতে ওপারে পেঁাছবার অনেক আগেই বাতাসের ঝাপটায় মেঘনার দিকে উড়ে যাবে সে চীৎকার। বয়রা বাঁশের মাচার ওপর রুদ্ধশ্বাস হয়ে বসে রইল আক্‌লিমা। অপারিসীম ভয়ে বুকের ভেতরকার স্পন্দনে বার বার ছন্দপতন হতে লাগল।

জিরান কাঠের খুঁটিতে ঠক্‌ করে সিঁদকাঠির আঘাত শোনা গেল। নাঃ, ভয় পেলে চলবে না। কয়েকদিন আগে ঢাকা থেকে রজিবুল তাকে একছড়া রুপোর গোট, গোখ্‌রি চুড়ি, সোনার বনফুল আর বেসর কিনে এনে দিয়েছে। সতর্ক হাতে গয়নাগুলোর অস্তিত্ব পরীক্ষা করে নিল আক্‌লিমা।

পদ্মা-মেঘনার দেশের সে অরণ্যকন্যা। শানানো সড়কি হাতে সেও তো ঝাঁপিয়ে পড়েছে অতিকায় কালিকচ্ছপের ওপর; ছেনু দার এক কোপে একবার সে নামিয়ে দিয়েছিল তারই দিকে সন্ধ্যার নির্জনতায় এগিয়ে আসা একখানা কদর্য অর্থভরা বে-আইনি হাতকে। কিন্তু আজ কেন এই ভয়, কেন এই আতঙ্ক? এই দোচালা ঘরের আড়াতেও রয়েছে অজগরের জিভের মত একটা লিকলিকে বল্লমের ফলা! এই বর্ষণঝরা রাত্রির নহবত থেকে সেই অনেক-দিন আগের কোন মাতলামি-ভরা সংগীতই কী তার পেশীগুলোকে শিথিল করে দিয়েছে! শ্লথর্মাদির মনের দুর্বলতার ওপর আতঙ্ক কী বাদ্‌শাজাদার মত ময়ূর-সিংহাসন গ্রহণ করেছে! এই নিশ্ছেদ অন্ধকারের মধ্যেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বাঁশের মাচাটার পাশ দিয়ে একটা অস্পষ্ট মাথা যেন কবর ফুঁড়ে জিনের মত উঠে এলো।

বুকের ভেতর নিজের অজান্তে বাইরের এক ঝলক ক্ষ্যাপা বাতাস যেন হু হু করে বিসর্পিল ছন্দে বেরিয়ে গেল আক্‌লিমার। লাফিয়ে উঠে আড়া থেকে বল্লমটা টেনে বের করার আগেই সিঁদ্‌-কাটা গর্তের মধ্য দিয়ে শিকারী বিড়ালের মত মখমলমসৃণ পদসঞ্চারে ওপরে এসে দাঁড়াল মানুষটা।

একটা তীব্র ঝাঁকানি খেয়ে স্নায়ু-গুলোর ওপর থেকে সমস্ত নিষ্ক্রিয়তা ঝরে গেল আক্‌লিমার। চেতনায় ফিরে আসার আকস্মিকতায় বাঁশের মাচার ওপর থেকে মানুষটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জাপ্‌টে ধরল, তারপর চীৎকার ক'রে উঠল আক্‌লিমা; "চোর, চোর—চোর—"

আক্‌লিমার নির্মম আলিঙ্গনের মধ্যে চম্‌কে উঠল মানুষটা। বর্ষার সমর্থন-ভরা রাত্রে সিঁদকাঠি নিয়ে বেরুবার আগে এমন একটা দুর্ঘটনার বিস্ময় যে তার জন্যই অপেক্ষা করছিল, তা আগে জানা ছিল না। সিঁদকাঠিটা দিয়ে একটা আঘাত সে নিশ্চয়ই বসিয়ে দিতে পারে, কিন্তু তার কোন উৎসাহই পাচ্ছে না মানুষটা। মেয়েটির আলিঙ্গনের মধ্যে কী কয়েকটা বছর আগের মেঘনায় বন্যা-নামার মত একটা উদ্দাম জীবন স্থির হয়ে রয়েছে। বড় পরিচিত, বড় নিবিড় এই আলিঙ্গনটা। চম্‌কে উঠল আক্‌লিমাও। মানুষটার শরীর থেকে একটা তীক্ষ্ণ উত্তাপ যেন সংক্রমিত হচ্ছে তার দেহেও, তার কঠোর আলিঙ্গনের মধ্যে থর থর করে কাঁপছে মানুষটা। নিশ্চয়ই জ্বর হয়েছে তার। মানুষটার গলায় তীব্র বিস্ময় শিউড়ে উঠল; "বউ তুই?"

হাত দুটো শিথিল হয়ে মানুষটার শরীর থেকে ঝরে পড়েছে আক্‌লিমার। তার কণ্ঠের স্বরটাও আশ্চর্য চমকে ছত্রখান হয়ে গেল; "কে তুমি?"

"আমি খলিল। তিনদিন খাওয়া হয় নাই; চুকা (টক) কাউফল খাইয়া আছি। আইজ ভাবলাম চুরি করুম—যেমুন কইর‍্যা হউক পেট ভরাইতে হইবই। ডাকাইতা পাড়ার রহমতের কাছ থিকা সিঁদকাঠিটা কর্জ লইয়া মেঘনা পাড়ি দিয়া আইলাম। তারপর এখন তো তোর লগেই দেখা। তাজ্জবের ব্যাপার।"

"তোমার গায়ে তো জ্বর আইছে সাই। বেজায় গরম, ধান দিলে এখনই খৈ ফুটব।"

অন্ধকারের মধ্যেও খলিলের নিষ্প্রাণ হাসিটা করুণ আর্তনাদের মত ভয়ঙ্কর শোনালো। "হু—জ্বর আইছে। প্যাটে ভাত পড়লেই যাইব গিয়া।"

আচম্‌কা বেমানান গলায় তিমিরঘন রাত্রিটাকে চকিত করে তুলল আক্‌লিমা; "তোমারে যদি চৌকিদারের কাছে ধরাইয়া দেই!"

নিষ্প্রাণ হাসিটাকে আরো একটু প্রলম্বিত করে দিল খলিল; "ভালই তো। চৌকিদারের কিলগুতো পিঠে খাওনের পর প্যাটে তো এক সানক ভাত পড়ব। কিন্তুক যত মুশকিল বাধছে ওগো লইগ্যা"—

"কাদের লেইগ্যা?"

"না—না, ও কিছু না।"

আশ্চর্য সতর্কতায় আক্‌লিমার

প্রশ্নের ফাঁদটা ডিঙিয়ে গেল খলিল। বাইরে মদালসা বৃষ্টির কঙ্কণ-ঝঙ্কার অবিরাম বেজে চলেছে। একটানা, অবিশ্রাম।

খলিলের জবাবের জন্য বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠা নেই আক্‌লিমার। এই বর্ষণ-মন্দ্রিত রাত্রির মেঘমল্লার শুনতে শুনতে তার মনটা উধাও হয়ে গিয়েছে মেঘনার আর এক পারে, অনেকগুলো দিনের পেছনে একটা মধুর অতীতের নেপথ্য-লোকে।

নিশ্বাসের সীমানায় দাঁড়িয়ে-থাকা এই মানুষটা, এই খলিলই ছিল তার আঠারো বছরের স্বর্ণপদ্মের মত যৌবনের একমাত্র বাদ্‌শাজাদা।

সেই সব দিন।

কাব্যধর্মের মানুষ তখন খলিল। সেদিন হাতে এমনি সিঁদকাঠি ছিল না; ছিল সারেঙ্গী। গলায় ছিল উদারব্যাপ্ত গান, মনে ছিল ঘনগুঞ্জিত সুর। সেই সুর মধুর হয়েছিল আক্‌লিমার উত্তপ্ত সাহচর্যে। ঘরের ভেতর মল বাজিয়ে গৃহস্থালির কাজ করত আক্‌লিমা। তার মেঘ্‌নার মত তরঙ্গময় একরাশ চুলে আর শ্যামলী সিঞ্জিনা লতার মত কোমল দেহটার চারপাশে আল্‌পনার ভঙ্গিতে বেয়ে ওঠা রাঙা ডুরে শাড়ীটায় কী মোহই না ছিল সে সব দিনে! পদ্মা-মেঘ্‌না-ইল্‌সা উথলপথল করে ইল্‌সাডিঙি বাইত তখন খলিল; কিন্তু আক্‌লিমার মলের বাজনার যাদুতে মেঘনার ঝড় কেমন করে আটকা পড়ে গেল ছোট্ট চৌচালা ঘরের আয়তনে। খলিল গাইত—

> ময়ুরপঙ্খী নাও ভিড়াইয়া আইলাম
> তোমার খালে;
> সোতের কোলে, ঢেউয়ের দোলে
> পরাণ কেমুন করে।
> মেঘবরণ চুল কইন্যা, তোমার
> টানা টানা ভুরু,
> রাঙ্গা ডুইর‍্যা শাড়ী দিমু,
> আয়না চুড়ি সুরু।
> তোমার লইগ্যা আনুম কইন্যা
> আসমানেরই তারা—
> পৈছা খাড়ু আনুম কইন্যা,
> রাঙ্গা চান্দের পারা—
> ময়ুরপঙ্খী নাও ভিড়াইয়া—য়া—য়া—

রূপমুগ্ধ গলার রেশের সঙ্গে সারেঙ্গী সুর মিশে স্নায়ুগুলোকে আচ্ছন্ন করে ফেলত আক্‌লিমার। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত খলিল। আর মিষ্টি করে হেসে উঠত আক্‌লিমা। "অমন ড্যাব ড্যাব কইর‍্যা আমারে যে গিলতে লাগলা, শ্যাষে ভাতের ক্ষিধা থাকব তো?"

বোকা বোকা সম্মোহিত জবাব দিত খলিল; "না থাউক, প্যাট আমার এমনেই ভরা আছে।"

রূপোর মল ঝম ঝম করে এনামেলের সানকিগুলো হাতের ওপর তুলে সামনের আয়নামতীর খালের দিকে দৌড়ে যেত আক্‌লিমা।

"বউ, বউ"—

পেছন পেছন মেঘনার কাইতানের মত হু হু করে ছুটে আসত খলিল। সেদিন শরীরের ওপর ছিল পেশীর উদ্দাম তরঙ্গ। কব্জীতে ছিল বুনো বাঘের জোর। অথৈ নদীর এপার-ওপার জালের বেড় দিয়ে একাই টেনে তুলত সে, পাড় থেকে মেঘনার বিশ হাত ফারাকে ছুঁড়ে দিত ক্ষেপ্‌লা জাল। একটু আগেই প্রখর আলিঙ্গনের মধ্যে খলিলের জ্বর-কম্পিত দেহটা অনুভব করে চমকে উঠেছে আক্‌লিমা। পবিত্র কঙ্কালের কাঠামোর ওপর পাত্‌লা চামড়ার খোলস ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই আজ। পুলকিত গলায় সরমের ধমক দিত আক্‌লিমা, "যাও, কেউ আবার দেইখ্যা ফেলব।"

"দেখুক।"

"তুমি ভারি আদেখিলা; আমার গন্ধ পাইলে একেবারে ছোক্‌ ছোক্‌ কর বিড়ালের লাখান। যাও, কামে যাও। পুরুষ মানুষ ঘরে বইস্যা থাকলে মাইন্‌ষে মন্দ কয়।"

"কউক। কারোরে আমি পরোয়া করি না। আমার বউ-এর গন্ধ আমি শুঁকি। কারোর জরুরে ধইর‍্যা তো টান দেই না।"

আহত গলায় জবাব দিত খলিল।

ফিক্‌ করে একমুখ হাসির রূপালী জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দিত আক্‌লিমা। "না, গো না। কেউ কিছু কয় না। আমিই কইলাম। আইচ্ছা জিগাই; বউ কী কারো হয় না। তুমিই দেখাইলা বটে!"

"হইব না ক্যান? তবে আমার লাখান হয় না।"

অগ্রহায়ণের আকাশের মত নির্মেঘ উচ্চারণ 'খলিলের গলায়' চকিত হয়ে উঠত।

রূপমদির যৌবনের গৌরবে আক্‌-লিমার চোখের ভ্রমর-কালো মণিদুটো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। "যাও, গাঙে যাইবা না? ঐ দেখ ইত্তিমালির ছোট বইনটা দেখতে আছে আমাগো।"

সচকিত হয়ে দৃষ্টির ওপর সন্ধানী তীক্ষ্ণতা জ্বালিয়ে চার পাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত খলিল। কিন্তু না কাউকেই আবিষ্কার করা গেল না। "কি ব্যাপার বউ?"

ততক্ষণে মেঘনার ঢেউ-এর মত কলোচ্ছ্বাসে খিল খিল করে হেসে উঠেছে আক্‌লিমা।

সন্দিগ্ধ গলায় খলিল বলত, "ও, তুই আমারে ফাঁকি দেস! তুই ভারি শয়তান!"

তারপর দুজনেই সমস্বরে হাসির তুফান তুলত।

সাদির পর কয়েকটা মাসের কনক-চাঁপার মত সকাল থেকে সপ্তর্ষির বাসর-জাগা রাতপ্রভাত পর্যন্ত দিনগুলো সারেঙ্গীর সুরের মসৃণ ছন্দে পাখনা মেলে উড়ে গেল।

এমনি বর্ষণস্পন্দিত রাত্রিগুলো এক একটা সুরভিত নেশার মত মনে হত সে-সব দিনে। বাইরের মেঘনা ফুলে ফুলে ঘনগর্জন করে চলেছে, বাঁকা খঞ্জের মত বিদ্যুতের আলোয় একটা সোনালী অজগরের মত পাক খেয়ে মাতামাতি করত এপাশের আয়নামতীর খালটা। ময়ুর-পঙ্ক্ষী টিনের চালে ধারাস্রোতে বৃষ্টি নেচে চলত। আর এমনি সময় চারটে দেওয়ালের আয়তনে বন্দী হয়ে থাকত জীবনের অমরতা।

কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকত খলিল "বউ—অ বউ"—

"উ।"

অস্পষ্ট জবাব আসত সঙ্গে সঙ্গে।

"কই তুই?"

"তোমার কাছে।"

"আমার বুকের মধ্যে আয় বউ।"

"আমি তো তোমার বুকের মধ্যেই।

"বুকে না, মনের মধ্যে আয় বউ।"

আক্‌লিমার মুঠো মুঠো নলখাগি ফুলের মত কোমল দেহটাকে বলিষ্ঠ

বুকের ওপর চেপে ধরত খলিল। শরীরের সমস্ত মধুমান কোষে কোষে বাঞ্ছিত পুরুষস্পর্শে বিদ্যুৎ চমকে চমকে যেত আক্‌লিমার। বাইরের বৃষ্টির আচ্ছন্ন সুর, ব্যাঙেদের ঐকতান, বেনেবউ কি কাঞ্চন ফুলের বুনো গন্ধ—সব মিলিয়ে বুকের মধ্যে কি একটা মাতন তুলে যেত।

সাদা সাদা ফেনার মুকুট-পরানো জল নেমে গেল মেঘনার দিকে। বর্ষার পর, দুধের মত সুশুভ্র কাশফুল-ফোটা শরৎ পাড়ি দিয়ে সোনালী ধান সিঁড়ির হেমন্ত নেমে এলো।

দূরের কোন নৈঋৎ আকাশে সেই অগ্রহায়ণ মাসের উজ্জ্বল সকালেও একটু একটু করে কখন যে গহন কালো অকাল বৈশাখীর সঞ্চার হয়েছিল, সে খবর জানত না তারা কেউ। খলিলও নয়, আক্‌লিমাও নয়।

ময়নামতীর খালের নারকেলগুঁড়ি বাঁধানো ঘাটে প্রথম দেখেছিল আক্‌লিমাকে। সামনের ভাঙা মসজিদটা থেকে কানা চোখটা কুঞ্চিত করে শকুনের মত ঘোলো একটা নজর ফেলেছিল রজিবুল। মেঘনার ওপারে আটপাড়ার সেই নগণ্য গ্রামের মসজিদের মোল্লা ছিল সে।

আক্‌লিমার রূপোর মলের ঝনঝমানি খলিলকেই কেবল চারটে ঘরের আয়তনে বন্দী করে নি, রজিবুলেরও ধ্যানভঙ্গ করে প্রলয়পর্ব ঘটিয়ে দিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় ইল্‌সাডিঙি নিয়ে মেঘনা উজান বেয়ে পদ্মার দিকে চলে গেল খলিল; ফিরতে ফিরতে পরের দিন দুপুর হয়ে যাবে। আর ঠিক সেই দিন রাত্রিতেই আক্‌লিমার ঘরের ঝাঁপটা একরকম ভেঙেই কতকগুলো ভারি ভারি পায়ের শব্দ বিছানাটার কাছে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। ভারি ঠন্‌কো ঘুম। জেগে চীৎকার করে উঠবার আগেই একটা কর্কশ হাত একখানা আস্ত কাপড় ঠেসে ধরেছিল মুখের মধ্যে। চীৎকারটা গালের মধ্যেই অবরুদ্ধ গোঙানির মত চক্রাকারে ঘূরপাক খেতে লাগল আক্‌লিমার।

হাত-পা মোটা কাছি দিয়ে শক্ত ক'রে বেঁধে খালের ঘাটের বড় ঘাসি নৌকাটায় রাত্রির অন্ধকারে অপযোনির মত মানুষ-গুলো এনে তুলেছিল আক্‌লিমাকে।

একটা অতিপরিচিত মেঘডাকা গলা করাত-চেরা হাসি হেসে উঠেছিল; "মধ্য গাঙ্গে নিয়া মুখের কাপড় সরাইয়া দিমু। রসবতী, তখন যত পার, চিল্লাইও। তোমার কোন সোয়ামীও শুনেতে পাইব না। এখন পইড়্যা পইড়্যা এট্টু ঘুম যাও।"

তার পরের দিন দুপুরবেলা ফিরে এসেছিল খলিল। পুরো একটা রাত আক্‌লিমার আতপ্ত সান্নিধ্য সে পায়নি।

ইল্‌সা মাছ পাইকারের কাছে বেচে চারটে টাকা মিলেছিল; তারই একটা ভাঙিয়ে তালতলার বন্দর থেকে সুগন্ধি সাবান আর সস্তাদামের গন্ধতেল কিনে এনেছিল আক্‌লিমার জন্য। বাকী টাকাগুলো কোমরের গোপন গেঁজেতে ঝন ঝন করে বাজছে। দ্রুত পদসঞ্চারে আঁকা বাঁকা আলপথগুলোর ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে খলিল। মনটা খুশীর পাখ্‌নায় ভর দিয়ে উড়ছে। গলার মধ্যে গুন গুন করে রণিত হয়ে উঠেছে একটা প্রসন্ন মধুর সুর—

কালনাগিনী কইন্যা তুমি,
আমার বুকের জ্বালা।
তোমার গলায় দিমু কইন্যা
ডুমুর ফুলের মালা।
চিকণ চুমা আঁইক্যা (এ'কে) দিমু,
তোমার রাঙ্গা মুখে।
আমার মনের মধু দিমু—
তোমার মোহন বুকে।
কালনাগিনী কইন্যা তুমি, ই—ই—ই—

ধানকাটা ক্ষেতের মধ্য দিয়ে ওপাশ থেকে আসছিল রোজ-কৃষাণ ফারুক; বলেছিল, "খুব যে গান গাও, ফুর্তি দেখি একেবারে টগবগ কইর‍্যা ফোটে। ঘরের খবর রাখ নি?"

গলার মধ্যে সুরটা একটা তীব্র ঝাঁকানি খেয়ে ছিঁড়ে গেল খলিলের। উৎকণ্ঠিত গলায় বলেছিল, "কি ব্যাপার?"

"তোমার বউরে রাত্রে কারা যেন চুরি কইর‍্যা লইয়া গেছে।"

খলিলের হাত থেকে গন্ধতেলের শিশি আর সুগন্ধি সাবান ঝর ঝর করে পড়ে গিয়েছিল আলপথের ওপর।

ধীরে ধীরে সব কিছুই অগ্রহায়ণ-দুপুরের প্রতিভাসের মত স্পষ্ট হয়ে এসেছিল। আক্‌লিমার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গা মসজিদটাকে তালাক দিয়ে রজিবুল মোল্লাও উধাও হয়েছে।

তারপর অনেক বিনিদ্র রাত গিয়েছে, শিশির-ঝরা অনেক সকাল ঝরে গিয়েছে পূবের আকাশে, রক্তকমলের মত অনেক বেলাশেষ মিলিয়ে গিয়েছে পশ্চিমের দিকচক্রে।

রজিবুল মোল্লা আক্‌লিমাকে মেঘনার এপারে এই মামদুপুরে এনে তুলেছে। সাদি তাকে সে করে নি। কোথায়ও যাবার সময় চারদিকের গহন অরণ্যের ছত্রছায়ায় ঢাকা এই ছম ছম নির্জন ঘরের মধ্যে তালাবন্ধ ক'রে রেখে যায় রজিবুল মোল্লা; কানা চোখটা কুঞ্চিত ক'রে গৃধিনীর মত গলাটা প্রলম্বিত করে চেঁচিয়ে ওঠে; "কোথায়ও পলানের মতলব করবি না। তা হইলে তাজাই তোরে গোরে পাঠামু সুমুন্দির ঝি।"
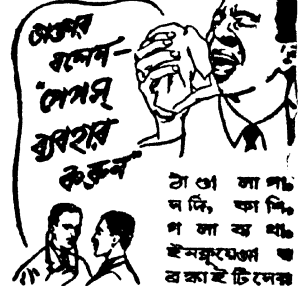
সেই অভিশপ্ত রাত্রিটা থেকেই এই

অসহ্য বন্দী জীবনকে স্বীকার করে নিতে হয়েছে; অভ্যস্ত হতে হয়েছে এই ভয়ংকর পরিবেশের ক্রূরতার সঙ্গে। কিন্তু এমনি বৃষ্টিনন্দিত রাত্রিগুলোতে, বয়রা বাঁশের মাচার ওপর বসে থাকতে থাকতে স্মরণের নেপথ্যলোক থেকে সেই নেশাভরা জীবনটা উঁকি দেয়, সেই বোকা বোকা রূপমুগ্ধ মুখটা রক্তের ওপর ছায়া ফেলে যায়। এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে তার বুকের বন্দরে দেহের নোঙর ফেলতে ইচ্ছা করে পরম নির্ভরতায়।

সেই মুখটা—সেই মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে সামনাসামনি। ইচ্ছা করলে হাত দিয়ে স্পর্শ পর্যন্ত করা যায়।

স্তব্ধতার যবনিকাটা ফালা ফালা ক'রে চীৎকার করে উঠল আক্‌লিমা, "আমি আর পারতে আছি না। আমারে একেবারে শ্যাষ কইর‍্যা ফেলাইল শয়তানটায়। আমারে তোমার লগে লইয়া যাও।"

"কিন্তুক্"—বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা ধক্ করে চমকে উঠল খলিলের।

"না, না কিন্তুক না। আমারে নিতেই হইব তোমার লগে। এখনই পলাইয়া যাওনের সুবিধা। খাটাসটায় আইস্যা পড়লে খুন কইর‍্যা ফেলব একেবারে।"

আক্‌লিমার গলায় ব্যাকুল প্রার্থনা রণিত হ'ল।

"কিন্তুক তোরে নিয়া রাখুম কই? খাওয়ামু কি? তিনদিন না খাইয়া আছি। না, না তুই এইখানেই থাক। অন্তত খাইয়া বাঁচবি। সেই সব দিন আর নাই বউ।"

"তোমার সারেংগীটা আছে?"

আক্‌লিমার গলায় নির্দোষ কৌতূহল।

"না। সারেংগীটা ফেলাইয়া দিছি মেঘনার সোতে—তুই নিখোঁজ হওনের পরের দিনই। ইল্‌সা ডিঙ্গিটাও ভাইংগা গেছে।" জ্বরের দোলন-লাগা থর থর গলাটা আশ্চর্য কান্নার দমকে মন্থর হয়ে এলো খলিলের।

হাউ হাউ করে ডুকরে উঠল আক্‌লিমা; "আমি আর এক মুহূর্তও থাকুম না এইখানে। আমারে এই জঙ্গলের মধ্যে তালা দিয়া রাখে বখিলটায়—না খাইয়া মরি, তবু তোমার কাছে থাকুম। তুমি আমার সোয়ামী।"

নির্বারিত উল্লাসে জ্বরটা সমস্ত শরীরে রাজত্ব শুরু করে দিয়েছে খলিলের; বিবর্ণ গলায় সে বলল, "কিন্তুক্ ওরা যে আছে—" ঝাঁকড়াঝাঁকড়া অবিন্যস্ত চুলের মাথাটা নীচের দিকে নেমে গেল খলিলের। একটা তীক্ষ্ণ অপরাধবোধে সমস্ত স্নায়ুকোষগুলো আচ্ছন্ন হ'য়ে এলো।

"কারা?" সমস্ত শরীরের ভার-সাম্যের বিন্দুটাকে তীব্র একটা ধাক্কা দিয়ে গলার মধ্য দিয়ে আর্তনাদটা মুক্তি পেল আক্‌লিমার। বাইরে বর্ষণঝরা রাত্রি, নারকেলগাছের মাথাগুলো মাতলা বাতাসের দোলা লেগে ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে, কোথায় কোন তালের বীথিতে একটা বাজ পড়ল; ঝল্‌সে গেল পশ্চিমের আকাশ।

আবারও চীৎকার ক'রে উঠল আক্‌লিমা; "কারা?"

পাণ্ডুর উত্তর ভেসে এলো; "আমি তোর খবর জানতাম না বউ। অনেকদিন তোর তালাস (খোঁজ) কইর‍্যা শ্যাষে আবার নিকাহ্ করলাম। পোলাপান হইচে।"

"তুমি নিকাহ্ করছ?"

এবার বাজটা বাইরের বর্ষাপ্লাবিত পৃথিবীতে পড়ল না; দুজনের মাঝখানে প্রচণ্ড শব্দ ক'রে বিদীর্ণ হ'ল।

"হ।" খলিলের গলায় সংক্ষিপ্ততম জবাব।

অনেকটা সময়ের বিরতিচিহ্ন। বাইরে বৃষ্টিবাতাসের অশ্রান্ত শব্দ ছাড়া মানুষের গলা যেন স্তব্ধ এখানে। দুটো হৃৎপিণ্ডের বাজনাও যেন নিথর হয়ে গিয়েছে।

বাতাসের মত ফিস ফিস গলায় খলিল বলল, "আর খাড়াইতে পারতে আছি না বউ। আমি এখন যাই—কিছু না লইয়া গেলে আবার ঐ গুষ্ঠি না খাইয়া শুট্‌কি দিব। আবার বুঝি জ্বর আইতে আছে সাই। তুই-ই ভাইব্যা দ্যাখ—ঐ দোজখে গিয়া ওঠনের থিকা এই জঙ্গলে থাকনও তোর ভাল।"

আলোর বিন্দুহীন অন্ধকারে এর মধ্যে গোট, বেসর, বনফুল খুলে ফেলেছে আক্‌লিমা; অগ্রহায়ণের সূর্যের মত পরিষ্কার গলায় সে বলল; "এই গয়না-গুলান্ ধর। আমি যামু না। মোল্লা ইবুলিশটায় তোমার ঘর ভাইংগা দিছে এক ফির। আমি গিয়া তোমার নয়া ঘর ভাংগুম না। ঘর যেমুন ভাঙছ, তেমুন তার দাম দিয়া দিমু আমি। এই ঘর যেন আর না ভাংগে। তুমি আবার আইসো, আবার আইস্যা দাম লইয়া যাইও।"

"আবার আসুম?"

হাতের অঞ্জলিতে গয়নাগুলো চেপে ধরে অবিশ্বাসী গলায় নিশ্চুপ উচ্চারণ করল খলিল।

"হ, আবার আইসো। আরো অনেকবার। আর পারলে একখান সারেংগী কিন্যা লইও আবার।"

আক্‌লিমার কণ্ঠটা ঘনীভূত কান্নার আবেগে গাঢ় হয়ে এলো।

বাইরে তালা খোলার শব্দ। রজিবুল মোল্লার আবির্ভাবকে চিহ্নিত করল তার প্রেতলোকের গলা; "কি লো সুন্দরি ঝি। বাদ্‌শাজাদীর লাখান ঘুমাস্ না কি? খাইয়া খাইয়া, আর ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া শরীরে ত্যাল (তেল) জমাও মনে মনে—ঠ্যালা পাওয়াইয়া ছাড়ুম যখন, তখন বুঝবি কয় সের চাউলে কয়সের তুষ—বাত্তি জ্বাল্"—

ব্যগ্র হাতে খলিলকে সিঁদকাটা গর্তের কাছে ঠেলে ক্ষিপ্র গলায় বলল আক্‌লিমা: "শিগ্‌গীর যাও গিয়া, এইটা কিন্তু ডাকু মানুষ খুন করতে পারে।"

অত্যন্ত করিৎকর্মা। চক্ষের পলকে গর্তের গর্ভলোকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল খলিল।

দরজার তালা খুলে ভেজা লুঙ্গি-পিরহান নিয়ে ঘরের ভেতর চলে এলো রজিবুল; খোলা কপাটের মধ্য দিয়ে তীরের ফলার মত বৃষ্টির তীর্যক রেখা-গুলো মেঝের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আর সঙ্গে সঙ্গেই হাউ হাউ করে মর্মবিদারী চীৎকার ক'রে উঠল আক্‌লিমা; "তুমি আমারে একলা ফেলাইয়া যাও এই জঙ্গলে, এই দ্যাখ সিঁদ দিয়া চোরে আমার বনফুল, বেসর, গোট লইয়া গেছে। একলা একলা ডরে চিল্লাইতে পারি নাই।"

বাইরের আকাশ থেকে মেঘনার ওপর আর একবার বজ্রপতন হ'ল।

গুহাতীর্থ অমরনাথ

—৩—

শেষনাগ থেকে বায়ুযান আন্দাজ মাইল দেড়েক। এটাকে পথ বলো না,—পথের নিশানা মাত্র। পথ বলতে কোথাও কিছু নেই। পাহাড় ছেড়ে পাহাড়ে ওঠা কিংবা নামা, পাথর ডিঙিয়ে যাওয়া, নিজেকে কোনমতে বাঁচিয়ে এগিয়ে চলা। শেষনাগ অবধি আমরা পনেরো হাজার ফুট উঁচুতে উঠেছিলুম, এবার নেমে এসেছি পাঁচ সাতশো ফুট। আকাশে মেঘ করেছে, সেজন্য আমরা বিশেষ উদ্বিগ্ন। মেঘ মানে ভয়, মেঘ মানে প্রায় হাজারখানেক লোকের মুখ শুকিয়ে যাওয়া। বৃষ্টি পড়লে এমন ভয় কিসের? কিন্তু আমার মনে আছে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের কথা। সেবারও এমনি করে মেঘ জমেছিল বায়ুযানে। দেখতে দেখতে বৃষ্টি, দেখতে দেখতে তুষারনদী মূল পাহাড় থেকে খ'সে নেমে এলো পঞ্চতরণীতে, তুষারের চূড়া ভেঙে ছুটলো উপর থেকে নীচে। চারিদিকে বরফ জমে গেল দশ ফুট উঁচু। তার পরের ঘটনাবলী জানে সংবাদপত্রের তৎকালীন পাঠকরা। ছয়শো লোক তুষার-গর্ভে সমাধিস্থ হোলো, পালাতে গিয়ে ঠাণ্ডায় জমে মরেছে শত শত, গাছে উঠে বাঁচতে গিয়ে গাছের ডালে ম'রে আটকে আছে, না খেয়ে মরেছে অজস্র,—কিন্তু তালিকা বাড়ানো উচিত নয়। ১৯২৮-এর কথা এখন আমি কোন ব্যক্তিকে শোনাচ্ছিনে, হিমাংশুবাবুকেও না। বেশ মনে পড়ে সেবার ছয়শো ঘোড়াকে এক হাজার মণ রসদসহ পহলগাঁও থেকে পাঠানো হয়েছিল এখানে। মিলিটারী স্যাপার্স ও মাইনার্স ইত্যাদি মিলিয়ে শত শত লোক ও স্বেচ্ছাসেবক এসেছিল এদিকে। কিন্তু সাহায্য এসে পৌঁছবার আগেই প্রথম চোটের ঢালাও মৃত্যু ও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে পুলিস আর মিলিটারীর কিছু লোক যাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে আসে, প্রতি বছর। সেই সময়টায় আমি কাশ্মীর-সীমান্তে ছিলুম ব'লেই এসব খবর আমার জানবার সুযোগ ঘটেছিল। এই নিয়ে গল্প লিখেছিলুম 'ভারতবর্ষে'।

সেই বায়ুযানকে ঘিরে সমস্ত আকাশ আজকেও ধীরে ধীরে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এলো। মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ, কিন্তু এত ঠাণ্ডা যে, দু'হাতের দশটা আঙুলে ঘোড়ার ঘাড়ের 'কাছে ওই লোহার পাতটাকে ধ'রে রাখতে পাচ্ছিনে। আঙুলগুলো অসাড় নীলবর্ণ হয়ে আসছে। সবাই ক্ষুধার্ত, কিন্তু আকাশের চেহারা দেখে আহারে রুচি ক'মে গেছে অনেকখানি। বায়ুযানে পৌঁছে আমরা যে যার তাঁবু বানিয়ে ভিতরে ঢুকলুম। শেষনাগ থেকে এ অঞ্চল পাঁচ-সাতশো ফুট নীচু এবং এখানকার উপত্যকাটা বোধ হয় চন্দন-বাড়ি অপেক্ষা কিছু প্রশস্ত। উপত্যকা কিংবা হিমলোক, কিংবা তুহিন প্রান্তর—ঠিক কোন্‌টা বলবো বুঝতে পাচ্ছিনে। মুখ দিয়ে আওয়াজ নির্গত হচ্ছে ঠাণ্ডায়। বিছানাপত্র এলিয়েছি, কিন্তু সে-বিছানা এত ঠাণ্ডা যে, ছোঁয় কার সাধ্য! মেঘের সঙ্গে সঙ্গে দিচ্ছে

বায়ুযানের তুষার প্রান্তর

বাতাস—সেই বাতাস মাঝে মাঝে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওই তুহিন উপত্যকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং আমাদের তাঁবুর ঝুঁটি ধরে মাঝে মাঝে শাসিয়ে যাচ্ছে। শিশু ও বালক এসেছে অনেকগুলি। ঘোড়ার পিঠে তাদের করুণ ভয়ার্ত শীতার্ত কান্না দেখতে দেখতে এসেছি। কেউ কেউ এনেছে নতুন ধরনের নিশ্ছিদ্র রবারের তাঁবু,—ওরকম তাঁবু মাঠের ওপর খাটালে বাতাস ও বৃষ্টি কোনমতে ভিতরে ঢোকে না। অমনি একটা তাঁবুর মধ্যে মা-বাপের সঙ্গে শুয়ে আছে সেই ছয় মাসের শিশুটি। আজ ভোর থেকে তার কান্না থামছে না কিছুতেই।

বৃষ্টি এলো ফোঁটা ফোঁটা। আমাদের তাঁবু পড়েছিল একটি শীর্ণ ঝরণার পাশে, ওপাশে পুলিস আর মিলিটারীর তাঁবু। তাদের সঙ্গে কিছু রসদ, কয়েকটি গাঁইতি আর বন্দুক, কিছু আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা, কিছু বা মদ আর দুধের গুঁড়ো, অথবা অতিরিক্ত কিছু গরম আচ্ছাদন। বৃষ্টি আরম্ভ হ'তেই তাদের দুজন লোক 'পরচা' নিয়ে এখানে ওখানে ছুটে গেল। এই বলে যাত্রীদলকে সাবধান করে এলো যে, এখান থেকে কেউ আর এক পা না নড়ে। যদি কোন জরুরী অবস্থা দেখা যায়, তবে পহলগাঁওকে সঙ্গে সঙ্গেই 'এলার্ট' করা হবে।

হিমাংশুবাবুর গা বেশ গরম, বোধ হয় জ্বর একটু বেড়েছে। তিনি তাঁবুর মধ্যে ঢোকার পর আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। আহারাদির ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। আমাদের সঙ্গে কিছু রুটি ছিল, কিন্তু হাত-পা অসাড় হবার পর থেকে সেগুলো আর বার করা হচ্ছে না। বৃষ্টি বেশ পড়ছে। এক একটি ফোঁটা, এককেটি চাবুক। আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছে অনেকে। কিন্তু যে পরিমাণ উত্তাপ ওই কাঠের আগুনে সৃষ্টি হলে চারিদিকের তুহিন ঠাণ্ডার মধ্যে জল গরম হয় কিংবা রুটি সেঁকে নেওয়া যায়,—সেই উত্তাপ ওই আগুনে পাওয়া যাচ্ছে না। কাঠ জ্বলে শেষ হচ্ছে, কিন্তু আধ সের আন্দাজ জল কোনমতেই গরম হলো না। আট আনারও বেশী কাঠ পুড়ে গেল। পণ্ডিত শিউজী পাণ্ডা হয়রান হয়ে শেষকালে গা ঢাকা দিল। সাড়া নিলুম হিমাংশুবাবুর, তিনি পাশের তাঁবুতে ছিলেন লেপের মধ্যে,—কাঁপতে কাঁপতে সাড়া দিলেন।

আমি সম্পূর্ণ সুস্থ, কিন্তু আমিও কাঁপছিলুম। মাথাটা ব্যালাক্লাভায় ঢাকা গায়ে সবচেয়ে মোটা পট্টুর কোট, তার নীচে সোয়েটার তার নীচে তিনটে সুতী জামা, পরনে খুব মোটা ব্রেজারের প্যাণ্ট, তার নীচে পশমের ড্রয়ার, হাতে দস্তানা,—কোমর থেকে পা পর্যন্ত মোটা ওভারকোট ঢাকা,—তার ওপরে দুখানা কম্বল—শীতে আমি কাঁপছিলুম কাঁপছে হাজারখানেক লোক, কাঁপছে গণিশেরের দল, কাঁপছে ঘোড়াগুলো।

অপরাহ্নের দিকে বৃষ্টি এলো জোরে। আমার তাঁবুটি বড় দরিদ্র উপরের কাপড়টা পাতলা, মাঝে মাঝে টস টস করে জল গড়াচ্ছে। বাতাসের ঝাপটায় পর্দাটা স্থির থাকছে না। খোঁটা পুঁতে দড়িগুলি টেনে বাঁধা সত্ত্বেও তলা দিয়ে রাশি রাশি হাওয়া ঢুকছে। কিন্তু নিরুপায় আর নিষ্ক্রিয় হয়ে সেই ঝুপসির মধ্যে চুপ করে বসে রইলুম। সেই খানে বসে নোটবই নিয়ে যেটুকু লিখে রেখেছিলুম, তার একটা অংশ এখানে তুলে দিইঃ

"পেন্সিল সরছে না ঠাণ্ডায় হাত অবশ। তাঁবুর বাইরে কোনমতেই আসতে পাচ্ছিনে। সমস্ত গরম বস্ত্র আর শয্যাদ্রব্য প্রয়োজনের তুলনায় কম মনে হচ্ছে। পহলগাঁওর পর থেকে উপযুক্ত খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে না! মাঝে মাঝে ময়লা রুটি চিবোতে হচ্ছে। এ অঞ্চল জনশূন্য, তৃণশূন্য, জল নেই, চা নেই। দুটো চলতি দোকানে খাদ্যের নামে অখাদ্য পাওয়া যাচ্ছে। তাঁবুর মধ্যে দিনমানটা কাটছে অত্যন্ত কষ্টে আর ঠাণ্ডায়। আকাশ পাণ্ডুর। দুরন্ত তুহিন ঝাপটের সঙ্গে মেঘের দৃশ্য ভীতিপ্রদ মনে হচ্ছে। মাঝখানে নামলো বৃষ্টির সাপট, রাত্রির কথা মনে করে আমরা উদ্বিগ্ন হলুম। কয়েক ব্যক্তির আমাশয় হয়েছে এবং প্রায় পঁচিশজন লোক—মেয়ে আর পুরুষ, অধিকাংশ বাঙালী—তারা মেঘ এবং বৃষ্টির ফোঁটা দেখে পহলগাঁওর দিকে ফিরে চলেছে আমার কিছুই করবার নেই। কেবল নিরুপায় হয়ে মাঝে মাঝে হাতঘড়িতে সময় দেখছি। বৃষ্টির মধ্য দিয়ে অপরাহ্ন গড়িয়ে যাচ্ছে—"

তাঁবুর বাইরে গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। আমাকে ডাকছে। বৃষ্টি পড়ছে বৈকি তখনও। কোন দুঃসংবাদ আছে কি পাহাড়ের দিক থেকে? কম্বল আর ওভারকোট সরিয়ে ঠান্ডা জুতোর মধ্যে পা ঢুকিয়ে বেরিয়ে এলুম তাঁবু থেকে।

দেখি সেই সপসপে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার সেই নবপরিচিত মিলিটারী বন্ধু—সেই চন্দনবাড়িতে গত রাত্রির পরিচয়সূত্রে—মিঃ মজুমদার এবং তাঁর পাশে একটি মোটা চশমাপরা তরুণী ঈষৎ খর্বকায়া, কিন্তু স্বাস্থ্যবতী। মজুমদার বললেন, কাল রাত্তিরে আপনার সঙ্গে কথা না বলেই চলে গিয়েছিলুম, ভারি চমক লেগেছিল আপনাকে দেখে। ইনি আমার সঙ্গে সঙ্গেই যাচ্ছেন—মিস মুখার্জী। ইনিও 'আর্মি-মেডিক্যাল ইউনিটে' আছেন। উনি এম-বি, বি-এস। উনি কাল রাত্রে বিশ্বাস করেন নি, আপনি এসেছেন।

নমস্কার বিনিময়ের পর প্রশ্ন করলুম, আপনার বাড়ি নিশ্চয়ই বাঙলা দেশে নয়?

হাসিমুখে শ্রীমতী মুখার্জী বললেন, কেমন করে বুঝলেন? আসুন আমাদের ওই তাঁবুতে, আপনাকে চা দিতে পারবো!

চললুম তাঁদের সঙ্গে। আন্দাজে বুঝতে পারি মেয়েটির বয়স পঁচিশের মধ্যে। চেহারাটা একেবারে রাঙা। দার্জিলিংয়ের ভুটিয়া ছেলেমেয়ের মতো গাল দুটো ছোপ ছোপ লাল। তাঁবুতে এসে ঢুকে মেয়েটি বললে, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাদের বাড়ি সিমলায়—বাবা থাকেন সেখানে। 'আর্মি মেডিক্যালে' কাজ করি, বাবার ইচ্ছে নয়!

হাসিমুখে বললুম, বাবার ইচ্ছেটা কি, সহজেই বুঝতে পারি।

তিনজনেই হাসলুম। ফ্লাস্ক থেকে ওরা গরম চা ঢাললো। মজুমদার বললেন, আমরা 'অফ ডিউটি'তে আছি, তাই শ্রীনগর থেকে এবার বেরিয়ে পড়লুম। আমাদের দলে অনেকেই আছেন, তবে বাঙালী আমরা শুধু দুজন।

বায়ুযানের পথে

মেয়েটি বললে, আমরা পাহাড়ে মানুষ, কিন্তু এই তিরিশ মাইল যে এত দুর্গম, আগে একবারও মনে হয়নি। আপনার কেদার-বদরির পথও কি এই রকম?

বললুম মাত্র তিরিশ মাইলের মধ্যে এত দুঃসাধ্য পাহাড় কেদার-বদরির কোথাও নেই। সেখানেও দুর্গম এবং দুরারোহ আছে বহু ক্ষেত্রে—কিন্তু তারা ছড়িয়ে আছে দুশো মাইলে। এ ঠান্ডা কেদারে আছে, কিন্তু বদরিতে নেই।

মজুমদার শুধু বললেন, চড়াই এখনো অনেক বাকি।

মেয়েটি বললে, আরো?

হ্যাঁ, মোটামুটি সাড়ে সতেরো পর্যন্ত উঠবো, অনেক সময় আঠারো তারপর নামবো পনেরোয়, তারপর আবার উঠবো ষোলয়।

মেয়েটি বললে, আমাদের কাছে সব রকমের জিনিস আছে, আপনার কিছু দরকার হলে আমরা দিতে পারবো।

ওদের তাঁবুর মেঝেতে মোটা চাটাই পাতা। বিছানাপত্রের ব্যবস্থা মোটামুটি ভালো। আহারাদির আয়োজন সন্তোষজনক। আমার চোখে মুখে কিছু জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটছিল, কিন্তু কোনো অশোভন কৌতূহল পাছে প্রকাশ পায় এজন্য সতর্ক ছিলুম। ওদের তীর্থ

যাত্রাটাকে মনে মনে তারিফ করেছিলুম সন্দেহ নেই। মজুমদার এক সময়ে বললেন, একটি দুর্ঘটনা ঘ'টে গেছে, পুলিশ রিপোর্টে জানলুম। আজ সকালে একটি লোক হার্টফেল্ ক'রে ঘোড়া থেকে প'ড়ে যায়। বোধ হয় নীচের দিকে তাকিয়ে আসছিল। জোয়ান লোক! ঘোড়ার পিঠের ওপরে থাকতেই মারা যায়!

বাইরে রীতিমতো বর্ষাকাল নেমে এলো। ঘন ঘোরালো সন্ধ্যা ছমছমিয়ে নামছিল। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আবার বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু তাঁবুতে না ফিরে সোজা গেলুম এগিয়ে। তাপ-মাত্রা নেমে গেছে ৩০ ডিগ্রির নীচে শুনলুম। ওই তাঁবুতে সেই শিশুর কান্না এখনও থামেনি। আর কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই, সবাই তাঁবুর মধ্যে ঢুকে চারিদিক বন্ধ ক'রে নিঃসাড়ে রয়েছে। গায়ে বৃষ্টি পড়ছে, পায়ের মোজা জুতো ভিজে। ঝাপসা মেঘ নেমেছে উপত্যকায়। প্রচণ্ড বাতাস ঘুরছে চারিদিকে। এতক্ষণে চোখ পড়লো চারিদিকের পাহাড়ে। প্রচুর বরফ পড়েছে অপরাহ্নের দিকে আমাদের আশে পাশে, এতক্ষণের মধ্যে লক্ষ্য করিনি। কোথাও কোথাও পাহাড়ের গা বেয়ে নেমেছে বরফজলের ধারা। বেশী পরিমাণ বৃষ্টিতে কোনো তাঁবু নিরাপদ থাকবে না। আকাশের ভ্রূকুটি-করাল চেহারার দিকে তাকিয়ে একটা খাবারের দোকানে গিয়ে ঢুকলুম। সেখানে শোনা গেল, খানিকক্ষণ আগে মিলিটারির লোক পুনরায় 'পরচা' জারি ক'রে যাত্রীদের সতর্ক ক'রে দিয়েছে।

দোকানের মধ্যে চাটাইয়ের উপর ব'সে কিছু আগুনের উত্তাপ পাওয়া গেল। আমার জলের পিপাসা শুনে দোকানদার শিখ সর্দার অবাক। আজ সকাল থেকে কেউই নাকি জলস্পর্শ করেনি! খাবার খেয়ে কেউ ঠাণ্ডা জল পান করে, এখানে এ খবর তাদের জানা নেই। চা ও রুটি এখানে মেলে, গরম পরটার অনেক দাম। তার সঙ্গে একটুখানি আলুর ঘাঁট। সব শেষে ফুটন্ত চা। গলার মধ্যে যখন যাচ্ছে, সে চা তখনও টগবগ করছে!

দোকান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলুম তাঁবুর দিকে। সেই মেডিক্যাল ছাত্র-বন্ধুরা ধরলো তাঁবুর পথে। তা'রা নাকি আমার কুশলবার্তা জানতে বেরিয়েছিল। কিন্তু বৃষ্টির ফোঁটার আঘাতে কোনো পক্ষেরই এখানে দাঁড়িয়ে দুটো প্রাণের কথা বলাবলির অবকাশ ছিল না। কোনো-মতে বন্ধুত্বটা বজায় রেখে যে যার তাঁবুর দিকে অগ্রসর হলুম। গলা বাড়িয়ে একবার হিমাংশুবাবুর সাড়া নিলুম, মনে হোলো তিনি কতকটা যেন সুস্থ হয়েছেন। আমি তাঁকে খাবারের দোকানের খবর দিলুম।

তাঁবুর মধ্যে ঠাণ্ডাটা যেন জমাট বেঁধে রয়েছে, যেন তুষারাচ্ছন্ন গুহাগর্ভ। বাইরে গেলে শরীরটা নাড়া পায়, মাংস-পেশী সচল থাকে। এখানে স্থাণু, সুতরাং রক্ত চলাচল নেই। মাথা ঠেকে যাচ্ছে তাঁবুর আচ্ছাদনে। শুনতে পাচ্ছি, সপ সপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে তা'র ওপর। জল চুঁইয়ে নামছে ভিতরে। দেশালাই জেলে মোমবাতি ধরালুম। ঠাণ্ডা মোমবাতি, হাতে লাগে। সিগারেটের প্যাকেট, ঘটি, চায়ের পেয়ালা, চেয়ারের হাতল, বালিশ এবং আমার নিজের নাকের ডগা এতই ঠাণ্ডা যে, ছোঁওয়া যায় না। দেশালাই জেলে মোমবাতির পলতে ধরাতে সময় লাগলো। জুতো জোড়া খুলে বিছানার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতে হোলো।

দড়ি দিয়ে তাঁবুর পর্দাটা বেঁধে দিতে গিয়ে বুঝতে পারা গেল, আঙ্গুলগুলো কোনোমতেই আজ আমার বাধ্য হবে না। বাইরে থেকে তুহিন বাতাসের ঝাপটায় মাঝে মাঝে সমস্ত তাঁবুটা ন'ড়ে উঠছে। রাত্রে কোনো সময় গোটা তাঁবু যদি আমার উপর উল্টে পড়ে তাহ'লে যথেষ্ট রকম আহত হবো কিনা সেটা একবার আন্দাজ ক'রে নিলুম। এদিকে পিছনের পাহাড় থেকে নেমেছে বৃষ্টির ধারা। তাঁবুর তিন দিকে ইঞ্চি তিনেক সরু ক'রে পরিখা কেটে দেওয়া হয়েছিল, জল নেমে এসে সেই পরিখা দিয়ে অন্যত্র চ'লে যাচ্ছে; ভিতরে আর জল আসছে না। পণ্ডিত শিউজি নিরুদ্দেশ, গণিশের এবং তা'র দলের লোকদের আর সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। এইভাবে সেদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হোলো এবং এইভাবেই সেদিন রাত্রি ঘনিয়ে এলো। বৃষ্টি পড়ছিল সপসপিয়ে।

তাঁবুর বাইরে ঘোলাটে অন্ধকার। পাঁজি অনুসারে আজ শুক্লা ত্রয়োদশী। একপ্রকার আলো দেখা যাচ্ছে বাইরের ওই মৃত্যু-উপত্যকায়, — যে-আলোটা ঠিক নৈসর্গিক নয়। এমনি আলো দেখা ছিল কেদারনাথের তুষার প্রান্তরে। কিছু আলো আসছে মেঘাবৃত আকাশ থেকে, কিছু আলো তুষারচূড়া থেকে প্রতি-ফলিত। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার হয় গহন অরণ্যলোক, কিংবা বনময় গ্রাম। কিন্তু ঘোর অমাবস্যার দিনেও উন্মুক্ত প্রান্তরে সম্পূর্ণ অন্ধকার হয় না! এখানে সমস্ত বর্ষণ এবং দুর্যোগের মধ্যেও আলোর আভা দেখছি, কিন্তু দশ হাত দূরেও কিছু চিনতে পাচ্ছিনে। একবার ঝাঁসিতে রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের দুর্গের মধ্যে ঢুকে হামামের ভিতরে গিয়েছিলুম। চতুর্দিক অন্ধকারে ঝুপসি, কিন্তু স্ফটিকের থেকে ছিল একটা বিচ্ছুরিত আভা,—সেই আভায় হামামটাকে চিনতে পারা যায়! এখানকার আকাশ-বিচ্ছুরিত সেই আলোর আভায় এবং তুষার-প্রতিবিম্বিত আলোয় দেখতে পাচ্ছি ওই অসাড় প্রান্তরের মৃত্যু-পাণ্ডুরতা। দেখলে ভয় করে। পৃথিবী এখান থেকে অনেক দূরে, ফেলে এসেছি সেই পৃথিবীকে কবে কোথায় সেই স্মৃতি লোপ পেয়ে গেছে। হয়ত সেখানে এখন আকাশভরা জ্যোৎস্নার রোমাঞ্চ হরষ, হয়ত সেখানে এখন শরতের মধুর মদিরতা!

কম্বলের মধ্যে ডুব দিয়ে বহুক্ষণ নিজের হাত দুখানা মুচড়ে-মুচড়ে আঙ্গুলগুলোকে একটু সচল করা গেল। তারপর ঠাণ্ডা নোটবইখানা খুলে তা'র পৃষ্ঠায় কোনোমতে পেন্সিল চালাতে লাগলুমঃ

"আর কিছু করবার নেই। নিরুপায়ের মতো প্রহর গুনছি। দুরন্ত বাতাস বইছে। বর্ষা নেমেছে। ঠাণ্ডার মধ্যে কোনোমতেই নিজেকে গরম ক'রে তোলা যাচ্ছে না। কতক্ষণ নোটবইখানা আলোর সামনে ধ'রে রাখতে পারবো জানিনে, কারণ মুহূর্তে মুহূর্তে হাত অবশ হয়ে আসছে। সিগারেট ধরানো যাবে না, কারণ ওর জন্য হাত এবং মুখ বার ক'রে রাখতে হয়। বিছানার মধ্যে সম্পূর্ণ নিশ্চল না থেকে উপায় নেই, কেননা যেটুকু জায়গা নিয়ে দেহটা স্থির হয়ে

রয়েছে. তা'র এক ইঞ্চি এপাশ ওপাশ হ'লে বরফের ছে'কা লাগছে বিছানার মধ্যেই। উপর থেকে মাঝে মাঝে টস-টসিয়ে বিছানার ওপর বরফজলের ফোঁটা পড়ছে। রাত্রে নিদ্রা যাবার মতো উত্তাপ সৃষ্টি বিছানার মধ্যে হবে কিনা বলা কঠিন। সমস্ত শরীর কনকন করছে শীতের যন্ত্রণায়। রাত এখন প্রায় বারোটা। মোমবাতি নিভে আসছে—"

সহসা বাইরে কিসের আওয়াজ। অত্যন্ত ক্ষীণ কান্নার শব্দ! কান পেতে শুনে বুঝতে পারা গেল, সেই শিশুটির কান্না এখনও থামেনি। প্রকৃতি ওকে অমনি ক'রে কাঁদাচ্ছে সারাদিনরাত। শীতের যন্ত্রণায় যত কাঁদবে ততই ওর দেহটুকুর মধ্যে উত্তাপ সৃষ্টি হবে। এছাড়া ওর বাঁচবার উপায় নেই!

না, ভুল করছি। শিশুর কান্না নয়,—অন্য কিছু। ক্ষুধাতুর, সর্বহারা যন্ত্রণাজর্জর মানুষের মৃত্যুর ঠিক আগেকার কান্না। বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলুম। দেখতে দেখতে সেই কান্না যখন আমার তাঁবুর ঠিক পাশের থেকে হঠাৎ শোনা গেল, তখন বুঝতে পারলুম, এ কান্না মানুষের নয়, আমাদেরই ঘোড়াগুলির। একটা দীর্ঘ শীর্ণ সকরুণ আওয়াজ অন্তস্তল থেকে বেরিয়ে আসছে, যে কণ্ঠস্বর আগে আমার এমন ক'রে জানা ছিল না। উপযুক্ত খাদ্য ওদের সারাদিনে জোটে না, ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা ব'য়ে আনে, চন্দনবাড়ীর পর আর বিশেষ কোথাও ঘাস খুঁজে পায় না, ঠাণ্ডায় আশ্রয় নেই কোথাও তুষারের হাওয়ায় আর বৃষ্টিতে পাগুলো ধীরে ধীরে জ'মে আসছে,—এবং একজোড়া পা দড়ি দিয়ে শক্ত ক'রে বাঁধা। ওরা তাই অমন স্খলিত ক্ষীণ করুণ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাচ্ছে ওদের ভাগ্যনিয়ন্তার কাছে! সমস্ত সৌর-বিশ্বের দিকে এক একবার উ'চু গলায় তাকিয়ে যন্ত্রণাজর্জর কণ্ঠে অন্তিম ঘৃণা প্রকাশ ক'রে চলেছে! আমার আরামের বিছানাটা দেখতে দেখতে যেন কণ্টকাকীর্ণ হয়ে উঠলো!

বাবু!

তাঁবুর বাইরে গণিশের ও তা'র সঙ্গীর সাড়া পেলুম। মোমবাতির ক্ষীণ

বায়ুযান থেকে পঞ্চতরণীর পথে লেখক

আলোটা তখনও নেভেনি। সাড়া দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললুম, কি চাই?

পর্দাটার গেরো খুলে ওরা ভিতরে এলো। সর্বাঙ্গে বৃষ্টির জল। ওরা নিজেদের ভাষায় বললে, বহুৎ মুস্কিল্ হয়েছে। সন্ধ্যার পর থেকে আমাদের একটা ঘোড়াকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এই পাহাড়ের গায়ে উঠেছিল ঘাস খেতে। আহমদ মিঞা ওকে খুঁজতে খুঁজতে এই তাঁবুর পাশের পাহাড় বেয়ে অনেক উ'চুতে উঠে যায়,—'বহুৎ বারিষ হোতা হ্যায় পাহাড়মে—'

বললুম, তারপর? ঘোড়া পেলে?

নহি।—গণি বলতে লাগলো, পাহাড়ের ওপরে অনেক গুম্ফা, সেখানে ঘোড়া ঢুকেছে কিনা এই তদারক করতে গিয়ে হঠাৎ বিপদ! 'ঘোড়ে ত' নহি মিলা, পরন্তু একঠো কালা জান্‌বর গুম্ফাসে নিকাল্‌কে আহমদকো উপর তাং কিয়া,—আহমদ ডরসে ভাগা।

কেমন জানোয়ার? বাঘ?

মালুম নহি পড়া! শের ইধর নহি মিলি, ভা়লু হো শক্‌তা! ব্যস, হিঁয়াসে দো রসি উপর! উ ত' হ্যায় হুঁয়া।

ঈষৎ উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করলুম, ভালুকটা আমাদের তাঁবুর দিকে নেমে আসতে পারে মনে করো?

গণিশের বললে, মালুম হোতা কি এত্‌না বারিষমে কোই জান্‌বর উৎরেগা নহি!

কিন্তু ঘোড়াটাকে যদি ওটা মারে, তবে কাল আমাদের গতি কি হবে? কেমন ক'রে পৌঁছবো?

গণিশের ও আহমদ খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তারপর যাবার সময় ব'লে গেল, কাল ভোর হ'লেই আবার ঘোড়াটাকে খুঁজতে বেরোবো, 'হাতিয়ার লেকে যায়েঙ্গে!'

ওরা চ'লে যাবার পর মোমবাতিটা এক সময় শেষ শিখা উঁচিয়ে নিভে গেল। তারপর ভিতরটা নিঃঝুম নীরেট ঠান্ডা অন্ধকার। সমস্ত তাঁবুর বোঝাটা যেন বুকের ওপর চেপে ধরেছে। কম্বল আর ওভারকোটের মধ্যে মাথাটা ঢুকিয়ে নিঃসাড় হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলুম, কতক্ষণে সেই কালো মস্ত ভালুকটা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসে প্রথমেই আমার তাঁবুর মধ্যে ঢুকবে, এবং বড় বড় নখরযুক্ত দুখানা হাত দিয়ে আমার পা ধ'রে টানবে!

পা দু'খানা হিম হয়ে আসছে। ঘোড়ার কান্না—সেই বুকফাটা কান্না চলতে লাগলো অবিশ্রান্ত। প্রভাতের জন্য অপেক্ষা ক'রে রইলুম।

নিদ্রার মতো উত্তাপ কেনোমতেই পাওয়া গেল না। অতএব চার পাঁচ ঘণ্টা পরে মুখের উপর থেকে কম্বল সরিয়ে দেখলুম, প্রভাতের স্বচ্ছতা চিকচিক করছে তাঁবুর পর্দার ফাঁকটুকু দিয়ে। ব্যস, তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম। নিদ্রার অভাবে কোনো ক্লান্তি কিংবা অবসাদ বোধ করছিনে। আমি কেবল চাচ্ছিলুম উত্তাপ। একটুখানি আগুন,—একপেয়ালা চা, এক ঘটি গরম জল। উঠে বাইরে এসে দেখি, এক আধজন যাত্রী এবং বৈরাগী এদিক থেকে ওদিকে ছুটে যাচ্ছে হি হি করতে করতে। বৃষ্টি পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়। পাহাড়-পর্বতের দিকে প্রভাতকালে সব চেয়ে কম দুর্যোগ, যত বেলা বাড়ে, ততই অবস্থা বদলায়। বরফ পড়তে থাকে সাধারণত বেলা নটা দশটার পর থেকে।

যাই হোক, গতকাল সন্ধ্যা অপেক্ষা এখন আকাশের অবস্থা উন্নত। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের কথা স্মরণ ক'রে কখন যেন মৃত্যুভয় ঢুকেছিল মনে,—কালো সরীসৃপ যেমন ঢোকে গর্তে। এবার থেকে আর ভয় পাবো না,—কোনোমতেই ভয়কে প্রশ্রয় দেবো না। ভয় মানেই মৃত্যু। ভালুক থাক্ পাহাড়ের চূড়ায়, আকাশে থাক্ দুর্যোগ, থাক্ তুহিন ঢাকা আমাদের সমস্ত পথ,—ভয় আর পাবো না। অতএব পর পর গোটা দুই সিগারেট টেনে রুমাল দিয়ে এলুমিনিয়মের ভয়ানক ঠাণ্ডা ঘটির কানাটা ধ'রে সোজা গেলুম সেই শিখ-সর্দারের চা-খাবারের দোকানে। সবেমাত্র সে কাঠ দিয়েছে উনুনে—আমি তার প্রথম খদ্দের। গত পরশুদিন চন্দনবাড়ী থেকে সর্দার এনেছে দুধ, সেই দুধেই চা তৈরী হয়ে আছে দুদিন থেকে। সেটা কেবল আমাকে গরম ক'রে দেবে মাত্র। সেই ঘোলাটে ফুটন্ত জলটুকুর দাম চার আনা। হোক চার আনা, দুঃখ করবো না। কিন্তু ওই সঙ্গে একঘটি ফুটন্ত জল না পেলে আমার কিছুতেই চলবে না। গতকাল এক টাকার কাঠ খরচ হয়েছে, কিন্তু জল গরম হয়নি। শিউজি বলেছে, পাঁচ টাকা খরচ করলেও একটি গাছের ডালও আর পাওয়া যাবে না। কাঠ নেই এ অঞ্চলে।

হিমাংশুবাবুকে সকালের দিকে একটু সুস্থ দেখা গেল। তাঁর সঙ্গে মোটা লেপ ছিল, সুতরাং ঘুমোতে পেরেছিলেন। পরম্পরায় জানা গেল, মিলিটারির লোকেরা পুনরায় 'পরচা' বার করেছে,—তাদের বিনা হুকুমে কেউ আজ অগ্রসর হ'তে পারবে না। যদি কেউ যায়, তবে তার নিজের দায়িত্বে। রাজসরকার নিজের ওপর কোনো ঝুঁকি নেবে না। আজকের আবহাওয়া সংবাদ নাকি ভালো নয়! আমাদের সামনে এখনও মহাগুনাস গিরিসংকট বাকি, তারপর বাকি পঞ্চতরণী, সেখানকার পথে একাধিক স্রোতস্বতী অতিক্রম ক'রে যেতে হবে। পঞ্চতর্ণী অথবা পঞ্চতরণী যাই বলো—সেখানে থেকে অমরনাথ আর মাত্র চার পাঁচ মাইল।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি চলছে। আমাদের খরচে প্রকৃতি দেখাচ্ছে তা'র নানা চটুল রঙ্গ। ভয় দেখাচ্ছে, ভাবনায় ফেলছে,
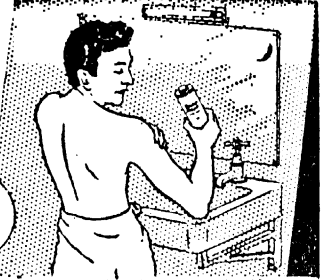
দেখাচ্ছে কখনও উষর অনুর্বর দিকদিগন্ত, নিয়ে যাচ্ছে কখনও সহস্র বরণের কুসুমাস্তীর্ণ উপত্যকাপথে, কখনও গিরি-গাত্রের নির্ঝরিণীর পাশ কাটিয়ে, কখনো বা বিজনতায় ভীষণতায় মহাশূন্যোচারিণী রাক্ষসীরূপিণীর আলুথালু তুষার ঝটিকায় উন্মত্ত রণরঙ্গের মাঝখানে। সেইজন্য দুরবস্থার মধ্যে মাঝে মাঝে ধৈর্যচ্যুতি ঘটলেও রস পাচ্ছি মনে মনে। রসো বৈ স—তিনি রসের মধ্যে আছেন! ঈশ্বর যদি রসের মধ্যে থাকেন, তবে রাজি আছি। রস পাচ্ছি ব'লেই অমরনাথ—নৈলে গুহা ছাড়া কিছু নয়। এমন কোনো যাত্রী দেখিনি—বুড়ো-বুড়ি ধ'রেই বলছি—যারা তীর্থপথ থেকে ফিরে গিয়ে অনুশোচনা করেছে! রস পায় ব'লেই তীর্থ। তিনি রসময়! ওই রসে মৌমাছির মতো ঘুরে মরে তীর্থযাত্রীরা। আমরা দুর্গমে রস পাই, রস পাই দুঃসাধ্য পথে, রস পাই মৃত্যুকে কলা দেখিয়ে পালানোয়, রস পাই [illegible] আত্মনিগ্রহে! নৈলে কালীঘাট ছেড়ে ছুটি কেন কামাখ্যায়? কাশীর মন্দির ছেড়ে কেন ছুটি কেদারনাথে আর পশুপতিনাথে? যদি কেউ এখন প্রশ্ন করে, ঈশ্বরকে চাও, না অমরনাথ যেতে চাও? তৎক্ষণাৎ জবাব দেবো, ঈশ্বর আপাতত থাকু, অমরনাথ যেতে চাই! অমরনাথ যাত্রায় রস! বিনিদ্র রাত্রি যাপনে রস, ভয়াতঙ্কে রস, উপবাসে আর বিপদাশঙ্কায় রস, চারিদিকের গগনস্পর্শী পর্বতমালা এক রাত্রের মধ্যে তুষারধবল হয়ে গেছে—ওর আশ্চর্য সৌন্দর্যতেই রস!

ওই সময় ডায়েরীতে লিখে রেখেছিলেম এই ক'টি কথা :

"সকালে চা নেই, খাদ্য নেই, শৌচাদি সম্ভব নয়,—জলের ব্যবহার অভাবনীয়। যে যার তাঁবুর মধ্যে রয়েছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। বাইরের চড়া হাওয়ায়, ঠাণ্ডায়, বৃষ্টিতে বেরোবার সাহস কারো হচ্ছে না। পাহাড়ের উপরে তুষারপাত হচ্ছে, দল বেঁধে মেঘেরা নামছে নীচে আমাদের তাঁবুর ওপর। মাঝে মাঝে ডুবে যাচ্ছি মেঘের মধ্যে। আশা ভরসা আর খুঁজে পাচ্ছিনে। আমাদের তাঁবুগুলি ভিজে সপসপ করছে। ঘোড়াগুলির করুণ চীৎকার এখনও থামেনি। এমন সময় আকাশ কিছুক্ষণের জন্য একটু স্বচ্ছ হয়ে এলো। বৃষ্টি আপাতত থামলো। পুলিশের তাঁবু থেকে খবর এলো, আমরা পঞ্চতরণীর দিকে এবার যাত্রা করতে পারি। বেলা তখন ন'টা বেজে গেছে। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তাঁবুগুলি উপড়ে তুলে নিয়ে আমরা যখন যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, তখন গণিশেরের লোক এসে জানালো, হারানো ঘোড়াটা প্রায় দুমাইল দূরে পাহড়ের পথ থেকে খুঁজে পওয়া গেছে। আমরা এই সুসংবাদে নতুন ক'রে সাহস পেয়ে যাত্রা করলুম।"

আজকের পথ অত্যন্ত পিছল এবং সংকটসংকুল। সারবন্দী ঘোড়ারা যখন মালপত্র এবং সওয়ার নিয়ে রওনা হোলো তখন আবার খবর পেলুম, প্রায় তিরিশজন যাত্রী বৃষ্টি-বাদলের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে পহলগাঁওর দিকে রওনা হয়েছে। তাদের মধ্যে 'কুণ্ডু স্পেশ্যালের' কয়েকজন যাত্রীও ছিল। পথে দেখছি, পাঞ্জাবী মেয়েরা সবচেয়ে শক্ত। তাদের অধ্যবসায় অক্লান্ত। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এক সময় ঠিকই তা'রা গিয়ে পৌঁছয়। শক্তিতে পুরুষ হোলো প্রধান,—কারণ সে জন্মদাতা, সৃষ্টি-কর্তা। পরিশ্রমে মেয়ে হোলো প্রধান,—কারণ সে ধৈর্যশীল। অপরিসীম পরিশ্রম করে মেয়ে ওই কোমলাঙ্গে! কী নধর, কী পেলব,—কিন্তু ভিতরে কী কঠিন! পৃথিবীর বলিষ্ঠতম পুরুষ জন্মায় ওই নবনীতকোমলার জঠরে; দিগ্বিজয়যাত্রায় ঐশ্বরিক শক্তি খুঁজে পায় পুরুষ ওই লাবণ্যলতার প্রাণদায়িনী স্তন্যে! সেইজন্য পুরুষ ওদের প্রিয়,—চিরশিশু ব'লেই প্রিয়! প্রতিভাধর পুরুষকে দেখে ওরা আনন্দ পায়,—জানে, সে ওদেরই দেহ-নিঃসৃত; বর্বর পুরুষকে দেখে ওরা কৌতুক বোধ করে,—জানে, ওদেরই স্তন্য-পায়ীর এই রণরসরঙ্গ! ওরা কোনো চেহারায় পুরুষকে দেখে ভয় পায় না,—কেননা ওরা শক্তিরূপিণী! সেই কারণে মহাশক্তির ভিন্ন নাম হোলো অভয়া! অভয়া একই জঠরে ধারণ করেন দেবতা ও অসুরকে। এই দেবাসুরের নিত্য দ্বন্দ্বে তিনি প্রমত্তা। কখনও তিনি জগদ্ধাত্রী, কখনও বা মহাকালী। একই শক্তি, কিন্তু বিভিন্ন তা'র অভিব্যক্তি।

ধীরে ধীরে আমাদের ক্যারাভান পর্বতের শীর্ষদেশে আরোহণ করছে। এবার চলেছি পর্বলোকে। পথ বড় কষ্টসাধ্য, বড় প্রস্তরসংকুল, বড়ই বিপজ্জনক। গণিশের লাগাম ধ'রে চলেছে। মাঝে মাঝে কণ্টকিত সওয়ারকে পরম বন্ধুর মতো অভয় দান করছে, 'ডরো মৎ।' ডরিয়ে উঠছে অনেকে সামনে আর পিছনে। শীতে ঠক ঠক ক'রে কাঁপছি সবাই, কিন্তু আমরা যেন বেপরোয়া। যত উপরে উঠছি,—একটির পর একটি ধবলচূড়া। বরফ পড়ছে তখনও পর্বতমালায়—দেখতে পাচ্ছি তাদের অস্পষ্ট ধূম্রজাল। বৃদ্ধ, যুবা, স্থবির, ধনী, দরিদ্র, সাধু, শিশু, নারী, পণ্ডিত, পাণ্ডা, মুসলমান, মিলিটারী—সবাই চলেছে ওই একই লক্ষ্যে। চলেছে ঘোড়া, ডাণ্ডি, মিউল,—চলেছে ভাটপাড়ার দল, চলেছে কুণ্ডু স্পেশাল, চলেছে পাঞ্জাব মহারাষ্ট্র তামিল বিহার আর বোম্বাই। বায়ুযানে যতটুকু নামতে হয়েছিল, আবার চড়াইপথে উঠে আসতে হোলো আন্দাজ হাজার ফুট। নিঃশ্বাসের জন্য অনেকেই কষ্ট পাচ্ছে, অনেকেরই বমির ভাব। দেখতে দেখতে ষোল হাজার ফুটের উপত্যকায় এসে পৌঁছলুম। আকাশ বড় হয়ে উঠলো, সামনে পাওয়া গেল উঁচুনীচু ময়দান। আশেপাশে জমাট বরফের ভিতর থেকে জলের প্রবাহ আসছে, দেখতে পাচ্ছি তুষারাচ্ছন্ন নদী আর হিমবাহ, দেখতে পাচ্ছি সহস্র বৈচিত্র্যভরা বহুবর্ণ কুসুম-লতাবল্লরী আস্তীর্ণ পথে পথে। গাছপালা কোথাও নেই, চিহ্ন নেই কোনো ফলনের, মানুষের ছায়ামাত্র নেই দূরদূরান্তরে। কোথাও কোথাও শুকনো শাদা কঙ্কাল, কোথাও বা গত বছরের যাত্রী সমাগমের চিহ্ন ছড়ানো। আমরা সারবন্দী চলেছি। মাঝে মাঝে অশ্বরক্ষীর গলার আওয়াজ—'হোঁস, সাব্বাস, হোঁস সাব্বাস'—প্রান্তরে

আর পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কখনও চলতে চলতে দেখছি একই পাথরে বহু-বর্ণসমন্বয়, কখনও নীল ফুলের আস্তরণ, কখনও নাকে আসছে জলপ্রপাতের সঙ্গে তীব্র গন্ধকের গন্ধ,—অনুর্বর পর্বতরাজির শিরে শত শত কারিফ্, মৃন্ময় ক্লিফ্। সামনে দিয়ে অগম্য পায়ে চলা পথ গেছে জোজিলা গিরিসংকটে, লাড়াকের পথ ঘুরে ঘুরে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, পূর্ব প্রান্তে তিব্বতের দুরতিক্রম্য পর্বতমালা দেশান্তের বিরাট প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে—অজর অমর অনাদি-অনন্ত! আমরা কখনও নামছি নীচে—নদী-ঝরণা পার হচ্ছি, কখনো উঠছি উপরে। চারিদিকের পার্বত্য প্রকৃতির মাঝখান দিয়ে এইভাবে মহাগুনেস গিরিসংকট অতিক্রম ক'রে চলেছি। নদীর গতি ছিল এতকাল আমাদের পিছনদিকে, এবার তাদের বিপরীত গতি। আমরা চলেছি নদীপ্রবাহ পথ ধ'রে।

সহসা আমাদের গতি রুদ্ধ হোলো। ছয় হাজার বছর আগে এখানে নাকি এক ঋষি এসেছিলেন হিমালয়ের কোনো প্রান্ত থেকে। তিনি মহাগুনেসের নৈসর্গিক শোভা দেখে পথের ধারে থমকে দাঁড়ান, এবং কালক্রমে প্রস্তরীভূত (fossilised?) হয়ে যান। পথের বাঁদিকে একটু পাশে সেই ঋষির আয়তন পাহাড়ের সঙ্গে মিশে একাকী দাঁড়িয়ে। আমরা স্তব্ধ, বিমূঢ়। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় এমন একটা মানুষের আকার-আয়তন কল্পনা করা আছে। আমরা যেন অনেকটা মায়াচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সেই আয়তনকে (outline) এককালের ঋষি ব'লে ভাবতে লাগলুম। ঝাঁঝরা পাথরে আকৃত একটা অদ্ভুত মানুষের কল্পনা সহসা মনে আসে বৈকি। বিচিত্রবর্ণ পাথরে, নানা রংয়ের ফুলে ও লতায়, বিভিন্ন গুল্মে ও শিকড়ে এবং পরিশেষে মানব-অবয়বের কল্পনায় দৃশ্যটা অভিনব সন্দেহ নেই। শোনা গেল, বহু শত বছর ধ'রে বহু সহস্র যাত্রী এর কাছে পূজা নিবেদন ক'রে চলে যায়।

সুদূর আকাশে হঠাৎ এক সময়ে গুরু গুরু ঘোষণা শোনা গেল। চেয়ে দেখি, দুগ্ধ-শুভ্র পর্বতমালার উপর দিয়ে আবার মলিন মেঘদলের ষড়যন্ত্র চলছে। আবার দেখতে দেখতে যাত্রীদের মুখে-চোখে আতঙ্ক দেখা দিল। মাঝপথে আত্মরক্ষার কোন উপায় নেই। এখনও অনেক পথ বাকি। পাহাড়ে দ্রুতগতিতে চলা যায় না। অত্যন্ত বিঘ্নসংকুল পথ। বছরে মাত্র দুটি দিন মানুষে এই পথ মাড়ায়। একবার যায়, একবার ফেরে। পায়ে হাঁটা সবচেয়ে নিরাপদ। যদি মৃত্যু হয়, তবে শ্বাসপ্রশ্বাসের গোলযোগে, আর নয়ত পাহাড়ী আমাশয়ে,—অন্য অপঘাতের সম্ভাবনা নেই। সবচেয়ে সুবিধা ঘোড়া কিম্বা ডাণ্ডি, কিন্তু দুটোতেই ভয়। হিমাংশুবাবু বললেন, জনৈক যাত্রী ডাণ্ডিতে যাচ্ছিল পাহাড়ে। ঘণ্টা চারেক পরে ডাণ্ডিওয়ালারা আবিষ্কার করলো যাত্রীটি মৃত,—ভয়ে ও ঠাণ্ডায় কখন মরেছে জানা যায়নি।

লাগাম কষে ধরেছে পথিকের। পথ নেই, আছে পেরিয়ে যাবার একটা রেখা। কাঠ হয়ে আছি ঘোড়ার পিঠে। দু'খানা হাতই অচেতন। বজ্রমুষ্টিতে ধরে আছি ঘোড়ার পিঠ, সেই মুষ্টি মুক্তর পরেও হয়ত আলগা হবে না। জমাট কঠিন মুষ্টি পাথরের মতো হয়ে থাকবে। ডান হাঁটু প্রায় ঠেকছে পাহাড়ে, বাঁ-হাঁটুর পাশে গভীর খদ—হাজার ফুট নীচু। একটু ভারসাম্যের এদিক ওদিক, বাস— অবধারিত মৃত্যু! পথিকের মাঝে মাঝে সেই অভয়বাণী উচ্চারণ করছে,—'ডরো মৎ।' বৃষ্টি এলো ফোঁটায় ফোঁটায়, এলো আবার তুহিনের ঝাপটা, এলো সেই ১৯২৮-এর সম্ভাবনা। আসুক, তবু ব'লে যাবো—যা দেখে গেলুম এর তুলনা কোথাও নেই। নীলগঙ্গা আর অমরাবতীর তীরে তীরে কাশ্মীরের অমৃতে আত্মাকে দর্শন ক'রে গেলুম। জেনে গেলুম এই পথে জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল কাটানো চলে। মানুষের যা কিছু শ্রেষ্ঠ চিন্তা, শ্রেষ্ঠ বর্ণাঢ্য কল্পনা, শ্রেষ্ঠ কাব্য ও সাহিত্যের পরম মধুর ভাবনা, শ্রেষ্ঠ যোগ ও সাধনা—মানবাত্মার নিগূঢ় রহস্যলোক থেকে যা কিছু উদ্ভূত হয়—এই পথে যেন তার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি।

বৃষ্টির ধারা নামছে। সমস্ত শরীর আবৃত মোটা গরম পোশাকে। শুধু নিজের নাক এবং তার চারদিকে ঘা ফুটছে কাল থেকে। হাতের দস্তানা খুলেছি। বৃষ্টিতে ভিজছে মুখ আর হাত। দেখতে দেখতে ঘন বৃষ্টিধারা। কিন্তু আমরা শান্ত,—এ আমাদের ধৈর্য, সাহস ও সহনশীলতার পরীক্ষা। এবার চূড়া থেকে এঁকে বেঁকে পাকদণ্ডী দিয়ে নামতে থাকি। এতটুকু ভুল, ঈষৎ পদস্খলন, সামান্য বিভ্রান্তি, একটুখানি দ্রুতগতির চেষ্টা,—নিশ্চিত অপঘাত। একটি স্বাস্থ্যবতী পাঞ্জাবী তরুণী তার কমরেডকে নিয়ে ছোটবার চেষ্টা করেছিল দেখেছিলুম। পরে হিমাংশুবাবুর কাছে শুনতে পাই, নিজের ভারসাম্য রাখতে না পেরে মেয়েটি ছিটকে পড়ে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। হিমালয় কখনো দুঃসাহসীকে ক্ষমা করে না।

অমরাবতী নদীর দিকে নামছি। কেউ কেউ বলে অমরগঙ্গা। এই অমর- [illegible] সামনে বিরাট ভৈরবঘাটের পর্বত [illegible] এবং তারই পাশে অমরনাথ পর্বতের তুষারশৃঙ্গ। গুহা কোথায় জানিনে, শুধু জানি ভৈরবঘাট পর্বত অতিক্রম ক'রে আমাদের আরোহণ করতে হবে অমরনাথ পর্বতে।

আবছায়া অন্ধকারে দিকদিগন্ত ঘিরে মুষলধারায় বৃষ্টি নামলো। ঠিক পঁচিশ বছর আগে এইখানে এইপ্রকার বৃষ্টিতে নেমে এসেছিল বিরাটকায়া তুষার নদী মূল পাহাড়গুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। পরের বছরে শত শত লোকের কঙ্কাল এই মৃত্যু উপত্যকায় খুঁজে পাওয়া যায়। এই প্রবল বৃষ্টি ও তুহিন ঝড়ের মধ্যে আমাদের পক্ষে কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করা চলছে না। আমরা সম্পূর্ণ নিরুপায় এবং শান্ত-ভাবে এক এক পা ক'রে নদীর দিকে চললুম। (ক্রমশ)

সাতরাজার ধন

অনুসন্ধানী

রূপকথায় সাত রাজার ধন এক মানিকের উল্লেখ থাকলেও তার রূপের কথা থাকে না, কিন্তু অভিধানের মতে মানিক হচ্ছে লাল রঙের পাথর, চলতি কথায় যাকে চুনি বলে, ইংরেজিতে বলে রুবি। ঠিক সাত রাজার ধন না হলেও ভালো চুনির দাম অনেক, রাজার ধন যথেষ্ট পরিমাণে কম হলে সাত রাজার সতেরো রাজার ধন হওয়াও বিচিত্র নয়।

মানিকের আগে মণির নাম অনেকেই শুনেছেন যদিও মণি কথাটির অর্থ খুব সহজ নয়। এককালে কিন্তু মণি-মাণিক্য বলতে বোঝাতো নয়টি প্রধান রত্ন—হীরা, চুনি, পান্না আর পলা। গজমোতি, সাপের মণি, চন্দ্রকান্ত মণি, পুষ্পরাগ, প্রবাল এবং এমনি ধরনের আরও অনেক নাম আছে বটে, তবে তারা হয় কল্পনার অসম্ভবরকম দামী জিনিস নয়তো মণিগুলোকে তেমন দামী নয়।

পৃথিবীর ভাণ্ডারে যা অজস্র পাওয়া যায় সেগুলো সুন্দর হলেও দামী নয়, দুষ্প্রাপ্য বলেই দাম বেশী। হীরার চেয়ে ভালো চুনি দুর্লভ তাই দামও তার চেয়ে বেশী।

যে সেদিন নারীকে নারী বলে চিনতে শিখেছে সেদিন থেকে তাকে চেয়েছে সাজাতে যতনে কুসুমে রতনে; এখন থেকেই হয়ত মণিমাণিক্যের কদর শুরু হয়েছে। কিন্তু সেসব পুরনো দিনের খবর পাওয়া ভারি শক্ত। সহজলভ্য তথ্য থেকে জানা যায় যে, ভারতের হীরক-শিল্প খৃষ্টজন্মের ছয় কি সাতশো বছর আগেকার। পৃথিবীর হীরক-শিল্পের আসরে এইটিই প্রাচীনতম; তাছাড়া ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিলের হীরার খনি আবিষ্কারের পূর্বে পর্যন্ত দুনিয়ার বাজারে ভারতের হীরা ছিল একচ্ছত্র অধিপতি। সেদিন এখন আর নাই। সরকারী হিসাবপত্র থেকে জানা যায় যে, ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে ভারতের খনি থেকে হীরা উঠেছিল মোট ১১৭৮ ও ১৭২৯ ক্যারাট, টাকার হিসাবে যার মূল্য যথাক্রমে ৫৪,৯৭৯ ও ৬৮,৪১৩ টাকা। তার সংগে তুলনা করতে হয় বিদেশ থেকে ভারতে আমদানী করা হীরার, যার দাম প্রতি বছরে এক কোটি টাকারও উপর।

রত্নরাজির আয়তন ছোট, ওজনও কম, তাই সেরদরে হীরা বেচাকেনা সম্ভব নয়, কিন্তু কি বিচিত্র দেশ এই ভারতবর্ষ, এক সময় সত্যই এদেশে সেরদরে রত্ন বেচাকেনা হয়েছিল তবে সে রত্ন হীরা নয়, নীলা, ইংরেজিতে যাকে স্যাফায়ার বলে।

অনেকদিন আগে, সম্ভবত ১৮৮১ সালে, কাশ্মীরের সুমজম গ্রামের কাছে একজন লোক আগুন জ্বালবার চকমকি পাথর করবার জন্য এক টুকরো নীলা কুড়িয়ে নেয়। সে তার প্রকৃত মূল্য বুঝতে পারেনি তাই কিছুদিন সেটি নিয়ে ছিনিমিনি খেলে সেটিকে বিক্রি করে দেয় এক লাহুলী ব্যাপারীর কাছে, ব্যাপারী সেটি নিয়ে আসে সিমলায় এবং সেখানে সেটির আসল পরিচয় সবাই জেনে ফেলে। খোঁজ করতে করতে সেই 'চকমকি' পাথর যেখানে প্রথম পাওয়া গিয়েছিল সেই জায়গা আবিষ্কৃত হয় আর তখন থেকে সেখানে পাহারা বসাবার ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত দলে দলে লাহুলী ব্যাপারীরা গিয়ে সেই পাথর কুড়িয়ে এনে টাকা টাকা সের দরে সিমলার বাজারে বিক্রি করে ফেলে। লাহুলীরা তো জানতো না নীলার আসল দাম কি!

আমাদের দেশে সোনা, রূপো আর রত্ন ওজন করবার নানারকম মান আছে, যেমন রতি, মাষা আর ভরি। ৯৬ রতিতে এক ভরি হয়, কিন্তু মাষার ওজন বড় গোলমেলে। অঞ্চলভেদে মাষার ওজন কমবেশি হয়, কোথাও ১০ মাষায় এক ভরি কোথাও বা ১২ মাষায় ভরি, আবার কবিরাজী ওজনে ৮ মাষায় এক ভরি হয়ে থাকে। এক ভরি ইংরেজি হিসাবে আন্দাজ ১৮০ গ্রেন (গ্রেন) হয়। বিদেশে রত্ন ওজনের মান হচ্ছে ক্যারাট; বিলাতী ক্যারাটের ওজন ২০৫·৩০৪ মিলিগ্রাম। ১৯১৩ সাল থেকে অবশ্য মেট্রিক ক্যারাট (২০০ মিলিগ্রাম) রত্নরাজির আন্তর্জাতিক মান হিসাবে গৃহীত হয়েছে। তার আগেকার বিলাতী ক্যারাট ছিল ৩·২ গ্রেন (গ্রেন) আর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়া ক্যারাটের ওজন ৩·১ গ্রেন (২৪ গ্রেনে ১ পেনিওয়েট; ২০ পেনিওয়েটে ১ আউন্স)।

পৃথিবীর বৃহত্তম হীরা 'কুলিনান' উঠেছিল দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিমিয়ার মাইন থেকে। এটির ওজন ছিল ২২ আউন্স; পরে এটিকে কেটে একশো পাঁচটি আলাদা আলাদা রত্ন তৈরি হয়।

এত বড় রত্নকে কেটে ছোট করবার কথা শুনলে মায়া হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু না কাটলে রত্নের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায় না। কাটাকুটি করাও আর্টের পর্যায়ে পড়ে। দিল্লী, জয়পুর ও অন্যান্য কয়েকটি জায়গায় রত্ন কাটা ও পালিশ করার শিল্প আজও চালু আছে কিন্তু আমাদের মণিকারদের হাতের কাজ খুব উঁচুদরের নয় তাই ভারতের উৎকৃষ্ট রত্নরা প্রায় সবাই ভারতীয় ছাত্রের মত সাগর পারে পাড়ি

দেয় লায়েক হয়ে আসবার জন্য। মণিকার শিল্পে অ্যামস্টারডাম আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়ে আসছে বহুদিন ধরে, ভারতীয় রত্নরা প্রধানত সেখানে যেয়েই ঝিকমিক করে।

হীরা ও অপরাপর বর্ণহীন রত্ন কাটবার প্রচলিত ধরনকে বলে ব্রিলিয়াণ্ট কাট। এর মূলসূত্র হচ্ছে একটি অষ্ট-তলকের মাথার দিকটি চওড়া করে কেটে একটি বড় চ্যাপ্টা মুখ আর নীচের দিকটি কেটে একটি ছোট মুখ অথবা তল তৈরি করা। এদের আশেপাশে আরও অনেক ছোট ছোট তল কেটে বের করা হয় যাতে রত্নটি দেখতে সুন্দর হয় আর তার ভিতরে আলো নানা তল থেকে প্রতিফলিত হয়ে একে ঝলমল করে তোলে। অষ্টতলকের ইংরেজি নাম অকটাহেড্রন, যদিও শীর্ষদেশ থাকে ছটি, চারকোণায় চারটি, উপরে একটি ও নীচে একটি। একটি চারকোণা পিরামিডের তলায় যদি ঠিক ঐ আকারের আরেকটি পিরামিড উলটো করে অর্থাৎ মাথা নীচের দিকে করে জুড়ে দেওয়া হয় তাহলে এই সম্মিলিত পিরামিডের আকৃতি যা হবে তাকেই অষ্টতলক বলে।
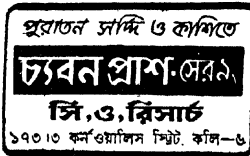
বলা বাহুল্য যে, হীরা কাটা বেশ শক্ত কারণ মণিদের মধ্যে হীরাই কঠিনতম। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, হীরাকে ঐ অষ্টতলকের সমান্তরালে অপেক্ষাকৃত সহজে চেরা যায়। মণির এই গুণকে বলে সম্ভেদ, ইংরেজি নাম ক্লিভেজ।

সবহীরা বর্ণহীন হয় না, একটু আধটু রঙের আভা প্রায়ই দেখা যায়। ঈষৎ হরিদ্রাভ আর নীলাভ রত্নই বেশী, তাদের মধ্যে নীলাভ হীরার মূল্য সর্বাধিক। হীরার প্রতিসরাঙ্ক, মানে এর ভিতরে-ঢোকা আলোকে তার গতিপথ থেকে বাঁকিয়ে দেবার ক্ষমতার পরিমাণ লাল আলোর বেলায় ২·৪০২ আর বেগুনী আলোর বেলায় ২·৪৬৫। এই দুটির ব্যবধান অর্থাৎ ০·০৬৩ হচ্ছে হীরার বিচ্ছুরণ শক্তির পরিমাণ। বিচ্ছুরণ বেশী বলেই ঠিকভাবে কাটা হীরায় 'ঈঠাৎ আলোর ঝলকানি'র বর্ণবৈচিত্র্য দেখা যায়।

রত্নরাজির এই সব গুণ আছে বলেই নকল মণি থেকে আসলদের আলাদা করে চেনা যায়। মণির আপেক্ষিক গুরুত্ব, কাঠিন্য, প্রভৃতি গুণও এদের চিনতে সাহায্য করে। রঙিন মণিদের অনেকেরই একটি মজার গুণ আছে; সমবর্ত আলোতে (যে আলোর ঢেউ একটিমাত্র সমতল দিয়ে প্রবাহিত হয়) এদের রং লম্বালম্বিভাবে ধরলে এক রকম, আবার আড়াআড়িভাবে ধরলে অন্যরকম হয়। কাঁচের তৈরি নকল মণিদের এ-সব বালাই থাকে না। রঞ্জন-রশ্মিও মণি পরীক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়।

পৃথিবীর হীরা উৎপাদনের শতকরা ৯৫ ভাগ এখন আফ্রিকার খনি থেকে ওঠে। মণি হিসাবে পরিচিত হলেও শিল্পে হীরার ব্যবহার খুব বেশী। বছরে যত হীরা বাজারে আসে তার দুই-তৃতীয়াংশ যায় কলকারখানার কবলে। শিল্পে অবশ্য দামী হীরা ব্যবহৃত হয় না। গাঢ় বর্ণের বোর্ট, গোল গোল বাল্লাস, কিম্বা কালো রঙের কার্বনাডো নামের সস্তা হীরা কলকারখানায় ড্রিলিং, কাঁচ কাটবার যন্ত্র, সরু তার টানবার ছাঁচ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। মণিকার শিল্পে হীরক চূর্ণ দিয়ে হীরা পালিশ করা হয়।

খনি থেকে যত হীরা ওঠে তারা সবাই সরাসরি বাজারে হাজির হয় না কারণ হীরার দাম চড়িয়ে রাখবার জ ব্যবসায়ীরা সম্মিলিতভাবে হীরা গুদ জাত করে চাহিদা হিসাবে আস্তে আ বাজারে ছাড়েন। সবচেয়ে দামী হী জলের মত স্বচ্ছ তাই তাকে 'ফা ওয়াটারের' মাল বলে। হরিদ্রাভ নী নাম 'অফ্-কালার'।

ভারতে হীরা পাওয়া যেত তি অঞ্চলে—উড়িষ্যার সম্বলপুরে ও ম প্রদেশের চাঁদা জেলায় মহান উপত্যকায়; মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদের কি জায়গায় আর মধ্যভারতের পান্না, চরখা বিজাওআর, অজয়গড়, সরমুন্ডা প্র জেলায়। শেষোক্ত অঞ্চলে হীরক খ অস্তিত্ব আজও আছে অন্য অঞ্চল দী গত ২০।৩০ বছরের মধ্যে কো উল্লেখযোগ্য হীরা পাওয়া গেছে ব জানা যায় না।

মধ্যভারতে হীরা পাওয়া যায় প্রা পাললিক শিলায়, যার স্থানীয় ন 'মুড়ভা'। এটি বিন্ধ্য শিলাস্ত পাললিক শিলার ভিতরে মাত্র দুই ফ পুরু একটি কংগ্লোমারেটের স্তর। স্তর সব জায়গায় সমান পুরু নয় এর বিস্তৃতিও একটানা নয়, বহু জায় এর খোঁজ মিলে না। বৃষ্টি-বাদল যেখ এর উপরের মাটি ধুয়ে নিয়ে একে অনাবৃ করেছে সেখান থেকে সহজেই হী উদ্ধার করা যায়, কিন্তু যে সব জায় ৬০।৭০ ফুট গভীর গর্ত করে স্তরে পৌঁছতে হয় সেখানে হীরা উদ্ধ করা সহজ নয়। এই কংগ্লোমারেট পা বেশ কঠিন। প্রথমে কাঠের আগু তাতিয়ে এতে ফাটল ধরিয়ে তার সাহা পাথরকে টুকরো করে কেটে ঝুড়ি বোঝ করে উপরে নিয়ে আসা হয় তারপর তা গুঁড়ো করে জল দিয়ে ধুয়ে ধুয়ে হী বেছে নেওয়া হয়, তাতে খরচ পড়ে বেশ এসব ঝঞ্ঝাট যেখানে প্রকৃতি দেবীই সে রেখেছেন, রোদবৃষ্টি দিয়ে তারপরে জ স্রোতে ধুয়ে এনে পলিমাটির ভিতরে হী জমা করেছেন সেখানে হীরা উদ্ধা পরিশ্রম কম।

মধ্যভারতের প্রায় সব হীরাই আ পান্না জেলা থেকে যার মধ্যে শহিদানে খনিগুলি প্রধান। উৎপাদন যতই ব হোক না কেন পান্নার হীরার দাম প্রায়

[আ]ফ্রিকার হীরার চেয়ে বেশী হয় কারণ [এ]খানকার বহু হীরা ফার্স্ট ওয়াটারের [অ]র্থাৎ উজ্জ্বল স্বচ্ছ কিম্বা ঈষৎ নীলাভ [র]ঙের। বস্তুত ভারত জগতকে কয়েকটি [খু]ব বেশী নামকরা হীরা দিয়েছে, যেমন [কো]হিনুর, ফ্লোরেণ্টাইন (১৩৩ই ক্যারাট), [রি]জেন্ট (৪১০, কাটাবার পর ১৩৬·৮৭৫), অরলফ (১৯৪ই), স্যানসি [৫৩]ই), 'মুন অফ দি মাউণ্টেন্স', নিজাম [২৭৭]) আর 'হোপ ডায়মণ্ড'—যেটি তার [মা]লিকের বরাতে সব সময়েই দুর্ভাগ্য [এ]নে দিয়েছে।

কোহিনুরের (এখন ১০৬·০৬৩) [কথা] সকলেই জানেন। ফ্লোরেণ্টাইনের ... করেছিলেন ট্যাভার্নিয়ার। রিজেন্ট ... প্যারিসের লুভার মিউজিয়ামে ... এর দাম চার লক্ষ আশি হাজার ...। অরলফকে মাইশোরের কোনও ... থেকে চুরি করে নেওয়া হয়েছিল ... প্রমাণ আছে। নাদির শা দিল্লী লুঠ ... সময় মুন অফদি মাউণ্টেন্সকে ... যান, পরে এটি রাশিয়ার রাজকোষে ... পৌঁছেছিল।

... রঙের কোরানডামকে রুবি ...। এর সংস্কৃত নাম বোধহয় কুরু-...। রুবির বহুবিধ দেশী নাম আছে ... চুনি, মানিক্য, পদ্মরাগ, মানিক ...। প্রাচীন সাহিত্যেও এর উল্লেখ ... নাই। তবুও আসল চুনি ভারতে ...। চুনির প্রধান উৎস হল আপার ... প্রাক-পুরাজৈবিক যুগের চুনা-...। ভারতের কয়েকটি রাজ্যে, যেমন ..., মাইশোর, মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ আসাম, কিছু কিছু কোরানডাম ...—কুরুন্দ) পাওয়া যায় বটে তবে ... কেউই রত্নের পর্যায়ে পড়ে না।

কুরুন্দ নানা রঙের হয় এবং রঙানু-... বিবিধ নামও হয়ে থাকে, যেমন [ওরি]য়েণ্টাল এমেরাল্ড (সবুজ), [ওরি]য়েণ্টাল টোপাজ (হলদে) আর [ওরি]য়েণ্টাল অ্যামিথিস্ট (বেগুনী)। ...দের প্রতিসরাঙ্ক ১·৭৬৮ ও ...৬০; দুটি সংখ্যার কারণ এই যে, [ম]ধ্যে আলোর রশ্মি ঢুকে দুটি আলাদা ...র্ত রশ্মিতে ভেঙে পড়ে, মণির ...রে তাদের মতিগতি আলাদা ধরনের তাই প্রতিসরাঙ্কও আলাদা। এর বিচ্ছুরণও কম ০·০১৮।

হীরা শুধু কার্বন দিয়ে তৈরি কিন্তু কুরন্দের অণুতে রয়েছে দুটি অ্যালুমিনিয়াম ও তিনটি অক্সিজেন পরমাণু। চুনিতে আলো ঢুকবার দিকের সাথে রঙের কিছু তফাৎ হয়, একদিকে গাঢ় লাল আর তার সমকোণে হয় ফিকে লাল। হীরা যদি রঙিনও হয় তবু তার এই গুণ থাকে না।

রঙিন স্বচ্ছ পাথরের বেলায় যে 'কাট' প্রচলিত তার নাম স্টেপ কাট অথবা ট্র্যাপ কাট। অস্বচ্ছ পাথরকে সাধারণত গোল অথবা ডিম্বাকৃতি করে কাটা হয়, উপরটা হয় চ্যাপটা না হয় গম্বুজের মতন করা হয়, তলাটা সমতল করা হয়। এই কাটকে en cabochon বলে। চুনি আর নীলা এইভাবে কাটলে তাদের অভ্যন্তরে কখনও কখনও একটি ষড়রশ্মি-যুক্ত তারা দেখতে পাওয়া যায়; প্রকৃতির কোলে জন্মের সময়ে ভূগর্ভে পর্বত সৃজনপ্রয়াসী আলোড়নের

ফলেই নাকি মণিতে এরকম আলোর খেলা তৈরি হয়ে থাকে।

নীল রঙের কুরুন্দকে নীলা বলে; এর অপর নাম নীলকান্ত মণি। চুনি না পাওয়া গেলেও নীলা পাওয়া যায় কাশ্মীরে। আর যে সব দেশে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে সিংহল, বার্মা ও শ্যামদেশ প্রধান। ভারতীয় ভূসমীক্ষা দপ্তরের লাটুস সাহেব নীলা পাওয়ার একটি মজার গল্প লিখে গিয়েছেন। গত শতাব্দীর শেষার্ধে একদল ব্যাপারী রুপসু থেকে সোহাগা নিয়ে এসেছিল সিমলার বাজারে। সেখানে এক দোকানে সোহাগার ঝুড়ি উপুড় করে খালি করবার সময় একটি ঝুড়ি থেকে এক টুকরো পাথর টুপ করে পড়ল সোহাগার স্তুপের উপর। অবাঞ্ছিত ময়লা মনে করে দোকানী সেটি ছুঁড়ে ফেলে দিলো রাস্তায়। ঠিক সেই সময় সুপরিচিত জহুরী মিঃ জেকবস সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, পাথরের টুকরোটি ঠক্ করে তার গায়ে যেয়ে লাগল। তিনি কৌতূহলী হয়ে সেটি কুড়িয়ে নিয়ে দেখেন এক খণ্ড নীলা, তৎক্ষণাৎ তিনি দোকানীর কাছ থেকে সেটি নামমাত্র মূল্যে কিনে নেন। এই কাহিনী যদি সত্যি হয়, তবে মনে হয় যে, এখনও কাশ্মীরে কোনও অজানা জায়গায় নীলার আকর আছে।

কাশ্মীরে সুসজাম গ্রাম থেকে প্রায় আড়াই মাইল উত্তর-পশ্চিমে ভূটনা নদীর ধারে নীলা প্রথম পাওয়া যায়। নদীর দুধারেই পাহাড়; সেই পাহাড় থেকে পাথরের টুকরো গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সারা উপত্যকায়। এই আলগা পাথরে ধস নামার পর এখানে নীলা আবিষ্কৃত হয়েছিল, জায়গাটি চওড়ায় মাত্র ১০০ ফুট, লম্বায় ৩০০০ ফুটের বেশী নয়। উপত্যকাটি সাগর সমতল থেকে ১৪,০০০ ফুটেরও বেশী উঁচুতে তাই সারা বছর ধরে এখানে কাজ চলত না। গোড়ার দিকে (১৮৮২ সাল) এখানে রত্ন উদ্ধারের কাজ বেশ জোর চলেছিল। পরে এই হঠাৎ পাওয়া রত্নাকরের রত্ন সম্ভার ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে ১৮৮৮ সালের পরে একদম শেষ হয়ে যায়। সেই বছর কাজের সময় (জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর) যে নীলা উদ্ধার হয়েছিল, তার মোট ওজন ১৬৩০ ভরি, কিন্তু তার সিকি ভাগকে রত্ন বলা চলে, বাকি সবই খেলো আর ছোট পাথর। ১৮৮৭ সালে এখানের বৃহত্তম নীলা ছিল ৬ আউন্স ওজনের। সে সময় লাটুশ সাহেব জম্মুর রাজকোষে যে সব নীলা দেখেছিলেন, তাদের কেউ কেউ লম্বায় ৫ ইঞ্চি, চওড়ায় ৩ ইঞ্চি পর্যন্ত বড় ছিল; আকার আর রঙের দিক দিয়ে এদের কয়েকটি নাকি অতুলনীয়।

এই জায়গার রত্নসম্ভার মাটির ৩ ফুট নীচেই শেষ হয়েছে তাই ১৮৮৮ সালের শেষে এখানে কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। পরে ১৯০৬ সালে আবার কাজ চালু হয়ে ১৯০৮ সালেই বন্ধ হয়ে যায়। তারপরে ১৯২৭ সালে আবার খোঁজা শুরু হয় এবং নতুন খনি আবিষ্কারও হয়। এখানে চিনামাটি আর তার নীচে পেগমাটাইট নামে এক রকম পাথরের ভিতর নীলা পাওয়া গিয়েছে। ১৯৩৩ সাল থেকে এখানে সুচারুরূপে কাজ চালু হয়েছিল, বর্তমানে এর কি অবস্থা তা বলা শক্ত।

কাশ্মীরী নীলার বর্ণ-বৈচিত্র্য আছে, ফিকে নীল থেকে শুরু করে গাঢ় আসমানী পর্যন্ত সব রকম নীলাভ রঙই দেখতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ পাথরের রঙ উজ্জ্বল নীল আর তাদের দ্যুতিও বেশ সুন্দর মখমলের মত। এই সব ক[illegible] কাশ্মীরের নীলা বেশ দামী হয়।

রত্ন হিসাবে এর পরেই নাম ক[illegible] হয় পান্না অথবা মরকত মণির। এ[illegible] বহু প্রাচীন কাল থেকে এটি রত্ন হি[illegible] পরিচিত। খৃষ্টজন্মের চারশো [illegible] আগেও ভারতে মরকত মণি খনি [illegible] তোলা হয়েছে। এর ইংরেজী [illegible] অ্যাকোয়ামেরিন, আর মণিক হিসাবে [illegible] নাম বেরিল। বেরিল নামটি জড়িয়ে [illegible] বেরিলিয়াম ধাতুকে কারণ রসায়[illegible] হিসাবে বেরিল হচ্ছে বেরিলি[illegible] অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট। পান্না অ[illegible] হীরা, চুনি অথবা নীলার মতন উজ্[illegible] নয়, কিন্তু রঙের বাহার আর দুর্লভ[illegible] এর দাম আছে।

সব বেরিলই সবুজ নয়; সোনা[illegible] রঙের বেরিলকে গোল্ডেন বেরিল [illegible] তাছাড়া অ্যাকোয়ামেরিনের রঙও [illegible] থেকে নীলাভ সবুজ পর্যন্ত [illegible] ভারতের নানা জায়গায় বেরিল পা[illegible] যায়, কিন্তু পান্না মিলে শুধু কাশ্মী[illegible] সেখানে শিগার উপত্যকায় ১৯১৫ সা[illegible] পান্নার খোঁজ মিলে। এখানকার পা[illegible] আয়তনে বেশ বড়; আধ ইঞ্চি থেকে [illegible] ইঞ্চি পর্যন্ত চওড়া আর ২।৩ ই[illegible] পর্যন্ত লম্বা রত্ন পাওয় অসম্ভব না[illegible] এখানকার উৎপাদনের পরিমাণ সম্বন্[illegible] জানা যায় না। শেষ যে খবর পাওয়া যা[illegible] তা ১৯২১ সালের উৎপাদনের পরিমা[illegible] ৬৯,৪৭১ ক্যারাট। পান্না নানা আকা[illegible] কাটা হয়, অস্বচ্ছ পাথরের উপর খোদাই[illegible] কাজও মাঝে মাঝে হয়ে থাকে।

ভারতে আর যে সব রত্ন পাওয়া য[illegible] তাদের মধ্যে গার্নেট আর ওপালের ন[illegible] উল্লেখযোগ্য, রাজপুতানা থেকে প্রা[illegible] ভালো গার্নেট বাজারে আসে। ওপ[illegible] পাওয়া যায় আমেদনগর, নাগপুর, হায়[illegible] বাদ, প্রভৃতি স্থানে। পোখরাজ (পুষ্পরা[illegible] ধলভূম ও খারসোয়ানে কিছু কিছু পাও[illegible] যায়। পাতিয়ালার কায়ানাইটও উল্লে[illegible] যোগ্য। গোমেদ অথবা জারকন ভারতে[illegible] চেয়ে সিংহল ও বার্মাতেই বেশী পাও[illegible] যায়। এরা অবশ্য খুব দামী রত্ন ন[illegible] ১৯৩০ সালে শুধু জয়পুরেই গার্নেটে[illegible] উৎপাদন ছিল ৭·৩ টন।

—৮—

একটু গলির ভিতরে রেস্টুরেন্ট। ইলেকট্রিকের খুঁটি এখান অবধি াসেনি। তা ছাড়া প্রকাণ্ড একটা ত্তি-গাছ ডালপালা ছড়িয়ে আছে বলে াকানের সামনেটা বেশ অন্ধকার। ভিতরে একটা কেরাসিনের বাতি জ্বলছে স্টুরেন্টের দেয়ালে। দুটো লম্বা ঞ্চ, একটা কেরাসিন কাঠের টেবিল, চ-পরানো দু'তিনটা টিনে কিছু মুড়ি স্কুট ও চিড়ের চাকতি সাজিয়ে ক্তীশের চায়ের দোকান। অদূরে কটা প্যাকিং বাক্স তৈরীর কারখানা। াগাটা এমনি চুপচাপ। কেবল রখানা থেকে কাঠ-চেরা মেসিনের কটানা ঘস ঘস শব্দ আসছে। দুটি ন্দুস্থানী কি নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কবিতর্ক ও বচসা করার পর আবার খন থেমে গেছে। কারখানার সামনে কটা লরী দাঁড়িয়ে। যেন কল বিগড়ে াছে বলে গাড়িটা আজ আর চলবে না। াইভার নেই। আলো নেই। কে কজন, খুব সম্ভব কারখানার লোক স্টুরেন্টের টেবিলটার ওপর পা তুলে য়ে বসে বসে বিড়ি ফুঁকছে। তার মনে একটা শূন্য কাচের গ্লাস। লায় একটু চা পড়ে আছে। এই াকটি কি অন্য কোন খদ্দের চা খেয়ে াসটা টেবিলের ওপর রেখে গেছে, বনাথ বুঝতে পারল না।

হ্যাঁ, একটু ইতস্তত করছিল বৈকি বনাথ। ময়লা কাপড়চোপড় পরা খতে প্রায় ইতরশ্রেণীর মত খদ্দেরের াশে টুলের ওপর হুট্ করে বসতে চিতে বাধছিল বলে শিবনাথ দোকানে াকার পরও এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল।

'বসুন স্যার, আমার হয়ে গেছে।' বিড়িটা তাড়াতাড়ি মুখ থেকে নামিয়ে লোকটি সোজা হয়ে বসল। 'এ পাড়ায় আপনি নতুন এসেছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।' গম্ভীর গলায় উত্তর ক'রে শিবনাথ লোকটি ও নিজের মধ্যে বেশ খানিকটা ব্যবধান রেখে বেঞ্চের এক পাশে বসল। 'এক পেয়ালা চায়ের দাম কত নেয় এখানে?'

'চার পয়সা। এর আগে কলকাতায় ছিলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।' শিবনাথ ঘাড় ফিরিয়ে আবার আপাদমস্তক লোকটিকে দেখল। বিড়ি নিভে গেছে, দেশলাই জ্বেলে বিড়ি ধরাচ্ছে। বিড়ি ধরিয়ে এক ঝলক ধোঁয়া শিবনাথের মুখের দিকে ছেড়ে দিয়ে লোকটি দাঁত বের করে হাসল। 'বাবুর দল শহর ছেড়ে আস্তে আস্তে খাল-পারের দিকে আসছে। জায়গাটার জেল্লা বাড়ছে দিনকে দিন। তা শহরের মতন মাজাঘষা রেস্টুরেন্ট পাবেন না এখানে। কি করে হবে—এ তল্লাটে তো আর ভদ্রলোক বলতে কিছু ছিল না। কেরাসিন কাঠের টেবিল আর তেলের বাতি আর আমরা দু'চারটে কুলি-মুটে খদ্দের নিয়ে ক্ষিতীশ দোকান খুলেছিল। এবার আপনারা এসেছেন, যদি শালার কপাল খোলে। কইরে, বাবুকে চা দে।'

হঠাৎ এখন শিবনাথের নজরে পড়ল দোকানে আর কাউকে দেখা দেখা যাচ্ছে না। তার পিছনে একটা চটের পর্দা ঝুলছে। হয়তো সেখানে উনুন এবং ক্ষিতীশ উনুনের পাশে কাজে ব্যস্ত আছে, শিবনাথ অনুমান করতে যাবে, এমন সময় সেখান থেকে পুরুষ, না একটি মেয়ের গলার স্বর ভেসে এল। 'বাবুকে বসতে বলো, জলটা একটু ফুটবে।'

শিবনাথ চমকে লোকটির মুখের দিকে তাকাল।

'বুঝতে পারছেন না!' লোকটিও শিবনাথের চোখের দিকে গোল চোখে তাকিয়ে মুখব্যাদন করে হাসে। 'চৌরঙ্গীর চায়ের দোকানে মেমসাহেব মেয়েমানুষ যেমন খদ্দেরকে এনে চা দেয়, ক্ষিতীশও আপনাদের জন্যে সে রকম কিছু একটা এখানে চালু করতে চাইছে। না হলে বাবুরা ভিড়বে কেন? মধু না থাকলে ভোমরা আসে না।'

শিবনাথ নীরব ফ্যালফ্যাল চোখে লোকটির বত্রিশ দাঁতের নিঃশব্দ হাসি দেখে কেমন চমকে ওঠে, যেন ভয় পায় এবং দারুণ অস্বস্তিবোধ করে।

'হা-হা।' এবার লোকটি শব্দ ক'রে হাসল। 'তা ক্ষিতীশের বুদ্ধি আছে। বলুন স্যার, মেয়ে না রাখলে আপনাদের শহরে এখন কোন্ কারবারটা চলছে। চায়ের দোকান, দুধের দোকান, সেলুন, লণ্ড্রি, আফিস, মায় শেয়ালদা ইস্টিশানে পর্যন্ত সেদিন দেখে এলাম মেয়েছেলে টিকিট বিক্রী করছে।'

—শিবনাথ চুপ।

হঠাৎ লোকটি সরে এসে শিবনাথের গা ঘেঁষে বসল এবং বিধু মাস্টারের মত মুখটা প্রায় শিবনাথের কানের ভিতর ঢোকাবার চেষ্টা ক'রে ফিসফিসিয়ে উঠলঃ 'কেনই বা হবে না, বিয়ে-থা হচ্ছে না যখন ধিঙ্গী সেজে ঘরের অন্ন ধ্বংস করবে, তাই বাপ-মা ঠেলে ঠেলে ওদের পাঠাচ্ছে দোকানে আর আফিসে। বছর দুই যাক না, দেখবেন ব্যাটাছেলেরা আর কোন জায়গায় পাত্তা পাবে না। সাধে কি এত ছাঁটাই চলছে। মেনকা উর্বশীদের ঠাঁই করতে হবে তো—'

হঠাৎ কে একজন এসে দোকানে ঢুকতে লোকটির মুখের কথা থেমে গেল এবং বেশ ব্যস্ত হয়ে শিবনাথের কানের কাছ থেকে মুখটা সরিয়ে নিজে সোজা হয়ে বসল।

'আবার তুই আমার দোকানে ঢুকেছিস সাধন। তোকে না বলেছি আমার দোকানে আসতে পারবি না। আবার এলি?'

ভীত, সংকুচিত হয়ে সাধন মুখ নিচু করল।

'চা খেতে হয়, খালপার আরো পাঁচটা দোকান আছে, সেসব জায়গায় গিয়ে খা। আমার এখানে না।'

'আজকে আর ধারে খাইনি ক্ষিতীশ, পয়সা দিয়েছি।'

ক্ষিতীশ ভেংচি কাটল।

'পয়সা দিলেও এখানে তুমি চা পাবে না। হ্যাঁ, আমার এক কথা। বাজে লোক এসে দোকানে আড্ডা দেবে, আমি পছন্দ করি না।' কথা শেষ করে ক্ষিতীশ আর কোনদিকে না তাকিয়ে হন হন করে সোজা পর্দার আড়ালে চলে গেল।

সাধন এক মিনিট তেমনি নীরব নতমুখ থেকে পরে গজ গজ করে কি জানি বলতে বলতে আস্তে আস্তে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

'শালা বদমায়েস। মেয়েমানুষের গন্ধ পেলে আর কথা নেই। পই পই করে বারণ করে দিয়েছি না এখানে না। কুলি-মজুরের জন্যে 'তৃপ্তি-নিকেতন' খোলা হয়নি। তোদের জন্যে আরো পাঁচটা দোকান আছে খালের এপাড়-ওপাড়। সেখানে বসে চা খা, আড্ডা মার গিয়ে। তুই-ই বা ওকে চা দিতে গেলি কেন। তোকে নিয়ে আমি আর পারি না।'

পর্দার আড়ালে থেকে বললেও শিবনাথ সব শুনল।

'আমি নিষেধ করেছি ও শোনেনি।' মেয়ের গলা।

'হারামজাদারা কেন এখানে আসে, তুই কি বুঝিস না!' ক্ষিতীশের ক্রুদ্ধ কণ্ঠ। 'এমন ধারা করলে তোকেও আর আমি দোকানে ঢুকতে দেব না, বেবি। হ্যাঁ, আমার এক কথা।'

শিবনাথ চমকে উঠল। বেবি! নামটা পরিচিত নয় কি!

এবং এক মিনিট পর চায়ের পেয়ালা হাতে ক'রে মেয়েটি যখন পর্দার এপারে এসে দাঁড়াল, বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল শিবনাথ। তার প্রতিবেশী কে গুপ্তের দুহিতা।

শিবনাথকে দেখে বেবিও চমকে ওঠে। হাতের পেয়ালাটা একবার ঠক্ ঠক্ করে ওঠে বৈকি! কিন্তু পর-মুহূর্তেই বেবি সামলে নেয়। বরং স্মিত হেসে সংযত হাতে বাটিটা শিবনাথের সামনে টেবিলের ওপর রাখে।

'বিস্কুট দেব।'

'না।' রুমাল বের ক'রে শিবনাথ কপাল মুছল।

'তুই এখন বাড়ি যা, রাত হয়েছে। চা খেয়েছিস?' বলতে বলতে ক্ষিতীশ এক পেয়ালা চা হাতে নিয়ে পর্দার বাইরে এল। বেবি মাথা নেড়ে জানাল 'হুঁ'।'

'তোর মার জন্য চা নিয়ে যা।'

'আচ্ছা!' ঘাড় নেড়ে বেবি আবার পর্দার আড়ালে গিয়ে ঢুকল এবং একটু পর একটা কাচের গ্লাসে ক'রে চা নিয়ে বেরিয়ে এল, তারপর আর কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা রাস্তায় নেমে গেল।

ক্ষিতীশ হাতের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে শিবনাথের পাশে বসল। 'চিনতে পারলেন মেয়েটিকে?'

'হ্যাঁ। আমাদের বাড়িতে থাকে।'

'ভদ্দরলোকদের দিনকে দিন কি অবস্থাটা হচ্ছে একবার দেখুন।' বাটিতে আর একটা চুমুক দিয়ে ক্ষিতীশ একটু সময় চুপ করে রইল।

শিবনাথ নিঃশব্দে চায়ের বাটি মুখের কাছে তোলে।

'দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা এখানে ঘুর-ঘুর। 'না' করি আর কি ক'রে। চোখের ওপর তো দেখছি। ভাত খেতে পায় না তো চা আর জলখাবার। শুকিয়ে মুখটা কেমন আমসির মত হয়ে যাচ্ছে দেখলেন তো! না হলে এই বয়সে কত লাবণ্য কেমন জেল্লা থাকত চেহারার।' ক্ষিতীশ বিড়ি ধরায়। 'আপনার চলে?'

'না',—শিবনাথ মাথা নাড়ল। 'আমার সিগারেট আছে।'

'আসে, এসে বলে মা একটু চা খাবে, দাদা একটু চা খাবে, এক বাটি চা দিন, কাল-পরশু দামটা দিয়ে দেব। শুনে মনে মনে হাসি—দুঃখও হয়। কত কাল-পরশু চলে যাচ্ছে। তা করবে কি, কোথা থেকে দেবে চায়ের পয়সা।' যেন নিজের মনে কথা বলে ক্ষিতীশ লম্বা নিশ্বাস ছাড়ে। 'শহরে থাকতে মেয়েদে[illegible] ইস্কুলে, কি নাম, হ্যাঁ, লরেটোতে প'ড়ত বাপের পয়সা ছিল। চা-জলখাবারই ব[illegible] কম খেয়েছে কি! তাই তো জিহ্ব[illegible] চুক্‌চুক করে এখন এক ফোঁটা গর[illegible] জলের জন্যে। হা-রে কপাল! তা আ[illegible] আসুক, খায় খাক। বারণ করি না[illegible] আমারও একটা কাজ হয় যতক্ষ[illegible] দোকানে থাকে। সন্ধ্যার পর শেয়াল[illegible] গেলাম কিছু সওদা আনব বলে[illegible] দোকানে বেবিটাকে রেখে গেলাম বললাম, বাবুরা কেউ এলে একটু [illegible] ক'রে দিবি। তা দেখলেন তো, কাণ্ড[illegible] খানা। পিছন ফিরেছি, আর ঐ শ[illegible] এসে ঢুকল এখানে আড্ডা মারতে[illegible] মেয়েছেলের গন্ধ পেলে মাছির মত এ[illegible] সব জোটে কোথা থেকে—' বলতে বল[illegible] ক্ষিতীশ হঠাৎ থামল। বাস্তসমস্তভা[illegible] আর একজন এসে দোকানে ঢুকল[illegible] শিবনাথ দেখেই চিনল ক্ষিতীশের [illegible] রমেশ রায়।

রমেশ রায়ের গায়ে একটা [illegible] ভারিমতন গরম কোট। গলায় [illegible] জড়ানো, মাথায় গরম কাপড়ের টুপি[illegible] কেবল তা-ই নয়, পায়ে মোজা, হা[illegible] দস্তানা। দেখে শিবনাথের হাসি পেল[illegible] কেননা এখনো এতটা ঠাণ্ডা পড়েনি [illegible] এমনভাবে গরম কাপড় দিয়ে সর্বশরী[illegible] মুড়ে রাখতে হবে।

ক্ষিতীশ হাত থেকে চায়ের বা[illegible] নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ায়।

'চা খাবে নাকি?'

'না।' বলে গম্ভীরভাবে রমেশ র[illegible] কেক্-বিস্কুটের টিনগুলোর দিকে চো[illegible] থাকে। ক্ষিতীশ হাতের লু[illegible] বিড়িটা কায়দা করে নিভিয়ে ফেলে।

'পাঁচু আসে এখানে চা খেতে[illegible] পাঁচু ভাদুড়ী?'

'হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আসে।' ক্ষিতী[illegible] দাদার মুখের দিকে তাকায়। চোখ ব[illegible] করে রমেশ রায় বলল, 'খবরদার, ও[illegible] শালাকে দোকানে ঢুকতে দিবি না[illegible] বলে রমেশ শিবনাথের দিকে তাকা[illegible] 'নমস্কার, রায়সাহেবের বাড়িতে আপ[illegible] নতুন ভাড়াটে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।' শিবনাথ প্রতিনমস্ক[illegible] জানায়। এ-বাড়ির সবচেয়ে প্রতিষ্ঠাব[illegible]

বক্তশালী লোকটির সঙ্গে তার এই প্রথম আলাপ হয়।

'মশাই, দোকান খুললেও কি আর স্বস্তিতে আছি।' রমেশ রায় শিবনাথের পাশে বসল। 'পাঁচুকে আপনি দেখেছেন তো?'

'হ্যাঁ, পাঁচ নম্বর ঘরের ভাড়াটে।'

'শালার সিফিলিস আছে বুঝলেন।' রমেশ রায় চোখ-মুখের বিকৃত ভঙ্গি করল। 'বেশ্যাবাড়ি পড়ে থাকে। ওর এসব হবে না তো কার হবে। তাই জোরবার ক'রে আমি ক্ষিতীশকে বলছি, না, এখানে না। ওই ব্যারাম নিয়ে শালা এখানে চা খেয়ে যাবে, আর সেই বাটিতে করে আপনারা ভদ্রলোকেরা চা খাবেন, এটা ঠিক না, কি বলেন?'

'নিশ্চয়ই।' শিবনাথ মাথা নাড়ল।

'তা, কে ভদ্রলোক কে ছোটলোক, সহজে কি আর চেনা যায়?' রমেশ রায় আবার চোখ-মুখের বিকৃত ভঙ্গি করল। 'ম্যাট্রিক ফেল্ করে ক্ষিতীশ যখন বাড়িতে বসা, আর কোন কাজকর্ম জোটাতে পারে না, তখন অনেক ভেবে-চিন্তে কিছু পুঁজি দিয়ে দোকানটা করে দিলাম। আগে তো আর এ-তল্লাটে কুলি-মজুর ছাড়া কিছু ছিল না। যখন দেখলাম শহর থেকে পাকিস্তান থেকে ভাল ভাল লোকেরা এখানে এসে বাস করতে শুরু করেছে, মনে একটু আশা জাগল, ভাল একটা রেস্টুরেণ্ট খুললে তা চলবে, লোকসান হবে না। এখন দেখছি, আমার স্পেকুলেশান ঠিক হয়নি।' রমেশ রায় থামল। শিবনাথ একটা সিগারেট ধরালে। ক্ষিতীশ উঠে পর্দার আড়ালে গিয়ে কি যেন করছে। পেয়ালা-পিরিচের টুং-টাং শব্দ হয়। যেন সেগুলো ধোয়া হচ্ছে।

'অমল চাকলাদারকে চেনেন তো?' রমেশ প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, আট নম্বরের ভাড়াটে।' শিবনাথ রমেশের চোখে চোখ রাখল।

'ঊনিশ টাকা শালার কাছে পাওনা মশাই। কেমনরে ক্ষিতীশ, ঊনিশ টাকা কত আনা যেন বাকি পড়েছে?'

'এগারো আনা।' পর্দার ওপার থেকে ক্ষিতীশ জবাব দেয়।

'তা'লে মশাই বুঝুন কি ক'রে আর কারবার চলে।' হাত ঘুরিয়ে রমেশ বলল। 'চাকরি-বাকরি করে, ভদ্রলোকের ছেলে। কাজে যাবার আগে সকালে চা-টা টোস্ট-টা খেয়ে যেত, বলত, মাসের শেষে এক সঙ্গে সব দাম মিটিয়ে দেবে। এখন? বাছাধনের চাকরি নেই শুনলাম।'

শিবনাথ নীরব।

'তোমার চাকরি নেই বুঝলাম উপোসে মরবে; কিন্তু আমার পাওনা মেটায় কে? এখন বলুন মশাই, পারিজাতের বাড়ির আপনিও তো একজন ভাড়াটে। অমল চাকলাদারও ভাড়াটে। এতগুলো টাকা বাকী পড়েছে, আপনারা আমায় বলে দিন, এর কি বিহিত করা যায়।'

শিবনাথ নিরুত্তর।

'আমি আদায় করব। ভদ্রলোক চিনে ফেলেছি। গলায় গামছা দিয়ে ঊনিশ টাকা এগারো আনা আদায় না করছি তো আমার নাম রমেশ রায় নয়।' উত্তেজনায় রমেশের মুখ-চোখ লাল হয়ে গেল। শিবনাথ দেয়ালের দিকে চোখ ফেরায়।

'তা আবার শালার গুমোর কত।' যেন নিজের মনে রমেশ এবার গজ্ গজ্ করে কথা কয়। 'কেন, এ-তল্লাটে একটা না চার ছ'টা গেঞ্জির কারখানা আছে। কত ভাল ভাল ঘরের বৌ-ঝিরা এখন কারখানায় ঢুকে কাজ করছে। দে না বৌকে পাঠিয়ে। কিন্তু একবার সেই প্রস্তাব দিন, দেখবেন চাকলাদার আপনাকে রুখে মারতে আসবে।'

রমেশ চোখ-মুখের এবং হাতের এমন

ভঙ্গি করে কথা বলল যে, শিবনাথ না হেসে পারল না।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক জায়গায় আছেন, দেখবেন। দেখেছেন নিশ্চয়ই ওর বৌকে। অমলের ধারণা কমলার চেয়ে রূপসী মেয়ে এ-দেশে আর একটি নেই। শালা ভাত জোটে না খেতে, বৌয়ের রূপের দেমাকে পট ফাটো-ফাটো। হাসি পায় মশাই, হাসি পায়। আমি জানি,—পারিজাতের সঙ্গে উঠতে বসতে, আমার সঙ্গে তো কথা হয়। দু' মাসের বাড়িভাড়া জমেছে। এ-মাসে ভাড়া ক্লিয়ার করতে না পারলে অমলকে দারোয়ান দিয়ে ঘাড়ে ধরে তুলে দেবে। ভদ্রলোক! কত দেখলাম। ধোপ-দুরস্ত জামাকাপড় পরে পারিজাতের বাড়িতে এসে ঘর ভাড়া করে থাকতে আরম্ভ করে। বাস্, দু' মাস ছ' মাস যেতে না যেতে খোলস খসে গিয়ে আসল রং বেরিয়ে পড়ে। কত দেখছি—হা-হা।' রমেশ এবার বিকট সুরে হেসে উঠল। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে শিবনাথের কানের কাছে মুখ নিয়ে গলা নিচু করে বলল, 'নতুন এসেছেন, আপনাকে আমি হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, পারতপক্ষে কাউকে একটা আধলা ধার দেবেন না, দিয়েছেন কি মারা পড়েছেন। মশাই, বাইরে সাবান বাড়ির বাহার ভিতরে ফুটুস। সাবধানে পা না ফেললে বিপদে পড়বেন।' বলে রমেশ উঠে দাঁড়াল।

'পাঁচুকে আর দোকানে ঢুকতে দিবিনে ঝুলি? হারামজাদার ভেনারেবল্ ডিজিজ।'

ক্ষিতীশ ঘাড় নাড়ল। দাদাকে উঠতে দেখে সে পর্দার এপারে এসে দাঁড়িয়েছে।

'আর, গরম জলটল দিয়ে কাপডিস-গুলো ভাল ক'রে ধুয়ে তবে এ'দের চা দিবি।' শিবনাথকে চোখের ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়ে রমেশ ভাইকে উপদেশ দিলে। ক্ষিতীশ দ্বিতীয়বার ঘাড় নাড়ল। উপদেশ দেওয়া শেষ করে রমেশ আবার ব্যস্ত-সমস্তভাবে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

এক সময় দোকান থেকে বেরিয়ে শিবনাথ ভাবছিল। এখানে এসে যেন এই রকম কেমন একটা অজানা আশঙ্কায় তার বুকের ভিতর ঢিব্ ঢিব্ করছিল। কেন তার কারণ ঠিক অনুমান করতে পারল না যদিও সে। শেখর ডাক্তার শিশিতে জল ভরে ওষুধ বলে চালাচ্ছে। কে গুপ্তর মেয়ে রোজ ধারে চা খায় ও মার জন্য নিয়ে যায় বলে ক্ষিতীশ সময় সময় বাবুদের চা তৈরি করে দিতে বৌদিকে দোকানে রেখে অন্য কাজে বেরুচ্ছে। অমল চাকলাদার বেকার হয়ে রেস্টুরেন্টের বিল শোধ করতে পারছে না, তাই রমেশ ওর গলায় গামছা দিয়ে টাকা আদায় করবার মতলব করেছে। পাঁচু ভাদুড়ির কুৎসিত রোগ আছে বলে তাকে আর রেস্টুরেন্টে ঢুকতে দেওয়া হবে না। এর কোন্‌টার সঙ্গে শিবনাথের মনে হঠাৎ একটা কালো ভয়-সিরসিরে ছায়াপাতের কারণ থাকতে পারে, ভাবতে ভাবতে শিবনাথ একবার থমকে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। স্ত্রী-কন্যা নিয়ে সেও ওই বাড়িতে সারি সারি ঘরের এক-খানা ভাড়া নিয়ে বাস করতে আরম্ভ করেছে বলে কি। কিন্তু সে-সব পরিবারের সঙ্গে শিবনাথের মিল কোথায়, হয়তো কোনো পরিবারের সঙ্গেই কোনটার মিল নেই, একটা বাড়িরই বারোখানা কামরা যদিও, যেমন হারমোনিয়মের বারোটা রীড। কিন্তু এক একটার এক এক রকম সুর। তা হলেও, তা হওয়া সত্ত্বেও বারোটা রীডের সমষ্টিগত সুর মিলিয়েই কি ঐক্যতান সৃষ্টি হয় না। এক উঠোন, একটা কুয়ো, এর উনুনের ধোঁয়া ওর ঘরে যাচ্ছে, ওর রান্নার গন্ধ এর নাকে আসছে, এই শিশুর কান্না ওই শিশু শুনছে, এক সংসারের অভাবের দীর্ঘশ্বাস আর এক সংসারকে ভাবিয়ে তুলছে বলে কি? কুয়াশা-কুণ্ঠিত শীত-শীত সন্ধ্যায়ও শিবনাথের কপাল ঘামে। পকেট থেকে রুমাল বার করে সে ঘাম মুছল। সাংঘাতিক রকমের একটা ক্যাঁচর ক্যাঁচর আওয়াজ তুলে মোষের গাড়িটা শিবনাথের গা ঘেঁষে চলছিল। হঠাৎ গাড়োয়ানের হৈ-রৈ শব্দে শিবনাথ রাস্তার এক-পাশে সরে গিয়ে আবার আস্তে আস্তে হাঁটতে আরম্ভ করল। তা হলেও, তা হওয়া সত্ত্বেও রুচি আর মঞ্জুকে নিয়ে শিব-নাথের সংসারের চেহারাটাই অন্য সব-গুলো থেকে স্বতন্ত্র। নিশ্চয়ই শিবনাথের এখানেই জোর। রমেশ রায়ের মত সে চায়ের দোকান খুলে বসেনি। শেখর ডাক্তারের মত হাড়কিপ্‌টে চশম-খোর বলে তার বদনাম নেই। বিধু মাস্টারের সংসার যেমন বাচ্চা-কাচ্চায় পিল্‌পিল্ করছে শিবনাথের অবস্থা হয়নি। তা ছাড়া, এসব ছেড়ে দিয়েও সবচেয়ে যেটি বড় কথা, রুচি উচ্চ-শিক্ষিতা। এ-বাড়িতে আর পাঁচটি মেয়ে কেন, কোনো পুরুষই রুচির চেয়ে বেশি লেখাপড়া করেনি। তা ছাড়া কমলা গার্লস স্কুলে রুচির পার্মানেন্ট চাকরি, ফ্যাক্টরী না। ধর্মঘট এবং ছাঁটাইয়ের প্রশ্ন সেখানে অনুপস্থিত। তা ছাড়া শিবনাথেরও ডিগ্রী আছে। আজ সে বেকার চাকরি নেই। কিন্তু একটু চেষ্টা করলে দু' তিনটা টুইশানি সে সহজেই পেতে পারবে। এবং তার টুইশানি বিধু মাস্টারের টুইশানি হবে না। ছাত্রী বিধু দত্তর সখী চামেলীকে ভবিষ্যতের চিঠি টিমে আশা দেবে জেনেও বিধু পড়ে ইংরেজী প্যাসেজের মানে বলে দিতে পাগলের মত ছুটবে না। কেননা বিধু মাস্টারের মত শিবনাথের রোজগার যে এতগুলো মুখ হাঁ করে বসে নেই। ভাবতে ভাবতে সকালবেলা দেখেছে সাহায্যনিরতা বালতি-হাতে লক্ষ্মীর চেহারাটা হঠাৎ শিবনাথের মনে পড়ে গেল। ফলু—বিধু মাস্টারদের মত লোকদের এ দিনে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না, নিজের মনে বিড়বিড় করে উঠল শিবনাথ। যেন তার শিস দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল এমন হাল্কা হয়ে গেল মন। একটা সিগারেট ধরালে সে। ছিমছাম মাজাঘষা নির্মল এবং অত্যন্ত সুরক্ষিত তার সংসার। এর মূলে চৌদ্দ আনা রয়েছে রুচির বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব। তার উগ্র আধুনিক মনের স্বচ্ছ বিভায় ছোট সংসারটি ঝলমল করছে। ভেবে শিবনাথের বড় ভাল লাগল। রুচিকে বোধ হয় আর কোনোদিন এত ভাল লাগেনি তার, এমন ভাল করে আর দশটি মেয়ের সঙ্গে যাচাই করে দেখেনি, আজ, এখন ক্ষিতীশের দোকান থেকে হঠাৎ মন খারাপ করে বেরিয়ে এসে খালের ধারের রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ হাঁটবার পর যেমন দেখছিল।

একটি কিশোর এবং একটি কিশোরী শিবনাথ ঠিক ধরতে না পারলে

জনের কথাবার্তা শ্বনে কিছ্বটা আঁচ রতে পারল এরা কারা।

জায়গাটা বেশ ফাঁকা এবং নির্জন। দিকে কপির ক্ষেত। সন্ধ্যার পর সির্-রে মেঠো হাওয়া বইছিল। কিন্তু ধোঁয়া বং ধ্বলো একেবারে ছিল না বলে হাঁটতে বনাথের ভাল লাগছিল। ময়লার খাল বং রেল-লাইন পিছনে ফেলে সে নেকদ্বর এসে পড়েছে। ছোট্ট একটা পের কাছাকাছি এসে ঠান্ডা অন্বচ্চ টি কিশোরকণ্ঠ শ্বনে শিবনাথ চমকে ড়াল। মাথার ওপর তারার ঝিকিমিকি। তগ্বলো থেকে ওলকপির কেমন একটা টি গন্ধ ভেসে আসছিল। ঝোপের ধর থেকে পাথরের সিঁড়ি ডিঙিয়ে ফিয়ে চলা ঝর্ণাধারার মত একটি ঠের কলহাস্য শিবনাথের কানে এসে গল। মেয়েটি হাসছে।

'আজ আমাদের ভাত রান্না হয়নি। বেলা ও বেলা উনানে আগ্বন দিতে র না।'

'ভালই তো, বেঁচে গেলি, কাজকর্ম রতে হল না তোর। কি খেলি?'

'ধাপার মাঠ থেকে বাবা কাল এক টি ম্বলো চুরি করে এনেছিল।'

'সারাদিন ব্বঝি ম্বলো খেয়ে আছিস।'

'তুই, তোরা?'

'ও-বেলা ম্বলো সেন্দ আর ভাত য়েছিল। এ-বেলা একটা বিস্কুট আর ক মগ্ জল।'

'বিস্কুটের পয়সা কে দিলে? তোর বা, মা?'

'বেবি। ফ্রকের তলায় দ্বটো গ্বঁজে নেছিল। একটা মা খেল, একটা আমি লাম।'

'তোর বাবা আজ মদ খেয়েছে?'

'জানি না। হয়তো খায়নি। রোজ র কে এত মাগ্না বোতল খাওয়াবে। র বাবা মদ খায় না?'

'নাঃ, যখন বড়বাজারে বাবার ফলের রবার ছিল, দ্বধ মিশিয়ে মাঝে মাঝে ন্ধি খেত। সিন্ধি চিনিস কাকে বলে?'

'তুই আমায় সিন্ধি চেনাস, খ্বব লাক হয়ে গেছিস মাইরি। তোরা যেমন লকাতায় ছিলি আমরাও ছিলাম মনে খিস। পার্ক স্ট্রীটে কত বড় বাড়ি ছিল মাদের।'

'তোর বাবা ভয়ানক অসভ্য।'

'কেন? তোকে কিছ্ব বলেছে ন্যাকি?'

'আমাকে? তোর বাবা? এ-বাড়ির একটাও ব্যাটাছেলে আমার সঙ্গে কথা বলতে সাহস পায় না জানিস্?'

'সত্যি সারাক্ষণ তুই এমন কট্মটে চেহারা করে রাখিস। যেন কত বড় মেয়েটি হয়ে গেছিস।'

'তোর চেয়ে আমি বড় মনে রাখিস।'

'কক্ষণো না। তোর কত বয়েস এখন শ্বনি?'

'চৌদ্দ।'

খিল্খিল্ মিঠা হাসিতে জায়গাটা ভরে গেল।

শিবনাথও মনে মনে হাসল। পারিজাতের বস্তির বাসিন্দা এরাও। কে গ্বপ্তর ছেলে আর সাবানের ফেরিওলা বলাইর মেয়ে।

'আমার পোনেরো পার হয়ে গেছে।'

'তবে আর কি, এখন বিয়েটিয়ে করে সংসারী হয়ে যা।' কিশোরীও এক ঝলক হাসল।

'না রে, মন ভাল না।' কিশোরের দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। বাবার র্বজি-রোজগার নেই, আড্ডা মেরে আর মদ খেয়ে দিন কাটাচ্ছে, বেবি বড় হচ্ছে, আমার লেখাপড়া বন্ধ, মা সারাদিন শ্বয়ে থেকে বড় বড় নিশ্বাস ফেলছে, এসব দেখে কিছ্ব ভাল লাগে না। এক এক সময় ইচ্ছা করে——'

'তুই এক কাজ কর্ না।' ছেলেটির কথা থামিয়ে দিয়ে মেয়েটি প্রশ্ন করল, 'সাইক্ল জানিস?'

'কেন?'

'খবরকাগজ ফেরি করলে ভাল রোজগার হয়। বাবা বলছিল। বাবা সাইক্ল জানে না বলে ম্বশকিলে পড়েছে। কাপড়-কাচা সাবানের এখন একদম বিক্রী নেই। সাইক্ল চালাতে জানলে খবরকাগজ ধরত।'

'ও-সব আমি পারব না। লোকের বাড়ি ঘ্বরে ঘ্বরে কাগজ বিলানো, ধোৎ লজ্জা করবে।'

একট্ব সময় মেয়েটি চুপ করে রইল।

'আজ চুল বাঁধলি না?'

'বেঁধেছিলুম ও-বেলা। এক ফোঁটা তেল নেই ঘরে তো আর চুল-টুল বাঁধব কি, ইচ্ছে করে না। আঃ, করছিস কি, ছেড়ে দে, ভীষণ লাগে।'

'না দেখছিলাম, তোর চুল তেল না দিয়েও ভারি নরম।'

'মেয়েমানুষের চুল নরম থাকবে না তো কি শক্ত থাকবে।'

কতক্ষণ দুজনের কোনো কথা শোনা গেল না। বেশ অস্বস্তিবোধ করছিল শিবনাথ, কেমন যেন অপরাধী বোধ করছিল নিজেকে অজানিতভাবে হঠাৎ এখানে ঝোপের পাশে এসে পড়ে চুপি-চুপি এদের কথা শুনছিল বলে। কিন্তু শিবনাথ তখনি জায়গাটা ছেড়ে উঠে আসতে পারল না। সির্‌সিরে বাতাস, ফিকে অন্ধকার, তারার ঝিকিমিকি ও পাশের ক্ষেত থেকে উঠে আসা কপির সুন্দর মিষ্টি গন্ধের আমেজ তাকে সেখানে আরো কিছুক্ষণ ধরে রাখল। সিগারেট খাবার ইচ্ছা থাকলেও সে সিগারেট ধরালে না।

'তুই একটা কাজে-টাজে ঢুকে পড় না, সাবান ফিরি করে যখন তোর বাবা সংসার চালাতে পারছে না।'

'লেখাপড়া জানি না, আমায় চাকরি দেবে কে?'

'আজকাল মেয়েদের আবার চাকরির অভাব, কাজের অভাব। কত মেয়ে কাজে ঢুকছে দেখিস না? পারিজাতের গেঞ্জির কারখানায় অনেক মেয়ে নিচ্ছে। ও-পাড়ার বেলা টগর চাঁপা কুন্দ সব ঢুকেছে। শুনছি তো এবার পরীক্ষায় পাশ দিতে না পারলে আমাদের বাড়ির বিধুমাস্টারের দুই মেয়েকেও ঢুকিয়ে দেবে। তুই তো পারিজাতের বৌয়ের সমিতিতে নাম লিখিয়েছিস। একটু বললেই তো ফ্যাক্টরীতে কাজ পাস।'

'লিখিয়েছিলুম সমিতিতে নাম। আর যাই না। পারিজাত আমার বাবাকে কুত্তা বলেছে।'

'কবে কোথায় কখন? তুই শুনলি কি ক'রে?' কিশোরকণ্ঠ গর্জন করে উঠল।

নিভন্ত স্তিমিত গলায় কিশোরী বলল, 'পারিজাতের উঠানে পেয়ারাতলায় আমরা সমিতির মেয়েরা ক্যারম খেলছি সেদিন। বৌয়ের পাশে দাঁড়িয়ে পারিজাত খেলা দেখছিল। এমন সময় সেখানে সরকার গিয়ে বলল, অমল চাকলাদার, বলাই নন্দী আর কে গুপ্তের ঘরভাড়া বাকি পড়েছে।'

'তারপর?'

'শুনে পারিজাত গরম হয়ে বলল, কুত্তা দুটোকে তাড়াতে না পারলে মন ঠাণ্ডা হচ্ছে না। কাহাতক মাসের পর মাস ভাড়া নিয়ে ঝামেলা পোহাবে সরকার। কুকুর দুটোকে কালই নোটিশ দিয়ে দিন।'

'শুনে সরকার কিছু বলল না?'

'দাঁত বার করে হাসছিল।'

একটু পর কিশোরের প্রশ্ন শোনা গেল, 'তারপর থেকে বুঝি তুই সমিতিতে যাওয়া বন্ধ করেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ করেছিস, আর যাসনি ও-বাড়ি।'

একটু থেমে থেকে পরে কিশোর বলল, 'আমাদের বারো ঘরের সব ভাড়াটে মিলে যদি ভাড়া বন্ধ করে দিই ত আক্কেল হয়।'

কিশোর তৎক্ষণাৎ কোনো কথা বলল না। যেন একটু সময় কি ভেবে পরে আস্তে আস্তে বলল, 'আমি একদিন পারিজাত শালার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। টাকার গরমে শালা সব মানুষকে কুকুর বেড়ালের মত দেখছে।'

'খুলি উড়িয়ে দিলে তোকে পুলিশ ধরে নিয়ে যেয়ে ফাঁসি দেবে।'

'আগে তো শালা মরবে।'

—কিশোরী কিছু বলল না।

—কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর কিশোর একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল। 'উঃ কতকাল সিনেমা দেখি না।'

'আমি সেদিন ফাঁকতালে একটা দেখে নিলাম।'

'কবে, কার সঙ্গে গেছলি, কি দেখলি?'

'এটম বম্, কমলাদি দেখাল আমাকে আর বীথিকে। নন্দনকানন হাউসে।'

'ওটার সঙ্গে মিশবি না। আমি কতদিন বলেছি তোকে, কমলাটা একেবারে বাজে মেয়ে। ঠোঁটে রং মাখে আর টেনে টেনে নাকি সুরে কথা কয় ও কক্ষনো ভাল হতে পারে না।'

'আহারে, যেন এ-বয়সেই কত মেয়ে চিনিস তুই!'

'তবে কি, আমাদের পার্ক স্ট্রীটে বনানী চ্যাটার্জিকে দেখেছি। ডোভার লেনে মামার বাসা। সেপাড়ায় নলিনী রায়কে দেখতাম। আর টালিগঞ্জে ছে

অসীমের সীমা রচনা রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম। কথাটি গভীর কেননা, কবির জীবনতত্ত্বের সহিত জড়িত। কিন্তু কত অনায়াসে, কত অবলীলাক্রমেই না তিনি কথাটি বলিয়াছেন। কলাকৌশল আপনাকে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন করিয়া 'সত্যেরে লও সহজে' নীতি অবলম্বন করিয়াছে। কড়ি ও কোমলের 'প্রাণ' কবিতাটিতে কবির জীবনতত্ত্বের একদিক যেমন প্রকাশ পাইয়াছে—ইহাতে তেমনি আর একদিক। আবার চয়নিকার কোন কোন সংস্করণে "ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে" কবিতাটি কবির সমগ্র কাব্যসাধনার সূত্ররূপে মুখ্য কবিতা হিসাবে ব্যবহৃত হইত। উপহার কবিতাটির উদ্ধৃত ছত্র কয়টিও অনুরূপ প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাইতে পারে। 'রচি শুধু অসীমের সীমা'—কবি সারা জীবন তো এই কাজই করিয়া গিয়াছেন।

মানসী কাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, মানসী মানসেই আছে। কথাটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হইবে। কোন কোন কবি মানব প্রেমপাত্রীকে সাধনার দ্বারা আরাধনার দ্বারা, বিশেষ প্রতিভার দ্বারা মানসীতে পরিণত করেন, উদাহরণ রবার্ট ব্রাউনিং ও তাঁহার পত্নী, চণ্ডীদাস ও রামী। ইঁহারা স্বভাবত সসীমকে অসীমের ব্যঞ্জনা দানের কঠিন চেষ্টা করিয়াছেন। আবার কোন কোন কবি আছেন, যাঁহারা মানসীকে মানব-প্রেমপাত্রীর মধ্যে আভাসিত করিয়া দেখেন, উদাহরণ শেলি ও রবীন্দ্রনাথ। স্বভাবতই যাহা অসীম, তাহাকে মানবিত করিয়া তুলিবার কঠিনতর চেষ্টা তাঁহারা করিয়াছেন, 'রচি শুধু অসীমের সীমা।' সেই জন্যই শেলি ও রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় কেমন যেন ঘনিষ্ঠ মানব সংস্পর্শের অভাব; আসক্তির তীব্রতার বদলে উদাসতা, প্রেমের চরিতার্থতার উল্লাসের বদলে নৈরাশ্য, হৃদয়স্পন্দন অনুভূতির বদলে বিষাদ ও করুণা—ইঁহাদের প্রেমের কবিতার বিশেষ ধর্ম। এ সমস্তই তত্ত্বরূপে ঐ কয়টি ছত্রে ধরা পড়িয়াছে। তবে প্রভেদ এই যে, শুধু মানসী কাব্য নয়, সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধেই ছত্র কয়টি প্রযোজ্য।

ব্যাখ্যা করিয়া কবিতার তত্ত্ব বোঝানো যায়, কিন্তু রসের তো ব্যাখ্যা চলে না। সূর্যাস্তের মেঘে যে আকাশকুসুম ফোটে বৈজ্ঞানিকের সাধ্য কি তাহার 'পরিচয় দেয়। আলোচ্য কবিতাগুলির তত্ত্বাংশ আলোচনা করিব, তাহাতে তাহাদের গুরুত্ব হয়তো বোঝা যাইবে, কিন্তু ইহাদের রসরহস্য বুঝিবার জন্য পাঠককে কষ্ট স্বীকার করিয়া কবিতাগুলি পড়িয়া লইতে হইবে।

মানসীর আর কয়েকটি উপেক্ষিত কবিতা একাল ও সেকাল, আকাঙ্ক্ষা, মরণ-স্বপন, কুহুধ্বনি ও সন্ধ্যায়।

তন্মধ্যে একাল ও সেকাল অপেক্ষাকৃত অধিক পরিচিত এবং চয়নিকায় সন্নিবিষ্ট। কবিতাটি অধিকতর পরিচিত হওয়া আবশ্যক।

> বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী।
> গাঢ় ছায়া সারাদিন,
> মধ্যাহ্ন তপনহীন,
> দেখায় শ্যামলতর শ্যাম বনশ্রেণী।

হইতে

> এখনো সে বাঁশী বাজে যমুনার তীরে।
> এখনো প্রেমের খেলা,
> সারাদিন, সারাবেলা
> এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয় কুটীরে।

পর্যন্ত একটি আদর্শ বর্ষাকে একটি আদর্শ বিরহিনী চিত্ত বৃন্দাবনে স্থাপন করিয়া ন্যূনতম অথচ নিশ্চিততম রেখায় অঙ্কনের সার্থক প্রয়াস। কিন্তু কবিতাটি দোষশূন্য নয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে রসাভাস ঘটিয়াছে। বৃন্দাবনের বর্ষা ও রাধিকার চিত্র মধ্যে প্রক্ষিপ্তরূপে অলকা ও যক্ষবধূ আসিয়া পড়িয়াছে—ক্ষুদ্রকায় কবিতাটিতে বৈষ্ণব কবির রাধিকা ও কালিদাসের যক্ষিণীর স্থানাভাব। ঐ দুটি শ্লোক বাদ দিলে আপনক্ষেত্রে ত্রুটিশূন্য হইয়া দাঁড়াইবে।*

মানসী কাব্যে যে কয়েকটি কবিতায় লিরিকবেদনা অত্যন্ত সংহত ঘনীভূতরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, সেগুলি কাব্যাংশে রসোত্তীর্ণ ও শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে আকাঙ্ক্ষা, মরণস্বপন ও কুহুধ্বনি অন্যতম। এগুলি কবির গাজিপুরে বাসকালে, কয়েকদিনের মধ্যে বৈশাখ মাসে রচিত। প্রবাসবাসের স্মৃতি ও প্রবাসের বেদনা কবিতাগুলির রসরহস্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

> আর্দ্র তীব্র পূর্ব বায়ু বহিতেছে বেগে,
> ঢেকেছে উদয়পথ ঘন নীল মেঘে।
> দূরে গঙ্গা, নৌকা নাই, বালু উড়ে যায়।
> ব'সে ব'সে ভাবিতেছি আজিকে কোথায়।

রবীন্দ্র-কাব্যে যে নিসর্গচিত্র পাওয়া যায়, সাধারণত তাহা হয় মধ্যবঙ্গীয়, নয় রাঢ়-বঙ্গীয়। এ কবিতাগুলির নিসর্গচিত্র গাজিপুর অঞ্চলের সেইজন্যই এগুলিতে রসের অভিনবত্ব আছে।

> মনে হয় আজ যদি পাইতাম কাছে,
> বলিতাম হৃদয়ের যত কথা আছে।
> বচনে পড়িত নীল জলদের ছায়,
> ধ্বনিতে ধ্বনিত আর্দ্র উতরোল বায়।

কবি তাহাকে কাছে পাইলে জীবন-মরণময় সুগভীর কথা বলিতেন, তাঁহার প্রাণের অসীমে আত্মার যে মহারাজ্য বিরাজমান, তাহাই দেখাইতেন।

> কতটুকু ক্ষুদ্র মোরে দেখে গেছ চ'লে,
> কত ক্ষুদ্র সে বিদায় তুচ্ছ কথা ব'লে!
> কল্পনার সত্য রাজ্য দেখাইনি তারে,
> বসাইনি এ নির্জন আত্মার আঁধারে।

ইহাই তাঁহার আক্ষেপ—আর, পুনরায় সুযোগ পাইলে কল্পনার সত্যরাজ্য ও আত্মার বিস্তার দেখাইবেন ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা।

মরণস্বপ্নে অঙ্কিত প্রবাসচিত্র আরও বিশদ—

> কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ। প্রথম সন্ধ্যায়
> ম্লান চাঁদ দেখা দিল গগনের কোণে।
> ক্ষুদ্র নৌকা থর থরে চলিয়াছে পাল ভরে
> কাল স্রোতে যথা ভেসে যায়
> অলস ভাবনাখানি আধ-জাগা মনে।
> একপারে ভাঙা তীর ফেলিয়াছে ছায়া;
> অন্যপারে ঢালুতট শুভ্র বালুকায়
> মিশে যায় চন্দ্রালোকে, ভেদ নাহি পড়ে চোখে,
> বৈশাখের গঙ্গা কৃশ কায়া
> তীরতলে ধীর গতি অলস-লীলায়।

এমন সময়

> স্বদেশ পূরব হ'তে বায়ু ব'হে আসে
> দূর স্বজনের যেন বিরহের শ্বাস।
> জাগ্রত আঁখির আগে কখনো বা চাঁদ জাগে
> কখনো বা প্রিয় মুখ ভাসে:
> আধেক উলস প্রাণে আধেক উদাস।

এ হেন নিসর্গদৃশ্যে বসিয়া কবি মরণ-স্বপন দেখিয়াছেন, জীবনে যাহা অলব্ধ রহিয়া গেল, মৃত্যুস্বপ্নে তাহাই উপলব্ধ সত্য হইল।

---

* রবীন্দ্র সাহিত্যের কপিরাইট পর্ব অতিক্রান্ত হইলে এরূপ বাদসাধ দেওয়া সঙ্কলন গ্রন্থ নিশ্চয় বাহির হইবে।

অন্ধকারহীন হ'য়ে গেল অন্ধকার।
'আমি' বলে কেহ নাই, তবু যেন আছে
অচৈতন্য তলে অন্ধ চৈতন্য হইল বন্ধ,
রহিল প্রতীক্ষা করি' কার।
মৃত হ'য়ে প্রাণ যেন চিরকাল বাঁচে।

'কুহুধ্বনি' কবিতার নিসর্গচিত্র অধিকতর তথ্যপুঞ্জযোগে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—

ছায়া মেলি সারি সারি
স্তব্ধ আছে তিন চারি
সিসু গাছ পাণ্ডু কিশলয়,
নিম্ব বৃক্ষ ঘন শাখা
গুচ্ছে গুচ্ছে পুষ্পে ঢাকা,
আম্রবন তাম্র ফলময়।
* * *
বসি আঙিনার কোণে
গম ভাঙে দুই বোনে
গান গাহে শ্রান্তি নাহি মানি,
বাঁধা কূপ, তরুতল,
বালিকা তুলিছে জল,
খর তাপে ম্লান মুখখানি।
দূরে নদী, মাঝে চর,
বসিয়া মাচার' পর
শস্যক্ষেত আগুলিছে চাষী,
রাখাল শিশুরা জুটে
নাচে গায় খেলে ছুটে;
দূরে তরী চলিয়াছে ভাসি।
কত কাজ কত খেলা,
কত মানবের মেলা
সুখ দুঃখ ভাবনা অশেষ,
তারি মাঝে কুহু স্বর
একতান সকাতর
কোথা হতে লভিছে প্রবেশ।

কবি বলিতে চান যে, চলমান, নিত্য অপসৃয়মান নশ্বর জগতে একমাত্র সত্য "সঙ্গীতের সরস্বতীর" এই সম্মোহন বীণাধ্বনি।

কেহ ব'সে গৃহ মাঝে,
কেহবা চলেছে কাজে,
কেহ শোনে কেহ নাহি শোনে,
তবুও সে কী মায়ায়
ওই ধ্বনি থেকে যায়
বিশ্বব্যাপী মানবের মনে।

সংসার অনিত্য, ঐ কুহুধ্বনি নিত্য; সংসার খণ্ড সৌন্দর্যে পূর্ণ, ঐ কুহুধ্বনি অখণ্ড সুন্দর; মানব জীবনের অতীত ও বর্তমান কুহুধ্বনির ঐ সূক্ষ্ম স্বর্ণময় সূত্রে গাঁথা পড়িয়া সুদূর ভবিষ্যতের দিকে চলিয়াছে—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের উহাই একমাত্র অবলম্বন, কবি ইহাই যেন বলিতে চান। কীটসের নাইটিঙ্গেল কবিতার মতোই ইহার মর্ম-বস্তু যদিচ কাব্যাংশে এ দুয়ে তুলনা চলে না।

আর একটি রসোত্তীর্ণ উপেক্ষিত কবিতা 'সন্ধ্যায়'।

ওগো তুমি, অমনি সন্ধ্যার মতো হও
সুদূর পশ্চিমাচলে
কনক আকাশ তলে
অমনি নিস্তেজ চেয়ে রও।
অমনি সুন্দর শান্ত
অমনি করুণ কান্ত
অমনি নীরব উদাসিনী,
ওই মতো ধীরে ধীরে
আমার জীবন তীরে
বারেক দাঁড়াও একাকিনী।

সন্ধ্যার করুণ সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রেম-পাত্রীর সত্তা মিশিয়া গিয়া এক অপূর্ব স্মৃতিমধুর বেদনার সৃষ্টি করিয়াছে। এটিকে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা পর্যায়ভুক্ত মনে না করিতে পারিলেও আগের কয়েকটি কবিতাকে নিঃসন্দেহে সেই শ্রেণীভুক্ত বলিয়া মনে হয়।

৩

খেয়া কাব্যের কোকিল কবিতাটির অনাদৃত এই সরল, সুন্দর কবিতাটি কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই, ইহার অতীতমধুর সৌন্দর্য সম্বন্ধে বোধ করি অল্প পাঠকেই সন্ধান রাখেন।

আজ বিকালে কোকিল ডাকে
শুনে মনে লাগে
বাংলাদেশে ছিলেম যেন
তিনশো বছর আগে।
সেদিনের সে স্নিগ্ধ গভীর
গ্রাম পথের মায়া
আমার চোখে ফেলেছে আজ
অশ্রু জলের ছায়া।

অতঃপর সেদিনকার পল্লীবঙ্গের মুগ্ধ সৌন্দর্যের মনোরম চিত্র অঙ্কন করিয়া কবি বলিতেছেন—

তিনশো বছর কোথায় গেল
তবু বুঝি নাকো
আজো কেন ওরে কোকিল
তেমনি সুরেই ডাকো।
ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে গেছে
ফেটেছে সেই ছাদ,
রূপকথা আজ কাহার মুখে
শুনবে সাঁঝের চাঁদ?

এমন সময় শহরের ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া কবি বুঝিতে পারিলেন—

সময় নাইরে হায়
মর্মরিয়া চলেছি আজ
কিসের ব্যর্থতায়।

চমকিত কবি তিনশো বছর আগেকার স্মৃতির সোনায় বাঁধানো চিত্রপটের ধ্যান হইতে সহসা বর্তমান যুগে ফিরিয়া আসিলেন, যেমন চমকিয়া উঠিয়া কবি কীটস নাইটিঙ্গেলের অমর সঙ্গীতের আসর হইতে ক্ষুধাতৃষ্ণা আধিব্যাধিপীড়িত মানব-সংসারে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন—

"The very word is like a bell to toll me back from thee to my sole self."

কবিতাটির সরল সহজ শিল্প দেখিয়া মনে হয় এটি স্থানভ্রষ্ট কবিতা, ইহার স্বাভাবিক স্থান ক্ষণিকা কাব্যে। কিন্তু যে কাব্যেই ইহা সন্নিবিষ্ট হোক না কেন, রবীন্দ্র-কাব্যের পুরোভাগে ইহার যথার্থ স্থান।

৪

উৎসর্গ কাব্যের শুক্ল-সন্ধ্যা (২৩ সংখ্যক) ও 'ওরে আমার কর্মহারা' (৩৮ সংখ্যক) কবিতা দুটি রসিকের কাছে যথোচিত সমাদর পায় নাই অথচ শিল্প-মহিমায় কবিতা দুটি তুলনাহীন।

শুক্ল-সন্ধ্যা কবিতার প্রথম দুটি শ্লোক কিঞ্চিৎ দ্বিধাজড়িত, যদিচ দ্বিতীয় শ্লোকে দ্বিধার জড়তা অনেকটা অপসারিত। কিন্তু তৃতীয় শ্লোক হইতে শেষ পর্যন্ত কবিতাটি কবির কল্পনাস্রোতে অকুণ্ঠিত বেগে ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছে দময়ন্তীর যে রাজহংসের উল্লেখ কবিতাটিতে আছে, তাহারই লীলা-মাধুর্য ছন্দে।

হেনকালে আকাশের বিস্ময়ের মতো
কোন্ স্বর্গ হ'তে
চাঁদখানি লয়ে হেসে
শুক্লা সন্ধ্যা এলো ভেসে
আঁধারের স্রোতে।

সেই শুক্ল-সন্ধ্যাই দময়ন্তীর নিকটে নল কর্তৃক প্রেরিত রাজহংস।

রাজহংস এসেছিল কোন্ যুগান্তরে
শুনেছি পুরাণে।
দময়ন্তী আলবালে
স্বর্ণ ঘটে জল ঢালে
নিকুঞ্জ বিতানে

কবিই যে দময়ন্তী, দয়িতের প্রেমের ঋণ স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই রাজ-হংসের মতো শুক্লসন্ধ্যাটি কবির কাছে আসিয়াছে—

জ্যোৎস্না তারি মতো আকাশ বাহিয়া
এলো মোর বুকে।
কোন্ দূর প্রবাসের
লিপিখানি আছে এর
ভাষাহীন মুখে।
সে যে কোন্ উৎসুকের
মিলন কৌতুকে
এলো মোর বুকে।

গুরু-সন্ধ্যা সম্পর্কিত এরূপ বর্ণনায়, ব্যঞ্জনায় সার্থক কবিতা রবীন্দ্র-সাহিত্যেও বিরল।

আটত্রিশ সংখ্যক কবিতায় সহসা যুগান্তরের সেতু খুলিয়া যাওয়ায় এমন সমস্ত আভাস ও স্মৃতির ইশারা পাওয়া যাইতেছে "এই জীবনে নাইকো তাহার হেতু।"

সেথায় মায়া দ্বীপের মাঝে
নিমন্ত্রণের বীণা বাজে
ফেনিয়ে উঠে নীল সাগরের ঢেউ,
মর্মরিত তমাল ছায়ে
ভিজে চিকুর শুকায় বায়ে
তাদের চেনে চেনে নাই বা কেউ।

ছবিগুলি এমন সূক্ষ্মরেখায় অঙ্কিত, যেন কোন বাস্তব তুলিতে আঁকা হয় নাই, যেন কোন্ অনাদিকাল হইতে ঐ পটে অঙ্কিত হইয়াই ছিল, আজ দক্ষিণ বাতাসে বিস্মৃতির কুয়াশা একটু সরিয়া যাইতেই 'জন্মান্তর সৌহৃদানির' মতো উপলব্ধি হইতেছে। সেই চিরপুরাতনকে নূতন পরিবেশে পাইবার ইচ্ছা জাগিতেছে—

ধারাযন্ত্রে সিনান করি
যত্নে তুমি এসো পরি'
চাঁপাবরণ লঘুবসনখানি।
ভালে আঁকো ফুলের রেখা
চন্দনেরি পত্রলেখা,
কোলের পরে সেতার লহ টানি।

সুন্দরী কবিতা সুন্দরী নারীর মতো, তাহার পিছু ছুটিলে সব সময়ে তাহার মন পাওয়া যায় না, বিশেষ হাতে ব্যাখ্যার কলম থাকিলে তো কোন আশাই থাকে না। ব্যাখ্যা করিয়া যাহার সৌন্দর্য বোঝানো সম্ভব নয়, উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতি রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম।

৫

গীতিমাল্য কাব্যের অন্তর্গত ছয়টি কবিতা (৪, ৫, ৯, ১০, ১১, ১২ সংখ্যক) কাব্যাংশে রসোত্তম হওয়া সত্ত্বেও কেন যে কাহারো দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় নাই, তাহা ভাবিয়া পাই না। এগুলির অস্তিত্ব অপরের চোখে না পড়িতে পারে, কিন্তু স্বয়ং কবিও যেন ইহাদের অস্তিত্ব ও সার্থকতা সম্বন্ধে সচেতন নন, স্বনির্বাচিত সঞ্চয়িতাতে একটিকেও স্থান দেন নাই। তাঁহার মনের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু সাধারণ পাঠকের অনবধানের হেতু কি? আমার মনে হয়, গীতিমাল্যকে সকলে গানের বই বলিয়া মনে করে, আর গানের বইয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা সঞ্চিত হইবে, তাহা কেহ খেয়াল করে নাই বা সন্দেহ করে নাই। ফলে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা সমাজভ্রষ্ট হওয়াতে অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

গীতিমাল্যের প্রথম দুটি গান গীতাঞ্জলিপর্বের রচনা তার পরের পঁচিশটি গান ও কবিতা ১৩১৮ সালের চৈত্র ও ১৩১৯ সালের বৈশাখ মাস মধ্যে রচিত। তারপরে ২৮ সংখ্যক হইতে ৪১ সংখ্যক পর্যন্ত বিলাতযাত্রার পথে, বিলাতে এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে রচিত। অবশিষ্টগুলির রচনা দেশে প্রত্যাবর্তনের পরে। আমাদের আলোচ্য কবিতাগুলি ১৩১৮ সালের চৈত্র ও ১৩১৯ সালের বৈশাখ মাসে রচিত।

১৩১৮ সালের চৈত্র মাসে কবির বিলাতযাত্রার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহাকে বিশ্রাম লাভার্থে শিলাইদহে চলিয়া আসিতে হয়। সেখানে রোগমোক্ষের কালে কবিতাগুলি রচিত। এই বিবরণটুকু স্মরণ না রাখিলে কবিতাগুলির মাধুর্য ও তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারা যাইবে না। কবির ভাষাতেই সে বিবরণ শোনা যাক।

"গেলবারে যখন জাহাজে চড়বার দিনে মাথাঘুরে পড়লুম, বিদায় নেবার বিষম তাড়ায় যাত্রা বন্ধ হয়ে গেল, তখন শিলাইদহে বিশ্রাম করতে গেলুম। কিন্তু মস্তিষ্ক ষোল আনা সবল না থাকলে একেবারে বিশ্রাম করবার মতো জোর পাওয়া যায় না, তাই অগত্যা মনটাকে শান্ত রাখবার জন্যে একটা অনাবশ্যক কাজ হাতে নেওয়া গেল। তখন চৈত্র মাসে আমের বোলের গন্ধে আকাশে আর কোথাও ফাঁক ছিল না এবং পাখীর ডাকাডাকিতে দিনেরবেলাকার সকল ক'টা প্রহর একেবারে মাতিয়ে রেখেছিল। ছোট ছেলে যখন তাজা থাকে, তখন মার কথা ভুলেই থাকে, যখন কাহিল হয়ে পড়ে তখনি মায়ের কোলটি জুড়ে বসতে চায়, আমার সেই দশা হল। আমি আমার সমস্ত মন দিয়ে আমার সমস্ত ছুটি দিয়ে চৈত্র মাসটিকে যেন জুড়ে বসলুম, তার আলো, তার হাওয়া, তার গন্ধ, তার গান একটুও আমার কাছে বাদ পড়ল না।" *

এদিকে কবির অসুস্থ শরীর, অপর দিকে কবির পুরাতন ও প্রিয় পরিবেশে প্রকৃতির পূর্ণ শুশ্রূষা, এই দুয়ে মিলিয়া কবিতাগুলির সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে। শরীর সুস্থ ও ইন্দ্রিয়গ্রাম সবল থাকিলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎটাই মানুষের মন অধিকার করিয়া থাকে। কিন্তু অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়সমূহ যখন দুর্বল অথচ মনটি সক্রিয়, তখন ইন্দ্রিয়াতীত সত্যোপলব্ধি সহজ হইয়া পড়ে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। কবিতা কয়টি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ও ইন্দ্রিয়াতীত জগতের সীমান্তবর্তী সত্য ও সৌন্দর্যকে সার্থকভাবে প্রকাশ করিয়াছে। এইশ্রেণীর কবিতা রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিরল।* সাধারণত রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্যকে অবলম্বন করিয়াই ইন্দ্রিয়াতীত সত্যকে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সরাসরি ইন্দ্রিয়াতীত সত্যের উপলব্ধিপ্রচেষ্টা তাঁহার কবিধর্ম নয়। কিন্তু কখনো কখনো ঘটনাচক্রে এমন ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্ত রোগশয্যায় ও আরোগ্য কাব্য, অপর দৃষ্টান্ত আলোচ্য কবিতাগুলি। কিন্তু দুয়ে প্রভেদ এই যে, পরবর্তী কালের কাব্য দুইখানিতে সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়াতীত জগতের প্রসঙ্গ; আর গীতিমাল্যের কবিতা কয়টিতে ইন্দ্রিয় জগৎ ও ইন্দ্রিয়াতীত জগতের সীমান্ত প্রদেশের প্রসঙ্গ· এই ভূমিকাটুকু করিয়া এবারে কবিতাগুলির আলোচনায় নামা যাক।

---

* "একটা অনাবশ্যক কাজ" বলিতে গীতাঞ্জলির গানগুলির ইংরাজি তর্জমা। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২০॥

* পরবর্তীকালে রচিত রোগশয্যায় ও আরোগ্য কাব্যের অভিজ্ঞতা এই উপলক্ষ্যে স্মরণীয়। দারুণ রোগের আঘাতে ইন্দ্রিয়গত চৈতন্য সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হওয়াতে কবির পক্ষে ইন্দ্রিয়াতীত সত্যোপলব্ধি সহজ হইয়া পড়িয়াছিল।

সব ক'টি কবিতাই যেমন সমান রসোত্তম এমন নয়, আমার বিবেচনায় ৪, ১০ ও ১১ সংখ্যক কবিতা তিনটি অধিকতর সার্থক এবং যে-কোন মাপ-কাঠিতেই বিচার করা যাক না কেন এ তিনটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা পর্যায়ভুক্ত হইবার অধিকারী। কিন্তু কবিতা ছয়টির মধ্যে রস সার্থকতার তর-তম থাকিলেও সবগুলি একই অভিজ্ঞতার বাহন—আর সে অভিজ্ঞতা কি আগেই বলিয়াছি, ইন্দ্রিয়প্রান্তে অথচ ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ আরম্ভ হইবার আগে যে সূক্ষ্ম শরীরী, অনির্দেশ্য, অনির্দিষ্ট, অলক্ষ্যপ্রায় জগৎ আছে তাহারই প্রসংগ বর্ণন। এ জগৎ সকলের অভিজ্ঞতার বস্তু নয়, তাই ইহার বিবরণও সকলের পক্ষে সহজবোধ্য হইতে পারে না, এমন কি কবির পক্ষেও তাহা সদালভ্য ও অনায়াসবোধ্য নয়। বোধকরি মানবভাষায় সে জগতের অভিজ্ঞতাবর্ণন দুঃসাধ্য—অথচ কখনো কখনো ইন্দ্রিয়ের যবনিকা অপসারিত হইয়া গেলে সে দেশ কাহারো কাহারো চোখে পড়ে—তখন, উপমা, ইঙ্গিত, আভাস ও নানারূপ সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতে হয়। তৎসত্ত্বেও কেহ যদি বলিয়া বসে বুঝিলাম না, কবির নিরুত্তর থাকা ছাড়া উপায় নাই। কবির যেখানে এমন অসহায় অবস্থা সমালোচকের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। অথচ যখন দেখি যে সাধারণ অভিজ্ঞতার বহির্ভূত এই জগতের সত্যকে রবীন্দ্রনাথ কত সুন্দররূপে, উজ্জ্বলরূপে, স্বভাবত বিদেহীকে কান্তিময় দেহীরূপে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তখন তাঁহার অত্যাশ্চর্য শিল্পনৈপুণ্য স্মরণ করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। দুই অ-সমভাবের জগতের উপরে শিল্পের এই দোলায়মান সেতু রচনা সত্যই শিল্প-চাতুর্যের চরম

কে গো তুমি বিদেশী।
সাপ-খেলানো বাঁশী তোমার
বাজাল সুর কি দেশী।

*　　*　　*

গোপন গুহার মাঝখানে যে
তোমার বাঁশী উঠছে বেজে
ধৈর্য নারি রাখিতে।

তাহার সাপ-খেলানো বাঁশীর সুর ঊর্ধ্ব অধঃ আকাশ পাতাল সর্বত্র বিসারিত হইয়া গিয়া অবশেষে হৃদয় গুহায় প্রবেশ করিয়াছে। তখন

কতকালের আঁধার ছেড়ে
বাহির হয়ে এল যে রে
হৃদয় গুহার নাগিনী,

নত মাথায় লুটিয়ে আছে,
ডাকো তারে পায়ের কাছে
বাজিয়ে তোমার রাগিণী।

তোমার এই আনন্দ নাচে
আছে গো ঠাঁই তারো আছে,
লও গো তারে ভুলায়ে;

কালোতে তার পড়বে আলো,
তারো শোভা লাগবে ভালো,

নাচবে ফণা দুলায়ে
মিলবে সে আজ ঢেউয়ের সনে,
মিলবে দখিন সমীরণে

মিলবে আলোয় আকাশে।
তোমার বাঁশীর বশ মেনেছে,
বিশ্ব নাচের রস জেনেছে,
রবে না আর ঢাকা সে।

হৃদয়গুহার যে কালো নাগিনীগুলো বিষাক্ত, বীভৎস, সর্বনাশসাধনতৎপর বাঁশীর বশ মানিলে তাহারাও যে সুন্দর হইয়া উঠিতে পারে, বিশ্ব নাচের রস জানিয়া তাহারাও যে আনন্দময় বিশ্বনৃত্যে যোগ দিতে পারে, তাহারাও যে প্রকৃতির সৌন্দর্যের অঙ্গীভূত হইতে পারে। নিতান্ত অবাঞ্ছিতেরও যে একটা স্পৃহনীয় স্থান বিশ্বতন্ত্রে সম্ভব সে কথা এমন সুন্দরভাবে আর কোথায় প্রকাশ পাইয়াছে? মনের যে-সব প্রবৃত্তি সাপের মতো ভয়ংকর "তোমার বাঁশীর বশ" মানিলে তাহারাও সুন্দর ও আনন্দময় হ[ইয়া] উঠিয়া বিশ্বতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করিতে প[ারে] —ইহাই কবির অভিজ্ঞতা।

"ওগো পথিক, দিনের শেষে
যাত্রা তোমার সে কোন্ দেশে,
এ পথ গেছে কোন্‌খানে?"
"কে জানে ভাই কে জানে।
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারার
আলোক দিয়ে প্রাচীর-ঘেরা
আছে যে এক নিকুঞ্জবন নিভৃতে,
চরাচরের হিয়ার কাছে
তারি গোপন দুয়ার আছে
সেইখানে ভাই, করবো গমন নিশীথে"

সেখানটিকেই আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ [ও] ইন্দ্রিয়াতীত জগতের সীমান্ত প্র[দেশ] বলিয়াছি।

"সেথা মেঘের কোণে কোণে
কেবল দেখি ক্ষণে ক্ষণে
একটি নাচে আনন্দময় বিজুরি।"

সে জগৎ সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়জগৎ হই[লে] ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চন্দ্রসূর্যের আলোতেই ভাস্[বর] হইতে পারিত আবার ইন্দ্রিয়াতীত জ[গৎ] হইলে "অলোক আলোকে" প্রভাময় হই[তে] পারিত, কিন্তু যেহেতু সে জগৎ স্বভাব[ত] অনির্দেশ্য ও অনির্দিষ্ট, চঞ্চলতাই তাহা[র] ধর্ম—তাই সেখানকার আলোকও চপ[ল] চঞ্চল, সেখানে "একটি নাচে আনন্দম[য়] বিজুরি।"

এই কবিতা কয়টিও "আনন্দম[য়] বিজুরির" মতো "ক্ষণিক প্রভা হা[নে] যখনি অর্থ পাইলাম মনে করিয়াছি, অম[নি] "নিবিড়তর তিমির চোখে আনে"—দেখি[তে] পাই যে, কিছুই বুঝি নাই, অর্থের এ[ই] লুকোচুরিতেই, রসের এই রহস্যেই কবিত[া]গুলির বিশেষ মাধুর্য। এ রূপের জগৎ নয় অরূপের জগৎও নয়, এ এমন এ[ক] জগৎ যেখানে রূপের সংগে অরূপে[র] নিরন্তর লুকোচুরি খেলাতে দু[য়ের] লীলাটি বড় মধুর হইয়া জমি[য়া] উঠিয়াছে।

স্থির নয়নে তাকিয়ে আছি
মনের মধ্যে অনেক দূরে।
ঘোরা ফেরা যায় যে ঘুরে।

গভীর ধারা জলের ধারে,
আঁধার-করা বনের পারে,
সন্ধ্যা মেঘে সোনার চূড়া
উঠেছে ঐ বিজনপুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে॥

*　　*　　*

পশ্চিমে ঐ সৌধ ছাদে
স্বপন লাগে ভগ্ন চাঁদে,
একলা কে যে বাজায় বাঁশী
বেদনভরা বেহাগ সুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে॥

ও সেই দুই জগতের সীমান্ত প্রদেশ, মনের মধ্যেই বটে. তবে অনেকদূরে, কেননা মনের conscious অংশ মনের সম্মুখভাগে আর sub-conscious অংশ মনের মাঝে অনেকদূরে।" এই কারণেই সমস্ত কবিতাটির ধুয়া ঐ ছত্রটি, "মনের মাঝে অনেক দূরে।"

মনে হায় এই নদীর পারে
ছিলে তুমি বনের ধারে
বলেনি কেউ আমাকে।
শুধু কেবল ফুলের বাসে
মনে হঠাৎ খবর আসে
উঠেছে হিয়া চমকে।

এ রাজ্যও সেই পূর্বকথিত দেশ। সবই যেখানে অনিশ্চিত ও অনির্দেশ্য, সবই অজানা জানার প্রান্তে কাঁপিতেছে—

সেদিন আমার লাগে মনে
আছ যেন কাছের কোণে
একটুখানি আড়ালে,
জানি যেন সকল জানি,
ছুঁতে পারি বসনখানি
একটুক হাত বাড়ালে॥

তবু পুরো ধরিবার উপায় নাই, কেননা এখানে কিছুই স্থির নয়, খাস জগৎটাই চঞ্চল, এখানে "একটি নাচে আনন্দময় জ্যোতি"—এখানকার অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহ আনন্দময়, কিন্তু আবার বিদ্যুতের মতোই চঞ্চল। ইহা যোগীজনলভ্য নিত্য জ্যোতিও নয়, আবার ভোগীর নিত্য অন্ধকারও নয়; ইহা বিশেষভাবে কবির জগৎ; নিত্যের অনিত্য অনুভূতির জগৎ, কারণ কবির স্থান ভোগী ও যোগীর মাঝখানে, কবি অনিত্যের ভেলায় নিত্যের যাত্রী, সেইজন্য এই অভিজ্ঞতাই তাঁহার আয়ত্ত। এ কয়টি কবিতায় সেই অভিজ্ঞতারই একটি সুষ্ঠু ও শিল্পসুন্দর প্রকাশ।

৬

বলাকা কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই অপেক্ষাকৃত্তর পরিচিত কেবল ২৫ সংখ্যক কবিতাটি যত পরিচিত ও সমাদৃত হওয়া আবশ্যক তত হয় নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস, চয়নিকা ও সঞ্চয়িতা ইহাকে গ্রন্থে কবিতার সম্মান দেয় নাই, পাঠকের মুখেও ইহার খ্যাতি শুনিতে পাই না। ইহার একমাত্র কারণ মনে হয় এই যে, কবিতাটি ক্ষুদ্র। কিন্তু কবিতার পরিসরের স্বল্পতা দোষ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। বস্তুত এমন নিশ্ছিদ্র, সর্বপ্রকার দোষত্রুটিহীন অথচ শিল্পগুণে অনবদ্য কবিতা রবীন্দ্র সাহিত্যে অধিক নাই। ইহার সুঠাম একশেলাক গঠন সনেট না হইয়াও সনেটের ধর্ম-সমন্বিত। কিন্তু সাধারণত পাঠকে কবিতায় অন্যান্য গুণের সঙ্গে তাহার পরিসরের স্ফীতি চায়—এখানে তাহার অভাবই কবিতাটিকে উপেক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে।

যে-বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল
লয়ে দলবল
আমার প্রাঙ্গণতলে কলহাস্য তুলে
দাড়িম্বের পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে;
নবীন পল্লবে বনে বনে
বিহ্বল করিয়াছিল নীলাম্বর রক্তিম চুম্বনে;
সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে;
অনিমেষে
নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে
চাহি সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।

ইহা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের বসন্ত। ব্যক্তিজীবনের যৌবনাবসানের সঙ্গে এ বসন্তের যৌবনও অবসিত; বিগত বিহ্বলতা ব্যক্তিগত জীবনের মতো এ বসন্তও অবিহ্বল। রবীন্দ্রনাথ প্রৌঢ়ের যৌবনের কথা বলিয়াছেন, এ বসন্ত প্রৌঢ়ের বসন্ত। ইহা কন্ব আশ্রমের শকুন্তলা নয়, মারীচ আশ্রমের দুঃখব্রতচারিণী শকুন্তলা, সে আর হাবভাব লীলালাস্যময়ী নয়, তাই বলিয়া কম সুন্দর নয়; বাহিরের সৌন্দর্য কর্তৃক অপসারিত বলিয়াই অন্তরের সৌন্দর্য আত্মার দুই কূল ছাপাইয়া যেন প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। অযুত বৎসর আগে যে-বসন্ত একদিন মানবসমাজে উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছিল অযুত বৎসর পরে তাহা আজও তেমনি উন্মাদনাময় আছে, কারণ অযুত বৎসর পরে মানব সমাজ আজও নবীন। এ বসন্ত নির্বিশেষ মানব সমাজের নির্বিশেষ বসন্ত।

কিন্তু বর্তমান কবিতাটিতে ব্যক্তিবিশেষ বসন্তের কথা বলা হইয়াছে। ব্যক্তির জীবনে পরিবর্তনের সঙ্গে এই বসন্তেরও স্বরূপ পরিবর্তিত। প্রৌঢ়ের যে-যৌবন "মরণের সিংহদ্বার" পারে প্রতীক্ষা করিয়া আছে, এ বসন্ত তাহারই পূর্বাভাস বহন করিতেছে, কবির ভরসা আছে একদিন ইহারই হাত ধরিয়া তিনি "মরণের সিংহদ্বার" অতিক্রম করিয়া সেই প্রতীক্ষমান যৌবনের আসনে গিয়া উপস্থিত হইবেন এবং তাহার কণ্ঠ হইতে মন্দারের মালা লইয়া নিজকণ্ঠে পরিতে পারিবেন। কিন্তু এখনো তাহার বিলম্ব আছে—আজ তিনি এবং তাঁহার বসন্ত দুজনেই নিস্তব্ধভাবে বসিয়া আছেন

চাহি সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।

এমন করুণ-মধুর কবিতাটির উপেক্ষায় দুঃখ না হইয়া যায় না। প্রবন্ধ বাড়িয়া যাইবার ভয়ে এ আলোচনার এখানেই শেষ করিতে হইল। এখন ইহার সূত্রে পাঠক সমাজের দৃষ্টি রবীন্দ্রকাব্যের উপেক্ষিতাগণের দিকে পড়িলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব, পাঠক সমাজও রবীন্দ্র-কাব্যে নূতন সৌন্দর্যের সন্ধান পাইবেন।

শাঙ্গর্দেব

জন্মদিনে স্মরণের তালিকা থেকে অনেক সংগীত রচয়িতাকে আমরা বাদ দিয়েছি বল্লে অত্যুক্তি হয় না। তার একটা কারণ এ'দের গান আমরা জানি না, শেখবার অপেক্ষাও রাখি না, অথচ একটা অস্পষ্ট ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক সময় এ'দের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করি, যার ফলে এই সব বরেণ্য সুরস্রষ্টা অবহেলিতই থেকে গেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে এই কথাটি বিশেষভাবেই প্রযোজ্য। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই দ্বিজেন্দ্রলালের গান সম্বন্ধে অত্যন্ত হীন ধারণার বশবর্তী হয়ে মন্তব্য করতে শুনেছি। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবদ্দশায় সাহিত্য জগতে যে প্রচণ্ড দলাদলির সৃষ্টি হয়েছিল পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীত রচনাকে অবলুপ্ত করবার সেইটাই হয়েছিল সহায়ক। কিন্তু আজ সেই দুই দলের কারুরই অস্তিত্ব নেই। সুতরাং দ্বিজেন্দ্রলালের সাংগীতিক রচনাকে ভাল করে জানবার এবং বোঝবার সময় এসেছে। আগামী ৪ঠা শ্রাবণ কবির জন্মদিন। এই উপলক্ষে তাঁকে আবার শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করি।

আধুনিক সংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিজেন্দ্রলালকে বিচার করবার আগে এটা স্পষ্টই মনে রাখা দরকার যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে আজ থেকে একচল্লিশ বৎসর পূর্বে। ধরতে গেলে তাঁর সংগীতের রচনাকাল সেই সময়ে, যখন বাংলা গানের একটা নবযুগের সূচনা সবে দেখা গেছে মাত্র এবং সেযুগের তুলনায় তিনি কতটা আধুনিক ছিলেন সেটাও আগে বিচার করা দরকার। তখনকার দিনে সংগীতের চিরাচরিত রীতি লঙ্ঘন করাটা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। যাঁরা নতুন পথে অগ্রসর হয়েছেন তাঁরা বাধা পেয়েছেন বিস্তর, প্রাচীনপন্থীদের বিদ্রূপ তাঁদের ওপর অকৃপণভাবে বর্ষিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালকেও এই সবই সহ্য করতে হয়েছিল। সামাজিক জীবনে তিনি একঘরে হয়েছিলেন আবার সংগীতের ক্ষেত্রেও তাঁকে একঘরে করবার চেষ্টা হয়েছিল তাঁর ইউরোপীয় রীতি অবলম্বন করবার দরুণ। কিন্তু এই রীতির মিশ্রণে তিনি এতই অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছিলেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণটা তেমনভাবে সমর্থিত হতে পারেনি। এই রীতি ছাড়াও রাগমিশ্রণে তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল আর ছিল গায়নপদ্ধতিতে নমনীয়তার সংগে দৃঢ়তার একটা সহজ এবং সুন্দর সমন্বয়।

এই পদ্ধতি দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পূর্ণ নিজস্ব। অত্যন্ত কোমল বস্তু প্রকাশ পেয়েছে চমৎকার বলিষ্ঠ ভংগীতে। উদাহরণস্বরূপ "এস প্রাণসখা এস প্রাণে" গানটির উল্লেখ করা যায়।

> একি জ্যোৎস্না গর্বিত শর্বরী
> একি পাণ্ডুর তারপুঞ্জ
> এ‌কি সুন্দর নীরব মেদিনী
> একি নীরব নিভৃত নিকুঞ্জ

সঞ্চারীর এই অংশটি সুরে কী গাম্ভীর্যের সংগে বিকশিত হয়ে উঠেছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল আবেগ। অত্যন্ত স্নিগ্ধ স্বাভাবিক এবং মর্মস্পর্শী একটা আকুলতা তাঁর গানকে অন্য সকলের সৃষ্টি থেকে পৃ করে রেখেছে। শুধু প্রেম সংগী নয়, তাঁর ভক্তিরসাত্মক গানগুলিতেও বৈশিষ্ট্য অনন্যসাধারণভাবে প্র পেয়েছে। "মলয় আসিয়া কয়ে কানে প্রিয়তম তুমি আসিবে", "ত তোমার কাছে ভাসিয়া যায় অন্তর আম "ও কে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়"—প্র গানগুলি এর চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

বস্তুত দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যসং খুব কমই আলোচিত হয়েছে। তাঁকে স্বদেশী সংগীত রচয়িতা জানেন এবং অনেকের ধারণা, প্রধানত হাসির গানই রচনা করে গেছে কাব্যসংগীতের দিক থেকেও তাঁর কত অসামান্য সে খবর অনেকেই না। তাঁর যে অল্প কয়েকটি গানের আজও আমরা পাই যেগুলি একটি একটি বিচার করে গেলে দেখা যাবে দৃপ্তভংগী, সেই আবেগ, সুর সেই সহজ রূপটি কত স্বাভাবিক সুন্দর। আজকের কাব্যসংগীতেও গান থেকে অনেক কিছুই নেওয়া

আজকাল তো প্রায় গানেই পাশ্চা সংগীতের অনেক রীতিনীতি প্রয়োগ হয় কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন সহজ এবং নৈপুণ্যের সংগে এইসব বৈচিত্র্য এনেছেন তার ধারে কাছেও আধু সুরকাররা পৌঁছোতে পারেন নি। "ম আসিয়া কয়ে গেল কানে" গানটির শে কলি বা "আমরা এমনিই এসে ভেসে প্রভৃতি গানের ক্রমিক আরোহণে পাশ্চাত্ত্য সংগীতের ভংগী এসেছে অ কালকার কোন গানেই সেই অন ভংগীর লেশমাত্রও পাওয়া যাবে না। একটি প্রধান কারণ এই যে, দ্বিজেন্দ্র রীতিমতো অর্থব্যয় করে পাশ্চাত্ত্য সংগ শিখেছিলেন এবং ভারতীয় সংগী সংগেও তাঁর নিগূঢ় পরিচয় ছিল। দুটি রীতির সংগে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ব'লেই তিনি এদের মিল স্বাভাবিক করতে পেরেছিলেন, কোন কৃত্রিম আশ্রয় তাঁকে নিতে হয় নি। আর পরিচয়টি নেই ব'লেই আজকালকার স

নার নূতনত্বটি এক বিসদৃশ আকার য়ে দেখা দেয় যার কোন সত্যিকারের ল্য আছে কিনা সন্দেহ।

বাংলার সংগীতকে যাঁরা সংগঠন রেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদের মধ্যে কজন—শুধু একজন নয়, একজন ধান সুরস্রষ্টা। সুতরাং বাংলার ংগীতকে যদি জানতে হয় তবে তাঁকে াদ দিলে সে জানা সম্পূর্ণ হবে না। য়তো তাঁর কোন কোন রচনা আজকের রিপ্রেক্ষিতে ঠিক এখনকার আসরে বসে াইবার মতো আধুনিক বলে বিবেচিত বে না, কিন্তু তবু এই গানগুলি লনা করলে দেখা যাবে, সেকালের লায় এগুলি ছিল কত অগ্রসর এবং ংগীতিক মূল্যসম্পন্ন। "আজি এসেছি হে" গানটি একটি এই ধরনের পেলো গান কিন্তু এখনো যখন এই টি প্রকৃত সুরে শুনতে পাই তখন মন কে নেচে ওঠে—এসব গানের বাঁধুনি সৌন্দর্য এখনো বিস্ময়কর লাগে। গীতের শিক্ষার দিক থেকে, ইতিহাসের ক থেকে বা আলোচনার দিক থেকে চার করলে পুরাতন সুরস্রষ্টাদের বহেলিত রাখাটা একটা মস্ত ভুল—এটা ীকার করতেই হবে। প্রকৃত শিক্ষা পেলে এটা নতুন এটা পুরোনো, সেকেলে এই ভাবটা থাকে না, তখন সংগীতে মন একটা রসের সন্ধান পাওয়া যায় যা সন্তন। তখনই একজন শিল্পী প্রকৃত শিল্পীর গৌরব অর্জন করেন, তাঁর দিব্য-দৃষ্টি লাভ হয়।

গত রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলনে লক্ষ্য রা গেল যে, রবীন্দ্রনাথের খুব প্রাচীন ানের প্রতি অনেকের গভীর আগ্রহ। ইট খাট টপ্পার স্পর্শ দেওয়া বা আড়-ষ্টা জাতীয় খুব সহজ সরল গান লোকে বেছে নিয়ে গাইলেন। আধুনিক যুগের বহু কারুকলাসমন্বিত গানের ঝখানে এই যে পুরাতন এবং সহজ ানগুলি, এগুলি কিসের টানে শিল্পীদের ে ভেসে এলো? এর উত্তর হচ্ছে প্রকৃত াংগীতিক বৈশিষ্ট্য। এই পুরোনো হজ সরল গানগুলির মধ্যে যে মাধুর্য াওয়া যায় আজকের বহু বৈচিত্র্যের ধ্যেও সে হয়তো দুর্লভ। প্রাক্-রবীন্দ্র যুগের গানের দিকেও আমাদের আগ্রহ ফিরে আসছে—প্রাচীন বাংলা টপ্পাও আজকাল মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে, তাদের সারল্য এবং মাধুর্য আমাদের আকৃষ্ট করছে। তাই বলছি, দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যসংগীতের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত নন তাঁরা যদি দ্বিজেন্দ্রসংগীত অনুশীলন করেন তবে তার মধ্যেও প্রকৃত রসমাধুর্যের আস্বাদ পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠবেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃত সংগীতরূপটি থিয়েটারের জন্য অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সাধারণত রংগালয়ের অভিনয়ে যে সুরে দ্বিজেন্দ্রসংগীত গাওয়া হয় তাতে বিকৃতির পরিমাণ এত অধিক যে, এর দরুণই বোধহয় অনেকে দ্বিজেন্দ্রলালের গান সম্বন্ধে তেমন উচ্চ ধারণা পোষণ করতে পারেন না। দ্বিজেন্দ্রসংগীতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গেলে তার আসল সুরটি ভাল করে শেখা এবং জানা দরকার। এইটি জানলে দ্বিজেন্দ্রসংগীতের প্রকৃত রসটি উপলব্ধি করা যাবে এবং এটাও বোঝা যাবে যে, দ্বিজেন্দ্রলালের সুরে গায়কের স্বাধীনতা কত উন্মুক্ত। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই শ্রেণীর সুরস্রষ্টা ছিলেন যিনি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও শিল্পীকে সুরবিহারের স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন।

১৮৬৩ (বাংলা ১২৭০) সালের ৪ঠা শ্রাবণ দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সে-যুগের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি কৃষ্ণনগরের রাজ-সরকারের দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য এবং সংগীত-প্রতিভা অল্পবয়সেই বিকশিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর প্রথম গ্রন্থ আর্যগাথা প্রথম ভাগের গানগুলি রচিত হয় বারো থেকে সতেরো বৎসর বয়সের মধ্যে। যে বৎসর তিনি হুগলী কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন সেই বৎসরেই এই গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়। এম-এ পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করে তিনি যখন শিক্ষকতায় নিযুক্ত তখন বিলাতে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। এই সুযোগ গ্রহণ করে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করলেন।

বিলাতে থাকবার সময় তিনি ইংরেজিতে অনেকগুলি কবিতা লিখে-ছিলেন। এগুলি Lyrics of Ind গ্রন্থে মুদ্রিত করেন। পাশ্চাত্ত্য সংগীতে শিক্ষাও তিনি বিলাতেই গ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে তাঁর উক্তিটি বেশ চিত্তাকর্ষক।

"আমি সলজ্জে স্বীকার করি যে, এককালে আমারও ইংরাজি গানে বিশুদ্ধ ও আন্তরিক ঘৃণা ছিল। আমি যেদিন ইংলন্ডের সর্বপ্রধান সংগীত রচয়িতার রচিত সর্বোত্তম Oratoria শুনিতে টিকিট কিনিয়া আলবার্ট হলে প্রবেশ করিলাম ও গুটিকতক গান শুনিলাম,

সেদিন ইংরাজি সংগীতের হীনত্ব ও অপদার্থত্ব আরও সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমি অবজ্ঞায় আলবার্ট হল পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে দ্রুত পদচারণ করিয়া, একেবারে শয়নকক্ষে উপনীত হইলাম এবং কেন যে লোকে পয়সা খরচ করিয়া এরূপ সংগীত শোনে ইহা পর্যালোচনা করিতে করিতে শয়ন করিয়া কতক শান্তি উপভোগ করিলাম। ক্রমে বিলাত প্রবাসে নানা বন্ধুর নিকট ছোটখাট ইংরাজি গান শুনিতে শুনিতে ভাবিলাম "বাঃ এ মন্দই বা কি?" ক্রমে তাহার অনুরাগী হইয়া আরও শুনিতে চাহিতাম এবং শেষে আমার ইংরাজি গান শিখিবার প্রবৃত্তি হইল ও পয়সা দিয়া গান শিখিতে আরম্ভ করিলাম। ইহাতে প্রমাণ হয়—প্রথমত যে, মানুষের প্রবৃত্তি কি পরিবর্তনশীল ও দ্বিতীয়ত যে, প্রথম ধারণা সব সময় ঠিক নহে।"

পরবর্তীকালে এইসব পাশ্চাত্য সংগীতের শৈলী তিনি বাংলাগানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চমৎকারভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। এ ছাড়াও হুবহু অনুবাদ করেছিলেন বহু স্কচ, ইংরেজি এবং আইরিশ গান। এর মধ্যে টম মুরের "Go where glory waits thee" নামক বিখ্যাত গানের অনুবাদও ছিল। এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ এইসব গানের সুর গ্রহণ করেন নি। তবে দ্বিজেন্দ্রলালের এইসব গান তেমন প্রচলিত হয়নি কেননা সাহিত্যের দিক থেকে এগুলির তেমন মূল্য নেই আর সংগীতের দিক থেকেও নিছক পাশ্চাত্য ধারা আমাদের কাব্যসংগীতে বোধ হয় তেমন পছন্দসই হয়নি। অথচ একেবারে খাঁটি পাশ্চাত্য ঢঙে রচিত হাসির গানগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল কেননা এক্ষেত্রে সুর নির্বাচনটি লোকের মনের মত হয়েছিল।

তিন বছর বিলাতে কাটিয়ে কৃষিবিদ্যার ডিগ্রী নিয়ে তিনি দেশে ফিরলেন। দেশে ফিরে ছোটলাটের সঙ্গে দেখা করলেন। সাহেব ভেবেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল চাকরির জন্য তাঁকে বেশ একটু খোশামুদি করবেন কিন্তু তাঁর প্রকৃতিই ছিল উল্টো। একে অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ব্যক্তি তার ওপর স্বাধীন দেশের আবহাওয়ায় কিছুকাল কাটিয়ে এসে ছোটলাটের সঙ্গে কথাবার্তায় তিনি কোনরকম হীনতা প্রকাশ করলেন না। ফলে যেখানে তাঁর স্ট্যাটিউটারি সিভিলিয়ান হবার কথা সেখানে তাঁকে দেওয়া হোলো ডেপুটির পদ। এই স্বাধীন মনোভাব তাঁর বরাবরই ছিল। এবং এরই জন্য চাকুরি জীবনে তাঁকে যথেষ্ট বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়েছে। তার ওপর সাহিত্যে স্বাদেশিকতার জন্য শেষ জীবনে তাঁকে ক্রমাগত এখান থেকে ওখানে বদলি করে ইংরেজ সরকার তাঁর ওপর অত্যাচার করতে কিছুই বাকি রাখে নি।

সরকারী কাজ নেবার পর অল্পকাল পরেই তিনি প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কন্যা সুরবালা দেবীকে বিবাহ করেন। বিবাহের পরে কর্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি মুঙ্গেরে সেটলমেন্ট অফিসার নিযুক্ত হন। এ সময়ে তিনি অনেক গান এবং কবিতা রচনা করেছিলেন। তাঁর হাসির গানও এই সময়েই শুরু হয়। নবরচিত কাব্যসংগীতগুলি "আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ" নাম দিয়ে প্রকাশিত করেন। এর অনেকগুলি গান পরে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল।

মুঙ্গেরে থাকতে তিনি নিয়মিতভাবে ভারতীয় সংগীতের অনুশীলন করতে আরম্ভ করেন। বিখ্যাত গায়ক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এই সময়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে মুঙ্গেরে অবস্থান করছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এঁদের সাহচর্য এবং রীতিমত ওস্তাদের সহায়তায় কিছুকাল সংগীতচর্চা করেছিলেন। তাঁর কয়েকটি টপ্‌খেয়াল জাতীয় গানের মূলে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রভাব বিশেষভাবে বিদ্যমান। এই সময় থেকে পত্নীবিয়োগের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় যুগ। স্ত্রীর মৃত্যুকালে তাঁর বয়স চল্লিশ এবং এরপর থেকেই তিনি ধীরে ধীরে আনন্দ উচ্ছ্বাস থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছেন।

এরপরে এলো তাঁর নাটক রচনার যুগ। কলকাতায় এবং বাইরে নানাস্থানে তিনি নাট্যরচনায় মনোনিবেশ করেন এবং স্বাদেশিকতার উগ্র আন্দোলনেও যোগদান করেন। বহু জায়গায় ঘোরাঘুরির পর তিনি গয়ায় বদলি হয়ে এলেন এবং এইখানে তাঁর জীবনের আর একটি সা[illegible] অধ্যায় রচিত হয়।

গয়াতে তিনি প্রিয়বন্ধু মন[illegible] লোকেন্দ্র পালিতের ঘনিষ্ট সাহচর্য [illegible] করেন। পালিত সাহেব প্রতি সন্[illegible] দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে সাহিত্যালোচ[illegible] মগ্ন থাকতেন। এটা তাঁর শ্বেতাঙ্গ[illegible] স্ত্রী এবং উচ্চ রাজকর্মচারীদের ক্[illegible] অনুমোদিত ছিল না কিন্তু তাতে [illegible] ভ্রূক্ষেপ করেননি। যে রাত্রে দ্বিজেন্দ্[illegible] তাঁর বিখ্যাত গান "বঙ্গ আমার জ[illegible] আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ" র[illegible] করে লোকেন্দ্রনাথকে শোনালেন সেই [illegible] তাঁর আনন্দ-উচ্ছ্বাস উন্মাদ হয়ে উঠ[illegible] দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে এই সঙ্গ[illegible] রচনাটি একটি বিশেষ ঘটনা। এই গান[illegible] বোধহয় পরোক্ষভাবে তাঁর মৃত্যুর জ[illegible] দায়ী। যখনই তিনি এ গানটি গাই[illegible] তখনই দারুণ উত্তেজনা অনুভব কর[illegible] এবং পরিশেষে এই [illegible] তাঁর পরে[illegible] শিরঃপীড়ার উদ্ভব হয় যার ফলে [illegible] পর্যন্ত মাত্র পঞ্চাশ [illegible] বয়সে [illegible] মৃত্যুবরণ করতে হল।

গয়াতে [illegible] দ্বিজেন্দ্রলালকে [illegible] সম্পর্কে একটি নিবন্ধ [illegible] যান। এ সম্বন্ধে [illegible] বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন [illegible] তুলে দিচ্ছি।

"[illegible] কথা প্রসঙ্গে [illegible] লালের কয়েকটি [illegible] জগদীশবাবু বলেন—

"আপনি রাণা প্রতাপ, দুর্গা[illegible] প্রভৃতির অনুপম চরিত্রগাথা [illegible] শুনাইতেছেন বটে কিন্তু [illegible] সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি [illegible] আপন ঘরের জন নহেন। এখন [illegible] আদর্শ বাঙ্গালীকে দেখাইতে হই[illegible] যাহাতে এই মুমূর্ষু জাতটা আত্মশ[illegible] আস্থাবান হইয়া আত্মোন্নতির [illegible] আগ্রহান্বিত হয়। আমাদের [illegible] বাঙ্গলাদেশের আবহাওয়ায় [illegible] আমাদের ভিতর দিয়াই বাড়িয়া উ[illegible] সমগ্র জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করি[illegible] পারিয়াছেন, যদি সম্ভব হয়, যদি পা[illegible] তো একবার সেই আদর্শ এ বাঙ্গা[illegible] জাতিকে দেখাইয়া আবার তাহাদিগ[illegible]

য়া মাতাইয়া তুলুন।"......এই ঘটনার মাস তিনেক পরে, পূজার আমি সেবার গয়ায় গিয়া কিছুকাল সহৃত্তমের অতিথি হইয়াছিলাম। কদিন বোধহয় অষ্টমী পূজার দিন র বেলায় আহারান্তে দুজনে আছি, কবিবর হঠাৎ বলিয়া ন—"দেখ আমার মাথার মধ্যে গানের কয়েকটা লাইন আসিয়া ভারি ন করিতেছে। তুমি একটু বোসো আমি সেগুলো গেঁথে নিয়ে আসি।" া বা তাহারও কিছু অধিককাল বসিয়া রহিলাম। দ্বিজেন্দ্রলাল র হইতে হাততালি দিয়া গুন গুন গাইতে গাইতে আমার কাছে উপস্থিত হইলেন এবং আমাকে একটা ধাক্কা দিয়া কহিলেন— চমৎকার গানই লিখেছি! শুনবে? ন নাকি? আচ্ছা তবে শোন।" লটা গাহিয়া উঠিলেন—

আমার জননী আমার ধাত্রী আমার দেশ—ইত্যাদি।

ন শেষ করিয়া বন্ধু বলিলেন— কেমন লাগল?" আমি বলিলাম— আপনি।" বালস্বভাব দ্বিজেন্দ্রলাল শুনে, একবার আমার মুখের চাহিয়া একটু হাসিলেন। পরে কছু না বলিয়া, হাতে তালি দিতে সারাটা ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া, নাচিয়া আবার গাহিতে লাগিলেন,—

দুঃখ কিসের দৈন্য কিসের লজ্জা
কিসের ক্লেশ
কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন
আমার দেশ।"

ই গানটিতে তিনি নিজেই যে শুধু মেতেছিলেন তাই নয় সারা বাংলা মেতে উঠেছিল। আজও এ গান র প্রাণে প্রেরণা সঞ্চার করে। গয়ায় বছর তিনেক ছিলেন। সরকারের কারণে ক্রমাগত উৎপীড়িত হয়ে ন দীর্ঘ দেড় বৎসরের "ফার্লো" তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন।

র বড় বড় নাটকগুলি শেষজীবনে এবং কলকাতায় বসেই লেখা। আটখানি গ্রন্থ তিনি চার বছরের প্রকাশিত করেন।

শেষজীবনে সবচেয়ে বড় দুঃখকর ঘটনা হোলো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রকাশ্য বিরোধ, যদিও তিনি বরাবরই রবীন্দ্রনাথের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। আজকের দিনে ভেবে দেখলে এই বিরোধের কারণটা নিতান্ত ছেলেমানুষি বলেই মনে হয়। তবু এটা হয়েছিল এবং এর জন্য প্রধানত দায়ী জনকয়েক স্বার্থপর এবং কুটিল ব্যক্তি যাঁরা দ্বিজেন্দ্রলালকে ক্রমাগত অন্যায়ভাবে উত্তেজিত করে তুলেছিলেন। যাই হোক, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ভারতবর্ষ পত্রিকায় তিনি রবীন্দ্র প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করে নিজেই এই বিরোধের অবসান করে যান।

দীর্ঘ ছুটির পরে তিনি আবার কাজে যোগদান করেন কিন্তু বেশীদিন কাজ করতে পারলেন না, অতিরিক্ত ব্লাডপ্রেসারের জন্য আবার বিদায় নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন। মৃত্যুর পূর্বে আর তিনি কলকাতা ছাড়েন নি।

মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার কালভার্ট তাঁকে একেবারে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের মত মজলিসি লোকের পক্ষে সেটা কোনক্রমেই সম্ভব হয়ে উঠল না। ইণ্ডিয়া ক্লাব, ডাকাত-ক্লাব এবং পূর্ণিমা-মিলনের মত প্রতিষ্ঠানের নায়ক দ্বিজেন্দ্রলাল চুপচাপ বসে থাকবার লোক ছিলেন না। সাহিত্য-চর্চা, গান এবং তর্ক চলতেই থাকল। অবশেষে ১৭ই মে ১৯১৩ সালে মৃত্যু তাঁকে সহসা ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

সেদিন শনিবার। রাত্রে ক্ষীরোদপ্রসাদের "ভীষ্ম" নাটক দেখতে যাবার কথা—সন্ধ্যা থেকে কবি একটা ফরাসের ওপর একটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে 'সিংহলবিজয়' নাটকের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করছিলেন। একসময় ক্লান্তি এলো। তাকিয়ায় মাথা রেখে দু'হাত তুলে আলস্য ভাঙলেন। সহসা প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চীৎকার করে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। মাথার একটা সূক্ষ্ম শিরা কোথায় অতর্কিতে ছিঁড়ে গেল। চিৎকার শুনে লোকজন ছুটে এলো। সাধ্যমত চিকিৎসাও চলল। কিন্তু কিছুই করা গেল না। রাত প্রায় ন'টার সময় তিনি একবার চোখ মেলে চাইলেন। মৃত্যুর পূর্বে অস্পষ্ট স্বরে একবার প্রিয়তম পুত্রকে ডাকলেন— "মণ্টু"।

আসরের খবর

গীতবিতান সম্মিলনী

গত ২৭শে জুন ১০, হিন্দুস্থান রোডে গীতবিতান সম্মিলনী সংগীত সহযোগে একটি আলোচনার অনুষ্ঠান করেছিলেন। আলোচনার বিষয়বস্তু "বাংলাগানে রাগরূপ"। বাংলা গানের একটি নিজস্ব রূপ আছে। রাগসংগীতের সহযোগে এবং প্রভাবে এই রূপটি আরো মাধুর্যমণ্ডিত বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। অতুলপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথের রচনায় নানাভাবে এই বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এই বিষয়টি নিয়ে উক্ত অধিবেশনে আলোচনা করেন। সংগীতাংশে ছিলেন শ্রীমতী গীতা সেন, বেলা ভট্টাচার্য, অমিয়া রায়, অরুণিমা দাশগুপ্ত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও তরুণ মিত্র।

নৃত্যভারতী

গত ৪ঠা জুলাই ৮১এ, কড়েয়া রোডে নৃত্যভারতীর উদ্যোগে লখনউ ঘরানার বিখ্যাত নৃত্যশিক্ষক শ্রীরামনারায়ণ মিশ্রের ছাত্রী বেবিরাণী ও ছাত্র অষ্টম বর্ষীয় বালক শ্রীচিত্রেশকুমার কথক নৃত্যে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী শ্রীমতী কেশোয়া মুসা ভারতনাট্যম্ নৃত্যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন। তবলা সংগত করেন মাস্টার মুন্নন। বেবিরাণী প্রায় একঘণ্টাকাল কথক নৃত্যের বিভিন্ন আঙ্গিক প্রদর্শন করেন। নৃত্যানুষ্ঠানের পর শ্রীতানসেন পাণ্ডে বেহাগে আলাপ করেন ও মালকোষে ধ্রুপদ গেয়ে শোনান। পাখোয়াজে সংগত করেন শ্রীকৃষ্ণ পাল। অনুষ্ঠানটিতে বহু সংগীতাভিজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

চক্রদত্ত

শরৎচন্দ্রের লেখা "শ্রীকান্তের নৈশ অভিযানে" আমরা অন্ধকারের যে বর্ণনা পাই তাতে মনে হয় যেন সূচীভেদ্য অন্ধকার সম্বন্ধে আমাদের বেশ ধারণা জন্মেছে। সাহিত্যিকের চক্ষে যেটা সূচী ভেদ্য অন্ধকার মনে হয়েছে বৈজ্ঞানিকেরা তাকে অত বড় আখ্যা দিতে নারাজ। প্রফেসর পিকার্ড বলেন যে, সমুদ্রের দু' মাইল তলদেশে নামলে তবে আমরা সূচি-ভেদ্য অন্ধকারের রূপ দেখতে পাব। তিনি তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই এ মত পোষণ করেন। সম্প্রতি তিনি সপুত্র: ইটালির নিকট ভূমধ্য সাগরের তলায় নেমেছিলেন। অবশ্য এই দু'মাইল তলদেশে মাঝে মাঝে ফস্‌ফরাসেন্টের ঝিলিক দেখেছেন। প্রফেসর পিকার্ডের মতে এ আলো কোনও সামুদ্রিক প্রাণীর দেহ থেকেই বিচ্ছুরিত হয়। প্রফেসর পিকার্ডের সংগে যে তীব্র সার্চ লাইট ছিল সে আলো জ্বালিয়েও তিনি ঐ স্থানের কিছু দেখতে পাননি।

*

সামুদ্রিক ঝিনুক বললেই আমাদের একটা নিরীহ গোবেচারা প্রাণীর কথা মনে পড়ে। কিন্তু এদের মধ্যেও এমন এক জাতীয় ঝিনুক আছে যারা তাদের বিষাক্ত খোঁচার সাহায্যে যে কোন প্রাণীকেই ঘায়েল করতে পারে। এদের বিষ যখন এরা কোন প্রাণীর শরীরের মধ্যে ঢোকায় তখন অনেক সময় পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত র‍্যাটেল সাপের বিষের চেয়েও এদের বিষ তাড়াতাড়ি কাজ করে। এই জাতীয় ঝিনুকদের 'টেক্সটাইল কোন' বলা হয়। দেখা গেছে যে, এই টেক্সটাইল কোনের খুব সামান্য পরিমাণ বিষই একটা খুব বড় অক্টোপাস্‌কে খুব অল্প সময়ের মধ্যে মেরে ফেলতে পারে।

*

প্রাণী জগতের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, শুধু কীট পতঙ্গ এক-টানা ২৫০ কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে এক নাগাড়ে রাজত্ব করে চলেছে। মানুষও এদের সম্বন্ধে বহু শতাব্দী ধরে তথ্য সংগ্রহ করছে। আজকের দিনে কম করেও ৭০০,০০০ রকমের শুধু ছারপোকা জাতীয় কীটের খবর পাওয়া গেছে। দিনের পর দিন মানুষ এই সব কীট পতঙ্গদের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খবর জোগাড় করেছে। কেন? না, এদের কি রকম ভাবে ধ্বংস করা যায়। আর এই জন্যই সব সময় নতুন নতুন কীট বিনাশক ওষুধও আবিষ্কার হচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, এসব সত্ত্বেও আজ এই মুহূর্ত পর্যন্ত কীটপতঙ্গের একটি প্রজাতিকে সম্পূর্ণ-রূপে ধ্বংস করে, পৃথিবী থেকে তার অস্তিত্ব নষ্ট করা সম্ভব হয়নি।

*

একটানা বসে মোটরগাড়ি, ট্রেন অথবা বাসে করে যেতে হলে খুবই কষ্ট হয়। কষ্ট হবার কারণ হচ্ছে যে, পিঠের পেশী-সমূহ এই ভাবে বসে থাকার জন্য খুব বেশী ক্লান্ত হয়। এই সময় পিঠের পেছনদিকে নরম কোন জিনিস যেমন বালিস জাতীয় কিছু ঠেস দিয়ে বসতে পারলে বেশ আরাম পাওয়া যায়। কিন্তু ঠেস দেবার জন্য সব সময় বড় কিছু বয়ে সংগে করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। দেখা গেছে যে একটা বড় তোয়ালেকে যদি মাঝামাঝি ভাঁজ করে নিয়ে সেটা গোল করে পাকিয়ে পিঠের পেছন দিকে দিয়ে বসা যায় তাহলেও বেশ আরাম পাওয়া যায়। প্রয়োজন মত পাকান তোয়ালেটাকে পিঠের ওপরে নিচে নামিয়ে
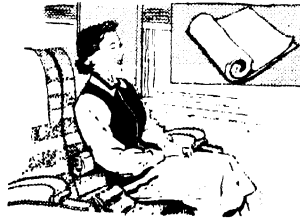
পিঠের পেছনে তোয়ালে দিয়ে আরাম করে বসা

উঠিয়ে আরামটা ভোগ করা যায়। সব-চেয়ে সুবিধা যে একটা তোয়ালেকে পাট করে অনায়াসেই খুব অল্প জায়গার মধ্যে পুরে নিয়ে যাওয়া যায়।

*

ইঁদুর ধরা কলে আমরা সাধারণত পাঁউরুটি, হাতেগড়া রুটি অথবা আটা বা ময়দার তৈরী খাবার টোপ হিসাবে ব্যবহার করি। ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ গুট্‌মান বলেন যে, ইঁদুর-কলে চিনি অথবা যে কোন মিষ্টি জাতীয় খাবার টোপ হিসাবে ব্যবহার করলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। ছুঁচো, ইঁদুরদের দাঁতের মধ্যে একটা দাঁত হচ্ছে 'মিষ্টি দাঁত'। এরই সাহায্যে এরা মিষ্টি জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করে। দেখা গেছে যে, মিষ্টি যত বেশী হবে ইঁদুরেরা সেটা তত বেশী পছন্দ করবে।

*

হঠাৎ কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে একটা জাহাজকে কি রকম করে ওজন করব বলতো তাহলে একটু ভাবনায় পড়বার কথা। কিন্তু ব্যাপারটা খুব সোজা—অবশ্য কি করে এটা করা সম্ভব সেটা যদি জানা থাকে। এটা 'আর্কিমেডিস্ পদ্ধতিতে' করা সম্ভব। এই সূত্র হচ্ছে যে, কোন একটা বস্তুকে যদি জলে ডোবান যায় তাহলে এই ডোবার জন্য যতটা জল উপ্‌চে যাবে সেটা মেপে নিয়ে যতটা ওজন হবে সেটাই হবে বস্তুটির ওজন। কোন জাহাজের ওজন জানতে হলে এই উপায়ে জানাই খুব সহজ। জাহাজ তৈরীর সময় অঙ্ক করে বার করে নেওয়া হয় যে, খালি জাহাজের একটা নির্দিষ্ট মাপ পর্যন্ত যদি জলে ডোবে তাহলে জাহাজ এত ওজনের জল উপ্‌চে ফেলতে পারে। তারপর জাহাজে মাল ভর্তি করে কতটা আরো জলে ডুবলো এবং কতটা জলের ওপরে থাকলো মেপে নিয়ে হিসাব করলেই সমস্ত জাহাজটার ওজনের হিসাব পাওয়া যাবে। এটাই জাহাজের ওজন ঠিক করবার একমাত্র উপায় বলা যায়। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভারী জাহাজ 'কুইন এলিজাবেথ' এর ওজন হচ্ছে ৮৩,৬৭৩ টন 'কুইন মেরী'র ওজন ৮১,২৩৫ টন।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

জীবনে এমন বিব্রতবোধ আর কখনো করেছি কিনা, মনে [illegible] না। তাও ভিক্ষে দিয়ে। আগে [illegible] পয়সা দিয়ে কে ওই মহৎ কাজটুকু [illegible]। মহত্ত্বের অমৃতে যে এত [illegible] ছিল, তা জানতাম না। জানতাম [illegible] আমার মধ্যে গোপন ছিল এত কলঙ্ক। [illegible] ফুটে বেরুবে এতগুলি [illegible] তীক্ষ্ম চোখের ধিক্কারে।

[illegible] থেকে ব্রাশ নামিয়ে, একটা কিছু [illegible] পারটার ইতি টেনে দিতে গেলাম। [illegible]। ততক্ষণে গুঞ্জনের গতি পরি- [illegible] হয়েছে। বলব কাকে, শুনবে [illegible] আলোচনা চলছে নিজেদের মধ্যে, [illegible] চোখে প্রথম ধরা পড়েছিল এ [illegible]। যে যা-ই বলুক, খন পিসীর [illegible] যে প্রথম পড়েছিল, সেটা প্রমাণ [illegible] দিল তার বিপুল দেহ ও সর্বোচ্চ [illegible]। '—ওমা! জল ভরব কি? তাকিয়ে [illegible], ছুঁড়ি ফিক্ ফিক্ করে হাসছে [illegible] কি বলছে।'

[illegible] বলে, ততই সকলের ধিক্কৃত নজর [illegible] এক রাশ তীরের মত এসে বেঁধে [illegible] সর্বাঙ্গে। যেন প্রমাণ হয়ে [illegible], সর্বনাশের দাগ আছে আমারও [illegible]। আমার চোখে মুখে। আমার [illegible]। কারুর খ্যাতি অকলঙ্ক বলে। [illegible] কু-খ্যাত হয় কলঙ্কের ডালি মাথায় [illegible]। এ দুদিনের মধ্যে বড় একটা [illegible] পড়িনি কারুর। আর সকালের [illegible] সামান্য ঘটনা আশ্রমের সকলের সামনে [illegible] চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল [illegible]। বিশেষ করে বাঙ্গালী মহলে। [illegible] চেয়েও বেশী নারীমহলে। এমন [illegible]করী ক্ষমতা শুধু কলঙ্কেরই আছে। [illegible] তো! দুধ জ্বাল দিয়ে ক্ষীর করতে সময় লাগে। লেবুর ফোঁটায় ছানা কাটে চকিতে।

ফিস্ ফিস্ হল, খিল্ খিল্ হল। সাড়া পড়ে গেল। কে আমি। কোথাকার ছেলে। কার সঙ্গে এসেছি। থাকি কার কাছে। কেন বা এসেছি এ ভরা বয়সে।

জটিল প্রশ্ন, কূট তর্ক, সন্দেহ নেই। অথচ আশ্চর্য! ভিক্ষেই দিয়েছি। সর্বনাশীর মুখখানি তো মনেও পড়ে না। কানে ভাসছে শুধু তার নির্ভীক তীক্ষ্ম হাসি।

বলরামের হাসিতে ছিল এক বিচিত্র আনন্দ। শ্যামার হাসিতে চাপা বেদনার ছটফটানি। আর এ হাসি! যেন দুস্তর তেপান্তরের সেয়ানা পাখীর ডাক। ডাকে তার আচমকা অট্টহাসি কে হো কে হো ক'রে ওঠে। একলা পথিক চমকে তাকায় ফিরে। নিরালা ধু ধু মাঠের অদৃশ্যচারিণী ভয়ঙ্করী খেলায় মাতে পথিককে নিয়ে।

ভাবি, যদি সে মেয়ে না হয়ে পুরুষ হত। চোর হোক, না হয় যদি হত মেয়ে-চোর-ই। হত যদি তেমনি এক সর্বনেশে! তবে কি এমনি ক'রে সবাই মিলে খাউ খাউ করে আসত আমাকে।

ইস্! তাকানো যায় না ব্রজবালার চোখের দিকে। তার কিশোরী চোখের ভাষা পরিষ্কার, 'ছি ছি, তোমার মনে এই ছিল! আর ডেকো না আমাকে বৌঠান বলে।'

যাওয়ার আগে বলে গেল তার দিদিমা, 'ভিক্ষে দেওয়ার আর লোক পেলে না?'

কোতোয়ালজী হাসল একটু বাঁকা মিঠে হাসি। একটু বা সমবেদনার আভাস। বলল, 'সাংঘাতিক মেয়ে মশাই। চিতাবাঘিনীর মত। চলে ডালে ডালে, পাতায় পাতায়। দৈনিক এমনি মেয়ে পুরুষ কত ধরা পড়ছে জানেন? পঞ্চাশ ষাট তো বটেই। এক শো জনও হয়। সারা মেলায় সব ওৎ পেতে আছে। একটু অসাবধান হয়েছেন তো, গেল।'

তারপর একেবারে অ-সন্ন্যাসী জনোচিত হেসে বলল, 'ভাল লোককেই পাকড়েছিল।' বলে একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে চলে গেল। কি ভাগ্যি, প্রহ্লাদ কিংবা পাঁচুগোপাল নেই। তা'হলে সমালোচনার ভাষা আর একটু সরস হত নিঃসন্দেহে।

ধন্য সর্বনাশী। কুসির সর্বনাশী। তাড়াতাড়ি ফিরতে গেলাম তাঁবুর দিকে। কলের দিকে যাওয়ার দুঃসাহস আর হল না। ফিরতে গিয়ে থামলাম।

সামনে শুধু দুটি অতিকায় মুগ্ধ চোখ। পথরোধ করেছে একটি মহিলা। ঘাড় হেলিয়ে তাকিয়ে রয়েছে মুখের দিকে। চোখে নজর কম। তাই, নজর চড়াতে গিয়ে ঠোঁট দুটি বেশ খানিকটা ফাঁক হয়ে গিয়েছে। চোখে মোটা লেন্সের চশমা। লেন্সের আড়ালে চোখ দুটি অস্বাভাবিক বড় হয়ে উঠেছে। বলিরেখা
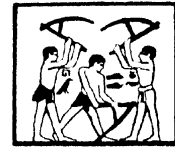
বহুল ফর্সা মুখ। মাথায় কাঁচা পাকা চুল। পাকা অংশ-ই বেশী। পরনে থান। ফিরতে গেলাম। বলল, 'দাঁড়াও বাবা।'

ঘর পোড়া গরুর চোখে সিঁদুরে মেঘ। দাঁড়ালাম। কি বলবে আবার। বললাম, 'কি বলছেন?' জবাব পেলাম না। দেখল খানিকক্ষণ অমনি করে। তারপর কোমল গলায় বলল, 'বেশ করেছ বাবা। দিয়েছ, বেশ করেছ। এখানে এসে দেবে না তো, কোথায় দেবে? আর, দিয়ে আনন্দ ভোগ করে ক'জনা?'

অবাক হলাম। চকিতে মনটিও উঠল ভরে নতুন আবেশে। চারদিকে এত সন্দেহ ও ভর্ৎসনা, নিজের দুঃখ ও বিদ্রূপ হাসির মধ্যে গুটিয়ে ছিল মনের পাপড়ি। সে যেন নতুন রসে, হাওয়া ও রৌদ্রে মেলে দিল দল। কলঙ্কে লাগল গৌরবের স্পর্শ। মুখ ফুটে বলতে পারলাম না কিছু।

সে আবার বলল, 'যে দিতে পারে না, তার চেয়ে দুঃখী এ সংসারে কে আছে বল তো বাবা?'

বলে সে তাকাল, লেন্সের আড়ালে তার সেই বিশাল দুটি চোখ মেলে। একটি লেন্স আবার ফাটা। দেখলাম তার সেই চোখ দুটি যেন জলভারে টলমল করছে। অথচ সপ্রশ্ন দৃষ্টি। সামান্য কথা, কিন্তু কি যে জবাব দেব, ভেবে পেলাম না।

বোধ হয় পান দোক্তা খায়। ঠোঁট দুটিতে লাল ছোপ। যৌবনে খুব সুন্দরী ছিল নিশ্চয়ই। আবার হেসে বলল, 'যে দেয়, সে-ই তো নেয়। সংসারে সবাই আসে দিতে। দিতে আর নিতে। আগে দেও পরে নেও, না কি বল বাবা, অ্যাঁ? মা ছেলেকে দেয়। আবার ছেলের কাছ থেকে হাত পেতে নেয়। বসুমতীকে তুমি দেও, মা বসুমতী তোমাকে দেবে ঘর ভরে। বিদ্বানে তো বিদ্যা দেয়। দেওয়ার চেয়ে সুখ কি আছে?'

মন ভরে উঠল সঙ্কোচে, আত্ম-ধিক্কারে। ভিখারিনীকে দু' আনা ভিক্ষে দিয়েছি। কিন্তু এত বড় দেওয়া, এত মস্ত দেওয়া তো দিইনি জীবনে কোনদিন। সংসারকে কিছু দেওয়া, সে তো আসল দেওয়া। সে দেওয়ার কাণাকড়িটি আছে কিনা নিজের কাছে, তা-ই জানিনে। দেব কি! যার আছে থলি ভরতি, সে দিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি ফিরছি শূন্য থলি নিয়ে। ভরব বলে। পাব বলে। পেলেও দিতে পারে ক'জনা? পাওয়ার গুমোরে মন যে ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে বসে থাকে।

কি কথার থেকে কি কথা! কোন দেওয়া থেকে কোন্ দেওয়ার কথা। একেবারে মাটি থেকে আকাশে। সীমা থেকে অসীমে। মন আপনি খাটো হয়ে এল। নুইয়ে এল মাথা।

সে আবার বলল, 'দেওয়ায় সুখ আছে, বড় ঘেন্নাও আছে বাবা। দিয়ে যার মাটিতে পা' পড়ে না। দিয়েছি তো মাথা কিনেছি। দ্যাখো, ক-ত্তো দিয়েছি। ওই হল ঘেন্না। আবার যার আছে, সে দিতে জানে না। দেওয়ার রীতি জানে না। সে বড় অভাগা। আমি তো এই বুঝি। তুমি কি বল বাবা, অ্যাঁ?'

কি বলব? চোখে তার সেই মুগ্ধ সপ্রশ্ন দৃষ্টি। একটু যেন আত্মভোলা। কণ্ঠে সেই কোমলতা। সকলের আড়ালে কোথায় দাঁড়িয়েছিল সে আমার দু' আনার দানকে গৌরবান্বিত করবে বলে। আমার কলঙ্ককে সম্মান দেবে বলে। তার নাম জানিনে, ধাম জানিনে। থুত্থুড়ে বুড়ি হলে মনে আসে ঠাক্‌মা দিদিমার কথা। সে তা' নয়। যেন খানিকটা মায়ের মত। কথা তার মায়ের চেয়েও বড়। তার গৌরবে ও সম্মানে যে আমি বাক্যহারা। কি বলব?

বললাম, 'যা বলেছেন, এর বাড়া আর কি বলব?'

সে তাড়াতাড়ি অসঙ্কোচে আমার হাত ধরে বলল, 'না না, অমন কথা বল' না বাবা। এখেনে এয়েছেন কত বামুন কায়েতের মা বো'য়েরা। আমার কথার বাড়া সংসারের সব কথা। ছোট কথাটিও। আমি গয়লার বেটি, গয়লার বেধবা। ছেলে আমার যা-ই বলুক, আমি গয়লার মা। লোকে আমাকে হিদে গয়লার মা বলে জানে।'

মনে মনে বললাম, জানুক। যে হিদে গয়লার-ই মা হোক সে, 'হিদয়ে' যার সর্বকিছু স'পে দেওয়ার অমন ব্যাকুলতা, তার চেয়ে হৃদয়বতী কে আছে। ভাবি, জানিনে হিদের মা কি দিয়ে কত দিয়েছে। কিন্তু যে অমনি করে বলতে পারে, সে দিতেও পারে। তার কথার বাড়া [illegible] কি কথা আছে।

হাত ধরা হয়ে রইলাম হিদের মা[illegible] নড়তে পারলাম না। ওদিকে [illegible] পারছি, খন-পিসীবাহিনী দেখছে [illegible] আদিখ্যেতা। তাদের মধ্যে ঘোর [illegible] আলোচনা চলছে এ নিয়ে।

তারপরে হিদের মা বলল, 'তোমা[illegible] বড় ভাল লাগছে বাবা। দিও বাবা, [illegible] চাইলে, থাকলে, অমনি দিও যত খুশি[illegible]'

বলে আবার জিজ্ঞেস করল, নাম [illegible] পরিচয়। জিজ্ঞেস করল, 'বাপ [illegible] আছে?'

বললাম, 'বাবা নেই।'

সে বলল, 'আহা, আসলটি [illegible] লোকে বলে, মায়ের চেয়ে বড় কিছু [illegible] কিন্তু আমি বলি, না। না বাবা। [illegible] থাকলে ছেলের মাথায় ছাদ থাকে। [illegible] মা যে কেউ নয়, কেউ নয়।'

ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে [illegible] 'তোমাকে বড় ভাল লাগছে বাবা। [illegible] মনের কথা বলি। বসবে?'

বসব? তাইতো, কেমন যেন [illegible] করছে। খন-পিসীবাহিনী না [illegible] ভাবছে। কিন্তু হিদের মাকে [illegible] করতে মন চাইল না। বসলাম [illegible] উপরে। বললাম, 'বলুন।'

সে বলল। বলল, 'বাবা, ঘরে [illegible] তাই বাইরে আসি। বাইরে এসে [illegible] আরও জ্বালা। অমনি ঘরে ছু[illegible] কোথা গেলে যে দু' দণ্ড শান্তি [illegible] ঘর বার আমার সমান হয়ে গেছে। [illegible] লোকে আমাকে বলে হিদের মা। [illegible] হিদে আমাকে মা বলে ডাকে না।'

বলতে বলতে হাসি ও [illegible] বিচিত্রভাবে থর থর করে কেঁপে উঠল ঠোঁট। পুরু লেন্সের আড়ালে ভেসে উঠ[illegible] বিশাল চোখ দুটি।

প্রস্তুত ছিলাম না এমন কথা শোনবা[illegible] জন্য। বিস্মিত ব্যথায় চমকে উঠল মনটা[illegible] বললাম, 'কেন?'

সে বলল, 'আমি যে মায়ের মত [illegible] নই। আমি যে বউ কাট্‌কি, আমি [illegible] ছেলে ভোলানী, আমি যে ঝগড়ু[illegible] হিংসুটে, লাগানি, ভাঙ্গানি।'

জানি, এর মধ্যে আমার কোন কা[illegible]

নেই। তবু না বলে পারলাম না, 'কে বলে এসব কথা?'

সে বলল, 'যে বলার। যাদের বলার। নিজেও বলি। বলি, নইলে যে হিদে আমার হাতে ছাড়া খেত না, সে একবার ডেকে কথা বলে না। তবু আমি মুখপুড়ি এখনো এ হাত পুড়িয়ে খাই। হিদে আমার লেখাপড়া শিখেছে। কলকাতার আপিসে চাকরী করে। কিন্তু ঝি বলে দুটো পয়সা দেয় না। কেন? আমি যে তার মা নই।'

কিছু বলতে পারলাম না। জানিনে, হিদের কথা। জানিনে তাদের ঘরকন্না। কেন না পুত্র স্নেহ থেকে বঞ্চিত হিদের মা সব মিলিয়ে সেখানে কোন্ পরিবেশ, কতখানি অবিচার, কে জানে। তবু, হিদের মার জন্য মনটা ভার হয়ে উঠল।

নিজের মনেই অভিমান করে বলে উঠল সে, 'না-ই বা ডাকল, নাই-বা দিল। নিজে দুধে বেঁচে, খাই। আমার আছো তোমরা, আমার ভাবনা কি? এই তো চলে এসেছি। কে রাখছে তার খবর, কে দেখছে? ওকে হাতে করে না খাওয়ালে কি হয়েছে আমার?'

চোখের থেকে চশমা খুলে জল মুছল সে আঁচল দিয়ে। বলল, 'দিন রাত-ই বলি, মনে মনে বলি। তোমাকেও বললুম। বড় ভাল লাগল তোমাকে। আমাকে দু'চার আনা পয়সা দেবে বাবা?'

পয়সা? নিজের কানকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমার কাছে পয়সা চাইছে হিদের মা? বললাম, 'কি বলছেন?'

তেমনি বিশাল মুগ্ধ চোখ দুটি তুলে বলল, 'আমাকে দু'চার আনা পয়সা দেবে?'

আচমকা আক্রান্ত শামুকের শুঁড়ের মত মন গুটিয়ে গেল হঠাৎ। এত বলে শেষে পয়সা? জিজ্ঞেস করতে গেলাম, 'কেন?' কিন্তু পারলাম না। সেই উন্মুক্ত মুখ, সেই চোখ, তেমনি ঘাড় কাৎ করা সরল অভিব্যক্তি। ভাবান্তরের লক্ষণ নেই কোথাও। তবু সন্দেহে বিরক্তিতে সিঁটনো মন খাটো হয়ে গেল বড়। আমাদের ভদ্রতায়, শিক্ষায়, আলাপনে ভাবনায় চিন্তায়, আত্মসন্তুষ্টির যে বেড়খানি দিয়েছি বেড় দিয়ে জীবনের চারপাশে, তার বাইরে গেলেই আমরা পেছিয়ে আসি। দল মেলা মন আসে গুটিয়ে। গণ্ডিতে আমরা উদার। বাইরে অস্বাভাবিক।

অবকাশ নেই নিজের মন যাচাইয়ের। চিরাভ্যস্ত মন-চোখ আমার দেখল, হিদের মা'র ওই সারল্যের পেছনে যেন একটি বাঁকা হাসি রয়েছে উঁকি মেরে। এত যে দানের কথা, মিষ্টি কথা, তার পেছনে কি শুধু ওই দু' চার আনার অধ্যবসায়! ভাবলে নিজেকেই যেন খাটো লাগে। কলঙ্কে লাগল আমার দ্বিগুণ অপমানের স্পর্শ। হয়তো এখুনি না চেয়ে, দুদিন বাদে চাইলে এতখানি মনে লাগত না। দুদিন কেন, ওবেলা হলেও এতখানি মনে হত না বোধ হয়।

মনের ভাব গোপন করে বললাম, 'দোব। তাতে কি হয়েছে। দিচ্ছি, এখুনি দিচ্ছি।' ব'লে পকেটে হাত দিতে গেলাম। হিদের মা তাড়াতাড়ি হাত ধরে বলল, 'দিও'খন। তাড়া কিসের? পালিয়ে তো যাচ্ছ না।'

তা যাচ্ছি না। কিন্তু তাড়া আছে বৈ কি। হিদের মা'র কাছ থেকে চলে যাওয়ার তাড়া। সে আবার বলল, 'তোমার পকেটে ওটি কি বাবা? কলম? কি যে বলে ওটাকে? যাতে আপনি আপনি লেখা হয়?'

কলমে তার আবার কি প্রয়োজন? বললাম, 'হ্যাঁ, ফাউণ্টেন পেন।'

একটু বা অপ্রতিভ হেসে বলল সে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ফাউণ্টেন পেন। হিদে লেখে ওই দিয়ে। তা বাবা, আমাকে একখানা চিঠি লিখে দিতে হবে। দেবে তো?'

মন বিমুখ হয়ে উঠেছিল। তবু বললাম, 'দেব।'

হিদের মা তাড়াতাড়ি কোমরে গোঁজা আঁচল খুলে বার করল একটি কাগজ। ভাজ করা, দলা মোচড়া।

খুলতে দেখলাম, একটি দু' আনা পোস্টেজের খাম। আঁচলে তার হাল এমনি হয়েছে যেন কুড়িয়ে এনেছে কোথা থেকে।

উঠে দাঁড়িয়েছিলাম চলে যাওয়ার জন্য। কৌতূহল হল ভেবে, কাকে চিঠি দেবে হিদের মা। বললাম, 'কাকে লিখবেন?'

সে বলল, 'হিদেকে। একটু জানিয়ে দিই, কেমন ক'রে আমার হাড় জুড়োচ্ছে এখানে এসে। নইলে মনে আমার শান্তি পাবো না।'

তা বটে। যাকে যত বেশী দুঃখ দিতে প্রাণ চায়, তাকেই তো দিতে হয় সুখের সংবাদ। তবে হিদের মা'র চোখ দুটি অমন ভেসে উঠছে কেন।

তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেলাম। খন-পিসীবাহিনী তাকিয়ে দেখছে কট্-কট্ ক'রে। ওই দৃষ্টিতে দাহ্য শক্তি থাকলে পুড়ে মরতাম নিঃসন্দেহে। ভাবছি, যখন তারা জানবে, হিদের মা'কে পয়সা দিয়েছি, তখন যদি মুখের সামনে এসে তারা হাসে, তবে আর মুখ লুকোবার জায়গা পাব না।

হঠাৎ নজরে পড়ল ব্রজবালাকে। চোখে মুখে তার ক্রোধ ও শঙ্কা। এত লোকের মাঝে তাকাতে পারছে না। কিন্তু ভ্রূ জোড়া উঠেছে কপালে।

পেছনে আমার হিদের মা। তাঁবুতে এসে ব্যাগ খুলে কাগজ বার করছি।

পেছন থেকে ব্রজবালা এক ঘটি জল নিয়ে এসে দাঁড়াল। মুখ ধোয়ার জল।

জলের ঘটি নেওয়ার জন্য হাত বাড়াতেই শঙ্কিত গলায় ফিসফিস করে বললে ব্রজবালা, 'সেই কিপ্‌টে বুড়ি। খবোদ্দার, একটি পয়সা দিও না।'

বলে, ঘটি হস্তান্তরিত ক'রে চলে গেল। হাসি বিস্ময় ও দুঃখে আমার মনের এক বিচিত্র ভাব। সত্যি, ব্রজবালাই দেখছি আমার প্রকৃত সখী। এই কিপ্‌টে বুড়ির কথা, ওই সর্বনাশীর কথা, গতকাল তো সে আমাকে বলেছিল। আমারই মনে ছিল না।

মুখ ধুয়ে বসলাম কাগজ নিয়ে। বললাম, 'বলুন, কি লিখতে হবে?'

হিদের মা খামখানি দিয়ে বলল, 'আগে ঠিকেনা লেখো। লেখো, ছিরি হিদয়রাম ঘোষ।'

অর্থাৎ হৃদয়রাম ঘোষ। ঠিকানা লেখা হল। আবার বলল, 'এই আশ্রমের ঠিকানাটা চিঠিতে দেও। তাই দিলুম। তারপর বলল, 'লেখো, বাবাজীবন, হিদু বাবা—

ব'লে চুপ ক'রে রইল অনেকক্ষণ। বুঝলাম পাতা ভরতি ইতিহাস লিখতে হবে। এখনো একটু চা জোটেনি এই দারুণ শীতের সকালে। মন ছটফট করছে বেরুবার জন্য। আটকা পড়ে গেলাম। না, নতুন আশ্রমের সন্ধান করতে হবে দেখছি।

হিদের মা বলল, হঠাৎ, 'লিখেছ? এবার লেখো, তোর পায়ে পড়ি বাবা হিদে, নেদো, গোপাল, পারুল, সকলে মিলে কেমন আছিস, ধর্মত জানাস। ইতি তোর শত্তুর—মা।'

ব্যস্? একেবারে ইতি? সে কি? যার মুখের প'রে জানিয়ে দিতে হবে সুখের কথা, শেষে তারই একটু সংবাদের জন্য এত ব্যাকুলতা? বললাম, 'আর কিছু না?'

সে বলল, 'আর কি আছে বাবা? আমার কথা? পথে পথে, ঘাটে ঘাটে, ঠাকুরের দোরে দোরে বলেছি। না বললে ও যে শুনতে পায়, সে যখন শোনেনি, তখন চিঠিতে লিখে কি ফল পাব? লেখা বলা অনেক হয়েছে, আর থাক। ওই লিখে দেও।'

তাই দিলাম। লিখে দিলাম। কেবল কানের মধ্যে বেজে রইল হিদের মা'র ক্লান্ত ব্যথিত স্বর। সংসারে আছে কত সুখ দুঃখ। কত রূপে তা' কত করুণ ও বিচিত্র। ঘরে বাইরে, মনের গঠনে, সংসারের কাঠামোতে রয়েছে তার জড়। কখনো তার সমূহ শেষ দেখি কান্নাতে, কখনো হাসিতে। গতিবিধি তার মানুষের হৃদয় ও মনোজগতে। এর বিজ্ঞান আছে, কিন্তু সীমা নেই।

হিদের মা ঠাকুরের দোরে দোরে বলেছে। তাঁর কানে না পেঁছুক, সে বলা যদি হিদের কানেও পেঁছুত, হিদের মা'র ঘরে থাকত অমৃত কুম্ভ। হাহাকার ক'রে ছুটে আসত না এখানে। কিন্তু ওই-খানে যে সব গণ্ডগোল। সোজা পথ তো সোজা নয়। কখন সে বাঁক নিয়ে নতুন দিকে মোড় ফিরেছে, অচিন পথিক তার কি জানে।

চিঠি লিখে দিয়ে পকেটে হাত দিলাম। বিমুখ মন খানিকটা ভিজে উঠেছিল। পকেটে দু' আনা আছে, চার আনাও আছে। পথের কড়ি, হাত দিলেই হিসাব করতে মন যায়। জানিনে, ভিক্ষে করা হিদের মা'র অভ্যাস কি না। তবু, একটি টাকা তুলে দিলাম তার হাতে। অস্বীকার করব না, মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ করুণা ও অনুগ্রহের ছোঁয়া লেগেছে। কিন্তু না দিলে মন তৃপ্ত হ'ত না।

হিদের মা চোখ তুলে বলল, 'পুরো একটি টাকা দিলে বাবা?'

বললাম, 'হ্যাঁ। তাতে কি হয়েছে।'

হিদের মা আঁচলে বেঁধে বলল, 'বেশ। সকলের কাছে তো চাইনে। যার কাছে মন চায়। বড় অল্প পুঁজি আমার। বড় ভয় করে, তাই আগে থেকেই সামলে চলি।'

আশ্চর্য! এত সামলা সামলি হিদের মায়ের। তবু দেওয়ার কথায় পঞ্চমুখ সে।

কিন্তু আর দেরী নয়। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে আসতেই, ব্রজ-বালা। মুখ ভার করে তাকিয়ে রয়েছে আকাশের দিকে। মাথায় অর্ধেক ঘোমটা। ও! হিদের মা'কে টাকা দিয়েছি বলে রাগ হয়েছে তার। হতেই পারে। সে যে আমার সত্যি সখী। পেছনে আমার হিদের মা। দৃপ্ত ক্রুদ্ধ চোখে তার দিকে তাকাল ব্রজ-বালা। আমি হাসি গোপন করে চলতে উদ্যত হলাম।

ব্রজবালা বলল, 'দি'মা তোমাকে খেয়ে বেরুতে বলেছে।'

'এখুনি?'

'হ্যাঁ। আমরা আজ বেরুব।'

খুবই রাগ করেছে ব্রজ। বললাম 'ফিরে আসি, তারপর খাব।'

সে বলল, 'আমরা এখুনি বেরিয়ে যাব। দেরি হলে, তোমার খাবার ঢাকা দেওয়া থাকবে তাঁবুতে।'

হেসে বললাম, 'তথাস্তু।' মনে মনে বুঝলাম, ব্রজর রাগ বাগ মানল না তাতে।

এমন সময় হিদের মা চেঁচিয়ে উঠল 'বউ মা। অ বউ মা।'

বলতে বলতে ছুটে গেল গেটের দিকে। অমনি ব্রজ আমার কাছে ছুটে এসে বলল, 'ওই যে, ওই সে ই।'

'সে-ই? সেই কে?'

কোথায় ব্রজর রাগ। বয়স কা কোথায়। সে চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'সেই গো, সেই বউটা। সোয়ামী যার সাধু হয়ে বেরিয়ে গেছে। সেই বউ। সঙ্গে ও লোকটা ওর দেওর।'

ও! মনে পড়েছে। স্বামী সন্ধানে বউ। তাকিয়ে দেখলাম। দীর্ঘাঙ্গী এ মহিলা। ফর্সা রং। বেশভূষায় আধুনিকা নীল শাড়ির উপরে হাল্‌কা গোলাপী রং-এর লেডিজ কোট। ঘোমটা নেমে পড়েছে ঘাড়ের কাছে। তাকিয়েছে এই দিকে। সকালের সূর্যালোকে ঝক্‌ঝক্‌ করছে কপালের ও সিঁথির সিঁদুর। পাশে একটি ভদ্রলোক, যুবক। স্বাস্থ্যবান। গায়ে অলেস্টার, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা মুখে হাসি। হেসে যেন কি বলে মহিলাটিকে। দাঁড়িয়েছিল হিদের মা জন্য। তারপর তিনজনে মিশে গে জনারণ্যে।

ব্রজ বলল, 'ওদের দুটিকে বেশ দেখা না?'

সত্যি দেখায়। ঠিক কথাটি দেখা বয়স মানে না। কেন বলল ব্রজ, কে জানে মনে মনে ভাবলাম, দেখায় হয় তো, মান কি না কে জানে। মানানো যে আলাদা কিন্তু, হিদের মা দেখছি ভারি ভ জমিয়ে নিয়েছে। (ক্রমশ

ছোট গল্প

বরফ সাহেবের মেয়ে—বিমল কর। টি কে ব্যানার্জী ; ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দু টাকা।

খুব সাম্প্রতিককালে বাংলা সাহিত্যের আসরে শক্তিমান যে কজন গল্প-লেখকের আগমন ঘটেছে, এবং আগমনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রচনা-রীতির বিশিষ্টতায় অত্যন্ত রুচি পাঠকের মনেও যাঁরা বেশ খানিকটা প্রশংস ঔৎসুক্য সঞ্চারে সমর্থ হয়েছেন, সংখ্যায় তাঁরা খুব বেশী নন। বিমল কর সেই গল্পলেখকদেরই অন্যতম। গল্পের ঘটনা-বিন্যাসে, ঘটনার মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপনে, পরিবেশ রচনায়, সংলাপ বয়নে এবং চরিত্র সৃষ্টিতে ইতিমধ্যেই যে দক্ষতার তিনি পরিচয় দিয়েছেন তা বড় সামান্য নয়, সেইসঙ্গে তাঁর অন্তর্দৃষ্টিও অসামান্য। তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেই সেই সূতীক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির স্বাক্ষর রয়েছে। শিল্পী হিসেবে তিনি সহানুভূতিশীল। এই সহানুভূতির উৎস যদি শুকিয়ে না যায় এবং আপন শিল্পধর্মে যদি না তাঁর কোনো অভাব ঘটে তো অনতিকালের মধ্যেই যে তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ আসন অধিকার করতে সমর্থ হবেন, এ সন্দেহ করবার কোনও কারণ নেই।

'বরফ সাহেবের মেয়ে' তাঁর গল্পগ্রন্থ। মোট চারটি গল্প এই গ্রন্থখানিতে সংকলিত হয়েছে: 'পিয়ারীলাল বার্জ', 'ইঁদুর', 'বরফ সাহেবের মেয়ে' আর 'মানবপুত্র'। পরিবেশের বৈচিত্র্যে এবং বক্তব্যের পার্থক্যে চারটি গল্পই স্বতন্ত্র, কারো সঙ্গে কারো কোথাও মিল নেই বললাম, কিন্তু আছে। মনোযোগী পাঠক মাত্রেই সেটা বুঝতে পারবেন। বুঝতে পারবেন যে, এই গল্পচতুষ্টয়ের বহিরঙ্গের আড়ালে নিত্যকালীন আনন্দ-বেদনার যে প্রায়-অদৃশ্য স্রোতোধারা প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে, তারই ভিতর মধ্যে একটি মহৎ ঐক্য বিদ্যমান। গল্পগুলির যা কিছু তাৎপর্য, তা সেই ঐক্যসূত্রের মধ্যেই বিধৃত হয়ে রয়েছে।

এ-বইয়ের সব কটি গল্পই ভালো লাগবার মতো, তার মধ্যে আবার বিন্যাসের সূক্ষ্মতায় 'ইঁদুর' গল্পটিই আমাদের সবচাইতে ভালো লেগেছে। গল্পের শেষাংশে অল্প কয়েকটি কথার মধ্য দিয়ে সমগ্র কাহিনীর উপরে লেখক যে-একটি সুগভীর ব্যঞ্জনার স্পর্শ লাগিয়ে দিয়েছেন, তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে হয়। গল্পটির সংলাপ-চাতুর্যও উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া লেখক এখানে যে সুন্দর পরিমিতি-বোধের পরিচয় দিয়েছেন, তারই গুণে বক্তব্যের সীমানা কোথাও নষ্ট হয়নি। অন্যান্য গল্পগুলিও সুন্দর, পরিচ্ছন্ন; একাধিকবার পড়বার মতো, এবং পড়ে মুগ্ধ হবার মতো।

গ্রন্থখানির মুদ্রণ এবং অঙ্গসজ্জা পরিপাটি। শিল্পী শ্রীঅহিভূষণ মালিকের আঁকা প্রচ্ছদ-পটটিও বেশ সুন্দর হয়েছে। ২৮।৫৪

উপন্যাস

বিবাহিতা স্ত্রী—প্রতিভা বসু; নাভানা ৪৭, গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ। সাড়ে তিন টাকা।

মেয়েদের মধ্যে যাঁরা ভালো উপন্যাস ও গল্প লেখেন বলে অধুনা খ্যাতি পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রতিভা বসুর স্থান নিঃসংশয়েই বিশিষ্ট। সাহসে, বলিষ্ঠতায়, চরিত্র-চিত্রণে ও ভাষা-সৌকর্যে আধুনিক অপরাপর মহিলা ঔপন্যাসিকদের তিনি অন্যতমা। অনায়াসে গল্প টেনে নিয়ে যাওয়ার গুপ্তমন্ত্র যে এঁর ভালো-ভাবেই জানা আছে সেটা এই উপন্যাসখানি পড়লেই বোঝা যায়। উপন্যাস লিখে সফল হবার পক্ষে কথকতার ক্ষমতাই অপরিহার্য ক্ষমতা—এর অভাব অন্য কিছু দিয়েই পুরিয়ে নেওয়া যায় না। সেই দুর্লভ ক্ষমতাই এঁর পুরোমাত্রায় আছে আর আছে অভিজ্ঞতা—মেয়ে মনের অন্ধি-সন্ধিগুলো সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। সুখের বিষয় মাধুর্যই এঁর রচনার শেষ কথা নয়—ইনি আরো গভীরে যেতে প্রয়াস পান এবং সফলও হন। ভাষাশিল্পে বুদ্ধদেবের প্রভাব অত্যন্ত প্রস্ফুট থাকা সত্ত্বেও এমন সংযমেরও পরিচয় লেখিকা দিয়েছেন যা বুদ্ধদেবে অনুপস্থিত। সেটুকু লেখিকারই স্বকীয়তা—তাঁর এই ন্যায্য পাওনাটুকু থেকে কেউই তাঁকে বঞ্চিত করতে পারে না।

বইয়ের গল্পাংশ সংক্ষেপে এই : অবিমিশ্র খারাপের প্রতীক হ'লো যজ্ঞেশ্বর কনট্রাকটর—এমন কোনো দুষ্কর্ম নেই যা এই লোকটা সম্পর্কে কল্পনা করা যায় না। তার মেয়ে প্রমীলা পিতার আদর্শে হ'য়ে উঠলো বাপেরই মতো এমন কি বাপের ওপরেও টেক্কা দেবার মতো। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী নিয়তির চক্রান্তে এবং সরলহৃদয় রাজেনবাবুর বধূ-নির্বাচন-প্রমাদের রন্ধ্র দিয়ে তাঁর শিক্ষিত, ভদ্র রুচি-সম্পন্ন পুত্রের বধূরূপে তাঁর বাড়ি প্রবেশ করলো প্রমীলা। তারপর থেকেই অমন সুখের সংসার অশান্তির ভারে ভেঙে তচনচ হ'য়ে গেলো। নির্মম অদৃষ্টের কাছেই আত্ম-সমর্পণ করতে হ'লো স্বামী সুনির্মলকে। সুনির্মল ভালোবাসতো শকুন্তলাকে, কিন্তু সেই দ্বিধায় অভিশপ্ত সংকল্পবর্জিত ও ভীরু ভালোবাসা তার জন্য নতুন কোনো ভাগ্য রচনা করতে পারলো না। দুঃখ হয় শকুন্তলার জন্য, সুনির্মলের মাতা হিরন্ময়ীর জন্য ও সুনির্মলের শ্বশ্রূ সুধাময়ীর জন্য—আমাদের চারপাশেই এদের নিত্যই দেখি আমরা। নায়ক সুনির্মল, শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, অতি ভদ্র অথচ এমনই নির্বীর্য ও মেরুদণ্ড-হীন যে, অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্য কোনো সমাধান সে খুঁজে পেলো না। এমন কি রাজেনবাবুর ও হিরন্ময়ীর মৃত্যুর পরও যখন সব-কিছু বাধা-বন্ধন খ'সে গেলো তখনো সে দ্বিধা কাটিয়ে এসে দাঁড়াতে পারলো না শকুন্তলার পাশে। কেনই বা এমন হবে, এটাই স্বাভাবিক কি না, এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে বটে, কিন্তু যা হ'য়েছে সেটাই বড়ো কথা। অন্য রকম অবশ্যই হ'তে পারতো, কিন্তু সেটার বিচার আমাদের আয়ত্তের বাইরে। তবে কথা হচ্ছে যে, শেষের দিকে পাঠকের অতৃপ্তি জেগে থাকে। বিশেষ করে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রূপটা যা ছিলো তার চেয়ে শেষাংশ অনেক বেশি সহনযোগ্য হ'য়েছে এবার বইয়ের মধ্যে। লোক সাক্ষী রেখে প্রমীলা অনুগত স্বামীর কোঁচার খুঁটের সঙ্গে নিজের আঁচলের গাটছড়া বেঁধে নতুন বাড়িতে 'গৃহপ্রবেশ' করলো—তারই বিবরণটা যে লেখিকা সারাংশ লিখনের পদ্ধতিতে শেষে জুড়ে দিয়েছিলেন বই করার সময়ে সেটুকু বাদ দিয়ে খানিকটা শেষরক্ষা হয়েছে। নইলে নায়ক-চরিত্রটা নিতান্ত অযৌক্তিকভাবেই আরো খেলো হ'য়ে যেতো।

রাজেনবাবুকে শেষ করতে লেখিকা দুর্ঘটনার দেবীর শরণ নিয়েছেন। দুর্ঘটনা বা আত্মহত্যা ইত্যাদির শরণ নেওয়া অনিবার্য-ভাবেই গল্পাংশকে দুর্বল করে। এখানে রাজেনবাবুর মৃত্যুটা সাধারণের প্রতীতিযোগ্য

সচরাচর দুর্ঘটনাও নয়, বড়ো অভিনবভাবেই আপতিক। সেজন্য পাঠকের মনে এটার প্রতীতি-জনন-ক্ষমতাও কম। ট্রামে বসে থাকাকালীন অন্য ট্রাকের লোহার শিকে গেঁথে যাওয়ার গল্প আশানুরূপ বিশ্বাসজননক্ষম হয় না।

স্থানে স্থানে ভাষা প্রদেশিকতাদুষ্ট এবং কথ্য বাংলার ইডিয়মগুলোর সর্বত্র ঠিকমতো ব্যবহারও হয়নি। যেমন 'গা চুট্‌মুট্‌ করে' 'ধাতানি' 'উড়াল দিল' 'ধানাই পানাই' 'উঁষ্টি গুষ্টি' 'উথাল-পাথাল' ইত্যাদি অনেক শব্দেরই অর্থ অধিকাংশ লোকের জানা নেই এবং এগুলো অভিধানেও প্রাপ্তব্য নয়। সুতরাং এগুলো বিশুদ্ধ কথ্যভাষার মধ্যে ব্যবহার্য নয়। তবে অবশ্য বিশেষ কোনো পূর্ববঙ্গীয় চরিত্রের মুখে সংলাপের মধ্যে দিলে হয়তো বা এগুলো মানিয়ে যেতে পারতো। স্থান-বিশেষের চরিত্রের মুখে তদ্দেশীয় ভাষা ব্যবহার অনেকেই খুব সুন্দরভাবে করেছেন। দীনবন্ধু মিত্র থেকে শুরু ক'রে শ্রীযুক্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও তৎপ্রমুখ অনেক সাহিত্যিকই এ কাজ বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গেই করেছেন এবং সেটা মানিয়েও গেছে; কেননা, সেটা একেবারে আদি ও অকৃত্রিম ছিলো এবং চরিত্রগুলোর প্রাণ সঞ্চার করার পক্ষে অপরিহার্যও ছিলো। কিন্তু এক্ষেত্রে সে-রকম কোনো উদ্দেশ্য অনুপস্থিত, সেজন্য বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, অনবধান-বশতই হোক বা কথ্যভাষার ওপর দখলের অভাববশতই হোক এ রকম ভেজালটা ঘটেছে। ভেজাল জিনিসটা কৃত্রিম ব'লেই সয় না, মেকি ব'লেই আদরের নয়।

বইখানা সত্যিই ভালো ও রীতিমতো উল্লেখ্য ব'লেই এর দোষ-ত্রুটিগুলো দেখতে চেষ্টা করলুম, নইলে সে শ্রম স্বীকার করতুম না। আরো ত্রুটি আছে, কিন্তু ত্রুটির তুলনায় সাফল্য এতখানিই বেশি যে, ত্রুটি-গুলো চোখ এড়িয়ে যাবে এবং আগাগোড়া এক নিশ্বাসে প'ড়ে ফেলা যাবে আর প'ড়ে মনে হ'বেই যে, এই উপন্যাসখানার মধ্যে গল্প আছে আর সে-গল্পের মধ্যে গতি আছে আর সে-গতির মধ্যেও সংযম আছে। এমন কি গল্পের গতিশীলতায় বিস্ময় লাগবে, প্রাণবন্ত চরিত্র-চিত্রণ মনকে নাড়া দেবে, ভাষার সংযত সুষমা মুগ্ধ করবে। আশা করি, রুচি-সম্পন্ন পাঠকের কাছে বইটা সমাদর পাবেই। এই সংস্করণটির শোভনতার জন্য 'নাভানা'র কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদভাজন। ১৯০।৫৪

আকাশ পাতাল (দ্বিতীয় পর্ব)—প্রাণতোষ ঘটক; ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ। ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য—পাঁচ টাকা বারো আনা।

এ কলকাতার চেহারাই আলাদা। অপচয়ের যুগ। দু হাতে ছড়িয়ে ছিটিয়েও শেষ হয় না। মুঠো মুঠো টাকাই শুধু নয়, মুঠো মুঠো যৌবন। ঘোড়ায় টানা ট্রাম, ঢিমে তেতালায় পাল্কীর দোলন, জীবনের গতিও এমনি শ্লথ। কিংখাবের তাকিয়া ঠেস দিয়ে তিল তিল করে উপভোগ করা। ঢিলে ঢালা মহার্ঘ পোশাক, সারা গায়ে মীনমুক্তার ছিটে, বেলোয়ারী কাচের ঠুং ঠাং ছন্দের তালে তালে সুরা আর নারীর উৎসব। কলকাতার আকাশে প্রমোদের রোশনাই।

প্রাচুর্যের পরিপ্রেক্ষিতে ধনীর দুলালের জীবনায়ন। ধীরে ধীরে অন্ধকারে নামার কাহিনী। প্রথম পর্বে যে সর্বনাশের শুরু হয়েছিলো, দ্বিতীয় পর্বে তারই শোচনীয় পরিসমাপ্তি। শহরের ছোট ছোট আকা-বাঁকা গলি-ঘুজিতে লুকিয়ে থাকা অন্ধকারের মতন, সাতমহল বাড়ীর অন্তঃস্তলে গুমরে গুমরে মরা এক হৃদয়ের নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার উপাখ্যান।

অসংখ্য ঘটনা, অসংখ্য চরিত্র, মালা গাঁথার অজস্র উপকরণ। বাণিজ্যিক সভ্যতার পদ-ক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবনের আমূল পরিবর্তন, এই যুগসন্ধিক্ষণের পটভূমিকায় বিরাট ইতিহাস রচিত হতে পারতো। সামন্ততান্ত্রিক শ্মশানভূমিতে জীবনের নতুন মূল্যবোধের, নতুন সংস্কৃতির আকাশচুম্বী সৌধ। কিন্তু গ্রন্থকারের লেখনী তিমিরাকীর্ণ রাত্রির ছবি এঁকেছে, পূর্ব দিগন্তের সূর্যোদয়কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। পঙ্কিল পরিবেশের ঊর্ধ্বে ওঠার চেষ্টা নয়, তার কাছেই আত্মসমর্পণ।

এই বিয়োগান্ত কাহিনীর নায়ক কৃষ্ণ-কিশোর, নায়িকা বারবিলাসিনী গহরজান। অগ্নি আর হুতাশনের মতন দুইয়ের মিলনে মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা। তিল তিল করে কৃষ্ণকিশোরের সর্বনাশের অতলে তলিয়ে যাওয়ার কাহিনী, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অপরূপ হয়ে ফুটেছে। মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার সামান্য চেষ্টা, সাধ্বী স্ত্রী আর রূপসী বাঈজীর মধ্যে তাঁতের ম মতন ওঠানামা সব কিছুই [illegible] উজ্জ্বল।

উপন্যাস ঘটনাবলীর বিবৃতিই ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে চরিত্রের পরিস্ফুট কাহিনী। কৃষ্ণকিশোর নায়ক, কিন্তু নায়কো গুণের অধিকারী নয়। দুর্বৃত্তোর [illegible] পরায়ণ। সূর্যের আলোয় মাথা তুলে দাঁড়া সবল প্রচেষ্টা নয়, অন্ধকার বিবরে লুকানোর প্রয়াস। দেশত্যাগিনী মার বিল সাধ্বী পত্নীর কাতরোক্তি, হিতৈষীদের উপ সব কিছু উপেক্ষা করে ধাপে ধাপে অধঃপত পথে অবতরণ। এই নিচে নামার কাহি পাশাপাশি হতভাগিনী রাজেশ্বরীর বেদনা দীর্ঘশ্বাস পাঠকদের বুক কাঁপিয়ে তো কিন্তু এইটুকুই। নায়কের প্রতি বি অন্তঃপুরচারিণীর প্রতি সমবেদনা এই হয়। মনে হয়, সে যুগের হাজার হা অধঃপতিত লম্পটের প্রতীক কৃষ্ণকিশে সে যুগের অজস্র বঞ্চিতা বধূর মুখপ রাজেশ্বরী। তার বেশী কিছু নয়।

উপন্যাসের প্রধান ধর্ম চরিত্রগত কিন্তু অন্যথায় উপন্যাসের পরিণতি হয় ছোট গল্প বৃহত্তর সংস্করণে। এ গ্রন্থে দ্বন্দ্বস অসংখ্য ঘটনার সমাবেশ, অজস্র চরিত্রে কিন্তু প্রায় সব কটিই মূল কাহিনীর সম্প বিগর্হিত। ফলে প্রতি পরিচ্ছেদে সার্থ ভালোলাগার আমেজ সৃষ্টি হয়েছে বি সংলাপ আর ঘাতপ্রতিঘাতের সূত্র ধরে কাহিনীকে এগিয়ে দেওয়ায় সাহায্য কর

এ উপন্যাসের উপজীব্য প্রাচীন কলকা বাবুকালচারের স্বরূপ। যেখানে যে উচ্ছৃঙ্খল জীবনের আলেখ্য আঁকা হ সেখানে গ্রন্থকারের লেখনী নিখুঁত। অভি জীবনের অবসর আর অপচয়ের প্রতি সম্পূর্ণ। জমিদারী সেরেস্তার খুঁটিন সে যুগের অলংকার আর অলংকরণ, জামার বৈচিত্র্য, কোথাও ত্রুটি নেই। প্রা কলকাতার ধনী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা, রী নীতি, আচার-ব্যবহার সম্পর্কে গ্রন্থকার প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তা তাঁর অ পরিশ্রমেরই পরিচায়ক।

উপন্যাসের পরিণতি অপেক্ষা আকস্মিক। যে বিলম্বিত লয়ে কাহিনীর এগিয়ে চলছিলো কিঞ্চিৎ দ্রুততালে তার যবনিকা টানার চেষ্টা করা হয়েছে। কৃষ্ণকি বন্দুকের গুলীতে শুধু রাজেশ্বরীকেই উপন্যাসটির সমস্ত সম্ভাবনাকেও করেছে। ঠিক সেই কারণেই রাজেশ মুছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গল্পের গ মাঝপথে থেমে গেছে। আচমকা টানার মত।

তবু এ ধরনের কাহিনীরও সার্থ আছে। বর্তমানকে অতীত থেকে বিচ্

...র দেখা সম্ভব নয়। কাল অবিচ্ছিন্ন। ...ধু আমাদের সুবিধার জন্যই তাকে খণ্ডিত ...া হয়। আজকের কলকাতা, সাম্প্রতিক ...নীতি মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী সব ...ছুর পরিমাপ চলে অতীত কালের পরি-প্রেক্ষিতে। বিবর্তনের স্বরূপ ধরা পড়ে ...রোকালের অস্বচ্ছ মুকুরে। 'আকাশ পাতাল' ...যুগের অভিজাত সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলতার ...ল, বিবেকবর্জিত নারী-নির্যাতনের ...চুর আলেখ্য।

...ভাষার স্বচ্ছন্দ গতি গ্রন্থটির অতিরিক্ত আকর্ষণ। ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদচিত্রণ প্রথম শ্রেণীর। ১২৮।৫৪

এগারোই ফাল্গুন—শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, নর্দার্ন বুক ক্লাব, ৬৭।বি [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা—৭, দাম দুই টাকা।

মহাজাতি—শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। [illegible] প্রেস, ১৬৯, ১৬৯।১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম সাড়ে তিন টাকা।

'এগারোই ফাল্গুন' ও 'মহাজাতি'র লেখক হরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যক্ষেত্রে [illegible]। ইঁহার রচিত 'নূরজাহাঁ', 'পৃথিবী' [illegible] সাধারণ পাঠকের মনোহরণ করিয়া [illegible] সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থ দুইটির একটি—[illegible] ইঁহার অদ্যতম উপন্যাস।...... 'এগারোই ফাল্গুন' নতুন টেকনিকে লেখা স্বল্প [illegible] উপন্যাস। প্রধানত একটি প্রেম ও [illegible] সুরে উপন্যাসটিকে ভরিয়া রাখিয়াছে। [illegible] উপন্যাসে খুব বেশি বৈচিত্র্য না [illegible] ইহা ঠিক মামুলী গল্পাংশকে ভিত্তি [illegible] রচিত নয়। বিশেষত, নতুন টেকনিকের [illegible] লওয়ায় এফেক্ট ভালই হইয়াছে। লেখকের ভাষা জোরালো। মনভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি অল্পবিস্তর ভাবাবেগ-আশ্রিত হইলেও সংলাপ রচনার বলিষ্ঠতার প্রশংসা করিতে হয়। গ্রন্থের নায়িকা কমলার চরিত্রটি [illegible] সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহিম চরিত্রও ভাল লাগিল। পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হইতেই অনুমান করা যায় পাঠকসমাজে ইহা আদৃত হইয়াছে।

মহাজাতির পটভূমিকা বিস্তৃত। বিগত [illegible]দের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিগত জীবনে যে তরঙ্গ জাগিয়াছিল লেখক তাহারই পরিচয় দিতে চাহিয়াছেন। মূলত ইহার কাহিনী রাজনৈতিক এবং সে দিক দিয়া বিচার করিলে মহাজাতির আবেদন যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাহা নিঃসন্দেহেই স্বীকার করিতে হয়। আরও উল্লেখযোগ্য যে, নিছক রাজনীতি না হইয়া [illegible]বোধিত হৃদয়বৃত্তির সুসামঞ্জস্যপূর্ণ [illegible]শ্রণে মহাজাতির আবেদন যথার্থ সাহিত্যের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। লেখকের ভাষা [illegible] ও বলিষ্ঠ। উপন্যাসের চরিত্রগুলি সুপরিকল্পিত। বিশেষত শংকর, কল্যাণী ও বাসন্তী মনে গভীর রেখাপাত করে। পল্লী অঞ্চলের চিত্রে একটি বিক্ষুব্ধ ও ব্যথিত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের সংবেদন ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে মহাজাতি প্রকৃতপক্ষে হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস হিসাবে সফল হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই উপন্যাসের সকল চরিত্র বা কাহিনীর সর্বাঙ্গীন বিন্যাস ত্রুটি-শূন্য নহে, তথাপি ত্রুটি অপেক্ষা মহাজাতির পূর্ণতা অনেক বেশি প্রশংসার যোগ্য। বইয়ের ছাপা, বাঁধাই মন্দ নয়। ১১১।৫৪, ২৪৬।৫৪

অনির্বাণ—রামপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। নবভারত পাবলিশার্স, ১৫৩।১, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৩॥০ টাকা।

মানুষের এই যে জীবন কি ইহার উদ্দেশ্য? সাধারণ দৃষ্টিতে আমাদের দৈনন্দিন বাঁধা জীবনের খুঁটিনাটি বিচার করিয়া ইহার সুস্পষ্ট কোন সমাধান পাওয়া যায় না। দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ভিতর দিয়া আমাদের জীবনটা যে কোন রকমে জোড়াতালি দিয়া কাজ চালাইয়া যাওয়ারই ব্যাপার। বস্তুত ধর্ম, নীতি, ন্যায়, আমাদের বাস্তব-জীবনে এগুলির কোন মূল্য আছে কিনা এ সম্বন্ধে সন্দেহ! প্রকৃতে ঐগুলি না মানিয়া যাহারা চলে, সমাজজীবনে তাহাদের উন্নতি, সুখসুবিধা এবং স্বাচ্ছন্দ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান সামাজিক প্রতিবেশে স্বার্থকেন্দ্রিক এই মনোভাবটি সমধিক পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে, নৈতিক আশ্রয়টি ভাঙিয়া পড়িতেছে। কিন্তু এই অবস্থা সত্ত্বেও সমাজ-জীবনের গভীরদেশে নৈতিক চেতনার একটি ধারা বহিয়া চলিতেছে এবং সমাজের একটি বিশেষ অংশ সেই চেতনার আকর্ষণকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইতেছে না। তাহাদের উপর প্রতিকূল প্রতিবেশের চাপ আসিয়া পড়িতেছে। তথাপি আঘাতের উপর আঘাতে নিপীড়িত পিষ্ট এই মানুষের দল তবু পথ করিয়া চলিতে চাহিতেছে। ইহারা প্রধানত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক। ইহারা যেন ফাঁদে পড়িতেছে। ভিতরের যে আকর্ষণ তাহা অনির্বাণ। সে আকর্ষণ সময়ে সময়ে শিথিল হইয়াও আবার জাগিতেছে। রামপদবাবু আলোচ্য উপন্যাসখানিতে এই শ্রেণীর মানুষদের মনোধর্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার এই বিশ্লেষণ-ভঙ্গীর কারিগরী খুবই সূক্ষ্ম, মানুষের মনের অন্তর্গূঢ় চেতনাটি ব্যক্ত করিতে এবং অনুভাবনাকে ব্যঞ্জনা দিতে শিল্পিমনের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

দরিদ্র মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলে প্রভাত এই উপন্যাসের নায়ক। জীবনে উচ্চ আদর্শের স্বপন সে দেখে। দেশের কাজ, সাহিত্যসাধনা, কালোবাজারী দুর্নীতির উচ্ছেদ প্রভৃতিতে প্রভাত আর তাহার সঙ্গী মাতিয়া আছে। প্রভাতের পিতার ইচ্ছা বি এ পাশ করিয়া সে চাকুরি নেয়। সাংসারিক নিদারুণ অর্থ-কৃচ্ছ্রতা দূর করে। কিন্তু প্রভাতের মন তাহাতে কিছুতেই সাড়া দেয় না। প্রভাত আদর্শের নেশার ঝোঁকেই চলে, দুঃখ-কষ্ট ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া সে গতি। সাংসারিক দুর্দশা চরমে গিয়া উঠে। প্রভাতের পিতা মারা যান। শেষটা প্রভাতকে চাকুরি লইতেই হয়। দেশের লোকের মুখে হাসি ফুটাইবার যে স্বপ্নে সে বিভোর ছিল, পারিবারিক ক্ষুদ্রতর পরিপ্রেক্ষণায় জননী এবং ভগিনীর মুখের হাসি দেখিয়াই তাহাকে সে স্বপন সার্থক করিতে হয়। যে বাতি প্রভাতের অন্তরে জ্বলিয়াছিল, তাহা কি তবে নিভিল? না তাহা অনির্বাণ, এইটুকুই হইল আলোচ্য উপন্যাসখানির ইঙ্গিত। আপাত-প্রতীয়মান পরাজয়ের ভিতর দিয়া মানব মনের আকুতির অনির্বাণ দীপ্তি।

এই দীপ্তির আলোকরেখা রামপদবাবুর কয়েকটি নারী-চরিত্রের ভিতর দিয়া কোমল মধুর, প্রচুর বৈচিত্র্য বিস্তার করিয়াছে। নারীই সমাজ জীবনের শক্তিস্বরূপিনী। অতি সূক্ষ্ম কৌশলে লেখক নারীর এই মাধুরী লীলার ধারা উপন্যাসখানির আগাগোড়া বহাইয়া লইয়া গিয়াছেন। এই ধারাই পরাজয়ের গ্লানি হইতে নৈতিক চেতনাকে প্রখর রাখিতেছে। ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে সংকেতে সংকেতে স্নেহ-প্রীতি ছড়াইয়া মাখাইয়া মানবতার আদর্শকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছে। প্রভাতের ভগিনী লক্ষ্মী, কালোবাজারী অর্থে পরিস্ফীত অর্ধেন্দুশেখরের কন্যা দীপা, জমিদার ত্রিলোচন সেনের ভ্রাতুষ্পুত্রী সিপ্রা প্রভাতের চরিত্রের পটভূমিকায় এই তিনটি তরুণীর রঙ্গময় ভঙ্গী ঔপন্যাসিক রামপদবাবুর লেখনীতে অপূর্বভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই তিনটি তরুণীর চটুল খেলা আবার ভাবঘন স্বরূপে ঔজ্জ্বল্য

লাভ করিয়াছে ত্রিলোচন সেনের ভ্রাতৃবধূ সিপ্রার জননীর চরিত্রে। এই নারী-চরিত্রটি মানব-মনের অনির্বাণ মহিমার উজ্জীবনরসের সঞ্চারিণী মূর্তি বলা যাইতে পারে। সিপ্রার চরিত্রে এই শক্তি গূঢ়, দীপাতে অনেকটা অব্যক্ত, কিন্তু ইঙ্গিতপূর্ণ। লক্ষ্মীর চরিত্রে সর্মাধিক ব্যক্ত। জেঠাইমার মাতৃমাধুর্যে এই শক্তি পূর্ণ ঐশ্বর্যময়ী।

নির্বাণ হইবার নয়। দেবতার তপস্যা চলিতেছে। মানুষের অন্তরে থাকিয়া জীবন-দেবতা তপস্যা করিতেছেন। মানুষকে চলিতেই হইবে—অনির্বাণ সেই দেবতার তপ-প্রভাব তাহাকে আত্মদানে উদ্বুদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিবে, নূতন আলোকের সন্ধানে। নির্বাণ হইবে না সনাতন সত্যের জন্য মানুষের এই চিরন্তন আকূতি। প্রভাতের মনে নৈরাশ্য আসিয়াছিল। দুর্নীতির প্রতীয়মান পরিস্ফীতির গ্লানি তাহার মনে মরিচা ধরাইবার উপক্রম করিয়াছিল। সে দেওয়াল হইতে রবীন্দ্র, গান্ধী, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগরের ছবি নামাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহাকে শেষটা চাকুরী লইতেই হইল—এ কি পরাজয়! লক্ষ্মীর স্নিগ্ধ মুখের হাসিতে তাহার মনের আঁধার কাটিয়া গেল। সে দেখিল, লক্ষ্মী ছবিগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে। তাহার উদ্যমিত হস্তে আরতির বাতিতে চিত্র-ফলকগুলি ঝলকিয়া উঠিতেছে। প্রভাত এই সব মহাপুরুষদের মুখজ্যোতিতে কি জীবন-দেবতারই ইঙ্গিত পাইল, সে মনের মূলে অনুভব করিল রসধর্মের অনির্বাণ আপ্যায়ন—অন্ধকার হইতে জ্যোতির রাজ্যে অভিসারের আহবান। ২৯০।৫৪

রহস্যোপন্যাস

ওগো ছলনাময়ীঃ স্বপনকুমার; প্রকাশক—পর্ণ কুটীর, ৬, কামারপাড়া লেন, বরাহনগর, কলিকাতা। মূল্য—১৲।

হঠাৎ সাদাসিধে প্রচ্ছদপট ও ছাপা দেখে কোন বইকে বটতলার পর্যায়ে ফেলা কতখানি ঠিক ভেবে দেখবার বিষয়। অন্যপক্ষে চাকচিক্য প্রচ্ছদপটযুক্ত অন্তঃসারশূন্য পুস্তককে অনায়াসে 'বটতলার নভেল' আখ্যা দেওয়া চলে। আলোচ্য পুস্তকটি এই শেষোক্ত শ্রেণীর। কী যে এর প্রতিপাদ্য বিষয় তা একমাত্র লেখকের মনই জানে। নায়িকা অরূপার চরিত্র তো হেঁয়ালিপূর্ণ—অন্যান্যরাও তথৈবচ। ২৫২।৫৪

সন্ধ্যারাগঃ স্বপনকুমার; প্রকাশক—ভারতী পাবলিশার্স, ১০-এ, যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ, কলিকাতা—৫। মূল্য—১৷৷০।

আলোচ্য পুস্তকটির লেখকের সহজে ও সস্তায় বাহবা লাভ করবার মনোবৃত্তি লক্ষ্য করলাম। ঘটনা সংস্থান ও পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে একটা চমক সৃষ্টির প্রয়াস সর্বত্র প্রকট। লেখকের সমতা-জ্ঞান মোটেই নেই—মাঝে মাঝে আবোল-তাবোল পারিস্থিতির অবতারণা হাসির উদ্রেক করে। ভাষাটি কিন্তু চলনসই। ২৫৩।৫৪

স্বাধীনতার ইতিহাস

Beginning of Freedom Movement in Modern India—বিপিনচন্দ্র পাল। যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড, ৪১।এ, বলদেওপাড়া রোড, কলিকাতা—৬। মূল্য—১৷০ আনা।

পুস্তকখানির আলোচনা স্বর্গীয় বিপিন-চন্দ্র পাল কর্তৃক তাঁহার Memories of my life & time নামক সুবিখ্যাত জীবন-স্মৃতির দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা স্বরূপে লিখিত। সম্প্রতি ইহা স্বতন্ত্রভাবে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইয়াছে। ভারতের রাজনীতিক স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকা-স্বরূপে যে সব সামাজিক এবং ধর্মমূলক আন্দোলন কাজ করে আলোচ্য প্রবন্ধটিতে লেখক তাহার বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য সমাজ এবং থিওসফিক্যাল সোসাইটির তৎকালীন কর্ম-তৎপরতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনা এবং অবদানের তাৎপর্য বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। দীর্ঘ পরাধীনতার পর ভারতে জাতীয়তার চেতনা প্রথমটা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাবে, পরে তাহারই প্রতিক্রিয়ার আকারে কিভাবে উজ্জীবিত হইয়া উঠে বিপিন-চন্দ্রের প্রখর মনস্বিতার আলোকে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য সমাজ এবং থিওসফিক্যাল সোসাইটির আন্দোলন সর্বভারতীয় ভিত্তিতে হইলেও সমগ্র ভারতে রাজনীতিক আন্দোলনের চে[tail missing]
বাঙলা দেশ হইতেই প্রথমে অন্যত্র কিছু
হয়। বাঙ্গালীর প্রকৃতি এবং তাহা
সংস্কৃতির এক্ষেত্রে অনেকখানি ক
করিয়াছে, বিপিনচন্দ্র সে কথাটি ভাঁ
বলিয়াছেন। পুস্তকখানির পরিশিষ্ট-স্বরূ
সংযোজিত মন্তব্য প্রতিপাদ্য বিষয়টি সহ
ভাবে উপলব্ধি করিতে বিশেষভাবে সহ
করে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন
ঐতিহ্য সম্বন্ধে আগ্রহসম্পন্ন সমাজে এ
আলোচনা সর্বত্র সমাদর লাভ করিবে।
২৮৪।৫

ধর্মগ্রন্থ

শ্রীমদ্ভাবগতম—(শত শ্লোকী)—প্রাণকিশোর
গোস্বামী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—মানস, গ্র
কার্যালয়, ২৪।এ, দুর্গাচরণ মুখার্জী স্ট্রি
বাগবাজার, কলিকাতা। মূল্য—৷০ আনা

শ্রীমদ্ভাগবতের ১ শত শ্লোক নির্বা
করিয়া পুস্তিকাখানিতে সঙ্কলন করা হইয়া
এবং সেগুলির ভাবার্থ প্রদত্ত হইয়াছে।
শ্লোকগুলির উপর সমগ্র বৈষ্ণব-সিদ্ধা
প্রতিষ্ঠিত বলা চলে। সংগ্রহ মূল্যবা
ভাবার্থ সুন্দর। ২৭৭।৫

প্রাপ্তি-স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনা
আসিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুপ্রসাদে—অনন্তগোপাল সেনগু

বেণ-হুর—লুই ওয়ালেস্ অনুবাদ
কুমারেশ ঘোষ

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন—শচীন
চট্টোপাধ্যায়

**বিপ্লবী-পান্নালাল দাশগুপ্তের অপ্রকাশি
পত্রাবলী**—সুধাংশু ভট্টাচার্য কর্তৃক ৩৪
ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, কলিকাতা—৪ হই
প্রকাশিত।

গল্পের চেয়েও অদ্ভুত—শ্রীসৌরীন্দ্রমো
মুখোপাধ্যায়

ঝড়োপাতা—লিন উটঙ্ অনুবাদক
নির্মলকান্তি মুখোপাধ্যায়

মীরাবাঈ ভজনে মীরা জীবনী—শ্রীম
বিজন ঘোষ দস্তিদার

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা—প্র
মুখোপাধ্যায়

আয়ুর্বেদের ইতিহাস—শ্রীবিজয়ক
ভট্টাচার্য

হিন্দু নারীর আবেদন—শ্রীমতী কনক
ঘোষ

পঞ্চ-প্রদীপ—শ্রীরণজিৎ রায় চৌধুরী

রাজসূয়—স্টিফান জাইগ—অনুবা
শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

মিতার জন্য রোমাণ্টিক কবিতা—শা
কুমার ঘোষ

ভারতে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ব্যাধি

॥ অভিজিৎ ॥

এই পৃথিবীতে মানুষ নানারকম রোগে ভোগে। তার মধ্যে কয়েক-কার রোগ আছে যেগুলি পৃথিবীর হাওয়া অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে হয়; আর কয়েকপ্রকার রোগ আছে যাদের ল নির্দিষ্ট কোনো সীমানা নেই; সে রোগ পৃথিবীর সর্বত্র হতে পারে এবং যেমন যক্ষ্মা, টাইফয়েড অথবা বসন্ত দি।

পৃথিবীর মাঝখান দিয়ে চলে গেছে বুব রেখা, তার উত্তরে কিছু দূরে কট একটি ক্রান্তি রেখা আর দক্ষিণে ছু নীচে আছে মকর ক্রান্তি। উত্তরে কটি আর নীচে মকর ক্রান্তি এর মধ্যে অংশ তার নাম হল উষ্ণমন্ডল; সেই বোঝা যাচ্ছে যে এই অঞ্চলের গুলি বেশ গরম। এইসব গরম দেশে যেগুলি রোগ হয় যেগুলি সাধারণতঃ র কোনো দেশে হয় না। এইসব রোগ-গুলিকে চলতি কথায় ডাক্তারবাবুরা বলেন "ট্রপিক্যাল ডিজিজ"। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কুষ্ঠ, টাইফাস, ইয়োলো ফিভার প্লেগ, ডেঙ্গু, কলেরা, স্লিপিং সিকনেশ প্রভৃতি হ'ল ট্রপিক্যাল ডিজিজের উদাহরণ। এর মধ্যে কয়েকটি ব্যতীত সবগুলিই ভারতবর্ষে হয়। ব্যতিক্রম ল টাইফাস, ইয়োলো ফিভার এবং স্লিপিং সিকনেশ।

ম্যালেরিয়া

বলা বাহুল্য, ট্রপিক্যাল ডিজিজের মধ্যে প্রধান হ'ল ম্যালেরিয়া। ভারতে প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোক ম্যালেরিয়ায় মারা যায়। সকলেই জানেন . এনোফিলিস নামে স্ত্রী মশার দংশনে ম্যালেরিয়া হয়। অনেকের ধারণা যে, ম্যালেরিয়া জ্বর একবার ধরলে আর বুঝি ছাড়তে চায় না। কথাটা কিছু সত্য, কারণ অনেক সময় এই রোগ অনেকেই চিনতে পারেন না। কখনও সবিরাম জ্বর, কখনও অবিরাম, কখনও একদিন অন্তর, কখনও দু'দিন অন্তর, কখনও রোজ জ্বর আসে, কখনও জ্বর নেই। অনেক সময় কলেরা, আমাশয়, ব্রংকাইটিস অথবা নেফ্রাইটিসের মতো লক্ষণ দেখা দেয় অথচ এর প্রত্যেকটি ম্যালেরিয়া। রক্ত পরীক্ষা করে অবশ্য ম্যালেরিয়া ধরা যায়; কিন্তু পল্লী অঞ্চলে রক্ত পরীক্ষার সুবিধা নেই অথবা লক্ষণ দেখে ম্যালেরিয়া বলে সন্দেহ হয় না এবং সেজন্য রক্ত পরীক্ষার কথা অনেকে চিন্তা করে না। একারণ ঔষধ জানা থাকলেও রোগ ধরবার আগেই রোগী মারা যায়।

ম্যালেরিয়া যে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যায় তার প্রমাণ হ'ল পানামা ও সুয়েজখাল অঞ্চল। এই দুটি স্থানে খাল খননের সূত্রপাতে বহু কর্মী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল কিন্ত সেখান থেকে ম্যালেরিয়া তথা মশককুলকে সম্পূর্ণ-রূপে ধ্বংস করা সম্ভব হয়েছিল যার সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়াও বিদায় গ্রহণ করে।

কুইনিন ও প্লাসমোকুইন ব্যতীত ম্যালেরিয়ার কয়েকটি বেশ ভাল ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে, যেমন অ্যাটেব্রিন, মেপাক্রিন, প্যালুড্রিন, ডারাপ্রিম ইত্যাদি। এই ঔষধগুলি ব্যতীত আজকাল ম্যালেরিয়া দমনে ডি-ডি-টি যথেষ্ট সাহায্য করছে। গত মহাযুদ্ধের সময় প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে ডি-ডি-টি মশককুলকে বিনষ্ট করে ম্যালেরিয়া দূর করতে সাহায্য করেছিল। ডি-ডি-টি ব্যতীত পাইরিথ্রাম, কেরোসিন তেল, প্যারিস গ্রীণ অথবা কোনো কোনো মাছ মশার বাচ্চা ও ডিম ধ্বংস করে ম্যালেরিয়া দমন করতে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে।

কলেরা

যেসব রোগ জলবাহিত জীবাণুর জন্য হয় তাদের মধ্যে কলেরা সর্বাপেক্ষা ভীষণ ও মারাত্মক। পৃথিবীর মধ্যে ইজিপ্ট ও পশ্চিমবঙ্গে এর প্রাদুর্ভাব সর্বাপেক্ষা বেশী। কলকাতায়ও কলেরা স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে, সারা বছর ধরে কলকাতায় কলেরা রোগ লেগেই আছে। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে কলকাতায় কলেরা মহামারীরূপে দেখা দেয়। বাড়ির ছাদে রক্ষিত ট্যাঙ্কের অপরিশোধিত জল কলকাতায় কলেরার অন্যতম স্থায়ী কারণ।

দূষিত জল কলেরার মূল কারণ। মাছি এই রোগ দ্রুত ছড়াতে সাহায্য করে। সেজন্য মাছি বসা খাদ্য পরিহার করা ভাল। কলেরার সময় জল এবং দুধ ফুটিয়ে খাওয়া উচিত। গ্রামে বা সহরে যে সময়ে কলেরা দেখা দেয়, তার কিছু-দিন আগেই কলেরা ভ্যাক্সিন নিলে এক বছর এই রোগ হবার ভয় থাকে না।

আজকাল অবশ্য সালফাগুয়ানাডাইন এবং টেরামাইসিন নামক ঔষধ প্রয়োগ করে কলেরা আরোগ্য করা যাচ্ছে; তথাপি ঔষধ আছে বলেই নিশ্চিন্ত থাকা উচিৎ নয়।

কলেরা নিবারণের অন্যতম উপায় হ'ল যে সময় এই রোগ দেখা দেয় সেই সময় গ্রামে বা সহরে যাতে জীবাণুহীন পরিশোধিত পানীয় জল সরবরাহ হয় এবং মলমূত্রাদি আবর্জনা দ্রুত নিষ্কাশিত হয় সেদিকে কঠোর দৃষ্টি রাখা। খাবার জিনিষ এবং কাটা ফল যাতে খোলাভাবে বিক্রয় না হয় অথবা বাড়ীতেও রাখা না হয় তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা। বাড়ীতে কারও কলেরা হলে অবিলম্বে কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দেওয়া এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। তবে পরস্পরের সহযোগিতা ব্যতীত কোনো মহামারী দমন করা যায় না।

কালাজ্বর

আসাম ও বাংলাদেশে যকৃত ও প্লীহাসংযুক্ত দীর্ঘদিনব্যাপী একরকম জ্বর হয়। সে জ্বরের নাম কালাজ্বর। ম্যালেরিয়ার বাহন যেমন মশা তেমনি এই রোগের বাহন হ'ল স্যান্ডফ্লাই নামে সাদা রঙের একরকম উনকি পোকা। এই পোকা আস্তাবলে বা গোয়ালে উড়ে বেড়াতে দেখা যায়। এই পোকা কামড়ে মানুষের দেহে কালাজ্বরের জীবাণু রক্তের মধ্যে চালিয়ে দেয়।

কালাজ্বরকে প্রথম প্রথম অনেকেই টাইফয়েড বলে ভুল করেন, গোড়ার দিকে চেনা একটু শক্ত। তিন চার সপ্তাহ পরে অবিরাম জ্বর থাকার পরিবর্তে যখন ছেড়ে ছেড়ে আসে তখন ম্যালেরিয়া বলে ভুল হ'তে পারে, কারণ কালাজ্বরেও যকৃত ও প্লীহা বেশ বেড়ে যায়। রক্ত পরীক্ষাই হ'ল রোগটির নিশ্চিতভাবে চেনবার প্রকৃত উপায়।

কালাজ্বরের ঔষধ হ'ল ইউরিয়া স্টিবামাইন। ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এই ঔষধ আবিষ্কার করেছেন। ভারত ব্যতীত চীন, পশ্চিম আফ্রিকা এবং ভূমধ্য-

সাগরীয় অঞ্চলেও কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব আছে।

কুষ্ঠ

ভারতে মোটামুটি দশ লক্ষ কুষ্ঠ-রোগী আছে, তার মধ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ রোগী ছোঁয়াচে, তাদের স্পর্শে অন্য ব্যক্তি আক্রান্ত হ'তে পারে। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব সর্বাপেক্ষা বেশী। শতকরা দুই থেকে পাঁচ জন এই রোগে আক্রান্ত। কলকাতা সহরে সহস্রাধিক ভিক্ষুক আছে যাদের কুষ্ঠ অত্যন্ত সংক্রামক, তাছাড়া মেলা অথবা রেল ষ্টেশনেও বহু কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ভিক্ষুকের দেখা পাওয়া যায়। এই সকল ব্যক্তিকে যথাশীঘ্র সম্ভব আলাদা করে কুষ্ঠাশ্রমে স্থান দেওয়া কর্তব্য।

কুষ্ঠকে চলতি কথায় বলা হয় মহাব্যাধি। কুষ্ঠে আক্রান্ত ব্যক্তির ত্বক ও নার্ভ-সমূহ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। কুষ্ঠরোগীর স্পর্শ থেকে এই রোগ সংক্রামিত হয়। রোগটির সূত্রপাত হয় খুব ধীরে ধীরে। প্রথমে শরীরের ত্বকের ওপর কোনো এক স্থানে লালচে কিংবা বাদামী রঙের অস্বাভাবিক খানিকটা দাগ ক্রমশঃ যেন বাড়তে থাকে। কিছুদিন পরে সেই জায়গার অনুভূতিও ক্রমশঃ লোপ পায়, সেখানে ছুঁচ ফুটিয়ে দিলেও টের পাওয়া যায় না, ক্রমে আগুনের ছেঁকা দিলেও বুঝতে পারা যায় না। স্থানটা সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে যায়। রোগ ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে হাতের পায়ের আঙুল খসতে থাকে। তখন কুষ্ঠ রোগীর চেহারা ভয়াবহ হয়ে ওঠে। দশ বারো বৎসর ভুগে রোগীর মৃত্যু হয়।

যদিও কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা সময় সাপেক্ষ, তথাপি সূত্রপাতে চিকিৎসা করালে কুষ্ঠ সেরে যায়। চালমুগরার তেল একটি উৎকৃষ্ট ওষুধ তবে আজকাল সালফোন নামক এক রকম রসায়ন থেকে কুষ্ঠের কয়েকটি দেশী ও বিলাতী ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ওষুধ প্রয়োগে কুষ্ঠ রোগীদের আরোগ্য-সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।

প্লেগ

একদা ইয়োরোপে প্লেগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী ছিল, কিন্তু আঠারো শতাব্দী থেকে এই রোগ সেখানে আয়ত্তে আনা হয়েছে। এখন আর ইয়োরোপে প্লেগ নেই। ভারতে ১৮৯৮ সাল থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে দেড় কোটি লোক মারা গেছে; এর মধ্যে দেশীয় রাজ্যের হিসেব ধরা হয়নি। আজকাল অবশ্য এই সংখ্যা অনেক কমে গেছে এবং ভারতে মহামারীরূপে প্লেগ অনেক দিন দেখা দেয়নি। তাহলেও সারা ভারতে বছরে এখনও বিশ হাজার লোক প্লেগে মারা যায়।

প্লেগের পরোক্ষ বাহন হল ইঁদুর, আসল বাহন হল ইঁদুরের গায়ের এক রকম মাছি। এই মাছি এক ইঁদুরের গা থেকে আর এক ইঁদুরের গায়ে উড়ে বসে এবং সেই সময়ে কিছু মানুষের গায়েও উড়ে আসে ও প্লেগের জীবাণু মানুষের শরীরে চালান করে দেয়। এই একমাত্র উপায়েই মানুষ প্লেগে আক্রান্ত হয়, তবে নিউমনিক নামে প্লেগ অত্যন্ত সংক্রামক, তা মানুষ থেকে মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়।

প্লেগ তিন রকমের দেখা যায়, তবে সাধারণতঃ যা দেখা যায়, তার নাম হল বিউবনিক প্লেগ। ইঁদুর মাছি মানুষের পায়ে কামড়ায়, তাই সেখান থেকে প্লেগের বিষ ওপরে ওঠবার সময় কুঁচকির গ্রন্থিগুলি ফুলে ওঠে। পরে শরীরের অন্যান্য গ্রন্থিগুলিও ফুলে ওঠে।

প্লেগে কম্প দিয়ে প্রবল জ্বর আসে, চোখ লাল হয়, ঘোর বিকার দেখা দেয়, রোগীর বুদ্ধিবৃত্তির গোলমাল দেখা দেয়, রোগী মাতালের মতো টলতে থাকে। তখন দেখা যায় যে, তার কুঁচকি ফুলেছে, তীব্র বেদনা।

নিউমনিক প্লেগে নিউমনিয়ার মতো লক্ষণ দেখা দেয়, কিন্তু নিউমনিয়ার চিকিৎসা করলে কোনো ফল হয় না অথচ রোগ ধরতে না ধরতেই রোগী মারা যায়। সেপটিসিমিক নামে আর এক প্রকার প্লেগ হয়, তাতে রক্ত বিষিয়ে যায়। আজকাল প্লে[illegible] চিকিৎসায় স্ট্রেপ্টোমাইসিন খুব ভ[illegible] কাজ দিচ্ছে। কলেরার মতো প্লেগে[illegible] ভ্যাক্সিন নিলে এক বছরের মধ্যে [illegible] হবার আশঙ্কা থাকে না।

ফাইলেরিয়াসিস

স্টেগোমায়া নামে এক প্রকার [illegible] আছে। এই মশা যখন ফাইলেরিয়া [illegible] কোনো রোগীকে কামড়ায়, তখন [illegible] লেরিয়ার ভ্রূণ মশার পেটে চলে [illegible] ফাইলেরিয়া সরু সুতোর মতো [illegible] রকম কৃমি জাতীয় জীব যা মানু[illegible] রক্ত বা লিম্ফরসের নালীতে আশ্রয় [illegible] এগুলি লম্বায় এক থেকে দেড় [illegible] হয়। যাই হোক, এই কৃমির [illegible] মশার পেটে ঢুকে খোলস ছেড়ে [illegible] রূপ ধারণ করে। এই মশা যখন [illegible] সুস্থ রোগীকে কামড়ায়, তখন [illegible] লার্ভা সেই মানুষের শরীরে প্রবেশ [illegible] রক্তে চালান হয়ে যায়। রক্তে ভ[illegible] ভাসতে তারা গ্রন্থি এবং [illegible] প্রণালীতে প্রবেশ করে। সেখানে [illegible] আস্তে আস্তে পূর্ণাঙ্গ কৃমিতে প[illegible] হয়ে ডিম পাড়তে শুরু করে। ডিম থেকে আবার নতুন ভ্রূণ [illegible] রক্তস্রোতে ঘুরে বেড়াতে থাকে আর [illegible] কামড়ালে এই ভ্রূণ মশার পেটে [illegible] পড়ে। এমনিভাবে ফাইলেরিয়া সংক্র[illegible] হয়।

ফাইলেরিয়া কৃমি যদি [illegible] নালীতে বদ্ধ হয়ে যায় এবং [illegible] সৃষ্টি করে আর সেই সঙ্গে [illegible] বুঝে যদি স্ট্রেপ্টোকক্কাস এবং স্ট[illegible] লোকক্কাস জীবাণু এসে যোগ [illegible] তাহলেই ফাইলেরিয়াসিস রোগ [illegible] দেয়। এই রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে [illegible] করে বলবার কিছু নেই। স্ট্রেপ্টো[illegible] স্ট্যাফিলোকক্কাস মারবার জন্য স[illegible] জাতীয় ওষুধ ত' রয়েছেই, ফাইলেরিয়া মারবার জন্য আজ[illegible] হার্টোজান নামে একটি ওষুধ আবি[illegible] হয়েছে, তাতে ফাইলেরিয়া থেকে [illegible] পেতে দেখা যাচ্ছে।

উক্ত রোগগুলি ছাড়া ডেঙ্গু, [illegible] ওয়ার্ম ইত্যাদি আরও কয়েক প্র[illegible] ট্রপিক্যাল ডিজিজের প্রাধান্য এ[illegible] দেখা দেয়, তবে ঐগুলিই হল প্রধ[illegible] ট্রপিক্যাল ডিজিজ সম্বন্ধে গবে[illegible] জন্য কলকাতা শহরে এবং পৃথি[illegible] নানাস্থানে গবেষণাগার আছে।

নেপালের মন্দির • অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বোধনাথ স্তূপ : সর্বদর্শী বুদ্ধনয়ন

গোর্খাদের সামরিক শৌর্য যতই কেন না জগৎবিখ্যাত হোক, সাধারণভাবে বলতে গেলে, নেপালীদের মত ধর্মভীরু জাত দুনিয়ায় বেশী নেই। এতে অসংগতি কিছু আছে বলে মনে হয় না; কেননা, মিলিটারী আদমীর ধর্মবিশ্বাস যে শিথিল হতেই হবে এ যুক্তি অকাট্য নয়। কপালে সিঁদুর মেখে, গলায় জবাফুলের মালা জড়িয়ে যে গোর্খা পুরুষেরা সকালবেলা কালীঘাটের মন্দির থেকে বাড়ি ফেরে, তারাই যে দু' দণ্ড বাদে চাঁদমারির সময়ে নির্ভুল লক্ষ্যে রাইফেল চালাতে পারবে না এমন মনে করবার কোনো সংগত কারণ দেখি না। তাছাড়া, নেপালী জাতটার সকলেই ত' আর গোর্খা সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। নেওয়ার, মাগার, গুরুং প্রভৃতি অন্যান্য নেপালী সম্প্রদায়গুলির রণনিপুণতার খ্যাতি নগণ্য। এদের মধ্যে, বিশেষ করে নেওয়ারদের হাতে নেপালের সভ্যতা ও ধর্মজীবন সর্বাধিক পুষ্টিলাভ করেছে এবং সেই সামগ্রিক কৃষ্টির ক্ষেত্রে ধর্মোপাসনার স্থান যে সকলের ওপরে একথা বললে সম্ভবত বাড়িয়ে বলা হবে না।

নেপালের ইতিহাসবিদ্ কার্কপ্যাট্রিক সাহেব লিখেছেন, সে দেশে দেবদেবীর সংখ্যা মানুষের সংখ্যা থেকে কম নয় আর মঠমন্দির গুণতিতে বোধ করি ঘরবাড়ির সমানই হবে; সমস্ত নেপালে এমন একটি পাহাড়, নদী বা ঝরণা নেই যা কোনো না কোনো হিন্দু বা বৌদ্ধ দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত হয়নি। নেপাল বলতে কার্কপ্যাট্রিক সাহেব কাঠমাণ্ডুর সন্নিহিত পাহাড়-ঘেরা অঞ্চলকেই বুঝেছেন যার প্রচলিত অন্য নাম নেপাল উপত্যকা। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কুড়ি মাইলের অনধিক এই সমতলভূমিটুকুতেই নেপালের সভ্য জীবন কেন্দ্রীভূত। এর বাইরে দূরবিস্তৃত অঞ্চল প্রধানত মানচিত্রকর ও নৃতত্ত্ববিদ্দের পাণ্ডিত্যের খোরাক জোগায়। নেপাল উপত্যকার স্বল্পপরিসর আয়তনে মঠ-মন্দিরের প্রাচুর্য সহজবোধ্য কারণেই পরিহার করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সে আধিক্য এমন ভয়াবহ নয় যে, কার্কপ্যাট্রিক বর্ণিত তথ্যকে যথাযথ বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। সম্ভবত, নেপালী ধর্মজীবনের বিস্তৃতি ও গভীরতার ওপর জোর দেবার জন্যই তিনি এরকম অত্যুক্তি করে থাকবেন। পরবর্তীকালে আর একজন উৎসাহী ঐতিহাসিক নেপাল উপত্যকায় মোট ২,৭৩৩টি দেবালয় গণনা করেছিলেন। এগুলির অধিকাংশই অনুল্লেখযোগ্য। পশুপতিনাথের শিবমন্দির, পাটনের কৃষ্ণমন্দির, চঙ্গুনারায়ণের বিষ্ণুমন্দির ও স্বয়ম্ভূনাথ ও বোধনাথের বৌদ্ধ স্তূপগুলিই নেপালের প্রধান উপাসনাকেন্দ্র। সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও, নেপাল ও নেপালের বাইরে এ-দেবালয়গুলির প্রভাব বড় কম নয়। প্রতি বৎসর শিবরাত্রির সময়ে পশুপতিনাথের দর্শন কামনায় ভারতবর্ষের দূর দূরান্তর থেকে শত সহস্র হিন্দু পুণ্যার্থী সমবেত হয়ে থাকেন। আবার বোধনাথ-স্তূপে প্রণাম জানাবার জন্য হিমালয়ের বিশ হাজার ফুট উঁচু গিরিবর্ত্ম লঙ্ঘন করে শত শত তিব্বতী ভিক্ষু আসেন তীর্থপরিক্রমায়। স্থানীয় অধিবাসীদের পূজা পার্বণ ও সংবৎসর লেগেই আছে। নেপালী ধর্মজীবনের এই প্রসার ও তার কারণ অনুসন্ধানের আগে, সেদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস কিছুটা জানা প্রয়োজন।

* * *

প্রাগৈতিহাসিক কালের কথা বাদ দিলে, ব্রহ্মণ্যধর্মই ভারতবর্ষ ও নেপালের

"বালাজু উদ্যানের" বিষ্ণুমূর্তি : সুনিপুণ ভাস্কর্য

সাবেক ধর্মমত। উত্তরকালে, বৌদ্ধধর্মের খরস্রোতে ভারতবর্ষ যখন ভেসে গেল তখন নেপালও সে স্রোত প্রতিরোধ করতে পারেনি। প্রিয়দর্শী অশোক স্বয়ং এসেছিলেন নেপাল উপত্যকার ললিতপত্তনে। ললিতপত্তনই ছিল তাঁর হিমালয় রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রধান কেন্দ্র। তারপরে, খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতকে, হিন্দুধর্ম যখন প্রবল আকার ধারণ করে ভারতভূমি থেকে বৌদ্ধধর্মকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করলে, অথবা তার অব্যবহিত পরে, ইসলামের জয়ধ্বজা যখন সবলে প্রোথিত হল এদেশের মাটিতে, তখন দুর্লঙ্ঘ্য শৈলশ্রেণীর ওপারে নিরিবিলি নেপাল একলাটি পড়ে রইল। উত্তর ভারতের সমতলভূমি থেকে ইতিহাসের রথচক্রের ধ্বনি বহুদিন সেদেশে পৌঁছল না। কালক্রমে, তন্ত্র-প্রভাবিত হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এক অভিনব আপসরফা করে যে যৌগিক ধর্মসাধনায় নেপাল মনোনিবেশ করলে তাকে, ব্যাপক অর্থে, হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্ম বললে ভুল হবে না। তারপরে, এতাবৎকাল ধর্মমার্গে নেপাল আর বিশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেনি।

এই মিশ্রিত-ধর্মই অদ্যাবধি নেপালে প্রচলিত। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে দিক্‌পাল পণ্ডিত ফার্গুসন সাহেব নেপালী ধর্মজীবনের এই বিবর্তন প্রসঙ্গে লিখেছেন—"আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই যে, মুসলমানেরা কখনো নেপাল উপত্যকা অধিকার করতে পারে নি এবং সেজন্য সে দেশের শিল্প বা ধর্মজীবন তাঁদের দ্বারা কোনো অংশে প্রভাবিত হয়নি. নেপালে বৈষ্ণব, শৈব ও বৌদ্ধধর্ম অদ্যাবধি পাশাপাশি বর্তমান আছে একথা বললে যথেষ্ট বলা হয় না। তাদের প্রত্যেকেই এতদূর সমৃদ্ধিশালী যে, তার সঙ্গে তুলনীয় কিছু ভারতবর্ষের সমতলভূমিতে আছে বলে আমার জানা নেই। এর কারণ,—ইতিপূর্বেই যে কথার উল্লেখ করেছি—নেপাল উপত্যকায় মুসলিম সভ্যতার অনুপস্থিতি। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙের ভারত-ভ্রমণের সময়, ব্রহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম যেরূপ আশ্চর্য সজীবতার সঙ্গে এদেশে পাশাপাশি পুষ্টিলাভ করেছিল, আধুনিক নেপালের স্বল্পপরিসর ভক্তিমার্গে ধর্মসমন্বয়ের সে-দৃষ্টান্ত এখনও অটুট রয়েছে। পরবর্তীকালে, ব্রহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান ইসলামের শক্তিশালী প্রভাবের য[illegible] ভারতবর্ষে এই সাম্যের অবস্থা দীর্ঘস্থ[illegible] হতে পারেনি; কিন্তু অনুকূল পা[illegible] পার্শ্বিকের গুণে নেপালের ধর্মজী[illegible] আর কোনো উল্লেখযোগ্য পরি[illegible] ঘটেনি।" নেপালের সাংস্কৃতিক জী[illegible] এই গোড়ার কথাটুকু মনে রাখ[illegible] সেদেশের মন্দির-কলার রীতি ও প্র[illegible] অনুধাবন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

নেপালে বুদ্ধ-পূর্ব ব্রহ্মণ্যধ[illegible] স্মারক কোনো হিন্দুমন্দিরের আজ [illegible] অস্তিত্ব নেই; পাটনের (ললিতপত্ত[illegible] অপভ্রংশ) চারটি বৌদ্ধস্তূপই সম্ভ[illegible] এখন নেপালের প্রাচীনতম দেবা[illegible] খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অ[illegible] যখন ললিতপত্তনে এসেছিলেন [illegible] তাঁরই নির্দেশে নাকি এগুলি নি[illegible] হয়। স্থাপত্যরীতিতে এ-স্তূপগু[illegible] সাবেক বৌদ্ধধর্মের নিরাভরণ ঋজু[illegible] প্রতীক। পরবর্তীকালে, স্বয়ম্ভূনাথ [illegible] বোধনাথ মঠের নির্মাণকৌশলেও মোটাম[illegible] এই একই রীতির অনুসরণ করা হয়ে[illegible] কারুকার্যবিহীন, সাদামাঠা এ-দেবালয়গু[illegible]

যে নেওয়ার শিল্পীদের দুর্লভ প্রতিভাকে তৃপ্ত করতে পেরেছিল এমন মনে হয় না। পিতল ও কাঠ-খোদাইয়ের কাজে নেওয়ার কারিগরদের পারদর্শিতা জগৎবিখ্যাত। পাথরের ভাস্কর্যেও তাঁরা সবিশেষ কুশলী। এহেন নিপুণতা ধর্মের আঁচল ধরে যে বেশীদিন নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবে এমন আশা করা বাতুলতা। ফলে, প্রতিভাবান্ নেওয়ার শিল্পীরা অগণিত রূপক-মণ্ডিত হিন্দু স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শৈলীর দিকে ধীরে ধীরে ঝুঁকে পড়তে লাগলেন। দেবদেবী, কিন্নর কিন্নরী, পশুপক্ষী, পত্রপুষ্পের মাধ্যমে অসংখ্য রূপক ও পৌরাণিক কাহিনীর যে বিশাল সম্পদ হিন্দু মন্দির নির্মাণকলায় বিকশিত, অন্য ধর্মে তার তুলনা কোথায়। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও সৃষ্টির তাগিদে, নেপালী শিল্পীরা এইভাবে ক্রমে ক্রমে হিন্দু ঐতিহ্যের সংগ্রহশালায় এসে নত-মস্তকে প্রবেশ করলেন। ফলে, পরবর্তী-কালের বৌদ্ধ স্থাপত্যরীতিতে নিরাভরণ [illegible] জায়গায় এল অলংকারের [illegible]। বিনা রক্তপাতে, অবলীলাক্রমে, এই আশ্চর্য সমন্বয় সাধিত হল।
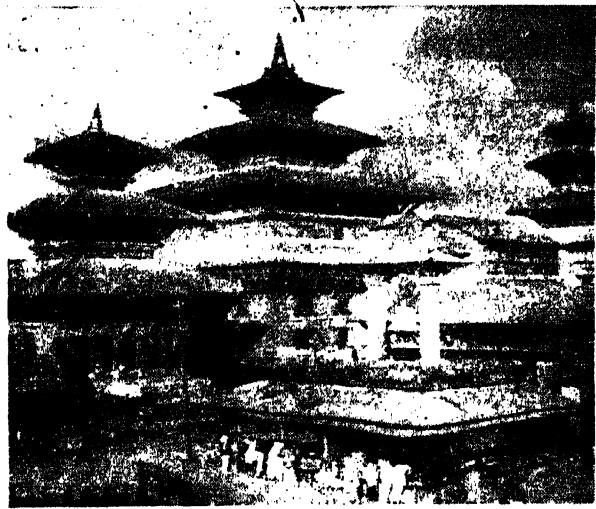
অবশ্য এ-ধারণা করা ভুল হবে যে, নেপালের মন্দির-স্থাপত্যে হিন্দু রচনা-শৈলীর প্রভাবই বেশী। এরকম হওয়া হয়ত অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ভারত-

দেবপল্লী : পাটন

ভূমি থেকে বৌদ্ধধর্ম উৎখাত হওয়াতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত নেওয়ার শিল্পীর এদেশে প্রেরণার একটি বড় উৎস হারালেন তিব্বত ও চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রসা সমসাময়িক ঘটনা। ধর্মীয় ব্যাপা বৌদ্ধ নেপাল অতঃপর ক্রমশই দক্ষি থেকে উত্তরে মুখ ফেরাতে লাগল

কিছুকাল পরে, ১২০৪ খৃষ্টাব্দে, মুসল মানেরা যখন বিহার অঞ্চল অধিকার কে নিলেন তখন ভারতবর্ষের সঙ্গে নেপালে ক্ষীয়মাণ সম্পর্কটুকুও একেবারে ছি হল। তবু হিন্দু মন্দির-শৈলীর ঐশ্ব ভোলবার নয়; নেপালী শিল্পীরা ে ঐতিহ্য বাঁচিয়েও রাখলেন সাধ্যমত কিন্ চীনের সাংস্কৃতিক সমীরণ উত্তর সীমা পার হ'য়ে অবাধগতিতে সে দেশের দা বয়ে আনতে লাগল নেপালের নিভৃ উপত্যকায়। নেপালের শিল্পসভায় আসনটি ভারতবর্ষ এতদিন সগৌর অলংকৃত করে ছিল, মহাচীন অনায়াসে অধিকার করে নিলে। নেপালে কলাক্ষেত্রে আর একটা যুগের সূচনা হ

প্রথমে ভারতবর্ষ ও পরে চীনের আধিপত্য নেপালের মন্দির-স্থাপে সুস্পষ্ট ছাপ রেখে গিয়েছে। দক্ষি

মন্দির প্রাঙ্গণ : স্বয়ম্ভুনাথ
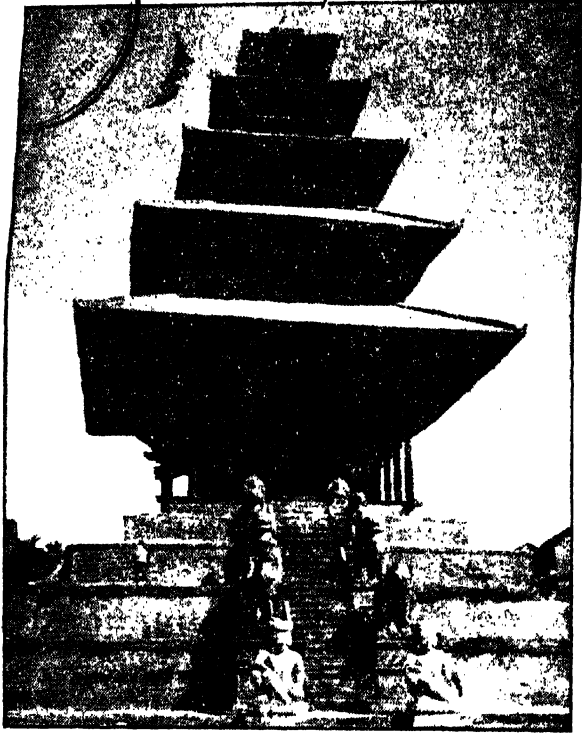
"ন্যাতপোলা দেবাল" : সুঠাম ঋজুতা

প্রতিবেশীর সঙ্গে যোগাযোগ যতদিন অব্যাহত ছিল ততদিন নেপালে যে-সব বৌদ্ধ মন্দির নির্মিত হয়েছে সেগুলি তৎকালীন ভারতীয় স্তূপ বা চৈত্য শ্রেণীর। আবার, এ সময়ে বা এ সময়ের পরেও নিখুঁত হিন্দু পদ্ধতিতে হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরেরও অভাব হয়নি। ভাদগাঁওয়ের পার্বতী বা পাটনের কৃষ্ণ-মন্দির তার উদাহরণ। তারপরে, উত্তর-প্রতিবেশীর সঙ্গে সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতার ফলে, নেপালে যে মন্দির-শৈলীর প্রবর্তন হয় ইংরেজীতে তাকে প্যাগোডাধর্মী ব'লে অভিহিত করা হয়েছে। ভারতীয় স্তূপ-রীতি ও চীনদেশাগত প্যাগোডা পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আকৃতিতে অনুরূপ ভারতীয় স্থাপত্য-কীর্তিগুলির সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও নেপালের স্তূপ-মন্দিরগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেকে স্তূপশীর্ষে অদ্ভুত আকৃতির এক একটি চূড়া আছে। সাঁচী প্রভৃতি ভারতীয় বৌদ্ধস্তূপের প্রাকার ও প্রবেশ-তোরণের অসামান্য কারুকার্য এগুলিতে নেই তবে চূড়ার অলঙ্করণে নেওয়ার শিল্পীদের প্রতিভা অল্পবিস্তর ব্যবহৃত হয়েছে। এই স্থাপত্যরীতির প্রধান উদাহরণ স্বয়ম্ভূনাথ ও বোধনাথের মন্দির দু'টি। কাঠমাণ্ডু শহরের উপকণ্ঠে অরণ্যসজ্জিত ছোট একটি পাহাড়ের ওপর স্বয়ম্ভূনাথের প্রাচীন মন্দিরটি অবস্থিত। প্রায় ষাট ফুট ব্যাসের এক বিশাল গোলার্ধের ওপর গিল্টিকরা চূড়াটি বহুদূর থেকে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমতলভূমিতে অবস্থিত বোধনাথ মন্দিরের তুলনায় আয়তনে এটি অনেক ছোট হলেও, প্রাচীনত্বে সম্ভবত হীন নয়। স্থানীয় কিংবদন্তীতে এ-কাহিনী প্রচলিত যে, পুরাকালে নেপাল উপত্যকা যখন বিস্তীর্ণ এক জলাশয় মাত্র ছিল তখন উত্তরদেশ থেকে ভগবান মঞ্জুশ্রী বুদ্ধ এখানে উপস্থিত হন। তরবারির আঘাতে তীরবর্তী এক পাহাড় দ্বিখণ্ডিত করে পৌরাণিক হ্রদের সমস্ত জল নিষ্কাশিত করবার পর তাঁর শুভাগমনের স্মারক হিসেবে স্বয়ম্ভূনাথের এ-মন্দির তিনিই নাকি নির্মাণ করিয়ে দেন। বিশেষ যত্ন সহকারে এক অনির্বাণ দীপশিখাকে অদ্যাবধি এখানে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে যা নাকি স্বয়ং মঞ্জুশ্রী বুদ্ধ প্রথম প্রজ্জ্বালিত করেছিলেন। এ-কাহিনীর কোনো ঐতিহাসিক সমর্থন না থাকলেও নেপালের হিন্দু বৌদ্ধ সকল সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা স্বয়ম্ভূনাথ যে অতিশয় প্রাচীন তাতে সন্দেহ নেই।

বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের কাছে বোধনাথের মাহাত্ম্য অসীম। ঐতিহাসিক ওয়াডেল সাহেব বলেছেন, তিব্বতের বাইরে লামা সম্প্রদায়ের তীর্থক্ষেত্রগুলির মধ্যে এ স্তূপটির খ্যাতি সর্বাধিক, কেননা লোক-শ্রুতি এই যে, এখানে দশ দিক ও ত্রিকালের সমস্ত বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের আত্মা রক্ষিত আছে। হিমালয়ের বিশ হাজার ফুট উঁচু গিরিবর্ত্ম পার হয়ে তিব্বত থেকে অসংখ্য ভিক্ষু যে প্রতি বৎসর এখানে এসে সমবেত হন সে কথার উল্লেখ ইতি-পূর্বেই করেছি। কাঠমাণ্ডুর উত্তর সীমানায় এ-মন্দিরটির এমন একটি ভয়াল গাম্ভীর্য আছে যা ভাষায় বর্ণনা করা সহজ নয়। স্তূপশীর্ষে চূড়ার চারদিকে সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ বুদ্ধের প্রতীক হিসেবে উগ্র রঙে যে চোখগুলি আঁকা আছে তা দেখে অবনতচিত্ত না হন এমন ভক্তের সংখ্যা নগণ্য। বোধনাথ সম্বন্ধে জনৈক বৃটিশ পর্যটক লিখেছেন—"এরকম তেজঃপুঞ্জ, ভীষণদর্শন দেবালয় পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। চূড়ার গায়ে বুদ্ধ-নেত্রগুলি যেন একথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, প্রাচ্যদেশীয়

[...]া অখ্যাত ধর্মমতের চর্চা এখানে [...]া.....যেন এক জ্বলন্ত ধর্মবিশ্বাস [...]রটির সমস্ত অবয়ব থেকে উৎসারিত [...]....।"

[...]চীনদেশাগত প্যাগোডা স্থাপত্যরীতি [...]ীর্যে অনেক হীন হলেও নেপালের [...]বাংশ মন্দিরই এই পদ্ধতিতে নির্মিত। [...]া পাথরে তৈরী চতুষ্কোণ গৃহের [...]র একাধিক ঢালু ছাতের ক্রমবিন্যাস [...]ীতির প্রধান লক্ষণ। ঊর্ধ্বারোহণের [...]া সংগে ছাতগুলির আয়তন ক্রমশ [...] পায় এবং শেষ ছাত ও চূড়াটি [...]ক ক্ষেত্রে সোনা বা গিল্টিকরা তামার [...] তৈরী হয়ে থাকে। নিছক ব্যবহারিক [...] থেকে এতগুলি তলার কিছুমাত্র [...]জন নেই কেননা—দেবমূর্তির জন্য [...]তলার ঘরখানিই যথেষ্ট। তবুও [...]হুল্যের সংগত কারণ আছে। ছাত-[...]র ভারক্ষার জন্য যে কাঠের খুঁটি [...]দি ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেগুলিকে [...]র্ব নিপুণতার সংগে শ্রীমণ্ডিত করে [...]ল নেওয়ার শিল্পীরা। বাস্তবিক-[...]ক, কাঠখোদাইয়ের কাজ যে কত সূক্ষ্ম ও কত উচ্চাংগের হতে পারে এ-দেবালয়-গুলি তার সার্থক প্রমাণ। প্যাগোডা মন্দিরের দ্বারপাল হিসেবে সিংহ, হাতি, ড্রাগন প্রভৃতির হিংস্র মূর্তি ব্যবহার করাও সুপ্রচলিত রীতি। মন্দিরের সামনে দীর্ঘ প্রস্তরস্তম্ভের ওপর মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা অথবা গরুড়ের মূর্তিও বিরল নয়।

এই শ্রেণীর অগণিত দেবালয়ের মধ্যে ভাদগাঁওয়ের "ন্যাতপোলা দেবাল" ও চংগুনারায়ণের বিষ্ণুমন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাঁচতলা উঁচু "ন্যাতপোলা দেবাল" নেপালের সর্বোচ্চ মন্দির। অধরোতী পাঁচটি বেদীর ওপর দিয়ে দ্বারপাল-রক্ষিত সিঁড়ি গিয়ে পৌঁছেছে একতলায়। তারপরে, ক্রম-হ্রস্বাকৃতি ছাতগুলি হাত বাড়িয়েছে আকাশের দিকে। সুঠাম উচ্চতার যে একটি বিশেষ মহিমা আছে—প্যাগোডা স্থাপত্যরীতির যা প্রধান অবলম্বন—তা' এ-মন্দিরটিকে দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না। আশ্চর্যের কথা, অধুনা এখানে কোনো দেবমূর্তি নেই। আঠারো শতকের প্রথমে কোন দেবতার অভিষেক হয়েছিল এ-মন্দিরে সেকথা এখন আর সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়।

চংগুনারায়ণের বিষ্ণু মন্দিরটিতে নেওয়ার শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা কেন্দ্রীভূত হয়েছে এ-কথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না। পাথর, তামা, পেতলের ওপর সুদক্ষ কারিগরি, কাঠ-খোদাইয়ের আশ্চর্য নিপুণতা আর দিকে দিকে রঙের অপূর্ব বিন্যাসে যে মনোহর সংগ্রহশালাটি গড়ে উঠেছে এখানে সমস্ত নেপালে তার তুলনা নেই। কলকাতা আর্ট স্কুলের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, শিল্পরসিক পার্সি ব্রাউন সাহেব চংগুনারায়ণের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কাঠমাণ্ডু থেকে আট মাইল দূরে এই অনবদ্য মন্দিরটি নেপাল পর্যটনকারী সকলেরই অবশ্য দ্রষ্টব্য।

অবিমিশ্র হিন্দু পদ্ধতিতে রচিত কিছু কিছু মন্দির ও দেবমূর্তিও যে নেপালে আছে এ কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। পাটনের কৃষ্ণমন্দির এই তালিকায় প্রথম স্থান অধিকারের যোগ্য। ফার্গুসন সাহেবের মত চুলচেরা বিচারকও এ-মন্দিরটির স্থাপত্যরীতিতে কোনো অশুদ্ধি আবিষ্কার করতে পারেননি এবং মন্দির-গাত্রে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত অজস্র দেওয়াল ভাস্কর্যের তিনি যে প্রশংসা করেছেন তা দুর্লভ প্রশস্তি সন্দেহ নেই। হিন্দু দেব-দেবীর মধ্যে 'বালাজু উদ্যান' ও 'বুঢ়া নীলকণ্ঠে' ছোট দু'টি পুকুরের মাঝখানে অধিষ্ঠিত দুই বিষ্ণুমূর্তির তুলনা ভারত-বর্ষেও বিরল। দক্ষিণ ভারতে এজাতীয় ভাস্কর্যের ছড়াছড়ি; কিন্তু সেখানেও অনন্তশয্যায় শয়ান এত মহিমান্বিত বিষ্ণুমূর্তি দেখেছি বলে মনে হয় না। যদি স্থানীয় শিল্পীরাই এগুলির রচয়িতা হয়ে থাকেন, তবে আমি তাঁদের সেই শ্রেণীর শিষ্য বলব যাঁদের অসামান্য প্রতিভা গুরুর পারদর্শিতাকেও ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

[আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত]

স্মরণীয় (!)

সমালোচনার কলমকেও স্তম্ভিত অচল করে দেওয়ার মস্ত গুণ নিয়ে মাঝে মাঝে এক একখানা ছবি এসে হাজির হয়। কোনকথা বলবার প্রবৃত্তিও থাকে না সে-সব ছবি সম্পর্কে। 'পণরক্ষা' সেই দলেরই একখানি। কোন একটা বিষয়ে সামান্য একটুও উল্লেখ না করতে পারার জন্য একটুও আফশোষ তো দূরের কথা, বরং আর কিছু লেখা থেকে রেহাই পাওয়া গেলো বলে একটা ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করে। ছবিখানির সংগঠনকারীদের মধ্যে আছেনঃ—কাহিনী ও সংলাপঃ সন্তোষ সেন; চিত্রনাট্য ও পরিচালনাঃ বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়; আলোকচিত্রশিল্পীঃ রমেন পাল; শব্দযন্ত্রীঃ সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়; শিল্পনির্দেশঃ মনি মজুমদার; সুর যোজনাঃ বৈদ্যনাথ রায়; ভূমিকায়ঃ সাধন সরকার; মণি চক্রবর্তী, গোকুল মুখোপাধ্যায়, হরিধন, শংকর বাগচী, রবীন, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল চক্রবর্তী, চিত্রা, রেবা বোস, মিনতি বোস, অনিমা প্রভৃতি। এদের নামগুলি দিতে হলো এদের মনে রাখার জন্য।

রঙ্গজগৎ

—শৌভিক—

বহুরূপীর "রক্তকরবী"

বহুরূপী দলের নবতম নাট্যপ্রচেষ্টা হচ্ছে 'রক্তকরবী'। রবীন্দ্রপক্ষে তারা মহাজাতি সদনে অভিনয় করেছিলেন, এবার অভিনয় করলেন গত রবিবার নিউ এম্পায়ার মঞ্চে। ভয়াবহ রকমের ভালো অভিনয় করলেন তারা সেদিন। অভিনয়ে তারা নিজেদের আগেকার সব কৃতিত্বকে ছাপিয়ে তো গিয়েছেনই, এমন কি স্মরণীয় কালের মধ্যেও এমন সুতীব্র অভিনয় নৈপুণ্য অন্য কোন নাটকাভিনয়ে দেখা গিয়েছে বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের লেখা এরা প্রায় হুবহুই অনুসরণ করে গিয়েছেন, কিন্তু চেহারাটা এ'কেছেন এমনি করে যে জন্যে 'ভয়াবহ' কথাটিই তাদের অভিনয় কৃতিত্ব প্রসঙ্গে অতি উপযুক্ত প্রয়োগ। 'রক্তকরবী' থেকে এরা নাটকীয় উপস্থাপন চাতুর্যে 'রক্ত ও করবী'কে দুটিতে ভাগ করে নিয়ে করবীকে দলিত করে রক্তের লালটাই দীপ্ত করে তুলেছেন। ফলে রবীন্দ্রনাথের লেখাটা কাজে লাগিয়ে কেমন যেন একটা ভিন্নতর ভাবাদর্শকে সামনে এনে দেওয়ার চেষ্টা ধরা পড়ে যায়। যার নামে "রক্তকরবী" সেই নন্দিনীকে রবীন্দ্রনাথ এমন এক মানবীরূপে পরিকল্পনা করেছেন যে, একাধারে আরাম ও শান্তি এবং চীৎকার ও অশান্তি। বহুরূপী যেভাবে নাটকখানি পরিবেশন করেছেন তা'তে আরাম ও শান্তির কিছু নেই, আছে শুধু চীৎকার ও অশান্তিরই পালা। অর্থাৎ রামকে বাদ দিয়ে শুধু রাবণকে নিয়েই রামায়ণ গান।

*　　*　　*

"রক্তকরবী" নাটকখানি রচনায়ও যেমনি কঠিন তার চেয়েও কঠিন ওর নাট্যরূপটা মঞ্চে ফুটিয়ে তোলা! রামায়ণের মতোই এটিও রূপক নাট্য নয়, এটিও সত্যমূলক। কি রকম সত্যি তার ব্যাখ্যা করতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "নব-

দিল-শ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষ সংলগ্ন তাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন ন হরণ করে নিয়েছিলো" তেমনি যুগের যন্ত্রদানব গ্রামের পঞ্চবটছায়া-তল কুটির থেকে নব-দূর্বা-দল-বিলাসী কদের ঝুঁটি ধরে টেনে এনে হরণের জ নিয়োজিত করে কৃষি-পল্লীকে বলই উজাড় করে দেওয়ার মতোই সত্যি। ক্তকরবী"কে এই হননের প্রতিবাদ বলে যায়। কিন্তু বহুরূপীর নাট্যরূপায়নে ড়তাবেই গড়ে উঠেছে শ্রেণী বিদ্বেষের টা গরম আবহাওয়া, যেটাকে রবীন্দ্র-থর কথাতেই বলতে হয় "শানবাঁধানো দের ওপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস গধ্বনি।" অথচ নাটকখানির প্রকৃত টা গ্রহণে সুবিধে হবে বলে রবীন্দ্রনাথ টি রস দেবার কথাই বলেছেন। ন বলেছেন "রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি ন্দনী বলে একটি মানবীর ছবি। রদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার প্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সংকীর্ণতার ড়ে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে র্ব উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তেমনি। সেই র দিকেই যদি সম্পূর্ণ তাকিয়ে দেখেন লে হয়তো কিছু রস পেতে পারেন। তো রক্তকরবীর পাপড়ীর আড়ালে খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে লে দায় কবির নয়। নাটকের মধ্যেই আভাস দিয়েছেন যে, মাটি খুঁড়ে পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয় নন্দিনী নিবার নয়; মাটির উপরিতলে যেখানে নর, যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে মর লীলা নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সহজ সৌন্দর্যের।" বহুরূপীর নাট্য-প তো তার ব্যতিক্রমই দেখা গেল। ন্দ্রনাথের কথাই যথাযথভাবে ব্যবহার ছেন শিল্পীরা যার যা চরিত্রে, কিন্তু 'রক্তকরবীর পাপড়ীর আড়াল' থেকে জে নেওয়া একটা অর্থ অবলম্বন করে য়ি ও হাবেভাবে এমন একটা ভঙ্গী শ করা হয়েছে যাতে 'সহজ সুখের' 'সহজ সৌন্দর্যের' নন্দিনী কোথায় া পড়ে গিয়েছে। শেষটাতেই তা আরো পড়ে যায়। এ'রা নাটক শেষ করেছেন য়ের জিগির তুলে—"আয়রে ভাই, ইয়ে যাই" বলে। যক্ষপুরীর বন্দিনী দনী ছুটে বেরিয়ে গিয়েছে জয়যাত্রার পথে; নিজের শক্তিতে নিজে বন্দী রাজাও নন্দিনীর অনুসরণ করছে মুক্তির সন্ধান পেয়ে। যক্ষপুরীর বিদ্রোহী কারিগররা বন্দিশালা ভেঙে পাগল বিশুকে মুক্ত করে দিয়েছে; যে বিশু গান গেয়ে শোনাতো নন্দিনীকে। বিশু এসে নন্দিনীর জয়-যাত্রার কথা শুনলে; কথাটা শোনালে খোদাইকর ফাগুলাল। এখানে বিশু আর ফাগুলালের কথার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এইভাবে নাটকখানি শেষ করেছেন:

"**বিশু**।........এবার আমার সময় হলো একলা মহাযাত্রার। হয়তো গান শুনতে চাইবে আমার পাগলী (নন্দিনী)! আয়রে ভাই লড়াইয়ে চল!

ফাগুলাল। নন্দিনীর জয়।

বিশু। নন্দিনীর জয়।

ফাগুলাল। আর ঐ দেখো ধুলায় লুটচ্ছে তার রক্তকরবীর কঙ্কণ। ডান হাত থেকে কখন খসে পড়েছে! তার হাতখানি আজ সে রিক্ত করে দিয়ে চ'লে গেলো।

বিশু। তাকে ব'লেছিলুম, তার হাত থেকে কিছু নেব না। এই নিতে হ'লো, তার শেষ দান। [প্রস্থান দূরে গান] পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে........যবনিকা"

বহুরূপী শেষটা এতদূর এগিয়ে আসেননি। ওরা বিশু যেখানে বলছে 'আয়রে ভাই, লড়াইয়ে চল' ঐ কথাটাই একটা শ্লোগানের ধাঁচে "আয় রে ভাই, লড়াইয়ে যাই"-তে পরিবর্তিত করে নিয়ে বার কয়েক ঐ বলে বিশুর চীৎকারের পর যবনিকা টেনে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কোথায় শেষ করেছেন, আর এ'রা কোথায় শেষ করলেন! এইতেই এ অভিনয়ের একটা মতলব ব্যক্ত হয়ে পড়ে। দৃশ্যসজ্জার মধ্যে যক্ষপুরীর রাজার সুড়ঙ্গ-পথের বন্ধ দরজার ওপরে, মাঝে একটা ঈগলের প্রতিমূর্তি, আর রাজা ভিতর থেকে সাড়া দেবার আগে ঈগলের দু'পাশে লালবাতির সংকেত—ওটাই বা কিসের প্রতীক? রবীন্দ্রনাথ তো কেবলমাত্র একটা জটিল জালের আবরণের কথাই বলে গিয়ে যে-আবরণের আড়াল থেকে রা কেবলমাত্র সাড়াটুকু পাওয়া যায়। আরম্ভের পূর্বে বহুরূপীর পক্ষ নাট্যপরিচালক শম্ভু মিত্র জানিয়ে দেন নাটকখানি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে করে গিয়েছেন তাঁরা তার সঙ্গে সম্ একমত। কার্যত দেখা গেলো, রবীন্দ্রনাথের ভাষাটাই কেবল করেছেন, কিন্তু তার ভাষ্য করে অন্যরকম। শম্ভু মিত্র আরও বলেন, দ বৃন্দ যেন তাঁদের এই নাটকাভি বিদেশী নাটকের সঙ্গে তুলনা না ক বিদেশী চিত্রকলার পাশে দিশী চিত্রক যেভাবে দেখা হয় দর্শক যেন সেই চো নাটকখানি দেখেন। একথার আর একথা ওঠেই বা কি সূত্রে তিনি দর্শককে বলতে চেয়েছেন রাক্ষসের শোষণজীবী সভ্যতার যে তাঁরা পরিবেশন করছেন সেটা এদেশেরই বলে মনে করে নেওয়া হয়

* * *

শেষের লড়াইয়ে যাবার ছোটানো বীভৎস শঙ্খধ্বনিই এই নাট্যাভিনয়টিকে সুন্দরের থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে। সমস্ত ক'জন অভিনয়শিল্পীই বড়ো সব চরিত্রাভিনয়েই এবং বিশেষ নন্দিনীর ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্র ও থেকে রাজার ভূমিকায় স্বরাভিব্য শম্ভু মিত্র যে নৈপুণ্যের পরিচয় দি তা আর কোন দলের কারুর ভাবা যায় না। অভিনয়শিল্পীদের ছিলেন গঙ্গাপদ বসু, শোভেন মজু অমর গাঙ্গুলী, কুমার রায়, জাকেরিয়া, আরতি মিত্র প্রভৃতি। সেনের আলোকসম্পাতও আবহ যথাযথ রূপ ফুটিয়ে তুলে একটা শালী ভূমিকারই অভিনয় করে গি দৃশ্যসজ্জায় জ্যামিতিক রেখায় চেহারা দৈত্যপুরীর একটা নিরেট ফুটিয়ে তুলেছে। ভাবাদর্শে ঘটানোর কথা ভুলতে পারলে বহুরূপীর অপূর্ব পরিকল্পিত, চালিত ও অভিনীত নাট্যরূপ অভিহিত করা যেতো;—কিন্তু কথাটা ভুলে থাকা যায় কি করে?

"গান্ধারীর আবেদন" অভিনয়ের দৃশ্য। (বাম হতে দক্ষিণে) কুমারী হেনা মজুমদার, শ্রীমতী সুজাতা গুহ, কুমারী মীরা মিত্র ও শ্রীমতী সীতা সেন গুপ্তা

(ফটো—শ্রীসন্তু রায়ের সৌজন্যে)

সিংগাপুরে টাগোর সোসাইটি

শ্রীনেপাল ঘোষ

বিংশ শতাব্দীর লীলাচঞ্চল বিশ্বজনের মিলন কেন্দ্র এই সিংগাপুর। আধুনিক প্রগতিশীল জীবনের কর্মস্রোতকে উপেক্ষা ক'রে দম্ভভরে দাঁড়িয়ে আছে শান্ত সমাহিত সেণ্ট এন্ড্রুজ্ গির্জা এই প্রিয় নগরীর এক ছায়াশীতল পরিবেশে। পৌরজীবনের আবিলতা এই শান্তিসৌধের ভাবগম্ভীর আবেষ্টনীতে পৌঁছতে যেন সন্ত্রস্ত।

১২ই জুনের ক্লান্ত গোধূলীতে সিংগাপুরের অনুসন্ধিৎসু ও জ্ঞান-পিয়াসী নরনারী এই শান্তিধামে উপনীত হয়েছিলেন তাঁদের ধ্যানজগতের এক কল্পনাকে বাস্তবের পটে রূপায়িত করতে। ভজনালয়ের শুচিস্নাত পরিবেশে মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার সিডনি কেইন্ সিংগাপুরে 'টাগোর সোসাইটী'র' উদ্বোধনে পৌরোহিত্য করলেন। কবিগুরুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ডক্টর কালিদাস নাগ ও শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র ও বিশ্ব শ্রম সংস্থার প্রাচ্যদেশীয় প্রতিনিধি শ্রী জি এল মপারার উপস্থিতি ও সক্রিয় সহযোগিতা এই অনুষ্ঠানকে মহিমান্বিত করে তুলেছিল।

রবীন্দ্রনাথ একদিন বিশ্বরাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তিনি চেয়েছিলেন জগতের লোককে মৈত্রীর বন্ধনে বাঁধতে যাতে মিলনের মহানন্দে আত্মহারা হয়ে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের বাহুবন্ধনে ধরা দেয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিক মিলন কেন্দ্র এই মালয়ের বুকে ডক্টর নাগ ও শ্রী মপারার উদ্যোগে গুরুদেবের জীবন-স্বপ্ন মূর্ত হয়ে উঠল 'টাগোর সোসাইটি'র গোড়াপত্তনের মধ্য দিয়ে।

জাপান হতে ফেরার পথে ডক্টর নাগ সিংগাপুরের বিদগ্ধ সমাজের কাছে তাঁর অনুপ্রেরণা এনে দিলেন "টাগোর সোসাইটি" প্রতিষ্ঠার জন্যে। নূতন উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে তাঁর নির্দেশমত সকলে কর্মতৎপর হয়ে উঠল। ডক্টর নাগ এই উপলক্ষে একটা বিষয়সূচী তৈয়ার করে দেন এবং অনুষ্ঠান যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে তার প্রতি যত্নবান হন।

স্যার সিডনি কেইন্ তাঁর ভাষণে বলেন যে, গুরুদেবের বাণীই হ'ল একমাত্র ফল্গুধারা যা মালয়দেশের জাতীয়তাবাদের গোড়াপত্তনে প্রাণরস যুগিয়ে তাকে অবিনশ্বর করে তুলতে সক্ষম হবে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁদের ক্ষুদ্র স্বার্থ-বুদ্ধি ও হিংসাদ্বেষ ভুলে যাতে বিশ্ব-কবির জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জাতিবর্ণনির্বিশেষে পরস্পরে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে সেজন্য এখন হতে সচেষ্ট হওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করতে বলেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, সিংগাপুরের রবীন্দ্র পরিষদ্ মালয়

এবং ভারতবর্ষকে সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ করবে এবং পরস্পরের ভাবের বিনিময়ে সহায়তা করবে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে ডক্টর নাগ কবি-জীবনের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দেন। গুরুদেবের মিলনমন্ত্র অধুনা সংশয়ব্যাকুল জনচিত্তে আবার শান্তির মন্দাকিনী বহাতে সক্ষম হবে ব'লে ডক্টর নাগ জনতাকে আশ্বস্ত ক'রে আসন গ্রহণ করেন।

উপাসনাগারের ভাবগম্ভীর পটভূমিকে আলোকস্নাত করে পাদপ্রদীপের কিরণে উদ্বোধন সংগীত আরম্ভ হল। এতে অংশ গ্রহণ করলেন শ্রীমতী প্রভা মজুমদার, শ্রীমতী সুজাতা গুহ, শ্রীমতী আনন্দময়ী বেজবরুয়া, শ্রীমতী রেণু দে, শ্রীদেবদত্ত জেভুলী ও শ্রীসতু রায়।

তারপর মিস্টার এন্‌তনী স্কুলিং কবিগুরুর অমর কাব্য গীতাঞ্জলির পাঁচটি কবিতা ইংরেজীতে ক্রমান্বয়ে আবৃত্তি করে গেলেন। অনুষ্ঠানের বিষয়সূচীর উৎকর্ষতার দিক দিয়ে শ্রোতাদের মনে অনেকদিন এই আবৃত্তির সুর অনুরণিত হবে। ভজনালয়ের মধুগন্ধী আবহাওয়ায় দাঁড়িয়ে মিস্টার স্কুলিং ভগবানের চরণে তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বাকে যেন অকাতরে বিলিয়ে দিলেন তাঁর আবৃত্তির মাধ্যমে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি শ্রোতাদের সম্মোহিত করতে পেরেছিলেন।

ডক্টর নাগ ও শ্রীমপারার পরামর্শ অনুসারে গুরুদেবের গীতিকবিতা "গান্ধারীর আবেদন" মঞ্চস্থ করলেন স্থানীয় বাঙালী শিল্পিবৃন্দ। কবি-গুরুর এই মর্মস্পর্শী কবিতার নাট্যরূপ দিয়েছিলেন ডক্টর নাগ কয়েকটি মোহ-মদির নৃত্যগীতের সমন্বয়ে। এই আন্তর্জাতিক সভাজনের কাছে এই বাঙলা নৃত্য, গীত ও অভিনয় কতটুকু হৃদয়গ্রাহী হবে তা কার্যনির্বাহক সমিতির একটা চিন্তার বিষয় ছিল; কিন্তু অভি-নয়ের ছোট বড় প্রত্যেকটি চরিত্র যেন বিভিন্ন ভূমিকায় নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তৎপর ছিল। যবনিকা অপসারণের পর হ'তেই প্রত্যেকটি অভিনেতা ও অভিনেত্রী দর্শকমনকে পুলকিত করে তোলেন। মঞ্চের আলোকসজ্জা ও দৃশ্য-পট শ্রোতাদের মোহাবিষ্ট করে যেন নিয়ে গেল অতীতের সেই হস্তিনা নগরের রাজান্তঃপুরে। জন্মান্ধ নৃমণি ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় শ্রীসমর মিত্র রাজধর্মকে দলিত ক'রে অপত্যস্নেহাতুর প্রাণের পরিচয় দিতে গিয়ে যে সৃজনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা দর্শকমনে অনেকদিন জাগরূক থাকবে।

রাজমহিষী গান্ধারীর ভূমিকায় শ্রীমতী প্রভা সেনগুপ্তার অভিনয় খুবই হৃদয়গ্রাহী।

কুরুকুললক্ষ্মী দুর্যোধন-দয়িতা সখী-পরিবৃতা, বিজয়োৎসবপ্রমত্তা ভানুমতী দর্শকচিত্তকে আকৃষ্ট করেন তাঁর গানে। এই ভূমিকাতে অংশ গ্রহণ করেছেন শ্রীমতী সুজাতা গুহ। নৃত্যপরা সখীর ভূমিকায় অভিনয় করেন কুমারী মীরা মিত্র ও শ্রীমতী গীতা সেনগুপ্তা শ্রীমতী রেণু দে, কুমারী হেনা মজুমদার ও শ্রীমতী বিনীতা প্রামাণিক।

পাদপ্রদীপের আলোর উপর সমাপ্তির কালো-যবনিকা পরার পরও দর্শকমণ্ডলী মোহান্ধ হয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থাকে তাদের পরিবেশ ভুলে। দর্শক মণ্ডলীর মধ্য হ'তে একজন ইউরোপীয় ডক্টর নাগের কাছে এসে এক কপি "ডা[illegible] ঘরের" বাঙলা সংস্করণ দেখিয়ে তাঁ[illegible] পরবর্তী অনুষ্ঠানে সেই বইটা অভি[illegible] করার জন্যে অনুরোধ জানান। এ[illegible] প্রতিষ্ঠান যেন অনাগত দিনের আলোর বর্তিকা হয়ে মালয়বাসীদের সত্য[illegible] সুন্দরের পথে পরিচালিত করে এইটুকু কামনা করি।

খেলার মাঠে

একলব্য

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বৃটিশ যুগের ...রাধিকার বহুস্থানে আজও বিদ্যমান। ...টবল শাসনেও তার ব্যতিক্রম নেই। তবে ...ল ক্ষেত্রের শাসন রজ্জুর মত ফুটবলের ...সন রজ্জুতেও মরচে ধরেছে, শাসন ব্যবস্থা ...য়ে পড়েছে শিথিল এবং বন্ধনহীন। ফুটবল ...লার নিয়ামক সংস্থা আই এফ এ ফুটবল ...রিচালনা ব্যাপারের হর্তাকর্তা হলেও চ্যারিটি ...চের চাবিকাঠি কিন্তু পুলিশের হাতে। ...লকাতা ময়দানে চ্যারিটি খেলার আয়োজন ...লিশ কমিশনারের অনুমোদন সাপেক্ষ। ...র্বেও এব্যবস্থা বলবৎ ছিল, আজও বলবৎ ...ছে। কিন্তু বৃটিশ যুগে পাঁচটির বেশী ...রিটি খেলা কোন মরসুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে ...লে শোনা যায়নি; কিন্তু এখন? পূর্বের ...চটির তুলনায় এখন তার দ্বিগুণ বা তিন ...ণ খেলা চ্যারিটি নামে ক্রীড়ামোদীকে ...শী পয়সা দিয়ে দেখতে হচ্ছে। অথচ এই ...তি পয়সা দ্বারা চ্যারিটির কতটুকু ...য়োজন মিটছে, সে বিষয়ে কারো হুঁশ নেই।

* * *

পুলিশ কমিশনার কর্তৃক পাঁচটি চ্যারিটি ...চের অনুমোদনের পূর্বাপর ঘটনা একরকম ...নীতিতে দাঁড়িয়ে গেছে। পূর্বে এই ...টি চ্যারিটি খেলার মধ্যে তিনটি লীগ ...র দুটি আই এফ এ শীল্ডের খেলা ...র্ধারিত করা হত। দুর্ভিক্ষ বা বন্যা ...পীড়িতদের সাহায্যের মহৎ উদ্দেশ্যে অন্য ...ন বিশেষ চ্যারিটি খেলার প্রয়োজন হলে ...লিশ কমিশনার তার জন্য পৃথক অনুমতি ...তেন। কিন্তু এখন বিনা প্রয়োজনেই ...রিটি খেলার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। আজ-...ল দু'রকম চ্যারিটি খেলার নামকরণ হয়েছে ...থা চ্যারিটি ম্যাচ আর প্রদর্শনী ম্যাচ। ...র্থক্য যে কোথায় বোঝা যায় না। উভয় ...লাই প্রবেশমূল্যের ক্ষেত্রে তিন টাকা, দুই ...কা ও এক টাকার টিকিটের ঢালা ব্যবস্থা। ...ম মূল্যের টিকিটের কোন ব্যবস্থা নেই। ...রিটি ম্যাচ আর প্রদর্শনী ম্যাচের মধ্যে ...টুকু পার্থক্য, সেটা হচ্ছে লীগ এবং শীল্ড ...র্ভুক্ত খেলাগুলিকে প্রদর্শনী খেলার ...খ্যা দেওয়া হয়, আর লীগ ও শীল্ডের ...র্ভুক্ত মূল্যের খেলাগুলি চ্যারিটি খেলা পদ-...চ্য। যাই হোক দর্শনীর ক্ষেত্রে দুইয়ের মধ্যে ...কোনই পার্থক্য নেই। নিয়ামক সংস্থার ...সুবিধার জনাই একই চ্যারিটি খেলার দুই ...রকম নামকরণ করা হয়েছে।

* * *

চ্যারিটি অর্থাৎ 'দান' কথাটির মধ্যেই তার মহানুভবতার ছদ্ম চিহ্ন লুক্কায়িত ...কে। সাধারণ ক্রীড়ামোদীর দানের সেই ...পুণ্য অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কোন ...অধিকার আই এফ এ নিয়ামক সংস্থার আছে ...কি? তাই কতকগুলি চ্যারিটি খেলাকে ...প্রদর্শনী খেলার আবরণে ঢেকে রাখা হয়; ...যার সেইসব খেলা থেকে সংগৃহীত অর্থের যদিচ্ছা খরচের ক্ষেত্রে বাধারও কোন সম্ভাবনা থাকে না।

গত ফুটবল মরসুমের কথাই ধরা যাক। গতবারের ফুটবল মরসুমকে অসমাপ্ত মরসুম বলা যেতে পারে। ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের ফলে মধ্যপথেই লীগের খেলা বন্ধ হয়ে যায়। মোহনবাগান ও ইস্ট-বেঙ্গলের প্রথম খেলাটি ছাড়া গতবার লীগের আর কোন খেলাই চ্যারিটি ম্যাচ হিসাবে অনুষ্ঠিত হয় নি। অথচ গত মরসুমেও চ্যারিটি ম্যাচের বাড়তি মূল্যে সাধারণ ক্রীড়া-মোদিকে ১৬।১৭টি খেলা দেখতে হয়েছে। শীল্ডের ৭টি এবং লীগের ১টি খেলা নিয়ে চ্যারিটি খেলার সংখ্যা দাঁড়ায় ৮। এছাড়া অস্ট্রিয়ার লিঞ্জ এ্যাথলেটিক ক্লাব, জার্মানীর অফেনব্যাক কিকার্স ও সন্তোষ ট্রফির খেলা-গুলি প্রদর্শনী খেলা হিসাবে পরিগণিত হয়।

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় ব্রেজিল ও হাঙ্গেরীর কোয়ার্টার ফাইন্যাল খেলার পূর্বে ইংরেজ রেফারী মিঃ আর্থার এলিস 'টস' করছেন। ডানদিকে হাঙ্গেরীর অধিনায়ক এবং বাঁদিকে ব্রেজিলের অধিনায়ককে দেখা যাচ্ছে

উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নসিপের পুরস্কারসহ আমেরিকার মহিলা টেনিস খেলোয়াড় মিস মোরিণ কনোলী। মিস কনোলী উপর্যুপরি ৩ বার উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করে বর্তমানে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহিলা খেলোয়াড় হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন

সুতরাং এই ১৬।১৭টি খেলার ব্যবস্থা যে পুলিশ কমিশনারের অনুমোদনে অনুষ্ঠিত হয়েছে বা তাঁর অনুমোদন আদায় করা হয়েছে সেবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ১৬।১৭টি চ্যারিটি খেলার জন্য কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের পকেট থেকে আই এফ এর কোষাগারে উঠেছে কম করেও পৌনে চার লাখ টাকা। এছাড়া সাধারণ খেলা দেখবার জন্যও দর্শকদের কম অর্থ যোগাতে হয়নি। অবশ্য সে অর্থে আই এফ এর কোন অধিকার নেই। সেখানে হেডওয়ার্ড কোম্পানীর নিরংকুশ অধিকারই বহাল রয়েছে। নীচের হিসাব থেকে আই এফ এর কোন চ্যারিটি খেলায় কি পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয়েছে, তার আন্দাজ পাওয়া যাবে।

* * *

চ্যারিটি খেলায় সংগৃহীত অর্থ

অস্ট্রিয়ার লিঞ্জ ক্লাবের তিনটি খেলা থেকে	৭৭,৯৮১৲
সন্তোষ ট্রফির খেলা থেকে	৯৯,৯৬৮৲
জার্মান টীমের খেলা থেকে	৬২,২৫৭৲
আই এফ এ শীল্ড ফাইন্যালে ইস্টবেঙ্গল ও আই সি লীগের খেলা থেকে	৫১,৯৭৬৲
ইস্টবেঙ্গল: উয়াড়ীর শীল্ডের খেলা থেকে	৮,৯৫৯৲
ইস্টবেঙ্গল: টাটা স্পোর্টসের শীল্ডে খেলা থেকে	১৩,৮৭
ইস্টবেঙ্গল: গুর্খা রাইফেলসের শীল্ডের খেলা থেকে	১০,৩৭
রাজস্থান: উয়াড়ীর শীল্ডের খেলা থেকে	২,৬৯
মোহনবাগান: আই সি লীগের শীল্ডের খেলা থেকে	৭,০৩
ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের লীগের খেলা থেকে	৩৫,১৪
মোট	৩,৭০২৭

চ্যারিটিই বলুন আর প্রদর্শনীই বলু ১৬।১৭টি বিশেষ খেলা থেকে আই এফ এ কোষাগারে সংগৃহীত কিঞ্চিদূন পৌনে চা লাখ টাকার মধ্যে চ্যারিটি খাতে প্রকৃতপক্ষ কত খরচ হয়েছে শুনলে অবাক হতে হ চ্যারিটি খাতে আই এফ এ ব্যয় করেছে মাত্র ৫৪৭৫৲ টাকা। এই অর্থ [illegible] সংখ্যা আরও প্রহসনজনক। মোট [illegible] জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই অর্থ [illegible] করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ [illegible] টাকা হিসাবে এক একটি প্রতিষ্ঠান [illegible] এর দানে কৃতার্থ হয়েছে। এই দানের [illegible] আই এফ এর কর্ণধারেরা সময় সময় [illegible] চীৎকার করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাক আই এফ এর দানের কথায় সেই [illegible] রাজার গল্পই মনে পড়ে যায়। [illegible] বললেন, 'রাজা বড় দাতা', অপরে প্রশ্ন কর 'দান করেন কোথায়?' উত্তর হলো, '[illegible] পুরে।' আবার প্রশ্ন, 'কুড়োন কে?' উ 'রাণী'। আই এফ এর দানের [illegible] নামের দীর্ঘ তালিকায়ও আই এফ এর [illegible] পুরবাসিনী অনেকে নেই, একথা [illegible] বলা যায় না।

তাছাড়া চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, [illegible] পাতাল বা যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতা যেখানে বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা [illegible] সেখানে ১৫।২০ টাকা দানের কোন অর্থ হ না। খেলা থেকে সংগৃহীত অর্থ [illegible] প্রচারের জন্য ব্যয়েরও কোন যৌক্তিক খুঁজে পাওয়া যায় না। আই এফ এর দান তালিকায় চিৎপুরে শতবর্ষব্যাপী অখণ্ড [illegible] নাম সংকীর্তনের জন্য ১৫৲ টাকা দান ক হয়েছে দেখা গেল। সাধারণের অর্থে [illegible] প্রহসন কেন? খেলা থেকে সংগৃহীত অ খেলাধূলার উন্নতির জনাই ব্যয়িত হও উচিত। আর যদি ক্রীড়ামাধ্যমে কোন জনহি কর প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করতে হয়, [illegible] যাতে সে সাহায্য প্রতিষ্ঠানের কাজে আ সেইভাবেই সাহায্য করতে হবে।

* * *

প্রধানমন্ত্রী ডাঃ রায় এবং রাজ্যপাল [illegible] মুখার্জি 'পোলিও ক্লিনিক' এবং যক্ষ্মা নিবারণী সাহায্য ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের জ আই এফ এর নিকট যে আবেদন করেছে

ভারতের বিশ্বখ্যাত তরুণ টেনিস খেলোয়াড় আর কৃষ্ণন

ই প্রসঙ্গেই এত কথার অবতারণা করতে [illegible] সংবাদে প্রকাশ, আই এফ এ এক [illegible] মার্কা' চ্যারিটি খেলার মাধ্যমে এই দুই মহৎ উদ্দেশ্যের প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টায় [illegible] একটি খেলার সংগৃহীত অর্থ দুই [illegible] মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। [illegible] দুই মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য দুটি [illegible] প্রদর্শনীয় খেলার ব্যবস্থা করা যায় না [illegible] মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের ফিরতি [illegible] খেলা এবং আই এফ এ শীল্ড [illegible] খেলা দুইটির সংগৃহীত অর্থ এই [illegible] দান করার বাধা কোথায়? ইতি- [illegible] দেখা গেছে, রাজ্যপাল ডাঃ মুখার্জির [illegible] আবেদন সত্ত্বেও আই এফ এ [illegible] দেশবন্ধু স্মৃতি মন্দিরের জন্য '[illegible]খনী মার্কা' খেলার ব্যবস্থা করে-ছিলেন। পরে অবশ্য নানা ঘটনা সংঘাতে [illegible] পড়ে তাঁদেরকে দেশবন্ধু স্মৃতি [illegible] জন্য রাজ্যপালের হাতে ১০ হাজার [illegible] অর্পণ করতে হয়। আমরা বলবো, দেশ-[illegible] স্মৃতি ভাণ্ডারে আই এফ এর আরও [illegible] অর্থ দান করা উচিত ছিল। একটা [illegible]র্শনীয় খেলার সমুদয় অর্থই তারা [illegible] দেশনেতার স্মৃতির জন্য ব্যয় [illegible] পারতেন। 'পোলিও ক্লিনিক' এবং [illegible] নিবারণী সাহায্য ভাণ্ডারের জন্যও দুটি [illegible]র্শনীয় পৃথক খেলার ব্যবস্থা করা উচিত।

* * *

[illegible]তায় স্টেডিয়াম নির্মাণের আলোচনার [illegible]নের আনাচ কানাচ থেকে মাঝে মাঝে [illegible], লালকুঠিতে এমনকি বিধানসভায় [illegible] পৌঁছয়। এবার আলোচনার ঢেউ এসে [illegible] 'কংগ্রেস ভবনে'। সংবাদে প্রকাশ, [illegible]গ্রেস ভবনের আলোচনা সভায় বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ স্টেডিয়াম নির্মাণের আশু প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করে রাজ্য সরকার এবং কর্পোরেশনকে স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য উদ্যোগী হতে অনুরোধ করেছেন। এই সভায় ক্রীড়ামোদী, ক্রীড়া পরিচালক, কংগ্রেস কর্মী, দেশ সেবক, ক্রীড়া সাংবাদিক এবং বেতার ভাষক উপস্থিত ছিলেন। লোকে বলে 'অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' স্টেডিয়ামের ক্ষেত্রেই তা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। যতদিন বড় সন্ন্যাসী কর্মযোগী ডাঃ রায় স্টেডিয়াম সম্পর্কে সত্যিকারের চেষ্টা না করছেন, ততদিন কলকাতায় স্টেডিয়াম নির্মাণের কোন সম্ভাবনা নেই।

উদীয়মান টেনিস খেলোয়াড় আর কৃষ্ণন

ভারতের উদীয়মান টেনিস খেলোয়াড় আর কৃষ্ণন উইম্বলডনে জুনিয়র চ্যাম্পিয়নসিপ লাভের পর ডারহাম কাউন্টি লন টেনিসের চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করেছেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে কৃষ্ণন টেনিস খেলায় যেরূপ পারদর্শিতা অর্জন করেছেন, তার দৃষ্টান্ত বিরল। ডারহামে তিনি স্ট্রেট সেটে পরাজিত করেছেন গ্রেট বৃটেনের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় টনি মট্রামকে। ৬—৩ ও ৬—৪ গেমে কৃষ্ণন বিজয়ী হন। খেলার শেষে মট্রাম মন্তব্য করেন, 'কৃষ্ণন আমার চেয়ে অনেক ভাল খেলেছে।' ইংলণ্ডের সেরা খেলোয়াড়ের এই উক্তির পর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

পশ্চিম ভারত ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নসিপ

বোম্বাইয়ের উদীয়মান খেলোয়াড় নন্দু নাটেকার উত্তর প্রদেশের কৃতী খেলোয়াড় ত্রিলোকনাথ শেঠকে পরাজিত করে পশ্চিম ভারত ব্যাডমিণ্টনের চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করেছেন। সিংগলসে জয়লাভ করা ছাড়াও নাটেকার ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসের খেলায় বিজয়ীর পুরস্কার পেয়েছেন। ডাবলসে নাটেকারের দোসর ছিলেন রবীন্দ্র ডোঙ্গরে আর মিক্সড ডাবলসে কুমারী শশিকলা ভাট।

পশ্চিম ভারত ব্যাডমিণ্টন ছিল এবার ভারতের টমাস কাপ টীম গঠনের নৈপুণ্য-পরখের মাপকাঠি। এখানে খেলোয়াড়রা এবার যেরূপ উন্নত ব্যাডমিণ্টন নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, এমন নৈপুণ্যের আভাস নাকি ইতিপূর্বে বোম্বাইয়ের ব্যাডমিণ্টন খেলায় প্রত্যক্ষ করা যায়নি। নাটেকার, শেঠ, ডোঙ্গরে, দেওয়ান, চাওয়াল কেউ কারো চেয়ে কমতি যায়নি। শেষ পর্যন্ত তারুণ্যের জয় ঘোষিত হয়েছে। ফাইন্যালে নাটেকার ও শেঠের চমকপ্রদ ক্রীড়াচাতুর্য ও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর শেঠ হয়েছেন পরাভূত। এখানে বলা যেতে পারে, নাটেকার ও শেঠ সম্প্রতি ইংলণ্ড ও আমেরিকা ঘুরে এসেছেন। সাগরপারের ধুরন্ধর খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তারা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, এখানে সেই অভিজ্ঞতালব্ধ ক্রীড়াধারায় সত্যিকারের মাধুর্য সুষমা ফুটে উঠে।

ভারতের সেরা ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় নন্দু নাটেকার

পশ্চিম ভারত চ্যাম্পিয়নসিপের পরিসমাপ্তির পর 'টমাস কাপে' ভারতের নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। টমাস কাপের খেলায় এশিয়াটিক জোনে ভারতকে থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। ব্যাংককে এই খেলার তারিখ স্থির আছে জুলাই মাসের ৩০শে ও ৩১শে। নীচে ভারতের টমাস কাপ টীমে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম এবং পশ্চিম ভারত চ্যাম্পিয়নসিপের ফলাফল দেওয়া হচ্ছে।

টমাস কাপ টীম

১। নন্দু নাটেকার (বোম্বাই)
২। ত্রিলোক শেঠ (উত্তরপ্রদেশ)
৩। অমৃত দেওয়ান (দিল্লী)
৪। পরদুমন চাওয়াল (দিল্লী)
৫। রবীন্দ্র ডোঙ্গরে (বোম্বাই)
৬। সি গোমস—ম্যানেজার ও নন-প্লেয়িং ক্যাপ্টেন।

পশ্চিম ভারত ব্যাডমিণ্টনের ফলাফল

মেনস সিঙ্গলস

নন্দু নাটেকার (বোম্বাই) ১৫—১১ ও ১৫—১০ গেমে ত্রিলোক শেঠকে (ইউ পি) পরাজিত করেন।

উইমেনস সিঙ্গলস

মিসেস মমতাজ লোটাওয়ালা ৫—১১, ১১—২ ও ১১—৩ গেমে কুমারী সুশীলা রেগেকে পরাজিত করেন।

মেনস ডাবলস

নন্দু নাটেকার ও রবীন্দ্র ডোঙ্গরে ১৫—৬ ও ১৫—৬ গেমে মনোজ গুহ ও জি হেমাডিকে পরাজিত করেন।

উইমেনস ডাবলস

মিসেস মমতাজ লোটাওয়ালা ও মিসেস নবীনা লুইস ১৫—৫ ও ১৫—১০ গেমে মিসেস প্রেম পরাশর ও মিস সুশীলা রেগেকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস

নন্দু নাটেকার ও মিস শশিকলা ভাট ১৫—৭ ও ১৫—৮ গেমে এইচ তলয়ার খাঁ ও মিস ফিলিপকে পরাজিত করেন।

ফুটবল লীগের সাপ্তাহিক আলোচনা

গত সপ্তাহে ফুটবল লীগের অবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের সমসংখ্যক খেলায় ৪ পয়েন্টেরই ব্যবধান রয়েছে। এদিকে শীর্ষস্থান অধিকারী মোহনবাগানের সম্ভাবিত প্রতিদ্বন্দ্বী উয়াড়ী ক্লাব মঙ্গলবার ই আই রেল দলের কাছে একটি পয়েণ্ট নষ্ট করলেও এখন পর্যন্ত তাদের অবস্থা ভালই আছে। মোহনবাগান ২০টি খেলায় নট করেছে ৯ পয়েণ্ট আর উয়াড়ী ১৬ খেলায় ৮ পয়েণ্ট।
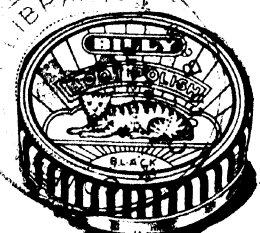
মোহনবাগান ও রাজস্থানের লীগের খেলায় রাজস্থান গোলরক্ষক ডি ঘোষ একটি উ'চু বল ধরছেন

বর্ষা শুরু হয়েছে। যে কোন খেলায় অনিশ্চিত ফলাফল হতে পারে। মোহনবাগান ক্লাব বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থায় থাকলেও আরও কিছুদিন চ্যাম্পিয়ানসিপের দৌড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র প্রশস্ত থাকবে।

দ্বিতীয় ডিভিসনের একমাত্র অপরাজিত টীম সালকিয়া ফ্রেণ্ডস ক্লাবকে এসপ্তাহে হাওড়া ইউনিয়নের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। তবে হাওড়া ইউনিয়ন দলে দুইজন খেলোয়াড় অন্তর্ভুক্তির যুক্তিযুক্ততায় সন্দিহান হয়ে সালকিয়া ফ্রেণ্ডস আই এফ এর কাছে প্রতিবাদ করেছে। চারটি ডিভিসনের ৬৩টি টীমের মধ্যে এখন তৃতীয় ডিভিসনে একটি মাত্র টীম অপরাজিত আছে, এরা হচ্ছে বোনিয়াপুকুর ক্লাব। নীচে গত সপ্তাহের প্রথম ডিভিসনের ফলাফল দিচ্ছি।

৭ই জুলাই, '৫৪

রাজস্থান (২) ভবানীপুর (০)
মহঃ স্পোর্টিং (২) ক্যালঃ সার্ভিস (১)

৮ই জুলাই, '৫৪

উয়াড়ী (১) পুলিশ (০)
এরিয়ান (০) জর্জ টেলিগ্রাফ (০)
বি এন আর (৩) স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০)

৯ই জুলাই, '৫৪

ইস্টবেঙ্গল (১) খিদিরপুর (০)
ই আই রেল (২) ক্যালঃ সার্ভিস (১)

১০ই জুলাই, '৫৪

মোহনবাগান (০) রাজস্থান (০)
মহঃ স্পোর্টিং (২) কালীঘাট (
বি এন আর (১) পুলিশ (

১২ই জুলাই '৫৪

ইস্টবেঙ্গল (০) : জর্জ টেলিগ্রাফ (
পুলিশ (০) : মহঃ স্পোর্টিং (
খিদিরপুর (১) : ক্যালঃ সার্ভিস (

১৩ই জুলাই '৫৪

মোহনবাগান (৩) : স্পোর্টিং ইউঃ (
এরিয়ান (১) : বি এন আর (
ই আই আর (২) : উয়াড়ী (

খেলাধুলার টুকরো খবর

ব্রুস ডুল্যাণ্ডের শত উইকেট—ইংল এবার বোলারদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম ১ উইকেট দখল করতে সমর্থ হয়েছেন, তি হচ্ছেন নটিংহামসায়ারের পেশাদার খেলো অস্ট্রেলিয়ার 'লেগ স্পিনার' ব্রুস ডুল্যাণ্ড।

ভারতের জাতীয় টেবিল টেনি বরোদায় গাইকোয়াড় অব বরোদার রাজপ্রা এবার জাতীয় টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নসি আয়োজন করা হয়েছে। নবেম্বর মাসের থেকে ১৪ই তারিখের মধ্যে জাতীয় প্র যোগিতা শেষ হবে।

এশিয়ান লন টেনিস—আন্তর্জাতিক টেনিস ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত অনু নিখিল ভারত লন টেনিস এসোসিয়ে উপর ১৯৫৪-৫৫ এবং ১৯৫৫-৫৬ এশিয়ান লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপের প চালনার ভার ন্যস্ত হয়েছে।

কেনিয়নের দেড় হাজার রান—উর কাউণ্টির ওপেনিং ব্যাটসম্যান ডন কে ইংলণ্ডের ক্রিকেট মরসুমে সর্বপ্রথ হাজার রান লাভের কৃতিত্ব অর্জন করে

মহিলাদের টীম, ব্যাডমিণ্টন—আ র্জাতিক ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন সি করেছেন টমাস কাপের খেলার মত ম খেলোয়াড়দের জন্যও ১৯৫৬-৫৭ সাল প্রাধান্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা ১৯৪৮ সালে টমাস কাপের সূচনা থে ভারত অংশ গ্রহণ করে আসছে। মহি দলগত প্রতিযোগিতার প্রথম বৎসর থে ভারত অংশ গ্রহণ করবে কিনা সেটা নি ভারত ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের স্থির হবে।

ডেভিস কাপ—ডেভিস কাপের আন্তর্জা আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় মেক্সিকো ৩ খেলায় জাপানকে হারিয়ে দিয়েছে।

৩ মাইল দৌড়ে নূতন রেকর্ড—ব এমেচার এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নসিপে গ্রীন এবং ক্রিচ চ্যাটওয়ে ৩ মাইল নূতন বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। সুই কৃতী এ্যাথলীট গুন্দার হেগ ১৯৪২ ১৩ মিনিট ৩২.৪ সেকেণ্ড সময়ে ৩ পথ অতিক্রম করে বিশ্ব রেকর্ড করেছি ফ্রেডি গ্রীন এবং চ্যাটওয়ে দু'জনে এক দৌড়ে ১৩ মিনিট ৩২.২ সেকেণ্ড হেগের রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছেন।

কলিকাতার অফিস লীগ—কলক

[illegible] অফিস ফুটবল লীগের প্রথম [illegible]ডিসনের দ্বিতীয় গ্রুপে স্ট্যান্ডার্ড [illegible]র্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস চ্যাম্পিয়ানসিপ [illegible]ভ করেছে। মূল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর [illegible]ম্মান অর্জনের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিউটি-[illegible] দলকে প্রথম গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দলের [illegible] প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

বাজ পেটির কৃতিত্ব—১৯৫০ সালের [illegible]ম্বলডন চ্যাম্পিয়ন এবং এই বৎসরের [illegible]লিয়ান লন টেনিস চ্যাম্পিয়ন বাজ পেটি [illegible]পর্যুপরি ৩ বৎসর সুইডিস লন টেনিস [illegible]ম্পিয়ানসিপে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে [illegible] 'প্লেটাড' কাপ লাভ করেছেন। [illegible] কৃতী খেলোয়াড় বাজ পেটি [illegible]ডিস চ্যাম্পিয়নসিপের ফাইন্যালে [illegible] খ্যাতিমান খেলোয়াড় রেক্স হার্ট-[illegible] ৭—৫, ২—৬, ৩—৬, ৮—৬ ও —৬ [illegible] পরাজিত করেন।

[illegible]ব ফুটবলে ১৬টি দেশের খেলোয়াড় সংখ্যা

[illegible]বিশ্ব ফুটবলে যে ১৬টি দেশ মূল প্রতি-[illegible] খেলার সুযোগ পেয়েছিল সেই সব [illegible] ক্লাব ও খেলোয়াড় সংখ্যার একটা [illegible] হিসাব নীচে দেওয়া হল। হিসাব [illegible] দেখা যায় ক্লাব এবং খেলোয়াড়ের সংখ্যা [illegible] সর্বাপেক্ষা বেশী। ইংলণ্ডে ক্লাবের [illegible] ৩১২০০। এই সব ক্লাবে প্রায় [illegible] খেলোয়াড় ফুটবল খেলে থাকে।

জার্মাণী—১৩০০০ ক্লাব ও ৭০০০০০ [illegible]। ১৯৩৪ সালের বিশ্ব ফুটবল [illegible] তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

হাঙ্গেরী—১৩০০ ক্লাব ও ১২০০০০ [illegible]। ১৯৩৪ সালে বিশ্ব ফুটবলে [illegible] করে এবং ১৯৩৮ সালের [illegible]।

উরুগুয়ে—৩৬০০ ক্লাব ১২৫০০০ [illegible]। ১৯৩০ ও ১৯৫০ সালের [illegible] রিমেট কাপ বিজয়ী।

অস্ট্রিয়া—১১৩০ ক্লাব ও ১২১০০০ [illegible]। ১৯৩৪ সালের বিশ্ব ফুটবলে [illegible] স্থানের অধিকারী।

যুগোশ্লাভিয়া—১৭০০ ক্লাব ও ১৫০০০০ [illegible]। ১৯৩০ সালের বিশ্ব ফুটবল [illegible]যোগিতার সেমি ফাইন্যালে পরাজিত।

ব্রেজিল—১১০০০ ক্লাব ও ৭৫০০০০ [illegible]। ১৯৩৮ সালের তৃতীয় স্থান [illegible] এবং ১৯৫০ সালের রানার্স।

ইংল্যান্ড—৩১২০০ ক্লাব ও ১০০০০০০ [illegible]। ১৯৫০ সালে বিশ্ব কাপে প্রথম [illegible]দান করে।

বেলজিয়াম—২০৮০ ক্লাব ও ৯০০০০ [illegible]। ১৯৩০, ১৯৩৪ ও ১৯৩৮ [illegible] বিশ্ব প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে।

ইটালী—৪৮৬৪ ক্লাব ও ২৫০০০০ [illegible]। ১৯৩৪ ও ১৯৩৮ সালের জুলেস [illegible]ট কাপ বিজয়ী।

ফ্রান্স—৮৪৭৭ ক্লাব ও ৪৫০০০০ [illegible]। ১৯৩৮ সালে বিশ্ব ফুটবল [illegible]যোগিতার পরিচালক।

তুরস্ক—১০২৭ ক্লাব ও ২০০০০ খেলোয়াড়। এই বৎসর বিশ্ব ফুটবল সর্বপ্রথম অংশ গ্রহণ করেছে।

সুইজারল্যান্ড—৭৫৬ ক্লাব ও ৪৭০০০ খেলোয়াড়। ১৯৩৪, ১৯৩৮ ও ১৯৫০ সালের বিশ্ব প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে।

স্কটল্যান্ড—২৫০০ ক্লাব ও ৬০০০০ খেলোয়াড়। বিশ্ব ফুটবলের নূতন প্রতিযোগী।

মেক্সিকো—১১০০ ক্লাব এবং ৭৫০০০ খেলোয়াড়। ১৯৩০, ১৯৩৪ ও ১৯৩৮ সালের অংশ গ্রহণকারী।

কোরিয়া—৪০০০০ খেলোয়াড়। বিশ্ব কাপে প্রথম যোগদান করেছে।

চেকোশ্লোভেকিয়া—৩৯২০ ক্লাব এবং ১৪০০০০ খেলোয়াড়। ১৯৩৪ ও ১৯৩৮ সালের মধ্যে প্রথমবার রানার্স হয়েছে।

ইংলণ্ডে পাকিস্থানের পঞ্চম জয়লাভ

ইংলণ্ডে পাকিস্থান ক্রিকেট দল দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় পরাজিত হবার পর দুটি খেলায় যোগদান করে ডার্বিশায়ারের সংগে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করেছে আর ল্যাঙ্কাশায়ার দলকে পরাজিত করেছে ৬ উইকেটে। এই খেলাটির ফলাফল নিয়ে পাকিস্থান ক্রিকেট দল ইংলণ্ডে ১৭টি খেলার মধ্যে ৫টি খেলায় জয়লাভ করেছে। ২টি খেলায় পরাজিত হয়েছে আর অমীমাংসিত-ভাবে শেষ করেছে ১০টি খেলা। ডার্বিশায়ার ও ল্যাঙ্কাশায়ারের সংগে খেলার ফলাফলঃ—

পাকিস্থান ডার্বিশায়ার

পাকিস্থান— ১ম ইনিংস—৩১৭ (হানিফ ৫৪, মাকসুদ ৫৩, খলিদ ওয়াজির ৫৩, ইক্রাম ইলাহি ৪২, মর্গান ৫৩ রানে ৪ উইঃ)।

ডার্বিশায়ার—১ম ইনিংস—১৭৬ (উইলাট ৪৪, জুলফিকার আমেদ ৫৩ রানে ৫ উইঃ)।

পাকিস্থান—২য় ইনিংস—(৬ উইঃ ডিঃ) ১২৪ (আলীমুদ্দিন ৪৩; মর্গান ৫৭ রানে ৫ উইঃ)।

ডার্বিশায়ার—(৫ উইঃ) ১৯১ (রেভিল নঃ আউট ১০১, কেলী ৪৩)।

[খেলা অমীমাংসিত]

পাকিস্থান : ল্যাঙ্কাশায়ার

ল্যাঙ্কাশায়ার—১ম ইনিংস—৩২৪ (এডরিচ ১৩৪, এ ওয়াটন ৫০, মামুদ হোসেন ৮৪ রানে ৫ উইঃ)।

পাকিস্থান—১ম ইনিংস—২১৯ (ইমতিয়াজ আমেদ ৮৭, স্ট্যাথাম ৫২ রানে ৫ উইঃ)।

ল্যাঙ্কাশায়ার—২য় ইনিংস—৯৮ (প্লেস ২২, সুজাউদ্দিন ১৬ রানে ৫ উইঃ, জুলফিকার আমেদ ৪৩ রানে ৩ উইঃ)।

পাকিস্থান—২য় ইনিংস—(৪ উইঃ) ২০৬ (ওয়াকার ৬০, হানিফ ৫৭, মাকসুদ ৪০, গ্রীণ হো ১৯ রানে ৩ উইঃ)।

[পাকিস্থান ৬ উইকেটে বিজয়ী]

সাপ্তাহিক সংবাদ
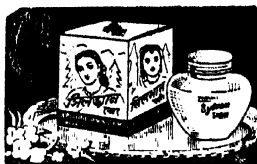
দেশী সংবাদ

৫ই জুলাই—প্রজা-সমাজতন্ত্রী নেতা ডাঃ রামমনোহর লোহিয়াকে গত রাত্রে ১৯৩২ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের বলে ফরক্কাবাদে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে। তিনি সেচ কর বৃদ্ধির প্রতিবাদ করিয়া জনসভায় বক্তৃতা করেন।

কুশী নদীর বন্যায় দ্বারভাঙ্গা জেলার প্রায় দুইশত গ্রাম প্লাবিত হইয়াছে। বন্যার ঐসব এলাকার প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার লোক দুর্দশায় পড়িয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অদ্য কলিকাতায় নিখিল ভারত সমাজ কল্যাণ ও ব্যবসায় পরিচালন ইনস্টিটিউটের কলেজ স্কোয়ার ওয়েস্টস্থিত নব-নির্মিত ভবনে এক অনুষ্ঠানে ব্যবসায় পরিচালন কোর্সের উদ্বোধন করেন।

আজ উত্তর কলিকাতার একদল প্রতিনিধি সরকারী দপ্তরখানায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান গুন্ডামি সম্পর্কে সরকারের আশু হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানান।

৬ই জুলাই—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু প্রধান প্রধান কংগ্রেস কমিটিসমূহের সভাপতিগণের নিকট লিখিত এক পত্রে এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মিঃ চৌ এন লাই ও তাঁহার মধ্যে এবং মিঃ চৌ এন লাই ও ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে আলোচনার পর সম্প্রতি যে দুইটি যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এশিয়ার শক্তিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়।

৭ই জুলাই—পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় পুনর্বসতি মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন আজ কলিকাতায় আগমন করেন।

একদল উদ্বাস্তু আজ কলিকাতা বনগ্রাম রেলপথের গোবরডাঙ্গা স্টেশনের নিকট রেলপথের উপর অবস্থান ধর্মঘট করিতে থাকায় ঐ পথে প্রায় ১০ ঘণ্টা রেল চলাচল বন্ধ থাকে। শেষ পর্যন্ত পুলিশকে কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করিয়া রেলপথের অবরোধ অপসারণ করিতে হয়।

আজ কলিকাতায় খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগীয় কর্মচারিবৃন্দের বিরাট জনসভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের কয়েকশত কর্মচারীর উপর গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে ছাটাই নোটিশ জারীর তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপনান্তে ঐ সকল নোটিশের আশু প্রত্যাহার এবং বিভাগীয় সমুদয় কর্মচারীকে বিকল্প চাকুরিতে নিয়োগের দাবী উত্থাপিত হয়।

৮ই জুলাই—ভারত সরকার আগামী শনিবার ১০ই জুলাই হইতে ভারতের সর্বত্র খাদ্যশস্য বিনিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। দেশের এক অংশ হইতে অন্য অংশে অবাধে চাউল চলাচল করিতে দেওয়া হইবে বলিয়াও স্থির হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এক বিবৃতিতে শনিবার ১০ই জুলাই হইতে কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থান হইতে রেশন ব্যবস্থা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া জানান যে, সারা পশ্চিমবঙ্গে অতঃপর ধান, চাউল এবং চাউল হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদির চলাচলের উপর কোন বাধা-নিষেধ থাকিবে না। কলিকাতা শহরে অবাধে চাউল আনয়নের উপরও কোন নিয়ন্ত্রণ থাকিবে না।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু অদ্য পাঞ্জাবে বিশ্বের বৃহত্তম খাল ভাকরা-নাঙ্গালের উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রায় লক্ষ লোক উপস্থিত ছিলেন। শ্রী নেহরু একটি বৈদ্যুতিক বোতাম টিপিবামাত্র 'স্লুইস গেট'-গুলির মধ্য দিয়া শতদ্রু নদীর জলরাশি খালের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। এই খালে সঞ্চিত জলরাশি দ্বারা পাঞ্জাব, পেপসু ও রাজস্থানের ৬০ লক্ষ একর উষর ভূমির সেচ কার্য হইবে।

কলিকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে প্রাইভেট বাস চলাচল ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে সরকারী পরিচালনাধীনে আনয়নের নিমিত্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি পাঁচসালা পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

৯ই জুলাই—কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বস্থ 'সুবারবন' রেলওয়েসমূহের বৈদ্যুতিকীকরণের উদ্দেশ্যে ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের সর্বময় নিয়ন্ত্রণে কলিকাতা বৈদ্যুতিকীকরণ পরিকল্পনা নামীয় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র সংস্থা গঠিত হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিবেশনে নগরীতে ক্রমবর্ধমান গুন্ডামির তীব্র নিন্দা করা হয় এবং স্থির হয় যে, নগরীতে গুন্ডামি দমনের জন্য কর্পোরেশন সরকারের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন।

১০ই জুলাই—নয়াদিল্লীতে ভারত ও পাকিস্থানের সংখ্যালঘু মন্ত্রিদ্বয় শ্রী সি সি বিশ্বাস ও মিঃ গিয়াসুদ্দিন পাঠানের মধ্যে এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, তাঁহারা অক্টোবরের শেষভাগে একসঙ্গে পূর্ববঙ্গ সফর করিতে যাইবেন।

১১ই জুলাই—অদ্য কলিকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জ[নসভায়] উদ্বাস্তুদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বা[সন] ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারের নি[কট] দাবী জানান হয়।

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ এলাহাবা[দে] জনসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, যদি ইন্দো-চীনে যুদ্ধবিরতি ঘটান না যায় এবং যুদ্ধকে বিস্তৃতিলাভ করিতে দেওয়া য[ায়] তাহা হইলে পৃথিবী আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে প্রায় ধ্বংসাবশে[ষ] সম্মুখীন হইবার ভয়াবহ বিপদের ম[ধ্যে] পতিত হইবে।

বিদেশী সংবাদ

৫ই জুলাই—পূর্ব পাকিস্থানে কম্যুনি[স্ট] পার্টি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্য টিউনিসি[য়ার] নিরাপত্তা বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধিকল্পে এক ব্যাটেলিয়ান ফরাসী সৈন্য জাহাজে টিউনিসে উপনীত হইয়াছে।

গতকল্য ফরাসী বোমারু ও জঙ্গী বিমান বহর হানয়ের ২৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে লোহিত নদীর ব-দ্বীপ এলাকায় সংঘ[বদ্ধ] ফরাসী রক্ষাব্যূহ বরাবর সন্নিবিষ্ট ভিয়েৎ[মিন] সৈন্যের উপর প্রচণ্ডতম আক্রমণ চালায়।

৬ই জুলাই—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া[য়] কম্যুনিস্ট অভিযান প্রতিরোধকল্পে [এক] সম্মিলিত প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা স্থির ক[রার] উদ্দেশ্যে অদ্য সিঙ্গাপুরে বৃটেন, [মার্কিন] যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়ার সেনাপতি[দের] গোপন বৈঠক আরম্ভ হয়।

৭ই জুলাই—লোহিত নদীর [ব-দ্বীপ] এলাকা হইতে অপসারিত ফরাসী সৈন্য[দের] নবগঠিত হানয়-হাইপং রক্ষাব্যূহে ভিয়েৎ[মিন] সৈন্যদল অনুপ্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়া[ছে]।

৯ই জুলাই—মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের [অধি]বাসিগণ আজ রাষ্ট্রপুঞ্জের দপ্তরে অভিযোগ করেন যে, বিকিনি দ্বীপে হাইড্রো[জেন] বোমা বিস্ফোরণের ফলে নিকটবর্তী প্রবাল দ্বীপের অধিবাসিগণ রক্তে শ্বেত[রক্ত] কণিকার পরিমাণ হ্রাস, প্রদাহ, [চর্মরোগ] কেশপতন প্রভৃতি রোগে ভুগিয়াছে।

১০ই জুলাই—পাঞ্জাবের শতদ্রু [নদীর] ধারা নূতন ভাকরা খালে প্রবাহিত করায় [পাক] সরকার বিশ্ব ব্যাঙ্কের নিকট ভারতের বিরু[দ্ধে] প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

পাক পার্লামেণ্টে শ্রীভূপেন্দ্রকুমা[র দত্ত] বলেন, জনাব মহম্মদ আলী পূর্ববঙ্গে[র] বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, [তাহা] সেখানকার সমগ্র অধিবাসীর বিরুদ্ধে যু[দ্ধ] ঘোষণারই সামিল।

ভিয়েৎমিন বাহিনী সাঁড়াশীর ন্যায় [দুই] দিক হইতে হানয়ের ২৫ মাইলেরও কম [দূরে] উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহাদের হানয় শ[হরে] আসিয়া একসঙ্গে মিলিত হইবার সম্ভা[বনা] দেখা দিয়াছে।

প্রতি সংখ্যা—৵৹ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষান্মাসিক—১০৲
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২১ বর্ষ
সংখ্যা ৩৮

দেশ
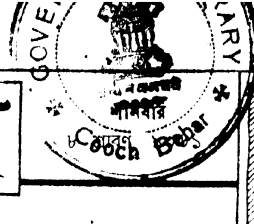
DESH

SATURDAY, 24TH JULY, 1954.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

যোগিতার সূত্র

ভারত সরকারের পুনর্বাসন সচিব ...ত শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন এবার দশদিন ...কাতায় অবস্থান করিয়া উদ্বাস্তুদের ...র্বাসন সমস্যা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ- ...ভাবে পর্যালোচনা করেন। তিনি ...র বিভিন্ন উদ্বাস্তু কেন্দ্রে গিয়া ...দের সঙ্গে মিশিয়াছেন এবং তাঁহাদের ...থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া- ...। শ্রীযুত জৈন কলিকাতা ত্যাগের ...র্বে আমাদিগকে আশার কথা শুনাইয়া ...ছেন। তিনি বলিয়াছেন, উদ্বাস্তু- পুনর্বাসন পরিকল্পনায় অতীতে ভুল ...ত্রুটি ঘটিলেও অতঃপর আর তেমন ...দেখা দিবে না। এবার তাঁহারা ...পরিকল্পিত রকমে কার্যকর পন্থা অবলম্বন ...তে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বর্তমানে ...রা যে কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছেন, ...তে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই ...ভবত দুই বৎসরের মধ্যেই উদ্বাস্তুদের ...র্বাসন সমস্যার সমাধান করা যাইবে। ...ত জৈন বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গেই একথা ...য়াছেন যে, টাকার অভাব এই সমস্যার ...ধানের পথে কোনরূপ অন্তরায় সৃষ্টি ...তে পারিবে না। অধিকন্তু যে টাকা ...র বরাদ্দ করা হইয়াছে, যদি তাহাতে ...য়োজন না মিটে তবে আরও অধিক অর্থ ...য় করা হইবে। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন ...আজ অর্থব্যয়ে সরকারী অকুণ্ঠতার ...ন্ধে যে কথা বলিতেছেন, এমন কথা ...া ইতিপূর্বেও শুনিয়াছি। ভারতের ...মন্ত্রী স্বয়ং তেমন আশ্বাস ...দিগকে দিয়াছেন; কিন্তু তথাপি ...বৎসরের সরকারী চেষ্টা সত্ত্বেও ...সমস্যার সমাধান হয় নাই। প্রত্যুত অর্ধেকটা কাজও যে সম্পন্ন হইয়াছে একথা বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে শুধু অর্থের উপরেই এই সমস্যার সমাধান নির্ভর করে না। সমস্যার সমাধানের উপযোগী সহযোগিতার প্রতিবেশ গঠনই প্রথমে প্রয়োজন। যাহাদের হাত দিয়া অর্থ ব্যয় হইবে, তাহাদের সততা, আন্তরিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সর্বোপরি উদ্বাস্তুদের প্রতি তাহাদের সহানুভূতি এবং সমবেদনার ভাব থাকা দরকার। আমাদের মনে হয়, উদ্বাস্তু- দের পুনর্বাসন পরিকল্পনা ব্যর্থতার মূলে এইসব ত্রুটি মুখ্যভাবে কাজ করিয়াছে। বিভিন্ন পরিকল্পনার ব্যর্থতা বিপন্ন উদ্বাস্তু নরনারীদের মনে নৈরাশ্য এবং অনেকটা অসন্তোষের ভাব বাড়াইয়া তুলিয়াছে। উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে সরকার পক্ষীয় কর্মচারীবর্গের মানসিক দৃষ্টির পরি- বর্তন সাধিত না হইলে সরকারের পরি- কল্পনা যতই সুগঠিত হোক না কেন, তাহা কার্যকর হইবে না, আমাদের ইহাই বিশ্বাস। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন সচিব এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, অতঃপর সরকারী বিভাগের যোগ্যতা এবং দ্রুততর কার্য- তৎপরতা সাধনের দিকে তিনি লক্ষ্য রাখিবেন। শ্রীযুত জৈনের এই শুভেচ্ছা সার্থক হইয়া উঠুক, আমরা ইহাই কামনা করি। পুনর্বাসন সচিব উদ্বাস্তু- দের সরকারী সংজ্ঞাকেও এবার কিছু ব্যাপক করিয়াছেন। ইহার ফলে যাঁহারা এতাবৎকাল উদ্বাস্তু হিসাবে সরকারী সাহায্যলাভে বঞ্চিত ছিলেন, তাহাদের অনেকের অভিযোগের কারণ দূর হইবে; কিন্তু এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন অমীমাংসিতই থাকিয়া যাইতেছে। ১৯৪৭ সালের পূর্ব হইতে যাঁহারা ব্যবসা কিংবা চাকরি উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে আছেন, অথচ এখানে তাঁহাদের কোন আশ্রয় নাই, তাঁহারা উদ্বাস্তুদের নূতন সংজ্ঞার মধ্যে পড়িবেন কিনা শ্রীযুত জৈনের উক্তিতে ইহা সুস্পষ্ট নয়। এ বিষয়টা সংজ্ঞায় পরিষ্কার হওয়া দরকার। ইহা ছাড়া, শুধু সংজ্ঞার সন্তোষজনক বা ব্যাপকতর ভাষ্যেই সমস্যার সমাধান হয় না, যাহাতে সংজ্ঞায় নির্দেশিত নরনারীরা অবিলম্বে সরকারী সাহায্য লাভ করেন, এরূপ ব্যবস্থাও অবলম্বিত হওয়া প্রয়োজন।

উচ্চশিক্ষার মাধ্যম

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতমণ্ডলীর সভায় বাংলা ভাষাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম স্বরূপে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়। প্রশ্নটি বহুদিন হইতে এতটা বহুলভাবে বিবেচিত এবং এ সম্বন্ধে মনীষিবর্গের অভিমত এতই সুস্পষ্ট যে, এ সম্বন্ধে নূতনভাবে গবেষণা করিবার কোন প্রয়োজন আছে, মনে হয় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সম্পর্কে দ্বিমত আছে মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মাতৃভাষাকে শিক্ষার সকল স্তরের মাধ্যম স্বরূপে গ্রহণের যৌক্তিকতা সাধারণভাবে সকলে স্বীকার করিয়া লওয়া সত্ত্বেও কলিকাতা বিশ্ব-

বিদ্যালয় এ সম্বন্ধে আন্তরিকতার সহিত কোনরকম কার্যক্রম লইয়া অগ্রসর হইতেছেন না। অথচ এতদিনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত কিছুদূর অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। বাংলা ভাষাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম স্বরূপে গ্রহণ করিবার যৌক্তিকতা সমর্থন করি বলিয়া অবশ্য ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করিতেছি না। বস্তুত ইংরেজী ভাষাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম না রাখিলেই যে ইংরেজী শিক্ষার মর্যাদা, মূল্য বা গুরুত্ব ক্ষুণ্ণ হইবে, এমন বিশ্বাস আমাদের নাই। ইংরেজী ভাষা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এতটা গুরুত্ব লাভ করিয়াছে যে, তাহার মর্যাদা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সব সময়ই থাকিবে এবং তাহার চর্চা এবং আলোচনার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি হইবে। কিন্তু শিক্ষার স্বাভাবিক বিকাশ এবং সমাজ-জীবনে তাহার সর্বতোমুখী সম্প্রসারণ শুধু মাতৃভাষার মাধ্যমেই সম্ভব, এজন্য মাতৃভাষাকে উপযোগী করিয়া তুলিবার দিকেই শিক্ষাব্রতীদের সাধনা প্রযুক্ত হওয়া কর্তব্য। দীর্ঘদিনের পরাধীনতার ফলে বৈদেশিক ভাষার প্রতি একটা মোহ জাতির মনের মূলে দস্তুরমত একটা জটিল গ্রন্থি সৃষ্টি করে। ইহা কাটাইয়া ওঠা কঠিন; কিন্তু এই গ্রন্থি মোচন করিতে না পারিলে সমাজ-জীবনের সব স্তরে শিক্ষার সঞ্জীবন-প্রভাব প্রসারিত হইতে পারে না এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় একটা আভিজাত্যের আবেষ্টনের মধ্যে পড়িয়া সমাজের ভারস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। জাতির স্বাভাবিক প্রাণধারার সঙ্গে সচ্ছন্দভাবে তাঁহাদের সংযোগ ঘটে না। এইরূপে জাতির সাংস্কৃতিক এবং রাষ্ট্রিক উন্নতি দুই-ই ব্যাহত হয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাকে মাধ্যম স্বরূপে গ্রহণ করিবার বিরুদ্ধে প্রধানত এই যুক্তি উপস্থিত করা হইয়া থাকে যে, এইসব ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের উপযোগী পুস্তকের অভাব বাংলা ভাষায় রহিয়াছে। কিন্তু এই অবস্থাকে স্বীকার করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে সমস্যার কোন দিনই সমাধান হইবে না। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী পুস্তক বাংলায় প্রণয়ন করিবার দিকেই বিশ্বকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত, বিশেষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে তেমন চেষ্টা হওয়া আবশ্যক। দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা শুধু অভাবেরই হিসাব ধরিয়াই বসিয়া আছি, অভাব মিটাইবার দিকে আমাদের বিশেষ আন্তরিকতা পরিলক্ষিত হয় না।

সমাজদ্রোহী অপরাধ

কলিকাতা পুলিসের এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ ভেজালের বিরুদ্ধে যে অভিযান আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার ফলে গত দুই মাসে ১৩৮টি ঘটনা ধরা পড়িয়াছে। এই ১৩৮টি ঘটনার মধ্যে ১১৬টি ক্ষেত্রেই রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা ভেজাল প্রমাণিত হইয়াছে; অবশিষ্ট কয়েকটি এখনও পরীক্ষাধীন। মাত্র দুই মাসের মধ্যে যে সকল ঘটনা ধরা পড়িয়াছে, তাহার সংখ্যাধিক্য হইতেই বুঝা যায় সমাজ ও মনুষ্যত্ববিরোধী এই প্রবৃত্তি কেমন ব্যাপকভাবে আমাদের সমগ্র জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। প্রকৃতপক্ষে পুলিসী তৎপরতার ফলে যেসব ঘটনা ধরা পড়িয়াছে, তাহাই যে সব, এমনও মনে করা উচিত নয়। প্রত্যুত অপরাধের বিস্তৃতি আরও ব্যাপক। জনসাধারণের নিত্য-ব্যবহার্য খাদ্যবস্তুর মধ্যে খাঁটি জিনিস বিরল। অধিকাংশ দ্রব্যই কৃত্রিম উপায়ে বিকৃত অবস্থায় বাজারে আসিয়া পৌঁছিতেছে এবং নিরুপায় জনসাধারণকে অর্থ দিয়া বিষ ক্রয় করিতে হইতেছে। জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে সরকারী প্রচারকার্যে আমরা কিছুদিন হইতে তৎপরতা লক্ষ্য করিতেছি। কিন্তু জন-জীবনের সম্বন্ধে কর্তব্য এবং দায়িত্ববোধ যদি সমাজদ্রোহী প্রবৃত্তির ফলে দুর্বল হইয়া পড়ে এবং যথেষ্ট কঠোরতার সঙ্গে সেই জঘন্য অপরাধ দমিত না হয়, তবে এইসব প্রচার-কার্যের সাফল্য সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহই রহিয়া যায়। বস্তুত স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি বা ব্যবস্থা জনগণের সামাজিক কর্তব্যবোধকে আশ্রয় করিয়াই সার্থক হয়। যাহারা খাদ্য এবং ঔষধ প্রভৃতিতে ভেজাল মিশ্রিত করিয়া সমাজদ্রোহী অপরাধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে আদর্শ দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াই সমাজ-জীবনে এই কর্তব্যবোধ জাগ্রত করা সম্ভব। প্রত্যুত শুধু পুলিসী কর্মতৎপরতাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। এই শ্রেণীর অপরাধে যাহারা প্রবৃত্ত আছে, তাহারা সুচতুর এবং তাহাদের চক্রান্তজাল সুবিস্তীর্ণ। ইহাদিগকে আইনের কবলের মধ্যে ফেলা কঠিন। তারপর আইনের কবলে পড়িয়া যদি লঘুদণ্ডে ইহারা নিষ্কৃতি লাভ করে, ইহাদের পাপ প্রবৃত্তি সংযত হয় না; অধিকন্তু ইহাদের বুদ্ধি প্রয়োগ-নৈপুণ্য অভিনব পথে এবং অধিকতর উৎকট আকারে প্রযুক্ত হয়। সুতরাং এই পাপ সমাজজীবন হইতে উৎখাত করিতে হইলে পুলিসী তৎপরতা এবং দণ্ডের কঠোরতা দুইটিই সমভাবে প্রয়োজন।

মাহের মুক্তি

দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলের মাহে ফরাসীদের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। ফরাসী সরকার অন্যান্য বৎসরের মত বর্তমান বৎসরেও ১৪ই জুলাই তারিখে 'বাস্তিল দিবস' উদ্যাপন করিতেছিলেন। ঐদিন মাহের মুক্তিকামী সংগ্রামপরায়ণ জনতার আহ্বানে তাহাদিগকে 'বাস্তিল দিবসে'র প্রকৃত মর্যাদা কার্যত স্বীকার করিয়া লইতে হয়। ফরাসী শাসক জনগণের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং ঘোষণা করেন যে মাহের জনগণের প্রতিনিধিস্বরূপে মহাজনসভার নেতৃবর্গের কাছে শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তর করিবার জন্য তিনি পণ্ডিচেরীর ফরাসী ভারতস্থ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে নির্দেশ পাইয়াছেন। গত ১৬ই তারিখে মাহের ফরাসী কর্তৃপক্ষ শাসন-ব্যবস্থা নেতৃবর্গের হাতে সমর্পণ করিয়া সদলবলে পণ্ডিচেরীতে পৌঁছিয়াছেন। ফরাসী কর্তৃপক্ষের মাহে পরিত্যাগের এই ব্যাপার কতকটা আকস্মিকভাবে ঘটিলেও ইহাতে আশ্চর্য হইবার মত কিছু নাই। বাস্তবিকপক্ষে অবস্থার চাপে পড়িয়া তাহাদিগকে বাধ্য হইয়াই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। সুতরাং এতদ্দ্বারা সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হয় নাই, ফলত ভারতের কোন অংশে ফরাসীদের প্রভুত্ব যতদিন পর্যন্ত থাকিবে ততদিন পর্যন্ত তাহা হইতেও পারে না

প্রতিভাস

সুশীল রায়

জানি আমাকে কেবল তুমি ভ্রান্ত ভাব,
যদি না জানি গাইতে তবে কী গান গাব।
বহু বন্দনা-গান মনে হয়েছে জড়ো
বীণা বাজে কি যদি-না তারে স্পর্শ কর।
এই নীরব গানের ভার তাই বহি নি,
আমি পাই নি যে আশ্বাস, শ্বেতাঙ্গিনী।

জেনো পাথরেরও প্রাণ আছে, পাহাড় বাড়ে—
সেও সেজে ওঠে নানা বনফুল-বাহারে।
যদি আবেগের বেগ পাই তেমনি, তবে
এই সংগীত নিভৃতে কি রয় নীরবে।
হব প্রাণে-মনে-সংগীতে-সুরেতে ঋণী
যদি দাও তারে ঝংকার, শ্বেতাঙ্গিনী।

যদি এতটুকু পাই ওই আঁখি-ইশারা
হব নিমেষেই নির্ঘাৎ লক্ষ্মীছাড়া।
পথে যত বাধা-বন্ধন দু পায়ে দলি'
দেব আশা আর দুরাশারে জলাঞ্জলি।
আর পাড়ি দেব ভরানদী কূলপ্লাবিনী
যদি ফুঁ দাও আমার পালে, শ্বেতাঙ্গিনী।

এস বীণা হাতে বাঙ্ময়ী, হে বীণাপাণি,
কানে বর্ষণ কর ওই মর্মবাণী।
এই পূর্বদেশের তুমি পুররমণী
দাও অপূর্ব অপরূপ কণ্ঠধ্বনি।
যেন তোমাকেই জানি আর তোমাকেই চিনি
চাও সদয় চোখেতে শুধু, শ্বেতাঙ্গিনী।

আমি চলে যাব বহুদূর দেশেতে নানা
নাই যে-দেশের সংজ্ঞা ও নাম-ঠিকানা।
আমি মরুর বসতি ভেঙে উদার নভে
বেঁধে নূতন ভবন রব সগৌরবে।
শেষে নেমে এসে পৃথিবীর চেনা উঠোনে
ফের তোমাকে বাঁধব বুকে আলিঙ্গনে।

বৈদেশিকী

১৯ জুলাইএর সকালবেলা কলকাতায় এই প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে। আজ সকালের কাগজ পড়ে পর্যন্ত সাধারণ পাঠকের বুঝবার উপায় নেই মঃ মেঁদে ফ্রাঁস তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারবেন কিনা, অর্থাৎ তাঁর ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণের এক মাসের মধ্যে ইন্দোচীনের যুদ্ধ থামবে কিনা। সে মেয়াদের মাত্র একদিন বাকী। জেনেভার খবরের মধ্যে একটা নূতন অনিশ্চয়তার সুর পাওয়া যাচ্ছে। তার সংগে প্রকৃত অবস্থার কতখানি মিল, তাও বুঝা কঠিন। প্যারিসে মিঃ ডালেসের সংগে আলোচনা করে আসার পর থেকে মঃ মেঁদে ফ্রাঁসের মনোভাবের নাকি একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে; পূর্বে যতটা নমনীয় ছিল এখন নাকি ততটা নেই — যদিও আমেরিকার দিক থেকে অন্তত বাহ্যত জেনেভা কনফারেন্সের প্রতি অসহযোগের ভাবের কিঞ্চিৎ হ্রাস দৃষ্ট হয়।

মিঃ ডালেস অবশ্য জেনেভায় যান নি, তবে মার্কিন আণ্ডার-সেক্রেটারী অব স্টেট মিঃ বিডেল-স্মিথকে কনফারেন্সে যোগ দিতে পাঠিয়েছেন। ইন্দোচীন সম্পর্কে যদি জেনেভায় কোন সমঝোতা হয়, তাহলে মার্কিন গভর্নমেণ্ট সেটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করবেন না, এ ঘোষণাও করা হয়েছে। তবে সংগে সংগে এটাও বলা হয়েছে যে, মার্কিন সরকার নিজে তাতে পক্ষ হবেন না। প্যারিসে মিঃ ডালেসের সংগে মিঃ ইডেন ও মঃ মেঁদে ফ্রাঁসের কথাবার্তার পরে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, তাতে মার্কিন সরকারের এই ভাবকে বৃটিশ ও ফরাসী সরকার স্বীকার করে নিয়েছেন। অর্থাৎ ইন্দোচীনের ব্যাপারে কম্যুনিষ্ট পক্ষের সংগে যদি কোন চুক্তি হয়, তবে তা থেকে মার্কিন সরকার আলগা থাকবেন, যাতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে আমেরিকা যে প্রতিরক্ষা প্যাক্টের পরিকল্পনা করছে, সে বিষয়ে মার্কিন সরকারের কর্মের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

কম্যুনিস্টের পক্ষের ভয় হচ্ছে। ইন্দোচীনে যদি যুদ্ধবিরতি হয়, ত যুদ্ধবিরতি লাইনের দক্ষিণ দি ইন্দোচীনের যে অংশ পড়বে, অর্থাৎ ভি ভিয়েৎনামের দক্ষিণাংশ এবং লাওস কাম্বোডিয়া রাজ্যও মার্কিন পরিকল্পি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্যাক্টের আওতার মধ্যে আনা হবে। কম্যুনিস্টপক্ষ [illegible] ইন্দোচীনের কোন অংশকে মার্কি পরিকল্পিত S. E. A. T. O.'র মধ্যে নেয়া চলবে না, ইন্দোচীনকে নিরপেক্ষীকৃ করে রাখা চাই। কারো কারো ধারণ কম্যুনিস্টপক্ষ এই দাবী জোর করে ধ থাকবেন না, এটা দরাদরির একটা চাল কারণ যুদ্ধবিরতির লাইন একবার [illegible] হলে তার একদিক কম্যুনিস্ট এবং অন্যদি কম্যুনিস্টবিরোধী অঞ্চল হয়ে উঠবেই কাগজে কলমে লাওস, ক্যাম্বোডিয়াকে S. E. A. T. O.'র বাইরে রাখাতে কিছু আসে-যাবে না। কোরিয়াতে যে অবস্থা ইন্দোচীনেও সেইরকমই হবে। সুতরাং কম্যুনিস্টপক্ষ যদি সত্যই যুদ্ধবিরতির জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে থাকেন এবং S. E. A. T. O'র মূলে পরিকল্পনাকে ঠেকানো সম্ভব নয় বলে যদি তাঁদের বিশ্বাস হয়ে থাকে, তাহলে কেবল লাওস, ক্যাম্বোডিয়ার S. E. A. T. O ভুক্তি প্রশ্নের উপর যুদ্ধবিরতির আলোচনা বার্থ হবে বলে মনে হয় না। তবে যদি কম্যুনিস্টপক্ষের বিশ্বাস হয়ে থাকে যে, আরো চাপ লাগালে ফল হতে পারে এবং আপাতত যুদ্ধবিরতি না হলে কম্যুনিস্ট-পক্ষের কোন বিপদ নেই, বরঞ্চ শান্তি আলোচনা ব্যর্থ করার দোষ আমেরিকার ঘাড়ে চাপিয়ে ফ্রান্স ও বৃটেনের সংগে আমেরিকার সম্বন্ধ আরো খারাপ করে দেয়া সম্ভব, যাতে S. E. A. T. O. গঠন ব্যাহত হবে, তাহলে কম্যুনিস্ট পক্ষ এই প্রশ্ন না ছাড়তেও পারেন।

কিন্তু সেরকম বোধ হচ্ছে না। মনে হয় কম্যুনিস্টপক্ষ যুদ্ধবিরতির জন্য সত্যই প্রস্তুত হয়েছেন এবং S. E. A. T. O. আটকানো যাবে না বলে বুঝেছেন এবং S. E. A. T. O. যদি হয়, তবে যুদ্ধবিরতি লাইনের দক্ষিণে ইন্দোচীনের যে অংশ পড়বে, তা S. E. A. T. O.'র আওতার মধ্যে যাবেই। তবে কাগজে-

...লমে সেটাকে S. E. A. T. O.'র বাইরে রাখতে পারলেও কিছুটা সুবিধা আছে, শেষ করে যদি ইন্দোচীন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণের একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণের ব্যাপারের পরিণাম কার্যত কী হয়, তা কোরিয়াতে চেনা গেছে, তাহলেও একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়ে থাকলে তার কিছুটা প্রয়োগ—অন্তত প্রোপাগাণ্ডার ক্ষেত্রে নেয়া যায়। তাছাড়া এই প্রশ্নের দ্বারা পরোক্ষে যুদ্ধবিরতি লাইনের অবস্থান নির্ধারণ দরাদরিতেও কিছু লাভ হতে পারে। যুদ্ধবিরতির লাইন কোন্‌খান দিয়ে হবে, আসলে সেটাই বোধ হয় এখন সবচেয়ে বড়ো দরাদরির ব্যাপার। ভিয়েৎমিনপক্ষের অভিপ্রেত ১৮ অক্ষরেখা এবং ফরাসীপক্ষের অভিপ্রেত ১৪ অক্ষরেখা—এই দুটির মাঝামাঝি ১৬ অক্ষরেখায় স্থির হবে বলে কেউ কেউ মনে করছে। সেখানেই কোরিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ... সরকারের অর্থাৎ বাওদাই-গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে আপত্তি উঠেছে দেশ বিভাগ সম্পর্কে। ভিয়েৎনাম একবার ভাগ হলে যে সহজে জোড়া লাগবার নয়, ভিয়েৎনামীরা কোরিয়ার দৃষ্টান্ত থেকে তা বিলক্ষণ বুঝেছে। কিন্তু যা হবার তা হবেই, ভিয়েৎনামী সরকার বড়ো জোর দক্ষিণ কোরিয়ার ডক্টর সীংম্যান রী'র গভর্নমেণ্টের অনুরূপ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন। সেই লক্ষণই দেখা যাচ্ছে। তাতে ভিয়েৎনামের বিভাগ বন্ধ হবে না বা ভাগাভাগি দেশ জোড়া লাগবে না। তবে কোরিয়াতে যেমন ডক্টর সীংম্যান রীকে খুশী বা ঠাণ্ডা রাখার জন্য এটা-সেটা করতে হয়েছে এবং হচ্ছে, এখানেও সেরকম করতে হবে। আর একটা পরিণতি অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হয়। সেটা হচ্ছে এই যে, ভিয়েৎনাম (দক্ষিণাংশ), লাওস এবং ক্যাম্বোডিয়ার উপর ফরাসী প্রভাবের পরিবর্তে ক্রমশ মার্কিন প্রভাবের বিস্তার হবে, যেটা বাহ্যত ঔপনিবেশিক বন্ধন পাশ থেকে উক্ত রাষ্ট্রগুলির পূর্ণ 'স্বাধীনতা' লাভ বলে প্রচার করা যাবে। যাই হোক, আপাতত যুদ্ধবিরতি সকলের কাম্য বলে মনে হয়। অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি হচ্ছে কি না, তা এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার আগেই বুঝা যাবে।

* * *

সুয়েজ অঞ্চলের সমস্যা সমাধানকল্পে বৃটিশ ও মিশরীয় গভর্নমেণ্টের মধ্যে আবার আলোচনা শুরু হয়েছে। খবরাখবরের রকম থেকে এবার মিটমাটের সম্ভাবনা বেশি বলে মনে হয়। ইরানেও জাহেদী গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তেলের ব্যাপারে একটা বন্দোবস্ত হল, যদিও তাতে আমেরিকাকে বড় রকমের বখরা দিতে হচ্ছে। বর্তমান ইরান সরকার সম্পূর্ণভাবে মার্কিন প্রভাবাধীন হতে চলেছেন। ইরান তুরস্ক-পাকিস্থান প্যাক্টে যোগদান করেছে। মধ্য প্রাচ্যে ইঙ্গ-মার্কিনবিরোধী দল যেগুলি আছে, সেগুলি এখন আরো কাবু হয়ে পড়বে বলে মনে হয়। আরব রাষ্ট্রগুলির দরাদরি করার জোর আরো কমে গেল। পাকিস্থানের 'ভর্নর জেনারেল ও প্রধান মন্ত্রী হজ করতে যাচ্ছেন, ধর্মই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য বিশ্বাস করা কঠিন।

১৯।৭।৫৪

ট্রামে-বাসে

পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনের পর জনাব সুরাবর্দীর যুক্তফ্রণ্টের নেতার আসন গ্রহণের সম্ভাবনা আছে বলিয়া একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বিশুখুড়ো এই সংবাদের উপর মন্তব্য

করিলেন—"আসন থাকিবে এবং তাহাতে বসিবার অধিকারও থাকিবে, শুধু থাকিবে না যুক্তফ্রণ্ট, বিশ্বাস করুন চাই না-ই করুন।"

*　*　*

টাকা হইতে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা গেল যে, শহর হইতে নাকি ভিখারীদের তাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। —"পাকিস্তানের খোদ মালিকদের অনেককেই ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হচ্ছে, তাই ভিখিরীর ভিড় কমানোর জন্যেই হয়ত এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে"—বলে শ্যামলাল।

*　*　*

পশ্চিম পাকিস্তানে পান দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ পূর্ব পাকিস্তান হইতে এরোপ্লেনে করিয়া পান চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন, তবু ভারত হইতে পান কিনিবার কথা ভাবিতেই পারিতেছেন না। জনৈক সহযাত্রী ছড়া কাটিতে লাগিলেন—"ঘুমপাড়ানী মাসিপিসি মোদের বাড়ি যেও, বাটা ভরে পান দেবো, গাল ভরে খেয়ো।"

*　*　*

ভারত পাকিস্তানের জল বন্ধ করিয়াছে; সুতরাং পাকিস্তানে ভারতের সিনেমা ছবি বন্ধ করা হউক, এই দাবী জানাইয়া একদল পাক্-হিতৈষী নাকি লাহোরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছেন। —কোথাকার জল কোথায় গিয়ে গড়ায়, কথাটা এতদিন শুনেই এসেছি, এ ব্যাপারে সেই জল গড়ানো চোখে দেখা গেল"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

*　*　*

ইণ্টার-ন্যাশনাল কোর্টে আসন লাভের জন্য নাকি পাকিস্তান ভারতকে সাহায্য করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছে। —"ভারত নিশ্চয়ই লেডিস্ সীট ছোড় দিজিয়ে বলতে দ্বিধা করবে না"—বলেন বিশুখুড়ো।

*　*　*

রেশনিং প্রথা উঠিয়া যাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, এবার নাকি তাঁর গঙ্গা-স্নান করিবার পালা। —"ডুবটাই যখন দেবেন, তখন ঐ সঙ্গে চান্দ্রায়ণের কথাটাও ভেবে দেখবেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

*　*　*

কলিকাতা শহরতলীর রেলওয়ের বৈদ্যুতিকীকরণের জন্য প্রধান ইঞ্জিনীয়ার এবং তস্য সহকারী নির্বাচিত হইয়াছেন যথাক্রমে শ্রীযুক্ত শার্ঙ্গপাণি এবং শ্রীযুক্ত বজ্রপাণি। —"এখন জনসাধারণ হালে পানি পেলেই হয়"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

*　*　*

বিহারের তথ্যমন্ত্রী মহাশয় "সাধু" সমাজকে পল্লী-উন্নয়ন সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। —"আমরা মন্ত্রী মশাইকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। তবে মন্ত্রীদের পল্লী-উন্নয়নের কাজে অপারগতার কথা খোলসা না জানা পর্যন্ত সাধুরা হয়ত এ ভার গ্রহণে রাজী হবেন না"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

*　*　*

ইরাণের তৈল-বিরোধ ব্যাপা[...] মূল বিষয়গুলির সম্বন্ধে মতৈ[...] হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম "তাহলে তো বলতে হয় ইরাণ কামা[...]

কর দিয়া। আমরা জানি তৈলাধা[...] পাত্র, না পাত্রাধারে তৈল, এর মীমা[...] কোনকালেই হয়নি"—মন্তব্য করেন বি[...] খুড়ো।

*　*　*

ভাখ্রা নাঙাল বাঁধের নাম "জ[...] ড্যাম" দেওয়ার পরামর্শ ন[...] শ্রীযুক্ত জওহরলাল গ্রহণ করেন [...] "করলেও পারতেন, কলিতে যে না[...] কেবলম্"—বলে শ্যামলাল।

*　*　*

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি[...] কলিকাতা স্টেডিয়াম নির্মাণে[...] যাবতীয় কর্মভার গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়[...]

হইয়াছে। —"আমরা যারা এতদিন গাছে[...] চড়ে খেলা দেখে আসছি, সেই আম[...] অন্তত জেনে গেলাম যে, স্টেডিয়াম না[...] হলেও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তা[...] স্থান হলো"—মন্তব্য করেন বৃদ্ধ খুড়ো।

লেখক জীবনের সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি এই যে, তাকে সারা জীবন ধরে খতে হবে এবং আজীবন ভালো খাই লিখতে হবে। একখানা ভালো ই লিখে থেমে গেলে চলবে না। এক-না ভালো বই লিখেছে বলে, পরের টা খারাপ লিখলেও কেউ তাকে ক্ষমা রবে না। শুধু ভালো লিখতে হবে াই নয়, আরো ভালো আরো, আরো লো। উত্তরোত্তর ভালো।

এ-সব কথা আমার নয়। এত কথা মি বুঝতাম না। এ-সব কথা আমাকে শিখিয়েছিল, তাকে আমার গল্পের ধ্য কখনও টেনে আনিনি। আমার বনের শেষ গল্প লিখবো আমি তাকে য়েই। কিন্তু সে-কথা এখন থাক্।

কিন্তু কাকে নিয়ে এই লেখা শুরু রি।

অলকা পাল, সুধা সেন, মিষ্টিদিদি, ছবির বৌদি, আমার মাসিমা, কালো-ম দিদি—কার কথা ভালো করে জানি। কে ভালো করে চিনেছি। আমার বনের সঙ্গে কে জড়িয়ে গিয়েছিল সব য়ে বেশী করে! ছোটবেলা থেকে কত য়গায় তো ঘুরেছি। কত কিছু খেছি। সকলকে কি মনে রাখা সহজ!

সোনাদি

বিমল মিত্র

জব্বলপুরের সেই নেপিয়ার টাউন, বিলাসপুরের শনিচরী বাজার, কলকাতার সেই উডমণ্ড স্ট্রীটে মিষ্টিদিদির বাড়ি, পলাশপুরের মিলি মল্লিক—কত জায়গায় কত লোককে দেখলাম, আমার নোট-বইতে সকলের গল্প লিখে রাখিনি। দু'-একটা টুকরো-টাকরা টুকিটাকি স্কেচ, সব তাই নিয়েই এই গল্প!

সোনাদি বলতো, 'যা কিছু দেখেছিস টুকে রাখ। আর্টিস্টরা যেমন স্কেচ্ করে খাতায়, তেমনি তুইও ধরে রাখ ও-সব, যখন উপন্যাস লিখবি তখন কাজে লাগবে তোর।'

উপন্যাসের কাজে কোনদিন লাগবে কিনা জানি না, তবু অনেক দিন ধরে যেখানে যা-কিছু দেখেছি, লিখে রেখেছি। এক একটা মানুষ দেখেছি, আর যেন এক-একটা মহাদেশ আবিষ্কারের আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছি। এক-একজন মানুষ যেন এক-একটা তাজমহল। তেমনি সুন্দর, তেমনি বিস্ময়-মুখর, তেমনি অশ্রুকরুণ!

ইচ্ছে ছিল, একদিন একখানা উপ-ন্যাস লিখবো। এমন উপন্যাস যে, পৃথিবীর সব মানুষ তাদের নিজের ছায়া দেখতে পাবে তাতে। অসংখ্য চরিত্রের শোভাযাত্রা। হাজার হাজার মানুষের মর্মকথা মুখর হয়ে উঠবে সে-উপন্যাসে। সে হবে দ্বিতীয় মহাভারত। সে আশা আমার সার্থক হয়নি জানি! হবেও না! তবু সোনাদি আশা দিতো, 'কেন পারবি না তুই, নিশ্চয় পারবি—নগদ পাওনার লোভ যদি ত্যাগ করতে পারিস, পুরুত হয়ে পুজোর নৈবেদ্য যদি চুরি না করিস তো, একদিন দেবতার প্রসাদ পাবি তুই নিশ্চয়ই।'

মনে আছে, ছোটবেলায় একমাত্র সোনাদির কাছেই যা-কিছু উৎসাহ পেয়েছি। যখন লুকিয়ে লুকিয়ে লিখে পাতা ভরিয়ে ফেলেছি, বাবা দেখতে পেয়ে রাগ করেছেন, বন্ধু-বান্ধবরা ঠাট্টা করেছে—তখনও কিন্তু সোনাদি হাসেনি।

সোনাদি বলতো, '... দের নিয়ে লেখাই শক্ত, মেয়েদের ...লো করে লক্ষ্য করবি। মেয়েরা ... ন ঠিক মঙ্গলগ্রহের মতো, এত দূরে থাকে তবু তার সম্বন্ধে পৃথিবীর কৌতূহলের আর শেষ নেই। মঙ্গল-গ্রহে পৌঁছুবার জন্যে কি মানুষের কম চেষ্টা, কম অধ্যবসায়! কিন্তু যদি কখনও পৌঁছুতে পারে সেখানে—'

জিজ্ঞেস করতাম, 'পৌঁছুলে কী দেখবে সোনাদি?'

'তা কি বলতে পারি! কেউ হয়তো ঠকবে, কেউ জিতবে। হারজিত নিয়েই তো জগৎ। কিন্তু আমার মনে হয় যে-মানুষের দূরত্ব নেই, তার সম্বন্ধে কোনো মানুষের কোনো কৌতূহলও নেই। মেয়েদের রহস্যময়ী করে সৃষ্টি করার কারণই তো তাই—

গল্পটা কী জানি কেন সোনাদিকে দেখাইনি। দেখাতে লজ্জা হয়েছিল বুঝি! কিম্বা হয়তো তখন সোনাদির অসুখ বেড়ে উঠেছিল। সোনাদির ছিল অদ্ভুত অসুখ। খাওয়া-দাওয়া সবই ছিল স্বাভাবিক মানুষের মতো। সবই খায়, সবই করে, কিন্তু সারাদিন শুধু শুয়েই থাকে। শুয়ে শুয়ে শুধু বই পড়ে কিম্বা জানালা দিয়ে চোখ মেলে থাকে আকাশের দিকে। কিম্বা আমার সঙ্গে গল্প করে, কিম্বা চিঠি লেখে। আমার এই যে বই লেখার নেশা, এর পেছনেও ছিল সোনাদির আগ্রহ। সেদিন যে-মানুষটি উৎসাহ দিয়ে শিক্ষা দিয়ে ভালো-মন্দ বুঝিয়ে দিয়ে আজকের আমিকে চিনিয়ে দিয়েছিল, সে তো আমার সোনাদি। কবে একদিন একটি নিঃসঙ্গ ছেলে নিজেকে প্রকাশ করবার ভাষা খুঁজেছিল পৃথিবীর বিচিত্র মানুষের মধ্যে দিয়ে, সে নিজেও বুঝি তা এতদিনে জানতো না। মুখচোরা ছেলেটি অবাক হয়ে ভাবতো সে বড় অনাবশ্যক এখানে। ভয় হত—মানুষের প্রতিযোগিতার ভিড়ে সে বুঝি হারিয়েই যাবে একদিন। কেউ তার কথা ভাববেও না, বুঝবেও না, মনেও রাখবে না। বেদনার বুঝি শেষ ছিল না তার তাই। তাই রাস্তার একপাশে সকলের ভিড় বাঁচিয়ে সে চলেছে। সকলের চোখ এড়িয়ে সে বেঁচেছে। পরীক্ষার বই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে রাস্তার লোক চলাচলের দিকে চেয়ে সে অন্যমনস্ক হয়ে গেছে বার বার। মাস্টারের সহানুভূতি সে পায়নি। বাপমায়ের অনাদৃত অপোগণ্ড সেই সন্তান। ইস্কুলের আর পাড়ার ছেলেদের বিদ্রূপের পাত্র হয়ে দিন কাটিয়েছে সে একলা। এমনি সময় একদিন সোনাদির সঙ্গে দেখা।

সেদিন সোনাদিকে পেয়ে যেন সত্যিই বেঁচে গেলাম আমি।

কিন্তু দিদি সম্পর্ক তো পাতানো। কবে একদিন সোনাদির বংশের কেউ আমাদের দেশে বুঝি থাকতেন। সে-ও তিন পুরুষ আগেকার কথা। সোনাদির বংশের কে বুঝি একদিন ছিটকে বেরিয়ে পড়েছিলেন গ্রাম থেকে। তারপর যশ, প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি কিছুরই অভাব হয়নি সেখানে। বাংলাদেশ থেকে দূরে পরিবারে শাখা প্রশাখা বেড়েছে। আত্মীয়-স্বজন সকলকে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিয়েছেন। সোনাদি সেই বংশের মেয়ে। তারও বিয়ে হয়েছিল একদিন প্রবাসে। স্বামী নিয়ে সুখে ঘর করতে পারতো সোনাদি। কিন্তু তা হয়নি। কেন হয়নি সে-কথা এখন থাক্।

সোনাদিকে দেখে আমার আর একজনের কথা মনে পড়তো প্রায়ই। সে আমার মিষ্টিদিদি। মিষ্টিদিদিও সোনাদির মতো শুয়ে থাকতো সারাদিন। কিন্তু মিষ্টিদিদির অসুখটা ছিল একটা রহস্য। শুধু আমার কাছেই যে রহস্য তা নয়, সকলের কাছেই।

লিখতে লিখতে আজকাল অনেক সময় অন্যমনস্ক হয়ে যাই। অনেক সময় তলিয়ে যাই নিজের ভাবনার সমুদ্রে। একদিন লেখক হতে পারবো একথা কি সেদিন ভাবতে পারতাম! লোলুপ নয়নে চেয়ে দেখেছি শুধু পরের বই-এর দিকে। ছাপা হয়েছে কত লোকের গল্প কত মাসিক-সাপ্তাহিকের পাতায়। কত লেখা পড়ে কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলে উঠেছে। আর ক্ষোভ হয়েছে, ঈর্ষা হয়েছে মনে মনে কবে আমি এমন লেখা লিখতে পারবো। আমার লেখা পড়ে কবে এমনি করে অন্য পাঠকরা কাঁদবে, হাসবে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ভুলে যাবে! কিন্তু কোথায় গেল সে সব লেখা আর সে সব লেখক। নিজে ভুল-ঠিকানার চিঠির মতন শুধু একদেশ থেকে আর এক দেশে ঘুরেছি। এক ঘাট থেকে জীবনের আর এক ঘাটে। দশটা স্কুল ছুঁয়ে তবে স্কুল-জীবনের শেষ পরীক্ষাটা উৎরোতে পেরেছি। তখনো কি জানি শুধু স্কুলের শেষ পরীক্ষাটাই বড় কথা নয়। জীবনের শেষ পরীক্ষার চৌকা[ঠ] পার হতে অক্লান্ত সাধনা চাই! কিন্তু সোনাদি না-জানালে সে কথা কি আমি জানতাম কোনো দিন! তখনো শুধু জানি সম্পাদকের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকলে লেখা ছাপানো যায়। প্রকাশকের আত্মী[য়] হলেই বই ছাপা হয়। অর্থবান হলে পরমার্থ লাভ হয়। কিন্তু সোনাদি আমায় শেখালে আরেকটা দিকের কথা। সোনাদিই আমাকে প্রথম স্বীকার কর[তে] বলা যায়!

অথচ সোনাদির সঙ্গে পরিচয় সে এক আকস্মিক ব্যাপার বৈকি!

অমরেশই তো আমায় প্রথম পরি[চয়] করিয়ে দিলে। সেই অমরেশ! অমরে[শের] গল্প বলবার ক্ষেত্র এ নয়। কাহিনীতে শুধু নারী চরিত্রের দিক[টা] দেখাবো ভেবেছি। কিন্তু অমরেশের ক[থা] যেদিন লিখবো সেদিন আমার সম[স্ত] কৃতজ্ঞতা উজাড় করে ঢেলে দিতে হ[বে]। অমরেশ নিজেও কোনদিন জানতে পারে[নি] আমার কী পরম উপকারটা সে করেছে।

অমরেশই একদিন ঠাট্টা করে বলেছি[ল] 'সোনাদি জানো, এ কবি—'

সোনাদিও ঠাট্টা হিসেবে ধরেছি[ল] প্রথমে। বলেছিল, 'পদ্য লিখিস ব[ুঝি] তুই?'

বললাম, 'পদ্য নয়, গল্প।'

'গল্প?' শুনে সোনাদি কি[ন্তু] হাসেনি। অবাক হয়ে গিয়েছিল। ... কিছু বলেনি।

কোথায় গেল সেই অমরেশ! কো[থায়] গেল অমরেশের ক্লাবের অন্য সব বন্ধু[রা]। সোনাদির বাড়ির সামনে বাগানের ... কোণে ছিল অমরেশের আখড়া। আ[মি] ছিলাম অমরেশের সাকরেদ। ডা[ম্বেল] ভাঁজতুম, মুগুর ঘোরাতুম। তারপর ... নিয়মে যখন ক্লাব ভেঙে গেল, স...

ছুটকে গেল যে-যার দিকে, আমিই শুধু
য়ে গেলাম টি'কে। সোনাদির সঙ্গে
মার যোগাযোগ রয়েই গেল বরাবর।

সত্যি যদি কোনদিন আমার লেখক-
বিনের জন্ম-কথা লিখি তো সেদিন
নাদির কথা আগে লিখতে হবে।
নাদি না হলে আমার লেখক-জীবনের
লেখাটাই যে বাদ পড়ে যেত।
স্কুলের একটা গরীব ছেলেকে সোনাদি
কী দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিল কে জানে।
চ সোনাদি আসলে আমার কে! কেউ
। আমার সমসাময়িক যারা তাদের এক
খানা করে চোখের ওপর দশ-বারো খানা
বেরিয়ে গেল। নাম-ধাম হল তাদের।
মার একখানাও বই নেই।

সোনাদি বলতো, 'তা না থাক, আগে
টা ভালো করে পাকুক—তারপর...'

এক-একটা গল্প লিখে নিয়ে পড়িয়ে
নাতে যেতুম সোনাদিকে। বলতাম,
নর হাত পেকেছে?'

সোনাদি বলতো, 'না, এখনও ঢের
র—জাত-উপন্যাস লিখতে এখনো
নক দেরি হবে তোর।'

মনে আছে সেই সব দুপুরেগুলোর
া। চারদিকে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর।
ন্ত কলকাতা খালি। রাস্তায় একটা
রিওয়ালাও নেই। একলা-একলা একটা
কেল নিয়ে চলেছি পত্রিকার অফিসে।
টা কি তাদের পছন্দ হয়েছে!
পত্রিকার অফিস থেকে সে-অফিস।
পর আর একটা অফিস। গৃহ থেকে
ন্তরে, কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে। অশান্ত
টি ছেলে সারা কলকাতা সাইকেলে
ঘুরে বেড়িয়েছে। একটা লেখা ছাপা
ক। দশজনে ভালো বলুক। আমার
ত হোক শুধু। আর কিছু কামনা
।

সে-সব দুপুরে সোনাদি ঠাণ্ডা ঘরের
রে বসে ইজি-চেয়ারে ভিজে চুল এলিয়ে
ছে। হাতের বইএর পাতাগুলো
র বাতাসে ফর্ ফর্ করে উড়ছে।
বাইরের বাগানে আমগাছটার ডালে
টা কাদের ঘুড়ি এসে আটকে গেছে।
নের সবুজ পরিবেশে লাল-নীল
র ঘুড়িটা যেন একটা বেখাপ্পা ছন্দ-
নের মতন স্পন্দমান। সোনাদির
টার জাতই আলাদা। সকাল-বিকেলেও
নিরিবিলি। হাতে বাজারের থলি নিয়ে
পথচারীর আনাগোনা বড় নেই। যা কিছু
শব্দ তা মোটরের। ওটা বিশেষ করে
মোটর-বিহারীদেরই পাড়া। আর আমি?
আমি ওই আমগাছটার দোদুল্যমান
ঘুড়িটার মতোই ও-বাড়িতে একমাত্র
অতিথি। ক্ষণে অ-ক্ষণে ওখানে আমার
গতি অবারিত।

শব্দ পেয়ে সোনাদি জিজ্ঞেস করেছে,
'কে রে—'

'আমি—'

'ও, আয়—' বলে সোনাদি আবার
ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়েছে।

আবার ফিরে বলেছে, 'আর কী
লিখলি—'

সোনাদি জানতো লেখার কথা বলতে
পেলে আমি আর কিছুই চাই না। লেখাই
তখন আমার জপ তপ নিদিধ্যাসন।
পকেট থেকে তাড়াতাড়ি কাগজ
বেরিয়ে আসে তখুনি। পাঁচ সাতটা
গল্প আমার পকেটে আছে। একটা
বসবার জায়গা, একজন মনোযোগী শ্রোতা
পেলেই আমি খুশি। আমি জীবন দেখব।
জীবন দেখাবো। যে-কথা লাজুক মুখ-
চোরা মন কাউকে বলতে পারে না, যে-কথা
একা-ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে মাথা কোটে,
আড্ডায়, সমাজে, সভায় বেরোতে আড়ষ্ট
হয়ে যায়, সেই সব কথা সস্তা তিন টাকা
দামের ব্ল্যাকবার্ড ফাউনটেন পেনের ডগায়
কেমন অবলীলায় বেরিয়ে আসে। বলতে
চায়,—আমি লাজুক হলেও সব বুঝি।
আমাকে যতটা বোকা ভাবো আমি তা নই।
আমি তোমাদেরও চিনি। যারা নিজেদের
চেনো না, তাদের আমি চিনিয়ে দেব। যারা
বোবা, তাদের আমি কথা ফোটাবো। আমি
শিল্পী। আমি সাহিত্যিক।

সোনাদিই আমাকে একমাত্র ভালো
করে বুঝতে পারতো।

বললাম 'ওরা ও-গল্পটা ছাপবে
বলেছে, সোনাদি—'

সোনাদি অবাক হয়ে যেত। বলতো,
'ছাপবে?'

'বা রে, কে' ছাপবে না, ওদের কাগজে
যে-সব লেখা বেরোয় তার থেকে তো ভালো
গল্প হয়েছে—'

'তা হোকগে ভালো, সেই তারাই কি
তোর আদর্শ! একদিন তোকে মহা-
ভারত লি... না? একদিন
পৃথিবীর মানুষ ... পৃথিবীর জীবন
নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না? কে কী
ছাপলো কী ছাপলো না, কার চেয়ে ভালো
হল, এ-কথা তুই ভাববি নাকি?'

বললাম, 'আমি থাকি সেই কোথায়,
গিয়ে খোঁজ খবর না নিলে ওরা যে ফেলে
রাখবে—জানা-শোনা লোকদের লেখাই
ছাপবে—'

সোনাদি বললে, 'একদিন তোর কাছে
সবাই ছুটে আসবে এমনি লেখা লিখতে
চেষ্টা কর দিকিনি—যা কিছু দেখেছিস,
সব লিখে রাখ, যা কিছু ভাবছিস, পড়ছিস,
সব টুকে রাখ—সেদিন কাজে লাগবে।'

তারপর হাতের বইটাকে পাশের
টেবিলের ওপরে রেখে দিয়ে সোজা হয়ে
বসতো।

বলতো, 'মানুষকে আগে ভালো করে
চিনতে শেখ, ক'টা মানুষকে দেখেছিস

তুই, আর বয়েসই বা কত—যাদের সঙ্গে পাশাপাশি, ...গছিস, এক সঙ্গে দিনরাত একঘরে কাটাস, তাদেরই কি ভালো করে চিনিস বলে গর্ব করতে পারিস —এই যে এতদিন আমার সঙ্গে আলাপ তোর, কতদিন দুপুরবেলা আমার কাছে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিস— আমাকেই কি চিনতে পেরেছিস তুই?'

হঠাৎ আমাকে ভাবিয়ে তুলতো সোনাদি। সোনাদিকে কি চিনি! সোনাদির সবটুকুকে! যে-মানুষটা এই দুপুরবেলা চুল এলো করে দিয়ে ইজি-চেয়ারে বসে আছে। যে-মানুষটা ধৈর্য ধরে আমার লেখাগুলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা শোনে। উৎসাহ দেয়, নিরুৎসাহ করে। কাছে টেনে নেয়, দূরে সরাতে দ্বিধা করে না। যে-মানুষটা বাইরে এত স্থির, ভেতরে এত অশান্ত। যে-মানুষটা বুদ্ধি, বিদ্যে, ফ্যাশান, সমস্ত নিঃশেষ করে দিয়েছে একটা জীবনে। যে সংসার করে, এ গৃহের গৃহিণী, অথচ এ-বাড়ির কারো স্ত্রী নয়! যে-মানুষ একদিন নিজের সংসার, স্বামী পরিত্যাগ করে এসেছে এক সামান্য কারণে! যে-মানুষটা এতগুলো সন্তান মানুষ করেছে, অথচ আইন মাফিক মা নয় এদের! যে-মানুষ পার্টি দেয়। সে-পার্টিতে নিমন্ত্রিত হবার গৌরবে যে-কোনো পুরুষ বা স্ত্রীলোক গৌরবান্বিত বোধ করবে।!

দাশ সাহেব বলতেন, 'আমাকে বলা মিথ্যে, ও-সব সোনাই জানে—'

অভিলাষ ছিল দাশ সাহেবের চাকর। চা নিয়ে এলে বলতেন 'এই তো চা খেলাম, আবার কেন—'

অভিলাষ বলতো, 'চা তো আপনি খাননি আজ—'

চটে উঠতেন দাশ সাহেব, 'আলবাৎ খেয়েছি। জিজ্ঞেস কর তোর মাকে—'

সোনাদি এসে বলতো, 'কী হল আবার—'

'দেখো তো সোনা, অভিলাষ বার বার আমাকে চা খাইয়ে মারতে চায়—ব্লাড্ প্রেসারটা কত করে কমাবার চেষ্টা করছি—'

ছুটিতে ছেলেমেয়েরা বাড়িতে এসে কোনদিন বায়না ধরলে বলতেন, 'আমাকে না—ওসব তোমরা মা-কে বলো গিয়ে।'

অফিসে গিয়ে দুপুরবেলা টেলিফোন করতেন, 'আজকে কী খাবো সোনা—'

সোনাদি এদিক থেকে বলতো, 'কেন, রোজ যা খাও, টোম্যাটোর সুপ আর দুস্লাইস ব্রেড্—'

'না, আজকে চিকেন রোস্ট করেছিল এখানে, খাবো একটু—'

'না, ডাক্তারকে প্রেসারটা দেখিয়ে, তারপর খেয়ো যত পারো।'

জব্বলপুর থেকে স্বামীনাথবাবু লিখতেন, 'তুমি কিছু ভেবো না, পণ্টুর জ্বর ছেড়েছে। কালকে নিরেনব্বুই ছিল, আজ আটানব্বুইতে নেমেছে। ডাক্তার ভাদুড়ি বলছেন,—টাইফয়েড রোগ সেরে ওঠার পর কোথাও চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া ভালো, ভাবছি অফিসে ছুটি নিয়ে কিছুদিন কোথাও ওকে নিয়ে যাবো—একেবারে রোগা হয়ে গেছে, তুমি দেখলে আর চিনতে পারবে না—'

খাবার টেবিলে সোনাদি একঘণ্টা ধরে বসে বসে খেতো। তখন সবাই বাড়ির বাইরে। দাশ সাহেব মাঝে মাঝে অফিস থেকে টেলিফোন করতেন। আর আমি তখন আমার গল্প লেখার খাতা নিয়ে পড়িয়ে শোনাচ্ছি। একটা গল্প শেষ করে আর একটা। এ একদিন নয়। সোনাদির সঙ্গে আলাপ হওয়ার প্রথম দিন থেকে কেমন যেন ভালো লাগতো। যখন কলকাতায় কেউ আমাকে চিনতো না, তখন একমাত্র সোনাদির কাছ থেকে কী সাহায্যই না পেয়েছি। তবু সত্যিই কি সোনাদিকে চিনতে পেরেছি। কিম্বা চিনতে চেষ্টা করেছি। শুধু জানতাম, সোনাদি দাশ সাহেবের বিয়ে করা স্ত্রী নয়। সে-কথা দুজনকে দেখে কিন্তু বোঝা যেত না। তিনটি ছেলেমেয়েকে দেখেও বোঝা যেত না। সোনাদির আচারে ব্যবহারে সমাজে-সভায় মেলামেশাতেও কেউ ধরতে পারতো না। বাড়ির চাকর-ঠাকুরের ব্যবহারেও সেজন্যে কিছু তারতম্য ছিল না। তেমনি সহজ স্বাভাবিক সুস্থ সম্পর্ক, যেমন আমার নিজের বাড়িতে দেখেছি। মাথার সিঁথিতে সিঁদুর। পায়ে আলতা। সাহেবী খানা ছিল বটে, কিন্তু সোনাদির জন্যে কুলের অম্বল কিম্বা ডাঁটা-চচ্চড়ি রান্না হত মাঝে মাঝে।

আর ওদিকে স্বামীনাথবাবু মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন সোনাদিকে। আমার কাছে সোনাদির কিছুই গোপন ছিল না। সে-সব চিঠি বাইরেই পড়ে থাকতো। কোনো... লিখতেন, 'একজন লাইফ-ইনসিও... এজেন্ট এসেছিল—আর কি লাইফ-ইনসি... করবো?'

সোনাদি লিখতো, 'লাইফ-ইনসিও... করে বরং বাড়িটা সারাও, কিম্বা কলকা... একটা বাড়ি করো। চাকরি থেকে রিট... করে তখন কী করবে—'

তিনি লিখতেন 'তোমার কথা... দুধ খাওয়া শুরু করেছি।'

সোনাদি লিখতো, 'আসছে মাস ... দুধ খাওয়া আরো বাড়াবে—আ... নিজের জন্যে রাখবে।'

এমনি মাসের পর মাস, বছরের বছর।

যখন সোনাদির সঙ্গে প্রথম আ... হয়েছিল তখন এ-সব কৌতূহল ছিল... স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকেও যে এক-... এক ঘরে বাস করতে হয়, এ-সম্বন্ধে কো... সঠিক ধারণা ছিল না। একবারও ... হয়নি সোনাদির স্বামী কেন জব্বলপু... থাকেন। তিনিও কেন একবার আসে... এখানে। কিম্বা সোনাদিই বা এ... জব্বলপুরে যায় না কেন। স্বামীনাথবা... যদি সোনাদির স্বামী তো দাশ সা... কে! দাশ সাহেব এ-বাড়ির ... সোনাদির সঙ্গে দাশ সাহেবের সম্প... কিসের। বেশিদিন যাতায়াত করতে ক... বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এ-সব সম... যখন কৌতূহল হবার কথা তখন সোনা... ব্যবহারে এত মুগ্ধ হয়ে গেছি যে, ও... কথা আর ভাববার অবসর পাইনি। সো... যে কাকে বেশি ভালবাসতো ধরা ... একবার মনে হত তার নিজের স্বামী... আর একবার মনে হত দাশ সাহেব... আবার কখনও মনে হত—আমাকে!

সেই স্বামীনাথবাবুর সেবার হঠাৎ অসুখের খবর এল। এখন যায়, ... যায়। সোনাদির কাছে গিয়ে বসে থা... ওদিক থেকে টেলিগ্রাম আসে আর এ... থেকে টেলিগ্রাম যায়। আমি চুপ... শুধু বসে থাকার বেশি আর কী ক... পারি!

স্বামীনাথবাবু চাকরি কর... জব্বলপুরে। জব্বলপুরের পোস্টাফি... ছাপমারা চিঠি এলেই আমি জব্বলপু... কথা ভাবতে বসে যেতুম। জব্বলপু...

দিন ছোটবেলায় কাটিয়েছি। জব্বল-
রর কালোজামদিদির কথা, মিছরি-
দর কথা মনে পড়তো আমার। মনে
তো নেপিয়ার টাউনে কালোজামদিদির
তে আমাদের সেই ফুটবল খেলার
। সেই 'মনোহর-দি-মাকাল-ফলে'র
। সব মনে পড়ে যেত! সেই মনো-
র সঙ্গে সেদিন এতদিন পরে হঠাৎ
ও হয়ে গিয়েছিল।

আমার কালোজামদিদির গল্পটা আমি
াদিকে বলেছিলাম। গল্পটা শুনে
াদি সেদিন কিছু বলেনি প্রথমে।
জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন লাগলো,
াদি?'

সোনাদি বললে, 'এত অল্পবয়েসে
তি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস, কিন্তু
তিটাই তো মানুষের প্রকৃতি নয়।
তি হল প্রকৃতির বিকার। লেখকদের
দৃষ্টি খণ্ডিত থাকে তখনই সে
রকম বিকৃতি নিয়ে মাথা ঘামায়। একে
াচার বলে না—। একে বলে পশ্বাচার।
ড় হয়ে তন্ত্র পড়লে বুঝবি শক্তি-উপাসনা
রকমের। এক বীরাচারী আর দুই
শ্বাচারী। লেখকদের মধ্যে এই দুই
কমের জাত আছে। কিন্তু তুই বীর সাধক
তে চেষ্টা কর। তবেই নাম হবে। বড়
ড় লেখকদের লেখা পড়তে হবে। শুধু
নিজে চরিত্র দেখে বেড়ালেই চলবে না।
ষট্চক্রভেদ শিখতে গেলে যে গুরু
চাই...'

এমনি কত উপদেশ দিত সোনাদি।
চুল এলিয়ে দিয়ে ইজি-চেয়ারে বসে বসে
আপন-মনে বলে যেত আর আমি
চেয়ে দেখতাম আর শুনতাম।

বলতো, 'নজর রাখবি বৃহতের দিকে,
ভূমার দিকে। সাধকের সঙ্গে লেখকের
কোনো তফাত নেই। যে লেখকরা সাধক
হতে পেরেছে তারাই ঋষি। মুণ্ডকোপ-
নিষদে আছে—

ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

যে ব্রহ্ম দেখতে পেয়েছে তার অবিদ্যা
চলে যায়, তখন আর কোনও মায়া থাকে
না তার। তখন রামপ্রসাদের মতো সে
বলতে পারে—

ইহ জন্ম পর জন্ম বহু জন্ম পরে
রামপ্রসাদ বলে আমার জন্ম হবে না জঠরে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায়
শ্বেতকেতু পিতাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—

যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং
মতং অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি কথং নু
ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি—

হে ভগবান, কী সে জিনিস যা
জানলে আর কিছু অজ্ঞাত থাকে না?

সোনাদি দর্শন-শাস্ত্র পড়েছিল বাবার
কাছে কত বছর ধরে। স্বামীনাথবাবুর
সঙ্গে বিয়ে হবার আগে সোনাদি কেবল
পড়াশোনা নিয়েই মেতে ছিল। বিশ্বেশ্বর-
বাবু নিজের মনের মতো করে গড়ে
তুলেছিলেন একমাত্র মেয়েকে। আজমীরের
শুকনো হাওয়ার সঙ্গে তাল রেখে গড়ে
উঠেছিল সোনাদি। কিন্তু তা বলে মনের
রসকষ শুকিয়ে যায়নি একেবারে। বেদ-
উপনিষদের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় এক
বিচিত্র বিশ্বাস মনের সমস্ত ভিত্তিমূলকে
একেবারে সুদৃঢ় করে তুলেছিল। সেখান
থেকে যেন নড়চড়ের কোনো ভয় ছিল না
আর। ছোটবেলাকার সেই শিক্ষা,
অপরিণত মনের সেই গ্রহণ, সারাজীবনের
সঙ্গে একেবারে জড়িয়ে গিয়েছিল। বিয়ে
হল, তবু সে বিশ্বাস তার বদলালো না
কোনদিন।

বিশ্বেশ্বরবাবু মারা যাবার আগে
বলে গিয়েছিলেন, 'অভেদে ভেদ না দেখে
ভেদের মধ্যে অভেদকে দেখবে মা, কেবল
বাদীর দর্শন ভেদেই তার যা ভিন্ন ভিন্ন
রূপ—'

বিয়ের পর স্বামীনাথবাবু একদিন
বললেন, 'এখানে কি তোমার অসুবিধে
হচ্ছে?'

নূতন বধূ বললে, 'অসুবিধে হবে
কেন?'

'কাল রাত্রে দেখলাম তুমি ঘরে শুতে
আসোনি।'

'পড়তে পড়তে অনেক রাত হয়ে গেল,
তারপর ওখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—
তুমি কি রাগ করেছিলে?'

'না, প্রথমে খেয়ালই হয়নি, ভোরবেলা
ঘুম থেকে উঠে নজরে পড়লো আমি
একলা শুয়ে আছি ঘরে।'

'একলা শুতে যদি তোমার সুবিধে
হয় তো, আমি না হয় দক্ষিণের ঘরেই
শোব এবার থেকে।'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'দক্ষিণের
ঘরে যদি শোও তো মশারিটা ভালো করে
গুঁজে দিয়ো [illegible]কে, ও ঘরে একটু
মশা আছে।'

'ঘুমোব আর ক[illegible] বা, বই
পড়তে পড়তেই তো রাত তিনটে বেজে
যায়।'

'রাত জেগে পড়া কি ভালো?'

'আমার যে [illegible] জগে পড়াই অভ্যেস।'

'অভ্যেসটা [illegible]গ করতে চেষ্টা করো, ওতে শরীর খারাপ হয়।'

এমনি করেই সূত্রপাত হয়েছিল। খুব সহজ স্বাভাবিক আরম্ভ। ঠিক বিরোধ নয়। আবার যেন ঠিক অনুরাগও নয়। বাইরের লোক যে দেখতো সে-ই অবাক হয়ে যেত।

সোনাদি আমাকে তার জীবনের সমস্ত কথা শোনাতো। আমার কাছে কিছু গোপন রাখতো না।

ননদরা বলতো, 'হ্যাঁ বৌদি, দাদা না হয় মাটির মানুষ, কিন্তু তোমার আক্কেল-খানা কী?'

সোনাদি বই থেকে মুখ তুলে বলতো, 'কিসের আক্কেল, ঠাকুর-ঝি?'

'তোমার বই পড়তে এত ভালোও লাগে! আমাদেরও তো বিয়ে আমরাও তো বই পাড়ি, কিন্তু বি পর...'

সোনাদি বলে, 'কিন্তু এ-সব তোমার দাদারই কিনে দেওয়া।'

'তুমি বই পড়তে ভালোবাসো জানতে পেরেছে, তাই...কিন্তু তা সারাদিন বই মুখে দিয়েই থাকবে

'এ-বইটা যদি পড়ো ঠাকুর-বি

নাওয়া-খাওয়া ভুলে যাবে, এমনি

আমাদের সংসার-ধর্ম আছে বৌদি, দের বই নিয়ে থাকলে চলে না।'
সোনাদি হেসে উঠলো, 'আর আমার সংসার-ধর্ম নেই?'
সংসার-ধর্ম থাকলে আর এমন বই মেতে উঠতে পারতে না,...তা দাদার তোমার ক'দিন কথাবার্তা নেই, ?'
'ওমা, সে কী কথা, এই তো পরশু-কথা বললাম।'
স্বামীনাথবাবু সেদিন অফিস থেকে তেই সোনাদি বললে, 'ঠাকুর-ঝি কী ছল জানো, তোমার সঙ্গে নাকি আমার া হয়েছে, কথা না বললেই যেন া হতে হবে—'
স্বামীনাথবাবু বললেন, 'ওদের কথায় দিয়ো না।'
'কিন্তু তুমিই বলো না, তুমি কি এতে করো?'
স্বামীনাথবাবু হাসতে হাসতে বললেন, াকে দেখে বুঝতে পারো না, আমি করি কিনা?'
সোনাদি বললে, 'তুমি ওদের সকলকে লে বলে দিয়ো যে তুমি এতে রাগ া না—ওরা কেন বোঝে না, ওদের াতে পারো না যে তোমার এতে অমত ?'
'আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে বলবো দের, কিন্তু ওরা কি বুঝবে?'
সেইদিন থেকে জব্বলপুরের একটি সারে স্বামী-স্ত্রীর এক অদ্ভুত দাম্পত্য-বন শুরু হল। সোনাদি স্বামীনাথ-রের স্ত্রী। তবু এক শয্যায় শয়ন না, লেও কিছু আসে যায় না ওদের। মীনাথবাবুর সঙ্গে যেদিন দেখা হয়, নাদি বলে, 'তোমাকে যে বড় রোগা খাচ্ছে আজ—'
স্বামীনাথবাবু সংক্ষেপে বলেন, ফিসে বড় খাটুনি পড়েছে কিনা জকাল।'
'অত না-ই বা খাটলে?'
'না খাটলে কি চলে?'
'রাত্রে ঘুম হয় ভালো?'
'ঘুমের ব্যাঘাত হবার তো কোনও কারণ নেই, একবার শুলে কখন যে আমার রাত পুইয়ে যায় টেরও পাইনে।'
'তাহলে খাওয়া-দাওয়া ভালো ক'রে করো, দুধটা তোমার আরো বেশি করে খাওয়া উচিত।'
'দুধ তো খাই।'
'তবে কিছুদিন ছুটি নিয়ে কোথাও চেঞ্জে যাও দিনকতক।'
'আর তুমি?'
'তুমি যদি বলো আমিও সঙ্গে যেতে পারি।'
'আমি না বললে যাবে না সঙ্গে?'
'আমার তো যাওয়াই উচিত, কিন্তু যদি না-ই যাই, তাতে কি তোমার খুব অসুবিধে হবে?'
'না, অসুবিধে আর কি?'
'তাহলে একলা যেও না কিন্তু; অফিস থেকে একজন চাপরাসী সঙ্গে নিয়ো, তোমার দেখাশোনা করবে।'
একদিন অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরলো সোনাদি। নেপিয়ার টাউনে দাশ সাহেবের বাড়িতে গীতাপাঠ হচ্ছিলো। ভাষ্যকার কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন, 'জীব কি অণু, না বিভু? জীব কি ব্রহ্মের অংশ, না ছায়া? জীব কি ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন, না অভিন্ন? আমাদের দর্শন-শাস্ত্রের এ এক মূল সমস্যা, মৈনাককে যদি লেখনী করি আর সমুদ্র-জলকে মসিরূপে ব্যবহার করি, তবু এর মীমাংসা হয় না—
ব্রহ্মসূত্র বলছেন,—অংশো নানাব্যপদেশাৎ...
অথচ গীতা বলছেন,—অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্...
আবার উপনিষদ বলছেন,—একই ভূতাত্মা ভূতে ভূতে অবস্থিত রয়েছেন। জলে চন্দ্রের ছায়ার মতো একই তিনি বহুরূপে দৃষ্ট হচ্ছেন...।'
ননদরাও শুনছিল। এক সময়ে বললে, 'চলো বৌদি, সংস্কৃতর কিছু মাথা-মুণ্ডু বুঝছিনে, বাড়ি গিয়ে ঘুমোলে কাজ হবে।' কিন্তু সোনাদির খুব ভালো লাগছিল। বললে, 'আর একটু শোনো না ঠাকুর-ঝি, বড় ভালো লাগছে।' সোনাদির মনে হচ্ছিল যেন সে বাবার কাছে বসে গীতার ব্যাখ্যা শুনছে। এমনি করে বাবার কথা শুনতে শুনতে কতদিন বিভোর হয়ে [illegible] কতদিন সংসার, সমাজ, খাওয়া-দাওয়া [illegible]লে গেছে বাবার পড়া শুনতে শুনতে।
ননদরা বললে, 'তবে তুমি থাকো বৌদি, আমরা আসি—'
কখন ননদরা চলে গেছে। সভার সব লোক চলে গেছে। শেষ পর্যন্ত বুঝি দাশ সাহেব একলা বসে ছিলেন। তা দাশ সাহেব নিজের গাড়ি করেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন। বাড়িতে এসে যখন পৌঁছুলো তখন রাত প্রায় বারোটা। সমস্ত আবহাওয়া নিঝুম। বাগানের গেট খুলে যখন ঢুকলো তখনও সোনাদির খেয়াল নেই রাত ক'টা বেজেছে।
দরজা খুলে দিয়ে ননদ বললে, 'হ্যাঁ বৌদি, এত রাত্তির করলে?'
'রাত ক'টা?'
'দেখো না ঘড়ির দিকে চেয়ে—'
স্বামীনাথবাবু ঘুম থেকে জেগে উঠে বললেন, 'ঠাণ্ডা লাগেনি তো?'
সোনাদি বললে 'না।'
পুটুর তখন এক বছর বয়েস। সোনাদি বললে, 'পুটু তাহলে তোমার কাছেই থাক্!'
স্বামীনাথবাবু বললেন, 'থাক্ আমার কাছেই, তুমি শুয়ে পড়োগে যাও—'
দাশ সাহেবের বাড়িতে আজ গীতা-পাঠ, কাল কথকতা, পরশু রামায়ণ পাঠ। দাশসাহেব ওসব ধর্ম-কর্মের ধার ধারেন না। দাশ সাহেবের স্ত্রীর অনুরোধেই এইসব অনুষ্ঠান হ'ত। কিন্তু সেই স্ত্রী-ই একদিন মারা গেল হঠাৎ, দুটি ছেলে-মেয়ে রেখে সংসারকে একেবারে অনাথ করে দিয়ে। সেই অনাথ সংসারের হাল ধরতে এল সোনাদি।
রতি বলে, 'আজ তোমার কাছে শোব মা আমি।'
শিশু বলে, 'আমাকে বেড়াতে নিয়ে চলো না মা তোমার সঙ্গে।'
প্রথম প্রথম পালিয়েই আসতো সোনাদি। রতি আর শিশু দেখতে না পায়। অভিলাষ তখন থেকেই ছিল। ভুলিয়ে-ভালিয়ে সে-ই আড়ালে নিয়ে যেত। দাশ সাহেবের গাড়ি নিঃশব্দে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিত সোনাদিকে।
দাশ সাহেব বলতেন, 'তোমার তো ভারি অসুবিধে হল দেখছি!'

'না, অসুবিধে আর কী?'

'কিন্তু তোমাকে মা বলে ডাকতে শেখালে ওদের কে?'

'ওদের মা বলতে শেখাতে হয় না— আমি তিনজনেরই মা যে—'

'কিন্তু রাত্তির বেলা তোমাকে যে এখানে থাকতে বলে ওরা, স্বামীনাথবাবু কী ভাবছেন কে জানে—'

'ও'কে তাহলে তুমি খুব চিনেছ!'

'এই যে এ-বাড়িতে এতক্ষণ কাটাও, উনি কিছু বলেন না?'

'বাড়িতে থাকলেই কি আমার সঙ্গে চব্বিশ প্রহর দেখা হয়?'

সেদিন স্বামীনাথবাবু বললেন, 'ক'দিন তোমাকে দেখিনি মনে হচ্ছে?'

সোনাদি বললে, 'আমি তো বাড়িতে তিন দিন আসতেই পারিনি।'

'ও।'

তবু স্বামীনাথবাবু জিজ্ঞেস করলেন না, এ-তিনদিন কোথায় ছিল সোনাদি। কী এমন রাজকার্য!

সোনাদি নিজেই বললে, 'রতির বড় অসুখ করেছিল জানো।'

স্বামীনাথবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কেমন আছে?'

খানিক পরে স্বামীনাথবাবু বললেন, 'এ মাসে প্রিমিয়ামের টাকাটা এখনও পাঠানো হয়নি, চিঠি এসেছে একটা।'

সোনাদি বললে, 'আমি আজই পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'আমি আজকে কী খাবো?'

'কেন, তোমার শরীর খারাপ নাকি?'

'মাথাটা ধরেছে সকাল থেকে, ছাড়ছে না মোটে।'

ওদিকে দাশ সাহেবের লোকও চিঠি নিয়ে আসে—'রতি তোমাকে দেখবার জন্যে বায়না ধরেছে বড়, একবার এলে আমি অফিস যেতে পারি—'

সংসারের সম্বন্ধে কয়েকটি খুঁটিনাটি বিষয়ে উপদেশ দিয়ে তখনি সোনাদি চলে আসে দাশ সাহেবের বাড়িতে।

দাশ সাহেব বলেন, 'আজ আমার অফিস যাওয়াই হল না।'

'এখন তো আমি এসে গেছি, এখন যাও।'

'এত দেরি করে আর যাবো না—'

'অফিস কামাই কোরো না মিছিমিছি, যাও, গাড়ি বার করতে বলছি আমি।'

'না-ই বা গেলাম।'

'না, তোমায় অফিস যেতেই হবে।'

এমনি করে এক অদ্ভুত সম্পর্ক গড়ে উঠলো জব্বলপুরের নেপিয়ার টাউনের দুটো বাড়ির সঙ্গে। সারাদিন দাশ সাহেবের বাড়িতে কাটালেও স্বামীনাথবাবুর কোনও অস্বস্তি হবার কথা নয়। সোনাদি স্বামীনাথবাবুরই স্ত্রী, তা সে নিজের বাড়িতেই থাকুক, আর পৃথিবীর যেখানেই থাকুক। আর দাশ সাহেব? কাছে পেলেই কি সম্পূর্ণ পাওয়া হয়! এক ছাদের তলাতে থাকলেই কি একাত্ম হওয়া যায়। সোনাদি দূরে গেলেও যেন কাছে থাকে, কাছে রেখেও যেন দুর্লভ মনে হয় সোনাদিকে! সত্যিই তো অখণ্ডকে যে জানতে পেরেছে, খণ্ড দেখে তো ভয় পাবার কথা নয় তার।

সোনাদি বলতো, 'উর্বশীর মতো একটা চরিত্র আঁকবার চেষ্টা কর্ তো দেখি, যে কারও মাতা নয়, কন্যা নয়, বধূ নয়— কিছু নয়! বিক্রমোর্বশী পড়েছিস? পুরুরবার সঙ্গে উর্বশীর সেই সম্পর্ক— মনে আছে?'

মনে হত সোনাদি যেন নিজের কথাই বলতে চাইছে। আমি যাদের দেখেছি, যাদের কথা লিখেছি—সব যেন সাধারণ মেয়ে সব। ওই সুধা সেন, অলকা পাল, মিষ্টিদিদি, মিছরি-বৌদি, মিলি মল্লিক— সবাই তুচ্ছ। সোনাদি আমার একটা গল্পও তাই ভালো বলেনি কোনদিন। কিছুই পছন্দ হয়নি সোনাদির কখনো। বলতো, 'বৃহতের দিকে নজর রাখ্, দৃষ্টি রাখ্ ভূমার দিকে, দৃষ্টি রাখ্ মহাভারতের দিকে। উপন্যাস যদি লিখতেই হয় তো মহা-উপন্যাস লিখবি—অখণ্ড যার পরমায়ু। নইলে বছরে দুটো করে বই লিখবি আর বছর না কাটতেই সব ভুলে যাবে লোকে, তবে আর কিসের জীবন-শিল্পী!'

আমিও ভাবতাম—এত চরিত্র দেখেছি বলে আমার মিথ্যেই গর্ব! সত্যিই যে উর্বশীকে দেখতে পেয়েছে, তার কাছে সব নারী-চরিত্রই তো ম্লান।

তাই মিছরি-বৌদির গল্পটা লিখবো লিখবো করেও আর লিখিনি। অথচ মিছরি-বৌদিকেই একদিন মনে হত বিচিত্র চরিত্র! অমরেশের বউ, মিছরি-বৌদি।

তা মিছরি-বৌদির গল্পটা শু[illegible] সোনাদি বলেছিল, 'তুই আমায় কথ[illegible] দশ বছর তোর লেখা আর ছাপাবি[illegible] কোথাও।'

এখন বুঝতে পারি, সোনাদি কত[illegible] উদারতা নিয়ে আমার গল্পগুলো শু[illegible] কিন্তু মতামতগুলো ছিল নির[illegible] আমাকে বার বার কেবল লেখা ছ[illegible] বারণ করেছে। বলেছে, 'লেখা ছ[illegible] এত আগ্রহ কেন তোর? লেখা [illegible] হলেই কি মহা-লেখক হয়ে যাবি?'

সব দিক থেকে যখন হতাশ [illegible] আর কোথাও যাবার মত জায়গা থা[illegible] না আমার, তখন যেতাম সোনাদির [illegible] কিন্তু না গেলেও কোনদিন [illegible] অনুযোগ শুনিনি সোনাদির কাছে। শুধু আমার ব্যাপারেই নয়। ছেলে[illegible] অসুখেও কোন উদ্বেগ দেখিনি ক[illegible] মনে হত সোনাদি যেন সারা পৃথি[illegible] একলা। দাশসাহেব, স্বামীনাথবাবু [illegible] তাকে সঙ্গ দিয়ে সুখী করতে পার[illegible] সোনাদিকে স্ত্রী পেয়েও স্বামীনা[illegible] যেন তাকে বেশি কাছে পাননি। [illegible] দাশ সাহেবের বাড়িতে থাকলেও [illegible] দূরে চলে যায়নি সোনাদি। [illegible] চারিদিকে এক দুর্ভেদ্য রহস্য[illegible] জড়িয়ে রাখে অনেকে। সোনাদির [illegible] ছিল না। সহজ-সরল-স্বাভাবিক [illegible] সোনাদির। তবু সোনাদিকে কাছে [illegible] গৌরব কারো কপালেই যেন [illegible] সোনাদি কারো কোনও কাজে কে[illegible] আপত্তি করেনি, তবু কোন কাজ [illegible] গেলে যেন সোনাদিকে না [illegible] করলেও চলবে না!

জব্বলপুরে সোনাদির যে [illegible] অনেকের চোখে অস্বাভাবিক মনে [illegible] দাশ সাহেবের সঙ্গে কলকাতা[illegible] আসার পর তা যেন তাদের চোখে অ[illegible] মনে হল। কেউ আর সোনাদিকে [illegible] পারলো না। কিন্তু বুঝেছিলেন [illegible] হয় স্বামীনাথবাবু। তিনি সো[illegible] অল্পদিনেই চিনে নিয়েছিলেন।

(শেষাংশ ৮৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দেবতাত্মা হিমালয়

প্রবোধকুমার সান্যাল
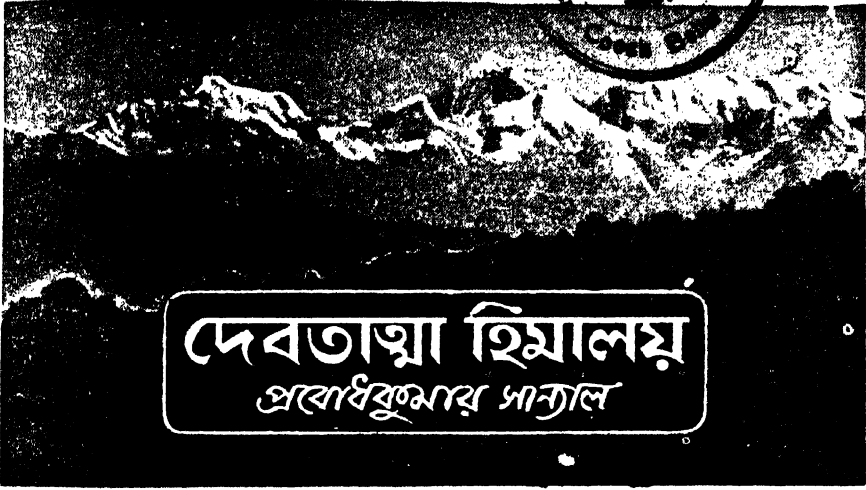
গুহাতীর্থ অমরনাথ

৪

এই আমাদের কপালে ছিল। ভাগ্য-দেবতা বললে, ভয় নেই, তোদের [illegible]রো না, কেবল শীতের চাবুকে ঠাণ্ডা [illegible]লো। এই দ্যাখ্, মুষলধারায় বৃষ্টি। [illegible]র বল্, ঈশ্বরকে মানিস কিনা?

শোনো কথা। পৃথিবীর বহু ঈশ্বর[illegible]র চোখে দিনরাত অশ্রু গড়ায় কেন? খেয়ে তাদের হাড়পাঁজরা ভাঙেগ[illegible]? পুণ্যের সংসারে কেন আগুন [illegible]গ? ভক্তিমতী বিধবার একমাত্র সন্তান [illegible] মরে অপঘাতে?

আবার তর্ক? তর্কে পাবি কিছু? [illegible]—মর!

মনে মনে বললুম, যাবার সময় মেরো [illegible] দোহাই। ফিরতি পথে 'এভালান্স্' [illegible]য়ো—একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবো। [illegible]পায়া লোক, দেশে গিয়ে আর দুঃখ [illegible]ত হবে না! মরে বাঁচবো!

পিছন থেকে হিমাংশুবাবু চেঁচালেন, মশাই, এ কি হোলো?

প্রবল বৃষ্টির ঝাপটায় আমাদের [illegible]া স্থির থাকছে না। গণিশেরের কাছে ছিল আমার ছাতা। ঘোড়ার পিঠে ব'সে ব'সেই সেই ছাতা নিলুম বাঁহাতে। কিন্তু এক হাতে ঘোড়ার পিঠে ভারসাম্য রক্ষা করা যে ভয়ানক সমস্যা। উত্তরদিক থেকে নদী বয়ে এসে ছুটছে পূর্বদিকে। এই মস্ত নদী আমাদের পেরোতে হবে। ঠাণ্ডায় অসাড় হচ্ছি প্রতি মুহূর্তে। কিন্তু ওর মধ্যেই অতি সন্তর্পণে ছাতা নিয়ে বাঁ হাতে ধ'রে থাকতে হোলো। নদীর খানিকটা অংশ পায়ে হাঁটা, খানিকটা সাঁকো। সামনে পিছনে মেঘের মধ্যে আমরা ডুবেছি। তার উপরে আবার প্রবল বারিধারার জন্য একটা আবছায়া যাদুজাল সৃষ্টি হয়েছে। যতদূর দক্ষিণে দৃষ্টি চলছে, পাহাড়ে পাহাড়ে শুধু তুষারের মুকুট। একদিকে লাডাক, একদিকে তিব্বত, উত্তর-পশ্চিমে জোজিলা গিরিপথ এবং উত্তর-পূর্বে ভৈরবঘাট পেরিয়ে অমরনাথ পর্বতচূড়া। নীচে এই খরস্রোতা অমরাবতী নদী—যাকে বলা হচ্ছে অমরগঙ্গা। আমরা পুনরায় ষোল থকে পনেরো হাজার ফুটে নেমেছি।

বৃষ্টির সঙ্গে ঝড় আমাদের ধাক্কা দিচ্ছে। হিমাংশুর সর্বাঙ্গ—মাথা সমেত—ঢাকা আছে পাতলা প্লাস্টিকের ওয়াটার প্রুফে। আমি ভিজছি মোটা জামা ও প্যাণ্ট সমেত। জল লাগছে হাতে পায়ে পিঠে—কেবল ছাতার জন্য বাঁচছে মাত্র মাথাটা। বরং মাথাটা গিয়ে বাকিগুলো বাঁচলে কাজ দিত। আমরা সাঁকো পার হচ্ছিলুম। ভাগ্যবিধাতার চেষ্টা ছিল, ঘোড়াসুদ্ধ ধাক্কা দিয়ে নদীগর্ভে তিনি আমাদের ফেলে দেন এবং ল্যাটা চুকে যায়। কিন্তু গণিশেরের কাছে তিনি পরাজিত, তাঁর কৌতুকরঙ্গ গণিশের বোঝে—সেইজন্য সে সকল অবস্থার জনাই প্রস্তুত থাকে। ধীরে ধীরে আমরা সেই প্রবল বারিবর্ষণের ভিতর দিয়ে সাঁকো পেরিয়ে ওপারে গিয়ে উঠলুম। ওপারে বালু ও পাথরের চড়া,—তারই পিছনে বিস্তৃত পঞ্চতরণীর তুহিন উপত্যকা। উপত্যকার পিছনে ভৈরব-ঘাটের বিশাল পর্বতচূড়া তুষারমণ্ডিত। চোখ ভ'রে দেখে নিচ্ছি সব, চোখ থেকে আমাদের কিছু না হারায়। এখানে আমার ডায়েরী থেকে একটুখানি উদ্ধৃত করিঃ

"ধীরে ধীরে তিন মাইল বরফানি বাতাসের ভিতর দিয়ে নদীগর্ভে এসে নামলুম। ঝড়বৃষ্টির ঝাপটায় কোনো কিছু দেখতে পারলুম না। কে কোথায় রইলো, কা'র কি গতি হোলো কে জানে। ঘোড়ার উপরে ব'সে সর্বশরীর ঠান্ডায় শিটিয়ে উঠছে। এখানে তাপমাত্রা বলতে আর কিছু নেই। ভয়েরকথা এই, সমস্ত জামা কাপড় এবং বিছানাপত্র ভিজে থক থক করছে। আমরা উদ্‌ভ্রান্ত, ক্লান্ত এবং বিপর্যস্ত। ঠান্ডায় জমে যাচ্ছি যেন। নদী পেরিয়ে এপারে এলুম। মাথার উপরে বরফের চূড়া। তুহিন বাতাস মুহুর্মুহু ঝাপটা দিয়ে চলেছে তুষার ঝড়ের মতো। কিন্তু সমস্তটা কী অপরূপ, কী অভিনব আমাদের চোখে। সর্বপ্রকার বিপদ আপদের বাইরে এখানকার পার্বত্য প্রকৃতির যে স্বাভাবিক শোভা দেখে গেলুম, সেই ত' আমাদের পরম পুরস্কার। তাকেই ত' লালন করবো মনে মনে চিরদিন! যাই হোক, খানিকটা চড়াই উঠে গিয়ে বিস্তৃত পঞ্চতরণীর উপত্যকা পাওয়া গেল। সেখানে পেঁছে সেই বৃষ্টির মধ্যে ধৈর্য সহকারে গণিশের আমাদের তাঁবু খাটিয়ে দিল। বেলা তখন দুটো বেজে গেছে। হিমাংশুবাবু তাঁবুর মধ্যে ঢুকে স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিলেন, আর তাঁর দেখা পাওয়া যায়নি। আমরা হাড়ের মধ্যে ঠক ঠক ক'রে কাঁপছি, কষ্ট পাচ্ছি এবং আর্তনাদ করছি। পকেটে খান দুই বিস্কুট ছাড়া এই দুর্যোগে আর কোনো আহারাদির কথা ওঠে না। গরম চা স্বপ্ন! তাঁবু থেকে কারো বেরোবার সাহস হচ্ছে না। কেমন ক'রে আহার অন্বেষণ করা হবে কেউ জানে না। নীচে দিয়ে নদী বইছে, তার ধারে এই তুহিন প্রান্তর। কোথাও কোথাও একটু আধটু ঘাস দেখতে পাচ্ছি। বাদ বাকি সমস্তটাই শূন্য ধূসর আব-ছায়াময় জনচিহ্নহীন পার্বত্য প্রকৃতি। তাঁবুর মধ্যে ব'সে যখন এই কথাগুলি এলোমেলোভাবে লিখে যাচ্ছি, তখন সন্ধ্যা সাতটা। শরীরের নীচের দিকটা বলতে গেলে অসাড় হয়ে গেছে এই বৃষ্টিবাদলের ঠান্ডায়।"

বৃষ্টি কমে গেছে সন্ধ্যার পর। কিন্তু তাঁবুর বাইরে আর কোথাও কিছু দেখা যায় না। ইস্পাতের ফলকের মতো ধূসর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে অদূরে খরতর নদী বয়ে চলেছে। চারিদিকে তার এমন ভীষণ বৃক্ষলতাহীন অনুর্বর পাহাড়তলী সহসা আর কোথাও দেখা যায় না। আন্দাজে বুঝতে পারি মেঘেরা নেমেছে পাহাড়ের গায়ে গায়ে। মেঘ আর গ্লেসিয়ার ঝুলছে প্রত্যেক পাহাড়ের কোলে কোলে। গতকাল থেকে সেই দুর্যোগ এবং বাতাস এখনও কমেনি। ইতিমধ্যে পেয়েছিলুম

প্রকৃত অমরনাথ গুহা

গরম চা এবং কিছু খাদ্য তাতে উপোস-রক্ষা হয়েছে। বুঝতে পারা যাচ্ছে আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি কোনোমতে পছন্দসই আহার জোটাতে পারি। আজ নিয়ে তৃতীয় দিন হোলো পহলগাঁও থেকে বেরিয়েছি। তিনদিন কিংবা তিন বছর সহসা ঠাহর করা যায় না। ভুলে গেছি সব, স্মৃতিশক্তি অনেকটা যেন লোপ পেয়ে গেছে। প্রতি ঘণ্টায় আবিষ্কার করেছি নতুন দেশ, নতুন জগৎ, নতুন প্রকৃতি। প্রতি মাইল পথ হোলো আমাদের জীবনের এক একটি পরিচ্ছেদ, এক একটি ইতিহাস। এত অল্প পথে এত দুস্তর গিরিলোক আগে আমার দেখা ছি[illegible] গতকাল প্রভাতে বায়ুযানের পথে পাহাড়ী মেষপালককে দেখে[illegible] তেলনাড় নামক অঞ্চলের কাছ[illegible] তারপরে যাত্রিদল ছাড়া পাহাড়ে [illegible] মানুষের চিহ্ন আর কোথাও দে[illegible] এটা নতুন বটে। মানস সরোবর, বদরি, পশুপতিনাথ—কোথাও এম[illegible] অথচ বুঝতে পারা যায়, এটা মধ্য এ[illegible] দিকে যাবার ভিন্ন একটি পথ। অ[illegible] এখান থেকে নিকটবর্তী পাহাড় [illegible] পশ্চিম তিব্বতে প্রবেশ করি, [illegible] করবার কেউ নেই। আমাদের এই প[illegible] পিছনেই ভারতের সীমানা, ম[illegible] মাইলের মধ্যে। একটি ঘোড়[illegible] রসদ নিয়ে যদি যাই বলতালের দি[illegible] দেখছে? কে জানছে, যদি [illegible] উপত্যকার ধার ঘেঁষে [illegible] চলে যাই? লাডাক [illegible] অমরগঙ্গা ধরে গেলেই [illegible] তিব্বত! কাছে হয়ত সহজসাধ্য নয়, [illegible] তেনজিংয়ের পক্ষে [illegible] হেডিনের পক্ষে কতক্ষণ? সঙ্গে [illegible] লোক থাকলে চব্বিশ ঘণ্টার বেশী কি?

ঠিক বায়ুযানের মতো [illegible] সমস্ত ওই নদীতীরের তুষারলোকের [illegible] তাঁবু নড়তে লাগলো। কম্বলের [illegible] প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে তেমনি [illegible] যাপন। চোখ বুজে রইলুম [illegible] হাড় পাঁজরার মধ্যে এমন [illegible] লাগলো যে, কোনো মতেই ঘুম এলো [illegible] সন্ধ্যা রাত্রের দিকে হিমাংশুবাবু এক[illegible] উপরি কম্বল আমাকে দিয়েছিলেন, [illegible] তাতেও সুবিধা হয়নি। তাঁবুর [illegible] বৃষ্টির ফোঁটার শব্দ কোনো স[illegible] থামেনি। কে জানে আগামী কালের আমাদের ভাগ্যে আর কি জমা অ[illegible] এখান থেকে অমরনাথ আর মাত্র চা[illegible] মাইল পথ। এত অনিশ্চয়তা, এত দু[illegible] এত আশঙ্কা—তবু মন আছে প্র[illegible] আমাদের বহুকালের বহু প্রত্যাশার [illegible] গিয়ে পেঁছতে পারবো। শিশুকাল [illegible] শুধু ছবি দেখে এসেছি, গল্প শু[illegible] দুঃসাধ্য পথের ইতিহাস জেনেছি, মান[illegible] এর অবস্থান চিহ্ন দেখে কতদিন কল্পনা করেছি,—আগামী কাল স[illegible]

পরিসমাপ্তি। মর্ত্য সীমার প্রান্তে অমর্ত্যলোকের দ্বার উন্মোচন কাল আমাদের পূর্ণ যাত্রা! আজ সমস্ত রাত্রির অনাগত স এখনও বুঝতে পাচ্ছিনে। বৃষ্টি থামে নি। জানি তুষার সমাকীর্ণ আমাদের সমস্ত পথ। কিন্তু নেমে কি 'গেলসিয়ার' এই উপত্যকায়? আসবে কি 'এভালান্স' ওই অমর শত শত প্রাণীর পক্ষে এমন রাত্রি কে কোথায় দেখেছে? সম্ভাবনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এদের কে কোথায় এমন করে প্রহর গুণেছে?

ক মনে নেই। বোধ হয় তন্দ্রাচ্ছন্ন। হিমাংশুবাবুর গলার আওয়াজ কম্বলের রাশির ভিতর থেকে মুখ লুম। বিশ্বাস করিনি, প্রভাত এত শীঘ্র! জানতুম দুঃখ আর রাত্রি বড় দীর্ঘ হয়।

বিশ্বাস করিনি এই আশ্চর্য প্রভাত! বৃষ্টি হয়েছিল, কোনো চিহ্ন তার করে মৃত্যুভয় পেয়েছিল সবাই, স্মৃতিও তার মনে পড়ে না। সমগ্র যেন নীলোজ্জ্বল এক মহাকাব্য। সূর্যকিরণ পড়েছে অমরাবতীর তুষারশিখরে। প্রভাতের মৃদু সমীরণ-শিহরণ দূরে দূরান্তরে দিচ্ছে অভয়বাণী। দুগ্ধশুভ্র আবরণে সমস্ত পর্বতগুলি রশ্মিজালে ঝলমল করছে। তবে কি তুমি! তবে গতদিন কেন অমন রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছিলে? কেন মহাকালের জটাজালে নটরাজের তালে তালে শিশু মানবকদের আতঙ্কের সঞ্চার করেছিলে? এত তুমি, কেন তবে এত ভীষণ!

তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ, মৃত্যো-মৃতং গময়ঃ,—অন্ধকার থেকে আলোয় যাও, মৃত্যুর থেকে নিয়ে যাও অমৃত-ক! হয়ত এ সেই অমৃতলোক। নে ছিল মৃত্যু—সামনে অমরাবতী। তার থেকে সত্য, ভয় থেকে জয়। বার্তা বিঘোষিত হচ্ছে আমাদের সম্মুখ-। প্রসন্ন প্রভাতের সূর্য এনে দিচ্ছে মধুরের ধ্যানাবেশ, আনন্দে আবার উঠেছে সেই প্রাচীন পৃথিবী!

দেবতাত্মা হিমালয় তাঁর রত্নগিরির দ্বার খুলেছেন। গত দুদিনের ইতিহাস দুঃস্বপ্নের স্মৃতি মুছে নিয়ে চলে গেল।

আমাদের পিছন দিকে প্রায় আধ মাইল দূরে ছিল কুণ্ডু স্পেশালের তাঁবু। সেখানে সরকারি চালা আছে। সেখান থেকে আমাদের যাত্রাকালে আবার এলো দুঃসংবাদ। এক বাবাজি শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টে কাল মারা গিয়েছে এবং পেটের পীড়ায় একজন মৃত্যুশয্যায়। শঙ্কর কুণ্ডু বললে, আবার কয়েকজন পালিয়েছে

অমরনাথ গুহা

ভয়ের হিড়িকে। মেয়েরা কাঁদতে বসেছিল আকাশের চেহারা দেখে, আশা ত্যাগ করে চলে গেছে অনেকে। কতগুলি মেয়ে-পুরুষ ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত, কেউ কেউ শ্রান্তিতে ধরাশায়ী।

আন্দাজ সাড়ে সাতটায় আমরা যাত্রা করলুম। আমাদের মালপত্র সমেত তাঁবু এখানে পড়ে রইলো অশ্বরক্ষীদের জিম্মায়, আহমদ রইলো তত্ত্বাবধানে। অবিশ্বাসের বিন্দুমাত্র কারণ নেই। আজ পূর্ণিমা তিথি, হিন্দুমতে উপবাস। দর্শনান্তে শত শত লোক জলগ্রহণ করবে, তার আগে নয়। শীতের হাওয়ায় আর রৌদ্রে আজকের যাত্রা বড় আনন্দদায়ক। আকাশের উজ্জ্বল নীলাভা বলছে, এ বছরে আর বৃষ্টি হবে না, নিশ্চিন্ত থাকো। সুতরাং পুনর্জীবন লাভ করেছি আমরা।

কিন্তু আজকের পথ বড় পিছল। সকলেই অতি সতর্ক। উঠছি উপরে, উপর থেকে উপরে। ঠিক যেন বিরাট কোনো প্রাসাদের কার্নিশের উপর দিয়ে চলা। মাথা টললেই মৃত্যু। ঘোড়ার পা পিছলোলে ঘোড়াসুদ্ধ অতলে তলিয়ে যাওয়া। পথ মানে, পথ নয়। অত্যন্ত আতঙ্ক ফুটছে মুখে চোখে, শরীরের রক্ত চলাচল মাঝে মাঝে যেন স্থির হয়ে আসছে। আজ আর কেউ নিরাপদ মনে করছে না। পাকদণ্ডী একটির পর একটি। ঘোড়াকে এক একবার টেনে তুলতে হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে শঙ্কিত সচেতন, ত্রস্ত এবং আড়ষ্ট। কিন্তু গণিশের আমার রক্ষক, জানি তার হাতে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। তার নীলাভ দৃষ্টিতে কী স্নেহ, মৃন্ময় কাশ্মীরের সমস্ত মধুর পেলবতা ওর ব্যবহারে। কিন্তু কী দরিদ্র সে। ছিন্নভিন্ন পরিচ্ছদ, ছিন্ন কম্বল, একেবারে নিঃস্ব। পায়ে ছেঁড়া জুতো, ছেঁড়া শেরওয়ানী। ওর খাওয়া দেখলে কান্না পায়। চার দিন আগেকার রান্না পোড়া ভাত, আর সেই পহলগাঁও থেকে আনা লাউয়ের শুকো,—ব্যস। আমি জোর করে ওর হাতে দিয়েছিলুম কিছু রুটি। প্রথমটা নিতে চায়নি, পাছে ওর জাত যায়। এদিকে গ্রাম্য মুসলমানদের ধারণা, হিন্দুর হাতের তৈরী কিছু মুখে দিলে তাদের সমাজচ্যুতি ঘটবে। এটা জাতি-গত অভিমান বুঝতে পারি। সেই একই ইতিহাস আসমুদ্র হিমাচল। এক রক্ত, এক প্রকৃতি, একই সংস্কৃতি। আফগানী তুর্কিরা পাঁচ ছশো বছর আগে এদেরকে ধরে গায়ের জোরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে। তারপর এরা ফিরে আসে কাশ্মীরী পণ্ডিতদের কাছে। পণ্ডিতরা এদের গ্রহণ করেনি। এরা পাহাড়ে পর্বতে দেহাতে উপত্যকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

পাহাড়ে পাহাড়ে নদী ঝুলছে তুষার মণ্ডিত। জল প্রপাত নামতে গিয়ে বরফে জমাট বেঁধে স্থির হয়ে গেছে—তাদের ভিতর থেকে চুঁইয়ে নামছে জলের ধারা। তুহিন নদী ও নির্ঝরিণী পথে পথে। কোথাও শ্যাওলা নেই, কোথাও নেই তৃণ-চিহ্ন। পথের ধারে মাঝে মাঝে আবার সেই কুসুমশয্যা—সেই নানাবর্ণ—সেই

পঞ্চতরণীতে লেখক ও অন্যান্যেরা

মৃৎপাথরের ভিতর থেকে প্রাণবন্যা। তৃণ-পুষ্পে কাশ্মীরের হৃদয়ের অর্ঘ্যসম্ভার। ধীরে ধীরে আমরা উঠছি—দৃঢ় পদ, দৃঢ় ইচ্ছা, দৃঢ় মনোযোগ আমাদের। উদার ভাবনা, মধুর স্বপ্ন, মহৎ চিন্তা—তার সঙ্গে ভয় আর অনিশ্চয়তা, তার সঙ্গে পায়ে আর শিরদাঁড়ায় অসহনীয় কনকনানি। আমরা শুধু এগিয়ে যাচ্ছি। এই পথে আসতো শক আর হূন—মিহির গুল আর চেঙ্গিস খার দল, আসতো তুর্কি-তাতার, আসতো মধ্য এশিয়ার অনামা অজানা যাযাবর দস্যুর দল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে যেখানে গিয়ে তারা প্রথম খাদ্য আর আশ্রয় পেতো, প্রথম পেতো মানুষের সমাগম—সেই অঞ্চলের নাম দিয়েছিল প্রথম গ্রাম, অর্থাৎ পহলগাঁও!

মাইলের পর মাইল চড়াই আর উৎরাই। বায়ু শীর্ণতার জন্য আমরা কষ্ট পাচ্ছি। প্রায় সাড়ে সতেরো হাজার ফুটের উচ্চতায় উঠেছি। এবার নামবার পালা। ধীরে ধীরে পথ ঘুরছে পূর্বদিকে। ভৈরবঘাটের সীমানা শেষ হচ্ছে। ডান দিকে ঘুরে যাচ্ছি। আশে পাশে চলেছে সাধুসন্ন্যাসী, চলেছে বাবাজি-বৈরাগী। ধীরে ধীরে নামছি। পোড়ামাটির মতো পথ, কিন্তু বৃষ্টি ভেজা,—পিছল। ফিরছি ডান দিকে, ভৈরবঘাটের পিছনে,—আবার নামছি। নামতে নামতে এসে পৌঁছলুম তুষার নদীর প্রান্তে। তুষারমণ্ডিত পথ আর উপত্যকা পেরিয়েছি অনেকবার, কিন্তু এবার নতুন অভিজ্ঞতা। তুষার নদীর ওপর ঘোড়া নিয়ে নেমে এলুম। পায়ের তলায় বরফের নীচে দিয়ে প্রবল নদীর স্রোত, আর আমরা উপরতলার কঠিন বরফের ওপর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছি। যদি চিড় খায় কোথাও, যদি কোথাও নরম থাকে—তবে রক্ষা নেই। বাঁকের মুখে সোজা উত্তরে চ'লে গেছে একটি নদীর ধারা তিব্বতের মধ্যে, কিন্তু এইটি হোলো অমরগঙ্গার মূল প্রবাহ। এপারে ভৈরব ঘাট, ওপারে অমরনাথের চূড়া। কিছুদূরে গিয়ে গণিশের বললে, উৎরাইয়ে!—হয়ত তার মনে দুর্ভাবনা ছিল, যদি দৈবাৎ আমাদের পায়ের তলায় ধস নেমে যায়! সুতরাং আমরা এবার নামলুম সেই তুষার নদীর ওপর। পায়ের তলায় বরফ কচমচ ক'রে উঠলো। এমন বরফ কিনতে পাওয়া যায় কলকাতার বাজারে সর্বত্র। বড় বড় ডেলা, মুঠোর মধ্যে ধরে রাখা যায় না। রংটা স্বচ্ছ 'শাদা নয়, ঈষৎ ঘোলাটে'। পায়ের তলায় দুরন্ত নদীর প্রবাহ। মাঝে মাঝে পায়ের পাশে ছোট বড় গহবর, তার ভিতর দিয়ে ভয়ে ভয়ে দেখছি কালো জল আবর্তিত হচ্ছে। অতি সন্তর্পণে পা ফেলে চলছি, প্রতি পদে যেন ... হচ্ছে। নদী ধরেই চললুম কিছুক্ষণ। ... সময়ে গণিশের আবার তুললো ... পিঠে। কিছুদূরে গিয়ে এই নদীই ... উত্তাল উদ্দাম জলধারাসহ প্রকাশ ... আমরা এলুম সাঁকোর কাছে। সেটা ... গঙ্গারই সাঁকো। সেই ছোট্ট সাঁকো ... হয়ে ওপারে অমরনাথ পর্বতের ... গিয়ে আমরা ঘোড়ার পিঠ থেকে ... নেমে পড়লুম। এর পর আর ঘোড়া ... না। সামনের চড়াই ধরে প্রায় তিন ... তিন শো ফুট উঠে গিয়ে পাবো ... নাথের গুহামুখ।

প্রসন্ন নীলাভ দুই চক্ষু ... ক'রে স্মিত হাস্যে সামনে ... আমার ভয়ত্রাতা সৌম্যদর্শন ... গণিশের। দুর্দিনের দুর্যোগের ... অভয়দাতা আমার নিত্য সঙ্গী— ... তাকালুম তার প্রতি। অন্তর্যামী ... কানে কানে বললে, থাক্ ... সকলের আগে আভূমি নত হয়ে ... করো ওই মুসলমানের পদতলে ... পঞ্চপিতার এক পিতা হোলো ওই ... হতভাগ্য চিরবুভুক্ষু গণিশের ... তোমার ভয়ত্রাতা—রক্ষক! অভিমান ... করো, প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য সংস্কার থেকে ... ক্ষণের জন্য মুক্ত হও, মানুষের ... নিহিত নারায়ণকে স্বীকার ক'রে ... পদধূলি গ্রহণ করো ওই ... মুসলমানের!

পারলুম না! হাজার হাজার ... রক্তের ধারাবাহিকতার সংস্কার ... বংশপরম্পরাগত জাত্যভিমান ... বাধা হয়ে দাঁড়ালো মাঝখানে। কী ... আমি! কী ক্ষুদ্রচেতা, কী দরিদ্র! ... চাবকালুম শতবার। চোখে জল ... দাঁড়ালো। অবশেষে দু'খানা প্রাণহীন ... বাড়িয়ে গণিশেরকে সহসা ঘন ... বেঁধে দিলুম। কিন্তু তার চেয়ে ... বেশী অপমান ক'রে ফেললুম ... যখন মনিব্যাগ খুলে কয়েকটা টাকা ... তার হাতে। প্রাপ্য তার কানাকড়িও ... সুতরাং গণিশেরের চোখেমুখে ... বিস্ময়। কিন্তু আমি আর পিছন ... কোনোমতেই তাকাতে পারলুম না।

প্রখর রৌদ্র। অমরগঙ্গার ... থেকে উঠে গেছে এই পথ সোজা

ঝুলন পূর্ণিমার দিন অমরনাথ গুহার অভ্যন্তরে

পর্যন্ত। নদীতে বহু লোক সাহস ক'রে স্নান করতে নেমেছে। এই নদী তিব্বতের দিকে চলে গেছে। আশেপাশে সামনে পিছনে পাহাড়ের গা বেয়ে তুষার নদী-গুলি ঝুলছে। এরা চিরস্থায়ী, সহজে গলে না। মে-জুন মাসে কি হয় বলতে পারিনে। রৌদ্র এত প্রখর যে, তুষার আব-হাওয়া সত্ত্বেও কোনো কষ্ট আমাদের হচ্ছে না। বরং রাশীকৃত গরম আচ্ছাদন এবার বেশ অসুবিধা হচ্ছে। এখন বুঝতে পারা যায় মোটমাট কত যাত্রিসংখ্যা এ বছরের। পুরো এক হাজার কি হবে? মনে হয় না। সেই সুইডিস ছাত্রটি এসেছে, একজন বৃদ্ধ ফরাসী ভদ্রলোক এসেছেন। অদূরে দেখছি সেই মিলিটারী যুবক মিঃ মজুমদার এবং তাঁর সঙ্গিনী শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়। এদিকে ভাটপাড়ার এন পি ভট্টাচার্য মহাশয়ের দল আর কুণ্ডু স্পেশালের লোকজন। উপরে উঠছেন ঘোষ মশাই তাঁর মাকে নিয়ে। চন্দনবাড়ির পথে সেই যে পাঞ্জাবী মহিলাটি ঘোড়া থেকে পাহাড়ের ধারে প'ড়ে গিয়ে আহত হন,—তিনিও এসে পৌঁছেছেন, কিন্তু মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আরো বহু এসেছেন, যাঁদের সঙ্গে মুখচেনা হয়েছে গত পাঁচ ছয় দিনে। এসেছেন সেই মিসেস রয়—শ্রীনগর ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কের এজেণ্টের স্ত্রী,—হিমাংশুবাবুর পাতানো দিদি। পুলিশ মিলিটারী সবাই আজ এসেছে।

এই শেষ চড়াইটুকু বড় গায়ে লাগছে। বায়ুশীর্ণতার জন্য পরিশ্রম খুব বেশী মনে হচ্ছে। ধীরে ধীরে প্রায় উপরে উঠে এলুম। আর পঁচিশ ফুট উঠতে পারলেই গুহামুখ পাই।

ঘোষ মশাইয়ের বৃদ্ধা জননী শুয়ে পড়লেন। আর তাঁর ওঠবার শক্তি নেই। বোধকরি জ্ঞানহারা হবার সম্ভাবনা ছিল। মাথা ঘুরছে, বমি ভাব। ঘোষ মশাই দিশা-হারা হয়ে ছুটে নেমে যাচ্ছিলেন। মায়ের যদি অন্তিম ঘনিয়ে থাকে? এখনও যে দর্শন হয়নি! ডাক্তার কি এখানে মেলে না?

দাঁড়ান—বাধা দিলুম ঘোষ মশাইকে। —মা ঠিক বাঁচবেন, কিন্তু আপনি মুখ থুবড়ে যদি গড়িয়ে পড়েন নীচে, আপনি বাঁচবেন না! আপনাকে যেতে দেবো না! মা বাঁচবেন? কেমন ক'রে? কিন্তু—কিছু ভয় নেই। কোলের কাছে এসেছেন অমরনাথ,—তাই বৃদ্ধার উত্তে-জনা! বিশ্রাম দিন, নিশ্বাস নিতে দিন—উনি নিজেই উঠে যাবেন উপরে।

আপনি কেমন ক'রে জানলেন? মা যে তিনদিন কিছু খান্‌নি। আজ আবার পূর্ণিমা!

আমারও উত্তেজনা এলো। বললুম, এরকম কেস্ অনেক দেখেছি তাই বলছি। আপনার মা যদি উঠে ধুলো পায়ে নিজের শক্তিতে দর্শন না করতে পারেন, তবে আমিও ব'লে রাখছি, অমরনাথকে না দেখে আমিও এখান থেকে সোজা কলকাতায় ফিরে যাবো।

ঘোষ মশাই থমকে দাঁড়ালেন। মিনিট পনেরো পরে তাঁর মা নিজে গা ঝাড়া দিয়ে ধীরে ধীরে আবার গুহামুখে উঠতে লাগলেন। ঘোষমশাই চললেন, মায়ের পিছু পিছু। ক্যামেরা হাতে নিয়ে হিমাংশুবাবু হাসিমুখে চললেন। মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে বহু যাত্রী উঠছে, কেউ কেউ নেমেও আসছে। সকলের মুখচোখ আনন্দে আর উৎসাহে উজ্জ্বল। আজ সকলের যাত্রা সার্থক হয়েছে। সূর্যের প্রখর আলো যেন সকলের জন্য অভাবনীয় আশীর্বাদ বহন ক'রে এনেছে।

ক্লান্ত পা তুলছি টেনে টেনে উপর দিকে। ঘোড়ার পিঠে ব'সে শিরদাঁড়া আড়ষ্ট, পা দুখানা ভারি,—বিনিদ্রা আর উপবাস। আর কয়েক পা বাকি। তার পরেই গুহার ওই বারান্দা! ব্যস, আর সামান্যই!

না, আগে দর্শন নয়, এখানে একবার দাঁড়াও,—নিশ্বাস নাও আগে। এখানে দাঁড়িয়ে আগে একবার মাতৃমন্ত্র জপ ক'রে নাও!—ওই উনি মা, যিনি একটু আগে ধরাশায়িনী হয়েছিলেন। ওই মাকে নিয়ে স্মরণ করো সেই আদি জননীকে, যিনি মাতা বিশ্বেশ্বরী, দেবতাত্মা হিমালয়ে যিনি পরিব্যাপ্ত! থাকুন অমরনাথ,—আগে স্মরণ করো তাদের কথা, যাদের এই পথে মৃত্যু ঘটেছে, যারা পৌঁছতে পারলো না কিছুতেই, যারা দেবতাত্মার পদতলে শেষ নিশ্বাসটুকু ফেলে যেতে পারেনি! তাদের কথা এখানে দাঁড়িয়ে আজ স্মরণ করো, যাদের পিতা মাতা সন্তান বন্ধু পরিজন—কেউ কোথাও নেই, যাদের পিপাসার্ত আত্মা ঘুরে বেড়ায় নিত্য প্রেতলোকে! যাদের কেউ কোনদিন স্মরণ করেনি।

ধীরে ধীরে উঠে এলুম গুহার সম্মুখভাগের অলিন্দে। সামনে লাল রেলিংঘেরা গুহার অভ্যন্তরভাগ। পনেরো হাজার ফুটের উপর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। গুহামুখ উত্তর-পশ্চিমে ফেরানো গুহার মাথার উপর আরো প্রায় তি[ন] হাজার ফুট উঁচু গিরিচূড়া। সেখান থেকে ঝুলছে তুষার নদী। চারিদিকে যতদূ[র]

দৃষ্টি চলে ভয়াবহ অনুর্বরতা,—বৃক্ষ, শষ্প, লতা গুল্ম—কোথাও কিছু নেই। তুষারগলা জলধারা নেমে আসছে প্রতি পাহাড়ের গা বেয়ে। ক্ষার, গন্ধক ইত্যাদি বহুবিধ পদার্থ এবং বহু বর্ণময় মৃৎ-প্রস্তর চারিদিকের পাহাড়ে আকীর্ণ।

যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, পাথুরে কালো মাটি মসমস করছে। গুহার ছাদ থেকে জল চুঁইয়ে পড়ছে। সামনে তিন চারটি ধাপ উঠে রেলিংয়ের দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলুম। গুহার পরিধি আন্দাজ শ' দেড়েক ফুট। ভিতরের অবকাশটুকু কম-বেশী চল্লিশ ফুট দীর্ঘ। ভিতরে ঢুকতেই দেখা গেল উপরের বহু ফাটল থেকে অবিশ্রান্ত জলের ফোঁটাগুলি চুঁইয়ে পড়ছে টপটপ ক'রে। গহ্বরের চারিদিকটা খড়ি পাথরের। ছুরি দিয়ে খোঁচাতে থাকলে মুঠো মুঠো চুনপাথরের গুঁড়ো পাওয়া যায়। ঢোকবার সময় ধাপগুলি ডানদিকে রেখে সোজা বাঁদিকের কোণের কাছে এলেই অমরনাথ। পাড়বাঁধানো একটি চৌবাচ্চার মতো আয়তন—মাঝখানে বরফের একটি স্তূপ—নীরেট, কঠিন। উপর থেকে ফাটল চুঁইয়ে তুষারগলা জল পড়ছে টসটস করে। বরফের স্তূপটির উপরটি কচ্ছপের পিঠের মতো। মধ্যাংশ ঈষৎ উঁচু—চতুর্দিকে ঈষৎ ঢালু। এতকাল শুনে এসেছি চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই তুষারস্তূপ কমে এবং বাড়ে। আজ শ্রাবণী পূর্ণিমায় শিবলিঙ্গের আকারে অন্তত তিন চার ফুট উঁচু হয়ে ওঠার কথা, কিন্তু তা হয়নি। গতমাসের পূর্ণিমায় যখন যুবরাজ করণ সিং সস্ত্রীক এখানে আসেন, তখন লিঙ্গটি পূর্ণ আকার প্রাপ্ত ছিল। এই প্রকার স্বচ্ছ ধূমেল বরফের চাংড়া কলকাতায় চলন্ত লরীর ওপর মাঝে মাঝে দেখি, কিন্তু হ্রাসবৃদ্ধিই হোলো এর বৈচিত্র্য। অনেকে বললে, উপরের ফাটল থেকে যে জলবিন্দু পড়ে, সেই জল অনেক সময় ঝুলনের রজ্জুর আকারে জমে যায়, এবং উপরের সেই জলবিন্দু এবং চৌবাচ্চার ভিতরকার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যহেতু অমরনাথ লিঙ্গটি ক্রমশ স্ফীত ও উচ্চাকার ধারণ করতে থাকে। প্রকাশ, প্রায় দেড়শো বছর আগে এক গুজর মুসলমান মেষপালক ওপারের পাহাড়ের উপর থেকে এই গুহাটি আবিষ্কার করে, এবং লোকজনসহ এখানে এসে অমরনাথের পূর্ণলিঙ্গ দেখতে পায়। বোধহয় সমগ্র ভারতে এই একমাত্র তীর্থ, যেখানে খৃস্টান মুসলমান হরিজনাদি জাতিবর্ণনির্বিশেষে প্রত্যেকের অবাধ প্রবেশাধিকার দেখতে পাওয়া গেল। আমাদের প্রত্যেকের পায়ে ছিল ঘাসের তৈরী জুতো—দাম এক আনা—নৈলে এই ভয়ানক ঠাণ্ডায় আমাদের দাঁড়াবার উপায় ছিল না। অমরনাথ লিঙ্গের উপরে একটি ঘণ্টা ঝুলছে। যাত্রীরা স্পর্শ করছে লিঙ্গ।

গুহার মধ্যে শ্রীশ্রীঅমরনাথ: পূর্ণাকার প্রাপ্ত লিঙ্গ

আমাদের হিমাংশুবাবু সেই লিঙ্গের থেকে এক টুকরো বরফ ভেঙে তাঁর শিশিতে সংগ্রহ করলেন। অনেকে নিলেন গুহামধ্যকার খড়িপাথরের গুঁড়ো। চৌবাচ্চার মধ্যে পড়ছে দূর দেশ থেকে আনা অজস্র ফুল আর বেলপাতা। প্রদীপ জ্বলছে আশে পাশে। প্রসাদ সংগ্রহ করছে অনেকে। কেউ মন্ত্র ও স্তবপাঠ করছে, কেউ কাঁদছে হাউ হাউ ক'রে, কেউ মাথা ঠুকছে, কেউ বা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বিকৃতকণ্ঠে অধীর অস্থিরভাবে প্রলাপোক্তি করছে। অত্যন্ত দুর্গম এবং বিপদসঙ্কুল তীর্থস্থানে না এলে এইপ্রকার আত্মহারা ভাবাবেগ কল্পনা করা যায় না। মূল অমরনাথের লিঙ্গের কয়েক ফুট দূরে-দূরে গণেশ ও পার্বতীর ওই একইপ্রকার তুষারলিঙ্গ। তবে তাদের ক্রমিক হ্রাস-বৃদ্ধির চেহারা কি প্রকার, ঠিক একথা নিয়ে তখন আর কেউ আলোচনা করে না। যাঁরা অমরনাথের পাণ্ডা ও পূজারী, তাঁরা সকলেই থাকেন মার্তণ্ড শহরে,—পহলগাঁও থেকে খানাবলের পথে। এতক্ষণ পরে চোখে পড়লো গুহার ভিতরে 'সিলিং'এর একটি কোটরে দুটি পায়রা দিব্য বাসস্থান ক'রে নিয়েছে। এরা নাকি আছে আদি-কাল থেকে, এরা নাকি দৈবপারাবত। প্রাণীচিহ্নহীন পর্বতমালার মধ্যে এরা নাকি দৈববার্তা বহন ক'রে বেড়ায়। এদের দর্শন করা পুণ্য। এই তুষার-পারাবত দুটিকে সকলেই ভক্তিভরে দেখতে লাগলো।

ভিতরটায় ঘুরে ফিরে আবার এলুম বারান্দায়। সামনে গণেশের দাঁড়িয়ে ওর জিম্মায় আমাদের লাঠি, জুতো ও ছাতা এবং গরম কোট। তাকালুম নীচের দিকে অনেক দূরে অমরগঙ্গার পারে। লোকে ওপারে গিয়ে এপারের এই গুহার ছবি তোলে, সেইজন্য চড়াই পথটা ছবিতে দেখা যায় না। চড়াইয়ের নীচে নদীতে স্নান করছে সাধু ও সন্ন্যাসী, মেয়ে আর পুরুষ। তুষার গলা জলে নীল হয়ে যায় দেহ, কিন্তু উলঙ্গ স্নান এখানে বিধি। অনেক নারী স্নানে নেমেছে একেবারে নগ্ন দেহে। যদি এই দুর্গমে এসে পৌঁছে থাকো তবে এই ব্রহ্মলোকের তীরে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ আত্মদান করো। সমস্ত আবরণ মোচন করো, সমস্ত আভরণ জলাঞ্জলি দাও—এখানে পৃথিবী নেই, সমাজ নেই, লৌকিক সংস্কার নেই। চেয়ে দেখছি কেউ বাদ যায়নি। পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটী, দক্ষিণী, বাঙালী, বিহারী, উত্তর প্রদেশী,—উলঙ্গ নরনারী অনেকে নেমেছে ঘাটে। তুষারনদীর ওপর বইছে হু হু বাতাস,—প্রখর রৌদ্রে চারিদিক আনন্দময়। কিন্তু কিছু নেই এখানে খাদ্য এবং আশ্রয়ের চিহ্নও নেই—উপর থেকে চার শো ফুট নীচে না নেমে গেলে তৃষ্ণার জলও নেই। সকল তীর্থেই কোথাও না কোথাও দাঁড়াবার মতো জায়গা পাও যায়। তুঙ্গশীর্ষ তুষারাচ্ছন্ন কেদারনাথে যাও, কিংবা ভারতমহাসাগরের তীরে কন্যা-কুমারিকার বালুবেলাতটে যাও, আহার

আশ্রয় দুই মেলে। এখানে সব শূন্য। মাইলের পর মাইল,—অন্তহীন রুক্ষ দুর্বার তরুতৃণশূন্য ভীষণকায় পর্বতমালা ও তুষারনদী ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই।

বন্ধুরা ছবি তুললেন কতকগুলি। তারপর মধ্যাহ্নের প্রাক্কালে আবার আমরা গুহামুখ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করলুম। মণিশের ঘোড়া নিয়ে প্রস্তুত ছিল। আমরা আবার সারবন্দী হয়ে তুষারনদীতে অবতরণ করলুম। সেই একই পথ, বৈচিত্র্য কিছু নেই। সেই ভীষণাকৃতি পিশাচ প্রকৃতির পর্বতমালার চড়াই, সেই ঘোড়ার পিঠে কার্নিশ বেয়ে চলা,—জন্তু আর মানুষ একইপ্রকার ক্ষুধার্ত। সূর্যকরোজ্জ্বল তুষারকিরীটের তলা দিয়ে পথ, নদী এবার ডানদিকে, সেই আমাদের অতি সতর্ক আড়ষ্ট দেহ, চোখে সেই পতনাশঙ্কা—কিন্তু উদ্দীপনা আর কঠোর অধ্যবসায়ের পর,—এবার তন্দ্রাতুর অবসাদ। আমাদের সকল উত্তেজনার অবসান।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে এলুম পঞ্চতরণীতে। প্রথমেই চোখে পড়লো নদীর ধারে বসেছে একটি পুরির দোকান। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে প'ড়ে কে আগে ছুটতে পারে ওই দোকানে! হুড়োহুড়ি প'ড়ে গেল ঘোড়ায় আর মানুষে। বাবা অমরনাথ রইলেন আমাদের মাথায়, কিন্তু ওই 'গুহামুখ' আমরা সকলে। অতএব মুখ ব্যাদান ক'রে সকলে দাঁড়ালো দোকানে। পুণ্যসঞ্চয় করেছি সকলে সন্দেহ নেই, কিন্তু ক্ষুধা সঞ্চয় করেছি তার চেয়ে অনেক বেশী। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লো। ভাটপাড়া, মাণিকতলা, হাওড়া, অমৃতসর, জম্মু, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাটনা—সবাই লালায়িত।

পঞ্চতরণী পেরিয়ে মহাগুণোস গিরিসংকটের পথ পার হয়ে চলেছি বায়ুযানের দিকে। কুণ্ডু স্পেশালের শঙ্কর কুণ্ডু ব'লে রেখেছিল, পঞ্চতরণীতে আমাদের তাঁবুতে আপনাদের নিমন্ত্রণ! কিন্তু পুরির দোকান দেখে আর অতদূরে যাবার ধৈর্য আমাদের ছিল না। হিমাংশুবাবুর জ্বর আর নেই, কিন্তু আমার এসেছে জ্বরা। অতএব আর কোথাও দাঁড়ানো নয়। এবারের পথ অধিকাংশ উৎরাই। ঘোড়ার ঘাড়ের পর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে পাহাড়তলীতে না ছিটকে পড়ি, এই ছিল ভয়। দেখতে দেখতে এসে পড়লুম বায়ুযানে। বিশ্বাস করলুম না, কেননা চিনতে পারা গেল না। শূন্য তুহিন প্রান্তর ধু ধু করছে। আমরা এখানে রাত্রিবাস করেছি, তার কোনো চিহ্ন কোথাও নেই। আবার প'ড়ে রইল ওই প্রান্তর আগামী তিনশো চৌষট্টি দিনের জন্য। দিনে রাত্রে এবার চ'রে বেড়াবে ওখানে সেই তিব্বতী ভালুকের দল! নেমে আসবে হয়ত ঈগলপাখী ছোট জন্তুর খোঁজে; কিংবা নাম-না-জানা কোনো বিচিত্র অতিকায় জানোয়ার—যারা হয়ত আজও অনাবিষ্কৃত।

শেষনাগ থেকে এগিয়ে অপরাহ্নে পথের ধারে পাওয়া গেল গরম চা। বৃষ্টিবাদল নেই, সুতরাং সবটা সহজ। জনহীন পার্বত্য জগৎ, কিন্তু তীর্থযাত্রীদের পথে ব'সে কিছু সংস্থান ক'রে নিলে মন্দ কি? সুতরাং শিখ সর্দারের কাছে চা খেয়ে আবার আমরা অগ্রসর হলুম। পথ উৎরাই। অতএব ঈষৎ দ্রুতগতি। কথা ছিল যশপালে রাত্রিবাস ক'রে যাবো। যশপালে যখন এলুম, তখন অপরাহ্নের শেষ,—ছয়টা বাজে। আশ্চর্য, এও সেই মরুভূমি,—মাথা গোঁজবার মতো কোথাও কোনো আশ্রয় নেই। আরেকটু এগিয়ে গেলেই সেই বিভীষিকাময় পিসুর-চড়াই। প্রায় আমরা পনেরো মাইল চ'লে এসেছি অমরনাথ থেকে।

হিমাংশুবাবু বললেন, আশা করি দু'ঘণ্টার মধ্যে চন্দনবাড়ি পৌঁছতে পারবো। আকাশ পরিষ্কার, আজ পূর্ণিমা।

নীচে বিস্তৃত অরণ্যলোক। সংকটসংকুল উৎরাই পথ সেইপ্রকার পিছল। অন্ধকারে সেই ভয়াবহ আঁকাবাঁকা ঢালুপথে ঘোড়ায় চ'ড়ে নামা চলবে না। পিছনে আসছে অনেকে,—সকলেরই চেষ্টা চন্দনবাড়ি পৌঁছনো, নচেৎ রাত্রির আশ্রয় আর কোথাও নেই। অতএব দুর্গা ব'লে গভীর 'কুয়ার' পথে নেমে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি?

ঘোড়া ছেড়ে রবারের জুতো পায়ে এগিয়ে চললুম। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আশেপাশে ঝরণার শব্দ শুনছি। বাঁদিকে তিন হাজার ফুট নীচু খদ। নীচের দিকে অরন্যাণী। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। বাতাস তুহিন ঠাণ্ডা। প্রাণহীন শব্দহীন পার্বত্যলোক। আমরা সেই আবছায়া

অন্ধকারে পাকদণ্ডীর রেখা ধ'রে নীচের দিকে পা চালিয়ে দিলুম।

থামবো না। বিশ্রাম নেবো না কোথাও। আন্দাজে সতর্ক পায়ে কেবল নীচের দিকে তলিয়ে চলেছি। কেবলই ঘুরে ঘুরে নীচের দিকে, আরও নীচে। একজন আরেকজনকে আর দেখতে পাচ্ছে না। গণিশের ঘোড়া নিয়ে নামছে। একটির পর একটি ঘোড়া, একের পর এক যাত্রী। অরণ্যে নামছি। জ্যোৎস্নার টুকরো নামছে লতাপাতার ফাঁক দিয়ে। কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে, কিন্তু পাও থামছে না। চার মাইল নামতে হবে এমনি ক'রে। দিক্‌চিহ্ন নেই, পথের সংকেত নেই, দাঁড়াবার মতো পাশ নেই। পিছন দিকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ, তাদের পায়ের হোঁচটে আল্‌গা পাথর গড়িয়ে নামলেই সর্বনাশ। কিন্তু কোনো অপঘাত ঘটছে না,—আশ্চর্য। কে বাঁচাচ্ছে, কেমন ক'রে নিরাপদ হচ্ছি, বিপদে কেন পড়ছিনে,—সমস্তটা আশ্চর্য। হিমাংশু দ্রুতপদে অনেক এগিয়ে গেছেন, আমি অনেককে পিছনে ফেলে এসেছি,—কিন্তু নীচেকার ঘনঘোর অন্ধকারে মাঝে মাঝে প্রেতহাস্যের ঝলকের মতো জ্যোৎস্না আমাকে সাহায্য করছে। কোন্‌টা ঠিক নির্দিষ্ট পথ, জানছিনে—অথচ পা দুটো থামছে না! চার মাইল, কিন্তু এতই কি দীর্ঘ সেই চার মাইল? চার, না চারশো? নীচের দিক থেকে প্রবল জলরাশির শব্দ শুনছি অনেকক্ষণ থেকে। সেই শব্দ ক্রমশ নিকটবর্তী হয়ে এলো। অন্ধকার অরণ্যলোক ক্রমশ সংকীর্ণ থেকে বিস্তৃত হতে লাগলো। ক্রমশ নদীর আছাড়িপিছাড়ি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। এবার ওই খোলা জগৎটায় গিয়ে একবার ভালো ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবো। চার মাইল শেষ হয়েছে।

জ্যোৎস্না এবার অবারিত। অপ্সরালোকের অমরাবতীর দ্বার এবার খুলে গেছে। আরো এক মাইল চ'লে এসে সেই শিখ সর্দারের দোকানের সামনে দেখলুম হাসিমুখে হিমাংশুবাবু দাঁড়িয়ে। রাত তখন প্রায় সওয়া আটটা। দু'জনেই ফিরেছি নিরাপদে, দু'জনেই বিস্মিত।

অবিস্মরণীয় সেই অমর্ত্যলোকের জ্যোৎস্নারাত্রি কাটলো চন্দনবাড়ির সেই প্রখর নীলগঙ্গার তীরে, তাঁবুর মধ্যে। একে আর শীত বলে না, বাঙলাদেশের ডিসেম্বরের শেষ। এখন আমাদের তুঙ্গে বৃহস্পতি, সমস্তগুলো সহজলভ্য হচ্ছে। উৎকৃষ্ট চা, ঘৃতপক্ক পরটা, ঘন গরম দুধ, মসালেদার তরকারি, সুশীতল জল, মূল্যবান সিগারেট। তুঙ্গে বৃহস্পতি! তারপর তুষারলিঙ্গের কৃপায় নাসিকাধ্বনিসহ ঘনঘোর নিদ্রা!

পরদিন প্রভাতে অধিত্যকার অরণ্যপক্ষিকুলের কূজনগুঞ্জনের ভিতর দিয়ে অশ্বারোহণে আমাদের যাত্রা। সকাল সাতটা। নীচে উষাকাল, উপরে নবসূর্যবন্দনা সভা বসেছে। পাশে পাশে নীলগঙ্গার নীলাভ তরঙ্গদলের রণরঙ্গ চলেছে। বাতাস স্নিগ্ধ। পর্বতগাত্রে প্রভাতসূর্যের রশ্মিচ্ছটা শিশিরবিন্দুগুলিকে বর্ণাঢ্য ক'রে তুলেছে। আমাদের পথ কুসুমাস্তীর্ণ। ভয় ক্ষোভ বেদনা দুশ্চিন্তা উদ্বেগ,—দেবতাত্মা হিমালয় প্রসন্ন আশীর্বাদ সবগুলিকে মু দিয়েছে। বসন্তের কুসুমকাননের পথ দিয়ে স্বর্গলোক থেকে নেমে চলেছি মর্ত্যে মানবসংসারের দিকে। অমরাবতীর পরম আশীর্বাদের বার্তা বহন করে চলেছি।

আমরা অনেকটা প্রথম দলের লোক। সংগে সংগে আসছে ভাটপাড়া, আর কৃষ্ণ দল। পিছনে আসছেন কোটপ্যান্টপরা মিসেস রায়, সংগে সংগে মজুমদার স শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়। প্রশস্ত প ঘোড়ারা এবার একটু আধটু ছুটছে পিছনে পিছনে আসছে বোম্বাই আ পাঞ্জাব। গ্রাম ছেড়ে আসছি, ঝরণা পেরি যাচ্ছি,—কাশ্মীরী মেয়েদের ভিক্ষা চল এখানে ওখানে। পথের ধারে বসেছে ক কাশ্মীরী ঝুলি নিয়ে। প্রখর রোদ উঠে বেলা সাড়ে ন'টা।

দেখতে দেখতে এসে পৌঁছলুম ট আপিসের ধারে। সেখানে ঘোড়াওয়ালাদে কাছে ট্যাক্স আদায় চলছে। সামনে লিদ্দ নদীর সাঁকো। আশে পাশে উপত্যক পড়েছে বায়ুবিলাসিনীদের তাঁবু। পিছ দিকে কোলাহাই হিমবাহের পার্বত্য প এপারে ওপারে ঘন পাইনের বন দূরান্তরে চ'লে গেছে। পাহাড়ীরা চলে হাটের দিকে। গ্রামের দরিদ্র মেয়েরা শি দের সংগে ময়লা জীর্ণ শয্যাগুলি রৌ নামিয়ে দিচ্ছে।

প'ড়ে রইলো পিছনে একটা জীব সেটা তীর্থযাত্রীর। এবার যেন উত্ত হলুম জন্মান্তরে। পৃথিবী সেই প্রা সুন্দরের সেই শোভা দিকে দিকে। ধী ধীরে এসে পৌঁছলুম আমাদের পরি নদীর ধারে—সনাতন মন্দিরের কাটিয়ে, সাধুসন্ন্যাসীর আশ্রম ছাড়ি আমাদের পুরাতন বন্ধু পহলগাঁও।

ঘোড়া থেকে নেমে বুঝলুম ত অকর্মণ্য। গত রাত্রের সেই পিসুর উৎ একটানা নেমে সর্বশরীরে এবার আড়ষ্টতা এসেছে। খুঁড়িয়ে খুঁ হোটেলের দিকে চললুম। এখানে করবো কয়েকদিন!

(ক্র

বাংলা নাটকের আলোচনা

শুভময় ঘোষ

আধুনিক বাংলা নাটকের শুরুতে দেখা যায়, তার শিক্ষানবিসি পর্ব চলেছে, সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটকের অনুবাদে। কিন্তু প্রায় সেই সঙ্গেই রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীনকুলসর্বস্ব এবং মাইকেল মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী রচিত হয়। এই দুটির প্রথমটি হলো সমাজ সমালোচনা, দ্বিতীয়টিতে আছে স্বাদেশিকতার কথা। এতো গেল বিষয়ের কথা। রূপের দিক দিয়ে প্রথমটি ব্যঙ্গ-কৌতুক, দ্বিতীয়টি ঐতিহাসিক ঘটনাবলম্বী পাশ্চাত্য আদর্শের ট্র্যাজেডি। সে যুগে সমাজে, ধর্মে নানা সংস্কার চলছে। জাতীয়তাবোধ জন্মাচ্ছে। ভারতীয় ইতিহাসের বীরত্বের কাহিনী তার প্রেরণা জাগাচ্ছে। ধর্মপ্রচার চলছে। বাংলা নাটক জাতির জীবনে এই নব প্রেরণা সঞ্চারিত করতে চেয়েছে। তাই ১৮৫২ খৃঃ প্রথম বাংলা নাটকের জন্ম হয়ে আজ ১০০ বছরের মধ্যেই তার সাহিত্যগুণ, বিষয় বৈচিত্র্যের সমৃদ্ধি ঘটেছে। বিশেষ করে অভিনয় প্রতিভায় বাংলা দেশ পৃথিবীর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের দেশের সমকক্ষ বলা যায়। অথচ আমাদের দেশে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ঐতিহ্য খুব বেশী দিনের নয়, মাত্র ৮০ বছরের। এই অভূতপূর্ব ঘটনার প্রথম কারণ হলো, বাঙ্গালী প্রথম থেকেই নাট্যামোদী। মধ্যযুগের কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ গান, কীর্তন গান, যাত্রা গানের মধ্যে বাঙ্গালীর অভিনয়ের প্রতিভা লুকিয়ে ছিল। আধুনিক যুগে তার পূর্ণ প্রকাশের সুযোগ হলো। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, বাংলা নাটক প্রথম থেকেই জাতীয় জীবনের সঙ্গে যোগ রেখে অগ্রসর হয়েছিল। তা নইলে এই সমৃদ্ধি সম্ভব হতো না। বিধবা বিবাহ, বাল্য বিবাহ, ধর্ম ও ভক্তিমূলক বিবিধ আন্দোলন দেশে যা যা হয়েছে নাটকেও তা স্থান পেয়েছে।

বাংলা নাটক, এ পর্যন্ত যত রচিত এবং সফলতার সঙ্গে অভিনীত হয়েছে তার বিচারে দেখা যায়, সে সব নাটক প্রধানত নিম্নোক্ত কয়েকটি ধারায় চলেছে।

সমাজ বিষয়ক। সমাজ বিষয়ক নাটকের দুটি ভাগ আছে। একটি সামাজিক ব্যঙ্গ কৌতুক, অন্যটি সমাজের সমস্যা নিয়ে "serious treatment"। প্রথমটিতে কুলীনকুলসর্বস্ব, একেই কি বলে সভ্যতা, প্রভৃতির নাম করা যায়। দ্বিতীয়টিতে নবনাটক, প্রফুল্ল, নীলদর্পণ প্রভৃতির নাম করা যায়। ব্যঙ্গকৌতুক জাতের নাটকে চিন্তার গভীরতা আশা করা যায় না, তবুও এই ভাগেও রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী বাংলা নাট্যে, যা সাধারণ রঙ্গালয়ে জনপ্রিয়, চিন্তার ছাপ বড় বেশি কম।

নাট্যকার হিসেবে বাংলা দেশে কোন লেখকই, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া উঁচু আসন পাবার যোগ্য নন। সবার রচনাতেই প্রভৃত দোষ আছে। অভিনয়ের গুণে নাটক জনপ্রিয় হয়েছে, আর হয়েছে পপুলার সেণ্টিমেণ্টের ব্যবহার নাট্যকাররা করেছেন বলে। এই ভাগের নাটকে দেখা যায় নাট্যকার তাঁর দোষ একদিকে ঢেকেছেন রঙ্গব্যঙ্গ দিয়ে আরেক দিকে ঢেকেছেন অত্যন্ত বেশী করুণ রস ঢেলে।

রামনারায়ণ তর্করত্ন

এই ভাগের নাটকে "burning questions of life" প্রকট হয়েছে। তাই সেই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই এইসব নাটকের মৃত্যু হয়েছে।

রোমাণ্টিক নাটক। রবীন্দ্রনাথের নাথের রচনা ছাড়া, অন্য সব বাংলা নাটকে দেখা যায়, রোমাণ্টিক নাটকের চেহারা হল আরব্যোপন্যাস, বা রূপকথা, উপকথা জাতের। আলিবাবা, লয়লা মজনু প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মানব চরিত্র অঙ্কন, বাস্তবতার স্পর্শও তাতে নেই। আর আছে রাজারাজড়া, যুদ্ধবিগ্রহ বীরত্ব বা অসম্ভব ঘটনাবহুল দৃশ্যের উন্মাদনার নাটক। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতির নাট্যরূপ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই সব নাটকে চিন্তার চেয়ে আড়ম্বর, জাঁকজমক এবং পরীর রাজ্যের মাধুর্য প্রধান। এই সব দিয়েই নাটকের দোষ ঢাকা হয়েছে।

ধর্ম ও ভক্তিমূলক নাটক। পৌরাণিক নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, নীতি ও ধর্ম আচরণের উপদেশ। গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকে চিন্তাযুক্ত নীতি ও ধর্মোপদেশ দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এখানেও শেষ পর্যন্ত চিন্তার চেয়ে আড়ম্বর ও জনপ্রিয় পৌরাণিক চরিত্র দর্শনের বিস্ময় ও উত্তেজনা বড় হয়ে উঠেছে। শিল্প ক্ষুণ্ণ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি প্রতিভার সঙ্গে এরকম যে কোন একটি নাটক, যা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সফল হয়েছে, তুলনা করলেই একথা বোঝা যাবে। নাটকীয় গুণে, কাহিনীতে, পাত্র-পাত্রীর সংলাপে, দৃশ্যরচনায় যেভাবে ফুটে ওঠা উচিত তা বাল্মীকি প্রতিভায় আছে।

মহাপুরুষ-জীবন নিয়ে ভক্তি রসাশ্রয়ী নাটক লিখে গিরিশচন্দ্র জনপ্রিয় হয়েছেন। তাঁর বুদ্ধ, চৈতন্য, বিল্বমঙ্গল'এর জীবন নিয়ে রচিত নাটক উল্লেখযোগ্য। এখানেও চিন্তাযুক্ত আদর্শের চেয়ে সেণ্টিমেণ্টই প্রধান।

জাতীয়তাবোধ উদ্দীপক নাটক। এই শাখাটি বাংলা নাটকের সবচেয়ে প্রধান অংশ। তার কারণ সমসাময়িক জাতীয় আন্দোলনকে এই নাটক প্রভাবিত করেছে এবং জাতীয় আন্দোলনও তাকে প্রভাবিত করেছে। মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারীতে এর ীজাকারে জন্ম। প্রথম পূর্ণাঙ্গ াতীয়তাবোধ উদ্দীপক নাটক বলা যায় করণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপক ভারত-াতা (১৮৭৩ খৃঃ অঃ), যা জোড়াসাঁকোর াকুরবাড়ির উৎসাহে রচিত ও অভিনীত য়। এর আগেই হিন্দুমেলায় জাতীয়তার র্চা শুরু হয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতে ঐতিহাসিক াতীয়তাবোধ উদ্দীপক নাটক বৃহদাকার পল। দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের াটক এখনও অভিনীত হয়ে চলেছে।

প্রকৃতপক্ষে জাতীয় জীবন ও াকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একদিকে এই জাতীয়তা-বাধ উদ্দীপক নাটক, অন্যদিকে সমাজ বষয়ক নাটকগুলিই বাংলা নাট্য সাহিত্যের যাগ ঘটায়। এর ফলেই বাংলা নাটকের ন্ম, উন্নতি সম্ভব হয়। বাংলা নাটকের এই জাতীয় জীবনের সঙ্গে যোগ রক্ষা একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। শুধু শিল্পরসের উপভোগের তাগিদে নাটকের জন্ম হয় না। াটক জীবনের বহু সমস্যা ও ঘটনার লে জন্ম নেয়। জীবনগঠনের জন্যও ার প্রয়োজন। তবে এই ভাগের নাটকেও চিন্তার চেয়ে সেণ্টিমেণ্টের প্রাধান্য পরিস্ফুট। ঐতিহাসিক রাজারাজড়াদের বরাট ইলাহী কাণ্ডে দর্শকদের চোখ াঁধিয়ে গেল। অভিনয়ে, ঘটনায়, সাজে, স্টেজরচনায়, জাঁকজমক, আড়ম্বর এবং যন্ত্রকৌশল বড় হয়ে উঠল।

জাতীয় জীবনের সঙ্গে জন্মারম্ভেই যোগ রক্ষা করা বাংলা নাটকের একটি বৈশিষ্ট্য আগেই বলা হল। দীনবন্ধু মিত্র এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাংলা নাটককে সার্থকভাবে, আরও সংহত আকারে অঞ্চল-বিশেষের জনসাধারণ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আসরে নামিয়ে আনলেন। "দীনবন্ধু এবং গিরিশচন্দ্র দুজনেই এদিক দিয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়েছেন। দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতা ছিল প্রত্যক্ষলব্ধ এবং সাধারণ পল্লীজীবনের সাংসারিক সুখ দুঃখের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ স্বভাবত গভীর ছিল। তাই অশিক্ষিত দরিদ্র লোকেরাই তাঁহার নাট্যরচনায় উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। ভদ্রলোকের ভূমিকা দীনবন্ধুর হাতে ব্যঙ্গরচনা ছাড়া অন্যত্র ফোটে নাই। ভদ্রঘরের সন্তান হইয়াও যাহারা খুব নীচে নামিয়া গিয়াছে মাতাল, নেশাখোর, বুদ্ধিহীন অসহায়

দীনবন্ধু মিত্র

তাহাদের ভূমিকা ব্যর্থ হয় নাই।"

(সুকুমার সেন)

"যেখানে তাঁহার অভিজ্ঞতার অভাব হইয়াছে সেখানে তিনি পুঁথিগত আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন।" (সুকুমার সেন) "তাঁহার চরিত্র প্রণয়ন প্রথা এই ছিল যে, জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রকরের ন্যায় আঁকিতেন।" (বঙ্কিমচন্দ্র)। দীন-বন্ধু মিত্রের সঙ্গে একদিক দিয়ে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের মিল আছে। বাংলা গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে যখন রাজ-সিংহ, সেলিম শাহের, আসর খুব জমকালো, তখন রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র নতুন সুর এনেছিলেন, গল্পগুচ্ছ, গোরা, পল্লীসমাজ, বিরাজবৌ প্রভৃতি লিখে। নাটকে কিন্তু কুলীনকুলসর্বস্ব'র সময় থেকেই এ কাজ হয়ে এসেছে। পরে বঙ্ক নাটক ও সাধারণ রঙ্গমঞ্চগুলি প্রতাপাদিত প্রতাপসিংহ নিয়ে মেতে রইল। উপন্যা গণদেবতারও আগমন হল।

বাংলা নাটকে গান। গানে বাহুল্য বাংলা নাটকের একটি বৈশিষ্ট্য। মধ্যযুগের বাংলা নাটক কি নেই। কীর্তন, রামায়ণগান, কথক কৃষ্ণলীলা, যাত্রাগান প্রভৃতিতে অভিন লুকিয়ে ছিল। এর পর নাটক এল বিদেশী আদর্শে নাটক রচিত হলে দর্শকদের মন পূর্বোক্ত অভিনয় ধারা পুষ্ট। তাই গান নাচ রাখতেই হল প্রথমে সংস্কৃত নাটকের অনুসারে দর্শক দের বিনোদন ও শ্রান্তি দূর করার কা গান ব্যবহৃত হয়। মনোমোহন ব (১৮৩১–১৯১২ খৃঃ) যাত্রা পাঁচাল কথকতার রীতির সঙ্গে আধুনিক নাটক মিল ঘটিয়ে অপেরা জাতীয় গীতাভি সৃষ্টি করলেন। গান এল সংলাপের হয়ে নাটকের ঘটনার প্রয়োজনে, শু অবসর বিনোদন, শ্রান্তি দূর তবে তাঁর নাটকও পুরোপুরি নয়। "মনোমোহনের নাটকে এবং গীতাভিনেতবা নাট্যের হইয়াছে।" (সুকুমার সেন)। প্রভৃতি এই ধারা গ্রহণ করেন এবং গদ্য এবং কাব্যনাট্যেও গান সংলাপ চরিত্র বিকাশের কাজে লাগে। নাচ সে সঙ্গে এসেছে, যদিও তার কাজ বিনোদন শুধু। বাংলা গান জীবনের সঙ্গে খুব যোগযুক্ত। সব অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তা ছাড়াও সাধার জীবনের সুখ দুঃখ বেদনার সঙ্গে গভী যোগযুক্ত। তাই নাটকের সংলাপে গা সহজেই মানায়। হৃদয়াবেগ একটু উ পর্দায় উঠলেই সহজেই গানে প্রকাশি হয়ে যায়।

বাংলা নাটকের ত্রুটি। বাং নাটক এখন যে দুর্দশায় এ পেঁছেছে তার পেছনে সামাজিক অর্থনৈতিক নানা কারণ আছে। তা একটি বড় কারণ হল, বাংলা নাটক দেশে জীবন ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আর যে রাখতে পারছে না। অথচ এই যোগ ছি বলেই তার সমৃদ্ধি দেখা গেছে। এখন পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসা

নাটকে রয়ে গেছে। পুরনো ব্যঙ্গ-
তুক অভিনীত হচ্ছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল এবং তাঁর আগে
দের দেশের জাতীয় আন্দোলনের যে
ল্রিক চরিত্র ছিল তা বদলে গিয়ে
ভীর জন-আন্দোলন এসেছিল।
ক কিন্তু তা এল না।

বাংলা নাটকে প্রচলিত সমাজ সমস্যাও
আর নেই। এখন নতুন সমস্যা
ছে। নাটকে কিন্তু তা আসেনি।
দর্শনের অনুসরণে রচিত নাটক
রণ রঙ্গমঞ্চে দেখা গেল না। তবে
নতুন নাটক, দুঃখীর ইমান, শ্রীযুক্ত
রকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় যা
তোর মঞ্চস্থ হয় এবং রঙমহলের
র্শ হিন্দু হোটেল" প্রভৃতি কয়েকটি
টি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বাংলা
উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারা পাল্টে
রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের ধারা এল।
ণ জীবনের কথা গভীর সুরে বলা
ঐতিহাসিক রোমান্স বা আরব্যোপ-
র জাতের রোমান্টিক রচনা দূরে হল।
ণ জীবন ও সমাজ শুধু ব্যঙ্গ-
দের নিয়ে রইল না। নাটকে কিন্তু
ত ইতিহাস, ভক্তিরস, পুরনো ব্যঙ্গ-
ক বজায় রইল। আরও পরে,
। সমস্যা শুধু দেশেরই সমস্যা
না আন্তর্জাতিক হয়ে উঠল।
যুগের সমস্ত পৃথিবীরই সমস্যা
উঠল। বাংলা উপন্যাসে সেই
। সমস্যা দেখা দিল, নাটকে তা হল
নাটকে বাংলা দেশেরই পুরনো দিনের
শকা, আড়ম্বর, সমস্যা বজায় রইল।
ল নিরপেক্ষ চিরন্তন, মানবজীবনের
বাংলা নাটক কখনও বলে নি। যে
পুরুষেরা দেশকাল নিরপেক্ষ মানব-
নর বীর্য, ধর্ম, নীতির আদর্শ প্রচার
হন, তাঁদের নিয়ে নাটক লেখা
হ: বিভিন্ন নাটক ধর্ম, প্রেম প্রভৃতি
ন বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে।
চিরন্তনতা কাহিনীতে থাকলেও
গুলির অবলম্বন হল সেই সময়ের
র দর্শকদের সেণ্টিমেণ্ট। তারই
প গ্রহণ করেছেন নাট্যকাররা। তাই
নাটকগুলিতে একটি বিশেষ সময়ের
তার ছাপই বড় হয়ে উঠল।

ভাবাবেগের আতিশয্য বাংলা নাটকের

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

একটি বিশেষ দোষ এবং অবলম্বন। তাই
দেখা যায় বাংলা নাটক বঙ্কিমচন্দ্রের
উপন্যাসের ধারা ত্যাগ করে কোন কোন
সময় কেবল শরৎচন্দ্রকে জায়গা দিয়েছে।
শরৎচন্দ্রের লেখা তার সাধারণ জীবনের
ছবি, সাধারণ চেনা মানুষের জন্য রঙ্গমঞ্চে
প্রিয় হয়নি, হয়েছে সেণ্টিমেণ্টাল বলে।
তা না হলে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের
নাট্যরূপও চলতে পারত। কিন্তু সে চেষ্টা
ব্যর্থ হয়েছে।

বাংলা গল্পে উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের পর
বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র
মিত্র প্রভৃতির ধারা এসেছে। নাটকে তা
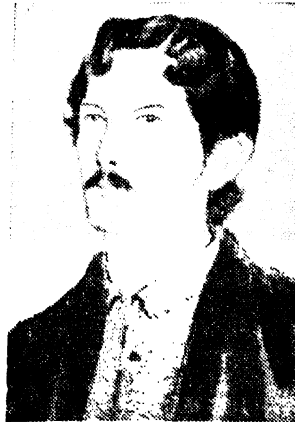
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

আসেনি। দেশের জনসাধারণের জীবনের
সঙ্গে নাটকের আরও গভীর যোগ
প্রয়োজন। সমাজের, জীবনের "sternest
criticism" প্রয়োজন।

বাংলা কাব্য, গল্প এবং উপন্যাস
প্রভৃতি সব সময় সমসাময়িক পাশ্চাত্য
সাহিত্য থেকে প্রেরণা নিয়েছে। বাংলা
নাটক কিন্তু বহু পুরনো ইংরিজী
নাটকের অনুসরণ করেছে। টি, এস,
এলিঅটের পরবর্তী কবি, ও ঔপন্যাসিক-
দের প্রভাব বাংলাকাব্য উপন্যাসে পড়েছে।
কিন্তু শ খানেক বছর আগেকার ইব-
সেন'ও নাটকে এখনও স্থান পান নি।
তাই আধুনিক নাটক এখনও রচিত হল
না। অথচ মধুসূদন ও ইবসেন সমসাময়িক,
কিন্তু তবুও সব নাট্যকাররা কেবল
শেক্স্পীয়র, শেরিডানকেই অনুসরণের
ব্যর্থ চেষ্টা করলেন।

আধুনিক নাটক ও ইবসেন।
পৃথিবীর সাহিত্যের জগতে ইবসেন
আধুনিক নাটকের জন্মদাতা বলে পরি-
চিত। আধুনিক কালের প্রায় সব নাট্য
আন্দোলনের উৎস কোন না কোনরূপে
ইবসেনে পাওয়া যাবে।

ইবসেনের আগে পাশ্চাত্য নাটকের
অবস্থা সম্বন্ধে জে ডব্লিউ ম্যারিঅট
বলেছেন যে, নাটক দেখত যারা তারা
অধিকাংশই অভদ্রজন। থিয়েটারের অবস্থা
অত্যন্ত কুৎসিত ছিল। "When British
drama was at its lowest ebb its
failure was due to the fact it
made no appeal to intelligence.
It had sensationalism, emotiona-
lism but no brains behind it."

ইবসেন নাটকে প্রথম আধুনিক যুগের
উপযোগী চিন্তা, জিজ্ঞাসা, সমালোচনা
আনলেন। বর্তমান যুগের সমগ্র মানব-
জীবনের কথা তাঁর নাটকে বলা হল।
আধুনিক যুগের সমস্যার সঙ্গে চিরন্তন
মানবজীবনও ইবসেনের নাটকে ধরা
পড়েছে। ইবসেনের নাটক নাট্য সাহিত্যকে
নতুন করে মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠা
দিল।

ম্যারিঅটের উপরে উদ্ধৃত উক্তিতে
ইবসেনপূর্ববর্তী পাশ্চাত্য নাটকের যে
অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায় আমাদের
দেশের সাধারণ রঙ্গমঞ্চের নাটক, অভিনয়
এবং সাধারণ অবস্থাও ঠিক তাই। ম্যারি-

অর্ট্ বলেছেন, এ অবস্থার পর ওদেশে হঠাৎ নাটকের যে বিস্ময়কর উন্নতি দেখা গেল তার কারণ, "a steady rise in standards of judgement due to the spread of education."

ইবসেনের হাতে নাটক লিজেণ্ড আর রূপকথার জগৎ ছেড়ে সাধারণ জীবনে নেমে এল। প্রচলিত নাটকে ভাল মন্দ, কমিক প্রভৃতি টাইপ চরিত্র থাকত। নাটকে তাদের প্রবেশ ও প্রস্থান ঘটত নাট্যকারের সুবিধা অনুসারে। তাই তারা নিখুঁৎ ব্যবহার করলেও সজীব ছিল না। প্রচলিত বাংলা নাটকেও তা ঘটেছে। ইবসেন সেই টাইপ্ চরিত্র বর্জন করলেন। ডেকে আনলেন সত্যি জীবনের মানুষদের। ইবসেনের সময়ে নাট্যকাররা অদ্ভুত সব ঘটনা, চক্রান্ত, অবিশ্বাস্য সমাধান নাটকে দেখাতেন। ইবসেন সে সব ত্যাগ করে দেখালেন যে নাটকের প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি চরিত্র এবং তাদের প্রবেশ, প্রস্থান কাহিনীর প্রয়োজনে ঘটান চাই। যুক্তিযুক্ত অর্থপূর্ণ হওয়া চাই। চরিত্রগুলিরও স্বাভাবিক, সজীব মানুষের মতই কথা বলা প্রয়োজন। তাই aside আর স্বগতোক্তির সস্তা কৌশল ইবসেন ছাড়লেন। অকস্মাৎ দৈব ঘটনা দূর হল।

ইবসেন তাঁর নাটকে প্রচলিত রীতির ১ম অঙ্কে ঘটনা ও চরিত্রের পূর্বেতিহাস প্রকাশ, ২য় অঙ্কে ঘটনার অগ্রগতি বা ডেভেলপ্‌মেণ্ট, ৩য় অঙ্কে ক্লাইম্যাক্স ও সমাধান, মানেন নি। তাঁর রীতি ছিল ঘটনার মাঝখানে নাটক আরম্ভ করা। নাটক যখন আরম্ভ হল, তখন ঘটনা ক্লাইম্যাক্সের দিকে অনেকটা এগিয়েছে। প্রচলিত রীতিতে ১ম অঙ্ক অত্যন্ত একঘেঁয়ে, গতিশূন্য হত। ইবসেন, ঘটনার ¾ অংশ পার করে শুরু করতেন, তার ফলে ঘটনার গতি ও সংহতি দ্বিগুণ বেড়ে যেত।

বাংলা নাটক ও রবীন্দ্রনাথ। বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত শিল্পরসোত্তীর্ণ নাটক লেখেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ। বাংলা নাটকের বহুবৈচিত্র্য ঘটেছে তাঁর হাতেই। তাঁর প্রথম জীবনের নাটকেই দেখা যায় তিনি প্রচলিত রঙ্গমঞ্চের অবলম্বন জাতীয়তা বোধ, ভক্তি রস এবং সমাজবিষয়ক ব্যঙ্গকৌতুক গ্রহণ করেননি। পৌরাণিক নাটক তিনিও লিখেছেন, বাল্মীকি প্রতিভা, কাল মৃগয়া। কিন্তু এ নাটকের আবেদন দর্শকদের শিল্পরসের অনুভূতির প্রতি। সহজ সেণ্টি-মেণ্ট, ভক্তিরসের প্রতি নয়। লক্ষণীয় এদের রূপ হচ্ছে গীতিনাট্যের বা Opera'র। বিদেশে দেখা যায় অভিনয়ের জগতে গান ও নৃত্য স্বতন্ত্র মর্যাদাপূর্ণ জায়গা করে নিয়েছে, ব্যালে এবং অপেরাতে। বাংলায় বহুদিন গান ও নাচ সাধারণ নাটকের সঙ্গে বাঁধা পড়ে ছিল। অপেরা

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

এবং ব্যালে'র জগতে মুক্তি পায় নি। রবীন্দ্রনাথ প্রথম তা করলেন—বাল্মীকি প্রতিভায়। বাল্মীকি প্রতিভা, মায়ার খেলা শেষ জীবনে নৃত্যনাট্যের আকার ধারণ করে। এ ছাড়াও অন্যান্য নৃত্যনাট্যও শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন। এইভাবে গান ও নাচের অভিনয়-জগতে বাংলা নাটকে একটা স্বতন্ত্র মর্যাদাপূর্ণ জায়গা রবীন্দ্রনাথ করে দিলেন। এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাধারণ নাটকে সবচেয়ে সার্থকভাবে গান ও নাচের ব্যবহার করেছেন। তারা ঘটনার প্রয়োজনে এসেছে, প্রক্ষিপ্ত নয়। নাটকের একটি প্রধান অবলম্বন সংলাপ। তার সাহায্যেই ঘটনা ও চরিত্র বিকশিত হয়। রবীন্দ্রনাট্যে গান ও নাচ সংলাপের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গেছে। ঘটনা ও চরিত্রের বিকাশ ও বিবর্তন হয়েছে সংলাপের সঙ্গে গান ও নাচের সাহায্যে। আর কোনও বাংলা নাটকে নাচ ত' দূরের কথা, গানও এমনভাবে নাটকের অঙ্গ হয়নি। তাসের দেশের রাজপুত্র, নটীর পূজার নটী বা শারদোৎসবের ঠাকুর্দা এরকম যে কোনও চরিত্র এবং নাটকের সঙ্গে অন্য বাংলা নাটক তুলনা করলেই বোঝা যাবে।

রবীন্দ্রনাট্যের প্রথম পর্বেই দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ যে রোম্যাণ্টিক নাটক লিখেছেন, তার সঙ্গেও প্রচলিত নাটকের কোন মিল নেই। তার কারণ, ভগ্নহৃদয়, নলিনীতে রবীন্দ্রনাথের হৃদয় ও মনের আবেগই প্রধান অবলম্বন। দর্শকদের হৃদয়াবেগ নয়। প্রকৃতির প্রতিশোধে রবীন্দ্রনাথ যে পথ নিলেন বাংলা সাহিত্যে তা সম্পূর্ণ নতুন। চিন্তার সঙ্গে নাটকের যোগ, চিরন্তন মানবজীবনের সমস্যার আলোচনা এই প্রথম হ'ল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাট্য-প্রতিভা এই পর্বে মোটেই ফুটে ওঠে নি।

দ্বিতীয় পর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত রঙ্গমঞ্চের আদর্শে নাটক রচনা করেন। কিন্তু সেখানেও চিরন্তন মানুষের জীবন প্রধান হয়ে ওঠে। চিন্তা ও বুদ্ধির প্রতি আবেদন বড় হয়ে ওঠে। সহজ সেণ্টিমেণ্ট তাঁকে ভোলায় নি। রাজা ও রানী, বিসর্জন, প্রায়শ্চিত্ত তার প্রমাণ। এই পর্বের হাস্য-কৌতুক এবং কাহিনী বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক একাঙ্ক নাটক। নিছক হাসির নাটকও রবীন্দ্রনাথেরই দান, তার আগে সব ছিল ব্যঙ্গপ্রধান।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে আধুনিক সিম্বলিক নাটকের রূপ প্রথম দেখা যায়। তাঁর নাটকে চিরন্তন মানবজীবন এবং বর্তমান যুগের মানবজীবনের সমস্যা বড় হয়ে ওঠে। ইবসেনের মতই—"The *burning questions* of the day did not excite him overmuch: he was concerned with eternal and fundamental truths. He was a poet, a creative artist, first last and all the time." (J. W. Marriott)

কোন দেশের আর সম্পূর্ণ একার জীবন বা সমস্যা এ যুগে নেই। রবীন্দ্রনাথ সেই যুগের সমস্যা নিয়ে নাটক

[...]ন। মুক্তধারা, রক্তকরবী, অচলায়তন [...] তার নিদর্শন। বলা উচিত, এসব [...] বর্তমান যুগের প্রধান সমস্যা [...] চিরন্তন মানবজীবনের কথা মিশে [...]। রাজা, ফাল্গুনী, শারদোৎসব, ডাক-[...] তপতী প্রভৃতিতে চিরন্তন মানব-[...]নের কথা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ [...]কবি। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বিশ্ব-[...]ত্যের যোগ ঘটিয়েছেন। এর কারণ, [...]বল প্রাইজ পেয়ে বিশ্বের কাছে প্রথম [...] সাহিত্যের কথা জানালেন তা নয়। [...] কারণ, আন্তর্জাতিক জীবন ও [...]্যা তাঁর সাহিত্যের বস্তু। আধুনিক [...]ত্যের এইটে একটা বড় বৈশিষ্ট্য, তার [...]লম্বনই বর্তমান যুগের মানবজীবন। [...] যুগে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেরও অবলম্বন [...] দেশ ও কালবিশেষের মানবজীবন,

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

[...]ও তারা স্থান পেয়েছে, সেই জীবনের [...]ড ছাড়িয়ে চিরন্তন মানব হৃদয়ে।
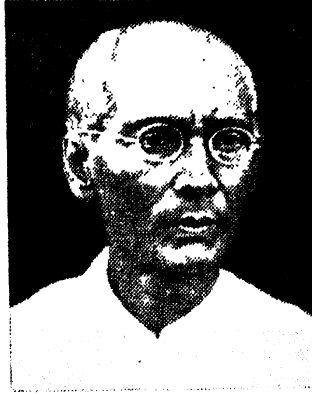
বাংলা নাটকে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক [...]হি[...]নাটকের রূপ আনলেন। অভি-[...]য়ের রীতি, মঞ্চ, সজ্জা, নাটক রচনার [...]ীতিতে আধুনিকতা দেখা দিল। তাঁর [...]টকেও সহজেই ভাল বা মন্দ বলা যায় [...]মন টাইপ চরিত্র নেই। তার নিদর্শন রক্ত-[...]রবীর রাজা, মুক্তধারার রণজিৎ, বিভূতি [...]ভৃতি। অবশ্য তাঁর নিজের সিম্বলিক [...]ঙ্গীর কয়েকটি টাইপ চরিত্র আছে, বাউল [...]াকুর্দা প্রভৃতি। স্বগতোক্তি রবীন্দ্রনাথ [...]াঁর শেষপর্বের স্বভঙ্গীর নাটকে প্রায় [...]াদ দিয়েছেন। নাটকের রচনারীতিতেও [...]ম অঙ্কে পূর্ব ইতিহাস বর্ণন (Exposition), ২য় অঙ্কে ঘটনাপ্রগতি (Development), ৩য় অঙ্কে ক্লাইম্যাক্স এবং পরিণতি এসব মানেন নি। একথা অবশ্য তাঁর শেষপর্বের নিজের ভঙ্গীর নাটক সম্বন্ধেই বলা হচ্ছে। তাঁর এইসব নাটকও আরম্ভ হয়—সাধারণত ঘটনার মাঝখানে। যদি কখনও প্রয়োজন হয় তবে খুব ছোট করে, নাটকের মাঝের কোনও দৃশ্যে, সংক্ষিপ্ত সংলাপে পূর্ব ইতিহাস হঠাৎ বলে দেন, যেমন মুক্তধারায়।

রবীন্দ্রনাথ অভিনয়শিল্পকে সর্ব-শিল্পের সমন্বয় মনে করেছেন। আধুনিক নাট্য-সাহিত্যেরই এটি একটি বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাট্যে গান, নাচ এবং সাহিত্য ত' মিলেছেই, তার সঙ্গে দৃশ্য এবং রূপ-সজ্জায় উন্নত চিত্রশিল্পেরও মিলন ঘটেছে। গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল রবীন্দ্রনাট্যের দৃশ্য এবং রূপ-সজ্জার ভার নিয়ে এই মিলন সার্থক করে তোলেন।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আরম্ভটাই হল বড় কথা। তাই রাজারাজড়া, যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী এত প্রিয়—যেখানে সাজপোশাকে, অভিনয়ে, গল্পে বেশ হৈ চৈ, জাঁকজমক আছে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিভাবান অভিনেতা যাঁরা, তাঁরাও কতগুলো স্টেজ্ ট্রিক্ ব্যবহার করেন—বিশেষ ভঙ্গী ইত্যাদি—যা দর্শকদের খুব প্রিয় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষপর্বের নাটকে স্টেজ সাজ, অভিনয়ে সব জাঁক-জমক ত্যাগ করলেন। অত্যন্ত সহজ ও নিরাড়ম্বর হল তাঁর নাটক, বিষয়ে, সাজে, ও অভিনয়ে। যেখানে "lavish spectacles, melodrama and lofty passion" আছে সেখানে অভিনয়েও হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠা, হঠাৎ গলা নামিয়ে নেওয়া, লাফঝাঁপ, দীর্ঘ স্বরবর্ণ টেনে টেনে উচ্চারণ করা মানায়। "When the drama changed its nature and concerned itself with coherent argument, the actor had to repress his exhibitionistic tendencies and speak naturally."

রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের নাটকের অভিনয়রীতিও সহজ ও স্বাভাবিক। হাত পা নাড়া কম, দীর্ঘ স্বরবর্ণ টেনে বলার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রীতি নেই। জীবনের মতই আড়ম্বর-হীনতা তাঁর এই নাটকগুলির প্রধান গুণ এই কারণেই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তাঁর নাট[ক] চলল না। আমাদের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে[র] অভিনয় পদ্ধতি, নাটক, দৃশ্য, সজ্জ[া] সংগীত এখনও ইয়োরোপের নাটকে ইবসেন-পূর্ববর্তী অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তার মানে প্রায় ১০০ বছ[র] পেছিয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ সাধারণ রঙ্গ-মঞ্চের সঙ্গে ইবসেনের মত যুক্ত থাকলে বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চও ইউরোপে[র] থিয়েটার ও নাটকের মত উন্নত হতে পারত

—৯—
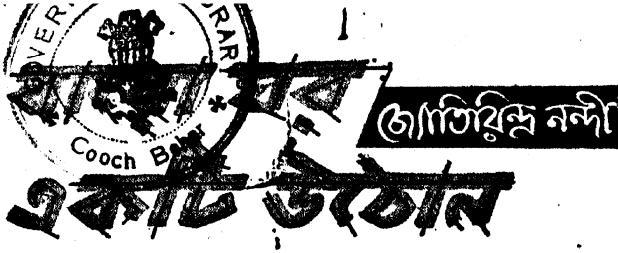
বনমালীর দোকানের সামনের পায়া ভাঙ্গা বেঞ্চে বন্ধুকে বসতে দিয়ে কে গুপ্ত হাসল, 'এই আমার রাজসিংহাসন ব্রাদার, বোস।'

'চমৎকার চমৎকার।' বন্ধু চারদিকে চোখ বুলিয়ে রাজসিংহাসনে বসল। 'খুব ভাল জায়গায় এসে আস্তানা গেড়েছ যা হোক।' কে গুপ্ত জোরে হাসে। বন্ধুকে তার বস্তির ঘর উঠোন পাইখানা সব দেখিয়ে এখন বৈঠকখানায় অর্থাৎ মুদিদোকানের সামনে নিয়ে এসেছে দুজনে ব'সে অনেকদিন পর একটু সুখদুঃখের গল্প করবে বলে।

'হ্যাভ এ স্মোক।' কে গুপ্ত বন্ধুকে বিড়ি অফার করল। বুদ্ধিমান চারু রায় কোনপ্রকার দ্বিধা না ক'রে হেসে হাত বাড়িয়ে বিড়ি তুলে নিলে।

'থাকী।' গুপ্ত চোখ বড় করে হেসে বন্ধুর দিকে তাকায়।

'দ্যাটস অলরাইট। তারপর, কেমন আছ? ছেলেমেয়ে ভাল আছে? ওয়াইফ কি সিক?'

'না।' গুপ্ত মাথা নাড়ল। 'মন খারাপ তাই অহোরাত্র শুয়ে কাটান।'

চারু রায় এসম্পর্কে আর কিছু প্রশ্ন না ক'রে বরং অধিকতর উচ্ছল হাস্য-বিচ্ছুরিত চোখে বন্ধুর দিকে তাকায়। 'দারুণ জায়গায় এসে বাসা বেঁধেছ ভায়া। আমি ভাবছিলাম, তাই তো, কোথায় গেল আমাদের গুপ্ত, এমন শৌখিন লোক, এমন সুখের পায়রা কোলকাতার আড্ডা ছেড়ে দিয়ে কোন্ বনে উড়ে যেতে পারে আমরা বন্ধুরা কেবলই বলাবলি করছিলাম। এ্যাঁ, ইন দি লঙ রান তুমি যে দেখছি সুন্দর মৌ-বনটিতে এসে যাকে বলে গা-ঢাকা দিয়ে আছ।'

বনমালী হা ক'রে তাকিয়ে রীমলেশ চশমা পরা দাড়িগোঁফ কামানো ফর্সা ধবধবে চারু রায়ের মেয়েলী চেহারাটা দেখছিল। কথা শুনে এখন মুখ টিপে হাসল।

'মৌ-বনই বটে, মৌ-মাছির ঝাঁক।' গুপ্ত খুশী হয়ে ঘাড় নাড়ে, কিন্তু পর-ক্ষণেই মুখ কালো করে। 'দুঃখের বিষয় মধু খাওয়া হয় না।' টাকা বাজানোর মত দু আঙুলের মাথায় বাড়ি মেরে কে গুপ্ত হতাশ ভঙ্গিতে বন্ধুর দিকে তাকাল, 'এই না হলে ভুবন মিছে।'

'দরকার কি।' ক্রিজ করা পেন্টুলন সমেত পায়ের ওপর আর এক পা তুলে দিয়ে চারু রায় হঠাৎ মেরু-দাঁড়া টান করে সোজা হয়ে বসল। 'টাকা খরচ ক'রে মধু খাওয়ার চেয়ে মধু বিক্রী ক'রে টাকা রোজগার করছ না কেন? ওটাই তোমার এখন করা উচিত।'

'কে কিনবে শুনি, কার কাছে বিক্রী করব?'

'হোপলেস।' চারু হতাশ ভঙ্গিতে আকাশের দিকে তাকালো, একটু যেন ভাবল কি, তারপর গুপ্তর দিকে চোখ নামিয়ে মৃদু হাসল। 'আমি, আমরা। তুমি কি চারু প্রডাকসনের নাম ভুলে গেছ?'

গুপ্ত চোখ বড় করল।

'নতুন বইয়ে হাত দিয়েছ নাকি?'

'হ্যাঁ।' চারু দৃপ্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'কাগজে বিজ্ঞাপন দেখছ না।'

'কাগজ আর পড়ি না।'

'না পড় ভাল। কিন্তু আমি তো এলাম তোমাকে জানাতে। আমার এখন একটা না, এক ঝাঁক মৌমাছির দরকার, দাও, পার দিতে?'

'এত!'

'হ্যাঁ এত।' বুক ফুলিয়ে চারু সতেজ ভঙ্গিতে বলল। 'কয়েক ডজন মেয়ে দরকার আমার ছবিতে। আই ওয়ান্ট ডজন অব গার্লস, দাও।'

গুপ্ত কথা বলে না।

'এমন ছবিতে হাত দিয়েছি আমি, আর সব বাংলা আর হিন্দীকে একদম কানা করে দেবে।'

'অনেক মেয়ের পার্ট আছে বুঝি বইয়ে?'

'হ্যাঁ, অনেক সেক্স। দেখি কোন্ বা টেক্কা দেয় চারু রায়ের ডিরেকসনের সঙ্গে কোন্ ছবি মাথা তোলে মায়াকাননকে ছাড়িয়ে।'

'ছবির নাম মায়াকানন হবে বুঝি' ওধার থেকে বনমালী প্রশ্ন করল।

চারু রায় এপ্রশ্নের উত্তর দিলে না পকেট থেকে সোনার সিগারেট কেস বা'র করে কে গুপ্তকে সিগারেট অফার করল। সিগারেট ধরিয়ে গুপ্ত এক চোখ ছোট ক'রে বন্ধুকে বলল, 'তা এ-বনের মৌমাছিদের কেমন দেখলে?'

'ওটি কে, ওই যে বারান্দার খুঁটি ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিল?'

'ওটা কিসসু না। বাজে। দেখলে না কেমন লম্বাটে ধরনের থুতনি।' মুখ বিকৃত করল গুপ্ত এবং নাক দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল। 'শেখর ডাক্তারের মেয়ে এ্যান্ড শী ইজ গোয়িঙ টু বি ম্যারেড সুন।'

'চুলোয় যাক।' ভক্ করে একগাল ধোঁয়া বার ক'রে চারু ঠোঁট বাঁকা করল। 'আর একটিকে দেখলাম মগ্ হাতে কুয়ো-তলার দিকে যাচ্ছিল। শ্যামলা চেহারা।'

'হ্যাঁ, এর বড়টাই টেলিফোনে কাজ করে। মন্দ না। ফেসকাটিং ভাল।' গুপ্ত ঘাড় নেড়ে বলল, 'বীথি নাম।'

চারু কিছু বলল না, শুধু একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'কিন্তু আসলটিকে তুমি দ্যাখোনি' গুপ্ত মিটিমিটি হাসল। 'হাজবেন্ড ঘরে ছিল ব'লে বারন্দায় বেরিয়ে আসবার সাহস পেলে না।'

'কত নম্বর ঘর?' চারু ভ্রুকুঞ্চিত করল। 'চার্মিং?'

'বলে কিনা চার্মিং।' গুপ্ত

রেটে টান দিল। তারপর বেশ কটা. ধোঁয়া গলধকরণ ক'রে বাকিটা থেকে ছাড়বার সময় তাই দিয়ে সুন্দর রিং তৈরি ক'রে ফেলল। ধোঁয়ার া ঘুরতে ঘুরতে একদিকে উড়ে পর কে গুপ্ত বলল, 'তোমার র ছবির হিরোইন হতে পারে।'

'এমন!' চারু ভুরু টান করল। 'আহা, ার দেখতে পেলাম না।'

'পাগল হয়ে যাবে রায়। আমি রেডি পাগল হয়েছি।' কে গুপ্ত রিন্স আওড়ায়—

How to keep—is there any, is there none such, nowhere wn some, low or brooch or id or brace, lace, latch or catch key to keep back beauty, keep beauty, beauty, beauty, from ishing away?

'এভেইলেব্‌ল?' চারু ভুরু কুঁচকোয়।

'তা জানি না।' গুপ্ত মাথা নাড়ল। ব কানাঘুসো শুনছি শ্রীমান শীগগির র হচ্ছে. হয়তো হয়েই গেছে। কাল ন্ ঘর থেকে আটা ধার করে এনেছিলেন সেটা আর ফিরিয়ে দিতে না পেরে অপমানিতা হয়েছেন।'

চারু গম্ভীর হয়ে কি ভাবে।

'আমার মৌ-বনের কুইন।' গুপ্ত বেশ্ করে হাসে। 'একবার প্রপোজ করতে। ভাল টাকা দিয়ে শ্রীমানটিকে যদি করতে পার, অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ঝয়ে বলতে হবে আজকাল অনেক ন ঘরের বৌ-ঝিরা ফিল্‌মে নামছে ষের কিছু নেই, নতুন মফস্বল থেকে ছে. বুঝলে না—' গুপ্ত হঠাৎ থামল। না তার কথা এমনিও চাপা পড়ে গেছে টা মোটারের শব্দে। গুপ্ত, চারু রায় ওধারে আর একটা বেঞ্চে বসা শিব-, বলাই ও দোকানের ভিতর থেকে ালী ঘাড় টান করে দেখল অদূরে তলায় কর্পোরেশনের জলের গাড়ি দাঁড়িয়েছে।

এ-পাড়ায় বাসিন্দা বেড়েছে। পাইপের কুলোচ্ছে না বলে দু' বেলা পিঁপে ড়তে ক'রে 'পানীয় জল' বিলানো হয়। ড় এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে পিল্ , ক'রে ছুটে আসে মানুষ। সে-এক কাণ্ড। কে আগে জল ভরবে এই নিয়ে মারামারি। লাইন করে সাজিয়ে রাখা কলসি বালতি ডেকচি গামলা হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ শব্দ ক'রে ছত্রখান হয়ে যায়। কেননা যতটা সময় গাড়ি দাঁড়াবার ও যত গ্যালন জল ঢালবার কথা তার চেয়ে প্রায়ই বালতি কলসির সংখ্যা বেশি হয়ে যায় বলে শেষ পর্যন্ত আর লাইনের নিয়ম রক্ষা হয় না। এর মাথার ওপর দিয়ে ওর বালতি ছুটে যায়, ওর পায়ের ফাঁক দিয়ে এর ডেকচি বেরিয়ে আসে। চলকানো জলে কারো মাথা ভেজে কারোর ব্লাউজ। বকাবকি ঝকাঝকি।

'হরিবল্।' দৃশ্য দেখে চারু ঘাড় ফেরাল।

'আমাদের চোখ সওয়া হয়ে গেছে দেখতে দেখতে গা সওয়া।' কে গুপ্ত শেষ টান দিয়ে সিগারেটের টুক্‌রোটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। 'এখানে বসে অই ত দেখি।'

'এখানকার ম্যানেজমেণ্ট আরো ভাল হওয়া উচিত।' ছোট্ট একটা নিশ্বাস ছেড়ে চারু রায় বলল, 'এতগুলি ভদ্দরলোকের বাস যেখানে, সেখানে—' কথা তার হঠাৎ থেমে যায়। কে গুপ্ত প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে বন্ধুর একটা হাত চেপে ধরল। 'দ্যাট, দ্যাট্ লেডী, এ কুইন, লুক ইয়ণ্ডার।' চারু রায়ের কানের কাছে ফিস-ফিসিয়ে উঠল কে গুপ্ত। চারু রায় চমকে লিচুতলার দিকে ঘাড় ফেরায়। তারপর হা ক'রে তাকিয়ে দেখে।

মাটির কলসী কাঁখে বিধুমাস্টারের দুই মেয়ে মমতা সাধনা পিছনে একটা বড় বালতি হাতে ময়না বীথি টগর। তারপর করবী ছন্দা বেবি। ওদের হাতে মগ ঘটি। এবং বেবির ঠিক পিছনেই চলছিল কমলা। আট নম্বর ঘরের গৃহিণী। আঁচল খসে খোঁপাটা দেখা যাচ্ছে একটা বড় কুন্দফুল গোঁজা। আর কলসীর ভারে যৌবনপুষ্ট শরীরে দোলা লাগছিল। গভীর জলের বুকের মন্থর ঢেউয়ের মতন। কমলার পিছনে আর কেউ ছিল না। শেষ পর্যন্ত ওর সবটাই দেখা গেল, তারপর বাসকের বেড়ার আড়াল পড়ে যাওয়াতে আর কিছু দেখা গেল না জল নিয়ে ঘরে ফেরার দল অদৃশ্য হ'ল।

দেখা শেষ হ'তে চারু ঘাড় ফেরায়।

'মক্ষিরাণী কিনা?' গুপ্ত চোখ বড় করে আছে।

তৎক্ষণাৎ কথার জবাব না দিয়ে চোখ বুজে চারু কি যেন চিন্তা করল, তারপর সোনার ডিবি থেকে সিগারেট তুলে বন্ধুকে একটা অফার করে এবং নিজে একটা মুখে গুঁজে, তাতে অগ্নিসংযোগ করল। সিগারেটে দুটো টান দেবার পর আস্তে আস্তে বলল, 'দ্যাখো গুপ্ত, যজ্ঞ যখন আরম্ভ করেছি, সম্পন্ন করবই। আই উইল ট্রাই, মাস্ট ট্রাই। আই লাইক টু হ্যাভ অল দোজ ফেসেস। কি নাম বলে আগের দুটির? বাপ মাস্টার? তাতে আটকায় না, আটকাচ্ছে না আজকাল। লিলুয়া থেকে আমি ডলিকে পেয়েছি, বাপ মাস্টার ঠিক নয়, টোলের পণ্ডিত। আরো গোঁড়া আরো ভীরু। কিন্তু কী করবে পেট বড় কি মান বড়। বরানগরের সুস্মিতার বাবা তো রিসার্চ স্কলার। মফস্বলের কোন্ কলেজের প্রোফেসর ছিলেন এককালে। বুড়ো বয়স তায় অন্ধ হয়ে গিয়ে কি আর হবে. সুমি গাইতে পারে ভাল. দিলেন ফিল্মে ঢুকিয়ে। তেমনি আমার মীরা চিত্রা পাখি বোস টেবি রায়। মোট আটটি মেয়ে আমি জোগাড় করতে পেরেছি এবং বংশ বল গোত্র বল পরিবারের শিক্ষাদীক্ষা ও সামাজিক মর্যাদা বিচার করলে কেউ তারা হীন নয়। কাজেই এখানেও যে আমি একেবারে নিরাশ হব বলা চলে না।'

গুপ্ত চুপ ক'রে সিগারেট টানতে লাগল।

'আরো আট দশটি মেয়ের আমার দরকার হবে। অ্যাণ্ড অল স্যাড বি নিউ ফেসেস। ছবি তোলার কাজে এই হল আমার প্রিন্সিপল। বিশেষ যে-সমাজ অবলম্বন করে আমার গল্প সেই সমাজের সেই অবস্থার মুখগুলোকে একত্র করে

বই আরম্ভ করতে না পারা তক প্রাণ ঠান্ডা হবে না। আন্ডারস্ট্যান্ড?'

গুপ্ত কথা না কয়ে ঘাড় নাড়ল।

'মায়াকানন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজ নিয়ে ছবি?' ওধারের বেঞ্চের শিবনাথ প্রশ্ন করে। 'ক্ষয়িষ্ণু নরনারীর গল্প?'

'হ্যাঁ।'

'তার ওপর সেক্স-এর কড়া ধ্রুপ।' এপাশ থেকে কে গুপ্ত দাঁত বের করে হাসে। 'চমৎকার ছবি হবে।'

'ইকনমিক্ ফ্রাসট্রেসান আর সেক্স অঙ্গাঙ্গি জড়িত', চারু রায় বক্তৃতা ক'রে বলল, 'যুদ্ধোত্তর জার্মেনীতে এই হচ্ছে, জাপানে হচ্ছে। আজ বাংলাদেশেও যা ঘটছে, তার প্রথম ছবি আমি তুলব। অ্যান্ড দিস্ উইল বি এ গ্রেট পিক্‌চার।' কথা শেষ ক'রে চারু ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। সবাই শুনে চুপ।

'এই ছবি দেখলে গায়ে কাঁটা দেবে রক্ত হিম হবে অথচ ছবি শেষ হয়ে যাবার পরও লোকে জায়গা ছেড়ে উঠতে চাইবে না।'

'এত অ্যাপীল এমন ইন্টারেস্টিং?' ওধার থেকে শিবনাথ চোখ বড় করল।

'হ্যাঁ।' চারু এবার শিবনাথকে সিগারেট অফার করল। 'আছে না কি আপনার জানাশোনা মেয়ে। মোটামুটি ইন্টেলিজেন্ট মডারেট শিক্ষিত। চেহারা যে খুব একটা মেনকা উর্বশী হতে হবে, তার কিছু নেই। ধরুন মিস ইভা চ্যাটার্জি সাবানের কারখানায় কাজ করছে, ওর অপ্সরী রূপ হবার দরকার নেই। সাধারণ প্লট কমন জিনিস নিয়ে গল্প হলে কি দরকার, কাদের দরকার বুঝতে পারছেন?'

অল্প হেসে শিবনাথ মাথা নাড়ল।

'হ্যাঁ, জানাশোনা এমন কাউকে অবশ্য দেখছি না।'

'না, না, তোমার টু-সীটার নিয়ে দিনকতক ঘোরাঘুরি কর এপাড়ায়, একটু চেষ্টা করলে খোঁজাখুঁজি করলে পেয়ে যাবে মনের মত মুখ।' গুপ্ত বন্ধুকে উৎসাহ দিয়ে তার সোনার ডিবি থেকে নিজেই হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট তুলে নিলে। চাকরিই তো করছে এখন চৌদ্দ আনা। ঘরে ব'সে আর ক'টা মেয়ে। এসো মাঝে মাঝে, আমরা বলে কয়ে দেখব 'খন।'

'ডিসেন্টভাবে থাকবার মেয়েদের এখন অই একটি লাইন।' পকেট থেকে সিল্ক-এর রুমাল বের করে চারু মুখখানা একবার মুছল। 'একটু পার্টস আছে এমন মেয়েদের কেরিয়ার গড়ে তোলার কতবড় সুযোগ! আমাদের বাংলা দেশের মেয়েরা বোম্বে মাদ্রাজের মত সাড়া পারছে না।'

'ভীরু, বড় লাজুক।' ওধার শিবনাথ বলল, 'একটু দেরি করছে। দেবে সাড়া।'

চারু রায় আর মন্তব্য করল না

'আচ্ছা আজ উঠি ব্রাদার।' একটু পর গুপ্তর দিকে তাকিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। …র এক শনিবারে আসব। কুইনকে …টিয়ে দাও গুপ্ত। বলে কয়ে দ্যাখো। …মাকে আমি মোটা কমিশন দেব। বিউটিফুল ওম্যান। কী নাম না যেন …সে হাজবেণ্ডের, কত নম্বর ঘর?'

'অমল চাকলাদার, আট নম্বর ঘর।' …গুপ্ত কিরণের স্বামীর নাম ও ঘরের …বর বলল। চারু নোট বইয়ে টুকে …লে।

'মাঝে মাঝে দেখতে পাবেন মশাই, …সব এ-পাড়ায়, চলি আজ?' নোট বই …কেটে পুরে চারু শিবনাথের দিকে …কায়।

'আসবেন বইকি,' হেসে শিবনাথ …ও ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। 'রিলিজড …হলে মায়াকানন ছবি আমি দেখতে …বো না।'

যেন এ কথার উত্তর দেয়া অনাবশ্যক …ধ করল চারু রায়। অথবা যেন উত্তরে …বলবে ভেবেও মুখে সেটা আর প্রকাশ …লো না, মুচকি হেসে হরিতকী গাছের …থায় বাঁধা তার হলুদে টু-সীটারে গিয়ে …ঠল।

গাড়িটা অদৃশ্য হ'তে কে গুপ্ত বেশ …দ ক'রে হাসল। 'শালা সিনেমার মেয়ে …জতে গেরস্তপাড়া অবধি ধাওয়া …রছে।'

'আমাদের পাড়ায় একটাও মেয়ে …বে না।' বলাই এই প্রথম মুখ খুলল।

'তোরা সেজন্যেই তো না খেয়ে …রিস হতভাগার দল।' কে গুপ্ত বলাইয়ের …কে তাকায়। 'কেন, দে-না তোর ময়নাকে …কিয়ে,—ভাল চেহারা, উঠতি বয়েস, বলব …রুকে?'

'ময়নার মা আপত্তি করবে।'

'তাতে বয়ে গেল। তুই বাপ। তোর অনুমতি থাকলেই হ'ল।'

'নাঃ।' যেন একটু সময় কী ভেবে বলাই মাথা নাড়ল। 'সিনেমায় ঢুকলে ছেলেমেয়ের চরিত্তির বিগড়ে যায়। ওটা ভাল রাস্তা না সাহেব।'

'তবে মরগে যাও।' ভ্রূকুঞ্চিত করল গুপ্ত। 'আমি ভেবেছি বছর দুই যাক আমার বেবিটাকে ঢুকিয়ে দেব। প্রমিনেণ্ট নাক-চোখ আছে। একটু দিশা থাকলে রাইজ করতে পারবে।'

'তাই দাও, তাই দিও গুপ্ত। এখানে ভাঙ্গা টুলে বসে গাছের পাতা গোনলে দিন যাবে কেন।' ব'লে বনমালী মুচকি হাসে। দেখে শিবনাথও হাসল।

'কি মশাই, আপনারও প্রেজুডিস আছে নাকি। চান্স পেয়ে ওয়াইফ যদি ফিল্মে নামতে চান আপনি আপত্তি করবেন নাকি?'

হঠাৎ এ-প্রশ্নের জবাব দিতে হবে যেন প্রস্তুত নেই এমন ভান ক'রে শিবনাথ গুপ্তর মুখের দিকে তাকায়।

'বলুন তো চারুকে বলি, রাজী আছেন?'

এবার বেশ অপ্রস্তুত হয়ে ঈষৎ আরক্ত হয়ে শিবনাথ মাটির দিকে তাকায়। যেন ভদ্রলোকের অসহায়ভাব লক্ষ্য ক'রে বনমালী বলল, 'ও'রটা উনি পরে ঠিক করবেন। তুমি আগে বলেকয়ে অমলকে রাজী করাও গুপ্ত। আহা ওই চেহারা পর্দায় উঠলে শহরশুদ্ধ লোক ভেংগে পড়বে ছবি দেখতে।' কথা শেষ ক'রে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বেশ চড়া গলায় সে হাসল, তারপর হঠাৎ গুপ্তর চোখে চোখ রেখে গম্ভীর গলায় বলল, 'খবরদার ওটি করতে যেও না গুপ্ত। বৌ-পাগলা মানুষ অমল। এমনধারা প্রস্তাব দিতে গেলে তোমার মাথা আলগা ক'রে দেবে হয়তো ও দায়ের কোপে।'

'তোর মতন গজমূর্খ কিনা আমি।' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কে গুপ্ত মাথাটা কাত করল। 'অমলের কানে এ-প্রস্তাব দিতে যাব কেন? বলতে হয় সোজাসুজি কিরণকেই একদিন নিরিবিলি ডেকে বলব —জিজ্ঞেস করব রাজী কিনা।'

'সেই নিরিবিলি তোমায় দিচ্ছে কে, পাচ্ছ কোথায় কিরণকে একলা যে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওকে সিনেমায় নামাবে।' বেশ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বনমালী কে গুপ্তর দিকে তাকায়। 'বাড়িভরা মানুষ। এখন এখানে রাস্তায়ও রাতদিন লোক গিস্‌গিস্‌ করে।'

'শালা ঈশ্বর সহায় হলে পাড়া ঠাণ্ডা হ'তে কতক্ষণ। ধর কলেরা লেগে চৌদ্দ-আনা লোক সাফ হয়ে গেল, বাকি দু'আনা পালাল প্রাণের ভয়ে। রইল শুধু কিরণ, আর আমি, আর তুই। আমি তোর দোকানের দরজায় এমনি ব'সে আছি। কর্পোরেশনের জলের গাড়ি এলো জল দিতে। বস্তি থেকে কলসী কাঁখে বেরিয়ে এলো সেদিন একলা কিরণ। এমন দিনও তো আসতে পারে, কি বলেন মশাই।'

কে গুপ্ত শিবনাথের দিকে চেয়ে টেনে টেনে হাসে। 'ঈশ্বর সহায় থাকলে সংসারে কী না হয়।'

শুনে শিবনাথ, বনমালী ও বলাই একসংগে হেসে উঠল।

সেদিন সকালে আড্ডাটা জমল ভাল।

ঠিক দুপুরটি হলে শহর থেকে ফেরিওলারা এখানে আসতে আরম্ভ করে। চীনা সিঁদুর আসে, আলতা আসে, সেফটিপিন, ধূপকাঠি, কাগজের ফুল, আয়না-চিরুনি-চুলের কাঁটা-ফিতা—কাজললতা।

এতবড় কাঠের বাক্সের মাথায় দোকান সাজিয়ে হাজার রকমের মনোহারী নিয়ে সাড়ে ছ'আনা আসে, কাচ পরানো বাক্স বুকে ঝুলিয়ে আসে রেশমি মেঠাই, অবাক-থাবার। আঙুল আপেল বেচতে আসে, কেউ বা শুধু কলা। কেউ না ডাকলেও ফেরিওয়ালা বস্তিতে ঢোকে এবং সোজা উঠোনে চলে আসে।

আর মাছির মতন ঝাঁক বেঁধে তখন সকলের আগে ছেলেমেয়েগুলো ফেরি-

ওলার বেসাতী ঘিরে দাঁড়ায়। পিছনে দাঁড়ায় বৌ-ঝিরা, সকলের পিছনে বুড়ির দল। তারা চোখে কম দেখতে পায় এবং ঠেলাঠেলি করার মতন গায়ে জোর পায় না ব'লে ফেরিওলার জিনিস দাম করার চাইতে সামনের মাথাগুলোকে দন্তহীন মাড়ি দিয়ে চিবোতে বা প্রত্যেকটিকে এই মুহূর্তে যমপুরীতে পাঠাতে পছন্দ করে বেশি। ভাগ্যিস ক্ষীণ কণ্ঠের অভিসম্পাত বা তিরস্কার কারো কানে পৌঁছয় না। যুবতীর কলহাসি, বালিকার চিৎকার, শিশুর আবদারে কান্না বা হাসিতে কানে তালা লেগে যায়। জিনিস কেনার চেয়ে দেখার, হাতাবার এবং শুধুই দরদস্তুর করার আগ্রহ দেখে ফেরিওলাও ক্রমাগত চিৎকার করতে থাকে এবং বেসাতি গুটিয়ে তখনি সরে পড়ার ভয় দেখাতে থাকে। কিন্তু এসেই ও চলে যাবে সাধ্য কি, রাস্তা কোথায়! কাচ্চাবাচ্চা এবং বড় মানুষের জঙ্গলের মধ্যে আটকা পড়ে ফেরিওলা হাঁসফাঁস করতে থাকে এবং ভবিষ্যতে এ-বস্তিতে আর ঢুকবে না ব'লে সবাইকে শুনিয়ে প্রতিজ্ঞা করে। যদিও বাড়ির লোকগুলো এবং তার চেয়েও বেশি সে নিজে জানে যে কাল আবার ঠিক এমন সময় তাকে এই উঠোনেই ফিরি নিয়ে এসে দাঁড়াতে হবে।

অনেকক্ষণ হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করার পর বিমল হালদারের বৌ হিরণ কাচের বাটিটা কিনল। বীথির বড় বোন প্রীতি কিনল প্ল্যাস্টিকের কুরুশী-কাঁটা। কমলা কিনল জুতোর কালি। রমেশ-গিন্নীও অনেকক্ষণ ইতস্তত করার পর মেজো মেয়ের আবদারে একটা স্নো ও একটা পাউডার-পাফ কিনলে। ডাক্তারের মেয়ে কিনল লাল ও সবুজ সুতোর লাছি। একটা টেবিল-ক্লথ তৈরী করছে সে। সম্ভবত, বিয়ে হলে ওটা ওর বরের টেবিলে বিছাবে, মনে মনে ঠিক ক'রে এখন রাতদিন ওটা নিয়েই পড়ে আছে। চারকোণায় চারটে গোলাপ মাঝখানে শুধু তিনটি পাতা। একটা ফুল ও পাতার কাজ একটু বাকি আছে, তাই আজ আরো খানিকটা সুতো কিনে নিলে। ডাক্তার-গিন্নী প্রভাতকণা টেবিল ঢাকনাটা তাড়া-তাড়ি সেরে ফেলতে মেয়েকে চাপ দিচ্ছে। এবং এখন সুনীতির সুতো কিনতে খাওয়া শেষ না হতে এঁটো হাতে ছুটে এসেছে উঠানে ও বাঁ-হাতে লাছি দুটো তুলে নিয়ে বার বার পরীক্ষা করছে রংটা পাকা কি কাঁচা। এবং গলা বড় ক'রে তিনবার ফেরি-ওলাকে জিজ্ঞেস করল টেবিল ঢাকানার কাজ হবে, ধোপে টেঁকবে কি না, এ-ঢাকনা জামাইয়ের টেবিলে থাকবে। হেসে ফেরিওলা ঘাড় কাত ক'রে বলেছে, 'এক ধোপ কেন সাত ধোপেও রং উঠবে না। শহরের তিনটে পাড়ায় এইমাত্র সে বারো লাছি সুতো বিক্রী ক'রে এল। সেদিন বালিগঞ্জে বিক্রী করেছে বিশ লাছি। বিধু মাস্টারের বৌ ছোট দু'ছেলে ও এক মেয়ের জন্যে তিনটে সেন্সিল কিনে পয়সার অভাবে আর কিছু কিনতে পারে না।

'আর কারো কিছু চাই?' ফেরিওলা হাঁক দেয়, যেন দোকান গুটিয়ে এখনি উঠবে, ঘনঘন সকলের মুখের দিকে তাকায়। কিরণ হাত থেকে কাচের কুঁজোটা নামিয়ে রাখল, ময়না সাবানটা কিনতে পারলে না। হিরুর মা ও প্রমথর মা শেষ-মুহূর্তে একটা ক'রে কাচের গ্লাস ও কুঁজো কিনল। এবং সেজো মেয়ের আবদার রাখতে রমেশ-গিন্নী প্ল্যাস্টিকের বড় সোপ-কেসটা কিনল। পাঁচু ভাদুড়ির বৌ কিনল আলতা। আর কেউ কিছু কিনবে না, এই বেলা দোকান তোলা যায় ফেরিওলা ভাবছিল, এমন সময় তিন-লাফে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল পুরুষ। অমল চাকলাদার। এসেই কিরণের হাত ধরে হিড়হিড় ক'রে তাকে নিয়ে গেল ঘরে। কি ব্যাপার! উঠোনে দাঁড়ানো আর দশটি মেয়ের চোখে বিস্ময়, ফেরিওলা হতভম্ব। ভয় পেয়ে তিনটি শিশু একসঙ্গে কেঁদে উঠল।

কান খাড়া রাখল সবাই আট নম্বর ঘরের দিকে।

কিরণ কাঁদছে।

'শাসন করছে।' নিচু গলায় একজন আর একজনকে বলল।

'মেরেছে, মারছে ওই শোন।' চাপা হাসি হেসে রমেশ-গিন্নী বলল, 'এদিক না থাক ওদিক আছে মরদের, একটা ছুঁচ কিনতে পারলে না, মেয়েটা মার খে[য়ে] মরছে।'

'কেন কি হয়েছে, কি দোষ কর[ল] কিরণ?' কে একজন প্রশ্ন করতে ঠোঁ[ট] বেঁকিয়ে আর একজন উত্তর দেয়: 'ছোট[-] লোক, ছোটলোকের বাস এখানে, রাতদিন মারপিট কান্না হৈ-রৈ লেগেই আছে কারণ আর অকারণ কি। ভাল ভদ্রপাড়ায় ঘর পেলে আমি কালই উঠে যেতুম।'

চোখ ফিরিয়ে সবাই দেখল প্রভাত[-] কণা। এঁটো ডান হাতটা শূন্যে তুলে রেখে বাঁ-হাতে সুনীতিকে ধ'রে ডাক্তার গিন্নী সকলের আগে উঠোন ছেড়ে ঘরে উঠে গেল।

'বেশি অহংকার হয়েছে ডাক্তারনীর। বীথির মা বিধু মাস্টারের স্ত্রীর কা[নে] কানে বলে। 'পয়সার গরম!'

'অহংকার ভাল না, অহংকারে পত[ন] ঘটে।' অনেকটা আবৃত্তির মতন সুরে কা[...] লক্ষ্মীমণি মন্তব্য করে। এবং হয়ত পু[রো] কবিতাই একটা শিক্ষকগিন্নী দেখ[...] দাঁড়িয়ে মুখস্ত বলে যেত কিন্তু সে পারল না, হ'ল না কিরণের কান্না বাড়াবাড়িতে। চিৎকার ক'রে কাঁদ[ছে] এখন ও।

আর কেউ কোনো কথা বলছে না।

বেসাতি তুলে ফেরিওলা আস[্তে] আস্তে উঠোন থেকে সরে যায়। এ[ক] এক-দঙ্গল ছেলেমেয়ে তার পিছ[ু] লেগেছে। তারা মুখ দিয়ে গলা দি[য়ে] নানারকম আওয়াজ বার করছে, শ্লোগ[ান] আওড়াচ্ছে: 'সাড়ে ছ'আনা অনেক [...] জিনিসপত্তর সস্তা কর।' আর এক[...] বলছে, 'ফেরিওলার জুলুম—চলবে [না'] ইত্যাদি। তাদের এই ধরনের আন্দোল[ন] করার কারণ পয়সার অভাবে তারা [...] একদিনও লোকটার কাছ থেকে বি[...] কিনতে পারে না। অথচ কী সে না আ[...] লাট্টু, লাটাই, রবারের বল, লু[...] প্ল্যাস্টিকের মাউথ-অর্গান পর্য[ন্ত] অতিরিক্ত খেলনার মধ্যে আজ এনে[ছে] প্ল্যাস্টিকের তৈরী একটা প্যাগোডা [ও] একটা মোটর সাইকেল। তাতে এক মেমসাহেব বসা। রাস্তায় নেমেও ফে[রি-] ওলার পিছন পিছন বাচ্চাগুলো অনেক ছুটে যায়।

(ক্র[মশ])

জীবন-নদীর এপারে

সুবোধ ঘোষ

সমস্যাটা হলো জীবন নদীর এপারেরই সমস্যা। যতদিন হ আছে, ততদিন দেহের রোগগ্রস্ত ার আশংকাও আছে। ওপারে যাবার গের মুহূর্তে পর্যন্ত এই আশংকার ঙ্গেই বসবাস করে মানুষ। ওপারে বার ব্যাপারটাও হলো দেহাশ্রিত ণের অন্তর্ধান, সেই অন্তর্ধান দেহকে ন না কোন প্রকারের পীড়ায় ব্যথিত র্ণ ও বিকল না ক'রে সম্পন্ন হয় । যোগীদের ইচ্ছামৃত্যু বরণের াহিনী শুনেছি। জানি না, ইচ্ছা-ত্যুর সাধকের দেহ হতে প্রাণের ন্তর্ধানের পূর্বে তাঁর দেহ পীড়িত ় কি না। কিন্তু সংসারের সাধারণ ীর জীবনের উপর এই একটা মোঘ নিয়মের শাসন সত্য হয়ে আছে ; রোগ নামক একটি বেদনায় তার স্থিমাংস স্নায়ু ও শোণিতকে থিত এবং স্তব্ধ করে তবেই প্রাণ দায় নেয়। রোগে মৃত্যু হতে পারে, ই কারণে মানুষ রোগকে ভয় করে—ই তত্ত্ব যেমন সত্য, এর বিপরীতটাও মনই সত্য। রোগে মৃত্যু হয় বলেই নুষ মৃত্যুকে ভয় করে। বিনা রোগে ত্যু হবার নিয়ম থাকলে নিশ্চয়ই ত্যুকে অনেক কম ভয় করতো নুষ। মৃত্যুকে ভয় করে না, কিন্তু রাগকে ভয় করে, সাধারণ সংসারী নুষের মনের মধ্যেই এই বিচার দেখা য়। স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষের কথা বলছি । তাঁরা সুখে-দুঃখে অবিকার। রাগ ও শোকের আঘাতকে জীবন-দেবতারই পুরস্কার বলে মনে করছেন, এমন মনের জোর এবং উপলব্ধির মানুষও আছে; কিন্তু তাঁদের সংখ্যা কোটিকে গুটিক। পুরাণকারের কল্পনাতে বৈতরণী নদী হলো শোণিতজলা। রোগভয় নামে ভয়টাই বোধ হয় ঐ বৈতরণী নামে বিষম এক কল্পনাকে সৃষ্টি করেছে। দেহী মানুষের চিন্তার মধ্যে উদ্বেগ তরঙ্গিত করে তোলে অদৃশ্য এক বৈতরণীর ভয়, সে ভয় হলো রোগভয়।

রোগের সহচর বলেই মৃত্যুকে এত ভয়াল বলে মনে হয়; নইলে মৃত্যুর মধ্যে সাধারণ মানুষও বোধ হয় এক সুন্দর অভ্যর্থনার আনন্দ দেখতে পেত। মহাভারতের এক কাহিনীতে সত্য সত্যই মৃত্যুকে সুন্দর বলা হয়েছে। মৃত্যু হলো প্রজাপতি ব্রহ্মার শান্ত তেজঃ হতে উদ্ভূতা এক কন্যা—পিঙ্গল-বসনা কৃষ্ণনয়না, কমলমাল্যধারিণী ও দিব্যাভরণভূষিতা এক সুন্দরী। জীব-সমুদয়ের জন্ম ও বিলোপের নিয়ম সংস্থাপন করতে চান ব্রহ্মা। মৃত্যুকে আহ্বান করে নির্দেশ দিলেন—তুমি প্রজা সমুদয়কে সংহার কর। কিন্তু এই নিষ্ঠুর আদেশ শুনে সুন্দরী মৃত্যুর চক্ষু হতে নির্ঝরের মত অশ্রুধারা ঝরে পড়লো। মৃত্যু তার নয়নবিগলিত সেই অশ্রুধারা অঞ্জলি-পুটে ধারণ করে দাঁড়িয়ে রইলেন; কিন্তু ব্রহ্মা বিচলিত হলেন না। বললেন—তোমার ঐ বেদনার্ত নয়নের অশ্রুই ব্যাধিরূপে পরিণত হয়ে মানুষকে বিনাশ করুক। ব্রহ্মার শাপভয়ে ভীতা হয়েই মৃত্যু ব্যাধির দ্বারা জীবের প্রাণ বিনাশ করবার কঠোর ব্রত গ্রহণ করলেন।

সুন্দরী মৃত্যুর অশ্রুজল হলো ব্যাধি। মহাভারতোক্ত কাহিনীর মৃত্যুও করুণায় সুন্দর, কিন্তু ব্যাধি নিষ্ঠুর। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মারই নির্দেশে মৃত্যুর এত মমতায় ভরা অশ্রু ব্যাধিতে পরিণত হলো। মৃত্যুর পূর্বে রোগ নামে এক ভয়ালের অসুন্দর ও কঠোর স্পর্শ দেহকে পীড়িত করবে, জীবের সৃষ্টি-নীতির মধ্যেই এই বাস্তব নিয়মটি নিহিত রয়েছে।

কিন্তু ঐ রোগভয়কে পরাভূত করার প্রয়াসও জীবনের স্বাভাবিক ধর্মরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ব্যাধিকে দূর করা এবং নীরোগ হয়ে থাকা, এই দুই আগ্রহের প্রেরণা থেকেই চিকিৎসা নামে বিজ্ঞানের উৎপত্তি। জীবন-নদীর এপারে দেহীদের কাছে আয়ু, স্বাস্থ্য ও শক্তির উপহার নিয়ে দেখা দিয়েছে এক বিজ্ঞান এবং সেই বিজ্ঞানের ধারক, বাহক ও রক্ষকরূপে বিদ্যমান রয়েছেন এক সমাজ। ঠিক সেবক সমাজ নয়; পেশাদার সেবক সমাজ, অর্থাৎ ডাক্তার, কবিরাজ ও হাকিম। চিকিৎসা নামে মানবসেবার একটি কাজকেই এ'রা জীবিকারূপে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং 'একথা নিশ্চয়ই বলা চলে যে, এ'দের জীবিকা মহৎ।

সমাজের সঙ্গে পেশাদার চিকিৎসক শ্রেণীর একটা সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে, সমাজের কাছে এ'রা সেবা বিক্রয় করেন। এটা নিশ্চয়ই অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। জীবিকারূপে গৃহীত বর্তমানের কোন 'সার্ভিস' সত্যই সার্ভিস নয়; সবই শ্রম দক্ষতা, জ্ঞান ও পণ্য বিক্রয়ের ব্যাপার। তাই এই বাস্তব সত্যও স্বীকার করে নিতে

হয় যে, প্রত্যেক জীবিকাগত সার্ভিসের মত চিকিৎসকের জীবিকাগত ব্রতের গুরুত্ব ও প্রয়োজন সমাজে স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু এটা সত্য নয় যে, যেহেতু চিকিৎসকেরা চিকিৎসা নামে অত্যুচ্চ এক সেবাব্রত ও রোগের নিরাময় সাধনের বিজ্ঞানকে জীবিকারূপে গ্রহণ করেছেন, সেই হেতু চিকিৎসকেরা অন্য কোন জ্ঞানোপজীবী শ্রেণীর তুলনায় সমাজের মনের কাছে বেশি শ্রদ্ধার আস্পদ বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন।

কিন্তু কে অস্বীকার করবে যে, চিকিৎসক শ্রেণীর প্রতি সমাজের মনে মর্যাদার স্থান উচ্চতর হওয়াই উচিত ছিল? কে অস্বীকার করবে, ঠিক যে, রীতিতে আর সব শ্রম, দক্ষতা, বিদ্যা ও জ্ঞানের পেশা চলে ঠিক সেই পদ্ধতিতে চিকিৎসকের পেশা চালিত হওয়া উচিত নয়? এক ফরাসী মনীষী, বোধ হয় ভিক্‌টর হুগোই বলেছিলেন যে, মৃত্যুর সময় আমার চোখের সম্মুখে শুধু একজন ভাল ডাক্তারের সান্ত্বনা-পূর্ণ দুটি চক্ষু যদি দেখতে পাই, তাহলেই আমি মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করতে পারবো। সেই ফরাসী মনীষীর মতে চিকিৎসকেরাই তো জীবন-দেবতার দূত।

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কবির দাবী হলো দুটি। 'ভাল ডাক্তার' এবং তাঁর 'সান্ত্বনাপূর্ণ দুটি চক্ষু।' ব্যাধির বেদনায় পীড়িত মানুষের কাছে কাম্য হলো এবং প্রয়োজনও হলো 'ভাল ডাক্তার', শুধু ডাক্তার হলেই চলে না। জীবিকাসর্বস্ব অর্থকর আগ্রহের মূর্তি মাত্র নয়, দুটি সান্ত্বনাপূর্ণ চক্ষুর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত মূর্তি, যে দৃষ্টি তাঁর সেবাব্যাকুল অন্তঃকরণেরই পরিচয়।

দেশের জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন সম্পর্কে যে সব আলোচনা, চিন্তা ও প্রস্তাব দেখা যায়, তার মধ্যে একটি কথার প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়। দেশে ডাক্তারের অভাব আছে। কথাটা খুবই সত্য। ছত্রিশ কোটি নরনারীর জীবনকে রোগের প্রকোপ থেকে মুক্ত রাখার জন্য যত জন চিকিৎসকের চেষ্টা ও তৎপরতা প্রয়োজন, তত জন চিকিৎসক দেশে নেই। কিন্তু চিকিৎসকদের এই সংখ্যাগত অল্পতা দূর হয়ে গেলেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যায়? নিশ্চয়ই নয়। ডাক্তারের অভাব আছে, এটাই একমাত্র সমস্যা নয়। 'ভাল ডাক্তারে'র অভাব আছে এবং প্রকৃত চিকিৎসকোচিত অন্তঃকরণেরও অভাব আছে। তা না হলে দেশের সাধারণ মানুষ আজও কেন হাসপাতালকে ভয় করে? রোগের ভয়ে এবং রোগে পীড়িত মানুষ হাসপাতাল নামে রোগ-নিরাময়েরই ব্যবস্থাটাকে ভয় করে। এর কারণ দেশের বর্তমান চিকিৎসা-পেশা, হাসপাতাল নামে চিকিৎসা-কেন্দ্র এবং চিকিৎসকের আচরণের রীতি-নীতির মধ্যে দেশের মানুষ ভীত হবার মত অনেক কিছু দেখতে পায়।

হাসপাতালগুলির রীতি-নীতির কথাই ধরা যাক্। দেশের গরীব সাধারণের জন্যই সরকারী অর্থে এবং বেসরকারী সাহায্যেও হাসপাতালগুলি স্থাপিত হয়েছে; কিন্তু গরীব রোগীর পক্ষে হাসপাতালের একটি 'ফ্রী বেড' লাভ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কে না জানে, ফ্রী বেডেরও একটা গোপন মূল্য আছে এবং এক গোপনতার চক্রকে কিছু অর্থদানে তুষ্ট না করলে গরীব রোগীকে হাসপাতালের দ্বার থেকে ফিরে যেতে হয়। এর ব্যতিক্রমও অবশ্যই আছে। গরীব রোগী সত্যই হাসপাতালের বিনামূল্যের বেড লাভ করতে পেরেছে, এরকম ন্যায়োচিত ঘটনা নিতান্ত বিরল নয়। কিন্তু সাধারণ পরিবেশই নানা সূক্ষ্ম ও স্থূল অন্যায়ের জালে অপরিচ্ছন্ন।

কোন হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে বাড়িতে একবার দক্ষিণা-যুক্ত আহ্বান জানানো সেই হাস-পাতালের ওয়ার্ডে বিনামূল্যের বিছানা লাভ করার একটা পন্থা। কিন্তু এই রীতি যে গরীব রোগীকে প্রাপ্য ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার রীতি। মানুষের হিতসাধনের কাজটাও গণতন্ত্রসম্মত পন্থায় সিদ্ধ হবে দেশের মানুষ এইটুকু চায়। যে রীতির অনুগ্রহে রাষ্ট্রের কোন বিনা মূল্য কল্যাণ-ব্যবস্থার সুযোগ ও সুবিধা বিত্তবান মানুষে লাভ করতে পারে এবং বিত্তহীনেরা পারে না, সে রীতি রাষ্ট্রদেহ এবং সমাজদেহের ব্যাধিবিশেষ।

সাধু এবং সৎ চিকিৎসক যথেষ্ট সংখ্যায় আছেন এবং তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে পরিশ্রম স্বীকার ক'রে এবং আন্তরিকতা নিয়ে রোগীর চিকিৎসা করেন। 'নিজে শ্রমের অন্ন খাই সুখী হয়ে'—সাধু শ্রমের এই আদর্শ তাঁদের জীবনে সত্য জীবিকানিষ্ঠ এই ধরণের চিকিৎসকে সংখ্যা কম নয়। প্রত্যেক চিকিৎসকের অর্থের প্রয়োজন আছে, কারণ তাঁরা সংসারের নানা দায়ের নিগড়ে বাঁ[illegible] মানুষ, তাঁরা সন্ন্যাসী নন। সমাজে আর সব শ্রেণীর মানুষের মত প্রচু[illegible] অর্থ উপার্জনের আগ্রহ ব্যবসায় চিকিৎসকের চিন্তাতেও থাকবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু চিকিৎসকের অর্থ[illegible] আকাঙ্ক্ষা যদি উপার্জন-পন্থার নীতি-গত সৌষ্ঠব ও মাত্রা অস্বীকার ক[illegible] তবে সমাজের পক্ষে সেই চিকিৎস[illegible] বিশেষ ভয়ের ও ক্ষতির আস্পদ। কার[illegible] চিকিৎসকের পেশা প্রত্যক্ষভাবে মানুষে[illegible] প্রাণের পরিণামের সঙ্গে সম্পর্কি[illegible] চিকিৎসকের অর্থস্পৃহা যে-ক্ষেত্রে প্রব[illegible] সে-ক্ষেত্রে চিকিৎসক রোগীকে প্রধান[illegible] তাঁর অর্থকরী সিদ্ধিলাভের উপকর[illegible] ব'লে মনে করতে বাধ্য এবং এ-ক্ষেত্রে রোগীর প্রতি চিকিৎসকের প্রত্যে[illegible]

র্থ্য অর্থ আহরণের অভিলাষের দ্বারা ান্বিত হতেও বাধ্য। এই অবস্থা ানে সত্য, সেখানে চিকিৎসা পেশার ত্ব লুপ্ত হয়েছে বলে মনে করতে ।।

আমাদের দেশে বর্তমানে এই স্থা সাধারণভাবে সত্য না হলেও, গুলি রীতির স্বচ্ছন্দ উদ্ভব হতে খ মনে হয় যে, অবস্থা এই রকমই টা অবাঞ্ছিত পরিণামের টানের মধ্যে ছে। দৃষ্টান্ত, বিখ্যাত চিকিৎসকের ক্ষণার পরিমাণ। কোন বিশেষজ্ঞ কৎসকের দক্ষিণার পরিমাণ যদি এক টাকা অথবা চৌষট্টি টাকা হয়, তবে অভিযোগ কখনই মিথ্যা বলে মনে না যে, সেই চিকিৎসকের কর্তব্যের ল প্রেরণা হলো অর্থ। এক শত টাকা ক্ষণা ধার্য করা অর্থ সমাজের দেশের সেবার ক্ষেত্র হতে সরে গিয়ে আভিজাতিক উচ্চতায় সমাসীন থাকা। এমন গুরুমূল্যে মূল্যবান কৎসকের সেবা ও পেশার লক্ষ্য শের রোগী নয়, দেশের ধনী রোগী।

জৈমিনি দর্শনে একটি গল্প আছে। র্ষি জৈমিনি তাঁর আশ্রমে বসে ছেন, এমন সময় নিকটের এক বৃক্ষের অন্তরাল থেকে একটি পাখি হঠাৎ ন করলো—কোঽরুক্? অর্থাৎ, রোগী কে? মহর্ষি জৈমিনি উত্তর লন- মিতভুক্। অর্থাৎ, যে মিতা- রী। আহার্য তত্ত্বের এই সত্যকে চিকিৎসকের জীবিকার সম্বন্ধেও াপন করা যায়। সুচিকিৎসক কে? ন মিতগ্রাহী, পরিমিত দক্ষিণায় যিনি তুষ্ট। দুঃখের বিষয়, বিখ্যাত ও শেষজ্ঞ চিকিৎসকদের অমিতগ্রাহিতা মানে দেশের জনজীবনে একটি চনীয় সমস্যা রূপেই রয়েছে। কোন কৎসকের দক্ষিণামূল্য এক শত টাকা. ং কারও বা দু' টাকা। একই শাদারী বিদ্যার ক্ষেত্রে কোন দুই ক্তির মধ্যে প্রতিভার এতখানি উত্তমাধম ধান বস্তুত সত্য নয়। তবুও ষ্ঠার ব্যাপারে এই ব্যবধান দেখা । একজন সাধারণ প্রতিভার কৎসকও তাঁর পেশাকে বাণিজ্যিক কর্মে, বিজ্ঞাপনী চমৎকারিতায় এবং র কুশলতার গুণে মূল্যগৌরবে ীয়ান ক'রে তুলতে সমর্থ হন এবং র্থ উচ্চ প্রতিভার চিকিৎসকও শুধু । বাণিজ্যিক বুদ্ধির অভাবে এবং অন্যাবিধ অক্ষমতার কারণে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার নাগাল পান না। বর্তমানের চিকিৎসা পেশা সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্যিক রীতিতে গঠিত রয়েছে বলেই চিকিৎসকের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা ঠিক গুণ-নির্ভর হয়ে উঠতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনী আড়ম্বরই হলো খ্যাতিলাভের সোপান।

"When pain and anguish
wring the brow,
A ministering angel thou".

স্কটের কাব্যের নায়িকার কাছে কাব্যের নায়ক যা আশা করে, সমাজের মধ্যে একমাত্র চিকিৎসকের কাছেই মানুষ প্রায় তাই আশা করে। সন্তাপিত মন এবং বেদনাপীড়িত দেহ যখন ছট্‌ফট করে, তখন দেবদূতের মত মমতাময় হস্তের স্পর্শ ও স্নিগ্ধ সান্নিধ্য নিয়ে রোগীর কাছে দেখা দিতে পারেন শুধু একজন, তিনি হলেন চিকিৎসক। কিন্তু দেখা দিয়ে থাকেন কি? অল্পসংখ্যক কোমলচিত্ত ও হিতবাদী চিকিৎসকের কথা ছেড়ে দিই। সাধারণ মানুষ হাসপাতালের আউট-ডোরে আর ইন-ডোরে পরিদর্শক চিকিৎসককে যে রূপে ও আচরণে দেখতে পেয়ে থাকেন, সেই রূপ ও আচরণের মধ্যে স্নিগ্ধতা ও মমতার পরিচয় কতটুকু থাকে? যেন অপরাধীদের শাস্তি বিধান করছেন, এমনই এক রূঢ় তুচ্ছতা নিয়ে চিকিৎসক রোগীকে ধমক-ধামক দিয়ে পরীক্ষা করছেন এবং সহযোগীর সংগে সিনেমা বা স্পোর্টের গল্প করতে করতে প্রেসক্রিপশন লিখছেন, এই দৃশ্য বিরল নয়। ওয়ার্ডের বিছানার দুই সারির ভিতর দিয়ে ব্যস্ততার সংগে পরিদর্শক চিকিৎসক রোগীদের মুখের দিকে মাত্র নেত্রসম্পাত ক'রে চলে যান এবং এই হলো পরিদর্শন। রোগী সম্বন্ধে প্রশ্ন ও পরীক্ষার ব্যাপার যতটুকু হয়, সেটুকু আবার এত দ্রুত ও ক্ষিপ্র যে, তাতে কোন ধন্বন্তরীর পক্ষেও রোগীর রোগ সম্বন্ধে সঠিক বিচার ও নির্ণয় সাধ্যসাপেক্ষ নয়। বিখ্যাত চিকিৎসকের 'কল'-এর বিরাম নেই। বিপুলসংখ্যক রোগীর দেহ ও প্রাণের পরিমাণের দায় একই সংগে গ্রহণ করলে রোগীর প্রতি সুবিচার করা বস্তুত সম্ভব হয় কি? এটা পেশাদারী বিপুলতা মাত্র, সুচিকিৎসার বিপুলতা নয় এবং একজন চিকিৎসকের পক্ষে একই সংগে এই রকম বিপুলসংখ্যক রোগীর চিকিৎসা বিধানের পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত নয়।

চিকিৎসা-পেশা বর্তমানে বাণিজ্যিক রীতিতে গঠিত, তাই এর মধ্যে প্রতি-যোগিতার দ্বন্দ্ব আছে এবং সেই প্রতি-যোগিতা এমন সুষ্ঠু ও পরিচ্ছন্ন নয় যে, ঠিক "যোগ্যতমের উদ্বর্তন" নীতি সত্য হয়ে উঠতে পারে। যোগ্য দারিদ্র্যে দিনাতিপাত ক'রে থাকেন। এমন চিকিৎসকও আছেন, যিনি গরীব রোগীর কাছ থেকে ফী দাবী করতে লজ্জা বোধ করেন, রোগীর অবস্থা খারাপ হয়ে গেলে বিচলিত হন এবং মৃত রোগীর আত্মীয়-স্বজনের সংগে শোকার্তের মতই কান্নাকাটি ক'রে ঘরে ফিরে আসেন। তিনি ফী চাইতে পারেন না, তাঁকে ফী দিতেও লোকে ভুলে যায়। এমন চিকিৎসকের অবস্থা কল্পনা

করতে পারি। এক্ষেত্রে চিকিৎসকেরই প্রতি সমাজের সুবিচার হচ্ছে না। চিকিৎসকের হৃদয়বত্তার সুযোগ নিয়ে তাঁকে তাঁর প্রাপ্য হতে বঞ্চিত করাও সমাজবিরোধী ক্রিয়া।

রোগীর চিকিৎসায় অনেক সময় ভুল হয়ে থাকে। বিখ্যাত সুবিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরও ভুল হয়ে থাকে এবং তার ফলও মারাত্মক হয়ে থাকে। কিন্তু এই ভুলের জন্য চিকিৎসকের প্রতি কোপ ও অভিযোগ পোষণ করাও ভুল। পৃথিবীর কোন বিদ্বানের বিদ্যা এবং সুদক্ষের কাজ ভুল-প্রুফ নয়। চিকিৎসকেরা ভুল ক'রে থাকেন, এই কারণে সমাজের পক্ষে উদ্বিগ্ন হওয়া অযৌক্তিক। ভুল নয়, ভয়ের বিষয় হলো ভেজাল। চিকিৎসকের নিষ্ঠায় ভেজাল এবং ঔষধের ভেজাল। আর একটি ভয়ের বিষয় আছে, ঔষধের ডিসপেনসিং ব্যাবসায়ীদের সততায় ভেজাল। প্রেসক্রিপশনে বিহিত বিভিন্ন ভেষজ-উপাদানের মধ্যে দু' একটি উপাদানকে বাদ দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না, এমন ভৈষজিকের বিবেকও ভেজালে কলুষিত এবং সে বিবেক সমাজের পক্ষে ভয়ের বিষয়।

চিকিৎসককে কল দেওয়া এবং প্রতি কল-এর সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণের ফী প্রদান করা, এই প্রথা ছাড়া কি অন্য কোন্ প্রথায় চিকিৎসকের সাহায্য ক্রয়ের ব্যবস্থা হতে পারে না? পৃথিবীতে সর্বত্রই কি এইরকম "ভিজিট" প্রথা বিদ্যমান? মনে হয়, এই প্রথার চেয়ে উন্নততর প্রথা পরিকল্পিত হতে পারে। কনট্রাক্ট তথা চুক্তি প্রথার উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রতি ভিজিটের জন্য দক্ষিণা গ্রহণের পরিবর্তে চিকিৎসক "কেস" প্রতি দক্ষিণার একটি সাকুল্য পরিমাণ নির্দিষ্ট করতে পারেন। এই রকম চুক্তিবন্ধ প্রথার মধ্যেও জটিলতা এবং অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণ থাকতে পারে। প্রশ্ন হলো, এই অতি পুরাতন ভিজিট প্রথার পরিবর্তে চিকিৎসার জন্য দক্ষিণা গ্রহণের সুষ্ঠুতর কোন রীতি প্রচলিত হতে পারে কি না?

চিকিৎসক নামক বিজ্ঞানী সমাজের কাছ থেকে উপকার গ্রহণের আর একটি যে বিশেষ প্রয়োজনের দিক আছে, সে-বিষয়ে আমাদের দেশের জনসাধারণের মনে এখনো কোন আগ্রহ জাগ্রত হয় নি। চিকিৎসককে শুধু রোগ নিরাময়ের জন্য আহ্বান করার রীতিই আমাদের জন-সমাজে প্রচলিত রয়েছে। অর্থাৎ অসুস্থ হলে ও রোগার্ত হলে তবেই, চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে। জনসাধারণের এই অভ্যস্ত সংস্কারের সংকীর্ণতা চিকিৎসকের জীবিকার এবং কর্তব্যের ক্ষেত্রও সংকুচিত ক'রে রেখেছে। শুধু অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে কেন, সুস্থ ব্যক্তির পক্ষেও চিকিৎসকের সাহায্য প্রয়োজন। রোগের সম্ভাবনার হেতু পরিহার ক'রে চলাই সুস্থতা রক্ষার রীতি। কয়েক লক্ষ চিকিৎসক কয়েক কোটি রোগীকে সুস্থ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন, এই অবস্থাটা কোন জাতির পক্ষে একটা কাম্য স্বাস্থ্যাদর্শ নয়। দেশের কোটি কোটি সুস্থ মানুষ চিকিৎসকদের কাছ থেকে সাহায্য ও পরামর্শ উপযুক্ত মূল্যে গ্রহণ ক'রে সুস্থতা অক্ষুণ্ণ রাখছেন এবং রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা হতে নিরাপত্তা লাভ করছেন, এটাই হলো কাম্য অবস্থা। শুধু রোগ নিরাময়ের জন্য লক্ষ লক্ষ চিকিৎসককে নিযুক্ত করা হবে, এমন পরিকল্পনা ঠিক উন্নয়নী পরিকল্পনা নয়। কারণ এই নীতিতে রোগের প্রকোপ হ্রাস হওয়ার অর্থ চিকিৎসকের কর্মাভাব ও জীবিকাচ্যুতি। সুস্থ সাধারণেও যদি চিকিৎসকের পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণের অভ্যাস লাভ না করেন, তবে চিকিৎসক-সমাজের দক্ষতা প্রতিভা ও উপকারিতার অর্ধেক ক্ষেত্র পতিত ক'রে রাখা হয়।

ভেষজের প্রতি আসক্তির প্রাবল্যও দেখা যায়। চিকিৎসার ব্যাপারে ভেষজ অপরিহার্য, এই সংস্কার একটা প্রত্যয়ের মতই জনসমাজের ধারণা গ্রাস ক'রে রয়েছে। বিনা ভেষজে, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কতগুলি বিধি-নিষেধের শারীর পরিচর্যার দ্বারাই যে সুস্থতা রক্ষা করা যায় এবং রোগ হতে মুক্তিলাভ করা যায়; সমাজে এই ধারণা ব্যাপ্তি লাভ করেনি এবং চিকিৎসকেরাও এই ধারণার সত্যতা ও যথার্থতা প্রমাণে ও প্রচারে তেমন সাহায্য করেন না। ভেষজের প্রতি লোকের মাত্রাধিক আসক্তি দেখেই এক শতাব্দী পূর্বে চিকিৎসাবিজ্ঞানী মনীষী ডাঃ হোমস মাত্রাধিকভাবেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন:—"আমার বিশ্বাস, মেটেরিয়া মেডিকাকে যদি তুলে নিয়ে সমুদ্রের জলের গভীরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়, তবে মানুষজাতির ভালই হবে, যদিও বেচারা সমুদ্রের ক্ষতি হবে।" ঔষধ না দিয়ে শারীর পরিচর্যা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিধি-নিষেধ পালনের পরামর্শ দান করবেন যে ডাক্তার, তাঁকে রোগী সত্যিই ডাক্তার বলে মনে করতে পারবেন না, এই এক সমস্যা।

প্রাচীন গ্রীসের মনীষী হিপোক্রাটি[s] চিকিৎসা-পেশাকেই একটি 'পবি[ত্র] পৌরোহিত্য'রূপে প্রবর্তিত করতে চেয়ে[ছি]ছিলেন এবং তার জন্য চিকিৎসকের অনু-সরণীয় কতগুলি নীতির নির্দেশ দিয়ে ছিলেন। সেই 'হিপোক্রাটীয় শপথ' আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবসায়ীও গ্রহণ ক'রে থাকেন। কিন্তু ঐ শপথের মর্যাদা আধুনিক পেশাদারী পদ্ধতির মধ্যে অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব কি না, এটাও একটি প্রশ্ন। মনে হয় পেশাদারিতা রেখে আধুনিক পদ্ধতির উন্নয়ন সম্ভব এবং সংস্কারও প্রয়োজন।

বৃহামি তে! অথর্ববেদের এই ম[ন্ত্র] চিকিৎসক-সমাজেরই কর্মাদর্শের মন্ত্র। বৃহামি তে, আমি তোমাকে ব্যাধি হতে মুক্ত করবো। যক্ষ্মং শীর্ষণ্যং মস্তিষ্ক[াৎ] জিহ্বায়া বি বৃহামি তে। এই সুন্দর প্রতিজ্ঞা, এই আশ্বাস ও সান্ত্বনা, আন্তরিক প্রতিশ্রুতি নিয়ে যে চিকিৎসক রোগার্তের কাছে এসে দাঁড়াবেন, তাঁকে জীবনদেবতার দূত বলে মনে হবে, তা[তে] আর আশ্চর্য হবার কি আছে?

জয়সলমেরে সূর্যগ্রহণ

শুভঙ্কর

জানুয়ারী মাসে বোধহয় প্রথম কাগজে বেরোয় যে, এই বছর া জুন জয়সলমেরে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ তখন থেকেই সেখানে যাবার করছিলাম। অবশ্য বেশী কিছু করবার ছিল না—প্রথম তো একটা গাড়ি যোগাড় করা আর দ্বিতীয় দের বলে রাখা যে, সে সময় আমাকে অন্য কোথাও না ডাকেন।

প্ল্যান মাফিক সব কাজই হয়েছে—আসল ব্যাপারটাই বুঝতে পারছি না পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখেছি কিনা।

গোড়া থেকেই বলি। আমি যেখানে বাড়মেরে—সেখান থেকে জয়সলমের প্রায় ১০৩ মাইল দূরে। প্রথম মাইল, অর্থাৎ যতটা বাড়মের জেলা, রাস্তা বেশ ভালই: তার পরই ছিলাম রাস্তা খুব খারাপ। মরু-দেশে খারাপ রাস্তা মানে রাস্তায় বেশী বালির পাহাড়। কাজেই ভাল গাড়ি যোগাড় করবার দরকার ছিল, া করে সঙ্গে মেয়েরা যাবেন বলে। একটা সুবিধে ছিল। জুন মাস পঙ্গপালের সীজন আরম্ভ হয়, এই সারা ভারত-পাকিস্থানের মরু-হল পঙ্গপালের ডিম পাড়ার জায়গা। পাল মারবার জন্য ভারত সরকারের একটা বিভাগ এই মরুভূমিতে ছড়িয়ে । তাদের কাছে সব নতুন নতুন আর তারা হরদম এই মরুভূমি চষে ছে। ঐ সময় এই বিভাগের একটি গাড়ি বাড়মের থেকে জয়সলমের বার পঙ্গপালের অফিসারকে নিয়ে ল। তাঁকে বলে আমরাও ঐ তে জয়সলমের রওনা হলাম।

বাড়মের থেকে বেরোলাম ২৯শে জুন া আটটায়। সঙ্গে পঙ্গপালের দার সর্দার অজিত সিংহ, এখানে দের একমাত্র বাঙ্গালী সঙ্গী শ্রী আর শ্রীমতী মিত্র, তাঁদের সাত বছরের ছেলে বাবু আর আমার স্ত্রী।

আগের দিন সন্ধ্যেবেলা বেশ বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল—দিনটাও মেঘলা—কাজেই বেশ ঠাণ্ডাই ছিল। বাড়মের থেকে জয়সলমের ঠিক উত্তরদিকে, আর এই ১০৩ মাইল রাস্তাই দেখলাম শক্ত পাথুরে জমির উপর দিয়ে। তাই রাস্তা যত খারাপ ভেবেছিলাম তত খারাপ নয়। ভারতবর্ষের এই মরুভূমি অংশের অর্ধেকের কিছু বেশী বালি আর বাকিটা এই শক্ত পাথুরে জমি। এদেশে বলে 'মগরা'। মরুভূমি বলতে আমাদের মনে যে ছবি ছোটবেলা থেকে ছিল যে, দিগন্ত বিস্তৃত বালির সমুদ্র—কোথাও সবুজের চিহ্ন মাত্র নেই, সে রকম মরুভূমি ভারত-বর্ষের কোথাও নেই। আমাদের দেশে মরুভূমিতে বেশ গাছপালা আছে, আর সারা বছরই সেই সব গাছপালা ঝোপঝাড় সবুজ থাকে। কয়েকটি ঝোপঝাড় যেমন ফোগ, কয়র, খীঁপ প্রভৃতি আছে যাদের কোন পাতা নেই। সরু সরু সবুজ ডালই পাতার কাজ করে। তাছাড়া, বড় বড় গাছও যেমন খেজড়ী (শমী বৃক্ষ), পিলু, রোহিয়া, আকন্দ ইত্যাদিও যথেষ্ট আছে। আকন্দকে গাছ বলছি এই জন্য
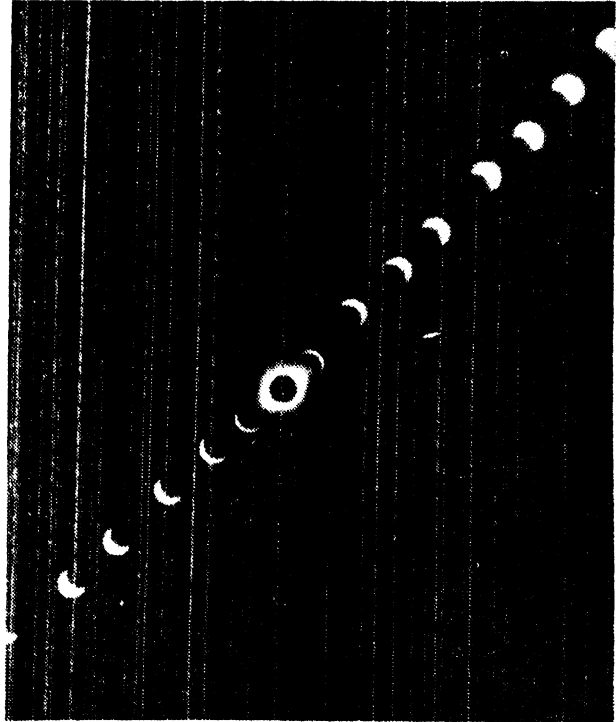
সূর্যগ্রহণকালে গৃহীত সূর্যের আলোকচিত্র

যে, এদেশে আকন্দ বেশ বড়সড় গাছ হয়। তাছাড়া, একবার বর্ষা হয়ে গেলে তার সাতদিন পরেই সারা মরুভূমি সবুজ হয়ে যায়। এত ঘাস হয় যে, মাইলের পর মাইল যতদূর দৃষ্টি যায়, মনে হয় সবুজ কার্পেট দিয়ে কে যেন মরুভূমি ঢেকে দিয়েছে। তবে এই ঘাস বেশী দিন থাকে না—মাস দুয়েক পরই শুকিয়ে যায়। সময়মত আর অন্তত পাঁচ ছয় ইঞ্চি বৃষ্টি না হলে বাজরার ফসল হয় না—কিন্তু মাত্র দু' তিন ইঞ্চি বৃষ্টি হলেই চমৎকার ঘাস হয়ে যায়—তাই গরু ভেড়া চরানই এদেশের প্রধান জীবিকা—তাছাড়া যদি বাজরা হ'ল তো ভালই—না হলেও ক্ষতি নেই।

যতক্ষণ বাড়মের জেলার মধ্যে ছিলাম মাঝে মাঝে লোকজনের সাক্ষাৎ মিলছিল। আগের দিন বৃষ্টি হয়ে গেছে বলে চাষীরা ক্ষেতে লাঙল দিচ্ছে। এদেশে লাঙল দে'য়া খুব সোজা। উটে লাঙল টানে—বালির উপর বেশী জোর লাগে না—আর ফলাও চার পাঁচ ইঞ্চির বেশী গভীর নয়। মাত্র একবারই লাঙল দিতে হয়, আর সেই সময়ই লাঙলের পিছনে একটা ফানেল দিয়ে মাঠে বীজ ছেড়ে দেয়। কোথাও মেয়েরা মাথার কলসী নিয়ে আর পুরুষেরা গাধার পিঠে কলসী চাপিয়ে জল আনতে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দু' এক জন লোক উটের পিঠে চড়ে যাচ্ছে। মেয়েদের সঙ্গে উটে বসবার একটা নিয়ম আছে। উটে দু'জন লোক বসতে পারে। সঙ্গী স্ত্রীলোক যদি মা, মেয়ে বা বোন হয় তাহলে সে বসবে সামনে আর পুরুষ বসবে পিছনে—আর স্ত্রী হলে সে বসবে পিছনের সীটে।

প্রায় দু' ঘণ্টায় ৫৫ মাইল চলে জয়সলমের জেলায় ঢুকলাম। আগে জয়সলমের একটা আলাদা রাজ্য ছিল। এখন সামান্য কিছু অদল বদল করে রাজস্থানের একটা জেলা হয়ে গেছে। জয়সলমেরে ঢুকতেই মনে হ'ল যেন মরা দেশে এসেছি। কোথাও লোকজনের চিহ্নমাত্র নেই। আট মাইল দশ মাইল অন্তর একটা করে গ্রাম—কিন্তু তাতে দু' ঘর কি এক ঘর লোক আছে। বিজোলাই বলে একটা গ্রামে ঢুকলাম—সেখানে অনেকগুলো বাড়ি কিন্তু সব খালি পড়ে আছে। মাঝখানে একটা ছোট ফোর্ট। তার মধ্যে ঢুকে দেখলাম সেখানে একটি পুলিশ থানা আর পশুপাল বিভাগের একটা ওয়্যারলেস স্টেশন। তার অপারেটর বাঙালী। বললাম, "মশাই, এখানে খেতে টেতে পান?' তা, ভদ্রলোক বল্লেন যে, "সপ্তাহে তিনদিন এই পথ দিয়ে জয়সলমের থেকে বাড়মের বাস যায়—তাতে মাঝে মাঝে শাকসবজি পাওয়া যায়।"

আর একটা গ্রাম দেখলাম, দেবীকোট। তাতে প্রায় সত্তর আশিটি পাকা বাড়ি—বাড়িগুলি পাথরের তৈরি, কিন্তু প্রায় সব ক'টিরই ছাত পড়ে গেছে। আর গ্রামে কেউ কোথাও নেই। শুনলাম এটা আগে পালিওয়াল ব্রাহ্মণদের গ্রাম ছিল। আগে নাকি পালিওয়াল ব্রাহ্মণদের ৮৪টা গ্রাম জয়সলমের রাজ্যে ছিল। আজ থেকে প্রায় দেড় শ' বছর আগে জয়সলমেরের কোন দেওয়ান একটি পালিওয়াল মেয়েকে জোর করে ধরে নিয়ে যান বলে পালি-ওয়ালারা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রাজ্য ছেড়ে চলে যায়। সেই থেকে এই ৮৪টা গ্রাম এমনি খালি পড়ে আছে। গল্পটা শুনতে ভাল হলেও কতখানি ঐতিহাসিক তা জানি না। কারণ, পালিওয়াল ছাড়া আরো অনেক জাতিই শুধু রাজ্যের এই সব গ্রামই নয়, খাস জয়সলমের শহর ছেড়েও চলে গেছে। আগে নাকি জয়-সলমের শহরে ২৭০০ ঘর জৈন ছিল। এখন আছে মাত্র সতর ঘর। এর একটা বড় কারণ এই যে, আগে ভারতবর্ষের সঙ্গে আফগানিস্তানের বাণিজ্য এই পথে হ'ত। পাঞ্জাবের রেল লাইন তৈরি হবার পর এই পথে সেই বাণিজ্য শেষ হয়ে গেছে—কাজেই এই মরুভূমি'র দেশে না থেকে এই সব লোকেরা ব্যবসার খাতিরে দেশে দেশে, বিশেষ করে মধ্যভার[…] মেবারে আর হয়ত কলকাতাতেও ছড়ি[…] পড়েছে।

রাস্তায় কিছুই দেখবার নেই। মাথা[…] উপর শিকরা আর লাগার ফ্যালকন[…] ইঁদুরের লোভে উড়ে বেড়াচ্ছে, কোথা[…] বা গাছের উপর টনি ঈগল রেগে মে[…] তাকিয়ে রয়েছে, ঝোপের আড়া[…] তিতিররা জোড়ায় জোড়ায় বসে আ[…] কমন ব্যাবলাররা শিস দিচ্ছে—কোথাও [...] এক ঝাঁক কমন স্যাণ্ডগ্রাউজ উড়ে যাচ্ছে[…] আর ফিঞ্চ লার্কেরা দল বেঁধে মাঠে[…] উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক্বচিৎ কখন তি[…] চারটে হরিণ গাড়ি দেখে ভয়ে দৌ[…] পালাচ্ছে।

জয়সলমের থেকে যখন প্রায় মাই[…] কুড়িক আছি, তখন রাস্তাটা বেশ পাথ[…] হয়ে গেল। আর কিছু পরেই ওখানকা[…] ফোর্ট দেখতে পেলাম। ফোর্ট এক[…] পাহাড়ের উপর তৈরি। জয়সলমেরে বা[…] তৈরির পাথরের রঙ হলদে তাই দূ[…] থেকে রোদ পড়ে বেশ চকচকে দেখায়।

ঠিক দুপুরে একটায় জয়সলমে[…] ডাকবাংলোতে পেঁছলাম, আগে এ[…] বাড়িটাতে রাজ্যের দেওয়ান থাকতো[…] বাড়িটা বড় হলেও এমন কিছু মস্ত নয়[…] কারণ প্রধানমন্ত্রী মশায় মাইনে পেতে[…] তো আড়াই শ' টাকা। তাও দেওয়া[…] সাধারণত বাইরের লোক হতেন বলে[…] বোধহয় এই মাইনে পেতেন, নয়ত সেনা[…] পতির মাইনে ছিল ২৫৲ টাকা আ[…] ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশের[…] (নগর কোটাল?) তাই। বাকিটা উপরিতে[…] পুষিয়ে নাও।

দুপুরটা মেঘলা ছিল। পরের দি[…] আকাশ পরিষ্কার থাকবে কিনা তে[…] একটু ভয় পাচ্ছিলাম। বিকেলে চা খে[…] সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা কর[…] বেরোলাম। শুনলাম, হোমরা চোমরা [...] বিজ্ঞানীরা ফলোদীতে এসেছেন। ফলো[…] জয়সলমের থেকে এক শ' মাইল দূ[…] আর একটা কথা শুনে তখনকার ম[…] উৎফুল্ল হলাম যে, ফলোদী থেকে প[…] গ্রহণ মাত্র ৩৫ সেকেণ্ড দেখা যাবে [...] জয়সলমের থেকে নাকি দেখা যাবে প[…] এক মিনিট। তবে কর্তারা জয়সল[…] তাঁদের যন্ত্রপাতি আনতে সাহস পা[…]

কুরুক্ষেত্রে সূর্যগ্রহণ স্নান

কারণ মাঝে রাস্তা বড় খারাপ ব'লে ...্লি ভেঙে যাবার সম্ভাবনা।

পরদিন সকাল থেকেই আকাশ খুব ...ষ্কার ছিল। আমরা সকাল আটটায় ...র দেখতে বেরোলাম। সমস্ত শহরটাই ...দে পাথরের তৈরি। ছোট্ট শহর, ...নকটা ফোর্টের বাইরে, খানিকটা ...তরে। তবে অধিকাংশ বাড়িই খালি ...ড় আছে, মরা শহর বলে মনে হয়। ...াদের জীপ সোজা ফোর্টের মধ্যে উঠে ...ানো রাজপ্রাসাদের সামনে দাঁড়াল। ...র্টের মধ্যে প্রায় বার শ' বাড়ি আছে— ...ই আগেকার কালের রাজকর্মচারীদের। ...ট্ট গলি দিয়ে গিয়ে জৈনদের কয়েকটি ...দর। মন্দিরগুলি ছোট তবে চমৎকার ...কার্য করা। আর জৈনদের মন্দির ...ন হয়, তকতকে পরিষ্কার। ভিতরে ...র্থঙ্করদের অজস্র মূর্তি ছাড়াও মন্দির ...াবার জন্যে মন্দিরের গায়, দরজায়, ...ম, খিলানে অনেক সুন্দর সুন্দর ...রের মূর্তি খোদাই করা আছে।

গোটা তিনেক মন্দির দেখবার পর আমাদের যে লোকটি দেখাচ্ছিল তাকে বললাম, 'আর মন্দির দেখব না—এবার তোমাদের লাইব্রেরী দেখাও'। সে বললে, "লাইব্রেরী তো এই এখানেই।" মন্দিরের পাশে একটা ছোট উঠান মত জায়গা, সেখান থেকে কয়েকটা সিঁড়ি নেমে দেয়ালের গায়ে একটা স্টীলের দরজা। সেই ঘরটায় প্রথমে ঢুকলাম। একটু অন্ধকার মতন। আগে থেকে সাবধান হয়ে টর্চ নিয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গের লোকটি চাবি দিয়ে আরেকটি স্টীলের দরজা খুলল। এই দরজাটা একটু ছোট। নীচু হয়ে যেখানে ঢুকলাম সেটা একটা সুড়ঙ্গ মতন। মাথা নীচু করে প্রায় ফুট পনর হেঁটে আরেকটা ছোট্ট স্টীলের দরজা পেলাম। এটার চাবি খুলে হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকে টর্চের আলোতে দেখলাম একটা ছোট ঘর, তার মধ্যে তিনটে বড় বড় স্টীলের আলমারি রয়েছে। আলমারিগুলির মধ্যে অনেকগুলি লম্বা লম্বা অ্যালুমিনিয়মের বাক্স সাজান রয়েছে। বাক্সগুলি এমন মাপের যে, তাতে দু' তিনটে মাঝারি সাইজের পুঁথি ধরে যেতে পারে। বেশীক্ষণ সেই ঘরে থাকতে ভয় করছিল, কারণ, কেউ যদি ঠাট্টা করেও বাইরের কোন দরজা বন্ধ করে দেয় তাহলে ভয়ে হার্ট ফেল করে মারা যাব। কাজেই তাড়াতাড়ি সেই ভয়ানক জায়গা থেকে বেরিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

জয়সলমেরের এই লাইব্রেরী বোধহয় উত্তর ভারতের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ প্রাচীন লাইব্রেরী। আগে বেশীর ভাগ মন্দিরেই এই রকম লাইব্রেরী থাকত। আজকাল শুধু দক্ষিণ ভারতে কোথাও কোথাও আছে। এই লাইব্রেরীর নাম "জীন ভদ্র সূরী জৈন জ্ঞান ভাণ্ডার"। চার পাঁচ শ' বছর আগে গুজরাটে পাটনা থেকে মুসলমানদের ভয়ে এই গ্রন্থাগার এখানে সরিয়ে আনা হয়। অবশ্য আজকালকার দিনেও গ্রন্থাগারটিকে ওরকম গুহার মধ্যে লুকিয়ে রাখবার কি মানে হয় জানি না।

কয়েক বছর আগে একজন জৈন সাধু সমস্ত পুঁথির একটা ক্যাটালগ বানিয়ে

ছেন। তাতে দেখলাম এখানে তালপত্রের পুঁথির সংখ্যা ৪২৬। তার মধ্যে সব চেয়ে পুরানোটির নকলের তারিখ ১১৫৬ সম্বৎ অর্থাৎ ১০৯৮ খৃষ্টাব্দ। কাগজের পুঁথিও আছে দু' হাজারের উপর। তার মধ্যে সবচেয়ে পুরানোটির নকল হয় ১২৭৯ সম্বতে অর্থাৎ ১২২২ খৃষ্টাব্দে। জৈন্য ধর্মগ্রন্থই বেশী, তবে কিছু অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থও আছে, যেমন কালিদাসের অধিকাংশ গ্রন্থ, রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা (১২১৬ সম্বতের নকল), দণ্ডীর কাব্যাদর্শ (১১৬১) সম্বতের নকল), তা ছাড়া ন্যায়শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ। বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায়তাৎপর্য টিকার একটি পুঁথি রয়েছে। এটিকে দিল্লীর ন্যাশনাল আর্কিভ্‌স থেকে বাঁধিয়ে নেয়া হয়েছে—প্রতিটি জীর্ণ পাতার দু' পাশে পাতলা কাপড় লাগিয়ে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের একটি খণ্ডিত পুঁথি আছে—১২ থেকে ৪৮ পাতা। নকলের তারিখ চতুর্দশ শতাব্দী। উৎসাহী কেউ দক্ষিণ ভারতে পাওয়া পুঁথির সঙ্গে এই ক' পাতা মিলিয়ে দেখতে পারেন।

পুঁথিগুলির দু'পাশে কাঠের পটি লাগান। এইগুলির উপরে বেশ রঙচঙে ছবি আঁকা—অধিকাংশই তীর্থঙ্করদের জীবনের ঘটনা নিয়ে। অন্ধকারে রাখা ছিল ব'লে ছবিগুলির রঙ এতদিনেও একটুও খারাপ হয়নি। আহমদাবাদের একজন প্রকাশক এই ছবিগুলির মধ্যে কতকগুলিকে ছেপে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেছেন। তাতে দেখলাম, একটা জিরাফের ছবিও আছে। আফ্রিকার সঙ্গে যে গুজরাটের যোগ বেশ কিছুদিনের তা এতে স্পষ্টই বোঝা যায়।

বিকেলের দিকে অমর সাগর বলে একটা বাগানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে একটা পুকুর আছে তাতে বর্ষাকালে কিছুদিন জল জমে থাকে। বাগানটা অপেক্ষাকৃত নীচু জমিতে—তাই খুঁড়লে কাছেই জল পাওয়া যায়। বাগানে অন্য গাছের সঙ্গে কিছু আমগাছও আছে দেখলাম। মরুভূমির ঠিক মধ্যিখানে আম গাছ একটা আশ্চর্য ব্যাপার। সেই বাগানের কুয়ো থেকেই সরকারী কর্মচারীদের জল সরবরাহ করা হয়। তা নইলে শহরের অধিকাংশ লোক গড়ীসর বলে একটি পুকুরের জল খায়। এই পুকুরের জল নাকি খুব হজমী—আর কখনও শুকোয় না। সমস্ত মরুভূমিতে দশ পনর মাইল অন্তর এই রকম বড় বড় পুকুর থাকে। কাছাকাছি গ্রামের লোকেরা আর জন্তু জানোয়ার, গরু বাছুর সেই জল খেয়ে বেঁচে থাকে। কারণ অনেক জায়গায় কুয়ো থাকলেও তার জল এত নোনতা যে, পুকুরের জল ছাড়া উপায় নেই। তবে বৃষ্টির জল ছাড়া গরু বাছুরের দয়ায় এই সব পুকুরে জান্তব জল এত বেশী যে, বাইরের লোকের পক্ষে সে জল মুখে দেওয়া শক্ত।

এইবারে আসল কথায় আসা যা[ক।] সেই বাগানে থাকতে থাকতেই গ্রহণ আর[ম্ভ] হয়ে গেলো। ছুটতে ছুটতে ডাক বাং[লোয়] ফিরে এসে ছাতে উঠে এলাম। ত[খন] সাতটা বাজে তখন এক চতুর্থাংশের বে[শী] গ্রহণ লেগে গেছে, আর সূর্য বেশ [ঢলে] পড়েছে। এদিকে মাইল দুই ধু[ধু] পশ্চিমদিকে একটা টিলা মতন। ভাব[লাম] সূর্য যদি ওর পেছনে চলে যায় তাহ[লে] সব মাটি হয়ে যাবে। কাজেই তক্ষু[নি] গাড়িতে বসে ছুটতে ছুটতে সেই টিলা[র] কাছে গেলাম। টিলার পর খানিকটা [দূরে] বাইনোকুলার হাতে পজিশন নি[য়ে] দাঁড়ালাম, যে ভাল করে 'কোরোনা' দেখ[া] হবে। তখন সূর্যের বাঁদিকটা কাস্তে[র] মতন হয়ে গেছে—চারিদিকে প্রায় অন্ধ[কার] —মরুভূমির মধ্যে একটা টিলার উ[পর] আমরা পাঁচ ছ' জন দাঁড়িয়ে আ[ছি] চারিদিকে আর কেউ কোথাও নে[ই] কিরকম একটা থমথমে ভাব। স্ত্রী এ[কটু] দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। চেঁচিয়ে বল[লেন] "ডায়মণ্ড রিং এফেক্ট দেখতে ভুলো [না]" ঠিক পূর্ণগ্রাসের আগে চাঁদের পা[হাড়ের] মধ্যে দিয়ে সূর্যের যে আলো দেখা [যায়] তাতে সূর্যকে হীরার আংটির মত দে[খায়।] ততক্ষণে সূর্য বাঁদিকে একটা সাদা [সুতোর] মত হয়ে গেছে। হঠাৎ সেই চুল [অদৃশ্য] হয়ে গেলো—আর তার জায়গায় দূ[রে] তলায় একটা লাল রঙের আভা দেখা [দিতে] লাগল। আমি ভাবলাম, এইবার [পূর্ণ] গ্রহণ হবে—কিন্তু হঠাৎ একি [!] সেই আভা সেকেণ্ড পাঁচেক স্থির [থেকে] বাড়তে আরম্ভ করল—আর আধ মি[নিটের] মধ্যেই কাস্তের মত হয়ে গেল। [মন] একেবারে দমে গেল। সেই আ[মাদের] তাবোলের ভাষায় 'দপ করে নিভে [গেল] বুক ভরা আশা'। তাহলে কি জয়স[লমীর] থেকে পূর্ণগ্রহণ দেখা যাবার কথা ন[য়?] ঐ যে সময় আলোর রেখা সূর্যের বাঁ[দিক] থেকে ঘুরে তলায় চলে এসেছিল [সেই] সময় এক সেকেণ্ডের কিছু অংশের [জন্য] পূর্ণ গ্রাস দেখেছি? কিন্তু [সে] দেখেই বা কি লাভ?

মন খারাপ করে ডাক বাংলোতে [ফিরে] এলাম। পরদিন ভোর সাড়ে চ[ারটের] সময় বেরিয়ে সাড়ে নটায় বাড়মের।

সোনাদি

(৮২৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

নতেন এবং বিশ্বাসও করতেন, বাইরের বার দ্বারা পুজোর চেয়ে হৃদয়ের মের দ্বারা ভোগ বড় জিনিস। তিনি ঝছিলেন ভেতরটা যেখানে সম্পূর্ণ, ইরেটা সেখানে বাহুল্য। সংসারে এক জন মানুষ থাকে যারা নিজেদের কীর্ণ না করে বাঁচতে পারে না। ভরের মধ্যে যেখানে সমাপ্তি, সেই-নেই পূর্ণতা বলে তারা বিশ্বাস করে। অথচ জীবনে সমাপ্তিটা যেমন ভা ব্যাপ্তিটাও তার চেয়ে কম সত্যি। ভাব যদি সত্যি হয়, তো প্রকাশ সত্য নয় তা বলে। পরিণতি যদি তা বলে মানি, পরিপূর্ণতাকে অস্বীকার তে পারিনে কোনও কারণেই।

একদিন দাশসাহেব জব্বলপুরের রি থেকে বদলি হয়ে চলে এলেন কাতায়।

রতি আর শিশু বায়না ধরলে, 'তুমি দের সঙ্গে কলকাতায় যাবে না, মা?'

দাশসাহেব বললেন, 'তুমি আদর রই ওদের বাড়িয়ে দিয়েছ।'

শেষে যাবার দিন ঘনিয়ে এল। নিসপত্তোর বাঁধা-ছাঁদা হল।

দাশসাহেব বললেন, 'কলকাতায় গিয়ে দর নিয়ে একলা মুশকিলে পড়বো—'

সোনাদি বললে, 'তুমি তোমার অফিসে য়া, আমি দেখবো ওদের।'

'তুমি?'

স্বামীনাথবাবুকে গিয়ে সেদিন নাদি বললে, 'পরশু দাশসাহেবের ঙ্গ কলকাতায় যাচ্ছি, তোমার আপত্তি ই তো?'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'হাওয়া লালে তোমারও শরীরটা ভালো হবে।'

'হাওয়া বদলাতে তো যাচ্ছি না।'

'তবু কলকাতায় তো অনেকদিন ওনি, দেখাশোনা হবে অনেক লোকের ঙ্গ।'

সোনাদি অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপর জিজ্ঞেস করলে, 'কিন্তু কেন আমি কলকাতায় যাচ্ছি, তা তো জিজ্ঞেস করলে না?'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'তুমি ভালো বুঝেছ তাই যাচ্ছো, তুমি তো অবুঝ নও!'

'কিন্তু পুটুকে একলা দেখতে পারবে তো তুমি?'

'পুটুর জন্যে তুমি কিছু ভেবো না।'

'আসছে মাসের পনেরই পুটুর জন্মদিন, নতুন জামা-কাপড় কিনে দিয়ো, আর কানের একজোড়া দুলও ওকে দিয়ো—এই চুড়িটা ভেঙে গড়িয়ে দিয়ো।'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'টাকা তো রয়েছে, চুড়িটা তুমি রাখো।'

'তা হোক্, তবু নাও।'

স্বামীনাথবাবু প্রতিবাদ কখনো করেননি। হাত বাড়িয়ে নিলেন।

যাবার দিন সোনাদি বললে, 'জিজ্ঞেস করলে না তো, কবে আসবো?'

'তুমি তো আমার চেয়ে ভালো বোঝো। যতিদন খুশি থেকো, তারপর সুবিধে মত একদিন এসো!'

ননদদের তখন বিয়ে হয়ে গেছে। যার-যার শ্বশুরবাড়িতে তারা। বিশ্বেশ্বর-বাবুও মারা গেছেন আজমীরে। আত্মীয়-পরিজন যারা রাজস্থানে ছড়িয়ে ছিল, তারাও আর যোগাযোগ রাখেনি। পরি-বারের বৃহৎ শাখা-প্রশাখা। কে কার খবর রাখে!'

সেই সময়ে দাশসাহেব ছেলেমেয়ে নিয়ে জব্বলপুরের সংসার তুলে কলকাতায় এলেন।

স্টেশনে স্বামীনাথবাবু তুলে দিতে এসেছিলেন পুটুকে নিয়ে।

সোনাদি বললে, 'আধসের করে দুধ নিয়ো রোজ নিজের জন্যে।'

'আমার জন্যে ভেবো না বেশি, নিজের শরীরের দিকে নজর রাখবে।'

সোনাদি বললে, 'পুটুর ইস্কুলে খাবার পাঠাতে ভুলো না যেন।'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'গিয়ে চিঠি দিয়ো।'

ট্রেন ছেড়ে চলে গেল।

পুটু জিজ্ঞেস করলে, 'মা কোথায় গেল, বাবা?'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'মা তো কোথাও যায়নি মা, কাঁদতে নেই, ছি— আমি কি কাঁদছি?'

কলকাতায় এসে দাশসাহেব নতুন বাড়িতে বাসা করলেন। চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজে একটা ব্যাঙ্ক করলেন। ব্যাঙ্কের নামটা আপনারাও জানেন। নামটা আমার মুখে না বলাই ভালো। তা রতি আর শিশু নতুন ইস্কুলে ভর্তি হল। সেখানেই ওই অসুখটা শুরু হল সোনাদির। সেই অদ্ভুত অসুখ। কিছু কাজ করতে পারলে না। ডাক্তারে বললে,—শুধু শুয়ে-বসে থাকতে হবে। অথচ খাওয়া-দাওয়ার কোনো বাছ-বিচার নেই।

ডাক্তার আরো বললে, 'এ-ও একরকম টি-বি।'

সোনাদি বললে, 'রতি-শিশুকে তুমি দূরে বোর্ডিং ইস্কুলে পাঠিয়ে দাও।'

দাশসাহেব তাই-ই করলেন।

'আর তুমি?'

'আমার কথা বলছো?'

সোনাদি বললে, 'আমার কাছে তুমিও এসো না, রোগটা ভালো নয়।'

দাশসাহেব হাসলেন। বললেন, 'তোমার কাছে কেউ আসতে পারে, এমন কথা কোনো আহম্মকেও বলবে না, সোনা!'

তারপর খানিক থেমে বললেন, জব্বলপুরে স্বামীনাথবাবুকে একটা খবর দিই, কী বলো—হয়ত ভাববেন খুব।'

সোনাদি বললে, 'খবরটা পরে দিলেই বা তাড়াতাড়ি কী?'

বলে হাসলো সোনাদি।

ননদরা এসে জিজ্ঞেস করে, 'বৌদি কোথায় দাদা?'

সব শুনে তারাও অবাক হয়ে যায়। বলে, 'তুমি একটু কড়া হতে পারো না, দাদা?'

স্বামীনাথবাবু হাসেন।

'তুমি হাসছো!'

তবু স্বামীনাথবাবু হাসেন।

বলেন, 'তোরা শুধু বাইরেটাই দেখিস, লোকে কী বলবে এইটেই ভাবিস, আমি তো কিছু তফাত দেখতে পাই না, আমার তো মনে হয় ও এখানেই আছে—'

ননদরা বলে, 'তুমি কি পাথর দাদা? সত্যি বলো তো কিছু ঝগড়া হয়েছিল বুঝি?'

'ঝগড়া করবার মতো লোকই বটে রে সে, চোখের সামনে দেখলেও যে আমি তা বিশ্বাস করবো না।'

'তোমার কথা ছেড়েই দিলাম, তুমি না হয় দেবতা, কিন্তু তার ওই নিজের পেটের একফোঁটা মেয়েটা!'

'তা পুটুর তো কোনো অসুবিধে হচ্ছে না—অসুবিধে হচ্ছে নাকি?'

'জন্ম দিয়েই যে কত ছেলের মা মারা যায়, তাতে কি অসুবিধে হয় তাদের? কিন্তু আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে যে মুখ দেখাতে পারবো না!'

'তোর তো বড় কষ্ট হবে তা হলে?'

'কষ্ট! তুমি বলছো কি দাদা, আমার যে আত্মঘাতী হতে ইচ্ছে করছে।'

'তুই ও'দের বলিস, আমার অনুমতি নিয়েই সে গেছে।'

'বৌদিকে তো জানি, তোমার অনুমতি নিতে তার বয়ে গেছে।'

'মুখ ফুটে অনুমতি চাওয়াটাকেই কি তোরা বড় ভাবিস—আর তা ছাড়া এই একটা জীবনে আমাদের কতবার জন্ম নিতে হয়, জানিস তুই? মহাভারতে পাণ্ডবদের জীবনে অজ্ঞাতবাসের পালা এসেছিল একবার, সেটা কি ভাবিস একেবারে অর্থ-হীন? তা তো নয়, আমি মনে করি, সেটা তাদের আর এক নবতর জন্মের উদ্যোগপর্ব—তা এসব কথা তোর শ্বশুর-শাশুড়ীরা যদি না বোঝেন তো বলিস তাদের যে, যাকে অনুমতি দিতে পারলে কৃতার্থ হয় লোক, তার অনুমতি চাওয়া-না-চাওয়া তুচ্ছ—'

'যদি কখনও ফিরে আসে বৌদি তো বাড়িতে ঢুকতে দিয়ো না দাদা, আমাদের বংশের মুখ পুড়িয়েছে সে।'

'ও কথা বলিসনি, ওতে আমার কষ্ট হয় রে!'

'কষ্ট তোমার ছাই হয়, দাদা!'

'না রে, তাকে ছাড়া আমি একদিনও থাকতে পারি না, সত্যি বলছি।'

'তবে এখন আছো কেমন করে?'

'সে তো আমার কাছেই আছে সব সময়, মনে হয় যেন পাশের ঘরেই আছে, ডাকলে সাড়া দেবে, যেমন তার বই নিয়ে পড়াশোনা করতো, তেমনি করছে! 'জীব অণু না বিভু' এই নিয়ে তার সমস্যার আর শেষ নেই। তোর বৌদির ওপর তোরা অবিচার করিস নে—'

বিকেলবেলা ননদ বললে, 'পুটুকে আবার দুধ পাঠাচ্ছ ইস্কুলে, দাদা?

'কিন্তু সে যে দুধ পাঠাতে লিখেছে সেখান থেকে।'

'কাল তো দুধ খায়নি ও, ফেলে দিয়েছে যে সবটা।'

'তা হলে আবার চিঠি লিখে পাঠাই।'

'এ-ও তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, দাদা! তোমার কি নিজের কিছু করবার ক্ষমতা নেই?'

'সে-ই যে এ-সংসারের গিন্নী রে, তাকে না জিজ্ঞেস করে কি কিছু করতে পারি?'

'সংসার জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে যে চলে গেছে, তার তো এ-সংসারের জন্যে ভারি মাথাব্যথা!'

দাশসাহেব অফিসে যান। গিয়ে একবার টেলিফোন করেন, 'কেমন আছো, সোনা?'

সোনাদি বলে, 'তোমার ব্লাড্-প্রেসার যদি সারে তো কী বলেছি!'

অভিলাষকে ডেকে বলে দিলে সোনাদি, 'তোমার সাহেবকে খেতে দেবার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করে নিয়ো এবার থেকে।'

[illegible]

অনেক রাত্রে তোমার ঘরে আলো জ্বলছিল কেন?'

'ঘুম আসছিল না যে।'

'আজ থেকে যেন আলো না দেখতে পাই আর।'

তা এই ঠিক এমনি সময়ে আমি এসে পৌঁছুলাম সোনাদির জীবনে। জীবনে অনেক রকম চরিত্রের সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু তবু সোনাদিকে দেখে অদ্ভুত লাগলো! কোথাও কোনো বিরোধ নেই। রাত ন'টা বাজলেই সোনাদি দাশসাহেবকে বলে, 'যাও, ন'টা বাজলো, এবার শোওগে যাও, গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে দেবে।'

দাশসাহেব হয়ত মৃদু প্রতিবাদ করেন, 'ঘুম এখন আসবে না আমার।'

'না আসুক, শুয়ে থাকোগে।'

নিঃশব্দে দাশসাহেব চলে যেতেন। যেন ছোট শিশুটি দাশসাহেব—ঘুম পাড়িয়ে তবে সোনাদির স্বস্তি। মনে হতো দাশ সাহেবের মধ্যে যে রক্তমাংসের ক্ষুধাতুর মানুষটা লুকিয়ে ছিল, সোনাদির সংস্পর্শে এসে সে যেন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। এক-একবার মনে হত সোনাদি বুঝি আমাদের সকলের মা, আর আমরা সবাই ছেলে মেয়ে। ওই স্বামীনাথবাবু, দাশসাহেব আমি, রতি, শিশু, পুটু—সবাই।

এক-একদিন এরই ফাঁকে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। মাইলের পর মাইল দূরে চেতলা থেকে আপার সারকুলার রোড। সেখানে 'প্রবাসী' অফিস সাইকেলটা উঠোনে চাবি দিয়ে বেঁধে দুরু দুরু বুকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় গিয়ে উঠি। সোনাদি যতই বলুক 'প্রবাসী'তে লেখা না ছাপা হলে স্বস্তি পাই না। 'প্রবাসী'তে লেখা ছাপা না হলে জীবনই বৃথা। সদ্য দেখে এসেছি আমার গল্প বেরিয়েছে 'ছায়ার মায়া' ব্রজেনবাবু থাকতেন ডানদিকের ঘরে সামনের চেয়ারে। বড় গম্ভীর মানুষ দেখলে ভয় হত। বললেন, 'কী চাই?'

বললাম, 'একটা গল্প ছাপা হয়েছে এ-মাসে?'

[illegible]

[illegible] বিশ্বা

লোম, 'আমার—'

যন না জেনেশ্যনে মহা অপরাধ হয়ে তাঁর! অন্তত এত কম বয়েস জানলে যেন লেখা ছাপতেন না। র‍ূঢ় ব্যবহার। কোনও আশা বা হ পেতাম না সে-দৃষ্টিতে। অথচ আশা নিয়ে গিয়েছিলাম। একটার একটা গল্প ছাপিয়েছেন, কিন্তু র র‍ূঢ়তা তবু একতিল কমেনি। র আবার সেখান থেকে সাইকেল যেতাম 'ভারতবর্ষ' অফিসে। গায়ের খ্যলে দিয়ে জলধর সেন মশাই চেয়ারে শ্যয়ে আছেন। কানে খাটো ন। জোরে জোরে সমস্ত অফিস-লোককে শ্যনিয়ে নিজের নিজের ন জানাতে হয়।

লেন, 'আমার গল্পটা তুমি এ-মাসের নীতে ছাপিয়েছ নাকি?'

বললাম, 'না, ওটা অন্য গল্প।'

'যাবে, যাবে, আসছে মাসে যাবে।'

ব্যকে ভরসা নিয়ে সেখান থেকে ম 'বিচিত্রা' অফিসে। উপেনবাব্য বসতে বলতেন। উপেন্দ্র-গঙ্গোপাধ্যায়। গল্প করতেন। হ দিতেন। মর্যাদা দিতেন। আবার দিতে বলতেন। সেখান থেকে তে ফিরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু পর সারারাত ধরে আমার লেখা চলতো র। এক-একদিন ভোর হয়ে যেত। আবার লেখাটা নিয়ে কোনো বন্ধ্যকে পড়িয়ে শ্যনিয়ে এসেছি। কিন্তু াদিকে পড়াতে তবু ভয় করতো। লোভ হত! মনে হত—এবার হয়ত াদি ভালো বলবে। এবার হয়ত তে অনুমতি দেবে। কিন্তু সামলে ম নিজেকে। মনে হত—সোনাদির লাগবার মতো লেখা কবে লিখতে । কবে সোনাদির পছন্দমতো 'ইলিয়ড' 'অডিসি' কিম্বা মত কাব্য কিম্বা বাল্মীকির মতো 'রামায়ণ' 'মহাভারত' বো। কবে তেমন লেখা বেরোবে!

ভারতবর্ষ', 'বিচিত্রা' তখন বেরিয়েছে। আমার

লেখা, ও-কাগজটা ভালো হচ্ছে আজকাল—'

মনে আছে 'আমীর ও উর্বশী' গল্পটা নিয়ে গিয়ে দিয়ে এলাম একদিন। কাউকে চিনি না।

বন্ধ্য জিজ্ঞেস করলে, 'কী নিয়ে লেখা?'

ম্যখে বললাম সব গল্পটা।

বন্ধ্য শ্যনে বললে, 'ও-গল্প ওখানে ছাপবে না, ও-কাগজের পক্ষে একটু কড়া হয়েছে, ওটা ফেরৎ নিয়ে এসো।' কী জানি কেন—আমারও মনে হল হয়ত তাই। সেই রাত্রেই আর একটা গল্প লিখে পরদিন নিয়ে গেলাম হাতে করে।

সম্পাদক মহাশয় বসেছিলেন। গিয়ে নিজের নাম বললাম।

আরো বললাম, 'প্যজো-সংখ্যার জন্যে একটা গল্প দিয়ে গিয়েছিলাম, আমার এক বন্ধ্য বললে, ওটা নাকি আপনাদের কাগজে ছাপার মতো নয়—তা আমি আর একটা লেখা নিয়ে এসেছি—'

শ্যনে তিনি খ্যঁজে খ্যঁজে বার করলেন 'আমীর ও উর্বশী' গল্পটা।

বললেন, 'আপনি বস্যন, আমি পড়ে দেখছি গল্পটা।'

তারপর চুপ করে অধীর আগ্রহ নিয়ে আমি সেইখানে বসে রইলাম। আর তিনি পড়তে লাগলেন। এক-একটা মিনিট যেন আর কাটতে চায় না। মনে হয় বিচারকের সামনে যেন নিজের দণ্ড শোনবার প্রতীক্ষায় কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছি।

এক সময়ে তিনি ম্যখ তুলে বললেন, 'গল্প ভালো হয়েছে, এটা যাবে, আমি ছাপবো এ-গল্প।'

আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। বললাম, 'আপনি ছাপবেন? ওতে যে......'

'যা-ই থাক্, আমি ছাপাবো।'

সম্পাদক মহাশয়ের ম্যখ দেখে মনে হল তিনি যেন মরিয়া হয়ে বলছেন, 'আমি ছাপবো, কিছ্য হবে না।'

কিন্তু তবু সোনাদিকে সে-গল্পও পড়াতে আমার সাহস হয়নি। ছাপলে যেন অপরিণত বয়েসের লজ্জার ছাপ চিরস্থায়ী হয়ে রইল। এদিক্ ছাড়া সোনাদির কিছ্যই ভালো লাগে না।

পাশে সেই

বাজার-চলতি লেখা সোনাদির কাছে সব অপাঠ্য। ব্রজেনবাবু, জলধরবাবু, উপেন-বাবুরও যে লেখা ভাল লেগেছে, সোনাদির যেন তা ভালো লাগবার কথা নয়! ভাগ্যিস সোনাদি ওসব পত্রিকা কিছুই পড়ে না, নইলে আমার হয়ত ও-বাড়িতে যাওয়াই বন্ধ হত!

সেদিন সোনাদিকে আমার 'রাঙা মাসীমা'র গল্পটা বলছি। রাঙা মাসীমার গল্পটা তখনও লেখা হয়নি। শুধু নোট্ বইতে স্কেচ্ করে রেখেছি।

এমন সময়ে বাইরের গেট্-এ যেন কে হাত নাড়লে।

সোনাদি বললে, 'দেখতো, কে?'

সেদিন আমাদের গল্পের শুরুতে যিনি এসেছিলেন তাঁকে আমরা কেউ-ই প্রত্যাশা করিনি। যাহোক সেকথা পরে বলবো।

মনে আছে এসব ছোটবেলাকার ঘটনা। এর পরে কত রকমফের হয়েছে সমাজ-জীবনে। যে-সব মেয়েরা বরাবর বিয়ে করে সংসার করার জন্যে তৈরি হচ্ছিল, তারাই এসে দলে দলে সরকারী অফিসে ঢুকেছে একদিন। নানারকম পার্টিতে যোগ দিয়েছে। ধর্ম-ঘট, শ্রমিক আন্দোলন হয়েছে। মেয়েরা এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। জাস্টিস চৌধুরীর মেয়ে লোক-নৃত্য দেখিয়েছে স্টেজে উঠে। যারা কখনও মটর ছাড়া চলেনি, দাঙ্গার সময় তারাই এসে নারী-কর্মী-সঙ্ঘ গড়ে তুলেছে। দল বেঁধে মিছিল করে চৌরঙ্গী দিয়ে লাল-নিশান উড়িয়ে চলেছে। সে আর এক জগৎ, আর এক অধ্যায়। আমার এ-কাহিনীতে এবার তাদের কথা বলা হল না। আর তাদের ক'জনকেই বা দেখেছি এক মিলি-মল্লিক ছাড়া। সব পাড়াতেই যেমন এক-একটা বাড়ি থাকে, যেখানে একটা দুটো মেয়ের পেছনে পঞ্চাশটা ছেলের জটলা। আর মিলি-মল্লিক নিজে না বললে আমি-ই কি তার সেই অতীত পরিচয় জানতাম, না উষাপতিই জানতো। অমরেশের আখড়ায় উষাপতিও ছিল একজন পাণ্ডা। কিন্তু সে-কাহিনীও এ-গল্পে অবান্তর।

আর সে-সময়ে আমিই কি সব দেখতাম! লেখাই তো ছেড়ে দিয়েছিলাম বছর দশেক। সোনাদির কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, লেখা আর ছাপাবো না। লিখবো, পড়বো, সাধনা করবো কিন্তু ছাপিয়ে নাম কলঙ্কিত করবো না। দশ বছর পরে তখন যদি সোনাদি অনুমতি দেয় তো ছাপবো আবার।

সোনাদি বলেছিল 'মহাভারতের পাণ্ডবদের মত এই দশটা বছর তোর উদ্যোগ পর্ব ধরে নে, এই দশটা বছর তোর অজ্ঞাতবাসের পালা মনে কর।'

সোনাদির সামনে বসে বলেছিলাম, 'তাই হবে সোনাদি!'

তারপর বলেছিলাম 'কিন্তু বন্ধুরা যে অনেক বই লিখে ফেলবে ততদিনে?'

'তা লিখুক, কিন্তু শেষে যদি একখানা তেমন বই লিখতে পারিস, তো সকলকে যে টপ্‌কে যাবি তুই আবার।'

যা হোক, সেদিনের সে-প্রতিজ্ঞা আমি রেখেছিলাম বৈকি! কিন্তু সেই দশ বছরে এমন কাণ্ড হবে কে জানতো! এমন করে সব উল্টে পাল্টে যাবে। এমন করে নিজের জীবন দিয়ে সোনাদি লিখতে শিখিয়ে যাবে আমাকে। বন্ধুবান্ধবরা লেখা চাইতো কাগজের জন্যে। যারা মুখে কখনও প্রশংসা করেনি আগে, লেখা বন্ধ করার পর বলতো, 'খাসা মিষ্টি হাত ছিল আপনার।'

একদিন সোনাদি বললে, 'এবার থেকে তোর সঙ্গে দেখা হবে না আর!'

আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'কেন?'

'এখানে তো অনেকদিন হয়ে গেল, এবার জব্বলপুরে যাবো।'

'কিন্তু তোমার অসুখ যে সারেনি।'

দাশসাহেবও সেদিন সেই কথাই বললে যে, 'তুমি চলে যাবে বলছো, কিন্তু শরীরটা তোমার এখনো যে সারেনি।'

সোনাদি বললে, 'আমি ঠিকই আছি, কিন্তু তুমি যেন আবার অত্যাচার শুরু কোরো না, তোমার যা সহ্য হয় না, সেই সব জিনিস খেতেই তোমার লোভ কেবল।'

দাশসাহেব বললেন, 'বলা তোমাকে বৃথা, আর ধরে রাখবোই বা কোন অধিকারে, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি, সংসারে কোনও কিছুর ওপরেই কি তোমার মায়া নেই? আমার কথা বলবো না, আমি কেউই নই তোমার, নেহাৎ ছেলে-মেয়েদের পাল্লায় পড়ে একদিন পড়েছিলে তাই, কিন্তু সত্যিই কি বাড়ির ওপরেও তোমার কোনও হয়নি? রতি আর শিশুকে কি একেবা ভুলে যেতে পারবে! তারা গরমের ছুটি বাড়িতে এলে তাদের-ই বা কী বোঝাবো?'

সোনাদি শুধু হাসতে লাগলো।

দাশসাহেব তবু হাল ছাড়লেন বললেন, 'তোমাকে বলতেই হবে পৃথিবীতে এমন কেউ-ই কি নেই গর্ব করে বলতে পারে তোমাকে পেয়েছে? যাকে ছেড়ে চলে যেতে তোম এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়বে চো বেয়ে?'

সোনাদি হাসতে হাসতে বললে, 'তু আজ হঠাৎ এমন করে কথা বলছো যে

দাশসাহেব বললেন, 'বলিনি, শুধু সাহস হয়নি বলে, কিন্তু কত আশ্চর্য লেগেছে আমার, স্বামীনাথবা তোমার চিঠি না পেয়ে কিছু করেন তাঁর সংসারের প্রতিটি খুঁটিনাটি তোম উপদেশ অনুযায়ী চলে, তাঁর বাড়ির ন ঝি-চাকর বহাল হয় বরখাস্ত হয় সে তোমার চিঠির মারফৎ, তুমি চলে আ এক কথায় নিজের সংসার ছেড়ে একজনের সংসারে। আবার হয়ত এক আর একটা অনাত্মীয় সংসারে তুমি এম করেই জড়িয়ে পড়বে! এ কেমন তোম নিয়ম! যেদিন জব্বলপুর থেকে চ আসি, তুমি চলে এলে আমার সঙ্গে, ম মনে ভেবেছিলাম বুঝি জিত্ হল আম কিন্তু আমার অন্তরাত্মাই জানে কে যে, সে আমার কতবড় ভুল!'

সোনাদি তেমনি ইজি-চেয়ারে হেল দিয়ে চুপ করে বসেছিল আর হাসছি

দাশসাহেব আবার বললেন, 'ত অবাক লাগে স্বামীনাথবাবুকে, কো অভিযোগ কোনো অনুযোগও কি কর নেই সে-মানুষটির, রক্ত-মাংসর মানুষ এ করে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে জয় করতে পা কেমন করে বলতে পারো?'

সোনাদি হাসতে হাসতেই বলে 'তুমি সাহেব মানুষ, ব্যাঙ্কের কার করো, টাকা-আনা-পাই নিয়ে মাথা ঘাম তোমার হঠাৎ এ-ভাবান্তর কেন বলো তে

'এ তোমার উত্তর এড়িয়ে যাওয়া, না।'

এমনি করে উত্তর এড়িয়েই গেছে নাদি বরাবর। আমি পাশে বসে রছি। নেহাৎ ছোট ছেলে বলে কখনও আমার উপস্থিতিতে আপত্তি নি। আর দাশসাহেব তো আমাকে লই দিতেন না। আমি এসব কথা করেই বরাবর শুনে গেছি। আর র হলে বড়জোর খাতায় টুকে রেখেছি একটা টুকি টাকি কথা।

মনে আছে তখন সব তোড়-জোড় হয়ে ছ। জিনিসপত্র সব বাঁধা-ছাদা প্রস্তুত। নাদি ইজি-চেয়ারে বসে সব তদারক ছ সেদিন। দাশসাহেব অফিসে! মনায় বাক্স গুছিয়ে রাখছে। সোনাদি মনে, মনটা আমার কেমন খারাপ লো। রাঙা মাসিমার গল্পটা বলছিলাম নাদিকে।

সোনাদি বলছিল 'সারা জীবন কত কে হারাবি, কত লোককে পাবি, কত ক ভালবাসবে, কত লোক আবার ত দেবে, এই হারানো, এই পাওয়া, ভালবাসা, এই আঘাত এই নিয়েই তো ন, এই সব দেখেই তো একদিন প্রজ্ঞা বে তবেই তো লেখক হতে পারবি, ই তো...'

এমনি সময়েই সেই লোকটা এসে র। গেট্-এর কাছে গিয়ে বললাম, কে চাই?'

'একটা চিঠি এনেছি স্বামীনাথবাবুর থেকে।'

লোকটা চলে গেল। চিঠিটা পড়ে নাদি কী যেন ভাবতে লাগলো নেকক্ষণ। তারপর টেলিফোন তুলে সাহেবের সঙ্গে অফিসে কথা বলতে লো।

সোনাদি বললে, 'তোমার গাড়িটা এখুনি ঠিয়ে দাও, আমি একবার বৌবাজারে বা...না, কখন আসবো কিছু নেই,...তোমার খাবার খেয়ে নিয়ে য় পড়ো,...আমার ফিরতে দেরি হতে র।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাবে নাদি?'

'চল্, তুইও আমার সঙ্গে যাবি।'

মনে আছে তখনও জানি না কোথায় যাবে সোনাদি। স্বামীনাথবাবু কোথা থেকে চিঠি পাঠাচ্ছেন, কেন পাঠাচ্ছেন, কী লেখা আছে চিঠিতে, তা-ও দেখতে পাইনি। যখন গাড়ি নিয়ে সোনাদি বৌবাজারের এক গলির ভেতর নামলো তখনও জানি না। নম্বর খুঁজে পেয়ে সোনাদি কড়া নাড়তে লাগলো। কড়া না-নাড়লেও চলতো। একটু ঠেলতেই দরজা ফাঁক হল সামান্য আর দেখা গেল একজন বুড়োমানুষ সামনের রান্নাঘরে যেন রান্না করছেন।

সোনাদির পেছন-পেছন আমি ঢুকলাম ভেতরে। সোনাদিকে দেখে বুড়োমানুষটি যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন এক নিমেষে। বললেন 'তুমি!'

সোনাদি বললে, পুটু এখন কেমন আছে?'

'সেই রকমই, কিন্তু...'

কী জানি কেন আমার যেন মনে হল ইনিই স্বামীনাথবাবু। হঠাৎ তাঁর হাতের দিকে নজর পড়তেই সোনাদি বললে, 'হাত পুড়িয়েছ দেখতে পাচ্ছি, কী দিয়েছ?'

'নারকোল তেল, কিন্তু...'

'সরো তুমি, একটু চাল-ডাল ফুটিয়ে নেবে, তা-ও পারো না....তা পুটুর অসুখ হল আর আমাকে একটা খবর পর্যন্ত দিতে পারলে না।'

'সময় পেলাম কই, আমার তখন মাথার ঠিক নেই, শিমুলতলায় এসেছিলাম ওকে নিয়ে হাওয়া বদলাতে আর হঠাৎ একদিন এই কাণ্ড, তাড়াতাড়ি এখানে এনে হাসপাতালে তুললুম, তারপর...'

'এতদিন কী করেছিলে, দিন পাঁচেক হল তো এসেছো?'

'কেবল হাসপাতাল আর ঘর করি, আর নিজের ভাতটা ফুটিয়ে নিই।'

'নিজের ভাতটা যা ফোটাচ্ছ তা-তো দেখতে পাচ্ছি, হাত তো পুড়িয়ে ফেলেছ, ঝি-চাকর কাউকেই তো আনোনি দেখছি, তোমার মতলব কী বলো তো?'

স্বামীনাথবাবু অপ্রস্তুত হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর সোনাদি সেই সিল্কের সাড়ি ব্লাউজ নিয়ে রান্নাঘরের মধ্যে বসলো। এ-সোনাদিকে যেন চেনা যায় না, ভাবা যায় না, একেই দেখেছি দাশসাহেবের পার্টিতে সৌখীন সমাজের চুড়োয়। জাস্টিস চৌধুরী, ব্যারিস্টার ব্যানার্জি আর মিসেস চ্যাটার্জির সঙ্গে যেমন অবাধে মিশেছে, তেমনিভাবে এই বউবাজারের ছোট বাসা-বাড়ির রান্নাঘরের ভেতরে যেন একাকার হতেও বাধলো না সোনাদির।

স্বামীনাথবাবু এক ফাঁকে বললেন 'তুমি কেমন আছো?'

সোনাদি সে-কথার উত্তর দিলে না বললে 'তোমার হাতে আমার সংসারের

ভার ছেড়ে দিয়ে তো তামি ভারি আরামে আছি। আমি জব্বলপুরে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে আর এমনি সময়ে এদিকে এই কাণ্ড......'

'তুমি যাবে?'

'যাবো না তো কি চিরকাল থাকতে এসেছি কলকাতায়?'

মনে আছে স্বামীনাথবাবুকে 'সেই আমার প্রথম দেখা। এতদিন স্বামীনাথবাবুর সম্বন্ধে যা কিছু শুনেছি সোনাদির মুখে, সব মিলিয়ে নিচ্ছিলাম। নির্বাক, নিরহঙ্কারী মানুষটির ঠিক এমনি চেহারাই আশা করেছিলাম। এমনি আপত্তিহীন, অভিযোগহীন, আত্মনির্ভরশীল উদার একটি ব্যক্তি। যেন সংসারে কাউকে অবিশ্বাস করতে জানেন না। সমস্ত জগৎ তাঁকে প্রবঞ্চনা করলেও যেন তিনি নিজের আস্থা হারাতে রাজি নন। ধবধবে রং, খালি গা, মাথায় কাঁচা পাকা চুল, সমস্ত মিলিয়ে মানুষটিকে যেন পরম আপনার বলে মনে হল।

দু'দণ্ডের মধ্যে কী করে যে সোনাদি সব শেষ করলে কে জানে! সোনাদি যে এমন পাকা সংসারী, দাশসাহেবের বাড়িতে তাকে দেখে তো মনে হয়নি।

সোনাদি বললে, 'নাও, হল, এরই জন্যে হাত পুড়িয়ে, পা পুড়িয়ে একাকার একেবারে...'

খাওয়া-দাওয়া' শেষ করতেই বেলা গড়িয়ে এল।

সোনাদি বললে, 'বাড়ি ভাড়া যা হয়েছে, মিটিয়ে দাও, আর জিনিসপত্তর তো দেখছি কিছুই সঙ্গে আনোনি—'

স্বামীনাথবাবু যেন কিছু বুঝতে পারলেন না।

সোনাদি বললে, 'টাকা না থাকে, আমিই পাঠিয়ে দেব কাল, কিন্তু এখন চলো—'

স্বামীনাথবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'কোথায়?'

'কোথায় আবার, আমার বাড়িতে, তোমাকে রেখে আবার হাসপাতালে যেতে হবে তো এখুনি—'

তারপর সোনাদির বাড়িতেই উঠতে হল। শুধু কি স্বামীনাথবাবু! অদ্ভুত মেয়ে সোনাদি! পুটু যেদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল, সে-ও সেদিন উঠলো ওখানে। দাশসাহেবের বিছানাতেই শোবার ব্যবস্থা হল স্বামীনাথবাবুর। দাশসাহেব বাইরের ছোট ঘরটায় আশ্রয় নিলেন। আর অসুস্থ পুটু রইলো সোনাদির ঘরের আলাদা একটা বিছানায়।

এ এক অদ্ভুত সংসার। এ-সংসারের মত এমন অদ্ভুত দৃশ্য কোথাও আর দেখিনি। পরে যখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, ঝি, চাকর, বাবুর্চি, দারোয়ান ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তখনও ...কিন্তু সে-কথা পরে বলবো সময় মত।

তা সেই বাড়িতেই দেখেছি লম্বা খাবার টেবিলে সবাই খেতে বসেছে। ছুটির দিনের দুপুর বেলা। সোনাদি টেবিলটার মাথায় বসে সকলের তদারক করছে। একপাশে স্বামীনাথবাবু বসেছেন, আর একপাশে দাশসাহেব। আর ও-পাশে পুটু, রতি, শিশু। ইস্কুলের ছুটিতে তারাও বাড়ি এসেছে।

মাঝপথেই রতি হাত গুটিয়ে বসেছে।

সোনাদি বললে, 'তুই কিছু খাচ্ছিসনে, কেন রে?'

'পেট ব্যথা করছে মা!'

দাশসাহেবকে লক্ষ্য করে সোনাদি বললে, 'শুনছো, বাগানের পেয়ারা গাছের একটা পেয়ারাও আর রাখেনি ওই তিনটেতে।'

দাশসাহেব খেতে খেতে বললেন, 'তুমি কিছু বলো না কেন?'

স্বামীনাথবাবু মুখ তুলে বললেন, 'আমিও একটা খেয়েছি।'

দাশসাহেব হেসে উঠলেন, 'আপনিও খেয়েছেন নাকি পেয়ারা?'

স্বামীনাথবাবুও হাসলেন, 'হ্যাঁ, দিলে যে ওরা—কাশীর পেয়ারা খেতে ভালো।'

আমাকে দেখিয়ে দাশসাহেব বললেন, 'ওই পেয়ারাগাছতলায় ওদের কুস্তির আখড়া ছিল, মাটিটা খুব সারালো কিনা, ফল ফলে ভালো।'

স্বামীনাথবাবু আমাকে বললেন, 'তুমি কুস্তি করতে নাকি?'

বললাম, 'তখন করতাম।'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'বেশ, তা অভ্যেসটা ছেড়ো না, ওতে শরীর মন দুই-ই ভালো থাকে।'

সোনাদি এবার বললে, 'তুমি [illegible] খাচ্ছো যে?'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'কে, আমি [illegible] আমাকে বলছ?'

'তুমি না, দাশসাহেবকে বলছি।'

দাশসাহেব মুখ তুললেন—'আমি?'

'হ্যাঁ, তোমার কথাই তো বল[illegible] শেষকালে প্রেশার বেড়েছে বলে [illegible] কান্নাকাটি কোর না আবার।'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'তা তো [illegible] আপনার বেশি অত্যাচার করা ভালো [illegible] সোনা বলেছে ঠিক।'

দাশসাহেব বললেন, 'মাঝে মাঝে [illegible] গিয়ে বেশি খেয়ে ফেলি—'

সোনাদি বললে, 'রতি শিশুকে [illegible] বকলে শোনে, যত বয়েস হচ্ছে, ছো[illegible] মানুষ হয়ে যাচ্ছো দিন দিন...'

এমনি করে এক সময়ে খাওয়ার [illegible] চুকতো। তারপর যার যার ঘরে গি[illegible] শুয়ে পড়তো সবাই। তখন ইজি-চেয়া[illegible] চুল এলিয়ে দিয়ে বসতো সোনাদি। [illegible] আমি পাশে বসে বসে আমার ক[illegible] করতুম। নিজের অভিমান, দুঃখ, অ[illegible] সব কিছু জানাবার একমাত্র মানুষ।

সোনাদি জিজ্ঞেস করতো, '[illegible] ছাপাতে দিস্ নি তো তোর লেখা?'

বলতাম, 'না সোনাদি।'

'সত্যি কথা?'

'সত্যি, তুমি দেখে নিও, দশ ব[illegible] পরে যা লিখবো, দেখবে নতুন জি[illegible] সবাইকে চমকে দেব—তখন তোম[illegible] ভালো বলতেই হবে, দশটা বছর দে[illegible] দেখতে যাবে......'

কিন্তু আজ ভাবি, সেই দশ ব[illegible] কি কম অদল-বদলটা হল! কো[illegible] রইল সোনাদি আর কোথায় রই[illegible] আমি। কোথায় গেলেন স্বামীনাথব[illegible] আর কোথায়ই বা গেলেন দাশসা[illegible] চেষ্টা করলে আজো যেন দেখতে [illegible] চোখ মেলে।

এরপর আমি কলেজের লেখা-[illegible] শেষ করেছি। ঘটনাচক্রে চাকরি [illegible] বিলাসপুরে গেছি। বন্ধুবান্ধব [illegible] জন্যে তাগাদা দিয়েছে। কেউ কেউ লেখার জন্যে অভিযোগ করেছে অনু[illegible] করেছে। কিন্তু কাউকেই সন্তুষ্ট ক[illegible]

পারিনি। মাঝে মাঝে কলকাতায় এসেছি বটে, কিন্তু লেখক কি সম্পাদকবন্ধুদের সঙ্গে দেখাও করিনি পাছে প্রতিজ্ঞা ভাঙতে হয়। পাছে সোনাদির কাছে দেওয়া কথার খেলাপ করতে হয়। সেই দশ বছরে পাঠক সমাজ আমাকে ভুলে গেল। সাহিত্য-জগৎ থেকে আমার নির্বাসন হল বলা চলে। সে দশ বছর আমার জীবনে অজ্ঞাতবাসের পালা। নবজন্মের উদ্যোগ পর্ব। আমি নতুন করে দেখছি। নতুন করে শিখছি! খণ্ড কল্পনার ছলনায় আর ভুলব না। অখণ্ডকে অনুভব করবো। আমার এই আমি সেই দশ বছরে পরম-আমির মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো। মনে আছে সেই দশ বছরেই প্রথম জীবনকে নতুন করে দেখার দৃষ্টি পেলাম! আমার তৃতীয় নেত্র খুললো।

আর সোনাদি?

সোনাদিকে আমি মিলি মল্লিকের গল্পটা বলবো ভেবেছিলাম। কিন্তু আজো গল্পটা আমার নোট খাতাতেই বন্দী হয়ে আছে। ও আমি লিখিনি। ও আমি লিখবোও না। মিষ্টিদিদি, কালোজাম-দিদি, মিছরি-বৌদি সকলের গল্পের মত ও আমার জীবনের শুধু সঞ্চয়ই মাত্র হয়ে রবে। ওর চেয়ে মহৎ কিছু লিখবো। মহত্তর, শ্রেষ্ঠতর কিছু। ওদের অতিক্রম করে নারীত্বের আরো বড় সত্তাকে দেখাবো আমি। নারীর অন্তরাত্মাকে আমি খুঁজবো। আমার নবজন্মের উদ্যোগপর্বে সেই হবে একমাত্র উদ্দেশ্য। আমার দশ বছরের অজ্ঞাতবাস তবেই হবে সার্থক।

বিলাসপুরে চলে যাবার আগে সোনাদিকে আমি সেই কথাই দিয়েছিলাম।

আমার প্রতিজ্ঞা আমি রেখেছি। কিন্তু বিলাসপুরে যাবার আগে আমি কি জানতাম এমন কাণ্ড হবে।

মনে আছে বিলাসপুরের সেই জীবন! কোনও কাজ নেই। শুধু চুপ করে দেখা আর শোনা। কেবল ট্রেনে চড়ে ঘুরে বেড়াই। কখনো জব্বলপুর, কখনো কাটনি, কখনো অনুপ্পুর। কত সব অখ্যাত সব ইস্টিশান। জঙ্গল, পাহাড় আর বিচিত্র সব মানুষ। মনেন্দ্রগড়, চিরিমিরি, নাইনপুর, গণ্ডিয়া, বালাঘাট। অমরকণ্টক রেঞ্জ ধরে রেল-লাইন চলেছে। পেণ্ড্রা রোড। কখনো চাঁড় গার্ড সাহেবের ব্রেক-ভ্যানে। কখনো আইস-ভেন্ডারদের থার্ড ক্লাস কামরায়। আবার দরকার হলে কখনো ফার্স্ট ক্লাস কামরার নির্জনে। সে-এক বিচিত্র চাকরি, বিচিত্র জীবন। নিজেকে বড় নগণ্য মনে হতো এই পৃথিবীর ভিড়ে। প্রথম উপলব্ধি হলো, পৃথিবীটা শুধু কলকাতাই নয়। এ-পৃথিবী আরো অনেক বড়ো। এ ম্যাপ দেখে পৃথিবী দেখা নয়। মানুষ যত বড়ই হোক, মনে হলো বিশাল বিশ্ব-প্রকৃতির কাছে সে তুচ্ছ। বড় স্বস্তি পেলাম। নিজের আমাকে আমার মধ্যে পেলাম খুঁজে। সোনাদির কথাই সত্যি মনে হলো। সোনাদি বলতো, 'বস্তুকে দেখবিনে, সত্যিকে দেখবি. বাচ্চা পাখীর যেমন চোখ ফোটার আগেই আলো দেখবার জন্যে বাসনা হয়, কাকে বলে আলো তা সে জানেনা, তখনও তবু তার বোঁজা চোখের মধ্যেও সেই আলোর সত্যটা প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তেমনি করেই তোর জীবনে সব দেখা সত্যি হোক!

সোনাদি আরো বলতো 'জীবনে সুখ নেই বলে দুঃখ করিসনে, জীবনকে তার সমস্ত সুখদুঃখ, সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি, সমস্ত উত্থানপতনের ভেতর দিয়ে যেন ভালো-বাসতে পারিস এমন শক্তি পাওয়া চাই।'

আরো কত কী কথা কতদিন বলেছে সব কি আজ মনে আছে!

একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুমি নিজে কোনোদিন লিখেছ সোনাদি?'

আমার যেন কেমন মনে হতো সোনাদিও এককালে লেখার চেষ্টা করেছে, নইলে এত কথা জানলে কী করে। আমি লিখি বলে কেন এত খাতির করে!

সোনাদি বললে, 'দূর, আমি লিখতে যাবো কেন?'

বললাম, 'তবে যে তুমি এত কথা জানো। কে তোমায় শেখালে?'

সোনাদি বলতো, 'সব আমার বাবার কাছে শোনা, বাবাকে তুই দেখিসনি, দেখলে বুঝতে পারতিস কী অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁর! আমার বাবাও লিখতেন।'

জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী লিখতেন, গল্প?'

সোনাদি বলেছিল, 'বাবা ছিলেন কিষেণগড়ের দেওয়ান, মনে আছে, ঢালু ডেস্কের ওপর কাগজ নিয়ে দিনরাত লিখে চলেছেন, শুধু কি গল্প? উপন্যাস, ইতিহাস, সাহিত্য, কী নয়?'

'সে সব বই কী হল?'

'সে আর ছাপা হয়নি, বাবা ছাপতে দিতেন না, কিন্তু আমি তো পড়েছি,

ছাপলে সে-বই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত বাজারে, কিন্তু বাবার ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তিনি লিখবেন, কিন্তু ছাপা হবে না। ছাপাও হয়ত হতো, কিষেণগড়ের দেওয়ানের লেখা ছাপাবার জন্যে রাজার ছাপাখানা সব সময়ই খোলা ছিল। রাজাও বলেছিলেন বাবাকে। আমিও বলেছিলাম। বাবা রাজী হতেন না, বলতেন—লিখি আমার আত্মবোধের জন্যে, আত্মপ্রকাশের জন্যে নয়—'

সত্যিই বিলাসপুরে আমার সমস্ত দেখে শুনে তাই মনে হতো আত্মবোধ না হলে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা বুঝি বিড়ম্বনা। এতদিন যেন সেই বিড়ম্বনাই করে এসেছি। জগৎকে না দেখে এতদিন শুধু বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটরি দেখেছি। যার আত্মবোধ হয়েছে, জীবন তার কাছে সহজ রূপে ধরা দিয়েছে। সেখানে তর্কবিতর্ক নয়, বিজ্ঞান নয়, দর্শন নয়, সে একটি একের সম্পূর্ণতা, অখণ্ডতার পরিব্যক্তি। তার বাহিরও মিলেছে অন্তরও মিলেছে। অন্তর-বাহির, আপন-পর ভেদ-অভেদ একাকার, একীভূত, একাত্ম হয়ে গেছে তার কাছে।

মনে হতো সোনাদি আত্মবোধের দীক্ষা বাবার কাছেই পেয়েছে বুঝি!

তারপর একে একে সবাই ভুলে গেল আমাকে। আমি যে একদিন লিখেছি, তা কয়েক বছর পরে আর কারো মনে থাকবার কথা নয়। আমার লেখক-জীবনের মৃত্যু হলো। আমার মুক্তি হলো। শুধু একজন ভোলেন নি। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক মশাই মাঝে মাঝে চিঠি দিতেন। লেখা চাইতেন। লিখতেন, 'বিলাসপুরে গিয়ে বিলাসী হয়ে গেলেন নাকি!' আমি কখনও সে-চিঠির উত্তর দিয়েছি, কখনও দিইনি।

একদিন সোনাদি চিঠি লিখলে, 'তুই লিখছিস আবার, এখনো যে দশ বছর কাটেনি—'

কিন্তু কই, আমি তো লিখিনি। কিন্তু আমার একজন প্রতিবেশীই আমার ভুল ধরিয়ে দিলেন। বললেন, 'দেশ' পত্রিকায় আপনার একটা লেখা পড়লাম, বড় ভালো লাগলো।'

বড় লজ্জায় পড়লাম। সত্যি পত্রিকা খুলে দেখি আমিই লিখেছি। সে যে কী লজ্জা কী বলবো! 'দেশ' পত্রিকার দপ্তরে চিঠি লিখলাম—'এ কার লেখা ছাপিয়েছেন আমার নাম দিয়ে?'

তখনো কি জানি এ কেন হলো!

সম্পাদক মশায় ভয় দেখিয়ে লিখলেন, 'আপনি যদি না লেখেন তো আরো লেখা আপনার নামে ছাপা হবে'—

কিন্তু কেমন করে প্রকাশ করবো—আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ! সোনাদিকে যে আমি কথা দিয়েছি। দৌড়ে এলাম কলকাতায়। মনে আছে হাওড়া স্টেশন থেকে সোজা সোনাদির বাড়ি গিয়ে হাজির। কিন্তু এই ক'বছরে এ-বাড়ির ভেতরে-বাইরে যে এমন পরিবর্তন হয়ে গেছে তা টের পাইনি। বাড়ির বাইরে বাগানের সে-বাহার নেই। নেই সেই ঘাসের কেয়ারি। নেই যত্ন-লালিত ফুলের বাগান।

সোনাদির ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই কেমন ফাঁকা লাগলো সব। সোনাদির সেই আলমারি ভর্তি বইগুলোর ওপর ধুলো জমেছে। বিছানাটা তেমনি রয়েছে পাশে। সোনাদির বড় মেয়ে পুটু শুয়ে রয়েছে তার ওপর। আর সোনাদির সেই ইজিচেয়ারটা ফাঁকা। রোজকার মত সেই পরিচিত দৃশ্য আর নেই সেখানে।

অভিলাষ দেখতে পেয়েছে আমাকে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'সোনাদি কোথায় অভিলাষ?'

অভিলাষ বললে, 'মা তো রান্নাঘরে।'

রান্নাঘরে! শুনে অবাক হলাম। দাশ সাহেবের বাড়িতে সোনাদিকে কখনও রান্নাঘরে যেতে দেখিনি। দাশসাহেবের খানসামা বাবুর্চি ছিল। আবার ঠাকুর-চাকরেরও ব্যবস্থা ছিল সোনাদির। সোনাদি দু'জনের হাতের রান্নাই খেয়েছে। পার্টিতে যখন বড় বড় ঘরের বউরা মেয়েরা আসতো, সোনাদিকে তাদের সঙ্গে সমান তালে ইংরেজী খানা খেতে দেখেছি, ইংরেজী কেতায় চলতে দেখেছি। শাড়িতে, গয়নায়, কেতাদুরস্তে সে যেন এক অন্য সোনাদি। আবার যেদিন স্বামীনাথবাবুর বৌবাজারের বাসায় অল্প-পরিসর রান্নাঘরের মধ্যে মাটির হাড়িতে ভাত রাঁধতে দেখেছি সে-ও এই একই সোনাদি। অথচ সোনাদিকে আমি চিনেছি বলেই সোনাদির চরিত্রের বৈচিত্র্যের মধ্যে কোন বিরুদ্ধতা পাইনি। কিন্তু দাশসাহেবের বাড়িতে এমনভাবে এমন সময় রান্নাঘরে যাওয়ার ঘটনা সত্যি চমকে দেওয়ার মত!

মাঝখানে বিলাসপুর থেকে যখন একদিন কলকাতায় এসেছিলাম, সেদি এমন ছিল না। দাশসাহেবের ব্যা তখন পুরোমাত্রায় চলছে।

মনে আছে কী একটা ছু দিনে দাশসাহেব পাশে ব খবরের কাগজ পড়ছেন আর পা বিছানায় হেলান দিয়ে আধশো হয়ে আছেন স্বামীনাথবাবু। তখ পুটুর অসুখ ভালো হয়নি। রাত শিশু খেলা করছে বারান্দায়।

দাশসাহেব মুখ তুলে বললেন, ' সোনা, কে এসেছে?'

স্বামীনাথবাবু উঁচু হলেন। বল 'কী খবর হে?'

আমি দু'জনকেই নমস্কার করল

সোনাদি আমাকে একেবারে প বসালে টেনে। বললে, 'কেমন আছ

দাশসাহেব বললেন, 'ও একটু হয়ে গেছে, না সোনা?'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'তুমি আম দেখে অবাক হয়ে গেছ, না?'

বললাম, 'তখন শুনেছিলাম আ বেশি দিন থাকবেন না।'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'যাও তো সব ঠিক ছিল ভাই। ওই দেখ দাশসাহেব যেতে দিলেন না।'

দাশসাহেব বললেন, 'অনেকদিন চাকরি করলেন আপনি। বিশ্রাম করেননি কখনও, একটু না-হয় দিনক বিশ্রামই নিলেন।'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'আপ নিজের ব্যাঙ্ক, আপনি বিশ্রাম পারেন, আমার হলো পরের চাকরি।'

মনে আছে তারপর চা নিয়ে অভিলাষ।

দাশসাহেবকে সোনাদির সামনে দেখতাম, তাঁর ব্যাঙ্কে ছিল অন্য চেহারা। একদিন গিয়েছিলাম সোন একটা কাজে। বিরাট ব্য বড় সাহেব বলতে ভয়ে কাঁ সবাই। দরজা বন্ধ ঘরের থেকে মাঝে মাঝে ঘণ্টার শব্দ আর চাপরাশি মহলে ছুটোছুটির পড়ে যেত। সবাই তটস্থ। সে

থছি। কিন্তু স্বামীনাথবাবুর অফিস
ম দেখিনি। তবে শুনেছি সোনাদির
ছ। সোনাদি বলতো—'অফিসে গেলে
ড়র কথা মনে থাকে না ও'র, আর
ড়তে এলে অফিসের কথা ভুলে যান—'
কিন্তু স্বামীনাথবাবুকে দেখে বোঝা
য় না অতবড় অফিসটা উনি চালান কী
র! সেই স্বামীনাথবাবুর নিজের হাতে
বার দৃশ্যটা যেন ভুলতে পারি না।
র দাশসাহেবের নতুন ছোট শোবার
টায় গিয়েও দেখেছি। স্বামীনাথ-
কে নিজের ঘরটা ছেড়ে দেবার
বাইরের ছোট ঘরটায় দাশ-
হেবের থাকবার ব্যবস্থা হলো। গোছানো
লা খাট, বিছানা, বই, কাগজ, ফাইল।
র দেয়ালে টাঙানো হলো সব ছবি। সব
য়ে বড় ছবিটা ছিল মধ্যেখানের দেয়ালে।
বতে পাশাপাশি বসে আছেন দাশ
হেব আর সোনাদি। আর দু'পাশে রতি
র শিশু। ছবিটা অনেকক্ষণ ধরে
খেছি। মনে হয়েছে ছবিটা দেখে যে-
উ সোনাদিকে দাশসাহেবের স্ত্রী বলেই
বে। কিন্তু যারা সোনাদির সঙ্গে
শেছে তারা জানে অতবড় ভুল সোনাদির
ও যদি কেউ থাকে তো তারাও
রে না।

কিন্তু অবাক হয়েছিলাম আর একটা
বি দেখে। সেটা টাঙানো ছিল স্বামীনাথ-
বুর ঘরে। সেটাতেই সোনাদি বসে আছে
বামীনাথবাবুর পাশে, আর সোনাদির
াশে ছোট পাঁচ বছরের মেয়ে পুটু।
দুটো ছবিতেই সোনাদি যেন স্ত্রী হয়ে
সে আছে। একই মুখের ভাব, একই
চাখের দৃষ্টি। কোথাও কোনও তারতম্য
নই তার।

কিন্তু এবার এ-বাড়িতে পা দিয়ে যেন
সব বদলে গেছে মনে হলো।

মনে হলো যেখানে যা থাকবার তা
যেন নেই।

সোনাদি দাশসাহেবের রান্নাঘরে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রান্না করছিল।

আমাকে দেখেই হাসিমুখে বললে,
'কী রে, তোর সোনাদিকে মনে পড়লো!'

বললাম, 'কেমন আছো সোনাদি?'

'ভালোই তো আছি রে, কেন, কী রকম
দেখছিস?'

ভালো করে সোনাদিকে চেয়ে
দেখলাম। কোথাও ও-চেহারায় কিছু পরি-
বর্তন হয়েছে কি। মুখের হাসির ভাষা
কিছু কম মুখর, চোখের দৃষ্টির রং কিছু
কম উজ্জ্বল। কোথাও তো টের পাচ্ছি
না। সোনাদি উনুনের ডেকচি নামিয়ে
কড়া তুললে।

খানিক পরে বললাম,'সোনাদি, তুমি
রাঁধছো?'

'কেন, আমি রাঁধতে পারিনে?' বলে
উনুনের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলো
সোনাদি।

তবু যেন আমার ভয় গেল না।

বললাম, 'সত্যি বল না, কী হয়েছে
তোমার।'

'হবে আবার কী রে পাগল ছেলে!'

'কিছু হয়নি, সত্যি? তবে খানশামা,
বাবুর্চি, পীরালি, সুখ সিং, ঝি-রা, বামুন
ঠাকুর সব কোথায় গেল, কাউকে দেখতে
পাচ্ছিনে যে!'

'ওঃ তাই বলছিস! তাদের তো ছাড়িয়ে
দেওয়া হয়েছে।'

'ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে! কেন?'

'কেন আবার, দাশসাহেবের ব্যাঙ্ক
যে ফেল হয়েছে, শুনিস নি?'

আমি যেন ভুল শুনছি। আমার মনে
হলো যেন স্বপ্ন দেখছি চোখ মেলে!

সোনাদি আমার মুখের দিকে চেয়ে
বললে, 'ট্রেন থেকে নেমে সোজা আসছিস
নাকি?'

আমি কিছু উত্তর দিতে পারলাম না।

আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'তা হলে কী
হবে সোনাদি?'

'কী আবার হবে?' বলে সোনাদি
আপন মনে রান্নাই করতে লাগলো।

বললাম, 'সোনাদি, কথা বল না?'

সোনাদি আমার পিঠে হাত দিয়ে
সান্ত্বনা দিতে লাগলো। তারপর তেমনি
রান্না করতে করতে বললে—'কী কথা
বলবো বল্?'

মনে আছে এখনো, কী ভীষণ সে
দিন ক'টা। দাশসাহেব নিজের বিছানায়
চুপ করে শুয়ে আছেন। মুখে কোনো কথা
নেই। টেলিফোনের পর টেলিফোন আসছে।
কতলোক আসছে দেখা করত, কারো সঙ্গে
দেখা করছেন না দাশসাহেব। অভিলাষ
বলতো, 'দেখা হবে না সাহেবের সঙ্গে,
সাহেবের অসুখ।'

তারপর কত কী ঘটলো। ...
ভীষণ অসুখ দাশসাহেবের! ব্লাড ...র
ছিলই, তারপর কেমন হলো, আর বি...
ছেড়ে উঠে বসতে পারেন না। সোনাদি
ওই দুর্বল শরীর নিয়ে পাশে বসে চা
করে খাইয়ে দেয়। বলে, 'এটুকু ...
নাও—'

দাশসাহেব চুপ করে খেয়ে নেন।
কিছু কথা বেরোয় না তাঁর মুখ দিয়ে।
চুপ করে সব দেখেন।

একে একে সকলকে ছাড়িয়ে দেওয়া
হলো।

অভিলাষকে ডেকে সোনাদি বললে,
'অভিলাষ, সাহেবের অবস্থা তো দেখছ,
তোমাকে মাইনে দিতে পারবো কিনা
বুঝতে পারছি না।'

অভিলাষ তবু যেতে চায় না। বলে,
'অনেক নুন খেয়েছি সাহেবের, আমাকে
আর তাড়িয়ে দিও না মা।'

রতি আর শিশু ইস্কুল ছেড়ে চলে
এল। সেখানেও গঞ্জনা শুনতে হবে সকলের
কাছে। খবরের কাগজেও খবরটা বেরিয়ে
গেছে। এক-হাজার দু-হাজার টাকার
ব্যাপার নয়, লাখ লাখ টাকার কারবার। সব
বন্ধ। সোনাদি রান্নাবান্না সেরে রতি আর
শিশুকে নিয়ে পড়াতে বসে। বলে এবার
থেকে আমি নিজেই তোমাদের পড়াবো।'
আমি চুপ করে শুনি দেখি সব। কী
চমৎকার সোনাদির পড়ানো। কী চমৎকার
সোনাদির ইংরেজী উচ্চারণ। আর সেই
হাসি মুখ। সেই হাসি মুখে, সকাল থেকে
সন্ধ্যে পর্যন্ত সোনাদির সংসারের কাজ।
কাজ করতে ক্লান্তি নেই, বিরাগ নেই।
টেলিফোনের লাইনটা একদিন এসে কেটে
দিয়ে গেল কোম্পানীর লোক।
মটর গাড়িটাও ক্রোক করে নিলে।
পুলিস এসে দাশসাহেবকে কী সব
জিজ্ঞেস করলে। য়্যারেস্ট করে জামিনে
দিয়ে গেল। সমস্ত জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত
করে নিলে। নিঃস্ব নিরাভরণ বাড়ি-ঘর।
সোনাদি একটা-একটা করে গয়না খুলে
দিতে লাগলো। শুধু সোনাদি আর অভি-
লাষ। আর তিনটি শিশু—দাশসাহেব
রতি আর শিশু।

আমি এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে কল-
কাতায় এসেছিলাম। আরো এক মা...
বাড়িয়ে দরখাস্ত করে দিলাম।

জিজ্ঞেস করতাম, 'কতদিন ব্যাপারে চলবে সোনাদি?'

বাজাদি তেমনি হাসতো। বলতো তিটি মালিক কি আমি, আমায় যে ছা করছিস?'

তোমাকে জিজ্ঞেস করবো না তো জিজ্ঞেস করবো আমি?'

সোনাদি দাশসাহেবের ভাত বাড়তে ড়তে বলতো, 'এতদিন যেমন করে চলেছে, মনি করেই চলবে।'

ওদিকে পুলিস আসে লোকজন সে, সোনাদি তাদের সঙ্গে কথা বলে। স্পষ্ট, কী ভদ্র, কী শান্ত ব্যবহার। দাশসাহেবকে আড়ালে রেখে সোনাদি গিয়ে আসে সামনে। আড়াল করে রাখে তকে শিশুকে। কাউকেই কিছু বুঝতে না কিন্তু বুঝতে পারি সবাই। স্তে আস্তে সোনাদির সমস্ত দেহ আভরণ হয়ে আসে। তবু সোনাদির র হাসি তেমনি অম্লান।

মনে আছে তখনো কতদিন যখনি সর হয়েছে সোনাদি ইজিচেয়ারে বসে র সঙ্গে গল্প করেছে।

সেদিন সকাল-সকাল সোনাদির বাড়ি ছি হঠাৎ বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল টা ট্যাক্সি আর নামলেন স্বামীনাথ-বু।

সোনাদি বললে, 'তুমি?'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'খবরের জে সব দেখলাম, তা দাশসাহেব য়ায়!'

সোনাদি বললে, 'ওই ঘরে দেখ, র খারাপ হয়ে পড়ে আছেন, বড় মন প হয়ে গেছে।'

স্বামীনাথবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন হলো হঠাৎ?'

সোনাদি বললে, 'কেন হলো তা কি জানি, আগের দিনও অফিসে গেছেন, ফোন করেছেন, যেমন রোজ খান নি দু' স্লাইস ব্রেড আর টোম্যাটোর খেয়েছেন, বিকেল তিনটের সময় *ফোন এল; বললেন—আমার বাড়ি একটু দেরি হবে—তা তখনও কিছু না আমি—'*

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'তারপর?'

সে-গল্প সোনাদি আমাকেও বলেছে। হাঁসি স্কোয়ারে সেদিন লোকে লোকারণ্য। হাজার হাজার লোক ব্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছে। ব্যাঙ্কের কোলাপ্সিব্‌ল্ গেট্ বন্ধ করে দিয়েছে। কত লোক সেই দেয়ালের পাথরের ওপরই মাথা কুটছে। দাশসাহেব আট্‌কে পড়লেন অফিসের কামরায়। তারপর আবার টেলিফোন করলেন সোনাদিকে।

সোনাদি টেলিফোন ধরে বললে, 'বাড়ি চলে এসো এখুনি।'

'এখন যাওয়া অসম্ভব, ওরা সমস্ত রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে বেরোতে দেবে না—সমস্ত রাস্তা বন্ধ।'

সোনাদি বললে, 'আমি যাচ্ছি এখুনি, গাড়িটা পাঠিয়ে দাও।'

'তুমি এসো না সোনা, তোমাকেও ওরা বাধা দেবে, আসতে দেবে না।'

'তবে আমি ট্যাক্সি করে যাচ্ছি' বলে টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে উঠলো সোনাদি।

সোনাদি বললে, 'দাশসাহেবকে কি আনতে পারি, হাজার হাজার লোক গেট্-এর সামনে দাঁড়িয়ে, আমি ট্যাক্সি থামিয়ে সোজা ভিড় ঠেলে গিয়ে উঠলুম, তারপর কেমন করে যে দাশসাহেবকে নিয়ে, আবার বাড়িতে এলুম, তা আমিই জানি, কিন্তু সেদিন রাত্রেই দাশসাহেব বিছানায় পড়লেন, দেখে এসো গিয়ে, আর উঠতে পারেন না, আমাকে নিজের হাতে খাইয়ে দিতে হয়—'

তারপর সে ক'দিন স্বামীনাথবাবু কী পরিশ্রমই করলেন। যে-ক'দিন ছিলাম সেবার, দেখেছি স্বামীনাথবাবু সারাদিন কোথায় কোথায় যান। উকিল-ব্যারিস্টার য়্যাটর্নী, সলিসিটর, জলের মত টাকা খরচ করেন। ঝি-চাকর যাদের ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল আবার রাখা হলো। সুখ সিং আবার এসে গেট-এ দাঁড়ালো। সোনাদির পুরোন ঝি-রা আবার এল। স্বামীনাথবাবু নিজের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুললেন। সারাজীবনে যা-কিছু জমিয়েছেন, পণ্টুর বিয়ের জন্যে, কলকাতায় বাড়ি করবার *জন্যে কয়েক হাজার টাকা আলাদা করে ছিল, তা-ও তুলতে হলো।*

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'ঠিক আগে যেমন ছিল, তেমনি চলুক।'

আমিও উকীল-ব্যারিস্টারের বাড়ি ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম। একা স্বামীনাথবাবু কত পারবেন।

দাশসাহেব বিছানায় শুয়ে বললেন, 'সলিসিটররা কী বলছে?'

'সে সব আপনি ভাববেন না, তো আছি।'

তারপর যখন সারাদিনের কাজের স্বামীনাথবাবু বাড়ি আসেন, তখন গোল হয়ে বসে আবার সভা হয়। আবার জমে।

সোনাদি বলে, 'পণ্টু খাচ্ছে কেন?'

পণ্টু মুখ কাঁচুমাচু করে বলে, পাচ্ছে না যে মা?'

স্বামীনাথবাবু বলেন, 'আজ আবার পেয়ারা খেয়েছে বোধহয়?'

সোনাদি জিজ্ঞেস করে, 'কত ছুটি নিলে তুমি?'

স্বামীনাথবাবু বলেন, 'এ-ব্যাপার মিটলে তো যেতে পারি না।'

সোনাদি আবার জিজ্ঞেস করে, কী রকম কাজ করছে ওখানে?'

'ও বলছিল, আর একটাকা বাড়িয়ে দিতে।'

'আর দুধটা দেখে নেওয়া হয়

'সব তো শনিচরীর মা করে, ওপরেই ছেড়ে দিয়েছি।'

'পণ্টু তো লেখাপড়া কিছু না, দ্বিতীয়ভাগের বানানই ভুলে আছে।

'পণ্টুকে তুমি তোমার কাছেই এখানে।'

এক-একদিন স্বামীনাথবাবু জিজ্ঞেস করেন, 'দাশসাহেব কেমন আজ?'

'সেই রকমই।'

'কিছু সুরাহা হলো?'

স্বামীনাথবাবু জামা ছাড়তে ছা বলেন, 'সুরাহা হবে বলেই তো হচ্ছে।'

সলিসিটারকে কত টাকা দিলে আ

'আগে যা দিয়েছিলাম, তার আজকেও আবার চেক দিলাম।'

'মামলা কতদিন আর চলবে হচ্ছে?'

'যত বছরই লাগুক, চালিয়ে হবে।'

'আর কতদিন এখানে থাকতে পা তুমি?'

ট আরো বাড়িয়ে নিয়েছি, তা
রের বাড়িটার জন্যে একটা পার্টি
আজ।'
দর দিতে চায়?'

যাহোক আমি সেবার বেশি দিন
পারিনি, দাশসাহেবের মামলা
চলছে। বিলাসপুরে এসে আবার
যোগ দিয়েছি। সোনাদিকে চিঠি
ঠিক-ঠিক জবাব এসেছে
র। প্রত্যেকবারই সোনাদি
লেখার কথা ভুলে যাসনি তো?'
র কথা কি ভুলতে পারি।
আমাকে ভুলে গেলেও আমি
দের। যুদ্ধের বাজারে কত রকম
বেরোলো। কত নতুন প্রতিভাকে
অভিনন্দিত হলো। আমি তবু
আমি ভুলিনি আমার সোনাদির
দিকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা।
আমার পথ সামনে, আমার পথ
আমার মধ্যে সংশয়রহিত আমি।
ই একটি এককে পেয়েছি। একে-
রূপে, আনন্দরূপে, অব্যবহিত
রেছি। এ জানা নয়, সংগ্রহ নয়,
দেওয়া নয়,—এ প্রকাশ, সূর্যের
মত ভাস্বর। সে-প্রকাশকে
বাইরে যেতে হবে না। কারো
গে খোশামোদ করতে হবে না।
রে গিয়ে খুঁজতে হবে না। শুধু
জানালা-দরজাগুলো খুলে দিলেই
একেবারে অখণ্ড হয়ে উদ্ভাসিত
নাদি আমাকে দিনের পর দিন
াই দিয়ে এসেছে।
ই আশ্চর্য, সোনাদিই তা দেখতে
সোনাদিকেই দেখাতে পারলাম
পর্যন্ত, এ-ক্ষোভ আমি রাখবো

ই সময়ে বিলাসপুরে একদিন
ামীনাথবাবুর চিঠি পেলাম।
'সোনাদি তোমায় দেখতে
একবার, চলে এসো শিগগির।'
চিঠি পেয়ে বড় উৎকণ্ঠা হল,
াম কলকাতায়।
আছে সোনাদির আগের চিঠিতে
শসাহেব মামলা থেকে মুক্তি
কিন্তু সে-মুক্তির মানে যে কী,
আন্দাজ করতে পারলাম। দাশ-
সাহেবের মুক্তির জন্যে স্বামীনাথবাবু
জীবনের যা কিছু সঞ্চয়, যা কিছু সামর্থ্য
সমস্ত ব্যয় করেছেন। জব্বলপুরের
বসতবাড়িটাও বাঁধা দিয়েছেন। এমন কিছু
ছিল না যা দেননি। প্রয়োজন হলে বাকি
সব কিছুই দিতে পারতেন। তারপর
যখন সমস্ত দিকে সুরাহা হয়েছে, দাশ-
সাহেব সেরে উঠেছেন, আবার ছেলেমেয়ে-
দের ইস্কুলে ভর্তি করা হয়েছে, আবার
সোনাদি যখন স্বামীনাথবাবুর কাছে
জব্বলপুরে ফিরে যাবার কথা ভাবছে,
এমন সময় এমন কী ঘটলো!

গিয়ে দেখলাম—সমস্ত বাড়িতে একটা
অস্বস্তিকর আবহাওয়া। তবু বাগানের
চেহারা আবার ফিরেছে। গেট-এ সুখ
সিং দাঁড়িয়েছিল। সেলাম করলে আমায়।
বললে—মাঈজীর বড় বেমার—

আমি গিয়ে দাঁড়ালাম সোনাদির ঘরে।
সোনাদি শুয়ে ছিল। যেন চিনতে পারলে
আমাকে। যেন হাসলো। যেন হাত দিয়ে
কাছে ডাকলো। কাছে গেলাম। দাশসাহেব
মাথার কাছে বসেছিলেন। এ-পাশে
স্বামীনাথবাবু দাঁড়িয়েছিলেন শুকনো
মুখে। আর একজন ডাক্তার কী যেন
লিখছেন একটা কাগজে।

ওষুধ-পত্রে ছেয়ে গেছে টেবিল।

সেদিনের সব কথা আজ আর বলবার
দরকার নেই। সব কথা আমি ছাড়া আর
কারো হয়ত মনেও নেই। তবু মনে
আছে, যখন সব শেষ হয়ে গেছে, তখন
স্বামীনাথবাবু সোনাদির প্রাণহীন দেহটার
দিকে উদার দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে আছেন।
কিন্তু দাশসাহেবের অবস্থা বড় করুণ।
ছেলেমানুষের মত আছড়ে-পিছড়ে কাঁদতে
লাগলেন। তাঁকে সবাই মিলে ধরেও
থামানো যায় না এমনি অবস্থা তখন।

মনে আছে স্বামীনাথবাবু বলেছিলেন,
'দাশসাহেব বড় কাতর হয়ে পড়েছেন—ওকে
তুমি দেখো—'

দাশসাহেবও বলেছিলেন, 'স্বামীনাথ-
বাবুর কাছে গিয়ে একটু বোস তুমি, ও'র
শোকটাই দারুণ—'

আর আমি!

স্বামীনাথবাবু কোথায় তা আজ
জানি না। দাশসাহেবের খোঁজও আর
রাখিনি। তাঁরা কী পেয়েছিলেন জানি
না। দাশসাহেবের ঘরে দেখেছি সোনাদির
ছবি, আবার স্বামীনাথবাবুর ঘরেও গিয়ে
দেখেছি, সে-ঘরেও সোনাদির একখানা
ছবি। কতবার ভেবেছি, সোনাদির কাছে
কে সবচেয়ে প্রিয় ছিল। স্বামীনাথবাবু
দাশসাহেব, না আমি! আমার কথা ও'রা
দু'জনেই হয়ত কখনো ভাবেন নি। কিন্তু
ওঁরা যা পেয়েছেন, তার চেয়ে যে কত
বেশি পেয়েছি আমি। আমার পাওয়ার
যেন শেষ নেই। আমি যে আশাতীত
পেয়েছি। সোনাদিকে পেয়েও পেয়েছি,
হারিয়েও পেয়েছি। জীবনের মধ্যে দিয়ে
পেয়েছি, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে পেয়েছি। এই
যে আজ অন্তরের সঙ্গে বাইরের, আচারের
সঙ্গে ধর্মের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির, বিচার-
শক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের সামঞ্জস্য করতে
পারছি এ তো সোনাদির জন্যেই।

আজ আমার জীবনে বাহির মিলেছে,
অন্তর মিলেছে, সুখ মিলেছে, দুঃখও
মিলেছে। শুধু যে জীবনই পেয়েছি তা
নয়, মৃত্যুও পেয়েছি। শুধু বন্ধুই নয়,
শত্রুও পেয়েছি। তাই তো আমার জীবনে
ত্যাগ আর ভোগ দুই-ই পবিত্র, লাভ আর
ক্ষতি দুই-ই সার্থক। তাই তো সমস্ত
সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ, বিরহ-
মিলনের সার্থকতা আমার জীবনে
নিটোল হয়ে একটি অখণ্ড প্রেমের
পরিপূর্ণতায় আজ এক হতে পেরেছে।
জীবনে প্রশংসাও যেমন পেয়েছি, নিন্দাও
পেয়েছি তেমনি। আমার প্রাপ্য বলে
আমি দুটিকেই গ্রহণ করেছি। আমি
বলতে পেরেছি—'সমস্ত লোকলোকান্তরের
ঊর্ধ্বে নিস্তব্ধবিরাজমান হে পরম-এক,
তুমি আমার মধ্যে এসে আমার হও—'

তারপর আমার অজ্ঞাতবাসের পালা
শেষ হলো একদিন। মনে আছে, আবার
কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম। এবার অনেক
দূরের যাত্রা। এবার বৃহতের দিকে আমার
লক্ষ্য। আমি স্থিতধী হতে পেরেছি।
সোনাদি আমার সত্য দৃষ্টি দিয়ে
গেছে। আমার তৃতীয় নেত্র খুলেছে। আমি
নবজন্ম নিলাম।

আমার আগেকার সব কথা বাতিল হয়ে
গেল সেই দিন থেকে। আমার লেখক
জীবনের একটি অধ্যায়ের ওপর এইখানেই
পড়লো পূর্ণচ্ছেদ।

অম্বুবাচী, আসামের কৃষি উৎসব

কমল দত্ত

আষাঢ় মাসে মিথুন রাশিস্থ সূর্য যখন আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথম পাদে, তখন এই প্রান্ত দেশের কোন চাষী হাল ধ'রবে না, কোন বিধবা মহিলা অগ্নি স্পর্শ অথবা অগ্নিপক্ক খাদ্য গ্রহণ করবেন না এবং আপামর জনসাধারণ পৃথিবীর গায়ে আঁচড় কাটবেন না, কেননা ধরিত্রী তখন ঋতুমতী হয়ে থাকেন। অন্তত ভগবৎ বিশ্বাসী জনসাধারণের বিশ্বাস তাই।

ইতিমধ্যে ভারতভূমির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অগণিত তীর্থকামী পুণ্যপীঠ নীলাচলে কামাখ্যার রুদ্ধ মন্দির দ্বারে জমায়েত। গ্র্যানাইট পাথরে তৈরী মন্দিরের ভিতরে বেশ খানিকটা নীচে নামার পর অন্ধকার এক প্রকোষ্ঠে ঘিয়ের সলতের মৃদু আলোয় দেখা যায়, যোনি-পীঠ। তিন দিন দেবী কামাখ্যাও ঋতুমতী। তাই রুদ্ধ মন্দিরে বিশ্রাম প্রয়াসী; চতুর্থ দিনে ভক্তকে দান করবেন দর্শন। এ-ই অম্বুবাচী।

যুগপৎ এই সময়টিতেই কিন্তু মহা-সিন্ধুর পার হ'তে পুঞ্জে পুঞ্জে বাদল মেঘের সম্ভার মৌসুমী বায়ুতে ভর করে পেঁাছে গেছে উড়িষ্যা, বাংলা ও আসামে। সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে বর্ষা নেমেছে অঝোর ধারে।

পূর্ব কাহিনী

অম্বুবাচীর এই ধর্মীয় আচারানু-ষ্ঠানের উৎপত্তি বহু প্রাচীন একটি জাতির কৃষিনির্ভর সংস্কৃতি থেকে। অস্ট্রো-এশিয়াটিক গোষ্ঠীর মনখ্মের শাখার এই প্রাচীন জাতিটি চার হাজার বৎসরেরও আগে আসামের লোহিত নদীর ধারা অনুসরণ করে আসামে প্রবেশ করে। আসামের খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড়ের খাসি জাতির মধ্যে ও মহাভারতভূমির বিভিন্ন উপজাতির ভিতরে ছড়ান রয়েছে এদেরই বংশধর।

পৃথিবীর সভ্যতার অন্যতম আদিক্ষেত্র চীন দেশের হোয়াং হো ও পী হো নদী বেষ্টিত বর্তমান পিকিং নগরীর নিকটবর্তী তিস্ (this) ভূমি থেকে একটি মানব-গোষ্ঠীর শাখা প্রায় ২৭৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের গিরিবর্ত্ম দিয়ে আসামে প্রবেশ করে। অস্ট্রো-এশিয়াটিক গোষ্ঠীর এই মানব শাখাটির চৈনিক নাম ছিল সিন্-তাইং (T'sin-taing)। আসামে বসতি স্থাপন করার পর এরা জাইন-তিয়েন এবং পরে জয়ন্তিয়া নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহাদেরই একটি উপশাখা খা-চিয়া অথবা খাসিয়া জাতি। প্রাচীন প্রাগ্-জ্যোতিষ-পুর (জু-তিস্-পুর) ও বর্তমান গৌহাটী শহরের চারিপাশের অঞ্চল ছিল এদেরই রাজ্যের অন্তর্গত।

কৃষি ও নারী

নবোপলীয় (Neolithic) যুগের যে কালীন সভ্যতা বাহনরূপে এদের এই দেশে আগমন, সেই কালে সবে কোদাল-কৃষি (hoe-cultivation) শুরু হয়েছে। জীবন ধারণের জন্য প্রধান জীবিকা তখনও শিকার, মাছধরা, ফলমূল সংগ্রহ এইরকম নানাবিধ বৃত্তি। সমাজের পুরুষরা যখন বনেজঙ্গলে নদীনালায় শিকারের দ্বারা জীবিকায়োজনে ব্যস্ত তখন সমাজের মেয়েরা কোদালীর সাহায্যে 'জুম' কৃষি দ্বারা শিকারে আহৃত অনিশ্চিত খাদ্যের পরিপূরক সংগ্রহের ব্যবস্থা ক'রত। তখনকার দিনে 'জুম' কৃষির জমি প্রস্তুত থেকে শুরু করে বীজ বপন ও শস্য কর্তন পর্যন্ত সব কিছুতেই ছিল নারীর একচেটিয়া অধিকার।

ভারতবর্ষে মাতৃতন্ত্রাধীন এই মানব সম্প্রদায়ই প্রথম ধানচাষের প্রবর্তন করে। প্রাচীন এক ধরনের যে কোদালী দিয়ে মেয়েরা চাষের জমি প্রস্তুত ক'রত তার নাম ছিল মো-খু। এই কথাটা থেকেই নাকি উৎপত্তি জু-মো অথবা 'জুম্'-চাষের, যে প্রথায় আজও আসা দুরতিগম্য অঞ্চলের পাহাড়ী উপজা শস্য উৎপাদন করে। এই আগল জাতির মেয়েরা করত জুম্-খে পক্ষান্তরে পুরুষদের উপর ছিল শিব ও অন্য উপায়ে খাদ্য সংগ্রহের ভা অভ্যাসের ফলেই হোক বা পারিপার্শ্বি প্রভাবে বা পরিস্থিতির চাপেই হোক প্রথাই দাঁড়িয়ে গেল কর্মবিভা স্বভাবত এ' বিশ্বাস সে' যুগের মানু মনে ক্রমে বদ্ধমূল হোল যে, মানবজ মূলাধার নারীর সঙ্গে শস্য উৎপা বসুমতীর অবয়বগত সাদৃশ্য কোথায় আছে। বীজের উদ্ভিদে বিকাশ মনুষ্যজন্মের বৈজ্ঞানিক রহস্য ভে যুগ যুগ আগে পৃথিবীকে উৎপাদিকা ও রক্ষিকা মাতারূপে ক করার পিছনে বিশ্বাস ও ভক্তিপ্র দুই-ই ছিল ধর্মমতের মতই সুদৃঢ়।

কৃষি-নির্ভর সভ্যতা

পৃথিবীর অন্যান্য কৃষিনির্ভর জা মধ্যে প্রত্যক্ষ এই বিশ্বাস আজও আসা অসংখ্য কৃষিজীবী জাতি ও উপজা জীবন ও চিন্তাধারার প্রধান বাহন।

মানব সভ্যতার আদিপর্ব নবোপ বা নব প্রস্তর যুগে যখন কৃষি নারীর প্রাসঙ্গিক কাজের নামান্তর, সমাজের অর্থনীতি ব্যবস্থায় কৃষি প্রধান শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হ পারেনি শুধু এইজন্য যে, কৃষিবিজ্ঞা সেই শৈশবে চাষের যন্ত্র হিসাবে লাঙ ব্যবহার শুরু হয়নি। কোদাল লাঙল, কৃষি-স্বল্পতা থেকে কৃষিপ্র সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থনীতিতে এ নিয়ে যেতে মানুষকে খুব বেগ হয়নি। ফলে, কালক্রমে কৃষিই দাঁড়াল সমাজের অর্থনীতির মেরু সেই স্বয়ং-সম্পূর্ণ সমাজের স্বভাবতই অত্যন্ত সচেতন হয়ে প্রকৃতির সেই সব শক্তি সম্বন্ধে যার হয় বর্ষাবাদল, রৌদ্রখরা ও ঝড়ঝঞ্ঝা যাদের বিপর্যয়ের উপর নির্ভর সমস্ত মানবসমাজের আহার অনাহারের প্রশ্ন।

প্রকৃতির এইসব দুর্বিপাক, মানুষের ন একান্ত কামনা, যে করেই হোক ষণ ক'রে বশীভূত ক'রতে হবে। র উর্বরতাবৃদ্ধির জন্য ইন্দ্রজাল বা ্তাকের আশ্রয় মানুষকে গ্রহণ করতে া। এমনকি, প্রাচীন প্রস্তর যুগের ত খুড়ে হাতীর দাঁত বা পাথরের াই যৌন লক্ষণ প্রকটিত ছোট ছোট মূর্তি পাওয়া যায়। নবোপলীর গর বসতি ও কবরের মধ্যেও এই নর অসংখ্য মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। সব মূর্তিকে বলা হোত "মাতৃরূপা ী" (Mother Goddesses)।

নারীকে রূপক জ্ঞানে ধরিত্রীর াধনার রীতি ও বিশ্বাস আজও ক্ষীণ ন। শীতের শেষে আসামের পাহাড়ে তের শুষ্ক বনে জংগলে অপূর্ব এক া দেখা যায়। রাত্রির অন্ধকারে মনে নর পাহাড়ে বুঝি বা দাবাগ্নি মাইলের মাইল বনভূমিকে গ্রাস করে চলেছে। ড়ীদের ভিতর বংশানুক্রমে বিশ্বাস া এসেছে, শীতে মাতা বসুমতীর াপ দরকার। সেই সংগে জুম্ র জমি ত পরিষ্কার হ'লই, কোদালের র আঘাতে যখন মাটি তৈরী হবে া সংগে ভস্মীভূত জংগলী সারও শয়ে দেবার ব্যবস্থা হোল।

পাহাড়ে আগুন দিয়ে ঢোলকের ল ও পেপা বাঁশীর সুরে পাহাড়ীরা া গায়। চাল থেকে প্রস্তুত 'জু' ার নেশায় সে গান জমাট বাঁধে।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সমতল ভূমিতে য় গাঁয়ে বহাগ (বৈশাখ) বিহুর হুর) উৎসবের আগমনে যুবক-তীর দল নতুন পোশাক পরে আনন্দে ত উঠে। দলে দলে তারা নাচে ও া গায়, প্রণয় ও মিলনের গান, উদ্দীপক নাচ। গোড়ার দিকে এসব নাচ ও নের লক্ষ্য ছিল, নারীরূপী ধরিত্রীর পাদিকা শক্তি উদ্দীপ্ত করা। কৃষির ংগ নারীর প্রাচীন আচ্ছেদ্য সম্পর্ক রণে আজও পূর্বভারতের বাংগলা, ড়য্যা ও আসামের চাষীদের বিশ্বাস, ত্রীর আকার, আকৃতি ও প্রকৃতিও রীদেহের সমতুল্য।
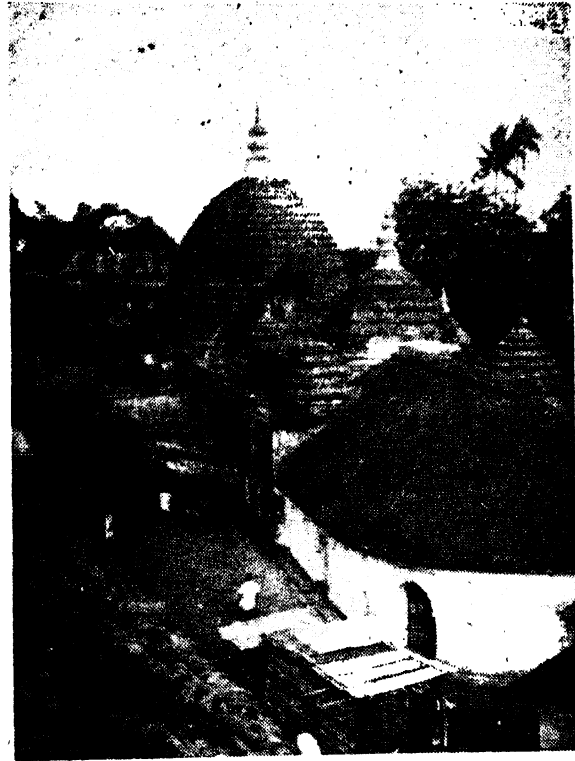
বৎসরের প্রথম কালবৈশাখীর সংগে সংগে যে বর্ষণ হোল তা'তে জমিটা একটু রসস্থ হলেই চাষী লাংগল নিয়ে নেমে পড়ল মাটি প্রস্তুতিতে। ধরিত্রী শস্য-রূপী সন্তান ধারণক্ষম কিনা সেটা জানবার আগে কিন্তু বীজ বপন করা হলেও ধানের চারা ক্ষেতে রোপণ করা হয় না।

কামাখ্যাদেবীর মন্দির

প্রকৃতির সাধনার ঐতিহ্য

কামাখ্যা পাহাড়ের গায়ে পাথরের ফাটলে ছিল একটি প্রকৃতির প্রস্রবণ। সেই প্রস্রবণ থেকে সারা বৎসর জলের ক্ষীণ ধারা চুঁইয়ে পড়ত। বর্ষার সেই ধারা হ'ত প্রবল এবং ভিতরের স্তরে hæmatite (খনিজ রক্তাভ ধাতু)-এর সংস্পর্শে এসে সেই জলের ধারা হোত লাল। যে ফাটলের ভিতর দিয়ে প্রস্রবণ গড়িয়ে পড়ত সেটা ছিল নয় ইঞ্চি লম্বা ও পনর ইঞ্চি চওড়া। বর্ষার আগমনে যখন প্রস্রবণ মুখে জলের রং লাল হয়ে উঠত তখন এই অঞ্চলের তদানীন্তন বাসিন্দা খাসিয়াদের সরল বিশ্বাস হলো ধরিত্রী ঋতুমতী হয়েছেন। তার প্রমাণ ঐ প্রস্রবণ,—কা-মেই-খা, মায়ের জলের ধারা। ঐতিহাসিক শ্রীরাজমোহন নাথ কামাখ্যা নামের উৎপত্তি হিসাবে এই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। কামাখ্যার প্রস্রবণের লাল জলে এই প্রমাণও পাওয়া গেল ধরিত্রী গর্ভক্ষম। জুম খেতে বীজ বপনের এই উপযুক্ত সময়।

কামাখ্যা নীলাচলবাসিনী

বিশ্বাসের স্তরের পর স্তর জমাট বেঁধে কালক্রমে প্রকৃতি এই লীলা দেবতার মর্যাদা লাভ করল। পরম সৃজনীশক্তির আধার ও রক্ষয়িত্রীরূপে দেবী কামাখ্যা পূজিত হতে লাগলেন। খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, বোড়ো-কচারী, আহম এবং আর্যহিন্দু সভ্যতার ঢেউ একে একে আসামের উপর দিয়ে বয়ে গেল। কামাখ্যার আদি পূজা-পদ্ধতি কি ছিল আজ বলা শক্ত; কিন্তু বহিরাগত বর্তমান পাণ্ডা ও পূজারিগণ স্মৃতি উদ্ধার করে বলেন যে, দেবীর পূর্বেকার পূজারী ছিল অস্ট্রিক বোড়ো-কচারী পাহাড়ী গারো জাতীয় পুরোহিত। তখন কামাখ্যায় শূকর বলি হোত।

বহু বৎসর পূর্বে এক আগন্তুক *মাতৃতান্ত্রিক অস্ট্রিক জাতি যে ধরিত্রীর রক্ষিকা উৎপাদিকারূপে মাতৃ সাধনার সূচনা করেন পরবর্তীকালে আর্য হিন্দু* দর্শনের প্রভাবে সেই সাধনার এবং অন্তর্নিহিত অর্থের রূপান্তর ঘটে। "কালিকা পুরাণে" দেবীতে 'কাম' গুণ আরোপিত ক'রে 'কাম' দেবীরূপে কামাখ্যার ব্যাখ্যা করা হয়। কামাখ্যা দেবী, "কালিকা পুরাণ" বলেন, নীলাচল পাহাড়ে মহাদেবের সহিত কামাভিলাষ পূরণ করবার উদ্দেশ্যে গোপনে অভিসার করতেন। বিভিন্ন কালে ও স্থানে কামাখ্যার যে অর্থ কল্পনা করা হয়েছে সব মিলিয়ে একটি অর্থসমষ্টি এই পুরাণে আমদানী করা হয়। ফলে আর্যভূমির মানচিত্রে দেবী কামাখ্যার আবির্ভাব হোল। 'কালিকা পুরাণ' আরও বলেন, মহাদেব যখন সতীর মৃতদেহ নিয়ে ক্ষ্যাপার মত ইতস্তত ভ্রমণ করছিলেন, তখন বিষ্ণুচক্রের আঘাতে ছিন্ন হয়ে নীলগিরিতে (নীলাচলে) সতীর যোনি পতিত হয়। ফলে পাহাড় নীলবর্ণ ধারণ করে। নীলাচল আজ ভারতভূমিতে

মন্দিরের রাস্তায় দ্বিতীয় তোরণের সামনে খোদিত নারীমূর্তি

বিক্ষিপ্ত ৫২ পীঠের একটি পীঠস্থান।

কামরূপের প্রাচীন ইতিহাসের উত্থান পতনের সঙ্গে কামাখ্যার নাম অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত। প্রাচীন প্রাগ্জ্যোতিষপুর ও বর্তমান গৌহাটী শহর থেকে দু' মাইল দূরে বার শ' ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত কামাখ্যা মন্দিরের অঙ্গন থেকে দক্ষিণে দেখা যায়, কিছু দূরেই খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড় শ্রেণীর শেষ পাহাড়টি এসে মিলেছে কয়েক মাইল দূরে সমতল ভূমিতে। যে ব্রহ্মপুত্রের তীরভূমির পাশে পাশে পায়ে হাঁটা রাস্তা ধরে চার হাজার বৎসরেরও আগে প্রথম অস্ট্রো-এশিয়াটিক জাতির একটি শাখা, পরে মঙ্গোলিয়া বড়ো-কচারী তারও পরে আহম জাতি আসামে পর্বত ভৈয়ামে (উপত্যকায়) ইতিহাসের নতুন প্রবাহের সঙ্গে ভাষা, সংস্কৃতি ও বিচিত্র জীবন যাত্রার প্রবাহ উপপ্রবাহ ছড়িয়ে দিয়েছে, কামাখ্যা পাহাড়ের উত্তরে সেই বিরাট নদ ব্রহ্মপুত্রের খরস্রোত আজও পা... পাদদেশের কঠিন পাথরের ধাক্কা... বিচিত্র ঘূর্ণির নক্সা কেটে কেটে বয়ে...

বর্তমান মন্দিরটি প্রায় ৪ শত ব... পুরানো। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম... আক্রমণকারী মুসলমান বাহিনী... ধ্বংস করার পর কোচবিহার অ... নরনারায়ণ ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে... পুনর্নির্মাণ করেন। কামাখ্যা মা... সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব এই যে, দে... কামাখ্যাদেবীর কোন প্রস্তর মূর্তি... ভারতভূমির অন্যান্য দেবালয়ের... এখানেই এর পার্থক্য। মন্দিরের গ... বেশ কিছুটা নেবে যাবার পর দেখা... একটি গহ্বর। তার ভিতরে... প্রাকৃতিক নির্ঝরিণী থেকে উঠে... *একটি ক্ষীণ জলধারা। এই... পাথরে খোদাই যোনি-প্রতীক নি... জলসিঞ্চনে সদা-আর্দ্র।*

সমাজ বিজ্ঞানীরা জানেন, জা... ইয়োডোর নিকটবর্তী একটি গহ্... উপর বিরাটাকার অথচ প্রকৃতি... পাথরে খোদাই একটি যোনির প্র... যুগ যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর... স্পর্শ ও পূজা পেয়ে আসছে।

অম্বুবাচীর তিনদিন কা... মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ থাকে। এই তি... প্রাত্যহিক পূজার্চনাও বন্ধ, কেননা... ঋতুমতী। পূর্ব ভারতের প্রতি... আসাম, বঙ্গ ও উড়িষ্যার হিন্দু র... গণের ন্যায় কামাখ্যার ঋতুকালীন... দিনের বিশ্রাম। চতুর্থ দিনে মন্দি... অর্গল খুলবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীপু... নির্বিশেষে হাজার হাজার তীর্থ... পীঠস্থান স্পর্শের জন্য অন্ধকার মন্দি... ভিতর ঘিয়ের বাতির মৃদু আলোয় সি... দিয়ে নীচে নামতে শুরু করবেন, কে... "তস্যা স্পর্শমাত্রেন পুনর্জন্ম ন বিদ্য...

ইন্দ্রজিতের আসর

রিক্সাওয়ালার কথা বলতে গিয়ে ভারি এক মজার গল্প মনে ড়ে গেল। গল্পটা আপাত-শ্রবণে বাসযোগ্য মনে হবে না; কিন্তু খাঁটি ত্য কথা। আমাদের বন্ধুমহলে গল্পটি হুপ্রচারিত। বলছি, শুনুন। একবার মাদের এক বন্ধু এক বিষম জরুরী াপারে রিক্সা ভাড়া করেছিলেন। জরুরী নগেজমেণ্ট, কিন্তু আড্ডায় এমন জমে য়েছিলেন যে, সে কথা তিনি বেমালুম লে গিয়েছিলেন। যখন মনে পড়ল, ন সময় মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকী ক গন্তব্যস্থলের ব্যবধান ছ' সাত মাইলের কম নয়। অন্য কোন যানবাহনের ব্যবস্থা নেই, একমাত্র রিক্সা, তাও হাতে-টানা। এনগেজমেণ্টটি এমন জরুরী যে, না গেলেই নয়। রিক্সাওয়ালাকে বললেন, পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে তাঁকে পৌঁছে দিতেই হবে। যথাসময়ে পৌঁছে দিতে পারলে ভাড়ার উপরে পাঁচ টাকা বক্‌শিশ মিলবে। রিক্সাওয়ালা রাজি হয় না, বলে, ঠিক সময়ে কিছুতেই পৌঁছোনো যাবে না। বললে কি হবে, বাবু কিছুতেই ছাড়বে না। বাবুটির মেজাজও বড় সুবিধের নয়। অগত্যা রিক্সাওয়ালাকে রওনা হতে হ'লো। অর্ধেক পথ আন্দাজ গিয়ে গলদ্‌ঘর্ম। বললে, বাবু, আমার বক্‌শিশের প্রয়োজন নেই, ঠিক সময়ে আমি পৌঁছোতে পারব না। কার কথা কে শোনে। বাবু চেঁচিয়ে বলছেন, পারবে না কি, আলবৎ পারবে। রিক্সাওয়ালা কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, বাবু, মাপ করুন, ও আমার দ্বারা হবে না। আর বাক্যব্যয় না করে বাবু রিক্সা থেকে লাফিয়ে নেবে পড়লেন, হবে না কি রে? বেশ, হয় কি না হয় দ্যাখ, তুই রিক্সায় বোস্, আমি টানছি। বলে আর কোন কথা নেই, এক রকম জোর করেই রিক্সাওয়ালাকে রিক্সায় বসিয়ে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে রিক্সা নিয়ে ছুটতে লাগলেন। আমাদের বন্ধুটি গায়ে যথেষ্ট শক্তি রাখেন। প্রচণ্ড ফূর্তিতে রিক্সা টানছেন আর চেঁচাচ্ছেন, দেখছিস্ তো এবার তোর রিক্সা পক্ষীরাজের মতো ছুটছে। বললে বিশ্বাস করবেন না, একেবারে ঘড়ি ধরে ঠিক সময়ে রিক্সা এসে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেল। শীতের দিনেও ভদ্রলোকটি ঘর্মাক্ত কলেবর; কিন্তু ফূর্তির অন্ত নেই। পকেট থেকে টাকা বের করে বিজয়ী বীরের মতো বল্লেন, এই নাও ভাড়া, আর এই তোমার পাঁচ টাকা বক্‌শিশ। কেমন, বড় যে বলছিলি, ঠিক সময়ে আসতে পারবি না, এই তো এসে গেছিস্। পেছন ফিরে তাকাবার আর অবসর নেই। ছুটে গিয়ে সম্মুখের বাড়িতে ঢুকে পড়লেন। রিক্সাওয়ালা হতভম্ব। শুধু তাই নয়, বাবুর রকম-সকম দেখে রিক্সাওয়ালার বিষম ভয় লেগে গিয়েছিল। হাতে-টানা রিক্সার যে এমন প্রচণ্ড গতি হতে পারে রিক্সাওয়ালা হয়েও একথা তার মনে ছিল না। তার গোড়া-গুড়িই সন্দেহ হয়েছিল, বাবুটি ঠিক প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নেই।

তা সে সন্দেহটা বোধকরি অমূলক নয়। আমাদের বন্ধুটির অল্পবিস্তর

ট গল্প

কায়কল্প—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়; [illegible] অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং [illegible] ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। [illegible] টাকা।

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় একজন প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক সে-কারণ শ্রদ্ধাভাজন। তাঁর কাছে প্রত্যাশাও আমাদের [illegible], কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আলোচ্য [illegible] কোনোক্রমেই সে-প্রত্যাশার পরিপূরক [illegible] এই বইখানার মধ্যে তিনি এমন নতুন [illegible] দিতে পারেন নি যা তাঁর কাছ থেকে [illegible] গেছে। এর সব-কিছুই [illegible] তিনি আমাদের পরিবেশন করেছিলেন [illegible] ও যোগ্যতরভাবে। 'কায়কল্প' [illegible] লেখকের সাম্প্রতিকতম ছোটগল্পের [illegible] মোট এগারোটি গল্প স্থান [illegible]।

[illegible] সম্বন্ধে উদারভাবে বিচার করলেও [illegible] না হয়েই পারে না যে, বইখানির [illegible] অভাব নেই, [illegible] আশানুরূপ ভালো গল্পের। [illegible] বিভূতিবাবুই এক সময়ে আমাদের [illegible] আশ্চর্য [illegible], কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে যে, তাঁর [illegible] রচনা বাদ দিলে বাকী যে [illegible] থাকে তার বেশীর ভাগই [illegible] মনের কাছে আবেদন [illegible] হয়। কারণ তিনি অনেক [illegible] রস পরিবেশন করেন ও মোটা [illegible] নেন। সেটা যাঁরা বরদাস্ত [illegible] না তাঁরা অভিযোগ করে বলেন [illegible] স্থূল; এতে রুচিবান মানুষ [illegible] বিরক্ত হয়। আবার কেউ কেউ [illegible] আছেন যাঁরা এতেই তুষ্ট হন অর্থাৎ [illegible] সুলভ অতিকৃতি যাঁদের হাস্য-[illegible] উদ্রিক্ত করতে পারে তাঁরা এ'কে সমর্থন

'করে বলেন—এই আপাতস্থূল ব্যঙ্গের অন্তরালে যেটুকু বেদনা প্রচ্ছন্ন আছে সেটুকু কৃত্রিম নয়, যথার্থ; সেটুকুই তো চিত্তস্পর্শী, এর যা-কিছু মূল্য সেখানেই তো নিহিত। এখানে বলা বাহুল্য, যদের ভালো লাগে না তারাও খানিকটা ঠিক বলেন, আবার যাঁদের ভালো লাগে তাঁরাও খানিকটা ঠিক বলেন। এক্ষেত্রে সত্য এ-দুয়েরই মাঝখানে সমন্বিত আছে।

অন্যপক্ষে এ-বইয়ের দু' তিনটি গল্প ব্যর্থ, বাকিগুলি মাঝারি। মাঝারিগুলির মধ্যেও অবশ্যই তারতম্য আছে। বিশেষ করে নামগল্পটিই ব্যর্থ গল্পগুলির অন্যতম। 'কালিকা' গল্পটিও শেষ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হলো না। উত্তরোত্তর বেশ রোমাঞ্চকর হ'য়ে উঠতে-উঠতেও শেষটা সবটাই কিম্ভূতমাৎ হ'লো। তবে 'দাদুর সমস্যা' নিছক মিষ্টি গল্প। 'কালস্য গতিঃ' গল্পটিও ভালো লাগলো। 'রাণুর প্রথম ভাগ'-এর সুদক্ষ শিল্পীর চকিত দেখা এর মধ্যেই যেন পাওয়া যায়। লেখকের ভোম্বল রাণুকে মনে পড়িয়ে দেয়। বাক্তিবিশেষের কাছে 'আর্ট' গল্পটিই সবচেয়েই ভালো লাগবে। এর গল্পাংশ বিশেষ কিছুই নয়, কিন্তু প্রকাশ-ভঙ্গী সুন্দর। এর মধ্যে লেখকের ব্যক্তি-মানসের যে-সব বেদনা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ও অন্তরঙ্গভাবে ফুটে উঠেছে, সেটাই যথার্থ প্রাণস্পর্শী। 'বিড়ম্বনা' গল্পটি কোনো-প্রকারে চলনসই। 'সম্পদের বিপদ', 'আর্ট', 'দাদুর সমস্যা', 'ভক্ত' ও 'লেখক' এই পাঁচটি গল্পকেই মোটের ওপর ভালো বলতে পারা যায়। এমন বেশি কিছু না হলেও অন্তত একজন পাকা শিল্পীর হাতের স্পর্শটুকু আছে। 'ফুটবল লীগ'ও মন্দ নয়।

ছাপা, বাঁধাই ভালো। প্রচ্ছদসজ্জা মোটামুটিরকম। ২৩২।৫৪

উপন্যাস

সমাজ—রমেশচন্দ্র দত্ত। শ্রীসৌরীন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় দেবসাহিত্য কুটীর, ২২।৫, ঝামাপুকুর লেন হইতে প্রকাশিত। দাম—২, টাকা।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী যুগের ঔপন্যাসিক-দের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্তের একটি বিশিষ্ট আসন আছে। রমেশচন্দ্র কয়েকটি ঐতিহাসিক এবং অল্প কটি সামাজিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'সমাজ'। বইটি আজকাল সাধারণ পাঠকের হাতে দেখি না---হয়ত আধুনিক কালের অনেকেই এ বইয়ের অস্তিত্বও জানেন না। রমেশচন্দ্রের 'সমাজ' নবপর্যায়ে প্রকাশ করে দেব-সাহিত্য কুটীর অতি উত্তম কাজ করেছেন। বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

২৭২।৫৪

নীল আলো—নীহাররঞ্জন গুপ্ত। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য—২৷৹।

'নীল আলো' রহস্য-উপন্যাস। নীহার-বাবু এই ধরনের উপন্যাস রচনায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসটির কাহিনী তেমন আকর্ষণীয় নয়। এর বিন্যাসের মধ্যেও যথোচিত সাসপেন্স্ রাখা হয়নি। তাছাড়া তিন বন্ধু এবং মণিকার মধ্যে সম্পর্কটিকে নিয়ে যে রহস্য আরও ঘনীভূত করা উচিত ছিল, তার অভাব দেখলাম। সুবালা চরিত্রটি প্রথম দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও পরে অন্যান্য চরিত্রের মত হতাশ করে। 'নীল আলো' আরও অনেক ভাল হওয়া উচিত ছিল। তবে যাঁরা রহস্য-কাহিনীর ভক্ত এবং নীহারবাবুর লেখার, তাঁদের এই বইটি একেবারেই যে নিরাশ করবে তা নয়। বইয়ের ছাপা, বাঁধাই ভাল। ১৭৪।৫৪

অনুবাদ সাহিত্য

জীবনযাত্রী—জর্জ দুয়ামেল। অনুবাদ—শান্তি রায়। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ; ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট; কলিকাতা—১২। মূল্য—৩৸৹ আনা।

ফরাসী ঔপন্যাসিক জর্জ দুয়ামেলের সর্বাধুনিক গ্রন্থ La voyage de Patrice Periot (পাত্রিস পেরিওর জীবনযাত্রা)-এর অনুবাদ "জীবনযাত্রী"। আঁদ্রে জিদ কিংবা জাঁ-পল্ সার্ত্র-এর মত জর্জ দুয়ামেল আধুনিক কালের সাহিত্যিক হলেও ও'দের দুজনের মত আমাদের কাছে পরিচিত নন—এমন কি, ফাঁসোআ মরিয়াকের মতও নন। তবু ফরাসী সাহিত্যে জর্জ দুয়ামেলের স্থান বেশ উঁচুতেই। সারা পৃথিবীতে—ফ্রান্সেও—যখন বিভিন্ন গোষ্ঠীগত আদর্শ সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার ক'রে চলেছে, সেই সময় যে ক'জন সাহিত্যিক মানুষের উপর মানুষের তৈরী অনুশাসনকে শ্রেয় না মনে করে 'সবার উপর মানুষ সত্য'—একথা বলে চলেছেন—স্নেহ-প্রেমের মত কোমল মানসিক বৃত্তিগুলির উপর প্রাধান্য দিয়ে মানুষে মানুষে বন্ধুত্বের, ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপনের মহান প্রয়াস ক'রে চলেছেন সাহিত্যের মাধ্যমে, জর্জ দুয়ামেল তাঁদের অগ্রণীতম না হলেও অন্যতম অগ্রণী।

জর্জ দুয়ামেলের লেখার বৈশিষ্ট্য—তাঁর সরলতা ও গভীর বিশ্লেষণ। আলোচ্য বইটিতেও তার পরিচয় সর্বত্র। অবশ্য, এজন্য মাঝে মাঝে বইটি একঘেয়ে লাগলেও সারা বইটির মাঝে সর্বত্র যে একটি শান্তি-কামী আত্মার হার্দ্য কাতরতা ধ্বনিত হয়ে চলেছে, তার জন্যই বইটি সকলের ভালো লাগবে।

অনুবাদক শান্তি রায়ের এইটিই বোধ হয় প্রথম অনূদিত গ্রন্থ। সে হিসাবে তাঁর অনুবাদ ভালোই বলতে হবে। তবে সম্প্রতি আমাদের অনুবাদ সাহিত্যের আগের তুলনায় যে পরিমাণ অগ্রগতি হয়েছে, তাতে "জীবন-যাত্রী"র অনুবাদ আরও স্বচ্ছ এবং সাবলীল হলেই তার সমপর্যায়ের দাবী করতে পারতো।

১৪৫।৫৪

জীবনী

শরৎচন্দ্রের রাজনীতিক জীবন—শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়। গুপ্ত ফ্রেন্ডস এন্ড কোং, ১১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২, টাকা।

লেখক বাংলার অসহযোগ আন্দোলন যুগের একজন খ্যাতনামা কর্মী। সুদীর্ঘ-কাল শরৎচন্দ্রের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভিজ্ঞতা অবলম্বন করিয়া পুস্তক-খানি লিখিত হইয়াছে। কথাশিল্পী স্বরূপেই শরৎচন্দ্রের সর্বজনীন খ্যাতি, তাঁহার রাজ-নীতিক জীবন সম্বন্ধে সকলে বিশেষ পরিচিত নহেন। আলোচ্য পুস্তকখানিতে লেখক সেই অভাব মোচন করিয়াছেন। ঔপন্যাসিক শরৎ-চন্দ্র এবং রাজনীতিক শরৎচন্দ্র, ভাবাদর্শের দিক হইতে বাস্তবিক এতদুভয়ের পার্থক্য নাই। বাংলার জল, বায়ু, মাটি এবং বাংলার নর-নারীর দরদে একান্ত দরদী শরৎ-চন্দ্রের রাজনীতিক জীবনের এই আলেখ্য বাংলার রাজনীতিক সাধনার বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। পুস্তকখানি পাঠে বাংলার রাজনীতিক আদর্শের মূলগত ভাবধারার নিবিড় স্পর্শ মনের উপর আসিয়া পড়ে, শরৎচন্দ্রকে আমরা আমাদের মনের মানুষ স্বরূপ পাই।

২৯০।৫৪

ধর্মগ্রন্থ

শ্রীশ্রীগুরু প্রসাদে—অনন্তগোপাল সেন-গুপ্ত প্রণীত। কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী কর্তৃক ৩৯, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৷৹ আনা।

পুস্তকখানি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে লেখক স্বয়ং গ্রন্থকার। তিনি শ্রীমৎ রামদাস বাবাজীর সহিত তাঁহার দর্শন এবং তাঁহার কৃপালাভের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। আন্তরিক ভক্তি রসে তাঁহার লেখা মধুর হইয়াছে, বর্ণনা-ভঙ্গীটিও সুন্দর। পুস্তকের দ্বিতীয় অংশ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর কর্তৃক লিখিত। লেখক শ্রীমৎ রামদাস বাবাজীর জীবন-লীলার ভাবঘন সংবেদনটি অতীব সুন্দর ভাষায় সরসভাবে উপস্থিত করিয়াছেন। উপসংহারে 'শ্রীরামদাস দশকম্' শীর্ষক সংস্কৃত শ্লোকে বাবাজী মহারাজের বন্দনা পরিবেশিত হইয়াছে। ভক্তিরসপিপাসু নরনারী পুস্তক-খানি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন।

২৯২।৫৪

বৈশেষিক দর্শন—সুখময় ভট্টাচার্য প্রণীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৷৷৹ আনা।

পুস্তকখানি বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহের অন্যতম। বাংলা দেশে বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায় এই কয়েকটি দর্শনের আলোচনাই সমধিক। ফলতঃ কনাদের বৈশেষিক দর্শনের পরিচয় পণ্ডিত সমাজের বাহিরে অনেকেই রাখেন না। সূক্ষ্ম বিচারমূলক বলিয়া বৈশেষিক দর্শন অনেকের পক্ষে দুর্বোধ। পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বৈশেষিক ভাষ্য পণ্ডিত সমাজে সুপরিচিত। পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন এই দর্শনে একটি টিপ্পনী রচনা করিয়া বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। অন্য ক্ষেত্রে এই দর্শনের সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয় নাই। আলোচ্য পুস্তকখানিতে সংক্ষেপে অথচ সহজ ভাষায় এই দর্শনের তাৎপর্য ব্যক্ত করা হইয়াছে। পুস্তকখানি বাঙ্গালী সমাজের চিন্তাশীলতা উদ্রিক্ত করিতে সাহায্য করিবে।

২৫৯।৫৪

চণ্ডীমঙ্গলের গল্প—কালকেতু। শ্রীপ্রহ্লাদ-কুমার প্রামাণিক প্রণীত। শ্রীঅশোককুমার প্রামাণিক কর্তৃক ১৫-এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৸৵৹ আনা।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী অবলম্বন করিয়া লিখিত। গ্রন্থকার সহজ সরল ভাষায় চণ্ডী-মঙ্গলের গল্প বিবৃত করিয়াছেন। কবি-কঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল প্রাচীন সাহিত্য হিসাবে

শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকখানি পাঠ করিয়া কিশোর-কিশোরীরাও ...দের বিষয়বস্তুর সংগে পরিচিত ...তে পারিবে এবং বাংগলা দেশ এবং ...লী জাতির সর্বাংগীণ জীবনের ...ন্নির পথ তাহাদের প্রশস্ত হইবে। ...র সুন্দর চিত্রের দ্বারা পুস্তকখানি ...শোর-কিশোরীদের পক্ষে আকর্ষণীয় করা হইয়াছে।

২৭১।৫৪

বিধ

আয়ুর্বেদের ইতিহাস — শ্রীবিজয়কালী ...চার্য প্রণীত। বঙ্কিম প্রেস, ১১৮।২, ...বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—২, টাকা।

...লেখক শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের ...। তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। ...বেদ সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত বহু গ্রন্থ ...জ্ঞ সমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ...লা পুস্তকখানিতে তিনি ঋষিদের যুগ ...তে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ...র্বেদ শাস্ত্রের ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। ...তে বিভিন্ন দেশে কিভাবে ...আয়ুর্বেদের বিস্তার ঘটিয়াছিল, ...পুস্তকখানিতে মূল্যবান তথ্য ...। গ্রন্থকারের মতে বৌদ্ধ-...হইতে বহির্ভারতে আয়ুর্বেদের ...প্রসার আরম্ভ হয়। বৌদ্ধ-...পরে তাহা সমধিক ব্যাপক ...করে। পুস্তকখানি গ্রন্থকারের ...পাণ্ডিত্য এবং অনুসন্ধিৎসার পরি-...আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে আগ্রহ সম্পন্ন ...পুস্তকখানি পাঠে উপকৃত হইবেন।

২৯৯।৫৪

গ্রন্থাগার—শ্রীবিমলকুমার দত্ত প্রণীত। ...গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, ...। মূল্য—৷৷৹ আনা।

শিক্ষা বিস্তার এবং প্রসারের পক্ষে ...রের প্রয়োজনীয়তা সর্বজনস্বীকৃত। ...আমাদের দেশে গ্রামে ও সহরে ছোট ...নানা প্রকার গ্রন্থকার গড়িয়া উঠিতেছে। ...পরিচালনার শৃংখলা এবং বিজ্ঞান-...পদ্ধতিতে সেগুলি কর্ম-বিন্যাস-...পুস্তকখানিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। ...র গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যে ...লিয়া, ইংলণ্ড ও আমেরিকা পরিভ্রমণ ...যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, ...কখানি প্রণয়নে তাহা সাহায্য করিয়াছে। ...গার পরিচালনার ক্ষেত্রে পুস্তকখানি ...ভাবে কাজে আসিবে।

১৬১।৫৪

...ন্দু নারীর আবেদন—শ্রীকনকলতা ঘোষ ...। কথা সাহিত্য মন্দির, ১৬।এ, ডাফ ...কলিকাতা। মূল্য ।৹ আনা।

লেখিকা পুস্তকখানিতে সমাজের নৈতিক ...জীবনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া-ছেন। তাঁহার মতে সর্বত্রই প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া আবশ্যক এবং প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর নারী ও পুরুষের শিক্ষার ধারাকে আপনাপন জীবনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইতে দেওয়া কর্তব্য। লেখিকার অভিমত বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।

৩০০।৫৪

শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন—অধ্যাপক অমিয় মজুমদার প্রণীত। 'কিশোর কল্যাণ কেন্দ্র', ১৩।২, কাটাপুকুর রোড, বাই লেন, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।৹ আনা।

শিশুদের মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে গ্রন্থকারের লিখিত কয়েকখানা পুস্তক ইতঃপূর্বে সমাদর লাভ করিয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানি শিশু-লালনী গ্রন্থমালার ষষ্ঠ পুস্তিকা। শিশুদের অভিভাবক এবং অভিভাবিকাগণ পুস্তকখানি পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। শিশুদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনের সম্বন্ধে অধ্যাপক অমিয়বাবুর পরামর্শ মনোবিজ্ঞানসম্মত এবং মূল্যবান।

২৮০।৫৪

নববর্ষ (বার্ষিকী ১৩৬১)—হরি গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। "নববর্ষ" কার্যালয়; ১৯, নূর মহম্মদ লেন; কলিকাতা—৯। মূল্য—দুই টাকা।

সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কিত বার্ষিকী "নববর্ষ"র এটি দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬০ সালে। তখনই এই সুন্দর বার্ষিকীটির জন্য এর সম্পাদক ও প্রকাশক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা কর্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত হন। এই খণ্ডটিও গতবারের মত সকলের অভিনন্দন লাভে সমর্থ হবে বলে আমাদের ধারণা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখের কয়েকটি অপ্রকাশিত চিঠি—নরেন্দ্রনাথ মিত্র, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের গল্প—ডাঃ কালিদাস নাগ, অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও নারায়ণ চৌধুরীর প্রবন্ধ—প্রেমেন্দ্র মিত্রের গান এবং নরেন্দ্র দেব, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখের কবিতা এই খণ্ডের প্রধানতম আকর্ষণ। আয়তনের তুলনায় "নববর্ষ"র দাম বেশ সস্তা এবং প্রচ্ছদপট দৃষ্টিপ্রিয়।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

চার-ইয়ারি কথা—প্রমথ চৌধুরী
উপলমুখর—অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়
জোটের মহল—অমরেন্দ্র ঘোষ
আরাকান—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
অসাধারণ—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কাছের যারা—শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
নার্সারি স্কুলের শিক্ষা-প্রণালী—যূথিকা চট্টোপাধ্যায়
বাংলা-পড়ানোর নূতন পদ্ধতি—শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়।
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার নববিধান (ঔষধ অংশ)—১ম খণ্ড—ডাঃ গিরীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়
দুই নারী—কানাইলাল মুখোপাধ্যায়
সিদ্ধার্থ — হেরমান হেসে — অনুবাদক—শীলভদ্র

ভ্রম সংশোধন

গত (৩৭ সংখ্যা) 'দেশে' পুস্তক পরিচয়ে শ্রীস্বপনকুমারের রচিত 'ওগো ছলনাময়ী' এবং 'সন্ধ্যারাগে' নামক উপন্যাস দুইটি রহস্যোপন্যাস শীর্ষে ভ্রমবশত ছাপা হইয়াছে। উক্ত উপন্যাস দুটি সাধারণ উপন্যাস-ই।

আমি ঃ আমার দেশ

সরিৎশেখর মজুমদার

'আপনার নাম?'
বহুবার এ-প্রশ্নের উত্তর দিলাম
জনে-জনে।
আদিতে বিনয়নম্র 'শ্রী' সংযোজনে
হয়নিকো ভুল কোনদিন।
পুরুষানুক্রমে-পাওয়া যে-উপাধি মাঝে
আছে মোর বংশ-পরিচয়,
তাহার উল্লেখ করি
নাম-বলা করিয়াছি শেষ।

'আপনার দেশ?'
জনে-জনে এ-প্রশ্নের দিয়েছি উত্তর
কত নিষ্ঠা লয়ে।
অমুক জেলার সেই অমুক যে রেল-ইস্টিশন,
সেথা হ'তে পাঁচ ক্রোশ দূরে,
জলজলা নদী বাঁক ঘুরে,
অমুক যে গ্রাম?
সাতপুরুষের ভিটে,
সেই হ'লো দেশ!

একই প্রশ্ন,
কিবা নাম? দেশ কোন্ গ্রামে?
আজ কিন্তু ডেকে আনে
নূতন উত্তর।

তুচ্ছ নাম গোত্র নয়
নয় ভুয়া উপাধি-গৌরব।
আমি আর সীমাবদ্ধ 'আমি' শুধু নই,
আরও বড় মহত্তর কিছু—

অনন্তকালের আমি।
প্রাণসমুদ্রের পানে চিরবহমান
গতিশীল ধারা এক,
মানুষ আমার নাম।

জগতের মানচিত্রে তুচ্ছ বিন্দুসম
ক্ষুদ্র কোনো গ্রাম; কোনো দেশ।
কাল্পনিক রেখা আঁকা
জেলা তালুকের সীমানা।
পরিক্রমা শেষে
খুঁজিয়া পেলাম মোর
সেই আদি পুরাতন দেশ
বিশ্বচরাচর যার নাম।

মানুষ আমার নাম,
দেশ,—ত্রিভুবন।

প্রতিহিংসা

অংশুপতি দাসগুপ্ত

ভুলে যাব আমি নিশিদিন এই মিথ্যা শোক,
শুধু যদি তুমি ফিরে দাও মোর এ-দুটি চোখ।
তোমার রূপের পিয়াসী যাহারা
ছিল এতদিন, কোথায় তাহারা—
দেখে চারিদিক মনে হয় এতো শুধু নরক।
তবে রেখে দাও, এই দুটি আঁখি তোমারি হোক।

দেবে নাকি তুমি ফিরিয়ে আমার ভগ্নপ্রাণ?
যে হৃদয় নিয়ে খেলেছ, ক'রেছ মহাশ্মশান—
করেছ যে মন ব্যথায় জীর্ণ,
ধূলিলুণ্ঠিত শতধাদীর্ণ—
আজ আর তাহা পারে না তো নিতে কাহারও দ
তবে রেখে দাও ক্রূরমুষ্টিতে ক্লিষ্ট প্রাণ।

তবু ফিরে দাও ভগ্নহৃদয়—এ-দুটি চোখ;
তোমারও ললাটে প্রবঞ্চিতের আকুল শোক।
আঘাতে আঘাতে ও হৃদয়খানি—
ভেঙে ভেঙে যাবে নিশ্চয় জানি;—
ভাঙা বুকে মোর জাগিবে সেদিন সুষমালোক।
তোমার কান্না দেখে নেব ভ'রে এ-দুটি চোখ।

[সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত একটি ইংরেজী কবিতা অবলম্বনে]

রঙ্গজগৎ

—শৌভিক—

কৃত্রিমতাকে যতোই ঝকঝকে ভাষার মোড়কে জড়িয়ে রাখা যাক্ না ন, তার প্রাণহীনতাটা অব্যর্থ ফুটে রবেই। আর যা কৃত্রিম তা আবেগের থেকে স্বতঃই দূরে সরে থাকে। যদি না হ'তো তাহ'লে সুকুমার দাশগুপ্তের নতুন ছবি "সদানন্দের মেলা" ছবির মতো ছবি ব'লে গণিত হয়ে ওঠায় আর কোন পেতো না। সবই থেকেও কিছুই পাওয়া গেল না ছবিখানি তার কারণ গল্পের ধাঁচটা কৃত্রিম শুধু নয়, ছাঁদটাও বিদেশী কোন বিলিতি ছবি থেকে চরিত্র ও ঘটনাকে বেছে নিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করা তাই এতে আবেগকে এড়িয়ে যেন একটা ভাব। বিষয়বস্তুর একটা অবশ্যই আছে— পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্তের গুণ। বরাবর সব ছবিতেই দাশগুপ্ত কোন না কোন একটা থেকে মানুষের হৃদয়ের এবং মানুষের এক একটা দিকের সামনে এনে দিয়েছেন। আমোদের মনের কণ্ঠে একটা নতুন সুর দিকে তিনি নজর দিয়ে এতাবৎকাল পর্যন্ত। "সদানন্দের সেদিক থেকে কোন ব্যতিক্রম না। কিন্তু ঠিক যে এর বক্তব্যটা কি ছেঁকে সামনে তুলে ধরতে নি। নানা ব্যাপারে তা জড়িয়ে ছে। এতে পাওয়া যায় এক লোকের পরিচয় যারা নিজেদের জীবনের জিদে পারিবারিক জীবনের ও কর্তব্য একেবারে উপেক্ষা করে। আবার গৃহসমস্যা নিয়েও কথা হয়েছে; কেউ বাড়ির অভাবে দিন কাটায়, আবার কারুর বা প্রাসাদ খালি পড়ে থাকে। এর মানবিক আবেদন যথেষ্টই রয়েছে বন্দের ঢঙে কষ্টকল্পনায় গড়ে নেওয়া চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশে বেদনের অন্তস্পর্শী ক্ষমতাটা প্রায় পেয়ে গিয়েছে, অথবা অন্তরে পৌঁছলেও অত্যন্ত আলতোভাবে ছুঁয়ে চলে যায়।
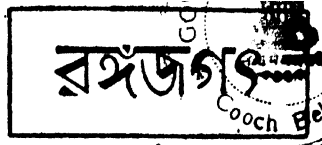
* * *

গৃহসমস্যা নিয়ে গল্পের আরম্ভ। গুণী সংগীতজ্ঞ সদানন্দ চক্রবর্তী কিছু-কাল বাইরে থেকে ঘরে এসে দেখলে তার ভাঙা বাড়িতে তারও প্রবেশ নিষেধ। বাড়িটা বিপজ্জনক ব'লে ওটা ভেঙে ফেলার আদেশ হয়েছে; সামনে পুলিশ মোতায়েন। অগত্যা বেহালাটি হাতে নিয়ে সদানন্দ গিয়ে বসলো পার্কে। একটা বিড়াল ছানা হ'লো তার ক্ষণিকের সংগী। বিড়ালের আকর্ষণে ওখেনে এসে দাঁড়ালো ছোট্ট মেয়ে মিনু; মিনুর খোঁজে ওখানে এলো তার মা আর দাদা অজিত। বিড়াল ছানাটি মিনু উপহার পেলে। এই সময় সদানন্দের সাথে ওদের আলাপ হ'লো; জানতে পারলে বাড়ির অভাবে মিনুদের ফুটপাতে আড়াল করে দিন থাকতে হচ্ছে। ওদের কষ্ট সদানন্দের মনে লাগলো। সদানন্দ তার সাধের বেহালা বন্ধক রেখে টাকা জোগাড় করে মিনুদের জন্যে বাড়ির ব্যবস্থায় বেরিয়ে পড়লো। সামনে পড়লো এক অট্টালিকা; মালিক দক্ষিণারঞ্জন দিল্লীর এক বিরাট ইন্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশনের হর্তাকর্তা। দিল্লীতেই থাকেন তিনি। সদানন্দের মাথায় এক বুদ্ধি এলো। নিজেকে সে-অট্টালিকার সরকার দরোয়ানের কাছে দক্ষিণারঞ্জনের সহপাঠি বলে পরিচয় দিয়ে সদানন্দ সরকারকে ছুটি দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলে; তারপর নিয়ে এলো মিনুদের। এই হ'লো মেলার পত্তন।

* * *

দক্ষিণারঞ্জন নিজের কাজে এতো লিপ্ত যে, স্ত্রী ও কন্যা সম্পর্কে তার যেন চেতনাই ছিল না। কিন্তু চেতনা হ'লো যেদিন কন্যা শীলার হস্টেল থেকে পাঠানো টাকা ফিরৎ এলো আর সেই সঙ্গে

উষাকিরণ—কয়েকখানি আগামী ছবিতেই তাকে দেখা যাবে তার মধ্যে অন্যতম অমিয় চক্রবর্তী'র "বাদশাহ"

খাজা আহমদ আব্বাসের "মুন্না"তে বেবি নাজ ও রোমি

এই চিঠি যে শীলা তার বাবার কাছ থেকে কোন সাহায্য না নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে এবং তাই সে আত্মগোপন করে থাকবে, তাকে যেন খোঁজ করা না হয়। শীলা তার মাকে কাশী যাত্রা করিয়ে এসে উঠলো তাদেরই সেই অট্টালিকায় যেখানে সদানন্দরা আস্তানা করে নিয়েছে। শীলাকে সদানন্দ তাদেরই মতো এক হাঘরে মনে করে তাকে স্বাগতম জানালে। প্রথমে শীলা নিজেরই বাড়িতে পরবাসীর মতো আচরণ লাভ করে ক্ষিপ্ত হ'লো, পরে অবশ্য নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন করে মেলারই একজন হয়ে রইলো। ঠিক হ'লো মেলাটা চালাবে সকলে যৌথ-ভাবে। অজিত তার উপার্জনের টাকা দেবে, সদানন্দও তার ভাগ দেবে, কিন্তু মুশকিল হ'লো শীলাকে নিয়ে। তবুও শীলা জানালে, সেও তার ভাগের টাকা দেবে উপার্জন করে এবং উপার্জন করবে গানের মাস্টারি করে। শীলার গলায় গানের কথা শুনে অজিতের ঠাট্টা মনে হলো। কিন্তু শীলা গান শুনিয়ে তার গুণের পরিচয় দিয়ে সকলকে অবাক করে দিলে। একদিন গ্রামোফোন কোম্পানীর কাছ থেকে শীলা গান রেকর্ড করার চিঠি পেলে, অথচ ক'দিন আগেই ঐ কোম্পানীই শীলাকে ভাগিয়ে দিয়েছে। গিয়ে শুনলে, গুণী ওস্তাদ সদানন্দ তার জন্যে সুপারিশ করেছে। এখানে জানানো দরকার যে, সদানন্দ এদের সকলের মামুভাই, তার নাম বা অন্য কোন পরিচয়ই শীলা বা অজিতদের কাছে অজ্ঞাত।

* * *

মেয়ের খোঁজে দক্ষিণারঞ্জন কলকাতায় এসে হাজির হলেন। এসে শুনলেন, তাঁর কলকাতার বাড়িটা কারা যেন দখল করে বাস করছে। গোড়াতেই এবাড়িতে থাকা নিয়ে অজিতের একটা সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল; পরে বাড়ি পাওয়ার রহস্যটা শেষ পর্যন্ত সদানন্দকে প্রকাশ করে দিতে বাধ্য হতে হ'লো। দক্ষিণা-রঞ্জন কলকাতায় এসে পড়ায় অজিত বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চাইলে কিন্তু তার মা তাকে বাধা দিলে। একটা কেলেঙ্কারীর আশংকা করে শীলা গোপনে তার বাবার সঙ্গে দেখা করে তাকে বাড়ি ব্যাপারে নিরস্ত হতে বললে। দক্ষিণারঞ্জন সেকথা মানতে রাজী নন। শীলা তার বাবাকে ওবাড়িতে নিয়ে এলো এই সর্ত করিয়ে যে, তিনি নিজেকে দক্ষিণারঞ্জন বলে পরিচয় দিতে পারবেন না; ওদেরই মতো একজন হয়ে ওদের সঙ্গে মিশে ওদের চিনতে হবে। শীলা তার বাবাকে এনে ছোটবেলার মাস্টার বলে পরিচয় করিয়ে দিলে। ওদের সঙ্গে নিজের বাড়িতে হাঘরে হয়ে একদিনেই দক্ষিণারঞ্জনের নাকালের অন্ত রইল না। নিজে দক্ষিণারঞ্জনের নামে ওদের কাছ থে[কে] অনেক যা তা শুনতেও হলো। পরদি[ন] দক্ষিণারঞ্জন অফিসে ফিরে গিয়ে ক[র্ম]চারীদের আদেশ দিলেন, দরওয়ান নি[য়ে] গিয়ে ওবাড়ির লোকদের বের করে দি[তে]। বেগতিক দেখে, শীলা কোথায় আশ্রয়হী[ন] হয়ে ঘুরে বেড়াবে এই সহানুভূ[তি] জানিয়ে অজিত তাকে বিয়ের প্রস্ত[াব] করলে। শীলা নিজের পরিচয় দিতে পা[রলে] না তাই, নাহ'লে একটা নগণ্য কেরা[নীর] স্পর্ধায় বেশ রুষ্ট হলো সে। মনে[মনে] কিন্তু অজিতের প্রস্তাবটা ভালোই ম[নে] করলে এবং তার সায় নিতে শী[লা] "মাস্টার মশাই"-কে কথাটা জা[নালে]। দক্ষিণারঞ্জনও প্রায় ক্ষেপে উঠলেন; কি[ন্তু] তারও তো ছদ্মবেশ। দরওয়ানেরা ... বেঁধে যথাসময়ে এলো মেলা ভেঙে দি[তে]। সদানন্দ সে সময়ে ফন্দী করে গ্রামোফো[ন] কোম্পানী থেকে লোক আনিয়ে রেক[র্ড] গান জুড়ে দিলে। ভোজপুরী দরওয়ানে[রা] লাঠি ফেলে হাতজোড় করে গানে মে[তে] উঠলো। অফিসের কর্মচারী এ[বং] মালিকের হুকুম তামিল করার জ[ন্য] দরওয়ানদের আবার উস্কে দিতে গেলো। একটা কান্ড বাঁধে বাঁধে ঠিক সেই সম[য়] দক্ষিণারঞ্জন সামনে এসে দাঁড়ালেন। দরওয়ানরা নিবৃত্ত হলো। মিনুর ত[খন] বিড়ালছানা গেছে হারিয়ে, কেঁদে এ[সে] বললে সে মামাবাবুকে। দক্ষিণারঞ্জ[ন] হুকুম দিলেন দরওয়ানদের বিড়ালছান[া] খুঁজে বের করতে। ইতিমধ্যে শীলা অ[জিতের] মাকেও ওবাড়িতে আনিয়ে রেখেছে। অ[জিতের মা] স্ত্রীকেও ওবাড়িতে দেখে দক্ষিণারঞ্জনে[র] রাগটা বেড়েই গিয়েছিল। গোলমালে[র] মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন, শীলা ও তার মা[র] পরিচয় ধরা পড়ে গেল। সদানন্দের মেল[া] এবারে ভাঙলো, যাবার আগে সে অজিতে[র] হাতে শীলার হাতটা মিলিয়ে দিয়ে গেল।

* * *

গল্পতে বেশ ভালো কথার অবতারণা করা হয়েছে। অসম ব্যাপার— কেউ বাড়ির অভাবে সপরিবারে রাস্তা[য়] রাস্তায় কাটাচ্ছে, অথচ তারই পাশে বহ[ু] অট্টালিকা খালি পড়ে রয়েছে থাকবা[র] লোকের অভাবে। অপরদিকে রয়েছে ধনোম্মাদদের দল, যারা টাকা-আনা-পাইয়ে[র]

...র নির্মজ্জিত থেকে জীবনের জমার
শূন্য করে ফেলে। কিন্তু বলবার
... এমনধারা কৃত্রিম ও অসংগত চরিত্র
ঘটনার সাহায্যে ... করা হয়েছে যে,
... অন্তরের গভীরে গিয়ে সাড়া
... পারে না। সদানন্দের মতো
... এক একজনকে দেখা যায়,
...দের প্রতিমূর্তি। সংসারের
... দুঃখ তারা হাল্কা করে দেয়।
... কেমন আবাসহীন অজিত পেলো
... দক্ষিণারঞ্জনের ভাঙা সংসারও
... যেন জোড়া লেগে গেল। এর
... ফুটে উঠেছে প্রধানত
...দের চরিত্রটির ভাবগতিকে, আর
... জন্যে কতকগুলো ঘটনা
... মধ্যে। হঠাৎ বাবার টাকা
... শীলার নিজের পায়ে
... আপন যোগ্যতায় পৃথিবীকে
... হতেই কপর্দকশূন্য হয়ে
... পড়া ব্যাপারটা সংগত নয়;
... আত্মগোপন করে থাকবে বলে
... ত্যাগ করে আসার পর
... পিতারই অট্টালিকাতে
... বা কেমন! অবশ্য ওর
... সদানন্দের মেলাতে এসে
... খানিকটা মজা উপভোগ করার
... পাওয়া গেল, কিন্তু ভাবপ্রকৃতির
... রইল কই? একটা বিরাট
... কর্পোরেশনের মালিক
...; তার একমাত্র সন্তান শীলা
... ছেড়ে যাবার কথা জানাতে তার
... অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পাগলের
... আচরণ করা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু
... সেই পাগলামীর মধ্যে থেকে পদ-
...ের ভারিক্কীয়ানাটা একেবারে লোপ
... যাবে এবং বোম্বাই ছবির নায়িকায়
... মতো বেসামাল আচরণ করতে,
... সেটা ভাঁড়ামী হিসেবে উপভোগ
... গেলেও সংগত বলে ধরে নেওয়া যায়
... অতোবড়ো ইন্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরে-
...র দপ্তর—কিন্তু দক্ষিণারঞ্জনের
... কর্মচারীরা সব যেন বুদ্ধু-
...র। বড়ো বড়ো ব্রীজ তৈরী করে
কিন্তু যেমন তার মালিক তেমনি
...র মতো এক একজন কর্মচারী।
... ভাকরা-নাঙালের যুগে পরিহাস-
...ও এমন বিসদৃশতা ভাবতে কষ্ট হয়।

আর শেষের দিকটা তো রীতিমতো গোঁজামিল। সদানন্দদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য দক্ষিণারঞ্জন হুকুম দিলেন তার পাঁচ-সাতটা মিল ফ্যাক্টরীর যতো দরওয়ান আছে, সব্বাইকে জড়ো করে বাড়ি চড়াও করতে। কার্যত দেখা গেলো এসেছে জন দশেক লোক এবং ভোজপুরী

বলে আখ্যাত করলেও একেবারে প্যাঙা চেহারার, তার ওপর হিন্দীতে কথাই ফোটে না তাদের—ওখানেই তো কৌতূহল দমে যায়। তারপর ওদেরই বশ করার জন্য সদানন্দ যে কান্ড করলে, সেটার মধ্যে যুক্তি প্রবিষ্ট করিয়ে দেবার চেষ্টা করা হলেও খাটে না মোটেই। সদানন্দ দরওয়ানদের আসবার কথা শুনেই গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে লোক আনিয়ে রামনাম গান আরম্ভ করে দিয়েছে শীলাকে দিয়ে, কারণ তার হচ্ছে অহিংস নীতি, হৃদয় দিয়ে সে বাহুকে জয় করতে চায়। আর গান শোনামাত্রই দরওয়ানরাও সুড় সুড় করে লাঠি ফেলে ভক্ত হনুমানের মতো হাতটি জোড় করে বসে পড়লো সবাই! গল্পের অভিপ্রায় যাই থাক, ব্যাপারটা এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, যাতে ওটা অহিংস নীতিকে ব্যঙ্গ করা বলে মনে হয়।

* * *

ছবিখানির মধ্যে রসিয়ে উপভোগ করার মতো জিনিস হচ্ছে ওর সংলাপ দিকটা; একটা স্বতন্ত্র 'আনন্দই' এনে দিয়েছে এবং তা কৃত্রিম ও অসংলগ্ন চরিত্র ও ঘটনাও যে শেষ পর্যন্ত সহ্য করে বসে দেখা যায়, সে গুণটা প্রধানত সংলাপের জন্যই সম্ভব হতে পেরেছে। সংলাপ রচনা করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। মণি বর্মার গল্প অবলম্বনে চিত্রনাট্য প্রেমেন্দ্র মিত্রেরই রচনা, তবে এদিককার ত্রুটির দিক নজর এড়িয়ে যায় চরিত্রগুলিকে অতি অন্তরঙ্গভাবে [illegible] করে নিতে কেমন যেন [illegible] পর্দা সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। [illegible] সদানন্দের মতো অমন একটি [illegible] পরোপকারীই শুধু নয়, সহজ জীবনকে দেখবার মতো খোলা [illegible] রয়েছে যার, তার কার্যকলাপে [illegible] উপভোগ করা যায়; কিন্তু তার উদ্দীপনার কেমন যেন অভাব—তার উচ্ছলতাহীন [illegible] যায়, তার [illegible] [illegible]

[illegible]

সুলসী চক্রবর্তী হাসির একটি ঢেউ [illegible] নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান। সদানন্দের [illegible] হা-ঘরেদের একজন হয়ে দেখা দেন [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, আর একজন [illegible] চট্টোপাধ্যায়—নৃপতি আবার বোবা। [illegible] জুড়ীতে যথেষ্ট হাসি পরিবেশন করে [illegible] আর হাসাবার জন্যে আছেন [illegible] দরওয়ানের বেশে জহর রায়। [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা গেল দক্ষিণারঞ্জনের এক জোহুকুম সহকারী [illegible] কেমন নির্লিপ্ত অভিনয়। [illegible]

জ্যোতিবাণী প্রযোজিত শরৎচন্দ্রের "সতী" কথাচিত্রে ভারতী ও অরুন্ধতী।

[অভি]নয়ে আছেন জয়নারায়ণ মুখো-[পাধ্যায়], [...] বাণী গাঙ্গুলী, পদ্মা দেবী, [...] মুখোপাধ্যায়, বিজয় বসু, শশাঙ্ক প্রভৃতি।

*   *   *

[কলা]কৌশলের দিকে অরোরা স্টুডিওর [...]তর পরিচয় পাওয়া যায়, বিশেষ [শব্]দগ্রহণের দিকে। এমন স্পষ্টভাবে [...] পর্দার শব্দযোজনা অরোরা স্টুডিওতে আর পাওয়া যায়নি। শব্দ-গ্রহণ করেছেন সমর বসু। কয়েকটি দৃশ্যে আলোকপাতের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়; নয়তো বঙ্কু রায়ের আলোকচিত্রগ্রহণও মন্দ নয়। ভালো লাগবে না সংগীতের দিকটা, বিশেষ দুখানি গানের ক্ষেত্রে। "নাই যদি কেউ শোনে, আমি বলার সুখে বলবো" এবং "হই যদি বড়োলোক মস্ত, করব কি? বল কি করব?" গান দুখানি রচনায় ক্বচিৎ এমন পাওয়া যায়; কিন্তু সুরের অপপ্রয়োগে মার খেয়ে গেছে। গানের রচয়িতা প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সুরযোজনা করেছেন কালীপদ সেন। শিল্প-নির্দেশনায় ভালো কাজ করেছেন সত্যেন রায় চৌধুরী।

"চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যাভিনয়

রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য "চিত্রাঙ্গদা"র অভিনয় সব সময়েই একটা বিশেষ আকর্ষণ এবং সে আকর্ষণ আরও বড়ো হয় যদি সে অভিনয়ের সঙ্গে রবীন্দ্র-সংগীতের খ্যাত শিল্পীদের কেউ সংশ্লিষ্ট থাকেন। গত রবিবার সন্ধ্যায় তাই সুচিত্রা মিত্র ও দ্বিজেন চৌধুরীর পরিচালনায় আশুতোষ কলেজ হলে "চিত্রাঙ্গদা"র অভিনয় শহরের রসিক-বৃন্দকে আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিল।

সমগ্রভাবে সেদিনের অভিনয় খুব মনোজ্ঞ হয়ে উঠতে পারেনি এবং সবচেয়ে বিস্ময় লেগেছিল, যেটা আশাই করা যায়নি, সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস প্রভৃতির গান, তা-ও তেমন জমতে পারেনি। অবশ্য এখানকার মঞ্চ ও হলের মধ্যে ত্রুটির জন্য শব্দের মাধুর্য অনেকটা খর্ব হবার সম্ভাবনা আছে। প্রথমা ও দ্বিতীয়া চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় যথাক্রমে ঝরণা মজুমদার ও গীতা ঘোষের নৃত্য-ভঙ্গীতে লালিত্য ফুটেছে, কিন্তু চমৎকৃত করার মতো ব্যক্তিত্বের অভাব। নৃত্য-পরিকল্পয়িতা প্রীতি ভৌমিক নিজে অবতরণ করেছেন অর্জুনের ভূমিকায়। মদনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কৃষ্ণা সেন। নাচের সঙ্গতের দিকটা বেশ ভালো ছিল, আর ভালো লেগেছিল সমবেত গানগুলি। সেদিনের "চিত্রাঙ্গদা" পরিবেশনে অন্যান্য বিভিন্ন কুশলীবৃন্দের মধ্যে ছিলেন মঞ্চ পরিকল্পনায় রবি সেন ও ধ্রুব মিত্র; সজ্জা পরিকল্পনায় অমলা সরকার ও সুকৃতি চক্রবর্তী ও আলোক-সম্পাতে তাপস সেন।
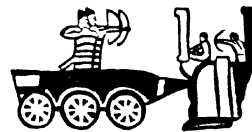
খেলার মাঠে

একলব্য

আগামী সপ্তাহে প্রায় একই সঙ্গে ভ্যাংকুভারে আরম্ভ হচ্ছে ব্রিটিশ এম্পায়ার এবং কমনওয়েলথ গেমস আর বুদাপেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠান। এম্পায়ার গেমের অনুষ্ঠানকাল ৩০শে জুলাই থেকে ৭ই আগস্ট। আন্তর্জাতিক বিশ্ব-বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা একদিন পরে অর্থাৎ ৩১শে জুলাই আরম্ভ হয়ে ৮ই আগস্ট শেষ হচ্ছে। ভ্যাংকুভার কানাডার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর আর হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেস্ট। দুটি দেশের রাজনৈতিক মতবাদের মত এ দুটি ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজনও যেন পরস্পরবিরোধী। খেলাধুলার উদ্দেশ্য শুধু শারীরিক উন্নতি সাধন বা দৌড়-ঝাঁপের সাফল্য থেকে আত্মসান্ত্বনা লাভ নয়, পরস্পরের মধ্যে প্রীতি বিনিময়, ভাবের আদান-প্রদান এবং সৌভ্রাত্র বন্ধন দৃঢ় করাই আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ভ্যাংকুভার এবং বুদাপেস্টের পরস্পরবিরোধী ক্রীড়ানুষ্ঠান যেন সেই মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি কটাক্ষ হানছে। অবশ্য এম্পায়ার গেমস শুধু ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির প্রতি-নিধির জন্য সীমাবদ্ধ। তবুও এম্পায়ার গেমের আন্তর্জাতিক রূপ অস্বীকার করা যায় না। আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়ানুষ্ঠান সম্পর্কেও একথা বলা চলে। কমনওয়েলথ-ভুক্ত দেশের প্রতিনিধির বুদাপেস্টের ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানের কোন বাধা আছে কি? তবে দুই ক্রীড়ানুষ্ঠানে পরস্পরবিরোধী সময়ের ব্যবস্থা কেন? যাই হোক, দুই ক্রীড়ানুষ্ঠানেই ভারতের প্রতিনিধিবৃন্দকে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যাবে। ভারতের প্রতিনিধি বিদেশে দেশের সম্মান বৃদ্ধি করুক এই কামনা করি।

*　　*　　*

১৯১১ সালে পরলোকগত রাজা পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেকের সময় এম্পায়ার গেমের প্রথম সূচনা। রাজ্যাভিষেকে নানা আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ হিসাবে লণ্ডনে খেলাধুলারও আয়োজন করা হয়। কয়েকটি দেশের অপেশাদার প্রতিনিধি প্রথমবারের এম্পায়ার গেমে অংশ গ্রহণ করে। এর পর সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয় প্রথম মহাযুদ্ধের সমরানল। এম্পায়ার গেমের প্রচার এবং প্রসারও বন্ধ থাকে। [illegible] এমনই [illegible] অলিম্পিকের পর [illegible] মাঠে [illegible] দেশগুলির অলিম্পিকের জন্য উৎসাহ [illegible] তাই শান্তির পরিবেশের মধ্যে স্থির হলো অলিম্পিক গেমের মধ্যবর্তী হিসাবে প্রতি ৪ বছর অন্তর এম্পায়ার গেম পরিচালনা করা হবে। ১৯৩০ সালে কানাডার হ্যামিল্টন শহরে এম্পায়ার গেমের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ১৯৩৪ সালে পুনরায় লণ্ডনের হোয়াইট সিটিতে এবং ১৯৩৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার সিডনী শহরে এম্পায়ার গেমের চতুর্থ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবার পর আবার বিশ্বব্যাপী সমরানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠে। ১৯৫০ সালে নিউজিল্যাণ্ডের অকল্যাণ্ডে শেষবার এম্পায়ার গেম পরিচালিত হয়। ১৯৫০ সালের অনুষ্ঠানে ১৫টি দেশ যোগদান করেছিল, কিন্তু এবার ভ্যাংকুভারে অনুষ্ঠানে তার দ্বিগুণ সংখ্যক দেশ অংশ গ্রহণ করছে।

এম্পায়ার গেমের সাফল্যের জন্য ভ্যাংকুভার [illegible] জোড় করেছেন [illegible] এমন আয়োজন [illegible] অলিম্পিকেরই [illegible] নতুন [illegible] এবং [illegible] ক্রীড়ানুষ্ঠানের [illegible] [illegible] হবে [illegible]।

*　　*　　*

[illegible] সময় আন্তঃরাজ্য বা জাতীয় ফুটবল প্রতি-যোগিতা [illegible] রাখবে। এবার মাদ্রাজ ফুটবল [illegible] জাতীয় ফুটবলের পরিচালক। [illegible] বাসীদের ভারতের সমস্ত [illegible] ফুটবল খেলোয়াড়দের খেলা দেখার [illegible] ঘটবে। সমস্ত প্রদেশই [illegible] সমন্বয়ে দল পুষ্ট করে অনুশীলন [illegible] করে দিয়েছে; কিন্তু বাঙ্গলার কর্তৃপক্ষ [illegible] চূড়ান্তভাবে দল গঠন করতে পারেন নি। বাঙ্গলার ২২ জন খেলোয়াড়কে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন করা হয়েছে। ট্রায়াল খেলার পর চূড়ান্তভাবে দল গঠন করা হবে। আমরা ভেবে পাই না ট্রায়াল খেলার কি প্রয়োজন আছে। খেলোয়াড় নির্বাচন করবার ভার যাদের উপর তারা ময়দানের প্রতিটি ঘাসের সঙ্গে পরিচিত। খেলোয়াড়দের [illegible] সম্যক অবগত আছেন; তারপর দু'মাস আড়াই মাস ধরে ফুটবল খেলা চলছে, তবুও ট্রায়ালের প্রহসন কেন? বহু পূর্বেই বাঙ্গলার দল গঠন করা উচিত ছিল। নির্বাচিত খেলোয়াড়-দের এক সঙ্গে খেলার সুযোগে দলগত ক্রীড়া-ধারায় যে সংহতির পরিচয় পাওয়া যায় কয়েক

ইস্টবেঙ্গল ও উয়াড়ী ক্লাবের লীগের খেলায় বিপজ্জনক অবস্থার মুখে উয়াড়ী গোলরক্ষক এম চ্যাটার্জী লাফিয়ে উঠে একটি বল ধরছেন

...তিভাবান খেলোয়াড়ের একক নৈপুণ্যেও ...ওয়া যায় না। ভারতীয় ফুটবলে ভিন্ন ...র খেলোয়াড়পুষ্ট বাঙলা দলের শ্রেষ্ঠত্ব ...নিষ্প্রয়। হয়তো এইজনাই বাঙলার ...কর্তারা আশু দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা ...র করেননি, কিন্তু আন্তঃরাজ্য ফুটবলে ...অন্য রাজ্যের নিকট পরাজয় স্বীকার ...হয়েছে, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

*   *   *

...কিস্থান ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ...র অনুযায়ী ভারতীয় ক্রিকেট টীম ...পশ্চিম পাকিস্থান সফর করবে বলে ...য় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভায় স্থির ...এই সভায় কন্ট্রোল বোর্ড ১৯৬১-৬২ ...বিদেশে ভারতের ক্রিকেট সফর ...দলগুলির ভারত পর্যটন সম্পর্কে ...করেছেন। এতে জানা যায় ... অথবা ১৯৫৭-৫৮ সালে ... এবং ১৯৫৯-৬০ সালে ... ভারত ভ্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানান হবে। এ ছাড়া ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৬১-৬২ সালে ইংলন্ডের ভারত সফরের কথা। ১৯৫৮ সালে ভারতেরও ইংলন্ড ভ্রমণের কথা আছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভারত সফরের সিদ্ধান্ত করেছে ১৯৫৮-৫৯ সালের শীত মরসুমে। ১৯৬০-৬১ সালে ভারতের পাল্টা সফরের পালা। মধ্যবর্তী কোন মরসুমে ভারত পাকিস্থান ক্রিকেট টীমকেও আমন্ত্রণের আশা রাখে। ভ্রমণ তালিকা দেখে মনে হয় আগামী ৬।৭ বছর ধরে ভারতের কৃতি ক্রিকেট খেলোয়াড়দের বিদেশ এবং স্বদেশের ক্রিকেট মাঠেই সময় কাটাতে হবে।

এর উপর আরও আছে। ভারতের শিক্ষা দপ্তর কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতির নিকট পত্র-যোগে জানিয়েছেন, এই বছরই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের একটি দল ভারত সফরে আগ্রহী। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ব্রিটিশ গিনি ও সুরি নামের সেই সব খেলোয়াড়দের নিয়ে এই দলটি গড়া হবে, যাদের পূর্বপুরুষ একদিন ভারতীয় ছিলেন। আর্থিক লোকসানের সম্ভাবনায় কন্ট্রোল বোর্ড এ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। আর্থিক অবস্থার বিষয় শিক্ষা দপ্তরকে খতিয়ে দেখতে অনুরোধ করা হয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ পাবার পর সেপ্টেম্বর মাসে এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

*   *   *

ধুরন্ধর খেলোয়াড় লেন হাটন অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড সফরের জন্য ইংলন্ডের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। গত মরসুমে অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধেও হাটন ইংলন্ডের অধিনায়কত্ব করেন। এবার পাকিস্থানের ও ইংলন্ডের প্রথম টেস্ট খেলায় হাটন ইংলন্ডের অধিনায়কত্ব করবার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন, ফলে পাকিস্থানের সঙ্গে দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ডেভিড শেফার্ড ইংলন্ডের অধিনায়ক নির্বাচিত হন। এর পর অস্ট্রেলিয়া সফরে হাটন আর অধিনায়ক নির্বাচিত হবেন কিনা এ নিয়ে যে জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হয়েছিল তার অবসান হল।

হাটনের পূর্বে কোন পেশাদার খেলোয়াড় ইংলন্ডের অধিনায়ক নির্বাচিত হবার গৌরব লাভ করেননি। ভারতের ইংলণ্ড সফরের সময় ব্রিটিশের রক্ষণশীল ক্রিকেট পরিচালকবর্গ তাদের আভিজাত্য ভুলে গিয়ে পেশাদার খেলোয়াড় হাটনকে অধিনায়ক নির্বাচিত করেন। ক্রিকেট খেলায় অধিনায়কের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করে। হার জিতের অনেক নিগূঢ় সূত্র নিহিত থাকে অধিনায়কের খেলা পরিচালনের উপর। ভারতের ইংলণ্ড সফরের সময় ইংলন্ডে এমন কোন প্রতিভাবান শৌখীন খেলোয়াড় ছিলেন না যার উপর অধিনায়কের গুরুভার অর্পণ করা চলে, তাই তখন এম সি সির নিয়ামক সংস্থা পেশাদার খেলোয়াড় হাটনকেই অধিনায়ক করেছিলেন। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে জানে ব্রিটিশ জাতি। তাই কালোপযোগী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না।

খেলাধুলোর টুকরো খবর

৪×১৫০০ মিটার রিলে রেসে নূতন বিশ্ব রেকর্ড—হাঙ্গেরীর হনভেড স্পোর্টস ক্লাবের চারজন এ্যাথলীট ৪×১৫০০ মিটার রিলে রেসে নূতন বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনের হোয়াইট সিটিতে ব্রিটিশ টীম ১৫ মিনিট ২৭.২ সেকেণ্ড সময়ে ৪×১৫০০ মিটার রিলেতে

মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের লীগের পাল্টা খেলায় লেফট আউট এস দত্ত মোহনবাগানের দ্বিতীয় গোল করছেন। মোহনবাগান এই খেলায় মহমেডান দলকে ২—১ গোলে হারান

রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন; হাঙ্গেরীর অ্যাথলীটরা ১৫ মিনিট ২১.২ সেকেন্ডে নূতন রেকর্ড করেছেন।

৩×৮০ গজ **দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড**—হোয়াইট সিটির ব্রিটিশ গেম অনুষ্ঠানে ইংলন্ডের মহিলা রিলে টীম ৩×৮০ গজ রিলে দৌড়ে নূতন বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। মিস এ্যান এ্যালিভার, মিস নোরা স্মেলে ও মিস ডায়না লেথার ৬ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড সময়ে এই রেকর্ড করেন।

ডেভিস কাপ—যুক্তরাষ্ট্র ৫-০ খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে দিয়ে ডেভিস কাপের আমেরিকা 'জোনের' সেমি-ফাইন্যালে উঠেছে। সেমি-ফাইন্যালে যুক্তরাষ্ট্রকে কিউবার সঙ্গে খেলতে হবে।

আমেরিকা অঞ্চলের অপরদিকে ক্যানাডা ৩-১ খেলায় চিলির বিরুদ্ধে অগ্রগামী হয়ে সেমি-ফাইন্যালে মেক্সিকোর সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

সামরিক বাহিনীর ফুটবল—সামরিক বাহিনীর আন্তঃবিভাগীয় ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় সাদার্ন কম্যান্ড অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়নশিপের গৌরব লাভ করেছে। এবার সামরিক বাহিনীর ফুটবল প্রতিযোগিতা মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত হয় এবং ইস্টার্ন কম্যান্ড, ওয়েস্টার্ন কম্যান্ড, সাদার্ন কম্যান্ড, নেভি এবং এয়ার ফোর্স এই পাঁচটি দল লীগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। সাদার্ন কম্যান্ড এইবারই প্রথম চ্যাম্পিয়ন হল; তাদের বিশেষ কৃতিত্ব যে, কোন খেলাতেই তাদের একটি পয়েন্ট নষ্ট করতে হয়নি।

পুণা টেবিল টেনিস—পুণার হিন্দু জিমখানা ওপেন টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে কে আর চন্দ্রশেখর [illegible] খ্যাতনামা খেলোয়াড় দিলীপ সম্পৎকে [illegible] দিয়ে বিজয়ীর সম্মান অর্জন [illegible] পুরুষদের সিংগলস ফাইনালে [illegible] অপ্রত্যাশিত ফলাফল প্রত্যক্ষ [illegible] মহিলাদের ফাইনালেও তেমন [illegible] মিরকার ভারতের [illegible] মিস মীনা পরাণ্ডেকে হারিয়ে বিস্ময় [illegible] করেছেন।
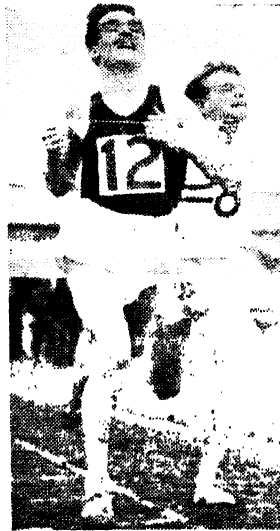
৩ মাইল দৌড়ে নূতন বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ফ্রেডি গ্রীন এবং ক্রিচ চ্যাটওয়ে একই সময়ে দূরত্বের শেষ সীমায় এসে পে'ছেছেন। সুইডেনের গুন্দার হেগ ১২ বছর আগে ৩ মাইল দৌড়ে যে রেকর্ড করেছিলেন ইংলন্ডের দুই এ্যাথলীট গ্রীন ও চ্যাটওয়ে তা ভেঙ্গে দিয়েছেন

পাকিস্থান: নর্দাম্পটনশায়ার—[illegible] ক্রিকেট দল ইংলন্ডে মোট ১৭টি খেলায় [illegible] ৫টি খেলায় জয়লাভ, ২টি খেলায় পরাজয় [illegible] ১০টি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ [illegible] অষ্টাদশ খেলায় নর্দাম্পটনশায়ার [illegible] সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এ খেলাতেও [illegible] পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি। সারের [illegible] পাকিস্থানের পরবর্তী খেলাটিও অমীমাংসিত থেকে গেছে। ফলাফল:—

পাকিস্থান : নর্দাম্পটনশায়ার

নর্দাম্পটনশায়ার—১ম ইনিংস (৬ [illegible] ডিঃ) ৩৫৯ (ব্যারিক নঃ আঃ ৮৪, [illegible] ৭৯, ট্রাইব ৭৮, লিভিংস্টোন ৭৫)

পাকিস্থান—১ম ইনিংস ৩৬৮ ([illegible] মহম্মদ ৬৯, ওয়াকার হাসান ৫৩, [illegible] ৪৬, মহম্মদ আসলাম ৪৬; ট্রাইব [illegible] ৩ উইঃ)

নর্দাম্পটনশায়ার—২য় ইনিংস—([illegible] ৮০ (আর্নল্ড ২৭)

[খেলা অমীমাংসিত]

সারে : পাকিস্থান

পাকিস্থান—১ম ইনিংস (৬ উইঃ [illegible] ৩৬৫ (ওয়াকার হাসান ১২৩, ওয়াজির [illegible] ৮৭, গজালী নঃ আঃ ৪৬)
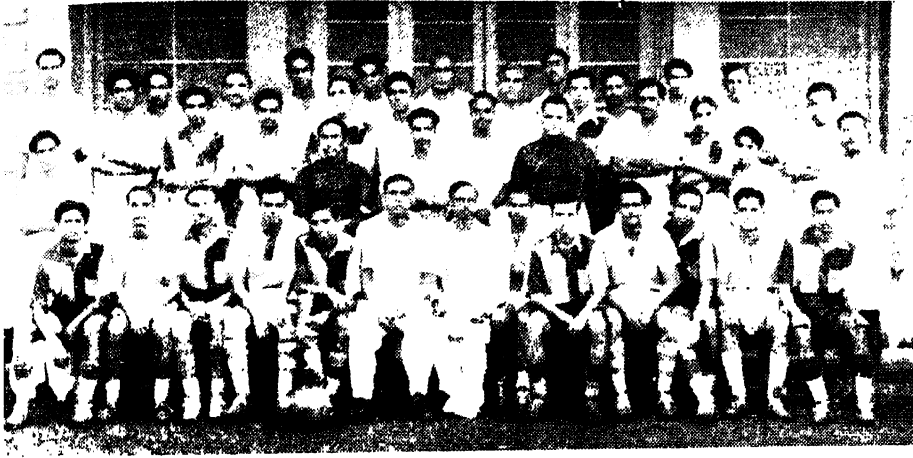
বাটানগরে আনন্দবাজার পত্রিকা স্পোর্টস ক্লাব ও বাটা স্পোর্টস ক্লাবের এক প্রদর্শনী খেলায় বাটা ক্লাব ১—০ গোলে বিজয়ী হয়। ছবিতে দুই দলের খেলোয়াড়দের দেখা যাচ্ছে

...—১ম ইনিংস—(৬ উইঃ) ৩২৯
...১০৬, পার্টিংটন ১০২)।
[খেলা অমীমাংসিত]

...বল লীগের সাপ্তাহিক আলোচনা

... লীগ খেলা প্রায় সমাপ্তির ... পৌঁছেছে। লীগ কোঠার শীর্ষ- ...টি মোহনবাগান ক্লাবের প্রাধান্য ...ছে। কোন অঘটন না ঘটলে তারা ...শিপ লাভ করবে এ কথা এখন বেশ ...ই বলা চলে। সম্প্রতি ইস্টবেঙ্গল ...শ ভাল খেলছে। পাকিস্থানের পূর্ব ...ল থেকে তারা আর দুজন খেলোয়াড় ... করেছে। সেণ্টার ফরোয়ার্ড জামাল খেলোয়াড় আর রাইট আউট তারাপদ ... অধিবাসী। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ... ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রশংসার দাবী রাখে ...নেই; কিন্তু সমসংখ্যক খেলায় মোহন-...বাগানের অর্জিত পয়েন্ট আর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অর্জিত পয়েন্টের মধ্যে যে পার্থক্য তা পূরণ হবার সম্ভাবনা কোথায়। মোহনবাগানের চেয়ে ইস্টবেঙ্গল ৪ পয়েণ্ট পিছিয়ে আছে। ফিরতি খেলায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব মোহনবাগানকে পরাজিত করলেও থাকে ২ পয়েন্টের পার্থক্য। মোহনবাগান ক্লাবও সম্প্রতি খুব ভাল খেলছে। তা ছাড়া শক্ত ম্যাচগুলো তারা প্রায় সবই খেলে নিয়েছে। অপরদিকের ইস্টবেঙ্গলের এখনও কটি শক্ত ম্যাচ খেলতে হবে। সেইজন্য ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে মোহনবাগানের অর্জিত পয়েন্টের নাগাল পাওয়া দুঃসাধ্য বলা যেতে পারে।

ইস্টবেঙ্গলের পর মোহনবাগানের সম্ভাবিত প্রতিদ্বন্দ্বী উয়াড়ী ক্লাব। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের কাছে পরাজয় স্বীকার এবং লীগ কোঠার সর্বনিম্ন স্থানীয় কালকাটা সার্ভিসেস দলের নিকট একটি পয়েণ্ট নষ্ট করায় উয়াড়ীর মনোবল ভেঙ্গে গেছে। সুতরাং তাদের সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করা চলে না। তবে সমস্ত বাঙালী খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত সিনিয়র ডিভিসনের জুনিয়র টীম উয়াড়ী ক্লাব মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যেভাবে সমান তালে খেলছে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে হয়।

স্থানাভাব বশত এ সপ্তাহে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ডিভিসনের আলোচনা করা গেল না। প্রথম ডিভিসন লীগে গত সপ্তাহের ফলাফল দিচ্ছি।

১৪ই জুলাই '৫৪'

ইস্টবেঙ্গল (৫) : ক্যালঃ সার্ভিসেস (০)
পুলিশ (১) : ভবানীপুর (০)

১৫ই জুলাই '৫৪'

মোহনবাগান (২) : মহঃ স্পোর্টিং (১)
ই আই আর (২) : বি এন আর (১)
কালীঘাট (২) : রাজস্থান (২)

১৬ই জুলাই '৫৪'

এরিয়ান (১) : খিদিরপুর (০)

১৭ই জুলাই '৫৪'

মোহনবাগান (৩) : ই আই আর (০)
ইস্টবেঙ্গল (২) : উয়াড়ী (০)

১৯শে জুলাই '৫৪'

ইস্টবেঙ্গল (২) : রাজস্থান (১)
মহঃ স্পোর্টিং (৩) : জর্জ টেলিগ্রাফ (০)
বি এন আর (২) : খিদিরপুর (০)

২০শে জুলাই '৫৪'

মোহনবাগান (৩) : কালীঘাট (০)
উয়াড়ী (১) : ক্যালঃ সার্ভিস (১)
ভবানীপুর (১) : স্পোর্টিং ইউনিয়ন (১)

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১২ই জুলাই—কলিকাতা শহরে গুণ্ডামি ও হাঙ্গামা দমনকল্পে কলিকাতা পুলিশ একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টি করিয়াছেন। দ্রব্যাদি কাড়িয়া লওয়া, পটকা নিক্ষেপ, ইষ্টক নিক্ষেপ এবং নারীর উপর অত্যাচার প্রভৃতি অপরাধ এই বিভাগের আওতায় পড়ে। গত ৪ সপ্তাহে ৪৯১ জন দুষ্ট প্রকৃতির লোক এবং ১৯ জন গুণ্ডার প্রতি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

নয়াদিল্লীতে ভারত এবং পাকিস্থানের সংখ্যালঘু মন্ত্রিদ্বয় শ্রী সি সি বিশ্বাস ও জনাব গিয়াসুদ্দীন পাঠানের মধ্যে আলোচনা শেষ হইয়াছে। বৈঠকের পর একটি যুক্ত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের মনে আস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহাদের নিরাপত্তা রক্ষাই মন্ত্রিদ্বয়ের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল।

রাষ্ট্রীয় শ্রমিক বীমা পরিকল্পনা নাগপুরে সম্প্রসারিত করা হইয়াছে। প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিক ইহার সুবিধা পাইবে। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল এক অনুষ্ঠানে ইহার উদ্বোধন করেন।

১৩ই জুলাই—কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন আজ কলিকাতায় কংগ্রেস কর্মীদের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের জবর দখল কলোনীগুলির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ১৩৩টি জবর দখল কলোনী বৈধীকরণের জন্য তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিকট সংবিধানের ৩১ ধারা সংশোধনের প্রস্তাব করিয়াছেন। ১৯৪৬ সালের মূল্য অনুযায়ী যাহাতে জমির মূল্য দেওয়া যায় তজ্জন্য এই সংশোধনের প্রয়োজন হইয়াছে।

১৪ই জুলাই—ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রেস কমিশনের সদস্যগণ আজ বোম্বাইয়ে এক হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী প্রেস কমিশনের রিপোর্টে স্বাক্ষর করেন। রিপোর্টটি এখন ভারত সরকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তর শীঘ্রই 'সেণ্ট্রাল ব্যুরো অব এডুকেশন্যাল এণ্ড ভোকেশন্যাল গাইড্যান্স' নামে একটি কেন্দ্রীয় মনস্তাত্ত্বিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে বিবিধ মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে পরীক্ষা করিয়া যাহার যে বিষয়ে দক্ষতা, তাহার প্রতিভাকে সেই স্থানেই নিয়োগ করিবার পরামর্শ দেওয়াই হইবে এই সংস্থার কার্য। শুধু ছাত্রই নহে, বিভিন্ন কর্মে যোগদানেচ্ছু কর্মচারী ও শ্রমিকদিগকেও এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বৎসরের ব এ এবং বি এস-সি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। বি এ'তে এবার শতকরা ৪৮ জন এবং বি এস-সিতে শতকরা ৫০.৩ পাশ করিয়াছেন।

১৫ই জুলাই—কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন আজ কলিকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে 'উদ্বাস্তু' অথবা 'বাস্তুহারা ব্যক্তি' সম্বন্ধে সরকারীভাবে এ যাবৎ যে সংজ্ঞা গ্রাহ্য হইত, সেই সংজ্ঞার কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছুটা কড়াকড়ি হ্রাসের কথা ঘোষণা করেন।

নয়াদিল্লীর অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রী ওয়াই এল তানেজা অদ্য তিনটি তরুণীকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করার অভিযোগে শ্রীমতী রতন বাঈ জৈন নাম্নী জনৈকা স্ত্রীলোককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

১৬ই জুলাই—ফরাসী সরকার আজ দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূলবর্তী ২৩ বর্গমাইলব্যাপী ভূখণ্ড মাহের অধিকার এক সরল অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ত্যাগ করে। মাহের শাসনকর্তা মঁ দেশী মাহে মহাজন সভার সংযোগে পরিষদের নিকট মাহের শাসন কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত করেন। মুক্তি আন্দোলনের যুক্ত সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি শ্রী আই কে কুমারন গভর্নমেণ্ট হাউসের শীর্ষে ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেন। আনন্দে অধীর প্রায় ১৫ হাজার মাহেবাসী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল।

১৭ই জুলাই—কলিকাতা পুলিশের এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ ভেজালের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালাইয়াছেন তাহার ফলে গত দুই মাসে ১৩৮টি ভেজাল দিবার ঘটনা ধরা পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে ১৯০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

কলিকাতা অল ইণ্ডিয়া হাইজিন ও হেলথ ইনস্টিটিউট ভবনে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিবিধ সমস্যা ও ঐগুলির সমাধান সম্পর্কে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছে। আজ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি ঐ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বারভাঙ্গা হলে একাডেমিক কাউন্সিলের এক সভায় ইণ্টারমিডিয়েট হইতে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সকল স্তরে প্রধানত মাতৃভাষা বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থার দাবী উত্থাপন করা হয়।

১৮ই জুলাই—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবে ভারতস্থিত বিদেশী উপনিবেশগুলিকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য পুলিশী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করা হয়।

কটকের উপকণ্ঠে কালিয়াবোদা নামক স্থানে একদল সাধু ও একদল পুলিশের মধ্যে এক সংঘর্ষে একজন কনস্টেবল ও দুই সাধু নিহত হইয়াছে এবং একজন সহকারী পুলিশসুপার, একজন দারোগা ও ৬। কনস্টেবল গুরুতর আহত হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১৩ই জুলাই—ইন্দোচীনে শান্তি প্রতিষ্ঠানে আজ জেনেভায় প্রবল কূটনৈতিক কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মঃ মেঁদে ফ্রাঁস আজ প্রাতঃকালে কম্যুনিস্ট চীনের প্রধান ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের সহিত ইন্দোচীন সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই বৈঠকের পর ফ্রান্স সমর্থিত ভিয়েৎনাম গভর্ণমেণ্টের নূতন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ [illegible] ভিয়েৎমিন সহকারী প্রধান মন্ত্রী মিঃ [illegible] সহিত আলোচনা করেন।

ভারতের প্রতিনিধি শ্রী ভি কে কৃষ্ণ মেনন আজ সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ মলোটভের সহিত সাক্ষাৎ করেন। [illegible]

১৪ই জুলাই—[illegible]

১৬ই জুলাই—[illegible] এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

লোহিত নদীর ব-দ্বীপ এলাকার ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ রেনে কোনি বলেন যে, [illegible] রক্ষাব্যূহে ৬০ হাজার ভিয়েৎমিন সৈন্য অনুপ্রবেশ করিয়াছে এবং আরও ৬০ হাজার সৈন্য এই রক্ষাব্যূহ পরিবেষ্টন করিয়াছে।

১৭ই জুলাই—অদ্য পাকিস্থান পার্লামেণ্টে পূর্ববঙ্গে গবর্ণরের শাসন প্রবর্তন [illegible] আলোচনার উত্তরে প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলি বলেন, "পূর্ববঙ্গে যে সঙ্কট [illegible] ঘটিয়াছে, তাহাতে ৯২(ক) ধারা প্রয়োগ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অবলম্বিত [illegible] ব্যবস্থা।"

১৮ই জুলাই—ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মেঁদে ফ্রাঁস ইন্দোচীনে শান্তি স্থাপন [illegible] ত্যাগের যে পণ করিয়াছেন, উহার নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার ঠিক ৫৬ ঘণ্টা পূর্বে নয়টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ আজ জেনেভায় এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন।

প্রতি সংখ্যা—৵৹ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষান্মাসিক—১০৲

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
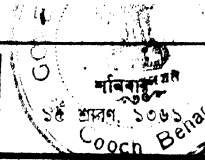
২১ বর্ষ
সংখ্যা ৩৯
দেশ
DESH
SATURDAY, 31ST JULY, 1954.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

আজমীরের সিম্ধান্ত

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বিগত আজমীর অধিবেশনে বৈদেশিক ব্যাপার-সম্পর্কে ভারত সরকারের অবলম্বিত নীতি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। ইহার কতকগুলি কারণ রহিয়াছে। ইন্দোচীনের যুদ্ধবিরতি এবং ভারতস্থ ফরাসী এবং পর্তুগীজ উপনিবেশগুলির মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে সর্বত্র মুখ্য আলোচ্য বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে ভারত সরকারের পক্ষের কথা শুনিবার জন্যই সকলে স্বভাবতই আগ্রহান্বিত ছিলেন। ...স্বাধীনতা লাভ করিবার পর নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কর্মক্রমের ধারা অনেকই বদলাইয়া গিয়াছে। সমিতিকে ... কংগ্রেস-নীতির নির্দেশক হইয়া চলে না। কংগ্রেস-পরিচালিত গভর্নমেন্টের উপরই সে ভার পড়িয়াছে। ইহারাই লোকসভা এবং সংসদের ...দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া নীতি পরিচালনা করেন। ফলত নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে সরকারপক্ষীয় অবলম্বিত নীতি বা কার্যক্রমের যৌক্তিকতাই শুধু প্রদর্শিত হইয়া থাকে এবং একতরফা রকমে সেগুলি গৃহীত হয়। কংগ্রেস সভাপতি স্বরূপে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অধিবেশনে ভারত সরকারের নীতির বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন। ইন্দোচীনের দীর্ঘ আট বৎসরব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের অবসান সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর অবদান সর্বজনস্বীকৃত। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সহিত চীনের প্রধানমন্ত্রীর দিল্লীতে যে আলোচনা হয়, সেই আলোচনা ইন্দোচীনের যুদ্ধবিরতি চুক্তির মূলে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে। এই চুক্তিতে শুধু ইন্দোচীনের নরঘাতী ধ্বংস-লীলারই যে বিরতি ঘটিয়াছে, ইহা নয়; বিশ্বশান্তির সহিতও এই চুক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। ইন্দোচীনের যুদ্ধবিরতির ভবিষ্যৎ লইয়া রাজনীতিক ধুরন্ধরগণের মধ্যে বহুবিধ জল্পনা-কল্পনা এবং গবেষণা চলিতেছে। মোটামুটিভাবে এই চুক্তি এসিয়ার উপর প্রভুত্বকামী বৈদেশিক রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর সামরিক প্রচেষ্টার পাকচক্রের মূলে আঘাত করিয়াছে, এ বিষয়টি অন্তত সুস্পষ্ট এবং এজন্যই আমরা খুশী। এই চুক্তির ফলে এসিয়ার স্বাধীনতাকামী জনগণ মুক্তির আবহাওয়ায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার অন্তত অবসর পাইবে। স্থগিত যুদ্ধ সম্বন্ধে ব্যবস্থাদির তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত আন্তর্জাতিক কমিশনের সভাপতিত্বের দায়িত্ব ভারতের উপর অর্পিত হওয়াতে ভারতের রাষ্ট্রনীতিক মর্যাদার গুরুত্ব সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির এতৎসম্পর্কিত সিদ্ধান্ত এইদিক হইতে সকলেই সমর্থন করিবেন। ভারতের ফরাসী এবং পর্তুগীজ উপনিবেশের মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কিত প্রস্তাবেও জাতির অভিমত সুস্পষ্টভাবেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। এইসব বৈদেশিক উপ-নিবেশগুলির ভারতভুক্তি ভারতের মুক্তি আন্দোলনেরই অংগীভূত এবং এই গুলি যতদিন পর্যন্ত বৈদেশিক শাসনের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া ভারতের অন্তর্ভুক্ত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্দেশ্যও সম্যকরূপে সিদ্ধ হইবে না, সমিতির এই সিদ্ধান্তে ফরাসী এবং পর্তুগীজদের অধীনতা হইতে মুক্তিকামী স্বদেশপ্রেমিক-দের সহিত সমগ্র ভারতের সংকল্পশীল সহানুভূতি বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনা দিয়াছে।

বেকার-সমস্যা ও তরুণ সমাজ

কেন্দ্রীয় অর্থসচিব শ্রীচিন্তামন দেশ-মুখ সম্প্রতি এ কথা খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করিয়াছেন যে, অন্যান্য দেশের গভর্নমেন্ট সেই সব দেশের স্কুল কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের জীবিকা সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে যেভাবে সমর্থ হইতেছেন ভারত সরকার তেমন উল্লেখযোগ্য রকমে এই সমস্যা সমাধানে সমর্থ হইতেছেন না। অর্থসচিব মহাশয় ইহার সমাধানের জন্য কোন উপায় কিন্তু নির্দেশ করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে আমরা পাশ্চাত্যের আর্থিক সমৃদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে চাহিতেছি, অথচ আমাদের ব্যক্তি কিংবা সমাজ-জীবনের তদুপযোগী পরিবর্তন সাধিত হইতেছে না। সমস্যার মূল কারণ এই-খানে সৃষ্টি হইতেছে। ব্যক্তির চরিত্রের উপর জাতির উন্নতি এবং সমৃদ্ধি নির্ভর করে। ব্যক্তির চরিত্র আবার সামাজিক পরিপ্রেক্ষাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া ওঠে। এদেশের তরুণ-সমাজে আর্থিক প্রয়োজন বর্তমানে তীব্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে অথচ সামাজিক প্রতিবেশ তাহাদের সেই মনোবৃত্তিকে সুষ্ঠুভাবে বিকাশের সাহায্য করিতেছে না। এই সমস্যার সমাধান করিতে

হইলে রাষ্ট্র এবং সমাজ-জীবনে নৈতিক আদর্শের উন্নয়ন সাধন করা যেমন প্রয়োজন, সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টির কল্যাণমূলক সামাজিক সংস্কারের পথেও দৃঢ়তার সহিত বলিষ্ঠ নীতি লইয়া অগ্রসর হওয়া দরকার। এদেশের সরকারী নীতিতে এ সম্পর্কে অনেকটা গতানুগতিক ধারা ধরিয়া গোজামিল দিয়া চলিবার চেষ্টাই হইতেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে বড় বড় কথার কারবার যতটা চলে, কাজ ততটা হয় না। বস্তুত রাষ্ট্রীয় নীতি ব্যক্তির চরিত্র গঠনের সহায়ক হইতেছে না এবং সমাজ-জীবনেও তাহা সমষ্টিস্বার্থে আদর্শের উদ্দীপনা সঞ্চার করিতেছে না। এদেশের তরুণদের জীবনে আমরা ইহারই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিতেছি। দৈনন্দিন জীবনে অভাব অনটনের ভিতর পড়িয়া যাহারা পিষ্ট হইতেছে, ভবিষ্যতের ভরসায় তাহাদিগকে সুদীর্ঘকাল সন্তুষ্ট রাখা সম্ভব হইতে পারে না।

উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের পুনর্নিয়োগ

খাদ্য-রেশন ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হওয়াতে সমগ্র ভারতে কয়েক সহস্র নরনারী বেকার হইয়া পড়িবেন, এমন আশঙ্কা দেখা দিয়াছে; পশ্চিমবঙ্গেও এ সমস্যা রহিয়াছে। সমস্যাটি সামান্য নয়। প্রকৃতপক্ষে কোন বিশেষ রাজ্য সরকারের চেষ্টায় বিশেষ অঞ্চলের মধ্যেও এই সমস্যার সমাধান হওয়া কঠিন। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারসমূহের সমবেত চেষ্টায় সমগ্র ভারতের বিভিন্ন কর্মবিভাগে কর্মসংস্থানের দ্বারাই এইসব উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের পুনর্নিয়োগ করা সম্ভব হইতে পারে। সুখের বিষয়, ভারতের প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টি ব্যক্তিগতভাবে এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং তিনি ইঁহাদিগকে সরকারী অন্য কাজে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিবেন, এমন আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। ইঁহাদের পুনর্নিয়োগের প্রশ্নটিকে সরকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য করিলে নূতন লোকের কর্মসংস্থানের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হইবে, এইরূপ কথা কেহ কেহ উত্থাপন করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের তেমন যুক্তির কোন গুরুত্ব আছে বলিয়া মনে করি না। এতগুলি কর্মচারী হঠাৎ বেকার হইয়া পড়িলে তাঁহাদের পরিবারবর্গ কিরূপ দুর্দশার ভিতর পড়িবে, মানবতার এ প্রশ্ন তো এক্ষেত্রে আছেই, কিন্তু মানবতার সে প্রশ্নই একমাত্র বিবেচ্য নয়। এ সম্বন্ধে রাষ্ট্রের কর্তব্যও রহিয়াছে। রাষ্ট্রের সঙ্কটকালে ইঁহারা নিজেদের শ্রম-সামর্থ্য দ্বারা রাষ্ট্রকে সাহায্য করিয়াছেন এবং সমাজ-জীবনের সংস্থান-বিধান করিয়াছেন। আজ রাষ্ট্রের সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই সরকার যে ইঁহাদিগকে উদ্বৃত্ত বলিয়া উপেক্ষা করিবেন, ইহা গণতান্ত্রিক কিংবা লোককল্যাণমূলক রাষ্ট্রের শাসন-নীতিসম্মত হইতে পারে না। পুনর্নিয়োগের ক্ষেত্রে ইঁহাদের সম্বন্ধে বিবেচনা এজন্য সকলের আগে করা উচিত। নূতন লোকের কর্মসংস্থান পরের কথা। বেকার-সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন অবশ্য সাধারণভাবে রহিয়াছে; কিন্তু সেজন্য ইঁহাদের পুনর্নিয়োগের প্রশ্নটিকে কম গুরুত্ব দিতে গেলে সে সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পাইবে। সংস্থিতিই কর্মের মূলে শক্তি দেয়। সরকারী কর্মচারীরা যদি মন-প্রাণে সরকারী কাজে তাঁহাদের জীবনের সংস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা উপলব্ধি করেন, তবে তাঁহাদের নিষ্ঠা-বুদ্ধি এবং আন্তরিকতা সহজেই জাগে। পক্ষান্তরে এ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা তাঁহাদের কর্মপ্রেরণাকে শিথিল করিয়া ফেলে এবং নানারকম অসদুপায় অবলম্বনের দিকে তাঁহাদের মন স্বভাবতই উন্মুখ হয়।

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী সংখ্যা হইতে 'দেশ' পত্রিকায় 'চা-কর' লিখিত বিচিত্র অভিজ্ঞতামুখর স্মৃতিকথা 'চা-বাগানের কাহিনী' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে। ছদ্মনামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যিনি এই স্মৃতিকাহিনী লিখিতেছেন দীর্ঘ তিরিশ বছর তিনি ভারতের বিভিন্ন চা-বাগানে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। এই রচনাটিতে চা-বাগানের কর্মী ও কুলিদের সর্বাংগীন জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি উপস্থাপিত হইয়াছে।

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

পুনর্বাসনের নূতন কার্যক্রম

পূর্ববঙ্গে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্বন্ধে নবোদ্যমে নূতন নীতি লইয়া কাজে প্রবৃত্ত হইতেছেন, কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন সচিব শ্রীযুত অজিতপ্রসাদ জৈন কলিকাতায় আসিয়া কিছুদিন পূর্বে এই প্রতিশ্রুতি দিয়া গিয়াছেন। সেদিন পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন সচিব শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় এ সম্বন্ধে কলিকাতার সাংবাদিকদের সম্মেলনে একটি বিবৃতি দিয়াছেন। শ্রীযুক্তা রায় তাঁহার বিবৃতিতে শহর এবং শহরতলীর উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধেই বিশেষভাবে আলোচনা করেন; কিন্তু এতদ্দ্বারা ইহা যেন বুঝিতে হইবে না যে, পল্লীঅঞ্চলে প্রধানতঃ যেসব কৃষিজীবী উদ্বাস্তু বা কারিগর শ্রেণীর তাঁহাদের পুনর্বাসনের সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ ভূমি সংস্থানের সমস্যাই এক্ষেত্রে প্রধান। সরকার এই ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন নাই, আইন সংক্রান্ত অন্তরায় এ বিষয়ে এখনও আছে। শহরতলী অঞ্চলের পুনর্বাসন ব্যবস্থা পাকা করিবার যে অন্তরায় সমভাবেই রহিয়া গিয়াছে। এই অঞ্চলের উদ্বাস্তুগণ যাহাতে গ্রাম অঞ্চলে গিয়া নিজেদের জমি কিনিয়া বসবাস করিতে পারেন, সেজন্য সরকার হইতে ঋণদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্যবস্থা ভাল; কিন্তু এজন্য ঋণের পরিমাণ পর্যাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। যাঁহারা ইতিমধ্যেই শহর অঞ্চলে বা শহরতলীতে নিজেরা বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে অন্যত্র যাইতে বাধ্য করা না হয় এদিকে লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন। শহরের চারিদিকে উদ্বাস্তুদের নিজেদের চেষ্টায় যেসব উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহাদের সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সরকারী উদ্বাস্তুদের জন্য যেসব বসতি নির্মাণ করিবেন, যাঁহারা এ পর্যন্ত নিজেদের বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাঁহাদের জনাই সেগুলি নির্দিষ্ট রাখা দরকার। উদ্বাস্তুদের জবরদখল উপনিবেশগুলি যথাসম্ভব সত্বর বৈধ করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া কর্তব্য।

ন্দোচীনের যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যুদ্ধবিরতির লাইন নাম রাষ্ট্রকে দ্বিখণ্ডিত করে ১৭ ধার কাছ-বরাবর যাবে। (গত হর বৈদেশিকীতে অনবধানতাবশত উল্টো লেখা হয়ে গিয়েছিল—নিস্টপক্ষের অভিপ্রেত ১৮ অক্ষরেখা অন্য পক্ষের অভিপ্রেত ১৪ অক্ষ-রেখা বাহুল্য এটা ভুল, হবে ভাগাভাগির লাইন যতদূর সম্ভব ঠেলা কম্যুনিস্টপক্ষের এবং সম্ভব উত্তরে ঠেলা ফরাসীদের ছিল।) ঐ লাইনের উত্তরে [illegible] অধিকার এবং দক্ষিণে অথবা ফরাসীদের, সাহায্যপ্রাপ্ত [illegible] অধিকার থাকবে। লাইনের [illegible] সেখানে ফরাসী সৈন্যের [illegible] ফরাসী অধিকার আছে, [illegible] তারা দক্ষিণে চলে আসবে, লাইনের দক্ষিণ থেকে ভিয়েৎমীনকে [illegible] হবে। লাওস রাজ্যের কোন [illegible] ভিয়েৎমীনের সৈন্য বা [illegible] কর্মতৎপরতা ছিল, তাদেরও [illegible] লাইনের উত্তরে চলে যেতে [illegible] সৈন্যেরা যে রকম [illegible] আছে, তাতে যে যার [illegible] গুটিয়ে নিয়ে আসতে [illegible] সময় লাগবে; সেই কারণে [illegible] দশ মাস সময় দেয়া হয়েছে। [illegible] লোকেরাও এক অঞ্চল ছেড়ে [illegible] যেতে পারবে। অর্থাৎ যারা [illegible] শাসনে থাকতে চায় না, তারা [illegible] দক্ষিণে চলে আসতে পারবে [illegible] ভিয়েৎমীনের শাসনের অনুরাগী দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলে যেতে।

অর্থাৎ কোরিয়া যেমন উত্তর ও দক্ষিণ [illegible] বিভক্ত, ভিয়েৎনামও এখন [illegible] ভিয়েৎনাম ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামে হোল। অবশ্য বলা হচ্ছে, এ চিরস্থায়ী নয়, যুদ্ধবিরতি চুক্তির [illegible]সারে যেমন লাওস ও কাম্বোডিয়াতে সমগ্র ভিয়েৎনামে দু'বছরের মধ্যে [illegible] করা হবে এবং সেই ইলেকশনের অনুযায়ী সমগ্র ভিয়েৎনামের এক

গভর্নমেণ্ট হবে। কিন্তু সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করলে এবং কোরিয়ার দৃষ্টান্তের পরে এরূপ হবে বলে আশা বা বিশ্বাস করা যায় না। ভাগ-রেখার উত্তরে কম্যুনিস্ট পক্ষ ও দক্ষিণে অ-কম্যুনিস্ট পক্ষ স্ব স্ব প্রভাব দৃঢ় করার যাবতীয় চেষ্টা অবশ্য করবে। ইলেকশন করে সমগ্র ভিয়েৎনামকে এক গভর্নমেণ্টের অধীনে আনার আশা বা আকাঙ্ক্ষা যদি থাকত, তবে বে-সরকারী লোকদের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাওয়া-আসার কথা উঠত না। যে সুপারভাইজারী কমিশন যুদ্ধবিরতির চুক্তির সর্ত মানা হচ্ছে কিনা দেখবেন, সে কমিশনের পক্ষে কম্যুনিস্ট অঞ্চলে অ-কম্যুনিস্ট মনোভাবাপন্নদের এবং অ-কম্যুনিস্ট অঞ্চলে কম্যুনিস্ট-মনোভাবাপন্নদের নিরাপত্তা দেখা সম্ভব হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সে সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ সকলেই বুঝছে যে, ভাগরেখার দুইদিকে দুইরকম মতবাদী গভর্নমেণ্ট চলবে এবং জনসাধারণের মতও তদনুসারে সংগঠিত করার ব্যবস্থা হবে, এক মতের লোকের অন্য অঞ্চলে থাকা সুখকর বা নিরাপদ হবে না। এই যদি অবস্থা হয়, তবে স্বাধীন নির্বাচন দ্বারা সমগ্র ভিয়েৎনাম রাষ্ট্রকে এক গভর্নমেণ্টের অধীনে আনার পরিকল্পনা কাগজপত্রেই আবদ্ধ থাকবে, কার্যত ঘটনা অন্যরূপ হবে।

মোট কথা ইন্দোচীনে এখন উত্তর ভিয়েৎনামে কম্যুনিস্ট-প্রভাবের স্থায়িত্ব স্বীকার করে নেয়া হোল এবং ইন্দোচীনের বাকীটা অর্থাৎ দক্ষিণ ভিয়েৎনাম,

---
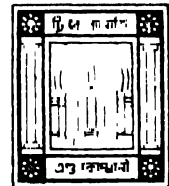
লাওস এবং কাম্বোডিয়াতে অ-কম্যুনিস্ট প্রভাবাধীন করে রাখার চেষ্টা হবে। যুদ্ধবিরতির চুক্তির সর্তের ব্যাখ্যায় এখন থেকেই কিছু কিছু মতভেদ দেখা যাচ্ছে। যুদ্ধবিরতির চুক্তির সর্তানুসারে ইন্দোচীনের রাষ্ট্রগুলিকে নিরপেক্ষীকৃত "neutralise" করা হোল কিনা এই নিয়ে মতান্তর লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভিয়েৎনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়াকে "neutralise" করা হোল অর্থাৎ এদের বাইরের কোন শক্তির সংগে কোনরকম সামরিক প্যাক্টভুক্ত হওয়া বা বাইরের কোন শক্তির নিকট থেকে (ফ্রান্স ছাড়া) সামরিক সাহায্য নেয়া চলবে না—এই ব্যাখ্যার উপরেই কম্যুনিস্টপক্ষ জোর দিচ্ছে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে ইন্দোচীন সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু কর্তৃক রচিত যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, তাতেও ধরে নেয়া হয়েছে যে, ইন্দোচীনের রাষ্ট্রগুলি কোন সামরিক জোট বা চুক্তিতে যোগ দেবে না, ঐ রাষ্ট্রগুলি "area of peace"এর অন্তর্ভুক্ত হোল বলে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মঃ মেঁদে ফ্রাঁস ফরাসী পার্লামেণ্টে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ইন্দোচীনের রাষ্ট্রগুলিকে "neutralise" করা হয় নি। লাওস ও কাম্বোডিয়া ফরাসী সাহায্যে নিজেদের সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে পারবে। কাম্বোডিয়াতে কোন ফরাসী সৈন্য বা ঘাটি নেই; কিন্তু লাওসে আছে। বৃটিশ পার্লামেণ্টে মিঃ ইডেনের বক্তৃতা থেকে বোধ হয় যে, বিদেশী সামরিক ঘাটি রাখা সম্বন্ধে নিষেধ লাওসে ফরাসী ঘাটির সম্পর্কে প্রযোজ্য হবে না। আমেরিকার মতও যে "area of peace"র খুব অনুকূলে তা মনে হয় না। মিঃ ডালেস বলেছেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জন্য পরিকল্পিত সামরিক চুক্তিতে কাম্বোডিয়ার যোগ দিতে কোন বাধা নেই। তিনি বলেন, লাওসের positionটা একটু অস্পষ্ট। চুক্তির সর্তগুলি আরো ভালো করে বিচার না করে বলা যায়। অনেকগুলি সামরিক সর্ত আবার বর্তমানে গোপন রাখা হয়েছে। তবে যুদ্ধবিরতির চুক্তির সর্তানুসারে ভিয়েৎনাম S. E. A. T. O.-তে যোগ দিতে পারে না, শুধু এটুকু মিঃ ডালেস স্বীকার করেছেন। মোটের উপর তাহলে কম্যুনিস্ট-অ-কম্যুনিস্ট পক্ষের মধ্যে মত-বিরোধের প্রচুর অবকাশ রয়েছে।

এ অবস্থায় যে আন্তর্জাতিক সুপারভাইজারী কমিশন যুদ্ধবিরতির সর্ত মানা হচ্ছে কিনা তার তদারক করতে নিযুক্ত হচ্ছেন, তাঁদের কাজ বড়ো সহজ হবে না। এই কমিশনে আছেন ভারতবর্ষ, কানাডা এবং পোল্যাণ্ড। চেয়ারম্যান হবেন ভারতবর্ষ। যুদ্ধবিরতি চুক্তির সর্ত অমান্য ক'রে কোন পক্ষ নূতন সমরায়োজন করছে কিনা, সেটা দেখাও যেমন এই কমিশনের কাজ হবে, তেমনি উভয়পক্ষের দ্বারা ইলেকশনের সর্ত পালন করানোও এই কমিশনের দায়িত্ব হবে। কমিশনের পক্ষে প্রথমোক্ত দায়িত্ব পালন বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হবে; কারণ সোজাসুজি সমরায়োজন কোন পক্ষই হয়ত এখন করবে না, অন্তত ভিয়েৎনামের মধ্যে করবে না—দূরে দূরে প্রস্তুতি চ[illegible] পারে। লাওস ও কাম্বোডিয়ায় ইলেক[illegible] করানো তত কঠিন হবে না, কারণ [illegible] নেয়া যেতে পারে, লাওস ও কাম্বোডিয়া[illegible] যখন ইলেকশন করার সময় আসবে, [illegible] উভয় রাষ্ট্রের কম্যুনিস্ট প্রভাবের [illegible] অবশেষ থাকবে না। কিন্তু আসল প্র[illegible] হচ্ছে ভিয়েৎনামকে নিয়ে। ইলেকশন [illegible] সমস্ত ভিয়েৎনামকে এক গভর্নমে[illegible] অধীনে আনার সম্ভাবনা কত[illegible] এক্ষেত্রে কমিশনের সফলতা লাভের [illegible] আশা আছে বলেই মনে হয় না। [illegible] ইলেকশন হয়, তবে উত্তর ভিয়েৎ[illegible] কম্যুনিস্ট ও দক্ষিণ ভিয়েৎ[illegible] অ-কম্যুনিস্ট সরকারের পক্ষে ভোট [illegible] না ভোট দিতে বাধা হবে; সুত[illegible] ভিয়েৎনাম দ্বিখণ্ডিতই থাকবে।

২৬।৭।৫৪

কটা বাজে?

ললিতকুমার মজুমদার

ছদিন যাবৎ আমার হাতঘড়িটা বিগড়ে ছিল। আপন খেয়ালমত খনও বাইশ মিনিট এগিয়ে চলে, ও আবার খোঁড়াতে খোঁড়াতে দশটা শে মিনিটের সময় দশটার ঘরে এসে ছয়। আজকে দেখি, ঘড়িটা স্রেফ হয়ে গেছে। এধারে কাঁটা ঘোরাই, রে কাঁটা ঘোরাই, হাত ঝাঁকুনি দিই; যাই করি না কেন, ঘড়ি আমার রকম ন গচ্ছামি গোঁ ধ'রেছে। শেষে রও রোখ চেপে গেল; ক'ষে এমন দিতে লাগলাম যে, স্প্রিংটা গেল কেটে। এখন নিশ্চিন্ত। ব্যাণ্ডশুদ্ধ টান মেরে খুলে একটা স্বস্তির ফেললাম। মনে হ'ল, যেন একটা ছেড়ে খুলে গেল।

কোনো এক শুভলগ্ন উপলক্ষে ঘড়িটা পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু ওটা কেন ক'রে আমার পাণিপীড়ন করবে জানত? গৃহিণীর কাছে আমাকে শুনতেই হয়, ঘড়িটা ছিল বাজারের জিনিস, আমিই জিনিসের মূল্য বুঝি না, ব্যবহারের দোষে ওটা খারাপ হয়ে গেল ইত্যাদি। কথাটা অবিশ্যি মিথ্যে নয়। ঘড়িটার আমি যত্ন করিনি কোনোদিন। তার কারণ হ'ল এই যার জন্যে ঘড়ির মূল্য সেই সময়ের জ্ঞানই আমার কম। সময়ের সদ্ব্যবহার লে তবে তো ঘড়ির সদ্ব্যবহার ক'রব? য়ের সঙ্গে আমার চিরকালের দ্বন্দ্ব, কে বলে racing against time. সময় মার জীবন যৌবন সব কিছু নষ্ট ছে, আমিও তাই বেপরোয়াভাবে সময় করি। সর্বনাশা কাল হ'ল আমাদের চেয়ে বড় দুশমন। শত্রুকে যত দূরে যায় ততই মঙ্গল। কিন্তু আমরা আদর ক'রে ঘড়িকে হাতে ক'রে, ক ধ'রে নিয়ে বেড়াই। কালসর্পের পিটাকে যত্ন ক'রে ঘরের তাকের উপর দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখি।

ঘড়িযন্ত্রটা হ'য়েছে আধুনিক মানুষের fetish। সারাক্ষণ আমরা তারই নির্দেশে উঠি বসি। মানুষকে অগ্নির ব্যবহার শিখিয়েছিলেন ব'লে দেবরাজ জুপিটার প্রমিথিয়ুসকে স্বর্গ থেকে নির্বাসিত ক'রেছিলেন। আর যে ব্যক্তি মানুষকে ঘড়ির ব্যবহার শিখিয়ে গেছেন, আমি হ'লে তাঁর শাস্তিবিধান করতাম অক্ষয় স্বর্গবাস। অমরাবতীতে গিয়ে সে বেচারী কি নরকযন্ত্রণাটাই ভোগ করতো।

কারণ স্বর্গে তো আর সময় মাপতে পেতো না। ঢে'কি যদিও বা স্বর্গে গিয়ে ধান ভানতে পারে, ঘড়ির প্রবেশ সেখানে একেবারেই নিষেধ। কালের গণ্ডী পেরিয়ে তবে স্বর্গরাজ্য আরম্ভ।

নিত্যনতুন কলকব্জা আবিষ্কার ক'রে মানুষ তার জীবনটাকে ক'রে ফেলেছে কলের মত। কিন্তু অধিকাংশ কলই হ'চ্ছে time-saving device; সাত ঘণ্টার কাজ কেমন ক'রে সাত সেকেণ্ডে সেরে ফেলা যায়। কাজেই পেছন থেকে সেই ঘড়িই কলকাঠি নাড়ছে বোঝা যায়। কিন্তু সময় বাঁচাবার এত চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের সময়ের অভাব ঘোচে কই? ঘড়ির হাত থেকে এক দণ্ড আমাদের রেহাই নেই। ঘণ্টা ধ'রে কাজ করার মানে বুঝি, কিন্তু মিনিট গুণে কি অবসরসুখ উপভোগ করা যায়? সময় নেই অসময় নেই ঘড়ি আমাদের পেছনে সর্বক্ষণ টিক্ টিক্ করছে। আমরা মুখে বলি, ঘড়ি ধ'রে চলি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘড়িই আমাদের ঘাড়ে ধ'রে নিয়ে চলে।

যখন ঘড়ির প্রচলন ছিল না তখন সময় সম্বন্ধে মানুষের কতখানি স্বাধীনতা ছিল বলুন তো। সকাল থেকে সারাটা দিন হাতে থাকতো। তখন অনেক বেশী পরিশ্রম করতে হ'তো জীবিকানির্বাহের জন্যে। কিন্তু লোকের অবসরও ছিল প্রচুর; শুধু leisured class অর্থাৎ বাবুরা নয়, সাধারণ লোকেরাও যাত্রা কথকতা শুনেছে সারারাত ধ'রে; পুজোয় পার্বণে উৎসবে অনুষ্ঠানে গা ঢেলে দিয়েছে সময়ের হিসেব না রেখে; হাটে মাঠে চণ্ডীমণ্ডপে কত বেলা ব'য়ে গেছে সুখ দুঃখের কথায়। আজ আপনি আপিসে দশটা পাঁচটা সেরে বেরিয়ে আসুন, কিন্তু ঘড়ি আপনার সঙ্গ ছাড়বে না। ফুটবল মাঠে যান খেলা দেখতে, সেখানে রেফারী মুহুর্মুহু ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন; যেন কোনোমতে খেলাটাকে সাঙ্গ ক'রে দেওয়াই তার কাজ। বাড়িতে আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে রেডিয়োটি খুলে দিয়েছেন। কাফি সিন্ধু বাজছে সেতারে; মিঠে আলাপ জমে উঠেছে শিল্পীর হাতে। কিন্তু আলাপের সময় কই? পনেরো মিনিট বাদের হাতেই শুনবেন, 'এ সপ্তাহের বাজার দর' অথবা 'হিন্দীমে সমাচার'! সিনেমায় গিয়ে যদি ব'সলেন তো দেখবেন ছবিটার ল্যাজামুড়ো কেটে এমনভাবে দাঁড় করানো হ'য়েছে যে, ঠিক সওয়া দু' ঘণ্টা হবে আর নায়ক-নায়িকা হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসবে কমেডির জোড়াতালি দিতে আর নয়তো খামকা কতকগুলো খুনোখারাপী কাণ্ড ক'রে ট্রাজিডী খতম হবে।

ইংরেজিতে সময় কাটানোকে বলে টু কীল টাইম। এ ব্যাপারে বাঙালী জাতি বিশেষ পটু। বাঙালী কালাতিপাত করে অতিকষ্টে, কিন্তু কালনিপাত করতে আমাদের জুড়ি নেই; তার কারণ আমরা আড্ডা মারতে জানি। মুখের কথায় সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে ঘণ্টাগুলোকে দিব্যি ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায়। তবে যে ব্যক্তি গৃহিণীর শাসনাধীন, তাঁর আর আড্ডা দেওয়া চলে না। কারণ তাঁকে সেই ঘড়ির শাসন মেনে চলতেই হয়। বাড়ি ফিরে যদি রোজই শুনতে হয়, 'বাজল খেয়াল আছে?' তাহলে আ[illegible] খেয়াল ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

অনেক লোক আছেন, যাঁরা [illegible] ঘড়ি ছাড়া এক পা চলেন না। [illegible] ঘড়ি কাছে না থাকলে তাঁরা কালের [illegible] দিশেহারা হ'য়ে পড়েন কম্পাসহী[illegible] নাবিকের মত। এঁদের ঘড়িটি একবার বিকল হ'ল তো হৃদযন্ত্রটি [illegible] বিকল হবার জোগাড়। আমি [illegible] ঘড়িটা অচল হ'য়ে যাবার পর থেকে বেশ জোর পাচ্ছি; কারণ এখন [illegible] খানিকটা নিজের মনে চলা যাবে। [illegible] বেলা থেকে আর সবাইেরই মত [illegible] মূল্য আর তার সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে [illegible] উপদেশ আর নীতিবাক্য শুনে [illegible] তার ইয়ত্তা নেই। [illegible] করেছি আর বৃথা কালক্ষেপ করে[illegible] কিন্তু কালস্রোতে সেসব সদুদ্দেশ্য কোথায় ভেসে গেছে। এই [illegible] সাধের যে কটা দিন পাওয়া [illegible] সেগুলোকে মিনিটে সেকেণ্ডে [illegible] খণ্ডিত ক'রে আমরা [illegible] টাইমটেবল বানিয়ে ফেলি। [illegible] যাবার সহজ [illegible] মিনিটের হিসেব [illegible] সারাদিনের সমগ্র [illegible] মানুষের জীবনে যে [illegible] ফিকেণ্ট মোমেণ্ট, সেই [illegible] ঘড়ির কাঁটায় ধরা পড়ে [illegible] আমাদের সারাজীবনের [illegible] যায়।

বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, 'Never Pu[t off] till tomorrow what you can [do] today.' কিন্তু আমি বলি [illegible] কারিতার কথা। ভালো করে [illegible] করতে হলে অগ্র-পশ্চাৎ ভেবে [illegible] উচিত এবং সেটা সময়সা[পেক্ষ।] কাজেই আমার নীতি হ'ল, যে [illegible] আগামীকাল করলেও চলবে, তা ক[খনো] আজ করবে না।

সেই কাল যখন আগত হবে, [illegible] আমি কাজ আরম্ভ করবো [illegible] প্রেরণায়, আমার ভাঙা ঘড়িটার [illegible] নয়।

হচ্ছে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি, একটি প্রেমের প্রতি।

...হাটের 'চকাচকী'। চকাচকী আমারই দেওয়া—যদিও সে-নাম ...শব্দে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রথম ... আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়ে-...টি। ঠাট্টা করে নয়; ভালবেসে। একটু ঈর্ষাও মেশানো ছিল ঐ ...দের সংগে। অদ্ভুত অবস্থায়, তাদের আমার প্রথম সাক্ষাৎ। আমার সহ-...কারী মুসাফিরলালের সংগে তখন গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াই রাজনীতিক ...। মুসাফিরলালই আমাকে ...গিয়েছিল ধামদাহা-হাটের দুবে-...র কুটিরে। তখন সেখানে ঘোড়ার ... হাসি চেঁচামেচির মধ্যে, ... টাগ-অব-ওয়র খেলা চলছে। একদিকে দুবেজী, অন্যদিকে ...র অবাধ্য ঘোড়াটি। হেঁইও জোয়ান!...বলেই দুবেজী হঠাৎ দড়ি ছেড়ে দিল। দুবেনী একেবারে চিতপাত। তবু হাসি থামে না।

দুবেজী নির্দোষিতার ভান করে। —"জানোয়ারেরা শুদ্ধ তোর দিকে, তোর সংগে কি আমি পারি। তাই হার মেনে ছেড়ে দিলাম।"......

"দাঁড়াও না! তোমার জানোয়ারগিরি বার করছি!"......

এর জের আরও চলত কি'না জানি না। আমরা গিয়ে পড়ায় তখনকার মত বন্ধ হয়ে গেল। ছারপোকাভরা দড়ির খাটিয়াটি, আমাদের জন্য বার করতে ছোটে তারা দুজনে।......

দুবেনীর বয়স তখনই বছর ষাটেক। তবু কি সুন্দর দেবীপ্রতিমার মত চেহারা! যেমন রূপ, তেমনি গায়ের রঙ।......আর কি আপন করে-নেওয়া ব্যবহার! আমার সবচেয়ে অবাক লেগেছিল বিয়ের পঞ্চাশ বছর পরও এই দম্পতি, বিয়ের সময়ের মনের উপচে-পড়া-ভাব বজায় রেখেছে দেখে।

তাই নাম দিয়েছিলাম চকাচকী।

বিশ্বনিন্দুক মুসাফিরলালের পছন্দ হয়নি নামটি। কুটিলতায় ভরা তার ভাল চোখটি একটু টিপে, ঠোঁটের কোণে একটা ইংগিতের ছাপ ফুটিয়ে তুলে সে বলেছিল, —"চকাচকী না বলে, চড়ুই-চড়ুইনী বলুন এদের। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে বুড়ীর, এখনও কি ছমক! ছেঁদো কথার কি বাঁধুনি! দেখেন না নেচে চলে! ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে উড়ে বেড়াতে চায় চড়ুই পাখির মত! এ গাঁয়ের বুড়োদের কাছ থেকে শোনা যে একটা লোটা আর এই দুবেনীকে সম্বল করে চল্লিশ বছর আগে, দুবেজী যখন এখানে প্রথম এসেছিল রোজগারের ধান্দায়, তখন এই হাটের মালিক বিনা সেলামীতে

বাজারের মধ্যে ঘর তুলবার জন্য জমি দিয়েছিল—শুধু দুবেনীর কোমরের লচক দেখে। সে বয়সে দুবেনী......"

মুসাফিরলালকে থামিয়ে দিই। জানিতো তাকে। দুবেনীর সম্বন্ধে ও সুরে কথা বলা আমার খারাপ লাগছিল। সব জিনিসে সে খারাপের গন্ধ পায়!......

এর পর কতবার যে তাদের বাড়িতে গিয়েছি তার ঠিক নেই। না গিয়ে কি নিস্তার ছিল? ওদিকে গিয়েও তাদের বাড়িতে যাইনি জানতে পারলে চকাচকী দুঃখিত হ'ত। শুধু আমি নই, এ অঞ্চলের প্রত্যেক রাজনীতিক কর্মীর বেলায়ই ঐ এক নিয়ম। দল-নিরপেক্ষ-ভাবে। তার কুঁড়েতে যা জুটবে, চারটি না খেলে রক্ষা নেই। না-খাওয়ার রকম-সকম দেখলে, অতিথির কাপড়-গামছার ঝুলিটি ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গিয়ে দুবেনী রাখবে রান্নাঘরে। যদি কোনদিন বলেছি, 'অমুক গ্রাম থেকে এখনই খেয়ে আসছি—আজ আর খাব না'; অমনি দুবেজী অভিমান করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকবে। কিন্তু দুবেনী চুপ করে থাকবার পাত্রী নয়। বেতো টাট্টুঘোড়াটার পিঠ থেকে চটের বোরাটা সে নেয় বাঁহাতে; আর ডান হাত দিয়ে আমাকে ধরে টানতে টানতে উঠনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে হুকুম করে, "ব'স এই বোরাটার উপর! বসে বসে দেখ, আমি কেমন করে রুটি সেঁকি।" তারপর দুবেজীকে লক্ষ্য করে বলে, "মরদ দেখ! মান করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলেন! থাকো! সবাই কি আর দুবেনী, যে তোমার মানের কদর দেবে!"

কতক্ষণ আর কথা না বলে থাকে দুবেজী। "রাঁধবার সময় মেলা বকিস না, বুঝলি! মুখের থুতু ছিটকে অতিথের রুটির উপর পড়বে।"

"থামো থামো! অত আর থুতু ছিটকোয় না! এ কি তোমাদের মত থয়নিগোঁজা মুখ, যে কথা বললে থুতুর ভয়ে বাঘ পালাবে। বুঝলে বাবুজী, আমি এক এক সময় বুড়োকে বলি যে, আমার সম্মুখে বসে বাজে বক বক না করে যদি সে হাটেরমালিকের তরকারী ক্ষেতে ব'সে আকাশের সঙ্গে কথা বলে তাহ'লে শাকসব্জীর পোকামাকড় দু-চারটে মরে, তামাক-গোলা থুতুতে। তা কি শুনবে। যত গল্প ওর আমারই কাছে।"...

নিজেরা না খেয়ে আমাদের খাওয়াতে দেখে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন তারা এত কষ্ট স্বীকার করে আমাদের জন্য?

জবাব দিয়েছিল—"আপনাদের সেবা করলে রামজী খুশী হবেন। তাঁকে খুশী করতে না পারলে আমাদের পাপ খণ্ডন হবে কি করে?"

এমন সরল নিষ্পাপ দম্পতিও পাপের ভয়ে আকুল! তাই রাজনীতি নিয়ে মাথা না ঘামিয়েও রাজনীতিক কর্মীদের জন্য নিজেদের যথাসর্বস্ব খরচ করে দেয়! শুনে আমার আশ্চর্য লেগেছিল।

কিন্তু বিস্ময়ের অবধি রইল না, যখন চকাচকী জেলে যাবার হুজুগ তুলল। তখন একটি রাজনীতিক আন্দোলনে জেলে যাবার হিড়িক উঠেছে দেশে। ঠাট্টা করে তাদের বলি, "ভেবেছ যে জেলে গিয়েও তোমরা এক সঙ্গে থাকবে? সে গুড়ে বালি! দুবেনীকে যে পাঠিয়ে দেবে মতিহারীর মেয়েদের জেলে!"

"রামজীর মনে যা আছে, তা তো হবেই।"—এক গাল হেসে জবাব দিয়েছিল দুবেজী।

রামজীর মনে কি ছিল তিনিই জানেন; হিসাব গুলিয়ে দিল থানার দারোগা। দুবেনীকে যথাসময়ে পুলিস জেলে ধরে নিয়ে গেল; কিন্তু বাহাত্তুরে বুড়ো ব'লে দুবেকে গ্রেপ্তার করতে বারণ করলেন দারোগাসাহেব। সে পরিচিত প্রত্যেকের দুয়ারে গিয়ে মাথা কোটে, দারোগা সাহেবের কাছে একটু তদ্বির করে, তাকে গ্রেপ্তার করিয়ে দেবার জন্য।

কিছুতেই কিছু হ'ল না।

দিন কয়েক পর দেখা গেল দুবেনী গভর্নমেণ্টের কাছে মাফ চেয়ে, মুচলেখা লিখে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

এ নিয়ে একেবারে ঢিঢিক্কার পড়ে গেল। চড়ুইনীর বেহায়াপনায় সবচেয়ে মর্মাহত হ'ল কানা মুসাফিরলাল। তার বিশ্বাস দুবেনী, দুবেজীকে ছেড়ে না থাকতে পেরেই বেরিয়ে এসেছে।......এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও?......

দুবেনী কারও ঠাট্টা-বিদ্রূপের একটি কথারও জবাব দেয়নি। শুধু তার দৈনিক রামজীর পুজো আগের চেয়ে ঘণ্টা [illegible] বাড়িয়ে দিয়েছিল। আর দুবেজী [illegible] দিল লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা।

আমার সঙ্গে দুবেজীর অন্তরঙ্গ[illegible] ছিল সবচেয়ে বেশী। 'নিমিখে [illegible] যুগ, কোরে দূর মানি'—বাঙালী [illegible] এই পদটির মানে তাকে বুঝিয়ে [illegible] জিজ্ঞাসা করি, "দুবেনীরও কি তাই?"

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে পাল্টা প্র[illegible] করে—"রামজীরও কি সীতাজীর [illegible] এমনি হ'ত নাকি?"

"সে কথাতো বলতে পারি না; [illegible] শ্রীকৃষ্ণের হ'ত রাধিকার জন্য।"

"আরে কিষুণজী-ভগবান[illegible] রামজীও তাই।"

আমি নাছোড়বান্দা। আবারও জিজ্ঞা[illegible] করলাম—

"জেলে এঁটোকাঁটার বাছবিচে[illegible] বলেই কি দুবেনী থাকতে পারল [illegible] সেখানে?"

এত অপ্রতিভ দুবেজীকে এর [illegible] কখনও হতে দেখিনি। [illegible] করে থেকে কাঁচুমাচু মুখে [illegible] "আপনার কাছে বলেই বলছি [illegible] কথাটা। জেলে গেলে পাপমোচন [illegible] রামজীর চোখে। সেই জন্যই আমার জেলে যাবার এত আকাঙ্ক্ষা। [illegible] বলে যে, জেলে গিয়ে পাপ খণ্ডন [illegible] হ'ত আমাদের দুজনকেই; কিন্তু [illegible] কপালে যে রামজী তা লেখেন [illegible] আমাদের দুজনের জীবন যখন একসঙ্গে গাঁথা, তখন আমার একার পাপমোচনের চেষ্টায় কি হবে? তাই দুবেনী [illegible] চেয়ে বেরিয়ে এসেছে।"

দুবেজীর চোখ ছলছল করছে। হতাশার ছাপ চোখে মুখে সুস্পষ্ট। [illegible] একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। গলার স্বর অন্য রকম হয়ে গিয়েছে।......রামচন্দ্র[illegible] যে কিছুতেই তাদের দোষ ক্ষমা করবে[illegible] না!......

তাদের মনের এক অজ্ঞাত দ[illegible] খুলে গেল আমার কাছে। পুণ্য সঞ্চয়ে[illegible] ইচ্ছা নেই, অথচ রামচন্দ্রজীকে খুশী ক[illegible] পাপমুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রবল।......আর [illegible] পাপমোচনের অনুষ্ঠানটি হওয়া চা[illegible] দুজনের এক সঙ্গে; একার চেষ্টা নিষ্ফ[illegible] হবে! অদ্ভুত! আমাদের জটিল [illegible]

স্পষ্ট বোঝা যায় না, তাদের সরল বুদ্ধির ধারা। তবে তার বৈশিষ্ট্য র না করে উপায় নেই।

দুবেজীর মনমরা ভাব দিন দিনই চলে এর পর থেকে। বয়সের জন্য ভেঙে পড়তে আরম্ভ করেছিল থেকেই। এখন যেন আরও তাড়া-খারাপ হতে লাগল। রোজগারের কোনদিনই বিশেষ মন ছিল না পেট চালানোর জন্য যেটুকু না নয়, কেবল সেইটুকুনি ছাড়া। চড়ে ঘোড়াটার পিঠে চড়ে কাছাকাছি চাষীদের কাছ থেকে ভ্যারেন্ডার দানা, তামাক, সরষে কিনে এনে গোলাদারের কাছে বিক্রি করা, এই র একেকালকার পেশা। এখন সে থেকে বার হওয়া বন্ধ করে দেয়। একে বলে দিল যে, এই বয়সে চড়ে বেরুনো আর সামর্থ্যে কুলয় গোলাদার জিজ্ঞাসা করে—"তবে কি?"

দুবেজী উত্তর দেয় না। নিষ্প্রভ পানের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মুশকিল হল দুবেনীরই। দুটি অন্ন যোগানো সোজা নয়। সে থেকে মধ্যে মধ্যে ছুটে ছুটে আমাদের কাছে দু' চারটে টাকার জন্য। সাধ্যমত দিই। যখন সাধ্যে কুলয় না, তখন চকাচকীর না লোকের কাছেও হাত পাতি। জন্য তারা অনেক করেছে এক তাদের অসময়ে এটুকুও ?......

তু এ মনের ভাব বেশীদিন রাখা তাদের উপর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা পরের জন্য লোকের কাছে হাত কতদিন আর ভাল লাগে! পর এমন হ'ল যে, দুবেনীকে ক দেখলেই আমরা পাশ কাটাবার র। কানা মুসাফিরলাল একদিন বলল তা'কে—"এখানে কি টাকার ছ? আমরা নিজেরাই বলে চেয়ে কোনরকমে কাজ চালাই!...... দেশ কোন্ জেলায়? কখন লিয়া, কখন বলো সারন, কখনও জপুর! কিছু বুঝেও তা পাই জেদের দেশে চিঠি লেখ না কেন টাকার জন্য? তিনকুলে কেউ নেই, এমন লোকও হয় না কি পৃথিবীতে?".

দুবেনী শুনেও শোনে না মুসাফির-লালের কথা। আমাকে বলে—"আপনাদের দুবেজী কী মানুষ ছিল, কী হয়ে গিয়েছে। আমার কথারও জবাব দেয় না আজ ক'দিন থেকে। কি সব বিড় বিড় করে বকে। মাঝে মাঝে টিনের চালের উপর উঠে বসে থাকে হাতুড়ি পেরেক নিয়ে। বলে বর্ষা আসছে; চাল মেরামত করছি।"......

দুবের চেয়ে দুবেনীর কথাই আমার বেশী মনে হয়—, তার বিষাদে ভরা মুখ-খানি দেখে। তাকানো আর যায় না সেদিকে! বাহাত্তুরে-ধরা বুড়োর জন্য দুটো টাকা দিয়ে তখনকার মত নিষ্কৃতি পাই।

তারপর মাসখানেক আর দেখা নেই দুবেনীর। টাকা নিতে আসে না দেখে অস্বস্তিই লাগে। প্রত্যাশিত বিপদ না ঘটতে দেখলে হয় না একরকম? মুসাফির-লাল সন্দেহ করল যে, হাটের বুড়ো জমিদারবাবু নিশ্চয়ই টাকা দিচ্ছে ওকে--পুরনো দিনের কথা মনে করে। ভাল চোখটি কৌতুকে ভরা।......তোমরা শুধু দেশ দেশ করেই মরলে—আশপাশের দুনিয়ার পুরনো ইতিহাসের কতটুকু খবর রাখ!......

একদিন দুবেনী এল, চোখে জল নিয়ে।

—দুবেজীর খুব অসুখ। কিছুদিন আগে হঠাৎ তার খেয়াল হয় যে, দুবেনী বড় রোগা হয়ে গিয়েছে।......"তাকিয়ে" তাকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল। তারপর উঠে এসে এই কব্জিটি আঙুলের বেড় দিয়ে মেপে বলল—তুই দেড় আঙুল রোগা হয়ে গিয়েছিস! দাঁড়া দেখিয়ে দিচ্ছি পয়সা রোজগার করতে পারি কি না।...... ঘোড়ার পিঠে বোরা চাপিয়ে বেরিয়ে গেল। কত মানা করলাম। মাথা কুটলাম পায়ে! শুনল না। সে বুঝ কি এখন আর আছে?......বেশী দূর যেতে হয়নি। পারবে কেন। ঘোড়াটাকে সন্ধ্যার সময় খালিপিঠে ঠুকঠুক করে ফিরে আসতে দেখেই আমার বুক কেঁপে উঠেছে। গোলাদারের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ি। সে লোক পাঠাল চারিদিকে। কিছুক্ষণ পরেই পুরানদাহার লোকেরা গরুর গাড়িতে করে দুবেজীকে পৌঁছে দিয়ে গেল আমার কাছে। তখন বেহুঁশ একেবারে। ঘোড়া থেকে পড়ে, মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। আমার ইচ্ছা তখনই আপনাদের এখানে নিয়ে আসি। কিন্তু গোলাদার বিসারিয়ার ডাক্তারকে ডেকে পাঠালে। ডাক্তারবাবু বললেন, এখন নড়াচড়া করলে রুগী বাঁচবে
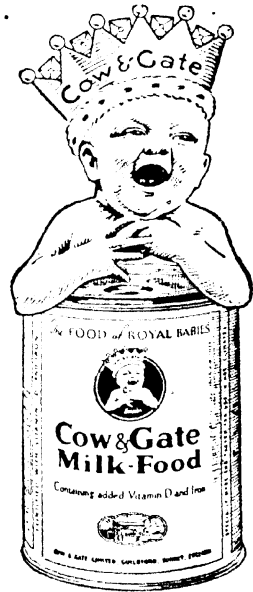
না।......তারপর থেকেতো চলছেই। চোখ খ্‌্লেলো তিনদিন পরে। জ্ঞানও তেমনি জ্ঞান! ঐ একরকমের জবুথবু অবস্থা। না পারে লোক চিনতে, না পারে কিছু বলতে। শুধু তাকায়। আমার দিকে তাকায় কিন্তু আমাকেও চিনতে পারে না। মুখে দুধ দিলে বেশ ঢুক ঢুক করে খায়।......ডাক্তার বলেছে খাওয়াতে বেশী করে। ঘোড়াটাকে বিক্রি করে তো এতদিন ওষুধ পথ্য চলল।......আপনাদের কাছে আসবার ফুরসতই পাই না, রুগী ফেলে।—আজ মুদীর ছেলেটাকে বাবা বাছা বলে বসিয়ে রেখে এসেছি। কে জানে থাকবে কি না এতক্ষণ!......সেইজন্যই 'বাস্'-এ এলাম এক টাকা খরচ করে।"

দুবেনীর দুঃখের কাহিনী আর শেষ হয় না। বুঝলাম এখন দরকার টাকার। বেশী টাকার। মেয়েমানুষের চোখে জল দেখলেই আমি কি রকম অভিভূত গোছের যেন হয়ে যাই। দুঃস্থ রাজনীতিক কর্মীদের সাহায্যের জন্য আমার কাছে একটি 'ফান্ড' ছিল। তার থেকে দশ টাকা আমি দুবেনীকে দিলাম। তাকে 'বাস'এ চড়িয়ে দিয়ে যখন ফিরে এলাম, তখন মুসাফিরলাল সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে আমার বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছে।......পাবলিকের টাকা এরকম নাহক খরচ করা, আর যে কেউ দরদাস্ত করুক, সে করবে না। দুবে জেলে যায়নি, তার স্ত্রী মাপ চেয়ে বেরিয়েছে জেল থেকে—ওরা আবার রাজনীতিক কর্মী হ'ল কবে থেকে?......

মুসাফিরলাল আমায় শাসিয়ে দিল যে, আসছে মিটিঙে সে এর একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বে না।

দিন দুই তিন পরে দুবেজীকে দেখতে গেলাম তাদের বাড়িতে। বাড়ি মানে তো একখানি ঘর—ঘরের দেওয়াল, চাল সব কেরোসিন তেলের টিন কেটে, দুবে-দুবেনীর নিজ হাতে তৈরী করা। দোকান বলো, শোবার ঘর বলো, অতিথিশালা বলো, ঠাকুরঘর বলো, সব এরই মধ্যে। সেই ঘরখানিকে ঘিরে কুতূহলী দর্শকের ভিড় জমেছে। ভিড় ঠেলে ভিতরে গিয়ে দেখি, ঘরের যে কোণায় রঙীন কাগজের রথের মধ্যে রামজীর মূর্তি আছে, তারই সম্মুখে একটি গরু দাঁড়িয়ে। সুন্দর নধর গাইটি। ঘরের মধ্যে খাটিয়ায় দুবেজী শুয়ে। চোখ বোঁজা। দুবেনী খাটিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে বাঁ হাত দিয়ে দুবের একখান হাত ছুঁয়ে রয়েছে; ডান হাত গরুটির গায়ে। পুরুত মন্ত্র পড়ছে। গোদান করছে দুবেনী। দুবেজীকে ছুঁয়ে থেকে রামচন্দ্রজীকে বুঝোবার প্রয়াস পাচ্ছে যে, গোদান করছে তারা দু'জনে মিলে।

পুরুত চলে গেলে দুবেনীর কথা বলবার সময় হ'ল।

......"দুবেজীর আজ দু'দিন থেকে কোন সাড় নেই। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের গোদান করবার। তাই আপনার দেওয়া দশ টাকা দিয়ে গরু কিনেছিলাম। জানি না এতেও রামজী আমাদের মত পাপীদের উপর কৃপাদৃষ্টি করবেন কিনা। ওই দেখুন না রথের মধ্যে রামজীকে! ও মুখে আগেও যেমন হাসি দেখেছি, এখনও তেমনি। মুচকে হাসছেন। ও হাসি দেখলেই আমার ভয় ভয় করে—বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। আমাদের দুজনের পাপমোচনের দরখাস্ত উনি নামঞ্জুর করেছেন বলেই বোধ হয় এই দুষ্টুমির হাসি মুখে! বলছেন—পাপীর মুক্তি কি অত সোজা!"......

......দুবেনীরও কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? পাপমোচনের চেষ্টা এদের একটা বাতিকের মত দাঁড়িয়ে গিয়েছে। টাকা দিলাম ওষুধ পথ্যর জন্য, খরচ করে দিল গোদানে! আমারই ভুল। নগদ টাকা না দিয়ে ঔষধ-পথ্য কিনে দেওয়া উচিত ছিল!......এদের মনের নাগাল পাওয়া দায়!......

দুবেজীকে ঐ অবস্থায় ফেলে চলে আসতে মন সরল না। থেকে গেলাম সেখানে সেদিন। বুঝলাম যে, দুবেজীর আর দেরি নেই।

সে রাত্রে আমি দুবেজীর মাথার কা[ছে] পাখা হাতে, বসে ঢুলছি। আমি থা[কায়] দুবেনী একটু মনে বল পেয়েছে। হাত জোড় করে বসে আছে রামজীর র[থের] সম্মুখে। ধ্যান করছে চোখ বুঁজে। পাপীদের দরখাস্ত-নামঞ্জুর-করা হাসি পাছে চোখে পড়বে ভেবে, চোখ খুলে সাহস পায় না। নিশুতি রাতে নিস্তব্ধতা হঠাৎ ভঙ্গ হ'ল, কেরো[সিন] টিন দিয়ে তৈরী ছাপ্পরের উপর, বৃ[ষ্টি] পড়ার শব্দতে। রামজীকে প্রণাম ক[রে] দুবেনী উঠে এল, খাটিয়ার উপর জ[ল] পড়ছে কিনা দেখতে।......বৃষ্টি পড়ব[ার] সময় খাটিয়া মধ্যে মধ্যে সরাতে হয়। এখ[ন] বাবুজী আছে। দুজন লোক না হ[লে] খাটিয়া সরানো যায় না। তখন মা[টির] ভাঁড় রাখতে হয় খাটিয়ার উপর। ভা[গ্যি] ও পাগল কদিন থেকে বেহুঁশ হয়ে আ[ছে]! নইলে এই রাত দুপুরেই হয়তো খাঁ[চা] উঠত, হাতুড়ি পেরেক নিয়ে চালের উপ[র] উঠবার!......

খাটিয়া সরানো হ'ল। কুপীর ম[ৃদু] আলোতেও বোঝা গেল দুবেনী কাঁদছে।

"বাবুজী, বিপদের সময় তুমি [যা] করেছ, সে ঋণ আমাদের গায়ের চাম[ড়া] দিয়ে তোমার পায়ের জুতো তৈরের ক[রে] দিলেও শোধ হ'বার নয়।"......

আচমকা এই অলঙ্কারবহুল কৃতজ্ঞত[া] নিবেদনে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। এ তো দুবেনীর স্বাভাবিক ভাষা নয়। অথচ কান্নার ফাঁক দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসা কথা! এতক্ষণ ধরে জপ[ে] বসেও সে নিজের মনকে শান্ত করতে পারেনি। ঝড় বয়ে চলেছে মনের মধ্যে তার। 'আমাদের গায়ের চামড়া'!...... 'আমাদের পাপ'!......'আমার' না বলে 'আমাদের' বলা, তাদের চিরকালের অভ্যাস। এখনকার এই বিহ্বলতার মধ্যে সে অভ্যাসের ব্যতিক্রম হয়নি!......খাটিয়ার ওদিক থেকে আমারই দিকে আসা দুবেনী! শঙ্কা, দ্বিধা চোখের জলে ঢাকা পড়েনি। আমার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে।......দ্বিধা কাটিয়ে চোখের জল ছাপিয়ে, আকুল মিনতি ফু[টে] উঠল সে চাউনিতে!......বলতে চায় কি[ছু] ......অনুরোধ জানাতে চায়।

বলো, বলো, ভয় কি।

আশ্বাসের ইঙ্গিত জানাই। তবু
তে কি পারে! সব কথা কি বলা যায়
লাকে! অচৈতন্য দুবেজীর দিকে আবার
বার দেখে নিল দুবেনী—কে জানে
তার কথা বুঝতে পারে!......পাখা-
ধ আমার হাতখানি সে নিজের মুঠোর
া চেপে ধরেছে!

"এ কি কাউকে বলবার কথা। তবু
ছি। তোমাকে ছাড়া আর তো কাউকে
থ না বলবার মত। একজন কাউকে
বলতেই হবে! চল্লিশ বছর ধরে চেপে
প কথাটা একেবারে জমে পাথর হয়ে
ছে বুকের মধ্যে! তবু রামজী ক্ষমা
ন নি আমাদের।......ডাক্তারবাবু
কের না বললেও ঘুরিয়ে বলেছেন
রোগী আর দু-চার দিনের বেশী
ব না। আমিও সেকথা বুঝতে
রছি।......সেইজন্য একটা কথা বলার
রে হয়েছে তোমার কাছে। শুনে
দের কি মনে করবে তাও জানি।
বলছি......আমার কথা রাখতে হবে
টা! রাখবে? আগে কথা দাও, তবে
......

কথা দিলাম।

"শোন তবে বলি। যে কথা বলিনি
শ বছর থেকে। পোড়া মুখ!......
দুবেজীর নিকট আত্মীয়া। দুবেজীর
জিম ছেলে ছিল, সব ছিল। তারা
রও আপনার লোক। ফিরবার পথ
র মত বন্ধ হয়ে গেল জেনেও এসে-
ম। যাক, সে সব ছেড়ে এসেছিলাম
দুঃখ নেই। আমার কথা বাদ দাও!
নিজের ছেলে থাকতে তার হাতের
না পেয়ে দুবেজী চলে যাবে, তা কি
মুখে আগুনটুকু পাবে না? তবে
লোকের ছেলে হয় কিসের জন্য?
র হাতের জল পেলে সে পাপ থেকে
পেয়ে স্বর্গে যেতে পারে। আমার
যে তাই বলছে। নিজের জন্য ভাবি
আমার বরাতে যা লেখা আছে তাই
। কিন্তু ওর যে রাস্তা রয়েছে পাপ
বার। তুমি বাবুজী, ওর ছেলেকে
ন ক'রে হোক নিয়ে এস বাড়ি থেকে!
বাদ জেলা,—সাসারাম থানা—হরকত-
ী গ্রামের পচ্ছিমটোলা। চিঠি দিলে
বে না। ধরে আনতে হবে। আমি
ছ জানলে আসবে না; বলে দিও মরে
গিয়েছে; তাহ'লে এক যদি আসে!......না
করো না বাবুজী! আমাকে কথা
দিয়েছ!"......

সাংসারিক জীবনের সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না। তবু জড়িয়ে পড়লাম এদের নিভৃত পারিবারিক জীবনের সংগে। দিন তিনেক পর সাহাবাদ জেলার এক গ্রামে গিয়ে দুবেজীর ছেলের সংগে দেখা করলাম। নাতিপুতিওয়ালা ঘোর সংসারী লোক। বাবা মৃত্যুশয্যায় শুনেও আমলই দিতে চায় না প্রথমটায়। রুক্ষ মেজাজ। তার মা বেঁচে আছেন কি না, জিজ্ঞেস করায় রুক্ষ স্বরে জানিয়ে দিল যে, তিনি পঁয়ত্রিশ বছর আগে স্বর্গে গিয়েছেন। স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল যে, তাদের বাড়ির জেনানাদের সম্বন্ধে বাইরের লোকের কৌতূহল সে পছন্দ করে না। বাবার কথা তার মনে নেই, তাই তাকে নিয়েও মাথা ঘামাতে চায় না। বুঝলাম যে, এতদিনকার ভুলে যাওয়া পারিবারিক কলঙ্কটাকে নিয়ে, সে আর ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাচ্ছে না। আদের সেই আত্মীয়াটি মারা গিয়েছে, এই মিথ্যা সংবাদটি পেয়েও তার মন ভিজল না। তখন আমি অন্য রাস্তা নিলাম। দুবেজী সেখানে একজন মস্ত লীডার, এ খবর শুনে একটু যেন তার উদাসীনতা কাটল। তখন ছাড়লাম ব্রহ্মাস্ত্র। "দুবেজী সেখানে বাড়িঘর-দোর করেছে। বাজারের উপর দোকান। তুমি না গেলে সেসব সাতভূতে লুটেপুটে খাবে। সেগুলো বিক্রি করে আসবার জন্যও তো তোমার যাওয়া দরকার।"

"বাড়ি কি খাপরার?"

"না। টিনের।"

মিথ্যা বলিনি। বাড়ি যে কেরোসিনের টিন দিয়ে তৈরী, শুধু সেই কথাটি খুলে বললাম না। এই ওষুধেই কাজ হল।

তাকে সংগে নিয়ে এক সন্ধ্যায় যখন ধামদাহা-হাটে পৌঁছলাম, তখন দুবেজীর শবদেহ বার করা হচ্ছে। কানা মুসাফির-লালের ব্যবস্থা ত্রুটিহীন। আশপাশের গ্রামের রাজনৈতিক কর্মীদের সে ডাকিয়ে এনেছে। বিস্তর লোক জমেছে। নিশান, শোভাযাত্রা, অ্যাসিটিলিন আলো,—সব যেমন হওয়া উচিত, তার চেয়েও অনেক বেশী।

আমাদের দেখেই মুসাফিরলাল এগিয়ে এল। তাকে আলাদা দূরে নিয়ে গিয়ে বলে দিলাম যে, এ হচ্ছে দুবেজীর ছেলে,—তাকে যেন কিছু গোলমেলে কথা না জিজ্ঞাসা করা হয়।

"ছেলে?"

মুসাফিরলাল অবাক হয়ে গেল। তারপর চাপা গলায় আমাকে শোনাল দুবেজীর মৃত্যুর চেয়েও চাঞ্চল্যকর খবর।

"দুবেনী পালিয়েছে! আমি এখানে এসেছিলাম পরশু রাতে, তোমার খোঁজে। তখনও দুবেনী ছিল। আমাকে রুগীর কাছে বসিয়ে, সে একটা ছুতো করে বাইরে যায়। আর ফেরেনি। ......এতক্ষণে বুঝলাম ব্যাপারটা।......বিদেশে এক কানাকড়িও না নিয়ে যে রোজগারের ধান্দায় আসে, সে কি কখনও বউকে

সঙ্গে করে নিয়ে আসে প্রথমেই?...এসে, মাথা গুঁজবার মত একটা জায়গা করে নিয়ে তবে না লোকে বউ আনে? আমি চিরকাল বলেছি......"

তার কথা শেষ পর্যন্ত শোনবার উৎসাহ তখন আমার নেই। বুঝলাম যে, মুসাফিরলাল এখানে আসায় দুবেনী হাতে স্বর্গ পেয়েছিল; সে না এলে রুগীকে একেবারে একা ফেলে বোধ হয় দুবেনী পালাতে পারত না! মুসাফিরলাল এখনও বোধ হয় ভাবছে যে, সে পালিয়েছে রুগীর সেবা করতে করতে বিরক্ত হয়ে।... কিন্তু আমি তো জানি!...দুবেকে মৃত্যু-শয্যায় ফেলে চলে যাবার সময় তার বুক ফেটে গিয়েছে। তবু নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলে দিয়ে, সে দুবের একার পাপমোচনের ব্যবস্থা করে গিয়েছে!......

একটি ছোট্ট নদীর ধারে শ্মশানঘাট। ভাদ্র মাস। শ্মশানঘাটের কাছটুকু ছাড়া প্রায় সর্বত্রই জলে ভরা। যেখানে জল নেই, সেখানে কাশের বন। চিতা জ্বলছে। আলো পড়ে ওপারের অন্ধকারের বুকে কাশফুলের চুনকাম বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দুবেজীর ছেলে একটিও কথা বলেনি এখন পর্যন্ত; বোধহয় বাড়ি দেখে হতাশ হয়েছে।......সকলেই চুপচাপ।...... হঠাৎ ওপারের কাশবন নড়ে উঠল—চুন-কামের মধ্যে যেন একটু ফাঁক—স্পষ্ট দেখা যায় না কিছুই—কাশের সমুদ্রের মধ্যে খসখসানির ঢেউটা মিলিয়ে গেল।......

বুঝলাম।...হয়তো আমার সন্দেহ মাত্র! ভুলও হতে পারে! কে জানে!

সকলেই সেইদিকে তাকিয়ে। দুবের ছেলেও।

মুসাফিরলাল বলে—"শিয়ালটিয়াল হবে বোধ হয়।" তাকিয়ে দেখি তার ভাল চোখটির উপর চিতার আলো পড়েছে। দরদে ভরা! তার, পরিচিত কুটিল দৃষ্টি গেল কোথায়?

সেও বুঝেছে, আমি যা বুঝেছি। শিয়ালের কথা তুলেছে, যাতে বাকি সকলে আর ও নিয়ে মাথা না ঘামায়—ওদিকে আর না তাকায়।

এই প্রথম কানা মুসাফিরলালকে খুব ভাল লাগল; তার ভাল চোখের চাউনিটিকেও।

হিমাচল প্রদেশ

সিন্ধু আর শতদ্রুর মতো বন্য ও পার্বত্য নদী ভারতে তৃতীয় আর ... ডায়েরীতে একদা লিখেছিলুম—
...হলেন রাজতরঙ্গিণী, কিন্তু শতদ্রু ...র বিস্ময়! আদিতে বিস্ময়, অন্তেও ...য়। ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করেছে ...। তিব্বত থেকে যাত্রা করেছে। ...স পর্বত শ্রেণীকে কেটেছে, তারপর ...র, তারপর ধবলাধার, শূলেশৃঙ্গ ও ...ঙ্গ পর্বতমালা—অর্থাৎ, সমগ্র ...য়কে কাটতে কাটতে এসে পাঞ্জাবের ...পুরে মোড় ঘুরেছে। আশ্চর্য নদী। ...কে টেক্কা দিয়ে পাঞ্জাবের ভিতর সোজা নেমে গেছে দক্ষিণে, তারপর ...র সঙ্গে মিলিত হয়ে আরব সমুদ্রে। ...তত্ত্ববিদ্‌রা অবাক হয়ে শতদ্রুর দিকে থাকে।

...লাসপুরের দিকে যখন শতদ্রু এলো, সে হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত। ...কল এই, পার্বত্য পাঞ্জাব এবং ...ল প্রদেশ এমন একাকার-যে, কোন্ তঁহশীল কার মধ্যে হঠাৎ বলা কঠিন। চাম্বা যদি হিমাচল প্রদেশে হয়, তবে কাংড়া ও কুলু এসেছে পাঞ্জাবে—এটা শুনতে অবাক লাগে। একটার সঙ্গে একটার সংযোগ নেই কোথাও। পশ্চিমবঙ্গের এক অংশ থেকে অন্য অংশে যেতে গেলে যেমন বিহার অথবা পূর্ববঙ্গ পেরিয়ে যেতে হয়, তেমনি হিমাচল প্রদেশে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যেতে গেলে পাঞ্জাব না মাড়িয়ে উপায় নেই। পেপসুও প্রায় তাই এবং পশ্চিম ভারতে বরোদারও ওই একই নমুনা। এর ফলে এই হয় যে, বাইরের থেকে কোনও প্রকার আঘাত এলে প্রদেশের রাষ্ট্রীয় সংহতি ও যোগাযোগ রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

আমি বিস্ময় বোধ করেছিলুম, যখন শিমলাকে আনা হলো হিমাচল প্রদেশের মধ্যে। কেননা, হিমাচল প্রদেশের মূল প্রকৃতি হলো রাজপুত এবং সিমলার হলো পাঞ্জাবী। বিচ্ছেদটা কামনা করিনে, কিন্তু মিলনটা বিস্ময়কর। পাঠান আর মোগলের আমলে হাজার হাজার রাজপুত পরিবার পালিয়েছিল হিমালয়ে পাঁচ-ছশো বছর আগে। স্থানীয় লোককে হটিয়ে তারা আপন আপন বিদ্যা, বুদ্ধি, শৌর্য, শিক্ষা এবং সুশাসনের গুণে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এইভাবে নেপালও যেমন গ'ড়ে ওঠে রাজপুতের হাতে, তেমনি উত্তর প্রদেশ এবং দক্ষিণ কাশ্মীরের মাঝামাঝি পার্বত্য অঞ্চল—যেটাকে আজ নাম দেওয়া হচ্ছে হিমাচল—সেটাও রাজপুতেরা আগে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। এর ফলে খণ্ড, ক্ষুদ্র, বিচ্ছিন্ন বহু ছোট ছোট রাজ্য একে একে গ'ড়ে ওঠে। দু-চারটি পাহাড় নিয়ে এক একটি রাজ্য—আশেপাশে কোন নদীর সীমানা এবং এইটিই প্রধান—ব্যস্, প্রত্যেকে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র। এই প্রকার একুশটি ছোট-বড় রাজ্য নিয়ে আজ হিমাচল প্রদেশ গ'ড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে চাম্বা, মন্ডি, বিলাসপুর, শিরমুর—এরাই হলো বড় বড়।

শিমলাতে বাস করেছিলুম কিছুদিন ওটা নাকি এই সেদিনও পাতিয়ালা মহারাজার জমিদারীর মধ্যে ছিল, কিন্তু

শতদ্রু

ইংরেজ গভর্নমেণ্ট ওটা নিজের দখলে রাখেন। পাঞ্জাবে গরম হলো অসহনীয়, সেজন্য পাহাড়ী শহর না হ'লে সাহেবদের চলতো না। এই সূত্রে য়্যালান্ ক্যাম্বেল জনসনের গল্পটা মনে পড়ে। পূর্ব-পাকিস্তান জন্মাধার সঙ্গে সঙ্গে জনৈক ইংরেজকে গভর্নরের পদটি নেবার জন্য জিন্না সাহেবের তরফ থেকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু পূর্ববঙ্গের এলাকায় শিলং ও দার্জিলিং পড়েনি বলেই সেই ইংরেজ ভদ্রলোক চাকুরি নেননি। সে যাই হোক, পাতিয়ালার প্রাসাদ আছে বটে শিমলায়, তবে তিনি তখন বাস করেন চাইল শহরে। শিমলা থেকে চাইল দেখা যায় রাত্রের দিকে, যখন চাইল-এ আলো জ্বলে। দিনের বেলায় অস্পষ্ট।

পার্বত্য শহরের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র শিলং, যেখানে পৌঁছলে একথা মনে হয় না যে, পাঁচ হাজার ফুট ওপরে বাস করছি। কেননা, পথঘাট আশ্চর্য রকম সমতল সেখানে। অন্য কোন হিল স্টেশনে সে সুবিধা নেই। অবশ্য শিলং হলো হিল সিটি, হিল স্টেশন নয়। শিমলা এর বিপরীত। যতদূর মনে পড়ছে, উচ্চতায় শিমলা সাত হাজার ফুটেরও বেশি এবং মুসৌরী ও রাণীক্ষেতের মতো শীতের দিনে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকে এবং তুষারপাত হয়। কোন কোন বছরে শিমলায় চার-পাঁচ ফুট অবধি বরফ পড়ে। শিমলায় যাবার পথঘাটও খুব সোজা নয়। কেননা, মণ্ডি, চাম্বা অথবা বিলাসপুর থেকে শিমলায় পৌঁছতে গেলে যে পরিমাণ দুস্তর পথ অতিক্রম করতে হবে, তাতে রাজধানীর সঙ্গে নিত্য সংযোগ রাখা খুবই দুরূহ। উত্তুঙ্গ পর্বত, অনধ্যুষিত উপত্যকা, ভীষণ অরণ্যানী এবং দুরতিক্রম্য নদী-নির্ঝরিণীর দ্বারা একটির সঙ্গে আরেকটি চিরকালের বিচ্ছিন্ন।

কাল্কা থেকে শিমলা পর্যন্ত রেলপথ, তার সঙ্গে আছে রেল-মোটর এবং তারই পাশে পাশে প্রশস্ত কার্ট রোড। যেমন দার্জিলিংয়ে কিংবা গৌহাটী থেকে শিলং অথবা কাঠগোদাম থেকে আলমোড়ার পথ। পথ আঁকাবাঁকা, বন্ধুর, অনেকগুলি লুপ, অনেক টানেল—যতদূর মনে পড়ে। এই পার্বত্য পথে কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ অঞ্চল রয়েছে। একটি হলো ডাগসাই—যেখানে ভারতীয় সৈন্যদলের অফি একটি হলো সোলন্,—যেখানে ভার প্রসিদ্ধ মদ্য প্রস্তুতের কারখানা। তৃতীয় হলো কসৌলী—কুকুরে কামড়ালে যেখা বিশেষজ্ঞের দ্বারা চিকিৎসা করা হ এবং চতুর্থটি ধরমপুর—যেখানক হাসপাতালে যক্ষ্মা রোগীরা আশ্রয় পে থাকে। সমতল পাঞ্জাবের ধূলি-ধূসর থেকে দূরে, পর্বতের নিভৃত বনময় মধ্যস্থলে ধরমপুর অতি মনোরম স্থান কার্শিয়াংয়ের হাওয়ায় জলীয় অংশ বে এমনকি, নৈনীতালের ভাওয়ালীও হয় অনেকের পক্ষে স্যাঁতসেঁতে মনে হ পারে, কিন্তু ধরমপুরের শুষ্ক এ স্বাস্থ্যকর বায়ু ও জল বাঙালীদের পক্ষে বিশেষভাবে উপকারী। এখানকার পারি পার্শ্বিক পার্বত্য বনভূমি, নানা বর্ণে অজস্র হিমালয়ের পাখী, নির্ঝরিণী কলমুখরতা—যে কোন পর্যটকের ক অমরাবতীর সংবাদ এনে দেয়।

কাল্কা থেকে শিমলা মনে হ আন্দাজ ষাট মাইল পাহাড়ী পথ। কিন্ত লাগে, এই পথ এককালে যারা তৈরী করেছিল! তাঁরা নমস্য সন্দেহ নেই পাহাড়ের গায়ে-গায়ে দেহাতিদের পায়ে পথ, সে ত' সংখ্যাতীত, তেমনি জটিল-কিন্তু কিছুতেই এবং কোনমতেই যেখা পথের আন্দাজ পাওয়া যায় না, সেখা প্রত্যেকটি পাহাড়ের ভিতর দি পারস্পরিক সংযোগ আবিষ্কার কর এ-কাজ অতিমানবিক। এখানেও ঠি দার্জিলিংয়ের মতো। রেলপথের সঙ্গে সঙ্গে মোটর-পথ। নেউল যেমন সাপকে নিয়ে খেলা করে, তেমনি এখানে মোটরের সঙ্গে ট্রেনের খেলা! উভ কখনও অদৃশ্য, অর্থাৎ উভয়েই হারিয়ে গেছে পার্বত্য বনপথে; কিন্তু যথাসম সহসা আবার দেখা হয়ে গেল। যাকে বলে শেষ পর্যন্ত নেউলের হাতেই সাপে পরাজয়! মোটর আগে গিয়ে পৌঁছ শিমলায়। শিমলায় প্রবেশপথে আ অক্‌ট্রয়, সেখানে একটা খানাতল্লাসী ব্যাপার থাকে, তারপর পোল্-টাক্সে কথা ওঠে। অতঃপর ছাড়পত্র সঙ্গে নি পাঞ্জাবের (বর্তমানে হিমাচল প্রদেশের এবং ভারতের পার্বত্য রাজধানীতে মা

লানো যায়। পাহাড়ের দুই প্রান্তের দুটি লভূমির উপর প্রদেশের গভর্নর এবং রতের ভাইসরয়ের আবাসভূমি ছিল। তি সম্প্রতি এটি হলো ইংরেজের স্মারক। ওয়েস্ট রীজের পথ ধরে ক্ষণ-পশ্চিমে গেলে মাসোব্রায় হলো লাটের প্রাসাদ, প্রাসাদের নাম 'রিট্রীট্।' ই রিট্রীটে পাইন বনের নীচে চায়ের সরে বসে ভারতের ভাগ্য বহুবার র্ণিত হয়েছে এবং এখানকারই একটি দ্র কক্ষে বসে কোন এক শেষ রাত্রে ডিত নেহরু পাকিস্তান সৃষ্টিতে রাজি য়েছিলেন।

ওই ওয়েস্ট রীজের দিকে, অর্থাৎ পের শিমলায় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের ছাকাছি ব্রাহ্ম মন্দিরের পাশ কাটিয়ে চের দিকে একটি বাড়িতে বাস করে-ম অনেকদিন। এখান থেকে চক্রাকারে রে গেছে শিমলা শহরের পথ। ওদিকে ল নোয়ার শিমলা। এধার দিয়ে পথ ল গেছে যক্ষ পর্বতের দিকে। ওখানে র্বতের নাম হলো 'জ্যাকো হিল'। তে পরিশ্রম করতে যায় অম্লরোগীর ল মেহনতি মেয়েপুরুষ। সমগ্র হাড়টি পরিভ্রমণ করতে গেলে মাইল ক হাঁটতে হয়। ওখানকার মায়া-নের আশেপাশে অনেক উর্বশী র্শনেরে টেনে নিয়ে যায় অনেক র্দনিক বিশ্বামিত্রকে। এদিকে ম্যাল্ র সোজা চলে গেল একটি নিরিবিলি লে বাঙালীসমাজ পরিচালিত কালী-ড়ি। এই কালীবাড়ি স্যার নৃপেন্দ্রনাথ কারের চেষ্টায় এক সময়ে প্রচুর তি লাভ করে। তিনি তৎকালীন কার তরফের লোক হলেও অত্যন্ত শপ্রিয় এবং বাঙালী সম্প্রদায়ের বিসম্বাদী নেতা ছিলেন। কীর্তির্যস্য জীবতি!

আমি ছিলুম বন্ধুবর সত্যেন্দ্রপ্রসাদ র অতিথি। তিনি ছিলেন একজন শিষ্ট সাংবাদিক এবং সাহিত্য-মালোচক। কিন্তু তিনি অধুনা রলোকে। তাঁর কথা অন্যত্রও বলেছি। র কাঠের বাংলোটি ছিল শিমলার হাড়তলীর এক নিভৃত বনময় অঞ্চলে। ন দিক সুউচ্চ পাহাড়ের প্রাচীর, নীচের

সিমলা হইতে ভারত-তিব্বত পথ

দিকে একটি ক্ষুদ্র উপত্যকা, আশেপাশে সুবিশাল পাইন, শাল ও চিড়ের ছায়া-নিবিড় নিকুঞ্জলোক। কিন্তু অমন নিভৃত-বাসের মধ্যেও আমাদের কয়েকজনকে মিলে একটি দল গড়ে উঠেছিল। বরিশালের নেতা শ্রীযুত সরলকুমার দত্ত, এম এল এ—যিনি স্বর্গত অশ্বিনীকুমার দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র—তিনি ছিলেন নাটের গুরু। সুরসিক এবং পণ্ডিত। এদিকে সাংবাদিক সত্যেনের কাছে আসতেন সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক শ্রীযুত দুর্গাদাস, আসতেন শ্রী ভি ভি গিরি—এই সেদিনও যিনি সিংহলের ভারতীয় হাই-কমিশনার ছিলেন। আর আসতেন মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ নেতা স্বর্গত সত্যমূর্তি, প্রাক্তন বিপ্লবী নেতা শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম এল এ এবং আরো অনেকে। মেয়েদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী বসু—অধুনা পরলোকগতা, কবি অজিত দত্তের শ্যালিকা শ্রীমতী মণ্টু ও তাঁর এক বান্ধবী শ্রীমতী রমা নন্দী। এছাড়া আরেকজন ছিলেন, শ্রীমান পাতঞ্জলি গুহঠাকুরতা। কিন্তু সেদিন সে আমাদের কাছে 'বলাই' নামে খ্যাত ছিল, পাতঞ্জলি হয়ে ওঠেনি। আরেকটি সুদর্শন তরুণ ছাত্র আসতো আমার কাছে মাঝে মাঝে। তার নাম প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। অতএব আমাদের দলটি সেদিন নেহাৎ ছোট ছিল না। সত্যেনের ঘরে ছিল বিনা-মূল্যের টেলিফোন, সুতরাং বহু উপভোগ্য কাহিনী টেলিফোনের সাহায্যেও রচিত হতো।

শিমলা থেকে তারাদেবীর ছোট্ট গ্রামটি নিকটবর্তী। যতদূর মনে পড়ছে এখানে একটি কালীমন্দির দেখেছিলুম। যেমন আগে বলেছি, আসামের উত্তর প্রান্ত থেকে আরম্ভ করে ভূটান, সিকিমের দক্ষিণ অংশ, দার্জিলিং, নেপাল, কুমায়ুন এবং তারপর কাংড়া ও হিমাচল প্রদেশ—সমগ্র হিমালয়ের প্রথম স্তরে শক্তিপূজার আয়োজন। চণ্ডীর পরে এলেন কালিকা, তারপর তারাদেবী, তারপর কিন্নরের ভীমকালী, শাকম্ভরী, মহিষমর্দিনী—এইভাবে চলেছে। ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং ধারণা থেকে সমাজ-মনের উৎপত্তি। সেই সমাজ-মন লালন করেছে ধর্মীয় সংস্কৃতি, চিৎপ্রকর্ষ, এবং সমষ্টিগত জ্ঞানলাভের বাসনা। যদি কেউ বলে, আমি বিশ্বাস করিনে, বলুক, কিন্তু বিশ্বাসটা চলে এসেছে। কাল থেকে কালে, যুগ থেকে
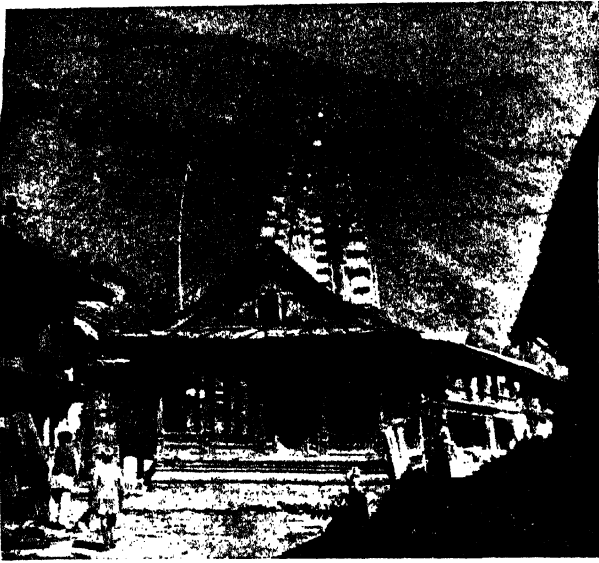
রামপুর বাজারে ১৫০ বৎসরের পুরানো লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির

যুগে। ভারতীয় মনের এই সর্বকালীন ধারাবাহিকতা এখনও অটুট।

শিমলার নীচেই সরকারী রিজার্ভ ফরেস্ট। উর্ধ্বতন কর্মচারীরা এখানে মধ্যে মাঝে শিকারে আসেন এবং অবসর বিনোদনের জন্য কিছু দূরবর্তী আনানদেল্ মাঠে যান ঘোড়দৌড়ে জুয়া খেলতে —শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে নীচের দিকে। যেমন দার্জিলিংয়ের প্রান্তে লেবং-এর মাঠ। বড় শিমলা পেরিয়ে ছোট শিমলার ধার দিয়ে একটা পথ চলে গেছে বয়লুগঞ্জ ছেড়ে প্রসপেক্ট পাহাড়ের দিকে। সে-অঞ্চলটি জনবিরল বলেই বনভোজনের পক্ষে ভারি সুবিধে। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে হিমাচল প্রদেশের বিস্তার ও বৃহত্তর চেহারা দেখা যায়।

সরকারী কর্মচারীদের বাসস্থান, বড় বড় হোটেল এবং বোর্ডিং হাউসে শিমলা শহর সকল সময়েই জনবাহুল্যে গমগম করে। এত অধিক সংখ্যক বাসস্থান বোধ হয় আর কোন পাহাড়ি শহরে খুঁজে পাওয়া যায় না। স্থানীয় লোকরা প্রধানত ব্যবসায়ী অথবা শ্রমিক, বাদ বাকি প্রায় সকলেই চাকুরে। তখন এমন অনেক বাঙালী ছিলেন,—যাঁদের মধ্যে অনেকেই উন্নাসিক সমাজের লোক—যাঁরা এই শহরে চিরস্থায়ী বসবাস করে থাকেন। অনেকে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও দিল্লী-শিমলার মোহ আজও ত্যাগ করতে পারেননি। সত্যি বলতে কি, মোহ ত্যাগ করাও কঠিন। জল, বায়ু, আহার, বিহার এবং একটা আনুপূর্বিক স্বাচ্ছন্দ্য—এইটেই শিমলার বৈশিষ্ট্য। এই শহরের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের জন্য পাঞ্জাব এবং ভারত—উভয় গভর্নমেণ্টই সুদীর্ঘকাল ধরে মাথা ঘামিয়েছেন।

শিমলার নীচে দিয়ে চলেছে বিস্তৃত কার্ট রোড—যে-পথ দিয়ে শিমলায় আসতে হয়। সমগ্র শহরের পরিশ্রমসাধ্য চড়াই আর উৎরাই ছেড়ে এই পথ চলে গেছে বহুদূর। এই 'হিন্দুস্থান টিবেট রোড' ধরে শিমলা থেকে আন্দাজ একশো মাইল গেলে তিব্বত ও ভারতের সীমানা। কিন্তু এই পথটি অতিশয় দুস্তর। পূর্ব-কাশ্মীরে যেমন কারগিল হয়ে লাডাক যেতে হয় এবং বহু দুর্গম গিরিসঙ্কট এবং অজানা অনামা ও দুরারোহ অধি... পেরিয়ে লাডাকের রাজধানী লে শহ... পেঁছানো যায়, এখানেও তেমনি। ঘো... ঝম্বু, অশ্বতর—এরা ভিন্ন আর কো... বাহন নেই। আহারের আয়োজন নি... হয় সঙ্গে, তার সঙ্গে একটি তাঁ... মাইনে-করা দুটি পথনির্দেশক,—এছা... দুঃসাধ্য। ঠিক অরণ্যের মতো, পাহা... পথ হারানো অতিশয় বিপজ্জনক। প... যেখানে শাখা-প্রশাখায় বহু বিভক্ত, সেখা... গাইড ছাড়া চলে না—কেননা, কোন পথে... কোন সংকেত নেই। চড়াই ভাঙতে ভাঙ... বায়ুর বিশেষ একটি স্তরে গি... পেঁছলে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের গোলযো... ঘটতে বাধ্য। অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান, সহ... ও কষ্টসহিষ্ণু ব্যক্তি অল্প পরিশ্রমে... কেন যে ক্লান্তি বোধ করছেন, তি... নিজেও বুঝতে পারবেন না। সে য... হোক, এই পথে একশো মাইল পর্য... গেলে তবে হিমাচল প্রদেশের সীমা... এই সীমানার মধ্যেই বুশাহর রাজ্য প... এবং এই রাজ্যেরই একটি অঞ্চলের ন... কিন্নর দেশ। একদিকে তিব্বত, দক্ষি... হিমাচল প্রদেশ, পূর্বে গাড়োয়াল... প্রান্ত সীমানা—এবং এ অঞ্চলের... বেয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে আশ্চর্য শত... নদী—এদেরই মধ্যস্থলে হলো কিন্নর দে... বুশাহরের প্রকৃত রাজধানী হলো শ... এখানে ভারতপ্রসিদ্ধ ভীমকালীর অ... সুদৃশ্য মন্দির—ভারতীয় ও তিব্ব... স্থাপত্য শিল্পের একটি উজ্জ্বল নিদর্শ... আগেও আমি বলেছি, পূর্ব-কাশ্মী... নেপালে, উত্তর গাড়োয়ালে এবং সিকি... ভূটানে তিব্বতীয় স্থাপত্য প্রভাব অতি... প্রকট। হিন্দু মন্দির ত' দূরের ক... মুসলমানের কোন কোন মসজিদও ... প্রভাব এড়াতে পারেনি। অনেক স্থ... তিব্বতী ধরনের হিন্দু দেবদেবী—যে... শিব, কার্তিক, কালী, লক্ষ্মী ইত্য... এদের গঠন ও সজ্জা-পারিপাট্যের মধ্যে... তিব্বতী প্রভাব অনায়াসে মিশে গে... অবশ্য হিন্দু দেবদেবীও বিভিন্ন ন... এবং বিচিত্র সংজ্ঞায় তিব্বতে পূজা পে... থাকেন সন্দেহ নেই। শতদ্রু নদীর ত... ধরে প্রাচীন পথ চলে এসেছে তিব... থেকে ভারতে, এই পথ বুশাহর রা... যখন প্রবেশ করে, তখন এরই ধারে পাং...

প্রাচীন শহর রামপুর। কিন্তু এই র অতিক্রমের পর অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যে, কিন্নর দুই ভাগে বিভক্ত। এক- ভারতীয়, অন্যটি তিব্বতীয়। ভারতীয় টা মন্দিরপ্রধান; আচার ও আচরণে ন দেখে এসেছি সমগ্র হিমাচল শে, তেমনি হিন্দুয়ানী। কিন্তু বতীয় অংশটা ভিন্নরূপ। এদের ধর্ম- হলো লামা। তাদের ধর্মস্থান হলো জাতীয়, তারা বৌদ্ধ। তাদের চোখ তিব্বতের দিকে—চেহারায় তিব্বতী, র ও ব্যবহার লামাজাতীয়। সেই প্রেত, পিশাচ এবং দৈত্য-দানবের মন্ত্রোচ্চারণ। স্পষ্ট বুঝা যায় র দেশ হলো ভারত ও তিব্বতের সেতুবন্ধ। এই কিন্নরের প্রধান হলো 'চিনি'। চিনির দক্ষিণে অধিত্যকা অঞ্চল হলো গহন আশ্চর্য, বৃহৎ রঙীন পাখী অরণ্যে ডাক দিয়ে চলেছে নীচে দিয়ে অবাধে চলেছে বন্য হরিণের পাল। এছাড়া থেকে নেমে আসে ধূসর বর্ণের ।

থেকে রামপুর যাবার পথে পড়ে। একটু বাঁকা পথ। কিন্তু পর থেকেই পথ অরণ্য- । চড়াই উঠেছে, উৎরাইতে নেমেছে। এপথ দিয়ে যাবার কালে কোনো চিহ্ন সহজে মেলে বছরের একটা বিশেষ সময়ে দের ক্যারাভান কেবল আনাগোনা তিব্বত হোলো একপ্রকার নিষিদ্ধ কিন্তু ভারতের দরজা চিরদিনই কে না জানে, ভারতের দরজা তিব্বতী ব্যবসায়ীদের দুর্গতির থাকবে না। সেইজন্য তিব্বতীয়দের দিক থেকেই 'টিবেট্-হিন্দুস্থান কোনোদিনই বন্ধ হয়নি। রামপুর ওয়াংটু, ওয়াংটু থেকে চিনি। কিন্তু হোলো অরণ্যের কেন্দ্র, কোথাও নেই। দেওদার এবং পাইন এবং টের বন, শাল ও সেগুনের অরণ্য। শ্রেণীর তরাই অঞ্চলে ঘন গভীর অরণ্যের মধ্যে মাঝে মাঝে পাওয়া যায় রয়াদের ঘর। তারা প্রায় সমস্ত বছর এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে কাঠ কেটে বেড়ায় এবং বড় বড় কাঠের গুঁড়ি ও স্লিপার শতদ্রুর প্রখর নীলাভ জল-স্রোতের মধ্যে ভাসিয়ে দেয়। সেই কাঠ ভেসে আসে পাঞ্জাবের দিকে। এ ব্যবসা চলেছে যুগযুগান্ত থেকে। ওয়াংটু থেকে চিনি হোলো চড়াইপথ। পথের মাঝখানে একটি ঝুলন-সাঁকো। সন্ধ্যার পরে এই সাঁকো দিয়ে এপার থেকে ওপারে বড় বড় জন্তু-জানোয়ারের আনাগোনা চলতে থাকে। এই সাঁকো পেরিয়ে ধীরে ধীরে যেতে হয় চড়াই পথে। রক্তিম আপেলের বন চলেছে, আঙুরের ক্ষেত তার গায়ে গায়ে। মেয়েরা সলজ্জ সুন্দর চোখে তাকায়; আঙুরের মতো টসটসে মুখ, আপেলের মতো আরক্তিম দুটি গাল। সুঠাম দেহখানি নজরে পড়ে না, এমনি ক'রে ঢেকে রাখে সর্বাঙ্গ,—পাছে পথচারীর কোনো গুপ্ত বাসনার দাগ এ'কে যায় সেই কিন্নরীর লাবণ্যলতায়। সভ্য মানুষকে ওরা ভয় পায়।

'চিনি' অনেক উঁচু, হয়ত বা দশ এগারো হাজার ফুট। হঠাৎ সামনে পাওয়া যায় মস্ত উপত্যকা, সমতল আর অসমতল মেলানো। তিনদিক তা'র চক্রাকার, নীচের দিকে বৃহৎ ভারতবর্ষ। কিন্তু এই আঙুর আর আপেলের প্রান্তর পেরিয়ে সামনে উঠে দাঁড়িয়েছে আকাশ-ছোঁয়া পর্বত শিখর,—চূড়ার পর চূড়া,—চিরতুষারে সমাচ্ছন্ন। প্রত্যেক চূড়ার নাম তিব্বতী আর ভারতীতে মিলানো,' নাম মনে রাখা কঠিন। এখানে, ধরো, এক শো মাইলের মধ্যে মিলেছে গাড়োয়াল, পাঞ্জাব, তিব্বত এবং কাশ্মীর। পাহাড়ের চূড়ার উপর দাঁড়ালে সমস্তটাই দৃশ্যমান। সিকিমে গিয়ে গ্যাংটকের দরবার গুম্ফার অংগনে দাঁড়ালে যেমন দেখা যায়, উত্তরে নেপাল, পূর্বে ভূটান, পশ্চিমে নেপাল এবং দক্ষিণে ভারতবর্ষ,—ঠিক এখানেও তেমনি। এই ভূভাগেরই ভিতর দিয়ে চলে এসেছে শতদ্রুর নানা শাখাপ্রশাখা অসংখ্য বিভিন্ন নামে। ঠিক এইখানে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে কিন্নরদেশ। উত্তরে দুস্তর পার্বত্যপথ, শস্যতরুতলাহীন তা'র চেহারা; দক্ষিণে অনন্ত শ্যামশ্রী এবং মাঝে মাঝে অগণিত দেবালয়। প্রতি গ্রামে, প্রতি লোক-বসতির আশে পাশে দেবস্থান।

এত মন্দির ও দেবস্থান কেন হিমালয়ে? এর জবাব পেয়েছিলুম নিজেরই মনে। পার্বত্য শহরের কাছা-কাছি যখন আসছি, যখনই এসে পৌঁছচ্ছি একটা কর্মজগতের কোলাহলে,—তখনই দেবালয়ের সংখ্যা কমে আসছে। যখনই
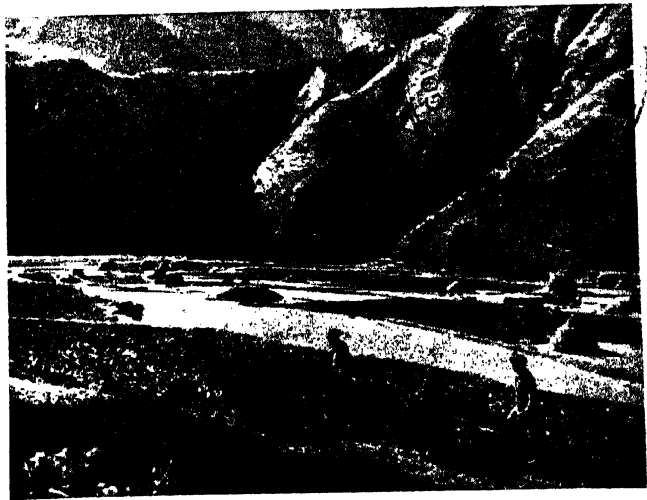
হিমাচল প্রদেশের চাষী

দুঃসাধ্য দুস্তর পার্বত্যলোকের দিকে এগোই তখনই এর সংখ্যা যায় বেড়ে! এর কারণ স্পষ্ট। মানুষ একা থাকতে চায় না, মানুষ চায় মিলন। ভালোবাসা দিয়ে বাঁধে, বন্ধুত্ব দিয়ে সেতু নির্মাণ করে, স্নেহের দ্বারা সম্পর্ক লালন করে। দেবালয় হোলো সেই মিলনের কেন্দ্রস্থল। এই দেবালয় থেকে শঙ্খের ফুৎকার আর মঙ্গলঘণ্টার আওয়াজ দূরদূরান্তরে চ'লে যায়; ডাক দিয়ে আসে পাহাড়ে পাহাড়ে, বার্তা পাঠিয়ে দেয় গ্রাম থেকে গ্রামে: প্রতি মানুষের মনে মিলনের চেতনা জাগায়। এই দেবালয় মানুষের মনে আনে নীতি-বোধ, সমাজধর্মচেতনা, অন্যায়ের প্রতি অনাসক্তি, শুচিশুদ্ধ জীবনের প্রতি অনুরাগ। একটি বিচারালয় আছে চিনি-তে,—কিন্তু সেখানে না আছে মক্কেল, না আছে মোকদ্দমা। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি—এসব কিছু নেই,—বিচারালয় উপবাস ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নিভৃত কিন্নরের নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার চেহারা, সন্দেহ নেই, মনের মধ্যে সম্ভ্রম-বোধ আনে। দক্ষিণ কিন্নর নাচে আর গানে মুখর। চাষী মেয়ে নেচে-নেচে গান ধরে আর মন্দিরের ব্রাহ্মণ পুরোহিতকেও সে নাচিয়ে বেড়ায়! অলঙ্কার আর আভরণ ফিরিয়ে দিলে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটলো,—ব্যস, বাকি জীবন নেচে গেয়ে কাটানো। নেচে এলো ঘরে বউ শ্রমিকের সঙ্গে। বনকুসুমের কোরক ধরেছে যখন, যখন ঘনশ্যাম অরণ্যতলে নেমে এসেছে নববসন্তের রক্তিম আভা,—কিন্নরীর দল তখন গিয়ে নৃত্যগীত ক'রে এলো তরুণ সুকুমার কাঠুরিয়াদের সঙ্গে। ভিন দেশের পর্যটক কিংবা পরিব্রাজক গিয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের মাঝখানে—কটাক্ষ-বতী নর্তকী এলো এগিয়ে, মধুর কি ডেকে নিয়ে গেল আপন অংগনে আংগুরে, আপেলে, মাখনে, মিষ্ট করলো তার অভ্যর্থনা। তারপরে মধুর কণ্ঠে গান গাইলে,—সে-গানের দুর্বোধ্য, সুরও অপরিচিত, কিন্তু কাকলীকণ্ঠের মর্মস্থলে আছে অনাস্বা উপলব্ধি, আত্মার রহস্য-উচ্ছ্বাস, আন সুদীর্ঘ জয়ঘোষণা! পাহাড়ে পর্ব অরণ্যে শতদ্রুর তীরে-তীরে সেই সঙ্গ সেখানে পরম সত্য, কেননা ওই গা সঙ্গে সেখানে,—হ্যাঁ, কেবল সেখা পরমার্থের আস্বাদ মেলে। পালা পা উপলক্ষে গানের সঙ্গে নৃত্য হয় নৃত্য,—যেমন কুলু উপত্যকায় —মু মুখোশ,—পিশাচের, প্রেতের, জ জানোয়ারের। নাচের সঙ্গে প্রাণের প্র আগ্নেয় উত্তাপ, যাকে বলে পাপ অন্যায়কে ভয় দেখানো, পাপকে নির্ করা, মহত্তের মৃত্যুকে অস্বীকার ক পুণ্যের জয়যাত্রার সঙ্গে জনতার সা মেলানো। আলুথালু হয়ে নাচে কিন্ন মেয়ে, অঙ্গে অঙ্গে তার নাচের নাচে তার ইহকাল আর পরকাল। নাচের সঙ্গে মেলানো থাকে ঝড়ের উ বর্ষার সজলতা, বসন্তের সেই নৃত্যরঙ্গের কাঁপন গিয়ে স্পর্শ ক প্রান্তরচারী মেষপালককে, পথচা ব্যবসায়ীকে, কুটির শিল্পের কর্মী তরুণ যুবককে,—ওই সঙ্গে তারাও গ গেয়ে ওঠে দীর্ঘকণ্ঠে। সমগ্র কিন্নর পার্বত্যলোকে সেই গান ধ্বনিত-প্রতি ধ্বনিত হয়।

উত্তর কিন্নরে ভিন্ন চেহারা। দক্ষি পাপ এখানে না ঢোকে। বিশাল তোর তলা দিয়ে এসে প্রবেশ করো, সম অকল্যাণ রেখে এসো বাইরে। রু ঊষর, উপলবহুল, কঠিন পার্ব পথ,—ওইখান দিয়ে এসে আনত বিন লামাদের পায়ে সাষ্টাঙ্গে পূজা নিবে করো এবং আশীর্বাদ মাথায় তোলে সেই যেমন আগে দেখেছি, এখানেও প্র পদে পদে উড়ছে শত শত ছিন্ন কাপড় টুকরো,—প্রেত পিশাচের বিরুদ্ধে শ্বেত পতাকা,—ওই পতাকার প্র দোলনে প্রার্থনা ভেসে চলেছে গৌ বুদ্ধের উদ্দেশে, যিনি লামাদের প

। প্রতি মানুষ পড়ছে মন্ত্র, যেমন
তের স্বভাব—প্রতি মানুষের হাতে
চক্র। আশেপাশের পাথরে-পাথরে
—ওঁ মণিপদ্মে হুঁ।' যে-বস্তিটি
মধ্যে একটু বড়, সেখানে একটি
া। সেখানে বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত
বাইরে একটি প্রকান্ড ঢোলডঙ্কা।
রা পুণ্যার্থিনী, মুখে চোখে সৌম্য-
চেহারা কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও সুশ্রী,
র চুল ছাঁটা। সমগ্র জীবন ধ'রে
সেবা, লামাসেবা। লামারাই সর্বাধি-
। লামাদের হাতেই সমাজ-ব্যবস্থা,
জনগণের দায়িত্ব। এই উত্তর কিন্নর
। তিব্বতের পথ সোজা চ'লে গেছে
কের দিকে শতদ্রুর ধারে ধারে,
কি চড়াই এবং 'শিপকি' পর্বতের
ট তুষারাচ্ছন্ন চূড়ার তলা দিয়ে।
ধারে পড়ে লুক এবং পিয়াং নামক
ট জনপদ। দেখতে দেখতে দুর্গম
মেলা পেরিয়ে গারটকে গিয়ে এই
াড়ন-পথটি মূল পথের সঙ্গে
। গারটক হোলো ভারত আর
তের মধ্যে বাণিজ্যের একটি প্রধান
। এই শহরের আগে পর্যন্ত দুর্গম
অনুধ্যাবিত অঞ্চলের মধ্যে ভারত ও
ম তিব্বতের সীমানা সম্পূর্ণ
দিষ্ট। কাগজেপত্রে এবং মানচিত্রে
অনেকখানি সমাধান করা আছে বলা
না। গারটক থেকে ক্যারাভান্ পথ
ই চারিদিকে। দক্ষিণ-পূর্বে কৈলাস
মানস সরোবরের পথ,—এপথে যায়
কে। কিন্তু ঠান্ডার জন্য মৃত্যুভয়
সে প্রচুর। উত্তরে একটি পথ গেছে
রুদোকের দিকে, যেখানে লাডাক ও
মীর যাবার প্রধান ক্যারাভান্ পথ।
-পূর্বে একটি পথ গেছে তিব্বতের
কেন্দ্র যেদিকে থোক্ জালুঙের
নার খনি। অন্য একটি উত্তরের পথ
গিয়ে হয়ে মধ্য এশিয়ার দিকে চ'লে
ই। সুতরাং গারটক হোলো তিব্বত-
তের অন্যতম প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্র।
তি চীন-ভারত চুক্তির মধ্যে গারটকের
টাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে।
াস পর্বতশ্রেণীর প্রায় মধ্য-কেন্দ্রে
টি পর্বতচূড়ার উপরে এই গারটক
। অবস্থিত,—উচ্চতায় পনেরো হাজার
টেরও বেশী। আমাদের পরিচিত
পৃথিবী থেকে এই পার্বত্য জগৎ এতই পৃথক্ এবং এমন একটা অনাস্বাদিতপূর্ব বন্য বিস্ময় আনে যে, সমতল জগৎ ও আধুনিক সভ্যতাটাকেই স্বপ্নবৎ মনে হয়। পৃথিবীর আদিম চেহারাটা চোখের সামনে আনে, আনে হাজার হাজার বছর আগেকার একটা অদ্ভুত চেতনা,—এমন একটা দিগন্তজোড়া নির্বাক বিস্ময়, যেটার কথা মনুষ্যসমাজের কাছে গিয়ে বর্ণনা করলে নিজের কানেও অলীক শোনাবে। এমনি একটা উপলব্ধি কাশ্মীরের প্রান্তে জোজিলা গিরিসংকটের কাছাকাছি গিয়ে আমার মনে এসেছিল। ঘোড়া, কিংবা টাট্টু, কিংবা ঝব্বু ও চমরী —যেটা মহিষের লোমশ কুটুম্ব এবং অতি শান্ত নিরীহ জীব,—এরা ছাড়া যান-বাহনাদির আর কোনো কথা ওঠে না। পৃথিবীর কোথাও চাকার গাড়ী আছে, কিংবা পেট্রল-কেরোসিন নামক কোনো পদার্থের গন্ধ আছে, এ একেবারে অজ্ঞাত।

শিমলা থেকে নেমে এসেছিলুম বহুদিন পরে। কিন্তু সেখানকার পাহাড়-তলীর সেই ফুলবাগান ঘেরা ছোট্ট বাড়িটি, তার পাশে ঝরণার সরসরানি, তার সঙ্গে বন্ধুবান্ধবগণের মধুর সঙ্গ—অনেকদিন অবধি আমার মনকে উন্মনা করে রেখেছিল। যিনি আমাকে পাঠিয়ে-ছিলেন এই ভ্রমণে, সেই বিদুষী লেখিকা ও কবি শ্রীমতী ক...... দেবীর কাছে ফিরে গিয়ে সবেমাত্র সবিস্তারে গল্প ফেঁদে বসেছি, এমন সময় শিমলার এক নিদারুণ সংবাদ 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' ছাপা হোলো, আমার অতিথিসেবক সাংবাদিক সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু গতকাল অপরাহ্নে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে! তার শেষকৃত্যের সময় ভারতের নেতৃস্থানীয় বহু ব্যক্তি এবং স্বয়ং স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার উপস্থিত ছিলেন।

এই সংবাদটি প্রকাশিত হবার ঠিক পরের দিন শিমলা থেকে সত্যেনের স্বহস্তলিখিত এক পত্র আমার হাতে এলো:—

"তোরা একে একে বিদায় নিয়ে আমাকে ছেড়ে চ'লে গেলি, আমিও এর প্রতিশোধ নেবো ব'লে রাখলুম।......দিন চারেক আগে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এখানে এসেছিলেন তাঁর কাজে। আমার সেই পুরনো হার্টের অসুখ তোর মনে আছে ত? ডাঃ রায় এবারে আরেকবার পরীক্ষা ক'রে বললেন, "পাহাড়ে থাকা তোমার কিছুতেই সইবে না, তুমি এক্ষুণি নীচে নেমে যাও।" কিন্তু আমি গেলে এখানে 'ইউনাইটেড প্রেসের' কাজ আর কেউ চালাতে পারবে কি? সমস্যার প্রতিকার কি তাই ভাবছি......"

'ইউনাইটেড প্রেস'-এর সমৃদ্ধির জন্য সত্যেন জীবন দিয়েছিল, একথা বিধুভূষণ সেনগুপ্তও বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমার আর কোনোদিন শিমলায় যাবার ইচ্ছা হয়নি! (ক্রমশ)

[এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত ফটোগুলি শ্রীবীরেন সিংহ কর্তৃক গৃহীত]

বাবা পঞ্চানন্দ ও মহাগণপতি

নরেশচন্দ্র বসু

রসা রোড আর আশুতোষ মুখার্জি রোড যেখানে কোলাকুলি করছে তারই বুকের উপর দিয়ে, পূর্ণ সিনেমাকে বাঁয়ে রেখে বেরিয়ে গেছে কালীঘাট রোড। এই কালীঘাট রোডে ঢুকেই একটা ছোট বাঁক পেরিয়ে একটু এগোলেই অর্থাৎ কয়েকখানা বাড়ির পরে বাঁ-ধারে বাবা পঞ্চানন্দের মন্দির। মন্দির বললে ভুল হবে, ছোট একটা ঘরে পঞ্চানন্দের পুজো হয়। বহুদিনের লৌকিক আচারে অবশ্য স্থানটি এখন মন্দিরোপম। কিংবদন্তী এই যে, আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে রূপচাঁদ মুখার্জি স্বপ্নে বাটীর নিকটস্থ পুষ্করিণী থেকে পঞ্চানন্দের ঘট তুলে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য আদিষ্ট হন। তিনি নিজের একতলার বৈঠকখানা সংলগ্ন ঘরখানি এই উদ্দেশ্যে দান করেন। পূর্বে এই অংশটি দ্বিতল ছিল, কিন্তু রূপচাঁদবাবু বাবা পঞ্চানন্দের স্বপ্নাদেশেই দ্বিতল অংশটি ভেঙে ফেলেন। এই রূপচাঁদ মুখার্জির নামে কর্পোরেশনের একফালি রাস্তা আজও তাঁর তদানীন্তন জমিদারীকে বেষ্টন করে স্মৃতিটুকুকে আঁকড়ে রেখেছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক কারণে বাংলার সামাজিক জীবনের উপর যে তীব্র বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল, তার ফলে বাঙালী তার সামাজিক জীবনের আদর্শকে পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। এই সূত্রে অনার্য সংস্কৃতি প্রসার লাভ করায় দেশের জনগণের রুচিও সেইভাবে গড়ে ওঠে। ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মমতের বিরুদ্ধে আর্যগণের উন্নত দেব পরিকল্পনা কোনদিনই সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। সেই সময়ই লৌকিক দেবতাদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সমস্ত দেবতারা গ্রামের পাশে, মাঠের মধ্যে অবস্থান করতেন এবং গ্রামবাসীরা ব্যক্তিগত সামাজিক যে কোন উপদ্রব থেকে পাবার জন্য তাঁদের শরণাপন্ন হতেন। গ্রামে যিনি অধিষ্ঠিত থাকতেন, গ্রামের তিনিই সুখ-দুঃখের বিধাতা অভিহিত হতেন।

শৈব ধর্মের ধ্বংস স্তূপের [illegible] যেমন পরবর্তী লৌকিক ধর্মের [illegible] গড়ে উঠেছিল, তেমনি শিব কাহি[illegible] ওপর সেই সমস্ত লৌকিক [illegible] কাহিনীর মূলও প্রতিষ্ঠিত [illegible] কারণ সেই যুগে শিব ছিলেন এ[illegible] প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন দেবতা। এইজন্য পর[illegible] কালে লৌকিক দেবতারাও শিবের [illegible] একটি কল্পিত সম্বন্ধ স্থাপন[illegible] নিতেন। পরবর্তীকালের ধর্মঠাকুর প্র[illegible] এই শিবরূপেরই বিভিন্ন প্রকাশ [illegible] আর কিছুই নয়।

পঞ্চানন্দও এইরূপ একজন [illegible] দেবতা, শিবেরই ভৈরব রূপ মূর্তি [illegible] নবরূপী বৃষের উপর আসীন। কিন্তু মূর্তি বলতে যে ভয়ঙ্কর মূর্তি [illegible] কল্পনায় উদিত হয়, এ তা নয়। [illegible] যুগের দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে যে [illegible] কার্তিক ঠাকুর ময়ূরের পিঠে বসে [illegible] পঞ্চানন্দেরও বসবার ভঙ্গীটি ঠিক [illegible] রকম এবং মূর্তিটির মধ্যে [illegible] কলকাতার পটুয়া শিল্পীদের [illegible] সুস্পষ্ট। এই কালীঘাটের [illegible] পটুয়া পাড়া বা পোটো পাড়া [illegible] অদ্যাবধি পরিচিত। চোখ লাল করে [illegible] দাঁত ঘষে ইনি যেন ছোটদের কাউকে দেখাচ্ছেন—ভাবটা যেন [illegible] শুনলে হাতের এই খেলনা দেব [illegible] শাস্তি পাবে।

এই মন্দিরে কেবলমাত্র পঞ্চানন্দের মূর্তিই নয়, তার [illegible] অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীও আ[illegible] প্রথম সারিতে পঞ্চানন্দের দুই [illegible] প্রমথগণ, দক্ষিণদিকে তিনমুখ বি[illegible] জরাসুর, দ্বিতীয় সারিতে ওলাই [illegible] হাঁসের উপর, ষষ্ঠী বিড়ালের [illegible] গণপতি ও শীতলা গাধার উপর রয়েছেন। তৃতীয় সারিতে মনসা, ম[illegible] চণ্ডী, শিবলিঙ্গ, নারায়ণ, জগন্নাথ ও

মহাগণপতি

দেবতা। একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, রে আপদ বিপদ থেকে রক্ষা করবার যত লৌকিক দেবদেবী কল্পিত ছেন প্রায় সকলেরই সমাবেশ ঘটেছে ন। এই মূর্তিগুলির মধ্যে গণপতির ছাড়া অন্যগুলির মধ্যে কোনরূপ টো নেই। এই মন্দির সংলগ্ন ণে দুইটি শিবমন্দিরও আছে। বাংলা গণপতি (গ=জ্ঞান, ন=মোক্ষ, =পরম ব্রহ্ম)-র যে মূর্তির সঙ্গে পরিচিত, এ মূর্তি তা নয়। দশ বিশিষ্ট সিদ্ধিদাতা গণেশ, বাম- শক্তি অথবা লক্ষ্মী উপবিষ্ট। টি শ্বেত পাথরের, উচ্চতায় প্রায় ইঞ্চি। সত্তর, আশি বছর আগে টের ব্যবসায়ী ডি এন ভট্টাচার্য পুরুলেন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ- এই মূর্তিটি পেয়েছিলেন এবং কিছুদিন আগে এইখানে কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারত বা অন্য কোন প্রদেশে বহু সিদ্ধিদাতার কোন সংবাদ না।

এই মূর্তিটি বহুপ্রকার গণপতির শিল্পীর এক অদ্ভুত বিঘ্নেশ্বর (Vighnesvara) পদ্মাসনে বসে আছেন এবং উপর দক্ষিণ পদ স্থাপন করে ছেন। হস্তীর শুণ্ডটি বামদিকে তামিল ভাষায় একে ইদমবুরি (Idamburi Vinayaka) (ইদম বলা হয়। দুটি চোখ, দশটি হাতে যথাক্রমে দাড়িম্ব, গদা, ধনু, ত্রিশূল, চক্র, পাশ, উৎপল, ব্রীহিগুচ্ছ ও স্বীয় দন্ত (২), কিন্তু দেহকে বেষ্টন 'করে কোনরকম উপবীত (১) নেই, তার বদলে দু' গাছি মালা আছে। শক্তি গণপতির মধ্যে মহাগণপতির সঙ্গেও এর সাদৃশ্য। কিন্তু মহাগণপতির ন্যায় বর্ণ লাল নয়, তার বদলে লক্ষ্মী গণপতির মত সাদা। শক্তির বর্ণও সাদা, গণপতির বাম ক্রোড়ে উপবিষ্ট কিন্তু তাঁর হাতে কোনরকম পদ্ম নেই, তার বদলে শক্তি জোড়হাতে বাম পদের উপর দক্ষিণ পদ ন্যস্ত করে রেখেছেন। এই মূর্তির সঙ্গে ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে পাণ্ড্যরাজ অরিকেশরী পরাক্রম

---

(১) পুরাণে উল্লেখ আছে যে, একবার গণপতি ভক্তদের নিকট থেকে অনেক মোদক (পদ্মপুরাণে "মোদক"কে মহাবুদ্ধির—সর্ব-শ্রেষ্ঠ জ্ঞান—প্রতীক বলা হয়েছে) এর পিঠে খেয়ে তাঁর বাহন ইঁদুরের পিঠে চড়ে বাড়ী ফিরছিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে ইঁদুরের এই ভার বয়ে নিয়ে যেতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। ইতিমধ্যে এক সাপকে রাস্তা অতিক্রম করতে দেখে ইঁদুর ভয়ে গণপতিকে ফেলে দেয় এবং গণপতির উদরটি ফেটে যায়। পিঠেগুলি সব ছড়িয়ে যাওয়ায়, গণপতি সেগুলিকে আবার উদরে ঢুকিয়ে দিয়ে যে সাপের জন্য এই কাণ্ড, সেই সাপকে দিয়েই পেটটি বাঁধেন। এইভাবে গণপতির সর্প উপবীত হয়।

(২) উপরিউক্ত ব্যাপার দেখে চন্দ্র হাসি চাপতে পারেননি। ফলে গণপতি শেষে তাকে নিজের একটি দাঁত ছুঁড়ে মারেন। সেই আঘাতে চন্দ্র ক্রমে ক্রমে তার রশ্মি হারাতে থাকে। তখন মর্তের মানুষেরা বিপদ দেখে গণপতিকে পূজাদির দ্বারা সন্তুষ্ট করে, ক্রোধ সংবরণ করতে বলেন। ভক্তদের প্রার্থনায় তিনি চন্দ্রকে ক্ষমা করেন এবং চন্দ্র তার রশ্মি একটু একটু করে হারিয়ে আবার পুনরায় ফিরে পাবে—এই প্রতিশ্রুতি দেন। গণপতির এক দন্তের ও অমাবস্যা ও পূর্ণিমার পেছনে এই কাহিনী প্রচলিত।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কিন্তু আছে যে পরশুরাম পরশুর দ্বারা ক্ষত্রিয়দের নির্বংশ করে শিবকে তাঁর অস্ত্র ফিরিয়ে দিতে যান। শিবের প্রাসাদের দ্বারে প্রহরায় রত গণপতি কর্তৃক বাধা পেয়ে তাঁকে পরশু ছুঁড়ে মারেন। গণপতি পিতার অস্ত্রটি ব্যর্থ হতে না দিয়ে বাম দন্তে আঘাতটি গ্রহণ করেন। ফলে দন্তটি ভেঙ্গে যায়। এইজন্য তাঁর আর এক নাম একদন্ত। (এক=পরমপুরুষ, দন্ত=শক্তি অর্থাৎ সর্বশক্তিসম্পন্ন পরমপুরুষ।)

লৌকিক দেবদেবী

প্রসিদ্ধি এবং বাবা বিশেষ জাগ্রত বলে খ্যাত। মৃতবৎসা বা বাধক ব্যাধি পীড়িত নারীরা বাবার দোর ধরে দৈব সন্তান লাভ ও আরোগ্য লাভ করেন। প্রচলিত। আমাদের দেশে যাদের সন্তান হয়ে বাঁচে না তারা এই পঞ্চানন্দের কাছে মানত করেন এবং সন্তান হলে তার নাম দেন "পাঁচু"। এইজন্য বলা হয় পঞ্চানন্দের দোর ধরে পাওয়া ছেলে। ধর্ম ঠাকুরের নিকটও সন্তান কামনায় পূজা মানত করা হয় এবং কৃষ্ণ ছাগ বলি দেওয়া হয়। বাবা পঞ্চানন্দের নিকটও ছাগ বলি দেওয়া হয়। নেপালে ধর্মঠাকুরের নিজস্ব শাস্ত্র মন্দির দেখা যায়। এইখানেও শক্তি অধিষ্ঠান করছেন। যখন এখানে অঞ্চল শহরে পরিবর্তিত হয়নি তখন কালীঘাট রোডই কালীর মন্দিরে যাবার একমাত্র পথ ছিল। সেই সময় এই মন্দিরে বহু জনসমাগম হ'ত। সেই লোয়ার সার্কুলার রোডের মধ্যস্থ মন্দির থেকে মাকে পরিত্যাগ করে বাড়িকে রেখে সুদূর সাগরের পথে নিস্তব্ধ অঞ্চলে বাবা পঞ্চানন্দই ছিলেন একমাত্র জাগ্রত লৌকিক দেবতা। এঁর সঙ্গে ধর্মঠাকুরেরও বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। কালের আবর্তনে মন্দিরের আয় গিয়েছে কমে, ভক্তের সংখ্যাও পেয়েছে হ্রাস। তবুও বাঙলার বিভিন্ন পল্লী অঞ্চল থেকে আজও অগণিত ভক্ত আসে বাবাকে তাদের প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করতে।

পাণ্ড্যদেব কর্তৃক নির্মিত তেনকাশী (Tenkasi) বিশ্বনাথ স্বামিন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীগণপতির সঙ্গেও সাদৃশ্য দেখা যায়। এই মূর্তির দশটি হাতে যথাক্রমে চক্র, শঙ্খ, শূল, পরশু, দন্ত, পাশ প্রভৃতি আছে কিন্তু অন্য হাতগুলির জিনিস, কালের আবর্তনে লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় নির্দেশ করা সহজসাধ্য নয়।

বর্তমান পূজারী মাণিকলাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে আমার এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা করবার সুযোগ হয়েছিল। এ'রাই পুরুষানুক্রমে এই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। ঐ অঞ্চলে এই মন্দিরের বাবা ঠাকুরের তলা বলিয়াই

কায়-কল্প

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

না, তার হৃদয়ে আজ স্বপ্ন নেই। প্রেমিক প্রাণের
দুরন্ত কামনাগুলি শান্ত কোনো সান্ত্বনার শ্লোকে!
আশ্বিনের শুভ্র মেঘে হৃতৈশ্বর্য বিলোল বেদনা,—
শীতের হিমের মতো এ-হৃদয় বেদনায় নীল!
না, তার হৃদয়ে আজ গান নেই ঃ সঙ্গীতফেনিল
মীড়ে-মীড়ে পৃথিবীর সকরুণ সায়াহ্ন-মূর্ছনা!
বৈশাখের ঘাসে-ঘাসে রোদ্দুরের মায়াবী আলোকে
সে শুধু শ্রাবণই খুঁজে হাহাকার তুলে নিলো ফের!

অথচ হৃদয়ে সে-ও চেয়েছিলো আশ্বিনেরই মেঘ
কোনোদিন, ফাল্গুনের স্বপ্ন-সাধ, সবুজ আরতি
বিষণ্ণ সন্ধ্যায়! তার এই মনে আকুল আবেগ
সান্দ্র হ'য়ে তোমাকেই কাছে চেয়ে পূর্ণ পরিণতি
পায়নি। তাই সে চুপ। তার সব প্রত্যাশা শিথিল
আসন্ন ঝড়ের গান ঃ বাতাসের নির্মম উৎসব!
তাই সে মৃত্যুই খোঁজে। বেদনার ম্লান কামনায়
তাই তার সব স্বপ্ন মৃত আজ। আহা, সব ... সব॥

—১০—

ব শ অন্ধকার ক'রে রুচি ফেরে।
শিবনাথ ঘরের মেজেয় উবু
বসে হ্যারিকেনের চিমনি পরাতে
নাথ ফিরতে দেরি দেখে মঞ্জু
এবং এতক্ষণ মেয়েকে সান্ত্বনা
দিয়ে সান্ধ্যবাতি লাগার সঙ্গে সঙ্গে
আলোটা জ্বালতে পারেনি।
রুচি ভিতরে ঢোকার পরও ঘর
র ছিল।

আলো জ্বলাতে সে ঘরে একটা নতুন
দেখতে পেল।

টা কখন কিনলে?'

'দুপুরে একটা ফেরিওলা এসেছিল।'
অল্প হাসল।

বাক্সের ওপর রাখা অ্যাশট্রেটা
রুচি একবার দেখল না।
মালটা নামিয়ে রেখে সে কাপড়
ব্যস্ত হয়।

নতুন ডিজাইন। দেখে পছন্দ
নতুন কেনা অ্যাশট্রেটা হাতে
শিবনাথ নাড়াচাড়া করে। 'সাড়ে ছ'
দাম খুব বেশি না।'

তো পয়সা ছিল না, যে ক' আনা
আমি সঙ্গে নিয়ে বেরলাম। পয়সা
কোথায়?'

র এই প্রশ্নে শিবনাথ একটু
ভঙ্গিতে তাকায়। অ্যাশট্রেটা
রেখে দিয়ে বলল, 'তোমার কি
?'

ক'রে বলব।' বেশ গম্ভীর হয়ে
দেয়। ফর্সা ব্লাউজ ছেড়ে সে
ব্লাউজটা গায়ে চড়ায়। মঞ্জু
অপেক্ষা না করে মা'র কোলে
পড়ে।

নাথ যতটা উৎসাহ নিয়ে কথাটা
সে মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছিল

রুচির চেহারা দেখে তা আর পারল না। তবু যতটা সম্ভব হাসি-হাসি মুখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখানে এসেছি, একটু একটু ক'রে এখন সকলের সঙ্গে জানাশোনা হচ্ছে। তখন জিনিসটা পছন্দ হ'তে ভাবলাম কোথা থেকে দাম দিই, ফেরিওয়ালারা কখনো ধারে কিছু বিক্রী করে না, এমন সময় বনমালী নিজে থেকে বললে, তার জন্য কি, আমি পয়সাটা দিয়ে দিচ্ছি, পরে এক সময় আমাকে দিলেই চলবে।'

'দুপুরেও বুঝি মুদিদোকানের সামনে তোমাদের আড্ডা জমেছিল।' রুচি এবার ঘাড় ফেরায়। 'কে কে ছিল?'

শিবনাথ ঈষৎ লজ্জিত হয়। 'আমি, কে — —' একটু থেমে পরে আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি বেরিয়ে গেলে কাজে, মঞ্জু ঘুমোচ্ছিল, একলা একলা আর কি করি তখন—'

'কারো কাছে কিছু খোঁজখবর পেলে? এ-মাস তো কাবার হ'তে চলল। সামনের মাসে একটাও অন্তত ট্যুইশানি যদি না জোগাড় করতে পার খুব মুশকিলে পড়তে হবে আমাদের।'

শিবনাথ নীরব।

মঞ্জুকে কোল থেকে নামিয়ে রেখে রুচি হাত-মুখ ধুয়ে এল।

'তা ছাড়া, এ্যাদ্দিন সবাই আমরা আশায় আশায় ছিলাম, কম হোক বেশি হোক এবছর একটা ইনক্রিমেন্ট হবে। আজ সেক্রেটারির কথায় বুঝলুম, এবছরও তা হবার আশা কম, কম কি নেই-ই একরকম। সিনিয়র টিচারদেরও বেতন বাড়বে বলে মনে হয় না। ইস্কুলের ফণ্ডের অবস্থা নাকি ভাল না।'

শিবনাথ তেমনি চুপ থেকে হাতের নোখ খোঁটে।

ও-বেলা রুটি-তরকারি ক'রে রেখেছিল রুচি। ঠাণ্ডা পড়েছে। এখন এক বেলার জিনিস আর এক বেলায় রেঁধে রাখলেও নষ্ট হবার আশঙ্কা নেই, তাই শিবনাথই রুচিকে এ-প্রস্তাব দিয়েছে। কেবল কয়লা বাঁচবে বলে নয়, খেটেখুটে এসে আবার এসব কাজে হাত লাগাতে রুচির কষ্ট হবে চিন্তা ক'রে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মঞ্জুকে খেতে দিয়ে রুচি বলল, 'চাকরিবাকরি যখন শিগগির হবার সম্ভাবনা নেই তখন ট্যুইশানির চেষ্টা করাই ভাল।'

'আমি চেষ্টা করছি।' শিবনাথ বলল, 'নতুন জায়গা, দু'চারদিন যাক, আর একটু জানাশোনা হয়ে গেলেই একটা দুটো অন্তত জুটবেই। হ্যাঁ, অনেক পয়সাওলা লোকও এসব অঞ্চলে আছে টের পাচ্ছি, তাদের ছেলেমেয়েরা প্রায় প্রত্যেকেই ইস্কুলে কলেজে যায়।'

হঠাৎ শিবনাথ থামল।

কেননা একটা চামচিকে ঘরে ঢুকে ফরর্ শব্দ করে মাথার ওপর অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে দেখে মঞ্জু খিল খিল করে হেসে উঠল, রুচিও খুব হাসতে লাগল। আবহাওয়া তরল হয়েছে অনুমান ক'রে শিবনাথ ঢোক গিলল এবং ফেরিওলার কাছ থেকে কেনা অ্যাশট্রেটার দিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'দুপুরবেলা আজ বাড়িতে এক কাণ্ড হয়েছে।'

'কি?' রুচি শিবনাথের দিকে তাকায়।

'অমল আজ তার বৌকে খুব মেরেছে।'

'কে অমল?' রুচি অবাক চোখে তাকাল।

'আট নম্বর ঘরের ভাড়াটে। কিরণ। কিরণের স্বামীর নাম অমল চাকলাদার।'

রুচি চুপ ক'রে রইল। বস্তুত এ বাড়ির প্রায় সব ক'টা ঘরের নম্বর এবং বাসিন্দাদের নাম শিবনাথ যেমন মনে রাখছে রুচি তা পারছে না। কেবল গোলমাল হচ্ছে ওর। এতগুলো মুখ, তাদের নাম ও প্রত্যেকের ঘরের নম্বর ঠিক

রাখতে মনের যে স্থৈর্য, নিশ্চিন্ততা ও সময়ের প্রয়োজন, রুচির তা নেই যদিও। শিবনাথ অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত, ঠান্ডা মেজাজের এবং চাকরিটি গেছে পর থেকে সময় তো প্রচুর পাচ্ছেই।

একটু বাঁকা সুরে রুচি প্রশ্ন করল, 'কি দোষ করেছিল তোমাদের কিরণ?'

খোঁচাটুকু শিবনাথ হয়তো বুঝল, কিন্তু গায়ে মাখল না। বলল, 'আমিও তখন বাড়িতে ছিলাম না, বনমালীর দোকানের সামনে ব'সে আছি, সেখানেই লোকটার কাছ থেকে অ্যাশট্রেটা কিনি। পরে বাড়িতে এসে শুনলাম, ফেরিওলাটা অনেকক্ষণ এই উঠানে দাঁড়িয়েছিল। আর দশটি মেয়ে যেমন দাঁড়িয়ে জিনিস কিনছিল কিরণও ছিল তাদের সঙ্গে। কিন্তু আর দশটির হাতের সঙ্গে হাত না ঠেকে কিরণের হাতের সঙ্গেই নাকি লোকটার হাত ঠেকেছিল। ঘরের ভেতর থেকে জিনিসটা তার স্বামীর নজরে পড়েছিল। পড়তেই উঠানে ছুটে এসে বৌকে হাতে ধরে টেনে ঘরে নিয়ে ভীষণ প্রহার। চিৎকার ক'রে সারা দুপুর কাঁদছিল বেচারা।'

কথা শেষ ক'রে শিবনাথ হাসল। রুচি গম্ভীর।

'লেখাপড়া না শেখার যা দোষ। অত্যন্ত কন্‌জার্ভেটিভ এই লোকটা। অমল চাকলাদার। এদিকে কিন্তু শ্রীমানের চাকরি নেই। চায়ের দোকানে উনিশ টাকা বাকি।'

কিন্তু রুচি হঠাৎ একটু বেশিরকম গম্ভীর হয়ে আছে দেখে শিবনাথ চুপ করল।

মঞ্জুর খাওয়া শেষ হ'তে ওর হাতমুখ ধোয়াতে রুচি উঠে যায়। শিবনাথ সিগারেট ধরায়। সিগারেট ধরিয়ে ভাবে এখন এই অবস্থায় সকালের সেই কে গুপ্ত এবং তার সিনেমার বন্ধু চারু রায়ের মধ্যে এ বাড়ির মক্ষিরাণী কিরণকে নিয়ে যে-গল্পটা হয়েছিল রুচিকে সেটা বলা ঠিক হবে কিনা। অবশ্য এ-গল্পের সঙ্গে রুচিও এক জায়গায় সূক্ষ্মভাবে জড়িয়ে আছে। ভেবে শিবনাথ মনে মনে হাসল। কিন্তু আবার মঞ্জুর হাতে ধরে স্ত্রীর ঘরে ফিরে আসার পর তার চেহারা দেখে শিব-
[illegible]

বহুক্ষণ সেটা কেবল তার মগজের মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে লাগল।

রাত্রে শিবনাথ এবং রুচি দু'জনেই শুনল পাশের কোন্ একটা ঘরে অত্যন্ত কর্কশ গলায় কে কাকে গালাগাল দিচ্ছে।

'আমি তোমায় পুনঃপুনঃ নিষেধ করেছি মুদিদোকান থেকে আর ধারে জিনিস এনো না, ও চার আনার সওদা ধারে আনলে অমনি খাতায় আট আনা ডবল দাম লিখে রাখে,—বনমালী হারামজাদা আমাদের সর্বস্ব গিলতে চাইছে তুমি কি জান না?'

প্রতিপক্ষের গলা শোনা গেল না।

'এটায় কুলোচ্ছে না ওটা ফুরিয়ে গেল রব ছাড়া তোমার মুখে আমি অন্য কথা শুনি না, যখনই ঘরে আসি।'

'আমার তো একটা মুখ না। ঘর ভরে ফেলছ বাচ্চা দিয়ে, চাল থেকে নুন, ডাল থেকে কয়লা চিনি থেকে কাঠ কেরাসিন কোন্‌টা কম লাগছে, এর চেয়ে কম দিয়ে কে চালাতে পারে একবার তুমি ঘরে এসে আসন পেতে দ্যাখ না।'—স্ত্রী-কণ্ঠ।

'না, আমি বাইরে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছি। গায়ে হাওয়া লাগাচ্ছি, বেশত, একবার ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে দ্যাখো না ক' টাকা রোজগার ক'রে আনতে পার। হ্যাঁ, আমি ভাত সেদ্ধ করছি।' পুরুষের বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠ।

'তোমার চেয়ে অনেক বেশি পারি আমি। তোমার মত গাধা না সবাই। এমন মোটা বুদ্ধি! ইস্কুলের মাস্টারি ছাড়া সংসারে আর টাকা রোজগারের পথ নেই।' বিদ্রূপ আরও কড়া।

'কি করতে, সিনেমায় নামতে, ওই চেহারায়! বারো সন্তানের মা হয়ে। গায়ে থু-থু দেবে সব, হা-হা।' পুরুষ হেসে উঠল।

'এই, সাবধানে কথা বলো বলছি, অসভ্য! না হলে গায়ে ভাতের গরম মাড় ঢেলে দেব। কী কুৎসিত চরিত্র হয়েছে তোমার দুটো গাধা মেয়ে পড়িয়ে পড়িয়ে। কেন আমি কি বলেছি নাকি যে সিনেমায় নামব। সাধনা,
[illegible]

বোন মানুষ করা। আমি কালই [illegible] তোদের মামাবাবুর বাসায় চলে [illegible] দাদা সেদিন এই সংসারের ও [illegible] নিজের স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে [illegible] ফেলেছিলেন। বলছিলেন চল [illegible] ক'দিনের জন্যে ভাইঝি, তোর [illegible] কাছে থাকবি। কালই আমি চলে [illegible] পারি ইচ্ছে করলে, আমায় বেশি [illegible] না বলছি।' লক্ষ্মীমণির [illegible] হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একসঙ্গে [illegible] ক'রে উঠল, 'না মা তুমি [illegible] চলে গেলে বাবা আমাদের [illegible] চিঁড়ে আর মুড়ো [illegible] ফেলবে। আমরা মরে যাব।'

'এই চুপ, চুপ' [illegible] বিধুমাস্টারের প্রচণ্ড [illegible] অন্ধকারে কেঁপে উঠল। [illegible] একলা হাতে কদিক সামলাব [illegible] ভাত-রান্না, চৌদ্দটি [illegible] হয় না। হ্যাঁ, চিঁড়ে কেন [illegible] তোদের মা কোথাও [illegible] তোদের গুষ্টিকে আমি [illegible] খাইয়ে রাখব। আমি [illegible]

এর পর লক্ষ্মীমণির [illegible] শোনা গেল না। রাত বাড়তে [illegible] ঘরে ঘরে শোনা যেতে [illegible] ঘুমের গর্জন, লম্বা লম্বা [illegible] সবটাই ঘুম না। সবাই [illegible] জেগে থেকে বিছানায় শুয়ে [illegible] করাত চালিয়ে অন্ধকার চিরছে [illegible] সেই শব্দ ঘুমের ফ্যাক্টরির [illegible] ডিউটিরও অভিশপ্ত শ্রমিকদের [illegible] ক্লিষ্ট দুর্বল ফুসফুসের [illegible] রুচি জেগে ছিল। শিবনাথ [illegible] ঘুমোচ্ছে।

দিনের বেলা রুচি শিবনাথকে কড়াভাবে বলল, হুট ক'রে [illegible] সাড়ে ছ' আনা দিয়ে একটা [illegible] কেনার বিলাসিতা তাকে ছাড়তে [illegible] নাহলে মঞ্জুকে নিয়ে সে বাড়িতে [illegible] কাকাবাবুর কাছে চলে যাবে। [illegible] একটা বস্তিতে বাস ক'রে সারা রাত [illegible] জোড়া মধুর কণ্ঠের দাম্পত্যালাপ [illegible] জীবনযাপন করতে রুচি রাজী নয় [illegible] দুপুরবেলা সে মঞ্জুকে সঙ্গে [illegible] ইস্কুলে পড়াতে চলে গেল।

সারা দুপুর মন খারাপ ক'রে রইল ...থ। তারপর একটা টাইশানির ...র বেরোবে ব'লে এক সময় পাঞ্জাবী ...র গায়ে দিয়ে রাস্তায় নামল।

...পিছনটা দেখেই শিবনাথ দু'জনকে ...তে পারল। কমলা এবং ন' নম্বর ...বীথি। টেলিফোনে কাজ করে ...র ছোট বোন।

...সাধারণত রুচি যে-ধরনের চুল বাঁধে ...র দু' জনের চুল বাঁধার ধরন তা ...একটু আলাদা।

কমলার চুল ভাঁজ করে রাখা চুপির ... বীথিরটা মাঝখানটা গর্ত রেখে ...ের মেন্দুরের মত ফাঁপানো। এক-...র কানে রিং, একজনের ছোট্ট দুটো ...মস্কদানা। লাল আর বেগুনি ... একজনের পায়ে চটি আর জনের ...নর্ডালের স্মার্ট হয়ে চলতে হয় ...মনের শান্ত শিবনাথ অনুমান ...

...ওরা বাঁক ঘুরে মেন্ রোডে পড়তে ...নাথও সেই রাস্তা ধরে চলল।

...মলা নুয়ে একটা লোকের কাছ ...চিনেবাদাম কিনল, তারপর বীথির ...এক মুঠো ছেড়ে দিয়ে দু'জনে ...টোপা মুখে দিয়ে আবার কথা ...বলতে চলল।

...পিছনে থেকে শিবনাথ সিগারেট ...

...'টি রাস্তা খুঁজে পেয়েছে আর ...নেই। হ্যাঁ, আমিই ওকে বলেছিলাম ...টি ছেড়ে দে। যদি পয়সার মুখ ...তে চাস আফিসে ঢোক্। তাই তো ...টিফিসে ঢুকেছে।'

'আমি তো খুঁজছি কমলাদি। আমি ...রে সুবিধে করতে পারছি না। ...সেই তো তোমাকে বলা।' বীথি ...ক'রে ডান হাতটা কমলার কোমরে ...ল। 'দিদির মত একটা আমায়ও' ...খে ক'রে দাও।'

উত্তরে কমলা কিছু বলল না। ...টা আকাশের দিকে তুলে কি একটু ...ল।

'হ্যাঁ, দিদি আমার চেয়ে স্মার্ট, কথা-...য় ঢের বেশি চোখামুখা। তাই তো ...র হয়ে গেল।'

'তোরও হবে।' কমলা বীথির দিকে চোখ নামাল। 'অ্যাদ্দিন তো আর রাস্তায় বেরোসনি। ভাবছিলি ধেলে-ঘাটাটাই বুঝি কোলকাতা শহর।'

শুনে বীথি লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল।

'হ্যাঁ তা-ও বটে। এই সেদিনও কেমন ভয়-ভয় করছিল একলা বেরোতে। শেয়ালদা পর্যন্ত যেতেও বাসে উঠতে অনেক দিন সাহস পেতাম না। বেশি ভিড় দেখলে তো কথাই নেই। তাছাড়া ঠিক করে রেখেছিলাম গুরু-ট্রেনিং পাশ করে এদিককারই একটা ইস্কুলে-টিস্কুলে ঢুকে পড়ব।'

'দূর বোকা! কেন ইস্কুলে শুকিয়ে মরতে যাবি। কী হয়েছে তোর যে, ইস্কুল ছাড়া গতি নেই?' সোহাগ-মাখা অথচ শাসনের সুর কমলার।

বীথি আবার লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল।

'এমন যার ভুরু, এমন নাক তার কিনা—' কথাটা কমলা শেষ করল না।

'শুধু চেহারা ভাল হলেই চাকরি পায় মেয়েরা এমন চাকরি আছে কমলাদি?'

'আছে', কমলা বলল, 'লেখাপড়া জানা দূরের কথা, কথা বলতে পারে না কানে শোনে না এমন কি চোখেও দেখে না অন্ধ মেয়ে চেহারা ভাল হওয়াতে চাকরি পেয়েছে কোনো আফিসে আমি জানি।'

ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে কি যেন ভাবল বীথি। তারপর প্রশ্ন করল, 'কি কাজ? চোখে দেখতে পায় না সে আবার কাজ-কর্ম করবে কী?'

'এই আর কি। চোখে দ্যাখে না মানে কাজকর্ম যা করে সবটাই ভুল হয়। কাজের দিকে মন না রেখে কাজ করলে যা হয়?'

'বকুনি খায় না ভুলের জন্য?'

'বকতেই তো ভিতরে ঘন-ঘন ডাক পড়ে।'

'কা-র, মেয়েটার? কে ডাকে?'

'ওপরওলা।'

'কতদিন বকছে? এভাবে তবে আর ওকে রাখছে কেন?'

'এত-ভাল-চোখের-পাতা মেয়ে হুট্ করে পাওয়া যায় না বলেই। যে-দিন পাওয়া যাবে সেদিন হয়তো মন দিয়ে কাজ করে না বলে ওর চাকরিটি যাবে।'

বীথি চুপ ক'রে রইল।

'মাইনে তো বকুলের জল-খাবার কেনার পয়সা।'

'অথচ অই টাকা মানে নম্বর্ই টাকা-ই তো বকুল ফি-মাসে ঘরে আনে এবং এই দিয়ে সারা মাসের ওদের সংসার খরচ চলে। মায় রাণী-টুনির ইস্কুলের বেতন। এই দিয়ে কুলোতে পারছে না বলে বকুল সন্ধ্যার পর একটা গানের টুইশানি নিয়েছে।'

'হ্যাঁ, অই একটা টুইশানির টাকায়ই তো ও গেল মাসে হার গড়িয়েছে।'

'হার নাকি ওর কোন্ জ্যাঠামশাই দিয়েছে?'

'বাড়িতে বকুল একথা বলেছে নাকি, বাড়ির লোকেরা কি তাদের এমন একজন আত্মীয় আছেন জানতেন না। বকুলের বাপ না খেয়ে রাত জেগে জেগে প্রেসের কাজ ক'রে শেষটায় টি বি হয়ে মরল। এই তো মাস ছ'য়েকেরও কথা না। জ্যাঠামশাই ব'লে কেউ উঁকি দিতে এলেন না, আর আজ অমনি বকুলকে আহ্লাদ ক'রে চার ভরি সোনা দিয়ে হার গড়িয়ে দিলেন!'

যেন বীথিরও একটু চোখ খুলল।

'কে তবে এই জ্যাঠামশাই?'

'অফিসের ম্যানেজার।' কমলা বলল, 'তার কাছেই রোজ সন্ধ্যার পর যায়, গান শেখাতে নয় শোনাতে।'

বীথি অতিমাত্রায় গম্ভীর।

লক্ষ্য ক'রে কমলা হাসল।

'যাকগে সেসব আফিসে কাজ নিয়ে আমার দরকার নেই। অত টাকাও আমাদের লাগে না, দিদি যা পাচ্ছে আর আমার যদি মোটামুটি রকম একটা ইনকাম থাকে তবেই যথেষ্ট।' বীথি কমলার দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ, তা তো বটেই।' ঘাড় নাড়ল কমলা। 'সেসব আফিসে ঢুকে চোখ দেখিয়ে গায়ের রং দেখিয়ে তুই মোটা ইনকাম করবি আমি বলছি না। বলছিলাম চেষ্টা থাকলে এই বিদ্যায় এই চেহারায় তুইও বকুলের মতন, মতন কেন, বেশি রোজগার করতে পারিস।'

'থাক।' অস্ফুট একটা শব্দ করল বীথি।

'কিন্তু তা ব'লে ইস্কুলে টিচারি করতে তুমি যেও না,' কমলা আবার আকাশের দিকে তাকাল। 'ওতে কোনো-দিনই অবস্থার পরিবর্তন হয় না, দিনের নাগাল পাওয়া যায় না। গরীব থেকে যাবে।'

বীথি একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল।

'তা কি আর বুঝি না, তা কি চোখে দেখছি না।'

'বারো নম্বর ঘরের নতুন ভাড়াটে রুচিদিকে দেখলি তো কাল?'

বীথি ঘাড় নাড়ল।

'দেখতে-শুনতে এমন ভাল, তার ওপর বি-এ পাশ। অথচ কি বা ঘরের চেহারা, কি তাঁর শাড়ি-ব্লাউজ! আমি তো দেখে অবাক। এ-বাড়িতে, বাড়িতে কেন পাড়ায় খুঁজলে ক'টা আর বি এ পাশ মেয়ে পাওয়া যায়। তার সংসারের এই ছিরি!

'আমার মনে হয় শিবনাথবাবুর চাকরি নেই। মুখে প্রকাশ করছে না বটে, কিন্তু দেখলে বোঝা যায়।' ফিক্ ক'রে বকুল হাসল।

কমলা হাসল না।

'না-ই বা থাকল স্বামীর চাকরি। না থাকা অস্বাভাবিকও না। চারদিকে এত ছাঁটাই চলেছে। কিন্তু তুমিই কোন্ বুদ্ধিতে ইস্কুলে পড়ে [illegible] বরং ও-বেচারার যখন কাজ নেই, ও আফিসে ঢুকে—

কমলা কথা শেষ করল না।

'বুদ্ধির দোষ।' বীথি বলল।

'নাহ'লে আড়াই জনের সং[illegible] কমলা এবার অল্প শব্দ ক'রে হা[illegible] 'দু'জনের চাকরি না করলেও চ[illegible] ইস্কুলের চাকরি ছাড়া আর কিছু [illegible] না পণ থাকলে অবশ্য অন্য কথা।'

বীথি নীরব।

'তাই বলছিলাম।' কমলা শেষ [illegible] 'এ-দিনে এই দুর্দিনে এতটা [illegible] হয়ে লাভ কি, কষ্ট পাওয়া ছাড়া।' [illegible] শেষ ক'রে সে রুমাল দিয়ে মুখ মু[illegible] দেখাদেখি বীথিও [illegible] রুমালটি কপালে মুখে [illegible] ভাঁজে ব্যাগে পুরল। শেয়ালদার [illegible] এসে গেছে। দু'জন গিয়ে [illegible] উঠল।

লাইট-পোস্টের আড়ালে দাঁ[illegible] শিবনাথ ভীষণ ঘামছিল। রুমাল [illegible] ঘাড় এবং কপাল মুছল।

শিবনাথ ভেবে অবাক হ'ল, [illegible] এতটা সময় দাঁড়িয়ে কথা বলল [illegible] একবার পিছনে ফিরে তাকাল না [illegible] না কে এপাশে দাঁড়িয়ে। কিন্তু [illegible] শিবনাথই কি বেশি লজ্জা পেত না [illegible]

বাস সরে গেছে।

ধারে-কাছে পরিচিত কেউ নেই [illegible] শিবনাথ বিড়ি ধরায়। বিড়ি খাচ্ছে [illegible] শিবনাথের দুঃখ হয় না। দুঃখের [illegible] কারণ আছে, ভাবল সে।

(ক্রম[illegible]

মাছ ও ম্যালেরিয়া

হিমাংশুলাল সরকার

ম্যালেরিয়া জ্বরে ধরলে কুইনাইন খেতে হয় একথা ... শিশুও জানে; কিন্তু ... উপায়ে ম্যালেরিয়া জ্বরের ...পাটন করা যায় তা বড় বৈজ্ঞানিকেরাও আজ পর্যন্ত ... করতে পারেন নি। ম্যালেরিয়া থেকে মনুষ্যকুলকে রক্ষা ...জন্য বৈজ্ঞানিকগণ বহুদিন ধরে প্রচেষ্টা করে চলেছেন। আজও ... রকম নতুন নতুন উপায় ... করেছেন। বৈজ্ঞানিকদের এই প্রচেষ্টা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ... পদ্ধতি অনুসারেই হয়। ... প্রক্রিয়া ছাড়া মৎস্য চাষের ... ম্যালেরিয়া নিবারণের একটি উপায়ও আছে।

... আমাদের প্রথমেই জানা ... মানুষ কীভাবে আর কী করে ... আক্রান্ত হয়। এনোফিলিশ ...য় মশা ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের ...। এই মশা ম্যালেরিয়া রোগীর ...থেকে প্যারাসাইট সংগ্রহ করে ...লোকের শরীরে প্রবেশ করায়। ...ধ্যে প্যারাসাইটের জীবনচক্রের ...cycle) কিছুটা মশার দেহের ... ঘটে যায়। সুতরাং এই ...রিয়া প্যারাসাইটের বহনকারী ...কুলের ধ্বংস সাধন করতে ...ই প্যারাসাইটের জীবনচক্র সম্পন্ন হতে পারবে না, ফলে রোগের প্রকোপ কমে যাবে।

মশা জন্মেই মশা হয় না। প্রথম অবস্থায় এদের শূককীট বলা হয়। এর পর পাখা গজালে মশক নামে পরিচিত হয়। ডানা গজানর আগেই এদের ধ্বংস করে ফেলা সহজ হয়। ডিম্ব অবস্থা থেকে ডানা গজানর আগে পর্যন্ত এরা জলেই বৃদ্ধি পায়, পক্ষান্তরে জলা ডোবাই মশার জন্মস্থান। জলে থাকাকালীন এদের নষ্ট করে ফেলা বিশেষ দরকার। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মশারা অপরিষ্কার ও অব্যবহার্য জলাশয়েই ডিম পাড়ে। সুতরাং এই ধরনের জলাশয় যদি কোনও রকমে ব্যবহারোপযোগী করে তোলা যায় তাহলে মশার ডিম পাড়া বন্ধ করা সম্ভব। কথাটা যত সহজে বলা যায় তত সহজে কার্যকরী হয় না। আমাদের দেশে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে মজা হাজা খাল বিল ডোবা পুকুর ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে আছে। বর্তমানে এই সব অব্যবহার্য জলাশয়গুলি ব্যবহারোপযোগী করে তোলা খুবই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। অবশ্য এখানে একটা কথা উল্লেখ করে রাখা ভাল যে, এই সমস্ত জলাশয় সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে না পারলেও কিছুটা পরিষ্কার করতে পারলেই ম্যালেরিয়া নিবারণ করা যায়। কারণ, জলাশয়ের পাড় থেকে আরম্ভ করে ৭।৮ ফিট জায়গার মধ্যে মশারা ডিম পাড়ে সুতরাং পাড়ের কিনারা থেকে ৭।৮ ফিট পরিমাণ স্থান পরিষ্কার করলেই চলে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ম্যালেরিয়া দুটি উপায়ে দমন করা যেতে পারে। রাসায়নিক পদার্থ জলে ছড়িয়ে বা মিশিয়ে মশার বাচ্চাগুলোকে ডিম ফুটে বার হওয়ার আগেই মেরে ফেলা সম্ভব। দ্বিতীয় উপায়টি হচ্ছে মৎস্য চাষের সাহায্যে মশককুল ধ্বংস করা। কয়েক জাতীয় শূককীটভোজী মাছ আছে, ইংরাজীতে এদের লার্ভিসাইডাল মাছ (Larvicidal fish) বলে। জলে যে সব কীটপতঙ্গের ডিম ও বাচ্চা জন্মায় এরা ঐগুলো খাদ্য হিসাবে খেয়ে ফেলে। যে সমস্ত জলাশয়ে এই রকম মৎস্যভোজী মাছ খুব বেশী পরিমাণে থাকে সেখানে কীটপতঙ্গ জন্মাতে পায় না। এই জাতীয় মাছদের শূককীট একমাত্র খাদ্য। এই সব মাছেদের যদি অপরিষ্কার এবং অব্যবহার্য পুকুরে রাখা হয় তাহলে এরা মশার ডিম ও বাচ্চাগুলি খেয়ে ফেলবে। দেখা গেছে যে, এই সব শূককীট-ভোজী মাছেদের

পুরুষ 'লেবিস্টিস'

স্ত্রী 'গামবুশিয়া'

যে কোনও পুকুরে বিনা যত্নেও খুব সহজেই রাখা যায়। পোনা মাছের মত এদের যত্ন সহকারে চাষ করতে হয় না। পোনা মাছেরা কোনও সময়েই বদ্ধ জলাশয়ে ডিম ছাড়ে না এবং বছরে একবার প্রতি বর্ষায় বহতা জলে ডিম ছাড়ে। কিন্তু বিভিন্ন শূককীটভোজী মাছ যে কোনও বদ্ধ জলাশয়ে বছরে দু তিনবার করে ডিম ছাড়ে। এই কারণে এই সব মজা হাজা জলাশয়ে কিছু পরিমাণ শূককীট-ভোজী মাছ যদি একবার ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে কয়েক বছরের মধ্যে এদের বংশ এত বেশী বৃদ্ধি পাবে যে, তখন আবার কিছুটা জাল টেনে এদের উঠিয়ে নেওয়ার দরকার করবে।
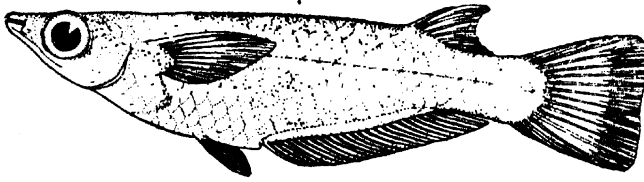
শূককীট-ভোজী মাছ নানা প্রকারের হয়। এদের মধ্যে কয়েক প্রকার মাছ একান্তভাবেই শূককীট-ভোজী, সুতরাং এদের উপকারিতা অন্যান্য মাছের তুলনায় বেশী। ১৮৫৪ সালে যুক্তরাজ্যের ডাঃ ফোর্ট সর্বপ্রথম শূক-কীট-ভোজী মাছেদের উপকারিতা পরীক্ষা করে দেখান। এর পর থেকেই ক্রমশ মানুষ এই সব মাছেদের ম্যালেরিয়া নাশনের কাজে লাগাতে থাকে। এই সব শূককীট-ভোজী মা[illegible] মধ্যে "এ্যাপলোকাইলাস" ও [illegible]ম্বুশিয়া'র নামই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

"এ্যাপলোকাইলাস"-কে আমরা সাধারণভাবে তে-চোখা মাছ বলি। এগুলি ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রদেশে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রদেশে এরা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। বাঙলা দেশে এদের তে-চোখা ছাড়া "পান চোখী" ধেনু চুনো ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। আসামে "কান পোনা", উড়িষ্যাতে "গুনজা", যুক্ত-প্রদেশে এবং পাঞ্জাবে "লাল জিংগরা" প্রভৃতি বলা হয়। জলের মধ্যে থেকেও তে-চোখা মাছ খুব সহজেই চেনা যায়। এদের মাথার ওপর দিকটা চ্যাপ্টা আর মাথার ঠিক মাঝখানে একটা সাদা দাগ দেখতে পাওয়া যায়। এই দাগটাকে লোকে আর একটা চোখ বলে ভুল করে। আর সেইজন্যই এদের "তে-চোখা" মাছ বলা হয়। এই মাছগুলোর লেজের দিকটা সুচোল এবং শরীরের দুই দিকই কিছু চাপা, মুখটা খুব বড় আর হাঁ-টা একটু ওপর দিকে তোলা। "তে-চোখা" সব সময় জলের ওপরভাগে বাস করে। জলের উপরিভাগে বাস করার জন্য এবং মুখের গঠনের বিশেষত্বের জন্যই এরা অনায়াসেই মশার বাচ্চা-গুলো খেতে পারে। "তে-চোখা" মাছ পাঁচ মাস বয়সেই ডিম পাড়তে থাকে এবং সারা বছর ধরে ডিম পাড়ে। তিন সপ্তাহ বয়স থেকে এরা মশার ডিম ও বাচ্চা খেতে থাকে।

তে-চোখা

"গামবুশিয়া" আসলে এ দে[illegible] মাছ নয়। এই মাছ প্রথমে [illegible] থেকে এনে আমাদের দেশে চাষ [illegible] হয়েছিল। এখন অবশ্য এগুলো [illegible] ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে। [illegible] চোখা" মাছের মত "গামবুশিয়া" ম্যালেরিয়া ধ্বংসকারী। এই [illegible] ধরনের মাছের পর "লেবিসটিস"-এর [illegible] করা যায়। এটিও এদেশীয় মাছ [illegible] প্রথমে বিদেশ থেকে এনেই এখানে [illegible] করা হয়েছে। "লেবিসটিস"গুলো [illegible] না পেড়ে একেবারে বাচ্চা প্রসব ক[illegible] এর পর বাংলাদেশের মৌরলা (এম্[illegible] ফ্যারিংগডন), ডানকুনি (রাসবোর দাঁড়িকে (ঈশোমাস্), অঙ্কু (ভানিও) খলসে (কলিসা), পুঁটি জাতীয় (বা[illegible] বাস), ন্যাদস (ন্যানডাস), [illegible] (বেডিস), চাঁদা (এ্যামবাসিস), [illegible] (চেলা), কই (এ্যানাবাস) ইত্যাদি [illegible] গুলিও অল্পাধিকতর কীট ভোজী [illegible] এগুলিও জলাশয়ে থাকলে মশক[illegible] নাশ করতে পারে।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মশক [illegible] ধ্বংস সাধনের ব্যবস্থা খুবই [illegible] অপরপক্ষে মৎস্য চাষের সাহায্যে [illegible] ধ্বংস করা এত বেশী সুবিধ[illegible] হতেও পারে। কিন্তু [illegible] প্রক্রিয়ার তুলনায় এ ব্যবস্থা অ[illegible] ব্যয়সাধ্য। বিশেষত আমাদের দে[illegible] রকম বহুলভাবে জলা ডোবা খা[illegible] ইত্যাদির অবস্থিতি তাতে মৎস্য চা[illegible] সাহায্যে মশা নাশনের ব্যবস্থা কর[illegible] সহজ উপায় বলেই মনে হয়। তার [illegible] সব মাছ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার কর[illegible] মাছের সমস্যার কিছুটা সমাধান [illegible] এ সব মাছ খুব সুখাদ্য না হ[illegible] অখাদ্য কিছু নয়। বস্তুত এ[illegible] ব্যয়ে এবং অল্প আয়াসে মশা তাড়ানো এই ব্যবস্থা একাধারে "রথ দেখা ও কলা বেচা"র সমতুল্য।

গোয়া, দমন, দিউ

মৃত্যুঞ্জয় রায়

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকে ভারতের উপর বিদেশী রাষ্ট্রশক্তিগুলির হামলা শুরু হয়। প্রথমে আসে পর্তুগীজ। তারপর আসে স্পেন, ফরাসী, ইংরেজ, ডাচ ইত্যাদি অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে নিয়ে তারা সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখতে থাকে। কিন্তু সে স্বপ্ন একমাত্র ইংরেজ ছাড়া আর কারুর বেলায় বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। [illegible] গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত ভারতের কোন কোন অঞ্চল দখল করে নিজেদের ঝাণ্ডা উড্ডীন করে রাখে। কিন্তু সে সময়ে 'সিংহের ভাগ' ভোগ করে ইংরেজই। কিন্তু তাকেও সাত বছর আগে ভারত ছাড়তে হয়েছে। তার সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ভারতকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করতে হয়েছে। কিন্তু আরও দুটো যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি স্বাধীন ভারতের বুকে স্বকীয় ঘাটি অটুট রাখবার চেষ্টা প্রকাশ করছে তারা হচ্ছে ফরাসী এবং পর্তুগীজ সরকার। এর মধ্যে ফরাসী অবশ্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন কোন জায়গা, যেমন—চন্দননগর এবং মাহে থেকে তাদের শাসন-ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে ভারত থেকে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ লুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু এ ব্যাপারে গোয়ার্তুমি করছে পর্তুগীজ সরকার। সে ভারতের বুক থেকে তার সাম্রাজ্যবাদী প্রতীক মুছে ফেলতে রাজী নয়। গোয়া, দমন, দিউ ভারতের এই তিনটি স্থান যেখানে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের ঘাটি এখনও বর্তমান, তা ছেড়ে চলে যেতে পর্তুগীজ সরকার সম্মত নয়। এ'দেরকে হটিয়ে দিয়ে গোয়া, দমন, দিউকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া ভারত সরকারের পক্ষে কঠিন কাজ নয়। আলাপ-আলোচনা দ্বারা সকল সমস্যার সমাধান বাঞ্ছনীয় বলে ভারত সরকার মনে করেন, তাই শক্তি প্রয়োগে তাঁরা বিরত আছেন। কিন্তু পর্তুগীজ সরকারের যে রকম মনোভাব দিনে দিনে প্রকাশ পাচ্ছে এবং ঐ স্থানত্রয়ে ভারতভুক্তি আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের উপর পর্তুগীজ সরকারের উৎপীড়নের প্রকোপ যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, মনে হয় না—ভারত সরকার আর বেশী-দিন নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারবেন। বিশেষ করে আগামী ১৫ই আগস্ট যদি ভারতস্থিত গোয়ার অধিবাসীদের ভিতর থেকে সংগৃহীত স্বেচ্ছাসেবক দল গোয়া অভিযান শুরু করে, তবে পরিস্থিতি যে গুরুতর হবে না, তা কে নিশ্চয় করে বলতে পারেন?

ভারতের বাজার বহুকাল থেকেই পশ্চিমী শক্তিগুলিকে প্রলুব্ধ করেছে। কিন্তু ভারতে আসার পথ তাদের জানা ছিল না, তাই এসে ভারতকে লুট করার সুযোগও তাঁরা পায়নি। এই সুযোগ
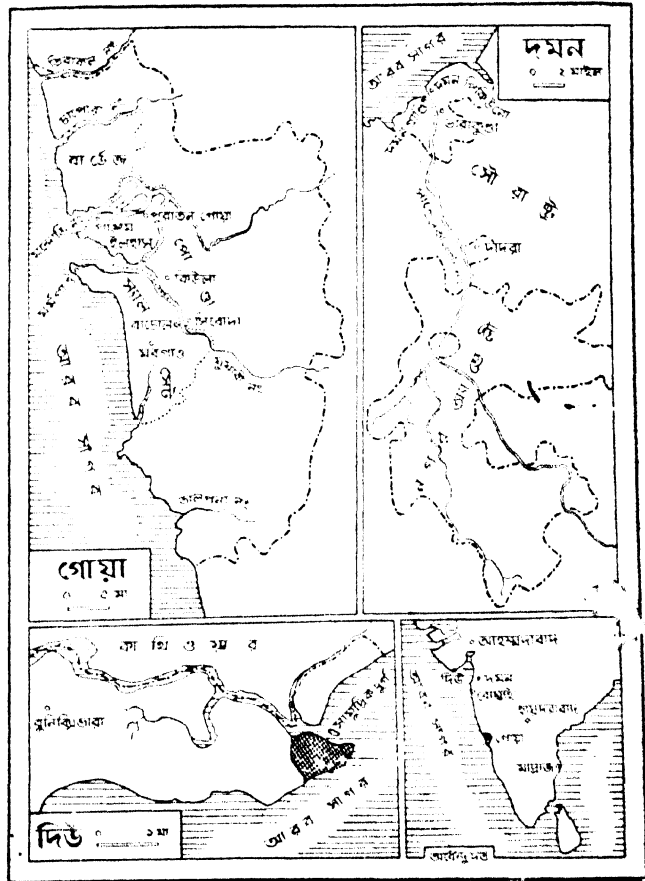
গোয়া, দমন ও দিউ-র মানচিত্র
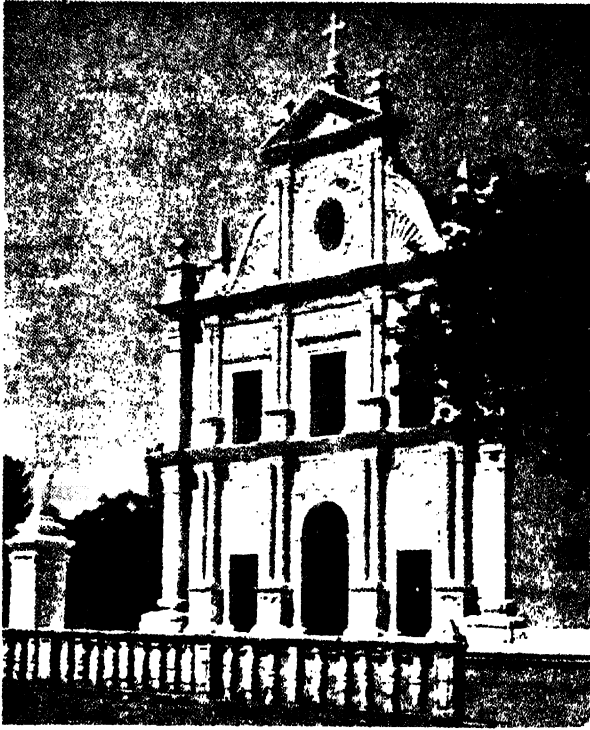
দিউ-র সেণ্ট পল গীর্জা। ১৬০১ খৃষ্টাব্দে গীর্জাটি নির্মিত হয়

করে দেয় ভাস্কো-দা-গামা। উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে জাঞ্জিবার হয়ে ভাস্কো-দা-গামা ভারতের উপকূলে উপনীত হয় ১৪৯৮ সালে। তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ছিল মসলার ব্যবসা করা। কারণ, তখন এটাই ছিল অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। গ্রীক, আরব, মিশর প্রভৃতি দেশের নাবিকদের আপত্তি সত্ত্বেও কালিকটের জামোরিণ উপাধিধারী হিন্দু রাজা তাকে বন্দরে ফ্যাক্টরী করার অনুমতি দেন। কিন্তু সেজন্যে দা-গামা প্রস্তুত হয়ে আসেননি। এখানকার অবস্থা সম্বন্ধে নানা তথ্য ও বিভিন্ন মসলার নমুনা নিয়ে তিনি দেশে ফিরে যান। এর প্রায় দু বছর পরে (১৫০০ খৃঃ অঃ ৯ই মার্চ) পেড্রো আলভারেজ কাব্রাল নামে একজন পর্তুগীজের অধীনে ১৩টি মালাবারের বিভিন্ন পণ্যের সঙ্গে বিনিময় করা যায় এমন সব পণ্য সে সঙ্গে করে আনে। কিছু আলাপ-আলোচনার পরেই মালাবার উপকূলে একটি ফ্যাক্টরী করার অনুমতি তাদের দেওয়া হয়। প্রায় ৭০ জন পর্তুগীজ সেই ফ্যাক্টরীতে থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে থাকে। কিন্তু শীঘ্রই ওদের সঙ্গে আরব ও পারস্য দেশীয় বণিকদের সংঘর্ষ বেধে যায়। ফলে তাদের ভারতভূমি থেকে সরে পড়তে হয়। পূর্বেই বলেছি ভারত সাগরে বাণিজ্য করা ছিল তখন অতি লাভজনক। তাই আরও জাহাজ ও সৈন্য নিয়ে কালিকটের জামোরিণকে সাজা দিয়ে ভারত সাগর থেকে আরব ও অন্যান্য বণিকদের হটিয়ে দেবার জন্য ভাস্কো-দা-গামা নিজে আসেন। প্রথমে তিনি ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন। তারপর কালিকটের রাজার কাছে দাবী করেন যে, কালিকটের উপকূলে বাণিজ্য করার অধিকার থেকে আরবদের বঞ্চিত করতে হবে এবং এই উপকূলে বাণিজ্য করার একচেটে অধিকার পর্তুগালকে দিতে হবে। তাঁদের এই অন্যায় আব্দারে রাজী না হওয়ায় কালিকটে বোমাবর্ষণ করা হয়। কিন্তু যুদ্ধে হঠে গিয়ে দা-গামা কালিকট রাজের শত্রু কোচিনের রাজার আশ্রয় নেয় এবং ওখানে আরেকটি ফ্যাক্টরী নির্মাণ করে। এমনিভাবে দক্ষিণ ভারতে রাজায় রাজায় যে বিরোধ ছিল তাতে নিজেকে জড়িত করে তোলে। ভারতে পর্তুগীজ শক্তির সত্যিকারের ভিত্তি স্থাপন করেন Alfonso de Albuquerque.

Albuquerque ভারতে আসেন ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে। তখন তিনি ছিলেন একটি নৌ স্কোয়াড্রনের কমান্ডার। তিনি এসেই কোচিনে একটি দুর্গ নির্মাণ করান। ভারতে পাশ্চাত্য শক্তির এইটি প্রথম দুর্গ। Duarte Pacheco নামক জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষের হাতে তিনি দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করেন। ভারতে পর্তুগীজ স্বার্থ দেখাশোনা করার স্থায়ী কোন বন্দোবস্ত না থাকায় নানা দিক থেকে অসুবিধা দেখা দেয়। এটা দূর করার জন্যে পর্তুগাল সরকার Francisco de Almeida নামক একজনকে তিন বৎসরের জন্য ভাইসরয় নিযুক্ত করে ভারতে পাঠান। ইনিই প্রথম ইউরোপীয় ভাইসরয়। কোচিন দুর্গ শক্তিশালী করার জন্যে আঞ্জাদ্বীপ ও ক্যানানোরে নতুন দুর্গ নির্মাণের জন্য এবং আরব ও পারসিক বণিকদের বাণিজ্যপথ রুদ্ধ করার জন্যে মালাক্কা, ওরমুজ এবং এডেন বন্দর দখল করার জন্যে Almeidaকে আদেশ দেওয়া হয়। Almeida পর্তুগাল সরকারের আদেশ প্রতিপালনের জন্য তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের আদেশ দেন যে, উপযুক্ত স্থানে দুর্গ নির্মাণ করতে হবে। সেজন্যে প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করতেও ইতস্তত করলে চলবে না।

এ সংবাদ পেয়ে এবং Almeida উপকূলে তিন বৎসর থাকবে জেনে কালি-

[illegible] সাগরে তারা তখন যথেষ্ট প্রভাব [illegible] করেছে। কালিকটের রাজা [illegible] পারলেন যে, ভারত সাগরের এ [illegible] যে অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল, [illegible] খর্ব হবে। তাই ব্যাপারটা আর [illegible] তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করলেন [illegible] ১৫০৭ সালে গুজরাটের সুলতানের [illegible] পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে অভিযোগ [illegible] এবং ওদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ [illegible] যদি যুদ্ধ করতে হয়, তাতে [illegible] সর্বপ্রকার সাহায্য করবেন বলে [illegible] দিলেন।

[illegible] পর্তুগীজদের জন্য ব্যবসা-[illegible] অসুবিধা হওয়ায় কায়রোর [illegible] এক নৌবহর পাঠালেন [illegible] করার জন্যে। সেই নৌ-[illegible] সেনাপতি ছিলেন মীর হোসেন। [illegible] থেকে গুজরাটের সুলতানের [illegible] সেনাপতি, দিউর শাসক, মালিক [illegible] সঙ্গে সলাপরামর্শ করলেন। [illegible] দক্ষিণে চৌল এর কাছে [illegible] ও মিশরীয় নৌবহরের [illegible] পর্তুগীজ নৌবহরের সংঘর্ষ বাধল [illegible] পর্তুগীজেরা পরাজিত হল [illegible] কিন্তু এর দমে না গিয়ে [illegible] সালে দিউর কাছে মুসলিম [illegible] সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে [illegible] নৌ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা [illegible] এর পর পর্তুগীজরা দিউতে [illegible] করারও অনুমতি পেলেন।

Almeida-র কার্যকাল শেষ হলে [illegible] Alfoso d' Albuquerque [illegible] হয়ে আবার ভারতে এলেন। তাঁর [illegible] কালিকটের রাজাকে শাস্তি দেবার [illegible] পর্তুগীজরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান [illegible] কিন্তু পর্তুগীজ বাহিনী ভীষণ-[illegible] পরাজিত ও বিপর্যস্ত হয়। এই [illegible] উঠতে পর্তুগীজদের যথেষ্ট [illegible] লেগেছিল।

[illegible] হোক, তিনি কান্নানোর এবং [illegible] থেকে সৈন্য আমদানী করে নিজ [illegible] শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং বিজাপুরে [illegible] অধীন সমৃদ্ধ বন্দর গোয়া [illegible] করে ১৫১০ সালের নবেম্বর [illegible] দখল করেন। এই নগরটিকে [illegible] শক্তিশালী ও বাণিজ্যিক দিক থেকে [illegible] করার জন্য তিনি যথাসাধ্য করেন এবং সেদিক থেকে সফলও হন। ১৫১৫ সালে Albuquerque মারা যান। কিন্তু তার আগে এমন এক শক্তিশালী নৌবহর তৈরী করেন, যা ভারতের পশ্চিম উপকূলে সহজেই প্রভুত্ব করতে পারে।

যাক, তাঁর পরে তাঁর উত্তরাধিকারীরা ভারতের অনেকগুলো বন্দর এবং নগর

জনৈক খৃষ্টান মহাপুরুষের মূর্তি। ইহার সহিত লক্ষ্মীদেবীর মূর্তির আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য লক্ষণীয়

দখল করেন, যেমন—দিউ, দমন, বেসিন, চৌল, বোম্বাই, হুগলী ইত্যাদি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সবই তাদের হারাতে হয়। কেবলমাত্র গোয়া, দমন আর দিউতেই পর্তুগীজদের 'Estado da India' সীমাবদ্ধ থাকে। দু' শতাব্দীর মধ্যেই ভারতের পশ্চিম উপকূল থেকে তাদের প্রভাব প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়।

পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্ন গোয়া, দমন আর দিউ-র কথা এবার বলব।

গোয়া অতি প্রাচীন হিন্দু-নগরী। হিন্দু ধর্মগ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাণে ও অন্যান্য উৎকীর্ণ লিপিতে গোপ, গোপাপুরী, গোমন্ত, গোমনচলা প্রভৃতি নাম দেখতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগীয় আরবী ভূগোলবেত্তারা গোয়াকে বলতেন সিনদাপুর বা সন্দপুর। প্রাচীন কালেও যে গোয়া একটি সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল, তার প্রমাণ আছে। এ রাজ্যে উন্নত ধরনের শাসনব্যবস্থা, অর্থনীতি, বাণিজ্য ও মুদ্রাব্যবস্থা ছিল। এর নৌ এবং স্থল সৈন্যবহরও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। কিন্তু তার কোন পরিচয় এখন আর পাওয়ার কোন উপায় নেই।

সম্রাট অশোক গোয়া পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তার করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর পরে গোয়া শাসন করেন কদম্ব বংশ। ১২২০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৩১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বংশ এখানে রাজত্ব করেন। তারপর গোয়ার শাসনভার চলে যায় মুসলমানদের হাতে। ১৩৭০ সাল পর্যন্ত মুসলমানরা গোয়া শাসন করেন। মুসলমান শাসককে পরাজিত করে বিদ্যারণ্য মাধব নামে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী গোয়া জয় করে নেন। এর পর এক শত বৎসর গোয়া ছিল হিন্দু শাসনাধীনে। ১৪৭০ সালে দাক্ষিণাত্যের বাহমনী সুলতান গোয়াকে জয় করে নেন। পরে যখন বাহমনী রাজ্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়, তখন বিজাপুরের রাজা ইউসুফ আদিল শা-র নিকট গোয়া হস্তান্তরিত হয় (১৪৮২)।

সে সময় গোয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নগর ছিল। কারণ এখান থেকেই মুসলমানরা মক্কা যাত্রা করতেন। ইউসুফ আদিল শা-র সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে পর্তুগীজরা Albuquerque-এর অধীনে ১৫১০ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী গোয়া আক্রমণ করেন। কথিত আছে, এর আগে কোন হিন্দু যোগী নাকি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, গোয়া কোন বিদেশী শক্তি কর্তৃক বিজিত হবে। তাই পর্তুগীজদের আসতে দেখে কেউ কোন বাধার [illegible] করল না। Albuquerque সহজেই গোয়া জয় করে নিলেন। কিন্তু তিন মাস পরে ইউসুফ আদিল শা এসে গোয়ায় হানা দিলেন। Albuquerque পালিয়ে জীবন বাঁচালেন, কিন্তু ভয়ে পেছিয়ে রইলেন না। নানা জায়গা থেকে সৈন্য ও নৌবহর সংগ্রহ করে আবার গোয়া আক্রমণ করলেন। ইউসুফ আদিল শা-র পুত্র ইসমাইল আদিল শা তখন গোয়া শাসন করছেন। তিনি পর্তুগীজদের নিকট পরাজিত

হলেন। Albuquerque নির্বিচারে মুসলমানদের হত্যা করলেন। তারপর তাঁর কাজ হল শহরের চতুর্দিকে যে প্রাচীর ছিল তা সংস্কার করান এবং একটি দুর্গ নির্মাণ করান। একটি গির্জাও তিনি তৈরি করিয়েছিলেন।

গোয়া যে ভারতে কেবলমাত্র পর্তুগীজশাসিত রাজ্যই হল তা নয়, আলেকজাণ্ডারের পর গোয়াই হল সরাসরি ইউরোপীয় শক্তি শাসিত প্রথম ভারতীয় ভূখণ্ড।

গোয়াতে পর্তুগীজ শাসন কায়েম হলেও বহুদিন পর্যন্ত তারা শান্তিতে থাকতে পারেনি। প্রথমত, ওলন্দাজরা যখন ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য করতে এল, তখন তাদের লক্ষ্য হল কি করে পর্তুগীজদের পশ্চিম উপকূল থেকে বিতাড়িত করবে। এজন্য তারা দুবার (১৬০৩ ও ১৬৩৯ সাল) গোয়াকে অবরোধ করে। তারপর মারাঠারাও এই রাজ্যের উপর বার বার হানা দিয়ে পর্তুগীজদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। ১৭৫৯ সালে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর এই বিপদের হাত থেকে পর্তুগীজরা রক্ষা পায়। ১৫৭৫ সাল থেকে ১৬২৫ সাল পর্যন্তই গোয়ার সমৃদ্ধির কাল বলা যেতে পারে।

গোয়ার আয়তন প্রায় ১৫০০ বর্গমাইল। মোট সাতটি জেলার মধ্যে ৪টি জেলা প্রথমেই জয় করা হয়েছিল, তাই ওর নাম 'ওল্ড কনকোয়েস্ট'; আর পরে যে সাতটি জেলা জয় করা হয় তার নাম 'নিউ কনকোয়েস্ট'।

গোয়ার উপকূলরেখা প্রায় ৬২ মাইল দীর্ঘ এবং পর্বতসঙ্কুল। প্রধান দুটি নদীর নাম হচ্ছে মানডোভি আর জুয়ারী। এই নদী দুটোর মুখেই পানাজিম আর মার্মাগোয়া পোতাশ্রয় অবস্থিত।

ওল্ড গোয়া ছিল প্রাচীনকালে গোয়ার রাজধানী। পরে সেখান থেকে রাজধানী সরিয়ে আনা হয় পানজিমে। নোভা গোয়া হচ্ছে ভারতস্থ পর্তুগীজ উপনিবেশের রাজধানী।

ওল্ড গোয়া এখন প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কেবলমাত্র সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স-এর গির্জা ছাড়া ওখানে আকর্ষণীয় কিছু নেই। সেদিক দিয়ে নতুন রাজধানী অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং নয়নমনোহর।

দমনের জনৈকা মহিলার ছবি

গোয়ার মোট লোকসংখ্যার পরিমাণ (১৯৫০ সালের হিসেব মতে) ৫,৪৭,৭০৩। মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই হিন্দু। মুসলমানের সংখ্যা ৯ হাজারের বেশী নয়। তাছাড়া আছে ক্যাথলিক এবং কিছু বর্ণসংকর জাতি। পর্তুগীজ সরকারী ভাষা হলেও এখন শতকরা আট জনও ও ভাষায় কথা বলে না।

গোয়ার জমি উর্বর হলেও কর্ষণযোগ্য জমির মাত্র এক-তৃতীয়াংশে চাষ করা হয়। প্রাচীন পদ্ধতিতেই চাষ করা হয়। ধানই হচ্ছে প্রধান খাদ্যশস্য। বৎসরে দুবার ধান উৎপন্ন হয়; কিন্তু তবু বোম্বাই থেকে চাল আমদানী করতে হয়। ধান ছাড়া নারিকেল, কাজু-বাদাম, কাঁঠাল, আম প্রভৃতি ফল প্রচুর উৎপন্ন হয়। গোয়ার এ্যালফানসো আম খুব প্রসিদ্ধ। এই আম ছাড়া নারিকেল, মসলা ও লবণ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। মাছধরা লোকের একটি প্রধান উপজীবিকা। তাছাড়া নারিকেল তৈল তৈরী, জুতা তৈরী, পটারী প্রভৃতি কাজে অনেকে নিযুক্ত আছে।

এই হ'ল মোটামুটি গোয়ার কথা। এবার অপর দুটি উপনিবেশের কথা বলা যাক।

দমনের আয়তন হচ্ছে ১৪৮ বর্গমাইল, বোম্বাই শহর থেকে ১ শত মাইল উত্তরে অবস্থিত। দমন তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা—মূল নগর দমন, দাদরা [illegible] আর নগর হাভেলি। দাদরা আর নগর হাভেলির মধ্যে ভারতীয় ইউনিয়নের [illegible] ৫।৭ মাইল প্রশস্ত ভূমিখণ্ড রয়েছে।

দমনের উপকূলরেখা মাত্র ছয় মাইল দীর্ঘ। প্রধান নদী দমনগঙ্গার [illegible] রাজধানী দমন অবস্থিত। দমনে [illegible] দুর্গ রয়েছে, তার একটি [illegible] প্রাসাদ, অপরটি সরকারী ভবন।

এখানকার জমিও খুব উর্বর। [illegible] শস্য ধান। তামাক, গম, শণ, ইক্ষু [illegible] কিছু কিছু জন্মায়। কর্ষণযোগ্য [illegible] এক-তৃতীয়াংশেও আবাদ করা হয় [illegible] এখানকার বনসম্পদ খুব [illegible] গভীর জলে মৎস্যশিকার ও [illegible] তৈরী দমনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ [illegible] এককালে দমন [illegible] রঞ্জন ও বয়নের জন্য প্রসিদ্ধ [illegible] বর্তমানে বৈদেশিক বাণিজ্য নেই [illegible] চলে।

দমনের লোকসংখ্যা ৬৯,০০০। [illegible] সংখ্যার অধিকাংশই হিন্দু।

পর্তুগীজদের বোমাবর্ষণের [illegible] ভারতের পশ্চিম উপকূলের যে [illegible] স্থান বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত [illegible] দমন তারই অন্যতম। সেই বোমা[illegible] শুধু বোমাবর্ষণ নয়, দমনের অধিবাসী[illegible] নির্বিচারে হত্যার কাহিনী সত্যি মর্ম[illegible] এই হত্যালীলা প্রথম শুরু হয় ১[illegible] সালে। নিজেদের অবাধ বাণিজ্যের [illegible] বাধা অপসারণের জন্য পর্তুগী[illegible] ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থ [illegible] রাজ্যের শাসককে সায়েস্তা করার [illegible] অভিযান আরম্ভ করে। Dioga [illegible] Silveira ছিলেন সেই অভিযানের [illegible] ম্যাঙ্গালোর, সুরাট প্রভৃতি বাজা[illegible] করে Silveira দমনের উপর হানা [illegible] দমন তখন গুজরাটের সুলতানের [illegible] বন্দর মাত্র। পর্তুগীজদের আ[illegible] দমনের অধিবাসীরা ভয়ে সব প[illegible] করে। Silveira নির্বিবাদে দেশ[illegible]

[illegible] ভস্মে পরিণত করে। এর পর পর্তুগীজরা আরও দু'বার দমনের উপর হানা দেয়। পরে ১৫৫৮ সালে পর্তুগীজ [illegible] ডন কন্সটানটিনো ব্রাগাঞ্জা দমন দখল করে নেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন মারাঠারা গুজরাটে তাদের শাসন-ক্ষমতা স্থাপন করে, তখন পর্তুগীজরা [illegible] মুক্তিপণ হিসেবে দাবী করে। মুক্তিপণ দাবী করার কারণ হচ্ছে মারাঠা [illegible] ভুলে পর্তুগীজদের নৌ-[illegible] লুঠ করেছিল। যা হোক, [illegible] সমস্ত দমন প্রত্যর্পণ করতে [illegible]। ১৭৮০ খৃঃ ৬ই জানুয়ারী [illegible] চুক্তি করে [illegible] হাভেলী [illegible] পর্তুগীজদের নিকট হস্তান্তরিত [illegible] তাদের সঙ্গে সর্ত থাকে [illegible] দুর্গ [illegible]। কিন্তু দমন [illegible] সুরক্ষিত করা হয়েছিল, [illegible] ফলে নগর [illegible] ও দমন এ দুটি স্থানই তাদের [illegible] এসে যায়। এ দুটো স্থানের মধ্যে [illegible] যে ভূমিখণ্ড ছিল, তা নিয়ে এবং [illegible] সীমানা নিয়ে পরবর্তী [illegible] ইণ্ডিয়ার সঙ্গে পর্তুগীজদের [illegible] উপস্থিত হয়। ১৮৬৩ সালে [illegible] মীমাংসা [illegible] ফলে। দমনও পাকাপাকিভাবে পর্তুগীজদের দখলে চলে যায়।

এর পর আসে পর্তুগীজদের তৃতীয় উপনিবেশ দিউ।

দিউ দ্বীপ, গোগলা নামে একটি [illegible] এবং সিম্বর নামে একটি দুর্গ—এই [illegible] নিয়ে দিউ উপনিবেশ। এই তিনটিই [illegible] বিচ্ছিন্ন। এগুলি কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত।

দিউ-র মোট আয়তন ২০ বর্গমাইল। [illegible] লোকসংখ্যা ২১ হাজার। মোট [illegible] শতকরা ৯৫ ভাগই হিন্দু। [illegible] অত্যন্ত অনুর্বর স্থান। নারিকেল [illegible] এখানে আর কিছুই হয় না। [illegible] জলেও দিউ-তে দুষ্প্রাপ্য। [illegible] লোকের প্রধান উপজীবিকা [illegible] মৎস্যশিকার। এককালে বয়ন ও রঞ্জন [illegible] জন্য দিউ প্রসিদ্ধ ছিল।

পর্তুগীজরা দিউ-র উপর প্রথম [illegible] হানে ১৫০৯ সালে। ১৫১৩ সালে গুজরাটের সুলতান দিউ-কে সম্ভাব্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্যে পর্তুগীজদের সেখানে ফোর্ট নির্মাণের অনুমতি দেন, কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনে সেই অনুমতি প্রত্যাহার করেন। এ নিয়ে যে সংঘর্ষ বাধে, তাতে ১৫১৪ সালে পর্তুগীজরা পরাজিত হয়। ১৫২৩ সালে পরবর্তী পর্তুগীজ গভর্নর দিউ জয় করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

এর পর পর্তুগীজ গভর্নর Nuno da Cunha নৌবহর নিয়ে আটঘাট বেঁধে দিউ জয়ে অবতীর্ণ হন এবং কঠিন যুদ্ধের পর দ্বীপে অবতরণ করেন। বিজয়ীরা দ্বীপের সমস্ত অধিবাসীকে নির্বিচারে হত্যা করে। কিন্তু তাদের হত্যালীলা শেষ হবার আগেই তুর্কী নৌবহর তাদের উপর চড়াও হয়। পর্তুগীজরা কোনক্রমে পালিয়ে বাঁচে।

এ সময় গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ মোগল সম্রাট হুমায়ুনের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য পর্তুগীজদের সাহায্য নিতে [illegible] করেন। এর জন্য তিনি দিউতে পর্তুগীজদের দুর্গ নির্মাণ করার অনুমতি দেন। পর্তুগীজরা যেনতেনপ্রকারেণ [illegible] করতে শুরু করেন। এতে এক বিষম অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং [illegible] করতে গিয়ে বাহাদুর শা অকালমৃত্যুর শিকার হন। এই মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য তুর্কী নৌবহরের সাহায্য নিয়ে [illegible] ১৫৩৮ সালে দিউ অবরোধ করেন। পরে এই অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। পরবর্তী বৎসর গুজরাটে শাসন ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সেই সুযোগে পর্তুগীজরা এক শান্তিচুক্তি করে দিউ দখল করে নেয়। ১৫৪৬ সালে গুজরাটের সুলতানের আদেশে আবার দিউকে অবরোধ করা হয়। জনৈক তুর্কী ক্যাপ্টেন ঐ অবরোধ পরিচালনা করেন। আট মাস ধরে এই অবরোধ চলে। ইতিহাসে এই অবরোধ যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করে আছে। যা হোক, পরিণামে পর্তুগীজরাই জয়লাভ করে। দিউ পাকাপাকিভাবে তাদের শাসনাধীনে চলে যায়। এই হ'ল দিউ জয়লাভের ইতিহাস।

এবার ভারতে পর্তুগীজ উপনিবেশের শাসন-ব্যবস্থার কথা মোটামুটি বলছি।

গভর্নর-জেনারেল হচ্ছেন গোয়া, দমন ও দিউর সর্বোচ্চ বেসামরিক ও সামরিক শাসনকর্তা। এসব ব্যাপারে সর্বময় কর্তৃত্বই তাঁর। পর্তুগালের মন্ত্রিসভা কর্তৃক তিনি মনোনীত হন।

তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে ১২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি পরিষদ আছে। এই বারোজন সদস্যের মধ্যে ৭ জন গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক মনোনীত এবং ৫ জন ৪০ জন ধনী করদাতা কর্তৃক নির্বাচিত। গভর্নর-জেনারেলের কাজ-কর্মের কোন সমালোচনা করার অধিকার এই পরিষদের নেই।

শাসনের সুবিধার জন্য গোয়াকে এগারটি জেলায় বিভক্ত করা হয়েছে। জেলার ভার রয়েছে গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক মনোনীত এক একজন 'এডমিনিস্ট্রেটরের উপর। এঁদের সাহায্য করবার জন্য অন্যান্য কর্মচারীও রয়েছেন। দমন ও দিউতে দুজন গভর্নর-জেনারেল মনোনীত গভর্নরও রয়েছেন।

আর্থিক ব্যাপারে উপনিবেশগুলি স্বয়ংশাসিত। তবে এর উপর কর্তৃত্ব করেন পর্তুগালের মন্ত্রিসভা স্বয়ং।

মোটামুটি এই হ'ল ভারতস্থ পর্তুগীজ উপনিবেশত্রয়ের ইতিহাস। এই উপনিবেশ সৃষ্টির জন্যে পর্তুগীজরা যত প্রাণ নিয়েছে, যত ক্ষতি করেছে তার তুলনা নেই। এখনও গোয়া, দমন আর দিউর প্রতি ঘরে সেই করুণ কাহিনীর স্বাক্ষর খুঁজে পাওয়া যায়। তাছাড়া তাদের অর্থনৈতিক শোষণের ইতিহাসও কম মর্মন্তুদ নয়। সেই বাঁধন ছেঁড়ার জন্যেই চেষ্টা চলছে প্রায় দশ বছর ধরে। এবার তার চরম পর্যায়। এই চরম [illegible] লড়াই ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গেছে। দমনের দাদরা গ্রাম ইতিমধ্যেই স্বাধীন হয়ে গেছে। এ বিষয়ে ভারত ও পর্তুগাল সরকারের মধ্যে যথেষ্ট মনোমালিন্যও সৃষ্টি হয়েছে। অবস্থা কি দাঁড়াবে বলা যায় না। ভারতের তিনটি শ্রেষ্ঠ বন্দর, শুধু বন্দর নয়, সৌন্দর্যের দিক থেকে যাদের তুলনা নেই, এমনি তিনটি স্থান ক্ষুদ্র একটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ভোগ করবে—এ হতে পারে না। এর অবসান যত সত্বর হয়, ততই মঙ্গল।

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

সেকালকার বাংলাগান সম্বন্ধে আজকাল একটা বিশেষ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। এইসব পুরোনো গানের মধ্যে যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি ঔৎসুক্য প্রকাশ পেয়েছে—সে হচ্ছে 'টপ্পা'। এর একটা প্রধান কারণ এই যে, প্রাচীন টপ্পা গানগুলির মধ্যে কী সুরে কী সাহিত্যে একটা খাঁটি জিনিস আছে, যা সহজ সরল, স্বাভাবিক আর আমাদের একান্ত অন্তরের বস্তু। আজকের সংগীতের বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে এই একান্ত স্বাভাবিক এবং আন্তরিক স্পর্শটি নিতান্ত দুর্লভ হয়ে পড়েছে। টপ্পার মনোহারিত্ব আর মর্মস্পর্শী আবেদনের তুলনা হয় না। এরই টানে পুরোনো টপ্পার প্রতি আমাদের আগ্রহ আবার ফিরে এসেছে।

টপ্পার মধ্যে যে সংগীতের দিক থেকে খুব একটা কঠিন ব্যাপার আছে এমন নয়। আন্দোলনযুক্ত তানের মধ্যেই এর বৈশিষ্ট্য। এই তানটি যখন প্রত্যেকটি শব্দের ভিতর দিয়ে হিল্লোলিত হয়ে ওঠে তখনই সে অন্তরে রসের আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং এইখানেই টপ্পার সার্থকতা। যে সূক্ষ্ম রসবোধ থাকলে টপ্পার এই আবেদনটি ফোটানো যায় সেই রসবোধটি যদি না থাকে এবং টপ্পার নিছক টানটিই যদি কণ্ঠস্থ করা যায় তবে যে বস্তু প্রকাশ পাবে তা প্রাণহীন ওস্তাদিয়ানা মাত্র। এইরকম ওস্তাদিয়ানারও অভাব নেই। টপ্পার মধ্যে যেটুকু কঠিন বস্তু তা এই মধুর করুণভাবটি ফুটিয়ে তোলবার মধ্যে নিহিত। টপ্পায় কাব্যের একটি প্রাধান্য আছে। টপ্পায় রসসৃষ্টি করতে হলে এই কাব্যের প্রাধান্যটি অক্ষুণ্ণ রাখা চাই।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, টপ্পার এই অনুপম কাব্যসৌন্দর্য আমরা উপভোগ করবার চেষ্টা করিনি। আজও অনেকে এইসব গানের খবর খুব কমই রাখেন। এক পুরুষ আগেই সুরুচির দোহাই দিয়ে প্রতিপত্তিশালী একদল লোক এই মনোরম সংগীত সম্বন্ধে অনেক অপবাদ দিয়ে গেছেন, যথা—টপ্পা অত্যন্ত ইতর এবং অশ্লীল গান। এই অপপ্রচার এমনি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল যে, লোকে টপ্পা শুনলেই কানে হাত দিত। অথচ তারও আগে এই টপ্পার প্রতি লোকের আগ্রহের অন্ত ছিল না। প্রাচীন বাংলা গান কী প্রেমের কী ভক্তিরসের—সবই টপ্পার রসে মাখা। বস্তুত প্রধান প্রধান টপ্পা রচয়িতাদের রচনায় অশ্লীলতা তো নেই-ই বরং সেই যুগের অপরাপর গানের তুলনায় টপ্পাকেই সর্বাপেক্ষা মার্জিত এবং রুচিসম্পন্ন বলে স্বীকার করতে হয়। টপ্পার মধ্যে একটুকু ইতরতার স্পর্শও নেই। নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, কালী মির্জা প্রভৃতির গান অনুসন্ধান করে দেখুন—এমন পরিচ্ছন্ন, সুন্দর এবং মধুর রচনা আপনি বাংলা সাহিত্যেই কম খুঁজে পাবেন। তথাপি এমনি মিথ্যা রটনা হয়েছিল। প্রচারকদের এমনি মহিমা।

বাংলা গানে যখন টপ্পা রচনা আরম্ভ হয় তখন অবশ্য দেশের নৈতিক অবস্থা বিশেষ প্রশংসনীয় নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যযুগের কথা। দেশের চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধবিগ্রহ চলেছে। একদিকে দারিদ্র্যের করাল মূর্তি অপরদিকে ধনী জমিদারদের বিলাস-প্রাচুর্য। দুর্দিনে যেসব দুর্লক্ষণ প্রকাশ পায় সমাজ-জীবনে সেই সবই প্রকট হয়ে উঠেছিল। সুতরাং এইসব অসংযত উচ্ছ্বাস যে তখনকার সংগীত সংস্কৃতিতেও প্রকাশ পাবে তাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নেই। টপ্পার অব্যবহিত পূর্বের কবি, খেউর প্রভৃতি গানে এইসব ইতর রসিকতার বিরাম ছিল না এবং জমিদারগণ ছিলেন এই সব গানের পৃষ্ঠপোষক।

আমাদের সংগীতের এই দুর্দিনেই নিধুবাবু বা রামনিধি গুপ্ত সংগীতের সংস্কার সাধনে ব্রতী হন। তিনি শুধু টপ্পার প্রতিষ্ঠাতা নন, বলতে গেলে আধুনিক বাংলা কাব্যসংগীতের প্রথম প্রেরণাও তাঁর কাছ থেকেই এসেছে। নিধুবাবু জন্মগ্রহণ করেন ১৭৪১ সনে কলকাতায় কুমারটুলীতে এবং তাঁর মৃত্যুও হয় কলকাতাতেই ১৮৩৯ সনে যখন তাঁর সাতানব্বই বছর বয়স। নিধুবাবু সে যুগের তুলনায় সুশিক্ষিত ছিলেন। সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজি তিনি ভালই শিখেছিলেন। [illegible] অবসর সময়ে ইংরেজি বই পড়তেন। [illegible] সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর [illegible] রচনায় এবং তাঁর সমসাময়িক [illegible] তাঁর বাহ্যিক জীবনেও এই [illegible] মানসিকতার উল্লেখ করে [illegible] কর্মোপলক্ষে নিধুবাবু ছাপরায় [illegible] ছিলেন। এইখানেই তিনি টপ্পা [illegible] [illegible] শেখেন এবং [illegible] সাধনা করেন। [illegible] পরিণত বয়সে কলকাতায় এসে তিনি [illegible] সব টপ্পার সুর ছড়িয়ে দিলেন [illegible] গানের মাধ্যমে।

এখানে বলে রাখা উচিত যে, [illegible] বাবুর টপ্পা আর পশ্চিমী টপ্পা এক জিনিস নয়। পশ্চিমী টপ্পায় [illegible] কাজটা খুব বেশি [illegible] কিন্তু নিধুবাবু [illegible] তানো এবং একটি সুরের ওপর [illegible] আন্দোলনের ভাব নিয়ে এলেন যাতে [illegible] টপ্পার করুণ রসটি মূর্ত হয়ে [illegible] বাংলা টপ্পার এই বৈশিষ্ট্যই পরবর্তী কালের রচয়িতাগণ গ্রহণ করেছেন।

নিধুবাবুর পরে টপ্পা রচনায় যাঁরা বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন তাঁদের মধ্যে শ্রীধর কথক এবং কালী মির্জার নাম সর্বাগ্রেই মনে আসে। বস্তুত বাংলা টপ্পার প্রধান রচয়িতা এই তিনজন—নিধুবাবু, শ্রীধর কথক এবং কালী মির্জা। নিধুবাবুর রচনা সম্বন্ধে ইতিমধ্যে নানা সময়ে প্রবন্ধাদি বেরিয়েছে কিন্তু শ্রীধর কথক এবং কালী মির্জার গানগুলি এ যুগে তেমন প্রচার লাভ করেনি। সংগীত রচনায় শ্রীধর কথকের দক্ষতা ছিল অসামান্য। তাঁর বহু গান নিধুবাবুর নামেই চলে এসেছে—এর একটি বিশিষ্ট উদাহরণ 'ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে' গানটি। বাংলার টপ্পায় এই গানটি একটি অমূল্য সম্পদ।

সর্ফর্দা—আড়া

বাসনার কি বাসনা তবু তারে ভালবাসে।
ভানু লক্ষান্তরে থাকে এমন সলিলে ভাসে॥
চক্রবাক চক্রবাকী, কি সুখে তাহারা সুখী,
নিশিতে বিচ্ছেদ দেখি কেহ নাহি কারো পাশে॥

বৈঠকী টপ্পা রচনার ক্ষেত্রে প্রথম যুগে যাঁরা প্রাধান্যলাভ করেন তাঁদের মধ্যে এই তিনজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেও ১৮২০ সাল থেকে আরো অনেকে টপ্পা রচনায় প্রশংসা অর্জন করেন। এঁদের মধ্যে কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র সরকার, শিবচন্দ্র রায়, আনন্দনারায়ণ ঘোষ, আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু), জগন্নাথপ্রসাদ বসুমল্লিক, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, মন্মথ ঘোষ, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিমোহন রায়, দয়ালচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি অনেকেই বহু গান রচনা করেছেন। অবশ্য সকলেই কেবলমাত্র টপ্পা রচয়িতা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ বর্তমান। টপ্পার এই বিরাট প্রভাবটি পরবর্তী যুগেও চলে এসেছে এবং তারই ফলে রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় টপ্পার স্পর্শ বিজড়িত হয়ে আছে।

এ তো গেল টপ্পা রচয়িতাদের কথা। টপ্পার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি বোধ করি তার উপায়ও নেই। ধ্রুপদ, খেয়ালের মত টপ্পাও সাঙ্গীতিক প্রেরণা থেকেই প্রচলিত সংগীত রীতি থেকে সংগঠিত হয়েছে। কাপ্তেন উইলার্ড নাকি বলেছেন টপ্পা ছিল রাজপুতানার উষ্ট্র-চালকদের গীত। কাপ্তেন সাহেবের এই মতবাদ কতখানি সত্য তা নির্ধারণ করবার ক্ষমতা আমাদের নেই আর তা ছাড়া আমাদের সংগীতের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে বিচার করবার মত সংগীতবোধ তাঁর ছিল কি না তাও আমাদের জানা নেই। তবে আমাদের ব্যবহারিক সংগীত সম্বন্ধে ইউরোপীয় স্কলারদের যেরকম ধারণা তাঁদের নানা রচনায় দেখেছি তাতে তাঁদের বিচারবুদ্ধির ওপর খুব আস্থা স্থাপন না করাই ভাল।

হিন্দীতে টপ্পা শব্দটার অর্থ হচ্ছে লাফিয়ে যাওয়া। টপ্পায় এই যে তানের কাজ, এ যেন এক স্বর থেকে আর এক স্বরে চটুলভাবে টপ্‌কে টপ্‌কে যাওয়া,— এ থেকেও টপ্পা কথাটা এসে থাকতে পারে। যাই হোক টপ্পাকে আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত হালকা গানের মধ্যেই ধরা হয়েছে, যদিচ টপ্পায় বেশ বিলম্বিত তালই ব্যবহৃত হয়, যার সঙ্গে বড় খেয়ালও গাওয়া যেতে পারে। টপ্পার উপযোগী কতকগুলি বিশেষ রাগ আছে— যেমন ভৈরবী, খাম্বাজ, দেশ, সিন্ধু, কালাংড়া, ঝিঁঝিট, পিলু, বারোয়াঁ প্রভৃতি। এগুলিতে টপ্পার স্বাভাবিক করুণ রসটি বিলক্ষণ প্রকাশ পেয়ে থাকে। টপ্পায় অবশ্য সবরকম গানই আছে, তবে প্রেমের গান, বিশেষ করে বিরহকে অবলম্বন করেই অধিকাংশ টপ্পা এ পর্যন্ত রচিত হয়েছে।

টপ্পাকে রঙিন গান বা হালকা গান বলে ধরলেও একে বরাবর বৈঠকী গানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আগেকার দিনে টপ্পার স্থান ছিল আখড়াই গানের আসরে, আর আখড়াই গান নেহাত বেশ উচ্চাঙ্গের সংগীতই বোঝাতো, যার সঙ্গে কাব্য-সম্পদও ছিল যথেষ্ট। পরে আখড়াই গান ভেঙে হাফ-আখড়াই হোলো এবং আরও কয়েকটি শাখা-প্রশাখাতেও যে আমাদের গান বিভক্ত না হয়েছিল তা নয়। নিধুবাবুর জীবদ্দশাতেই এসব ঘটে। সংগীতকে ক্রমশ হালকা করে সাধারণের কৌতুকের খোরাক হিসাবে তুলে ধরাতে তাঁর যথেষ্ট আপত্তি ছিল এবং এই কারণেই বোধ হয় যখন টপ্পায় খেমটা ধরনের গানের প্রাবল্য দেখা গেল, তখন তিনি ধীরে ধীরে এইসব ক্ষেত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন।

টপ্পা আমাদের গৌরবের বস্তু এই কারণে যে, টপ্পায় বাঙালী শিল্পীর স্বকীয়তার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। বস্তুত বাঙলা টপ্পা অনেক মার্জিত এবং বিশেষত্বসম্পন্ন, যার মধ্যে প্রাচীন রীতির সঙ্গে নবীন রীতির একটা সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে।

এটা দুঃখের বিষয় যে, কলকাতায় বড় বড় গানের কনফারেন্সে বাঙলা টপ্পা আজও অবহেলিত হয়ে রয়েছে। ঠুংরির চেয়ে টপ্পায় গুণপনা দেখাবার সুযোগ কম তো নয়ই, বরঞ্চ বেশিই। লয়ের কৌশল টপ্পায় অনেক বেশি দেখানো যায়, আর তার সঙ্গে তানের বৈচিত্র্য। এক একটি শব্দের ওপর ছোট ছোট তান সহযোগে বা গমকের সঙ্গে যে অপরূপ ছন্দের হিল্লোল তোলা যায়, [illegible] রীতিতেই বোধ হয় সেই [illegible] সম্ভব নয়। আমাদের শিল্পীরা [illegible] খেয়াল বা ঠুংরিতে শেষ পর্যন্ত [illegible] প্রায় কাহারবায় এসে পৌঁছে [illegible] প্রদর্শন করে থাকেন। [illegible] নেই, কিন্তু তার সাঙ্গীতিক [illegible] বেশি নয়। টপ্পায় এইরকম [illegible] [illegible]

আসরের খবর

এক্স-ভেন্টোরিয়ান্স ক্লাবের বর্ষমঙ্গল

[illegible] এক্স-ভেন্টোরিয়ান্স [illegible] [illegible] সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন [illegible] রায়।

বর্ষামঙ্গল প্রধানত গানের [illegible] অতএব যেমন গোষ্ঠীতে যথেষ্ট [illegible] সংগীত-শিল্পী বর্তমান তাঁরাই [illegible] সঙ্গে এই উৎসব পালন করতে [illegible] এই ক্লাবটিতে উপযুক্ত সুরশিল্পীর [illegible] দেখা গেল এবং এঁরা বাইরে থেকে [illegible] না এনে নিজেদের মধ্যে থেকেই [illegible] শিল্পী বেছে নিয়েছেন। অতএব [illegible] বিষয়ে তাঁদের কিছুটা অসুবিধায় [illegible] হয়েছে বলাই বাহুল্য। আমার মনে [illegible] এই পরিস্থিতিতে এই ক্লাবটি [illegible] সম্পূর্ণ সংগীতানুষ্ঠানে হাত না [illegible] ভাল করতেন। অনুষ্ঠানটি সঙ্গীত [illegible] দিক থেকে তেমন সাফল্যমণ্ডিত হয় [illegible]

অনুষ্ঠানের বাণীতাংশ রবীন্দ্র [illegible] থেকেই সংকলিত হয়েছে এবং [illegible] রবীন্দ্র-সঙ্গীত সহযোগে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলেই ভাল হত। এর মধ্যে [illegible]

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বেরিয়ে এলাম। মেলা তো মেলা। আজ যেন বড় বেশী জাঁকজমক। লোকের আনাগোনাও বেশী। খানিকটা উত্তরে এসে একটি সাইনবোর্ডে চোখ পড়তে থামলাম। বড় তাঁবুর গায়ে সাইনবোর্ড। নর্থ ওয়েস্টার্ন রেস্টুরেন্ট। ব্র্যাকেটে, ভেজিটেরিয়ন। চারপাশে তার কাগজের ফুল আর মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে। ঝকঝকে পোশাকে রয়েছে দাঁড়িয়ে বয়।

উঁকি মেরে দেখলাম, লোক নেই। ভেতরটা যেন অন্ধকার, ফাঁকা। ঢুকে তো পড়ি। চা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। ঢুকে দেখি, টেবিল চেয়ার পাতা আছে ঠিক। সবই বালির উপরে। কোথাও কোথাও পাতা রয়েছে কাঠের পাটাতন।

বয় এসে দাঁড়ালো ছাপানো মেনু নিয়ে। আবার ' কি! বালুচরে শহুরে স্বর্গ রচনা হয়েছে।

মেনুর প্রয়োজন ছিল না। বললাম, 'চা আর টোস্ট।'

পরমুহূর্তেই নজরে পড়ল, কোণের চেয়ারে একটি লোক বসে রয়েছে। সামনে টেবিল। টেবিলের উপর ফুলদানি, কাগজ কলম দোয়াতদান। ভদ্রলোক তাকিয়েছিলেন আমার দিকেই। চোখ পড়তেই, উপযাচক হয়ে হাত তুলে নমস্কার করলেন। আন্দাজে অনুমান করলাম, উনি উত্তর-পশ্চিম রেস্তোরাঁর প্রোপ্রাইটর হবেন হয় তো। কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রতিউত্তর দিলাম। দিতেই উঠে এলেন ভদ্রলোক। ইংরেজীতে বললেন, 'অর্ডার দিয়েছেন?'

বললাম, 'দিয়েছি'।

অপরিচিতের সঙ্গে আলাপে যারা দুরন্ত গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োজন হয় না তাদের। তা'ছাড়া, অপরিচিতের সঙ্গে আলাপে যারা আগ্রহান্বিত, আচমকা কোন প্রশ্ন করতেও তাদের বাধে না। একটু হেসে বললেন ভদ্রলোক, 'বাংলা দেশ থেকে আসছেন নিশ্চয়ই?' কথাটা ইংরেজীতেই বললেন। জবাব দিলাম, 'কি করে বুঝলেন?'

পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'বয়কে যে ভাষায় হুকুম করছিলেন, তাতেই বুঝলুম আপনি বাঙ্গালী। আমাদের বাঙ্গালী ভায়ারা ওরকম হিন্দী-ই বলেন কিনা।' বলে একটু হাসলেন।—'আপনাকে সেজন্য দোষ দিচ্ছিনে। শতকরা শতকরা বাঙ্গালীই তাই বলেন। শুনেই বুঝলুম আপনি বাঙ্গালী।'

বুঝেও না বোঝার মত করেই অবাক হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করতে হল, 'আপনিও নিশ্চয়ই বাঙ্গালী?'

ভদ্রলোক একটু হেসে, বসে পড়লেন আমার পাশের চেয়ারে। ঠ্যাং দুটো ছড়িয়ে দিয়ে ইংরেজীতে বললেন, 'কি মনে হয়?'

পাল্টা প্রশ্ন শুনে বিব্রতভাবে হেসে তাকালাম ভদ্রলোকের দিকে। রীতিমত চ্যালেঞ্জের হাসি তার স্থূল ঠোঁট দুটিতে। বোধহয় সে অধিকারও ছিল তার। কারুর মুখ থেকে পরিষ্কার বাংলা শুনে যদি তাকে বাঙ্গালী বলা যায়, তা'হলে ইনিও বাঙ্গালী নিঃসন্দেহে। কিন্তু চেহারার কোথাও সে ছাপ নেই।

লম্বায় প্রায় ছ'ফিট লোকটি। কপালটি রীতিমত চওড়া। কপালের ঠিক মাঝখান থেকে, তীরের মত উল্টানো ও কোঁকড়ানো চুলের অগ্রভাগ ঘাড়ের কাছে বাবড়ি পাকিয়ে উঠেছে। রংটি ফর্সা, কিন্তু পোড়া তামাটে খানিকটা। সবচেয়ে দ্রষ্টব্য হল তার কপালে ও গালে কয়েকটি গভীর রেখা। হাসিতে অমায়িক, [illegible] ওই মুখ ভয়ংকর নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে। পোশাকে, যাকে বলে [illegible] সায়েব। ময়লা জামা, তেলচিটে টাই [illegible] লক্ষ্য করলে দেখা যায় পোকা খাওয়া ছিদ্র জর্জরিত কোট। সব মিলিয়ে [illegible] বলা মুশকিল।

বলতে গেলাম, অবাঙ্গালী। [illegible] চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে [illegible] ঠোঁটের হাসিটুকু ছিল না চোখে। [illegible] গভীর সেই চোখ জোড়াতে উঁকি দিয়ে রয়েছে যেন আর একটি মানুষ। [illegible] [illegible] মাউন্টেনের পথিক। [illegible] 'আপনি বাঙ্গালী।'

ভদ্রলোক এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। [illegible] '[illegible] ইট [illegible]' হাত দিন। [illegible] [illegible] ঠেলে দিলেন আমার একটি হাত [illegible] চীৎকার করে উঠলেন, [illegible]

নামের শেষে একটু বিসর্গ [illegible] দ্রুত আকস্মিক ছেদ। অর্থাৎ [illegible] হাঁও নয় হুঁও নয়, অদ্ভুত শব্দের [illegible] এল তাঁবুর ভেতর থেকে। ভদ্রলোক [illegible] দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বলে উঠলেন। তেমনি ভাষায় জবাব এল ভেতর থেকে।

অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম ভদ্রলোকের দিকে।

সন্দেহ হ'ল। সত্যিই, বাঙ্গালী [illegible] লোকটি! না কি স্রেফ ভেলকি? [illegible] আবার কি ভাষা বলছেন ভদ্রলোক।

বাহাদুরীর ভঙ্গি নেই। চাপা উচ্ছ্বসিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ভাষা বললাম বলতে পারেন?'

বললাম, 'না।'

'তেলেগু ভাষা। আপনার চা [illegible] দেরী হচ্ছে কেন, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম, ও বললে, আপনার রুটি সেঁকছে।

কথা শেষ হওয়ার আগেই চা এসে পড়ল। টে'র উপরে সাজানো [illegible]

[illegible] আলাদা আলাদা। এমন কি মাথন-[illegible] ভুলেই গিয়েছিলাম, ঢুকেছি এক [illegible] রেস্তোরাঁয়। টি-পটের [illegible] খুলে দেখি, কাপ তিনেক চা আছে। [illegible] বললাম, 'আর একটি কাপ দাও।'

প্রোপ্রাইটর বললেন, 'কেন?'

বললাম, 'চা খান।'

'না না না।'

[illegible] প্রকাশ পেল কি না জানিনে। [illegible] বললাম, 'না কেন? এত চা কে [illegible] দু'জনের মতই রয়েছে।'

[illegible] উঠে বললেন উনি, 'ও মশাই [illegible] দের পক্ষে। নইলে, ওটুকু চা [illegible] একজন কি খাবে। বেশ, আপনাকে [illegible] কাপ দিতে বলছি।'

[illegible] বলে উঠলাম, 'না না [illegible] আমি আপনাকে আমার টেবিল-সঙ্গী [illegible] বলছি। আসুন না চা খেতে খেতে [illegible] যাক।'

'[illegible] আমাকে খাইয়ে ই পয়সা উশুল [illegible]।'

[illegible] হা হা করে হাসি। [illegible] টেবিলে ইশারা করলেন বয়কে। [illegible] এনে দিল। বললেন, [illegible] আর আপনি [illegible] দু'টি খেয়ে থাকুন।'

[illegible] চা তৈরী করতে করতেই [illegible] বলে চললেন উনি, 'মশাই, [illegible] বিষয়ে কখনো খুঁতখুঁত করবেন [illegible] খারাপ জিনিস। আগে আমারও [illegible] ছিল। একবার কি হল জানেন? [illegible] ছিলাম করাচীতে। পাকিস্তান [illegible] আগে। শহর খুব ফিটফাট। রাস্তা-[illegible] একটি ভিখিরী দেখতে পাবেন না, [illegible] কড়া আইন। ভিতরে যান, বারাক-[illegible] বস্তি অঞ্চলকে হার মানিয়ে দেবে, [illegible] নোংরা। বিশেষ হাবসী পাড়ায় [illegible] নোংরা, তেমনি দুর্গন্ধ। মারামারি [illegible] কথায় কথায়। বন্দরের এক হাবসী, [illegible] সর্দার ইয়াকুব ছিল আমার বন্ধু। [illegible] একবার নেমন্তন্ন করে বসল তার [illegible] খেতে গেলুম। আরে রাম রাম। [illegible] দশদিনের বাসি হাতরুটি, সাদা সাদা [illegible] দেখা যাচ্ছে। তেমনি দুর্গন্ধ। তার [illegible] মাংস বলে যা এল, সে আর চেয়ে [illegible] যায় না। কালো রং, বোধ হয় কোন [illegible] সব্‌জী ছিল, আর কতগুলো নাড়ি-ভুঁড়ি। তার ওই নোংরা পাজামা দিয়ে রুটি খাস তুলে দিল আমার হাতে। কি করি? বিরক্তি করছি দেখে সে বিদ্রুপ করে বলল, 'বাঙালি শুনেছি, কলাগাছের ছাল খেতে ভালবাসে। মাংস রুটি পেয়ার করে না তারা।' কথাটা বড় লাগল। বাঙালীকে খোঁচা? তাও এই অমৃত-সমান মাংস রুটি দিয়ে। ভাবলুম, মরার বাড়া ভয় কি? খেয়ে ফেললুম। পেট ভরেই খেলুম। বাসায় এসে তুলে ফেললুম সব গলায় আঙ্গুল দিয়ে। তারপর একদিন নেমন্তন্ন করলাম তাকে। বাসন্তীও করেছিলুম তেমনি। দু'দিনের পচা পান্তাভাত আর [illegible]। খা, কত খাবি।'

বলে ভদ্রলোক ঘাড় কাত করে তাকালেন আমার দিকে। গম্ভীর বিস্ময়ে [illegible] হল তার মুখের রেখা। বললেন, 'মশাই, [illegible] খেয়ে ফেললে? তারপর দিয়ে আর কাটিয়ে উঠতে পারলে না। মাইরী, কি বলব আপনাকে, [illegible] একটুকু হয় [illegible] খাওয়ার সময় কি বলে [illegible] বললে, বহুৎ বঢ়িয়া চীজ্ [illegible]।' বুঝুন ব্যাপারটা। তাই বলছি, বাইরে যখন বেরুবেন বাইরের মত হয়ে বেরুবেন। অর্থাৎ চা আপনি কম খান তাতে কিছু নয়। কিন্তু বাঙালী বলে সব জায়গায় নিজের রীতিনীতির খুঁটি আঁকড়ে থাকবে, তা করতে গেলে ফ্যাসাদে পড়ে যাবেন। তা হলেই গলায় আঙ্গুল দিতে হবে। আরে মশায়, শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াও তাই সয়। এ তো বাঙালীই বলে।'

পেটরোগা খুঁতখুঁতে বলে দুর্নাম আছে বাঙালীর। আমি তার বাইরে নয়। তিন কাপ চা একলা খেলে আমাকেও যে গলায় আঙ্গুল দিতে হত। বিষয়টি তর্ক সাপেক্ষ। তবু আপাত মূল্য আছে এর কথার। প্রতিবাদ করতে পারলুম না। বিশেষ, এঁর বাঙালী-জেদ, আর হাবসীর পাল্টা-প্রীতির কথা শুনে। যে বাঙালীকে তিনি বিদ্রুপ করতে চান, সেই বাঙালী নামের জন্য সামান্য এক হাবসী কুলির পচা রুটি মাংস খেতেও পেছপা হননি।

কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই তিনি বলে উঠলেন আবার, 'বিদেশে কোন বিষয়ে পেছিয়েছেন তো, আপনি গেলেন। ওমনি সবাই যো পেয়ে যাবে। ভেটে থাকতে হবে। যখন যেমন, তখন তেমন। লে আও তোমার কি খানা আছে। অত পটপট্ কিসের? সত্যি, অনেক অখাদ্য খেয়েছি। কিন্তু বমি কোনদিন করিনি আর। থাকগে যাক, ভায়ার নামটি কি, শুনি?

গায়েপড়া অন্তরঙ্গতার হাসি ছড়িয়ে পড়ল তার চোখে মুখে। সুরে ছড়ালো চায়ের টেবিলে। টাইপ আসর-জমানো লোকের মত 'ভায়া' শব্দটি তার মুখে একটুও বিচিত্র ঠেকল না। নাম বললাম।

'বেশ বেশ। তা এলাহাবাদে কি কোন আত্মীয়স্বজন আছে?'

'না।'

'কোথায় উঠছেন?'

আশ্রমের নাম বললাম।

আশ্রমের কথা শুনে আবার তার মুখে একটু চাপা হাসির লক্ষণ দেখা গেল। যেন কতদিনের বন্ধুত্ব, কতদিনের পরিচয়। এমনি অন্তরঙ্গ সুরে, একটু রহস্য করে বললেন, 'তা ভায়া, এ বয়সে এত বৈরাগ্য কেন?'

বললাম, 'বৈরাগ্য নয়। মন টানল, তাই চলে এলাম। দেখব আর ঘুরব বলে বেরিয়ে পড়লাম।'

চা খেতে খেতে বললেন, 'কোথায় ঘুরবেন, আর কি দেখবেন?' মুখে তার কৌতূহল ও বিস্ময়। যেন ঘুরবার দেখবার কিছুই নেই।

বললাম, 'যা দেখিনি, যেখানে বেড়াইনি, সেই সবই দেখব, সেখানেই বেড়াব।'

ভদ্রলোক তাঁবুর আধা অন্ধকার কোল থেকে কয়েক মুহূর্ত বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যেন বহুদূরে কি দেখছেন। চোখে তার সেই আলোছায়ার খেলা। তারপর হঠাৎ বললেন, 'দেখুন, আমি সত্যি মুখ্যু মানুষ। কি বলতে কি বলে ফেলব। অনেকদিন আগে একটা জাপানী কবিতার বাংলা অনুবাদ পড়েছিলুম,

> কি করি কোথা যাই,
> কোথা গেলে শান্তি পাই?
> ভাবিলাম বনে গিয়া,
> জুড়াবো তাপিত হিয়া।
> শুনি সেথা অর্ধরাত্রে,
> কাঁদে মৃগী কম্প্র গাত্রে॥

বলে তিনি চুপ করে গেলেন। মনে হচ্ছিল, একটা চাপা গম্ভীর অথচ তীব্র আর্তনাদ শুনেছি কানের কাছে। তার মধ্যে অনুরণিত এক ঘোর অস্থিরতা। কিন্তু শান্ত। তারপর আচমকা চুপ করে গেলেন। যেন নিঃশব্দ রাত্রে এক পোড়ো বাড়ির দেউড়ী একবার ককিয়ে উঠে থেমে গেল। তারপর অসহ্য নিঝুমতা, অন্ধ নিঃশব্দ রাত্রির আড়ষ্টতা।

বাইরে কোলাহল। তাঁবুর আশেপাশে গণ্ডগোল চীৎকার। সে কোলাহল ধ্বনি যেন ঝিঁঝিঁ-র ঝিল্লিরব। বাইরে রৌদ্রালোকিত রূপোলী বালুচর। আর কালো রং-এর তাঁবুটার মধ্যে এখনো অন্ধকার লেপটে রয়েছে কোণে কোণে।

তাকিয়ে দেখি সামনে আমার নতুন মানুষ। তার বিশাল তামাটে মুখটা উঁচু নীচু। যেন কোন দূর পাহাড়ের গড়িয়ে পড়া এক লাল পাথর। গভীর ফাটলের মত মুখের রেখাগুলি তার গভীরতর। চোখ দুটো পাথরের মূর্তির চোখের মত নিষ্পলক, উদ্দীপ্ত অথচ অন্ধকার। যেন এই শিলাখণ্ডের উপর দিয়ে বহু যুগ যুগান্তের রোদ বৃষ্টি ঝড় বয়ে গিয়েছে। পোড়া, ধোঁয়া, জ্বলা।

কি বলব ভেবে পেলাম না। উনি এমনভাবে চুপ করলেন, সেটি যেন আর একজনকে চুপ করিয়ে দেওয়ার মত। আমার ঘরছাড়া অবারিত মন আকুল আগ্রহে মেলে রয়েছে দু' চোখ। ডানা মেলে রয়েছে মুক্ত বিহঙ্গের মত। উৎকর্ণ কান, মনের মাঝে উত্তুঙ্গ মর্ম। মনো-বীণার তারে অজানা সুরের ডাক। তাকে যেন দুহাতে মুঠি করে চেপে ধরলেন ভদ্রলোক। আড়াল করে দাঁড়ালেন আমার দিগবিদিক ছোটা পথের সামনে। কি বলব।

এত লোক, এত নারী আর পুরুষ, শিশু আর বৃদ্ধ এসেছে সারা দেশ থেকে। আমিও এসেছি। কে ডাক দিল জানিনে। কি বলে ডাকল, কি সুরে বাজল সেই ডাকের সুর, তাও বুঝিনি। এ যেন সেই রাধার উক্তির মতই, খেতে সাধ নেই, শুতে আনন্দ নেই। কোন্ অতৃপ্তি রেখেছিল চারপাশ থেকে ঘিরে, তাও খুঁজে দেখিনি। মন বলল, রইতে নারি, আর রইতে নারি ঘরে। মন ব্যাকুল হয়েছিল। তারে ঝঙ্কার দিল আগ্রহের অঙ্গুলি। তাই বেরিয়ে পড়েছি। দেখব। দেখব, ঘুরব, আশ মেটাবো। কিন্তু বিচিত্র বেশে এ কোন্ হরিণী সজাগ চোখে দাঁড়াল আমার সামনে। নিজের মাঝে ছিল অতৃপ্তির কত গভীর উৎস, ভেবে দেখিনি। কিন্তু এ যে অতৃপ্তির সমুদ্র। বুকে যার তীব্র গোঙানি, স্বাদ যার কটু ও লবণাক্ত।

কবিতা চীনে কি জাপানী জানিনে। হৃদয়ে যে ভাষা জোগায়, সে কারোর কোন জাত নেই। সে কাব্য সকল মানুষের। মনে পড়ল, কবে একদিন পাড়ার মুদীখানায় বসে শুনেছিলাম এক পথচারী গায়কের গান,

> কত ঘাটে ঘাটে বাঁধলাম নৌকা,
> তোমার দেখা পেলাম না,
> যারে শুধাই, এক জবাব পাই
> 'কার কথা কও, কোন্ জনা?'
> শুধায় সবে, শুধাই আমি
> শুধাই বনে বনে,
> (হায় রে) বনও কাঁদে, কয় আমারে
> 'তার দেখা পেলাম না॥'

সেই একই হাহাকার। তবু কে বসে থাকবে নিশ্চেষ্ট হয়ে। ঠাঁই নেই, তবু বুকে হাত রেখে বসে থাকব কোন্ সন্ধ্যাতারার দিকে চেয়ে। এক তারার পাশে আর এক তারা, তারপরে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি অসংখ্য। চোখ বাধা মানে না। মন বাধা মানে না। বলরামের কথা মনে পড়ে গেল। আর আমার এই ঘরছাড়া চোখ দেখেছে শ্যামাকে। হাসির তার সেই, মধ্যরাত্রির বিরহিনী হরিণীর কান্নাও বুঝি ছিল। শুনব বলে আসিনি। না এলে যে শুনতেও পেতেম না। কথা বলতে গেলাম। উনি বলে উঠলেন, 'যেখানে যাবেন, এটি তো সঙ্গে যাবেই?' বলে, তার বুকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। তারপর বললেন, 'এ কি কখনো ভরে?'

বললাম, 'ভরে না বলেই তো!'

অতবড় মানুষটা। হাসিতে কি সরল ও নিরীহ। বললেন, 'তবুও ভরাতে [illegible] কিন্তু ভায়া, ও তো কখনো ভরে না। এ সংসারে কার আছে ভরা ভর্তি, কলসি? নিজেরটা তো দেখি, ফুটো পাত্র। যত ঢালি সে তত ঝরে। হিন্দীতে একটা গান আছে জানেন। যমুনা থেকে গাগরি ভরে এসে বারবার জল নিয়ে এলি তুই তো [illegible] কিন্তু কি অজুহাত! ছলকে ছলকে [illegible] যেন সব জল পড়ে যায়। তুই [illegible] ছুটিস যমুনার পানে। বলি, এ কি তোর ভরানো ঝরানো খেলা? যমুনার এ জল কি দুরন্ত ছেলের মত এতই [illegible] যে, সে কিছুতেই তোর কলসীতে [illegible] হতে চায় না!' বলে হেসে উঠলেন। [illegible] তীব্র কনকনে হাওয়া চঞ্চল [illegible] দুলিয়ে। চকিত ফনার মত উড়ে [illegible] তার তেলচিটে টুপির অগ্রভাগ। বললেন, 'জন্মে যা ভরেনি, মরলে কি সে ভরবে? তবু'—

বলে এক মুহূর্ত থেমে নিজে বললেন আবার, 'তবু মন মানে না [illegible] বলেন? আগে বোঝাপড়া ওর সঙ্গে, [illegible] পরে তো সব? আপনাদের সেই খৃষ্টান কবির কথা মনে আছে তো?

> আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়
> তাই ভাব মনে
> জীবন প্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায়
> ফিরাব কেমনে?

আমাদের খৃষ্টান কবি বটে। কিন্তু মুখস্থ দেখছি ওরই আছে বেশী [illegible] আচমকা একটি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'বড় খারাপ নেশা ভাই। [illegible]

কিছু নেই। এ ডেকে নিয়ে এসে ছেড়ে দেয়, আর ডাকে না, পেছন ফিরতেও দেয় না?'

বলে এক চুমুকে ঠাণ্ডা চা'য়ের কাপটি শূন্য করে দিলেন। আমার চায়ের পাট চুকিয়েছে অনেকক্ষণ। কিন্তু আটকা পড়েছি আপনা আপনি। যেচে আলাপ করতে এলেন উনি। কিন্তু ও'র রূপ ও এমন কী গুণ্ করল আমাকে, যেচে নিজের কথা পারলাম না বলতে। শুধু তাই নয়। ও'র চোখের ওই দূরবিসারী দৃষ্টি, মুখময় কড়ের দাগ আর অসহায় চাহনি মনের মধ্যে যুগপৎ অকারণ একটু মমতা ও কৌতূহল জাগিয়ে দিয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার দেশ কোথায়?'

জিজ্ঞেস করতে আবার হেসে উঠলেন। ... অদ্ভুত নেশা ... বললেন ... আসরটা ... জমেছে ভাল, কি ... দেশ তো ভাই আমার নেই। ... পর করেছি, পরকে ঘর। এখন ... দেশ বলে মনে হয়। তবে জন্মে-ছিলাম বাঙলার এক গাঁয়ে। আঠারো বছর ... সে গ্রাম ছেড়ে এসেছি। তারপর ... দেশ থেকে দেশান্তরে, যাকে বলে দেশান্তরী।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার বাবা মা ... আত্মীয়স্বজন, তাঁরা কোথায়?'

বাবাকে ভাই কোনদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। মাকেও হারিয়েছি অল্প বয়সে। আঠারো বছর পর্যন্ত পেলেছিল এক মাসী। মাসী মারা গেল। তার ছিল ... জমি জমা। দেখলুম, আমার মত ... বোনপো ভাইপো রয়েছে মাসীর। ... এসে দাবী করল ঘর বাড়ি জমি গরু ...। বিশ্বাস করবেন কি না জানিনে। ... গেলুম। ভেবেছিলুম, কাকে দেব? দাবীদারের সংখ্যা দেখে চিন্তা ঘুচল। ... আঠারো বছর বয়স। সে যে অথৈ ... তার কূলকিনারা নেই।

বলতে বলতে তার সমস্ত মুখখানিতে ... নেমে এল। জানিনে, এ শুধু তার ... জমানো কথা কি না। কিন্তু তাকে ... কোন নিশি পেয়েছে, সে চিহ্ন ফুটে ... তার মুখের গভীর রেখায় রেখায়। বললেন, 'ছোটকালে বাঁশঝাড় দেখিয়ে মা ... খবরদার, ওদিকে যাস নি। কিন্তু ... বড় চোখে সারাদিন তাকিয়ে থাকতুম বাঁশবনের ঝুপসি ঝাড়ে। আপনি বাংলা-দেশের ছেলে। জানেন নিশ্চয়ই বাঁশঝাড়ের হাওয়ায় কি এক আয় আয় ডাক শোনা যায় অষ্টপ্রহর। লোকে শুনলে হাসবে, আমার মুখে কাব্য? কাব্য নয়, এখনো কানে লেগে রয়েছে সেই ডাক। বাঁশবনের ফাঁক দিয়ে দেখতুম ধূ ধূ মাঠ। কে যেন আমাকে ডাকত ওই মাঠ থেকে। বিশ্বাস করুন। আমাকে ডাকত। লেখাপড়া করতে পারিনি। যেমনি পাখা গজালো, মানে একটু বয়স হল, অমনি পালিয়ে গেলুম মাঠের উপর দিয়ে। আস্তে আস্তে ভয় ভেঙে গেল। মাসী কাঁদত, মাসী আমাকে বেঁধে রেখেছিল। তারপর যেদিন মাসী ছেড়ে দিয়ে গেল সেইদিন, সেইদিন কে-ই বা তৈমুরলঙ, আর কেই-বা চেঙ্গিস খাঁ। বেরিয়ে পড়লুম দিগ্বিজয়ে। শুধু এক-জনের কাছে দাঁড়িয়েছিলুম গিয়ে। সে ছিল আমার সোনার বাঁধন। মাসী ছিল রক্তের। জানেন তো, মানুষের ব্যাপার। রক্তের চেয়ে দামী সোনা। তাকে ছাড়তে পারলে যেন সব ছাড়া গেল। সে কোন কথাই বলেনি, শুনল, তাকাল, তারপর ঘাড় কাত করে জানালো, যাও। চলে গেলুম। কেন যাচ্ছি, কিসের দিগ্বিজয়, কিছুই জানতুম না। তবু বেরিয়ে পড়লুম। সেইদিনটি ছিল আমার বড় আনন্দের দিন, আর আজ ভাবি, কি ভয়ংকর, কি সর্বনাশের দিন ছিল সেটি?'

আমি নিতান্ত বোকার মত জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন?'

জিজ্ঞেস করতে করতেই তাকিয়ে অবাক হলাম। একি, এত অজস্র রেখা তার মুখ ভরতি।

যেন একরাশ শুকনো দগ্ধ বর্ণের তুলকুটীর মুখ একটি। চোখে ব্যক্ত অব্যক্ত যন্ত্রণা। বললেন, 'কেন? কেন নয়? কোন্ নিশি ডেকে নিয়ে এল আমাকে, এখন মাথা খুঁড়ে মরছি। ফেরবার জায়গা নেই, এগুবার জায়গা নেই, কোথায় ঘুরে মরছি। কেন এসেছিলুম, কোথায় এসে-ছিলুম সব ভুলে গেছি। ঘুরছি শুধু গোলক ধাঁধায়। শুনেছি অনেকে বেড়ায়, বেড়িয়ে লেখে ভ্রমণকাহিনী। আমি দু' চক্ষে দেখতে পারিনে ওই বইগুলোকে। দু' চক্ষে নয়। ভ্রমণকাহিনী, সে আবার কি? দু'দিনের বেড়ানো?' তাহলে আমি কি? আমার এ কোন বেড়ানো, এ কোন্ সর্বনেশে ভ্রমণ। শুকনো ঝরা পাতা উড়ছি পথে পথে। উঠছি পড়ছি, তারপর একদিন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাব কার পায়ের চাপে। কি যে চাইলুম, আর কি যে পেলুম। বড় ভয়ংকর নেশা ভাই, ভয়াবহ নেশা। ওই নিয়ে আবার লোকে বই লেখে?'

চুপ করলেন। মনে হল একটা তীব্র যন্ত্রণার সুর ঢেউ দিয়ে ফিরছে কানের কাছে। ভুলে গেলাম কুম্ভ মেলার কথা। ভুলে গেলাম, কোথায় এসেছি। এ যে মাতালের ধিক্কারের কান্না। একদিন যা আকণ্ঠ পানে মাতাল করেছে, আজ তার-ই বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে।

কিন্তু পথ কি মন্দ? ঘরছাড়া মানুষের সে যে তৃষ্ণার জল। যতক্ষণ সে জীবনস্বরূপ, ততক্ষণ সে আনন্দময়। সে আনন্দ অশ্রুভরা। সে ব্যথার ব্যথী। অশান্তির শান্তি। নিঃস্বের সঞ্চয়। পথ না হলে চলব কোথায়।

কিন্তু জানিনে, বুঝিনে পথ কখন এমনি প্রতিশোধ নেয়। আর কী ভয়ংকর তার প্রতিশোধ। সেই প্রতিশোধেরই এক প্রতিমূর্তি যেন আমার সামনে।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার নামটি কিন্তু জানা হয়নি।'
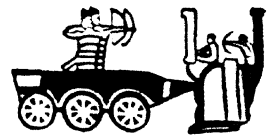
বলতেই আবার হাসি। উচ্চহাসি হেসে বললেন, 'নামটা ভাই বড় খারাপ। আমার এই বাউণ্ডুলে জীবনে সেটাও একটা ঠাট্টা। তা'হলে আর একটু চা খেতে হয়।'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই।' বলে বয়কে ডাকবার আগেই উনি নিজেই সেই দাক্ষিণী ভাষায় হুকুম করলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আর কখনো দেশে যাননি?'

বললেন ,'বাংলা দেশে? অনেকবার। তবে গাঁয়ে গেছি একবার।'

'মাত্র?'

হ্যাঁ। যুদ্ধের পর গেছলুম। সারাটি দিন ঘুরলুম, কেউ চিনতেও পারলো না। গাঁয়ের হরে মুদী তেমনি বসেছিল দোকানে। শুধু গায়ের চামড়া তার ঝুলে পড়েছিল থলের মত। কি বলব ভাই, আমাকে দেখে বললে, কি মাংতা সাহেব? মনে মনে হাসলুম। বললুম, পোয়া ভর চি'ড়ে দাও, দো পয়সা কী গুড়। সাহেবকে চি'ড়ে গুড় খাইয়ে তার ভারী আনন্দ। বললে, 'কার বাড়ি আসা হয়?' বললুম, 'সোনার বাঁধন কি বাড়ি।' সে বললে, ও, সোনার বেনে? পশ্চিমপাড়ায় আছে বটে দু'ঘর। নাক কি বরাবর চলে যাইয়ে। হাসিও পেল। দুঃখও হল। সত্যিই, সোনার বাঁধনের বাড়ি নাক বরাবরই বটে। গেলুম। গিয়ে দেখলুম, ভাঙ্গা বাড়ি আর ঘন জঙ্গল। সন্ধ্যার অন্ধকারে একটা ভুতুরে বাড়ি। বুঝলুম, কেউ নেই। ফিরে গেলুম।'

আবার চুপচাপ। চা এল। এবার দুটি সিঙ্গল কাপ। বুঝলাম, সে-ই যে গেলেন, সেই যাওয়া আজো শেষ হয়নি।

বললেন, 'যদ্দিন আছেন, আসবেন একটু আধটু। একটু বকব প্রাণভরে, সে মানুষও পাইনে।'

বললাম, 'নামটা?'

হেসে বললেন, 'ভোলেননি দেখছি। হাসবেন না যেন। নাম আমার রমণী-মোহন মুখোপাধ্যায়।' বলে কী হাসি। হাসি আর থামতে চায় না। বললেন, 'কি আশ্চর্য বলুন তো, টো টো মোহন কিংবা বাউণ্ডেলে মোহন নাম রাখলেই ঠিক হত।

স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, চা খেতে ঢুকে এমনি এক রমণীমোহন মুখো-পাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হবে। তাঁবুটার অন্ধকার তখনো কাটেনি ভাল করে। বাইরে বালুচরের আকাশ রুপোর পাতের মত ঝকঝক্ করছে। আর বসে থাকতে পারিনে। পকেট থেকে পয়সা বার করতে গেলুম।

রমণীমোহন গল্পের নায়কের মত বাধা দিলেন। বললেন, 'পয়সাটা ভাই পাওনা থাক্, কাল দিয়ে যাবেন।'

বুঝলাম, আমার জন্যই এই কথা। বললাম, 'যদি না আসি?'

—'তাহ'লে একলা বসে বসে হাসব।'

অদ্ভুত কথা। দুজনেই হেসে উঠলাম। বললাম, 'কিন্তু ব্যবসা করতে বসেছেন। পয়সা না নিলে অসব কি করে?'

'ওটাই তো ফন্দী।' হেসে আবার বললেন, 'দোকানটি আমার এক মাদ্রাজী বন্ধুর। আড়াই হাজার টাকা নিয়ে দোকান নিয়েছি। বুঝতেই পারছেন অবস্থা। সকাল থেকে আপনি একমাত্র খদ্দের। তবে সে সম্মান আপনাকে দেব না। আমার আত্মীয়তাটুকুই মেনে নিতে হবে আপনাকে। কি ভাগ্যি আপনি এসে-ছিলেন। প্রাণে একটু হাওয়া লাগল। আসবেন, আসবেন। রোজ পয়সা নেব, আজকের দিনটি পারব না ভাই।'

বলতে বলতে উনি গম্ভীর হয়ে উঠলেন আবার। আমারও মুখের হাসিটি আড়ষ্ট হয়ে রইল। এই বিরাট সুপুরুষ চেহারার মানুষটির ভেতরের সেই ক্লান্ত অসহায় প্রাণটি কখন যে মন দিয়ে মন কেড়েছে, টের পাইনি। যাবার সময় ও'র এই গাম্ভীর্য খচ্ ক'রে উঠল বুকের মধ্যে।

একসঙ্গে বাইরে এলাম। রমণীমোহন বলে উঠলেন, 'আঃ!'

দেখলাম, বুকটা ওর ঠেলে উঠেছে সামনের দিকে। মাথাটি উ'চু করে তুলে ধরেছেন দূরের আকাশের দিকে। দু' চোখে মুগ্ধতা। বুঝলাম, নেশা লাগছে। [illegible] এখনো মাঝে মাঝে অন্যত্র হয়ে [illegible] খোলা আকাশ দেখলেই মন ছুটে [illegible] চায়। বোধহয় ওইটুকুই এখনো প্র[illegible] হয়ে আছে।

বললাম, 'চলি।'

সেকথার জবাব না দিয়ে [illegible] 'মানুষের ভিড় একটু বেড়েছে [illegible] কাল পূর্ণিমা কি না। স্নান রয়েছে।'

পথের মানুষ। বাইরের কথা [illegible] পারেন না কিছুতেই। বললাম [illegible] 'চলি।'

হাত ধরে বললেন, 'আসুন।'

খানিকটা গিয়ে ফিরে দাঁড়ালাম। [illegible] গেল, লজ্জাও হল। তবু বললাম, [illegible] কথা বলব?'

'একটা কেন, একশোটা বলুন।'

বললাম, 'কেন এসেছি [illegible] না এলে আপনার দেখা হত না [illegible]

বলতেই ওর ঠোঁট দুটো [illegible] চকিতে [illegible] পড়লেন [illegible] তাকিয়ে দেখতে পেলাম [illegible] চললাম। শুনতে পেলাম, চীৎকার [illegible] বলছেন, 'তা হলে এ [illegible] নিষ্ফল [illegible] কুম্ভ আপনার [illegible] থেকে যাবে। হা হা হা....'

উত্তুরে হাওয়ায় ভেসে এল [illegible] শূন্য কুম্ভ আমার ভরবে কি না [illegible] কিন্তু হৃদিকুম্ভ যে তার [illegible] মানুষরতনের স্বাদে। যে মানুষ দেখে [illegible] স্বাদ মেটে না, সেই অমৃত উনি [illegible] দিলেন হাজার গুণ। এ বৈচিত্র্যের [illegible] নেই, রূপের সীমা নেই। এ [illegible] মৃত্যু নেই।

হঠাৎ বুকে আমার আনন্দের [illegible] রইল না। চারিদিকে মানুষ। [illegible] হাহাকার। কোলাহল, ব্যস্ততা, [illegible] ঊর্ধ্বশ্বাস মানুষ। সকলে [illegible] সামনে পেছনে, ডাইনে বাঁয়ে। মনের [illegible] বেজে উঠল সহস্র রাগিণী একই [illegible] ঝঙ্কারে।

দ্রুত পা চালিয়ে দিলাম পূ[illegible] বালি শুকিয়ে ঝুরঝুর করছে। [illegible] উঠেছে এর মধ্যেই। শীতে বড় [illegible] লাগছে তাতে। পূর্বদিকের সমুদ্র[illegible] টিলার দিকে চললাম।

(ক্রমশ)

নীহারিকা থেকে সৌরজগতের উৎপত্তি : ল্যাপলাসের নীহারিকা মতবাদ

চিঠির ফল ধরল সংগে সংগেই। অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে ল্যাপলাসকে সাদর আহ্বান জানিয়ে এলেমবার্ট লিখলেন,

'Sir, you see that I paid little enough attention to your recommendations; you don't need any. You have introduced yourself better. That is enough for me; my support is your due.'

খুশীতে চঞ্চল হয়ে উঠলেন ল্যাপলাস। বুঝলেন স্বপ্ন তাঁর সার্থক হবে। এর কিছুকাল পরেই এলেমবার্টের চেষ্টায় তিনি প্যারিসের মিলিটারী স্কুলে গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। নদী আহ্বান পেল যেন প্রথম সাগর সঙ্গমের। জীবনে সুযোগ এসে গেছে। পায়ের তলায় অনুভব করতে পেরেছেন শক্ত মৃত্তিকার স্পর্শ। দাক্ষিণ হাওয়ার দাক্ষিণ্যের মত দ্য এলেমবার্টের সহযোগিতার সাহচর্য তো রয়েইছে জীবনে। অতএব প্রতিভাধর ল্যাপলাস তো বসে থাকতে পারেন না—পারেন না আপনার স্বপ্নমাখা সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিতে। আপনার আকুল আকুতি নিয়ে তাই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে—সমস্ত বিজ্ঞান-জগতকে সচকিত করে তুলতে। কি জানি কেন, এই সময়ে হঠাৎ একটা শ্রদ্ধা-সজল প্রতিজ্ঞা করে বসলেন—বিজ্ঞানসম্রাট নিউটনের সমপর্যায়ে উন্নীত করতে হবে নিজেকে। মনে মনে স্থির করে ফেললেন, নিউটনের অসমাপ্ত কাজের থেকেই শুরু হবে তাঁর পথ-পরিক্রমা; নিজের প্রতিভার আলোকে স্পষ্ট করে তুলবেন নিউটনের অস্পষ্ট অংশগুলো। আর এমনি করে নিউটনের সূত্র ধরে নিউটনকেই অতিক্রম করে যাবেন। সমস্ত স্বপ্ন, কল্পনা মানসিক দ্বন্দ্ব ও প্রতিজ্ঞার পরিসমাপ্তিতে দেখা গেল ল্যাপলাস নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে দিয়েছেন নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্রকে কেমন করে সমগ্র সৌর জগতে ব্যবহার করা যায়—তারি গবেষণার কাজে।...

চব্বিশ বছর বয়সের সময় বিজ্ঞান-ভারতী মুখ তুলে চাইলেন ল্যাপলাসের দিকে। এই সময় থেকেই শুরু হল তাঁর আবিষ্কারের পথ-পরিক্রমা। তাঁর অপূর্ব বিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত 'Recherches sur le calcul integral' নামক প্রবন্ধে। তাঁর এই বিশ্লেষণী প্রতিভাকে সহচর করে এর পরেই তিনি আক্রমণ করলেন মাধ্যাকর্ষণ-সূত্রের বিভিন্ন অমীমাংসিত সমস্যাগুলোকে। এর ভিতর বৃহস্প... ও শনির সমস্যাগুলোই উল্লেখযো... উলার ও ল্যাগরেঞ্জ যথাসাধ্য ... করেও কিছুতেই এগুলোকে ... পারেন নি সূত্রের কোন সুষ্ঠু ... তাঁদের গবেষণার ফলাফলে ... অসামঞ্জস্য ও অমিল ছিল ... ল্যাপলাসকে গভীরভাবে ভা... তুলল। কালবিলম্ব না করে ... তৃষিত অন্তর নিয়ে অদম্য উৎ... তিনি গ্রহঘটিত আলোড়নকে ... করে শুরু করলেন বৈজ্ঞানিক গবে... ব্যর্থ হলেন না ল্যাপলাস। বিজ্ঞা... ভারতী আবিষ্কারের বরমালা প... দিলেন তাঁর গলায়। এই আবি... পেছনে শুধু তাঁরই একক অবদা... না—তাতে ছিল তাঁর মহান প্রতি... ল্যাগরেঞ্জের যথেষ্ট অবদান। ... গবেষণার সাফল্য নিউটনোত্তর ... জ্যোতির্বিজ্ঞানে নিয়ে এল ... অগ্রগমনের জোয়ার। ১৭৭৩ খৃ... ১০ই ফেব্রুয়ারী প্যারিসের একা... অব সায়েন্সেস-এ গ্রহের গড় ... (Planetary mean mo... অপরিবর্তনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর ... গবেষণা ও সমাধানের কথা ঘোষণা ... সৌর জগতের স্থায়িত্ব স্থাপনে ... প্রথম ও প্রধান অবদান। এর প... পর্যায়ক্রমে চলল আরো গবেষণা, ... অন্বেষণ।......

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ ল্যাপ... জীবনের একটি স্মরণীয় বৎসর। ... সময়ে তিনি তাঁর অসাধারণ বৈজ্ঞা... গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ লাভ ... প্যারিসের 'একাডেমী ও সায়েন্সে... স্থায়ী সদস্য পদ। আবার এই সম... তিনি বিজ্ঞান জগৎ থেকে আংশিক... সরে এসে জড়িয়ে পড়লেন জটিল ... নীতির ঘূর্ণাবর্তে। তাঁর ... সাধনা বিজ্ঞানের গবেষণা থেকে ... নীতির পিছল পথে। এই পদক্ষে... মূলে ছিলেন নেপোলিয়ান ... পার্ট। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক ... তাঁর বিজ্ঞানী জীবনকে বিশেষ ক... লিপ্ত করতে পারেনি। যত দূ... হয়, ল্যাপলাসের কাছ থেকে যা ...

এ সম্বন্ধে ল্যাপলাস আবিষ্কার করে বসে আছেন। নৈরাশ্যে ভেঙে পড়লেন বায়ট। কিন্তু স্মিতহাস্যে ল্যাপলাস অভয় দিলেন তাঁকে। তিনি বায়টকে তাঁর আবিষ্কার প্রকাশ করতে পরামর্শ দিলেন; আর সঙ্গে সঙ্গে সাবধান করে দিলেন কেউ যেন না জানতে পারে ল্যাপলাসের এই আবিষ্কারের কথা। এমনি করে ল্যাপলাস আরও কত শিক্ষানবীশকে যে সাহায্য করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। উপরকার ঘটনা বায়ট নিজের মুখে স্বীকার করে গেছেন।......

ল্যাপলাস ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ। ছেলেবেলা থেকেই গণিত ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোন আলোচনায় তিনি অদ্ভুত আনন্দ পেতেন। নিউটনের সমান হবার একটা অভিলাষ ছেলেবেলাতেই তাঁর মনে জাগে। এ অভিলাষ তাঁর সফল হয়েছিল। উত্তরজীবনে যে অসামান্য সুশৃঙ্খল ও দৃঢ় উৎসাহ নিয়ে প্রকৃতি-জগতের গবেষণায় তিনি মেতেছিলেন তা চিরদিনই তাঁর সঙ্গে ছিল একান্ত বিশ্বস্ত অনুচরের মত। এছাড়া ছিল তাঁর অসাধারণ বিশ্লেষণী প্রতিভা। এই বিশ্লেষণী প্রতিভার কল্যাণেই জন্ম হয়েছে এতগুলি আবিষ্কারের। আর অনুরূপ সমস্যা থেকে নতুন সমস্যা ও সমাধানের জন্য নতুন সূত্রকে তাঁর অল্প সময়ে বুঝবার এবং বিভিন্ন সূত্রের ভিতরকার সুপ্ত ঘটনার আবিষ্কারের একটি অদ্ভুত মানসিক ক্ষমতা তাঁর ছিল। তিনি একবার যে সমস্যাকে আঁকড়ে ধরতেন তা থেকে যতদিন না তাঁর অভীষ্ট ফললাভ করতেন, ততদিন বছরের পর বছর কেবল গবেষণাই করে যেতেন; কিছুতেই রেহাই দিতেন না সে সমস্যাকে। প্রকৃতি বিজ্ঞানের শাখায় শাখায় ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর চিন্তা ও গবেষণার জ্বলন্ত স্বাক্ষর। এ প্রসঙ্গে ল্যাপলাস সম্বন্ধে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 'ফোরিয়ের' (Fourier) উক্তি মনে পড়ে ঃ

'He would have completed the science of the sky, had the science been capable of completion.

তাঁর দারুণ সংযম ও স্বাভাবিক দৈহিক স্বাস্থ্য তাঁকে বার্ধক্যের সামর্থ্যহীনতা থেকে মুক্ত করে [illegible] অনেকদিন। তিনি যখনই [illegible] অত্যন্ত যত্নের সঙ্গেই [illegible] জীবনে অসাবধানতার [illegible] একেবারে। তাঁর অসাধারণ [illegible] ও প্রতিভা মৃত্যুর দুই [illegible] পর্যন্ত ছিল অম্লান। কিন্তু [illegible] রোগের দিকে অত্যধিক পরিশ্রম [illegible] স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে [illegible] সময় তিনি প্যারিস ছেড়ে [illegible] চলে আসেন [illegible] আর্কুয়েলের শান্ত নির্জন গ্রাম [illegible]

[illegible]

সেদিন ১৮২৭-এর ৫ই মার্চ।

আর্কুয়েলের মাঠে মাঠে [illegible] সন্ধ্যার [illegible]। [illegible] আকাশ সন্ধ্যারাগে রক্তিম। [illegible] রক্তিমাভা ছড়িয়ে পড়ল ল্যাপলাসের মুখে-চোখে। পাশে বসে ডাক্তার [illegible] দেখছেন। নিস্প্রভ বৈজ্ঞানিকের [illegible] প্রসারিত হয়ে উঠল; ধীরে ধীরে [illegible] কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন ঃ 'আমরা যা [illegible] সে তো কিছুই নয় যা জানিনে [illegible] অপরিসীম।'

অন্ধকার নেমে এল আর্কুয়েলের পথ-ঘাট-প্রান্তর জুড়ে; আর ধীরে ধীরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানীর জ্যোতির্ময় চোখেও নেমে এল অনেক রাত্রির অনেক অন্ধকার।

কাব্যমিতির পক্ষে নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। স্বপ্ন ও বাস্তবের সানুরাগ স্বীকৃতির অকুণ্ঠতা তাঁর এই বইয়ের বহু-পরিচিত নানা কবিতায় সুস্পষ্ট। তাঁর কবিতার রাজ্য যেমন প্রাকৃতিক, তেমনি মানবিক। বিষয়ের দাবী স্বীকার করেও গীতি কবিতার গীতিমজ্জার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখতে তিনি সিদ্ধহস্ত।

৩১৮।৫৪

রহস্যোপন্যাস

চিড়িয়াখানা—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়; বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২; দাম—আড়াই টাকা।

Arthur Conan Doyle-এর যেমন Sherlock Holmes অক্ষয় কীর্তি শরদিন্দুবাবুর ব্যোমকেশও বাংলায় কতকটা তাই। সুখের বিষয় যে, শরদিন্দুবাবু শুধু গোয়েন্দা-গল্পের লেখকই নন, সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রের একাধিক বিরল কোণে এঁর স্বাক্ষর এত স্পষ্ট যে, আজকের দিনে এঁর বই আর কারো পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হলে তিনি যে অত্যন্ত বিশিষ্ট ভাবেই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন—সে সম্বন্ধে এখন আর কারো সন্দেহ নেই। যদিও বিচিত্র ধারায় তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি বিকাশ পেয়েছে তবুও তিনি শিল্পিজীবনের প্রথম থেকেই প্রধানত দুটি দিক বেছে নিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় কর্মক্ষেত্র হিসেবে। এই উভয় দিকেই তিনি অজ সর্বজনবিদিত ও প্রতিযোগীরহিত। প্রথমটি হচ্ছে ঐতিহাসিক রোমান্স—এ জিনিসে আজকের দিনে তাঁর সমকক্ষ মেলা ভার। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনীর জনপ্রিয় দিক—এতেও তাঁর জুড়ি নেই। সত্যিকার উঁচুদরের গোয়েন্দা-গল্প এখনকার সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র ইনিই লিখছেন। 'জাতিস্মর' 'বিষকন্যা' 'সদা পৃথিবী' ও 'কালের মন্দিরা' ইত্যাদি বহু বিশিষ্ট গ্রন্থে আমরা তাঁর একটি উজ্জ্বল দিক উন্মোচিত হতে দেখেছি। অনেকেই অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন এই বিরলপূর্ব ও দুর্লভ শিল্পীকে। আবার ব্যোমকেশের গল্পগুলিতে আমরা তাঁর অপর একটি স্বতন্ত্র দিক দেখতে পাই। এ ছাড়াও অবশ্য তাঁর অন্যান্য দিক আছে, যেমন সামাজিক কথাশিল্পের দিক, চিত্রনাট্য-রচনার দিক, এমন কি তিনি প্রথম প্রথম কবিতাও লিখেছিলেন কিন্তু তাঁর সামগ্র সাহিত্যিক মূল্যায়ন করতে গেলে পূর্বোক্ত দুটি দিক ছাড়া অন্যান্যগুলি আমরা খুব সহজেই উপেক্ষা করতে পারি। বিশেষ করে যাঁরা শরদিন্দুবাবুকে শুধু চিত্রনাট্য রচয়িতা হিসেবে জানেন, তাঁদের মতো দুর্ভাগাদের কথা ভেবেও লজ্জা করে। সমালোচ্য চিড়িয়াখানা বইটি পূর্বোক্ত দু' শ্রেণীর মধ্যে শেষোক্ত শ্রেণীতেই পড়ে অর্থাৎ এটি একটি রহস্যোদ্দীপক রোমাঞ্চ কাহিনী। আনন্দবাজার পত্রিকার পূজা সংখ্যায় এটি প্রথম যখন বেরোয় তখন সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বইটি একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না করা পর্যন্ত নিস্তার নেই—এমনই এর কৌতূহলোদ্দীপনের ক্ষমতা। একটা রুদ্ধশ্বাস সাসপেন্স, একটা উত্তেজক কৌতূহল পাঠকের নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত—এতেই বোঝা যাবে যে, গোয়েন্দা-গল্প হিসেবে কতোটা সার্থক হয়েছে বইটি। লেখকের এতদিনকার অর্জিত প্রতিষ্ঠার একান্তই অনুকূল হয়েছে বইখানি। বই প্রায় শেষ হয়ে এলেও কোনোকিছু আন্দাজ করে নিতে পারা যাবে না যে, নিশানাথবাবুর হত্যাকারী কে বা কারা, কী জন্যই বা মোটরের অংশগুলো মাঝে মাঝে আসতো, কে ফেলতো, এর পেছনে কীই বা অভিসন্ধি ছিলো, কেনই বা Blackmail করার কথাটা ব্যোমকেশের কাছে বলে ফেলতে গিয়েও চেপে গেলেন নিশানাথবাবু, ওঁর নিজেরও যেন কোথাও দুর্বলতা আছে স্পষ্টই বোঝা গেল, কিন্তু কী সেই দুর্বলতা? বরাবর নেপালবাবুর ওপর পাঠকের সন্দেহ হবে বেশি—মনে হবে নেপালবাবু ও তার কন্যা মুকুল হয়তো এর পেছনে আছেন। আবার কখনো মনে হবে বিজয় ও দময়ন্তী—এদেরই ষড়যন্ত্রে মৃত্যু ঘটেছে নিশানাথবাবুর। কখনো মনে হবে ডাক্তার কিন্তু তার সামান্যতম [illegible] নেই—কিছুই বলা যাবে না ঠিক করে নেত্যকালী বা সুনয়না প্রকৃতপক্ষে [illegible] কি মুকুল বা বনলক্ষ্মী বা অপর কেউ [illegible] সঙ্গে গোলাপ কলোনীর হত্যাকাণ্ডের [illegible] কী সম্বন্ধ—এ সব কোনোকিছুরই [illegible] করতে পারা যাবে না। এমন কি পানুগোপালের সন্দেহজনক মৃত্যুরও কোনো [illegible] না। রসিক বা ব্রজদাসই বা অমন সন্দেহজনকভাবে পালালো কেন?—এই সব [illegible] প্রশ্নের গোলকধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে [illegible] সব রহস্যের উন্মোচন হবে শেষের [illegible] পাতায়, তখন সকল সমস্যার সমাধান [illegible] আপনিই, কুটিল রহস্য হবে উদঘাটিত [illegible]

শুধু যে প্লটের জন্যই [illegible] গল্পটি—তা নয়। এর অধিকাংশ [illegible] [illegible] বটে। তবে বিভিন্ন মহৎ শিল্পীর [illegible] পড়লে গোয়েন্দা গল্পও দু'একটি [illegible] হয়ে পড়ে অন্তত মহৎ শিল্পকর্মও [illegible] হয়ে যায়। শক্তিমান শিল্পীর [illegible] জিনিসটা সম্ভব হয় নইলে এ বিষয় [illegible] ও অসঙ্গতি থেকে যাবেই। [illegible] যুগের একজন শক্তিমান কথাশিল্পীর [illegible] বিস্ময়কর সৃষ্টি আমরা এ প্রসঙ্গে [illegible] করতে পারি। Wilkie Collins-এর [illegible] Woman in White বইয়ের [illegible] Fosco-কে কে ভুলতে পারে? [illegible] ছদ্মবেশী শয়তান, রোক দুর্ধর্ষ দুর্বৃত্ত [illegible] এত বড়ো ধুরন্ধর চরিত্র আঁকা [illegible] শিল্পী ছাড়া কি সম্ভব হতো? [illegible] Fosco-র তুলনায় চিড়িয়াখানার [illegible] ডাক্তার নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর হলেও Count Fosco-র সামান্যতম স্ফুলিঙ্গও [illegible] পাওয়া যায় ভুজঙ্গধর ডাক্তারের [illegible]

A master of shudder [illegible] suspense—Poe-র সম্পর্কে [illegible] হয়েছিলো কথাটা এবং স্পষ্টতই [illegible]

হয়ে গেছে পরিণতির সঙ্গে তার কোন সামঞ্জস্য না থাকায়। অফিসে চাকুরিরত কুমারী মেয়েদের একদিকে সংসারের অর্থনৈতিক চাপ ও অন্যদিকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নারীত্বের চরম বিকাশের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা ও বেদনার বিষয়টুকু একমাত্র পাঠক-চিত্তকে দ্রবীভূত করে। নইলে কি টেকনিক, কি বিষয়বস্তু—সব দিক থেকেই 'কাক-বন্ধ্যা' বৈশিষ্ট্যহীন। লেখকের অহেতুক পাণ্ডিত্য জাহির করবার অপচেষ্টায় কাহিনীর রস বাধাপ্রাপ্ত হয়। অসংখ্য ছাপার ভুল চোখে পড়ল—ছাপাখানার ত্রুটির চেয়ে মনে হল লেখকই এর জন্য দায়ী (বিশেষ করে ভুল বানানগুলি)। সবচেয়ে তাজ্জব হলাম, বিগত যুগের মত টাইপে ছাপা প্রচ্ছদপট সহ মাত্র ৭৭ পৃষ্ঠার বইখানির দাম তিন টাকা কোন্ হিসাবে করা হল? ২৩৩।৫৪

নতুন অতিথি : স্বপনকুমার; প্রকাশক—বিশ্বসাহিত্য প্রকাশনী, ৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৷৷৹।

সাধারণ একটি গোয়েন্দা কাহিনী। রহস্যজাল তেমন জমজমাট হয়ে না ওঠায় প্রকৃত হত্যাকারীকে যবনিকাপাতের অনেক আগেই ধরা যায়। উত্তম ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট কিশোরদের খুশি করবে। ২৮৮।৫৭

পৃথিবী থেকে দূরে : স্বপনকুমার; প্রকাশক—বিশ্বসাহিত্য প্রকাশনী, ৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—৷৷৹।

বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কারের পটভূমিকায় রচিত কিশোরদের উপযোগী একখানি রোমাঞ্চকর কাহিনীর বই। বিদেশী ভাষার বইয়ের ব্যর্থ অনুকরণ করতে গিয়ে বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ স্বচ্ছ হয়নি—বর্ণনাই হয়েছে সার। এই ধরনের বই লেখবার আগে আলোচ্য পুস্তকের লেখককে প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত 'পৃথিবী ছাড়িয়ে' পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। ২৮৯।৫৪

খেলার কথা

খেলাধুলায় জ্ঞানের কথা—শ্রী খেলোয়াড়; ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য—২৷৷৹।

শ্রী খেলোয়াড় এক উৎসাহী ক্রীড়া সাংবাদিকের ছদ্মনাম। লেখক ইতিপূর্বে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য 'জগৎজোড়া খেলার মেলা' লিখে প্রশংসাভাজন হয়েছেন। তাঁর নূতন রচনা 'খেলাধুলোয় জ্ঞানের কথা' বাঙলা ভাষায় লিখিত এরূপ ক্রীড়াপুস্তকের বহুদিনের অভাব পূরণ করেছে। এতে সুন্দর এবং সহজ ভাষায় ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, টেবিলটেনিস, [illegible]

সাঁতার, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি সম্পর্কে খেলার জন্মকথা এবং তার ক্রমবিকাশ [illegible] করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক এবং [illegible] ক্রীড়াপ্রতিষ্ঠানগুলির পরিচয়, বিশ্বের [illegible] প্রধান প্রতিযোগিতার পরিচালনা [illegible] এপর্যন্ত যে সমস্ত বিদেশী খেলোয়াড় ভারতে আবির্ভাব ঘটেছে এবং [illegible] খেলোয়াড় বিদেশ ভ্রমণ করেছে [illegible] তালিকাও স্থান পেয়েছে। [illegible] টিকসের ট্রাক এবং ফিল্ড [illegible] রেকর্ডের 'চার্ট' পুস্তকখানির [illegible] আকর্ষণ। খেলাধুলায় নিতান্ত [illegible] ব্যক্তিও বইখানি পড়লে বিশ্বের [illegible] সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি [illegible] পারবেন। প্রচ্ছদপটে [illegible] দীপবর্তিকার ছবিটি বইখানির সৌষ্ঠব [illegible] করেছে। ছাপা প্রশংসার দাবী রাখে।

[illegible]

বিবিধ

শিক্ষাব্রতী (রবীন্দ্র সংখ্যা ১৩৬১—[illegible] প্রদ্যুম্নকুমার [illegible] সম্পাদিত; শিক্ষাব্রতী কার্যালয়; ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট; কলিকাতা—১২। মূল্য—দুই টাকা।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা অধ্যুষিত [illegible] দেশে 'শিক্ষাব্রতী'র স্থান বিশিষ্ট। [illegible] করে শিক্ষা সম্পর্কিত এই পত্রিকাটির [illegible] সংখ্যাগুলি প্রতি বৎসরই বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বৎসরের [illegible] সংখ্যাটিও সুসম্পাদনার গুণে তার [illegible] বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে।

আমরা 'শিক্ষাব্রতী'র উত্তরোত্তর [illegible] কামনা করি।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

জাতক কৌমুদী—কালীপদ ভট্টাচার্য [illegible]
দিবাকরী—দিবাকর শর্মা।
ত্রিপদী—বিমল কর।
সারনাথ তীর্থ—ভিক্ষু শীলাচার।
দেশে দেশে মোর ঘর আছে—[illegible]
সাহিত্য জিজ্ঞাসা—শ্রীকুমুদনাথ [illegible]
চণ্ডলাচার্য—শ্রীপ্রদ্যুম্নকুমার চক্রবর্তী [illegible]
দর্শনের ইতিবৃত্ত—(১ম পর্ব)—[illegible] রায়।
সংসার—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সরকার।
পথের সন্ধানে—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় [illegible]
কন্যারত্ন—শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।
ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস—সুবোধ ঘোষ [illegible]
ভারতের আদিবাসী—সুবোধ ঘোষ [illegible]
শাল পিয়ালের বন—শক্তিপদ রাজগুরু [illegible]
তপোবন—স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী [illegible]
Temples nd Religious Endo[illegible]

আছে? না এ শুধু স্ট্যাটিস্‌টিক্সের বিদ্রূপ? আজও গায়ে লেগে রয়েছে সেই কবরের গন্ধ; বাতাসে উড়ছে চিতাভস্ম! তবু হে কবরোত্থিত ল্যাজারাস্! পারতো আনন্দ কর! দুদিন বই তো নয়। প্রত্যেক মানুষের সামনে রয়েছে একটিমাত্র সমস্যা। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী মেয়াদটুকু কোনরকমে অতিক্রম করতে হবে। একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে বিশুদ্ধ গণিতের একজন কৃতী ছাত্র সমস্যাটিকে এইভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন। সমস্যাটি যদি এতই সরল হ'ত, অনুবর্তী সময়টুকু 'ড্রাগিং'এর দ্বারা ঘুমিয়েও কাটিয়ে দেওয়া যেত। যখন মহাবীর অ্যালেকজাণ্ডারের অনুকরণে গর্ডিয়ান গ্রন্থিটিকে এক আঘাতেও ছিন্ন করা যেত; কিন্তু বিচ্ছিন্ন একাকীত্বের সীমান্ত অতিক্রম করেও অস্তিত্ব পরিব্যাপ্ত রয়েছে। এই এক এবং একাধিকের সম্পর্কের সূত্রে যথাযথ 'ডিসিসন'এ পৌঁছনই আসল সমস্যা।

এই প্রসঙ্গে পঞ্চাশ সালের কথা আর একবার মনে পড়ছে। সে সময় আমার এক কবি-বন্ধু পাটনায় এক মেসে থাকতেন। একদিন সকালে উঠে তিনি দেখলেন, মেসের উঠোনে বড় বড় মাছ প্রথম রুদ্দুরে চিক-চিক করছে। ধড়ফড়িয়ে মাছগুলো মারা গেল। "ধরার ধুলোর হতে তারার সীমার কাছে ভাষাহারা যে ভুবন ব্যাপিয়াছে" সেই ভুবনের অগোচর চেতনার মূক ক্রন্দন তিনি শুনতে পেলেন। বন্ধু লিখেছিলেন, আমি কবি নই, আমি নিষাদ; আদি কবির প্রথম শ্লোকে আমার শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা অভিশপ্তা হয়েছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরেও একটা জাত ধড়ফড়িয়ে মারা গেছে। শাশ্বতী প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে কে?

দু'পাশে সমান ব্যবধানে সম-পরিমাণ খাদ্য-পেয় মজুত থাকা সত্ত্বেও বুরিদানী গাধার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছিল। এস্থলে দুটোর মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার মত 'ডিসিসন'এর অভাব ঘটেছিল। ডান দিকেতে তাকাই যখন বামের লাগি কাঁদে রে মন, আবার বাম দিকেতে চাইলে পরে দখিন ডাকে আয়রে আয়! সুতরাং ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় শেষ পর্যন্ত বুরিদানী গাধাটি মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হয়। ঠিক এই ধরনের 'আইডিয়াল ইকুইলিব্রিয়াম'এর অবস্থা পঞ্চাশের দিনগুলোতে দেখা যায় নি। তবু বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না, যথাযথ 'ডিসিসনের' অভাব, সঠিক সংকল্পের অভাবই পাইকারী আত্মহননের মূলে। এইমাত্র যে লোকটি গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করল, 'ডিসিসন' গ্রহণের অসামর্থ্যই হয়তো তারও এই ট্র্যাজেডির মূলে।

হাওড়া স্টেশন থেকে ব্রীজ পর্যন্ত যতটুকু পথ পেরিয়ে এসেছি, মনের পটে তারই একটি ছবি ফুটে উঠছে। প্ল্যাটফর্মের ওপরে যতক্ষণ ততক্ষণ 'ডবলিউ টি' সন্দেহে আপনার মুখের ওপর অনেকগুলো দৃষ্টি নিপতিত হতে পারে। একবার এধারে আসতে পারলেই আপনি জেন্টেলম্যান-অ্যাট-লার্জ! আমি প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে এসেছি; সুতরাং আমি একজন ছাড়া-পাওয়া ভদ্রলোক! য়ুরোপের শেষ বোহেমিয়ান শিল্পী মোদিল্লিয়ানি একদা ঈষৎ সুরাসিক্ত অবস্থায় নিজের ডেরায় ফিরছিলেন। তখন অনেক রাত। পথিমধ্যে পুলিসের চ্যালেঞ্জের জবাবে মোদিল্লিয়ানি পকেট থেকে কতকগুলো স্কেচ বের করে তার নাকের ওপর তুলে ধরে বললেন, পাসপোর্ট? হিয়ার আর মাই পাসপোর্টস্ টু ইমমর্টালিটি!—এই দেখ আমার অমৃতলোকের ছাড়পত্র! টিকিটবিহীন অবস্থায় এই ধরনের স্মরণীয় কথা কাউকে বলতে শো[illegible] যায় নি।

প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে স্টেশন চত্ব[illegible] ঢুকেই মাথা উঁচু করতে [illegible] সত্য, প্রেম, অহিংসার বাণী [illegible] চোখ নামাতেই দেখা [illegible] উদ্বাস্তুর দল। দুটো [illegible] জড়াজড়ি করে সৃষ্টি করেছে [illegible] সীল! ওপরে যা নীচেও তাই, নীচে যা ওপরেও তাই। [illegible] এই কিম্ভুতটা [illegible] চলতে আর একদিনের কথা [illegible] তখন বৃটিশ আমল। [illegible] অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্টেশন চত্ব[illegible] [illegible] নীচে দাঁড়িয়ে এক [illegible] শিরীষদা প্রতিবাদ [illegible] সমস্ত দর্শকটি তাঁকে [illegible] আশপাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে [illegible] অপরিচিত লোক। [illegible] একান্তে এই [illegible] অসাধারণত্ব [illegible] পড়েছিল। [illegible] কাহিনীও অসাধারণ [illegible] আসছে একদিন আসবে যেদিন [illegible] এই অতিপ্রিয় পৃথিবীর [illegible] সূর্য আর তাপ বিকীরণ [illegible] সূর্য যদি উত্তাপ দিতে ভুলে [illegible] সূর্যলোকে প্রয়াণ করে আমরাই [illegible] সেই আলো এবং উত্তাপ। এই [illegible] সংকল্প নিয়ে শিরীষদা আত্মহত্যা [illegible] ছিলেন। পাগল? তা সে যাই [illegible] হোক, মিসেস. ব্রাউনিং'এর কাপোর [illegible] লেখা এক কবিতার লাইনই কেবল [illegible] পড়ছে—

Oh poets! from a maniac's lips
was poured this deathless singing!

কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না, এক[illegible] লোক পাশে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস কর[illegible] দৃশ্য এর আগে বুঝি দেখেন নি? এরকম হামেশাই ঘটছে, রোজই একটা দুটো [illegible] হা মোর দুর্ভাগা দেশ! যীশুর [illegible] মনে পড়ছে, মৃতের সংকার মৃতেরা কর[illegible] তুমি চলে এস! দ্রুতপায়ে বাকী ব্রীজটা পেরিয়ে যাই।

ট্রামে-বাসে

শ্রীযুক্ত অজিতপ্রসাদ জৈন কলিকাতা [illegible]দের প্রোগ্রামে তাঁর বেতার [illegible] বলিয়াছেন যে, উদ্বাস্তুদের [illegible] একটি "মানবীয়" সমস্যা— [illegible] সংস্কৃতিতে আমরা আস্থাবান [illegible] অনেক মনে করতেন এই [illegible] মানুষের কোন সম্ভব [illegible] করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

শ্রীযুক্ত জৈন আরও বলিয়াছেন যে, [illegible] মৌমাছির মত চাক [illegible] ছিলেন। —"তা ছিলেন। [illegible] দূরের কথা, চিঠি [illegible] ভাগে পড়েনি"—বলে [illegible] শ্যামলাল।

* * *

শুনিলাম কটকে কোন এক পাগলা-[illegible] আমদের বাবাজীদের [illegible] সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। [illegible] প্রকাশ, বাবাজীরা এই সংঘর্ষে [illegible] প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র [illegible] করিয়াছেন। —"বোধ হয় ভস্ম [illegible] বর্তমান যুগে অচল বলেই

[illegible] ব্যবস্থা। পুলিসও অবশ্য পাগলের [illegible] মধ্যমনারায়ণ ব্যবহার না করে [illegible]দের ব্যবস্থাই করেছেন"—মন্তব্য [illegible] জনৈক সহযাত্রী।

* * *

একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত লালবাহাদুর শাস্ত্রী মহাশয় [illegible]য়াছেন যে, অদূরভবিষ্যতে রেলওয়ের [illegible] হ্রাসের কোন সম্ভাবনাই নাই। [illegible] বলিল—"বর্ধিত হারে ভাড়া [illegible] অনেকটা গা-সহা হয়ে গেছে; [illegible] তার জন্যে ভাবছিনে। শাস্ত্রী [illegible] ভবিষ্যতে রেলওয়ের কলিসন্-[illegible] আশ্বাস দিলে বেঁচে যাই।"

লিগ অব নেশন প্রতিষ্ঠার সময় সন্তুষ্ট হইলে সেলাসি হস্তিদন্ত নির্মিত স্বর্ণখচিত একটি বৃহদাকার দোয়াত উপহার দিয়াছিলেন। সংবাদে
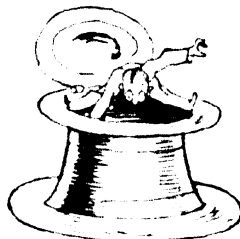
প্রকাশ, ইংল্যান্ডে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদনের জন্য নাকি সেই দোয়াতটি ব্যবহার করা হইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"দোয়াতের লেখা যারা পড়তে পারেনি, তারা পাততাড়ি বগলে নিয়ে এখনো ছড়া কাটছে—থালা-ভরা আছে মিঠাই, দোয়াতে আছে, কালি নাই"!!

* * *

চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাই ফরাসীর প্রধান মন্ত্রী মেঁদে ফ্রাঁসের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করিয়াছেন। ভোজনান্তে চৌ এন লাই নাকি বলিয়াছেন যে, ফরাসীর রান্না তাঁর খুব ভাল লাগিয়াছে। —"শুধু আহার্যই নয়, পানীয় প্রস্তুতেও ফরাসীদের বেশ সুনাম আছে। সুস্পষ্ট কারণে তার উল্লেখ অনেক সময়েই করা হয় না; আমরাও করলাম না"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

মাহে ত্যাগের পূর্বে ফরাসী-শাসক মহাশয় বলিয়াছেন, আমি আশা করি, মাহের অধিবাসীরা ফরাসী সংস্কৃতির অন্তত কিছু একটা সংরক্ষণ করিবেন। —"কী তাঁরা রাখবেন জানিনে, তবে একথা জানি যে, "ফ্রেঞ্চলিভের" জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই"—বলে [illegible]

এই সংস্কৃতিতে শ্যামলাল অনেকবারই উপকৃত হইয়াছে বলিয়া জানি।

* * *

এক সংবাদে প্রকাশ, "স্টেলিনন" নামক একটি ঔষধ খাইয়া ফরাসীতে নাকি অনেকের প্রাণনাশ হইয়াছে। —"সংবাদে প্রকাশিত না হলেও আমরা লোকের মুখে শুনেছি "ডালেস-ড্রুস" নাকি প্রাণনাশ না হলেও অনেকেরই প্রাণান্ত হচ্ছে"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

জাপানে কোন একটি রেশম-শিল্প প্রতিষ্ঠানের মহিলা কর্মীরা নাকি প্রেম করিবার অধিকারের জন্য দাবী জানাইয়াছেন। —"আমাদের দাবী মানতে হবে ধ্বনি আমরা অনেক শোভাযাত্রীদের মুখেই শুনেছি এবং সেসব দাবীর বেশিরভাগই না মেনে নেওয়ার খবরও পেয়েছি। কিন্তু অনুরূপ দাবী না মানার মতো অরসিক দেশে এবং বিদেশে কতজন আছেন, তাই ভাবছি"!

* * *

১৯৫৪ সালের "মিস্ ইউনিভার্স" প্রতিযোগিতার তিনজন প্রতিযোগিনী নাকি তাঁদের ফটো গ্রহণের সময় অজ্ঞান হইয়া পড়েন। —"ফটো দেখে অজ্ঞান হওয়ার বিপদ থেকে অনেকেই রেহাই পেলেন"—বলে শ্যামলাল।

* * *

পাক্ প্রধান মন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলী বলিয়াছেন—হক্ মানেই আত্মীয়-পোষণ, ভণ্ডামি ও দুর্নীতি। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কিন্তু আমরা

জানি হক্ মানে প্রকৃত, যথার্থ, ন্যায্য (চলন্তিকা দ্রষ্টব্য)। আর আলী সাহেব বাঙলা ভুলে গিয়ে থাকলে—ভুলে যাবারই- [illegible]

কথক নৃত্যের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত

মহাশয়,—গত ২৫শে আষাঢ়, ১৩৬১, আপনার পত্রিকায় মুদ্রিত শ্রীনলিনকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের "কথকনৃত্যের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত" শীর্ষক প্রবন্ধটির 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' সম্বন্ধে কয়েকটি কথার এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। তাঁহার বিশ্লেষণে ব্রহ্মেই অর্থাৎ একেই যদি জীব ও জগৎ লীন না হইতে পারে, তবে তাহাকে অদ্বৈতবাদ বলা যায় কিরূপে। লীন কে হইবে—উত্তর পাওয়া যায় জীব—অর্থাৎ জীবের যে একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে তাহা লীন শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয়। তাহা হইলে কেবল অদ্বৈতবাদ দ্বারা জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও কেবল দ্বৈতবাদেরই সংমিশ্রিত নামান্তর। অবশিষ্ট রহিল দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, যাহাকে মাধবাচার্যীয় ভাষ্য দ্বারা ব্যাখ্যা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ব্রহ্মের সহিত জীবের সত্তাগত প্রভেদ যেখানে নাই ঠিক সেইখানেই অদ্বৈতবাদ কিন্তু ব্যাপ্তি অর্থে ব্রহ্ম, বিভু ও জীব অণু হওয়ায় দুইটি অবস্থার সমতা রক্ষা হইল না এবং কেবল এইখানেই দ্বৈতবাদের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। বিষয়টি আরও বিশদভাবে বলিতে গেলে লোষ্ট্রখণ্ড ও পর্বত—দুইটির মধ্যে যখন সত্তাগত পার্থক্য নাই তখনই অদ্বৈতবাদ যখন ব্যাপ্তিগত পার্থক্য স্পষ্ট হইয়া উঠে তখনই দ্বৈতবাদ। অতএব শংকরাচার্যের কেবল অদ্বৈতবাদ বা রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে স্বীকার করিতে গেলে জীবের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়, যাহা আত্মঘাতী নীতিরই পরিপোষক। সেজন্য দ্বৈত ও অদ্বৈত দুইটি বাদই একই সময়ে সত্য ও নিত্য। ইহার কোনটিকেই কোন অবস্থায় অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই এবং একই সময়ে যুগপৎ দুইটি অবস্থাকে চিন্তা করা যায় না বলিয়া ইহাকে বৈষ্ণব ব্যাখ্যায় "অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব" নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। অতএব ইহার পরিপ্রেক্ষিতে নলিনবাবুর আলোচ্য বিষয়টির সমাধান হইবে আশা করা যায়। ইতি—

শ্রীপ্রণবপ্রতাপ দাস, কলিকাতা।

আর্টের আধুনিক ধারা

মহাশয়,

গত ২৫শে আষাঢ়ের দেশে শ্রীকৃষ্ণা চৌধুরীর "আর্টের আধুনিক ধারা" প্রবন্ধটি পড়লাম। আন্তর্জাতিক সমসাময়িক চিত্রপ্রদর্শনীর বেশীর ভাগ দর্শকের মনে যে প্রশ্ন জেগেছিল, শ্রীমতী চৌধুরী সেই প্রশ্নই এ প্রবন্ধে করেছেন। বস্তুজীবনের ফোটোগ্রাফিক প্রতিলিপি দেওয়া শিল্পীর কাজ নয়, কিন্তু তাই বলে সত্য ও সুন্দরকে ছাড়িয়ে দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি করাই কি আর্টের উদ্দেশ্য?

ছন্দ হল সৌন্দর্যের মূল কারণ, আর সৌন্দর্যই আর্টের প্রাণ। শুধুমাত্র চিত্রকলা নয়, নৃত্য, গীত, অভিনয়, সব শিল্পেই এই ছন্দ হ'ল মূল কথা। জীবনেরও ছন্দ আছে; এই বাস্তব-ছন্দের যেখানে ঘাটতি আছে সেখানটা পূরণ করে দেওয়াই হল আর্টিস্টের কর্তব্য, চিত্রকলা, সংগীত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন;—

> 'সঞ্চার করো সকল কর্মে,
> শান্ত তোমার ছন্দ।'

প্রিমিটিভ আর্টিস্টরা যদিও বাস্তবের অবিকল প্রতিরূপ অঙ্কন করতে চেষ্টা করেছিলেন তবুও তাতে যে আকৃতিগত ছন্দের সুসংবদ্ধ ভাব রয়েছে তা আমাদের মনকে চিরকাল আনন্দ দেবে। আর্টের ধর্মই এই যে, তা দেশ ও কালকে জয় করে; বিশ্বজনীন আবেদন যে-আর্টের নেই সে আর্ট, আর্টই নয়। অবশ্য চিত্রকলার রস আহরণ করতে গেলে মনকেও কিছুটা তৈরী করা দরকার। কিন্তু সমসাময়িক চিত্রপ্রদর্শনীর অধিকাংশ চিত্র দেখেই মনে হয়েছে এরা সব বুদ্বুদের মত ক্ষণস্থায়ী, মহাকালকে জয় করবার ক্ষমতা এদের নেই, যে মহাকালকে জয় করেছে দা ভিঞ্চির 'মোনালিসা' বতিচেলির 'ভেনাসের জন্ম।' মনে হয়েছে আধুনিক শিল্পীরা ছন্দের কথা ভুলে শুধুমাত্র টেকনিকেই জোর দিয়ে পৌঁছেছেন, যে ছবি এঁকে তাঁরা নিজেরাও তৃপ্তি পাচ্ছেন না, দর্শকদেরও আনন্দ দিতে পারছেন না; তাই তাঁরা সৃষ্টি করে চলেছেন কতকগুলি উদ্ভট, অবাস্তব চিত্র, যেগুলি দুর্বোধ্যতা ছাড়া আর কিছু প্রকাশ করে না।

লেখিকা পরিশেষে এই আশার বাণী জানিয়েছেন যে,—"চিত্রকলার ইতিহাস এখানে থেমে থাকবে মনে করার কোনও কারণ দেখি না।" আমিও বলি চিত্রকলার জগতে আবার "রেনাসাঁস্" আসবে, নতুন প্রাণের ছন্দ জেগে উঠবে, কোনও এক নবীন-পন্থী আধুনিকের আবির্ভাবে। ইতি—**শ্রীমিহিরকুমার অধিকারী, হুগলী।**

'সোনার তরী'

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়,—গত ১লা শ্রাবণের (১৩৬১) "দেশে" শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মশায়ের "রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি অনাদৃত কবিতা শীর্ষক প্রবন্ধে "সোনার তরী" কবিতা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনার সঙ্গে একমত হতে পারলুম না। তিনি লিখেছেন "কবিতাটির খ্যাতি তাহার শিল্পকৃতিত্ব ছাড়াইয়া গিয়াছে। আমার মনে হয় কবিতাটির খ্যাতির মূলে আছে সুললিত ছন্দ, সহজবোধ্য পল্লীবঙ্গের সুন্দর ছবি, আর কিঞ্চিৎ দুর্বোধ্যতা।" প্রথমত, সুললিত ছন্দ এবং সহজবোধ্য পল্লীবঙ্গের সুন্দর ছবি কবিতাটির মধ্যে নিখুঁতভাবে নিশ্চয়ই আছে এবং তারা কবিতাটিকে আরও কাব্যময় (poetic) করে তুলেছে সত্য; কিন্তু কবিতাটি ভাল লাগার মূলে এরাই সব কথা বা বড় কথা নয়। দ্বিতীয়ত, কবিতাটির মধ্যে দুর্বোধ্যতা কোথায় আছে বুঝলাম না। আমার ত মনে হয়, কবিতাটি এত প্রশংসা পেয়েছে তার কারণ এ নয় যে, সকলেই "রসবোধের [illegible] শ্রেণীর যাত্রী", বরং এই যে কবিতাটি [illegible] স্পষ্ট এবং সত্য। "সত্য"—এইটেই [illegible] কবিতাটির জনপ্রিয়তার মূল কারণ [illegible] একমাত্র কথা। কবিতাটি প্রথমবার [illegible] পরই অনুভব করতে পারি [illegible] ভাষায় সহজ কল্পনার মধ্যে [illegible] জীবনের একটি সুগভীর সত্য [illegible] সুন্দরই না অভিব্যক্তি পেয়েছে [illegible] আইনে। কী সেই সত্য, তা প্রথমবারেই [illegible] স্পষ্ট না হতে পারে, কিন্তু প্রথম [illegible] আমাদের মনে যে একটা দার্শনিক মনো[illegible] (philosophic mood) সৃষ্টি [illegible] নিয়ে যখন আমরা পুনরায় কবিতাটি [illegible] তখন তা নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়ে [illegible] উপর কবির নিজের ব্যাখ্যা [illegible] তৃতীয়ত, কবিতাটির জনপ্রিয়তার [illegible] দুর্বোধ্যতা নয়, এর করুণ সুরটি [illegible] জীবনের যে সত্যটি প্রকাশ করে তা [illegible] করুণ—শেলীর ভাষায়, [illegible] thought" এবং এই করুণ সত্যটি [illegible] একটি সূক্ষ্ম ঝঙ্কারের মধ্যে দিয়ে [illegible] পেয়ে একটি করুণ সুরের সৃষ্টি করেছে [illegible] গীতিকাব্যের সীমা ছাড়িয়ে কবিতাটি সম্পূর্ণ ভাবে গীতিধর্মী (musical) হয়ে উঠেছে। কবিতাটি ভাল লাগার এইটেই হল মূল কারণ। তাই আমার ত মনে হয় কবিতাটির খ্যাতি [illegible] শিল্প-কৃতিত্বকে ছাড়িয়ে যায়নি, বরং উপযুক্ত খ্যাতিই (recognition) পেয়েছে [illegible] কবিতাটি নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর।

পরিশেষে, একথা অবশ্যই সত্য [illegible] "সোনার তরী" কবিতাটি নিয়ে অনেক [illegible] প্রতি-ব্যাখ্যা এবং অপব্যাখ্যা হয়েছে। [illegible] সেটা সাহিত্যের জগতে মোটেই বিরল [illegible] অভিনবত্বের বা মৌলিকত্বের প্রলোভনে সমালোচকগণ অনেক কিছুই অনেক সময় [illegible] থাকেন। কিন্তু প্রকৃতই যাঁরা রসিক [illegible] মৌলিকত্ব খোঁজেন না, তাঁরা খোঁজেন কবি[illegible] আপন কথাটি তাঁদের সমস্ত সত্তা [illegible] অনুভব করবার জন্যে। ইতি—

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র চক্রবর্তী, এলাহাবা[দ]

অনুধ্যান

দেবদাস পাঠক

কী নিয়ে বাঁচব তবে, কোন আশা অন্ধকার থেকে
আমাকে আলোতে নেবে, নিরন্তর হৃদয়ের সাথে
এই যে সংগ্রাম—এই রক্তক্ষয়ী দুঃসহ যন্ত্রণা
নিরন্ধ্র তিমিরে পথচলা, কথা বলা এই রাতে
একক মনের সাথে, কুয়াশার ফাঁকে তারা গোণা
অজানা নদীর স্রোতে বাসনার অজস্র কমল
কেবল ভাসানো সেই অনিশ্চিত সাগর মানসে
তাহলে হবেনা শেষ? হবেনা হবেনা অচপল
এষণার ইষ্টলাভ—এই ধূলিকণা সেই সোনা?

কে আমাকে বলে দেবে কোন পথে গেলে সেই বট
সহস্র প্রশাখা মেলে প্রজ্ঞার প্রতিভূ হয়ে একা
সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছে, জীবনের সকল জিজ্ঞাসা
মিটিয়ে প্রশান্ত, তার ছায়াশ্রয়ে বসে পাঠলেখা
যদি হতো, যদি তার শান্তির সায়রে এই ঘট

একবার ভরা যেত—এই ক্ষতবিক্ষত হৃদয়
তার হাতে তুলে দিয়ে বলা যেত দাও শান্তি দাও।
আকণ্ঠ পিপাসা দেখ, আর এই কুটিল সংশয়
আমার চারদিকে; নাও, সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব তুলে নাও,
আমাকে আশ্রয় দিয়ে কর তুমি একান্ত নির্ভয়।

অথচ কোথায় সেই বৃদ্ধ বট, বুঝি কোনদিন,
খুঁজেও পাবনা তার দেখা, অন্বেষণ বৃথা তার।
সহস্র শিকড়ে যার মাটির সান্নিধি, অমলিন
সবুজ পত্রের শিখা তুলে ধরে সূর্য উপাসনা
যে করে সমস্ত দিন তার অন্বেষণ অকারণ,
সময় হনন যদি হয়, কোনদিন তার দেখা
নাই মেলে যদি সে দুরান্ত হয় তবু এষণার
শেষ নেই—এই কথা জানা হয়ে গেলে তারপর
প্রতীক্ষার রাত্রে ঝরে শিশিরের মতন প্রহর।

নির্জন নদী

শ্রীকরুণাময় বসু

[illegible] ভোর লোক নেই জন নেই, শুধু চুপ চাপ;
[illegible]পোকা উড়ে যায় ঘাসে ঘাসে, কাঁটা ঝোপ ঝাপ
[illegible] আছে নদী পাড়ে; বালি ওড়ে, রোদ ঝিম ঝিম;
[illegible] ফালি সরু নদী চোখ বুজে আছে সারাদিন।
[illegible] ফোটা আঁকা বাঁকা নদী,
[illegible] মনের মতো নির্জন নিঃশব্দ তার গতি।

[illegible] সন্ধ্যে রাতে চাঁদ ওঠে, মরা স্রোতে ঝিন্ঝিকের গান,
[illegible] ঝাঁক পরীদের ঝিলিমিলি নদীজলে অশরীরী স্নান;
[illegible] সুবাস যেন চুরি করে কবরীতে নিয়ে আসা তারা,
[illegible] পাখির সুরে বাজায় অদৃশ্য একতারা।
তারপর হু হু করে হাওয়া বয়, এলো মেলো ছন্নছাড়া হাওয়া,
নদীজল ফুলে ওঠে, ক্ষেপাটে ঝড়ের আসা-যাওয়া;

নদীর অতল জলে ছায়া কাঁপে, ঘুম ভাঙে কার?
চুল ছেঁড়ে, হাহাকারে ডুবে যায় বন্দিনীর শিকল ঝংকার।
রাত ভোর লোক নেই জন নেই, ঘুম ঘুম শুধু চুপ চাপ;
চোখ বুজে শুনে যাই এ নদীর কান্নার আলাপ।

কেন যে কান্নার ঢেউ, কী যে ইতিহাস?—
বালুতে কি লেখা আছে, পাখায় কি নিয়ে যায় উড়ো বালু হাঁস
মানুষের মতো কাঁদে বোবা নদী, জলের ভাষায়
কী যেন বোঝাতে চায়, শূন্যে স্ফীত সে ভালোবাসায়
দুই তটে মাথা খোঁড়ে কেন সারা রাত;
কার খোঁজে বাড়ায় সে হাত?
হায় নদী, তোমার কান্নার স্রোতে ভাসায়ে তরণী
আমার নিঃসঙ্গ আত্মা পথযাত্রী, অন্ধকারে শুনি পদধ্বনি।

চন্দ্রকান্ত

অনেক ক্ষেত্রে রোগী শয্যাশায়ী হলেও কিছুটা কাজ কর্ম করার ক্ষমতা থাকে এবং হয়তো কিছু কাজ করতে বাধ্যও হয়। বিশেষত চিঠিপত্র লেখায় খুবেই প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে শুয়ে শুয়ে টাইপ করার সুবিধা থাকলে খুব উপকার হয়। এই ধরনের টেবিলটা রোগীদের সেই

শয্যাশায়ী রোগীর উপযোগী টেবিল

সুবিধাই দিতে পারে। টেবিলের চারটি পায়ার মধ্যে সামনের পায়া দুটি পিছনের দুটির চেয়ে ছোট কারণ এতে টেবিলটা রোগীর দিকে ঝুঁকে থাকতে পারে। তাছাড়া এই পায়াগুলিও সুবিধা মত ছোট বড় করে নেওয়া যায়। টেবিলটা বিছানার ওপর বসানোর জন্য যাতে নড়বড় না করে তারও একটা ভালো ব্যবস্থা করা আছে। এখন এই টেবিলের ওপর টাইপের যন্ত্র রেখে রোগী সচ্ছন্দে টাইপ করে যাচ্ছে।

*

অনেক সময় খুব সাবধানী মোটর চালককেও রাস্তায় দুর্ঘটনা করতে দেখা যায়। এই সমস্ত দুর্ঘটনার কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মোটর চালকের বিভিন্ন ধরনের রাস্তায় গাড়িতে ব্রেক চাপবার পর কতদূরে গিয়ে গাড়িটা থামতে পারে সে সম্বন্ধে ধারণার অভাবেই ঘটে। যদি শুকনো সিমেন্ট করা রাস্তায় একটা গাড়ি ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে যায় তাহলে সেই গাড়িতে ব্রেক কষলে প্রায় ১৯০ ফিট দূরে গিয়ে গাড়িটা একেবারে থামবে। যদি এই রাস্তা ভিজে হয় তাহলে এটা বেড়ে গিয়ে ২৫৮ ফিট হবে। রাস্তা যদি বরফে ঢাকা থাকে তাহলে গাড়িটা ৭৭২ ফিট দূরে গিয়ে থামবে। অবশ্য এটা বলাই বাহুল্য যে গাড়ির ব্রেক খুব ভাল অবস্থায় যদি থাকে তাহলেই এই সব দূরত্বের পর গাড়ি থামবে। এই কারণে চালক যখন শুকনো রাস্তায় গাড়ি চালাবে তখন ঘণ্টায় প্রত্যেক ১০ মাইল গতির জন্য সামনের গাড়ি থেকে অন্তত নিজের গাড়ির সমান মাপের মত স্থান ছেড়ে রাখবে। যখন ভিজে রাস্তা হবে তখন এটা দেড় গুণ মত স্থান আর বরফে ঢাকা রাস্তা হলে তিনগুণ মত স্থান ছেড়ে গাড়ি চালাবে। এই ধরনের নিয়ম মেনে চললে দেখা গেছে যে দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেক কম হয়।

*

অংকশাস্ত্রের একটা অংশ হচ্ছে 'ডেসিমেল'। যাদের অংকশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আছে তারাই জানেন যে ডেসিমেল কি করে করতে হয় এবং লিখতে হয়। ১৬১৭ সালে স্কটল্যাণ্ডের জন নেপিয়ার নামক একজন অংকশাস্ত্রবিদ্ প্রথম এই ডেসিমেলের প্রয়োগ করেন। প্রথমদিকে অংকশাস্ত্রের ডেসিমেলের জন্য বিন্দু সংখ্যা ব্যবহার না করে তিনি অন্য এক পদ্ধতিতে এটা করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ একটি সংখ্যাকে লিখে দেখান হচ্ছে— ১২৩° ৪' ৫'' ৬''' অথবা ১২৩, ৪' ৫'' ৬'''।

*

হিসাব করে দেখা গেছে আমেরিকার চারটি আণবিক গবেষণাগারে প্রায় ৩৫০ জন পি এইচ ডি ডিগ্রীধারী বৈজ্ঞানিক কাজ করছেন। এ ছাড়াও প্রায় ১৬৮ জন বৈজ্ঞানিক এম এস-সি এবং ২৬০ জন বি এস-সি ডিগ্রীধারী।

*

মানুষের শরীরের ভেতর ক্যানসার হলে প্রথম অবস্থায় এটা খুব সহজে ধরা যায় না। ডাক্তাররা বলেন যে এই ধরনের ক্যানসারের মধ্যে কণ্ঠনালীর ভেতরের ক্যানসার খুব সহজে ধরা যায়। এর কারণ যে, এই সময় স্বর ভঙ্গ হয় এবং স্বর কর্কশ হয়ে যায়। ৪০ বছরের বেশী লোকের যদি বিনা কারণে প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে গলার স্বর ভাঙ্গা অথবা কর্কশ অবস্থায় থাকে তাহলে ক্যানসার বলে সন্দেহ প্রকাশ করা যায়। এই সময় সাধারণত লোকেরা ভাঙ্গা এবং কর্কশ স্বরের জন্য খুব অসুবিধা ভোগ করে বলেই ডাক্তারদের কাছে চিকিৎসার জন্য আসে—ফলে ক্যানসার ধরা পড়ে। শরীরের অন্য স্থানের প্রাথমিক ক্যানসার বেশী অসুবিধার সৃষ্টি করে না বলেই লোকেরা ডাক্তারদের কাছে এই সময় যায় না। ফলে এই অবস্থায় ক্যানসারও ধরা পড়ে না।

*

পেট্রলের খনি থেকে শোধনাগারে পেট্রল আনতে গেলে হাজার হাজার মাইল পথ পাইপের সাহায্যে পেট্রল চালনা করতে হয়। এইসব পেট্রোলিয়াম পাইপ সাধারণত লোহা বা কোনও রকম ভালো ধাতু দিয়ে তৈরী হয়। ধাতুর তৈরী এইসব পাইপগুলো বহুদিন ব্যবহারের পর জরে ক্ষয়ে যায়। প্লাস্টিকের পাইপ ব্যবহার করতে পারলে আর জরে-ক্ষরে যাওয়ার ভয় থাকে না। এইরকম প্লাস্টিকের পাইপ বেশ হাল্কা হয় আর এর খরচও কম। বেকালাইট, পলিয়েস্টার, রজন ও আঁশের কাচ দিয়ে এইরকম প্লাস্টিকের পেট্রোলিয়াম পাইপ তৈরী হয়।

থিয়েটার জাঁকিয়ে তোলার একটি উপায়

দেশে থিয়েটার অর্থকরী উপায় সেবে না চলার কারণ নিয়ে অনেক ...ের আলোচনা হয়েছে এই পাতাতেই। ...করলে চলতে পারে, সে সম্পর্কে মাঝে ...ব প্রস্তাবও করা হয়েছে নানা রকমের। ...ন্তু কোনটাই যে কাজে লাগছে, এমন ...ন লক্ষণ দেখা দেয়নি এখনও। অথচ ...সাধারণও যেমন, তেমনি রাজ্য ...কারেরও থিয়েটারকে বাঁচিয়ে ও ...কয়ে তোলার যে আন্তরিক ইচ্ছা ...ছ, থিয়েটারকে অবলুপ্তির গহ্বরে ...ত দেওয়ার মর্মান্তিকতাটা যে সকল ...ই চরম অনুভূতিতে উপলব্ধি করছেন, ...ও বেশ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু উপায়ের ...অন্ধতিমিরে সেই তিমিরেই থেকে ...চ। সমস্যা এক-আধটাও নয়, আর ...নও নয়, সেটা বোঝাই যাচ্ছে। ভালো ...ভরা আধুনিক আরামপ্রদ ব্যবস্থা... ...দের প্রেক্ষাগৃহ নেই; একে তো ...ই বহুশত অভিনয়-শিল্পীর কর্মের ...না নেই, তার ওপর শখের দলে ...না করতে করতে শিল্পীর সংখ্যাও ...স্ফীত করছে—যারা এই জীবনের ...ই তাদের প্রতিভা বিকাশের মাধ্যম ...রূপে পেয়েছে। তাছাড়া দেশের প্রকৃত ...ও সাহিত্য, সংগীতাদি সাংস্কৃতিক ...তো সম্পর্কে জনসাধারণের চেতনা ...দৃপ্ত করে তুলতেও যেমন, তেমনি ...সংগে মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্রের কাজে ...নিজিত হয়ে থাকার জন্যও থিয়েটার ...প্রয়োজনগুলির অন্যতম। এমন ...রাষ্ট্র গঠনের ও উন্নয়নের পরি-...নাদির মধ্যে অগ্রাধিকার পাবারও ...। কিন্তু করা যায় কি? রাজ্য ...নর হয়তো বেকার অভিনয়-শিল্পীদের ...চেয়ে কয়েক দফায় লাখ কয়েক টাকা ...ন করে দিলেন; তা দিয়ে দল করে ...কখানা নাটক হয়তো অভিনীত হলো, ...সা পাক না পাক, তবু কতক শিল্পী ...কিছুদিন কাজ পেলেন। কিংবা ...তা আরও বেশী কিছু টাকা থোক ঢেলে ...ন এবং তা দিয়ে হয়তো দু'একটি ...প্রেক্ষাগৃহ ...

—মৌভিক—

কিন্তু ওভাবে কতটুকু প্রয়োজন মিটবে? হয়তো বছরে কয়েক লক্ষ টাকা করে সরকারী বাজেটে প্রতি বছরই অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো; কিন্তু সেভাবে এখনকার সমস্যাগুলি মিটোতে এত বছর লেগে যাবে যে, তখন আরও কতো কি কিভাবে ঘটে যাবে তার ঠিক কি? এখন দরকার এমন পরিকল্পনা করা, যার দ্বারা এক্ষণি কে এক্ষুণি সব সমস্যাগুলির সুরাহা হতে পারে, অথচ সরকারী তহবিলের ওপরেও বেশী চাপ না পড়ে। এমন কোন উপায় উদ্ভাবন করা, যার দ্বারা সহসা মধ্যেই যথা প্রয়োজন প্রেক্ষাগৃহও পাওয়া যাবে, অভিনয়-শিল্পীদের সবাইকে কাজে লাগানো যাবে, উপরন্তু সংগীত, নৃত্য ও অন্যান্য চারুকলার শিল্পীদেরও সংস্থানের একটা অতি ব্যাপক ক্ষেত্র সামনে এসে পড়বে। এমন ম্যাজিক কিন্তু সত্যিই সম্ভব এবং তা সম্ভব হতে চলেছে দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেণ্টিনা রাজ্যে।

* * *

আর্জেণ্টিনারও থিয়েটারের অবস্থা হুবহু এদেশেরই মতো এবং ওদেরও একই সব সমস্যা। কিন্তু ওখানে সমস্যার সমাধান হতে চলেছে, অবশ্য সরকারী সহায়তায়। আর্জেণ্টিনা সরকার সম্প্রতি একটা আইন জারী করে দিয়েছেন যে, আটশো আসন সংখ্যার অধিক সমস্ত সিনেমাকে ছবির সংগে নাটক দেখাতে হবে। এই আইনের খপ্পরে পড়ছে আশীটি চিত্রগৃহ, অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় কয়েক হাজার থিয়েটারের লোকের কাজের জোগাড় হওয়ার সংগে থিয়েটারকে জাঁকিয়ে তোলারও বেশ একটা উপায় করে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। আর্জেণ্টিনার অবশ্য এই ব্যবস্থায় প্রণোদিত হওয়ার পিছনে একটা অতিরিক্ত সমস্যাও ছিল। ওদের নিজেদের দেশে যে পরিমাণ ছবি তৈরী হয়, তা পর্যাপ্ত নয়; তাছাড়া কয়েক বছর ধরেই মার্কিন ছবি আমদানী নিয়েও গণ্ডগোল চলছে জটিল অবস্থার মধ্যে যার ফলে ওখানকার চিত্র-গৃহগুলিকে ছবির অভাব ভুগতে হচ্ছিল। আমাদের দেশে অবশ্য এ সমস্যাটা নেই, তবে কতকসংখ্যক চিত্রগৃহের সপ্তাহে দু-তিনটি প্রদর্শনী নাটকাভিনয়ের জন্য বরাদ্দ রাখলে তাতে চিত্রশিল্পের খুব একটা ক্ষতি হবে বলে

মনে হয় না। বরং এখন যা বাজার পড়েছে,. তাতে চিত্রগৃহগুলিতে নাটকাদির বৈচিত্র্য হয়তো মালিকদের আয়ের একটা অতিরিক্ত পথই করে দিতে পারবে।

* * *

সমগ্র পশ্চিম বাঙলায় মোট যতো চিত্রগৃহ আছে, তার মধ্যে অনেকগুলিরই মঞ্চকে কাজে লাগানো যায়। কলকাতাতেই নাটকাভিনয় সম্ভব হতে পারে এমন প্রশস্ত মঞ্চসমন্বিত অন্তত ষোলটি চিত্রগৃহের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর চিত্রগৃহের সংখ্যাও অত্যল্প নয়। 'এমনি ধারা মফঃস্বলের বড়ো চিত্রগৃহগুলিতেও ঠাঁই করে নেওয়া যেতে পারে। এখন যেমন মঞ্চাভিনয় হয়, শনি, রবি ও ছুটির দিন একবার বা দুবার করে, তেমনি ব্যবস্থাই হতে পারে।' কিন্তু শুধু আইন প্রণয়ন করে মঞ্চসমন্বিত চিত্রগৃহে নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থা করে দিলেই সরকারী কাজ ফুরিয়ে গেলে চলবে না। যে যে চিত্রগৃহে মঞ্চাভিনয়ের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে, তারা যাতে মঞ্চের সাজ এবং থিয়েটারের আনুষঙ্গিকের জন্য কোনরূপে খরচের চাপে না পড়ে, সেজন্যে গোড়াতে থোক টাকা দিয়ে তাদের সাহায্যও সরকারকেই করতে হবে। এর ওপরেও যাবতীয় মঞ্চানুষ্ঠানের ওপর থেকে কয়েক বছরের জন্য প্রমোদ-কর রেহাই করে দিতে হবে: আর সেই সঙ্গে চিত্রগৃহগুলির যাতে থিয়েটার চালাতে কোন লোকসানে না পড়তে হয়, সে বিষয়েও সরকারকে বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

* * *

চিত্রগৃহে মঞ্চাভিনয় হতে পারে দুরকমভাবে। এক হতে পারে প্রতিটি চিত্রপ্রদর্শনীর সঙ্গে খানিকটা সময় মঞ্চের কোন অনুষ্ঠান জুড়ে রাখার ব্যবস্থা করে দিয়ে, যেমন আগেকার দিনে বহু সিনেমাতে হতো। এবিষয়ে এককালে দক্ষিণ কলকাতার পূর্ণ থিয়েটার ছিল চ্যাম্পিয়ন। আর হতে পারে, শনি ও রবিবার সন্ধ্যার প্রদর্শনীতে ছবি বাদ দিয়ে কেবলমাত্র নাট্যাভিনয় পরিবেশনের ব্যবস্থা করে দিয়ে। এইভাবে নাট্যাভিনয়ের ব্যাপক ব্যবস্থার দ্বারা সব সমস্যা কাটিয়ে নাট্যশালার পুনরভ্যুত্থানের পথ তো করে দেওয়া যায়ই উপরন্তু থিয়েটার ও সিনেমার মধ্যে যে একটা প্রতিযোগিতা রয়েছে যার ফলে থিয়েটার মুমূর্ষু অবস্থায় এসে পৌঁচেছে, সেই অসম প্রতিযোগিতাও চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। সিনেমাগুলিতে থিয়েটার যোগ করার আইন করলে চিত্রশিল্পের কাছ থেকে আপত্তি হয়তো উঠবে, কিন্তু শুদ্ধ-মাত্র ব্যবসায়িক দিক বাদ দিয়ে যদি সংস্কৃতি ও শিক্ষার দিক এবং সমাজের প্রয়োজনের কথা মনে করেই এমন ব্যবস্থা হয়, তাহলে চলচ্চিত্র শিল্প এমন সুযোগ করে দিতে খুব বেশী আপত্তি হয়তো করবে না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এই প্রস্তাবটি সম্পর্কে অবহিত হবেন কি।

হতভম্ব হওয়ার আনন্দ

মানুষের বুদ্ধিকে হতভম্ব করে আনন্দ পরিবেশন করার নাম যাদুখেলা। কোন প্রকারেই নিজে বুদ্ধ না বনে যা[illegible] কিন্তু যাদু-শিল্পীদের ধাপ্পা ও ধোঁ[illegible] দেওয়ায় এমনই কারচুপি যে লোক[illegible] বোকা বনে থ হয়ে যেতে হয়ই। এক[illegible] পৃথিবীর মধ্যে এখন দুজন সবচেয়ে না[illegible] করাদের মধ্যে পড়েন ভারতের যাদুস[illegible] পি সি সরকার বা 'সোরকার'। অনেক[illegible] ধরেই তিনি সারা ভারতে তার খে[illegible] দেখিয়ে লোককে বুদ্ধু বানিয়ে আন[illegible] পরিবেশন করে তো যাচ্ছেনই, সেইসঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যেরও বহু দেশে তি[illegible] অতি দক্ষ যাদুশিল্পী রূপেও সম্মান [illegible] জনপ্রিয়তা অর্জন করে নিতে সক্ষ[illegible] হয়েছেন। ইওরোপ, আমেরিকা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজ্যগুলি তিনি ব[illegible] কতকই ঘুরে এসেছেন। প্রায় দু[illegible] পর এবারে তিনি গত [illegible] রঙ্গপাত্রের মঞ্চে আবার কলকাতার [illegible] প্রিয়দের সামনে হাজির হয়েছেন। [illegible] কতক আগে দূরপ্রাচ্য পরিভ্রমণে [illegible] আগে থেকেই তিনি যে কটি নতুন খে[illegible] কথা ঘোষণা করে আসছিলেন এ[illegible] সূচীর মধ্যে সেগুলি অন্তর্ভুক্ত [illegible] খেলাও যেগুলি তিনি পরিবেশন কর[illegible] সেগুলিরও সাজপোশাক কিছু কিছু ব[illegible] করে নিয়েছেন। চটকদার সাজপোশাক [illegible] দৃশ্যপট এবং আলোর [illegible] সরকারের এবারের প্রদর্শনী [illegible] আরও অনেক জমকালো হয়েছে [illegible] কোন কোন খেলাতে তার আগেকার [illegible] মার্জনার ও স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব [illegible] পড়ে, কেমন যেন একটা [illegible] ভাব, বিশেষ করে নতুন খেলা[illegible] ক্ষেত্রে।

* * *

পুরনো খেলা "ওয়াটার অফ ইণ্ডিয়া" সরকারের বলার ভঙ্গীতে আগের ম[illegible] আমোদ দেয়। ছোট্ট একটা কাঁসার কু[illegible] থেকে সবটুকু জল নিঃশেষে এ[illegible] বালতির মধ্যে ঢেলে দিয়ে তারপর খেলার শেষে একবার করে সেই কুঁজো থেকেই বারবার বালতিতে [illegible] ঢেলে দেওয়া। শূন্য থেকে জালে [illegible] ধরা বা শূন্য থেকে ছিপ দিয়ে মাছ [illegible] খেলাগুলিতে কোথায় যেন কি [illegible]

নি। বিনা পাসপোর্টে শ্রীমতীকে দ্রকে ভরে জাহাজে নিয়ে যেতে তার- লোকবদল ও লোক উধাও করার টি সাজানো হলেও দর্শকের মধ্যে ক একজনকে দিয়ে চ্যালেঞ্জ করিয়ে, নিস আনিয়ে হৈচৈ করে বেশ আনন্দ দেয়। আড়াই ফিট উঁচু তাস বদল একটা ছোট মন্দিরাকৃতি বাক্সে একটি কে পুরে চতুর্দিক থেকে তলোয়ার করে তারপর অক্ষতভাবে মেয়েটিকে করে আনা; ছোট একটা সিলেন্ডার ক একরাশ জিনিস বের করা যথা ল, ডজন খানেক ঘড়ি; একটা ছোট স থেকে প্রায় সমমাপের বারোটি গ্লাসে ভর্তি করা ইত্যাদি খেলাগুলিতে কে বিস্মিতও হয় এবং আনন্দও উপ- গ করে। আমোদ পাবার মতো আরও খেলাও আছে। নতুন যে খেলা- ল দেখিয়েছেন তার মধ্যে তেমন পারি- ফেন নেই, লোকে যেন একটু চিবিয়ে বলতে চায়। সবচেয়ে বিজ্ঞাপিত খেলা আরোহিনী সমেত মোটরগাড়ী নিমেষে অদৃশ্য করে দেওয়া। র ওপরে বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা ক থেকে একজন পরীক্ষা বললেন গাড়ীখানি আসল— এই পরিদর্শক নিজেও একজন শিল্পী—অচল নিঃশব্দ গাড়ীতে আরোহণ করার পর একটা আওয়াজের সঙ্গে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর গাড়ীখানি অদৃশ্য হয়ে যায়। অবাক হতে হয়, তবুও গাড়ীখানি স্টার্ট সঙ্গে একটু চালিয়ে না দেখানোর থেকে যায়। মেয়ের রূপান্তরের খেলাটি স্রেফ জীবন্ত সিংহ নয়, সিংহের পরা মানুষ সেটা ধরাই পড়ে যায়। সহকারিদের তৎপরতায় একটু ছুটে খাঁচে যাওয়ায় মেয়েটিকে খাঁচায় ভর্তি করে পর্দা টেনে দেবার সময় একফালি ফাঁকের মধ্যে দিয়ে পিছনের ঘেরোয়া ঠেলে সিংহের মুখোশ পরতে যাওয়ার, অথবা মুখোশ পরিহিত একজনের ভিতরে প্রবেশ করার ব্যাপারটা আকস্মিকভাবে চোখে পড়ে গিয়েছিল। তীব্রগতিশীল বৈদ্যুতিক করাতে নারীদেহ দ্বিখণ্ডিত করার খেলাটিতে এবারে একটু নতুনত্ব যোগ করা হয়েছে। দেহটি পেট থেকে দ্বিখণ্ডিত করার পর, আগে ছিল, পুনরায় তা জোড়া দিয়ে সম্মোহিতা মেয়েটির জ্ঞান ফিরিয়ে আবার তাকে মঞ্চে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। এবারে দেহ জোড়া না লাগিয়ে বিভক্ত দেহাংশ দুটি দুজন লোকের হাতে বইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু নিয়ে যাবার সময় প্ল্যাস্টারের অঙ্গ বলে স্পষ্ট ধরা পড়ে যায়। তবে এর মধ্যে বিস্ময়কর বাহাদুরী হচ্ছে আসল মেয়েটিকে এক- ফাঁকে উধাও করে দেওয়াটা। 'ব্ল্যাক আর্টে' এবারে সরকার বর্ণের সমাবেশ ঘটিয়েছেন; এখন আর সাদা ও কালোই নয়, সাজ- পোশাক ও সামগ্রী অনেক রঙে রঙীন। শেষে কিন্তু মঞ্চের ওপরে ভূতের হকি খেলাটা পোশাক-পরা লোক বলে ধরা পড়ে যায়, এটা তেমন জমে না, তার চেয়ে আগেকার সেই প্রেক্ষাগৃহময় ভূতের নৃত্য বেশী ত্রাস ও বেশী আনন্দদায়ক ছিল। তবে সরকারের 'এক্স-রে আইজ' যাতে চোখবাঁধা অবস্থায় বোর্ডে পৃথিবীর যে কোন ভাষায় লেখা ঠিক অনুকরণ করে লিখে যাওয়া বা একটু আঁচড় থেকে একটা মূর্তি এঁকে ফেলা ইত্যাদি এখনও সব- চেয়ে চমকপ্রদ অদ্বিতীয় আনন্দদায়ক খেলা; প্রায় সমগ্র প্রেক্ষাগৃহই ভেঙে পড়ে এই খেলাটিতে।

এবারের এই যাদুপ্রদর্শনীর বিবৃতি প্রসঙ্গে একটা বিষয় উল্লেখ করার কথা মনে এলো। গত ক' বছরের কলকাতার এই নিউ এম্পায়ার মঞ্চেই অন্তত পৃথিবীর তিনজন অতি বিশিষ্ট যাদু- শিল্পী খেলা দেখিয়েছেন—ইংলণ্ডের ডাইল, আমেরিকার ভার্জিল এবং ভারতের 'সোরকার'। কিন্তু দেখা গেল এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব মৌলিক খেলা দু' একটির বেশী নেই। সকলেরই অধিকাংশ নামের পার্থক্য। যেমন সরকার দেখাচ্ছেন 'টেম্পল অব বেনারস' নাম দিয়ে মন্দিরা- কৃতি ছোট বাক্সে একটি মেয়েকে ভরে দিয়ে

খেলাই একই, কেবল সাজপোশাক আর তারপর চতুর্দিক থেকে তাকে তরবারি বিদ্ধ করা; ভার্জিল ঐ খেলাটাই দেখাল মেয়েটিকে একটি ঝুড়িতে ভর্তি করে এবং অন্য একটা নাম দিয়ে; লাইল হয়তো আর একটা নামে চীনে ড্রাগন মার্কা সাজ-পোশাক বাক্স নিয়ে ঐ খেলাই দেখান। এমনি ধারা অনেক খেলাই সবায়েরই এক, আর সব খেলাই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল যান্ত্রিক কুশলতার ওপর। পি সি সরকার যে সব খেলা দেখান তারও অধিকাংশই হচ্ছে যান্ত্রিক কৌশল যা ভারতীয় ভোজ-বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। বস্তুত পি সি সরকারের খেলাগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ ভারতীয় বলে আখ্যাত করা যায় কোন-গুলিকে বা কোনটিকেই বলা যায় কি না তা জানা দরকার। পি সি সরকারের পরি-বেশন পদ্ধতি ও কৌশলাদিও একেবারেই পাশ্চাত্য ঘেঁষা যার মধ্যে থেকে ভারতীয়ত্ব খুঁজে বের করতে হয়। তবে পি সি সর-কারের বাহাদুরী হচ্ছে ওদেরই জিনিস নিয়ে ওদের দেশকেই বারবার চমকে দিয়ে প্রশংসা অর্জন করে আসা।

শরৎ রচনার নিষ্প্রাণ রূপায়ন

শরৎচন্দ্রের ভাষার, বিশিষ্ট ভঙ্গিটা ধরতে না পারলে তার গল্পের যে কি দুর্দশা হয় 'সতী' তার জ্বলন্ত প্রমাণ। চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে গল্পতে অনেক কিছু যোগ করা হয়েছে, তাতে কিছু মূল আখ্যানবস্তুতে হানি ঘটেনি কিন্তু তার সেই ভাষার মহিমা না থাকায় সমগ্র ছবি-খানি একটা নিরেট চেহারা নিয়ে সামনে এসে হাজির হয়েছে। একে এই দুর্বলতা তার সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছে অতি শ্লথ-গতি ঘটনাপ্রবাহ এবং নির্জীব চরিত্র-চিত্রণ। বিষয়বস্তুর আবেদনের দিক থেকেও এখনকার মনকে নাড়া দেবার মতোও নয়। হিন্দুয়ানীর অন্ধ গোঁড়ামীর দিনের কথা, যে যুগে গোঁড়ারা ব্রাহ্মদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতো, তাদের সমাজের শত্রু বলে মনে করতো। সে-যুগে অসুখে লোকে মন্দিরে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতো ঠাকুরের আশীর্বাদে নিরাময় হবার কামনা জানিয়ে, ছেলেদের মাথার ওপরে থাকতো 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম'-য়ের স্তোত্র, আর মেয়েরা পতিকেই একমাত্র সর্বময় দেবতাজ্ঞানে এমন অবস্থা করে তুলতো যাতে পতিদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠতো. গীতাপাঠ শোনা, চরণামৃত খাওয়া, কাজে বের হবার সময় ঠাকুরের ফুল পকেটে নিয়ে যাওয়া, গুরুজনদের সামনে মাথা নীচু করে নির্বাক বসে থাকা, বাপ-মার ইচ্ছা ও খেয়ালখুশী নির্দ্বিধায় মেনে চলা ইত্যাদিই জীবনের পরম ধর্ম বলে পরিগণিত হতো—সেই যুগেরই পরিবেশে স্বামীর আচরণে সন্দেহ বিদগ্ধা এক অশিক্ষিতা অথচ পতিপ্রাণা নারীর কাহিনী 'সতী।'

* * *

গোঁড়া হিন্দু জমিদার রাজমোহন কড়া শাসনে একমাত্র পুত্র হরিশকে বড় করে তোলেন। এম-এ পড়তে পড়তে হরিশ গ্রামে এলো এবং এখানেই দর্শনের অধ্যাপক হরমোহন ও তার কলেজে শিক্ষিতা কন্যা লাবণ্যের সঙ্গে আলাপ হলো। হরিশ হরমোহনের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হলো এবং তার চেয়ে বেশী আকৃষ্ট [illegible]

পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। হরিশ লাব[illegible] বিয়ে করে হরমোহনের বুকের [illegible] হালকা করে দিতে প্রতিশ্রুত হলো। রা[illegible] মোহন এ ব্যাপারটা জেনে ফেললেন [illegible] হরিশের কোন মতামত না নিয়েই [illegible] অজ্ঞাতে অন্যত্র বিবাহ ঠিক করে ফেলল[illegible] আচারনিষ্ঠ গোঁড়া হিন্দুর মেয়ে নির্ম[illegible] সঙ্গে হরিশের বিয়ে হয়ে গেল; হরমো[illegible] মর্মান্তিক আঘাত পেলেন। বিয়ের [illegible] নির্মলার মা কন্যাকে বলে দিয়েছিল[illegible] সে যেন স্বামীকে সর্বদা চোখে [illegible] রাখে, কারণ পুরুষ মানুষ একটু [illegible] পেলেই হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাব[illegible] নির্মলা হরিশকে এমন চোখে [illegible] রাখতে আরম্ভ করলে যে হরিশের [illegible] অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। নির্মলা মুখে [illegible] হরিশের টেবিলে 'এল' অক্ষরটি [illegible] লাবণ্যের প্রতি হরিশের আকর্ষণ উপল[illegible] করে নিলে, তাছাড়া হরিশের সঙ্গে লাব[illegible] বিয়ের কথাও শুনে নিয়েছে। হরি[illegible] ওপরে নির্মলার খালি সন্দেহ। এক[illegible] কোর্ট থেকে বাড়ি ফিরতে দেরী হলেই না[illegible] কৈফিয়তে নির্মলার কাছে হরি[illegible] জর্জরিত হতে হয়। মহিলা মজলিসে [illegible] হরিশ আলোচনায় রত থাকাকালে [illegible] থেকে তাদের কথা শুনে নির্মলা স[illegible] বেরিয়ে এসে কুৎসিৎ মন্তব্য করে [illegible] লাবণ্য ওখানকার মেয়ে স্কুলের [illegible] হয়ে এলো, নির্মলার সন্দেহ হরি[illegible] সুপারিশ করিয়ে লাবণ্যকে [illegible] তার ওপর যখন লাবণ্যর কাছ [illegible] শুনলে যে, হরিশ কলকাতায় গিয়ে [illegible] বাড়িতে খেয়ে এসেছে তখন নির্মলা [illegible] ভয়ঙ্করী হয়ে উঠলো। হরিশও [illegible] হলো; নির্মলাকে শুনিয়ে শুনিয়েই [illegible] লাবণ্যর ছেলের জন্মদিনে নিমন্ত্রণ [illegible] করতে গেলো। তাই দেখে নির্মলা [illegible] কাণ্ড করে বসলো। হরিশের আসতে [illegible] দেখে নির্মলা আফিম খেলে। খবর [illegible] হরিশ ছুটে এসে ডাক্তার ডাকালে: [illegible] বের হলো। লাবণ্যও এসে পৌঁছলো, [illegible] সেবায় নির্মলা বেঁচে উঠলো। নির্ম[illegible] অন্ধত্ব তাতেও ঘুচলো না। অগত্যা [illegible] দিন হরিশ নির্মলার নামে সর্বস্ব দা[illegible] লিখে দিয়ে বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়ে [illegible]

...ন স্থান থেকে লাবণ্যকে একখানা ... লিখলে তাতে সে নির্মলার পতি-... কথা স্বীকার করে একথাও জানিয়ে ... যে, তার জন্যে যদি কেউ মরতে ... সে নির্মলা। লাবণ্য চিঠিখানা ... গিয়ে নির্মলার হাতে দিলে। ...দিনে নির্মলার জ্ঞানচক্ষু খুললো। নিজেই গিয়ে হরিশকে ফিরিয়ে নিয়ে ..., কিন্তু তাদের পুনর্মিলনে যার ...তো সবচেয়ে কাজে এলো সেই লাবণ্য ... আগেই গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছে।

* * *

...চিত্রনাট্যে গল্পটা যেভাবে তৈরী করে ... হয়েছে তাতে ওর 'সতী' নামটা ...ক নয়। কারণ গল্পটা আগাগোড়াই ... হরিশকে নিয়েই। দুটি প্রায়-সমান ... গল্পটি বিভক্ত। প্রথম অর্ধেক ... আর লাবণ্যকে নিয়ে; দ্বিতীয়ার্ধ ... আর নির্মলাকে নিয়ে—একেবারে ... টেনে এমনভাবে এক একটি অংশ ... করে দেওয়া হয়েছে যে দুটো ভাগকে ... আলাদা গল্প মনে করে নিলে কিছু ... যায় না। প্রথম অংশ শেষ হয়েছে ...শের নির্মলাকে বিয়ে করে সংসারে ...ষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত। তারপর আরম্ভ ...কে সংসার নিয়ে এবং শেষ হয়েছে গৃহত্যাগী হরিশকে গৃহে ফিরিয়ে আনা নিয়ে—একেবারেই স্বয়ংসম্পূর্ণ আর একটি অধ্যায়। আগের অংশটিকে বড়ো জোর একটা ভূমিকা বলে ধরা যায় কিন্তু অতো দীর্ঘ ভূমিকা আখ্যানবস্তুর ওজনেরই ভার-সাম্য নষ্ট করে দিয়েছে। তবে যা কিছু উপভোগ করার রস সঞ্চার করে শেষাংশটাই। তাও এমনভাবে ঘটনার বিন্যাস যে ছবির সমগ্র চেহারাটাই সটান চোয়াড়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে; শরৎ রচনার কমনীয় সৌকর্যের রেশও নেই। বিন্যাসে গোড়ার অংশ হয়েছে তত্ত্বের নিরস ঝামেলা, আর শেষাংশ নির্মলার সন্দেহবাতিকতা নিয়ে কৌতুক ঘেঁষা পরিবেশ। আর সর্বোপরি রয়েছে নিথর গতি যা ক্লাইম্যাক্সকেও দরকার মতো পর্দায় উঠতে নিরস্ত করে দিয়েছে। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে পঠিত পাঁচ ছখানা চিঠি এবং টেলিগ্রাম রয়েছে—লাবণ্যর গ্রামে আসার টেলিগ্রাম, হরিশের বিয়ে ঠিক করে নির্মলার বাবার কাছে চিঠি, লাবণ্যর চিঠি হরিশের কাছে, হরিশের চিঠি নির্মলার নামে গৃহত্যাগের সময়, তারপর লাবণ্যর কাছে চিঠি—এতেও গতি ঝিমিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে।

* * *

চরিত্রোপযোগী শিল্পী নির্বাচনের ত্রুটি অভিনয়ের দিকটা দুর্বল করে দিয়েছে। ধীরাজ ভট্টাচার্য গল্পের প্রধান চরিত্র হরিশের ভূমিকায় অবতরণ করেছেন। তাঁর শেষের দিকে প্রাপ্ত-বয়স্করূপে যদিও বা কিছু সহ্য করা যায়, কিন্তু গোড়ার দিকে তরুণ হরিশ রূপে তিনি অসহনীয়। রূপসজ্জার গুণে চেহারাটা তিনি বিশ বছর কমিয়ে ফেলতে সক্ষম হলেও তরুণের ভাবভঙ্গী তিনি আনতে পারেননি; তাকে দেখিয়েছে বয়স্ক লোকের ছোট সাজবার ভান করার মতো। আর তার সর্বথা ছল ছল আবেগে ফুঁপিয়ে কথা বলার সেই হাজারি ঠাকুরের ভঙ্গীটাই অত্যন্ত প্রকট হয়ে পড়েছে। অভিনয়ের দিক থেকে ছবির যা-কিছু প্রাণ ও মান রক্ষা করে গিয়েছেন আচারনিষ্ঠ, পতিপ্রাণা অথচ সন্দেহবাতিকগ্রস্তা নির্মলার চরিত্রে ভারতী দেবী। ছবির শেষাংশটা তিনিই উজ্জ্বল করে রেখে দিয়েছেন। মুখরা প্রকৃতি, কেবলই স্বামীকে সন্দেহ মাখের নির্মলাকে স্বামীকে কেবলই চোখে চোখে রাখা যাওয়া, আবার স্বামীর জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত বলে গর্বিতা প্রকৃতির একটি অন্ধ-বিশ্বাসী চরিত্র তিনি চমৎকার ফুটিয়ে...

তুলেছেন। জহর গাঙ্গুলীর হরমোহন দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অধ্যাপকের চেয়ে স্নেহাতুর পিতার রূপটাই ভালো ফুটিয়েছে। কমল মিত্রের গোঁড়া প্রকৃতির জমিদার রাজমোহন বিকট; হরিশের বিয়ে ঠিক করতে বলে ওর দানবীয় হাসি এখানে খাপ খায়নি। লাবণ্যর ভূমিকায় অরুন্ধতীকে মানিয়ে গিয়েছে মাত্র। সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়ও হরিশের মায়ের ভূমিকায় যথাযথ। নির্মলার পিতার ভূমিকায় তুলসী লাহিড়ী আছেন বলেই কি ওটাকে কমিক চরিত্র করে নেওয়া হয়েছে!—নয়তো স্ত্রীরে চোখে ধুলো দিয়ে ওষুধের নামে মদ্যপান করার মতো চরিত্র মানায় না এক্ষেত্রে। কানু বন্দ্যোপাধ্যায় এতে আছেন জমিদার বাড়ির পুরাতন কর্মচারি-রূপে। রাজমোহনের আচরণের প্রতিবাদে চুপিসারে ওবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় তার অভিনয়টা ভালো। বার লাইব্রেরীর উকীলরা রসিক হতে পারেন কিন্তু একেবারে চ্যাঙড়া নিশ্চয়ই হন না; কিন্তু এখানে দেখিয়েছে সেইরকম। এমনি জনকয়েক উকীলের ভূমিকায় রয়েছেন জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় (স্বামীজী), প্রীতি মজুমদার প্রভৃতি। সাত-সাতটি কন্যার জনক বৃদ্ধ উকীলের প্রতি প্রীতি মজুমদার সহানুভূতি আকর্ষণ করবেন। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে আছেন খগেন পাঠক, শ্যাম লাহা, বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়, নৃপতি, রাজলক্ষ্মী, ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপ্তা রায়, ননী মজুমদার প্রভৃতি। কলাকৌশলের দিকটা চলনসই। রবীন্দ্রনাথ ও রজনী সেনের দুখানি গানের সঙ্গে প্রণব রায় ও সুবোধ পুরকায়স্থের লেখা গানও কয়েকখানি আছে; শুনতে মন্দ লাগবে না। ছবিখানির গঠনকারিদের মধ্যে আছেন চিত্রনাট্য ও সংলাপঃ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়; পরিচালনাঃ অমর মল্লিক; আলোকচিত্রঃ বিভূতি দাস; শব্দগ্রহণ লোকেন বসু; সুরযোজনাঃ অনি বাগচী ও শিল্পনির্দেশঃ বিজয় বসু।

একটি অনুকরণীয় প্রচেষ্টা

সহপাঠির সাহায্যার্থে ছাত্রদের এক অনুকরণীয় প্রচেষ্টার পরিচয় দিয়েছে গভর্নমেণ্ট কলেজ অফ আর্টস এণ্ড ক্র্যাফ্‌টসের ছাত্রবৃন্দ। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর বিমলচন্দ্র সিংহ যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হওয়াতে সরকারী এবং [illegible] সাহায্য অপ্রতুল হওয়ায় তার চিকিৎসা[illegible] উক্ত কলেজের ছাত্রবৃন্দ সম্প্রতি [illegible] চিত্রগৃহে একটি সাহায্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। সহপাঠির জন্য এই আন্তরিকতা এবং ছাত্রদের এই প্রশংসনীয় উদ্যম শ্রী বিমলকে রোগমুক্ত করে তুলবে, এই সকলের কাম্য।

কয়েক মুহূর্তের গান

কল্যাণ সেনগুপ্ত

(১)

সব দিয়ে তবু দিলে না কিছুই!
কতবার লঘু মেঘের মতন
তোমার মনের দিগন্ত ছুঁই।
তাও যদি শুধু দূরে স'রে যাও,
হৃদয় নীরবে ঝ'রে যেতে দাও
দূর পৃথিবীতে ডেকেছে আমায়
প্রথম গন্ধে ছোট ছোট যুঁই!

(২)

ঋতুবদলের রীতি মেনে যারা বহুদূরে গেছে স'রে,
কোনোদিন তারা ফিরে আসে যদি, চিনব কেমন ক'রে?
জানি চিনব' না; তবু এ-মনের মৌমাছি সারাদিন
অতীত স্মৃতির আলোয় তাদের করবে প্রদক্ষিণ!

(৩)

হাওয়ায় পাখীর শিস্; মাঠ ঘাট নদী বন আলোয় আলোয়
একাকার।
তবু ওই মন্দিরের অশথের নীচে দ্যাখো এক ফোঁটা নীল
অন্ধকার!

(৪)

আকাশ ছোঁবে?
আমার কথা মানবে না?
হরিণ হয়ে ছুটেছো তবে এই পাহাড়ে কিসের লোভে?
চূড়োয় উঠে কখন তুমি ফুরিয়ে গেছ জানবে না॥

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ জে সি ঘোষ (দক্ষিণ দিকে উপবিষ্ট) ঢাকুরিয়া লেকে 'ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির' নূতন সুইমিং পুলের উদ্বোধন করবার পর সন্তরণ-ড্রিলের নৈপুণ্য প্রদর্শন করছেন

উন্নত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আর কলকাতায় একটা ভাল সুইমিং পুল নেই। সন্তরণ ক্লাবগুলির কর্মচাঞ্চল্যও মন্থর, ডাইভিং বোর্ডগুলি জরাজীর্ণ, এ কি কম পরিতাপের কথা?

* * *

সাঁতার প্রসঙ্গে আর একটি গল্পকথা মনে পড়ে গেল। শহর প্রবাসী এক বিজ্ঞানের ছাত্র কলেজের ছুটি উপভোগ করতে পল্লীগ্রামের পৈত্রিক ভবনে এসেছেন। ছুটি অন্তে আবার যাত্রা করেছেন শহরের উদ্দেশ্যে। নদীপথে কিছুটা নৌকোয় যেয়ে ট্রেন ধরতে হবে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে ছাত্র নৌকায় চড়লেন। বিজ্ঞানের ছাত্র। চারিদিকে কৌতূহলী দৃষ্টি। মনে নানা জিজ্ঞাসা। সামনে যাকেই পান, তাকেই বিজ্ঞানের দুরূহ নিয়মের জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বসেন। মেঘ দেখে নৌকার মাঝিকে ছাত্র প্রশ্ন ক'রে বসলেন—'মাঝি বলতো মেঘ হয় কেন?' এ বিষয়ে মাঝি তার অজ্ঞতা জানালে ছাত্র বললেন, 'মাঝি তোমার জীবনের চার আনাই বৃথা, মেঘ হয় কেন এই সামান্য কথা তুমি জান না?' আকাশের মেঘ বলতো মাঝি মেঘ হতে জল পড়ে কেন?' ছাত্রের মনে দ্বিতীয় প্রশ্ন উদয় হলো, 'আচ্ছা বলতো মাঝি মেঘ হতে জল পড়ে কেন? এবারও মাঝি তার অজ্ঞতা জানালে ছাত্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'এও জান না, তোমার জীবনের আট আনাই বৃথা।' আকাশে মেঘ বেশ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, বৃষ্টির সঙ্গে ঝড় উঠবার উপক্রম; মাঝির নিকট ছাত্রের তৃতীয় প্রশ্ন, মাঝি ঝড়ের উৎপত্তির কথা জানে কি না? পূর্বের মতই মাঝি এবিষয়ে তার জ্ঞানের অভাবের কথা জানালে ছাত্র বললো, 'মাঝি তোমার জীবনের বারো আনাই বৃথা।'

মাঝি তার অসার মানবজীবনের কথা চিন্তা করছে, এমন সময় ভীষণ ঝড় উঠলো। নৌকো বাগে রাখা দায়। মাঝির মুখ পাংশু বর্ণ। মাঝি ছাত্রকে সম্বোধন করে বললো, 'কর্তা সাঁতার জানেন তো?' উত্তরে ছাত্র 'না' বলতেই মাঝি বললো, 'তবে তো কর্তা আপনার জীবনের ষোলো আনাই বৃথা।'

ছাত্রের মতানুযায়ী মাঝির বাকি চার আনা জীবন কাজে লেগেছিল কি ছাত্রের ষোলো আনা জীবনই বৃথা গিয়েছিল, সে প্রশ্ন এখানে নিরর্থক। তবে ছাত্র উপলব্ধি করেছিল, জানার শেষ নেই। মেঘ জল ঝড়ের অনুসন্ধানী বিজ্ঞানী এবং অণুপরমাণুর গবেষকেরও সাঁতার শেখার প্রয়োজন আছে।

* * *

অন্ধ্রের ফিজিক্যাল এডুকেশন কলেজ প্রাঙ্গণে ত্রিচুরের সাইকেল চালক জোসেফ থোকালত ৯৭ ঘণ্টা অবিরাম সাইকেল চালনার এক মহড়া দিয়েছেন। ১৭ই জুলাই সকাল সাড়ে ৮টার সময় তিনি সাইকেলে আরোহণ করেন, আর ২১শে জুলাই সাড়ে ... তাকে সাইকেল থেকে নামানো হয়। ... দিন থোকালত সাইকেলের উপর ... স্নানাহার এবং দৈনন্দিন নিত্যকর্ম ... করেছেন। মাঝে সাইকেল চালনার ... দেখিয়েও দর্শকদের আনন্দ ... পুরস্কার গ্রহণের সময়ও নাকি ... ভূমি স্পর্শ করেননি। সাইকেলের উপর থেকেই পুরস্কার এবং ... নন্দন গ্রহণ করেন। ৯৭ ঘণ্টা ... অবিরাম সাইকেল চালিয়েছেন, তাঁকে ... চর, জলচর বা খেচর জীবের মধ্যে ... করে 'সাইকেলচর' বলে গণ্য করা যেতে ... জোসেফ থোকালত লণ্ডনের আন্তর্জাতিক 'সাইকেল চালনা প্রতিযোগিতায় অংশ ... আশা রাখেন।

জাতীয় ফুটবল

বিগত ২৮শে জুলাই থেকে ... আন্তঃরাজ্য বা জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হয়েছে। ১৯৪১ ... থেকে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভের পর ... কোন বার জাতীয় ফুটবল পরিচালিত ... ফলে জাতীয় ফুটবলকে কেন্দ্র করে ... ক্রীড়ামোদিবৃন্দের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে। কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে বিপুল দর্শক সমাগমের ... মাদ্রাজের রাজ্যপাল শ্রী শ্রীপ্রকাশ প্রতিযোগিতা ...

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১৯শে জুলাই—আজ কলিকাতা ও হাওড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের কর্মচারিগণের কয়েকটি সভায় ঐ বিভাগের সমস্ত কর্মচারীর জন্য বিকল্প চাকুরী সংস্থানের দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। খাদ্যশস্য বিনিয়ন্ত্রণের ফলে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের যে ১৬ হাজার কর্মচারী ছাটাইয়ের সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে, তাহাদের জন্য বিকল্প চাকুরীর সংস্থান সম্পর্কে সরকার তরফ হইতে কোন প্রকার প্রতিশ্রুতি না দেওয়ায় সভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য আজ ভারত সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে কলিকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত এক মহতী জনসভায় সভাপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস বলেন, আজ ভারতের শান্তির বাণী সারা পৃথিবী শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছে।

২০শে জুলাই—আগামী সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে রাজ্য সরকারের খাদ্য বিভাগের ১৪ হাজার কর্মচারীর মধ্যে প্রায় সাত হাজার কর্মচারীকে উদ্বৃত্ত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে। ইঁহারা ব্যতীত ইতিপূর্বে আরও ৪৬০০ কর্মচারীকে উদ্বৃত্ত বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং তন্মধ্যে ২৮০০ জনকে বিকল্প চাকুরী দেওয়া হয়। আজ সরকারী দপ্তর ভবনে জনৈক সরকারী মুখপাত্র উপরোক্ত সংবাদ দিয়া বলেন যে, অবশিষ্ট সাত হাজার কর্মচারীর চাকুরী বজায় রাখা হইবে।

যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা যেন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া না যায়, তজ্জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে জাতীয় সরকারকে অনুরোধ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ আজ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের একটি নবনির্মিত হলঘরের উদ্বোধন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ছাত্র ও অধ্যাপকগণের এক মহতী সভায় বক্তৃতা করেন।

অদ্য ইন্দোরে হোলকার কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীহরিজীবন ঘোষের কার্যকাল বৃদ্ধির দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী ছাত্রদের সহিত পুলিশের এক ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষ হয়। এই সময় অনুমান ৬০জন লোক আহত হয়।

২১শে জুলাই—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য এক বিবৃতি প্রসঙ্গে ইন্দোচীন সম্পর্কে জেনেভা আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় আনন্দপ্রকাশ করেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ এক বিবৃতি প্রসঙ্গে ইন্দোচীন সম্পর্কিত চুক্তিকে যুদ্ধোত্তর কালে অন্যতম বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলিয়া অভিহিত করেন।

আজ ইন্দোরে পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে ৮জন নিহত ও ৩০জন আহত হইয়াছে। শহরে ৭২ ঘণ্টা কার্ফু জারী করা হইয়াছে।

দক্ষিণেশ্বর কালীনাথ আশ্রমের অধ্যক্ষ কালীনাথ দেবশর্মন ও অপর ১৪জন লোককে প্রতারণা, আগ্নেয়াস্ত্র রাখা এবং অনধিকার প্রবেশের দায়ে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

২২শে জুলাই—ভারতে পর্তুগীজ অধিকারভুক্ত ভূখণ্ডের কিছুটা অংশ অদ্য প্রথম 'মুক্ত' হইল। গোয়াবাসী যুক্ত ফ্রণ্টের ৩৫জন স্বেচ্ছাসেবক স্থানীয় অধিবাসীদের সমর্থনসহ দমনের অন্তর্ভুক্ত বিচ্ছিন্ন পর্তুগীজ ছিটমহল নগর হাভেলীতে অবস্থিত দাদরা গ্রামে প্রবেশ করিয়া গ্রামটিকে 'মুক্ত' করেন। স্বেচ্ছাসেবক দল ও পর্তুগীজ পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে একজন পর্তুগীজ পুলিশ অফিসার নিহত হয়।

২৩শে জুলাই—আজ আজমীরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। অধিবেশনে শিল্পনীতি, উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ভারতে বিদেশী উপনিবেশ সম্পর্কে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারতে বিদেশী উপনিবেশ সম্পর্কিত প্রস্তাবে এইরূপ আশা প্রকাশ করা হয় যে, ভারতস্থ ফরাসী উপনিবেশসমূহ যাহাতে ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়, তজ্জন্য ভারত ও ফরাসী সরকারের মধ্যে অবিলম্বে একটি চুক্তি নিষ্পন্ন হইবে।

কালিম্পংয়ের সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি প্রবল বারিপাত এবং বন্যার ফলে তিব্বতের বাণিজ্য প্রধান শহর গিয়ানৎসে শহরের নিকটস্থ নামচুং নদী তীরবর্তী দুর্গটি ধসিয়া পড়ায় বহু ভারতীয়সহ তিন শতাধিক লোক ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়িয়াছে।

২৪শে জুলাই—আজমীরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদ সংশোধনের প্রস্তাব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ দুইটির সংশোধনের প্রশ্ন আলোচনায় বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে।

ইন্দোচীনের যুদ্ধবিরতি তদারকী কমিশনের প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণে ভারত সম্মত হইয়াছে।

২৫শে জুলাই—আজমীরে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির অদ্যকার অধিবেশনে ভারতে বৈদেশিক উপনিবেশ, শিল্পনীতি ইত্যাদি বিষয়ে ৬টি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

ভারত সরকার প্রেস কমিশনের রিপোর্টে সংক্ষিপ্ত সার প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা এবং সংবাদপত্র উহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সাহায্য করার উদ্দেশ্যে আইন দ্বারা একটি সর্বভারতীয় প্রেস কাউন্সিল গঠন, সাংবাদিকতা ও সংবাদিকগণের মানোন্নয়ন, একজন প্রেস রেজিস্ট্রার নিয়োগ এবং সংবাদপত্র মুদ্রণের [illegible] সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য একটি [illegible] বাণিজ্যিক কর্পোরেশন গঠনের সুপারিশ [illegible] হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১৯শে জুলাই—ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী নু অদ্য রেঙ্গুনে শহীদ দিবসে এক [illegible] জনসমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, [illegible] ও চীন এক বিপর্যয়কর যুদ্ধের দিকে [illegible] চলিয়াছে। তৃতীয় বিশ্ব সংগ্রামের [illegible] আজও বিদ্যুমাত্র হ্রাস পায় নাই, [illegible] বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

২১শে জুলাই—আজ জেনেভায় [illegible] চীনের তিনটি রাজ্য ভিয়েৎনাম, [illegible] কাম্বোডিয়া সম্পর্কে যুদ্ধবিরতি [illegible] স্বাক্ষরিত হইয়াছে। [illegible]

২২শে জুলাই—[illegible] সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ২৭শে [illegible] ইন্দোচীনে সরকারীভাবে যুদ্ধ বন্ধ [illegible] কারণ, ঐদিন উত্তর ভিয়েৎনামের [illegible] এলাকায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকরী [illegible]

২৩শে জুলাই—জনাব এ কে [illegible] হক ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি [illegible] জন্য রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে অবসর [illegible] করিতেছেন।

অদ্য ঘোষিত হইয়াছে যে, ফরাসী [illegible] ভিয়েৎমিন উভয় পক্ষই যুদ্ধবিরতি [illegible] সরকারীভাবে কার্যকরী হইবার [illegible] অবিলম্বে ইন্দোচীনের সমস্ত প্রধান [illegible] রণক্ষেত্রে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করিতে [illegible] হইয়াছে।

২৪শে জুলাই—পাকিস্থান গভর্ণমেণ্ট বাহাওয়ালপুর ও খয়েরপুর রাজ্য [illegible] পশ্চিম পাকিস্থানের সর্বত্র কম্যুনিষ্ট [illegible] বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২১ বর্ষ
সংখ্যা ৪০

শনিবার
২২ শ্রাবণ, ১৩৬১

DESH

SATURDAY, 7th AUGUST, 1954.

সম্পাদক—**শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন**

সহকারী সম্পাদক—**শ্রীসাগরময় ঘোষ**

সাময়িক প্রসঙ্গ

বন্যায় দুর্গতি

দুই বৎসর পরে ভারতের কয়েকটি রাজ্য যুগপৎভাবে প্রবল বারিপাতে নদী-গুলি বিক্ষুব্ধ হইয়া ব্যাপক অঞ্চলে বন্যা হইয়া বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়াছে। উত্তর-প্রদেশ, উত্তরবঙ্গ এবং আসামের কয়েকটি জেলা জলে ভাসিয়া গিয়াছে। উত্তরবঙ্গে বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ভয়াবহ। নেপাল হইতে বহির্গত সব নদীগুলি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। তিস্তা ও তোর্সা নদীর প্লাবনই সর্বাপেক্ষা বিপর্যয়কর। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জলে ভাসিয়া গিয়াছে, পশ্চিম দিনাজ-পুরেও বন্যার জল প্রবলবেগে প্রবেশ করিয়াছে। উত্তর বঙ্গের এবারের বন্যা ১৯৫০ এবং ১৯৫২ সালের বন্যার অপেক্ষাও ভীষণ। বন্যার ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শস্য বিধ্বস্ত হইয়াছে। সহস্র সহস্র গবাদি গৃহপালিত পশু মারা গিয়াছে। রেলপথ ভাঙিয়াছে। অনেক লোকেরও প্রাণহানি ঘটিয়াছে। আশ্রয়-হীনদের দুঃখ ও দুর্দশা অবর্ণনীয়। বিপন্ন অঞ্চল হইতে নরনারীর উদ্ধার সাধন, তাহাদের খাদ্য সংস্থান, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, কৃষির ক্ষয়ক্ষতি পূরণের সমস্যা সহজ ব্যাপার নয়। সর-কারের হাতে প্রচুর খাদ্যশস্য মজুত আছে, ইহা আশার কথা। কলিকাতা হইতে বিমানযোগে কুচবিহারে খাদ্যশস্য প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু এইসব খাদ্যশস্য ইতঃস্তত বিচ্ছিন্ন বিপন্ন অঞ্চলের সর্বত্র পৌঁছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা অবিলম্বে অবলম্বন করা কর্তব্য। ইহা ছাড়া এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় হইতে দেশকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনেও ভারত সরকারের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। তাঁহারা নদী শাসনের কাজে হাত দিয়াছেন কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে নদ-নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এখনও কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। সেইরূপ চেষ্টারও যে বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। এই অভিজ্ঞতা অর্জনের নিমিত্ত নিশ্চয়ই তাঁহাদের ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিবার আবশ্যক ছিল না। আশা করি, বিহার, উত্তরবঙ্গ এবং আসামের প্লাবন-পীড়ন এ সম্বন্ধে সরকারকে সজাগ করিয়া তুলিবে। দেশবাসীর দুর্গতির এই অবসরে লাভখোর ও মুনাফা-শিকারীর দল খাদ্যের বাজারে মাথা তুলিয়া না উঠে, এজন্যও প্রখর দৃষ্টি রাখা দরকার। বস্তুত বিপন্ন নরনারীর দুর্গতি মোচনের দায়িত্ব শুধু সরকারের উপরই নয়, দেশবাসী সকলের উপরই রহিয়াছে। মানুষের এই দুর্দিনে মানুষ হিসাবে সে কর্তব্য যেন বিস্মৃত না হই।

লোকমান্য তিলক

গত ১লা আগস্ট লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুবার্ষিকী অতি-বাহিত হইয়াছে। তিলক ভারতে বলিষ্ঠ নব জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠাতা। বাংলার অন্তরে স্বাধীনতা লাভের যে বহ্নাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে,—লোকমান্য তিলকের জীবনাদর্শে এবং তাঁহার দুরন্ত বীর্যে সেই আগুনে দিগ্‌দাহী বৈপ্লবিক আবর্ত উত্থিত হয়। দেশের বুক হইতে অগ্নিবর্ণা জননী বাহির হইয়া আগ্নেয় লীলা বিস্তার করেন। ভারতের আকাশে বিদ্যুৎবজ্র গর্জন করিয়া উঠে। শত শত সাধক মাতৃযজ্ঞে নিজকে আহুতি দিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হন। লোকমান্য তিলকের সাধনায় বৈদেশিক প্রভুদের নির্মম, নিষ্ঠুর নখরদন্ত দেশবাসীর দৃষ্টিতে উন্মুক্ত হয়। রাজনীতিক চেতনা বুদ্ধিজীবী মুষ্টিমেয় ব্যক্তির-বিচারের সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করিয়া জাতির জনগণের মর্মমূলে শক্তিময় আকার পরিগ্রহ করে এবং অমোঘ আত্মবলে সক্রি[য়] হইয়া উঠে। জনশক্তির এই শক্তির বিচি[ত্র] বৈভব এবং বিলাস আমরা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পরবর্তী যুগে লক্ষ করিয়াছি। লোকমান্য তিলক সুপণ্ডি[ত] ছিলেন, সূক্ষ্মাগ্রবুদ্ধিসম্পন্ন মনীষা তাঁহার ছিল, সর্বোপরি তিনি জাতী[য়] আদর্শের ধারক, বাহক এবং সা[ধক] ছিলেন। স্বাধীনতার বেদীমূলে তি[নি] দেহ, মন এবং প্রাণ, তাঁহার সর্ব[স্ব] উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বন্ধন, পী[ড়ন] এবং নির্যাতন তিনি বীরের বিক্রমে ব[রণ] করিয়া লইয়াছিলেন। জাতির মুক্তির [জন্য] প্রাণপাতী সংকল্পশীলতা ছিল তাঁ[হার] আদর্শ। গীতাভাষ্যকার তিলক নি[ষ্কাম] কর্মসাধনার জীবন্ত মূর্তি ছিলে[ন]। তাঁহার আদর্শ, তৎকালীন দুর্যো[গময়] প্রতিবেশে দেশের অগ্রগতির আধার

ধ্রুব-জ্যোতি বিস্তার করিয়াছে। সেই আদর্শই আজ জাতিকে মুক্তির মন্দিরে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। ভারতের এই বীর্যবান সিংহবীর্য ব্যাঘ্রোরস্ক বরেণ্য পুরুষের চরণে তাঁহার তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে আমরা অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।

ভেজাল নিবারণ

ভেজাল নিবারণের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন এবং কলিকাতা পুলিসের এন্‌ফোর্সমেণ্ট বিভাগ কিছুদিন হইতে বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছেন। পুলিসের কর্মতৎপরতার ফলে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ভেজাল ঔষধ এবং বিভিন্ন খাদ্যের কয়েকটি আড্ডা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কতকগুলি লোক ধৃতও হইয়াছে। কিন্তু অপরাধের তুলনায় উপযুক্ত দণ্ডের বিধানের ব্যবস্থা না করিলে এই পাপ ব্যবসায়ের প্রতিকার হইবে না। এ কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। দুঃখের বিষয়, সরকার এ সম্বন্ধে উদাসীন রহিয়াছেন অথচ অপরাধের গুরুত্ব তাঁহারা সর্বদাই স্বীকার করেন। আইন প্রণয়নের জন্য সময় আবশ্যক ইহা বুঝি, কিন্তু সরকারের পক্ষে তেমন সময়ের অভাব ঘটিয়াছে, আমরা মনে করি না। ইহা ছাড়া, সমাজের ও রাষ্ট্রের গুরুতর স্বার্থের ক্ষেত্রে অর্ডিন্যান্স-এর আবশ্যক হয়। অনেক অর্ডিন্যান্স নানা প্রয়োজনে এদেশেও জারী করা হইয়াছে, কিন্তু ভেজাল দমনের উদ্দেশ্যে অর্ডিন্যান্স জারী করিতে তাঁহাদের কিসে আটকাইয়াছে, আমাদের বুদ্ধির অগম্য। কলিকাতা কর্পোরেশন শহরে ভেজাল দমনের নিমিত্ত একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। তাঁহারা এই অপরাধের সম্পর্কে দীর্ঘতরকালের জন্য কারাবাস এবং অর্থদণ্ডের সঙ্গে বেত্রদণ্ড বিধানেরও প্রস্তাব করিয়াছেন। এই শ্রেণীর সমাজ-দ্রোহী পশুদের জন্য তেমন কায়িক দণ্ড বিহিত বলিয়াই আমরা মনে করি। ভেজাল অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিকে ব্যবসায়-স্থানে তাহার দণ্ডের বিবরণ টাঙ্গাইয়া রাখিতে বাধ্য করার একটি প্রস্তাবও হইয়াছে। ইহারও প্রয়োজন আছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আমাদিগকে এই ভরসা দিয়াছেন যে, বিধানসভার আগামী অধিবেশনে তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে একটি আইনের খসড়া উপস্থিত করিবেন, আইনটি যাহাতে অপরাধে গুরুদণ্ড বিধানে উপযোগী হয় এবং তাহাতে কোন ফাঁক না থাকে এমন হওয়া দরকার। আইন পাশে দেরী হওয়া বিশেষভাবে বিপজ্জনক। অপরপক্ষ নিজেদের পাপ-ব্যবসা চালু রাখিবার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করিবে, ইহা স্বাভাবিক। তাহাদের ধনবল সামান্য নয়, গোষ্ঠীগোত্রও রহিয়াছে অনেক। এসব সম্বন্ধে সতর্ক হইয়াই কাজে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বাস্তবিকপক্ষে এই শ্রেণীর অপরাধ সমাজ-জীবন হইতে উৎখাত করিবার উদ্দেশ্যে সরকার যেমন কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা অবলম্বন করুন না কেন, দেশবাসী সর্বান্তঃকরণে তাহা সমর্থন করিবে।

ক্ষুদ্রের স্পর্ধা

ফরাসীরা আগামী ১৪ই আগষ্ট পণ্ডিচেরী ও কারিকল ত্যাগ করিবে শুনা যাইতেছে। সত্য হইলে সুবুদ্ধি নিশ্চয়ই; কারণ ভারত তাহাদিগকে ছাড়িতেই হইত। কিন্তু পর্তুগীজরা সে বান্দা নয়। পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়া, দমন, দিউ—এই তিনটি ছিটমহলের অধিবাসীরা পরাধীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য আজ বীরোচিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে। পর্তুগীজ সরকার ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য ভারতের ভিতর দিয়া সৈন্য প্রেরণ করিতে চায়, ভারত সরকার তাহাতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। অতঃপর তাহারা ভারত সরকারের কাছে নিজেদের বক্তব্য উপস্থিত করিবার জন্য তিনজন প্রতিনিধি পাঠাইবার প্রস্তাব করে, ভারত সরকার তাহাতেও রাজী হন নাই। পর্তুগালের ক্ষুদে কর্তার দল ইহাতে ভারতের উপর বেজায় খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা চোখ রাঙ্গাইয়াছে, ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাইতেছে। শক্তিগোষ্ঠীর দরবারে দরখাস্ত লইয়া দাঁড়াইতেও কসুর করে নাই; কিন্তু সর্বত্রই ব্যর্থকাম হইয়াছে। পর্তুগীজ কর্তাদের স্পর্ধা এইখানেই শেষ হয় নাই। গোয়া হইতে ভারতের বাণিজ্য-দূতকে বহিষ্কৃত করিয়া পর্তুগীজ সরকার ভারত সরকারকে অবমাননা করিয়াছে, তাহাদের এতই ঔদ্ধত্য। কিন্তু ইহার প্রত্যুত্তরে ভারত সরকার বোম্বাই হইতে পর্তুগীজ বাণিজ্য-দূতকে বিদায় দিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছেন, অন্য ব্যবস্থা তাঁহারা পরে দেখিবেন, ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে এই কথা আছে। এই পরের ব্যবস্থা এখনই অবলম্বন করার যৌক্তিকতা অনেকেই উপলব্ধি করিতেছেন এবং সে ব্যবস্থার স্বরূপ জানিবার জন্যও লোকের মনে আগ্রহ জাগিতেছে। পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীরা গোয়ায় যে অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে কয়েকদিনের মধ্যে সেখানে দ্বিতীয় জালিয়ানওয়ালাবাগের অভিনয় ঘটিবে, এমন আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। সমগ্র ভারতে তখন নির্মম অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে, ইহাই স্বাভাবিক। সুতরাং আপোষ নিষ্পত্তির মামুলী নীতি অন্ততঃ এক্ষেত্রে ভারত সরকারের পরিত্যাগ করা কর্তব্য। ইহারা সে পথে চলিবার পাত্র নয়, ইহা তো বহুদিন হইতেই বোঝা গিয়াছে। দেখা যাইতেছে, ভারত সরকারকে গণ-বিদ্রোহ দমনে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীদিগকে সাহায্য করিতে হইবে এমনই তাহাদের জিদ। তাহাদের এমন স্পর্ধা বিচূর্ণ হইতে বিলম্ব ঘটিবে না। দীর্ঘদিন সাম্রাজ্যবাদীদের দুঃশাসনে নিপীড়িত প্রজাশক্তি মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারত সরকারেরও আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়। এইসব ক্ষুদ্রে সাম্রাজ্যবাদীদিগকে ভারতের তটভূমি হইতে বিতাড়িত করাই এখন দরকার।

দু সপ্তাহ পূর্বে বৈদেশিকীতে লেখা হয়েছিল যে, সুয়েজের পরে এবার সম্ভবত বৃটেন ও মিশরের মধ্যে একটা মিটমাট হবে। তাই-ই হয়েছে। সুয়েজ ঘাটি সম্পর্কে দুই গভর্নমেণ্ট একটা নূতন চুক্তি করবেন—তার প্রধান শর্তগুলি স্থির হয়েছে। সুয়েজ অঞ্চল থেকে বৃটিশ সৈন্য—যাদের সংখ্যা প্রায় আশি হাজার সরে চলে আসবে, অবশ্য একদিনে নয়—এই অপসারণকার্য ক্রমশ হয়ে ২০ মাসের মধ্যে সমাপ্ত হবে। ঘাটির সাজসরঞ্জাম ঠিক রাখার জন্য বৃটিশ ও মিশরীয় গভর্নমেণ্ট অসামরিক বৃটিশ ও মিশরীয় কন্ট্রাক্টর নিযুক্ত করবেন। তাদের কার্য পর্যবেক্ষণের জন্য অবশ্য কায়রোস্থ বৃটিশ দূতাবাসের সঙ্গে একটি বৃটিশ মিশন যুক্ত থাকবে। ঘাটির সাজ সরঞ্জাম রক্ষার জন্য বৃটিশ টেকনিশিয়ানরা সামরিক পোষাকে থাকবে—বৃটিশ গভর্নমেণ্ট পূর্বে এরূপ শর্ত রাখার জন্য জেদ করেছিলেন। সে জেদ তাঁরা পরিত্যাগ করেছেন। মিশরীয় ভূমিতে বিদেশী সামরিক চিহ্নধারী কাউকে কোনপ্রকার কাজ করতে দিতে মিশরীয় গভর্নমেণ্ট রাজী ছিলেন না। কারণ তাতে মিশরের সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হোত। অতঃপর ঘাটির জিনিষপত্রের তদারক করার জন্য বেশ কিছু সংখ্যক বৃটিশ টেকনিশিয়ান থাকবে বটে কিন্তু তারা কাগজে কলমে বেসামরিক কর্মচারীর পর্যায়ে পড়বে। কোন্ সঙ্কটের সৃষ্টি হলে আবার সুয়েজ ঘাটিকে "সক্রিয়" করে তুলতে দিতে হবে অর্থাৎ ঘাটিকে কাজে লাগাবার জন্য বৃটিশদের আবার ফিরে আসতে দেবার প্রশ্ন উঠবে তা নিয়ে দুই পক্ষের মতের মধ্যে কিছু অনৈক্য ছিল। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট চেয়েছিলেন যে, কেবল আরব রাষ্ট্রগুলি নয়, তুরস্ক অথবা ইরাণও যদি আক্রান্ত হয় তা হলেও সুয়েজ ঘাটিকে কাজে লাগাবার সর্ত থাকবে। মিশর তুরস্ক পর্যন্ত রাজী হয়েছিল, বটিশ গভর্নমেণ্ট ইরাণের জন্য জেদাজেদি না করে তাতেই স্বীকৃত হয়েছেন। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট চেয়েছিলেন নূতন চুক্তি ২০ বছরের জন্য হবে, মিশর গভর্নমেণ্ট সেখানে চেয়েছিলেন পাঁচ বছর। শেষ পর্যন্ত মিশর গভর্নমেণ্টের দাবীই একরকম স্বীকৃত হয়েছে—নূতন চুক্তির মেয়াদ সাত বছর স্থির হয়েছে, অতঃপর কী হবে। চুক্তির সপ্তম বছরে আবার উভয় দেশের মধ্যে আলোচনার বিষয় হবে।
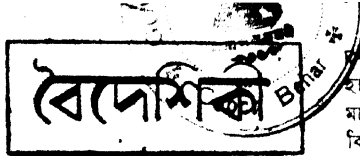
সুয়েজ সম্পর্কে এখন যে মিটমাট হোল বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ইচ্ছা করলে অনেক দিন পূর্বেই এটা করতে পারতেন। টেকনিশিয়ানদের পোশাক ইত্যাদি নিয়ে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট জেদাজেদি কেন করছিলেন? যেসব শর্তে তাঁরা পূর্বে কিছুতেই রাজী হচ্ছিলেন না হঠাৎ সেগুলিতে রাজী হয়ে যাবার কারণ কি? ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট পূর্বে যেরকম জেদাজেদি করছিলেন তা থেকে এইটাই সন্দেহ হচ্ছিল যে, আসলে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট সুয়েজ থেকে সৈন্য সরিয়ে আনতে চান না, তাই টালবাহানা করছেন। এ সন্দেহ যে সম্পূর্ণ অমূলক নয় তার প্রমাণ বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিল সাহেবের নিজের কথা থেকেই পাওয়া গেছে।

কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত চার্চিল সাহেবের ধারণা ছিল যে, সুয়েজ ঘাটি হাতে রাখা অত্যাবশ্যক। তাঁর সে ধারণা হাইড্রোজেন বোমা বদলে দিয়েছে। কয়েক মাস পূর্বে হাইড্রোজেন বোমার ক্ষমতার বিষয়ে মার্কিন এ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের কর্তা মিঃ কোলের একটি বিবৃতির সংবাদ কাগজে পড়ে চার্চিল সাহেব চমকে উঠেন এবং প্রেসিডেণ্ট

আইজেনহাওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। গত জুন মাসে চার্চিল-আইজেনহাওয়ার সাক্ষাৎকারের এই নাকি ছিল মূল কারণ। যাই হোক, চার্চিল সাহেব এখন বুঝেছেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে সুয়েজ ঘাটির যে গুরুত্ব পূর্বে ছিল হাইড্রোজেন বোমার আগমনের পরে তা আর নেই। এখন যুদ্ধ লাগলে মনে হয় চার্চিল সাহেব ধরে নিচ্ছেন যে, ভবিষ্যৎ যুদ্ধে হাইড্রোজেন বোমা ব্যবহৃত হবে—মধ্যপ্রাচ্যের জন্য লড়াই সুয়েজ ঘাটির কাছে হবে না, অথবা সুয়েজ ঘাটিকে হাইড্রোজেন বোমার আক্রমণ থেকে বাঁচানো যাবে না। অর্থাৎ সুয়েজ ঘাটির মূল্য পূর্বের তুলনায় এখন আর তেমন কিছু নেই। চার্চিল সাহেবের কথা থেকে মনে হয় যে যদি হাইড্রোজেন বোমার আগমনের দরুণ সুয়েজ ঘাটির এরূপ মূল্য হ্রাস না হোত তবে চার্চিল সরকার সুয়েজ থেকে বৃটিশ সৈন্য সরিয়ে আনতে রাজী হতেন না। তাহলে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ও মিশর গভর্নমেণ্টের মধ্যে যে মিটমাট হোল তার জন্য ধন্যবাদ হাইড্রোজেন বোমারই প্রাপ্য!

মিটমাটের মূল কারণ যাই হোক না কেন, এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এই মিটমাটের ফলে মধ্যপ্রাচ্যে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। মিশরের নাসের গভর্নমেণ্টের সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের যোগ ক্রমশ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে। মিশর গভর্নমেণ্ট মার্কিন সাহায্য—সামরিক এবং অর্থনৈতিক উভয়বিধ সাহায্য পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। M. E. D. O.-র প্রথম কল্পিত রূপ অনুযায়ী কোনো সংস্থা গঠনের চেষ্টা হয়ত এখনই হবে না, তবে অন্যভাবে একই উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা তো চলেইছে। মিশরের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত হয়ে গেলে মধ্যপ্রাচ্যের এমন একটি দেশও থাকবে না যে না মার্কিন অথবা বৃটিশ সামরিক সাহায্যের বাঁধনে বাঁধা পড়েছে। তুরস্ক ও পাকিস্তানের চুক্তির সঙ্গে মিশর এবং অন্য আরব রাষ্ট্রগুলি এখন পর্যন্ত কোনো সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করতে আপত্তি করছে বটে; কিন্তু পরোক্ষভাবে সকলেই ধীরে ধীরে এক জালে জড়াচ্ছে।

একটা গোলমাল খালি বেধে র[illegible] ইস্রেল ও আরবদের পারস্পরিক বি[illegible] নিয়ে। সুয়েজ অঞ্চল থেকে বৃটিশ [illegible] সরে এলে মিশর ও ইস্রেলের [illegible] ঠোকাঠুকি লেগে না যায়—এই ভয় [illegible] কেউ প্রকাশ করেছেন। তবে মার্কিন [illegible] বৃটিশ গভর্নমেণ্ট উভয়েই ঘোষণা করে[illegible] যে, জোর করে সীমানা পরিবর্তনের [illegible] কেউ করলে তা বরদাস্ত করা হবে [illegible] মিশরের গভর্নমেণ্ট পূর্ব পরাজ[illegible] প্রতিশোধ নেবার জন্য ইস্রেলের বি[illegible] কোনো আক্রমণাত্মক নীতি চালাবে ন[illegible] প্রতিশ্রুতি নিশ্চয়ই বৃটিশ ও মা[illegible] গভর্নমেণ্ট পেয়েছেন। তাছাড়া [illegible] গভর্নমেণ্টের পক্ষে এখন [illegible] আভ্যন্তরিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্ন[illegible] দিকে প্রথম দৃষ্টি দিতে হবে, যুদ্ধবিগ্র[illegible] দিকে ঝুঁকলে চলবে না। তবে গভর্ন[illegible] যদি জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি [illegible] করতে অপারগ হন তবে দেশের [illegible] মন অন্যদিকে ফেরাবার জন্য হয়ত ইস্র[illegible] বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন হ[illegible]

* * *

ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মঃ মেন্দেস টিউনিসিয়াকে "হোম রুল" দেবার প্র[illegible] করেছেন। এই "হোম রুলের" প্রস[illegible] একটু নূতনত্ব আছে। দেশরক্ষা [illegible] সৈন্য বিভাগ এবং পররাষ্ট্রনীতি [illegible] ফরাসীদের হাতে থাকবেই, [illegible] টিউনিসিয়ার ফরাসী ঔপনিবেশিক[illegible] একটা আলাদা Status হবে যাতে [illegible] তাদের উপর এবং বর্তমানে তারা [illegible] সুখ-সুবিধা ভোগ করছে সেগুলির [illegible] "নেটিভ" গভর্নমেণ্টের বিশেষ [illegible] এক্তিয়ার না হয়। ফরাসী ঔপনিবে[illegible]দের একটা আলাদা এ্যাসেমব্লী হবে [illegible] বে'র পরিবর্তে ফরাসী রেসি[illegible] জেনারেলের নিকট দায়ী থা[illegible] বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ না হওয়া [illegible] ফরাসী গভর্নমেণ্টের প্রস্তাব [illegible] আলোচনা করা কঠিন। তবে [illegible] দৃষ্টিতে মনে হয় টিউনিসিয়ার [illegible] সঙ্গীদের নিকট ফরাসী প্রস্তাব খু[illegible] লোভনীয় বলে মনে হবে না।

আমার একজন অধ্যাপক বন্ধু গত আসরের একটি মন্তব্যের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আপনাদের অনেকের মনে আছে, আমি বলেছিলাম জন্তু জানোয়ারেরাই দেবতাদের বাহন। একমাত্র মানুষই মানুষকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করে। আমার বন্ধুটি আমাকে জানিয়েছেন যে, আমার এই ধারণা ভ্রমাত্মক। ...দি ব্যাপারে আমার বন্ধুর মতামত আমি নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারি কারণ ...বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আছে। আমি একদিকে খুব ভাগ্যবান যে আমার বন্ধুদের মধ্যে অনেকে বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন। আমার যা ...ছু বিদ্যাবুদ্ধি তাঁদের কথাবার্তা আলাপ আলোচনা থেকেই সংগ্রহ করা। ঐ ...পুঁজিতেই আজ পর্যন্ত কোনো রকমে ...চালিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু যার নিজের ...এমন নড়বড়ে সে ধার করা বিদ্যেতে ...দিন চালাবে, বিশেষ করে যাকে হপ্তায় ...সেই বিদ্যে জাহির করতে হয়! ...এই ভ্রমাত্মক কথা আমি হামেশাই ...লে থাকি এবং তাই নিয়ে বড় ...একটা মাথা ঘামাই না। আমি ...নে থাকি, পড়বার সময় পাঠকেরা ...নিজেরাই সে সব ভ্রম সংশোধন করে নেন। ...তাঁরা নিজগুণে আমার ভুল ভ্রান্তি মার্জনা করেন বলেই আমার পক্ষে লেখা সম্ভব হচ্ছে। প্রতি পদে যদি আমাকে ভাবতে হতো এবং অনুপুঙ্খ বিচার করতে হতো তবে আমি লিখতুম কখন? বিচারের ভার পাঠকের উপরে ছেড়ে দিয়ে লেখক নির্বিচারে লিখে যাবেন, এই নিয়ম। যাঁরা এই ব্যাপারে অতি মাত্রায় সাবধানী তাঁরা কখনো লেখক হতে পারবেন না। পণ্ডিত ব্যক্তিরা স্বাভাবতই ভ্রম-কাতর, তাঁরা নির্বিচারে লেখনী চালনা করেন না পাছে কোন প্রকার ভ্রান্তি ঘটে। এমন যে জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ সক্রেটিস তিনিও কিছুই লিখে যাননি। তাঁর মুখের বাক্য লিপিবদ্ধ করে প্লেটো জগৎজোড়া নাম করে ফেললেন। আমার তো মনে হয় সক্রেটিসের মনে এই ভয় ছিল যে তিনি বিশ্বসুদ্ধ মানুষের ভুল ধরে বেড়ান, পাছে আবার অপরে তাঁর ভুল ধরে বসে এই ভয়েই তিনি লেখনী ধারণ করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তিনি জীবনে অনেক পণ্ডিত দেখেছেন; কিন্তু তাঁর বড়দাদার মতো পণ্ডিত ব্যক্তি তিনি কমই দেখেছেন। একবার ভেবে দেখুন সেই দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর পাণ্ডিত্যের তুলনায় কত সামান্যই লিখেছেন। তিনি লিখতেন কম, পড়তেন বেশি। জ্ঞানলাভেই তাঁর আনন্দ, জ্ঞান দানে নয়। ভাগ্যিস রবীন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রজের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেননি। আর রবীন্দ্রনাথের দেখাদেখি আমিও দ্বিজেন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত বর্জন করাই শ্রেয় মনে করেছি। দ্বিজেন্দ্রনাথ অগাধ বিদ্যার অধিকারী ছিলেন। আপনারা জানেন, বিদ্যা বিনয় দান করে। বিদ্বান ব্যক্তি মনে করেন, আমি কী-ই বা জানি আর কী-ই বা লিখব। পাছে উক্তরূপ বিনয় আমার মনে প্রবেশ করে এই ভয়ে আমি বিদ্যার পথই মাড়াই না। আমাদের মতো যারা কিছু না জেনেই লিখতে বসে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাদের ঠাট্টা করে বলেছেন, না-পড়া-পণ্ডিত। শুনেছি, ম্যাকলে সাহেবও ঐ ধরনের উপদেশ দিতেন। তিনি বলেছিলেন, আমি এক লাইন লিখবার আগে একশো পাতা পড়ে নিই। এঁদের পাল্লায় পড়লে আমাদের আর লিখতে হ'তো না। কিন্তু ও'রা যাই বলুন এত বছর ধরে লিখে আমার এইটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, কিছুই না

জেনেও দিব্যি লেখা যায়। তা ছাড়া এও দেখেছি, আমি পড়তে গিয়ে কিছুই শিখিনি, যা কিছু শিখেছি লিখতে গিয়ে। অর্থাৎ লিখতে গিয়ে ভুল করেছি আর আমার বন্ধুরা কিম্বা পাঠকরা ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের কাছেই আমার সব কিছু শেখা।

আমি বিদ্যার্জনের ধার ধারি না ব'লে কত সুবিধে দেখুন, কি লিখব তাও ভাবি না, কেমন ক'রে লিখব তা নিয়েও মাথা ঘামাই না। পণ্ডিত ব্যক্তি হ'লে সাজিয়ে গুছিয়ে একটা কোনো গুরুতর রকমের প্রতিপাদ্য বিষয়কে বহু যুক্তি-তর্কের ঠেকো দিয়ে পাঠকের সম্মুখে খাড়া করতে হ'ত। আমার সে সব বালাই

নেই। এই তো দেখুন না কেন, গত সপ্তাহে যে ভুলটা করেছিলুম সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কত কথা বলে ফেললুম, অথচ আসল কথাটা এখনও বলাই হয়নি। লক্ষ্য ক'রে থাকবেন, আমার লেখার সব সময়েই মূল বক্তব্যটা উহ্য থাকে, আমি শুধু ভূমিকাটুকু ক'রে ছেড়ে দিই। চার্লস ল্যাম্ব তাঁর নিজের লেখার ধরন সম্বন্ধে চমৎকার একটি উপমা দিয়েছেন। বলেছেন, শিকারীদের সঙ্গে একদল লোক থাকে তারা জঙ্গল পিটিয়ে শিকারকে ঘরছাড়া করে, ও যাতে কোথাও লুকিয়ে থাকতে না পারে। জন্তুটা যেই না তার আশ্রয়স্থল থেকে ছুটে বেরিয়ে এল অমনি পড়ল শিকারীর খপ্পরে। শিকারী যতক্ষণ না তাকে বাগে আনতে পারছে ততক্ষণ তার পিছু ছাড়বে না, তাড়া করতেই থাকবে। ল্যাম্ব বলেছেন, আমি শিকারীর দলে নই, আমি 'বিটার্স'-এর দলে। ল্যাম্ব-এর মতো আমিও শিকার নিরপেক্ষ হয়ে জঙ্গল পিটিয়ে বেড়াই। জলজ্যান্ত শিকার ধরা হ'ল পণ্ডিতদের কাজ। তাঁরা বিষয়বস্তুটাকে তাড়া করে করে ক্রমে কোণঠাসা করে এনে পাকড়াও করবেন। তারপরে মেরে, ছাল ছাড়িয়ে, রোস্ট করে একেবারে আমার পাতে এনে পরিবেশন করে দেবেন।

হাঁ, এবার তবে আসল কথাটা বলি। গতবারে আমি বলেছিলাম, মানুষকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করা কোনো দেবতার ক্ষমতায় কুলোয়নি। কিন্তু আমার বন্ধুটি জানিয়েছেন যে, কুবের নামক দেবতাটি নর-বাহন। এসব ব্যাপারে আমার জ্ঞান যে কি সীমাবদ্ধ কি বলব। সত্যি সত্যি মানুষ যে কোনো দেবতার বাহন একথা আমি এই প্রথম শুনলুম। তাছাড়া, কুবের নামে যে একটি দেবতা আছে সে কথাই আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আমার ধারণা উক্ত দেবতাটি বহুদিন পূর্বেই স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে মর্ত্যধামে আগমন করেছেন। স্বর্গ যে কুবেরের পক্ষে উপযোগী স্থান নয় সেটা সহজেই অনুমেয়। কারণ ওখানে সমস্তই সুলভ, কিছুই দুর্মূল্য নয়। এইজন্য ধনপতি কুবের পুঁজিপতি হয়ে বর্তমানে মর্ত্য-ধামেই বসবাস করছেন।

কিন্তু আমার অধ্যাপক বন্ধুটি যে সংবাদ দিলেন তাতে আমার জ্ঞা[illegible] উন্মীলিত হয়েছে। দেবতার [illegible] মানুষের প্রতি বরাবরই আমার [illegible] বেশি। এই সংবাদ শ্রবণ করবার [illegible] আমার ভক্তি আরোও বেড়ে গি[illegible] এত দেবতা থাকতে দেখুন মানুষ [illegible] দেবতাটিকে বহনযোগ্য ব'লে [illegible] নিয়েছে। জন্তুজানোয়ারের যেমন [illegible] যত সব ব্যোম ভোলানাথ দেবতাদের বয়ে বেড়াচ্ছে। মানুষ এসে জুটেছে [illegible] যায়গাটিতে, জানে কোথায় [illegible] অন্য দেবতাদের কাছে বর প্রার্থনা [illegible] বর দান করেন বটে, কিন্তু তা[illegible] লোকে কোন সুখ সুবিধা [illegible] একমাত্র কুবের ইহলোকের দেবতা [illegible] দেবতাদের দিয়ে পারলৌকিক [illegible] ছাড়া অন্য প্রয়োজন সমাধা [illegible] লক্ষ্মীর কাছে অবশ্যই বর চাও[illegible] কিন্তু তিনি বোধ হয় কুবেরের [illegible] দিয়েই খালাস হতেন। সে ঠিকা[illegible] নিজেই খুঁজে বের করেছে।

কুবেরকে আমি স্বর্গভ্রষ্ট [illegible] বলেছি। একটু ভাবলেই তার [illegible] অনুধাবন করতে পারবেন। [illegible] ধরে মানুষ যার বাহন তার ভাণ্ডা[illegible] আর কিছু আছে? কুবের এখন [illegible] এবং স্বর্গ থেকে বিতাড়িত। [illegible] ক্ষমতা কম নয়, ভগীরথ যেমন [illegible] এনেছিলেন মর্ত্যে কুবেরের বাহন [illegible] কুবেরের ভাণ্ডারকে মর্ত্যে [illegible] করেছে। নানা হাত ঘুরে এখন [illegible] ধন বাটপাড়ের হাতে এসে [illegible] আমি ভাবতুম তহবিল তছরুপটা [illegible] আবিষ্কার। আমার বন্ধুর কা[illegible] তথ্যটি জেনে অবধি বুঝতে পা[illegible] ব্যবসাটি মানুষের আদি এবং [illegible] ব্যবসা। মানব সভ্যতার উৎপত্তি [illegible] বিকাশ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত নানা [illegible] নানা কথা বলেছেন কিন্তু তাতে এ[illegible] তত্ত্বটিই বাদ পড়ে গেছে। আমার [illegible] হয়, এ তত্ত্বটি অবলম্বন করে বি[illegible] এখন পুনর্বিবেচনা করা দরকার। [illegible] ডিগ্রী সন্ধানী ব্যক্তি যদি [illegible] তছরুপ-এর আদ্যোপান্ত ইতিহাস [illegible] মৌলিক গবেষণা করেন তো মানব-স[illegible] ইতিহাসের উপর নূতন আলোক[illegible] হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের 'শেষ লেখা'

সঞ্জয় ভট্টাচার্য
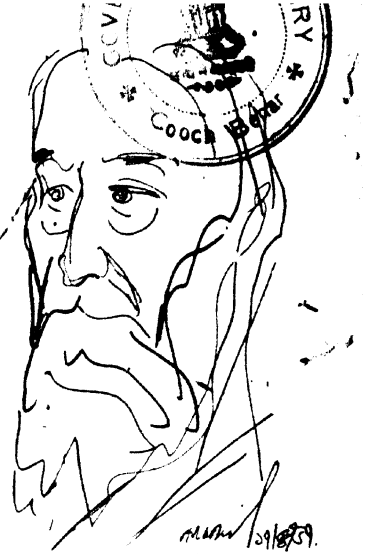
রবীন্দ্রনাথের আশ্রমিক জীবন শেষ অধ্যায়ে পরিপূর্ণভাবে এসে ...ছিল ১৯৩৯ সনে, যখন দ্বিতীয় ...যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এ-যুদ্ধ ...উনিশ-শতকীয় জীবনের ...থেকে উদ্ভূত। বস্তুবাদের উদ্ধত ...রাজবৎ পশ্চিম দিকপ্রান্তে ...আর তেমনি যুগসন্ধ্যায় ভারতীয় ...সূর্যবৎ রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুশয্যায় ...এ-যেন ভারতবর্ষের উনিশ ...এর সব সাধনা-সিদ্ধির অস্তগমন। ...তৃতীয় মাসে রবীন্দ্রনাথের ক্ষীণ-...হল:

...শান্তি পারাবার
...তরণী হে কর্ণধার।

...সিদ্ধার্থ যেমন যুগসন্ধিতে ...প্রার্থনা সমাপন করেছিলেন:

...সংসারম্ সন্ধাবিস্সং
অনিব্বিসম্
...গহকারকং গবেসন্তো দুক্‌খা জাতি
পুনপ্পুনম্

...এই স্বগতোক্তি বিনিঃসৃত করে, তেমনি ...'বাণী'-প্রণেতা পৃথিবী-পূজারী ...জীবনাবসান সন্নিকটে দেখে ...করলেন পরপারের আরেকটি ...এই জীবনের নাবিক যে ভগবান ...দের শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ সিদ্ধার্থের ...প্রত্যেক জাতির প্রতিনিধি কোনো ...'ভগ'-আদিত্যবৎ যোগীপুরুষেরা ...ভারতীয় মহচ্চরিত্রের নিকট ...ও পূজ্য হয়েছেন। তাঁরা দেবতা ...ব্রাহ্মণ-সংস্কৃতি-সম্পন্ন মানবের ...আর 'বুদ্ধ' হয়েছেন পরবর্তী ...রবীন্দ্রনাথ সেই প্রাচীন দেবতাকে ...জানালেন যিনি বৈষ্ণবের ...। তাঁকে ঠিক নিরবয়ব বৈদেহ আত্মা ...বলে চিনতে পারলেন না তিনি। ...দেখতে পেলেন নৌ-নাবিকের ...। বুদ্ধ তাঁকে দেখতে পেয়েছেন ...গৃহকারক শ্রেণীর বংশ-প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে। উভয়পক্ষেই 'ভগবান' বা 'ভগবা' সাংসারিক কর্মীর ভূমিকায় প্রকাশিত। পৃথিবী যখন প্রলয়োন্মুখ তখন এই কর্মী ভগবানের কাজ নেই। তাঁর ভক্তদেরও কাজ ফুরোয়।

যেমনিভাবে রবীন্দ্রনাথের ডাকঘরের শিশুটির কাছে মৃত্যু-লিপি এসে পৌঁছেছিল তেমনিভাবেই চিরশিশু ভক্ত রবীন্দ্রনাথের কাছেও 'অন্য কোনোখানে' যাবার ডাক এসেছিল। সেই ডাকের উত্তর-লিপিই এই গীতি-কবিতাটি। বাস্তবপক্ষে 'ডাকঘর' নাটিকায় ব্যবহৃত হবার জন্যেই স্বদেশ-পর্বের এই গানটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন। তিনি এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলেন যেন গানটি তাঁর দেহান্তের পর গীত হয়। গানটিতে অমরের মহাপথ সূচিত হয়েছিল বলেই হয়ত তিনি এ-ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। এ আত্মা ব্রহ্মলোকে যাচ্ছেন না—যাচ্ছেন এই মহাপথ ধ্রুবতারকার অভিমুখে:

"অসীমের পথে জ্বলিবে
জ্যোতি ধ্রুবতারকার।"

ধ্রুব-তারকা বৈদিক বিবাহ-রীতির সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হত। পার্থিব জীবনের বৈবাহিক বন্ধন ধ্রুব হোক এই ঋষিদের কামনা। কিন্তু ধ্রুব-কাহিনী স্মরণ করলে আমরা বলব এ হচ্ছে মহাভারতীয় ভক্তিলোক। ভক্ত-ভগবানের বন্ধনের মতোই স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন। এ-বন্ধনকে ধ্রুব রেখেই প্রস্থান করতে প্রস্তুত হলেন মানুষ রবীন্দ্রনাথ। তিনি এখানে এমন কোনো কামনা ব্যক্ত করছেন না যে, তিনি নরলোকে ধ্রুব-তারকার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবেন বা ধ্রুবপদী কবি হবেন। আজীবন ঈশোপনিষদের প্রতি আসক্ত থেকেও ঈশপোনিষৎ-বর্ণিত জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন না—বলছেন না, 'সর্ব-গত কল্যাণতম পুরুষ আমি'। সূর্যের কাজ পৃথিবীকে নিয়ে—সে কাজ তার থাকবে। মানুষের কাজ যদি ফুরোল, তবে আর সূর্য-তৃষ্ণা কেন? সৌর-মণ্ডলের পরেও যে স্থির আলোকবিন্দু তারই সন্ধান করুক আলোকিত আত্মা। উপনিষৎ যদি তাকে অসূর্যের (অসুরের) তমসার দেশ মনে করে, বৈদিক মন তাতে আপত্তি জানাবে না। দর্শনের রাজ্য থেকে ভ্রষ্ট হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ:

"পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা অজানার।"

এ-কথা উপনিষৎ-প্রণেতা ঋষি বলতে পারেন না। 'অজানা' ত কেউ তাঁদের কাছে নেই। বৈদিক ঋষিরা বরং বলেছেন, প্রথম যিনি তিনি ঘোর তমসা। উপনিষৎ-প্রণেতারা তমসার পারে মহান পুরুষকে দেখতে পেলেন। 'মহা অজানা' তিনি নন। রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির 'মহা-অজানা' আলো অন্ধকারের সংজ্ঞার বাইরে কিছু হওয়াই স্বাভাবিক। এখানে রবীন্দ্র-নাথ সাধারণ্যের অজ্ঞানতাকেই প্রশ্রয় দিচ্ছেন 'মহা অজানা' বলে। অন্তরস্থিত এই অজানা 'বিরাট বিশ্বে বাহু মেলে' আছে, এই অনুভব নিয়েই তিনি মৃত্যুর সম্মুখীন হচ্ছেন। কিছু-একটা আছে মাত্র এই বিশ্বাসটুকু সম্বল, সে তাঁর জীবন-দেবতা, বিশ্বদেবতা কিছুই নয়—অজানা কোনো সত্তা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের

বৈশিষ্ট্য এখানেও এই যে অজানার পরিচয় তিনি নির্ভয়ে গ্রহণ করতে পারেন। বিশ্বাস না কি আশা হ'তে এ-ভাব ব্যঞ্জিত, তা বলা মুশকিল। সপ্ত-সংখ্যক কবিতায় ১৯৪১ সনেও তিনি লিখেছিলেন, 'ধ্রুবতারকার পাশে জাগে তার জ্যোতিষ্কের লীলা।' এখানে যিনি কর্তা তিনিও অজ্ঞেয়-রহস্য,' জীবনের উৎস।

রবীন্দ্রনাথের এই অবস্থার চিহ্ন বিশ-শতকী বিজ্ঞানের দ্বান্দ্বিকতার কাছে তাঁর আজন্মলালিত বিশ্বাসের পরাভব সূচিত করে। কিন্তু এই জড়িমায় আচ্ছন্ন হয়ে তিনি শান্তিতে থাকতে পারছেন না। আবার সাংখ্যের জ্ঞানে আশ্রয় নিচ্ছেন। ১৯৪০-এ লেখা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংখ্যক কবিতায় অস্তিত্ববাদের মারফৎ তিনি অহঙ্কার-তত্ত্বে ফিরে যাচ্ছেন:

> "বিশ্বেরে যে জেনেছিল আছে বলে
> সেই তার আমি
> অস্তিত্বের সাক্ষী সেই,
> পরম আমির সত্যে সত্য তার
> এ-কথা নিশ্চিত মনে জানি।"

জড়ের বোধ ও তার বোধন যে মৃত্যুরই দান এ-কথা তিনি বুঝতে পারছেন। মৃত্যু পরিবর্তন-বিরোধী। পরিবর্তনশীলতা জীবনধর্ম। এসব কথা এ-কবিতায় ভেবে চলেছেন তিনি। তার মানে, মৃত্যুত্তর ধ্রুবতারকার জ্যোতি এ-ভাবনায় দূরে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। এ বোধ সাংখ্যের সংসারবাদ বা দ্বান্দ্বিক মনোভাবেই স্থান পায়।

সাংখ্যের পার্থিব তত্ত্বে জড়িয়ে পুরুষের যে অবস্থা হয়—তিনি প্রাণের যে স্তরে এসে যান রবীন্দ্রনাথ ১৯৪১-এ সে-অবস্থা ফিরে পেলেন আবার। এ যেন প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে শেষ একবার জ্বলে ওঠা। তৃতীয়-সংখ্যক কবিতায় তিনি গীতজ্ঞ পাখীর মনও ফিরে পাচ্ছেন। সেখানে এমন কি কবিতার ছন্দও পয়ারের সংযম ছাড়িয়ে গীতি-ছন্দে পা বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি পাখীকে বুলি শেখাচ্ছেন যে পাখী খাঁচা ছেড়ে দেবার কালে পতিত। তিনি বলছেন:

> "ওরে পাখি,
> থেকে থেকে ভুলিস কেন সুর,
> যাসনে কেন ডাকি—
> বাণীহারা প্রভাত হয় যে বৃথা
> জানিসনে তুই কি তা।"

যুক্তির শৃঙ্খলা, বয়েসের বেড়া ডিঙিয়ে বাল্যের প্রাণময় সত্তায় উপস্থিত হওয়া, এ কি শুধু মৃত্যুর মায়াজালে? আমরা মনে করি, তা নয়। কবি-স্বভাবেরই এমন হাওয়া-পরিবর্তন স্বাভাবিক। প্রজ্ঞাবান রবীন্দ্রনাথকেই আমরা সাধারণত চিনতে ভালোবাসি, ভুলে যাই যে তিনি একজন প্রাকৃত কবি। তাঁর কবি-প্রতিকৃতি ছাড়িয়ে আর কোনো বিশেষ চিত্র এতো বেশি উজ্জ্বল নয় যে, তার প্রতি ঝোঁক দিয়ে বলা যায়, তিনি অমুক বা তমুক। ভারতীয় দর্শন-বিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্যের বিদ্যাবত্তা তিনি কাব্যের উপাদান হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। তারপর সৃষ্টিকর্মে যতোটুকু আত্ম-সংস্কৃতি সাধ্য তা-ই তিনি করেছেন। তাঁর আদর্শ ছিল দেবশিল্প —মানে বিশ্বপ্রকৃতি। বিশ্বপ্রকৃতিকে নিজের প্রাণে একান্তভাবে পাওয়া এবং তারই জয়গান গাওয়া ছিল তাঁর জীবন। সে জীবন থেকে আমরা বহুবিধ ভাব আহরণ করতে পারি, কিন্তু বিশেষ কোনো সত্তা আহরণ করতে গেলে শিল্পী সত্তা ছাড়া আর কিছুই পাব না। তাঁর শিল্প ব্যবহারিক জীবনে ও মানসিক জীবনে উপভোগ করবার জন্যে সৃষ্ট। সে-জীবন প্রথমত একান্তভাবেই তাঁর। যদি পথিক এসে তাঁর সৃষ্টিকে গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি তা দান করে জীবনকে ধন্য মনে করবেন। এই মাত্র। এই মনোভাবকে আমরা আত্মকেন্দ্রিকতার অপবাদে অভিযুক্ত করতে পারি কিন্তু আত্মায় যিনি বিশ্বপ্রকৃতিকে ধারণ করবার জন্যে প্রয়াসী, তাঁর প্রতি এই অভিযোগ-আরোপ অভিযোগীর অজ্ঞতারই সামিল। রবীন্দ্রনাথের বৃক্ষবৎ জীবনের আত্মার পরিচয় আছে চতুর্থ সংখ্যক কবিতায়, যা তিনি পাখীর গানের পরবর্তী মাসে রচনা করেছিলেন। নিজেরই শূন্য চৌকির প্রতি দৃষ্টিপাত করে কবিতাটি রচিত। কিন্তু 'যেদিন পড়বে না আর পায়ের চিহ্ন' গীতির আত্মবিলোপ এতে নেই। চৌকির সার্থকতা যে মানুষের গাত্র স্পর্শে। তা তিনি যেন শুষ্ক কাঠের অন্তরে অনুভব করছেন। চৌকির ব্যর্থতা যখন সে শূন্য পড়ে থাকে। জনহীনতায় যেমনি ফলভারাক্রান্ত বৃক্ষ অসার্থক, তেমনি ভারবহ[illegible]ক্ষম চৌকিও তার প্রিয় স্পর্শ [illegible] ব্যর্থ। পরিচিত গাত্র স্পর্শে [illegible] পালিত পশুর মতোই তার আনন্দ। কবি জড় ও জন্তুতে এই অনু[illegible] দেখতে পাচ্ছেন বা মানবিক অনু[illegible] আরোপ করছেন তিনি বিশ্ব[illegible] আত্মকেন্দ্রিক বা অসামাজিক [illegible] পারেন না। রবীন্দ্রনাথের রচনার প্র[illegible] মনোযোগী হলে এমন কোনো স[illegible]লোচক নেই যে, তাঁকে আত্মকেন্দ্রিক[illegible] অপবাদ দেবেন।

'শেষ লেখা'-র কবিতা[illegible] বিশেষত্ব এই যে, তিনি নির্মল[illegible] আত্মচিত্র প্রতিফলিত করে [illegible] অন্ধকার লুকিয়ে শুধু আলো[illegible] দেখান [illegible]নি চন্দ্রের মতো। এ [illegible] আমরা তাঁর সুপরিচ্ছন্ন চিত্র[illegible] পাই। এ শুধু বয়েসেরই [illegible] চিত্রের সং চিত্র দেখবার ক্ষম[illegible] চাই। চিত্র অতীত সম[illegible] ফেলে। যেমনি জীবনের অ[illegible] নানা অনিশ্চয়তায় ছায়া আঁকে [illegible] এ-জীবনেও অতীত প্রতি[illegible] অধিকতর মোহময় হয়ে ওঠে [illegible] অতীত মনোভঙ্গী সহিত [illegible] উপভোগ স্মৃতির সাহায্যেই [illegible] করা যেতে পারে। আনন্দের [illegible] থেকে আনন্দ অনুভবের সময় [illegible] পাওয়া যায় না। যেমন স্নানে[illegible] স্নানের আরাম অনুভব [illegible] তেমনি আনন্দের বাইরে [illegible] সত্তাকে আনন্দ-লীলা থেকে [illegible] আনন্দাস্বাদ নিতে হয়। কবি[illegible] আস্বাদ নিতে সর্বাপেক্ষা প[illegible] ওয়ার্ডস্বার্থ বলেছিলেন, [illegible] রিকলেক্টেড ইন ট্রাঙ্কুইলিটি'-ই [illegible] এ কবিতা রচনা করতে হলে [illegible] ইমোশনকে অতীত বস্তু হতে [illegible] উদ্ধারে স্মৃতি প্রয়োগ করতে হবে [illegible] নির্জনতায় বসে। রবীন্দ্রনাথ [illegible] কয়েকটি দিন পরম নির্জনতা[illegible] ছিলেন। সে নির্জনতায় হয়[illegible] ভবিষ্যৎ ছায়াপাতও হয়;

> শূন্য চৌকির পানে চাহি
> সেথায় সান্ত্বনা-লেশ নাহি।

অপ্রাণ বস্তুও যে প্রাণের বেদনায় দিত বলে মনে হয় এ নির্জনতায় মন বোধ 'বলাকা' রচনাকালেও তিনি প্রেছিলেন, যখন অনুভব করেছিলেন, পর্বত হইতে চাহে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ। কিন্তু এ-বোধে নিয়তি পেক্ষিত। কবি নিয়তির সাহচর্যেই ত্রিকাল দ্রষ্টা হতে পারেন। ওয়ার্ড-স্বার্থের কাব্য-সংজ্ঞাকে যদি আমরা স্বীকার না করি, তাহলে বলতে বাধা নেই যে অতীত বস্তু নিয়েই কবি-দের কারবার। অনেকে একটি কথা প্রায়ই বলেন, কতিপয় কবি সম্পর্কে তাঁরা বলেন, অমুক অমুক 'প্রকৃতির কবি'। 'প্রকৃতির কবি' কে নয়? প্রকৃতি বা প্রকৃত জীবনকে অতীত বলে কোন্ কবি না স্মৃতিতে ... মানুষের পক্ষে অতীত হচ্ছে ... প্রকৃতি থেকে মানুষ আলাদা হয়ে গেছে বহুদিন, সুতরাং প্রকৃতির ... মানুষ কেমন প্রীতি পেয়েছে, ... স্মৃতিতে প্রায়ই আসে যদি সে ... আহ্বান করতে চায়। সাধারণ ... মানুষ স্মৃতির ধার ধারে না ... কবি স্মৃতির কুটিরে প্রায়ই চলে ... পারেন। কবি প্রায়ই অতীত ... মনোভূমি ফিরে পান।

... তাঁর শেষ বয়সের চিত্র-... প্রাচীনতম প্রকৃতিকে স্মরণ করেছিলেন। সে 'পুরাণো প্রকৃতি' ছিল ... ও কুমীরের রাজ্য। সেই রাজ্যে ... পদপ্রোথান করেই মানুষ সুন্দর ... পেয়েছে। রবীন্দ্র চিত্রাবলী একথাটিই ... চেয়েছে। সেই চিত্র রবীন্দ্রনাথের ... দান। বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ... কৌতূহলও হৃদয়ঙ্গম করেছেন ... দেহে। এবং বৃদ্ধা পৃথিবীর ... কুৎসিত রূপও দেখতে পেয়েছেন ... উন্মত্ত পৃথিবীতে। রবীন্দ্রনাথ ... মনোবলে এই পৃথিবী থেকে ... দূরে সরিয়ে চিত্তে প্রশান্তি ... করেছেন। যে-বিদেশকে তিনি ... বেসেছেন, সে বিদেশ তখন হিংসায় ... উন্মত্ত। কিন্তু সেই হিংস্র মনেও ... একদিন প্রীতি ছিল, এই 'পুরাণা ...

তিনি স্মরণ করছেন 'শেষ লেখা'র পঞ্চম-সংখ্যক কবিতায়। সেই সঙ্গে স্মরণ করছেন নিজের শুভবোধে যে খুঁত ছিল তাকে। তাঁর মনে হচ্ছে, তিনিই বিদেশকে অতীতে তেমন স্মরণীয় আশ্রয় দিতে পারেননি যার মায়ায় ভুলে দুষ্প্রবৃত্তি থেকে এখন বিদেশ বিরত হবে। তাই বলছেন:

"আরো একবার যদি পারি
খুঁজে দেব সে-আসনখানি
যার কোলে রয়েছে বিছানো
বিদেশের আদরের বাণী।"

গীতাঞ্জলির গানের সুরের আসনখানি পথের ধারে আবার পেতে দেবার সাধ জাগল মৃত্যুপথযাত্রী বিশ্বকবির চিত্তে, যেন পরম বিশ্বকবির ইঙ্গিতে। 'দত্ত, দয়ধ্বম্, দম্যত' মন্ত্রের ধমক শুনিয়ে

টি এস এলিঅট উরোপে ব্যর্থ হয়েছেন—তেমন ব্যর্থতা গীতাঞ্জলির হয়নি বলে আশা জেগেছিল এই মহাপ্রাণে। তাই তিনি বলেছিলেন :

"অতীতের পালানো স্বপন
আবার করিবে সেথা ভিড়,
অস্ফুট গুঞ্জন স্বরে
আরবার রচি দিবে নীড়।"

উরোপার পোড়া জমিতে নীড় গড়ে দেবার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে আগুনের কথা ভাবতে হয়নি। দান্তের পার্গেটোরিওর আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পাউন্ড এলিঅটের অবস্থায় যেতে চাননি রবীন্দ্রনাথ—দান্তের চাইতেও যে অতীতের সংস্কৃতি ছিল পাশ্চাত্যে—ছিল গ্রীস, ছিল তার মনে ভারতীয় শুভবোধ, সে-দিকেই তিনি তাকিয়েছেন। গ্রীস একদা ভাগবত হয়েছে, ভগবান বুদ্ধের শরণ নিয়েছে, সেই আশাতেই উজ্জীবিত হয়েছিলেন পরম-ভাগবত রবীন্দ্রনাথ। সেই উরোপা প্রেয়সীকে স্মরণ করে শেষ জন্মমাসে রবীন্দ্রনাথ তাই বলে গেলেন :

বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে
যে-প্রেয়সী পেতেছে আসন
চিরদিন রাখিবে বাঁধিয়া
কানে কানে তাহারি ভাষণ।

রবীন্দ্রনাথ ভাবছিলেন, এপারে-ওপারে আবার কেউ সেতুবন্ধন করবে—

তারপর আবির্ভাব হবে মহামানবের। রামচন্দ্র যাবেন স্বর্ণলঙ্কা থেকে সীতা উদ্ধার করে আনতে এবং তারপর স্বর্ণ-সীতামূর্তি স্থাপন করতে।

কিন্তু মুশকিল এই যে, মহামানবের আবির্ভাব-উল্লাসে মহাকবিও মহামানবীর কথা ভুলে যান। "জয় জয় জয়রে মানব-অভ্যুদয় মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে" বলে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ যে পুরুষ-সত্তার জয়-ঘোষণা করলেন, এখানেই তাঁর আত্মরূপ অনাবৃত হয়ে পড়ল। আত্মরূপ মানে কবি-সত্তা। কোনো প্রেয়সীর বন্ধনই কবি বা শিল্পীমন চিরন্তন বলে স্বীকার করতে পারেন না। এ স্তরে কবি সাংখ্যের পুরুষ। অবশ্য বহুপুরুষবাদী সাংখ্যের পুরুষ নন। মহাকবি পুরুষ-প্রকৃতি সেখানে একটি সত্তারই বিপরীত রূপ, পুরুষও এক, প্রকৃতিও এক তবে এক হলেও বিপরীত সত্তা মিলন-বিরহে কম্পিত, স্পন্দিত। পুরুষের ক্রন্দন নিয়েই মহাকাশ ক্রন্দসী। মহাকাশ থেকে পৃথক্ হয়েই পৃথিবী বিরহিনী। সেই মহাকাশ সূর্যের আকাশ, নক্ষত্রের আকাশ, নীহারিকার আকাশ ছাড়িয়ে অজ্ঞেয় রহস্যে আসীন। সে আকাশ সলিলাকাশ। জীবনের বীজ সেখান থেকেই আসে। ষষ্ঠ সংখ্যক কবিতায় 'মহামানবের জন্মে' রবীন্দ্রনাথ সেই মহাকাশের ধ্বনি-স্পন্দন শুনেছেন :

সুরলোকে বেজে উঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এলো মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।

প্রলয়াবসানে নূতন সৃষ্টির জন্যে এ জন্ম সম্পূর্ণ নূতন। এ-মহামানব জন্মান্তরের চক্রে বন্দী নয়, তাই জাতিস্মর বুদ্ধ নন। অন্যান্য অবতারেরও পুনরাবির্ভাব সুতরাং হতে পারে না। এ হবে নূতন ধ্বনিসুরবাহী এক দেব-শিশু যে পৃথিবীতে আর আসেনি। পৃথিবীর রক্ত যে পাল্টে দেবে, পৃথিবীর জীর্ণ রক্তের উত্তরাধিকার থাকলে তার চলে না। সে একা। রামচন্দ্রের মতোই সহস্রবান্ধব-পরিবৃত হয়ে তাঁকে একা থাকতে হবে।

মহামানবের আবির্ভাব সব দেশে গ্রাহ্য হয় না। হলেও তাঁদের মনে নিঃসঙ্গতার ভাবটি একরকমই থাকে। তাঁরা দুর্বোধ্য মানব। সাধারণের ধ্যান ধারণার বাইরে থাকে তাঁদের চিন্তা কর্ম। পৃথিবীতে যে ভাবটি ব্যবহৃত হয়ে পুরাতন হয়ে গেছে তার পুনরাবৃত্তি করতে মহামানব আসেন না। সুতরাং তাকে এমন স্তর থেকে আসতে হয় অপ্রত্যাশিতভাবে নূতন। এ-প্রসঙ্গে উরোপের একজন যুগসন্ধিনায়কের উদাহরণ এখানে উপস্থিত করা যায়, তিনি কর্শিকান নেপোলিয়ন। নেপোলিয়ন উরোপার লোকদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বলেছিলেন : "Monsieur Adams [illegible] ga centans que je ne vous ai [illegible]" আদমের সন্তানদের মধ্যে তিনি নূতন বীজ দেখতে পাননি। ইহুদির সন্তানের (সেমেটিক) কোন্ জন যে [illegible] ভার নিতে সমর্থ হবেন কে জানে? নেপোলিয়নের নূতনত্বটুকুই সহ্য হয়নি উরোপার। কিন্তু আমাদের নিকট এ চরিত্রের বিগ্রহ-শান্তি, প্রেম [illegible] খুবই পরিচিত। আমাদের [illegible] এ-চরিত্র দেখেছি—বঙ্কিমচন্দ্র [illegible] চেয়েছিলেন তখন। তিনি না এসে [illegible] দূত নেপোলিয়ন এলে আমরা [illegible] পছন্দ করতাম কিনা সন্দেহ। আমরা মনোনীত করেছি সেদিন পরমহংসদেবকে তাঁর নিঃসঙ্গতা থেকে খুঁজে এনে তাঁকে।

মহামানবের আবির্ভাবের ঘটনা ভারতীয় মন অভ্যস্ত। এমন অভ্যস্ত যে তা ভাবে যে এদেশেই মহামানবের আবির্ভাব ও কর্মকীর্তি সম্ভবপর। রবীন্দ্রনাথও তেমনি কোনো ঘটনার ধ্বনি শুনে গেছেন। সে মহামানব জাত কি অজাত তা তিনি বলেন নি। তবে তিনি যে কৃষ্ণ-জাতির হবেন সে-সম্পর্কে হয়ত তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন উরোপায় মহামানবের স্থান ত' হয়ই নি, অধিকন্তু তাঁদের মনোভাবও সেখানে উপযুক্ত স্থান লাভ করেনি। যে বিষ-ক্রিয়ায় উরোপার এই অবস্থা, তা যদি প্রত্যেক দেশে বিস্তৃত হতে শুরু করে তাহলে হয়ত এ ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে, পৃথিবীতে মহামানব বা অবতারের আর জন্ম হবে

স্বর্গ থেকে মহামানবের বীজ এলেও, [illegible] মাটিতে থাকে তাঁর লালন-পালনের ভার। সে-মাটি অনিচ্ছুক হলে মহামানব জন্মান না।

যদি অন্তঃকরণে মহামানবের মহা-[illegible] থাকে, তিনি নিজের কাছেও অনেক সময় দুর্জ্ঞেয় হয়ে পড়েন। [illegible] কোনো ভাবধারাই তাঁর মনঃপূত হ[য়] না অথচ কী সিদ্ধি তাঁকে দিয়ে হবে [illegible] অনেক সময় সুস্পষ্ট দেখতে [পে]ন না তিনি। শুধু মনে হয়ঃ যদি [illegible] ডাক শুনে কেউ না আসে তবে [illegible] চলো রে। গান্ধীজীকে এই বোধ [illegible] করেছে, শ্রীঅরবিন্দকে এই বোধ [illegible] করেছে, রবীন্দ্রনাথ ত বাল্যাবধিই [illegible] উজ্জীবিত। সপ্তম-সংখ্যক [illegible] এই বোধকে তিনি প্রাঞ্জল [illegible] তার উৎস-সন্ধান করতে গিয়েঃ

> [illegible] পবিত্র জানি,
> [illegible] স্বরূপ তার
> [illegible] রহস্য-উৎস হতে
> [illegible] প্রকাশ
> [illegible] অলক্ষিত পথ দিয়ে,
> [illegible] মেলে না তার।

শুধু একটা পবিত্রতা-বোধ নিয়ে [illegible] শুধু, হল আদিপঙ্ক হতে মানব-[illegible] তা যে কোত্থেকে এলো একথা [illegible] জানে না। কোন্ পথে যে তার [illegible] তা-ও মানুষের দৃষ্টিগোচর নয়। [illegible] আলোক-দৃশ্যে দিনের পর দিন তার [illegible] প্রকৃতিকে ভালোবাসবার বৃত্তি এনে [illegible] সে ভালোবাসা প্রিয়াতে যেমন, [illegible] তেমনি ছড়িয়ে দেওয়া যায়। [illegible] এমনি শক্তি যে,

> [illegible] সে অন্তরতম
> [illegible] করেছে যারে।"

জীবন হয়ে ওঠে একটি প্রেম-কাব্য-[illegible] মতো। রচনার শেষে প্রণেতা যখন [illegible] করে নিজের স্বাক্ষর লিখে দেন [illegible] নিজ পরিচয় তিনি জানতে [পা]রেন। মহাকবি বা মহামানবের জীবন-[illegible] মূল কথা এইমাত্র। হয়ত [illegible] কালো কালি সে প্রেম-কাব্যের [illegible] লেখাই মুছে দেয় কিন্তু এমন সব '[illegible] লিপি'-ও তাতে থাকে যার '[illegible]কের লীলা', 'ধ্রুবতারকার' পাশে [illegible] রয়। মহামানব মানবজাতি থেকে উত্থিত একটি প্রাণ, বিশ্বমানবকে ভালো-বাসাই যাঁর জীবন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বপ্রেম কাব্যখানি নিয়ে ধ্রুবতারকার দেশে যাত্রা করতে ইচ্ছুক, মহাকবি বা মহামানব হবার মানসিকতা তাঁর নেই। তাঁর প্রেম-কেন্দ্রে তিনি যোগীর মতো আসীন—এই শুধু বলতে চান। নবম-সংখ্যক কবিতায় নিঃসঙ্গ যাত্রীর মনোভাব (যা মহামানবেরই ছায়ায় তৈরী মনোভাব) আরো বেশি সুস্পষ্ট। যেমনঃ

> নিমন্ত্রণ ছিল কোথা শুধাইলে তারে
> উত্তর কিছু না দিতে পারে,
> কোন্ স্বপন বাঁধিবারে
> বহিয়া ধূলির ঋণ
> দেখা দিল
> মানবের দ্বারে।

আদর্শের সব প্রতিমা পিণ্ড পিণ্ড মাটি হয়ে শূন্যে নিরুৎসুক চেয়ে থাকে—প্রলয়কালে জীবন-শিল্পী দেখতে পান। ১৯৪১-এর ওরা-মে'র কবিতায় মানুষের 'আদিম আত্মীয়' ধূলির খবর লিখে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। তবু চিত্তে তাঁর এই সান্ত্বনা যে বাণীর ভগ্নমূর্তি যদিও বিশ্বব্যাপী ধ্বংসের সম্মানের দিনে পঙ্গু আবর্জনা, তবু তা

> "কালের চরণক্ষেপে পদে পদে
> বাধা দিতে জানে"

প্রলয়ে যে অতীতের ঐতিহ্য লোপ হয় না খানিকটা এই কারণে—অতীতের আদর্শ কালের বিনাশী শক্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কোনো ক্ষীণ ঐতিহ্য বা অতীতের শুভ আদর্শও বুঝি ১৯৪১-এর পর আর টিকে থাকবে না—এই আশঙ্কা উপস্থিত হয়েছিল রবীন্দ্র-নাথের মনে। তাই তিনি পরবর্তী দুটি পংক্তিতে লিখে গেলেনঃ

> শান্তি পাক শেষে
> আবার ধূলিতে যবে মেশে।

কিন্তু পৌত্তলিকতার দেশে এ কথা হয়ত খাটে না। সেই মাটি থেকে আবার প্রতিমা তৈরী না হলেও, প্রতিমা তৈরী হতে থাকে। অন্য মাটিতে বাণীর মূর্তি তৈরী হয়। বাণী-রূপা দেবতার মূর্তিই যদি তৈরী হতে পারে মর্ত্যের মাটিতে স্বর্গের সুষমা মিশিয়ে, তাহলে মর্ত্য-মানব যতদিন বেঁচে থাকবে তার মধ্যে স্বর্গ-সুষমা নিশ্চয়ই অবতীর্ণ হবে এবং আবির্ভূত হবেন মহামানব, নূতন বাণী-রূপে পুরাতনেরই খানিকটা সৌরভ মিশিয়ে। তবে মাটিই যদি না থাকে, মানুষ, অতিমানুষ, দেবতা প্রভৃতির প্রশ্নই তখন আর থাকে না। রবীন্দ্রনাথ কি এমন একটি মহাপ্রলয়ের ছবি দেখতে পেয়েছিলেন? তা নয়। ধূলি হলেও মাটি থেকে যাবে। ধূলিধূসর মানব থাকবে। সেই ধূসরতা থেকেই আবির্ভূত হবে শুভ্র স্বচ্ছতা। মহামানব বা ঐশ্বর্য-ময় মানবের বিভূতি হৃদয়ের এই বিভূতি। তিনি বিশ্বকর্মাই হোন আর বিশ্বকবিই হোন—তাঁর শিল্পকর্মে অপরিচ্ছন্নতা থাকবে না। এই বিশ্বকবিরই পর্যায়েই নিজেকে উন্নীত করে রবীন্দ্রনাথ তৃপ্ত ছিলেন।

শ্রীমতী নন্দিতা দেবীর জন্মদিন ও বিবাহের পঞ্চম-বার্ষিকী দিন উপলক্ষে রচিত দুটি কবিতা (দ্বাদশ-সংখ্যক ও

অষ্টম সংখ্যক) রচনা করেছেন উপরোক্ত বিশ্বকবি। পৌত্রীর 'জন্মদিন' উপলক্ষে তিনি বলছেনঃ

"দাতা আর গ্রহীতার যে-সংগম লাগি
বিধাতার নিত্যই আগ্রহ
আজি তা সার্থক হোলো,
বিশ্বকবি তাহারি বিস্ময়ে
তোমারে করেন আশীর্বাদ......"

একটি সাধারণ মানব-জন্মও বিশ্বকবির নিকট বিস্ময়কর—শুধু মহামানবের জন্মেই যে তিনি পুলকিত, তা নন। বিশ্বকবি সৃষ্টির বন্দনা-গানেই মুখর। জগৎ সৃষ্টি থেকে শুরু করে একটি বালুকণা সৃষ্টি পর্যন্ত যে বিধাতার আগ্রহে তৈরী তাঁরই ঘরোয়ানা কবি বিশ্বকবি। বড়ো-ছোটোর কোনো ভেদাভেদ নেই তাঁর কাছে। সবই যে বিশ্বরূপ।

"স পর্যাগাৎ শুক্রম্ অকায়ম্ অব্রণম্
অস্নাবিরম্ শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্
কবিঃ মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ যাথাতথ্যতঃ
অর্থান্ ব্যদধাৎ......"

একটি শুভ্র, নিষ্পাপ, অকায়ী, অক্ষ... বোধরহিত আত্মার আবির্ভাব যেমন কবি মনীষীতে, তেমনি স্বয়ম্ভূ সর্ব ... নানা অর্থ, নানা নামে ... ঈশোপনিষৎ-বর্ণিত এ-শ্লোক রবীন্দ্র... সত্য বলে মানতেন। তাঁর বিশ্বকবি... এই আত্মারই বন্দনা-গীতিতে ... এই আত্মা সাংখ্যের পুরুষ—ঈশোপনিষৎ তাকে পুরুষই বলেন, তবে তা ... পুরুষ। এই পুরুষের থাকে ...

কবিতায় যখন বিশ্বময়ীকে, বিশ্বময়ীরা হিসেবে দেখতে পাচ্ছেন। যখন বলছেন :

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি'
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত;
তার তরে রাখোনি গোপন রাত্রি।

শেষ দুই পংক্তিতে আমরা ডি. এইচ. লরেন্সের মনকে উদ্ভাসিত দেখতে পাই, যে লরেন্স 'দি ম্যান হু ডাইড'—গ্রন্থখানি লিখেছেন। মহৎ হবার অভিশাপে মানবত্ব হারিয়ে ফেলার প্রতিবিধান দিতে চেয়েছেন লরেন্স উক্ত গ্রন্থে। অধিক আলোর আকাঙ্ক্ষার পেছনে যে অন্ধকারের ছবি উঁকি দিতে থাকে এই পরম সত্য রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করে গেছেন উক্ত দুই পংক্তিতে। কিন্তু মহত্বের দুর্ভার যারা বহন করছেনা সহজ বিশ্বাসী সাধারণ মানব তারা যে মায়াময়ীর কাছে ঠকে যায় না, একথাও অকপটে ব্যক্ত করেছেন এ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ হয়ত এই অভিব্যক্তিতে ভক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন ১৯৫১ সনের ৩০শে জুলাই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে অন্তিম শয়নে আশ্রয় নিয়ে। আজ তেরো বছর পরে বাংলাদেশে যখন ভক্তিবাদের আবেগ দেখা যাচ্ছে তখন আমরা বলব রবীন্দ্রনাথের কোনো দিকই বাঙালী মনে-প্রাণে গ্রহণ না করে পারছে না। অবশ্য এ-সংস্কৃতির পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন কৃষ্ণচরিতের দলিল নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র আর পদাবলী নিয়ে ভানুসিংহ ঠাকুর। আর অনেক পেছনে তাকালে সহজিয়া পদকর্তারা বঙ্গের অঙ্গন কীর্তনমুখর করছেন দেখতে পাব। কিন্তু তবু বলব, রবীন্দ্রনাথ বিশেষ থেকে সাধারণে অবতীর্ণ। মহৎ জীবনের এই গতি দেখলে হয়ত তাকে অবতারত্বও বলা যায়।

তবে রবীন্দ্রনাথের জীবনে অনন্যতাই ছিল বৈশিষ্ট্য; তাই বিশেষ থেকে সাধারণে চলে আসাটা তার পক্ষে আকস্মিক নয়। সাম্প্রতিক যুগে বিশেষ থেকে সাধারণে আসবার একটা আকস্মিক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে হয়ত বহুপুরুষবাদের মতো বহু-অবতারবাদও ভারতীয় দর্শনের একটি বিষয় হয়ে উঠবে।

রবীন্দ্রনাথের মানবিক-পথে অবতরণের ধাপগুলো সুস্পষ্ট। উপনিষদগুলোকে যদি আমরা শংকর-ভাষ্যের মারফৎ না বুঝতে চাই তাহলে সেখানেই অবতরণের পথ নির্মলভাবেই দেখা যাবে। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের শিশু হিসাবেই প্রথম আবির্ভূত। 'জীবনের মিথ্যা কুহক' যদি শিশুকাল থেকে তাঁর পায়ে জড়িয়ে ধরে থাকে, তাহলে তা ধরেছে উপনিষদের প্রচলিত ব্যাখ্যার দরুণ। বার্ধক্যে এসে এই বন্ধাবস্থা তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছেন। উপনিষদ থেকে ব্রহ্মসাযুজ্যকে আলাদা করে নিয়ে একটি অদ্বৈত বিষয় করে তোলা যে শংকরাচার্যই প্রথম করেছেন এমন নয়। বহু আগেকার যোগীপুরুষেরা এই কাজটি করে গেছেন। শংকর তাঁদের পদাংক মাত্র অনুসরণ করেছিলেন, ইসলাম-প্রবেশের প্রাবল্য দেখতে পেয়ে।

ভারতবর্ষে উপনিষদের সংস্কৃতি ম্লান হতে শুরু করে বৌদ্ধ মতবাদের প্রভাবে। শাক্য সিদ্ধার্থ আবির্ভূত হয়ে সে-সংস্কৃতির গায়ে নূতন পোশাক পরিয়ে দেন সাংখ্যের দুঃখবাদকে গ্রহণ করে। দুঃখবাদও ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন মতবাদ। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দেখা যায় জনমানস দুঃখবাদ থেকে উত্থিত হচ্ছে। সেখানে আমরা দেখতে পাই শারদশ্রীর ধ্যান। বর্ষাঋতুর চার মাস ছিল দুঃখের সময়। হয়ত তখন প্লাবন, মড়ক, দুর্ভিক্ষ হত কিন্তু এই দৈব-দুর্যোগ অতীত হয়ে গেলেই কর্মী ভারত-সন্তান দিকে দিকে বেরিয়ে পড়তেন জীবনের স্ফূর্তি নিয়ে। বলতেন : 'অক্ষি দুঃখোত্থিতস্যৈব বিপ্রসন্নে কনীনিকে।' [illegible] জীবিতের জন্য বোধ, [illegible] জীবনপ্রদ অহং-জ্ঞান নিয়ে [illegible] ভারতী-সন্তানরা [illegible] এবং গণশক্তিকে অমান্য করে [illegible] বিখ্যাত হয়ে ওঠেনি। [illegible] মানসিক পরিশ্রমের ফল [illegible] ভারতবর্ষ জন্মগ্রহণ করেছিল। রবীন্দ্র[illegible] তা বুঝতেন। কোনো [illegible] একার পরিশ্রমে হতে পারে না তা [illegible] জানতেন। 'বিশ্বভারতী' [illegible] নিকেতন' বা 'শ্রীনিকেতন' [illegible] দান নয়। কিন্তু গণশক্তি [illegible] কি বুঝতেন তা আমাদের [illegible] হওয়া দরকার। শিল্পী [illegible] তিনি পছন্দ করেন নি। [illegible] করবী' এবং 'চার অধ্যায়' [illegible] প্রমাণ। শ্রেষ্ঠী অনার্দিপন্থে [illegible] নিকট ধনতন্ত্রের আদর্শ। [illegible] করে মানুষের জীবনের [illegible] অধ্যায় রচিত হতে পারে [illegible] করতেন না। আমাদের [illegible] বসবাস করতে এসে [illegible] করেছিলেন। এ-ও তাঁর [illegible] নামী রবীন্দ্রনাথ [illegible] করলেন অনার্যদের সঙ্গে [illegible] বসবার জন্যে। দিলেন [illegible] পুনরুত্থিত করবার ভার [illegible] ছেড়ে। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় [illegible] আমাদের কাজ করতে পারিনি। [illegible] পরও কি আমরা রবীন্দ্রনাথকে [illegible] করতে পেরেছি? [illegible] ভঙ্গীকে লুফে নিয়েছি [illegible] তাঁর দুঃখবাদের অন্ধকারটুকু। [illegible] শক্তিকে উজ্জীবিত করার [illegible] খেয়াটায় কিনা নিতে চাচ্ছি তাঁর [illegible] 'ভাসাও তরণী হে কর্ণধার' [illegible] কর্ণামৃতটুকু! আমরা জাতিকে [illegible] জরাগ্রস্ত। জরার রোপা দীপ্তিটুকু [illegible] —অন্ধকারটুকু পূর্ণ মাত্রাই [illegible] আর আছে ঐতিহ্যের অহংকার।

পরিশেষে একটা কঠোর [illegible] নিজেদের প্রতি আমরা করতে বাধ্য [illegible] বলতে ইচ্ছা হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথের [illegible] যদি ধ্রুবলোককে 'শান্তির অক্ষয় [illegible] পেয়েও থাকেন, তাহলে সে-আত্মাও [illegible] অশান্ত।

কালিম্পঙ

ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহ। এ বছর শীতটা কিছু দীর্ঘ-বিলম্বিত, একটু যায় গিয়ে আবার ফিরে আসে। আকাশের চেহারাও গত দুদিন থেকে খুব উৎসাহজনক নয়। শুনেছি পাহাড়-জঙ্গলের লোকেরা চৈত্র মাসেও অনেকে লেপ ঢাকা দিয়ে রাত্রে ঘুমোয়।

কোন এক রাত্রে জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং জেলায় ঢুকেছি। দীর্ঘ প্রান্তর পেরিয়ে এসেছি অন্ধকারে। বাতাসে ঠান্ডা ছিল প্রচুর। আমার দুর্নাম আছে, ঠান্ডা আমার লাগে না। যাঁর মোটরে আসছিলুম তিনি ভূপেন্দ্রনাথ বক্সী,—মোহরগাং-গুলমার চা-বাগানের ম্যানেজার। আমার ভ্রমণ ব্যাপারে তিনি অতিশয় উৎসাহী,—যে কোন প্রকারের সহায়তা তাঁর কাছে মিলবে। শিলিগুড়িতে এসে তিনি কিছু কেনাকাটা ক'রে নিলেন, তারপর আবার গাড়ি ছেড়ে চললো দার্জিলিংয়ের রাজপথ ধ'রে। দীর্ঘপথ চ'লে গেছে উত্তরের পাহাড়তলীর দিকে।

শুকনার জঙ্গলে থাকিনি কোনদিন। হিমালয়ের এই অঞ্চলের যে অরণ্যের কথা বলে এসেছি, শুকনা হোলো তারই প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য। রাত্রে হাঁটাপথে এ অঞ্চলে যাওয়া বিপজ্জনক। এই পথ পেরিয়েছি বহুবার,—দার্জিলিঙে যাওয়াটা যখন নিতান্ত সহজ ছিল। মন খারাপ হোলে দার্জিলিং, পুজোর সময় দার্জিলিং, বৈশাখের শেষে কলকাতায় গুমোট দেখা দিলে দার্জিলিং,—কিছু না হোক, আত্মগোপনের বড় আশ্রয় হোলো দার্জিলিং। কিন্তু আজ এই প্রথম, রাত্রের দিকে যাচ্ছি শুকনার জঙ্গলে, কেননা জঙ্গলের মধ্যেই হোলো ভূপেনবাবুদের চা-বাগান এবং তাঁর বাগানের ভিতর দিয়েই চ'লে গেছে আসামের রেলপথ কোচবিহারের দিক দিয়ে। পথ সামান্য, কিন্তু ওর মধ্যেই আনে ঘন অরণ্যের উপলব্ধি। শিলিগুড়ির শাল আর সেগুন বঙ্গ-বিখ্যাত, বর্মাটীকের পরেই নাকি এর ঠাঁই। কিন্তু বাণিজ্য এক বস্তু, আর অন্ধকার রাত্রির শাল-সেগুনে আচ্ছন্ন শত শত মাইল অরণ্য অন্য বস্তু। মাত্র আট মাইল পথ, তবু ওর মধ্যেই উত্তরে পর্বতের দিকে দেখা গেল, তিনধরিয়ার ঝিকিমিকি আলোর মালা; অন্ধকারে যেন মণিমানিক্য জ্বলছে। ঠিক এই দৃশ্য,—এই প্রকার প্রদীপের মালাখচিত পর্বতের দৃশ্য দেখা যায় দেরাদুন থেকে মুসৌরী। অন্ধকার থেকে বড় সুন্দর লাগে। দেখতে দেখতেই আমরা গুলমার চা-বাগানে এসে প্রবেশ করলুম। এ নিয়ে অনেকগুলি চা-বাগানে আমি অনেকবার কাটিয়েছি, কিন্তু সেসব আলোচনা এখানে থাক্।

নিত্যই বাঘ আসে এ অঞ্চলের চা-বাগানে। গতকাল সন্ধ্যায় ঠিক এইখানে লাইনের ধারে মোটরের আলো দেখে একটি লেপার্ড থমকে দাঁড়িয়েছিল। ওরা আসে গরু-ছাগলের আশায়। তবে মানুষের আওয়াজ পেলে পালায়। মাঝে মাঝে ম্যান্-ঈটার বেরিয়ে পড়ে, তবে চা-বাগান মাত্রই ভালো শিকারী রাখে। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই চা-বাগানের সব কাজ-কর্ম বন্ধ হয়ে যায়। বাগানের ভিতর দিয়েও প্রায় দু'মাইল পথ। কিন্তু অন্ধকারে দুই পাশে কিছু দেখা যায় না

কালিম্পঙের রাস্তা

তরাই অঞ্চলের নীরেট অরণ্য প্রেতচ্ছায়ার মতো চারিদিকে দাঁড়িয়ে। আমাদের মোটর এ'কে-বে'কে এসে বিস্তৃত বাগান-বাড়ির মধ্যে ঢুকলো।

ম্যানেজারের প্রাসাদের নীচে চন্দ্র-মল্লিকার মস্ত বাগান। বড় জমিদারের বাগানবাড়ির সঙ্গেই কেবল এর তুলনা চলে। ভূপেনবাবু সপরিবারে এখানে বাস করেন। তাঁর অপরিসীম যত্ন, আতিথেয়তা ও পরিহাস-সরস আলাপে সেই রাত্রি বড় আনন্দে অতিবাহিত করেছিলুম। পরদিন সকালে প্রাতরাশের পর তিনি সঙ্গে দিলেন একখানি নতুন মোটর এবং একজন নেপালী ড্রাইভার। বলে দিলেন, এ গাড়িটি আমি যেখানে খুশী নিয়ে যেতে পারি এবং চার-পাঁচশো মাইল যাবার মতো পেট্রলের ব্যবস্থা ড্রাইভারের সঙ্গে রইলো। অতঃপর জোর করে তিনি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন আজানুলম্বিত এক ওভারকোট এবং একটি ব্যাক্লাভা টুপি। পশমের তৈরী। তিনি নাকি আমার স্বেচ্ছাচারের চেহারা দেখে অত্যন্ত ক্লান্ত। কথা রইলো ফিরবার পথে তাঁর এখানে হয়ে যাবো।

অনন্যসাধারণ আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদের কথা ওঠে না, কিন্তু নিজেকে হঠাৎ এমন বেপরোয়া আর কোনদিন মনে হয়নি। পাহাড়ের পথে মোটরগাড়ির মধ্যে একা বসে এমন আরাম এবং সুখের চেহারা পাইনি কোনদিন। এমন নধর গদি এবং কাঠের আবরণ, এমন একান্ত নিরাপদ একা। আসুক বৃষ্টি, আসুক তুষার ঝটিকা,—একেবারে আমি নিশ্চিন্ত। দায় নেই, বায় নেই, তাগিদ নেই,—যখন খুশি, যেদিকে খুশি! ভূপেনবাবু লেখকের মনকে চেনেন।

শিলিগুড়িতে এসে গাড়ি ঘুরলো সেবকপুলের দিকে,—গেলিখোলার পুরনো রেললাইনের গা বেয়ে সেই পথ চ'লে গেছে পাহাড়-পর্বতের অন্তঃপুরে। বিদ্যুৎ-গতিতে গাড়ি ছুটলো। মাঝপথের নদীর নাম মহানন্দা, বোধ করি তিস্তার সঙ্গে গিয়ে মিলেছে। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার সীমানাটা এখানে ঠিক বুঝতে পারিনে। জলপাইগুড়ির সীমানা সম্ভবত শিলিগুড়ির নীচে দিয়ে এগিয়ে গেছে আলীপুর দুয়ারের দিকে অরণ্যের প্রান্ত-রেখা দিয়ে। সমতল পথ ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে, দেখতে দেখতেই পথ সঙ্কীর্ণ। পিছনে ফেলে এসেছি প্রান্তরের পর প্রান্তর,—মাঝে মাঝে সেখানে ইদানীং ব'সে গেছে রেফুজীদের উপনিবেশ। কোথাও কাঠের ব্যবসা, কোথাও বা কুটির-শিল্প। অনেক কাঠের বাড়ি খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে, যাকে বলে পোতা,—মাঠ থেকেই কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে উপরতলায়। এরকম বাড়ি তরাই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। গোহাটি থেকে নাংপোর পথে দেখে এসেছি এই প্রকার, আলীপুর দুয়ারে এই, কোচবিহার অনেক অঞ্চলে এই। যেখানে বন্যার [illegible] যেখানে পার্বত্য-নদীর ঢল নেমে আ[illegible] অকস্মাৎ, কিংবা জন্তু-জানোয়ার [illegible] খোপ,—সেখানে মানুষ এইভাবে নিজ[illegible] নিরাপদে রাখার প্রয়াস পায়।

গেলিখোলার পুরনো শীর্ণ রেলপথ দেখতে পাচ্ছি পাশে পাশে। তিস্তা[illegible] দুরন্তপনার জন্য এপথে ট্রেন চলাচল [illegible] সম্ভব হলো না। জলের ধাক্কায় রেল লাইন মুচড়ে যায়, স্লিপারগুলি [illegible] হয়ে অদৃশ্য হয় এবং গাড়ি ও [illegible] ডুবজলে তলিয়ে থাকে। ফলে [illegible] মোটরবাস ও লরীওয়ালাদের [illegible] তিস্তার এই পথটিতে আমার [illegible] অভিযানটির কথা মনে পড়ছে। [illegible] শিলিগুড়ি থেকে ট্রেনে [illegible] সঙ্গে ছিলেন 'কাল-পরিক্রমা'র লে[illegible] বন্ধুবর শশাঙ্ক চৌধুরী। [illegible] থেকে বৃষ্টি হওয়ার ফলে পাহাড়ে [illegible] ভাঙ্গন ধরেছিল, তিস্তাও [illegible] দুরন্তপনা বেড়ে উঠেছিল। [illegible] কালিঝোরা পর্যন্ত গিয়ে ট্রেন আর [illegible] পারলো না। কিন্তু দুর্যোগ যতই [illegible] হোক, আমাদের কোথাও থামলে [illegible] না। সেটা ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ এবং [illegible] তারিখ ছিল ২৩শে বৈশাখ। [illegible] জন্মদিন উপলক্ষে আমরা [illegible] কালিম্পঙে। রবীন্দ্রনাথ তখন [illegible] তাঁর পাদপদ্মে দেবার জন্য কিছু [illegible] ছিল সঙ্গে। তার মধ্যে [illegible] হোম পাঠিয়ে দিয়েছিলেন একখানি [illegible] গন্ধ এবং একটি কলম। ফলে যদি শুকোয়, কবির কলম যেন শুকোয় [illegible] কোনদিন!

তিস্তা নিস্তরঙ্গভাবে [illegible] পথে। সঙ্কীর্ণ গিরিসংকটের ভি[illegible] দিয়ে দীর্ঘপথ এসে প্রথম সে [illegible] দেয় উপত্যকায়। পাহাড় [illegible] সঙ্গে, আনে কাঁকর আর বালু। [illegible] মোটর চলেছে তারই প্রান্ত-সীমানা [illegible] দেখতে দেখতে এলো করনেশন ব্রী[illegible] এরই চলতি নাম হলো [illegible] এপারে দার্জিলিং জেলা, ওপারে জলপাই-গুড়ি। যতদূর মনে পড়ছে মোটর চ'লে গিয়েছে আলীপুর এবং কোচবিহার

দিকে। পাহাড়ের গা বেয়ে যেতে হয়। পুলটি ডান দিকে রেখে মোটর চললো এবার পাহাড়ের ভিতর দিয়ে। পাশে রইলো তিস্তা। কোথাও রৌদ্রের প্রখরতা, কোথাও বা মেঘচ্ছায়ার সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝলক,—আজ ফাল্গুনের এই প্রথম সপ্তাহে খেলাটা জমেছে ভালো। চড়াই পথ উঠছে, ভূপেনবাবুর ড্রাইভার এবার সতর্ক। বনময় পাহাড় দেখছি দুই পাশে, প্রথম স্তরের পর দ্বিতীয় স্তর, তারপর ধীরে ধীরে মহাহৈমবন্তের বিশাল রূপরেখা। উচ্চ থেকে উচ্চতর হচ্ছে তার শিখরদেশ। কতকাল ধ'রে দেখছি, কল্পনা ক'রে। শ্রদ্ধা নিয়ে দেখা ব'লেই অনেকখানি, নৈলে হিমালয় কেবল পাথরের পুঁজি। মাটি আর পাথরের স্তূপের শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হয় ব'লেই [illegible]। তার নিস্তব্ধ আকারের মধ্যে [illegible] কিছু নেই, কিন্তু মহিমা আছে আমার মনে। ইউরোপের আল্‌পস্‌ পাহাড় নিয়ে এক শ্রেণীর লোক [illegible] করে, আমাদের কাছে ওটা [illegible]। আমরা হিমালয়কে মিলিয়েছি দেবতার সঙ্গে; দেবাদিদেবের প্রতীক হোলো হিমালয়,—তিনি শিব, তিনি [illegible] আমাদের। কিন্তু ইউরোপের [illegible] আল্‌পস্‌-এর সে মহিমা একেবারেই নেই।

[illegible] বাইশ মাইল পথ শিলিগুড়ি থেকে। তারপর এলো তিস্তার দ্বিতীয় পুল। বাঁদিকে সোজাপথ চলে গেল চড়াই ধরে দার্জিলিং শহরের দিকে। ওর নাম পেশক রোড। এখান থেকে দার্জিলিং বাইশ মাইল—পথে পড়বে ঘুম। ডানদিকে তিস্তা পুল পেরিয়ে উপর দিকে চমৎকার পথ ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে কালিম্পঙে। মাইল দশেক পথ। পুল পার হবার আগে পড়ে জৈমল [illegible] মস্ত গদি। এরা একশো বছরেরও বেশী হোলো দার্জিলিং জেলা ও সিকিমে আমদানি-রপ্তানির কাজ করে আসছে—ব্যবসাটা প্রায় একচেটিয়া। এরা হোলো পাঞ্জাবী রাজপুত। যখন কোন যোগাযোগ ছিল না, রেলপথ এবং মোটর-গাড়ি যখন ছিল স্বপ্নবৎ—তখন এরা আসে হিমালয়ে। এদের প্রতাপ ও প্রভাব এ অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত।

১৯৩৮ সালের জন্মদিবসে কালিম্পঙে কবিগুরু

আমার মোটর চললো কালিম্পঙে। সুখ আছে সঙ্গে, তাই স্বস্তিও আছে। এ সুখ সইছে না। দ্রুতগতি মোটরে ভ্রমণ সিদ্ধ নয়। গ্রহণ করবার সময় পাচ্ছিনে কোথাও, মন কোথাও দাঁড়াতে পাচ্ছে না, সেজন্য দেখাটাও সত্য হচ্ছে না। শরীরে শ্রম নেই, পথশ্রম অনুভব করছিনে, প্রতি পদক্ষেপে পথের স্পর্শ পাচ্ছিনে, সুতরাং এ ভ্রমণ সার্থক নয়। নিজেকে নিঃশেষ করে কোথায় হিমালয়ের কোন শিলাতলে বসেছিলুম, গোমতীর ধারা পেরিয়ে কবে কোন্ মধ্যাহ্নে গরুড় নামক ছোট্ট শহরে হাঁটতে হাঁটতে গিয়েছিলুম, মুসৌরীর থেকে হাঁটতে হাঁটতে নেমেছিলুম কেম্পটি জল-প্রপাতের দিকে, ঘন অরণ্যের ভিতর দিয়ে পরিশ্রান্ত দেহ টানতে টানতে কবে গিয়ে পৌঁছেছিলুম মন্দাকিনীর তীরে গৌরী-

সেবক পুল

কুণ্ডে—সেইসব পথের প্রতিটি বাঁক, প্রতিটি মুহূর্তের উপলব্ধি আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। এ ভ্রমণে ফাঁকি আছে, তঞ্চকতা আছে, স্পর্শের অভাব আছে, তাই এ ভ্রমণ সিদ্ধ নয়। পোস্ট-অফিসের পার্সেল এখান থেকে যায় বিলেত, কিন্তু সে ইউরোপ ভ্রমণ করলো, একথা বলা চলবে না।

দেখতে দেখতে অনেক উপরে উঠে এলুম। এবার ধীরে ধীরে বুঝতে পারা যাচ্ছে ভূপেন বক্সী মহাশয়ের হাত থেকে ওভারকোটটি নেবার মূল্য কতখানি। ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহ শেষ হচ্ছে, কিন্তু [illegible] পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতায় এ প্রকার ঠাণ্ডা একটু অস্বাভাবিক। বেলা অপরাহ্ন, মেঘে-রৌদ্রে কালিম্পঙের আকাশ নানা বর্ণে শোভাময়। আমার মোটর এসে দাঁড়ালো এক বাঙালী মিঃ মুখার্জীর হোটেলের সামনে। একটুখানি ঢালু পথ দিয়ে ঘুরেই সামনে মস্ত লন। এখন ঠিক মরসুমের কাল নয়, সুতরাং বোর্ডিং প্রায় শূন্য। ড্রাইভারের জন্য আহারাদির ব্যবস্থা ক'রে আমি গেলুম ভিতরে। শ্রেষ্ঠ ঘর চাই, শ্রেষ্ঠ বিলাসব্যসন এবং তিন-চারজন হোটেল-বয়কে আমার এখুনি দরকার। অনেককাল পরে একটু নবাবী ক'রে নেওয়া যাক্। বন্ধুরা বলেন, আমি যখন একা, তখন আমি নাকি বিপজ্জনক।

মোটরের চেহারাটায় যতখানি আভিজাত্য ছিল, আমার পরিচ্ছদে তার আভাস বিশেষ মেলে না। পরিচ্ছন্ন পারিপাট্য ফেলে আসি নিজের দেশে। কৈফিয়তের কোন দায় নেই, ফিটফাট থাকার দরকার আছে মনে করিনে। পোশাকেই হোলো পরিচয়, সে পরিচয় না পেলেই খুশী থাকি। কেউ না জানুক, মুখ ফিরিয়ে চলে যাক্, কৌতূহল প্রকাশ না করুক—সেইটি আমার প্রয়োজন। বোর্ডিংয়ের ভিতরে গিয়ে দোতলায় উঠে দেখি, এঘর থেকে ওঘর, ওঘর থেকে সেঘর—সমস্ত শূন্য। শূন্য বারান্দা, শূন্য করিডর—সুতরাং স্বাধীনতাটা অবারিত। জানালা দিয়ে হিমালয়কে দেখা দরকার, যেদিকে ওই তিস্তা উপত্যকা,—যেখানে অপরাহ্নের রক্তিম আলোয়, দল ছাড়া ছোট ছোট মেঘ নেমেছে উত্তরীয় উড়িয়ে। বারান্দায়

কালিম্পঙ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য

ঁড়িয়ে দেখা দরকার দূর উত্তরে যেখানে ড়ায় চূড়ায় বর্ষার সজলতা। ওখানে ই গ্রেহাম্‌স্‌ হোমের উত্তরে একটির পর কটি চূড়া আবহমানকালের বিস্ময়স্তব্ধ ানগম্ভীর মূর্তিতে দাঁড়িয়ে। ওখানে য়েছে মহাকবরু, কাঞ্চনজঙ্ঘা, শ্রীশম্ভু, নরসিংহ চূড়া, শিনিওলচু ও জনগেবের শিখর। কে নাম দিয়েছিল জানিনে, ইতিহাসেও পাওয়া যায় না। নাম যদি ওদের খুঁজে না পেতুম, ক্ষতি ছিল না কিছু। ওরা হিমালয়ের দল, এতেই আমি খুশী। ওরা আশ্রয় দিয়েছে আমার অস্থির প্রকৃতিকে চিরদিন, তাই ওদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ওরা জবাব দিয়েছে আমার অনেকদিনের অনেক প্রশ্নের, অনেক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার,—ওরা আমার অনেক দিনের অনেক গোপন অশ্রুর সাক্ষ্য আর সান্ত্বনা,—ওতেই আমি তৃপ্ত। ওদের পাথরে পাথরে দেখেছি আমার প্রাণের ভাষা, ওদের ওই পাখীডাকা উপত্যকায় আমার জীবন-জিজ্ঞাসার সুবৃহৎ দরখাস্তখানা কতবার মেলে ধরেছি, আমার হৃৎপিণ্ডের রক্তধারা কতবার বয়ে গেছে, ওদের উপলাহত নির্ঝরিণীর উন্মত্ত নর্তনে। ধ্যান-মৌন চিরনির্বাক হিমালয়, কিন্তু কেবলমাত্র আমার কানে কানে ওরা কথা কয়, আমাকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায় ওদের অন্তঃপুরে বার বার, আমাকে চেনে ওরা মর্মে মর্মে। ওদের মাঝখানে গিয়ে কখনও বিক্রম প্রকাশ করিনি, অসহসাহসিক অভিযানে গিয়ে ওদের মাথায় দাঁড়িয়ে কখনও নিজের মাথা তোলবার চেষ্টা পাইনি,—কিন্তু ওরা দেখিয়েছে আমাকে শ্রদ্ধা আর আনন্দের পথ, দেখিয়েছে নৈবেদ্য উৎসর্গের পথ। ওদের একখানি পাথরের কাছে আমি কীটানুকীট—সেই আমার একান্ত একাগ্র আনন্দ।

রামকৃষ্ণ আশ্রম রয়েছে কালিম্পঙের দক্ষিণ শিখরে। একটি উদ্দেশ্য ছিল ওখানে গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন। তখনও সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব ছিল। কিন্তু ওখানকার বেণী ব্রহ্মচারী মহারাজ সহসা আমাকে দেখে উল্লসিত হলেন এবং আমি ধরা পড়ে গেলুম। তাঁকে কখনও দেখেছি মনে পড়ে না, কিন্তু তিনি নাকি আমাকে দেখেছেন কোন এক উপলক্ষে। দেখামাত্রই পরমাত্মীয়ের মতো তিনি কাছে টেনে নিলেন। ফলে, আমার স্বাধীনতাটুকু সম্পূর্ণ মুছে গেলো। ফিরে আসতে হোলো সামাজিক জগতে। মহারাজ দল ভারি করে তুললেন এবং কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিককে ডেকে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চললেন ছোট হাকিমের বাঙলোয়। হাকিম বয়সে তরুণ, কিন্তু তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর মিষ্ট আলাপ এবং অমায়িক আচরণে মুগ্ধ হয়েছিলুম। হাকিমের নাম মিঃ বি ভট্টাচার্য। আমি সিকিম যাচ্ছি শুনে তিনি সোৎসাহে ফোন্‌ করে দিলেন গ্যাংটকে, এবং জেঠমল ভোজরাজের নামে চিঠি লিখলেন। এমন জনপ্রিয়, ভদ্র এবং সুশিক্ষিত হাকিম সহসা চোখে পড়ে না। এখন তিনি কোথায় আছেন আমি জানিনে, কিন্তু তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আজও জানানো হয়নি। ওখানেই পরিচয় হয়েছিল মিঃ ডি পি প্রধানের সঙ্গে, তিনি এ অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আমাদের সঙ্গে ছিলেন আরেকজন অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট মনোরঞ্জন চৌধুরী মহাশয়। অতঃপর গেলুম ডাঃ গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয়ের বাড়িতে। বাড়ির নীচে মস্ত ডাক্তারখানা। জলপাইগুড়ির প্রসিদ্ধ নেতা ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল, এম-এল-সি আমার মারফৎ একখানা চিঠি দিয়েছিলেন ডাঃ দাশগুপ্তের নামে। ভেবেছিলুম সে চিঠি চেপে যাবো। কিন্তু সঙ্গীরা ডাঃ দাশগুপ্তের কাছে গিয়ে আমার কথা বলতেই বুঝতে পারা গেল, তিনি আমার আসার খবর আগে থেকে জানতেন। অতঃপর এই সমস্ত আলাপ পরিচয়ের শেষ [illegible] হোলো, স্থানীয় বাঙালী সমিতিতে আমার এলোমেলো বক্তৃতা! কী বলেছি তা মনে নেই, কিন্তু কি বলতে চেয়েছিলুম সেটা মধ্যরাতে তোলাপাড়া করে দেখলুম। বলা বাহুল্য, আমার কিছু জানবার এবং অনুধাবন করবার আগেই দেখলুম আমার মালপত্র সমেত আমাকে হোটেল থেকে তুলে এনে ডাঃ দাশগুপ্তের দোতলার একটি ঘরে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং তাঁর বিদুষী স্ত্রী অপরিসীম যত্নে নৈশ ভোজনের সমস্ত রাজসিক উপকরণ টেবলের উপর সাজিয়ে আমাকে ডেকে বসালেন। এতটুকু অবাধ্য হবার উপায় ছিল না, এবং আমি যে অন্ততঃ দিন পনেরো এখানে থাকতে বাধ্য,—তার সর্বপ্রকার আয়োজন নাকি ইতিমধ্যেই করা হয়ে গেছে। সহসা নিজেকে কলের পুতুল বলে মনে হতে লাগলো।

এ অভিজ্ঞতা অভিনব সন্দেহ নেই। কপালের ঘাম মুছে এসেছি হিমালয়ে এতকাল, অন্ন আর আশ্রয় জোটেনি কতবার। নিজের পায়ে নিজে মালিশ করেছি, কাঁধ কনকন করেছে বোঝা সঙ্গে নিয়ে, পায়ে ফোস্কার ঘা নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটেছি,—এদের সাক্ষী ছিল না কেউ। আজ শুতে পেলুম পালঙ্কের গদিতে, মেঝের উপরে কার্পেট পাতা, আরাম কেদারায় মখমল বসানো, মাথার কাছে

যন্ত্রে বেহাগের আলাপ। বাইরে হিমালয় ডাকছে ওই বেহাগের ... ওর ক্রন্দনকম্পিত মূর্ছনায়, ... বেদনায়। কত সঙ্গী আর ... মিলেছিল আমার সঙ্গে এই ... মারী পাহাড়ের সেই আজিজ ... মোতি সিং, কোহালার পথে কাশ্মীরের এম কে ধর, জম্মুর সেই ড্রাইভার, রুদ্রপ্রয়াগের সেই মারাঠা ... নেপালের মান বাহাদুর, কুলু ... সুখনলাল। এরা ছাড়া ছিল ... ছেলে আর মেয়ে; বন্ধু আর ... অনেকে নেই, অনেকে রয়েছে সংসারে। হারিয়ে গেছে কেউ, ... কেউ অন্ধকার স্মৃতির ... গেছে, কেউ বা গৃহস্থাশ্রমী ... গেছে। বিপদ হয়েছে এই, ... পথ এখনও ফুরোয়নি। ... চেষ্টা পেয়েছি, কাঁদুনে ... ভুলিয়ে অন্যমনস্ক ... কিন্তু হাওয়ায় হাওয়ায় ... হিমালয়। ওর মাঝখানে ... সব খেলা আর সব ... ছদ্মবেশটা মিথ্যে এই- ... নিজের সঙ্গে নিজের ...

... আমার ড্রাইভার গাড়ী ... ডাইনিং হলো ... গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়া ... কালিম্পঙের উপর দিয়ে চলেছে ... তিব্বতের দিকে, কিন্তু ... বেশী, এবং দুঃসাধ্যও ... এই প্রাচীন পথ ছেড়ে ... যায় গ্যাংটকের পথ দিয়ে। ... মধ্যে কালিম্পঙ থেকে ... অপেক্ষা নিকটবর্তী। রেনক্ ... 'জেলাপ লা' গিরিসংকটে, ... তিব্বত সীমানা। গ্যাংটক থেকে ... গিরিসংকট হোলো মাত্র ছাব্বিশ ... থেকে জেলাপ লা ঠিক ... আমার জানা নেই। এই পথ ... তিনজন জগৎপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ... তিব্বতে। তাঁদের মধ্যে প্রধান ... চিরদিনের গর্ব ঢাকা- ... সন্তান অতীশ দীপংকর ... থেকে নয়শো বছরের বেশী ... ভারতের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ঋষি দীপংকর তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্মের নির্মল স্বরূপকে প্রচার করেছিলেন। তিনি তেরো বছর সেখানে বাস করেছিলেন, এবং লাসার নিকটেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। গৌতম বুদ্ধের পরেই তিব্বতবাসীরা তাঁর মূর্তিকে আজও বোধিসত্ত্ব নামে পূজো করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন আধুনিক ভারতের কুলগুরু, রাজা রামমোহন রায়। তিনি তিব্বত যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু তার আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত আমার জানা নেই। তৃতীয় যে-ব্যক্তির প্রতি আমি অসীম শ্রদ্ধা পোষণ করি তিনি ছদ্মবেশে গিয়েছিলেন তিব্বতে, তাঁর নাম শরৎচন্দ্র দাস। তিনি গিয়েছিলেন উনিশ শতকের শেষভাগে। তাঁর কাছে আধুনিক ভারতবর্ষ ঋণী, কেননা তাঁরই ভ্রমণবৃত্তান্ত শুনে একালে প্রথম আমরা তিব্বতের বিষয় জানতে পারি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে স্যার ফ্রান্সিস ইয়ং হাসব্যাণ্ড যখন তিব্বত জয় করতে যান, তখন শরৎ দাসের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকেই তিনি সর্বাধিক সাহায্য লাভ করেছিলেন এটি স্যার ফ্রান্সিসেরই স্বীকারোক্তি। অতীশ দীপংকরের আগে আরেকজন ভারতবাসী বাঙ্গালী তিব্বতে গিয়ে অত্যন্ত বোধিসত্ত্ব উপাধিলাভ করেন, তিনি হলেন যশোরের রাজপুরে শান্ত রক্ষিত। অষ্টম শতাব্দীতে তিনি তিব্বতে যান। লামারা তাঁকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জানায়। কিন্তু দীপংকরের যে বিপুল কীর্তির কথা আমরা জানি শান্ত রক্ষিত সম্বন্ধে অতটা জানা যায় না।

কাশ্মীরের পূর্ব প্রান্তে ভারত তিব্বত বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হোলো গারটক, কিন্তু সে বহুদূর এবং বহু অগম্য অঞ্চল পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। কুমায়ুনের প্রান্তে গার্বিয়াং ছাড়িয়ে লিপু লেক গিরিসংকট অতটা না হলেও অনেকটা তাই; ওখানে তাকলাকোট, হোলো তিব্বতীদের ঘাটি। নেপালেও আছে নামচেবাজার দিয়ে তিব্বত। অন্যান্য পথও পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গলার এই পথই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিব্বত যে এত কাছে তা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। বিমানে গেলে কলকাতা থেকে দিল্লী পৌঁছতে লাগে সাড়ে তিন ঘণ্টা,—সেই গতিতে গেলে লাসা পৌঁছতে ঘণ্টা তিনেক লাগে কি?

কালিম্পঙের যে পথ চলে গিয়েছে উত্তরে সেখানে পশমের ঘাটি একটির পর একটি, অসংখ্য তিব্বতী আর মাড়োয়ারী তার আশেপাশে। এইটি হোলো তিব্বতীদের প্রধান ব্যবসায়। কিন্তু এখানে কারবারিদের উন্নতি ঘটেছে একালে প্রচুর, তার প্রকাশ্য নিদর্শন হোলো বড় বড় অট্টালিকা, আর অগণ্য কুঠিবাড়ী।

ভোর থেকে আকাশ আজ মেঘময় শীতের হাওয়া ছিল কনকনে। বড় গির্জাটা হোলো কালিম্পঙের ল্যান্ডমার্ক তারই পাশ দিয়ে চলে গেছে চড়াই প

এদিক ওদিক ঘুরে অনেক উঁচুতে গ্রেহাম্‌স্‌ হোমের দিকে। এখানে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং সাহেব সুবার অভিভাবক-হীন ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো ক'রে মানুষ হয়। সমগ্র পাহাড় নিয়ে এ এক বিরাট কীর্তি। পরিচালনা ব্যবস্থা সমস্তই খাঁটি সাহেব-মেমদের হাতে। একটু আধটু দেখে বেড়াতেই ঘণ্টাখানেক সময় লাগলো। ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়েই চলেছে।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক ঘুরে আবার ফিরে এলুম ডাঃ দাসগুপ্তের পাড়ায়। এটা অভিজাত পল্লী। কিন্তু এরই একপাশে একটি সংকীর্ণ গলির নীচে নেমে যে মন্দিরটির চত্বরে এসে দাঁড়ালুম, এটির কথা আজও ভুলিনি। দেখে নিলুম সেই অপরিচ্ছন্ন নোংরা ঝুপসি ঘরখানা, যেখানায় একটি রাত্রি বাস ক'রে গিয়েছিলুম আমি আর শশাংক চৌধুরী। এটির নাম ছিল ঠাকুরবাড়ি, আজও সেই নামটি তেমনি প্রচলিত। সেদিনও কালিম্পঙে এসেছিলুম বটে, কিন্তু কালিম্পঙ চোখে পড়েনি,—মহাকবি রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্ব সমগ্র হিমালয়কে সেদিন আমাদের চোখের আড়ালে রেখেছিল। মনে পড়ে সেদিন ২৫শে বৈশাখের অপরাহ্ণ। কবি রয়েছেন গৌরীপুর প্রাসাদে। বৈদান্তিক এটর্নী হীরেন দত্ত আছেন, আছেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী। অনিল চন্দ, মৈত্রেয়ী আর চিত্রিতা। অমল হোমের কলম এবং রজনী-গন্ধার গুচ্ছ কবির হাতে তুলে দিয়ে প্রণাম করলুম। আমার হাতে ছিল কয়েকখানি কোনো একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকার 'রবীন্দ্র জয়ন্তী সংখ্যা'। তার প্রথম পৃষ্ঠায় ছিল শিল্পীর হাতে আঁকা কবির একখানা ছবি। গ্রাম-নগর-দেশ-মহাদেশ এবং দিগ্‌বলয় ছাড়িয়ে কবির মাথা উঠেছে ধবলাধার গৌরীশৃঙ্গের মতো,—হিমালয়ের চেয়ে তিনি বড়,—পৃথিবীর উচ্চতম শিখর তিনি! ছবি-খানার মধ্যে এই চেহারাটা প্রকাশ করতে চেয়েছিলুম। উক্ত দৈনিক পত্রিকার সংগে তখন আমি যুক্ত।

কবি বললেন, সমগ্র মহাভারতখানা তিনি নিজের হাতে একবার লিখতে চান, অত বড় এপিক্‌ পৃথিবীর কোনো কালের কোনো সাহিত্যেই নেই। কিন্তু কাজটি দুরূহ, অনেকদিন সময় লাগবে। হীরেন বাবুকে আনিয়েছি, ও'র সাহায্য নেবো।—

তাঁকে যখন জানালুম, এখানকার এক ঠাকুরবাড়িতে এসে উঠেছি, তিনি বললেন, এ ছাড়া আর ঠাকুরবাড়ি কোথায় হে?

সৌম্য সুহাস কবির মুখে স্বাস্থ্যের রক্তিমাভা প্রকাশ পাচ্ছে। আলো এসে পড়েছে সেই সুন্দর শ্মশ্রুময় মুখে। নরম একখানা এলায়িত দেহের উপর ছড়ানো।

আরাম কেদারায় তিনি অর্ধশয়ান। ... কথার পরে তাঁর পরিহাস সরস ... ছুটতে লাগলো। বলা বাহুল্য, ... আমিই বিশেষ হচ্ছি ... এবং হাসির রোল উঠছে এপাশে ... সেদিন আমাকে রাগে ... ছিলেন।

... সন্ধ্যায় তিনি দেশবাসীর ... তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি ... কবিতা বেতারযোগে পাঠ ... সেজন্য কলকাতার বেতারকেন্দ্রের ... কলকাতা-কালিম্পঙের মধ্যে ... বন্দোবস্ত করেছেন। ... টেলিফোন ছিল না, এই ... প্রথম উদ্বোধন। সেজন্য ... টেলিফোনের খুঁটি ... তার খাটানো হয়েছে গত ... থেকে। টেলিফোনের কর্তৃপক্ষ ... অর্থব্যয় করেছেন। কবি তাঁর ... বসে টেলিফোনে কবিতা ... এবং বেতার কর্তৃপক্ষ তাঁর ... নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ... এই ছিল বন্দোবস্ত। ... বিশেষজ্ঞ এসেছেন ... উপলক্ষ্যে। তাঁদের মধ্যে ... মজুমদার ছিলেন ... মাঝে মাঝে একবার ... আড্ডা দেন, একথা ... কিন্তু আজ কাজ- ... হয়ে যাবে কিনা, এই ... রথীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকের ... উদ্বেগও ছিল। মাঝখানে ... একবার আমাকে বললেন, ঠিক ... বসে যন্ত্রে মুখ রেখে ... একবার ডাকুন তো? আপনার ... না ফাটে তবে আর ভয় নেই। ... উঠলুম। ওটা যে কবির ... কিন্তু নৃপেনবাবুর ফরমাশ ... হোলো। নধর মখমল বসানো ... বসে কয়েকবার ডাকলুম, হ্যালো, ... হ্যালো......?

... থেকে তৎক্ষণাৎ জবাব এলো ... (O.K.)

... সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা কিংবা আটটা। একটা বুঝি বেল্ বাজলো! কবি উঠে গিয়ে বসলেন যন্ত্রের সামনে। আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালুম। বাইরে আমাদের পাশেই রয়েছে রেডিয়ো যন্ত্র,—কলকাতা ঘুরে কবির কণ্ঠ ফিরে আসবে এই যন্ত্রে,—সেই আমাদের রোমাঞ্চ পুলক। কবি মাত্র পনেরো মিনিটকাল তাঁর কবিতা পাঠ করবেন। বাইরে থেকে আমরা কাচের দরজা বন্ধ ক'রে দিলুম। শব্দ না ঢোকে।

একটি আলোর নিশানা পেয়ে কবির দীর্ঘ শীর্ণ এবং দীপ্ত কণ্ঠের মূর্ছনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো—

"আজ মম জন্মদিন। সদ্যই প্রাণের প্রান্তপথে
ডুব দিয়ে উঠেছে সে বিলুপ্তির
অন্ধকার হতে
মরণের ছাড়পত্র নিয়ে।"

আমাদের পায়ের নীচে কালিম্পঙ থর থর করতে লাগলো কিনা সেকথা তখন আর কারো মনে রইলো না। জ্যোৎস্না ছিল সেদিন বাইরে। একটা মায়াচ্ছন্ন স্বপ্নলোকের মধ্যে আমরা যেন হারিয়ে যাচ্ছিলুম। ভুলে গিয়েছিলুম পরস্পরের অস্তিত্ব।

"আজ আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন, একাসনে দোঁহে বসিয়াছে,
দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে
জীবনপ্রান্তে মম—
রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যুষের শুকতারা সম,
এক মন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনা।"

* * *

"ইন্দ্রের ঐশ্বর্য নিয়ে হে ধরিত্রী,
আছ তুমি জাগি
ত্যাগীরে প্রত্যাশা করি, নির্লোভেরে
সঁপিতে সম্মান,
দুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে তব দান
বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে। ক্ষুব্ধ যারা,
লুব্ধ যারা,
মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার
দৃষ্টিহারা,
শ্মশানের প্রান্তচর, আবর্জনাকুণ্ড তব ঘেরি
বীভৎস চীৎকারে তারা রাত্রিদিন করে
ফেরাফেরি
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি।"

* * *

"বৃথা বাক্য থাক্। তব দেহলিতে শুনি
ঘণ্টা বাজে,
শেষ প্রহরের ঘণ্টা; সেই সঙ্গে ক্লান্ত
বক্ষোমাঝে
শুনি বিদায়ের দ্বার খুলিবার শব্দ সে অদূরে
ধ্বনিতেছে সূর্যাস্তের রঙে রাঙা
পূরবীর সুরে।"

* * *

"......দিনান্তের শেষ পলে
রবে মোর মৌন বীণা মূর্ছিয়া
তোমার পদতলে।—
আর রবে পশ্চাতে আমার নাগকেশরের চারা
ফুল যার ধরে নাই, আর রবে খেয়াতরীহারা
এপারের ভালোবাসা—বিরহস্মৃতির অভিমানে
ক্লান্ত হয়ে রাত্রিশেষে ফিরিবে সে পশ্চাতের
পানে।"

মাত্র পনেরো মিনিট, কিন্তু আমরা বাইরে ওই জ্যোৎস্নানিমীলিত হিমালয়ের দিকে নিমেষনিহত চক্ষে চেয়ে কেমন যেন আদিঅন্তহীনকালের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলুম। সহসা পাশ থেকে যেন কতকটা রুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে রথীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, যাক্, উনি গলা ছাড়া দেননি!

এরপর কবি মাত্র তিন বছর তিন মাস জীবিত ছিলেন!

ডাঃ দাসগুপ্ত এবং তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে যেমন ক'রেই হোক আমাকে এযাত্রা বিদায় নিতে হোলো। আকাশে মেঘ রয়েছে এখনও, হয়ত বা কোথাও বৃষ্টিও নামতে পারে। কিন্তু আজ আমি স্থির করলুম, ভূপেনবাবুর গাড়ী ছেড়ে দিয়ে এবার অন্যপ্রকারে সিকিম রওনা হবো। পথের চেহারাটা আমার জানা নেই, সুতরাং যদি অন্যপ্রকারে তাঁর গাড়ীর কোনো ক্ষতি হয়, সে বড় লজ্জার কথা। অনেক ভেবেচিন্তে ড্রাইভারকে গাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বললুম। প্রথমটা সে একটু বিস্মিত হলো, তারপর রাজি হোলো। ফিরবার পথে—যদি নিরাপদে ফিরি—তবে ভূপেনবাবুর ওখানে হয়ে যাবো ব'লে দিলুম। সে গাড়ী নিয়ে চ'লে গেল।

ভারতবর্ষের বাইরে হোলো সিকিম, তাই একটা মিশ্র মনোভাব রয়েছে আমার। অজানা অপরিচিত সেই পথ। কিন্তু সেইটিই ত' বড় আকর্ষণ! আমি মোটর বাসে গিয়ে উঠে বসলুম।

ক্রমশ

পাকিস্তানের একটি গ্রাম। শিখপ্রধান বাঁর্ধক্যু গ্রাম। উত্তর সীমানায় গুরুদ্বারা, তা ছাড়িয়ে বাবলা খেজুরের বন আর ফণীমনসা ছাওয়া পতিত জমি গ্রামান্তরের শস্যক্ষেত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। উঁচু বলে এদিকটায় নয়ানজুলি আনা যায়নি, জলাভাবে পতিত রয়ে গেছে। মুলতান-লায়লপুর শাহীসড়ক থেকে বেরিয়ে আসা কাঁচা উপপথ গুরুদ্বারাকে বুড়ি ছুঁয়ে গ্রামে ঢুকেছে আর মিলেছে গিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানার বাঁধানো বড় কুয়াটার ওধার দিয়ে চলে যাওয়া আর একটি পথের সঙ্গে।

সকাল না হতেই কুয়োতলীতে মেয়েদের ভীড় হয়। সোমত্ত বউ-ঝি স্নান করতে আসে না বড় একটা। পর্দা নেই, আব্রু আছে তো। কিন্তু প্রগল্‌ভা কিশোরীদের কে থামাবে? কুয়ার চাতালে বসে গা ধোয়া; কেমন কি সই দিয়ে চুল ঘষঘষ করে মাথা ঘষে। আর ওদের কলকল হাসির রোল, চলচল চলার হিল্লোল ক্ষেতমুখো কোন কোন যুবক চাষার চলা থামিয়ে দেয়। কোনো বয়ীয়সীর কটুবাক্যে সম্বিত ফিরে পেয়ে ঈষৎ হেসে, বার দুই অকারণে গোঁফ চুমরে হেলে-দুলে আবার এগোয় রূপসীরা, কিন্তু যতক্ষণ না কুয়াতলা চোখের আড়াল হয় সে ফিরে তাকায় বারবার।

কুয়াতলাই গ্রামের প্রাণকেন্দ্র। বলতে নেই, গুরুদ্বারার গুরুত্বও বুঝি তার কাছে ম্লান হয়ে যায় দৈনন্দিন প্রয়োজনের আপেক্ষিকতায়।

অথচ সেদিন সন্ধ্যায় কুসুমকৌর যখন জল তুলে চাতাল থেকে নেমে এল, তখন কুয়াতলীর চারিধার জনমানবহীন। সংক্রান্তি তিথি। গুরুদ্বারায় ... হচ্ছে। বুড়োরা ... নিয়ে মেয়েরা সেইখানে। ... খামারে খামারে পুরোদমে ফসল ... চলছে, অধিকাংশ পুরুষরা সেখানে ... কুয়াতলীতে এই অসময়ে ... তবু এতটা নির্জনতা কুসুম ... করেনি।

জোয়ান ভাই কৃপালসিং ... পর থেকে এক বিশেষ ... গুরুদ্বারার কোন অনুষ্ঠানেই কুসুম ... আর যেতে ইচ্ছে করে না। সখীরা ... করলে বলে, "বুড়ো যদি কিছু চায় দেবে? মুন্না ছোঁড়া কি কিছু পারে ... যায় না কুসুম কিছুতেই। আর ... তো, গেলে কি চলে? এই ... ধরো না। বুড়ো জল চাইল। ... গিয়ে দেখি না জলের বড় ...

উল্টে দিয়ে, সমস্ত উঠনময় কাদা পাজীটা কোথায় পালিয়েছে। তাই সময় কুয়ায় আসতে হ'ল। নিজের চোখ ঠারে কুসুম। হ্যাঁ, জল ই তো আসা! ওর চোখ কিন্তু যেন খ‍ুঁজছে। নাঃ, বড় নির্জন। আর অনর্থক দাঁড়িয়ে থাকা না, বুড়ো নিশ্চয় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে এতক্ষণে।

বুড়ো—শোকতাপদীর্ণ ঠাকুর্দা তেজাসিং—আর নাবালক ভাই এখন তার সম্বল বল সম্বল, দায় য়। মুন্নাকে ছুমিণ্ঠ করে মা তার বছর না ঘুরতে বাপ অম্বালা ছাউনীতে ওলাউঠা য় গেল, আর সামনের শ্রাবণে পূরো হবে ভইয়া সর্দার কৃপাল-খুনের।

পালসিং, গাঁয়ের সেরা জোয়ান, লাঠিতে, তলোয়ারে, ঘোড়-তে, কি বন্দুকের চাঁদমারীতে এ গাঁয়ে, এ গাঁয়ে কেন সারা জেলায়, আর কেউ ছিল কি অথচ গাঁয়ের মুখে কুয়াতলীতে খুন করে গেল তাকে দুর্ধর্ষ ইমামখাঁর দল।

* * *

ছিল গত বছর শ্রাবণের অসহ্য রাত। 'মক্কী' বিছিয়ে বাইরে য়েছে। তিনপ্রহর রাত তখন। গোল হ'ল পশ্চিমদিকে। কটা শব্দ, একটা আর্তনাদ, সঙ্গে অনেকগুলো ছুটে-যাওয়া ঘোড়ার আওয়াজ, তারপর সব চুপচাপ। লোক মশাল জ্বালিয়ে কুয়া-এল—ঐদিকেই. বন্দুকের শব্দ। এসে দেখে, পেটে একটা কটা, গুলী খেয়ে মুখ থুবড়ে কৃপালসিং কুয়াতলীর কাদায়। র হওয়ার আগে একটিবার মাত্র তার। চোখ খুলে কাকে যেন খুঁজে বিড়বিড় করে উচ্চারণ শুধু দুটি কথা। দুটি নাম—উমরী।

রী অর্থাৎ উর্মিলাকৌরের বাপ দরবারাসিং কাছেই দাঁড়িয়েছিল। মাত্রীর মুখে যুবতী কন্যার নাম শুনে বাড়ি ছুটল। কাছেই বাড়ি। গেল আর এল। মেয়ে বাড়ি নেই। গোলমালের সময় ঘুম ভেঙ্গে ইস্তক তার মা তাকে দেখতে পায়নি। শূন্য শয্যা দেখে মনে হয়েছিল তখন সেও হয়ত বা ব্যাপার, দেখতে বেরিয়েছে। আর একবার সবাই মশাল হাতে বেরল, কিন্তু হারানো উমরীর কোন হদিশই পাওয়া গেল না।

বুঝতে বাকি রইল না, ইমামখাঁ কৃপালকে খুন করে উমরীকে নিয়ে উধাও হয়েছে। পুলিসে কিন্তু খবর গেল না। গাঁয়ের মেয়ের ইজ্জত জড়ান ছিল বলেই নয় শুধু, আসলে খুন-জখম তো আক-ছারের ঘটনা। প্রতিবার যদি পুলিস-পেয়াদা আসত তাহলে এতদিনে গাঁয়ের কত মরদের ফাঁসি-কালাপানি হয়ে যেত দু'চারবার।

খুনের বদলে খুন। একটা মাথার বদলে দুটো মাথা। এই তো চিরকালের ধারা। পুলিস কাছারি কী করবে? পরে অবশ্য খবর পেয়ে পুলিস নিজেই এসে-ছিল, এজাহার নিয়ে গিয়েছিল এর তার, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। খানবাহাদুর ইমামখাঁ শুধু প্রবলই নয়, তার পয়সার প্রতাপও কম ছিল না, এ কথা কার না জানা ছিল।

কৃপালের খুন আর উমরীর হরণ—দুটোর যোগাযোগ নিয়ে একচোট গ্রাম্য ঘোঁট হ'ল বটে তবে দরবার সিংকেই সবাই 'ছি' 'ছি' করল একবাক্যে। গাঁয়ের সেরা জোয়ান কৃপাল আর সেরা সুন্দরী উমরী—কবে 'কুড়মাই' হয়ে আছে ওদের—ওরা প্রীত তো করবেই। অনুচিত হলেও, তাই তো স্বাভাবিক। যৌবনের ধর্ম। দরবারাসিংই তো এবছর নয় ওবছর করে মেয়ের বিয়ে পিছিয়ে রাখল। বিয়ে হয়ে গেলে, না ছেলেমেয়ে দুটো এভাবে বনে বাদাড়ে নিশুতি রাতে মিলত, না এই কান্ড হ'ত।

* * *

বছর ঘুরে এল।

কৃপালের হত্যার ঘটনা ধীরে ধীরে সবাই ভুলে যাচ্ছিল। ভোলেনি শুধু কুসুম।...খুনের বদলে খুন! ভাইয়ের রক্তাক্ত দেহের ছবি এক ইমামখাঁর রক্ত-মোক্ষণই মন থেকে মুছে দিতে পারে, আর কিছুই নয়। বুড়ো তেজাসিং কতবার তাকে বলেছে সিতারা সিংএর সঙ্গে বিয়েটা চুকিয়ে নিতে। সিতারা সিং নিজে কতবার তাকে অনুনয় করেছে। মাথা নেড়েছে কুসুম। নাঃ, বিয়ে হ'লে, ছেলেপিলে এলে ভাইয়ের কথা সে হয়ত ভুলে যাবে। বদলা নেবে কে? সিতারা সিং তবু নাছোড়বান্দা।

...কথাটা সেদিন আবার তুলেছিল সিতারা সিং। কৃপালের যাওয়ার অনেক-গুলো মাসের পরের কথা। মাঝামাঝি রাত। চালাঘরে রোমন্থনরত শায়িত বড় মোষটার পিঠে ঠেস দিয়ে বসেছিল ওরা। নিবিড় আলিঙ্গনাবন্ধ। প্রণয়ীর উত্তল প্রেমাবেগে বিহ্বল হয়ে আর একটু হলে বিয়ের কথায় মত দিয়ে ফেলত কুসুম। চকিতে কৃপালের মুখ মনে পড়ে যাওয়ায় নিজেকে বাহুমুক্ত করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল।

"বেশ তো। যেদিন তুমি এসে গ্রন্থ-সাহেব ছুঁয়ে বলবে ইমামখাঁকে সাফ করে দিয়েছ সেদিনই আমি বিয়ের সালোয়ার-কমীজ সেলাই করতে বসে যাব।"

"আমি মারব ইমামখাঁকে?"—প্রায় চমকে উঠেছিল সিতারা সিং।
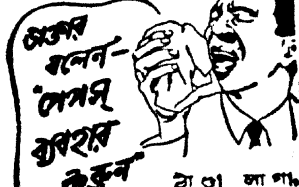
"হ্যাঁ, তুমি নয়তো কে? মুন্না তো এখনো বাচ্চা। আমার হয়ে তুমি বদলা নেবে। কেন পারবে না, না কি তোমার গায়ে খালসার রক্ত নেই? নামর্দ কোথাকার!"

মাথা নিচু করে সিতারা সিং চলে গিয়েছিল।

পরদিন থেকে গাঁয়ে তাকে আর কেউ দেখেনি। তার মা-বাপকে প্রশ্ন করলে জবাব আসত—গাঁয়ে মন বসে না ছেলের, কামকাজের খোঁজে শিয়ালকোট গেছে।

হবেও বা। গাঁয়ের কোন ছেলে কোথায় গেল? কেন গেল? ফিরবে কবে? এই নিয়ে লোকে মাথা ঘামায় না বিশেষ। জোয়ানমরদরা তো এদিক ওদিক হরদমই যাবে, না কি বসে থাকবে ঘরের কোণে? তাছাড়া গাঁয়ের লোক সিতারা সিংকে বড় একটা খাতিরও করত না। অকেজো পুরুষকে কে কবে খাতির করে? বিশ-বাইশ বয়স, অথচ ক্ষেতের কাজে বাপকে সাহায্য করবে না এক কড়া। আচ্ছা, লাঙল ধরতে ভাল না লাগে যা গিয়ে পল্টনে ঢোক! না, তাও নয়। শুধু জোড়াবাঁশী বাজিয়ে, হীর গেয়ে, ভঁয়সার পিঠে চেপে যে ছেলে টই টই করে ঘুরে বেড়ায়, কি সকাল না হতে মদ টেনে বাড়িতে হাঙ্গামা করে, মানীদের মান রাখে না, তাকে কে খাতির করবে? কে নিতে যাবে তার খোঁজ খবর? গ্রাম থেকে গেছে, আপদ গেছে। বাইরের দুনিয়া দেখে সুমতি হোক!

কুসুমের মন কিন্তু টনটন করে বারবার। আহা, অমন করে না বললেই হ'ত। যার বদলা নেওয়ার কথা, বসে সেই দরবার সিংই তো দিব্য রয়েছে। মেয়ের সঙ্গে ঘরের আর গাঁয়ের লাজ গেছে, তাতে কোন পরোয়া নেই—আর সে কিনা পাঠাল সিতারা সিংকে। বেচারা! কে জানে কেমন আছে? নিমেষের জন্য তাকে ভুলতে পারে না কুসুম। ভুলবে কেমন করে? সেই কোন শৈশবে দুজনার কুড়মাই হয়ে আছে। বড় হয়ে ইস্তক দিন গুনছে বিয়ের। কথাই ছিল, কৃপাল আর উমরীর বিয়ের পরই হবে কুসুম-সিতারার। সারা গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো জানত।

কাজকর্ম না করুক কী হীর গাইতে পারত সিতারা সিং, কী [illegible] বাজাত। কতবার না কত মেয়ে মা[illegible] হয়ে গেছে। ওর ঐ গান—

"নি সোনী কুড়িয়ে, দিলা তো[illegible]

আহা কী মধুর! সে কি ভোলা যা[য়]

যায় না।

* * *

দিন যায় দয়িতের পথ চেয়ে। মন[ের] ব্যাকুলতায় মৃত ভইয়ার স্মৃতিও [illegible] ম্লান হয়ে আসে।

হঠাৎ খবর এল লায়ালপুর শহ[রে] ইমামখাঁ নাকি তার নিজের হ[াভেলী]তে খুন হয়েছে। গাঁয়ের মুচী সিংকে মে[রে] গুঁতিয়ে জখম করেছিল। শহরের হা[স]পাতালে পট্টী করাতে গিয়ে [illegible] লাস সে আপন চোখে দেখে এসেছে। [illegible] খুনীর নাকি পাত্তা পাওয়া যায়নি।

আনন্দে আত্মহারা কুসুম এ[ক] ঝপকাও ঘুমোতে পারেনি সে রা[তে]। এ সিতারা সিং, তার সিতারা সিং ছা[ড়া] আর কারো কাজ নয়। বাহ গুরু [illegible] ফতেহ, বাহ গুরুদা খালসা! [illegible] পণ রেখেছেন ওর, মান [illegible] সিতারার। গুরুদ্বারায় [illegible] মানত করল কুসুম।

আরো দিন কয়েক কাটল। প্র[তী]ক্ষা প্রতি অনুপল অসহ্য। সিতারা[র] [illegible] দেখা নাই। কোথায় গেল? হয়[ত] [illegible] করে আছে এখনো! লোকটা [illegible] গোঁয়ার হলে কি হবে, ভিতরে ভিতরে [illegible] ছেলেমানুষ। আপন মনেই হাসে কু[সুম], প্রশ্রয়-প্রসন্ন হাসি।

মন অহরহ ব্যাকুল হয়ে রইল।

একটা ধাবমান ঘোড়ার খ[ুরের] আওয়াজ, কি দূরে পুরুষকণ্ঠের এ[কটা] উদ্দাম হাসি, কি এক কলি গানের [illegible] কি মাঠ পেরিয়ে বাতাস চিরে [illegible] জোড়া-বাঁশীর সুর তাকে চকিত [করে]। কিন্তু কই সে?

ঝরা সোঁদাল ফুলের হলুদ আ[ভা] ছাওয়া কুয়াতলী ছাড়িয়ে ফসল ধূ ধূ মাঠের মাঝ দিয়ে চলে [illegible] সড়কটার দিকে সে প্রায় চেয়ে [থাকে]। তপ্ত ঘূর্ণি হাওয়ায় শুকনো পাতা, ধুলো ওড়ে কোন পথচারীর পায়ে। মনে হয়, ঐ বুঝি আসছে।

কই সে?

বুড়োকে জল দিয়ে, ঘরে ঢুকে ভিজে জ পাল্টাচ্ছিল কুসুম। হঠাৎ ন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিজেরই র দিকে চেয়ে। তন্বী, সুন্দরী তো নক মেয়েই আছে গ্রামে, কিন্তু ওর তে বেশী কি আর কেউ নেই? কেন রী ছিল না? বেহায়া খোশামুদের ছেলেগুলো, যাকে যখন পায় তাকেই হয় "সবার সেরা" বলে স্তুতি র! সত্যই যদি সে ওর চোখে এত রী ছিল, তাহলে বেইমানটা অন্য র প্রণয়কামনায় একটা প্রাণ নিল ? অত মিঠে মিঠে কথা, অত আদর, সোহাগ ভালবাসা কি সবই মিছে ? এত হীন প্রতারক পুরুষেরা হয়? খোলা বুকের উপর চোখের জল কে পড়তে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে কমিজ টেনে মাথার উপর দিয়ে সে সাজোয়ারটা এবার ছেড়ে ফেলল।

পরিপাটি পাঁচ পদ রান্না সারতে রাত য় গেল। বুড়োকে মুন্নাকে খাইয়ে, হসনদের খড়-ভুষি মেখে দিয়ে এল। কৈঠিক অন্য কাজও বাকি রইল না। নিয়মে যন্ত্রের মত কাজ করে গেল ম। দোর বন্ধ করে, বাইরে বিছানো টিতে ঘুমন্ত মুন্নার পাশে যখন ক্লান্ত হ এলিয়ে দিল, রাত তখন অনেক।

নিঝুম রাত্রি। পত্র-পল্লবে মৃদু মর্মর। র উপর ম্লান চন্দ্রালোকিত আকাশ। র মিটিমিটি দিঠির ইশারা। সুপ্ত ন মৃত্যুর মত নিশ্চুপ।

...কে যেন দু'হাত বাড়িয়ে সুমকে বুকে টেনে নিচ্ছে। সেই পরিচিত শের আবেশ, সেই পেশীবহুল দেহের না-মানা আলিঙ্গনের মধুর নিবিড়তা।......কখন ক্লান্ত দু' চোখ জুড়ে ম এসে স্বপ্নলোকে নিয়ে গিয়েছিল সুমকে। সে যেন সিতারা সিংএর বুকে য়ে অজস্র আদর খাচ্ছিল। এত আরামের মধ্যেও বুক উথলে কান্না পায় কেন? এই তো পাশাপাশি ঘাসের উপর শুয়ে আছে সিতারার বুক ঘেঁষে। কিন্তু মাথার উপর আকাশটা ধীরে ধীরে আরো কালো আর ছোট হয়ে আসছে কেন? তারাগুলো হঠাৎ নিষ্প্রভ কেন?...... একটা উল্কা-পাত হল।

আতঙ্কে, ধড়মড়িয়ে উঠে বসল কুসুম। একটা গ্রাম-প্রহরী কুকুর বিকট চিৎকার করছে। কুসুমও আর একটু হলে চিৎকার করে উঠত, পায়ের কাছে বসা সিতারা সিংকে দেখে। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরল না। চাঁদ ডুবে গেছে, তবু চিনতে কষ্ট হল না কুসুমের। সিতারা সিং ওর ডান হাতখানা তুলে নিয়ে একটু চাপ দিল, ছাড়িয়ে নিতে পারল না। সারা দেহ থরথর করে কাঁপছিল। ঘুমঘোরে মুন্না হাত-পা ছুঁড়ল, তারপর ও পাশ ফিরে শুলো। একটু জায়গা পেয়ে সিতারা সিং আর একটু কাছে সরে এসে ওর কোমর এক হাতে জড়িয়ে নিজের দিকে আকর্ষণ করতেই কুসুমের রক্ত-স্রোতে যেন একটা তরঙ্গ বয়ে গেল। এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বলল—"না।"

একটু হাসল সিতারা সিং, তারপর নরম গলায় বলল—"না কেন? ও, এখানে নয় বুঝি? চালাঘরের দিকটায়?"

"না।"—এবার কুসুমের কণ্ঠ দৃঢ়, অচঞ্চল।

"না? না মানে কী?"

"না মানে না।"—ততক্ষণে আর একটু পিছিয়ে বাড়ির দোরের হুড়কো খুলেছে কুসুম। দোর খুলে, খানিক থেমে, মুখ ফিরিয়ে বলল—"চালার দিকে নয়। কুয়া-তলাতে নিমের নীচে। আমি আসছি।"

বুড়োর ঘুম আচমকা ভেঙ্গে গেল নাতনির ডাকে। বেচারার দুই পা প্রায় পঙ্গু। এত গরমেও ভিতরের দালানে ঘুমোয়। তবু ঘুমতে কি দেয় ছাই। কুসুম বলছে পাশ ফিরতে, বন্দুক নেবে সে। মোটা তোশকের তলায় দেয়ালের ধারটায় বন্দুক থাকে। না নিয়ে শুলে বুড়োর আবার ভাল ঘুম হয় না। অনেক কালের বদ অভ্যাস যে।

"এত রাতে বন্দুক কি করবি?"—বুড়োর গলায় বিরক্তি মাখানো।

"জংলী শুয়োর এসেছে একটা। মারব। পাশ ফের না।"

"যা, যা, শুয়ে ঘুমো গিয়ে। মাঝ-রাতে মেয়েছেলে যাবে শুয়োর মারতে। দেবে গুঁতিয়ে পেট চিরে।"

শুক্লে কাকে চেরে তা দেখা যাবে।—এবার জোর করে বুড়োকে পাশ ফিরিয়ে বন্দুক আর টোটার পেটি বার করে নিল কুসুম। দুনলে ভরে নিল দুটো টোটা। সরকারের ইনাম দেওয়া বন্দুক, নির্ভুল নিশানা। কপাল থাকতে তার সঙ্গে কত শিকার করেছে কুসুম।

* * *

নিথর রাতের স্তব্ধতা চিরে দূরে বন্দুকের আওয়াজ হল। দুম, দুম। শুয়ে শুয়ে শুনল বুড়ো, মনটা খুশিতে ভরে উঠল তার। না, মেয়েটা আসল সর্দারণী বটে। আহা, শুয়োরের ভাজা মাংসর সঙ্গে পরেটা—চমৎকার! পরদিনের উপাদেয় আহারের কাল্পনিক আয়োজনে তার রসনা সিক্ত হয়ে উঠল।

গুলীর আওয়াজে গাঁয়ের আর যাদের ঘুম ভেঙ্গেছিল, তাদের কেউই উঠে এল না। ঘর, ঘর বন্দুক আছে, গরমের রাতে কত লোকই তো শিকার করতে বেরোয়—শুয়োর, খরগোস, নীলগাই। খামকা ভাবতে বসলে কি চলে?

কিন্তু ভোর না হতে সারা গ্রাম ভেঙ্গে পড়ল কুয়াতলাতে।

পিঠে গুলীবিদ্ধ সিতারা সিং কুয়া-তলার কালো কাদায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তারই অনতিদূরে মোটা নিম-গাছটার নিচে বন্দুক বুকে ধরেই লুটিয়ে রয়েছে কুসুমকোর—গুলী তার কণ্ঠনালী ভেদ করে বেরিয়ে গেছে।

বারো ঘর একটি উঠোন

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

—১১—

ছুটতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলাই। তার হাঁটু ছড়ে গেছে, কপাল কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে। নাকের ডগায় এসে খানিকটা রক্ত জমাট বেঁধে নোলকের মত ঝুলছে। বাঁ-হাতের তেলো দিয়ে বলাই সেটা মুছে ফেলে। পরনের ময়লা লুঙ্গি ও গায়ের ছেঁড়া গেঞ্জিতে রক্ত লেগে চট্‌চট্‌ করছে। যন্ত্রণায় বলাই চিৎকার করে কাঁদত, কিন্তু বুঝি তার সময় ছিল না। ঘাড় ফিরিয়ে বার বার পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখছে, পুলিসের গাড়ি আছে কি চলে গেছে। না, তখনো গাড়িটা দাঁড়িয়ে। আর দেখতে না দেখতে গাড়ি বোঝাই হয়ে যাচ্ছে ফল সব্‌জি পেঁয়াজ, আলু, পান, বাতাসা, তেলেভাজা খাবার ও চিনাবাদামের ঝুড়ি ঝাঁকা টিন ও ডালায়। রাস্তার ওধারে গেঞ্জি গামছা ও মনোহারী জিনিসের দোকান সাজিয়ে যারা বসেছিল তারাও রেহাই পেলে না। জিনিসপত্রের সঙ্গে সঙ্গে দোকানীকেও পাকড়াও ক'রে পুলিস গাড়িতে তুলছিল। বলাইর মত যারা দোকান ফেলে পালিয়ে গেল তারা অবশ্য বাঁচল। কিন্তু সবাই তো আর দোকানের মায়া ছাড়তে পারে না। 'হল্লা' এসেছে শুনে তাড়াহুড়ো করে কেউ হয়তো দোকান গুটোতে শুরু করে, কিন্তু ইতিমধ্যে হুড়মুড় করে গাড়ি এসে যায় আর পুলিস ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠির গুঁতোয় সব লণ্ডভণ্ড ক'রে দেয়। কিছু জিনিস গাড়িতে ওঠে কিছু রাস্তার ধুলোয় ছড়ে ছিট্‌কে পড়ে।

ঘাড় ফিরিয়ে বলাই তাকিয়ে দেখছিল তার ফেলে আসা বেগুনের ঝুড়িটা পুলিস বুটের ডগা দিয়ে ঠুকছে। ঝুড়িটা কাত হয়ে গড়াতে গড়াতে প্রায় নর্দমার কাছে চলে যায়। বেগুনগুলো অনেক আগেই রাস্তার মাঝখানে ছড়িয়ে পড়েছিল।

'এগুলো গাড়িতে তুললো না?'

'নাঃ, কানা বেগুন সব।' বলাই এই প্রথম শিবনাথকে দেখে ঈষৎ হাসল এবং বাঁ-হাতের তেলো দিয়ে আর একবার নাকটা মুছল।

'তুলত হয়তো,' কে আর একজন শিবনাথের পিছন থেকে বলল, 'গাড়িতে আর জায়গা হচ্ছে না ব'লে ছেড়ে দিলে।' কথা শেষ করে লোকটি হাসে।

'এগুলো নিয়ে লাভ কি।' একজন বলল, 'গরিব লোক সব। দু'চার পাঁচ টাকার জিনিস নিয়ে রাস্তায় বসেছিল, কিন্তু তা-ও তাদের বেচতে দেবে না। দিনে পাঁচবার ক'রে গাড়ি আসছে আর সব লণ্ডভণ্ড ক'রে দিচ্ছে।'

'লাভ আর কি।' গম্ভীর হয়ে শিবনাথ বলল, 'রাস্তার ওপর দোকান সাজিয়ে বসলে ভিড় জমে, গাড়ি ঘোড়া লোকজনের চলাফেরার অসুবিধা।'

'ওকথা বলবেন না, স্যার।' শিবনাথের পিছনের লোকটি চড়া গলায় বলল, 'রাস্তার মাঝখানে তো আর কেউ দোকান নিয়ে বসে না। বসে একেবারে ধার ঘেঁষে। গাড়িঘোড়া লোকজনের চলাফেরা করার অনেক জায়গা থাকে। খামকা বেচারাদের হয়রানি করা।'

'হাতে অন্য কাজ নেই তো, গভর্ন-মেণ্ট কি আর ওমনি বসিয়ে বসিয়ে বাছা-ধনদের খাওয়াবে? তাই কাজ দেখাতে পুলিস এসব কর্ম করে।'

ভিড়ের জন্যে শিবনাথ লোকটার চেহারা দেখতে পেলে না। কিন্তু তা হলেও সে বলতে ছাড়ল না। 'গাড়িঘোড়া লোক-জনের চলাফেরার অসুবিধা ছাড়া আরো একটা জিনিস আছে যা আমাদের বুঝে চলা উচিত। এটা শহর,—এখানে কিছুরই একটা নিয়ম আছে, শৃ[illegible] আছে। দোকানের জায়গায় দোকান থা[illegible] সব্‌জি ফল কাপড়চোপড় সব কিছু [illegible] করার জন্যে বাজারের ভিতর আ[illegible] আলাদা জায়গা ক'রে দেয়া হয়ে[illegible] এলোমেলো ছত্রখান করে শহরময় [illegible] ওটা ছড়িয়ে রাখলে শহরের শো[illegible] থাকে না, তাই পুলিস রাস্তার [illegible] দোকান বসাতে দিচ্ছে না।'

'এটা শহর না, স্যার, শহরতল[illegible]' পিছনের লোকটি দু'পা এগিয়ে এ[illegible]

'ঐই একই কথা।' যেন লো[illegible] দিকে তাকিয়ে শিবনাথ করুণা [illegible] হাসল। 'এখানেও কর্পোরেশনের [illegible] চলছে, আমাদের জল দিচ্ছে, [illegible] ইলেকট্রিক পাচ্ছি, রাস্তা সাফ [illegible] দু'বেলা ঝাড়ুদার আসছে, শহর নই [illegible] কি ক'রে বলছি।' একটু চুপ [illegible] শিবনাথ বলল, 'আসল কথা [illegible] ডিসিপ্লিন মেনে চলি না, ডিসিপ্লি[illegible] বলে আমাদের কিছু নেই, সেজন্যই [illegible] কাজ করি, রাস্তায় দোকান [illegible] পায়খানা ঢুকে [illegible] টিকিট কাটতে গিয়ে মারামারি কর[illegible]

যে লোকটি এগিয়ে এসেছিল [illegible] চুপ ক'রে রইল। পিছনের লোকটি [illegible] 'যে দেশের লোক খেতে পায় না [illegible] ডিসিপ্লিন বোঝে না, ডিসিপ্লিন [illegible] কাকে বলে জানে না।'

'শিক্ষিত লোক হয়ে আপনি [illegible] কথা বলছেন।' শিবনাথ একটু [illegible] গম্ভীর হয়ে বলল, 'ইউরোপ আমেরিকা[illegible] এমন দিন হয় যখন লোকে খেতে পায় [illegible] তাই ব'লে তারা ডিসিপ্লিন রেখে চল[illegible] ভোলে না।'

'ওরা না খেয়েও যা খায় তা আমা[illegible] দেশের লোকের চেয়ে সর্বদাই [illegible] খাওয়া হয়।' যেন লোকটি টিপ্পনি কা[illegible]

একটু রাগের সুরে শিবনাথ ব[illegible] 'আরো বেশি ইল্‌লিটারেটের মত আপ[illegible] কথাগুলো হ'ল।'

'মশাই আপনিই বা কোন্‌ [illegible] লিটারেটের মত কথাগুলো আওড়া[illegible] শুনি।' যে-লোকটি এগিয়ে এসে চুপ ক[illegible]

...ল সে. হঠাৎ চোখ লাল করল। ...লিসকে সাপোর্ট করুন ক্ষতি নেই, ...দ্র লোকের সঙ্গে কথা বলতে ভদ্রভাবে ...া বলবেন, ইতর।'

'এই, আপনি মুখ সামলে কথা ...বেন।' শিবনাথ জামার আস্তিন ...টায়। 'রাস্কেল!'

'ইডিয়ট!'

'মূর্খ!'

'আহম্মক!'

'ননসেন্স!'

'স্টুপিড!'

'আপনি...আপনি...আপনি...' শিবনাথ ...রেজনায় আর কিছু বলতে পারে না। ...ে দাঁত ঘষে।

'তুমি আমার কাঁচকলা করবে, পাঁঠা—' ...তে বলতে সামনের লোকটি স'রে গেল। ...পিছনে যে লোকটি দাঁড়িয়েছিল, ...ও বিড় বিড় করে কি বকতে বকতে ...দের দিকে শেষবারের মত বিষ-...ক নিক্ষেপ করে আগের লোকটির ...েতে কলল।

'অদ্ভুত মেন্টালিটি মানুষের, গায়ে ...ে ঝগড়া করতে আসে।' নিজের মনে ...ল শিবনাথ এবং সমর্থন পাবার ...শা এদিক-ওদিক তাকাল। কিন্তু ...েউ বড় একটা সেখানে ...েই। পুলিসের গাড়ি চলে ...ে আস্তে আস্তে যে যার কাজে সরে ...। বলাই ইতিমধ্যে কানা বেগুন-...লো রাস্তা থেকে কুড়িয়ে ঝুড়িতে তুলে ...টা মাথায় নিয়ে ফিরে এসেছে।

'...দের ঝগড়া থামল।' শিব-...র দিকে তাকিয়ে সে মুখ টিপে ...স।

'...বলো না, যত সব মূর্খ আসে ... করতে।' শিবনাথ একটু হাসতে ...া করল। 'তারপর? আজ আর ...বিক্রী করা হবে না বুঝি।'

'নাঃ।' বলাই মাথা নাড়ল। 'এমনি ...র বাজার, তার ওপর সাতবার হল্লা ...এসে দোকানে ভেঙ্গে দিলে বাজার জমে ...?'

শিবনাথ হঠাৎ কিছু বলল না। বলাইর সঙ্গে সঙ্গে হাটতে লাগল।

'...র বেগুন দিয়েও সুবিধা করতে পারছি না।' হাটতে হাটতে বলাই একবার মুখ খুলল: 'চার পয়সা সের, তা-ও লোকে এখন কিনতে পারছে না।'

'হুঁ,' শিবনাথ গম্ভীরভাবে বলল, 'হার্ড ডেজ্। চাকরিবাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সব কিছুরই অবস্থা খারাপ।'

বলাই কিছু বলল না।

'সাবান দিয়ে বুঝি সুবিধা হ'ল না?' শিবনাথ প্রশ্ন করল।

'নাঃ।' বলাই বলল, 'সারা বিকেল ব'সে থেকে আড়াই সের চালাতে পারলাম না। এক সের বেগুন বেচে ক'পয়সা লাভ থাকে বলুন। এভাবে তিনটে পেট চলে?'

'পাগল!' শিবনাথ মাথা নাড়ল। একটু চুপ থেকে পরে আস্তে আস্তে বলল, 'কিন্তু তোমার সুবিধে ছিল।'

'কি রকম?' বলাই ঝুড়ি-শুদ্ধ মাথাটা ঘোরাল।

'না, বলছিলাম, একটু লেখাপড়া যদি শেখাতে মেয়েটাকে, একটা আপিস-টাপিসে ঢুকে পড়লে দুটো পয়সা রোজগার করে তোমাকে হেল্প করতে পারত।'

বলাই গম্ভীর হয়ে গেল।

'আমি অবশ্য সিনেমায় দিতে বলছি না। কাল সকালে কে গুপ্ত তাই তোমাকে বলছিল না?'

'ওর কথা ছেড়ে দিন। পাগল। পাগলে কী না বকে, ছাগলে কী না খায়।' বলাই ঈষৎ হাসল।

শিবনাথ হাসল।

'এককালে বড় চাকরি করত।'

'এককালে আমারও বড় কারবার ছিল।'

'ও বলছে বেবিকে সিনেমায় দেবে।'

'যা খুশি করুক গে।' বলাই হাসি বন্ধ করল। 'আমার কথা হ'ল কি, শিবনাথবাবু, শেষ পর্যন্ত দেখব। ফলের কারবার গেছে পরে সাবান ধরেছিলুম, সাবানে সুবিধা হয়নি দেখে বেগুন ধরেছি। বেগুনে কিছু না করতে পারলে আমড়া ফিরি করব। যদি তাতেও সুবিধে না হয় লোকের জুতো সাফ করব। আর জুতো সাফ করেও যদি দেখি পেট চালাবার মতন রোজগার হচ্ছে না, তখন চুরি করতে আরম্ভ করব, সিঁদ কাটব, পকেট কাটব, হ্যাঁ চুরিতে সুবিধে না হলে লোকের মাথায় বাড়ি মেরে গলায় ছোরা বসিয়ে টাকা আদায় করব ঠিক করে রেখেছি। উপোস থেকে মরবার আগে একবার শেষ চেষ্টা করব তো, তাই ব'লে ঘরের বৌ আর মেয়ের রূপযৌবন ভাঙ্গিয়ে পেটের ভাতের যোগাড় করতে যাব না।'

কেমন একটা অদ্ভুত গুম্‌গুম্ শব্দ বেরোচ্ছিল বলাইর গলার ভিতর থেকে। তার কথা বন্ধ হবার পরও যেন শব্দটা বাতাসে ভেসে ভেসে চলতে লাগল। শিবনাথ নীরব। দু'জনে খালের ধারে এসে গেল। বলাই আর কথা বলছে না। সন্ধ্যার ঘোর নেমেছে। দূরে কোথায় করাত-কলের ঘস-ঘস শব্দ হচ্ছিল। দম বন্ধ করা ধোঁয়ার চাদরে চারদিক ঢাকা পড়ে গেছে। খালের জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে

জোনাকি পোকাগুলো নাচানাচি করছিল। খেয়া পার হয়ে বলাই বলল, 'আপনি কি এখন ঘরে ফিরবেন?'

'না, আমি একটু বেড়াব।'

'আমি চলি।'

কথা না বলে শিবনাথ শুধু ঘাড় নাড়ল। বলাই বাড়ির রাস্তা ধরল। শিবনাথ উল্টোদিকের রাস্তা ধ'রে হাঁটতে লাগল।

লোকটা সরে যেতে শিবনাথ স্বস্তি-বোধ করল। অশিক্ষিত, তাই এমন গোঁয়ার, ভাবল সে। না খেয়ে মরবার আগে চুরি-ডাকাতি করব। বৌ বা মেয়ের রূপ-যৌবন ভাঙিয়ে পেটের ভাতের যোগাড় করব না। যত নিচের দিকে তাকাচ্ছে শিবনাথ, মানে যেসব জায়গায় শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি, স্ত্রীলোকের সতীত্ব সম্পর্কে পুরুষরা বড় বেশি সচেতন সতর্ক, সতীত্ব যাবে ভেবে বড় বেশি সন্ত্রস্ত সব, এটাই যেন বেশি দেখছে। অমল চাকলাদারকে দেখেছে শিবনাথ, এখন বলাইর কথাগুলো শুনল। মরুকগে। যেমন-তেমন একটা সুবিধে হয়ে গেলেই এ বাড়ির এদের সঙ্গ ত্যাগ করব আমি, শিবনাথ মনে মনে আর একবার প্রতিজ্ঞা করল এবং বেশ একটু জোরে পা ফেলে হাঁটতে লাগল। এক সময় শিবনাথের মনে পড়ে কপাল ও পা কেটে গেছে, রক্ত পড়ছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই বলাইর। শিবনাথ হলে পৃথিবীর আর কিছু ভাবনা ভাববার আগে কাটা জায়গাগুলোতে আইডিন লাগাতে চেষ্টা করত। পয়সা সঙ্গে থাকলে তো কথাই নেই, না থাকলেও ধার-কর্জ করে, ধার-কর্জ না পেলে জুতো, জামা, চশমা—যা হোক একটা কিছু বাঁধা রেখে হলেও টাকা যোগাড় করে একটা অন্তত অ্যান্টি-টিটেনাস্ ইঞ্জেকসন নিয়ে নিত। অর্থাৎ যে জায়গায় সতর্ক হবার যেটি সম্পর্কে সন্ত্রস্ত থাকবার তা থাকত শিবনাথ এবং এখনও তাই আছে। বলা যায় কি, বলা যায় না। হয়তো রাত-ভোর হলে সবাই শুনবে, দেখবে বলাই ধনুকের মত বাঁকা হয়ে বিছানায় মরে আছে। বিছানার পাশে ব'সে বৌ ও মেয়ে কাঁদছে এবং বলাইকে কোনরকম একটা ফার্স্ট-এড্ নিতে বলতে ভুলে গেছে বলে শিবনাথের মনে এখন একটুও অনুতাপ হ'ল না। হয়তো রাগ করে সে শিবনাথের সং-পরামর্শ কানেই তুলত না, মেয়েকে সিনেমায় দিতে কে গুপ্তের মত সে-ও পরামর্শ দিচ্ছে ভাবতে ভাবতে এখন হয়ত ঘরে ফিরছে বলাই। শিবনাথ নিজের মনে হাসল। আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের অজ্ঞতা এবং রুক্ষতা নিয়ে এখানে এই শহরে, শহরতলীতে আরো কত শত লোক আছে, চিন্তা করতে করতে শিবনাথ বড় রাস্তা ছেড়ে বাঁ-দিকের গলিতে ঢুকল।

টিমটিমে গ্যাসের আলোটা আজ বোধ হয় আর জ্বলেনি। কড়ি গাছের নিচেটায় অন্ধকার ছমছম্ করছিল। তার ওপর কুয়াশা এবং পাশের খোট্টা বস্তি থেকে উঠে আসা কাঠের ধোঁয়া। চোখ জ্বালা করে। চোখ বুজে শিবনাথ গলিটা পার হয়ে এসে মাঠে পড়ল। এখানে তারা-ছড়ানো আকাশের নিচে অন্ধকার খুব পাতলা; অন্ধকারকে আর অন্ধকারই মনে হয় না, যেন একটা ঘোলাটে কাঁচ। পরিষ্কার দেখা না গেলেও বোঝা যায় ওখানে একটু দূরে ওটা গাছ কি মানুষ, গরু কি গাড়ি। মাঠ পার হয়ে শিবনাথ কপি-ক্ষেতের ধারে চলে এল। ঝোপটা সে চিনতে পারল। শব্দ না হয় এমনভাবে পা ফেলে আস্তে আস্তে সে ঝোপের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। অনুমান তার মিথ্যা হয় না। একটু সময় কান পেতে রেখে শিবনাথ দু'জনের কথা শুনতে পেল।

'আমি খেয়েছি, তুই খা।'

'আমি তো খেলাম তিনটে, তুই এটা খা।'

'কাশীর পেয়ারা।'

'তা হবে। চার আনায় ছ'টা পেলাম।'

'কোথায় পেয়েছিলি পয়সা?'

'চুরি করেছি।'

ছেলেটির কথা শুনে মেয়েটি একটু সময় যেন ভাবল। তারপর প্রশ্ন করে, 'কাদের ঘরে ঢুকেছিলি, রুচিদির? ওদের খুব পয়সা আছে মনে করিস না।'

'তা চার-ছ'আনা কি আর থাকবে না ঘরে।' ছেলেটি বলল, 'না বাপু, বাড়ির লোকের পয়সা চুরি আমি করি না। শত হলেও আমাদের একটা প্রেস্টিজ আছে এ বাড়িতে। বাবা এত বড় চাকরি করত। আমাকে সন্দেহ করবে ভাবতে মন খারাপ লাগে।'

'যাদের বেশি আছে, তাদেরটা চুরি করতে ক্ষতি কি।' মেয়েটি বলল, 'আমি হিরুদের ঘর থেকে সেদিন চার কৌটো চাল চুরি করে এনেছি।'

'না বাপু, আমি বাড়ির লোকের ঘরে সাহস পাই না।'

'চার আনা কোথায় পেলি?'

'ফেরিওলার ডালা থেকে তুলে নিলাম। ব্যাটা তার জিনিস বিক্রী করে পয়সাগুলো ডালায় রাখে দেখিস না?'

'হুঁ।'

'সবাই যখন এটা-ওটা হাতে নিয়ে দেখছিল, আমিও একটা চা-ছাকনি তুলে দাম জিজ্ঞেস করছিলাম।'

'তারপর?'

'ডান হাতে ছাকনিটা তুলে নিয়ে ওর চোখের সামনে ধরলাম।'

'তারপর?'

'বাঁ-হাত বাড়িয়ে সিকিটা তুলে নিলাম।'

'বেশ পরিষ্কার হাত তোর, তবে আর কারোর ঘরে ঢুকে একটা কিছু তুলে আনতে ভয় পাস কেন?'

'ধেৎ, বাড়িতে সবগুলো ঘরে এত লোকজন।'

'ফেরিওলার সামনে তো লোকজন কম ছিল না।'

'তাই তো সুবিধা হ'ল। ফেরিওলা যদি টের পায়, ওর ত'বিলে চার আনা সট আছে তো এ বাড়ির সবাইকে সন্দেহ করবে, আমার মতন উঠানে এসে সবাই

দাঁড়িয়েছিল দোকান দেখতে। তা ছাড়া ভিড় থাকলেও পয়সার দিকে কেউ চেয়ে ছিল না, কাচের গ্লাস আর আরশি আলতো, চিরুনির দিকে চোখ ছিল সবার।'

'আমি একদিন একজনের একটা জিনিস সরাব।'

'কার শুনি না।' ভয়ানক নিচু গলায় কিশোর প্রশ্ন করল। 'কি জিনিস?'

'মেজদির রিস্টওয়াচ।'

[illegible] কিছুক্ষণ কি ভাবল ছেলেটি।

'চুরি করে এনে তোর কাছে দেব।' [illegible] বলল।

'আমি কি করব?' প্রস্তাবে মনঃপূত হল না রুণুর।

'বিক্রী করবি, বাইরে কারো কাছে [illegible] টাকা আনবি।' ময়না বলল।

রুণু আবার ভাবে।

ফিসফিসে গলায় ময়না বলল, 'আমার [illegible] আর ও-কাজ সম্ভব হবে না। [illegible] একদিন দুজনে রেস্টুরেন্টে [illegible] সিনেমা দেখা হবে।'

'[illegible] জন্যে চুরি করবি।' রুণু [illegible] হাসে। 'দেখিস আবার না [illegible]।'

'[illegible] আমি তের বেশি চালাক।' [illegible] গলা। 'যেদিন এনে ঘড়িটা [illegible] তুলে দেব, সেদিন না আবার [illegible] আমার ভয় করবে বিক্রী করতে, [illegible] পারবে না।'

'[illegible], আগেই তোর ওসব ভাবনা। [illegible] তুই। বিক্রী করে টাকা আনতে [illegible] কি না পারি, দেখবি।'

'[illegible] রেস্টুরেন্টে খাব আমরা?' [illegible] আব্দারের সুরে ময়না প্রশ্ন করল।

'চৌরঙ্গী, চৌরঙ্গীর ভাল রেস্টুরেন্টে [illegible] একদিন তুই আর আমি।' কে গুপ্তর ছেলে সেয়ানা সুরে বলল, 'ইস্ কতকাল [illegible] খাই না জানিস। আগে বাবার চাকরি ছিল, আমরা মুর্গীর মাংস [illegible] ভাত ছাড়া রাত্তিরে অন্য কিছু [illegible]।'

'এখন শুধু মুলো-সেদ্ধ চালাচ্ছিস।' ময়না নীচু গলায় হাসল।

'তোরা মাছ-ভাত খাস্ নাকি।' রুণু খোঁচা দেয়। 'কৈ, গন্ধ পাই না তো একদিনও রান্নার। দেখি, হাতটা শুঁকি। গন্ধ লেগে থাকবে। কি মাছ খেয়েছিলি তোরা দুপুরবেলা?'

'আঃ, ছাড়ো, লাগে।' ময়না ব্যস্ত গলায় ফিসফিসিয়ে উঠল।

'ননীর শরীর, মাখনের শরীর, গলে যায়। দাও এবার গালটা শুঁকি।'

'ইস্, কী অসভ্য!'

সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে ওঠে শিবনাথের। সিরসিরে হাওয়ার সঙ্গে গুলকাপির মিষ্টি গন্ধটা তাকে অনেকক্ষণ ঝোপের পাশে ধরে রাখল।

'কি মশাই, দাঁড়িয়ে কেন, আসুন ভেতরে আসুন।'

দোকানে ঢুকতে গিয়ে শিবনাথ দাঁড়িয়ে পড়েছিল, ইতস্তত করছিল।

কিন্তু রমেশ রায় এমনভাবে আদর-অভ্যর্থনা জানাল যে, শিবনাথ আর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে না থেকে চৌকাঠ পার হয়ে ভিতরে চলে এল।

'বসুন বসুন।' রমেশ রায় নিজের হাতে বেঞ্চটা মুছে দিল। 'তারপর, খবর কি, আজ যেন দেরি করে ফেললেন চা খেতে আসতে।'

আগের দিন এই সময় না আরও আগে এখানে এসে ঢুকেছিল, ঠিক মনে করতে পারল না শিবনাথ। শূন্য বেঞ্চটার এক পাশে সে বসল।

'বৌর!'

'যাই।'

'বাবুকে ভাল করে এক কাপ চা করে দাও।' পর্দার কাছ থেকে সরে এসে রমেশ শিবনাথের সামনে দাঁড়াল।

শিবনাথ আড়চোখে পর্দাটা দেখে একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল।

'বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, কদ্দুর গেছলেন?' রমেশ বেঞ্চের আর এক পাশে বসল।

'মাঠ পর্যন্ত, বেশিদূরে গেলাম না।' শিবনাথ লক্ষ্য করল দোকানে ক্ষিতীশ নেই। 'ছোটভাই বাইরে গেছে বুঝি?' প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ, একটু কাজে পাঠিয়েছি।' রমেশ মাথার গরম টুপিটা খুলে ফেলল। 'আজ ঠাণ্ডাটা কম, কি বলেন।'

'তাই মনে হয়।' ব'লে শিবনাথ হঠাৎ ঘাড় ফেরাতে দেখল, পর্দা সরিয়ে চা নিয়ে আসছে কে গুপ্তর মেয়ে। শিবনাথকে দেখে আগের দিনের মত ততটা লজ্জাবোধ করছে না যেন ও, বরং একটু হাসতে চেষ্টা করছে।

এই হাসতে চেষ্টা করাটাই বেবির ভুল হ'ল, হয়তো একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল পেয়ালাটা টেবিলে রাখতে গিয়ে। টেবিলের কোণায় বাড়ি খেয়ে ওটা উল্টে ওর হাত থেকে নিচে পড়ে গেল। ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল গরম চা, আর পেয়ালার ভাঙ্গা টুকরো।

এক সেকেন্ড। এক সেকেন্ড চুপ থেকে সবটা দৃশ্য দেখল রমেশ রায়। তারপর দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে গিয়ে বেবির বেণী ধরে এমন জোরে টান মারল যে, ও ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল।

'ইয়ার্কি করতে আসিস এখানে, ছোটলোক, ছোটলোকের মেয়ে!' রমেশ গর্জন করে উঠল। 'চা নষ্ট হ'ল, একটা পেয়ালা ভাঙ্গল আমার, জানিস একটা পেয়ালার কত দাম?'

মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে বেবি। দুই হাতে মুখ ঢাকা। কাঁদছে কি? শিবনাথ ঠিক বুঝতে পারল না। হয়তো লজ্জায় মুখ ঢেকেছে, ভাবল সে।

'আবার দাঁড়িয়ে ঢং করা হচ্ছে।' রমেশ আবার ওর বেণীতে হাত দেয় কিনা শিবনাথ আশঙ্কা করল; কিন্তু তা না করে গলায় একটা ধাক্কা মেরে বেবিকে পর্দার ওপারে পাঠিয়ে দিয়ে রমেশ চিৎকার করে বলল, 'যা, চা করে নিয়ে আয়। বাবু কতক্ষণ বসে থাকবেন।' হুকুম শেষ ক'রে সে টেবিলের কাছে ফিরে এল। শিবনাথের সঙ্গে চোখাচোখি হতে রমেশ অল্প হাসল।

'একটু শাসন না করলে বেড়ে যায়, বুঝেছেন তো, আমি রোজ মুখ খুলি না, রোজ গায়ে হাত তুলি না; কিন্তু বেয়াদপি দেখলে, বেসামাল হয়েছে দেখলে টেম্পার ঠিক রাখতে পারি না।'

'তা তো ঠিকই, সত্যি কথা।' মাথা ঈষৎ আন্দোলিত করল শিবনাথ [illegible] একটু হাসতে চেষ্টা করল। 'চার ছ'আনা একটা পেয়ালার দাম।'

'একটা পেয়ালা!' শিবনাথের কাছে [illegible] মধ্যে মুখ ঢোকাতে চেষ্টা করে [illegible] ফিসফিসিয়ে উঠল: 'চা-চিনি কিছু দি[illegible] আমি কুলোতে পারছি না মশাই [illegible] করব। ঠেকেছে, বিপদে পড়েছে। [illegible] হলেও তো ভদ্রলোকের মেয়ে!'

'তা তো ঠিকই।' শিবনাথ [illegible] মাথা নাড়ল।

'না হ'লে আমি কি আর [illegible] বাইরের একটা ছেলেটেলেকে মাইনে দি[illegible] রাখতে। বরং আমার আরো দু'টো [illegible] কাজের সুবিধে হ'ত।'

'তা তো হ'তই।'

'কিন্তু লোকে তো আর [illegible] না, শুধু দেখছে, বলাবলি করছে [illegible] পয়সায় আমি কে গৃহস্থের মেয়েকে [illegible] খাটাচ্ছি।'

একটু বিস্মিত হয়ে শিবনাথ [illegible] দিকে তাকাল। [illegible] মেয়েকে দিয়ে [illegible] ঝি-চাকরের কাজ করানো হচ্ছে [illegible] ওর মা ওর বাবার অনুমতি [illegible] এতে? প্রশ্নটা যখন মনের [illegible] চাড়া করছে, তখন বেবি চা [illegible] এবার আর হাসি নেই, [illegible] মুখ। বাটিটা টেবিলে [illegible] রেখে পর্দার দিকে সরে দাঁড়িয়ে [illegible] রায় গম্ভীর গলায় বলল [illegible] এখন ঘরে যা।'

বেবি ঘুরে দাঁড়ায়।

'চা খেয়েছিস?'

বেবি ঘাড় নাড়ল।

'একটা মগে করে চা তৈরী [illegible] নিয়ে যা। তোর মা চায়ের জন্যে [illegible] করছে।'

বেবি ঘাড় কাৎ করল।

'কেক-বিস্কুট আজকে [illegible] কিছু নিবি না।'

'না।' অস্ফুট শব্দ করল বেবি [illegible] রমেশের দিকে না তাকিয়ে আস্তে [illegible] পর্দার ওপারে চলে গেল।

(ক্রমশঃ)

বর্ষার বর্ষণ

শ্রীসরলাবালা সরকার

[illegible] হ'ল বর্ষার বর্ষণ!

> “[illegible] তাপে ছিল নিমগন
> ধরণী তপস্বিনী
> রুক্ষ দগ্ধ পাংশু ধূসর
> [illegible] শুষ্ক উষর”

কবি রৌদ্রের দারুণ দহনের ভিতর [illegible] তপস্বীর মত যেন তপস্যায় রত হইয়াছিলেন, সজল জলদের [illegible] করিয়া।

> “[illegible] আসন হ'ল তার রথ,
> শুনি গর্জন রথ ঘর্ঘর”

মেঘের গর্জনে যেন বর্ষার আগমনসূচক [illegible] ধ্বনিত হইতেছে, কবি [illegible] সেই বরষাত্রা নবঘন শ্যাম [illegible] মেঘকে বন্দনা করিয়াছেন—

> “নম নম নম করুণাঘন নম হে।
> নয়ন স্নিগ্ধ অমৃতাঞ্জন পরশে,
> জীবন পূর্ণ সুধারস বরষে,
> তব দর্শনধনসার্থক মন হে,
> অকৃপণ বর্ষণ করুণাঘন হে।”

কবি [illegible] বিরহিণীরূপে [illegible] করিয়াছেন, ওগো বিরহিণী, [illegible] অবসান হইল, এতদিন [illegible] মনের মধ্যে গানের [illegible] করিয়াছিলেন, আজ সমগ্র [illegible] আবির্ভূত হইবে। আবির্ভূত [illegible] শ্যাম [illegible] করিয়া, কুঞ্জকানন পাখী [illegible] মুখরিত করিয়া, [illegible] কেবল বাহিরের ধরণীই নয়, [illegible] অন্তরবাসিনী বিরহিণীকেও লক্ষ্য [illegible] এই উক্তিগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাই বর্ষার আগমনে পুলকিত [illegible] উঠিলেন,

> “হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
> ময়ূরের মতো নাচে রে!”

কবি বলিলেন,

> “মেঘের মাঝে মৃদঙ্গ তোমার
> বাজিয়ে দিলে কি ও—
> ঐ তালেতেই মাতিয়ে আমায়
> নাচিয়ে দিও দিও!”

“বর্ষামঙ্গল” রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা। বহু দিন পূর্বে প্রথম যখন “বর্ষামঙ্গল” শুনিয়াছিলাম ও দেখিয়াছিলাম, তখন মন [illegible] হইয়া গিয়াছিল। কেয়া ফুলের গন্ধে আবার কেয়া গাছের ঝাড়েও [illegible] অভিনয়-মণ্ডপ, কদম্ব পুষ্পের [illegible] রচিত হইয়াছে, যূথিকা ফুলের গন্ধে চারিদিক ভরপুর। স্বর্গীয় দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর গান ধরিলেন গুরু গুরু মেঘ-গর্জনের তালে যেন তাল মিলাইয়া,

> “[illegible] নীল অম্বর উপরে বাজে,
> যেন রে প্রলয়ঙ্করী শঙ্করী নাচে।”

আবার গাহিলেন,—

> “অম্বরে নব নীল নীরদ-পরিকীর্ণ দিগন্তে,
> চিত্ত মোর পথহারা, কান্ত বিরহ কান্তারে।”

গাহিলেন,—

> “এসো এসো হে তৃষ্ণার জল
> ভেদ করো কঠিনের ক্রূর বক্ষতল,
> কল কল ছল ছল।”

আর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করিলেন,—

> “হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে—
> ময়ূরের মতো নাচে রে!”

আবৃত্তির ছন্দে ছন্দে অভিনয়-মণ্ডপ মুখর হইয়া উঠিল, আর শ্রোতাগণের হৃদয় ও নব মেঘ দর্শনে ময়ূরীর মত নৃত্য করিতেছিল সেই ছন্দের তালে তালে।

অতীতের সেই অভিনয়ের দিন, কিন্তু আজিও সে দিনের স্মৃতি মনের অতীত হয় নাই।

বর্ষা এবং বিরহের আকুলতা যেন একই সূত্রে গ্রথিত। বৈষ্ণব কবিগণ বর্ষার সাথে বিরহকে এমনভাবে মিশাইয়া দিয়াছেন যে, বর্ষা মনে করিতে গেলেই মনে পড়ে কৃষ্ণবিরহে আতুরা শ্রীরাধিকা। মনে পড়ে—

> “এ ভরা বাদর মাহ ভাদর,
> শূন্য মন্দির মোর!”

মহাকবি কালিদাস আষাঢ়ের নবীন মেঘকে বিরহীর প্রিয়া-সম্বোধনে মর্ম বেদনার বার্তাবহনকারী দূতরূপে কল্পনা করিয়াছেন। আবার বৈষ্ণব-কবি নবীন মেঘের নবঘন শ্যাম রূপকে নিখিল জনের চিরবাঞ্ছিতরূপে কল্পনা করিয়াছেন। নবঘন নীরদবরণ বলিতে শ্রীরাধিকার প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। আর গোপ-বালা শ্রীরাধিকা,—তিনিই তো চির-আকাঙ্ক্ষিতকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া যাঁহারা অন্য সকল আকাঙ্ক্ষা তুচ্ছ করিয়া ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্তরের প্রতিমূর্তি-স্বরূপা।

“প্রথম আষাঢ়ে” নামে একটি কবিতার প্রথম প্যারাটি এইরূপঃ—

> প্রথম আষাঢ়ে বরষা যখন তার
> এলাইয়া দিল নিবিড় কেশের রাশি,
> শ্যামল কুঞ্জে ফুটিয়া উঠিল যবে
> যূথিকা ফুলের শুভ্র মধুর হাসি,—
> ঝঞ্ঝা বাতাস হা হা হা হা করি—
> কাহার বিরহ জানিল বিশ্ব ভরি,
> বহু অতীতের কি ব্যথা উঠিল ভাসি!
> ওগো নবঘন-নীরদ বরণ মোর,
> বঁধু আমার! আমার চিত্তচোর!
> চাতকী তোমার কত শত যুগ হতে,
> সঘনে চাহিয়া রয়েছে গগন-পথে,
> ঢালো কি দিবে না শীতল সলিল ধারা
> চির জনমের দারুণ পিপাসা নাশি?

আমি পিপাসার্তা চাতকী, ওগো নবঘন নীরদ, বন্ধু আমার, তোমার বর্ষিত কৃপাবারি ভিন্ন এ পিপাসা তো মিটিবার নয়। এ পৃথিবীতে আছে বহু জলাশয় বহু স্রোতস্বতী নদী, কিন্তু মেঘের বারি ভিন্ন আর কিছুতেই তো চাতকীর চির-জনমের, জন্ম-জন্মান্তরের পিপাসা মিটিবে না।

বৈষ্ণব-কবি তাঁহার চির-অভীষ্টকে নবঘন শ্যামসুন্দররূপে কল্পনা করিয়াছেন। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, নব অনুরাগিনী শ্রীরাধা যখন মেঘের দিকে চাহিতেছেন, তখন যেন তাঁহার প্রাণবন্ধুকেই দেখিতে পাইতেছেন,—

"এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসাঞা চুলি
হসতি নয়নে চাহে মেঘপানে
কি কহে দুহাত তুলি।"

নবীন মেঘ যেন নূতন করিয়া বিরহিনীর মনে জাগ্রত করিতেছে প্রিয়তমের বিরহ:—

"নবীন আষাঢ়ে যতবার চেয়ে দেখি
আকাশ প্রান্তে নবীন মেঘের পানে,
তোমারি বিরহ নূতন হইয়া কেন
ততবার জাগি উঠিছে আমার প্রাণে!
কতদিন গেছে,—গেছে চলে কত রাতি,
মনোমন্দিরে কবে নিভে গেছে বাতি,
অচেতন প্রাণ, জাগে না বাঁশীর গানে।
ওগো নবঘন নীরদ বরণ মোর,
বন্ধু আমার, আমার চিত্তচোর,
আবার মেঘের গুরু গুরু গরজনে
গৃহ ছাড়ি মন যেতে চায় কেন বনে?
বিস্মৃতি ফুলে গাঁথিয়া স্মৃতির মালা
আবার হৃদয় ধাইছে তোমারি পানে।"

মেঘ-গর্জ্জন জাগাইতেছে অচেতন প্রাণে চেতনা। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, এই মেঘের গর্জন এমন এক আহ্বান যে, সে যেন গৃহবিলাসীকে 'ঘরছাড়া' করিতে চায়। কমলাকান্ত তাঁহার দপ্তরে 'একটি গীত' নামক নিবন্ধে "এসো এসো বঁধু এসো, আধ আঁচরে বসো" নামক একটি গীতের আলোচনায় বলিয়াছেন,—

"যখন এই গান প্রথম কর্ণ ভরিয়া শুনিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল নীলাকাশ-তলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত গাই। ...জগতের সর্বত্র এই রব—"এসো, এসো, বঁধু এসো।" সর্ব-কর্মের এই মন্ত্র—"এসো, এসো, বঁধু এসো"। জড়-জগতে ইহাই আকর্ষণ। বৃহৎ গ্রহ উপগ্রহকে ডাকিতেছে, "এসো, এসো বঁধু এসো।" সৌর-পিন্ড বৃহৎ গ্রহকে ডাকিতেছে—"এসো এসো বঁধু এসো।" জগৎ জগদন্তরকে ডাকিতেছে—"এসো এসো, বঁধু এসো।" পরমাণু পরমাণুকে অবিরত ডাকিতেছে—"এসো এসো বঁধু এসো।"...জগতের এই গম্ভীর অবিশ্রান্ত ধ্বনি—"এসো এসো বঁধু এসো।" কমলাকান্তের বঁধু কি আসিবে?"

এই চিরন্তন আহ্বানই নবঘন নীরদ বরণের বংশীধ্বনি। মেঘের গর্জ্জনে, বজ্রের হুঙ্কারে সেই ধ্বনিই ধ্বনিত হয়। কোনও গ্রাম্য-কবি গাহিয়াছেন,—

"ওপারে বসে বাজাও বাঁশী—
এপারে বসে শুনি,
ওরে, আমি তো অবলা নারী
সাঁতার নাহি জানি।"

আবার আর একজন কবি বলিয়াছেন,—

"তোদের বাঁশী বাজে,—বাজে কানের কাছে।
ওরে আমার বাজে হিয়ার মাঝে।"

বর্ষা-রজনী,—বনপথ পিচ্ছিল, কর্দম ও কণ্টকময়;—সেই পথে অভিসারে চলিয়াছেন শ্রীমতী, বংশীধ্বনির আহ্বানে—বাঁশী তো কানের কাছে নয়, তাঁহার হিয়ার মাঝেই বাজিতেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভানুসিংহের পদাবলী গানে বলিয়াছেন,—

"সাওন গগনে ঘোর ঘন ঘটা, নিশীথ যামিনীরে,
কুঞ্জপথে সখি কৈসে যাওব অবলা কামিনীরে!
উন্মদ পবনে যমুনা তর্জ্জিত ঘন ঘন গর্জ্জিত
মেহ;
দমকত বিদ্যুত পথতরু লুণ্ঠিত থর হর
কম্পিত দেহ।"

কিন্তু সেই কম্পিত-দেহেই বালিকা রাধা চলিয়াছেন একাকী বনপথে,—

"দ্বিপ্রহরা ঘোরা বরষা রজনী
দুয়ারে শতেক বাধা,
গহন বিপিনে চঞ্চল চরণে
একাকী চলিছে রাধা।"

বর্ষার বারিধারা ঝম্ ঝম্ করিয়া ঝরিতেছে সেই ঝরার ছন্দে ছন্দে মানবমনে ঝঙ্কৃত হইতেছে প্রিয় মিলনের আকাঙ্ক্ষা। রবীন্দ্রনাথের 'শ্রাবণের পত্রে' তাহারই পরিচয় পাই,—

"বন্ধুহে, পরিপূর্ণ বরষায় আছি তব ভরসায়,
কাজকর্ম কর সায় এসো চট্‌পট্।
শামলা বাঁধিয়া নিত্য তুমি [illegible] বেণী,
একা পড়ে মোর চিত্ত [illegible]

'প্রথম আষাঢ়ে' কবিতার শেষ পাতায়—

তিমিরা রজনী নিদ্রিতা সবে [illegible],
জলদের কোলে ঘুমাইছে [illegible]
চারিধারে ঝরে প্রবল [illegible]
ঝম্ ঝম্ ঝম্ শোনা যায় সেই [illegible]
এমন নিবিড় তিমির [illegible]
বন্ধু আমার, আমার চিত্ত[illegible]
দেখ, দেখ, কত কাঁদিছে [illegible]
অকারণে মোর অবিরল আঁখি [illegible]
আশা নাই কিছু, তবুও [illegible]
মনে হয় যেন আছ তুমি [illegible]
মনে হয় ওই কে এলো [illegible]
শুনি মৃদু মৃদু কাহার [illegible]
তিমির মগনা নিদ্রিতা [illegible]
জলদের ক্রোড়ে ঘুমাইছে [illegible]

সমস্ত ঋতুর মধ্যে [illegible] বসন্ত ঋতুকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, কেননা শীতের পরে বসন্ত [illegible] ধরিত্রীকে নব-পুষ্প পল্লবে [illegible] সাজাইতে। আর বর্ষা [illegible] গ্রীষ্মের পর শীতল জলধারা [illegible] নৃত্যপরা নটিনীর বেশে। বর্ষা [illegible] বিশ্বের তাপহারিণী [illegible] বরদায়িনীর বেশে। [illegible] রূপিণী সৃষ্টিধ্বংসকারিণী [illegible] বেশে।

এই বর্ষা আগমনের [illegible] আয়োজন। বৈশাখী ঝড় তাহার [illegible] পথ পরিষ্কার করিবার ভার [illegible]

"অম্বর প্রান্তে যে দূরে,
ডম্বরু গম্ভীর সুরে
জাগায় বিদ্যুৎ ছন্দে—
আসন্ন বৈশাখী [illegible]"

এই বৈশাখী ঝড়ই জানায় বর্ষার [illegible] আগমন বার্তা—মেঘের ডম্বরু রবে।

আরম্ভ হয়েছে বর্ষার বর্ষণ। কবি গাহিয়া উঠিলেন,—

"কুঞ্জকানন জাগ্রত হোক
আজি বন্দনা সংগীতে—
শিহর লাগুক শাখায় শাখায়,
মাতন লাগুক শিখীর পাখায়,
তব নৃত্যের ভঙ্গীতে।"

কবি বলিলেন, "শ্যাম বন্ধু এই [illegible] কেননা এই যে পৃথিবীর শ্যামল-শ্রী এ ত তারই দান। তাই তাহার বসিবার যোগ্য আসন শ্যামল তৃণাসন। টগর, করবী,

… আর চামেলী ফুল ছড়াইয়া দাও …নের চারিপাশে। বনপথ দিয়া …ছে মনোরঞ্জন বর্ষা, জয় জয়ধ্বনি …সেই মরুজয়ী বীরকে অভ্যর্থনা … মল্লার রাগে মেঘের ধ্বনির সঙ্গে …মিলাইয়া বর্ষা আবাহনের গান কর।

কবি বলিলেন—"ওই দেখ, মেঘের … কোলে বলাকা শ্রেণী চলিয়াছে … নিরুদ্দেশ যাত্রায়। সুদূর হইতে … আসিয়াছে ওদের প্রাণে? …শার দুঃসাহস উহাদের উদাসীন … তাই গতির মত্ততার পাগলামীতে … মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ওরা … বাসা ছাড়িয়া চলিয়াছে অজানার … ওদের ভয় একেবারেই দূর হইয়া … সংসার জড়তা দূর হইয়া … ওদের অলক্ষ্যেতেই লক্ষ্য, তাই … পিছন ফিরিয়া তাকায় না। … দূর পথের পথিক এই মেঘের … বলাকারই দল ঘরছাড়া মানব- … দিন পরে উহাদের জন্য আহ্বান … বর্ষার এই অভিনন্দনকে … আর একটি সুরের ঝংকৃত … কবির বীণাতন্ত্রীতে:— … বর্ষিছে!

… হয় গর্বিত, হয় … প্রলয়ংকরী, আবার তিনিই … বর্ষণ করে শস্য-শ্যামল … ডুবাইয়া দিতেছে, … সেই ধরণীকে শস্যশালিনী …

… কি নামিয়া সেই কল্যাণময়ী … পৃথিবীতে, যে ধারা পৃথিবীর … সকল বিচ্ছেদ, বিদ্বেষ … যে ধারা প্রেমরূপে প্রাণে …বর্ষণ করিবে, জাগাইবে আকুল … প্রাণে প্রাণে, "এসো এসো … এসো" এই আহ্বান-গীতি নিখিল … প্রাণে প্রাণে ধ্বনিত হইবে।

… কি নব-বর্ষার নবীন মেঘের … গরজনে সেই আহ্বান, যে … প্রবাসী হয় নিরুদ্দেশের যাত্রী, … মানব-মনকে মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় … দুষ্কর তপস্যার পথে, যে … শ্রীমতী রাধা কুল-মান-লাজ-ভয় … অবহেলায় ত্যাগ করিয়া বাহির … শ্যামচন্দ্রের অভিসারে?

উড়িষ্যার মন্দির স্থাপত্য

প্রভাতকুমার দত্ত

সূর্যমন্দির : কোনারক

ভারতবর্ষের মন্দির-স্থাপত্যের ঐশ্বর্যময় ইতিহাসে উড়িষ্যা বিশিষ্টতম স্থান অধিকার করে আছে। বস্তুত কাশ্মীর যেমন মনোরম হ্রদ ও নয়নাভিরাম উদ্যানের জন্য বহির্জগতে পরিচিত, তেমনিভাবে উড়িষ্যাকে মন্দিরের দেশ বললে অত্যুক্তি হয় না। মন্দির নির্মাণের যে বিভিন্ন রীতি ভারতে এক সময়ে বিকাশ লাভ করেছিল, তাতে উড়িষ্যা তার নিজস্ব অবদান যুগিয়েছে। মন্দিরের রীতিগত অনন্যবৈশিষ্ট্য এবং সংখ্যা এই দুই দিকের বিচারেই ভারতের অন্যান্য স্থানের তুলনায় উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠত্ব চোখে পড়ে। রাজপুতানা, মধ্য ভারত কি দক্ষিণ ভারতে অনেকগুলি সত্যিকার ভালো মন্দির আছে, কিন্তু তা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, উড়িষ্যার মত একটা ব্যাপক ও ঘনসন্নিবিষ্টভাবে অবস্থিত নয়। উড়িষ্যার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য তথা মানুষের প্রকৃত পরিচয় মেলার একটা চমৎকার মাধ্যম হচ্ছে তার শিল্পকলা। আর উড়িষ্যার এই শিল্পকলার মূল ভিত্তিই হচ্ছে তার মন্দির। ধর্ম সংক্রান্ত স্থাপত্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তা সবক্ষেত্রেই সামাজিক প্রেরণা উদ্ভূত আত্মিক সাধনার ফল। ভারতের বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য যুগের স্থাপত্য, কি, ইউরোপের বাইজেনটিন ও গথিক স্থাপত্য তারই নিদর্শন। এখন আত্মিক সাধনা জিনিসটা মানুষ ও তার সমাজকে সমগ্রভাবে নিয়েই পূর্ণ। সুতরাং ধর্ম-সংক্রান্ত স্থাপত্যের চর্চার মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে বহু পরিমাণে জানা হয়ে যায়। উড়িষ্যা সম্পর্কে একথা তো বিশেষ-ভাবে সত্য; কারণ আগেই বলেছি এটি হচ্ছে 'মন্দিরের দেশ'।

একটা কবিতা কিম্বা একটা উপ-ন্যাসের মত মন্দির হচ্ছে অখণ্ড সৃষ্টি। তাকে খণ্ড খণ্ড করে উপভোগ করা যায় না। তবে ভাষার যেমন ব্যাকরণের দিকটাকে আমরা একেবারে বাতিল করতে পারি না, তেমনি মন্দিরের পরিপূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য তার গঠনের বিভিন্ন দিক জানা প্রয়োজন। ভারতবর্ষের মন্দির-স্থাপত্যের রীতি সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত, যথা—নাগর, দ্রাবিড় ও বেশর। নাগর রীতি উত্তর ভারতে, বেশর দাক্ষিণাত্যে এবং দ্রাবিড় দ্রাবিড় দেশ অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত ছিল। নাগর অর্থাৎ উত্তর ভারতের মন্দিরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার ক্রুশাকার ভূমি-পরিকল্পনা এবং বক্ররেখাবিশিষ্ট চূড়ার [illegible] উপস্থিতি। দ্রাবিড় মন্দিরের প্রধান [illegible] বিষয় হচ্ছে তার পিরামিডাকার [illegible] কয়েকটি তলায় বিভক্ত হয়ে ক্রমশ [illegible] দিকে ছোট হয়ে গেছে। [illegible] ততটা গুরুত্ব নেই, কারণ [illegible] উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের রীতি [illegible] থেকে সৃষ্ট। সুতরাং মন্দির-স্থাপত্যে [illegible] শাস্ত্রিক তিনটি রীতি মূলতঃ [illegible] দাঁড়ায়। নাগর রীতি বিন্ধ্য পর্বত [illegible] উত্তর ভারতের বিস্তৃত স্থানে [illegible] করে। একটি বিরাট ভূখণ্ডে প্রচলিত থাকায় স্বাভাবিক রূপেই এর [illegible] আঞ্চলিক বিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। অঞ্চলগুলিতে স্থানীয় অবস্থা [illegible] রীতির প্রভাবে নাগর পদ্ধতির [illegible] পরিমার্জন সংঘটিত হয়। উড়িষ্যার আমরা যে মন্দির-স্থাপত্য [illegible] তা উত্তর ভারতের নাগর রীতির একটি আঞ্চলিক পরিমার্জন। যে কথা আমরা আগেই বলেছি—উত্তর ভারতে নাগর পদ্ধতির যে সমস্ত আঞ্চলিক বিবর্তন ঘটে, শিল্পরসের বিচারে উড়িষ্যার রীতিই বোধ হয় তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। উত্তর ভারতে কয়েকটি জায়গায় নাগর রীতির এক
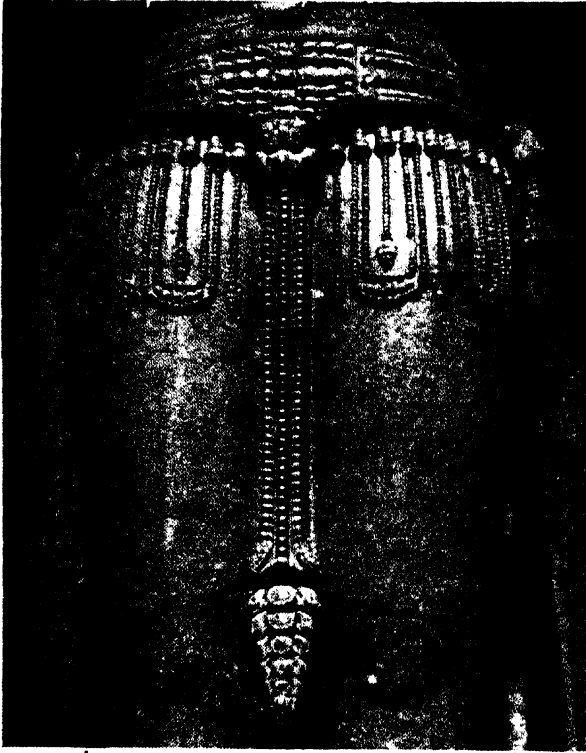
সূর্যদেবের কটিভূষণ

ধর্মানুষ্ঠানে পবিত্র বস্তু বলে পরিগণিত। মন্দিরের একেবারে চূড়োয় থাকে ধ্বজা বা আয়ুধ, যা দেখে মন্দির কোন্ দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত তা বোঝা যায়। এখন পরিকল্পনার দিক থেকে গর্ভগৃহ ও জগমোহনের ভিতরের অংশ বর্গাকার, কিন্তু বাইরের দিকে দেয়ালে আমরা ঠেস্ বা আলম্ব লক্ষ্য করি। প্রত্যেক দেওয়ালে একটি করে ঠেস্ বা আলম্ব থাকলে সমগ্র দেয়ালটি খাড়া-ভাবে তিনভাগে বিভক্ত (যাকে রথ বা রথক বলা হয়) হয়ে যায় এবং এই ধরনের মন্দিরকে তাই ত্রিরথ মন্দির বলা হয়। এমনিভাবে প্রত্যেক দেয়ালে যদি দুটি, তিনটি অথবা চারটি ঠেস্ বা আলম্ব থাকে, তবে মন্দিরগুলিকে যথা-ক্রমে পঞ্চরথ, সপ্তরথ বা নবরথ বলা হবে। দেয়ালের ঠেস্ বা আলম্বের জন্য উড়িষ্যার মন্দিরগুলির ভূমি নক্সা ক্রুশাকার। মন্দিরের উচ্চতার ব্যাপারে উড়িষ্যার মূল রীতি হচ্ছে শিখরের উচ্চতা হবে গর্ভগৃহের প্রস্থের তিনগুণ অর্থাৎ ১ঃ৩ এই অনুপাত। এই রীতি অবিশ্যি অপরিবর্তিত থাকেনি। কারণ উড়িষ্যায় বিভিন্ন সময়ে ১ঃ৪, ১ঃ৫ এমন কি ১ঃ৭ অনুপাতবিশিষ্ট মন্দিরও নির্মিত হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীতে তৈরি পরশুরামেশ্বরের অনুপাত ১ঃ৩, ত্রয়োদশ শতাব্দী মধ্যবর্তী সময়ে তৈরি কোণরকের অনুপাত হচ্ছে ১ঃ৭। যাই হোক এই হলো উড়িষ্যার স্থাপত্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগত সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

উড়িষ্যায় প্রাচীন এবং অপেক্ষা-কৃত কম পুরানো অসংখ্য মন্দির চোখে পড়ে। পথচলতি রাস্তার ধারে ঢেলা বা নুড়ির মত উড়িষ্যায় মন্দিরের ছড়াছড়ি। সমস্ত মন্দিরের পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয় এবং তার প্রয়োজনও নেই। উড়িষ্যার মন্দিরের যে মূল তাৎপর্য তা গ্রহণ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সুতরাং মন্দিরের কয়েকটি বিশিষ্ট ও প্রতিনিধিমূলক উদাহরণ বেছে নিয়ে আলোচনা করলে সমগ্র জিনিসটি পরিষ্কার বোঝা সম্ভব হবে। এই হিসাবে উড়িষ্যার প্রতিনিধি-মূলক মন্দিরের মোট তিনটি ভাগ ধরে নিয়ে আলোচনা করতে পারি। এই তিনটি ভাগ হচ্ছে যথাক্রমে ভুবনেশ্বর মন্দির, পুরীর মন্দির ও কোনারক মন্দির। প্রাচীনত্ব ও গঠন বৈশিষ্ট্যের জন্য ভুবনেশ্বরের কথা প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। ভুবনেশ্বরের অনেক মন্দির আছে, কিন্তু তার মধ্যে বিশিষ্ট হচ্ছে পরশুরামেশ্বর, মুক্তেশ্বর, লিঙ্গ-রাজ, রাজরাণী, বৈতাল দেউল, ব্রহ্মেশ্বর ও অনন্ত বাসুদেব। এদের পরশুরামেশ্বর সবচেয়ে প্রাচীন। এটি নির্মিতকাল সপ্তম শতাব্দী। উড়িষ্যার মন্দির স্থাপত্যের প্রথম নিদর্শন হিসাবে এই মন্দিরটিকে লক্ষ্য করা যায়। এটি ত্রিরথ দেউল এবং শিখরটি চতুষ্কোণ। খর্বাকৃতি। নাগর রীতির অনুগামী এর শিখরের সঙ্গে এটির কোন পার্থক্য নেই। লম্বা ও আয়তাকার জগমোহন দুটি ঢালু ছাদবিশিষ্ট। এটি মূল মন্দির নির্মাণের কিছুকাল পরে সংযোজিত হয়। এ প্রকার জগমোহন উড়িষ্যায় অন্য বৈতাল দেউল ছাড়া আর কোথাও চোখে পড়ে না এবং উড়িষ্যার মন্দির স্থাপত্যের মূল রীতিরও অন্তর্ভুক্ত নয়। গঠনের দিক থেকে এর পরে বৈতাল দেউল উল্লেখ করতে হয়। এটির পরিকল্পনা উড়িষ্যার রীতি থেকে একেবারে ছাড়া-ছাড়া। এর গর্ভগৃহ আয়তাকার ও চূড়াটি অদ্ভুত ধরনের। জগমোহনটি আয়ত, তবে চারকোণে দেওয়ালের গায়ে রেখমন্দিরের ক্ষুদ্রাকার প্রতিরূপ আর চূড়া শিলানয়ুক্ত হওয়ায় বৈতাল দেউল অনেকটা দাক্ষিণী অর্থাৎ দ্রাবিড় স্থাপত্যের সমগোত্রীয়। মহাবালীপুরমের ভীম

সমগোত্রীয়। এটি আকারে ছোট এবং জগমোহন ও সঙ্গেই আরো দু একটি গৃহের পিরামিডাকার ছাদের ক্রমশ উপর দিকে উঠে যাওয়ার যে ভঙ্গি, তা খজুরাহোর অনুরূপ। ব্রহ্মেশ্বর মন্দির লিঙ্গরাজের ঠিক আগেকার ধাপ অর্থাৎ লিঙ্গরাজে উড়িষ্যার স্থাপত্যের যে বৈশিষ্ট্যগুলি চরম সার্থকতা লাভ করেছে, তারই ইঙ্গিত আমরা ব্রহ্মেশ্বরে পাই। এছাড়া ভুবনেশ্বরের সিদ্ধেশ্বর ও কেদারেশ্বর মন্দির দুটিও অনুপম সৃষ্টি।

এর পর আসে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের কথা, যার সঙ্গে চৈতন্যের জন্মভূমি বাঙলার অনেক মানুষ পরিচিত। লিঙ্গরাজের মত পরিণত গড়ন-রীতি বিশিষ্ট এই মন্দির উচ্চতায় আরো বিরাট প্রায় ৩১০ ফিট। চতুষ্কোণ এক স্থানের মধ্যে চারটি অংশ যথা মূল দেউল, জগমোহন, নটমণ্ডপ ও ভোগমণ্ডপ নিয়ে মন্দির পরিকল্পনা সম্পূর্ণ। সাদা রঙের চুনকামের জন্য এই মন্দিরকে White pagoda বলা হয়ে থাকে। জগন্নাথের মন্দির আকারে এবং উচ্চতায় বিরাট, তবে লিঙ্গরাজের মত এর সেই মনোরম গভীরতা নেই। বোধ হয় পরবর্তী কালে মন্দিরটির বহুবার সংস্কার হওয়ায় আসল ঔজ্জ্বল্য চাপা পড়ে গেছে। তবে উড়িষ্যার বিভিন্ন মন্দিরের মধ্যে তীর্থযাত্রীদের ভিড় এখানেই সবচেয়ে বেশী। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালে রাজা প্রথম নরসিংহ তাঁর রাজ্যের বারো বছরের সমস্ত রাজস্ব ব্যয় করে কোণারকের সূর্য মন্দির বা ব্ল্যাক প্যাগোডা নির্মাণ করান, যা শুধু ভারতের নয় পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্পদ। বিমান, জগমোহন, নটমন্দির ও আনুষঙ্গিক ভাস্কর্য সমেত এই মন্দিরটি রথের আকারে ৪৬৫×৫৪০ ফিট একটি প্রাঙ্গণের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। এখন অবিশ্যি কালের ধ্বংসলীলা কাটিয়ে কেবল জগমোহনই দাঁড়িয়ে আছে। কোণারকের মূল বিমানের উচ্চতা ছিল ২২৫ ফিট। এখানে বিমান, জগমোহন, নটমণ্ডপ ও ভোগমণ্ডপ ভুবনেশ্বরের মত এক সারিতে সংলগ্নভাবে নয়, আলাদা আলাদাভাবে নির্মিত। এখন যে জগমোহন শুধুমাত্র দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার কারুকার্য থেকে বোঝা যায় যে, চারটি গৃহের ধূলি পরিমাণ স্থানও ভাস্কর্য আর খোদাই কার্য থেকে বাদ পড়েনি। তাছাড়া মন্দিরের বিরাট চত্বরে ছিল অরুণ স্তম্ভ (বর্তমানে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সামনে সংস্থাপিত) এবং এখনও রয়েছে গজসিংহ, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির আশ্চর্য সুন্দর ভাস্কর্য মূর্তি। কোণারকের মন্দির আঙ্গিকভাবের বস্তু-

বাদ্যরতা সুরসুন্দরী

গ্রাহ্য প্রকাশেই অতুলনীয় নয়, এর নির্মাণ কৌশলও নিখুঁত। কোণারকের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে জীবজগতের সমস্ত কিছু বৈচিত্র্য বিধৃত। অথচ এই বৈচিত্র্যকারো স্থাপত্য কৌশলের প্রসাদে অদ্ভুত এক সমগ্রতার সূত্রে গ্রথিত। আলোচ্য মন্দিরের বাইরের কারুকার্য অনুধাবন করলে দেখি যে, তলার অংশে রয়েছে সাধারণ জৈব অস্তিত্বের নানা বিষয়ের আলেখ্য। এর মধ্যে মানুষ, প্রকৃতি ও প্রাণিজগত কোনটাই বাদ পড়েনি। মন্দিরের উপরের দিকে কিছু কারুকার্যের শুধু গুণগত পরিবর্তন হয়নি, তার সংখ্যাও কমে এসেছে। কোণারকের জগমোহনের উপরের অংশে আমরা কেবল পাই নৃত্যরতা সুরসুন্দরীদের মূর্তি। মন্দিরের আরো উপরে অর্থাৎ চূড়ায় কোন কারুকার্যই নেই, আছে শুধু আমলক শিলা আর কলস। কারুকার্যের এই পদ্ধতি থেকে এইটুকুই বোঝা যায় যে, মানুষ জগত ও জীবনকে পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করে অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধির ভিত্তিতে তার আত্মিক বিকাশকে চরিতার্থতার পথে নিয়ে যেতে পারে। কোণারকের স্থপতি আর ভাস্করেরা মিলে সূর্যদেবের বন্দনায় সাতরঙা আলোর প্রতীক সপ্তাশ্ববাহী রথের অনুকরণে কল্পনা করেছিলেন। এই পার্থিব রূপের মধ্য দিয়ে সূর্যের আরাধনা জগতের শিল্পভাণ্ডারকে আলোকে উদ্ভাসিত করেছে, ছন্দ আর গাম্ভীর্যময় [illegible] উড়িষ্যার সমুদ্রসৈকতে এক [illegible] সঙ্গীতের ধ্বনিরূপ সৃষ্টি হয়েছে। ভারতীয় স্থাপত্যের বিশিষ্ট [illegible] শ্রীসরসীকুমার সরস্বতীর [illegible]

"The Sun temple at Konarak [illegible] presents the crystallised and accumulated experience of several hundreds of years and illustrates in every respect, the fulfilment and finality of the Orissan architectural movement".

কোণারকের সূর্য মন্দিরের পর উড়িষ্যায় প্রথম শ্রেণীর মন্দির [illegible] নির্মিত হয়নি। [illegible] মন্দিরের নির্মাণ [illegible] উড়িষ্যার [illegible] স্থাপত্যের [illegible] বাস্তুশিল্পকলার, [illegible] সহজ গাম্ভীর্যময় [illegible] পরিচয়হীন [illegible] যে শিল্পসম্ভার সৃষ্টি করে গেছে [illegible] আজও আমাদের বিস্মিত [illegible] রেখেছে। কাশ্মীর থেকে [illegible] পর্যন্ত ভারতের যে [illegible] মন্দিরের ইয়ত্তা নেই। এই সমস্ত মন্দিরের নির্মাণ রীতিতে বৈচিত্র্য, [illegible] সবই আছে। কিন্তু সেই একটি জিনিস [illegible] হচ্ছে শিখরের পরিধির [illegible] উচ্চতার গাম্ভীর্য। এটা আছে বলেই উড়িষ্যার স্থাপত্যের মর্যাদা এত উ[illegible] স্তরের। জীবনধর্মী শিল্প সাধনার [illegible] সর্বব্যাপী রূপ আমরা উড়িষ্যায় পাই, তা দেশ ও কালের সীমানা ছাড়িয়ে সর্বমানবের উত্তরাধিকার হিসাবে পরিগণিত বলা চলে।

[এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত ফটোগুলি শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত]

বিচারাধীন ছিল। ধার্য তারিখের কিছু পূর্বে সাহেব আমার মাতামহকে মোকদ্দমার সমস্ত বিষয় বুঝিয়ে দিয়ে তাঁর হাতে সাত হাজার টাকা দিয়ে বললেন, "তোমার যাতায়াতের জন্য নৌকা ঠিক করাই আছে। আর এই নাও সাত হাজার টাকা, এর সবটা খরচ করতে হলেও মামলা জিতে আসা চাই। তোমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে বলেই এত বড় দায়িত্বের ভার তোমাকে দিচ্ছি। কোন দিক দিয়ে কোন রকম কার্পণ্য করো না।"

দাদামহাশয় সিলেটে গিয়ে সাহেবের প্রদত্ত অর্ধেক টাকা দিয়ে সে মামলা নিষ্পত্তি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই সময় তাঁর সিলেটে অবস্থানের সংবাদ পেয়ে তাঁর মা আপন দৈন্য ও সংস্কারাভাবে গৃহাদির চরম দুর্দশা জানিয়ে খবর পাঠান। তাঁর মা তখন সিলেট থেকে পনর মাইল দূরে আপন পিত্রালয়ের কাছে বসবাস করছিলেন। মায়ের এই আকুল আবেদন সন্তানের মনে অপরাগতার দুঃখ ও ক্ষোভের আলোড়ন তুলবে এ আর বিচিত্র কি! তখনও মোকদ্দমার খরচ বরাদ্দ থেকে ৩৫০০ টাকা উদ্বৃত্ত হয়ে তাঁর জিম্মায় রয়েছে। মায়ের দুর্গতি ও নিজের অসহায়তা চিন্তা করে মনে চাঞ্চল্যের অবধি নেই। পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারা বিবেকের আঙ্গিনায় ভৈরব নৃত্য শুরু করেছে। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব উচিত অনুচিতের প্রাচীর ভেঙে চুরমার করে দিতে চাইছে। কি কর্তব্য? মনিবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে মায়ের দুঃখ দূর করার কর্তব্য পালন, না নিয়োগকারীর বিশ্বাসের সম্মান রেখে চিরদুঃখিনী মাকে জীবনসংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ফেলে রাখা? অবশেষে বিবেকের জয় হল ও অস্থিরচিত্তে তিনি মাঝিমাল্লাদের আদেশ দিলেন শিলচরের দিকে অবিলম্বে নৌকা ভাসাতে। মায়ের কাতর মুখ মনে উঁকি ঝুঁকি মারা সত্ত্বেও দুর্বলতার পুনরাবির্ভাবের ভয়ে এ যাত্রা মাকে দেখে যাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁকে দমন করতে হলো। শিলচরে পৌঁছেই তিনি সাহেবের সঙ্গে দেখা করে কিঞ্চিৎ উষ্মার সঙ্গেই বললেন, "মোকদ্দমায় আপনার জয়লাভ হয়েছে, টাকাও সাড়ে তিন হাজার উদ্বৃত্ত হয়েছে; সমস্ত বুঝে নিয়ে আমাকে বিদায় দিন। কারণ আমি আর চাকুরি করতে অনিচ্ছুক।"

হঠাৎ এ মনোভাবের কারণ জানবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা সাহেব জেনে নিলেন ও পাগলামি পরিহার করে আমার মাতামহকে কাজ করে যেতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার প্রলোভনের সম্মুখীন হলে হয়ত তিনি জয়ী হতে পারবেন না, এই সন্দেহ প্রকাশ করে দাদামহাশয় কাজে যোগ দিতে বার বার অসম্মতি প্রকাশ করতে লাগলেন। সাহেবের স্নেহ ও উপরোধ মত বদলাতে তাকে বাধ্য করল। নিদারুণ দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়ে এই আত্মসংযম ও প্রলোভনের নিরোধ ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁর জয়যাত্রার সূচনা করে। জীবনের যা কিছু সম্পদ, যা কিছু প্রতিষ্ঠা, যা কিছু প্রতিপত্তি তিনি অর্জন করে ছিলেন এই কঠোর পরীক্ষা থেকেই তার উৎপত্তি। তাই মনে হয় আমাদের জীবনসংগ্রাম একটি বিশেষ পরীক্ষা কেন্দ্র। যে এই সংগ্রামে সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পারে সর্ব নিয়ন্তা ভগ[illegible] তাকে উদার হস্তে পুরস্কৃত করেন।

উপরোক্ত ঘটনা থেকে দাদামহাশয়ের অন্তরের পরিচয় পেয়ে ও চরিত্রের দৃ[illegible] দেখে সাহেব যে শুধু বেতন বৃদ্ধি করল[illegible] তা নয় পরন্তু তিনি গোপনে দাদামহাশয়ের নামে একটি তহবিল করে মাসে মা[illegible] নিয়মিতভাবে কিছু কিছু টাকা গচ্ছি[illegible] রাখতে শুরু করলেন। দাদামহাশয়ের অজ্ঞাতে এই গচ্ছিত তহবিল [illegible] ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয়ে উত্তরো[illegible] বৃদ্ধি পেতে লাগল। কয়েক বছর পর পূর্বোল্লিখিত যন্ত্র নির্মাণ কারখানা বেলফাস্টে স্থাপন করার [illegible] করে ডেভিডসন সাহেব যখন [illegible] করতে মনস্থ করলেন, তখন তিনি [illegible] সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিশাল ব্যবসা [illegible] মহাশয়কে বিক্রী করে যাওয়ার ইচ্ছা প্র[illegible] করলেন। বিস্ময়াভিভূত হয়ে দাদামহা[illegible] শুধু প্রশ্ন করলেন—

"আমার সঙ্গে এ পরিহাস কেন [illegible] কি? আপনার এ ব্যবসা কিনতে [illegible] টাকার প্রয়োজন তার সামান্য [illegible] জোগাড় করা আমার পক্ষে সম্ভবপর [illegible]।"

সাহেব কিন্তু মৃদু হাস্য করে [illegible] তিনি বললেন, "তুমি শুধু তোমা[illegible] হাজার দুই টাকা সংগ্রহ কর, [illegible] ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।"

সাহেবের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে কতকটা অবিশ্বাসের [illegible] দাদামহাশয় অনেক কষ্টে দুই হাজার টাকা সাহেবের হাতে এনে দিলে, সাহেব এক খানা দলিলের খসড়া বের করে দেখালেন যে, তাঁর ব্যবসাটি তিনি দশ হাজার টাকা মূল্যে দাদামহাশয়ের কাছে বিক্রী করেছেন। তখন তিনি দাদামহাশয়ের কাছে গোপন তহবিলের রহস্য উদ্ঘাটিত করে দেখালেন যে এই তহবিলে তাঁর আট হাজার টাকা গচ্ছিত আছে। সুতরাং মূল্যের জন্য তাঁকে আর ভাবতে হবে না। এরকম লাভজনক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায় তখনকার দিনেও [illegible] কেউ ২৫০০০ টাকা মূল্যে কিনতে সহজেই স্বীকৃত হত। কত বড় মহাপ্রাণ হলে অধীনস্থ কর্মচারীকে একরূপ বিনা মূল্যে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দিতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আর দাদা মহাশয়কে বলতে শুনেছি পাছে তাঁর

চারদিকে যা কিছু দেখে তাতেই নিজের মনে রঙ মাখাতে চায়। রঙের সংগতি বা সামঞ্জস্য তখন তার বিচারের মধ্যে আসে না। বয়সের পরিণতির সংগে সংগে দেখা ও জানার ব্যাপকতা ও জীবনের অভিজ্ঞতা দৃষ্টিভংগীর বিবর্তনে আংশিক সহায়তা করে। অনেক সময় বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে ব্যক্তিগত ধারণা ও মনোভাবের পরিবর্তনও ঘটায়। মানুষ জীবন-সংগ্রামের যত সম্মুখীন হতে থাকে তার চিন্তাধারাও তত ক্রম-বিকাশ লাভ করে।

আর এই চিন্তা করার ক্ষমতা থেকেই জ্ঞানের উন্মেষ। পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের যে ছবি ও রূপ মনের গহনে প্রতিফলিত হয় জগৎ সম্বন্ধে চিন্তার তা কাঁচামাল ব'লে ধরে নেওয়া যায়। জীবনের অভিজ্ঞতা লাভের সংগে সংগে সেই ছবি শুধু রঙ বদলায়। চিন্তা, জ্ঞান ও প্রতিভার সমন্বয় যে মানুষে সঞ্জাত হয় তাকেই আমরা অসাধারণ পর্যায়ে গণ্য করি। আমার মাতামহকে আমি এই শ্রেণীভুক্ত বলে মনে করতাম। তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব ও তাঁকে কেন্দ্র করে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রভাবে আমার ভবিষ্যৎ জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিল বলেই তাঁর প্রসংগ বিশদভাবে আলোচনা করতে হল।

শৈশবে বা বাল্যে মামার বাড়ি আমার যাতায়াত বিরল ছিল। যে দু' একবার যাওয়া আসা করেছি তখন পর্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে বিচার করা বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণাগুণ উপলব্ধি করার মত মানসিক উৎকর্ষতা লাভ আমার হয়নি. তাই যা কিছু তখন দেখা বা শোনা তা চোখের ভিতর দিয়ে ছবি দেখার মতই স্থূল-দৃষ্টির গণ্ডি অতিক্রম করে মনে কোন ছাপ ফেলতে পারেনি। তবে সেই সময়ের একটিমাত্র ঘটনা, তার অনুভূতি তার চিরজাগরূক স্মৃতি নিয়ে পরবর্তীকালে আমার জীবনধারার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। যে সময়ের ঘটনা সে সমসাময়িককালে চা বাগানের জন্য "চুক্তিবন্ধ শ্রমিক" (Indentured Labour) প্রথায় "আড়কাটির" সাহায্যে শ্রমিক সংগৃহীত হত। চলতি ভাষায় এদের বলা হতো "গিরমিটি কুলী"। গিরমিট শব্দ শ্রমিকদের পরিভাষায় Agreement-এর অপভ্রংশ বলেই মনে হয়। 'গিরমিটির' বিস্তৃত বিবরণ যথাস্থানে দেওয়া যাবে। আপাততঃ উপস্থিত প্রসংগের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই উল্লেখ করছি। এইসব মজুর সাধারণত তিন বৎসরের জন্য চুক্তিবন্ধ হয়ে আসত, যদিও চুক্তিনামার শর্তাদি সম্বন্ধে তারা সব সময়ই অজ্ঞ ছিল। একবার চা বাগানের চতুঃসীমায় প্রবেশ করে "গিরমিটি" চা শ্রমিকদের কাছে, সেকালের দিনে, চিরজীবনের জন্য নিষ্ক্রমণের পথ দুরারোহ পর্বত লঙ্ঘন অপেক্ষাও সংকীর্ণ ছিল। এমন অবস্থায়ও যখন একদিন অন্দরমহলে খবর পৌঁছল যে, একজন সুদর্শনা পলাতকা শ্রমিক রমণী তার শিশুপুত্রসহ দাদামহাশয়ের দয়াপ্রার্থী হয়ে এসেছে, তখন সকলের মুখে বিস্ময়ের রেখা পরিস্ফুট হয়ে উঠল। আমাদের ছোটদের মনে কৌতূহলের সীমা নেই। আমার বয়স তখন সাত বৎসরের মত। রমণীর মায়ের মুখের উপর নিবদ্ধ দৃষ্টি সেই মানব শিশুর আকুল দৃষ্টি আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, কালের অগ্রগতির পাকেও দুর্ভাগিনীর সেই বেদনা বিস্মৃত হয়ে যায়নি। ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে অনেক ভয় আমাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে থাকবে। আমার সমবয়স্ক শিশুটিকে আমি আপন ভ্রাতৃজ্ঞানে গ্রহণ করবার জন্য আকুল হয়ে ছিলাম। যার ফলে মাতা পুত্র আমাদের পরিবারে আশ্রয়লাভ করেছিল। মানবাত্মার সহানুভূতির অনুভূতি আমার জীবনে সেই প্রথম উদ্ভূত হয় ও এখনও মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখলে অতীতের এই স্মৃতি আমার মানসপটে উদিত হয়ে আমাকে বিচলিত করে। এই দুটি প্রাণীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ যতই ঘনিষ্ঠতর হতে লাগল ততই সেই রমণীর অত্যাচারজর্জরিত আমার ইতিহাস ও চা শ্রমিকদের দুঃখ পীড়িত ক্লান্তিকর জীবনের কাহিনী আমার কাছে ততই উদ্ঘাটিত হতে থাকে। এইসব করুণ কাহিনী আমার বাল্য হৃদয়ে চা বাগানের পরিচালক হয়ে শ্রমজীবীদের দুঃখ লাঘব করার এক প্রবৃত্তি তখনকার মত জাগায়। অপরিণত বয়সের এই সংকল্প যদিও তখন চা প্রবণতা প্রসূত ছিল তবু কার্যকালে সংকল্পই যে আমার জীবনের পথনির্দেশের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা প্রকাশ পাবে। (ক্রমশ

ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী

বুকের ক্ষয়দুষ্ট ব্যাধিকে যক্ষ্মারোগ বলা হয়; আমাদের দেশে এখন এরা সকলেই থাইসিস্ কথা জেনেছেন, টি বি বলেন। অনেকে সংক্ষেপে টি বি বলেন। ... বীজাণুর সংক্ষিপ্ত ... আয়ুর্বেদে এই যক্ষ্মাব্যাধির অপর নাম রাজরোগ। যে অধ্যায়ে এর বিবরণ আছে তাকে রাজরোগ অধিকার বলা হয়েছে। এই রাজরোগ আখ্যা কেন দেওয়া হয়েছে, এ নিয়ে কিন্তু অনেকেই ভিন্ন মতামত আজও দেন, বহু শতাব্দী পূর্বেও রাজরোগের ব্যাখ্যা একাধিক মতের আলোচনা পাঠ করা যায়।

সাধারণ্যে এ রোগের প্রাচুর্য এই ... রোগদের রাজা মনে করা অনেকেই ... স্বাভাবিক বলেও ... অত্যন্ত জটিল ... উপরে বিশেষ ... তাদেরই এ রোগ ... আকস্মিকভাবে ধরে ফেলে ... নিরীহ লোকও ... [illegible]। বেশী প্রচলিত অর্থে কিন্তু ... এ ব্যাধিতে অর্থব্যয় ... অত্যধিক; যেন ... ভাগ্যবান লোকেই সামান্য মূল্য দিয়ে স্বাস্থ্যসম্পদ ক্রয় করতে পারে।

আমরা কিন্তু মনে করি রাজরোগ রাষ্ট্রেরই রোগ। হয়ত কেউ কেউ আপত্তি করবেন এ ব্যাখ্যা আধুনিক বা বর্তমান রাষ্ট্রনীতি বিভিন্ন দেশে লক্ষ্য করে অথর্ববেদের অতি প্রাচীন ব্যাধিকে রাজারই ব্যাধি বলে বুঝান হচ্ছে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নীতিতে যারা বিশ্বাসী তাদেরই এসব নূতন রকমের ব্যাখ্যা। আমরা তা মনে করি না।

প্রাচীন ভারতে ব্যাধি নিরাময় করা রাজার কর্তব্য ছিল, সে সময়ের পুস্তক পাঠে অবিলম্বে জানা যাবে। বিজ্ঞান চিরতরে মৃত্যুরোধ করতে আজও পারেনি, দুহাজার বছর পূর্বেও লোকে চিরজীবী অমর ছিল না তা ঠিক। তবে অকালমৃত্যু এখন বহু সভ্য দেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছে এটা প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনা।

অকালমৃত্যু কিন্তু বাস্তবিকই অস্বাভাবিক ঘটনা সে যুগেও গণ্য হত, আজও হয়। মানুষের যৌবন অতীত হলে, প্রৌঢ় আসে, বার্ধক্যও তারপর আক্রমণ করবেই এমন কথাও নয়, আর কিছুকাল ... পরে শরীর পতন অবশ্যম্ভাবী। কাল সর্বকিছুই ধ্বংস করে; ... শরীরও তাতে ... হয়। তবু, বহুদিন বাঁচতে হবে, ... বাঁচাই যেমন সকলের ... অসময়ে তাতেও ... নেই। ... হয়, পরানুগ্রহে ... কারণ যতটা, ... রোগ-... ব্যাপার, অকাল-মৃত্যুও ঠিক তাই ... মনে করেন।

... এক শ্রেণীর লোক মনে করেন, অকালমৃত্যুর উপরে বোধহয় মানুষের হাত নেই। কিন্তু ব্যাধিতে অকালমৃত্যু অনেক দেশেই অনেক কারণে ... আর দেখা যায় না—এমন উদাহরণ ... নেহাৎ কম নয়। ... পরিমাণে অনেক সন্দেহ আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ... ব্যাধি লোকক্ষয় করায়, সময় বিশেষে মহামারীরূপেও দেখা দেয়। কিন্তু আজ যে সব অসুখকে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অসুখ বলা হচ্ছে, এক সময়ে ইংলণ্ড, আমেরিকার শীতপ্রধান অংশেও তাদের প্রসার ছিল এবং এমনই লোকক্ষয় করেছে। সে সব স্থান থেকে নির্বাসিত হয়ে তাদের এখন নাম হয়েছে 'গরম দেশের ব্যারাম'। ম্যালেরিয়া ইংলণ্ডে ছিল যথেষ্ট, থাকবার কারণও আছে। যে মশক (এনোফেলিস্) ম্যালেরিয়ার বীজাণু বহন করে অন্তত ও দের তিনটি শ্রেণী স্কটল্যাণ্ডেও দেখা যায়; যে তাপ প্রয়োজন হয় ম্যালেরিয়ার বীজাণু ফুটাতে তাও বছরে তিন মাসের বেশী ইংলণ্ডে পাওয়া যায়, আর ম্যালেরিয়া রোগীও প্রতি বৎসরে বিভিন্ন দেশ থেকে ব্রিটেনের বন্দরে আসে, তবুও ইংলণ্ডে ম্যালেরিয়া নেই এখন। বিসূচিকা, প্লেগ, রক্ত-আমাশয় এমন কি কুষ্ঠ ব্যাধিও শীতপ্রধান দেশে রাজত্ব করেছে যতদিন লোকে স্বাস্থ্যের নিয়ম-কানুন অভ্যাস করেনি বা সমাজে বিভিন্ন স্তরের লোকের অবস্থার তারতম্য বিদ্যমান ছিল। "ট্রপিক্যাল" রোগ কথাটাই অর্থহীন; অপরিচ্ছন্নতা, দারিদ্র্য, পুষ্টির অভাবেই 'ট্রপিক্যাল' রোগ দেখা যায় বা বাড়ে—এই ধারণাই প্রমাণিত হয়েছে।

টাইফয়েড রোগী ইংলণ্ডে প্রভূত সংখ্যায় কষ্ট পেয়েছে, অকালে প্রাণ হানিও তাদের হয়েছে কিন্তু আজ কদাচিৎ এ রোগ দৃষ্ট হয় সেখানে।

ব্যাধি অপসারণের দায়িত্ব কার, কেনই বা ব্যাধি প্রসার পায়, রাষ্ট্রের হাত কতখানি নিরাকরণে, বর্তমান সমাজ বিজ্ঞানের তাই বিশেষ আলোচনার বিষয়। রাষ্ট্রের উন্নতি, তত্ত্বাবধানতায় বহুব্যাধি অপসৃত হয়েছে, এটা সকলেই মানবেন অথচ সে সব ব্যাধির নামও রাজরোগ আর নেই শুধু ক্ষয়ব্যাধির নামের সঙ্গে এটা সংযুক্ত হয়ে আছে।

যে-কোনও কারণে অকালমৃত্যু ঘটলে রাজার রাজকার্যে ত্রুটিই তার কারণ, প্রাচীন ভারতে বিবেচিত হত। এক অষ্টম-বর্ষীয় বালকের মৃত্যুর কারণে প্রজারঞ্জক রাজা রামচন্দ্র অভিযুক্ত হন। অকালমৃত্যু রাজার অপচারেই ঘটে এটা যেন আপামর সাধারণে বিশ্বাস করত। এমনটা মনে করা

যেতে পারে কেন না, উত্তর রামচরিতে মেয়েরাও আলোচনা করেছে, "ন রাজাপচারমন্তরেণ প্রজাসু অকালমৃত্যুশ্চরতি"।

ক্ষয়ব্যাধি সম্বন্ধে রাষ্ট্রের দায়িত্ব কতখানি? আমরা মনে করি এর আদিতে, অন্তে, মধ্যে সর্বত্রই রাষ্ট্রের কর্তব্যনিষ্ঠার পরিমাণ করা যায়।

ব্যাধির মূল বা গৌণ কারণ ক্ষয়বীজাণু। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি থুথুতে, মলমূত্রে বীজাণু আশে পাশে ছড়ায়। নিরীহ নিরপরাধ লোকে নিকটে থেকে, মুখ থেকে নির্গত বিষ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নিজেরা অসুখে পড়ে। রাজ্যে যত সংখ্যক লোক ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় থাকবে ততোধিক রোগীর সংখ্যা মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে বাড়বে।

বাংলা দেশে একটা মোটামুটি হিসাব করা হয়েছে একজনের বীজাণু বিষ থেকে তিনশো পয়ষট্টি দিনে বা এক বৎসরে অন্তত চারজন আক্রান্ত হয়।

এই সব রোগীরা যদি অবাধে রাজপথে চলাফেরা করে, রাস্তায় নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে, প্রকাশ্য জনতায়, সিনেমায়, চায়ের দোকানে, খাবারের ঘরে সুস্থ লোকের সঙ্গ করে, সংখ্যায় রোগী বাড়বে বহুগুণে। তাদের জন্য স্বতন্ত্র বাসস্থান বা চিকিৎসা স্থানের আবশ্যক। জানা-শোনা, চিহ্নিত রোগী এ রকম সহজে রোগ বৃদ্ধি করতে পারে; পক্ষান্তরে যখন রোগটা জানাই নেই অথচ রোগ আছে এমন অবস্থা যদি সম্ভব হয়, অলক্ষ্যে, অজ্ঞাতসারে কত বেশীগুণে রোগ বৃদ্ধি ঘটবে সহজেই অনুমেয়।

রোগীর বাসস্থান, চিকিৎসালয় নির্মাণ সম্ভব শুধু রাষ্ট্রের সহায়তায়; অন্যান্য অনেক ব্যাধি ঘরে রেখে চিকিৎসা সম্ভব কিন্তু নানা কারণে যক্ষ্মারোগীকে পরিবারের মধ্যেই চিকিৎসা করান দুর্ঘট। পশ্চিম বাংলার শহর বা গ্রাম, যেখানেই বলুন না কেন অজ রোগীর জন্য স্বতন্ত্র কক্ষ মেলা দুষ্কর সকলেই জানেন। চিকিৎসা যেমন রাষ্ট্রের চেষ্টা ব্যতীত সম্পূর্ণ এমন কি কথঞ্চিৎ সম্ভব নয়, সেই রকম নিজেও রোগী অধিকাংশ স্থলে ব্যাধির প্রারম্ভে জানতে পারে না বা বুঝতে পারে না। এ জন্য রাষ্ট্রের বন্দোবস্ত আবশ্যক হয় লোককে সজাগ রাখতে, অনুক্ষণ সতর্ক থাকা প্রয়োজন, সেটা জানিয়ে দিতে। মধ্যে মধ্যে, তথাকথিত সুস্থ নরনারীর বাধ্যতামূলক পরীক্ষা করান প্রয়োজন; বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সে রকম পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, রোগ অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে অথচ রোগী বা রোগিণী তার কিছুই জানে না। অনেক রাষ্ট্র এ জন্য নিয়মিতভাবে এক্সরে পরীক্ষা, মাঝে মাঝে রাষ্ট্রের সব প্রজার জন্যই ব্যবস্থা রাখেন। এতে ব্যয় যথেষ্ট, লোকবল প্রচুর থাকা চাই, কিন্তু রাষ্ট্র এ দায়িত্ব নিয়েছেন নিজেরই গরজে। যতদিন না নিরাময় হয়, লোকেও ত কাজ দিয়ে রাষ্ট্রকে পুষ্ট বা সমৃদ্ধ করতে পারবে না। কাজেই রাষ্ট্র প্রজাপালের মতই রোগে শোকে প্রকৃতিপুঞ্জকে আশ্রয় অভয়দান করে। ঠিক যেমন আয়ুর্বেদ যখন প্রথম সংকলিত হয়েছিল, আজও তেমনই অনেক রাষ্ট্রই সে দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে।

কিন্তু অসুখ হবে লোকের, তার সম্ভাবনা বা নিশ্চয়তা আছে নাকি রাজকর্মচারী বলে দেবে, এটা অনেকেই বুঝতে পারেন না। এমন কথাও শোনা যায়, 'আমার কষ্ট আমি জানলাম না, জানিয়ে দেবে রাজার সেপাই'।

বুকের ক্ষয় ব্যাধি যাকে রাজরোগ বলা হয়েছে, তার কিছু পার্থক্য আছেই অন্য ব্যাধি থেকে। অন্য অসুখে হয়ত এতটা দরকার হয় না, মানুষের নিদ্রিত চৈতন্য জাগাতে, এত বন্দোবস্তও রাখতে হয় না। ম্যালেরিয়াতে কাঁপুনি দিলেই লোকে সজাগ হয়; কলেরায় একবার দুবার ভেদ বমি হলেই অস্থিরতা আসে। যক্ষ্মারোগে উপসর্গ [illegible] উগ্র নয় বলেই, গোড়ার দিকে [illegible] পর্যন্ত চাপা থাকতে পারে। [illegible] পরীক্ষিত হলে, তার পূর্বে [illegible] জানা যায় নি। এমনই বিচিত্র [illegible] যে, যে সব দণ্ড দিতে হয়েছে [illegible] জীবন পর্যন্ত অন্য লোকের [illegible] নিজের বেলা হতে পারে [illegible] বুঝে থাকা চলে। এই ঔদাসীন্য [illegible] ব্যাধির একটা উপসর্গের মতই [illegible] গেছে। কাজেই রাষ্ট্রকেও [illegible] হয়েছে।

যক্ষ্মা ব্যাধির সাধারণ উপসর্গ[illegible] সকলেরই জানা। [illegible] কথা হয়ত [illegible] কিন্তু এমন একজন [illegible] বাংলা দেশে বিশেষ করে নেই, [illegible] উপসর্গগুলি ক্ষয় ব্যাধিরই [illegible] একথা জানে না। [illegible] আমাদের দেশে থাকুক না [illegible] পরম্পরায় এ জ্ঞান সকলেই [illegible] পেয়েছে।

[illegible] দীর্ঘকাল ভুগতে হবে [illegible] হয়ে যাবে, [illegible] নিজের মনেই [illegible] চেষ্টা করে। এ বিষয়ে শিক্ষিত [illegible] পার্থক্য খুব বেশী নেই। [illegible] চিকিৎসকরাও নিজেকে পরীক্ষা [illegible] দিতে আপত্তি করেন পাছে রোগ [illegible] যায়। আর একজনের হাতে [illegible] নিশ্চয়ই হয়েছে, কিন্তু আমার [illegible] গুলি খুবই মৃদু বা যক্ষ্মাব্যাধির [illegible] করছে না এই নিজে বুঝে [illegible] হিতৈষীদের মানুষ স্বভাবতই [illegible] চেষ্টা করে।

যে সব উপসর্গ নিয়ে [illegible] এ ব্যাধির বিশেষত্ব তার অনেক[illegible] বর্তমান থাকতে পারে, কিন্তু [illegible] উপসর্গ এখনও আছে, একেবারে [illegible] তারও কারণ দর্শাতে রোগীর [illegible] না। কাশি হয়ত থাকেই, কিন্তু [illegible] হয় ওটা পেট গরমের জন্য বা ঋতু[illegible] বর্তনের সময়ে কাশিটা হয়েছে [illegible] শীগ্‌গির ইত্যাদি। হয়ত কাশির [illegible] রাত্রে আধ ঘণ্টা ঘুম হয় না, [illegible] বাড়ীর কতলোক কাশির কারণেই [illegible]

[illegible] রোগীও প্রতিজ্ঞা করে, সকাল [illegible] বুক পরীক্ষা করবে। কিন্তু সকাল [illegible] সন্ধ্যা আসে, আবার সকাল হয় [illegible] আসে; দিনের ব্যস্ততায় পরীক্ষা [illegible] উঠে না। মনে পড়ে শুধু [illegible] নিস্তব্ধতায়। এমন করে মাস [illegible] পারে, মাসের পর মাস, গোটা [illegible] বছরও চলে যেতে পারে। অল্প জ্বর [illegible] বা অশিক্ষিত, স্ত্রী কিংবা পুরুষ [illegible] স্থায়ী হলে আর অনুভব করে [illegible] হয়ে যায়।

[illegible] রাষ্ট্রে তাপমান যন্ত্র কিনবার [illegible] প্রজার থাকে না, রাষ্ট্রও থার্মো- [illegible] পরিবারবর্গকে দান করে না, [illegible] জ্বর দেখা হয় না, কাজেই প্রতি- [illegible] জ্বর ধরে সম্ভবত নেই। নাড়ী [illegible] করে জ্বর বুঝেন অনেকে, কিন্তু [illegible] বোঝান যায়, [illegible] [illegible] চঞ্চল, নাড়ীও চঞ্চল হবেই।

[illegible] রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক পরীক্ষা না [illegible] প্রথমেই যক্ষ্মারোগ ধরা পড়বে না, [illegible]।

[illegible] গরজে নিজের চিকিৎসা করান [illegible] চলিত হয় নি। আমাদের বাংলা [illegible] মধ্যে অনাহৃত। রক্ত উঠলেও [illegible] বুঝাতে চেষ্টা করে ডাক্তারকে [illegible] তার রক্ত ওঠার কারণ কি?

[illegible] রকম অদ্ভুত, বিশ্বাসঘাতক [illegible] রাষ্ট্র ভিন্ন প্রজা স্বতন্ত্রভাবে [illegible] অক্ষম। কাজেই রাজরোগ বলা [illegible] এটা সার্থক নাম।

রাষ্ট্রের দৃষ্টি থাকবে অলক্ষ্যে ব্যাধি [illegible] রাজ্য মধ্যে প্রবেশ না করে, নজরে [illegible] মাত্রই যেন তাকে স্বতন্ত্র রাখা হয়, উচ্ছেদের চেষ্টা আত্যন্তিক হয় যাতে তার করাল জিহ্বা বিস্তৃত না হয়।

রাষ্ট্রনীতি এমন হতে পারে, বাইরের লোক দেশে আসবার আগে এ ব্যাধি যেন না আনতে পারে। ছাড়পত্রের সঙ্গে উপযুক্ত চিকিৎসকের দিন স্বাক্ষর তাতে থাকে। সুইজারল্যাণ্ডে লোকে যায় চিকিৎসার জন্য। অন্য কারণে তিন মাসের বেশী থাকলেই ফটো নিয়ে দেখা হয়—নির্দিষ্টভাবে, উদ্দেশ্য অসুস্থ লোক রাজ্যে না বাস করে, কেন না রাষ্ট্রের ভার তাতে বাড়বে। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এমন নীতিই অবলম্বন করছে, বাইরে থেকে আনা ব্যাধির প্রবেশ বন্ধ যাতে হয়।

বীজাণু রাস্তা ঘাটে ছড়ান হলেও সূর্যের রশ্মিতে নির্জীব হয়। কিন্তু সূর্যালোক নেই যেখানে, আনাচকানাচ, ফাটা দেওয়াল, কোণ ঘুঁচি, আবর্জনায় ক্ষয়-বীজাণুর রাজত্ব।

সূর্যালোকবর্জিত গৃহে বাস করলে বীজাণুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া দায়। মানুষ কেমন করে থাকবে তাও রাষ্ট্রের বিচারেই স্থির হয়।

অনেক লোকই অসুখে পড়ে, অনেক লোক অব্যাহতি পায়, জীবনীশক্তি কি কারণে বাড়ে, রোগ প্রতিরোধের শক্তি খর্ব বা অপহৃত হয় যক্ষ্মা রোগে তাও বিচার্য।

বাসস্থান যেমন এ ব্যাধিতে রোগ-প্রবণতায় সহায়ক বা পরিপন্থী, পথ্য আহারও তদ্রূপ হয়ত বেশী।

পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, যেখানে দুর্বল লোক বেশী সেখানে সবল লোকেরও ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা অনেকগুণই থাকে।

ক্ষুৎকাতর নরনারী ধনী প্রতিবেশীরও বিপদের কারণ কেন না সমাজে ধনী দরিদ্রের মেলামেশা একেবারে বন্ধ করা শক্ত।

কাজেই আহার আবাস এককালীন সর্বপ্রজারই যাতে স্বাস্থ্যসম্মত হয়, সেই ব্যবস্থাই একমাত্র রোগ প্রতিষেধে সক্ষম। আহার্য সংগ্রহ, উৎপাদন, ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি, প্রজার শারীরিক সুস্থতা সবই যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, আর এগুলির কোনটিরও অভাব বা অসঙ্গতি হলে সে রাষ্ট্রের প্রজাও যক্ষ্মায় বলি হবে তাও দেখা যাচ্ছে।

কাজেই রাজরোগ যক্ষ্মারোগের প্রতিশব্দ কেন যে হয়েছিল, বুঝা কঠিন নয়।

প্রতি শতাব্দীতে মানুষের জ্ঞান বাড়ছে, নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হচ্ছে, তুলনামূলক বিচারে জীবনের কর্তব্য নিশ্চিততর হচ্ছে, কিন্তু জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তার অবিলম্বে প্রয়োগ—সমবেত প্রজার বা রাষ্ট্রের সহায়তা ভিন্ন সম্ভব নহে। আমরা ভারতবর্ষে বর্তমানে বিজ্ঞানের অনেক কিছুই জানি, কিন্তু প্রয়োগে প্রায়শ অসমর্থ। মানবধর্মীরা এই বিলম্বের কারণে অসহিষ্ণু কেন না রাষ্ট্রই সমাজ বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে সমর্থ, হয়ত রাষ্ট্রের দীনতায় তা সম্ভব হয় না। একজন জ্ঞানী সমাজ চিকিৎসক বলেছেন (Prof. Ryle) "নূতন জ্ঞান আহরিত হওয়ার পরে প্রযুক্ত হতে যে সময় লাগে, সেই সময়টুকুই যেন অসহ্য মনে হয়।"

কনে দেখা

জ্যোতির্ময়ী দেবী

জ্যৈষ্ঠ মাসের এক সংখ্যা দেশে শ্রীমতী বাণী সেনের লেখা 'কনে দেখা' পড়লাম। আলোচনাটি সময়োচিত, ভেবেছেনও লেখিকা। তবে আরো একটু স্পষ্টভাবে আলোচনা হওয়া দরকার তাই আমাদের যা' দু'এক কথা মনে হ'ল লিখছি।

বাংলা দেশের কনে দেখার মত বর্বর খেলো প্রথা ভারতবর্ষের আর কোথাও আছে কিনা বলা শক্ত। এই প্রথার বর্বরতা যেন দিন দিন বাড়ছে মনে হয়। 'কনে দেখার' লেখিকা কিছুটা আলোচনা করেছেন।

এই বর্বর প্রথার দু'টি প্রধান দিক আছে। ১ম হচ্ছে পণের অর্থের মাপে মেয়ের রূপ গুণ বংশের যাচাই বা মান নিরূপণ; ২য় মেয়েটিকে সবান্ধবে সমাজ-কুটুম্ব, মেসোপিসে, বরকর্তা—বর, বরের বন্ধু, মা, মাসী, পিসি, বোন ইত্যাদি সহ দু পাঁচদিন ধরে দেখে তাদের বাড়িতে ব'সে ভীমনাগ, নবীন ময়রা, দ্বারিক ঘোষের মিষ্টান্নের ভূরিভোজন করে অনায়াসে মেয়েটিকে পছন্দ হ'ল না বলে দেওয়া। এবং সেই বলে দেওয়া একদিনে নয়, পাঁচদিন তার বাপ ভাইকে, আত্মীয়-স্বজনকে ঘুরিয়ে নির্লজ্জভাবে কারুর পছন্দ হয়নি বলা। এর চেয়ে ঘটক বা ঘটকী দিয়ে মেয়ের সম্বন্ধ করা আগের দিনে যা ছিল, তাতে এতটা অপমানবোধ করতেন না কন্যাপক্ষ। কেননা, ঘটকরাই কন্যার বিবরণ দিয়ে দিতেন।

আশ্চর্য এই, আমাদের সকলেরই ঘরে মেয়ে আছে অথচ সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে ঐরকম ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন না। প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদার, দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত সরকারী কর্মচারী, ধনশালী ব্যক্তি থেকে দীন দরিদ্র গৃহস্থ সকলেই ঐ মেয়ে দেখানোর সময়ে যেন দীনাদপি দীনে সংকুচিত হয়ে পাত্রের অভিভাবক বা পিতার প্রসাদ ভিক্ষু হয়ে চেয়ে থাকেন। সেই একদিনের জন্য তাদের রাজমর্যাদা দেখবার জিনিস। কিন্তু একদিন কেন, সুপাত্রের বা কৃতী পাত্রের অভিভাবকের এই মেয়ে দেখা এবং ভূরি-ভোজ আর অহংকৃত মেজাজ দেখানো কতদিন ধরে চলে কে জানে। কেননা, একটি মেয়ে দেখেই তো আমাদের দেশে বিয়ে হয় না।

বলতে পারেন অনেকে, বিবাহের মত চিরকালের কাজ পাঁচটি মেয়ে না দেখে কি করে করা যায়? মেয়ে তো না দেখে বিবাহ দেওয়া যায় না? তা যায় না। কিন্তু পণের পরিমাণ? রূপ-গুণের যাচাই? বিদ্যার ললিতকলার খোঁজখবর? অবশেষে মেয়ের পিতা এবং তাঁর জীবিত থাকা অথবা কর্মক্ষেত্র কেমন —তাতে এইসব কেমন করে আসে তা ভেবে দেখবার বিষয়। সর্বোপরি, যাদের মেয়ে নেওয়া হয়ত যাবে না তাদের বাড়িতে স্বচ্ছন্দে সবান্ধবে জলযোগ।

যাক্ আমি এখন অন্য দু'একটা দেশের মেয়ে দেখার প্রথার কথা বলি। আজকাল সেটাও জানা দরকার আমাদের।

বিহারে তিন শ্রেণীর উচ্চবর্ণ আছেন ব্রাহ্মণ, বাভন, (এই বাভন জাতি ব্রা[illegible] নন কিন্তু দ্বিজ বলেন নিজেদের) আর লালা বা কায়স্থ। এ'দের পর্দা আছে কিন্তু মেয়েদের বাল্যবিবাহ ছিল, এখনো আছে গ্রাম অঞ্চলে।

এ'দের ঘরে মেয়ের বিয়ে, মেয়ে না দেখিয়েই হয়। কোনোক্রমেই বিয়ের আগে বরপক্ষীয়েরা কনে দেখতে পান না। যদি মেয়ের রূপের অভাব থাকে, এমন কি বিকলাঙ্গও হয় তাহলেও [illegible] উপায় নেই। লোকমুখে, কুটুম্ব [illegible], দাসী নাপিতানী মারফৎ জানা [illegible] কেমন, মেয়ের বাড়ির লোকেরা [illegible] 'আশীর্বাদ'কে 'তিলক' বলেন [illegible] তাতেও মেয়ে দেখার প্রথা নেই [illegible] 'তিলক' চড়ানো হয়। মেয়েকে [illegible] হলুদ পাঠানো হয়। বরের বাড়ির [illegible] এসে মেয়ে দেখে পছন্দ বা অপছন্দ [illegible] যাওয়ার মত, কখনো হাঁটিয়ে [illegible] চুল খুলে, গান গাইয়ে, নানা রকমে [illegible] করে একঘর পুরুষ ও মেয়ের [illegible] একটি অশিক্ষিত বা শিক্ষিত [illegible] মেয়ে দেখার বর্বরপ্রথা বিহারে নেই।

এই প্রথা ইউ পিতে [illegible] কাশী ইত্যাদি দেশেও নেই। [illegible] ব্রাহ্মণ ও লালা প্রধান। অরূপা [illegible] বতী মেয়ের অভাব নেই।

পাঞ্জাবে নেই। ওখানে পর্দা [illegible] ক্ষেত্রীজাতিরা পরম সুন্দর [illegible] ব্রাহ্মণ রাজপুত শিখ জাতিও [illegible] দেখতে। কাশ্মীরী তো আছেই [illegible] পর্দাও নেই, কনে দেখাও নেই। [illegible] আছে অন্য ধরনের।

রাজপুতানায় কনে দেখা নেই। সুন্দরের দেশ, ঘরে ঘরে পরমা সুন্দরী মেয়ে দেখা যায়। কন্যা হত্যা ছিল, কন্যা-দায়ের ভয়ে পণপ্রথার ধরনের [illegible] আছে। কিন্তু কনে দেখা নেই। [illegible] পুত, মাড়োয়ারী ব্রাহ্মণ বৈশ্য [illegible] জাতে এমনকি নিম্ন শ্রেণীতেও 'কনে দেখা' নেই। বম্বেওয়ালাদের মধ্যে এ প্রথা নেই। পর্দাও নেই। গুজরাটী [illegible] সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ প্রথা নেই। [illegible] ঘরেই স্বভাবতই আদানপ্রদান চলে! কিন্তু আদায় জুলুমের প্রথা নেই!

লুব্ধ বিবেকহীন অসাড়বুদ্ধি পুরুষ সম্বন্ধ বা বর পক্ষ।

ভাববার কথা এই, আদর্শই বা আমাদের কি, আর মানুষ হিসাবেই বা আমরা কি?

একটি গত শতাব্দীর গল্প বলে লেখা শেষ করি। তখনকার দিনের এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী সকালবেলা নিজের বাড়ির উঠানে দাঁতন করছিলেন। এক ভদ্রলোক গলবস্ত্র হয়ে দাঁড়ালেন। গৃহকর্তা পরিচয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর কি প্রয়োজন?

তিনি, বল্লেন, যদি তাঁর কথা থাকে তিনি বলবেন।

গৃহকর্তা বলেন, 'শোনবার মত হলে নিশ্চয় শুনবেন।'

ভদ্রলোক তাঁর অরূপা কন্যাটির সঙ্গে গৃহকর্তার পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করলেন।

গৃহকর্তা ঈষৎ হাস্যে সম্মত হলেন।

বাড়ির মেয়েরা উপর থেকে দেখছিলেন। ভিতরে আসার পর স্ত্রীকন্যারা সকলে প্রশ্ন করলেন। উত্তর শুনে অত্যন্ত অসন্তুষ্টি জানালেন।

মেয়েরা বল্লেন, 'মেয়ে দেখলে না, জানলে না, একেবারে এককথায় রাজি হয়ে গেলে......।'

কর্তা বল্লেন, 'কত বড় অহঙ্কারী ভদ্রলোক, সকালে আমার দরজায় এসে মেয়ে নিতে হবে বলে দাঁড়াল, কি করে বলব তার মেয়ে নোব না? দেখতে কেমন? না, দেখার দরকার নেই। ভদ্রলোকের মেয়ে তো।'

ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক লোক, জগদীশচন্দ্র রায়।

কিছুকাল আগে আরেকজন সাধারণ স্কুলমাস্টার, তাঁকেও তাঁর [illegible] বিধবা স্ত্রী বলে পাঠালেন, 'আমার মেয়েটিকে নিতে হবে। মেয়ে সুন্দরী নয়।'

তিনিও তৎক্ষণাৎ সম্মত হলেন। বাড়ির লোক ও অন্য পাঁচজন জিজ্ঞাসা করল, 'এককথায় রাজি হলে, মেয়ে ফর্সা নয় ইত্যাদি।'

তিনিও বল্লেন, 'বিধবা ভদ্রমহিলা বলে পাঠিয়েছেন নিতে হবে। ভদ্রলোকের মেয়ে কি করে নিতে পারব না বলব।'

'রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের আত্মচরিতে পড়ি তাঁর জননীর সম্পর্কে [illegible] কথায় তাঁর পিতাকে 'রামমোহন রায় বলেছেন, 'বংশের পরিচয় যখন [illegible] তোমার স্ত্রী সুসন্তানবতী হইলে [illegible] তোমার ক্ষোভের কারণ নাই।'

'রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের [illegible] জ্ঞানের কীর্তির কথা কে না জানে।

বাংলাদেশের সমাজের এই প্রথা সম্বন্ধে এখন সকলেরই [illegible]

এই ধরনের লাঞ্ছিত ও লুব্ধ [illegible] পর যদি মেয়ের শ্বশুর বাড়ির উপর বিতৃষ্ণা বিরাগ জন্মায় [illegible] বলবার আছে কি? কোনো বান্ধব [illegible] বাড়ির পরিজনের উপর থাকে না [illegible] মেয়েটি ক্ষমতা ও সুবিধা পেলে [illegible] শাশুড়ীই উদ্ধত ব্যবহার করে। প্রায়ই [illegible] হয়ে যায়। মেয়ে দেখার লাঞ্ছনা [illegible] মেয়ে ভুলেছেন কি না বলা শক্ত। [illegible] দুঃখ এই যে, তাঁরাই নিজের ছেলের বিবাহের সময় পুরাতন প্রথাকেই অনুসরণ করে চলেন। সমাজের মূলে [illegible] এই মনোভাব আমাদের জাতীয় জীবন থেকে তুলে ও মুছে ফেলা উচিত। [illegible] মেয়ে দেখাই সুন্দর হিসাবে উদ্দেশ্য হয় স্পষ্ট আর সোজাসুজিভাবে দেখা উচিত। আর যদি টাকা নেওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তাও মেয়ে দেখার আগেই ব্যবসা বাণিজ্যের মত দরাদরি করে নেওয়া ভালো। তাও দুই পক্ষীয় কর্তা ছাড়া অন্য লোক না হলেই ভাল হয়

আশীর্বাদ, আভ্যুদয়িক, নান্দীমুখ সম্প্রদান, কুশণ্ডিকা সপ্তপদী [illegible] উৎসব করার সঙ্গে এই ভদ্রতাহীন মেয়ে দেখা ও যৌতুকলুব্ধতা খাপ খায় না।

আছে [illegible] সমালোচনা। আর এই [illegible] সমালোচনার বিস্তর রূ ভেদ; একটা মুক্ত এমোশনাল, রোম্যান্টিক; দ্বিতীয়টা প্রধানত ইন্টেলেকচুয়াল। হিন্দু-মুস্লিম সমস্যা সম্বন্ধে তাই প্রমথ চৌধুরী যখন লেখেন* তখন তিনি রামের সংগে রহিমের বোনের বানানো প্রেমের কাহিনী লেখেন না, এমনকি পলিটিশানদের মতো ঐক্য সম্বন্ধে তারস্বরে চিৎকার করেন না; তিনি সাহিত্যিক হিসাবে প্রশ্নটি সাহিত্যের দিক থেকে বিচার করেন। এই যে সমসাময়িক সমস্যা সম্বন্ধে সচেতনতা —তা প্রমথ চৌধুরীর সংগেই প্রায় অন্তর্হিত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে যে রিসার্চ আছে, তারই বা পরিচয় কই পরবর্তীকালের সাহিত্যে? তাই বলছিলুম, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের উপর প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব যতটা হওয়া উচিত ছিল তার সামান্যই হয়েছে। প্রেরণা নামক একটি অনির্দিষ্ট বস্তু আবার বাঙলা রচনায় একমাত্র নির্ভর হয়েছে—বিদ্যা, চিন্তা ও অনুশীলন যেন নিম্নস্তরের প্রচেষ্টা।
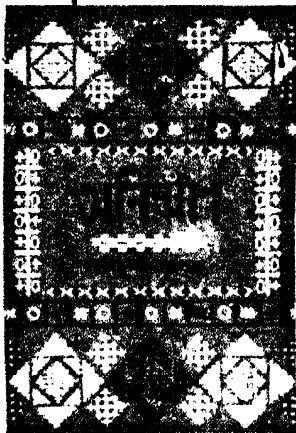
প্রমথ চৌধুরী যে প্রেরণার উপর নির্ভর না করে অধ্যয়ন ও সজ্ঞান চেষ্টার সাধক হয়েছিলেন তার একটা কারণ তাঁর কল্পনা-শক্তি অপরিমিত ছিল না। তাঁর একমাত্র ক্ষুদ্রোপন্যাস** বহু বৎসরের ব্যবধানে দ্বিতীয় পাঠের দুরূহ পরীক্ষায় ঠিক অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হয় না। গল্পগত দৈন্য ছাড়াও, তাঁর স্টাইলটিও বোধহয় উপন্যাস রচনার জন্যে কিছু পরিমাণে অননুকূল। (যদিও "বেদান্তের 'বে' দূরে থাক, আলো পর্যন্ত জানিনে" পড়ে অনেকক্ষণ হেসেছি।) বাঙলা উপন্যাসের ইতিহাসে "চার-ইয়ারি কথার" স্থান স্থায়ী, কিন্তু এর মূল্য প্রধানত ঐতিহাসিক বলে আশংকা করি।

কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর আসল পরিচয় লেখক হিসাবে নয়, সাহিত্যিক হিসাবে—যাকে বলে L'Homme De Lettres। আর সেই বিচারেই তিনি নিজে যেমন সাহিত্যিক হিসাবে সার্থক হয়েছিলেন, তেমনি ব্যর্থ হয়েছেন বাঙলা সাহিত্যের পথপ্রদর্শক হিসাবে। তিনি যুক্তি ও তর্ক বাঙলা সাহিত্যে অংগীভূত করতে চেষ্টা করেছিলেন—আজ আমরা দুইই বর্জন করেছি। তিনি য়ুরোপীয় ভাবধারা বাঙলায় প্রচলন করতে চেয়েছিলেন—আমরা গোলওয়ালকার বা নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের প্ররোচনায় কাল-প্রত্যাখ্যাত একটা অসম্ভব অতীতে ফিরে যেতে চাইছি। প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন, "স্ব-দেশের জ্ঞান লাভ করতে গিয়ে স্ব-কালের জ্ঞান যেন না হারাই" : আজ আমরা পুরোপুরি বিপরীতমুখী। প্রমথ চৌধুরী বাঙলা গদ্যে ফরাসির প্রিসীশন আনতে চেয়েছিলেন : আধুনিক গদ্যে ও বস্তুর বালাই নেই।

আজ প্রমথ চৌধুরীর জন্মদিনে বাঙালী লেখককে কবুল করতেই হবে যে তাঁর কাছ থেকে আধুনিকদের অনেক কিছু শেখবার ছিল এবং তারা তা শেখেনি। শিক্ষার সংগে বাঙলা সহিত্যের বর্তমান বিচ্ছেদ যেদিন ঘুচবে, সেদিন বলা চলবে যে প্রমথ চৌধুরী স্থান বাঙলা সাহিত্যে সত্যই সুপ্রতিষ্ঠিত। সে প্রতিষ্ঠায় তার আমাদের প্রত্যেকের উপর ন্যস্ত।

—নি।

২১৮।৬[illegible]

---

* প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান : প্রমথ চৌধুরী (বিশ্বভারতী আট আনা)।

** চার-ইয়ারি কথা : প্রমথ চৌধুরী (বিশ্বভারতী ২।০)।

উপন্যাস

জোটের মহল—অমরেন্দ্র ঘোষ। [illegible] লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, [illegible] ৩॥০।

প্রাক্-বিভাগ যুগের পূর্ববঙ্গের [illegible] ভূমিকা করে বাঙলা সাহিত্যে [illegible] রচনা পূর্বে আবির্ভূত হয়েছে, কিন্তু [illegible] মাত্রিক পূর্ববঙ্গের যে-দিকটির [illegible] করে আনছে অমরেন্দ্র ঘোষের [illegible] নতুন এবং অভিনব। রাজনৈতিক [illegible] পূর্ববঙ্গ আজ বিচ্ছিন্ন, কিন্তু [illegible] দিক দিয়ে পদ্মা-মেঘনা [illegible] কখনো হারিয়ে যাবার নয়। [illegible] জেলে-জেলে প্রভৃতিদের বিচিত্র [illegible] তাঁর সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য [illegible] নিচ্ছে। নদী বা বিল-অঞ্চলের এই [illegible] সাধারণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাদের [illegible] ও মন, যার আবেদনটা মূলত [illegible] [illegible] হয়েছে পূর্ববঙ্গের লোক-জীবনে [illegible] স্বল্প-আনন্দের অকপট [illegible] তারই অনুবেদন [illegible] [illegible] মতো মাঝে মাঝে [illegible] আমাদের বিস্মিত করে, কিন্তু [illegible] দুর্ভাগ্য—এই সুর সবার অন্তরে [illegible]

'জোটের মহল' বিল অঞ্চলের [illegible] জীবনের 'একজোট' হয়ে [illegible] বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রয়াস-কাহিনী [illegible] প্রয়াসের বিরুদ্ধে আমাদের বলার [illegible] কিন্তু উপন্যাস হিসাবে এই [illegible] কাহিনী কতখানি রসোত্তীর্ণ হয় [illegible] সেটাই বিচার্য।

মুনি ঋষির মতো উন্নত দেহ, [illegible] গৌরবর্ণ' [illegible] দল থেকে বেরিয়ে [illegible] নমঃশূদ্রপল্লীর [illegible] ব্রাহ্মণ তনয় [illegible] কাহিনীর নায়ক। তার বাল্যসঙ্গিনী [illegible] পরস্ত্রী হয়েও তার প্রণয়িনী। বিধবা [illegible] কনক মৎস্যজীবী 'জীবনের' [illegible] এই চরিত্রগুলির চিত্রণে একটা [illegible] বিপ্লবের আভাস দিয়ে লেখক তাদের [illegible] টেনে নিয়ে গেছেন রাষ্ট্রনীতি-প্রভাবিত [illegible] আবর্তের মাঝখানে। তাতে আপত্তির [illegible] কিছু নেই। কথা হচ্ছে রস-সাহিত্যিকের [illegible] এই আবর্তই প্রধান হয়ে ওঠা উচিত [illegible] আমাদের মনে হয়, আবর্তটা মাধ্যম, [illegible] মধ্য দিয়ে কাহিনী একটা সত্যে, [illegible] সৌন্দর্যে, একটা গভীর-চেতনায় যাতে [illegible] উত্তীর্ণ হয়, সেটাই ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য [illegible] উচিত। আলোচ্য উপন্যাসের প্রারম্ভে যে [illegible] যে সাবলীলতা লক্ষ্য করলাম, লক্ষ্য কর[illegible]

মুঠি চাপা রয়েছে। নিমাই সাগ্রহনয়নে ধরেছে গান,

মায়ার বাঁধন, ছাড়া কি গো. যায়?
যাই যাই মনে করি, যাইতে না পারি
মহামায়া আমার পিছনে ধায়॥

কে জানে, কাল যেতে পারব কিনা রমণীমোহনের কাছে। কে জানে, কোনদিন যেতে পারব কিনা? ঋণ? কই, মনে মনে একটুও ঋণভার অনুভূত হচ্ছে না তো। জানি, দিয়ে সুখ, নিয়ে দুঃখ। কিন্তু, রমণীমোহনের ঋণ তো ঋণ বলে লাগছে না। কত কত ঋণ নিয়েছি, ভোগ করেছি মনোকষ্ট। কিন্তু সে ঋণে তো বাঁধেনি আমাকে সে। সে যে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বাঁধলে। সে যে ধরে রাখলে আমাকে মুক্তি দিয়ে।

তার সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী, সংক্ষিপ্ততর তার সোনার বাঁধনের কথা। যে কাহিনীর তরী ভাসছে রক্ত আর অশ্রুর নদীতে। জানি, এ চলার পথে হারিয়ে যাবেন উনি। হারিয়ে যাবেন হয়তো সূর্যাস্তেরই আগে। তবু বুঝলাম, মন-সৈকতে আঁকা রইল যে রেখা, সে অনন্তে ফিরবে আমার চলার পথে ক্লান্ত নেরের মত। তাকে তো আটকাতে পারব না।

ঝড় এল বালুচরে। এক রাশ ভিখারী। যেন চৈত্র ঘূর্ণির ঝরাপাতা, ফুটোফাটা। কোথা দিয়ে এল, কোন্‌খান্ দিয়ে এল, কেউ জানে না। জানে না কেউ, এ ঘূর্ণি যাবে ঘুরতে ঘুরতে কোন্ পথের উপর দিয়ে, কাদের দাগে, মাড়িয়ে।

হঠাৎ আমরা একরাশ নরনারী পাগলা ঘূর্ণির আবর্তে যেন পথরুদ্ধ, বিব্রত অসহায় হয়ে পড়লাম। হে পুণ্যবান, দাও দাও। হে তীর্থযাত্রী, দাও দাও। হে দয়ালু, হে রাজা রাণী দাও দাও, দাও দাও, দাও দাও।

কিন্তু, প্রতিবাদ নেই, ক্রুদ্ধ গর্জন নেই, হা হা করে বিতাড়ন নেই। সকলেই বিব্রত তবু হাসিমুখর। দিই দিই, দেব, দেব। যা আছে, তাই দেব। গতিক খারাপ। পকেটে হাত দিলাম। কোনরকমে একজনের হাতে তুলে দিলাম পয়সা।

দেবার পরমুহূর্তেই সেই হাসি। নিঃশব্দ, নিরালা, দুস্তর, তেপান্তরের সেই একাকী পথিকের বুকে আতঙ্ক ধরানো পাখীর বিচিত্র তীব্র হো হো সেই লাল জামা, আর পাজতোলা পথ্থী পাড়। তেপান্তরের সেই বিহঙ্গিনী।

সচকিত চোখে তাকিয়ে দেখি, নয়। অনেক, এক রাশ। ভিখারী ভিখারিনী বাহিনী। বেশভূষায় সকলেই একরকম। তার মধ্যেই, ছিন্ন শাড়ি ও জামার জ্বালাই। রুক্ষ চুল, ধূলিধূসরিত মুখ আর হীন ছিন্ন পোশাক। সবচেয়ে [illegible] তার মধ্যেও সিঁদুরের প্রসাধন, শুকনো ফুলের সজ্জা। কারো বুকজোড়া সন্তান।

তারই মাঝে ওই লাল জামা। মধ্যে রয়েছে মিশে। তবু যেন করে আলাদা হয়ে উঠল চোখের [illegible] বোধ হয় চোখেরই দোষ। [illegible] মনেরই। কে জানত, আবার থেকে পয়সা তুলে দিয়েছি [illegible] ছি, কী কলঙ্ক। কী [illegible] সেই শিল্পী, শিল্পীর কাহিনী।

চোখ পড়তে দেখি [illegible] আমার দিকে। [illegible] ছাই। আবার ঠিকরোচ্ছে [illegible] দেখি, ঠোঁটের কোণে [illegible] জ্বরের মধ্যেই তো [illegible] বিদ্রূপের ছোঁয়া। ঠোঁটের [illegible] রেখায়, তার সেই মৃদু [illegible] হাসি। চাউনি দেখে [illegible] হেলানো ঘাড় আর [illegible] ঘুটিয়ে দেখছে আমাকে। [illegible] পড়েছে লুটিয়ে বালুচরে। [illegible] ধর কাঁপছে তার [illegible] চুলে, তার মেটে সিঁদুরের [illegible] কোনো সিঁথিরেখায়, তার [illegible] মিলিয়ে এই উন্মাদিনী [illegible] এক দেশ যেন দেখা দিয়েছে এই সব যাযাবরীর মধ্যে।

একে রূপ বলব কিনা জানিনে। রূপ বলব, বুঝিনে। একে রূপ [illegible] বাঁধে। অরূপ বলতে [illegible] এ রূপের দাম নয়। [illegible] উঠছে না অপরূপ বলে। [illegible] তলোয়ার, নাকি রূপোলী [illegible] কাষ্ঠখণ্ড মাত্র?

মনের তলে আমার বিস্ময়ের ঘোর। ...বরী ভিখারিনীর চোখে মুখে এত ...য়োজনই বা কেন? এত শাণিত দীপ্তি ...সের করুণাপ্রার্থিনীর এ নির্লজ্জ ...ছড়ানো কেন। একি শুধু যাযাবরী ...প্রকৃতেরই স্বভাব। নাকি, ঘরছাড়া ...য়ের সেই চিরাচরিত অভিশপ্ত জীবন ...নীর ক্লেদ। অথবা, জীবন প্রস্তরে ...খেয়ে খেয়ে প্রতি মুহূর্তে সে শাণিত দীপ্ত।

চোখ সরিয়ে নিলাম। লজ্জা হল, ...কণ্ড হল মনে মনে। নিজেকে আমরা ...তে পারি না বোধ হয় ক্ষণেকের তরে। ...ই বলছে, সে সর্বনাশী। আমিও ...ল, সে সর্বনাশী। শুধু সর্বনাশী। ...নাশেরই আয়োজন তার চোখে মুখে ...।

...সে সব হারিয়ে, পথে এসে দাঁড়িয়েছে ...ও পেতে, সর্বনাশের আগুনে তো ...লেছে সে। যার কিছু নেই, সর্বনাশের ...কে সাজে তারই।

...ভিক্ষে দিচ্ছে কেউ কেউ বেছে। ...চোখের পেছনে, ভিখারিনী ...রাণীর মত মাথা তুলে রয়েছে ...। মাথা নুইয়ে অগ্রসর হলাম ...পথিকের স্বভাব-সুলভ চাউনি দিয়ে অভিনন্দিত করতে পারলাম না তার দীপ্ত হাসিকে। সে মন নেই, সে সাহসও নেই।

ঘূর্ণি ঝড় এল, আবার চলে গেল। যেন সেই রূপকথার কাহিনীর আউ মাউ কাউ শব্দের মত ভিখারিনী বাহিনী ছুটে চলল আবার। ওই শব্দের মধ্যে ব্যাকুলতা, ব্যস্ততা। এ ওকে ধাক্কা দিচ্ছে, ও একে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। পরস্পরের মধ্যে হিসেব হচ্ছে, কে কত পেয়েছে। ঝগড়া হচ্ছে, হাসি হচ্ছে।

সমস্তটা মিলিয়ে শোনাচ্ছে একটা ব্যস্ত ত্রাস আর্তনাদের মত।

কারা নিজেদের মধ্যে কথায় কথায় বলছে, হিন্দীতে বলছে, ভিখারিনীগুলো মারাঠার অওরৎ। জানিনে কোন্ দেশের অওরৎ। কিন্তু এদের দেখেছি চিরকাল। দেশের মেলায়, বাজারে, শহরে। কলকাতার শহরতলীতে, শনি রবিবারে দেখেছি দল বেঁধে ঘুরতে।

বিদেশ বেড়ানো নাকি কপালে লেখা থাকা চাই। লিখে দেন নাকি কোন এক বিধাতা। জানিনে, কে সেই বিধাতা যে, ঘরছাড়ার বৈরাগ্যের তিলক এঁকে দেন কপালে। কিন্তু আমার পোড়াকপালে তো সে তিলক কোনদিন পড়েনি জানি। তবু কয়েকবার গিয়েছি নিকট ভারতের এদিকে ওদিকে। কিন্তু ওই জাতের মেয়েদের দেখেছি সর্বত্র।

সেই যেন চিরাচরিত চেহারা। চুল বাঁধার এদের কোন ছিরি ছাঁদ নেই। তবু কেমন একটা রকম আছে। যা শুধু মানায় ওদের রুক্ষ জটায়। কাপড় পরার বিচিত্র ধরন। আমাদের ঘরের মেয়েদের আয়াসসাধ্য বেশসজ্জার চেয়ে ওদের ময়লা কাপড়ের অনায়াস বেষ্টনী তৈরী করে একটি বিচিত্র ছন্দ। আর, কেন জানিনে, ওদের ধূলিমলিন কাঁটি সমাচ্ছন্ন দেহে দেখেছি অটুট যৌবন।

ভাবি, আমরা কত সঞ্চয় করে বেরুই তীর্থযাত্রার পথে। মন্দিরে মন্দিরে ফিরি মাথা কুটে কুটে। ওরা ফেরে শুধু আমাদের পেছনে পেছনে, দুটো পয়সার জন্য। এত যে তীর্থক্ষেত্রের আনাচে কানাচে ঘুরে ফেরে ওরা, ভগবানের এক ছিটা পুণ্যও কি বর্ষিত হয় না ওদের মাথায়।

কোলাহলমুখর জনবন্যার সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে চলছিলাম, আর ভাবছিলাম এমনি এক দার্শনিক তত্ত্ব। আচমকা

কানের কাছে হাসি শুনে থমকে গেলাম। আবার সর্বনাশী। পাশ দিয়ে, আঁচল উড়িয়ে তীরবেগে ছুটে গেল সামনের দিকে কিছু ঠাহর করবার আগেই, চকিতে তার পাল-তোলা নৌকা আঁচলের পাশ দিয়ে উঁকি দিয়ে উঠল দুই খর চোখের দীপ্ত তারা। তারপর নিরালা বনের পাখীর ডাকের মত আকাশে উধাও হয়ে গেল হাসি। পেছনে তাকিয়ে দেখি, তিন চারটি প্যান্ট কোট পরা আধাবয়সী মানুষ, লুব্ধ উৎসুক চোখে লক্ষ্য করছে তার গতিবিধি।

পাশ থেকে কে বলে উঠল, 'হাঁসতি হ্যায়।'

ফিরে দেখি অন্ধ সুরদাস। আপন মনেই বলছে। তার লাঠি এসে ঠেকছে আমার পায়ের কাছে। চোখের দুটি সাদা পর্দা ঠেলে এসেছে সামনের দিকে। পর্দা দুটি কাঁপছে থর্ থর্ করে। আর হাসছে। হাসতে হাসতে আপন মনেই আবার বলে উঠল, 'হাঁসতি হ্যায় কৌন?'

বলে আবার হেসে উঠল নিজের মনে। যেন কথোপকথন করছে কারুর সঙ্গে। হাসতে হাসতেই আবার জিজ্ঞেস করে উঠল, 'রাস্তা তো ঠিক হ্যায়?'

জানিনে, এ শুধু তার কথার কথা কিনা। জানিনে, এ শুধু তার স্বগতোক্তি কিনা। তবু বলে ফেললাম, 'হ্যাঁ, রাস্তা ঠিক আছে।'

'ঠিক হ্যায়?' বলে সে আবার হেসে উঠল। সরল ও বোকাটে মনের অভিব্যক্তির মত সে হাসি। তবু যেন, সামান্য একটু বিস্ময়ের ঘোর তার গম্ভীর কণ্ঠে। একটু বা রহস্য ছোঁয়ানো। তেমনি হেসে আবার জিজ্ঞেস করল, 'বাবুজী, আপ-কা রাস্তা ঠিক হ্যায়?' বলে সে হাঁ করা হাসিমুখে তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। রোদ লেগে সাদা পর্দা দুটি রূপোর মত উঠল চকচকিয়ে। যেন আকাশের বুকে পেতেছে কান। জবাব আসবে ওখান থেকে।

জবাব দিতে গিয়ে থমকে গেলাম। এ আবার কেমন প্রশ্ন? আমি রীতিমত চক্ষুষ্মান মানুষ। অন্ধকে বাতলে দিচ্ছি ঠিক পথের ঠিকানা। সে উল্টে আমাকে জিজ্ঞেস করে, আমার ঠিক ঠিকানা। তবু কথা বলতে গিয়ে আটকালো। পথের ঠিক আছে কিনা কে জানে। কিন্তু এক কথায় তার জবাব দিতে পারলাম না। বিশেষ করে ওই মুখের দিকে তাকিয়ে। আমার জবাব দেওয়ার আগেই সে হেসে উঠল। এই ভিড় ও কোলাহলের মধ্যে অপূর্ব শান্ত উদাস তার কণ্ঠস্বর। বলল, 'কোই নহি রহা সকতা, কিধর গয়ী সড়ক, কহাঁ গয়া রাস্তা। হ্যায় না বাবুজী?'

মনে মনে ভাবলাম, তবে কি সে নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করছিল শুধু? রাস্তা তার ঠিক আছে কিনা, এ শুধু জিজ্ঞাসা নিজেকে। এত লোক চমকে ফিরে তাকে বার বার জবাব দিয়েছে, আর সে শুধু এমনি হেসেছে মনে মনে। তারপর আবার নিজেই বলল বিনীতে, বাবুজী, আমি তো অন্ধ। জন্মান্ধ। মায়ের পেট থেকে পড়ে একটু শিখেছি আমি, রাস্তা ঠিক আছে। সারা সংসার যখন চেঁচিয়ে বলে, স… হ্যায়, তখন আমি দাঁড়িয়ে পড়ি। ঠিক হ্যায়? দুনিয়ার সব ঠিক … তবে আমি কেন সবকিছুর ঠিক প… বাবুজী, গুছিয়ে পড়ো কি, আপ-কা ঠিক হ্যায়?'

বলে আবার সে লাঠিটা … একবার ঘুরিয়ে বসে উঠল, 'রাস্তা হ্যায়?'

তারপর তার কম্পিত সাদা দুটি ঠেকে রইল আকাশে। ওই … সে এগিয়ে চলল আমার পাশে। মুমূর্ষু শিশুর খেয়াল করার মত হাঁ-করা মুখে কখনো হাসি, … গাম্ভীর্য।

কে বলে উঠল, 'কা হে স… গানা কাহে বন্ধ কর দিয়া?'

সুরদাস বোধ হয় গানই … আবার গান ধরল।

সামনে তাকিয়ে দেখি, … করেছে কুমির উঁচু ভূমি। সেই জমির উপরে, নীচ থেকে উঠে … সিঁড়ি। সোজা উঠে, সিঁড়ি … নিয়েছে বাঁদিকে। … বিশাল বটের আড়ালে। তার উপর লাল প্রাচীর বেষ্টিত কেল্লা মাথা … আকাশে। উত্তরাংশের … প্রাচীর নীচের দিকে নেমে এসেছে … প্রাচীরের গায়ে মস্ত একটি অন্ধ… মুখের গহ্বর। গহ্বর মুখ থেকে … একটি সিঁড়ি নেমে এসেছে … সেই গুহামুখ থেকে, পিঁপড়ে পিল্ পিল্ করে নেমে আসছে … সিঁড়ির ধাপ, এমন এঁকেবেঁকে এসেছে, চলন্ত নরনারী … দেখাচ্ছে যেন দূর থেকে দেখা … কর্ণার মত।

শুনেছিলাম, এটি সমুদ্রগুপ্তের … কিন্তু কূপ কোথায়? এ যে … চারদিক থেকে একটি সুরক্ষিত গড়ের মত। হঠাৎ মনে হয় যে সামরিক গাম্ভীর্যে ও কৌশলে এর পাশে গোপন রয়েছে সমরায়োজন।

ট্রামে-বাসে
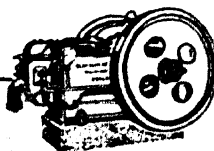
পণ্ডিত জওহরলাল যে-দিন দিল্লী ত্যাগ করিয়া আজমীঢ় যাত্রা করেন ঠিক সেইদিন দিল্লীর এক সংবাদে জানা গেল যে, প্রায় পঁচিশ মাইল দীর্ঘ একটি পঙ্গপালের ঝাঁক দিল্লী অঞ্চলে দেখা দেয়।......"অস্যার্থ একটা নিশ্চয়ই আছে কিন্তু আমরা এ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না, রাজনীতিবিদগণ কথাটা মনে রাখুন এবং সতর্ক হোন"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে জওহরলালজী সদস্যদিগকে একটি নির্দেশ বা উপদেশাবলী দিয়াছেন সেইসব নির্দেশ মানিয়া নিতে অধিকাংশ সদস্যই হয়ত অন্তত নিমরাজি হইয়াছেন। কিন্তু নেহরুজীর "আরাম হারাম হ্যায়" [illegible] অনেকেরই চক্ষু নাকি চড়কবৃক্ষে [illegible] হইয়াছে। তাঁহারা নাকি বলাবলি করিতেছেন যে, চাকুরি, ব্যবসা বা দেশের সেবা যাহাই হউক না কেন, [illegible] সবটাই আরাম। কিন্তু তাই যদি [illegible] হয় তাহা হইলে কিমহং [illegible] [illegible]

* * *

নেহরুজী কংগ্রেসাদি অনুষ্ঠানে সমবেত কণ্ঠে "জনগণমন" গান গাহিবার পরামর্শ দিয়াছেন।—"অ-সুর-[illegible] বেঁটেমোটাই দলে ভিড়ে গেলে

[illegible] দিচ্ছেন; একটুখানি ছাটকাটের [illegible] না রাখলে যে শেষপর্যন্ত [illegible] বৈঠক হয়ে উঠবে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

জওহরলালজী আরও বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন যেন কখনই মেলায় পর্যবসিত না হয়। —"কিন্তু আমরা যে জানতাম রথ দেখার সঙ্গে সঙ্গে কলা বেচা বুদ্ধিমানেরই নীতি"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

ভারতে অবস্থিত গোয়া সরকারকে প্রতারণা করিয়া জনৈক আমেরিকাবাসী অস্ট্রেলিয়ান নাকি ৩৫ লক্ষ টাকা লইয়া উধাও হইয়াছে।—'রকম

সকম দেখে মনে হচ্ছে গোয়া সরকারের ধন-স্থানে শনি চলছে। একটু শান্তি-স্বস্ত্যয়নের বন্দোবস্ত না করলে অদূর ভবিষ্যতে আরো কোথা দিয়ে কী যে হয়ে যাবে বলা শক্ত'—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, দাদরাতে নাকি [illegible] ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। —"সুতরাং দাদরার পর [illegible] খবর বুঝি আসায় হয়ে উঠলো"—মন্তব্য করিল আমাদের শ্যামলাল।

* * *

কালিয়াবোদা মঠে পাগলাবাবা কর্তৃক সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্রের ছবি দেখিলাম,—"এবং মনে মনে ভাবলাম, পাগলাবাবা পাগল হলেও, বেশ সেয়ানা পাগল"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

শ্মশ্রুমণ্ডিত জনৈক ব্যক্তিকে [illegible]তে জনসাধারণ আক্রমণ করিয়া তাহাকে দাড়ি কাটিয়া ফেলিতে বাধ্য করা হইয়াছে। তাহাদের এই ধারণা হয় যে, লোকটা নিশ্চয়ই কালিয়াবোদা মঠের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু আসলে সে নাকি তা নয়। পাঁচ বৎসর পূর্বে পত্নী বিয়োগের পর হইতেই সে দাড়ি ধারণ করিয়াছিল। ট্রামে-বাসের যাত্রীদের অধিকাংশই মাকুন্দচোপা কিন্তু তা হইলেও আমরা ব্যক্তিস্বাধীনতার এবম্বিধ অমর্যাদা সন্দর্শনে ক্ষুণ্ণ হইয়াছি।

* * *

জাপানের তরুণীরা শুনিলাম তাহাদের কেশ কর্তন করিয়া ফেলিতেছেন।—'এটা বোধহয় তাঁদের সাম্প্রতিক প্রেমে-পড়ার দাবীরই প্রতিক্রিয়া—হয়ত তাঁরা—রাঁধবো না, বাঁধবো না চুল বলে বেঁকে বসেছেন"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

ডায়মণ্ড হারবার অঞ্চলে জনৈক ব্যক্তির দাড়িতে সম্প্রতি এক ঝাঁক মৌমাছি চাক বাঁধিবার জন্য নাকি

বসিয়াছিল।—"কবির আহ্বানে কলিমদ্দী মিঞা আসতে পারেন, কিন্তু দাড়ি নাড়ি আসা তো দেখছি সত্যি বিপজ্জনক হয়ে উঠলো"—বলে শ্যামলাল।

* * *

কলিকাতায় সম্প্রতি "সঞ্চয় সপ্তাহ" চলিতেছে। —"কিন্তু সঞ্চয়ঘট কন্দ্রে কী দাঁড়াবে বলা শক্ত, মাঠে এখন মনসুন মিটিং চলছে কি না, তাই!

বহু পরিচিত কাহিনীর সবরসপুষ্ট চিত্রের

বাসররাত্রির উৎসবের
মাঝে
উচ্ছলমনা নারী
জীবন-নাট্যে নে
এলো কালরাত্রি
অমোঘ বিপর্যয়....
....সেই
সকল
ক্রম
কাহিনী
সংলাপ:
গৌর চট্টোপাধ্যা

গান:
প্রণব রায়

রঙ্গজগৎ

—শৌভিক—

নতুন রঙমহলে নতুন নাটক

প্রায় মাস দশেক আগে স্টার থিয়েটার চেহারা সংস্কার করে উদ্বোধিত হয়ে নাট্যজগতে একটা সাড়া নিয়ে আসে। ঘটনাক্রমে ওদের প্রথম নাটক 'শ্যামলী'ও সমবেত চেষ্টায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করায় এই কথাটাই প্রমাণ হয়ে গেল যে পরিচ্ছন্ন ও আরামপ্রদ প্রেক্ষাগৃহ এবং সত্যিই বৈচিত্র্যপূর্ণ নাটক ও শিল্পীদের আন্তরিক চেষ্টা থাকলে বাঙলার মৃতপ্রায় নাট্যালয়ের প্রাণ ও মর্যাদা দুই-ই আবার ফিরে আসতে বাধ্য। স্টার থিয়েটার প্রেরণাও এনে দিয়েছে এবং পথও দেখিয়ে দিয়েছে। তবে সেপথ চট্ করে যে কেউ অবলম্বন করবে সে আশা পূরণ হবার বিশেষ লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। তার কারণ স্টার নতুনভাবে উদ্বোধিত হবার সময়ে আর যে বাকী থিয়েটার ক'টি সে সময় চলছিল তারা দেখেও যেন লজ্জাই না পায় এমন ভাবে ঠিক যেমন চলছিল তেমনিভাবেই নিজেদের চালিয়ে যেতে লাগলো। এমনিভাবে চলতে চলতেই রঙমহল হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। তখন চলছিল 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' এবং চলছিলোও ভালই, তবুও বন্ধ হয়ে যাওয়াটা নাট্যজগতে একটা আতঙ্কেরই সৃষ্টি করলো। একে তো তার আগে থেকেই মিনার্ভা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে পোড়া বাড়ি হয়ে। তবে রঙমহল বন্ধ হলো হাত বদল হওয়ার জন্যে, কিন্তু তাই জানা গেল যে নতুন যারা যুক্তভাবে লীজ নিয়েছেন তারা দুই অংশীদারই চলচ্চিত্রের প্রবাদ পরিবেশক প্রদর্শক। তখন রঙমহলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সব সন্দেহের নিরসন হয়ে গেল। সকলেই যখন উদ্বেগ কলকাতার আধুনিক চিত্রগৃহের আর একটা সংখ্যা বেড়ে যাওয়া অবধারিত বলেই মেনে নিয়েছিল ঠিক সেই সময়েই জানা গেল, তা নয়; ওটা থিয়েটারই থাকবে, এবং শুধু তাই নয়, ওটাকে ভেঙে-চুরে নতুন করে সংস্কারও করে নেওয়া হবে। থিয়েটারের বর্তমান স্বত্বাধিকারী প্রাচী সিনেমা ও মানসাটা ফিল্ম ডিস্ট্রি-বিউটার্সের কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার অগণিত নাট্যামোদী রসিক জনের ধন্যবাদার্হ হয়ে উঠলেন। তারপর প্রেক্ষাগৃহটি যেভাবে সংস্কার করে উদ্বোধন করেছেন সেজন্যে তারা নাট্যরসিক সমগ্র জনসাধারণের অকুণ্ঠ প্রীতি ও শুভেচ্ছা অর্জনে সফল হবেন।

* * *

সংস্কার হয়েছে অবশ্য প্রেক্ষাগৃহের ভিতরটাই বেশী। একেবারে নতুন চেহারাই হয়ে উঠেছে, আগের পাশে ফেলে চেনবারই উপায় নেই। বসবার সাতশো আসনের সবই গদি মোড়া এবং সামনের

উঁচু শ্রেণীতে আরও আরামপ্রদ রবারের গদি। চতুর্দিকে [illegible] থেকে ঝোলানো পাখা নেই ওপরতলার আসন থেকে দৃষ্টির প্রতিবন্ধক হয়ে। পাখা আগের চেয়েও সংখ্যায় অনেক বেশীই বসানো হয়েছে কিন্তু পাশ থেকে এমন-

ভাবে যাতে গৃহের সর্বত্রই দর্শক হাওয়া উপভোগ করতে পারে। প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে চতুর্দিকের দেওয়ালে সুধাংশু চৌধুরীকে দিয়ে ম্যুরাল আঁকাবারও ব্যবস্থা হয়েছে। শিল্পী সুধাংশু চৌধুরীই গৃহটির সংস্কার কাজ সম্পন্ন করেছেন এবং তিনি বেশ প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন মঞ্চটির সংস্কার সাধনে। একটু নতুন চেহারা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন যা অন্যান্য মঞ্চের সঙ্গে একটা বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। শিল্পকৃতিত্বে জ্বলজ্বলে নতুন দৃশ্যপট ও আসবাব। সমগ্রভাবেই ভব্য ও আকর্ষণীয় চেহারা, একটা আধুনিক চিত্রগৃহের মতো আরামপ্রদও। নতুন ব্যবস্থাপনা ও নতুন চেহারার প্রেক্ষাগৃহে শিল্পীদলও বলতে গেলে নতুনদের নিয়েই গঠিত হয়েছে। নতুন বলতে হয় এইজন্যে যে, যে জন তিরিশ শিল্পী যোগদান করেছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই অভিজ্ঞতা পর্দাতে এবং সেইসূত্রেই জনপ্রিয়। এদের মধ্যে হয়তো মাঝেসাঝে কেউ কেউ মঞ্চাভিনয়ে অবতরণ করেছেন, কিংবা পর্দায় প্রতিফলিত হবার আগে হয়তো কোনকালে শখের দলে নাটকে অবতরণ করে থাকতে পারেন, কিন্তু তাঁদের সাধারণ্যে পরিচয় চলচ্চিত্রশিল্পীরূপেই। বোধহয় সেইজন্যেই এদের নাম বিজ্ঞাপিত হওয়ার সময় ব্র্যাকেটে 'ফিল্ম' শব্দ উল্লেখ করে দিতে হচ্ছে। এতে কিন্তু পরোক্ষে মঞ্চের আভিজাত্য ও মর্যাদাকে একটা আঘাতও করা হচ্ছে। কারণ চলচ্চিত্রের গৌরবকে গায়ে মেখে যদি চলতে হয় তাহলে নাট্যালয়ের নিজস্ব ঐতিহ্য আর মর্যাদা রইল কোথায়? [illegible] নিয়ে যোগদানকারী শিল্পীদের [illegible] রয়েছেন দীপক মুখোপাধ্যায় [illegible] কুমার, জীবেন বসু, [illegible] মজুমদার, হরিধন মুখোপাধ্যায় [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণতি ঘোষ [illegible] তপতী ঘোষ, জয়শ্রী সেন, [illegible] ও বাণী গাঙ্গুলী। [illegible] নীতীশ মুখোপাধ্যায়, [illegible] নবীন [illegible] চক্রবর্তী, সন্ধ্যা দেবী প্রভৃতি [illegible] পরিবেশে [illegible] আকর্ষণীয় হয়ে [illegible] আনুষ্ঠানিকভাবে রঙমহলের [illegible] করেন রাজা রায় [illegible] এবং পৌরোহিত্য করেন [illegible] ঘোষ। প্রথম নাটক [illegible] মঞ্চস্থ আরম্ভ হয় পরদিন [illegible]

• • •

সুরভাষিণীর [illegible] নরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং [illegible] করেছেন নতুন ইন্দুদীর [illegible] সেন। দ্বারোদ্ঘাটন হবার [illegible] কিছু রদবদল হয়ে যায়। [illegible] প্রসাদ ঘোষের নাম দেখা গিয়েছিল [illegible] পরিচালকরূপে, পরে দেখা গেল [illegible] দল থেকে বাদ পড়েছেন। তারপর [illegible] দের দলে বহুরূপীদের শম্ভু মিত্র, [illegible] পদ বসু ও তৃপ্তি মিত্র যোগদান [illegible] তারপর তারাও অভিনয় আরম্ভ হবার দিন কয়েক আগে চলে যান। [illegible] শেষমুখে কজন শিল্পীকে অবশ্য গ্রহণ করা হয়, কিন্তু পরিচালনার জন্যে কাউকে নেওয়াও হয়নি, আর শেষ পর্যন্ত